প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

একাদশ ভাগ—প্রথম খণ্ড।

১৩১৮ সাল, বৈশাখ—আশ্বিন।

প্রবাসী কার্য্যালয়,

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

প্রবাসী ১৩১৮ বৈশাখ হইতে আশ্বিন

১১শ ভাগ, ১ম খণ্ড

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়। পৃষ্ঠা।

অকৃতজ্ঞের প্রতিদান (কবিতা) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা ... ৩৩৬
অচলায়তন (নাটক)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৪৫
অধমের দাবী (কবিতা)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা ... ১১২
অনজিমা জাতি বা কাচানাগা (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা ... ৪৭১
অর্ঘ্য (কবিতা)—শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী ... ২৫৫
অশোক ষষ্ঠী (চিত্র)—শ্রীনিরুপমা দেবী ... ১১৯
আবির্ভাব (গল্প)—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৫২৬
আমার চীন প্রবাস (সচিত্র)—শ্রীআশুতোষ রায় ৪৭৪, ৫৭৪
আমেরিকায় ভারতবাসী (সচিত্র)— ... ৫০৩
আয়ার পাটা (সচিত্র)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ... ১৮৩
আর্য্যভারতে গোগ্রাস ভূমি—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম এ, ৩৩৭
আলোচনা—
বরাহমিহির—শ্রীবিনোদবিহারী রায় ... ১০৮
পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান শ্রীবিনোদবিহারী রায় ... ১০৯
হিন্দুর জ্যোতিষ ও পুরাণ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, ... ২০৪
মহাকর্ষণ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, এম্-এ, বি এল, ... ৩৭৩
যৎকিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ৩৭৩
ষ্টুডেণ্ট্‌স্ ফণ্ড—শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু ... ৫৩১
এক পুরুষে জাতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, ৩৭৪
বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যকরূপ—শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, বি এ, ... ৩৭৬
বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৬৮১
আসামী ভাষা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম্-এ, ... ২৯, ২৭০
আসামের আবর জাতি ... ১৭৭
ইতর প্রাণীরা কি বুদ্ধিমান জীব (সচিত্র) শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন ... ২৮০
ইতিহাস বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা—শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম্-এ, ... ৩০২
ইরানে নওরোজ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত... ১
উড়ো চিঠি (গল্প)—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৩৪
উপহার (কবিতা)—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ... ৩৯৯

বিষয়। পৃষ্ঠা।

উষা (কবিতা)—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ... ১০
একখানি অপ্রকাশিত কাব্য—শ্রীজগদীশ্বর রায় ... ৩৮৬
এক নিশ্বাসে যুগযুগান্তরের বিবদমান তত্ত্বের মীমাংসা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, ... ১১০
কবি ও যোগী (কবিতা)—শ্রীহেমলতা দেবী ... ২৬৬
কবির প্রতি (কবিতা)—শ্রীসুশীলা দেবী ... ২৬৪
কবিপ্রিয়া (কবিতা)—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি এল, ৩৬২
কবিসম্বর্দ্ধনা (কবিতা)—বঙ্গমহিলা ... ২৬৫
কবিসম্বর্দ্ধনা (সচিত্র) ... ১১২
কষ্টিপাথর ... ৯৫, ১৯৬, ৩১৭, ৪৩৫, ৫৩৬, ৬৮৮
কাজের লোক (গল্প)—শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪২১
ক্ষণিকের গান (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৩৯২
খণ্ডগিরির যৎকিঞ্চিৎ (সচিত্র) শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, এম-এ, ... ২৮৯
খেজুরের চাষ—শ্রীশরৎচন্দ্র সান্যাল ... ৬৬৮
গীতাপাঠের ভূমিকা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪১, ১১৩, ২১৭, ৩৬০, ৪৯২, ৬২৯
গারোজাতির বিবরণ (সচিত্র)—শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী ... ২৬৭
ঘুমহারা (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি, এ, ৬৩১
ঘুমের রাণী (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৬৭০
চন্দ্র ও সূর্য্য (কবিতা)—শ্রীঅন্নদাচরণ ঘোষ ... ১৬০
চিত্রপরিচয়—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২০৯, ৩১২, ৪৪০, ৬৮
জগৎস্বামী (কবিতা)—শ্রীহেমলতা দেবী ... ১৩৪
জন্ম-দুঃখী (উপন্যাস)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ১৮৯, ২৫৭, ৪২৫, ৫২৪, ৬৭৭
জয়পুর-প্রবাসী বাঙ্গালী (সচিত্র) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ... ২৮৩
জাপানী নারীপরিচ্ছদের বিবর্ত্তন (সচিত্র) ... ৩৮১
জীবন-বৈচিত্র্য (শৈশব)—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ... ১১৬
জীবনস্মৃতি (সচিত্র)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৪১, ৫৯৩
ঝুলন (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৪২৯
ডাউলিং—শ্রীঅতসী দেবী ... ৫৯৮
তটের প্রতি (কবিতা)—শ্রীবিপিনবিহারী দাস, বি এ, ৩৬৮
তদবধি (কবিতা)—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ... ৫২২

বিষয় — পৃষ্ঠা।

শ্রীকালীচরণ মিত্র—
দিব্যদৃষ্টি (গল্প) ... ৮৭
শ্রীকালীপদ বসু—
প্রদেশবিভাগের ব্যবস্থা ও বাঙ্গালীর অবস্থা (আলোচনা)... ৫৯
শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী—
বঙ্গবিভাগের শিক্ষা ... ৪৮৬
শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী—
প্রেম ভিক্ষা (কবিতা) ... ৫৯৯
শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস—
বিধবার কাজ ও ব্রহ্মচর্য্য ... ৩৪৭
শ্রীগঙ্গাচরণ দাশ গুপ্ত—
বিশ্বজয় (কবিতা) ... ২৮
শ্রীগণপতি রায়—
সর্দ্দার স্যার চিনুভাই মাধবলাল ... ৫৪০
শ্রীগিরিশচন্দ্র দে, বি এ,
গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ ... ৪০০
নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ ... ১৮৮
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, বি এ,
গার্ডনিং ... ১৩৮
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ,
অপরাজিতা (গল্প) ... ২১৫
চটির পাটি (গল্প) ... ৩৭৮
চিত্রপরিচয় ইত্যাদি ... ৩০৫, ৫২৮
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, বি-এল্,
গুপ্তমাতৃকা ও সাঙ্কেতিক পরিভাষা ... ৩৩৮
শ্রীজগৎমোহিনী দেবী—
পৌষসংক্রান্তি ... ৬০০
শ্রীজগদানন্দ রায়—
জ্যোতিষিক যৎকিঞ্চিৎ ... ৪০
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল্-এম্-এস,
আলোক ও স্বাস্থ্য ... ৪৮
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত—
ভক্ত কবি তুলসীদাস... ১২৩
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—
পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি ... ৩৮৭
প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ... ৬১, ১২৯, ১৫৭, ৩২৮, ৪৩০, ৫৫২
শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—
বালবিধবা ও ব্রহ্মচর্য্য (আলোচনা) ... ৪৯৪
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা—
রেণু ও বিশ্ব (কবিতা) ... ২৪০
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ,—
বাকি পাঁচশত রূপেয়া (কবিতা) ... ৮৪
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ, বি-এল্,—
রবীন্দ্রমঙ্গল (কবিতা) ... ৪৯০
শান্তশীলা (কবিতা) ... ১৩৬
শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম এ,—
প্রাচীন ভারতে দুগ্ধাদি গব্য ... ৪৭৭
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—
গীতাপাঠ ... ৩৫, ১৫৯, ২৯১, ৩৭২
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ,—
নাসিক ... ২২৬
শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত—
পৌষসংক্রান্তি (আলোচনা) ... ৬০২
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ,
বৃক্ষের উপকারিতা ... ২০
শ্রীনিরুপমা দেবী—
অদ্বৈত (কবিতা) ... ৫৭৩
বঙ্গের প্রথম পৌষ ... ২৪১
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম—
জাতিগঠনে রক্তসংমিশ্রণ ... ৩৯৪
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—
প্রবাসী বাঙ্গালী—সর্ব্বেশ্বর মিত্র ... ৫৬৪
শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী—
মিনতি (কবিতা) ... ৩৫০
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ, ব্যারিষ্টার,—
নবীন সন্ন্যাসী (উপন্যাস ... ৮২, ১৭৯, ২৯৬, ৩৬৪, ৪৯৬, ৫৮১
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী—
আনন্দ (কবিতা) ... ৩৬৪
মনস্কামনা (কবিতা) ... ৫৫৯
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গুপ্ত—
পেঙ্গুইন পক্ষী (সচিত্র) ... ২৬
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—
বাংলা নির্দ্দেশক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (আলোচনা)... ৯৫
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্,—
বহির্ভারত (সচিত্র) ... ৪২৫
ঋগ্বেদের একটি সূক্ত ... ৩৫৭
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী—
জৈনদর্শনের জীবতত্ত্বের একাংশ ... ৪৩৮
শ্রীবিনোদবিহারী রায়—
ঋগ্বেদের একটি সূক্ত (আলোচনা) ... ৪৯১
পালিভাষা নয় (আলোচনা) ... ৯৪

বিষয় — পৃষ্ঠা।

শ্রীবিপিনবিহারী দাস—
পাষাণ ও নির্ঝরিণী (কবিতা) ১১৫
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—
বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ (গল্প) ১১৮
কর্ণেল শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর—
ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল (সচিত্র) ... ৯০
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—
জাতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব ... ৫৩৭
শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি এ,—
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব (সমালোচনা) ... ৩৬
শ্রীমাধুরীলতা দেবী—
দ্বীপনিবাসী ... ৬৭২
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী, এম, আর, এ, এস,—
একটি প্রাচীন গ্রীকমূর্ত্তি ... ৬৩১
শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—
প্রবাসী বাঙ্গালী—স্বর্গীয় ডাক্তার নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সচিত্র) ... ৬৬২
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি এ,
সীতানাথ ঘোষ, (আলোচনা) ৪২৬
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
বাংগলা শব্দের ড় ২৬৪
বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিচার্য্য ... ৩৩১
শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—
সন্ধ্যায় (কবিতা) ১১৫
শ্রীরঘুনাথ শুকুল—
পেচক ও হংস (কবিতা) ৯৭
শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার, এম-এ, এম্, আর, এ, এস্,
জয়মতী (সচিত্র) ১২
শ্রীরজনীরঞ্জন দেব
সোফোক্লিশ ৩৭৪
শ্রীরফিউদ্দিন আহম্মদ—
ভারতীয় নাবিক ৫১৫
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ
বসন্তের আহ্বান (কবিতা) ৫৬২
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
জীবনস্মৃতি ১, ১০৭, ২১৭, ৩১১, ৪১৩, ৫১১
ধর্ম্মের অধিকার ৪৫৯
বাংলা বহুবচন ৯০
ভগিনী নিবেদিতা (সচিত্র) ১৬৩
রূপ ও অরূপ ২৭৩
স্ত্রীলিঙ্গ ১২০
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন—
বসন্ত মহল্লা ৫০০
শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ,—
বাজারে কেনা বেচা ৪৫০
লোকশিক্ষার প্রণালী ৭২
শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ,
মালদহের রাধেশচন্দ্র (সচিত্র) ২১৪
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত—
প্রাচীন ভারত ১৫
শ্রীরামলাল সরকার—
ইউন-সি-খাই ও সম্রাট কোয়াংশুর চরম পত্র - ১৩২
চীন ব্রহ্ম সীমান্তের অসভ্য জাতি (সচিত্র) ৩৫, ৫৪২
শ্রীশরৎকুমার রায়
জাপানের প্রসিদ্ধ বিচারক ৪৬
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল
হর্ষচরিতে ঐতিহাসিক উপাদান ৫১৬
শ্রীশরৎচন্দ্র সান্যাল—
করঞ্জা বৃক্ষ ও করঞ্জা তৈল ১৭৭
শ্রীশশিভূষণ দত্ত—
পৌষ সংক্রান্তি (আলোচনা) ৪২৩
শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ,—
প্রাচ্য-প্রাচীন যন্ত্রবিদ্যা ও পাশ্চাত্য নব্য যন্ত্রবিজ্ঞান ২১
শ্রীশোভনা রক্ষিত—
নব শিক্ষাপদ্ধতি (সচিত্র) ৫৮
শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত—
দেশলাইয়ের কথা ২৮০
শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, এল্‌এল্-ডি, পি-আর-এস,— দিল্লীতে একদিন ... ৩৫০
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এসসি,—
প্রকৃতি-পরিচয় ১৫৫
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—
কবিপ্রশস্তি (কবিতা) ৪৪৯
চীনের জাতীয় সঙ্গীত (কবিতা) ... ২৮১
জন্মদুঃখী (উপন্যাস) ৫৮, ১৯৮, ২৮১, ৩৫৯, ৪৩৪, ৬০৬
তারেন্ট (কবিতা) ৭২
দিবা স্বপ্ন ১০
অধম ও উত্তম (কবিতা) ৬০২
নব্য তুরস্কের জাতীয় সঙ্গীত (কবিতা) ... ১৮৯
বরভিক্ষা (কবিতা) ৪০৩
বৈরাগ্য (কবিতা) ৬০৬
ভাবুকের নিবেদন ৪৫২
রহসি (কবিতা) ৪৩৩

বিষয় — পৃষ্ঠা।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার, বি-এস,—অশ্বের মনস্তত্ত্ব ... ৭১
শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী—নিরাশপ্রণয় (গল্প) ... ৪৫৪
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এল,—
বিরহে (কবিতা) ... ২৮৮
ভক্ত ও তাঁহার নেশা ... ১৫৬
শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী—
শীত ও বসন্ত (কবিতা) ... ৪১০
হৃদয়মন্থন (কবিতা) ... ২৫
শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ—দধি (আলোচনা) ... ৯৪
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাতচল্লিশ রোনিন ... ৪২০
শ্রীসৌদামিনী দেবী,—পিতৃস্মৃতি। ... ৪১২, ৫০৬
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু—বঙ্গের পৌষসংক্রান্তি ... ৩৯০
শ্রীহরিতোষ দত্ত—দিবাভাগে নক্ষত্রদর্শন ... ৯৬
শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী—ভগ্নপোত (গল্প) ... ২৮৩
শ্রীহেমলতা দেবী—
আফ্রিকায় ইসলাম ধর্ম্ম ... ১১৬
মহান্ (কবিতা) ... ২৯০
মাটি (কবিতা) ... ৪০০

চিত্রসূচী

অন্ধ ভিক্ষুক—শ্রীমান মুকুলচন্দ্র দে ... ২০৬
আনবার বে ... ১০৫
আনামের মন্দির ... ৪২৮
আলতামাশের কবর ... ২১২
ইন্দিরা-রাজা, রাজকুমারী ... ৫২০
উইনিফ্রেড ষ্টোনার ... ৫৬
এডলফ্ বার্লি ... ৫৬
কচ ও দেবযানী (রঙিন)—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪১৩
কনফুসিয়ান মন্দির ... ১৭৬
কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বৰ্দ্ধনা সামগ্রী ... ৫১২
কাচিন পুরুষ ... ৫৫৪
কাচিন রমণী ... ৫৪৩
কাচিন রমণীর মোটবহা ঝুড়ি ... ৫৪৬
কাচিন রমণীর পরিচ্ছদ ... ৫৪৭
কাপ্তেন হডসন কর্ত্তৃক দিল্লীর শেষ বাদশাহ বন্দীকৃত ... ২৭৩
কাশ্মীর, শ্রীনগরের চতুর্থ সাঁকোর পশ্চাতে হরিপর্ব্বতে দুর্গ ... ৪৪৩
কাশ্মীর, শ্রীনগরের তৃতীয় সেতু ও শিকারা নৌকা ... ৬২১
কাশ্মীরী ছাত্রগণের জলক্রীড়া ... ৪৪৮
কাশ্মীরী পণ্ডিতের ঝিলাম নদে আহ্নিক ... ১৯০
কাশ্মীরের প্রাচীন মন্দির ... ১৯৫
কাশ্মীরের রাজপ্রাসাদ ... ৪৪২
কুতুব মিনার ... ২৬১
কুতুব মিনারের দ্বার ... ২৬২
কুতুব মিনারের বারান্দার অভ্যন্তর ... ২৬৩
কুমারের দোকান, কাশ্মীরপথে ... ১৯২
গায়কোয়াড়, শ্রীমন্ত সম্পৎ রাও ... ২৪৭
গায়কোয়াড়, সয়াজিরাও, মহারাজা ... ২৫৮
গ্রীক প্রস্তরমূর্ত্তি ... ৩৯৩, ৩৯৪
গ্রীক স্বর্ণমূর্ত্তি ... ৩৯২
চিনার বাগ, কাশ্মীর ... ৩২০
চিন্নভাই মাধবলাল, সদার স্যর ... ৫৪১
চীন দেশের গাড়ী ... ৩৪২
চীনসম্রাট ... ৫২৩
চীন সাধারণতন্ত্রের পতাকা ... ৫০৩
চ্যাং চু চুন, ডাক্তার শ্রীমতী ... ৫২১
জয়দোল, শিবসাগর ... ১৫
জিয়ারং ... ৪৪৭
জুম্মা মসজিদ, দিল্লী ... ২৬৬
ঝিলাম নদের তটে ধর্ম্মশালা-পরিবেষ্টিত হিন্দুমন্দির ... ৪৪৬
টাম্বে, ডাক্তার জি, আর ... ৩৪
টোঙ্গা ... ১৯১
টোঙ্গায় বসিবার স্থান ... ১৯১
ডালহ্রদে সবকারী জলক্রীড়া ও উৎসব ... ৪৪৫
ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল—(৪ খানি চিত্র) ... ৮৯, ৯১
তিব্বতী সর্দ্দার ... ৭১
তিব্বতী সর্দ্দারের স্ত্রী ... ৭২
ত্রিপলি ও ইতালি ... ২০৫
দড়ির পুল, স্যালউইন নদীর উপর ... ৬৬
দিল্লীর দুর্গের কাশ্মীর তোরণ ... ২৬১
দিল্লী প্রাসাদের প্রবেশপথ ... ২৬৪
নদী প্রশস্ত করিবার যন্ত্র ... ১৯৬
নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বর্গীয় ডাক্তার ... ৩১২
নোবার্ট উইনার ... ৫৫
পিকিনের প্রাচীর ... ১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা।
পেঙ্গুইন পক্ষী	২৬
পোষা ময়ূর (রঙিন) - মোলারাম	১০৭
প্রমদাকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত	৪০৮
প্রাদেশিক সমিতির (ফরিদপুর) প্রধান প্রধান প্রতিনিধি	১০৩
ফরমোজা দ্বীপের অসভ্য অধিবাসীর যুদ্ধসজ্জা	৫৯৩
ফরমোজানদিগের ডোঙ্গা	৫৯৪
ফরমোজা দ্বীপের অধিবাসী	৫৯৫
ফরমোজানদিগের নরকপাল সংগ্রহ	৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭
ফরমোজানদিগের উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান	৫৯৬
ফরমোজা দ্বীপে জাপানি পুলিশের ঘাঁটি	৫৯৭
ফরমোজা দ্বীপে জাপানি পুলিশ অসভ্যদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে	৫৯৮
বজরা বা নৌগৃহ	১৯৭
বজ্রযক্ষ	১০২
বড়োদা কেন্দ্র লাইব্রেরীর নক্সা	২৫১
বড়োদা-লাইব্রেরী স্কুলের ছাত্র, ছাত্রী ও অধ্যক্ষগণ	২৫০
বনবাসে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ—(প্রাচীন চিত্র)	২৮
বরামুলা শহর	১৯৬
বর্ডেন, শ্রীযুক্ত	২৪৯
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯
বাহাদুর শাহ	১৭৪
বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত	২৭৯
বিষেণনারায়ণ দর, পণ্ডিত	৩০৬
বুনিয়ার মন্দিরের চত্বর	১৯৪
বেগম জেনৎ মহল	২৭৫
ভগিনী নিবেদিতা	১৬৫, ১৭১
ভারতসম্রাট ও সম্রাজ্ঞী	৩০৮
ভুপেন্দ্রনাথ বসু, মাননীয় শ্রীযুক্ত	৩১০
মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয়	৫৬৩
মধুকরী	৩৭
মরক্কোর প্রতি	২০৫
মর্ম্মর প্রস্তরের পদ্মা ও ন্যায়ের তুলাদণ্ড	১৬৫
মামুদ শফকেৎ পাশা	১০৫
মালদহ জেলার আমেরিকা-প্রবাসী চারিজন ছাত্র	৪০৯
মেয়ো তোরণ ও লৌহ স্তম্ভ	২৭১
মোতি মসজিদের অভ্যন্তর	২৬৫
যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	১০৪
যাত্রী—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৪২৪
যিয়ুস গ্রীক বজ্রের দেবতা	১০২
য়ুয়ন-শিহ্-কাই	৪১১
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১০, ৫১৪
রাও স্বাস্থ্যনিবাসে—সুন্দরাবাঈ গৃহচত্বর	৩৫
রাগিণী মল্লার—প্রাচীন চিত্রকর	১২৬
রাধেশচন্দ্র শেঠ	২১৫
রামকুণ্ড	২২৯
লক্ষ্মণকুণ্ড	২৩০
লিচ্ছ উৎসব ও মিছিল	৬৮
লিচ্ছ পুরুষ	৬৭
লিচ্ছ রমণী	৬৭
লিনা বাইট বার্লি	৫৫
লুথার বারবাঙ্ক	৫৭০
শঙ্করাচার্য্য শৈল বা তখ্‌ৎ-ই সুলেমান	৪৪৫
ষষ্ঠীপূজা (রঙিন)—শ্রীনন্দলাল বসু	৩১১
সত্যশরণ সিংহ, শ্রীযুক্ত	৪১২
সপ্ত-সেতু-নগর	৪৪১
সফদর জঙ্গের সমাধি	২৬৮
সরাইখানার অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে—প্রাচীন চিত্রকর	২৩৮
সর্প ও মহিষের কথোপকথন—প্রাচীন চিত্রকর	৩৫০
সর্ব্বেশ্বর মিত্র, স্বর্গীয়	৫৬৫
সাবিত্রী (রঙিন)—শ্রীমতী সুখলতা রাও	১
সীতাকুণ্ড	২৩০
সুন্দর সিং, ডাক্তার	১০৪
সুবটার, উইলিয়ম মর্গান	৫২৮
সূর্য্যমন্দির, পিকিন	১৭৭
স্বর্গমন্দির, পিকিন	১৭৫
সান্ধ্য-আরাধনা (রঙিন) শ্রীযামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	২০৫
স্বাভাবিক ফল ও লুথার বারবাঙ্ক কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট ফল	৫৭১
হাঁজি	৩২৪
হাঁজি রমণীর ধানভানা	৩২৪
হাঁজি রমণীর জ্বালানি সংগ্রহ	৩২৫
হাঁজিবধূ	৩২৬
হাঁজি পল্লী—শ্রমজীবী	৩২১
,, কর্ম্মজীবী	৩২২
,, শালীওয়ালা	৩২৩
হাঁজি বজরা-ওয়ালী	৩২৩
হাঁজি রমণীর বেণীবন্ধন	৩২৩
হিন্দুরাজত্বকালের স্তম্ভশ্রেণী, দিল্লী	২৭

পড়ছে মনে ক'নে তোমার মরা মায়ের মুখ,
সুজনী গায়ে রুমাল মাথায়,— হয়নি তো অসুখ ?
লুকিয়ো না ডিম তুঁষের ভিতর লুকিয়ো না বেবাক,
নওরোজে দাও আমায় দুটো, গতর সুখে থাক।

নওরোজে নয় দোলা
আমার তরে ঝোলা,
হারিয়ে গেছে টুপি কোথায়
জামার বোতাম খোলা !

হাজির হ'ল নূতন বছর ক্ষেত্রে খামারে,
ঘোড়া কোথায় বাঁধব ? এখন বল্ তা' আমারে।
নওরোজে আজ খোশ্ মেজাজে না দিলে বক্শিশ্
গমের ক্ষেতে বাঁধব ঘোড়া কাঁদবে যবের শীষ।
বন্ধু ও গো বন্ধু তোমার ঠোঁট দু'খানি বেশ,
ঠোঁটের উপর তিলটি কালো কালো মাথার কেশ;
ঘরের কোণে আপন মনে খুঁ'চ্ছ যে কিস্মিশ ?
পেস্তা বেছে রাখ্ছ কেন ? পোলাও হবে ? ইস্ !
দেরী অত সইবে নাক' দাও কিছু বক্শিশ্।
মস্ত বাড়ী খাসা বাড়ী আমীরী কারখানা,
গরীবখানা নয়কো মিঞা, মির্জ্জা-মালিক-খানা।
ডিমের হিসাব রাখ্ছে, দেখ, মীর মালিকের মেয়ে,
একটি ডিমের নেইক হিসাব কেউ ফেলেছে খেয়ে !
নতুন ক'রে হিসাব কর আমাদের মুখ চেয়ে।
একটি দিলেও নিইগো মোরা দুটি দিলেও নিই,
মোটে যদি না দাও তবে বাঁচবে নাক' জী';
মনের দুঃখে মারা যাব, বলব তোমায় 'ছি';
গোরের খরচ গুণতে হ'বে মীর মালিকের ঝি।

তোমার ছেলে খাসা,
রাজবাড়ী তার বাসা,
মোড়ল হ'তে পারবে, এমন
হচ্ছে মোদের আশা।

পাহাড়তলীর বিবি মোদের সুর্ম্মা-আঁকা চোখ্
ভগবানের দোহাই তোমার একটি খোকা হোক্।
সুখ-বাহারীর কন্যা ওগো কণ্ঠে কুচের হার,
নওরোজের এই নূতন হাওয়ায় যন্ত্রে চড়াও তার !
পালাই কোথা লুকাই কোথা মরি যে লজ্জায়,
ছেলের দলে হাঁকিয়ে দিয়ে কৃপণ খানা খায়।
দৌড়ে যেও ফুটল কাঁটা বাজল পাথর পায়,
নওরোজের এই নূতন নিশি সুখেই যেন যায় !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমাজতত্ত্বের এক অধ্যায় *

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় কোন একটী জাতি চিরকাল আপনার সভ্যতা ও প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। আর্য্য, মিশর, চীন প্রভৃতি জাতি ধীরে ধীরে উন্নতিশিখরে আরোহণ করিল, আবার কিছুকাল পরে অনিবার্য্যভাবে শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতনের গহ্বরে নামিয়া গেল। আজ ইউরোপীয় জাতিগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু কতকাল তাঁহারা এই অভ্যুদয় সম্ভোগ করিবেন তাহা চিন্তার বিষয়। ইহারই মধ্যে তদ্দেশীয় মনীষিবর্গ জাতীয় অবনতির ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন; যে পথে আর্য্য, মিশর ও চীন গিয়াছে তাঁহাদেরও কি সেই পথে যাইতে হইবে? এই ভয়ঙ্কর অদৃষ্টের হস্ত হইতে কি তাঁহারা কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না?

একদল বলিতেছেন, না। উন্নতির পর অবনতি জাতীয় ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা—উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। অপর দল বলিতেছেন অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা লজ্জার বিষয়; মিশর ও গ্রীকের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিগণের ভাগ্যেও যে তাহাই ঘটিবে এটা জোর করিয়া বলা যায় না। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সাহায্যে হয়ত এমন উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে যাহার সাহায্যে তাঁহারা এই দুর্ভাগ্য হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। অন্ততঃ চেষ্টা করিলে "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া দিতে পারা যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন, এই চেষ্টাবাদিগণ কিরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন তৎসম্বন্ধে আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

* ২৩শে ফেব্রুয়ারি, দেবালয়ে পঠিত।

প্রথমে দেখা আবশ্যক কি কি কারণে জাতীয় অবনতি সংঘটিত হয়। কেহ কেহ বলেন, একজন মানুষের জীবনে যেমন বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু, একটী জাতির জীবনেও সেইরূপ। বহুকালব্যাপী সভ্যতার পর একটী জাতি জরাগ্রস্ত হইয়া তেজহীন হইয়া পড়ে, তখন নব-যৌবনদৃপ্ত একটী সদ্য-সভ্য জাতির দ্বারা ইহা বিনষ্ট হয়। ইহার উত্তরে অপর পক্ষ বলেন, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের রূপক জাতির প্রতি প্রযুজ্য নহে, কেননা পঁচিশ বৎসর অন্তর জাতি আপনাকে নূতন করিয়া লয়। বৃদ্ধগণ মরিয়া যান এবং শিশু ও যুবাগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করে—এইরূপে একটী জাতির যৌবন অনন্ত বলা যাইতে পারে।

বিভিন্ন জাতির অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ বিলাসিতা-বৃদ্ধি দ্বারা জাতীয় চরিত্রহানি, অজ্ঞানতার প্রকোপ, সংসারে বৈরাগ্য, প্রভৃতি যেসকল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলিকে এককথায় পারিপার্শ্বিক (environments) অবস্থার প্রভাব বা কুশিক্ষার প্রভাব নামে অভিহিত করা যায়। সম্প্রতি জীবতত্ত্বের উন্নতির পর বিজ্ঞানের আলোক-সাহায্যে জাতীয় ইতিহাস পাঠ করা হইতেছে। যেসকল প্রাকৃতিক নিয়ম ইতর প্রাণিগণের মধ্যে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলি প্রধানতঃ মনুষ্যজাতির মধ্যেও প্রয়োগ করা হইতেছে। ইহার ফলস্বরূপ জাতীয় উন্নতি-অবনতির দ্বিতীয় একটী কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাকে এক কথায় কৃত্রিম নির্ব্বাচন বলা যাইতে পারে। কৃত্রিম নির্ব্বাচন কি তাহা পরে বুঝান যাইবে।

এখন কথাটা দাঁড়াইতেছে এই, একটী জাতির উন্নতি বা অবনতির অর্থ সেই জাতীয় ব্যক্তিবর্গের উন্নতি বা অবনতি*; এই ব্যক্তিবর্গের ভাল বা মন্দ হওয়া মুখ্যতঃ দুইটী কারণের উপর নিভর করে। প্রথমতঃ তাহারা কিরূপ প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ তাহারা কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছে। দুইটী কারণই সমান প্রভাবশালী। সকলেই জানেন ভিন্ন ভিন্ন শিশু ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইয়া জন্মায়—এক এক জন সুন্দর মেধাবী, অতি অল্প আয়াসে পাঠ আয়ত্ত করে, আবার এক এক জন মেধাহীন, কিছুতেই পাঠ প্রস্তুত করিতে পারে না; কেহ কেহ স্বভাবতঃ দয়ালু ও স্বার্থত্যাগী, কেহ কেহ স্বভাবতঃ নির্দ্দয় ও স্বার্থপর। বাস্তবিক, যেমন শিশুগণ বিভিন্ন আকৃতি লইয়া জন্মায় তেমনই বিভিন্ন মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূহ লইয়া জন্মায়। গাধা পিটিয়া যেমন ঘোড়া করা যায় না, সেইরূপ নির্ব্বোধ বা স্বার্থপর শিশুকে শিক্ষার দ্বারা পণ্ডিত বা স্বার্থত্যাগী করা যায় না।

আবার মনুষ্যজীবনে শিক্ষার প্রভাবও বড় কম নয়। শিক্ষার অর্থ কেবলমাত্র অধ্যয়ন বুঝিলে চলিবে না—পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী দ্বারাই শিক্ষা প্রধানতঃ সম্পাদিত হয়। শিশু যেরূপ সংসর্গে থাকিবে কতকটা সেইরূপ হইবে—স্বভাবতঃ দয়ালু শিশুও নিষ্ঠুর ব্যক্তিগণের সহবাসে থাকিয়া অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য করিবে। বুদ্ধিমান বালক অধ্যয়নের অভাবে মূর্খ হইবে, বলিষ্ঠ ও সাহসী বালক ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষার অভাবে পালওয়ান বা সৈনিক হইতে পারিবে না। একই শিশু বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইলে বিলাসী ও চিন্তাশক্তিহীন হইবে এবং দারিদ্রোর সহিত সংগ্রাম করিয়া কষ্টসহিষ্ণু ও চিন্তাশীল হইবে।

কাজেই দেখা গেল কোন ব্যক্তির পাণ্ডিত্য, ধার্ম্মিক বা সৈনিক হওয়ার পক্ষে স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহও যেমন আবশ্যক, শিক্ষা বা সেই বৃত্তিসমূহের অনুশীলনও তেমনি আবশ্যক। একের অভাবে অপরটী পণ্ড হইয়া যায়। গণিতের একটী সঙ্কেত দ্বারা এই বিষয়টী স্পষ্টীকৃত করা যায়। মনে করুন স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির নাম 'ক' এবং শিক্ষার নাম 'খ' এবং মানবের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ সে কিরূপ লোক হইল তাহার নাম 'গ'। তাহা হইলে

$$গ = ক \times খ$$

এখন যদি 'ক' সামান্য সংখ্যক হয় কিন্তু 'খ' অধিক সংখ্যক হয়, তাহা হইলে উহাদের গুণফল 'গ' নিতান্ত কম হইবে না। কিন্তু যদি 'ক' = ০ হয় তাহা হইলে 'খ' যত বড় সংখ্যাই হউক না কেন উহাদের গুণফল 'ক × খ' শূন্য

* জাতীয় জীবনে কতকগুলি আকস্মিক ঘটনারও (accidents) প্রভাব আছে; যেমন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পরাক্রান্ত আফগান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের পরাধীনতার একটী কারণ। কিন্তু এই কারণগুলি তেমন ক্ষমতাশালী নহে; হিন্দুজাতির ভিতরে যদি ঘূণ না ধরিত তাহা হইলে এসকল বিপদ হইতে সে উত্তীর্ণ হইত সন্দেহ নাই।

হইবে। তেমনি যদি 'খ'=০ হয় তাহা হইলেও 'ক' যত বড়ই হউক না 'ক×খ'=০।* পরে দেখান যাইবে এই 'ক' বংশানুক্রমের উপর নির্ভর করে।

কতকগুলি পণ্ডিত—সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায় ইঁহাদের অগ্রণী—বিবেচনা করেন যে সমাজের অবস্থা যদি এমন করা যায় যে প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে স্বাস্থ্যকর উপায়ে বর্দ্ধিত হইবে, তাহাদের শিক্ষার প্রথা এরূপ করা যায় যে প্রত্যেকেই একজন সমাজের হিতকর ব্যক্তি হইতে পারিবে, তাহা হইলেই সমাজের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইবে। বিভিন্ন শিশুর শক্তির উপযোগী বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় আমরা অনেককে জীবনেও অকৃতকার্য্য করিয়া ফেলি। এক কথায় ইঁহারা সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষার উপরই বিশেষ আস্থাবান অর্থাৎ আমাদের উপরকার সমীকরণের 'খ' চিহ্নিত বিষয়টী-তেই ইঁহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই এই মতের একদেশদর্শিতা বুঝিতে পারা যাইবে। ইঁহারা বিস্মৃত হন যে শিক্ষা বালকের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলে মাত্র, তাহাদের সৃষ্টি করিতে পারে না। উন্নত প্রণালীর শিক্ষায় অনেক সুফল আশা করা যায় সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বালকগণ যাহাতে উৎকৃষ্টতর বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার ত ব্যবস্থা করিতে হইবে!

সুখের বিষয় সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একটী জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ কিরূপ প্রকৃতি লইয়া জন্মাইতেছে তাহা লইয়া অর্থাৎ আমাদের সমীকরণের 'ক' চিহ্নিত বিষয়টী লইয়া—যথেষ্ট আলোচনা করিতেছেন। জীবতত্ত্বের কয়েকটী আবিষ্কার তাহারা সমাজতত্ত্বে প্রয়োগ করিয়া শেষোক্ত বিষয়টীকে যথার্থ বিজ্ঞানের পদবীতে উন্নীত করিয়াছেন। এই আবিষ্কারগুলি কি, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক।

(১) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ম্যালথস এক অদ্ভুত পুস্তকে লিখিলেন মানবসমাজে যে অনুপাতে লোক বৃদ্ধি হয় সে অনুপাতে খাদ্য বৃদ্ধি হয় না।† কাজেই কিছুকাল পরে সমাজে খাদ্যাভাব হয়—তাহার ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারি বা যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি হইয়া লোকক্ষয় হয়—যাহারা দুর্ব্বল ও নির্বুদ্ধি তাহারা মারা পড়ে, বলবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া থাকে এবং তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভাবিতেছিলেন কেমন করিয়া নানাপ্রকার জীবের উৎপত্তি হইল। কিছুকাল হইতে একটা মত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছিল যে, আদিতে সমুদায় জীবই একপ্রকার সামান্য গঠনের জীবাণুর ন্যায় ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার আকৃতি প্রকৃতি বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রধান কারণটা কি তাহা অবধারিত ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় ম্যালথসের আবিষ্কৃত নিয়মটী সমুদায় জীবজগতে বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করাতেই সব পরিস্কার বুঝা গেল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ডারউইন ও ওয়ালেস্ দেখাই-লেন বংশবৃদ্ধি দ্বারা দুইটী জীব হইতে বহুসংখ্যক জীব উৎপন্ন হওয়া সম্ভব কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই খাদ্যাভাবে ও অন্যান্য কারণে মরিয়া যায়। পিতা মাতার সকল সন্তানই ঠিক একরূপ হয় না। তাহাদের মধ্যে যেগুলি অধিকতর বল বা বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায় বা কোনওরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় সেই সময়কার প্রাকৃতিক অবস্থার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বা যোগ্যতম তাহারাই বাঁচিয়া যায় এবং ইহাদের বংশ ইহাদের তুল্য বলবুদ্ধিসম্পন্ন ও আকৃতিবিশিষ্ট হয়। এইরূপে পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের মধ্যেও অল্পে অল্পে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এরূপ পরিবর্ত্তন বহুকাল-সাপেক্ষ।

(২) স্পেন্সারের আবিষ্কার।

ম্যালথস মোটামুটী লোকবৃদ্ধির কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু স্পেন্সার দেখাইলেন (১৮৬৭ খৃঃ) সমাজের সকল শ্রেণীই একভাবে বাড়ে না, যে শ্রেণী বিদ্যা বুদ্ধিতে এবং ঐশ্বর্য্যে যত শ্রেষ্ঠ তাহাদের মধ্যে বংশবৃদ্ধিও তত কম। সমস্ত জীবজগতেই দেখা যায় যতই জীব শারীরিক গঠনে শ্রেষ্ঠতা-লাভ করিতে থাকে ততই তাহাদের সন্তান-জননের শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। কীট পতঙ্গ বা মৎস্যের যে সংখ্যায়

* Dr. Saleeby's Parenthood and Race Culture, p. 127.

† Malthus's Essay on the Principle of Population (6th Ed.), Vol. I, pp. 6—17.

সন্তান হয় স্তন্যপায়িগণের সেরূপ হয় না, আবার মানুষের সন্তানের সংখ্যা অন্যান্য স্তন্যপায়ীর অপেক্ষা কম। মানুষের মধ্যেও সভ্যজাতির জননশক্তি অসভ্যজাতির অপেক্ষা অল্প এবং সভ্যজাতির মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর লোকের জননশক্তি নিম্নশ্রেণীর লোকের অপেক্ষা অল্প।*

(৩) বংশানুক্রম।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্যাল্টন জাতীয় ইতিহাসে বংশ-প্রভাবের কথা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচারের সূত্রপাত করিলেন। বহুকাল হইতেই মানুষের ধারণা আছে সন্তান যেমন পিতা মাতার আকৃতি লইয়া জন্মায় তেমনি তাঁহাদের মানসিক ও নৈতিক গুণাবলিরও উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এইজন্য এক একটী জাতি বা এক একটী বংশ এক একরূপ গুণের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কিছুকাল হইতে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি ইতর প্রাণীর মধ্যে পরীক্ষা করিয়া ভাল বা মন্দ প্রাণী হওয়ার পক্ষে বংশের প্রভাবই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ইহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। এইজন্য ইয়ুরোপীয় পশুপালকগণ আরবী ঘোড়ার সহিত অন্য জাতীয় ঘোড়ার মিশ্রণে শেষোক্ত ঘোড়ার বংশ (Breed) উন্নত করেন। ঘোড়দৌড়ে যেসকল ঘোড়া জিতে তাহারা সকলেই ঘোড়াদের মধ্যে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই নিয়ম মানুষের প্রতি প্রয়োগ করিতে গিয়া অনেক বাদানুবাদের উৎপত্তি হয়। গ্যাল্টন অনেক প্রতিভাবান লোকের জীবনী সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন ইহাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই সাধারণ লোকের অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন—অর্থাৎ একই বংশে অনেক বীর বা একই বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ হইয়া প্রতিভাবান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কাজেই বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ বংশানুক্রমিক (hereditary)।† ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিলেন পণ্ডিতের পুত্রের পক্ষে পণ্ডিত হওয়া বা যোদ্ধার পুত্রের পক্ষে যোদ্ধা হওয়া বাল্যকালের শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধার উপর নির্ভর করে, বংশপ্রভাবের উপর নহে। এক কথায় আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সমীকরণের 'ক' ও 'খ' বিষয় লইয়া বিবাদ বাধিল। শেষে মীমাংসা দাড়াইল একব্যক্তি কিরূপ শক্তি লইয়া জন্মায় তাহা তাহার বংশ-প্রভাবের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তবে সেই শক্তিগুলির পরিস্ফুটনের জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধার আবশ্যক, নহিলে কিছু হইবে না।

গ্যাল্টনের কতকগুলি পরীক্ষা এইরূপ। তিনি বহুসংখ্যক যমজ ভ্রাতার বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহা হইতে দেখাইলেন যে যদিও, অনেক স্থলে দুই ভাই দুই ভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে তথাপি তাহাদের বুদ্ধি ও চরিত্রের অদ্ভুত মিল ছিল।

গ্যাল্টনের মতাবলম্বী আচার্য্য কার্ল পিয়াশন কতকগুলি সুন্দর পরীক্ষা করেন। তিনি স্কুলের বালকগণের মধ্যে এক এক পরিবারভুক্ত বালকগণের দৈহিক গঠনের (যেমন শারীরিক দৈর্ঘ্য) কি পরিমাণে সাদৃশ্য আছে তাহা দেখিলেন এবং তারপর সেইসকল বালকের বুদ্ধি ও চরিত্রের মধ্যে কি পরিমাণে সাদৃশ্য আছে তাহাও দেখিলেন —তাহাতে প্রমাণ হইল যে, যে পরিমাণে শারীরিক গঠন মিলে সেই পরিমাণেই বুদ্ধি ও চরিত্র মিলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সন্তান পিতা ও মাতা উভয়েরই গুণের অধিকারী হয়, সাধারণলোকে এই কথাটী বিস্মৃত হইয়া অনেক ভ্রান্ত মত প্রচার করেন। অমুক চরিত্রবান পিতার পুত্র চরিত্রহীন, অমুক বুদ্ধিমান পিতার পুত্র নির্বুদ্ধি প্রভৃতি উদাহরণ দিয়া তাঁহারা বংশপ্রভাবের অলীকতা প্রতিপাদন করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা দেখেন না মাতা কিরূপ গুণসম্পন্না ছিলেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া কঠিন, এই জন্য সেই ব্যক্তির মাতুল বা মাতামহ কিরূপ প্রবৃত্তির লোক ছিলেন তাহার আলোচনা করিলে বংশপ্রভাবের সত্যতা অনেকস্থলে প্রতিপাদিত হইবে।

শুধু পিতা মাতা নহে, পিতামহ ও মাতামহের গুণাবলীও এক ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে গ্যাল্টনের নিয়মটী এই :—এক ব্যক্তি তাহার প্রত্যেক গুণের $\frac{1}{2}$ অংশ পিতা ও মাতার নিকট হইতে লাভ করে, (পিতার নিকট $\frac{1}{4}$, মাতার নিকট $\frac{1}{4}$) $\frac{1}{4}$ অংশ পিতামহ,

* Spencer's Principles of Biology, Vol. II. Secs. 343 et seq.

† Galton's Hereditary Genius.

পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহীর নিকট হইতে পায়, $\frac{১}{৮}$ অংশ প্রপিতামহ ও প্রপিতামহী, প্রমাতামহ ও প্রমাতামহী এবং পিতামহীর ও মাতামহীর পিতামাতা, সর্ব্বসুদ্ধ এই আট জনের নিকট হইতে পায় ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলেই জানেন এই ($\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{১৬}+\cdots\cdots$) একের সহিত সমান।* কাজেই একটা সদ্যজাত বালকের মন একটা সাদা কাগজের মত নহে, একখানি হিজিবিজি-কাটা কাগজের মত—তাহাতে বালকের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বহু ব্যক্তির বুদ্ধি ও চরিত্র যেন বিভিন্ন নক্সার ন্যায় আঁকা রহিয়াছে,—নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষের নক্সাগুলি বড় বড়, দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষের নক্সাগুলি ছোট ছোট, প্রায় মুছিয়া আসিয়াছে।

এরূপ প্রায়ই দেখা যায় যে পিতার একটী গুণ পুত্রে দেখা গেল না কিন্তু পৌত্রে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। আবার এরূপও কখনো কখনো দেখা যায় যে পিতা ও পিতামহে বা প্রপিতামহে যে গুণ দেখা যায় নাই তাহা পুত্রে দেখা গেল। এখানে বুঝিতে হইবে পুত্র কোনও দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষের গুণ লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ বালকের মনরূপ নক্সা-কাটা কাগজখানির একটী ছোট নক্সা অনুকূল অবস্থা পাইয়া বেশ বাড়িয়া উঠিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

এখন কথা হইতেছে কোন্ কোন্ গুণগুলি বংশানুক্রমিক এবং কোনগুলি নহে তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে কেহ কেহ ভাবিতেন এক ব্যক্তি যদি ব্যায়াম করিয়া মাংসপেশী বর্দ্ধিত করেন বা বিদ্যালোচনা দ্বারা মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে সন্তান তাঁহাদের বর্দ্ধিত মাংসপেশী বা মস্তিষ্কের উত্তরাধিকারী হইবে। কিন্তু বাইসম্যান নামক একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ব-বিদ প্রমাণ করিয়াছেন যে, একজন স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা যে, সকল গুণ উপার্জ্জন করে তাহা তাহার সন্তান পায় না। বাইসম্যান নিম্নলিখিত রূপ একটী পরীক্ষা করেন। তিনি কতকগুলি ইন্দুরের ল্যাজ কাটিয়া দিলেন এবং এই ল্যাজকাটা ইন্দুরগণের বংশে যাহারা জন্মিল তাহাদের সকলের ল্যাজ কাটিয়া দিলেন—এইরূপে কয়পুরুষ ধরিয়া ল্যাজকাটা ইন্দুরের বংশে যাহারা জন্মিল তাহারা সকলেই ল্যাজওয়ালা। এই প্রকারের কতকগুলি পরীক্ষা হইতে বাইসম্যান সিদ্ধান্ত করিলেন অবস্থার প্রভাবে এক ব্যক্তির যেসকল গুণ উপার্জ্জিত হয় তাহা সন্তান দ্বারা উত্তরাধিকৃত হয় না। এক ব্যক্তির পাণ্ডিত্য (বুদ্ধির কথা বলিতেছি না) বা যুদ্ধকৌশল (যুদ্ধশিক্ষার্থ স্বাভাবিক পটুতা স্বতন্ত্র) তাহার পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পাইবে না, তাহাকে আবার গোড়া হইতে শিখিতে হইবে। পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ হইতে পারে কিন্তু তাহার পৌত্রের পণ্ডিত হওয়ার পক্ষে তাহাতে কিছু অসুবিধা হইবে না (এখানে অবস্থার কথা বলিতেছি না, কেবল স্বাভাবিক বৃত্তি সম্বন্ধে বিচার করিতেছি), কেননা পিতামহের বুদ্ধি পিতার ভিতর দিয়া পুত্র লাভ করিবে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে উহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। কোনও আকস্মিক ঘটনায় পিতা যদি অন্ধ, খঞ্জ বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পুত্রের স্বাভাবিক বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। এই জন্য দেখা যায় দারিদ্র্য প্রযুক্ত হীনস্বাস্থ্য ব্যক্তির সন্তান ভাল অবস্থায় প্রতিপালিত হইলে বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া থাকে।

মোটামুটী বলিতে গেলে, প্রধান প্রধান মানসিক বৃত্তি-গুলি, যেমন স্মৃতিশক্তি, বুঝিবার শক্তি, চিন্তাশক্তি, এবং প্রধান প্রধান নৈতিক বৃত্তিগুলি, যেমন নিঃস্বার্থপরতা, সাহস প্রভৃতি, বংশানুক্রমিক। সদ্বৃত্তির ন্যায় অসদ্বৃত্তিগুলিও, যথা নির্ব্বুদ্ধিতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, এমনকি মদ্যপানে আসক্তি পর্য্যন্ত, সন্তান পিতামাতার নিকট হইতে পায়। শারীরিক আকার ও বর্ণ যে বংশানুক্রমিক তাহা বলা বাহুল্য। তথাকথিত মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে শরীরের অংশীভূত মস্তিষ্কের গুণ মাত্র। সন্তান তাহাদের দেহের অস্থিগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যেমন পিতৃপুরুষের নিকট হইতে লাভ করে তেমনি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট মস্তিষ্কও তাহাদের নিকট হইতে পায়।

কতকগুলি ব্যাধি আছে যেমন মূক-বধিরতা (deafmut-ism), উন্মাদ, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি যেগুলি বংশানুক্রমিক বলিয়া বিবেচনা করিবার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—এবং অপর

* অবশ্য নিয়মটী মোটের উপর সত্য, কোনও কোনও ব্যক্তিবিশেষের বেলা না খাটিতেও পারে। Vide Prof. J. A. Thomson's Heredity, pp. 324-325.

কতকগুলি রোগ, যেমন ক্ষয়কাশ, বংশানুক্রমিক কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।*

এতক্ষণে বোধ হয় স্পষ্ট বোঝা গিয়াছে যে এক ব্যক্তি কিরূপ বৃত্তিসম্পন্ন হইবে তাহা বংশানুক্রমের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এইবার জীবতত্ত্বের এইটী এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী সিদ্ধান্ত সমাজতত্ত্বে কিরূপে প্রয়োগ করা হইতেছে দেখা যাউক।

যেমন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থার জীবের উৎপত্তি হইয়াছে সেইরূপ কতকগুলি অসহায় মানবসমষ্টি হইতে নানা জটিল নিয়মযুক্ত ক্ষমতাশালী সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ পুরাকালের কতকগুলি অসভ্য সমাজ হইতে ক্রমবিকাশের ফল স্বরূপ বর্ত্তমান-কালের সুসভ্য সমাজগুলি বাড়িয়া উঠিয়াছে।† প্রথমকার অসভ্য সমাজের মধ্যে যেসকল ব্যক্তি রুগ্ন বা দুর্ব্বল বা নির্বুদ্ধি হওয়ায় জীবন-সংগ্রামের অনুপযুক্ত হইত তাহারা মরিয়া যাইত, কেবল সবল ও বুদ্ধিমান লোকেরা বাঁচিতে ও বংশরক্ষা করিতে পারিত। এইরূপে সেই সমাজে ক্রমে সবল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িতে থাকিল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সমাজ উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে থাকিল। অসাধারণ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার কিরূপে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও বিধিব্যবস্থার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন; সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। আপাততঃ একটা কথা কেবল আমাদের দরকারী। সমাজ যতই উন্নত ও সভ্য হইতে লাগিল তাহার মধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাব ততই হ্রাস পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেসকল রুগ্ন বা দুর্ব্বল ব্যক্তি রোগের হাতে বা শত্রুর হাতে মারা পড়িত, এক্ষণে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহায়তা এবং শান্তিরক্ষক প্রভৃতির নিয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করা হইতে লাগিল। যেসকল নির্ব্বুদ্ধি লোকের অন্নাভাবে মারা পড়িবার কথা, তাহারা দাতার প্রদত্ত অন্নে পুষ্ট হইতে লাগিল; যেসকল সমাজদ্রোহী ব্যক্তিকে অসভ্য সমাজের কঠিন শাস্তি মতে বধ করা হইত তাহাদিগকে সামান্য শাস্তির পর অব্যাহতি দেওয়া হইতে লাগিল। আবার ধন, মান প্রভৃতি কতকগুলি কৃত্রিম প্রভেদের সৃষ্টি হওয়ায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পথ আরও রুদ্ধ হইল; রুগ্ন, নির্ব্বোধ বা পাপাত্মা, ধনীর উচ্চপদস্থ হইলে অনায়াসে বংশবৃদ্ধি করিতে পারিল। এইসকল অযোগ্য লোকের বংশবৃদ্ধি হইয়া সভ্যসমাজে বহুসংখ্যক অযোগ্য লোকের সৃষ্টি হইল। এইসকল লোকের ভরণ পোষণের ভার পড়িল যোগ্যতর ব্যক্তিগণের উপর। এখন যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই ভারে পীড়িত হইয়া এবং সমাজে বিলাসিতা প্রভৃতি অন্যান্য কারণে আপনাপন বংশবৃদ্ধির প্রতি উপেক্ষা করিতে থাকেন; আর, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইঁহাদের জননশক্তিও নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের অপেক্ষা অল্প। এইরূপে কিছু কালের মধ্যে একটী সভ্যসমাজে যোগ্যলোকের হ্রাস ও অযোগ্য লোকের বৃদ্ধি হয়, তখন কাজে কাজেই সে সমাজ অবনত হইতে থাকে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিপরীত এই কৃত্রিম নির্ব্বাচনই জাতীয় অবনতির দুইটী প্রধান কারণের অন্যতর বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, জাতীয় উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে সমাজে যোগ্য লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং অযোগ্য লোকের সংখ্যা হ্রাস হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত—অর্থাৎ সমাজে এরূপ নিয়মসকল প্রচলিত করা আবশ্যক যাহাতে যোগ্য ব্যক্তিগণ বংশবৃদ্ধি করেন এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণ বংশবৃদ্ধি করিতে না পারেন। সকলেই বুঝিতে পারেন এই কথাটী কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত সহজ নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের সমাজ সম্বন্ধে কিছুই বলা হইবে না, পাশ্চাত্য সমাজের কথাই আলোচনা করা যাইবে।

গ্যাল্টন-প্রমুখ যেসকল বৈজ্ঞানিক উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কতকগুলি নিয়ম সমাজে প্রচলিত করিতে চান, তাঁহারা বিষয়টীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, যাহাতে যোগ্য ব্যক্তিগণের বংশবৃদ্ধি হয়; দ্বিতীয়, যাহাতে অযোগ্য ব্যক্তিগণের বংশ হ্রাস হয়।

---

* কাহারো কাহারো মতে রোগগুলি বংশানুক্রমিক নহে, কেবল সেই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাটুকু (predisposition) বংশানুক্রমিক। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে সে রোগ সন্তানের জীবনে দেখা না দিতে পারে। Vide J. A. Thomson's Heredity, pp. 250-308.

† Spencer's Study of Sociology, p. 330 et seq.

সেন্সস্ রিপোর্ট হইতে দেখা যায় ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রত্যেক সভ্যদেশেই বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা বড় একটা বাড়িতেছে না কিন্তু নির্ব্বোধ ও কুচরিত্র নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। এই বিপদ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে ইহার কারণসমূহ অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রথম কারণ, অর্থাভাব; সমাজে বিলাসিতার বৃদ্ধি হইয়া এবং শিক্ষা বহু ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া মধ্যবিত্ত লোকের সাংসারিক ব্যয় এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অল্প বয়সে কেহ আর বিবাহ করিতে পারে না, আয় বৃদ্ধি হইলে প্রৌঢ়াবস্থায় কেহ কেহ বিবাহ করে, কেহ কেহ আবার আজন্ম অবিবাহিত থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, ভ্রান্ত ধারণা; মধ্যবিত্তগণের মধ্যে অনেকেই ম্যালথসের শিষ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন যে কয়টী সন্তানকে উপযুক্তরূপে লালিত ও শিক্ষিত করিতে পারেন তাহার অধিক সন্তান হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে; আরও সমাজের লোকসংখ্যাও বেশী বাড়িয়া যাওয়া ভাল নয় কেন না তাহা হইলে দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা লোকহানি হইবার সম্ভাবনা। এখন কথা হইতেছে যে যদি সমাজের সকল লোকই এই মতানুসারে চলিত তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু অধম নিম্নশ্রেণীস্থ লোক দায়িত্ববোধহীন, তাহারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে। কাজেই যাহাতে মধ্যশ্রেণীর বংশও বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। মধ্যশ্রেণীই সমাজের মস্তিষ্ক স্বরূপ—সমাজের পরিচালক ও সংস্কারকগণ, দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, সেনানী ও রাজনৈতিকগণ প্রধানতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণী হইতেই উদ্ভূত হন। ইঁহাদেরই চেষ্টায় একটী জাতি জগতের মধ্যে বরণীয় হইয়া উঠে। ওয়াসিংটন বা নেপোলিয়ন, ফ্যারাডে বা বেয়ারের ন্যায় এক একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের জাতিগণ স্বীয় সৌভাগ্যের জন্য কতটা ঋণী তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? বাস্তবিক, একটী জাতির প্রকৃত সম্পদই হইতেছে তাহার অন্তর্ভুক্ত বলিষ্ঠ বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান লোকসকল। গল্প শুনিয়াছি, এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের জননীকে প্রশ্ন করেন, তাঁহার কি পরিমাণে ধন আছে। ইহার উত্তরে মাতা তাঁহার কয়টী পুত্রকে দেখাইয়া বলেন আমার এই কয় ঘড়া মোহর আছে। অনেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তি সমাজকে ধনদান করেন এবং জ্ঞানদান করেন কিন্তু যিনি প্রতিভাবান পুত্র দান করেন তাঁহার দানই শ্রেষ্ঠ। তাই রাজস্থানের চারণ কবি গাহিয়াছেন—

এ মাতা পুত এয়সা জিন জ্যায়সা দুর্গাদাস!

হে জননিগণ! আপনারা দুর্গাদাসের ন্যায় পুত্র জন্মভূমির চরণে উপহার দিন!

কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন যে প্রতিভাবান ব্যক্তি (Genius) কিরূপ বংশে জন্মাইবে তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য, অন্যান্য চাষের ন্যায় প্রতিভাবান ব্যক্তির চাষ করা যায় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে যদিও কোন্ বংশে প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্মিবে বলা যায় না তথাপি কিরূপ বংশে এ প্রকার লোক জন্মিবার খুব সম্ভাবনা তাহা ঠিক করা যাইতে পারে—নির্ব্বোধ বংশে কয়জন প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছে? ইঁহারা প্রায়শঃ বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান বংশ হইতেই উদ্ভূত হন। আর এক কথা; একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বহু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ (talented) লোকের সাহচর্য্যেই একটী বড় কাজ সম্পন্ন করেন। এক নেপোলিয়নের অধীনে যদি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন না থাকিত তাহা হইলে একাকী তিনি কতটুকু কাজ করিতে পারিতেন? আমরা যদিও প্রতিভাশালী লোকের জন্ম আমাদের নিয়মের ভিতরে আনিতে পারি না তথাপি বুদ্ধিসম্পন্ন (talented) বংশের সন্তান যে বুদ্ধিসম্পন্নই হইবে ইহা একরূপ নিশ্চিত।

এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যাহাতে যৌবনের প্রাক্কালে বিবাহ করে তাহার জন্য গ্যাল্টন বলিতেছেন—সমাজের এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত যাহাতে ইহাদের সংসার প্রতিপালনে অর্থাভাব না ঘটে। ইহাদের সন্তানগণ দ্বারা যখন সমাজ লাভবান হইবে তখন ইহাদের প্রতিপালনের দায়িত্বও কতকটা তাহার নিজের উপর লওয়া উচিত—অর্থাৎ ইহাদের আয় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। অপর পক্ষে ইহাদের নিজেদেরও বিলাসবর্জ্জন করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ সন্তানোৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাদের যে ভ্রান্ত উপেক্ষা আছে তাহাও বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা বিদূরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এইবার আমরা অযোগ্য ব্যক্তিগণের বংশহ্রাস নামক বিষয়টীর দ্বিতীয় ভাগে আসিলাম। প্রাচীন স্পার্টায় দুর্ব্বল ও অযোগ্য সন্তানগণকে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইত বর্ত্তমানকালের কোনও সভ্যসমাজ তাহার অনুমোদন করিতে পারে না। যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদিগকে পালন করিতেই হইবে তবে যাহাতে অযোগ্য ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় অযোগ্য ব্যক্তিগণের বিবাহ নিষিদ্ধ করা, তাহা হইলে ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে পাইবে না। কাহারও কাহারও বিবেচনায় এরূপ নিয়ম কতকগুলি ব্যক্তির প্রতি সমাজের জুলুম ও নির্দ্দয়তার পরিচায়ক। কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে এটী খুব বিবেচনাসঙ্গত ও দয়াপ্রণোদিত নিয়ম। কতকগুলা অধম মনুষ্য উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগকে আজন্ম দুঃখভোগ করান অপেক্ষা, নিজে সংসারসুখে বঞ্চিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। এই নিয়ম প্রচলিত হইলে যতই কাল যাইবে ততই সমাজে অযোগ্যব্যক্তির হ্রাস হইবে, কাজেই ততই অল্পসংখ্যক লোককে সংসারসুখ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু এখন সমাজ কি নিয়মে চলিতেছে? অযোগ্য ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তাহারাও কষ্ট পাইতেছে আর তাহাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রদানের জন্য যোগ্য লোকদিগের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ এই সব ট্যাক্সের ভারে পীড়িত হইয়া আর পরিবার বৃদ্ধি করিতে সম্মত হন না। কাজেই সমাজ যেন যোগ্য মধ্যবিত্ত লোকদিগের বংশহানি করিয়া অযোগ্য (নির্ব্বোধ, মদ্যপ ও চরিত্রহীন) নিম্নশ্রেণীর বংশবৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের একবারে বিপরীত এই নির্ব্বাচনের ফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

যাহা হউক উপরোক্ত সমাজহিতকর নিয়মটী প্রচলিত করিবার পক্ষে দুইটী প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে। আচার্য্য হাক্সলির ন্যায় বৈজ্ঞানিকও তাহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছেন।* প্রথমটী হইতেছে এই যে বিবাহ পরস্পরের পছন্দের উপর নির্ভর করে, সে পছন্দ সব সময়ে বিজ্ঞানের অনুবর্ত্তী নয়। বিজ্ঞানকে সকলের প্রভু করিলে প্রণয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের কবিত্ব লোপ পাইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এই নিয়মের স্বপক্ষ দল উত্তর দেন যে সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যসকল সুপরিচিত হইলে প্রণয় বিজ্ঞানের অনুসরণ করিবে কদাচ ইহার বিরুদ্ধে যাইবে না। মানবজীবনের আদর্শ, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটী ধারণা কোনো ব্যক্তির প্রণয়কে তাহার অজ্ঞাতসারে নিয়মিত করিয়া থাকে—এই ধারণাগুলি বিজ্ঞানসম্মত হইলে প্রণয়ও বিজ্ঞানের অনুমোদিত হইবে।

দ্বিতীয় অন্তরায়টী এই যে পশুপক্ষিগণের মধ্যে কোনটী যোগ্য এবং কোনটী অযোগ্য নির্দ্ধারণ করা যত সহজ মনুষ্যের মধ্যে তত নয়। কোনো কোনো রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন; অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি চরিত্রহীন এবং অনেক চরিত্রবান ব্যক্তির বুদ্ধি প্রশংসনীয় নহে। এ ছাড়া আরও মুস্কিল এই যে কোন্ কোন্ গুণ বা দোষ বংশানুক্রমিক আর কোন্ কোন্টী বংশানুক্রমিক নহে, কেবল সেই ব্যক্তির অবস্থার ও শিক্ষার ফল মাত্র, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইহার উত্তরে বলা যায় যে এ সকল স্থলে কোনও নিয়মের অন্ধভাবে অনুসরণ না করিয়া নিজের বিবেচনা দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে,—যেমন, শারীরিক সৌন্দর্য্য ও বলিষ্ঠতা অপেক্ষা বুদ্ধিকে উচ্চ স্থান দিতে হইবে এবং বুদ্ধি অপেক্ষা সচ্চরিত্রতাকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। আর, এক ব্যক্তির কোন্ গুণগুলি বংশানুক্রমিক তাহা ঠিক করিবার জন্য কেবলমাত্র তাহার গুণাবলী পরীক্ষা না করিয়া তাহার বংশের ইতিহাসও দেখা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক একটা কথা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে। এ সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের মন্তব্যাদি অধ্যয়ন না করিয়া এবং কিছুকাল ধীরভাবে চিন্তা না করিয়া এ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়; কারণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির স্থানে স্থানে এখনও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান প্রবন্ধে এদেশীয়

* Prof. Huxley's Essay on Evolution and Ethics, Prolegomena. See his collected Essays, Vol. IX.

সমাজ সম্বন্ধে কোনও আলোচনার উত্থাপন করা হয় নাই, কারণ সেস্থলে নিজ নিজ প্রিয় মতগুলির প্রতি অন্যায় অসঙ্গত অনুরাগ এবং নিজ সমাজের প্রতি অহেতুকী শ্রদ্ধা, বৈজ্ঞানিক জনোচিত নির্ব্বিকার ও অপক্ষপাতী ভাব রক্ষা করিবার পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। কাহারো কাহারো মতে মহর্ষি মনু ও অন্যান্য স্মার্ত্তগণের বিধিব্যবস্থাই হিন্দুজাতির পতনের কারণ, আবার কাহারো কাহারো মতে হিন্দুজাতি যে বহুকাল স্বীয় প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিয়াছিল এবং এখনও যে তাহার উন্নতির আশা রহিয়াছে তাহার জন্য সে ঐ সকল ব্যবস্থা-প্রণেতার নিকট ঋণী। প্রবন্ধমধ্যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের যে-সকল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাদের সাহায্যে এই মত দুইটীর সত্যতা অসত্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এস-সি।

ঊষা

১

হে ঊষা সুন্দরী মোর হে রূপসী বালা,
নিত্য আমি মুক্ত তব পূর্ব্ব-বাতায়নে
নীরবে দাঁড়ায়ে শুধু নিস্পন্দ নয়নে
হেরি স্বপ্নরূপরাশি। ঘুমাও নিরালা
একাকিনী হে অনূঢ়া তিমির-কুটীরে
রুধিয়া অর্গলখানি, রাখিয়া শিয়রে
স্নিগ্ধ তব রত্নদীপ—শুক্‌ তারাটিরে।
শিথিলিত কেশপাশ মেদুর অম্বরে
সমুচ্চ পালঙ্ক হতে তাজি উপাধান
পরেছে আলুলায়িত দিগন্ত আবরি।
এত শোভা মনলোভা হবে কি নির্ব্বাণ
হে চিরকৌমার্য্যব্রতা হে চিরকিশোরী
চিরশূন্য শয্যাতলে? বাসর-দুয়ার
রবে কি গো চিররুদ্ধ—খুলিবে না আর?

২

বহু দিন পরে আজি হেরিনু ঊষার
অনাবিল মুখচ্ছবি;—ঘুমন্ত বধূর
লাজ-অরুণিমা-মাখা চুম্বনবিধুর
নব-জাগরণ-শোভা অঙ্গ ভরি তার
অনুপম সুষমায় উঠেছে ফুটিয়া,
ভানুর প্রণয়দীপ্ত তপ্ত পরশনে।
আলোক-অঞ্চলখানি বুকে টানি দিয়া
তুলি ঊর্দ্ধে হেমবাহু কবরী বন্ধনে
স্রস্ত তার কেশভার লুণ্ঠিত তিমির
বাঁধিছে সে ক্ষিপ্র হস্তে। মেলি মুগ্ধ আঁখি
হেরিনু মোহিনী মূর্ত্তি ঊষা তরুণীর।
মোর বক্ষনীড় হ'তে প্রভাতের পাখী
মেলি তার স্বর্ণপাখা উড়িল আকাশে
ঊষার অরুণাধর চুমিবার আশে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

বাঙ্‌লায় উচ্চারণ

বর্ত্তমান বাঙ্‌লা ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহার প্রকৃত উচ্চারণ করা হয় না; আবার এরূপ শব্দও আছে, যাহা আমরা লিখিতে একরূপ লিখি, কিন্তু উচ্চারণ করিতে আর একরূপে উচ্চারণ করি। এরূপ বৈষম্য কিরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমে ঋকার হইতে আরম্ভ করা যাউক। বাঙ্‌লায় আমরা ঋকারের ও রকারের উচ্চারণে গোলমাল করিয়া ফেলি। বিশেষ সাবধানে প্রয়াস না করিলে দা ত ণাং ও দা ত্রী ণাং এই উভয় শব্দের পৃথক্‌ পৃথক্‌ উচ্চারণ আমরা রক্ষা করিতে পারি না। ঋকার স্থানে রকার, এবং রকার স্থানে ঋকার প্রায়ই হইয়া পড়ে। গৃ হ স্থানে গ্রি হ উচ্চারণ করিতে প্রায়ই শুনা যায়। এই জন্যই একজন স্কুলের ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর কোন বিদ্যালয়ে গিয়া পরিদর্শক-পুস্তকে গ্রী স্ম কা ল লিখিতে গৃ স্ম কা ল লিখিয়াছিলেন। শুদ্ধ

ঋকার ও রিকার এই উভয় শব্দ কিরূপ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারিত হইবে, তাহা সংস্কৃত পড়িয়াও ও শিক্ষা-প্রাতিশাখ্য দেখিয়াও আমি ঠিক মত করিতে পারি না, এবং বঙ্গবাসী শতকরা নিরানব্বুই জনই বোধ হয় পারেন না।

কেবল বর্ত্তমান বঙ্গবাসী নহে, আমরা দেখিতে পাই সমগ্র ভারতেই এই গোলমাল হইয়াছে। নিতান্ত গোলমাল হইত বলিয়াই প্রাকৃতে ঋকারকে সাধারণতঃ* লুপ্ত দেখা যায় এবং প্রয়োজন স্থলে ঋকার স্থানে রিকার করা হইয়াছে।† সংস্কৃত ঋণ প্রাকৃতে রিণ; এইরূপ ঋদ্ধি=রিদ্ধি, ঋষি=রিসি, ইত্যাদি। হিন্দীতেও এই নিয়মানুসারে আমরা পৃথ্বী হইতে প্রিথী, গৃহস্থ স্থলে গ্রিহস্ত (আবার গ্রিহস্তী) দেখিতে পাই।

সংস্কৃতে এই ভাব খুব বেশী ঢুকিয়াছে। আমরা যে মৃ ধাতু হইতে ম্রিয়তে, ধৃ ধাতু হইতে ধ্রিয়তে, দৃ ধাতু হইতে দ্রিয়তে প্রভৃতি পদ পাইয়া থাকি, তাহার মূলে ঐ ঋকার ও রিকারের উচ্চারণের গোলমাল ভিন্ন কিছুই নহে। আমি এখানে কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র দিতেছি, সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগ অনেক আছে।‡

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণসমূহে ঋকার স্থানে যেমন রকার হইয়াছে দেখা গেল, রকার স্থানেও সেইরূপ ঋকার দেখা যায়। আমরা অথর্ব্ববেদে (১২. ১. ৪৬) ক্রিমি দেখিতে পাই, কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে অধিকাংশ স্থলেই কৃমি পাওয়া যায়, এবং ক্রিমি শব্দেরও অল্প প্রচার নাই। সংস্কৃতে আসল ভ্রূকুটী হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু আমরা তাহার পাশাপাশি ভৃকুটী শব্দও অনেক পাই।

* অপভ্রংশে কৃবা (কৃপা), নৃব (নৃপ) প্রভৃতি পদ দেখা যায়; কু. চ. ৮. ৮২, ৮৩।

† প্রা. প্র. ১. ৩০; হে. চ. ৮. ১. ১৪০; পা. প্র. ১. ২২, টীকা, ৩ পৃ.।

‡ দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃতের উচ্চারণ অতি বিশুদ্ধ ভাবে হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু ঋকারের উচ্চারণ সেখানেও ঠিক আছে বলিয়া মনে হয় না। দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণ ঋকারকে কতকটা রু করিয়া উচ্চারণ করেন; ঋগ্বেদ বলিতে তাঁহারা রুগ্বেদ উচ্চারণ করেন। ঋকারকে রুকাররূপে উচ্চারণ করা পূর্ব্বেও চলিত ছিল বলিয়াই প্রাকৃতে বৃদ্ধ হইতে বুড্ঢ, বৃষ্টি হইতে বুট্‌ঠি প্রভৃতি পদ দেখা দিয়াছে। এইসকল স্থানে প্রাকৃতের নিয়মে পদের আদ্য বর্ণস্থিত রকারের লোপ হইয়াছে; অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য উচ্চারণে বৃদ্ধ স্থানে ব্রুদ্ধ (ড্ঢ) উচ্চারিত হইয়া তাহার পর প্রাকৃতের রফলা-লোপের নিয়মে বুড্ঢ হইয়াছে।

চলিত বাঙ্‌লায় কোনো রোগীর মূর্চ্ছার সময় ভ্রমি শব্দ স্থানে অনেকে ভৃমি বলিয়া থাকেন; এবং আমরা মনে করিতে পারি যে, ঐ ভৃমি-উচ্চারণকারীর কোনো ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু ঋগ্বেদ খুলিয়া বসিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঋষিরাও বহুস্থলে (ঋ. সং. ১. ৩১. ১৬; ৩. ৬২. ১; ২. ৩৪. ১; ৪. ৩২. ২; ৭. ৫৬. ২০) ঐ শব্দটি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আবার ভ্রম স্থানে ভৃম শব্দও বেদে আছে।* অথর্ববেদে (১২. ১. ৪৬) আমরা ভ্রমর স্থানে ভৃমল শব্দও দেখিতে পাই।

ত্রি+ঋচ্ শব্দ হইতে তৃচ (ঐ. ব্রা. ১. ৩. ২, পা. বার্ত্তিক, ৬. ১. ৩৪; নি. ২. ১. ২) এবং ত্রিচ (শত. ব্রা. ১. ৩. ৩. ৩৩; কা. শ্রৌতসূত্রেও এইরূপ) এই উভয় পদই দেখা যায়। পক্ব এই অর্থে শ্রা ধাতু হইতে ঋগ্বেদে শ্রাত (১০. ১৭৯. ২, ইত্যাদি) এবং শৃত (১. ১৬২. ১০; ৯. ১১৪. ৮.) এই উভয় পদই পাওয়া যায়; কিন্তু পাণিনি কেবল শৃত ধরিয়া লইয়াছেন (৬. ১. ২৭)। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে (১. ৫. ৩. ৭-৮) শৃত ও শ্রিত এই দুই শব্দের অভেদ গৃহীত হইয়াছে।

এই উচ্চারণের গোলমাল হেতুই আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রে (১১. ১) প্রচ্ছ্+ক্ত হইতে প্রষ্ট, এবং পাণিনি-প্রভৃতিতে পৃষ্ট পদ দেখা দিয়াছে। স্পৃশ্ ধাতু হইতে স্প্রক্ষ্যতি পদ হয়। মৃদ্ ধাতু এবং ম্রদ্ ধাতু বস্তুতঃ একই, এবং ইহা হইতেই মৃদু, ম্রদ (ক্রিয়া, ঋ. ক. ৬. ৫৩. ৩), ম্রদস্ (বা. স. ২. ২. ৫; শ. ব্রা, ১. ৩. ৩. ১১), ম্রদীয়স্, ইত্যাদি শব্দ হয়। মৃড় ধাতুও মূলত মৃদ্ ধাতু হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপেই দৃঢ় শব্দ হইতে দ্রঢ়ীয়ান্ ইত্যাদি। এক প্রথ্ ধাতু (অথবা, পৃথ্ ধাতু) ইহতেই পৃথু—প্রথ,‡ পৃথা—প্রথা, পৃথু, প্রথিমা ইত্যাদি পদ হইয়াছে। সংস্কৃতে রকারযুক্ত কতকগুলি ধাতুর সম্প্রসারণের বিষয়ও এখানে চিন্তনীয়।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই ঋকার-স্থানে রকার উচ্চারণের রীতি এত বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে,

* Apte's Dictionary.

† Apte's Dictionary.

‡ অ. ব. স. ৪. ৯. ২।

বেদের অন্যতম অঙ্গ শিক্ষার মধ্যে তদ্বিষয়ে নিয়মের উল্লেখ দেখা যায়। লিখিবার ও অর্থ করিবার সময় ঋকার গ্রহণ করিলেও উচ্চারণের সময় ঋকার স্থানে রকার করিতে হইবে বলিয়া শিক্ষাকারেরা উপদেশ দিয়াছেন। [illegible] য, পদস্থিত ঋকারকে রেকারের ন্যায় উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা—কৃ ষ্ণো হ সি (বা. স. ২. ১) স্থলে ক্রে ষ্ণো হ সি, অগ্নয়ে পি তৃ ম তে (বা. স. ২. ২৯) স্থলে পি ত্রে ম তে উচ্চারণ করিতে হইবে। এইরূপ ঋ ত্বি য় (বা. স. ৩. ১৪) স্থলে রে ত্বি য় শব্দ উচ্চার্য্য। এ নিয়ম যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনশাখা-সম্বন্ধে।*

ঋকারকে রেকার করিয়া উচ্চারণ করা হইত বলিয়াই গৃ হ শব্দ হইতে গ্রে হ, এবং তাহা হইতে প্রাকৃতনিয়মে র-লোপে গে হ হইয়া সংস্কৃতে বেশ চলিয়া গিয়াছে। এই নিয়মেই কৃ ষ্ণ হইতে ক্রে ষ্ণ, এবং তাহা হইতেই বাঙ্‌লায় কে ষ্ট দেখা দিয়াছে; তৃ ষ্ণা স্থলে বাঙ্‌লায় তে ষ্টা হইবারও মূল ইহাই, এবং ইহা হইতেই বাঙ্‌লায় এখনো চলিত কথায় ঘৃ ত স্থানে ঘ্রে ত অথবা ঘে ত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

ঋকার স্থানে যেমন রেকার দেখা গেল, রেফ (ও রফলা-) স্থানেও সেইরূপ রেকার দেখা যায়। শিক্ষাকারগণ বলিতেছেন যে, ব্যঞ্জনান্তরের সহিত অসংযুক্ত শ-ষ-স ও হ-কারে স্থিত রেফ-স্থানে রেকার উচ্চারণ করিতে হইবে।† যথা—দ র্শ ত ম্ (বা. স. ১৮. ১৭) স্থানে দ রে শ ত ম্ ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে হয়।‡

ঋকার ও রেফের স্থানে যেরূপ রেকার হইয়াছে, রফলা-স্থানেও সেইরূপ বাঙ্‌লায় রেকার দেখা যায়। এই নিয়মেই চলিত বাঙ্‌লায় গ্র হ স্থানে গ্রে হ এবং তাহা হইতে ক্রমে গে র দাঁড়াইয়াছে; প্র থ ম স্থানে প্রে থ ম, এবং তাহা হইতে পে থ ম ইত্যাদি উচ্চারণ আসিয়াছে।

সংস্কৃতে কখনো কখনো ঋকারের একবারে লোপ হইয়া যায় ও তাহার স্থানে অকার হয়; যথা—কৃ ধাতু হইতে চ কা র ইত্যাদি পদে পূর্ব্বস্থিত ঋকারের, আবার পদের আদি বর্ণে সংযুক্ত রফলারও লোপ হয়; যথা—ব্র জ্ ধাতু হইতে ব ব্রা জ প্রভৃতি পদে। প্রাকৃতেও এরূপ প্রয়োগ সর্ব্বত্রই রহিয়াছে; যথা—দ্র ব স্থানে দ ব, গ্র হ স্থানে গ হ ইত্যাদি। এই সাদৃশ্যেই বাঙ্‌লায় কোনো কোনো স্থানে অসংযুক্ত রকারেরও লোপ দেখা যায়। উত্তরবঙ্গবাসিগণ, বিশেষত দিনাজপুর-অঞ্চলের অধিবাসিগণ, র স স্থানে অ স, রা ম স্থানে আ ম উচ্চারণ, কোচ ও পলিয়াদের মধ্যে, অবশ্যই শুনিয়াছেন। আবার রু ই, উ ই উভয় শব্দই বাঙ্‌লায় শুনা যায়। কিন্তু তাহাদের নিকট আ ম স্থলে রা ম ইত্যাদি কিরূপে আসিল? তাহারা বলে "রা মে র অ স পড়ি কাপড় ভিজি গেল।"

খুব সম্ভব প্রাকৃতে ঋকারের, অকার ইকার ও উকার রূপে পরিবর্ত্তন হওয়ায়,* এবং পদের আদি বর্ণে সংযুক্ত রফলারও লোপের নিয়ম থাকায় অকারাদির সহিত ঋকার ও রকারের একটা সাদৃশ্য উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই উচ্চারণের সময় আ ম স্থানে রা ম হইয়া পড়ে। অথবা, অপভ্রংশ প্রাকৃতে যেমন কোনো কোনো স্থলে রকারের কোন সদ্ভাব না থাকিলেও তাহার আগম হইয়া থাকে, যথা—ব্যা স স্থলে ব্রা স,† ভা ষ্য স্থলে ভ্রা স,‡ আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও§ অ ধি গু স্থানে অ ধ্রি গু দেখা যায় প্রকৃত আলোচ্য স্থলেও সেইরূপ রকার আগম হয় বলিতে পারা যায়। প্রচলিত বাঙ্‌লাতেও এইরূপ রকার আগম দেখা যায়। যথা—

* "হলযুতাযুতয়োঃ সৈকারশ্চ।" পদান্তমধ্যে হলযুতাযুতস্য ঋকারস্য ঋবর্ণস্য সৈকার ইবোচ্চারঃ স্যাচ্ছন্দসি মাধ্যন্দিনীয়ে। উদাহরণানি যথা—দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে, 'কৃষ্ণোঽসি' ইত্যত্র 'ক্রেষ্ণোঽসি'; 'অগ্নয়ে' ইতি ঋ... মধ্যে পি তৃ ম তে ইত্যত্র পি ত্রে ম তে.."—কেশবীশিক্ষা, শি. সং. ১৪৭ পৃ.। "ঋকারস্য তু সংযুক্তাসংযুক্তস্যাবিশেষণ সর্ব্বত্রৈবম্"—প্রতিজ্ঞাসূত্র (নির্ণয়সাগর) ২; প্রাতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং, ২৯৫; "হলযুক্ত ঋকারস্তু রেকারশ্ছন্দসি স্মৃতঃ। পি তৃ ণা মিতি পি ত্রে ণা মিত্যাদি চ নিদর্শনম্।"—স্বরভক্তিলক্ষণ-পরিশিষ্টশিক্ষা, শি. সং. ১৭৪।

† কেশবীশিক্ষা, শি. সং. ১৪১; প্রতিজ্ঞাসূত্রে ২; প্রতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং, ১৯২; ইত্যাদি।

‡ রকার ও লকারের অভেদ ধরিয়া লকার সম্বন্ধেও এই নিয়ম ধরা হয়। যথা—শ ত ব ল্ শ স্থানে শ ত ব লে শ, ইত্যাদি।

* যথা—ঘৃ ত=ঘ ত, শৃ ঙ্গ=শি ঙ্গ বৃ দ্ধ=বু ড্‌ ঢ।
† হে. চ. ৮. ৪. ৩৯৯।
‡ স. সা. ৫. ৫।
§ ২. ১; নি. ৫. ২. ৭, ভাষ্য।

"তোমার মঙ্গলাদি না পেয়ে বিশেষ চি স্তা র্দি ত আছি।
হপ্তা বাদে পত্তর ভি র্ণ কি প্রকারে বাঁচি?"

(রজনী সেন)।

এতাদৃশ রকার যোগ করিয়া শব্দপ্রয়োগ চলিত কথায় এখনো বঙ্গের অনেক স্থানে দেখা যায়; এবং ইহা অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতেই আসিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

ঋকার স্থানে যেমন রকার, সেইরূপ ৯কার স্থানেও বাঙ্‌লায় লকার উচ্চারিত হয়, এবং শিক্ষাগ্রন্থেও ইহার বিধান দেখা যায়। ক্‌ ৯ প্ত স্থানে ক্লে প্ত উচ্চারণ করিতে হয়।* ঐ এক ক্‌ ৯ প্ত পদ ছাড়া সংস্কৃতে ৯কার আর দেখা যায় না; প্রাকৃতে তাহার কোনো অস্তিত্ব নাই, বাঙ্‌লাতেও তাহাই হইয়াছে।

ঐকারকে অনেক সময় বাঙ্‌লায় অ ই করিয়া, এবং ঔকারকে অ উ করিয়া পাঠ করা হয়। যথা, তৈ ল স্থানে ত ই ল, শৈ ল স্থানে শ ই ল, চৈ ত্র স্থানে চ ই ত্র, ইত্যাদি; এবং কৌ র ব স্থলে ক উ র ব, গৌ র স্থলে গ উ র ইত্যাদি। এই উচ্চারণ একবারে প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, প্রাকৃত ব্যাকরণসমূহে এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মই রহিয়াছে।† কিন্তু ইহার সূচনা বৈদিক সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা অ গ্নৌ স্থলে অ গ্না উ।‡

বাঙ্‌লায় পদের আদিস্থিত ক্ষ স্থানে খ, এবং অন্যত্র ক্ষ স্থানে ক্‌খ উচ্চারিত হয়; যথা, ক্ষ য় স্থানে আমরা উচ্চারণ করি খ য়, দ ক্ষি ণ উচ্চারণ করিতে আমরা উচ্চারণ করি দ ক্‌ খি ন। হিন্দী প্রভৃতিতেও এইরূপ হইয়াছে, অধিকন্তু হিন্দীতে ক্ষ স্থানে ছ অথবা চ্ছ উচ্চারণও হইয়া থাকে; যথা, ক্ষ ণ স্থানে ছ ন, দ ক্ষি ণা স্থানে দ চ্ছি না ইত্যাদি। পালি ও প্রাকৃতে ক্ষকারের এই উভয় পরিবর্ত্তনই আমরা দেখিতে পাই, ব্যাকরণসমূহে তজ্জন্য নিয়মই রচিত হইয়াছে।§ এতএব আমরা বলিতে পারি যে, বাঙ্‌লায় এই উচ্চারণ প্রাকৃত হইতেই আসিয়াছে।

বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত উচ্চারণের সময়েও ক্ষকারকে খকার করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এজন্য বর্ত্তমান বঙ্গীয় পণ্ডিতগণকে অপরাধী বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের উচ্চারণকে সমর্থন করিতে পারা যায় এরূপ প্রাচীন প্রমাণ আছে। দ ক্‌ ষি ণ স্থলে দ ক্‌ খি ন উচ্চারিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, পদমধ্যস্থিত ষকারকে খকার করিয়া উচ্চারণ করা হইতেছে, ইহা ভিন্ন বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য নাই। ষকারকে খকাররূপে উচ্চারণ করিবার রীতি হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষাতে সুপ্রসিদ্ধ। মৈথিল পণ্ডিতগণ সংস্কৃত উচ্চারণের সময়েও বি ষ য় তা বলিতে বি খ য় তা, বি শে ষ ণং বলিতে বি শে খ ণং, ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন উচ্চারণ প্রভাবেই অভিধানে পা ষ ণ্ড—পা খ ণ্ড উভয়ই স্থান পাইয়াছে, তরুসমূহ অর্থে ত রু ষ ণ্ড—ত রু খ ণ্ড উভয়রূপই আমরা সংস্কৃতে দেখিতেছি।

কেবল লৌকিক সংস্কৃতেই যে ষকার-স্থানে খকার উচ্চারিত হয়, তাহা নহে; যজুর্বেদিগণ বৈদিক সংস্কৃতেও ঐরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন, এবং তৎসম্বন্ধে প্রাচীন প্রমাণেরও অভাব নাই। যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনীয় শিক্ষা প্রতিজ্ঞাসূত্রে (বম্বে, ২৭ পৃ.) উক্ত হইয়াছে :—

"অথো মূর্দ্ধন্যোষ্মণোঽসংযুক্তস্য টুম্নতে সংযুক্তস্য চ খকারোচ্চারণম্‌ অধ্যয়নাদিকর্ম্মষু, অর্থবেলায়াং প্রকৃত্যা।"

অসংযুক্ত, এবং টবর্গীয় ভিন্ন অপর বর্ণের সহিত সংযুক্ত মূর্দ্ধন্য উষ্মবর্ণের অর্থাৎ ষকারের অধ্যয়নাদি কার্য্যে খকার উচ্চারণ হয়, কিন্তু অর্থ করিবার সময় তাহা প্রকৃতি বা স্বাভাবিক রূপেই উচ্চারিত হয়।

যজুর্বেদীয় অন্যান্য বহু শিক্ষাগ্রন্থেই এই নিয়ম উক্ত হইয়াছে।*

টবর্গের সহিত সংযুক্ত ষকারের খকার উচ্চারণ হয় না বলিয়াই ষ ষ্ঠী স্থানে হিন্দুস্থানী বা মৈথিলেরা খ ষ্ঠী উচ্চারণ করেন, খ থ্‌ ঠী উচ্চারণ করেন না। প্রাতিশাখ্য-

---

* প্রাতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং. ২৯৬ পৃ.।

† হে. চ. ৮. ১. ১৫২, ১৬২; প্রা. ল. ২. ৭, ৯; প্রা. প্র. ১. ৩৬, ৪২।

‡ শত. ব্রা. ১. ২. ১. ২৫, ২৭।

§ পা. প্র. ১. §§ ২০-২১; প্রা. প. ৩. ২৯-৩১; প্রা. ল. ৩-১৪; হে. চ. ৮. ২. ৩, ৬।

* লঘু মাধ্যন্দিনীয় শিক্ষা, শি. সং, ১১৪; প্রাতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং, ২৯৯; কেশবী (বা নবাঙ্ক) শিক্ষা, শি. স. ১৪০।

প্রদীপকার বালকৃষ্ণের মতে ক্ষকারের ষ স্থানে ষকারই উচ্চারণীয়।* ণ্ড ষ্ণ প্রভৃতি বিপরীত সংযোগ স্থলেও ষকারই উচ্চারণ করা নিয়ম।†

দ ক্ ষি ণ প্রভৃতি শব্দের ষকার স্থানে প্রথমে কিরূপে খকার উচ্চারিত হইল? প্রথম অবস্থায় ষকার ও খকার পরস্পর বিভিন্নরূপেই উচ্চারিত হইত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। অতএব উচ্চারণের বৈষম্য ও বৈচিত্র্যেই যে এক বর্ণ স্থানে অপর বর্ণ উচ্চারিত হইয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ষকার-স্থানে অপর কোন বর্ণ উচ্চারিত না হইয়া খকার হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, ক্ষকারস্থিত ষকারের অপরাপর বর্ণ অপেক্ষা খকারের সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে। এক বর্ণের স্থানে তৎসদৃশই অপর বর্ণ হইয়া থাকে, বিসদৃশ বর্ণ হয় না। ষকার যেমন অঘোষ, খকারও তেমনি অঘোষ: ষকার যেমন মহাপ্রাণ, খকারও তেমনি মহাপ্রাণ; অতএব ষকার ও খকারের এইরূপে সাদৃশ্য আছে। ছ, ঠ প্রভৃতির সহিত ষকারের ঠিক এইরূপ সাদৃশ্য থাকিলেও ককারের সান্নিধ্যহেতু ষকার স্থানে খকারই হইয়াছে, ছকারাদি হয় নাই।

এইরূপে দ ক্ ষি ণ প্রভৃতি স্থানে ষকার খকাররূপ ধারণ করিবার পর তৎসাদৃশ্যে অন্যত্রও ষকার খকার হইয়াছে। এই জন্যই পালি ও প্রাকৃতে ক্ষকারস্থিত ভিন্ন অপর ষকার স্থানে আমরা খকার দেখিতে পাই না। পালি ও প্রাকৃতের এই বিবরণ লক্ষ্য করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, পালি ও প্রাকৃতের উচ্চারণ-প্রভাব সংস্কৃতে বিপুল বিস্তার লাভ করিবার পরে পূর্ব্বোদাহৃত শিক্ষার নিয়মগুলি বিরচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ক্ষ স্থানে ছ অথবা চ্ছ উচ্চারিত হয়, এবং ইহাও পালি-প্রাকৃত হইতে আগত: এখন ষকার-স্থানে ছকার কিরূপে হইল দেখিতে হইবে।

মাগধী প্রাকৃতে দেখা যায় যে, সকার ও ষকার স্থানে শকার হইয়া থাকে।‡ সেই নিয়মে ক্ষকার-স্থিত ষকারও শকার-রূপে উচ্চারিত হইতে থাকে; তখন দ ক্ ষি ণ শব্দ দ ক্ শি ন হইয়া পড়িল।* তাহার পর উচ্চারণ বৈচিত্র্যে শকার স্থানে ছকার হইয়া যায়, কারণ শকারের সহিত ছকারের অনেক সাদৃশ্য আছে; কেননা ঐ উভয় বর্ণই অঘোষ ও মহাপ্রাণ, এবং উভয়েই তালু হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে। শকার-স্থানে ছকার হওয়া সংস্কৃতেও প্রসিদ্ধ;† বিশেষত প্রাকৃত ও চলিত বাঙ্লায় তাহার খুবই প্রচলন দেখা যায়।‡ যথা, সংস্কৃত শা ব হইতে প্রাকৃত ছা ব, এবং বাঙ্লায় ছা; শ্রী ধ র স্থানে বাঙ্লায় ছী ধ র অথবা ছি রী ধ র বলে; এইরূপ বহু শব্দ আছে। অতএব দ ক্ ষি ণ হইতে দ ক্ শি ন, এবং তাহা হইতে দ ক্ ছি ন হয়। তাহার পর ছকারের সান্নিধ্য-হেতু উচ্চারণের সৌকর্য্যে দ ক্ ছি ন শব্দের ক-স্থানে চ হইয়া পড়িয়াছে। এবং এইরূপেই সংস্কৃত দ ক্ষি ণ শব্দ দ চ্ছি ন আকার ধারণ করিয়াছে। লিখিতে ও বানান করিতে হিন্দী উচ্চারণানুসারে প্রাকৃত রূপই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্লা কেবল উচ্চারণেই প্রাকৃতকে অনুসরণ করিয়া লিখিতে ও বানান করিতে সংস্কৃতকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

বর্গীয় জকার ও ঞকারে যে সংযুক্ত বর্ণ (জ্ঞ) হয়, তাহাকে আমরা কখনো কখনো গ্‌গ্ঁ এবং কখনো বা গ্‌গ উচ্চারণ করিয়া থাকি। আমরা বলি—'সে য গ্ গঁ দেখিতে গিয়াছে', আবার ইহাও বলি যে,—'সে য গ্ গ দেখিতে গিয়াছে।' য গ্‌গি শব্দও আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পাঞ্জাবী ভাষাতেও জ গ্‌গ বলে। হিন্দীতে আবার গ্য উচ্চারিত হয়; আ জ্ঞা শব্দ হিন্দীতে আ গ্যা হইয়া থাকে, এইরূপ জ্ঞা ন হয় গ্যা ন। বাঙলাতেও গ্যা ন উচ্চারিত হইয়া থাকে।

এই উচ্চারণ পালি ও প্রাকৃত হইতেই আসিয়াছে। পালি§ এবং মাগধী ও পৈশাচী প্রাকৃতে জ্ঞ স্থানে ঞ্ঞ

* শি. স. ২৯৯।

† "অসংযুক্তস্য মূৰ্দ্ধন্যোষ্মণঃ খোচ্চারণং মতং। টুম্যতে সংযুক্তস্যাপি কস্য যোগে ষ এব হি॥"—কাত্যায়নশিক্ষা, শি. সং. ২৯৯।

‡ হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮; প্রা. প্র. ১১. ৩; প্রা. ল. ৩. ৩৯।

* মারাঠীতে ক্ষে ত্র স্থানে উচ্চারিত শে ত শব্দও ইহা সমর্থন করিবে।

† পা. ৮. ৪. ৬৩।

‡ হে. চ. ৮. ১. ২৬৫-২৬৬।

§ পা. প্র. ১. ২৯।

বা ঞ্ঞ* হইয়া থাকে। যথা, জ্ঞা ন = ঞ্ঞা ন, বি জ্ঞা ন = বি ঞ্ঞা ন। তালুর ন্যায় নাসিকাও ঞকারের উচ্চারণ-স্থান হওয়ায় পালি ও প্রাকৃতের ঞ্ঞ ও ঞ্ঞ ক্রমশ যথাক্রমে গ ও গ্‌গঁ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং তদবলম্বনেই আমরা গাঁ ন, ও বি গ্‌ গাঁ ন উচ্চারণ করিয়া থাকি। কালক্রমে আবার সানুনাসিক উচ্চারণের অভাবে বি গ্‌ গা ন হইয়া পড়িয়াছে। ঞ-উচ্চারণে একটু যকারের সংসর্গ প্রতীয়মান হয় বলিয়াই বাঙ্গলা ও হিন্দীতে গ্যা ন উচ্চারণ শুনা যায়। এইরূপ বি গ্যা ন শব্দও উচ্চারিত হয়। বি গ্যা ন শব্দেরই আবার উচ্চারণ ভেদে যকারের লোপ ও তদনুরোধে গকারের দ্বিত্ব হওয়ায় বি গ্‌ গা ন হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারা যায়।

কৃ ষ্ণ, বি ষ্ণু, তৃ ষ্ণা প্রভৃতি শব্দের ণকার-স্থলে আমরা টঁ অথবা ট উচ্চারণ করিয়া থাকি; আমরা বলি কৃ ষ্টঁ, বি ষ্টুঁ, তৃ ষ্টাঁ, অথবা কৃ ষ্ট, বি ষ্টু, তৃ ষ্টা; আবার কে ষ্ট, বি ষ্ট, তে ষ্টা শব্দও আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। উড়িয়াতেও এইরূপ আছে।† মূর্দ্ধণ্য ণকারের উচ্চারণ কতকটা ড়ঁ-কারের মত হওয়ায় প্রথমে ড়ঁ-কারই ণকারের স্থান অধিকার করিয়া ফেলে, এবং তদনন্তর ড়ঁ-কার স্থলে কালক্রমে টঁ হইয়া পড়িয়াছে; আবার উচ্চারণভেদে অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দুর লোপ হওয়ায় শুদ্ধ টকারই দেখা দিয়াছে। চূলিকা ও পৈশাচী প্রাকৃতে বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থানে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হইয়া থাকে,‡ এবং তদনুসারে ড-স্থানে ট হয়। এই নিয়মেই ত ড়া গ স্থানে ত টা ক হইয়া থাকে।§ অতএব ড়ঁ স্থানেই যে টঁ হইয়াছে তাহা বলা অসঙ্গত নহে।¶

* হে. চ. ৮. ৪. ২৯৩, ৩০৩।

† See John Beame's Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. I. p. 80.

‡ হে. চ. ৮. ৪. ৩২৫; প্রা. প্র. ১০. ৩; স. সা. ৫. ১০২।

§ কিন্তু ত টা ক শব্দ সংস্কৃতেও প্রচলিত হইয়াছে।

¶ আমাদের মালদহে গাঢ় করিয়া দুধ জ্বাল দেওয়ার প্রয়োজনস্থলে উক্ত হইয়া থাকে যে, 'কা ঠ করিয়া আঁট।' গাঢ় করিয়া কিছু মাখিতে হইলে 'কা ঠ করিয়া মাখ' ইহা বঙ্গের অন্যত্রও শুনা যায়। এতাদৃশ স্থলে এ চূলিকা ও পৈশাচী হইতে গা ঢ শব্দ কাঠ হইয়া আসিয়াছে। হেমচন্দ্র স্বকীয় ব্যাকরণে (৮. ৪. ৩২৫) চূলিকা-পৈশাচী-প্রসঙ্গে তাহা স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলায় মূর্দ্ধণ্য ণকারের উচ্চারণ মোটেই নাই, আমরা অবিশেষে সর্ব্বত্রই দন্ত্য ন উচ্চারণ করিয়া থাকি। এ রীতিও পৈশাচী প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। পৈশাচী প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই নকার প্রযুক্ত হয়, তাহাতে ণকারের কোনো সম্বন্ধ নাই।*

বাঙ্গলায় আমরা অনেক স্থলে যকারকে জকার-রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি, এবং এই জন্যই ঐ উভয়বর্ণের পার্থক্য রক্ষার জন্য 'ব গী র জ' অ ন্ত স্থ য' এইরূপে বিশেষণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে।† ইহাও যে প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সাধারণ প্রাকৃতের নিয়মই এই যে যকার-স্থানে জকার হইবে।‡

প্রাকৃতের এই প্রভাব সংস্কৃতের মধ্যেও বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কেবল বঙ্গীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণ নহেন, বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতেরাও অনেক স্থলে যকারকে জ বলিয়া উচ্চারণ করেন। বেদের উচ্চারণেও ইহার অন্যথা ভাব হয় না। শিক্ষাগ্রন্থসমূহে এতৎসম্বন্ধে নিয়মই বিহিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাসূত্রে(৩) উক্ত হইয়াছে:—

"অথান্তস্থানাম্ আদ্যস্য পদাদিস্থস্য অন্তঃস্থসংযুক্তস্য সংযুক্তস্যাপি রেফোষ্মভ্যাভ্যামুকারেণ চাবিশেষেণ আদি মধ্যাবসানেষু উচ্চারণে জকারোচ্চারণম্।"

ইহার অর্থ এইরূপ—অন্তস্থ বর্ণসমূহের প্রথম বর্ণ অর্থাৎ যকার যদি বর্ণান্তরের সহিত সংযুক্ত না হয়, এবং পদের আদিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণ জ হইবে। আর যদি যকার রেফ ও হকারের সহিত যুক্ত

* প্রা. ল. ৩. ৩৮; হে. চ. ৮. ৪. ৩০৬; প্রা. প্র. ১০. ৫।

† হিন্দী, পাঞ্জাবী ও উড়িয়াতে এইরূপ হয়, এবং কখনো কখনো মৈথিলী, মরাঠী, গুজরাটী ও সিন্ধীতেও হইয়া থাকে।

‡ প্রা. প্র. ২. ৩১; প্রা. ল. ৩. ১৫; হে. চ. ৮. ১. ২৪৫ ২. ২৪।

এই প্রসঙ্গে একটা কথার মীমাংসা করিয়া লওয়া মন্দ নহে। আমাদের সাহিত্যিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় যে, তাঁহারা কার্য্য-অর্থে বাঙ্গলায় কা জ লিখিতে শেষে জকার বা যকার লিখিবেন। ইহার উত্তরে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গলার কা জ শব্দ যে প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে তদ্বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। এই প্রাকৃত যদি আর্ষ বা মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ধরা যায়, তাহা হইলে সংস্কৃত কা র্য্য শব্দ ঐ প্রাকৃতে ক জ্জ হইবে, এবং তদনুসারে বাঙ্গলায় কা জ হইবে। আর যদি মাগধী ধরা যায় তাহা হইলে সংস্কৃত কা র্য্য হইবে ক য্য (হে. চ. ৮. ৪. ২৯২), এবং তদনুসারে বাঙ্গলায় কা য বলাই উচিত। আবার শৌরসেনী ধরিলে ক য্য এবং ক জ্জ উভয়ই হইতে পারে (হে. চ. ৮. ৪. ২৬৬), এবং বাঙ্গলায় কা য ও কা জ উভয়ই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু উচ্চারণ দেখিলে কা জ শব্দই হওয়া উচিত।

থাকে, তবে পদের আদি মধ্য ও অবসানেও সেই যকারের উচ্চারণ জ হইবে। বর্ণান্তরের সহিত সংযুক্ত বা অসংযুক্ত যেরূপই হউক, যকারে ঋফলা থাকিলে আদি, মধ্য, ও অবসান সর্ব্বত্রই ঐ যকারের উচ্চারণ জ। যথা—সংস্কৃত য় জ্ঞ তে উচ্চারিত হইবে জ্ জ্ঞ তে, এইরূপ সূ র্য্যঃ = সূ র্জ্জঃ, প্র বা হ্যা য = প্র বা হ্ জা য়, স দো হ স্ত্য তস্য = স দো হ স্ জ্ তস্য, ইত্যাদি। পদের আদিস্থিত নহে বলিয়া অ য জ স্ত স্থানে অ জ জ স্ত উচ্চারণ হইবে না।*

বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ যকার-স্থানে জ-উচ্চারণের সমর্থন করিবার জন্য সাধারণত এই কবিতাটি উল্লেখ করেন:—

"পাদাদৌ চ পদাদৌ চ সংযোগাবগ্রহেষু চ।
জঃ শব্দ ইতি বিজ্ঞেয়ো যোঽন্যঃ স য ইতি স্মৃতঃ।"

এই কবিতাটি যাজ্ঞবল্কীয় ও অন্যান্য অনেক শিক্ষা গ্রন্থের মধ্যেই দেখা যায়।+

বাঙ্‌লায় এ নিয়ম ঠিক চলিয়া আসিতেছে।

ইহার পর অন্তস্থ ব। বাঙ্‌লায় অন্তস্থ বকারের উচ্চারণ একবারে লুপ্ত হইয়াছে, আমরা সর্ব্বত্রই বর্গীয় বকার উচ্চারণ করিয়া থাকি। মৈথিলীতেও সামান্য কয়েকটি স্থান ভিন্ন সকল স্থানেই বকার উচ্চারিত হয়।‡ হিন্দীতে উভয় উচ্চারণই আছে, কিন্তু দেখা যায় যে বহু স্থানে তাহাদের বিপর্য্যাস ঘটিয়াছে। সিন্ধী, গুজরাটী ও মারাঠীতে উভয় বকারেরই পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ আছে।§

অন্তস্থ বকারের স্থানে সর্ব্বত্র বর্গীয় বকার উচ্চারণ করিতে হইবে এরূপ নিয়ম কোন প্রাকৃতের মধ্যেই দেখা যায় না। সাধারণ প্রাকৃতে বরং বিপরীত নিয়মই দৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে স্বরের পরবর্ত্তী অনাদি ও অসংযুক্ত বর্গীয় বকার স্থানে অন্তস্থ বকার হয়।¶ এই নিয়মে সংস্কৃত অ লা বূ হইতে অ লা বূ, এবং তাহা হইতে ক্রমে অ লা উ এবং লা উ** হইয়াছে।

* প্রাতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং. ২৯৭; কেশবীশিক্ষা ২, শি. সং. ১৩৯; লঘুমাধ্যন্দিনীশিক্ষা, ২-৬, শি. সং. ১১৪; লঘুমোঘানন্দিনী শিক্ষা, ১, শি. সং. ১০৭; যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা, ১৫০, শি. সং. ২৩; বর্ণরত্নপ্রদীপিকা শিক্ষা, ২০৪, শি. সং. ১৩৫।

+ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ Grierson's Maithili Language, pp. 7, 244.

§ Beame's Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, pp. 251—252.

¶ হে. চ. ৮. ১. ২৩৭।

** হে. চ. ৮. ১.৬৬।

পালিতে অন্তস্থ ব স্থানে বর্গীয় ব অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (পা. প্র. ১. § ৯২, গ); যথা সংস্কৃত বা রা ণ সী, পালিতে বা রা ণ সী, ইত্যাদি। সংস্কৃত কাব্য প্রাকৃতে ক ব্ব, কিন্তু পালিতে ক ব্ ব। মূলত অন্তস্থ ব অথবা বর্গীয় ব হউক, দ্বিত্ব হইলেই পালিতে তৎ-স্থানে বর্গীয় বকার দেখা যাইবে। ব্রহ্মদেশীয় হস্তলিখিত পালি পুস্তকসমূহে সংস্কৃতের ব্য-স্থলে নির্ব্বিশেষে ব্বা দেখা যায়, কিন্তু সিংহলীয় পুস্তকসমূহে সেরূপ নহে,* তবে ক্বচিৎ কখন কখন ব্যত্যয় ঘটিয়াছে।

অতএব বাঙ্‌লায় বকারের নির্বাধ অধিকার সম্পূর্ণ-ভাবে পালি-প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে বলিয়া প্রথমত আমরা মনে করিতে পারি না।

এদিকে শিক্ষা গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাই অন্তস্থ বকারকে গুরু, লঘু ও লঘুতর এই তিন ভেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। পদের আদিস্থিত বকার গুরু; যথা বি ভ্রা ট্ শব্দের বকার গুরু। দ্বিত্ব করিলে বকারের যেরূপ উচ্চারণ হয়, এখানেও কতকটা সেইরূপ উচ্চারণ হইবে। এই জন্যই যে যে স্থলে বকারের গুরু উচ্চারণ হইবে সেই সকল স্থলে বকারকে দ্বিত্ব বিশিষ্ট করিয়া লিখিবার প্রথা বৈদিক ও অন্যান্য গ্রন্থে চলিয়া আসিয়াছে। অতএব বি ভ্রা ট্ শব্দের উচ্চারণ ব্বি ভ্রা ট্। পদমধ্যবর্ত্তী বকার লঘু; স বি তা শব্দের বকার তদনুসারে লঘু। এবং পদের অন্তস্থিত বকার লঘুতর, যথা ত ব শব্দের বকার লঘুতর।+ কেহ কেহ বলেন ঐ স্থানে জাত আব্-এর বকার লঘুতর। এতৎসম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাসূত্রের (২) বচনটি এই:—

"অগাস্যান্তাস্তস্থানাং পদাদিমধ্যান্তস্থস্য ত্রিবিধং গুরুমধ্যমলঘু-বৃত্তিভিরুচ্চারণম্।"

অর্থাৎ পদের আদি, মধ্য ও অন্তে-স্থিত বকারের যথাক্রমে গুরু, মধ্যম ও লঘুভাবে উচ্চারণ হইবে।

* V. Trenckner's Milinda Panho, p. xvi; Sumangala Vilasini, p. xiii.

+ "বকারস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো গুরুর্লঘুর্লঘুতরঃ। আদৌ গুরুর্লঘুর্মধ্যে পদান্তে তু লঘুতরঃ॥"—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, ১৫৫ শি. সং. ২৩ পৃ.; পারাশরী শিক্ষা, ৬১-৬৩, শি. সং. ৫৮ পৃ.; অমোঘানন্দিনী শিক্ষা, ২৭-২৯, শি. সং. ৯৫; লঘুমাধ্যন্দিনী শিক্ষা, ৭-৮, শি. স. ১১৪।

বর্গীয় বকারের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ, এবং অন্তস্থ বকারের উচ্চারণস্থান দন্ত ও ওষ্ঠ উভয়ই। অতএব এ হিসাবে ইহাদের মধ্যে যে পরস্পর অনেক সাদৃশ্য আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অন্তস্থ বকারের দ্বিত্ব করিলে তাহার উচ্চারণ স্বভাবত ওষ্ঠ্য হইতে হইয়া পড়ে, এবং তাহা হইলেই ঐ অন্তস্থ বকার বর্গীয় বকারে পরিণত হয়। পালিতে এইরূপ অনেক হইয়াছে, এবং সেই জন্যই সংস্কৃত ক্ব বা পালিতে ক ব্‌ ব হইয়াছে। দ্বিত্বাবস্থায় অন্তস্থ বকার উচ্চারণ করা বড় শক্ত বলিয়া বোধ হয়; আমাদের ত ঠিক আসে না। প্রাকৃতে দ্বিত্ববিশিষ্ট অন্তস্থ বকারের বহুল প্রচলন আছে। আমার মনে হয় প্রাকৃত বৈয়াকরণিকগণ হয়ত সংস্কৃতের নিয়ম ধরিয়া প্রয়োগে অন্তস্থ বকারই করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চারণে বর্গীয় ভাবেই উচ্চারণ করিতেন। প্রাকৃতের কতকগুলি শব্দ পর্য্যালোচনা করিলেও ইহা সমর্থন করিতে পারা যায়। প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র আছে যে, সে বা, দৈ ব প্রভৃতি শব্দের বকারের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়;* অর্থাৎ সে বা স্থানে সে ব্বা এবং দৈ ব স্থানে দে ব্ব হইবে। উ এবং অ এই দুই অক্ষরকে এক সঙ্গে দ্রুত উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয় অন্তস্থ বকারের উচ্চারণও অনেকটা সেইরূপ। এইরূপ ভাবে উচ্চারণীয় বকারের দ্বিত্ব করিলে ঐ উভয় বকারের যুগপৎ কিরূপ উচ্চারণ হইতে পারে? প্রত্যেক দেশেই কোন না কোন শব্দের উপর উচ্চারণের সময় বিশেষ ভাবে একটু তীব্র স্বর (বা accent) প্রয়োগ করা হয়। বোলপুর-অঞ্চলে ইহা বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। এখানে বে টী শব্দকে বলে বি ট্টি; হ ই বে ক, বা, হ বে ক শব্দকে বলে হ ব্বে, ইত্যাদি। আবার 'এ ক্কা শি ক ড়া ব্বো ল তে না র্‌ লে ব্ব প্প!' (ইহার অর্থ—'বাপু তুমি একাশি কড়া বলিতে পারিলে না!')। প্রাকৃতের সে বা স্থানে সে ব্বা শব্দও এইরূপেই হইয়াছে, এবং তাহার ঐ অন্তস্থ বকারকে বর্গীয় বকার বলিয়া গণ্য করাই উহার মূল। অন্তস্থ বকারের দ্বিত্ব-অবস্থায় উচ্চারণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

* হে চ. ৮. ২. ৯৮-৯৯; স. সা. ২. ১১১-১১২; পা. প্র. ৩, ৫৮।

পদের মধ্যে বা অন্তে অন্তস্থ বকারকে উচ্চারণ করা যেমন সহজ, আদিস্থিত বকারকে উচ্চারণ করা সব স্থানে তত সহজ নহে। আমরা স বি তা, দে ব, শি ব, বা স ইত্যাদি বেশ উচ্চারণ করিতে পারি, কিন্তু ব্যা স, ব্যা কু ল, ব্র ত ইত্যাদি স্থলে তেমন স্বচ্ছন্দ উচ্চারণ নহে। শিক্ষাকারগণ ইহাই লক্ষ্য করিয়া গুরু, লঘু ও লঘুতর, অথবা গুরু, মধ্যম ও লঘু, এই তিনরূপে বকারের ভেদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাই মনে হয় ব্রহ্মদেশীয় হস্তলিখিত পালিপুস্তকসমূহে উচ্চারণ অনুসরণ করিয়াই বা স্থলে সর্ব্বত্র ব্ব করা হইয়াছে; সিংহলে ব্যাকরণগত সংস্কারকে লক্ষ্য করিয়া তাহা করা হয় নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণসমূহেও এই ব্যাকরণ-সংস্কার অনুসৃত হইয়াছে, উচ্চারণ অনুসৃত হয় নাই। প্রাকৃতে যে অন্তস্থ ব বহু স্থলে ঠিক উচ্চারিত হইত তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কখনো বা বর্গীয় বকারও প্রাকৃতে অন্তস্থ বলিয়া গণ্য হইত, এবং তাহাতেই সংস্কৃত অ লা বু প্রাকৃতে অ লা উ (এবং পরে লা উ) হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অন্তস্থ বকারও প্রাকৃতে সময়ে সময়ে বর্গীয়রূপে উচ্চারিত হইত, ইহা বলা হইয়াছে।* প্রাকৃতের সময়েই এই গোলমাল আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তাহা হইতেই ক্রমশ বর্ত্তমান বাঙ্‌লার মধ্যে কেবল একটি বকারের স্থান হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাকৃতের মধ্যে উভয় বকারের যে বিপর্য্যাস আরম্ভ হয়, তাহা সংস্কৃতের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার ফলে এখনো অনেক শব্দ অন্তস্থ বর্গীয় উভয় বকার দিয়াই লিখিত হয়।

ইহার পর মূর্দ্ধন্য ষ এবং দন্ত্য স। মূর্দ্ধন্য ষকারসম্বন্ধে

* সংস্কৃত বদ ধাতুর দকার স্থানে ল এবং পূর্ব্বস্থিত অন্তস্থ ব স্থানে বর্গীয় ব করিয়া প্রথমে বল্‌ ধাতু উৎপন্ন হইল (বাঙ্‌লাতে আমাদের ইহাই চলিতেছে)। প্রাকৃতে আবার বাঙ্‌লারই ন্যায় ব-কে বো, এবং তীব্র উচ্চারণ ল্‌ কে ল্ল করিয়া বোল্ল্‌ ধাতু করা হইয়াছে। বদ্‌ ধাতু যখন একবার বোল্ল্‌ ধাতু হইয়া নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন বৈয়াকরণিকগণ বর্গীয় ব লিখিতে আর কোন আপত্তি দেখিতে পান নাই; বদ ধাতু হইতে যে বোল্ল্‌ ধাতু হইয়াছে তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই, এবং সেই জন্যই লিখিয়াছেন যে, কথ ধাতু স্থানে বোল্ল আদেশ হয় (হে. চ. ৮. ৪. ২)। এখানে কেবল উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়াই বর্গীয় বকার লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে,* এখানে অবশিষ্ট কয়েকটি কথা আলোচনা করা হইবে। এই আলোচনার পূর্ব্বে মূর্দ্ধন্য ষকারের যথার্থ উচ্চারণ কি তাহা ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক। সকলেই জানেন টবর্গের ন্যায় ইহারও উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, এবং সেই জন্যই ইহার বিশেষণ হইয়াছে মূর্দ্ধন্য। এই মূর্দ্ধা শব্দে কি বুঝিতে হইবে? বলা বাহুল্য মুখের মধ্যবর্ত্তী কোন অবয়ব ভিন্ন ইহার অপর কোন অর্থ হইবে না। ইহা কোন অবয়ব? তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের (২. ৩৭) ত্রিভাষ্যরত্নকার সোমাচার্য্য বলেন—

"মূর্দ্ধশব্দেন বক্তৃবিবরোপরিভাগো বিবক্ষ্যতে।"

মূর্দ্ধা-শব্দে মুখবিবরের উপরিভাগ বুঝিতে হইবে। মুখবিবরের উপরিভাগ বলিতে তালুর উপরিতন স্থান।† প্রথমে কণ্ঠ, তাহার পর তালু, এবং তাহার পরে মূর্দ্ধা। ট উচ্চারণ করিতে তালুর পর যে উপরিতন স্থান জিহ্বা দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহার নাম মূর্দ্ধা। এই মূর্দ্ধা হইতে যে সকল বর্ণ জাত হয় তাহারা মূর্দ্ধন্য।‡

এই মূর্দ্ধন্য বর্ণ উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাকে আবেষ্টন করিয়া অর্থাৎ ঘুরাইয়া তাহার অগ্রভাগের দ্বারা মূর্দ্ধা স্থানে আঘাত করিতে হইবে। প্রাতিশাখ্যসমূহে এই নিয়মই দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন জিহ্বাগ্রকে আবেষ্টন করিয়া মূর্দ্ধা স্থানে যে মূর্দ্ধন্য ষকার উচ্চারিত হয়, বাঙ্‌লায় তাহার স্থান নাই। বাঙ্‌লায় কোনো স্থানে আমরা মূর্দ্ধন্য ষকার উচ্চারণ করি না। ইহা সকলেই অনুভব করিয়া দেখিতে পারেন। বি ষ য় শব্দে মূর্দ্ধন্য ষকার আছে, কিন্তু তাহা উচ্চারণ করিবার সময় আমরা জিহ্বাগ্রকে আবেষ্টনও করি না, এবং মূর্দ্ধাতেও তাহা স্থাপিত হয় না। ট উচ্চারণ করিবার সময় আমরা যেমন জিহ্বাগ্র আবেষ্টন করি, মূর্দ্ধন্য ষকারের বেলা সেরূপ করি না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

তবে মূর্দ্ধন্য ষকার স্থানে বাঙালীরা কি উচ্চারণ করেন? আমি বলিব তাহা তালব্য শ। কেননা তালব্য শকার উচ্চারণের যে নিয়ম আছে, তাহাই আমরা অনুসরণ করিয়া চলি।

তালব্য শকার চবর্গীয় বর্ণের ন্যায় তালু স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, ইহা কাহারো অবিদিত নাই। কিরূপে ইহার উচ্চারণ হয়, তৎসম্বন্ধে প্রাতিশাখ্যকারগণ বলিয়াছেন যে, জিহ্বার মধ্যভাগের দ্বারা তালু স্পর্শ দ্বারা তাহা উচ্চারিত হয়।*

বি শা ল শব্দে তালব্য শকার আছে। ইহা উচ্চারণ করিবার সময় আমরা যে জিহ্বাগ্র আবেষ্টন করি না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; এসময় জিহ্বার মধ্যদেশ দ্বারা তালু স্থানই আমরা স্পর্শ করিয়া থাকি। আমরা যেরূপে চবর্গীয় বর্ণ উচ্চারণ করি সেইরূপেই শকারকে উচ্চারণ করি। ইহা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

এখন বি ষ য় ও বি শা ল শব্দ উচ্চারণ করিলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি আমরা উভয় স্থলেই নির্বিশেষে শকার উচ্চারণ করিতেছি।

বাঙ্‌লায় দন্ত্য সকারেরও উচ্চারণ নাই; দন্ত্য সকারকেও আমরা তালব্য শকার করিয়া উচ্চারণ করি। জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্তমূলের স্পর্শে তবর্গ ও দন্ত্য সকার উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইংরাজীর S, ও দন্ত্য সকারের উচ্চারণ এক। বলা বাহুল্য স ক ল উচ্চারণের সময় তন্মধ্যবর্ত্তী সকারকে কেহই আমরা Sএর মত উচ্চারণ করি না। এস্থলেও আমরা তালব্য শকারই উচ্চারণ করিয়া থাকি।

অতএব আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, বাঙ্‌লায় মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য সকারের উচ্চারণ নাই, তাহাদের স্থানে তালব্য শকারকে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা কেবল লিখিবার সময় তাহাদের ভেদ রক্ষা করিয়াছি।

* গত বৎসরের ফাল্গুন মাসের প্র বা সী তে "সংস্কৃতে প্রাকৃতপ্রভাব" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী স্বকীয় ব্যাকরণের বর্ণোচ্চারণপ্রকরণে (১২) ইহাই লিখিয়াছেন—"মূর্দ্ধা অর্থাৎ তালুকে উপর।"

‡ "জিহ্বাগ্রেণ প্রতিবেষ্ট্য মূর্দ্ধনি টবর্গে" তৈ. প্রা. ২. ৩৭; ত্রিভাষ্যরত্নে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—"টবর্গে কার্য্যে জিহ্বাগ্রেণ বর্ণান্ মূর্দ্ধনি স্পর্শয়েৎ। কিং কৃত্বা? যোগ্যত্বাৎ জিহ্বাগ্রং প্রতিবেষ্ট্য আবেষ্ট্য।" মূর্দ্ধন্য ষকার সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের বচন এই:—"স্পর্শস্থানেষূষ্মাণ আনুপূর্ব্ব্যেণ" ২.৪৪। শুক্লযজুঃ প্রাতিশাখ্যে—"ষটৌ মূর্দ্ধনি ॥ ১ ৬৭ ॥ মূর্দ্ধন্যাঃ প্রতিবেষ্ট্যাগ্রং ॥ ১. ৭৮ ॥" শেষোক্ত সূত্রের উব্বটভাষ্য এইরূপ—"মূর্দ্ধন্যাঃ ষকারটবর্গৌ এতৌ প্রতিবেষ্ট্য জিহ্বাগ্রেণ ক্রিয়েতে।"

* "তালৌ জিহ্বামধ্যেন চবর্গে ॥ স্পর্শস্থানেষূষ্মাণ আনুপূর্ব্ব্যেণ ॥" তৈ. প্রা. ২. ৩৬, ৪৪ "তালব্যানা মধ্যেন ॥"—শু. য. প্রা. ১. ৭৮;

কেবল বাঙ্‌লাতেই যে এইরূপ বিপর্য্যাস হইয়াছে তাহা নহে, মারাঠী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও ইহার প্রভাব দেখা যায়।* সংস্কৃত ভাষাতেও ইহার অল্প প্রভাব প্রবিষ্ট হয় নাই ইহা আমি অন্যত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

এখন বাঙ্‌লায় কিরূপে মূর্দ্ধন্য ষকার ও দন্ত্য সকারের লোপ হইল তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত। পালি ও প্রাকৃতের মধ্যে মূর্দ্ধন্য ষকার একবারে লুপ্ত হইয়াছে, এক স্থানেও তাহার প্রয়োগ নাই। সংস্কৃত শব্দে যেখানে মূর্দ্ধন্য ষকার, পালিতে‡ এবং মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃতে§ সেই স্থলে দন্ত্য সকার দেখিতে পাওয়া যায়। এ জন্য সূত্রই বিহিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃতে তালব্য শকারও নাই, তালব্য শকার স্থানে সর্ব্বত্রই দন্ত্য সকার প্রযুক্ত হয়।¶ আবার মাগধী প্রাকৃতে মূর্দ্ধন্য ষকারের ন্যায় দন্ত্য সকারেরও সাধারণতঃ** প্রয়োগ নাই, ঐ উভয় স্থলে অবিশেষে তালব্য শকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।†† অতএব মাগধীতে যখন আমরা প্রধান ভাবে এক তালব্য শকারেরই প্রয়োগ দেখিতে পাই, তখন বাঙ্‌লার তাদৃশ প্রয়োগ যে ঐ মাগধী হইতেই আসিয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি।

ইহার পর হ। অনুস্বারের পরবর্ত্তী হকারকে আমরা ঘকার রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি। সিং হ স্থানে সিং ঘ, সং হা র স্থানে সং ঘা র উচ্চারণ বাঙ্‌লায় সুপ্রসিদ্ধ। ইহাও প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, অনুস্বারের পরবর্ত্তী হকার স্থানে বিকল্পে ঘকার হয়।‡‡

হকারে যফলা প্রদান করিলে বাঙ্‌লায় তাহার উচ্চারণ হয় জ্ঝা। আমরা বা হ্য শব্দকে বলি বা জ্ঝা, স হ্য স্থলে বলি স জ্ঝা, ইত্যাদি। আবার হকারে বফলা প্রদান করিলে আমরা তাহা ব্ভ উচ্চারণ করি। আমরা জি হ্বা শব্দকে জি ব্ভা, গ হ্ব র শব্দকে গ ব্ভ র* উচ্চারণ করিয়া থাকি। এই উভয় উচ্চারণই প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে। প্রাকৃতে জি ব্ভা, বি ব্ভ ল (বিহ্বল) এবং স জ্ঝ (স হ্য), গু জ্ঝ (গু হ্য) প্রভৃতি শব্দ সুপ্রসিদ্ধ; প্রাকৃত ব্যাকরণসমূহে এজন্য নিয়মই রচিত হইয়াছে।†

সংস্কৃত জি হ্বা হইতে প্রাকৃতে জি ব্ভা হয়; কিন্তু ইহা কিরূপে হইল তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা প্রথমে পালির নিকট উপস্থিত হই। পালিতে হ্ব এই সংযুক্ত বর্ণদ্বয়ের স্থানবিপর্য্যয় হয়;‡ তদনুসারে পালিতে তাহা জি ব্হা, হইয়া থাকে। পালির এই জি ব্ হা হইতেই প্রাকৃতে জি ব্ ভা হইয়াছে।

বৈদিক ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বহু স্থানে হ স্থলে ভ হইয়া থাকে§; এবং প্রাকৃতেও ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে। তদনুসারে পালির জি ব্ হা প্রাকৃতে প্রথমে জি ব্ ভা হইয়াছে, এবং তাহার পরে ভ এই বর্গীয় বর্ণের সান্নিধ্যহেতু জিহ্বা পদের অন্তর্গত অন্তস্থ বকারটিও বর্গীয় বকাররূপে পরিণত হইয়াছে।

স জ্ ঝ সম্বন্ধে ক্রমিক পরিবর্ত্তন দুই প্রকারে হইতে পারে। হ্য এই সংযুক্ত বর্ণদ্বয়ের পালিতে স্থানবিপর্য্যয় হয়,¶ এবং সেই নিয়মে সংস্কৃত স হ্য পালিতে স য্ হ হইয়া থাকে। পালির সেই স য্ হ শব্দের যকারকে পূর্ব্ববর্ণিতরূপে জকার করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে তৎসন্নিহিত হকারও ঝকাররূপে পরিণত হইয়াছে। অথবা প্রাকৃতে ধ্য-স্থানে যেমন জ্ঝ হয়, যথা ম ধ্য স্থলে

* See Beame's Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. 1. pp. 70-78; Hoernle's Comparative Grammar of the Gaudian Languages, pp. 24-25.

† পালিপ্রকাশের ভূমিকা; গত বৎসরের ফাল্গুনের প্র বা সী তে "সংস্কৃতে প্রাকৃতপ্রভাব" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ পা. প্র. ১. § ৬।

§ প্রা. প্র. ২. ৪৩; হে. চ. ৮. ১. ২৬০; স. সা. ২. ১০৩।

¶ অব্যবহিত পূর্ব্ব টীকা দ্রষ্টব্য।

** প্র + ঈক্ষ্ ধাতু ও আ + চক্ষ্ ধাতুর ক্ষ-স্থানে মাগধীতে স্ক হয়, হে. চ. ৮. ৪. ২৯৭; তুলঃ প্রা. প্র. ১১-৮; এবং স্থা-ধাতু স্থানে আদিষ্ট তি ষ্ঠ স্থলে চি ষ্ঠ হইয়া থাকে। ঐ ২৯৮; প্রা. প্র. ১১.১৪। দ্রঃ— হে. চ. ৮. ৪. ২৮৯-২৯১।

†† প্রা. প্র. ১১-৩; হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮; স. সা. ৫. ৮৬।

‡‡ হে. চ. ৮. ১. ২৬৪।

* মালদহে প্রচলিত গা ভা র ইহা হইতেই হইয়াছে।

† হ্য—হে. চ. ৮. ২. ৫৭. ৫৮; প্রা. প্র. ৩. ৪৭; প্রা. ল. ৩. ১, ২১; স. সা. ২. ৯৭; জ্ঝ—হে. চ. ৮. ২ ২৬; প্রা. প্র. ৩. ২৮; প্রা. ল. ৩. ১, ২০; স. সা. ২. ৮৭।

‡ পা. প্র. ১. § ৪১।

§ যথা গৃহ্নামি স্থলে গৃ ভ্না মি, ইত্যাদি বহুস্থলে; এ বিষয় পালি-প্রকাশের ভূমিকায় বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

¶ পা. প্র. ১. § ২১।

ম জ্ঞ (বাঙলায় মা ঝ*), সেইরূপ এস্থলেও অন্তস্থ যকারের বর্গীয় জকারের ন্যায় উচ্চারণ হওয়ায় একবারে হ্য স্থানেই জ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে।

প্রবন্ধ ক্রমশঃ বিপুল হইয়া উঠিতেছে বলিয়া সম্প্রতি এস্থানেই নিরস্ত হইতে হইতেছে। নতুবা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আরো কথা রহিয়াছে। এখানে কেবল সামান্য দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।

উপসংহারে একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। আমাদের কাহারো অবিদিত নাই, এবং এই প্রবন্ধেও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমরা যেরূপ উচ্চারণ করি, তদনুসারে তাহা লিখি না; উচ্চারণ করিবার সময় এক, এবং লিখিবার সময় আর এক। বলা বাহুল্য ইহা পূর্ব্বে কখনই এতদূর ছিল না, এবং হওয়াও সম্ভব নহে; বলিব রাম, লিখিব শ্যাম, ইহা হয় না। প্রাকৃত ভাষাই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, সেই সব ভাষা যেমন উচ্চারিত হইত সেইরূপই লিখিত হইত। আমাদের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকেও এই প্রথা সম্পূর্ণ অনুসৃত ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাহার পর সংস্কৃতমাত্রপ্রিয় ব্যক্তিগণ যখন প্রাকৃতের দিকে একবারে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িলেন, তখন প্রাকৃতানুসারে প্রযুক্ত সমস্ত শব্দকেই সংস্কৃত নিয়মে অশুদ্ধ গণ্য করিয়া ঐ সকল শব্দের স্থানে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এখনো এ প্রবাহের নিবৃত্তি হয় নাই। ইহার ফলে এই দাড়াইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রাচীন বাঙলার কিরূপ আদর্শ ছিল তাহা আর জানিবার উপায় নাই। প্রাচীনগ্রন্থ-সংস্কর্ত্তৃগণের এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত বাঙলা বাঙলাই, তাহা সংস্কৃত নহে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

রাঙা মেয়ে

১

তোরে হেরি, রাঙা মেয়ে, আজি আমি নিদ্রায় মগন;
তুই মম সুখের স্বপন।
ভয় হয় পাছে আসে বুকভাঙা চির জাগরণ,
তীব্র রৌদ্রে ধাঁধিয়া নয়ন।
কোথা ছিলি এত দিন দেবকন্যা, আনন্দের খনি?
নয়ন হারায়েছিনু;—কোথা ছিলি নয়নের মণি?

২

তোরে হেরি, রাঙা মেয়ে, বুঝেছি যা কভু বুঝি নাই;
নারী সর্ব্ব সুষমার সার!
চাঁদের কেবলি জাঁক, গোলাপের কেবলি বড়াই,
ফিকে ইন্দ্রধনুর বাহার!
সৃজিয়া নারীর মূর্ত্তি, হে শ্রীহরি, কোন্ উষাকালে,
হইলে অবাক্ তুমি, নিজে মুগ্ধ নিজ ইন্দ্রজালে?

৩

তোরে হেরি রাঙা মেয়ে, বুঝিয়াছি, আসল সৌন্দর্য্য
চিত্রমাঝে নাহি পড়ে ধরা।
প্রতিভার তুলিকায় ল'য়ে ম্লান বর্ণের ঐশ্বর্য্য,
সুধু বৃথা অভিনয় করা!
দীপ-দরশনে হায়, রুদ্ধ কোনো গৃহকোণে বসি,
হয় না হয় না তৃপ্তি, বিনা আকাশের পূর্ণশশী।

৪

তোরে হেরি রাঙা মেয়ে, বুঝিয়াছি, কাব্যের নায়িকা
মিছা খ্যাতি পায় ধরাতলে।
তুই মাগো চিরসত্য, তা'রা হয় মিথ্যা বিভীষিকা;
বহু ভেদ আসলে নকলে!
বনবাসে গেলে চলি, সীতা সতী লাবণ্যের রাণী,
কে চায় সোনার সীতা? সোনা নয়, সে সুধু পাষাণী!

৫

তোরে হেরি, রাঙা মেয়ে,—বুঝেছি মা, বিলাস-লালসা
সব ভস্ম; কেবলি তা ছাই!
একমাত্র হোমানল-পবিত্রতা, হরিপদ-আশা;
হেন আলো ধরাতলে নাই!
তুই যে মণির শিখা, রাঙা মেয়ে, না জানি কেমন
আমার সে নীলমণি, কৃষ্ণধন, অতুল রতন!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

যৌথকারবার-নীতি

তাহার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার—নৈতিক ফল—উদাহরণ।

(বিগত ১৯১১।২৯ জানুয়ারি হইতে তিন দিন মেদিনীপুর বেলীহলে যৌথ ঋণদান সম্পর্কীয় মেদিনীপুর জেলার দ্বিতীয় বার্ষিক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ঐ সভার সভাপতি হন। এই প্রবন্ধ সেই কনফারেন্সের প্রথম দিনে পঠিত হয়।)

কেমন করিয়া আমরা প্রত্যেকে পরস্পরকে দুঃখে বিপদে অভাবে সাহায্য করিতে পারি সেই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য আজ আমরা সকলে এই স্থানে একত্র মিলিত হইয়াছি এবং সেই বিষয়টীরই নাম যৌথনীতি। সকলে মিলিয়া পরস্পরের উন্নতিকল্পে সাহায্যদান ও সহানুভূতি প্রকাশ, সকলের সুখদুঃখের কথা প্রত্যেকে এবং প্রত্যেকের সুখদুঃখের কথা সকলে বুঝিয়া শুনিয়া প্রতীকার ও ব্যবস্থাবিধান করাই যৌথনীতি। একের ব্যক্তিগত চেষ্টায় যাহা হয় না, সকলের সমবেত চেষ্টায় তাহা সহজ ও সরল হয়। হইতে পারে, জগতে একের যত্নে, একের মঙ্গলে অগণিত লোক মঙ্গলময় হইয়া থাকে—একজন বৃক্ষরোপণ করেন, শত শত পথিক তাহার ছায়ায় বিশ্রামসুখ লাভ করে। যে সকল মহাপুরুষেরা সংসারের সুখের জন্য স্বতঃপরতঃ নিরন্তর অবহিত থাকিয়া আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি করেন না, তাঁহারা যখন যেই পথে অগ্রসর হন্ সেই পথেই দয়াধনের বীজ বপন করেন—ইতর প্রাণিগণ তাহার ফলভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। আজ এই সভাস্থলে যেসকল পুণ্যশ্লোক মহানুভব ব্যক্তিগণের সম্মিলন হইয়াছে ইহাই এদেশের নবপ্রবর্ত্তিত যৌথনীতির সুফল—পূর্ণ সম্মিলনের ভাবী ভিত্তি।

আমাদের সমাজের মধ্যে সুখী হইতেও সুখী, দুঃখী হইতেও দুঃখী অনেক আছেন। তথাকথিত সুখের ক্রোড়ে কত লোক বিলাস ও বাবুগিরিকে আলিঙ্গন করিয়া জীবনের পুরুষার্থ চরিতার্থ করিতেছেন—কতবা আবার দীনহীন দরিদ্র অন্নাভাবে অনশনক্লেশে নিজ ও পরিবারবর্গের উদর পূরণ করিতে না পারিয়া আপনার ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে অলসভাবে দিন যাপন করিতেছেন। যিনি ধনী—সুখে যাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সংকুলান হইতেছে—ভোগবিলাসের কোন বাধা ঘটিতেছে না—তিনি দরিদ্রের কথা ভ্রমেও একবার ভাবিবার অবসর পান না! যে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করিয়া ধনীর সুখ নিয়ত অপ্রতিহত রাখিতেছে, সে বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্যও ধনীর চিন্তার বিষয়ীভূত হয় না। যে দরিদ্র, নিয়ত হাহাকারে যাহার দুঃখের জীবন দিনের পর দিন গুণিয়াও শেষ হইতেছে না, যে হতাশ হইয়া প্রতিপদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, কষ্টের জীবন কতদিনে শেষ হয় ভাবিতেছে, সেও ধনীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষায় ব্যস্ত! একজন সুখের কোলে থাকিয়া উদাসীন, অপর জন দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিয়া ধনীর সন্তোষ বিধান করিতেছে। এই বিভিন্নমুখী বৃত্তি দুইটীর মিলন কোথায়? মিলন—পরস্পর সহায়তায়।

সত্য বটে, চিরসুখী জন ভ্রমেও কখনো ব্যথিতের বেদনা বুঝিতে পারে না! কিন্তু তাহাকে বুঝাইতে হইবে। তখন সে অতি সহজেই বুঝিবে! ধনী তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত ধনরাশির মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—কিন্তু তাঁহার যথেচ্ছাচার চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। দরিদ্র কায়ক্লেশে দিন দিনান্ত ধরিয়া তাহার কর্ত্তব্য অবিরাম সমভাবে করিয়া চলিয়াছে—তাহার বিন্দুমাত্র অবহেলা নাই, লেশ মাত্র ত্রুটী নাই—তথাপি তাহার অবস্থারও উন্নতি নাই, দুঃখ ভোগ করিতেছে এ চৈতন্যও তাহার নাই। কিন্তু যদি তাহার ভাতে ঘা লাগে—দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও যদি শ্রমজীবী একমুঠা ভাতের সংস্থান করিতে না পারে, তখন আর ধনীর নিশ্চিন্ত থাকা চলে না! তাহার বিলাস ও বাবুগিরির পথ অচিরেই রুদ্ধ হইয়া যায়। যে বৃক্ষের সুফল সম্ভোগ করিতে হইবে, তাহার মূলে জলসেচন করা চাই—বৃক্ষকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ত। দরিদ্র শ্রমজীবিগণ সমাজের মূলতন্তু—তাহার উচ্ছেদসাধন করিলে ধনীর ধনগর্ব্ব চূর্ণ হইবে, মানমদে প্রমাদ ঘটিবে! শরীরাবয়বের কোনটীকে বাদ দিয়া দেহের কোন ক্রিয়া চলে না। মাথায় দেহের রাজা অবস্থান করেন—তাহার ক্ষুদ্র রাজ্যটীতে হাতপা, নাকমুখ, চোককান প্রভৃতি সকলের পরস্পর সহায়তায় কি সুন্দর

বৈধ সামঞ্জস্য! অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্য্যপ্রণালীর কি সুবিহিত ব্যবস্থা! প্রত্যেকেই সকলের জন্য, সকলেই প্রত্যেকের জন্য নিয়মিত নিয়মিত ক্রিয়া করিতেছে;—কাহারও বিরাম নাই বা বিরক্তি নাই। মানবের দেহরাজ্যে যাহা ঘটিতেছে, রাজার রাজ্যে—লোকের সমাজে কি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে? কিছুতেই না! ধনী আজ কৃষিজীবী দরিদ্রের কথায় কর্ণপাত করিতেছে না, কৃষকের নগণ্য কষ্টে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না—হয়ত কাল সে দেখিবে কৃষকের অভাবে পদে পদে তাহার বিপদের আশঙ্কা হইতেছে।—তখন সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে! সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে এই সকলের সামঞ্জস্য, ইহাদের সম্মিলন ও পরস্পর সহায়তায়—তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই নহে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৮০ জনের বেশি লোক কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে; অবশিষ্টেরও অধিকাংশ অতি কষ্টে দিন যাপন করে—তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের যে খুব সচ্ছলতা আছে, বোধ হয় না। বরং কৃষক সুখী; কিন্তু তথাকথিত চাকুরে বাবুর বা তেজারতী মহাজনী বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যক্তিবৃন্দের জীবিকার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। যে রকম কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আত্মশক্তির সুপরিচালনা দ্বারা সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ ভিন্ন অযোগ্যের এক্ষেত্রে জয়-লাভের আশা নাই। যোগ্যতম ব্যক্তি চিরবিজয়ী! তাঁহারই জন্য ইহলোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও পরলোকের শান্তি! কিন্তু হায়, অগণিত ধনের ভাণ্ডার ও জগতের ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ভারতের দীনদরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবিবর্গের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদে অভিভূত হইতে হয়। কি কারণে এই হীনতা উপস্থিত হইয়াছে এবং দিন দিন কেনইবা তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক ভাব ধারণ করিতেছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা এক বিষম সমস্যা। সেই উৎকট সমস্যার সমাধানে যদি আংশিক ভাবেও সহায়তা করিতে পারা যায়, সেই জন্যই আজ সকলে এই সমক্ষেত্রে সম্মিলিত। কেন এ দশা উপস্থিত হইয়াছে, সে কথা ছাড়িয়া দিয়া, কিসে তাহার প্রতীকার হয়, সেই চিন্তা সেই কার্য্যই উচিত। পণ্ডিতগণ সকলেই অবস্থা বুঝিয়া স্থির করিয়াছেন যে "যৌথকারবার-নীতির" প্রচলন ও প্রসারণ ভিন্ন এ সমস্যার সমাধান হইতেই পারে না। আমিও আজ সেই বিষয়টী এই প্রবন্ধে একটু বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিব।

এ দেশের প্রাচীন কালে অর্থনীতির কিরূপ চর্চ্চা হইত, তাহার সবিশেষ তথ্য এখন অবগত হওয়া অসম্ভব। সুখ দুঃখ জগতে বিজড়িত ভাবে বিদ্যমান থাকে; এখানে চিরকালই যে রামরাজ্য চলিয়াছে, তাহা নহে; কিংবা চিরকালই যে এখানে কেবল বর্গীর হাঙ্গামার অভিনয় হইয়াছে তাহাও নহে। প্রজা চিরকাল রাজরক্ষিত। পুরাকালে রাজপুরুষগণ এদেশে "ধান্যাগারের তত্ত্বাবধারণ করিতেন"; লব্ধ অর্থের কিয়দংশ মাত্র নিজে ব্যয় করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা "বণিক, শিল্পী, আশ্রিত দীনদরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ধন ধান্য প্রদান দ্বারা অনুগৃহীত করিতেন"; "রাজ্যস্থ কৃষকদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতে দিতেন"; নদ নদী তড়াগে "জলের সুবন্দোবস্ত করিতেন"—"বৃষ্টি না হইলেও যাহাতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার বিধানে মনোযোগী থাকিতেন; কৃষকদিগের যাহাতে গৃহে বীজ ও অন্নাদির অভাব না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে অনুগ্রহ স্বরূপ * * ঋণদান করিতেন। লাভ প্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে সমাগত বণিকগণের নিকট যথোক্ত শুল্ক গ্রহণ করিতেন; সেই সকল বণিক্‌দিগকে সম্মানের সহিত আপ্যায়িত করিয়া উপযুক্ত লোক দ্বারা তাহাদিগের আনীত পণ্যদ্রব্য সকল পরীক্ষা পূর্ব্বক নিজ দেশে বিক্রয় করিতে দিতেন; কৃষিতন্ত্র, গো, পুষ্প ও ফল রক্ষার জন্য যত্ন করিতেন; শিল্পকার-দিগকে উপকরণ সামগ্রীসকল নিয়ত প্রদান করিতেন।"

সেকালের আট প্রকার কাজকার্য্যের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্য এই দুইটীই প্রধান অঙ্গ ছিল; অতঃপর ছিল গ্রাম ও নগরবাসিগণের কার্য্যপরিদর্শন ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাজানুগ্রহ ব্যতীত প্রজার মঙ্গল নাই; কিন্তু যাহাতে প্রজালোক অলস ও উদ্যমহীন হইয়া পড়ে সেরূপ অনুগ্রহ রাজার অভিপ্রেত নহে। রাজা তথ্যানুসন্ধান, আদেশ, উপদেশ এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলে অনুগ্রহ স্বরূপ অর্থ দ্বারাও আনুকূল্য করিতে পারেন। আমরা যে কালের কথা কহিতেছি সে অনেকদিনের কথা।

ইদানীং আমাদের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে—আমরা যে ভাবে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে জীবন রক্ষার জন্য, দেশ ও দেশবাসিগণের প্রাণধারণের জন্য এখন আমাদিগের শেষ সাহায্য ঋণগ্রহণ পর্য্যন্ত আবশ্যক হইতেছে। আপনারা সকলেই জানেন যে দীন দরিদ্র মফস্বলের চাষী প্রজা বছর বছর কি প্রকারে ঋণ করিয়া চাষ করে; করিয়াও শেষে চাষের সমস্ত ফসল দিয়াও ঋণমুক্ত হইতে পারে না। তথাকথিত ভদ্রনামধারী মহাজনগণ নামের কলঙ্ক করিয়া সেই নিষ্পিষ্ট প্রজাগণকেই আবার পেষণপূর্ব্বক তাহাদিগের স্নেহে স্বশরীরের স্নিগ্ধতা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন। হায়, দেশের কি দুর্ভাগ্য! ইঁহারাই এখানে মহাজন সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন! কি অধোগতি! দুর্জ্জন শাইলকের দুরন্ত আচরণও এ দেশে শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিল! ইঁহারা পিষ্টপেষণে সিদ্ধ হস্ত—মরার উপরেও খাঁড়া ধরিতে উদ্যত—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতেও কুণ্ঠিত নহে! মহামতি ভক্তিভাজন শ্রীযুত গুরলে সাহেবও একদিন তাহাদিগের দুরন্ত প্রতাপে বোধ হয় সভয়েই বলিয়াছিলেন—"এই গ্রাম্য ঋণদাতাদিগের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন, আমাদিগের যৌথনীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নহে—কেন না ধোবা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতির ন্যায়—মহাজনগণও গ্রাম্য সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয়—এবং তাহাদিগের সাহায্য ভিন্ন কৃষকদিগের কৃষিকার্য্য চলাই সম্ভব নহে।" এ আজ কয়েক বৎসরের কথা; আমার বোধ হয় এখন এই গ্রাম্য শাইলকগণকে বিদায় দিয়া কিংবা তাহাদিগকে মোলায়েম ভাবে নূতন ছাঁচে গড়িয়া লইয়া সহৃদয় রাজপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত যৌথ-নীতির অবলম্বনে আমরা অসহায় প্রজাকুলের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারি। সেই উদ্দেশ্যের সমালোচনা ও সহায়তা করিবার জন্যই আজ আমাদিগের এই সম্মিলন—যৌথকারবারের এই নীতিটীই আজ আমাদিগের বিশেষ ভাবে আলোচ্য বিষয়।

এতকাল এ দেশে যৌথসম্মিলনের সাহায্যে ব্যবসায় বাণিজ্য চালিত হয় নাই। এ দেশে শ্রমজীবী সমাজ (Labour organised) শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই; সকলে বা বহুলোকে একত্র হইয়া কোন লোকহিতকর কার্য্যে অগ্রসর হইতে বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না;—সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে নিজে নিজে কর্ম্ম করাই এ দেশের চিরপ্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এই জন্যই বোধ হয় এ দেশে চাষের এত প্রচুরতা; চাষ ভিন্ন এত সহজে আর কি হইতে পারে? অবশ্য দেশের জলবায়ু মাটিও তাহার অনুকূল; লোকেরও প্রবৃত্তি সেইরূপ। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে কালসহকারে এখন সেইরূপ ব্যক্তিগতভাবে ভিন্ন ভিন্নরূপে পরার্থপর কার্য্যেরও লোপ পাইতেছে—এমন কি চাষের পক্ষেও নানা অন্তরায় ঘটিতেছে—অনেক বাধা বিঘ্ন জুটিতেছে; সুতরাং অন্যান্য ব্যবসায় বাণিজ্যের ন্যায় কৃষিকার্য্যের জন্যও যৌথ চেষ্টার আবশ্যক হইয়াছে। চাষী মূলধন না পাইলে—উপযুক্ত বীজ সংগ্রহ করিতে না পারিলে—যথামূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে না পারিলে—কি প্রকারে কার্য্য চালাইবে? সুতরাং এখন সেই পূর্ব্ব প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইতেই হইবে; নতুবা জীবন রক্ষার—লোকপালনের গত্যন্তর নাই। আলোচ্য "যৌথকারবার নীতি" সেই চেষ্টায়ই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহারই উপকার সাধন করিতেছে।

এই ত গেল কৃষির কথা। কৃষিকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত আর একদল লোক দেশের ক্রোড়ে তদপেক্ষাও দীনহীনভাবে দিন যাপন করিতেছে। কৃষক অল্পে সন্তুষ্ট;—কিন্তু ইহাদের আশা অনেক। দরিদ্র চাকুরী ব্যবসায়িগণ এই দলের অগ্রগণ্য। তাহাতে আবার বর্ত্তমানকালে শিক্ষা দীক্ষার বহুল প্রচার ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের জনসাধারণের অবস্থা ও উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা প্রভৃতি দ্বারা লোকের মনে এক অদম্য উৎসাহ, উৎফুল্ল আশার সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং যে দেশের যেটী ভাল, সে দেশের সেইটীকে, মন্দ ভাগ বর্জ্জন পূর্ব্বক, গ্রহণ করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। আমরা যে "যৌথনীতির" কথা আলোচনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি তাহাও বৈদেশিক আমদানী; অতি অল্প দিন মাত্র ইহা ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ইদানীন্তন ভারতবাসী বহুদিন হইতেই এবংবিধ কোন নীতির অনুসরণে তৎপর হইয়াছিলেন—শুভ মুহূর্ত্তে বিশ্ববিশ্রুত জার্ম্মান দেশীয় এই নীতি আমাদিগের রাজপুরুষগণ প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধনের পথ উন্মুক্ত করিয়া

দিয়াছেন। আশা আছে, সর্ব্বত্রই ইহার সমাদর হইবে;—উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সকলেই সমভাবে এই নীতির অনুসরণ করিবেন—তাহা হইলেই ভারতবাসী হীনতাপঙ্কে নিমগ্ন না হইয়া আবার এই দেশে অমৃত-প্রবাহের সৃষ্টি করিতে পারিবে—নিশ্চয়ই আবার বেদ-কীর্ত্তিত সুপবিত্র পঞ্চনদের পার্শ্ববাহিনী জাহ্নবীর পবিত্র জলধারা সমস্ত ভারতভূমিকে উর্ব্বর করিয়া তুলিবে—দেশ মধুময় হইবে।

বৈদেশিক যৌথকারবারের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এদেশে মাদ্রাজ অঞ্চলে কিরূপভাবে পরস্পর সাহায্যদান-প্রণালী বর্ত্তমান ছিল তাহার কথা একটু বলা আবশ্যক মনে করি। কাল সর্ব্বগ্রাসী বলিয়া আমরা মনে করি, কিন্তু কাল সর্ব্বপ্রসবকারীও বটে; ইহা ভাঙ্গিতেও যেমন, গড়িতেও তেমন; কালে সকলই লয় হয়, ক্ষয় পায়—কিন্তু কালেই আবার সকলের উৎপত্তি ও আবির্ভাব হয়। কাল হেতু আনয়ন করিয়া দেয়—যখন যাহা দরকার কালই তাহার সংঘটন করিয়া দেয়। অভাবের মূলেই আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে—মাদ্রাজ অঞ্চলেও তাহাই ঘটিয়াছিল। বিশ্বাস, একতা ও সাধুতা প্রভৃতি আত্ম-নির্ভরমূলক গুণাবলী মাদ্রাজবাসীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। যে সময়ে জার্ম্মেনীতে শুলজ, রাইফিসেন প্রভৃতি পরগতপ্রাণ মহাত্মারা জনসাধারণের অভাব বিমোচনের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, ঠিক সেই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে মাদ্রাজেও ঋণভারপ্রপীড়িত কতকগুলি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত লোক মিলিত হইয়া "নিধি" নামক সমিতি স্থাপন করেন। 'নিধি'র উদ্দেশ্য—পূর্ব্বকৃত ঋণজাল হইতে সভ্যগণকে মুক্তি প্রদান, উচ্চ সুদে ঋণগ্রহণ নিবারণ—বিবাহাদি কার্য্যে অবস্থোচিত ব্যয় সংকুলান, ভূমি বিক্রয়, গৃহনির্ম্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য পরস্পর সাহায্য-দান। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—স্থায়ী ও অস্থায়ী। প্রত্যেক সমিতিই সাধারণত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অংশের দ্বারা গঠিত হয় এবং সভ্যগণ মাসিক চাঁদা দ্বারা নির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে নিজ নিজ অংশের টাকা সম্পূর্ণ প্রদান করেন এবং আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মুনাফাসহ প্রদত্ত টাকা ফিরাইয়া পান। "অস্থায়ী নিধি"র কার্য্য এইখানেই শেষ। "স্থায়ী নিধি"র অংশ গ্রহণ করা চলিতে থাকে; কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশীদারগণ টাকা উঠাইয়া লয়েন মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে সকল নিধিই প্রায় স্থায়ী সমিতিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে সভ্যগণ ঋণ পানই; আবশ্যক হইলে বাহিরের লোককেও উপযুক্ত জামীনে উচ্চতর সুদের হারে টাকা ধার দেওয়া হয়। প্রাবেশিক দক্ষিণা, বৎসরান্তে হিসাব নিকাশ, লভ্যাংশ বিতরণ প্রভৃতি এবং হিসাব পত্র প্রভৃতি যাহা কিছু, দেশীয় প্রণালীতেই রক্ষিত হয়;—স্থানে স্থানে ইদানীং পাশ্চাত্যভাবেও রাখা হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজের নিধির অনুকরণে বঙ্গদেশের রংপুর, নদীয়া, পাবনা, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় কতকগুলি "পরস্পর সাহায্যদান সমিতি" স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল; এখন তাহার সম্পূর্ণ তত্ত্ব অবগত হওয়া দুঃসাধ্য। বোধ হয় এই কলঙ্কিত বঙ্গভূমির আব হাওয়া সেইগুলির পক্ষে সহ্য হয় নাই; এখন তাহাদিগের নামও কেহ জানে না।

বলা বাহুল্য প্রাগুক্ত "নিধি"র প্রণালী মাদ্রাজ অঞ্চলের আরও প্রাচীন "কুওচিৎ" প্রথার অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরস্পরে বিশ্বাস, একতা এবং সাধুতা "কুওচিৎ প্রণালী"র মূলভিত্তি। কতকগুলি লোক, মনে করুন ৫০ জন, একত্র হইয়া মাসিক ১৲ একটাকা করিয়া চাঁদা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত। প্রতি মাসে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সুরতি খেলার নিয়মানুসারে গুটিকা পাত করিয়া একজনকেই ঐ ৫০ টাকা দেওয়া হইত; এই প্রকারে ৫০ মাস ধরিয়া ক্রমান্বয়ে ৫০ জনে সাহায্য প্রাপ্ত হইলে মণ্ডলীর কার্য্য সমাপ্ত হইত। ইহাতে সুরতির বিশেষ কিছু নাই; লব্ধ অর্থের সময়ের অগ্রপশ্চাৎমাত্র। কালক্রমে, দরকার বুঝিয়া প্রতি মাসের দেয় টাকা নীলাম করা হইত; যে কম মূল্যে অর্থাৎ প্রাপ্য ৫০৲ টাকা ৪০৲ বা ৪৫৲ টাকা দিয়া লইতে রাজি হইত তাহাকেই দেওয়া হইত। উদ্বৃত্ত অর্থ লভ্যাংশ বা স্থায়ী ভাণ্ডারে পরিণত হইত। এইরূপে সামান্য সামান্য সঞ্চয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়া এই প্রণালীই কালসহকারে 'নিধি'রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; এবং এই "নিধির" ভিত্তিভূমি মাদ্রাজের খ্যাতনামা সিভিলিয়ান শ্রীযুত

নিকলসন সাহেব মহোদয়ই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের যৌথ-নীতির তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হন।

কিন্তু কি প্রকারে প্রকৃত "পসার" ও পরস্পর সহযোগিতায়, সাধুতা শ্রমশীলতা ও যৌথদায়িত্বে, আত্মশিক্ষা ও স্বাবলম্বনের ভিত্তিস্বরূপ, অর্থশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ দ্বারা এইসমস্ত যৌথসমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে—ঋণদানমণ্ডলী জন্মলাভ করিতেছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়-মণ্ডলীর সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ ঘটিতেছে—তাহার ইতিবৃত্ত সমুন্নত জার্ম্মানী দেশের অদূর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই কতগুলি সুবিধা চাই—উভয়ে উভয়ের নিকট থাকা চাই—দাতার নিরাপদ জামীন চাই,—গৃহীতার সুদটী অল্প হওয়া আবশ্যক—পরিশোধের ক্লেশ লাঘব হওয়া চাই—সময়ের সুবিধা না হইলে পরিশোধের বিঘ্ন পদে পদে। এইসকল বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া জার্ম্মানী দেশের প্রাতঃস্মরণীয় যেসকল মহাপুরুষেরা ইয়ুরোপখণ্ডে যৌথনীতির প্রথম প্রচলন করিয়া জগতে অর্থনীতির জটিল সমস্যার মীমাংসার সুগম পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, মহাত্মা শুলজ, রাইফিসেন ও হাস তাঁহাদিগের অগ্রণী ও জগন্মান্য নেতা। তাঁহাদিগের উদ্যোগ, প্রণালী ও কার্য্যকলাপ বিস্তারিতরূপে এস্থলে বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৮৫০ সালেই এইসকল সমিতির প্রথম পত্তন হয়। জার্ম্মানী দেশের লোকে এইসকলের উপকারিতা অনুভব করায় শনৈঃ শনৈঃ অচিরকাল মধ্যে ইহাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। মহাত্মা শুলজের সমিতির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না—ইহা নগরের বা গণ্ডগ্রামের উপযোগী—অপেক্ষাকৃত ভদ্রতর সম্প্রদায় লইয়া গঠিত। রাইফিসেন সমিতি প্রধানতঃ কৃষক, শ্রমজীবী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী লইয়া গঠিত। কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য উন্নতি। প্রথমতঃ, নির্দ্দিষ্ট গ্রামের কয়েকটী অবস্থাপন্ন লোক কার্য্য আরম্ভ করেন—পরে সাধারণে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। শুলজ-সমিতিতে অংশ আছে—রাইফিসেনে তাহা নাই। সুতরাং শেষোক্তের দায়িত্ব অধিক—একতা, সাধুতা ও বিশ্বাস অনেক দরকার। কালবশে শুলজ ও রাইফিসেন-প্রবর্ত্তিত সমিতিগুলির নিয়মাবলী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কঠোর ভাব ধারণ করিলে পাছে উহাদিগের কার্য্যকারিতার হ্রাস হয় এই উদ্দেশ্যে মহামান্য হাস অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিয়া যান। ইহা রাইফিসেনের শাখা বলিলেও হয়—মূলে ব্যতিক্রম অতি কম। এই হাস-প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর কল্যাণে দেশময় পরস্পর সহযোগিতায় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায়ের অভ্যুদয় দ্বারা জনসাধারণ কার্য্যতৎপর ও প্রতিভাশালী হইয়া দেশের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে তাহারই ফলে আজ ইয়ুরোপের দেশসমূহ জগতের লোকলোচনের দর্শনীয় হইয়া আছে; এবং প্রাতঃস্মরণীয় জার্ম্মান মনিষিগণ অগ্রণী হইয়া অঞ্জনশলাকা দ্বারা যে জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার রসসিক্ত সেই বিশ্বের নয়ন-পংক্তি চিরদিন উৎফুল্ল ভাবে জার্ম্মান দেশের দিকে ভক্তি-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে।

কেবল যে আর্থিক অসুবিধার উচ্ছেদ সাধন করিয়া যৌথনীতি জার্ম্মান দেশের আনুকূল্য করিয়াছে তাহা নহে; নৈতিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে কোন জাতি অপর জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যৌথপ্রথা সকল বিষয়ে জাতীয় সফলতা না দেখাইতে পারিলে ইয়ুরোপ-খণ্ডের অন্যান্য ভূভাগে ইহা কিছুতেই বিস্তৃতি লাভ করিত না। জার্ম্মানদিগের সকল সুবিধা ও উন্নতির মধ্যে সভ্যগণের নৈতিক চরিত্র এবং সাংসারিক অবস্থার উন্নতি-বিধানই যৌথকারবারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জার্ম্মানী বুঝিত একজনের উপকার করিতে হইলে সকলকে উদারতার আশ্রয় লইয়া আত্মত্যাগ করিতে হইবে এবং সকলের উপকার যাহাতে হয় এমত কার্য্যে প্রত্যেকের সাধু ও সরলভাব অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা সমাজের ব্যক্তিগত বা সমবেত উৎকর্ষের আশা নাই। কাহারও সাধুতা ও 'পসারের' উপর নির্ভর করিয়াই লোকে তাহাকে টাকা ধার দিবে—টাকা না হইলে যাহার চলিবে না সে অধঃপাতে যাইবে;—আর টাকা পাইয়া সময়ে পরিশোধ করিলে,—আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া অবস্থার উন্নতি করিলে, অপরে নিশ্চয়ই

তাহার অনুকরণ করিবে,—এবং ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি করিয়া ঋণদান-সমিতিকে ঋণবদ্ধ করিবার সমিতিরূপে পরিণত করিবে। অঋণী অপ্রবাসী হইয়া দিবসের অষ্টম ভাগে—সায়ংকালেও যদি শাকান্নের সংগ্রহ করিতে পারে, তথাপি লোকে ধন্য। দরিদ্রবহুল দেশে যৌথকারবারের সাহায্যেই যে কেবল তাহা সম্ভব ইয়ুরোপের দৃষ্টান্তে আজ তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এইখানে বলা আবশ্যক যে লাভের উদ্দেশ্যে সমিতির ঋণ দেওয়া হয় না—দরিদ্র এবং ইচ্ছুক ব্যক্তিকে কার্য্যক্ষম করা এবং তাহাকে মিতব্যয়ী করিয়া সমাজের উন্নতিবিধানকল্পেই ঋণ দান করা হয়। এমত অবস্থায় ঋণপ্রার্থীর ঋণ গ্রহণ আবশ্যক কি না—ঋণগ্রহীতা কোন হিতকর এবং লাভজনক কার্য্যের জন্য ঋণ প্রার্থনা করিতেছে কি না এইসকল বিষয়ের তন্ন তন্ন তদন্ত হয়। ঋণগ্রহীতার কার্য্যে এইরূপ অনুসন্ধান ও লক্ষ্য রাখায় তাহার হৃদয়ে আত্মনির্ভরতা, মিতব্যয়িতা, যথাসময়ে অর্থের আদান প্রদান প্রভৃতি সদ্‌গুণের উদ্রেক হওয়ায় তাহার নৈতিক চরিত্রের ও সাংসারিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। সামাজিকগণ যদি ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে থাকে তবে কালে সমাজে এক অদম্য অত্যুন্নত শক্তির সঞ্চার হয়। সেই শক্তির বলে সমাজ ও সামাজিকের মধ্যে যে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় তাহাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক—হিন্দুর পুরুষার্থ। দীনের দুঃখ বিমোচন, অনাথ আতুরজনকে অন্ন বস্ত্রদান, রোগার্ত্ত শোকার্ত্তগণকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া সান্ত্বনা করা প্রভৃতিই উদারতা। দুঃখীর নয়নস্রোতে যাহার বুকে করুণার ধারা বহিয়া যায় না, যে আত্মহারা হইয়া দীনের আঁখিনীর শত করে মুছাইয়া দিতে শিখে নাই তাহার এখনও সংসারের শিক্ষার বাকী আছে। ভারতবাসী আজ শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করে—জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত বলিয়া তাহাদের স্পর্দ্ধার সীমা নাই—গুণের গৌরব করিতে শিখিয়াছে বলিয়া মনে মনে ধারণা। জগতের যত বড় বড় জাতি, যত বিশিষ্ট বিশিষ্ট কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষ, সকলেই অনাথের পিতামাতা, দরিদ্রের কল্পতরু, রোগার্ত্তের সঞ্জীবনী সুধা, দয়া ও করুণার সিন্ধু, স্নেহে মমতায় শরদিন্দুর ন্যায় বিকাশমান। আর ভারতে নিরন্নের অন্নদাতা, ভয়ার্ত্তের ভয়ত্রাতা, আশ্রিতের চিরবৎসল একালে কয়জন আছেন? এককালে অগণিত ছিল—এখন খুঁজিয়াও একটী পাওয়া দুর্লভ। সুতরাং এই উপদেশটী কি আমাদের শিক্ষার বিষয়ীভূত হইবে না? বিশ্বপ্রেমের অপূর্ব্ব শক্তিতে সকলেই এখন উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—আমাদের নয়নসমক্ষে ভূভাগের অন্যত্র সভ্যতার ক্ষীণালোক সহসা বিজলীপ্রভায় পরিস্ফুট হইয়াছে ও হইতেছে! সকলেরই একটী একটী মূলমন্ত্র আছে! আমাদের কি আছে? যৌথনীতির স্নিগ্ধ ছায়ায় জার্ম্মানদেশ শান্তিসুখ অনুভব করিতেছে—ক্ষুদ্র সমাজ ও সামাজিকগণ অল্প সময়ের মধ্যেই এক স্পষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। সমগ্র ইয়ুরোপ দেখিতে দেখিতে সেই শুভসঙ্কল্পের সহযোগী হইয়াছে। যুক্তরাজ্যের সুদূর প্রান্তে ও ইয়ুরোপের ক্ষুদ্র জনপদসমূহে সমবেত চেষ্টায় যে সুফল ফলিতেছে তাহার মূলবীজ অতি অল্পকাল পূর্ব্বেই উপ্ত হইয়াছে।—হায়, আমাদের দেশের ভূমি কি অনুর্ব্বর যে এখানে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইবে না!

এইখানে বলা উচিত যে জার্ম্মানী দেশে এত উন্নতি, এত প্রসার, এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াও যৌথনীতি গত শতাব্দীর শেষভাগে মাত্র ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশে প্রচারিত হয়। এই অত্যল্পকালের মধ্যে সেখানে যে উন্নতির আবির্ভাব হইয়াছে ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বৈদেশিক শিল্পপণ্যসমূহই তাহার সাক্ষী। ইয়ুরোপ-খণ্ডে যৌথনীতির নিয়মে যেসকল সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাদিগের সংখ্যা ও কার্য্যপ্রণালী উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং এখন স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে তথাকার জনসাধারণ তাহাদিগের উপকারিতা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছে। এই সমিতিগুলির গঠনপ্রণালী, উদ্দেশ্য ও পরিচালনের নিয়মাবলী এক না হইলেও অনুরূপ। তাহা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত;—(১) ক্রয়বিক্রয় সমিতি—উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র সমিতির সভ্যগণকে (এবং আবশ্যক হইলে কদাচিৎ অপরকেও) স্বল্পমূল্যে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ ও শ্রমজাত 'কাঁচা মাল' বা উপকরণ বিক্রয় করা। (২) উৎপাদন সমিতি—উদ্দেশ্য, সভ্যগণ দ্বারা যৌথ চেষ্টায় উৎপন্ন কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয় করা।

(৩) ঋণদান-সমিতি—উদ্দেশ্য, কৃষি ও শিল্পকার্য্যোদ্দেশ্যে সভ্যগণকে খুব কম সুদে ব্যবসায়ের :মূলধনের জন্য টাকা ধার দেওয়া। ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রকারের অনেক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, যথা,—বান্ধব সমিতি, সৎকার সমিতি, গৃহনির্ম্মাণ সমিতি, কুলী সমিতি ইত্যাদি। সকলের মূলেই যৌথনীতি। ইহা বলা আবশ্যক যে ইয়ুরোপের তিনটী দেশে এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন-প্রণালীর আধিক্য ও আদর দেখা যায়। ক্রয় বিক্রয়ে ইংল্যাণ্ড, উৎপাদনে ফরাসী দেশ, এবং ঋণ ও 'পসারে' জার্ম্মানী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

ফরাসী দেশের যৌথকারবার-নীতির প্রসার অতি বিস্তৃত, তাহা এখানে বর্ণনা করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে বলা যাইতে পারে যে সেখানে প্রজালোক শ্রমশক্তির (Labour) সৃষ্টি করিয়া দিলে—সকলে অগ্রণী হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে অগ্রসর হইলে, রাজসরকার হইতে মূলধন প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা স্বাবলম্বন-ভিত্তি যৌথনীতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমাদের সে বিষয়ে অধিক উল্লেখ অনাবশ্যক।

রাইফিসেনের যে প্রণালী ভারতের উপযুক্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা ইয়ুরোপখণ্ডের ইতালী দেশে সর্ব্বপ্রথমে বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ লাভ করে। আজ আমরা সহানুভূতিতে প্রণোদিত ও অনুপ্রাণিত, তাই সকলে সমবেত হইয়াছি। পূর্ব্বগৌরবে ইতালী আমাদিগের অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দেয়—সুখের কাল স্মরণ করাইয়া দেয়। কুসীদব্যবসায়িগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত ইতালী দেশে মহাত্মা লুজ্জাতী রাইফিসেনের অসীম দায়িত্ব উঠাইয়া দিয়া তাঁহার দেশের উপযোগী ভাবে সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতি স্থাপন করেন; এবং তিনি সামান্য অংশ ক্রয়ের ব্যবস্থাও রাখেন। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সভ্য নির্ব্বাচন, দেনাপাওনার সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রকাশ, স্বায়ত্তশাসন-প্রণালীর চর্চ্চা প্রভৃতি তাহার বিশেষত্ব। ফলতঃ মন্ত্রশক্তির ন্যায় তাহার চেষ্টা কার্য্যকরী হইয়াছিল।

ইহা সত্ত্বেও তখন পল্লীবাসী কৃষকের ও মধ্যবিত্ত লোকের দুর্গতির সীমা ছিল না; জমীদারের উদাসীনতা ও কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। কৃষিকার্য্য একেবারে উপেক্ষিত হইতে লাগিল; শ্রমজীবীর দৈনিক বেতনেও উদরান্নের সংস্থান হইত না, সুতরাং কৃষক ও শ্রমজীবী উভয়কেই উত্তমর্ণের দ্বারে "ধরণা" দিতে হইতে লাগিল। উত্তমর্ণের অত্যাচার জগদ্বিখ্যাত—এক্ষেত্রে বর্ণনাতীত হইয়াছিল। তখন ২৪ বৎসরের যুবক ডাক্তার উলেনবার্গ সচেষ্ট হইয়া গ্রাম্য ঋণদান সমিতি স্থাপন করিলেন। শীঘ্রই তাহার সফলতা দেশময় প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি আরও নানা লোকহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতে লাগিলেন—এমন কি "গ্রাম্য ঋণদান অনুষ্ঠান" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রচার করেন। ইহাঁর বিশেষত্ব ইনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি করিয়া তাহাদিগের অধ্যক্ষ স্বরূপ কেন্দ্রসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; মহাত্মা লুজ্জাতীর তাহা ছিল না। জার্ম্মানীদেশ ইয়ুরোপখণ্ডে পরস্পর সহায়তায় যৌথকারবারের এবং ঋণদানপ্রণালীর জন্মভূমি। ইতালীর উৎকৃষ্ট ভূমিতে তাহার বীজ উপ্ত হওয়ায় অচিরেই সুফল ফলিয়াছিল। ক্রমে তাহা বিস্তৃতি লাভ করিয়া নীল নদের বন্যাপ্লাবিত উর্ব্বর ক্ষেত্র মিশর দেশে রোপিত হয়। এদিকে ১৮৭৭ খৃঃ হইতে এ পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের দেনমার্ক রাজ্যে (দিনেমার) গ্রামে গ্রামে এবং বেলজিয়ম ও ইংলণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্র, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বদ্ধমূল যৌথনীতি দেশের শ্রী ফিরাইয়া দিয়াছে। আয়র্লণ্ডও দেনমার্কের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে। এই প্রাগুক্ত দেশের সর্ব্বত্রই চাষ ও কৃষির প্রভূত উন্নতি দেখা যাইতেছে। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যেরও এখানে যৌথ-উপায়ে উৎপাদন করিয়া ক্রয় বিক্রয় করা হয় তাহার নৈতিক ফলে তত্তৎ দেশে পরমুখপ্রেক্ষিতার তিরোধানে সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বন ও উন্নতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

আমাদিগের যৌথকারবার ও ঋণদান সমিতির মেরুদণ্ড মহামতি গুরলে উল্লিখিত সকল দেশেই স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতের দরিদ্র প্রজার আর্ত্তনাদ তাঁহার, বিশেষতঃ আমাদিগের সম্রাট স্বর্গগত সপ্তম এডোয়ার্ড মহোদয়ের ও তাঁহার সুযোগ্য বংশধর সার্ব্বভৌম সম্রাট পঞ্চমজর্জের এবং অত্রত্য রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষগণের সকলেরই, হৃদয়ের অন্তস্তলে আঘাত

করিয়াছে—তাই সকলেই আজ মহাজনের পন্থা অবলম্বন করিয়া দরিদ্র ভারতীয় প্রজার অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন;—তাঁহারা বাহুপ্রসারণ করিয়াছেন—সকলকেই সমভাবে সাদরে আলিঙ্গন করিবেন। আপনারা হয়ত সকলে জানেন না যে, আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ভক্তিভাজন শ্রীযুত মার সাহেবও তাঁহার অনেক সময় কেবল মাত্র এই জেলাতে যৌথকারবারের উন্নতির জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া ব্যয় করিয়া থাকেন। অতএব এই সময়ে উচিত, আমাদের সকলেরই অগ্রসর হওয়া—মিত্র ভাবে একক্রিয়ভাব অবলম্বন করা। সুদূর সমুদ্র পার হইতে সমাগত মহাপুরুষগণ যাহাদের দুর্দ্দশায় অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন না, সেই আমাদের প্রতিবাসী সকলের আর্ত্তস্বর যদি আমাদিগের হৃদয়তন্ত্রীর সুর না জাগাইয়া দেয় তবে আমরা অধম, মানব নামের অযোগ্য—দেশের শল্য ও সমাজের কলঙ্ক। মহামতি গুরলে "গ্রাম্য ঋণদান সমিতি" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আমরা অর্থ চাই না, সরকার অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবে—যে উপায়ে হউক সহজে অর্থের সংকুলান হইবেই হইবে—আমরা চাই, ইচ্ছা, সৎসাহস, নৈতিক বল এবং পরস্পরে বিশ্বাস। এইরূপ লোক হইলেই আমাদিগের কার্য্য হইবে; আমরা এই বিষম সমস্যার সমাধান করিতে পারিব। কথা খুবই সত্য। অতি অল্পকাল মধ্যেই যেমন ইহার প্রতিপত্তি ও আদর দেখা যাইতেছে, অচিরেই এই যৌথপ্রথা ভারতের রেলপথের ন্যায় চারিদিক শৃঙ্খলে ছাইয়া ফেলিবে এবং প্রজার আর্ত্তনাদ সুখের প্রভাতী সঙ্গীতে পরিণত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির পরই বাণিজ্য; বাণিজ্য ও ব্যবসায় কৃষির উন্নতি ভিন্ন অসম্ভাবিত। শত সাহায্য পাইলেও কিংবা রাজরক্ষিত হইলেও বাণিজ্যের অভ্যুদয় হইবে না; কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ও ধনী উভয়ের যুগপৎ গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্য স্বতঃই আবির্ভূত হইবে। ভূমি লক্ষ্মী—সর্ব্বধনের প্রসূতি;—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায়,—সকলেরই আশ্রয়-স্থল ভূমি। আর আমাদিগের জন্মভূমি ভারত উর্ব্বরতায় অদ্বিতীয়, বিশেষত বঙ্গভূমি সর্ব্ববিষয়ে অতুলনীয়। আমাদিগের ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা সকলে একথা বুঝেন না; তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গৌরবে গৌরবান্বিত কিন্তু প্রজার আর্ত্তনাদে নির্ব্বিকার। কিন্তু হায়, তাঁহাদেরই হস্তে দরিদ্র প্রজাকুলের সুখ শান্তির কুটীরদ্বারের চাবি রহিয়াছে, তাঁহারা দ্বার খুলিলেই দরিদ্র প্রজা রক্ষা পায়। আশা করি, এই মহাবাক্য প্রতি দ্বারে দ্বারে প্রতিধ্বনিত হইবে। এবং বঙ্গের জমীদারগণ—এই যৌথনীতির অনুসরণ ও সহায়তায় জমীতে সোনা ফলাইতে সমর্থ হইবেন।

আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট যথা সময়েই এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইয়ুরোপের যেসকল দেশে যৌথনীতির প্রচলন হয় সকলদেশেই গবর্ণমেণ্ট এই নীতির প্রতিকূলতাচরণ করেন; উদ্যোগকারিগণকে বিশেষ-ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হয়;—অন্যে পরে কা কথা, বিশ্ববিশ্রুত স্বনামধন্য বিসমার্ক পর্য্যন্ত ইহার পরিপন্থী হইয়াছিলেন! কিন্তু ভারতের সৌভাগ্য যে সরকারী উদ্যোগেই এদেশে এই নীতির প্রচলন হইতেছে। আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন সেই অশীতিপরবৃদ্ধ ভারতগতপ্রাণ স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবরন মহোদয়ই প্রথমে দেশীয় কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ১৮৮২ খৃঃ বোম্বাই অঞ্চলে পুনা জেলায় কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই প্রস্তাব নানা কারণে তখন সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই। কিন্তু একালে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। ওয়েডার-বরন মহোদয়কে সেদিনও আমরা মাল্যাভরণ দিয়া পূজা করিয়াছি—হিন্দু মুসলমানের জাতীয় বিবাদ নিষ্পত্তিতে তিনি পুনরায় যে চেষ্টা করিয়া গেলেন, আশা আছে, অবিলম্বে তাহাও ফলপ্রসূ হইবে। বুদ্ধিমান্ লোক গৃধ্রের ন্যায় দূরদর্শী, বকের ন্যায় নিশ্চল, কুকুরের ন্যায় জাগরূক, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত, কাকের ন্যায় ইঙ্গিতজ্ঞ এবং ভুজঙ্গের ন্যায় নিরুদ্বেগে অবস্থান করেন; অথচ তাঁহাদের কার্য্যের সাফল্যে জগৎ চমকিত হইয়া যায়; লোকের ভাগ্য ফিরিয়া যায় মরুভূমিতে অমৃতধারার আবির্ভাব হয়।

অতঃপর ১৮৯২ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মাদ্রাজ সিভি-লিয়ান স্যার ফ্রেড্রিক নিকলসন, রাইফিসেন ও শুলজ

প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রবর্ত্তিত পরস্পর সহায়তায় ঋণদান সমিতির কার্য্যপ্রণালীর তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ইয়ুরোপের প্রায় সমুদয় সমিতি সন্দর্শন ও উহাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গভীর গবেষণাপূর্ণ সকল তত্ত্বের আকর স্বরূপ একখানি নাতিদীর্ঘ বিবরণপুস্তক প্রণয়ন করেন, এবং তাহার ফলে ১৯০১ সালে পরস্পর সহায়তায় ঋণদান সমিতি সম্বন্ধে আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় ও সবিশেষ আলোচনার পর তাহা ১৯০৪ সালের মার্চ্চ মাসে আইনে পরিণত হয়। এই বৎসরই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও সাধারণের গোচরার্থে উক্ত বিধানের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য আলোচনাপূর্ব্বক কি কি উপায়ে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক এক মন্তব্য প্রচারিত হইয়াছে।

ইহার পর উদারমতি বিজ্ঞ সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত গুরলে মহোদয় বঙ্গের যৌথসমিতিসমূহের অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যক্ষতঃ কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া জার্ম্মানী ইতালী প্রভৃতি প্রতীচ্য ভূখণ্ডের সমিতিগুলির কার্য্যানুসন্ধান ও এতৎসম্বন্ধে তত্তৎদেশীয় নেতাদিগের সহিত আলোচনা পূর্ব্বক বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অদম্য উৎসাহে ও আশান্বিত হৃদয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আশা আছে, স্বদেশবৎসল ব্যক্তি মাত্রই এই শুভ কার্য্যে যোগ দান করিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিবেন;—অচিরেই আশার অঙ্কুরে প্ররোহ হইবে এবং অধিক পরিমাণে সুফল ফলিতে থাকিবে, ব্যতিক্রম হইবে না। এখন আমরা ইষ্টদেবের স্মরণ করিয়া, দেশের ধূলি মাথায় লইয়া, বিশ্বপ্রেমের মোহিনী শক্তিতে আসক্ত হইয়া কার্য্য করিতে পারিলেই সুফল ফলিবে; সন্দেহ বা আশঙ্কার অবসর না দিয়া তাহাই এখন আমাদিগের একমাত্র চিন্তা ও শক্তির বিষয় হওয়া উচিত। আশা করি আপনারা সকলেই তাহার অনুমোদন করিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিরত্ন।

আসামী ভাষা

(১) প্রাচীন।

ইং সন ১৮৯৬ সালে ডাঃ গ্রিয়ার্সন সাহেব লিখিয়াছিলেন*

"'গ্রামারে' আসামী ভাষার সহিত বিহারী ভাষার সম্বন্ধ বাঙ্গালার অপেক্ষা নিকটতর।"

ইং ১৯০৩ সালে লিখিয়াছেন।†

যদি কেবল 'গ্রামার' বিচার করা যায় তাহা হইলে আসামী ভাষা যে বাঙ্গালার ভাষা নহে, তাহা প্রমাণ করা অতিশয় দুরূহ। চাটিগাঁয়ের ভাষা বাঙ্গালা। কিন্তু কলিকাতার ভাষা হইতে চাটিগাঁয়ের ভাষা যত দূরে, আসামী ভাষা তত দূরে নহে। কিন্তু যদি লিখিত সাহিত্য দেখি, তাহা হইলে আসামীকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে হয়।"

ইং ১৮৫৫ সালে শিবসাগর হইতে প্রকাশিত আনন্দরাম-ঢেকিয়াল-ফুকন লিখিত আসামী-ভাষা-বিষয়ক এক পুস্তিকা অবলম্বন করিয়া গ্রিয়াসন সাহেব প্রথম মত প্রচার করেন। সে পুস্তিকা আমি দেখি নাই। কিন্তু সাহেব ইহার সারাংশ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। ফুকন-মহাশয় লিখিয়াছিলেন, —

"ইং ১৯শ শতাব্দীর প্রথমে শ্রীরামপুরের পাদ্রীসাহেবেরা বাঙ্গালা ভাষার রূপ বিধান করেন। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা লিখিত ভাষা ছিল কি না সন্দেহ। কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ দেড়শত বৎসর [এখন দুইশত বৎসর] পূর্ব্বে লিখিত। এই দুইখানিই পাদ্রী-সাহেবদের চেষ্টার পূর্ব্বের যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রায় চারিশত [এখন সাড়ে চারিশত] বৎসর পূর্ব্বে রাম-সরস্বতী ও শ্রীহঙ্কর (শঙ্কর) মহাভারত ও রামায়ণ আসামীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইং ১৩শ শতাব্দী হইতে আসামীতে বুরঞ্জী নামক ইতিহাস আছে।"

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা-সাহিত্য-সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞান থাকা আশ্চর্য্যের কথা ছিল না।

ইং ১৯০৩ সালে গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁহার "ভারতীয় ভাষা দর্শন" গ্রন্থে এবং ইহার পর গেইট সাহেব "আসামের ইতিহাসে" আসামী বুরঞ্জীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গ্রিয়ার্সন সাহেব লিখিয়াছেন, —

"বুরঞ্জী অনেক ও বৃহৎ। দেশের রীতি এই, প্রসিদ্ধ বংশের বুরঞ্জী রাখা হইত এবং বুরঞ্জীর জ্ঞান থাকা ভদ্রলোকের আবশ্যক হইত।"

গ্রিয়ার্সন সাহেব বাঙ্গালা-সাহিত্য-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ইতিহাস-লিখিতকালের পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালায় প্রচুর গ্রন্থ আছে। মাণিকচাঁদের গান সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহা বৌদ্ধ সময়ে রচিত।

* Indian Antiquary, Vol xxv.

† Linguistic Survey of India, Vol. V, Part I.

ইং ১৪শ শতাব্দীতে চণ্ডীদাস, ১৫শ শতাব্দীতে কাশীরাম ও কৃত্তিবাস, ১৬শ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণবগ্রন্থ, ১৭শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম, ১৮শ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র।"

এই কয়েক জনের নাম ও সময় দিয়া সাহেব বক্তব্য শেষ করিয়াছেন।

যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন বাঙ্গালা পুথীর নাম-ধামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার কত পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে এবং হইতেছে। শ্রীরামপুরে পাদ্রীদিগের আগমনের বহু পূর্বে এই সকল পুথী লিখিত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় একখানি নয় বাইশখানি মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, এবং তন্মধ্যে অনেক কাশীদাসী অপেক্ষা প্রাচীন।

আসামী ভাষার বুরঞ্জী* লইয়া আসামী অবশ্য গর্ব করিতে পারেন। এই বুরঞ্জী যেমন, বাঙ্গাল'র অসংখ্য কুলজী তেমন। এমন কুলীন বংশ নাই, যাহার ইতিহাস ছিল না। সাধারণ ভদ্রলোকে এই সব কুলজী অভ্যাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ঘটকঠাকুর কণ্ঠস্থ রাখিতেন। আর প্রভেদ এই বঙ্গের অনেক কুলপঞ্জী সংস্কৃত-ভাষায় রচিত। বঙ্গদেশ চিরকাল সংস্কৃতের আদর করিয়া আসিতেছে। কৌতূহলী পাঠক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৪শ ভাগে 'বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ' প্রবন্ধে বিপুল কুলপঞ্জীর যৎসামান্য আভাস পাইবেন। লেখক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,

"স্ব স্ব সমাজের উন্নতি, স্ব স্ব বংশের বিশুদ্ধিতা রক্ষা, স্ব স্ব কুলধর্ম্ম প্রতিপালন এবং স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবকীর্ত্তন, এই কয়টী বিষয়েই সাধারণের বিশেষ লক্ষ্য ও মনোযোগ ছিল, তাহারই ফলে বাঙ্গালার সকল উন্নত সমাজেই বিস্তৃত সামাজিক ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। *** কেবল কতকগুলি রাজবংশের তালিকা এবং কোন্ বর্ষে কে কোথায় যুদ্ধ করিল, কোথায় কিরূপে জয়পরাজয় হইল, কেবল এইসকল ঘটনাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইতিহাস বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা প্রতি সমাজ, প্রতি জাতি, প্রতি গোষ্ঠী, এবং প্রতি শ্রেষ্ঠ বংশের অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস আদরের সহিত কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে এই বঙ্গদেশে মহারাজ শশাঙ্কের সময় হইতে এক বিশাল সার্ব্বজনীন ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে।"

ইং ১৩শ শতাব্দী হইতে বুরঞ্জী লেখা আরম্ভ। প্রায় এই সময় হইতে ওড়িয়া মাঁদলা পাঁজীর আরম্ভ। ইহার পূর্ব হইতে বাঙ্গালা কুলজী গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছিল।

গ্রীয়ার্সন সাহেব এবং অন্যে আসামী ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থের বিষয় দেখিয়া আসামী ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিতেছেন! ভাষার জাতীয়ত্ব-বিচারে ইহা এক অভিনব পরীক্ষা! বাঙ্গালী ও আসামী স্বতন্ত্র সমাজ বটে; কিন্তু বিভিন্ন সমাজে এক ভাষা থাকিতে পারে। গ্রীয়ার্সন সাহেবই বিহারী-ভাষা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"যে মানবসমাজ বিহারী ভাষা বলে, সে সমাজ ইতিহাসে, সংসার-বন্ধনে পশ্চিমবাসীর সহিত সম্বদ্ধ, পূর্ব্ববাসীর (বাঙ্গালীর) সহিত নহে। কিন্তু সে বিচার এখানে আবশ্যক নহে; 'গ্রামার'কে লক্ষণ ধরিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, বিহারী, বাঙ্গালা, ওড়িয়া, আসামী এক শ্রেণীর; এমন কি, এই চারি ভাষার এক 'গ্রামার' লেখা অসম্ভব হইবে না।"*

বাস্তবিক আসামী, ওড়িয়া, বাঙ্গালা, মৈথিলী ভাষার পরস্পর এমন সাদৃশ্য যে বোধ হয় এক হইতে চারির উৎপত্তি হইয়াছিল। চারিরই মূল সংস্কৃত। কিন্তু সে মূল বহু পুরাতন। তার পর একটা যুগ চলিয়া গিয়াছে, পুরাতনের নূতন কলেবর হইয়াছে। হিন্দী মরাঠীরও মূল সংস্কৃত; কিন্তু সে দুই ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য নাই, উল্লিখিত চারি ভাষার সহিতও নাই। স্থানভেদে হিন্দীর নানারূপ হইয়াছে, মরাঠীরও হইয়াছে। যে ভাষা বহু লোকের ভাষা, সে ভাষা স্থানান্তরে কিছু কিছু রূপান্তর পাইয়া থাকে। রূপান্তর অগ্রাহ্য করিলে মনে হয় সংস্কৃত-ভাষা তিন শাখাতে বিভক্ত হইয়া উত্তর খণ্ডে হিন্দী, পশ্চিম খণ্ডে মরাঠী, এবং পূর্বখণ্ডে বর্তমান আসামী, মৈথিলী, বাঙ্গালা, ওড়িয়ার আদি ও শাখা বিস্তৃত হইয়াছিল।

সাদৃশ্য-পরিমাণ চিরকাল দুরূহ। কিন্তু সাদৃশ্য-বিচার নিরন্তর করিতেছি, এবং দুরূহ বলিয়া সংসার অচল রাখিতেছি না! দুই বস্তুর মধ্যে প্রয়োজনীয় সাদৃশ্য

* হেমচন্দ্র বড়ুয়া আসামী অভিধানে বুরঞ্জী শব্দের এই ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, অহমী ভাষায় বু পুরানা কথা+রঞ্জ বা লঞ্জ বর্ণনা। অর্থ পুরানা কথার বর্ণনা। এখানে তিনি অহমী শব্দের সহিত সংস্কৃত ধাতুর মিলন ঘটাইয়াছেন। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার বোধ হয় সং পুরাপঞ্জী হইতে আসামী বুরঞ্জী শব্দের উৎপত্তি। বাঙ্গালা কুলজী, ঠিকজী ঠিক এইরূপ শব্দ। কুলপঞ্জী হইতে কুলজী। ঠিকজী শব্দ কেহ কেহ ঠিকুজী বলে। তুলনা কর, ওড়িয়া মাঁদলা পাঁজী—(পুরীর) মন্দির-পঞ্জী। হেমচন্দ্র বড়ুয়া যে অহমী বু শব্দ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অভিধানে অন্য শব্দে পাই না। অহমীদিগের নিকট হইতে না কি বুরঞ্জীর আদি? কিন্তু তা বলিয়া শব্দটা অহমী না হইতে পারে।

* Linguistic Survey of India. Vol V. Part II.

পাইলেই আমরা দুইকে এক মনে করি। "ইহার দ্বারা কাজ চলে কি না" এই বিচারই সার বিচার। গঙ্গার জল সর্বদা এবং সর্বত্র এক থাকে না। উপাদানে প্রভেদ অবশ্য ঘটে। তথাপি গঙ্গার জল জল, পুষ্করিণীর জলও জল। গঙ্গার জলে পিপাসা শান্ত হয়, কৃষিকর্ম হয়; পুষ্করিণীর জলেও হয়। অতএব দুই-ই জল। প্রয়োজন বুঝিয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল বিচার আবশ্যক হয়। যখন স্থূলে চলে, তখন সূক্ষ্মের আশায় ফিরিলে লোকে রোগের লক্ষণ মনে করে। তা ছাড়া, সূক্ষ্মেরও সূক্ষ্ম আছে, এবং স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যে দিবা ও রাত্রির সন্ধ্যা আছে।

আমার ভাষা তুমি বুঝিলে এবং তোমার ভাষা আমি বুঝিলে তোমার আমার ভাষা এক। কারণ ভাষার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল।

দার্শনিক বিচারে একটু সূক্ষ্মে প্রবেশ করিতে হয়। শব্দ এবং শব্দের পরস্পর যোগ না ঘটিলে ভাষা হয় না। সংস্কৃত-ব্যাকরণে সংস্কৃত-ভাষার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। আধুনিক ব্যাকরণে, 'গ্রামারে', শব্দের পরস্পর যোগরীতি প্রদর্শন করে। কাজেই ভাষার শব্দকোষ ও ব্যাকরণ না পাইলে ভাষা শিখিতে পারা যায় না। যখনই কোন ভাষা শিখিতে যাই, তখনই সে ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংগ্রহ করিতে হয়। কেবল ইংরেজী 'গ্রামার' পাইলে ইংরেজী ভাষা বুঝিতে পারা যায় না।

আসামী, ওড়িয়া, বাঙ্গালা, মৈথিলী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতমূলক হইলেও মূল হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সরিয়া গিয়াছে। এই যে ভ্রংশ, ইহার পরিমাণ এক নহে, দিকও এক নহে। এক বিন্দু হইতে বিভিন্ন দিকে গোটাকতক রেখা টানিলে যেমন সব রেখা সমদীর্ঘ না হইয়া ছোট বড় হয়, এবং পরস্পর কোণ ছোট বড় হয়, সংস্কৃতমূলক ভাষাগুলিরও তেমন হইয়াছে। ইহাদের বর্তমান স্থিতি রেখার অগ্র, এবং পরস্পর সাদৃশ্য পরস্পর অগ্রান্তর।

কেবল ইহা নহে। অন্য ভাষা আসিয়া ভাষাগুলিকে কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছে। রেখা টানিবার সময় কলমে কোন কিছুর বাধা বা আঘাত লাগিলে যেমন রেখা এদিকে ওদিকে বাঁকিয়া যায়, আলোচ্য ভাষাগুলির তেমন পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাতে ভাষাগুলির ভ্রংশের রীতি পরিবর্তিত হইয়াছে, অভিজ্ঞান ভিন্ন হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় আরবী ফার্সী শব্দ দেশভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, এখন ইংরেজী শব্দ প্রবেশ করিতেছে।

এরূপ শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ। কদাচিৎ ক্রিয়াপদও প্রবেশ করে। তখন তাহা বিশেষ্য ও বিশেষণ আকারে প্রবেশ করে। পরীক্ষা 'পাশ' করিতে পারে নাই, 'ফেল' হইয়াছে; জল 'কম' হইয়াছে, 'কমিয়াছে', ইত্যাদি উদাহরণে ভিন্ন ভাষার শব্দকে গ্রাস করিবার শক্তি দেখা যায়।

প্রতিবেশী ভিন্নভাষী হইলেও তাহার ভাষার প্রভাব শব্দের উচ্চারণ ও টানে প্রকাশ পায়। মাদ্রাজের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলায় তেলুগু ভাষার প্রভাবে ওড়িয়া ভাষায় তেলুগু টান এবং মধ্যপ্রদেশে হিন্দীর প্রভাবে হিন্দী টান ঘটিয়াছে। মৈথিলী হিন্দীত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।

এক ভাষার মধ্যেই সমাজভেদে শব্দ ও শব্দের টানের ভেদ ঘটিতে দেখা যায়। বঙ্গের পূর্বাঞ্চলে উচ্চ ও নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে সর্বনাম ও ক্রিয়ার বিভক্তির প্রভেদ আছে। মিথিলা ও ওড়িশার ব্রাহ্মণের ও শূদ্রের ভাষার জাতিভেদ অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে। শুধু ভাষা নহে, অক্ষরেও জাতিভেদ আছে। এইরূপ নানা ভেদ ঘটিলেও যখন পরস্পর কথাবার্তায় বিঘ্ন না হয়, তখন ভাষা একই বলা যায়। যোজনান্তে ভাখা। এই হিসাবে বাঙ্গালা ভাষার কত ভাখা আছে। যে বঙ্গ-ভাষা সাড়ে চারি কোটি লোকে বলে, যাহা দীর্ঘ প্রস্থে পাঁচ শত মাইল স্থানে ব্যাপ্ত আছে, তাহার ভাখা না থাকিলে আশ্চর্যের কথা হইত।

বলা বাহুল্য, ভাখা কথ্য ভাষা, চিরনূতন; লেখ্য ভাষা জাতীয় ভাষা, চিরপুরাতন। কথ্য ভাষা দ্বারা লেখ্য ভাষা পরিবর্তিত হয়, কালক্রমে লেখ্য ভাষাও নূতন বোধ হয়। সাহিত্য নূতনত্বের গতিরোধের চেষ্টায় থাকে, কিন্তু বহুকালের প্রতিঘাত সহিতে পারে না। প্রবল বিদেশীর অনুকরণে সাহিত্য বিচলিত হয়, লেখ্য ভাষায় প্রাচীন রীতি পরিবর্তিত হয়।

রামায়ণ মহাভারতে যাহা থাকুক, আসাম প্রদেশের পূর্বনাম কামরূপ-রাজ্য ছিল। কামরূপে রাজধানী ছিল। প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে এই রাজ্য ভারতসীমার

পূর্ববাসী অহম নামক অনার্য রাজার অধীনে আসে। ক্রমে আর্যজাতির সহিত মিশিয়া অনার্য আর্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অনার্য-আর্যজাতীয় শেষ রাজার নিকট হইতে ইংরেজ আসাম রাজ্য অধিকার করিয়াছেন।

ভিন্নভাষী রাজা দুর্ধর্ষ হইলেও অধীন রাজ্যে নিজের ভাষা চালাইতে পারেন না। মোগল রাজার অধীনে দেশভাষায় আর্বী ফার্সী বিশেষ্য বিশেষণ শব্দ প্রবেশ করিল, কিন্তু ভাষার অস্থি-মজ্জা পরিবর্তিত হইল না। ভাষায় উপাদান বাড়িল, কিন্তু গড়ন যেমন তেমনি রহিল। বরং মোগল রাজাকে হিন্দী ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। হিন্দী নাম থাকিতে লোকে অনাবশ্যক আর এক নামের অপপ্রয়োগ করিয়া এই আর্বী-ফার্সী-শব্দ-মিশ্রিত হিন্দী ভাষাকে উর্দু বলে। কামরূপ-রাজ্যেও অহম রাজার অধীনতার সময়ে অহমী ও অন্য অ-সংস্কৃত শব্দ পুঞ্জে-পুঞ্জে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ অতি-বিকৃত হইল। এইরূপ শব্দবহুল ভাষা বর্তমানে আসামী-ভাষা নাম পাইয়াছে। কামরূপের পুরাতন ভাষা বাঙ্গালার মতন ছিল। ভাখাভেদ অগ্রাহ্য করিলে বলিতে পারা যায় সে ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষা এক ছিল। নীচে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

কিছুদিন পূর্বে এক আসামী লেখক রঙ্গপুরের বর্তমান ভাষাকে আসামী বলিয়াছিলেন। ইহাতেই বোঝা যায়, আসামের পশ্চিমাংশের ভাষার প্রকৃতি অদ্যাপি পরিবর্তিত হয় নাই। আসাম-প্রদেশ পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় চারি শত মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত। পশ্চিমে গোয়ালপাড়া গৌহাটী, পূবে শিবসাগর ডিব্রুগড়, মধ্যে তেজপুর নওগাঁ। এই দীর্ঘ ভূভাগের সর্বত্র কথা ভাষা এক হইতে পারে না। তথাপি কোন কোন আসামী বলিতে চান, আসামী ভাষায় ভাখাভেদ নাই, আর যে ভাষায় তাঁহারা ঘরে কথাবার্তা করেন, সাহিত্যের ভাষা সেই কথা ভাষা! লেখ্য ও কথ্য ভাষা এক হইলে বোঝা যায়, সাহিত্য নূতন রচিত হইতেছে; ভাখাভেদ নাই বলিলে বোঝা যায়, আসামী ভাষা প্রকৃতির বাহ্য। এক শিক্ষিত আসামী ভদ্রলোক এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। সে কথা পরে হইবে।

গ্রীয়ার্সন সাহেবও শিবসাগরী ও কামরূপী অর্থাৎ পূর্ব আসামী ও পশ্চিম-আসামী নামে দুই ভাষা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গণনায় সাড়ে আট-লক্ষ লোকে পূব আসামী এবং সাড়ে-পাঁচ-লক্ষ লোকে পশ্চিম-আসামী বলে। মোট প্রায় সাড়ে চৌদ্দ-লক্ষ লোকের ভাষা আসামী।

প্রায় এক কোটি লোকের ভাষা মৈথিলী বা বিহারী, এবং প্রায় তত লোকের ভাষা ওড়িয়া। এই গণনায় আসামী অল্প লোকের ভাষা।

পূর্বকালে আসামী, বাঙ্গালা, মৈথিলী ভাষা অভিন্ন ছিল। কেবল ব্যাকরণে নহে, লিখিবার অক্ষরেও অভিন্ন ছিল। আরও পূর্বে ওড়িয়া-ভাষা এই সব ভাষার সদৃশ ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরের মিশ্রণে ওড়িয়া অক্ষরের উৎপত্তি। সাত-আট-শত বৎসর পূর্ব হইতে ওড়িয়া অক্ষর বাঙ্গালা অক্ষর হইতে পৃথক আকার ধরিয়াছে। এই সময়ের ওড়িয়া পুথী পাওয়া যায় নাই, তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। পুরীর মাঁদলা পাঁজিতে সাত শত বৎসরের পূর্বের লেখা নাই, পরের আছে। সে সময়ের আসামী পুথীও পাওয়া যায় না। পাইলে আসামী-বাঙ্গালার সাদৃশ্য স্পষ্ট বোঝা যাইত। তথাপি প্রাচীন আসামী ও ওড়িয়ার যে পুথী পাওয়া যায়, তাহাতে আসামী, বাঙ্গালা, ওড়িয়ার সাদৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। মৈথিলী বিদ্যাপতি বহুকাল হইতে বাঙ্গালা কবি হইয়া বহু বৈষ্ণব কবির আদর্শ হইয়া আছেন। বর্তমান মৈথিলী ওড়িয়া বাঙ্গালা পৃথক হইয়াছে। আসামীও হইয়াছে।

এই সব ভাষার মধ্যে ওড়িয়া প্রাচীন রীতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলের বর্তমান ভাষার মূলরূপ পাইতে হইলে এই কারণে ওড়িয়া ভাষা আলোচ্য হয়। শব্দের উচ্চারণে, সর্বনাম শব্দের রূপে, ক্রিয়া-বিভক্তিতে ওড়িয়া বাঙ্গালা পৃথক। বাঙ্গালায় বলি পবন্, ঘর্, কাঠ্; ওড়িয়ায় বলি পবন, ঘর, কাঠ। হলন্ত শব্দ ওড়িয়ায় নাই বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা, আসামী, বিহারীতে অকারান্ত বিশেষ্য শব্দ নাই বলা যাইতে পারে। ণ, য-ফলা, ব ফলা, র-ফলা, উচ্চারণ বাঙ্গালায় পরিবর্তিত হইয়াছে, ওড়িয়ায় হয় নাই। বৈদিককালে দুই প্রকার ল ছিল,

ওড়িয়ায় অদ্যাপি আছে। ওড়িয়া ভাষায় ল শব্দের ল কারের উচ্চারণ ল ও ড় এর মধ্যবর্তী। হয়ত দাক্ষিণাত্য ভাষার প্রভাবে ওড়িয়া ভাষা উচ্চারণ বিষয়ে সংস্কৃত ও সংস্কৃত-প্রাকৃত রীতি রাখিতে পারিয়াছে। কারণ যাহা হউক ওড়িয়া অক্ষরেও তেলুগু অক্ষরের গোলত্ব বর্তমান রহিয়াছে। সর্বনাম ও ক্রিয়া-বিভক্তিতে ওড়িয়াতে অনেকটা সংস্কৃত-প্রাকৃত রূপ আছে, বাঙ্গালাতে সংক্ষিপ্ত ও লঘু হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালাতে এই রূপ ছিল; এমন কি বঙ্গের পূর্বাঞ্চলের দুই শত বৎসরের পুরাতন গ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায়।

শব্দ-সংক্ষেপ ওড়িয়াতেও হইয়াছে। কিন্তু সে সংক্ষেপ দুই রকমে হইয়াছে। দীর্ঘ শব্দের শেষের স্বর, এবং শব্দের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হইয়াছে। কোন্ কোন্ শব্দে ব্যঞ্জনের স্বরও লুপ্ত হইয়া যুক্ত বর্ণ হইয়াছে।

ওড়িয়াতে সারলা দাস প্রসিদ্ধ কবি। কেহ কেহ ইঁহাকে আদি কবি বলেন। ইনি প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে ছিলেন। ইনি অশিক্ষিত শূদ্র ছিলেন, সারলা (সারদা) দেবীর প্রসাদে ওড়িয়া ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। বিরাটপর্ব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে। বানান অবিকল রাখা গেল।

অশী সহস্র ব্রাহ্মণ একত্রে বসাই।
বার সস্র উদ্ধরেতা-মান তহি থাই॥
বসন্তি যুধিষ্ঠি দেব হোইণ বিনয়ী।
আহে ভূনে শুণ সর্ব্বে একমন হোই॥
তুম্ভ প্রসাদে মু সুখে বনরে বুলিলি।
পুণ্য কথা শুণি জন্ম কৃতার্থ মু কলি॥
নারদ যে তীর্থমান কহিথিলে মোতে।
তুম্ভ অনুগ্রহে মু বুলিলি সেহি তীর্থে॥
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর আহে তপোধন।
যে ঝা সুখে এ স্থানরু কর হে গমন॥
অজ্ঞাত বাসরে মু পশিবি ঘোর বনে।
তুম্ভঙ্কু ঘেনি কি পরি রহিবি গোপ্যানে॥
দুর্য্যোধন আম্ভঙ্কু খোজিব স্থানে স্থানে।
আম্ভঙ্কু পাইলে আনন্দিত হেব মনে॥
দুর্য্যোধন জাণই যে আম্ভর চরিত্র।
তুম্ভেমানে নিজস্থানে যাঅ যা তুরিত॥
আম্ভঠারু তুম্ভঙ্কু মু পরিত্যাগ কলি।
পূরুব-জন্ম-সুকৃতি-ফলকু ভুঞ্জিলি॥
শুণি ঋষি ব্রাহ্মণে যে সুআশিষ কলে।
তুম্ভ শত্রুগণে আম্ভু নাশ যাস্ত ভলে॥

এখানে দুই এক টিপ্পনী করা আবশ্যক। সহস্র—সস্র, যুধিষ্ঠির—যুধিষ্ঠি, যে ইচ্ছা—যে ঝা, গ্রহণ করি—গ্রহণি—ঘেনি, গোপ্যস্থানে—গোপ্যানে, ত্বরিত—তুরিত, শুভাশিস্—সুআশিষ, আজহু—আম্ভু, কলে, কলি—করিলে, করিলি। উদ্ধরেতামান, তীর্থমান প্রভৃতির 'মান' বহুবচন জ্ঞাপক। আসামীতে 'কিছুমান'—কিছু পরিমাণ অর্থে প্রচলিত আছে। হোইণ বাস্তবিক হোই (হইয়া)। এইরূপ পদের শেষ স্বর সানুনাসিক করা বর্তমান ওড়িয়াতে গ্রাম্য বিবেচিত হইতেছে। পূর্বকালে বাঙ্গালাতে এইরূপ ছিল। অদ্যাপি বীরভূমে কিছু কিছু আছে। একদিকে ব যেমন লুপ্ত হইয়া থাকে, অন্যদিকে শেষ স্বরে যুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে, বনে—বনএ—বনবে, স্থানউ—স্থানরু, (স্থান হইতে), আম্ভ (আমা) স্থানউ—আম্ভঠারু। সংক্ষেপে অনেকে বলে আম্ভঠু। অশীতি হইতে বাং আশী, ওং অশী। সং ভদ্র হইতে প্রথমে ভল্ল; ইহা হইতে বাং ভাল, ওং ভল্। যান্তে, যান্ত—যানতু—যানউ—বাং যাউন। এইরূপ ক্রিয়াপদের ত লোপে বাঙ্গালায় করেন, ওড়িয়ায় করন্তি, প্রাচীন আসামী করন্ত।

গেইট-সাহেব-কৃত আসামের ইতিহাসে পাই, যখন আকবার-শাহ দিল্লীর সম্রাট, তখন কোচবিহারে নরনারায়ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সময়ে কামাখ্যায় নরবলি সহ তান্ত্রিক পূজা প্রচলিত ছিল। এই সময়ে নওগাঁয়ের শঙ্কর-দেব নামক এক কায়স্থ দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। ইং ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। মাধব-দেব নামক এক কায়স্থকে তিনি শিষ্য রাখিয়া যান। বঙ্গে ও উৎকলে চৈতন্যদেব যেমন, ইঁহারা আসামে তেমন যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর ও মাধব দেবের কিঞ্চিৎ রচনা 'বৈষ্ণবী কীর্ত্তন' হইতে উদ্ধার করিতেছি।

নমো নারায়ণ সংসার-কারণ
ভকত তারণ তোমার চরণ।
দৈত-অন্তকারী গোবর্দ্ধন-ধারী
ভবভয়-হারী তুমি সি মুরারী।
কালীক দমিলা পুতনা শুষিলা
দেবক তুষিলা ব্রজক তুষিলা।
তুমি বারম্বার হয়া অবতার
পৃথিবীর ভার খণ্ডিলা অপার।
ইত্যাদি।

এখানে একটি শব্দ দ্রষ্টব্য। দৈত্য—দৈত। শেষের য়-ফলা লুপ্ত। ঠিক এইরূপ লোপ ওড়িয়ায় পাই। যথা, সত্য—সত্, দৈত্য—দৈত্।

সোই সোই ঠাকুর মোহি যো হরি পরকাশা।
নাম স্মরত রূপ ধরত তাকেরি হামু দাসা॥
পণ্ডিতে পঢ়ে শাস্ত্র মাত্র সার ভকত লিয়ে।
অম্বর জল ছুঁয়ি কমল মধু মধুকর পিয়ে॥
যাহে ভকতি তাহে মুকতি ভকত এ তত্ত্ব জানে।
যৈছে বণিক চিন্তামণিক জানিয়া গুণ বখানে॥
কৃষ্ণকিঙ্কর শঙ্কর কহে ভজ গোবিন্দক পায়।
সোহি পণ্ডিত সোহি মণ্ডিত যো হরিগুণ গায়॥

এখানে বিদ্যাপতির ভাষা স্মরণ হয়। তাকেরি=তাকের+ই। বিদ্যাপতি এস্থলে লিখিতেন তাকর। ওড়িয়াতে বলে তাহাঙ্কর—তাঙ্কর। 'ভজ গোবিন্দক পায়'—এখানে ক সম্বন্ধে। বিদ্যাপতিতেও এইরূপ আছে। কেবল বিদ্যাপতি কেন, বাঙ্গালী বহু বৈষ্ণব কবি এইরূপ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, দুইশত বৎসর পূর্বে দক্ষিণ রাঢ়ে বসিয়া এক কবি গাইয়াছিলেন,—

অট্টালি উপরে বৈঠল রসবতী রঙ্গিনী সখি মণিমালা।
ঝাঁকি ঝোরখে দুরু হেরই আয়ত নাগর কালা॥
শ্রীদাম সুদাম দামহি সখাগণে বেণু বিশালাদি পুর।
গোধন গমন ধূলি তনু অম্বরে অম্বর আদি পরিপূর॥
হোই হোই রব ঘন বোলত মধুরিম নটবর ভঙ্গিম ঠাম।
দোলহি অলক চূড়ে শিখা চন্দ্রক খচিত কুসুমকি দাম॥
ইত্যাদি।

ইহা মিথিলার কি বাঙ্গালার ভাষা, তাহা কেহ তর্ক তোলেন নাই। শঙ্কর-দেব-রচিত নারায়ণ-কবচ হইতে স্থানে স্থানে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইতেছে।

শুক নিগদতি শুনা সুভদ্রার নাতি।
বিশ্বরূপে এহি অঙ্গীকার করি আতি॥
দেবগণে বরিলা ভৈলন্ত পুরোহিত।
করিলন্ত কার্য্য যত গুরুর বিহিত॥
অসুরক রক্ষা করে শুক্রর বিদ্যায়।
তাক নষ্ট করিবাক দিলন্ত উপায়॥
তেন শুনি পরীক্ষিতে পুছন্ত শুকত।
কহিয়ো বান্ধব গুরু মহাভাগবত॥
তুমি বিনে মোর প্রাণ বন্ধু নহি আন।
করায়োক মোক কৃষ্ণকথা মধু পান॥
সেহি কবচর কথা মোত কহিয়োক।
চরণে শরণ লৈলো উদ্ধারিয়ো মোক॥
রাজার বচনে শুক ভৈলা আনন্দিত।
হাসিয়া বোলন্ত শুনা রাজা পরীক্ষিত॥
নারায়ণ কবচক করিবে ধারণ।
অনায়াসে হৈবে ঘোর ভয় নিবারণ॥
আপনাকে ঈশ্বর স্বরূপে ধ্যান করি।
এহি মন্ত্র উচ্চারিব মাধবক স্মরি॥
গ্রহগণ কেতু সঙ্গে মিলে যিতো ভয়।
সর্প ব্যাঘ্র ভূতাদিত যিবা ভয় হয়॥
শ্রীকৃষ্ণর নাম রূপ অম্বর কীর্তনে।
সবে রিষ্ট নষ্ট মোর হোক এতিক্ষণে॥
এহি সত্য মোর যত উপদ্রব মানে।
সবে নষ্ট হৌক কৃষ্ণ নাম সুমরণে॥
যিতো হতো কবচক শুনে এক মন।
যদি বা আদর ভাবে করয় ধারণ॥
তাহাঙ্ক সমস্তে প্রাণী করয় বন্দন।
সকলে ভয়ত সি তো তোআয় মোচন॥

এখানে কয়েকটি শব্দ দ্রষ্টব্য আছে। শুনা—অনুজ্ঞার পদ। তুলনা কর, বাঙ্গালা যাবা, করিবা। আতি—অতি। বহুবচনে মাত্রে এ, যেমন দেবগণে। ওড়িয়াতে অবিকল এইরূপ হয়। বাঙ্গালায় 'লোকে' বলে—এইরূপ বহুবচন। ভৈলন্ত, হইলন্ত, হইলেন—এক। মৈথিলীতে অদ্যাপি ভৈল। তাক নষ্ট করিবাক দিলন্ত উপায়—ওড়িয়াতে তাকু নষ্ট করিবাকু। এই আকার শূন্য-পুরাণে আছে। ক্রিয়াপদের শেষের ক—যেমন কহিয়োক, রাখন্তোক ইত্যাদি—পূর্বকালে স্বার্থে বসিত। হইবেক, করিবেক—বাঙ্গালা হইতে সম্প্রতি উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু হউক, করুক পদে আছে। মৈথিলীতেও ক স্বার্থে বসে। ওড়িয়াতে এই ক নাই। কর্মকারকে ওড়িয়াতে কু, হিন্দীতে কো, মৈথিলী বাঙ্গালায় কে, আসামীতে ক কর্মকারকে মোত ওড়িয়াতে মোতে। এইরূপ ওড়িয়াতে তোতে। ওড়িয়াতে আর নাই, আসামীতেও নাই। কেহ কেহ মনে করেন অধিকরণের তে, আসামী ত, এর মূল সং তঃ। বাঙ্গালা 'হইতে', প্রাচীন আসামী হন্তে। বাঙ্গালা যে সে এ, আসামী যি সি ই।

আসামে মাধব-দেব গাইয়াছিলেন,—

নাথ তারিয়ো তারিয়ো তারিয়ো যদুমণি।
মজিলোঁ এ ভবসিন্ধু তোমাক না জানি॥
এ ভবসাগর মাজে পরি হামু ভাসি।
কাম ক্রোধ কুম্ভীর মগরে গিলে আসি॥
শোক মোহ ভয় মহাপাকে তল করে।
তৃষ্ণাতরঙ্গে পায়া সব শ্রোত হরে॥
চিন্তা নাম বাড়ব অগনি শোষে প্রাণ।
নাহি কে তরণী তুয়াপদ বিনে আন॥
জানিয়া তোমার পায়ে পশিলোঁ শরণ।
কহয় মাধব গতি অরুণ লোচন।

পরভাতে শ্যামকানু ধেনু লৈয়া সঙ্গে।
বংশীর নিষানে বৃন্দাবনে চলে রঙ্গে॥
জগতর গুরু হরি কাচি গোপকাছে।
আভীর বালক বেঢ়ি চলে আগে পাছে॥
শিকা বান্ধি চান্দি কান্ধে লৈয়া দধি ভাত।
মাথায় চান্দনি জড়ি সাজে জগন্নাথ॥
বাম কাথে শিঙ্গা বেত নেত করুচেলী।
বহু রসে লাসে বেশে চলে করি কেলি॥
অসংখ্য সহস্র শিশু ধেনু বৎসগণ।
শিঙ্গা শঙ্খ বেণু রবে পরয়ে গগন॥
নানান খেলান খেলে বহুভাবে গায়ে।
নানান বিনোদ রসে ভুবন ভুলায়ে॥
বৈকুণ্ঠর পতি হরি বনে চারে ধেনু।
কহয় মাধব গতি কানুপদরেণু॥

এখানে একটু টিপ্পনী করা যাইতেছে। মজিলোঁ, পশিলোঁ পদের তুল্য পদ পুরাতন বাঙ্গালায় এবং বর্তমান ওড়িয়ায় আছে। 'বংশীর নিষাণে'—বোধ হয় বংশীর নিঃস্বনে হইবে। কাচি গোপকাছে—গোপকাছ—কাছুটি কাচিয়া—বান্ধিয়া। সংস্কৃত কচ, কাঞ্চ্ ধাতুর দুই অর্থ আছে; এক অর্থ বন্ধন, অন্য অর্থ দীপ্তি। আসামীতে বন্ধন অর্থ, ওড়িয়া বাঙ্গালায় দীপ্তি অর্থ প্রচলিত। কাপড় কাচায় দীপ্তি অর্থ। প্রাচীন শূন্যপুরাণে কাচন্তি ক্রিয়াপদ আছে। সেখানে বন্ধন অর্থ হইতে পারে। চান্দি—এই শব্দ হেমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় দেন নাই। ইহার অনুরূপ আসামী শব্দ চাঙ্গী দিয়াছেন। চন্দ্রাতপ খাটাইতে খুঁটার মাথায় যে কাঠ বা বাঁশ বাধা যায়, তাহা চাঙ্গী। চন্দ্রাতপী হইতে চান্দি এবং ইদানীং চাঙ্গী। বাঙ্গালা শাঙ্গা শাঙ্গী (সং শঙ্কু) যে অর্থে, আসামী চান্দি চাঙ্গী সেই অর্থে। মাথায় চান্দনী জড়ি—চন্দ্রাকারে জটা—কেশ। বাম কাথে নেত—নেত বস্ত্র। করুচেলী—কি তাহা বুঝিলাম না। হেমচন্দ্র নেত- ও করুচেলী শব্দ দেন নাই। বনে চারে ধেনু—চারায় স্থানে চারে যেন পুরাণা বাঙ্গালায় দেখিয়াছি।

মাধব-দেব রচিত 'নামঘোষা' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে।

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম　　লভিয়া পশুর যোগ্য
　　বিষয়র আশা পরিহরা।
সন্তর সঙ্গত বসি　　সুখে হরিগুণ গায়া
　　সন্তোস অমৃত পান করা॥
শুনিয়োক চিত্ত ভের　　পরম রহস্য বাণী
　　তুমি শুদ্ধ জ্ঞানর আলয়।
কৃষ্ণ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ　　পরম ঈশ্বর দেব
　　ন ছাড়িবা তাহান আশ্রয়॥
দিবা সহস্রেক　　নাম তিনি বার
　　পঢ়ি পাবে যিটো ফল।
একবার কৃষ্ণ　　নাম উচ্চারিলে
　　পাওয় তাক সকল॥
পরম কৃপালু　　শ্রীমন্ত শঙ্কর
　　লোকক করিয়া দয়া।
হরির নির্ম্মল　　ভকতি প্রকাশ
　　করিলা শাস্ত্রক চায়া॥

এখানে দুই একটা শব্দ দ্রষ্টব্য আছে। সন্ত—সৎ শব্দের বহুবচন হইতে। ওড়িয়াতে সান্ত। বাঙ্গালায় মহন্ত তুলনা করুন। তাহান পদ বাঙ্গালা তাঁহার পদের সূচনা করিতেছে। তিনি বার—তিন বার। ওড়িয়াতেও অদ্যাপি, তিনি—সং ত্রীণি। নাম উচ্চারিলে—বাঙ্গালা ওড়িয়াতেও এই। গাইয়া, চাইয়া—গায়া, চায়া। লভিয়া, করিয়া—বর্তমান আসামীতে লভি, করি। ওড়িয়াতেও এইরূপ। বাঙ্গালায় কেবল পদ্যে চলিত আছে।

যে পুস্তক অ-শিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিত নরনারী আগ্রহের সহিত পাঠ করে, সে পুস্তকে সমাজের সাহিত্য ব্যক্ত হয়। পণ্ডিতে নানা বিদ্যা শিখিয়া সাধারণের বাহিরে যাইতে পারেন। তাঁহাদের পাঠ্য গ্রন্থ দ্বারা দেশের ভাষার প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় না। কলিকাতার বটতলার পুস্তকে বাঙ্গালা ভাষা যেমন পাই, ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য লেখকের ভাষায় তেমন পাই না। গ্রাম্য গীত, হেঁয়ালী, ছড়া প্রভৃতি দেশের ভাষায় রচিত বলিয়া স্থায়ী হইয়া থাকে। পাঠশালার শিশুবোধকে দাতাকর্ণ, গঙ্গার স্তোত্র, কলঙ্ক-ভঞ্জন বাঙ্গালাভাষার প্রকৃতি নির্দেশ করিতেছে। এই লক্ষণ ধরিয়া আসামী ভাষার কলঙ্ক-ভঞ্জন নামক পুথী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আগ অনন্তরে কথা শুনা হেল যেন।
রাধার কলঙ্ক কৃষ্ণে করিল ভঞ্জন॥
এক দিনা মনে মনে ভাবি নারায়ণ।
শ্রীমতীর ঘরে হরি করিল গমন॥
শুতি আছে শয্যার ওপরে রাধা সতী।
চন্দ্র বিনে তারা যেন নো শোভয় অতি॥
তামর মাজত যেন নো শোভয় রূপ।
কৃষ্ণবিনে শুতি আছে রাধা সেইরূপ॥
হেন দেখি রঙ্গ ভৈল দেব নারায়ণ।
শয্যার ওপরে পাছে উঠিল তেখন॥

তারার মাজত চন্দ্রে শোভয় যেমন।
শ্রীমতীর সঙ্গে কৃষ্ণ শোভা করে তেন॥
সরোবর মাজে যেন পদ্মফুল ফুটি।
সেই মতে রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ আছে শুতি॥
হেন সময়ত আসি রাধার শাশুরী।
জটালা নামত সেই জনী আছে বুঢ়ী॥
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণক দেখিয়া গজ্জে অতি।
কিয় তই ইঠায়ে আসিলি যদুপতি।
বড় তিরী লোভী তোক বুঝিলোঁ নিশ্চয়।
পর তিরী ধর্ম্ম কিয় নষ্ট কর তই॥
এতিক্ষণে যাইবোহোঁ যশোদার ঘরে।
কহিবোহোঁ সব কথা দেখাবোহোঁ তোরে॥
ছি ছি সর্ব্বনাশী রাধা এই কাম তোর।
মোর ঘরে থাকি পাপ করিয়াছ ঘোর॥
কিয় তই কৃষ্ণক আনিলি মোর ঘরে।
ইহার উচিত শাস্তি দিবোঁ আজি তোরে॥
কলঙ্কিনী হৈলি তই হেন পাপ করি।
ছিছি কিয় জীয়াইয়া আছহ ন মরি॥

এই পুস্তিকা কোন্ সময়ে রচিত, তাহা জানি না। বোধ হয় প্রাচীন। তবে প্রাচীনে নূতন মিশিয়া থাকিবে। পূর্ব্বে শঙ্কর ও মাধব দেবের যে পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও নূতন প্রবেশ করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, এখানে আত—অথ। শুতি আছে—শুইয়া আছে। হেমচন্দ্র বড়ুয়া শুত ধাতু উল্লেখ করেন নাই। মৈথিলীতে আছে, বাঙ্গালা চণ্ডীদাসে আছে। তেখন—অবিকল বাঙ্গালা রূপ; লেখায় আজি কালি, তখন। বাঙ্গালায় এক 'জন' পুরুষ, এক 'জন' স্ত্রী, আসামীতে এক 'জনী' স্ত্রী। কিয়—বানান করা উচিত ছিল—কিঅ। ওড়িয়াতে কিস্ শব্দ কেন অর্থে আছে; সংস্কৃত-প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে; আমরা রাঢ়ে বলি কিস্‌কে—কেন; কিসে যাবে—কেন উপায়েন। তুলনা কর, কেনে। স-লোপে আসামীতে কিঅ—কিয়। তই—তুই। কহিবোহোঁ, দেখাবোহোঁ—কহিবোঁ, দেখাবোঁ।

আসামী ভাষার প্রকৃতি বুঝিতে আর বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বর্ত্তমান আসামী ভাষা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইবে।

কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ

প্রথম খণ্ড

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

অবতরণিকা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ভারতবাসীদিগের চরিত্রসম্বন্ধে, সমাজসম্বন্ধে, ভারতের ভূগোল হইতে আমরা অনেকটা শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। এক্ষণে অনুসন্ধান করিতে হইবে,—কি কি উপাদানে ভারতীয় জাতি সংগঠিত হইয়াছে, কোন্ কোন্ সভ্যতা হইতে ঐ জাতি স্বকীয় সভ্যতার উপকরণ আহরণ করিয়াছে।

১

আদিম অধিবাসী ও প্রথম আগন্তুকের দল: টোডা ও নিগ্রেটো।—কোলারীয়গণ—মোগল ও দ্রাবিড়ীয়দিগের আক্রমণ। উহাদের সভ্যতা।

প্রথমে, ঐতিহাসিক যুগেরও পূর্ব্বে, কতকগুলি আদিমনিবাসী বন্য জাতি বহুশতাব্দী হইতে ভারতে আসিয়া বাস করিতেছে। এই সকল জাতি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর, যথা, টোডা ও নিগ্রেটো। অপর জাতিগুলির অবস্থা অতটা রূঢ় নহে। যথা কোলারীয় জাতি; ইহারা ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদের নাক চ্যাপ্টা, থুতি বহিঃপ্রসারিত, ঠোঁট মোটা, চুল কোঁকড়া। বৃক্ষপত্র-রচিত একটিমাত্র বসনে দেহ আচ্ছাদিত। কাঁচা মাংস আহার করে। শিকার করা ও মাছ ধরাই উহাদের একমাত্র ব্যবসায়। উহাদেরই কতকগুলি শাখা-জাতি পাথর কাটে, পাথর পালিশ্ করে, স্মৃতিস্তূপ গড়িয়া তুলে, কুটীর নির্ম্মাণ করে; এইরূপ কতকগুলি কুটীর লইয়া তাহাদের এক একটি গ্রাম; এবং তাহার চারিদিকে উহারা খোঁটার বেড়া দিয়া থাকে। উহারা জমি চাষ করে, অথবা গোমেষাদি পালন করে। এই সকল শাখা-জাতির মধ্যে, (tribe) প্রভুত্ব কতকটা প্রধানদিগের হস্তে ও কতকটা ঐন্দ্রজালিকদিগের হস্তে।

পরে, বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হইল। মঙ্গলীয়েরা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা দিয়া এবং তুরানীয়েরা (দ্রাবিড়ীয়) পঞ্জাবের সংকীর্ণ গিরি-পথ দিয়া প্রবেশ লাভ করিল।

মোঙ্গলীয়েরা আসাম ও বঙ্গদেশে আসিয়া বাস স্থাপন করিল। উহাদের বড় মাথা, তের্চা চোখ্, হল্‌দে রং, মুখ প্রায় রোমহীন। উহারা শান্তিপ্রিয়, কৃষিকার্য্যে রত, উহারা পিতৃশাসনতন্ত্র মানিয়া চলে, উহারা শুভকারী ও অশুভকারী প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে।

দ্রাবিড়ীয়েরা সমস্ত ভারতে—বিশেষত দাক্ষিণাত্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। উহাদের দৈহিক উচ্চতা মধ্যম-প্রমাণ, উহারা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ও (Brachycephal) অদীর্ঘ-শিরস্ক ছাঁচের। উহাদের ভাষা (agglutinant) সমাসাত্মক। উহারা খাড়া পাথরের লিঙ্গমূর্ত্তি গড়িয়া লিঙ্গপূজা করে, বানর পূজা করে, ব্যাঘ্র পূজা করে, বিশেষত গরু পূজা করে। উহাদের বিশ্বাস, উহারা বানরের বংশধর। উহারা ভাবে, মৃতদিগের আত্মা,—শৈলে, গাছপালায়, জীবজন্তুর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু উহারা এদিকে বেশ কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান, তাই শীঘ্রই উহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতা লাভ করিল। উহারা মেষপালক, কৃষক; মৃণ্ময় পাত্রাদি গড়িতে জানে; কতকগুলি ধাতুর ব্যবহারও জানে; উহাদের গ্রাম আছে, এমন কি নগরও আছে। উহাদের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত। ব্যবসায় অনুসারে উহাদের বংশ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে ও পদমর্য্যাদার ক্রম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সকল বংশে, চাতুর্য্য-পরিচায়ক কোন একটা ব্যবসায় আবিষ্কৃত হইয়াছে ও গুপ্তভাবে রক্ষিত হইতেছে, সেই সকল বংশকেই উহারা প্রাধান্য দিয়া থাকে। এই সামাজিক সোপানের সর্ব্বোচ্চ ধাপে, পুরোহিত ও রাজা অবস্থিত। তাহাদের যথেচ্ছাচারী প্রভুত্ব।*

২

প্রাচীন যুগের বিংশতি ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন এক সময়ে, আর্য্যগণ পঞ্জাবের গিরি-পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। এই আর্য্যগণ পারস্যের ইরানীয়-দিগের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে সংযুক্ত। দীর্ঘকায়, বলবান, ফর্সা রং, মুণ্ডিত-শ্মশ্রু, কিন্তু গুম্ফবিশিষ্ট।

ইহারা যে ভাষায় কথা কহে তাহা হিন্দ-য়ুরোপীয় বংশের একটি অতীব উন্নত ও পুষ্টাঙ্গ ভাষা। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চর্ম্মাদি পরিধান করে, কেহ বা উর্ণার বস্ত্র ও ক্ষৌমবস্ত্রও পরিধান করে। উহাদের অস্ত্রশস্ত্র পিত্তল বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত:—ধনু, বল্লম, কুঠার, অসি, যুদ্ধের রথ। (ঋগ্বেদ দেখ)। ইহারা প্রধানত পশু-পালক; ইহারা গো, ছাগ, মেষ চরাইয়া বেড়ায়। তথাপি ইহাদের রীতিনীতি কতকটা গৃহবাসীর মত; ইহারা কৃষিকার্য্যও জানে। তাহাদের শত্রুদিগকে,—দস্যুদিগকে তাহারা সহজে বশীভূত করিল; এবং তাহার পরেই তাহাদের চরিত্র রূপান্তরিত হইল। অবশ্য প্রচণ্ড উত্তাপের কষ্ট তাহাদিগের বড় একটা ছিল না; পঞ্জাব হিন্দুস্থান নহে;—শীত দেশ, সেখানকার গাছপালা ও জীব জন্তু, মধ্য এসিয়ার গাছপালা ও জীবজন্তুকে মনে করাইয়া দেয়। তাছাড়া, আর্য্য ও দস্যুদের মধ্যে কোন প্রকার মৈত্রীবন্ধন বা আত্মীয়তা ছিল না। আর্য্যেরা দস্যুদিগকে পশুবৎ জ্ঞান করিত। কিন্তু এই সকল অস্থির-বাস লোকেরা বিস্তৃত ভূমি দখল করিয়া বসিল। এই উর্ব্বর ভূমিতে শস্যের খুবই প্রাচুর্য্য। এই

---

* যে সকল প্রমাণাদি হইতে কোলারীয় ও দ্রাবিড়ীয়দিগের সামাজিক অবস্থার বিচার করা যাইতে পারে, তাহার সংখ্যা অবশ্য অধিক নহে। মুখ্য প্রমাণ এইগুলি:—ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত মসৃণীকৃত প্রস্তরের অস্ত্র; উহার মধ্যে প্রধান প্রধান অস্ত্রগুলি লাহোরের যাদুঘরে পাওয়া গিয়াছে। যাথা স্মৃতিস্তূপ, চক্রাকৃতি প্রস্তর, রাশীকৃত পাথরের ঢিবি (Cairn)।

যে সকল নিকৃষ্ট জাতি এখনও বর্ত্তমান, তাহাদের রীতিনীতি। বঙ্গদেশীয় নিকৃষ্ট জাতিদিগের রীতিনীতি সম্বন্ধে Sir W. Hunterএর "Statistical Account" দেখ। নেগ্রিটোদের সম্বন্ধে M. Man-প্রণীত গ্রন্থাদি দেখ। ঋগ্বেদ দেখ। দেখিবে, ইন্দ্রের প্রতি প্রযুক্ত একটি মন্ত্রে, দস্যুদিগের নগরের উল্লেখ আছে, দুর্গের উল্লেখ আছে, ৭০ জন রাজার উল্লেখ আছে।

দ্রাবিড়ীয়দিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে, M. M. Lassen, Stevenson, Muir, Caldwell—ইঁহাদের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। Comparative Grammar of the Dravidian Languages. Bose, Journ. A. Soc. Bengal LIX, First part—P. 270.

অনেক সময়, বেলুচিস্তানের ব্রাভইগণও এই দ্রাবিড়ীয় জাতির অন্তর্ভূত বলিয়া গৃহীত হয়—ইহারা ঋগ্বেদের উল্লিখিত দস্যুদিগের বংশধর। মুণ্ডা, কোল, কোটা, সাঁওতাল, চণ্ডাল ইত্যাদি—ইহারাও দ্রাবিড়ীয় জাতির অন্তর্ভূত। দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে তামিল, তেলুগু, কানারে, মলয়ালম্, গোদ্ এই দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলিই প্রধান।

আর্য্যগণ—তাহাদের পঞ্জাবে বাসস্থাপন। ভাষা, রীতিনীতি।—পরিবার সংগঠন, গোত্র সংগঠন, শাখা-জাতি সংগঠন। জন্মভূমি পূজা, পিতৃপুরুষদিগের পূজা।—নৈসর্গিক দেবতাসমূহ: ইন্দ্র।—মন্ত্রপাঠকারা—ঋষি ও ব্রাহ্মণ।—ঋগ্বেদ।

সকল ভূমি তাহারা আদিমবাসীদিগের দ্বারা চাষ করাইয়া লইল। এই কারণেই ইহাদের মধ্যে কষ্টকর শ্রমকর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা, যোদ্ধ্-সুলভ গুণের অবনতি, শান্তি-সুলভ বিবিধ শিল্পকলার প্রভূত উন্নতি:—যথা কাঠের কাজ, শোধিত চর্ম্ম, সূতা কাটা, তন্তুবয়ন, বস্ত্রবয়ন, সেলাই-করা বস্ত্র, মৃণ্ময় পাত্র, রজ্জু, পোত ও ভেলা, স্থল ধরণের শকট; শকটবাহী গরু ও ছাগল, পর্য্যাণ (জিন্), রত্নালঙ্কার। উহারা, সোনা, রূপা, ও পিতলের কাজ করে। ক্রীড়া যুদ্ধ ঘোড়দৌড় ও পাশা-খেলা ইহাই উহাদের লোকপ্রিয় আমোদ। উহাদের মধ্যে ভিষক্ আছে, ক্ষৌরকার আছে।

যেমন য়ুরোপীয় আর্য্যদিগের মধ্যে সেইরূপ ভারতের আর্য্যদিগের মধ্যেও, সমস্ত বংশ কুলপতিকে মানিয়া চলে। কালক্রমে, পরিবারসমূহের বৃদ্ধি হওয়ায়, কতকগুলি বংশ লইয়া এক একটি গোত্র সংগঠিত হইল। যুদ্ধ ও দেশান্তর-বাস, ঐ সকল গোত্রকে (clan) কতকগুলি শাখায় (tribe) বিভক্ত করিল। এই শাখাগুলি নিজ নিজ দলপতি নির্ব্বাচন করে; এই দলপতি, এই অধিপতি, এই রাজা বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িল।

উহাদের ধর্ম্ম কৌলিক ধর্ম্ম। এক হিসাবে,—নিজ বংশের প্রতি, নিজ গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা গৃহরক্ষিত অগ্নির পূজা। এই অগ্নিশিখায় যে অন্ন পাক করা হয়, তাহা পরিবারস্থ পিতা ও তাঁহার সন্তানগুলি ছাড়া আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না; কেবল, একটা গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান করিবার পর, তবে অন্য গৃহের দুহিতা ঐ পাক্-চুল্লীর নিকটে যাইতে পারে, ও অন্ন পাক করিতে পারে। পুরুষের অনেকগুলি উপপত্নী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ধর্ম্মপত্নী একটি মাত্র। তাহার পর পিতৃপুরুষদিগের পূজা। সমাধি ভূমির অভ্যন্তরে মৃতব্যক্তি নিদ্রা যায়; মৃতব্যক্তির আত্মা পূর্ব্ব বাসস্থানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আরও কিছু কাল পরে, উহারা প্রেতাত্মার একটা বাসস্থান, একটা নরক* কল্পনা করে। মৃত্যুর পরেও মৃত ব্যক্তির আত্মার মধ্যে পূর্ব্বেকার সমস্ত বাসনা, সমস্ত তৃষ্ণা থাকিয়া যায়; খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইলে, সে তাহার সন্তানগণের প্রতি অত্যাচার করে; তাহার ক্ষুধা শান্তি করিতে পারিলে তবে সে তাহাদিগকে সুপথে চালিত করে, তাহাদিগকে রক্ষা করে; কিন্তু তাহার এই শোচনীয় অবস্থার দরুন সে চিরদিনই কৃপাপাত্র, অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের এই মন্ত্রটি তাহার সাক্ষী:—

"মৃতব্যক্তি যে পথ দিয়া যাইতেছে, কোন জীবিত ব্যক্তি যেন সে পথ অনুসরণ না করে। জীবিত ব্যক্তিরা যেন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন শত শরৎ ভোগ করে, মৃত্যু যেন তাহাদিগের হইতে দূরে থাকে। নারী, উঠ, জীবিতদিগের লোকে ফিরিয়া যাও। যাহা হইতে আত্মা পলায়ন করিয়াছে এরূপ মৃত শরীরের সম্মুখে পড়িয়া আছ কেন? একজন তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া তোমাকে তাহার আপনার করিয়া লইয়াছিল:—তোমার সেই পতি আর নাই; মৃত্যু আসিয়া তোমাদের যোগ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।"(২)

যেমন একদিকে গৃহদেবতা অগ্নির পূজা, তেমনি আবার অন্য দিকে নৈসর্গিক দেবতাদিগের পূজা। বরুণ (আকাশের দেবতা); সূর্য্য; ঊষা; রুদ্র (ঝড়ের দেবতা, সংহারকর্ত্তা); যম (পাতালস্থ নরকের অধিপতি); ইন্দ্র (বজ্রের দেবতা); সর্ব্বাপেক্ষা এই ইন্দ্রেতেই একটা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আছে; ইনি প্রমোদাসক্ত, সুরা-মত্ত, যুদ্ধপ্রিয় আর্য্যের প্রকৃত আদর্শ। নিম্নলিখিত সূক্তিগুলিতে ইন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে:—

* ইন্দ্রের প্রতি প্রযুক্ত কোন কোন মন্ত্রের মধ্যে স্কান্ডিনেভিয়ার Walhalla-র ন্যায় যোদ্ধ্গণের স্বর্গও কল্পিত হইয়াছে।

(২) মনে হয়, কতকটা ইরাণীয়দিগের অগ্নি পূজার ন্যায়। অগ্নি পূজা একটা বিশেষ ধর্ম্মরূপে গঠিত হইয়াছিল, অগ্নি দেবতা সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান সূক্তিগুলিতে, অগ্নির জন্ম, অগ্নির শোভাসৌন্দর্য্য, অগ্নি হইতে দেবতারা যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন,—এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। দেবতারা অগ্নিকে বিদ্যুৎ আকারে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অগ্নি, মেঘ-বৃষ্টির দেবী মাতৃগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরে দেবতারা, অগ্নিকে পৃথিবীতে জন্ম দান করিলেন, তখন দুই কাষ্ঠখণ্ডের ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইল; তখন অগ্নি যজ্ঞের রূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং অন্নের দ্বারা তাঁহার জন্মদাতা দেবতাদিগের পুষ্টি-সাধন করিলেন। নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ সূক্তিটিতে, অগ্নি গৃহ-দেবতারূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন:—

"অগ্নিদেব কৃপা করিয়া মনুষ্যদিগের গৃহে বাসস্থাপন করিয়াছেন; ইনিই তাহাদের রাজা; ইনিই সমস্ত পরিবারবর্গের আনন্দ। স্যন্দমান বসার দ্বারা কেমন ইনি দীপ্তি পাইতেছেন। আমি যে তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি, আমাকে তুমি বড় বড় গাভী দেও, আমায় ঔরসজাত একটি পুত্র দেও, অসংখ্য সন্তান সন্ততি দেও।"

"জয় হোক্ তোমার পূর্ব্বতন বলবিক্রমের, জয় হোক্ তোমার অদ্যতন বলবিক্রমের। আমরা তোমার স্তুতি করিব,—স্তুতি করিব তোমার সেই উদ্যত বজ্রের, তোমার সেই শৃগাল-যুগলের, সেই সৌর দীপগুলির···শক্তিমানের বাহু, আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, তুমি তাহা নিবারণ কর; মানবের মিত্র, মানবের শত্রুকে চূর্ণ করিয়া দেন· ইন্দ্র, পান কর, হে বীর, সোম পান কর। এই সোমরস যেন তোমার মত্ততা উৎপাদন করিয়া তোমার মস্তকে আরোহণ করে, তোমার উদর পূর্ণ করিয়া তোমাকে বলবান করিয়া তুলে।"

প্রত্যেক বংশেরই, আপনার নিজস্ব বরুণ আছে, নিজস্ব ইন্দ্র আছে, নিজস্ব উষা আছে। এবং প্রত্যেক বংশেই, এই সকল দেবতার মধ্যে, কোন একটী দেবতাকে স্বকীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বরণ করিয়া লওয়া হয়। মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায়, দেবতারাও যজ্ঞাহুতি পাইতে ইচ্ছা করেন; সোমরস ব্যতীত, বলিপশুর বসা ব্যতীত, ইন্দ্রদেব শুষ্কতার অসুর বৃত্রাসুরকে জয় করিতে পারেন না, অথবা, মেঘ-গাভীর স্থূল স্তন হইতে বৃষ্টি দোহন করিতে পারেন না।(১)

কিন্তু আর্য্যদের কোন দেবালয় নাই, কোন বিগ্রহও নাই। কিয়ৎ শতাব্দী হইতে, আর্য্যেরা তাহাদের সমাধি মন্দির ত্যাগ করিয়াছে। দেবতাদের প্রতি, পিতৃ-পুরুষগণের প্রতিই তাহাদের সূক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পূজা, অভিসম্পাৎ, ভয় প্রদর্শন, প্রার্থনা, প্রসন্নতা, বিশেষত অভিচার এই সমস্তের দ্বারা এই সকল সূক্তি—অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে, দেবতাদিগকে প্রোৎসাহিত করে; যেমন ভূতপ্রেতদিগকে তেমনি দেবতাদিগকেও সান্ত্বনা করে, স্তবস্তুতি করে; মন্ত্রের দ্বারা মানুষ তাহার প্রভুদিগকে বশীভূত করিয়া, তাহাদিগকে হুকুম করে; এখন সেই মানুষের প্রভুরাই মানুষের দাস হইয়া পড়িয়াছে। যে বংশের মধ্যে ভাল-ভাল সূক্তি আছে, মন্ত্র আছে, সেই সকল বংশই নিজ ইন্দ্রের উপর, নিজ বরুণের উপর, নিজ সূর্য্যের উপর, বীররূপে পূজিত মৃত ব্যক্তিদিগের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-শক্তিই সূক্তি রচনা করে, অভিচার উদ্ভাবন করে। এই সকল ঋষিদিগের বংশধরেরাই পরে ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিল। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া রচিত এই সকল ঋষিদিগের রচনাই ঋগ্বেদ-সংহিতা; পঞ্চদশ ও দশম শতাব্দীর মধ্যে (অবশ্য খৃষ্ট পূর্ব্ব) কোন এক সময়ে এই সংহিতা সংকলিত হয়।

নানা গ্রন্থের উপর আর বরাত না দিয়া এবং উদ্ধৃতাংশ আর না বাড়াইয়া Muir-কৃত "Sanskrit Texts" হইতে সংক্ষিপ্তসারের মত একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"হে ইন্দ্র, যেমন শিশু সন্তানেরা পিতার পরিচ্ছদ হাত দিয়া ধরে, আমরাও তেমনি সূক্তির দ্বারা তোমার অঙ্গরাখা ধরিতেছি। পত্নী যেমন পতিকে আলিঙ্গন করে, তেমনি আমাদের স্খলন্ত প্রার্থনা-মন্ত্র তোমার দেহকে আলিঙ্গন করিতেছে। অশ্ব-পর্য্যাণের চর্ম্ম-বন্ধন যেমন পর্য্যাণকে আঁটিয়া ধরে, আমাদের সূক্তিও সেইরূপ তোমাকে ধরিয়া থাকে।"

* * *

এইরূপ আর্য্য জনসমাজ পঞ্জাবে ছিল। নূতন-নূতন শাখাজাতি-সকল দেশান্তর হইতে আসিয়া এই আর্য্য-জাতির বল বৃদ্ধি করিল। সভ্যতার দ্রুত উন্নতি হইল; সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব, ও রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। শীঘ্রই, পঞ্চ নদ-অঞ্চলে আর্য্যদিগের আর সংকুলান হইল না। তখন উচ্চাভিলাষী প্রধানেরা নূতন দেশ জয় করিতে ইচ্ছুক হইল।

যে গ্রন্থের বিষয় সভ্যতা,—ধর্ম্ম নহে, এইরূপ গ্রন্থে আমি সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসের কথা বলিয়াছি—জাতীয় রীতিনীতির উপর যে সকল বিশ্বাসের অব্যবহিত প্রভাব। কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া যে সকল সূক্তি রচিত হইয়াছিল, তাহার সংহিতার মধ্যে, বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়:—বহুদেববাদ, বিশ্ব-ব্রহ্মবাদ, একেশ্বরবাদ, যোগবাদ (Mysticism).

একেশ্বরবাদ-মতাত্মক সূক্তগুলি, অধিকাংশ বরুণের প্রতি সংবোধন করিয়া রচিত হইয়াছে। বোধ হয়, ইরাণীয় ও হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্ব্বে বরুণই আর্য্যদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। ঋগ্বেদের এই সূক্তিটির প্রতি দৃষ্টিপাত কর:—

"শক্তি ও জ্ঞানই তাঁহার স্বরূপ। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি গগন-মণ্ডল উত্তোলন করিয়াছেন, তিনি নক্ষত্র-সৈন্যদল ও পৃথিবীর ক্ষেত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"

অথর্ব্ববেদের আর একটি সূক্তি দেখ। ঋগ্বেদের বহু শতাব্দী পরে এই অথর্ব্ববেদ সংকলিত হয়:

"আমাদের কার্য্যকলাপের উপর আকাশ-অধিপতির সতর্ক দৃষ্টি আছে। মানুষ যতই গোপন করিতে চেষ্টা করুক, দেবতারা তাহাদের

(১) উপরে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা বেদের একটি প্রধান পৌরাণিক কথা। বৃত্রাসুর মেঘ-গাভীগণকে হরণ করিতে যাওয়ায় ঝড়ের দেবতা রুদ্র ও মরুৎদিগের সাহায্যে, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ইহা কতকটা Hercules ও Cacus কাহিনার মত)।

সমস্ত কাহাই জানিতে পারেন। তুমি উত্থানই কর, অঙ্গ সঞ্চালনই কর, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যাও, কোন অন্ধকার-কোণে জড়সড় হইয়াই থাক,—দেবতারা সকল চেষ্টারই অনুসরণ করেন। দুই জন ব্যক্তি একত্র মিলিয়া পরামর্শ করিতেছে; মনে করিতেছে,—সেখানে আর কেহ নাই; কিন্তু বরুণ তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া সেখানে আছেন, তাহাদের সকল পরামর্শই তিনি জানেন। এই ভূগোল তাঁহারই, এই অসীম দ্যুলোকও তাঁহারই।"

ঋগ্‌বেদের দুইটি সূক্তিতে আমরা জানিতে পারি,—কি করিয়া ইন্দ্র বরুণের স্থান অধিকার করিল। একটি সূক্তিতে দেখা যায়, তখনও ইন্দ্র অপেক্ষা বরুণেরই প্রাধান্য; বরুণ বলিতেছেন: "আমিই রাজা; সাম্রাজ্য আমারই। আমিই দেবতাদিগকে জীবনদান করিয়াছি, দেবতারা আমারই আদেশ পালন করে।" ইন্দ্র সগর্ব্বে ইহার উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রতিপাদন করিতে সাহস করিলেন না। বহু-পরবর্ত্তী আর একটি সূক্তিতে দেখা যায়, বরুণ স্পষ্টই পরাভূত হইয়াছেন। অগ্নি এইরূপ বলিতেছেন:—"আমি পিতাকে (বরুণ) ত্যাগ করিলাম; যে দেবতার যজ্ঞাহুতি নাই তাঁহাকে ছাড়িয়া সেই দেবতাকে গ্রহণ করিলাম যাঁহার যজ্ঞাহুতি আছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমি পিতার সেবা করিয়াছি, এক্ষণে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রকে গ্রহণ করিলাম।" যদি এইরূপ মনে করা যায়,—বরুণই বড় দেবতা; আর, ইন্দ্র একজন সুরা-মত্ত যোদ্ধৃপুরুষ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বরুণের বদলে ইন্দ্রের পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, আর্য্যেরা আবার বর্ব্বরতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল: ইহার কি হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? ইরানীয়গণ যাহারা আরও বেশী সভ্য ছিল, এবং যাহারা পরে আর্য্য-দেবতাদিগকে অসুর বলিয়া বিবেচনা করে,—সেই ইরানীয়দিগের সহিত ভারতীয় আর্য্যদের বিচ্ছেদ ঘটাই কি ইহার হেতু? যুদ্ধ বিগ্রহ কি ইহার হেতু? এই ঘটনার উপর কোলারীয়দিগের কি কোন প্রভাব ছিল? ইহা কি ভারতীয় আব হাওয়ার ফল?

ঋগ্বেদে,—দেবতারা, দেব কিংবা অসুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু বেদের গদ্য ভাষ্য ব্রাহ্মণ সংহিতায় এই অসুর শব্দে দৈত্য দানব ছাড়া আর কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। ঋগ্‌বেদে, আকাশের কতকগুলি দেবতা, আদিত্য নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা,—বরুণ, মিত্র (পারসীকদিগের এই একই দেবতা), সূর্য্য (সূর্য্য অথবা সাবিত্রী), ইন্দ্র ইত্যাদি।

ঋগ্‌বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কতগুলি সূক্তি,—পৌরাণিক গল্পের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া, বিশ্বব্রহ্মবাদের প্রবণতাসূচক একটা সৃষ্টি প্রকরণ সৃষ্টি করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই ধরণের একটি প্রসিদ্ধ সূক্তি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

"যাহা নাই, তাহা তখন ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, তাহা হইতে উন্নত স্থলও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক ও অদ্বিতীয়, বায়ু ব্যতিরেকে, আত্মামাত্র অবলম্বনে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।—সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যা প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।—সর্ব্বপ্রথমে ইচ্ছার আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে মনের প্রথম উৎপত্তি-কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন।—রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল। রেতোধার উদ্ভব হইল, মহিমা সকলের উদ্ভব হইল। নিম্নদিকে স্বধা রহিল, প্রযতি ঊর্দ্ধ দিকে রহিল।—কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে।—এই সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন যিনি ইহার প্রভুরূপে পরমাকাশে আছেন। তিনিও জানেন বা নাও জানেন।"

অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রতি প্রযুক্ত বিভিন্ন বংশের সূক্তিগুলি তুলনা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে, প্রত্যেক বংশেরই নিজস্ব ইন্দ্র, নিজস্ব বরুণ, নিজস্ব অগ্নি আছে এবং বিভিন্ন বংশ বিভিন্নরূপে সেই সকল দেবতার কল্পনা করিয়াছিল।

ঋগ্‌বেদের সময়ের শেষভাগে, আদিমবাসীদিগের সহিত আর্য্যদের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। উহারা তখন আর দস্যু বা শত্রু নহে, উহারা তখন দাস মাত্র। তথাপি সকলকেই যে দাস করা হয় নাই—ভাবীকালের চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগই তাহার প্রমাণ। ব্রাহ্মণের সাদা রং, ক্ষত্রিয়ের লাল রং, বৈশ্যের হলদে রং, ও শূদ্রের কালো রং।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরহী বিশ্ব

পশ্চিম দিগন্ত-বুকে ধীরে অস্ত যায়
অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র ম্লান পাণ্ডুকায়।
তারা-কণ্টকিত দেহে আছে শিহরিয়া
আঁধারে আকাশ যেন পশ্চিমে চাহিয়া।
কভু নারিকেল কুঞ্জে শন্ শন ধ্বনি,
আর্ত্তস্বর বংশপুঞ্জে, স্তব্ধা নিশিথিনী।
বিঘোষিল যামঘোষ দ্বিতীয় প্রহর,
কি যেন অপেক্ষি স্থির বিশ্ব চরাচর।
সহসা আঁধারে কোথা ভাষাময় পাখী
"পিউ কাঁহা" "পিউ কাঁহা" মুহু উঠে ডাকি।
সে উচ্চ বিরহ কণ্ঠ ছুঁইয়া আকাশে
মূক তারাদলে ভাষা জাগাইয়া আসে!
'প্রিয় কই' 'কোথা প্রিয়' কোথা সে বাঞ্ছিত,—
ফুকারিল আর্ত্ত বিশ্ব প্রিয়-বিরহিত।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

গীতাপাঠ

ভূমিকা।

(শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত।)

এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটী দীপ জ্বলিতেছে—ভগবদ্গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা—উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে—ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই। পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকচ্ছটা দিগ্দিগন্তরে বিস্তার করিতেছে—আমাদের ঐ ক্ষুদ্র দীপের অপরাজিত শিখা সে সমস্তেরই উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে। উহা হইতে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উদ্গিরিত হইতেছে তাহাতে আমাদের দেশের বায়ু পবিত্র হইতেছে; আর সেই বাষ্পনিচয়ের শ্বেতাভ্র হইতে বিন্দু বিন্দু শান্তিবারি যাহা আমাদের ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে সিঞ্চিত হইতেছে তাহা মৃতসঞ্জীবনী সুধা, তাহা অমরত্বের সোপান। আমার শরীর যখন শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন—কোনো কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে যখন আমার মন উঠিতেছে না, সেই সময়ে একছিটা অমৃত আমার গায়ে লাগিল; তাহা এই যে, "উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানং অবসাদয়েৎ" আত্মার বলে আত্মাকে টানিয়া তুলিবে—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। তাহারই বলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুটীরের যে কিছু সম্বল তাহা আশপাশ হইতে কথঞ্চিৎ প্রকারে জড়ো করিয়া থাল সাজাইয়া আনিয়াছি—শান্তিনিকেতনের সজ্জনসেবায় তাহা বিনিয়োগ করিয়া ধন্য হইব—ইহারই প্রত্যাশায়। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া—শান্তিনিকেতনের সুকুমার বালকগণের খেলাধূলা এবং পাঠাভ্যাসের সরল মাধুর্য্যের মধ্যে, বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ভক্তিমান্ নিষ্ঠাবান আচার্য্যগণের কর্ম্মদক্ষতা, সহৃদয়তা এবং সদাশয়তার মধ্যে, স্বস্থানে স্থির দণ্ডায়মান বনস্পতির মধ্যে, পুষ্পগন্ধী বনকাননের মধ্যে, স্বচ্ছন্দবিহারী গো মৃগ পক্ষিগণের মধ্যে, দিগন্তরব্যাপী বনান্তশোভিত প্রান্তরের মুক্ত সমীরণের মধ্যে পরমপুরুষ পরমাত্মার মঙ্গলমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ বিরাজমান দেখিয়া তাঁহাকে প্রাণমনহৃদয়ের সহিত নমস্কার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

ভগবদ্গীতার প্রথম পইঠাতেই সাংখ্যশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার সে যে সাংখ্য তাহা কি এই সাংখ্য অর্থাৎ যাহা সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে আর্য্যাচ্ছন্দে সূত্রপরম্পরায় গ্রথিত হইয়াছে—সেই সাংখ্য? না তাহার অধিক আর কিছু? এবিষয়ে মীমাংসার জন্য দার্শনিক পুরাতত্ত্বের অন্ধকার হাতড়াইয়া বেড়াইবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখিতেছি না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের মূল বচনগুলি সমস্তই গীতার অনুমোদিত। এই জন্য গীতার ব্যাখ্যায় সহসা প্রবৃত্ত না হইয়া ভূমিকা স্বরূপে সাংখ্যদর্শনের ভিতরের কথাটা বিবৃত করা আবশ্যক বোধে অগ্রে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি। সমগ্রভাবে সাংখ্যদর্শন পর্য্যালোচনা করিবার স্থানও এ নহে, কালও এ নহে, আর, যাহা কর্ত্তৃক তাহা হইতে পারা সম্ভবে সে মানুষও আমি নহি। আমার বিবেচনায়, আমাদের দেশের ভাষ্যকারদিগের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে সাংখ্যদর্শনের উপক্রমণিকা এবং উপসংহারের মধ্য হইতে সাংখ্যের নিগূঢ় মর্ম্মকথাটি সোজাসুজিভাবে সুকৌশলে বাহির করিয়া আনাই সংকল্পিত অভীষ্ট সাধনের সুচারু পন্থা—সেই পন্থা অবলম্বন করাই এ স্থলে আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। সাংখ্যকারিকার প্রথম সূত্র এই:—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্ জিজ্ঞাসা"

আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ বাহ্য বস্তুঘটিত, আপনাঘটিত এবং দেবতাঘটিত এই ত্রিবিধ দুঃখের কিরূপে বিনাশ হইতে পারে তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। "তদভিঘাতকে দৃষ্টে হেতৌ সা অপার্থাচেৎ" যদি বল "দুঃখ বিনাশের উপায় তো কাহারো অবিদিত নাই; চিকিৎসাদি দ্বারা রোগ নিবারিত হইতে পারে, প্রিয়সম্মিলনাদির দ্বারা মনোগ্লানি নিবারিত হইতে পারে, দেবার্চ্চনাদি দ্বারা দৈবকোপ নিবারিত হইতে পারে—এ তো, সকলেরই জানা কথা; জানা কথার জিজ্ঞাসা নিরর্থক।" "না।" ন "ঐকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ" সাধিতব্য বিষয় এখানে দুঃখের শুধুই যে কেবল বিনাশ তাহা

নহে, পরন্তু দুঃখের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক বিনাশ—দুঃখ যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও ভোক্তাপুরুষের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে না পারে তাহারই জন্য জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। ওসকল লৌকিক উপায়দ্বারা হইতে পারে কেবল দুঃখের আংশিক এবং ক্ষণিক বিনাশ, তা বই ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানই ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

"ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি!" কি তেজের কথা! এ কালের কোনো ইংরাজি অধ্যাপক ওরূপ একটা কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন কি? তাহা যদি করেন তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর শুনিতে হইবে এই যে, From the sublime to the ridiculous there is but a step আশ্চর্য্যরস এবং হাস্যরসের মধ্যে কেবল এক পা ব্যবধান। তিতুমিয়াবীরের অসামান্য সাহস দেখিয়া একদিকে যেমন আমরা আশ্চর্য্যসাগরে নিমগ্ন হই, আর এক দিকে তেমনি আমাদের মনে হাস্য রগর উথলিয়া ওঠে—কিছুতেই রোধ মানে না। পাড়ালোকের ম্যালেরিয়া নিবারণ করিবার যাঁহার ক্ষমতা নাই সেইরূপ একজন চিকিৎসক যদি বলেন যে যমকে কিরূপে বিনাশ করা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টা দেখা যাইতেছে—তবে তাঁহার স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—সেটাও বিবেচ্য। তিতুমিয়াবীরের দুঃসাহসিকতা তাহার পক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ তাই তাহা শোভা পায় না—কিন্তু অভিমন্যুকে কিম্বা নেপোলিয়ন বনাপার্টিকে উহা অপেক্ষা সহস্রগুণ দুঃসাহসিকতা শোভা পাইয়াছিল। পচিশজন সৈন্যের ভেঁপুর জোরে নেপোলিয়ন দশহাজার অষ্ট্রেলীয় সৈন্যের উপরে জয়লাভ করিয়াছিলেন—ইহা বিগত শতাব্দীর ইউরোপীয় যোদ্ধাগণের দেখা কথা। তেমনি, একালের একজন অমুকানন্দ স্বামী যিনি নামের আনন্দেই আনন্দে আছেন, আর, সেইজন্য দুঃখনিবৃত্তির উপায়চেষ্টা যাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, তাঁহার মুখে ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তির কথা শুনিলে আমাদের হাসি পাইতে পারে; কিন্তু কপিল মুনির মুখ হইতে উহা অপেক্ষা সহস্রগুণ জোরালো কথা বাহির হইলেও আমাদের কর্ত্তব্য, কথাটা যাহা বলিলেন তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি, তদ্গতচিত্তে তাহার ভিতরে তলাইতে চেষ্টা করা। কপিল মুনি জিহ্বা সংযত করিয়া বলিতে পারিতেন যে, "যথাসম্ভব দুঃখনিবৃত্তিই জিজ্ঞাসার বিষয়" কিন্তু তাহা হইলে তিনি কপিল মুনি হইতেন না—তাহা হইলে তিনি একালের ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দলভুক্ত হইতেন। একালের গ্রন্থসমালোচকেরা ঐকান্তিক সত্যের প্রতি বড়ই নারাজ। দশ আনা সত্যের সঙ্গে অন্ততঃ পাচ আনা মিথ্যা মিশ্রিত না থাকিলে সত্য ইহাদের মনঃপূত হয় না। লেখকের নিগূঢ় মর্ম্মকথাটার ভালমন্দ বিচার সমালোচকের ক্ষমতাবহির্ভূত; এইজন্য সমালোচক ভাষা বেশভূষার ভালমন্দ বিচারের খোরাক না পাইলে লেখকের প্রতি খড়্গহস্ত হ'ন। কাজেই একালের কৃতবিদ্য লেখকেরা একটি সহজ-শোভন অকৃত্রিম সত্য প্রকাশ করিতে হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে বোঝা বোঝা কৃত্রিম বেশভুষায় সাজাইয়া দাঁড় করাইতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা পাঠকগণের দৃষ্টি-পথে বাহির করিতে সাহসী হ'ন না। কপিল মুনি যদি বেন্থাম্ হইতেন তবে তিনি বলিতেন—অধিকাংশ লোক কিসে সুখী হইতে পারে তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। বেন্থামের এটা দেখা উচিত ছিল যে, সুখই যাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাদের সুখের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্চে আপনাদিগকে অধিকাংশ অপেক্ষা সুখসৌভাগ্যশালী বলিয়া জানা, আর জাঁকজমক করিয়া লোককে তাহা জানানো; অধিকাংশ লোকের শ্রীসমৃদ্ধি ওসকল ব্যক্তির প্রাণে সহিবে কেমন করিয়া—উহারা চা'ন্ অধিকাংশ লোক তাঁহাদের পদতলে গড়াগড়ি যা'ক্। এই জন্য সুখের অনন্যভক্ত উপাসকদিগের মুখে অধিকাংশ লোকের সুখের জন্য কাজ করিবার কথা শোভা পায় না; শোভা পায় শুধু এই কথা যে, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ঋণ করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। কেননা সুখভোগই যদি মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে ভোক্তাদিগের আপনার আপনার সুখসমৃদ্ধিই সে উদ্দেশ্যের একমাত্র সাধনোপকরণ তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; তবেই অধিকাংশের সুখসৌভাগ্য সে উদ্দেশ্যের পথের কণ্টক। জর্ম্মান দেশের সুবিখ্যাত তত্ত্ববিৎ কাণ্ট্ আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অনেকটা

কাছাকাছি আসিয়াছিলেন যদিচ,—কিন্তু তাঁহার দুইমুখা কথাগুলির ভাব আঁকড়িয়া পাওয়াই সুকঠিন। কাণ্ট্ বলেন যে, অন্তরের অহেতুকী আজ্ঞা পালন করাই—Categorical Imperative-এর কথা শোনাই—ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পথ। কাণ্ট যদি বলিতেন যে অন্তর্যামী পুরুষের আজ্ঞাপালন করাই ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পথ, তবে তাঁহার কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য্য করিতাম; কিন্তু তাহা বলিতে তিনি ইতস্তত করিয়াছেন অতিমাত্র। কাণ্ট্ তাঁহার নিজের কথার অসম্পূর্ণতা নিজে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াও তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে পারিয়া ওঠেন নাই। এটা তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অন্তরের অহেতুকী আজ্ঞার সঙ্গে যদি কোনো প্রকার কার্য্যপ্রবর্ত্তক শক্তি সংযুক্ত না থাকে তবে তাহা ফাঁকা আওয়াজ বই আর কিছুই নহে। রাজাজ্ঞার সহিত যদি রাজবল বা প্রজাগণের রাজভক্তি সংযুক্ত না থাকে তবে তাহা যেমন জনসমাজের কোনো উপকারে আসে না, তেমনি অন্তরের অহেতুকী আজ্ঞার সঙ্গে কার্য্যপ্রবর্ত্তনা শক্তি সংযুক্ত না থাকিলে তাহাতে কোনো ফল দর্শিতে পারে না। কাণ্ট্ আর কোনো কার্য্যপ্রবর্ত্তনী শক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন যে, নিয়মের প্রতি ভক্তিই কর্ত্তব্যকার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক। কাণ্টের এ কথায় আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে পারে না। রাজনিয়মের প্রতি ভক্তি রাজভক্তি ছাড়া আর যে কি তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। যদি বল যে, সাধারণতন্ত্র-রাজ্যের রাজা নাই অথচ রাজনিয়ম আছে—এমত স্থলে রাজনিয়মকে রাজা অপেক্ষাও বড় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি সমর্পণ করা সকলেরই উচিত। কিন্তু একটা প্রাণশূন্য বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বকে ভক্তি করা উচিত বলিলেই তো আর তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি যায় না। আমেরিকার রাজ-সভাপতি লিন্‌কলন্-এর তুল্য সাধারণতন্ত্রের মস্তকশ্রেণীয় লোকেরা যদি ভক্তির উপযুক্ত পাত্র হ'ন, তবে সাধারণতন্ত্রের রাজনিয়মের প্রতি ভক্তি বলিলে—হয় বুঝায় সেই মস্তকশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি ভক্তি, নয়, বুঝায় ওয়াশিংটনের ন্যায় দেশের পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি, তা বই, দণ্ডবিধির প্রতি ভক্তি যে কিরূপ পদার্থ তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। নিয়মের প্রতি ভক্তি না বলিয়া কাণ্ট্ বলিতে পারিতেন অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি ভক্তি। কিন্তু কাণ্ট্ ধর্ম্ম-নিয়মের গোড়ায় প্রকৃতিকেও যেমন স্থান দিতে নারাজ—প্রকৃতির অধীশ্বর পরমাত্মাকেও তেমনি স্থান দিতে নারাজ। তিনি বলেন ধর্ম্মের নিয়ম জীবাত্মার স্বনিয়ম Autonomy; পুনশ্চ বলেন যে আপনার নিয়মে নিয়মিত হওয়ার নামই ধর্ম্মের নিয়মে নিয়মিত হওয়া, আর, তাহারই নাম স্বাধীনতা। কাণ্টের এ কথা যদি সত্য হয়—ধর্ম্মের নিয়ম যদি আমার আপনার নিয়ম হয়, তবে তাহার প্রতি আমার ভক্তি যাইবে কেমন করিয়া? পুত্রের প্রতি পিতার ভক্তি যেমন একটা অসঙ্গত কথা, আপনার নিয়মের প্রতি আপনার ভক্তি সেইরূপ একটা অসঙ্গত কথা ইহা কে না স্বীকার করিবে? প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বরের ঐশীশক্তির নামই প্রকৃতি; অন্তর্যামী পুরুষ বলিলে ঈশ্বর এবং ঐশীশক্তি দুইই এক সঙ্গে বুঝায়। আমাদের শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের প্রেরণা, অন্তর্যামীপুরুষের প্রেরণা এবং প্রকৃতির প্রেরণা এ তিনের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই। আর ঐশীশক্তি যেহেতু সমস্তেরই কারণ—তাহার উপরে যেহেতু আর কোনো কারণ নাই, এই জন্য ঐশীশক্তির প্রেরণাকে অহেতুকী প্রেরণা বলিলে কোনো দোষ হয় না, আর সেই অহেতুকী প্রেরণাকে অন্তর্যামীপুরুষের অহেতুকী আজ্ঞা বলিলেও তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারো বিলম্ব হয় না। কিন্তু যে ভাষায় সে আজ্ঞা বিশ্বভুবনে প্রচারিত হয়, সে ভাষা সংস্কৃত ভাষাও নহে, ইংরাজী ভাষাও নহে, জর্ম্মান্ ভাষাও নহে—সে ভাষা হ'চ্চে রজোগুণের প্রবর্ত্তনা বা দুঃখের উত্তেজনা। উদরে যখন ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হয়, তখন সেই অহেতুকী আজ্ঞার বা অহেতুকী প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া জীব অন্ন-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। পরের দুঃখ দেখিয়া যখন আপনার দুঃখ উদ্দীপ্ত হয়, তখন সেই অহেতুকী প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য সেই দুঃখের প্রতিবিধান চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই—অথচ যদি সুখের উদ্দেশে ভূরিভোজনে প্রবৃত্ত হই, তবে সেরূপ কার্য্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকৃতির প্রেরণামূলক নহে; সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে তাহা আমার দুর্ব্বুদ্ধির প্রেরণামূলক। আমার মনে দীন-দরিদ্রের প্রতি লেশমাত্রও দয়া নাই অথচ যদি আমি জাঁকজমকের সহিত দানকার্য্যে প্রবৃত্ত হই তবে সেরূপ কার্য্যও সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকৃতির প্রেরণামূলক নহে, তাহা অহঙ্কারের প্রেরণামূলক। এক কথায় বলিতে হইলে এইরূপ বলাই সঙ্গত যে, ঐ প্রকার নিম্নশ্রেণীর কার্য্য সকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিকৃতির সহেতুকী প্রেরণা অনুসারে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু প্রকারান্তরে বা গৌণ রূপে যাহা মূল প্রকৃতি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার প্রবর্ত্তনাকেও যদি প্রকৃতির প্রেরণা বলা যায়, তবে সেভাবে সবই প্রকৃতির অহেতুকী প্রেরণামূলক। কেননা বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ বিকৃতি আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের অপরোক্ষ কারণ বা সাক্ষাৎ কারণ হইলেও সর্ব্ব স্থলেই মূল প্রকৃতি সকল কার্য্যের মূল কারণ।

এত কথা উঠিল কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের ভেদাভেদের মোটামুটি রকমের একটা আদর্শ শ্রোতৃবর্গের বিবেচনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিবার উদ্দেশে। ভারতে যে সময়ে কপিল মুনি বিরাজমান ছিলেন সে সময়ে নারদ মুনির ঢেঁকি যে চুপ করিয়া ছিল তাহা বোধ হয় না। গ্রীক দেশে যে সময়ে সোফিষ্ট শ্রেণীর তার্কিকদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বে আমাদের দেশের জ্ঞানীমহলেও ঐরূপ একটা ঝড় উঠিয়াছিল—এমন কি ঈশোপনিষদের পাতার মধ্যেও তাহার প্রাবল্যের কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। সে ঝড়ে যেসকল সারবান্ বৃক্ষ হালে নাই টলে নাই তাহাদিগকে লইয়া যোজন-ব্যাপী ছায়া বিস্তার করিয়া মহা প্রকাণ্ড এক বনস্পতি দণ্ডায়মান—ইনি কি কপিল মুনি? ইঁহার চরণে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। কল্পনার স্বপ্নে এইরূপ একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্যের আবির্ভাব কিছুই বিচিত্র নহে। গ্রীকদেশীয় ষ্টোয়িক শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞানীরা দুঃখকে মঙ্গলের বেশে সাজাইয়া দাঁড় করাইবার জন্য বিস্তর আয়াস পাইয়াছিলেন। কপিল মুনি ওরকমের কোনো সাজানো কথার দিক্ দিয়াও যা'ন নাই; তিনি শুধু কেবল সাধকগণের হিতার্থে অকৃত্রিম সত্যের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে বলিলেন যে, দুঃখ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য,—ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায়ই জিজ্ঞাসার বিষয়। আমরা যদি একালের মহাপণ্ডিতগণের কথার ভেল্কিবাজিতে না ভুলিয়া কপিল মুনির ঐ কৃত্রিমতাশূন্য সত্য কথাটির ভিতরে স্থিরচিত্তে প্রণিধান করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, দুঃখের প্রতীকারসাধনই জীবের মুখ্য সাধন—অধিকন্তু যে সুখসাধন বলিয়া একটা কথা আমরা কথোপকথনচ্ছলে সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা প্রকৃতপক্ষে, সাধন বলিতে যাহা আমরা বুঝি ঠিক তাহা নহে। ভূমি চাষ করাই কৃষিকার্য্যের সাধন; কিন্তু শস্যের উৎপাদনকে স্বতন্ত্ররূপে সাধন বলা যাইতে পারে না; কেননা কৃষিকার্য্য সুনিষ্পন্ন হইলেই শস্যরাজি কোনো সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনি উৎপন্ন হয়। চাষ কার্য্যের ন্যায় দুঃখের প্রতীকারই সাধনের মুখ্য অঙ্গ—সুখ-ভোগ শস্যোৎপত্তির ন্যায় প্রকৃতিজাত ফল। তা ছাড়া, কৃষিকার্য্য শস্যোৎপত্তির একটা সহকারী কারণ বই প্রধান কারণও নহে; বিনা কৃষিকার্য্যেও শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ইহা সকলেরই দেখা কথা—যেমন ঘাসের শস্য। আর সে যে অযত্নসুলভ শস্য, তাহা গো-মহিষদিগের পক্ষে সাক্ষাৎ প্রকৃতি মাতার স্তন্য দুগ্ধ। একটি অভিনব বালক সুখ যে কাহাকে বলে তাহার কোনো খবরই রাখে না, অথচ তাহার বারোমেসে সুখ কেমন নির্ম্মল নিষ্কণ্টক এবং স্ফূর্ত্তিযুক্ত। কিন্তু সেই বালকের পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, তখন সে তাহার প্রতীকারচেষ্টায় ব্যস্তসমস্ত না হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। যখন তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়—তখন সে অন্নের জন্য লালায়িত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধপোষ্য বালকের দুঃখনিবারণও সাধনসাপেক্ষ। আপনারই বা কি, আর অন্যেরই বা কি, চাষারই বা কি, আর রাজারই বা কি, পণ্ডিতেরই বা কি, আর মূর্খেরই বা কি, দুঃখ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। দুঃখ নিবারিত হইলে সুখ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, সুখের জন্য স্বতন্ত্ররূপে সাধন করিবার প্রয়োজন নাই। তা শুধু না—লজ্জাবতী লতার পত্রাবলী যেমন নিকটাগত ব্যক্তির স্পর্শ সহে না, সুখ তেমনি ভোক্তাপুরুষের লক্ষ্য সহে না; সুখের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিলেই সুখ মাথা হেঁট করিয়া ভূতলে নিপতিত হয়।

কর্ম্মশীল চাষাভুষাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, স্বাস্থ্য বলিয়া যে পায়ে শিকলি দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার মতো একটা পক্ষী আছে, তাহা তাহারা মূলেই জানে না। ভোগী শ্রেণীর রাজা রাজড়াদিগের অস্বাস্থ্যের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ঐ বনের পাখীটিকে তাঁহারা পিঞ্জরে পুরিয়া তাহাকে ঘড়ি ঘড়ি জারক ঔষধ এবং পুষ্টিকর অন্নপানীয় এত পরিমাণে খাওয়ান যে, দুই দিনেই তাহার প্রাণবধ হইয়া যায়। এই সকল রাজা রাজড়ারা—বিশেষতঃ ইউরোপ অঞ্চলের রাজকীয় নাচমজলিসের অধিনায়কেরা সুখের সাধনে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া তাহার ফল কি পান? ইংরাজেরা যাহাকে বলে Satiety এবং আমরা যাহাকে বলি অতৃপ্তি অরুচি এবং অবসাদ তাহাই তাঁহারা লাভ করেন। এ রোগের একমাত্র ঔষধ হচ্চে সুখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দুঃখনিবারণের উপায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া; তাহা হইলে ভোগ এবং কর্ম্ম দুয়ের সামঞ্জস্যের দ্বার দিয়া সুখ অলক্ষিত ভাবে আসিয়া তোমার ঘরের লোক হইয়া যাইবে; তাহার পরিবর্ত্তে তুমি যদি সুখকে জোড়হস্তে সাধ্যসাধনা করিয়া ঘরে আনিতে চেষ্টা কর তবে সুখ তোমার উপরে এমনি রুষ্ট হইবে যে, সে জন্মেও তোমার ঘরের চৌকাট মাড়াইবে না। সুখের উপাসনা এবং সাধ্যসাধনার পরিবর্ত্তে রাজা রাজড়ারা যদি নগর পল্লীর পথঘাট পরিষ্কার করাইয়া পুরবাসীদিগের রোগ-শোকের মূলোচ্ছেদ করেন—পুষ্করিণী খনন করাইয়া পল্লীগ্রামস্থ দীন দুঃখিগণের জলকষ্ট নিবারণ করেন—যথা যথাস্থানে পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া পথিকগণের পথকষ্ট নিবারণ করেন—চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দীন দরিদ্রগণের রোগ প্রতীকারের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখেন—লোকের অজ্ঞান এবং কুসংস্কার নিবারণের জন্য বিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত করেন—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র লোকদিগের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্মালয় উন্মুক্ত করেন—তাহা হইলেই তাঁহাদের রাজভোগ এবং রাজকার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়া দাঁড়ায়, আর, সেই সামঞ্জস্যের দ্বার দিয়া পরমানন্দ অনাহূত আসিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পথ পায়; তা বই প্রতিহারী পদাতিক দ্বারা তাহাকে ডাকাইয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাজা রাজড়ারা কাঙালের কথায় কর্ণপাত করিবার পাত্র নহেন—সুতরাং দুঃখ তাঁহাদের ললাটে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। রাজা রাজড়াদের অপেক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সজ্জনেরা অনেক পরিমাণে সুখী। মনে কর একটি সামান্য শ্রেণীর গৃহস্থ ব্যক্তি যথানিয়মে কাজ কর্ম্ম করে খায় দায় থাকে। যৎস্বল্প অর্থ যাহা সে উপার্জ্জন করে তাহাতেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারের ভরণপোষণ এবং বাসাচ্ছাদনাদি কার্য্য দিব্য নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়। একদিকে যেমন অল্লায়াসেই তাহার দুঃখনিবৃত্তি হয় আর একদিকে তেমনি সে অল্পেতেই সুখী হয়। তাহার সুখভোগ এবং কর্ম্মোদ্যম দুয়ের মধ্যে এইরূপ দিব্য সৌসামঞ্জস্য। সে সুখে আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে যে সুখে আছে এ কথা অন্যে বলে—সে আপনি তাহা বলে না। সে বলে "আমি অতি দীন দুঃখী—আমাকে প্রত্যহ দশটা থেকে চারিটা পর্য্যন্ত গাধার মতো খাটিতে হয়—তা নহিলে আমার সংসার চলে না।" সে যে সুখে আছে একথা তাহার নিজের মনে আমল পায় না এই জন্য, যেহেতু দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না। আর, সে যে বলিল "আমাকে প্রত্যহ গাধার মতো খাটিতে হয়" এটা তাহার অত্যুক্তি; কেননা গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন তাহার হাতে কোনো কাজ না থাকে তখন সে গ্রীষ্মতাপে যত না ছট্‌ফট্ করে—ভোজনান্তে শয্যায় গা ঢালিয়া তা অপেক্ষা দ্বিগুণবেগে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে—দিনের মধ্যে হাই তোলে বিশ ত্রিশ বার, আর বলে "ছুটি ফুরাইলে বাঁচি।" প্রকৃত কথা এই যে, যাহাতে তাহাকে পথের ভিখারী হইতে না হয় তাহার প্রতিবিধানের কর্ত্তব্যতাই তাহার কর্ম্ম-চেষ্টার গোড়ার প্রবর্ত্তক। এই জন্য প্রতিদিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময় পরিহার্য্য দুঃখের প্রতিই তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয়, তা বই, সে যে যথাবিহিতরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সুখে আছে তাহার প্রতি তাহার লক্ষ্যই হয় না। নিম্নশ্রেণী লোকের সুখভোগের পরিসর যেমন স্বল্পায়ত, তাহার দুঃখনিবারণোপযোগী কর্ম্মচেষ্টারও পরিসর সেইরূপ স্বল্পায়ত। জনসমাজে মস্তকশ্রেণীর লোকদিগের ভোগের পরিসর যেমন সুবিস্তীর্ণ, তাঁহাদের দুঃখনিবারণক্ষম

কর্ম্মচেষ্টার পরিসরও সেইরূপ সুবিস্তীর্ণ। রাজার সংসারও যেমন বৃহৎ রাজ্যও তেমনি বৃহৎ, এই বৃহৎ সংসার এবং বৃহৎ রাজ্যের দুঃখমোচনের জন্য আকবর সাহের ন্যায় উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে রাজভোগ এবং রাজকার্য্যের মধ্যে সৌসামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না; আর সেই সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলেই সুখের আগমন-দ্বারে কপাট পড়িয়া যায়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দুঃখনিবারণোপযোগী কর্ম্মচেষ্টা ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখকে নাগাল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এটাও একটা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবার বিষয় যে, দুঃখ নিবারণের চেষ্টা না করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদি সুখের আরাধনা এবং সাধ্যসাধনা করা যায়, তাহা হইলে সুখ অচিরে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাই বলেন যে দুঃখই—রজো-গুণই—কর্ম্ম-চেষ্টার প্রবর্ত্তক; আর, যেমন কাঁটা দিয়া কাটা বাহির করিতে হয়, তেমনি কর্ম্ম-দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করা যায়। যাহারা মনে করেন যে, নৈষ্কর্ম্যই আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জীবনের আদর্শ ছিল—দুই ছত্র গীতার পাতা উল্টাইলেই তাহাদের সে ভুল জন্মের মতো ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা একটি গুরুতর কথার পর্য্যালোচনায় এখনো হাত দেওয়া হয় নাই—সে কথা এই যে, কপিল মুনি বলিতেছেন—ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ভিন্ন সামান্য রকমের দুঃখনিবারণ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে ফলদায়ক নহে। এ কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি তাহা আগামী-বারে বলিব, আজিকার মতো এ যাত্রা বলিলাম এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৌনবিকাশ

ওগো আজিকে তোমারি আঙিনার কোলে
মুকুল মেলিল আঁখি!
পলিব কোলে সে কোথা হ'তে এল
স্বর্গ-সুষমা মাখি'!
এনেছে সে শোভা এনেছে গো হাস,
অঙ্গ ভরিয়া সৌরভরাশি;
তাহারি রূপের মাধুরি হেরিয়া
কুহরি' উঠিছে পাখী!
ওগো সে এসেছে যে,
তারে আরতি করিয়ে নে;
বনের দুলাল দুয়ারে তোমার
তাহারে লহ গো ডাকি'।
চোখে কত কথা করে ফুটি-ফুটি,
মু'খানিতে কত হাসি লুটোপুটি,
কত ফাগুনের কাহিনী এনেছে
ওগো, সে শুনিবি না কি?
কিরণ দোলায় সে
মৃদু বায়ুভরে দুলিছে,
ঘনপল্লব সিন্ধু-লহরে
মুকুতার ছবি আঁকি'!
কত কথা যেন চাহে সে সুধাতে,
কি বারতা যেন এনেছে শুনাতে,
ধূলি-পিঞ্জর খুলি' কৌতুকে
এসেছে মৌন পাখী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

একটি গান যখনি ধরা যায় তখনি তার রূপ প্রকাশ হয় না—তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সমে ফিরে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কি এবং তার অন্তরাটা কোন্‌দিকে গতি নেবে সে কথা চিন্তা করবার সময় আসে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা একটা সমে এসে দাঁড়িয়েছে; তার আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁচেছে। যে-মস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে

বসেছিল—ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই যে আঘাত দেবার কাজ, এ একটা সমে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে—হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

এই চেষ্টা একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, এই চেষ্টা নানা ঘাত প্রতিঘাত ও সত্য মিথ্যার ভিতর দিয়ে ঘুরে নানা শাখা প্রশাখার পথ খুঁজতে খুঁজতে আপন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। এই চেষ্টার অনেক রূপ দেখা যাচ্চে যার মধ্যে সত্যের মূর্ত্তি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাচ্চেনা—কিন্তু তবু যেটি প্রধান কাজ সেটি সম্পন্ন হয়েছে,—হিন্দুসমাজের চিত্ত জেগে উঠেছে।

এই চিত্ত যখন জেগেছে তখন হিন্দুসমাজ আর ত অন্ধভাবে কালের স্রোতে ভেসে যেতে পারেনা—তাকে এখন থেকে দিক্‌নির্ণয় করে চল্‌তেই হবে, নিজের হালটা কোথায় তা তাকে খুঁজে নিতেই হবে। ভুল অনেক করবে কিন্তু ভুল করবার শক্তি যার হয়েছে ভুল সংশোধন করবারও শক্তি তার জেগেছে।

তাই বল্‌ছিলুম ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভের কাজটা সমে এসে সমাপ্ত হয়েছে। সে নিদ্রিত সমাজকে জাগিয়েছে। কিন্তু এইখানেই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরিয়েছে? যে পথিকরা পান্থশালায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের দ্বারে আঘাত করেই কি সে চলে যাবে—কিম্বা জাগরণের পরেও কি সেই দ্বারে আঘাত করার বিরক্তিকর অভ্যাস সে পরিত্যাগ করতে পারবে না? এবার কি পথে চলবার কাজে তাকে অগ্রসর হতে হবেনা?

নিরুদ্ধ উৎসের বাধা দূর করবার জন্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাটি খোঁড়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাজটা বিশেষভাবে আমারই। সেই খননকরা কূপটাকে আমার বলে অভিমান করতে পারি—কিন্তু যখন খুঁড়তে খুঁড়তে উৎস বেরিয়ে পড়ে, তখন কোদাল ফেলে দিয়ে সেই গর্ত্ত ছেড়ে বাইরে উঠে পড়তে হয়। তখন যে ঝরণাটা দেখা দেয় সে যে বিশ্বের জিনিষ—তার উপরে আমারই শিলমোহরের ছাপ দিয়ে তাকে আর সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে ধরে রেখে দিতে পারি না। তখন সেই উৎস নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে—তখন আমরাই তার অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও এইরকম দুই অধ্যায় আছে। যত দিন বাধা দূর করবার পালা, ততদিন আমাদের চেষ্টা, আমাদের কৃতিত্ব; ততদিন আমাদের কাজ চারিদিক থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, এমন কি, চারিদিকের বিরুদ্ধ, ততদিন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত তীব্র।

অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছন যায় যেখানে বিশ্বের মর্ম্মগত চিরন্তন সত্য-উৎস আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিষ সকলেরই জিনিষ—সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে নিজেকে তারই অনুবর্ত্তী করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্প্রদায় তখন কূপের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার লক্ষ্য পরিবর্ত্তন হয়, তখন তার বোধশক্তি নিখিলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করে, পদে পদে আপনাকেই তীব্রভাবে অনুভব করে না।

ব্রাহ্মসমাজ কি আজ আপনার সেই সার্থকতার সম্মুখে এসে পৌঁছে নিজের এতদিনকার সমস্ত ভাঙাগড়ার চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্তক্ষেত্রের মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় নি?

অবশ্য, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক্ থেকে আমাদের একটা আশ্রয় দিয়েছে সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্ব্বে আমাদের ভক্তিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বহুদিনব্যাপী দুর্গতিপ্রাপ্ত দেশের নানা খণ্ডতা ও বিকৃতির মধ্যে যথার্থ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশবদ্ধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল, তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের

বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়ল। সেই সঙ্কটের সময়ে অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বুদ্ধিকে ও ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেসে যেতে দেয়নি।

সাম্প্রদায়িক দিক থেকেও দেখা যেতে পারে ব্রাহ্ম সমাজ আঘাতের দ্বারা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের বহুতর কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করেছে এবং বিশেষ ভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে আমরা উপাসনা করে আনন্দ পাচ্চি এবং সামাজিক কর্ত্তব্যসাধন করে উপকার পাচ্চি এইটুকুমাত্র স্বীকার করেই থাম্‌তে পারিনে। ব্রাহ্মসমাজের উপলব্ধিকে এর চেয়ে অনেক বড় করে পেতে হবে।

এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয় সাধনের বর্ত্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্ম্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনি প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনি আপনার সকলের চেয়ে সত্যসাধনাকেই, ব্রহ্মসাধনাকেই, নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

মুসলমানধর্ম্ম প্রবল ধর্ম্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম্ম নয়। এই ধর্ম্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহুশতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল, তখনকার ধর্ম্ম-ইতিহাস আমরা দেখ্‌তে পাইনে। কারণ সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই মুসলমান অভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখ্‌লে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমানধর্ম্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি, হয়, আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয়, আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক, রবিদাস, কবীর, দাদূ প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করচেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম্মইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ সম্বন্ধে কি রকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমানধর্ম্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এই জন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক তার মর্ম্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।

আজ আবার পাশ্চাত্যজগতের সত্য আপনার জয়ঘোষণা করে ভারতবর্ষের দুর্গদ্বারে আঘাত করেছে। এই আঘাত কি আত্মীয়ের আঘাত হবে, না, শত্রুর আঘাত হবে? প্রথম যেদিন সে শৃঙ্গধ্বনি করে এসেছিল সেদিন ত মনে করেছিলুম সে বুঝি মৃত্যুবাণ হানবে। আমাদের মধ্যে যারা ভীরু তারা মনে করেছিল ভারতবর্ষের সত্য-সম্বল নেই অতএব এইবার তাকে তার জীর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হল বুঝি।

কিন্তু তা হয় নি। পৃথিবীর নব আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহুদিনের অবরুদ্ধ দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ভারতবর্ষের সাধন-ভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে—ভয় নেই, কোনো অভাব নেই—এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দভোজে পূর্ব্ব পশ্চিম এক পংক্তিতে বসে যাবে।

ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন সাধনার দ্বার-উদ্‌ঘাটনই ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য। অনেক দিন দ্বার রুদ্ধ ছিল, তালায় মরচে পড়েছিল, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইজন্যে গোড়ায় খোলবার সময় কঠিন ধাক্কা দিতে হয়েছে, সেটাকে যেন বিরোধের মত বোধ হয়েছিল।

কিন্তু বিরোধ নয়। বর্ত্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনো এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার সকল জটিলতার যথার্থ সমাধান করে দেবে এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্রকণ্ঠে আজ ফুটে উঠ্‌চে।

ব্রাহ্মসমাজকে, তার 'সাম্প্রদায়িকতার' আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয় তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

ব্রহ্মের উপলব্ধি বল্‌তে যে কি বোঝায় উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,—
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এই মোটা কথাটা বলে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়—এ একটি পরিপূর্ণ বোধের কথা। অগ্নি জল তরুলতাকে আমরা ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য আমাদের চিত্ত তাদের নিতান্ত আংশিক ভাবেই গ্রহণ করে—আমাদের চৈতন্য সেখানে পরমচৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আহ্বান করচে। জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র জানা নয়, সর্ব্বত্র নমস্কার করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রসই হচ্চে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই রসের বিচ্ছেদ না রাখা, সমস্তকেই ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা; জীবনের এমন পরিপূর্ণতা, জগদ্বাসের এমন সার্থকতা আর কি হতে পারে!

কালের বহুতর আবর্জ্জনার মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে জিনিষ ত একেবারে হারিয়ে যাবার নয়। তাকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কেননা এই ব্রহ্মসাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখ্‌লে মনুষ্যত্বের কোনো একটা চরম তাৎপর্য্য থাকে না—সে একটা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান অন্তহীন ঘূর্ণার মত প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষ যে সত্যসম্পদ পেয়েছিল মাঝে তাকে হারাতে হয়েছে। কারণ, পুনর্ব্বার তাকে বৃহত্তর করে পূর্ণতর করে পাবার প্রয়োজন আছে। হারাবার কারণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অপূর্ণতা ছিল—সেইটিকে শোধন করে নেবার জন্যেই তাকে হারাতে হয়েছে। একবার তার কাছে থেকে দূরে না গেলে তাকে বিশুদ্ধ করে সত্য করে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হারিয়েছিলুম কেন? আমাদের সাধনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমাদের সাধনার মধ্যে অন্তর ও

বাহির, আত্মার দিক ও বিষয়ের দিক্ সমান ওজন রেখে চল্‌তে পারেনি। আমরা ব্রহ্মসাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলুম—তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম—তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে পর্য্যন্ত একেবারে পরিহার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্য্যাপ্ত করে তুল্‌তে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল, ভক্তি তখন বিচিত্র কর্ম্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত্ত সৃষ্টি করেছে।

যে জিনিষ জড় নয় সে কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে টিক্‌তে পারে না, আপনার বাইরে তাকে আপনার খাদ্য খুঁজ্‌তে হয়। জীব যখন খাদ্যাভাবে নিজের চর্ব্বি ও শারীর উপকরণকে নিজে ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে তখন সে কিছুদিন বেঁচে থাকে কিন্তু ক্রমশই নীরস ও নির্জ্জীব হয়ে মারা পড়ে।

আমাদের জ্ঞানবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তি কেবল আপনাকে আপনি খেয়ে বাঁচতে পারে না—আপনাকে পোষণ করবার জন্যে রক্ষা করবার জন্যে আপনার বাইরে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জ্জন করে নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল—এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিতে নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে ব্যর্থ করে তুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উল্টো দিকে চল্‌ছিল। সে বিষয়রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে অহরহ ঘুরে ঘুরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্তূপাকার করে তুলছিল—তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো ঐক্য ছিল না। তার ছিল কেবল সংগ্রহের লোভেই সংগ্রহ, কাজের উত্তেজনাতেই কাজ, ভোগের মত্ততাতেই ভোগ।

কিন্তু এই বিষয়ের বৈচিত্র্যরাজ্যে য়ুরোপ গভীরতম চরম ঐক্যটি পায়নি বটে, তবু তার সর্ব্বব্যাপী একটি বাহ্য শৃঙ্খলা সে দেখেছিল। সে দেখেছে সমস্তই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে পরস্পর অবচ্ছিন্ন বাঁধা;—কোথায় বাঁধা, কার হাতে বাঁধা—এই সমস্ত বন্ধন কোন্‌খানে একটি মুক্তিতে একটি আনন্দে পর্য্যবসিত য়ুরোপ তা দেখেনি।

এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্ব্বাসিত করে রাখেননি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্বইতিহাসে বিশ্বধর্ম্মে বিশ্বকর্ম্মে সর্ব্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনি উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতি দূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারিদিকে রাজত্ব করছিল আচার-বিচার-বাহ্যঅনুষ্ঠান এবং ভক্তি-রস-মাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্ম সাধনকে পুঁথির অন্ধকারসমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠ্‌ল এ আমাদের আপন জিনিষ নয়, এ আমাদের বাপ পিতামহের সামগ্রী নয়, বলে উঠ্‌ল এ খৃষ্টানি, এ'কে ঘরে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না। শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্য-গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায় তখনই ব্রহ্ম সকলের সুদূর, এমন কি, সকলের চেয়ে

বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এদিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করচে। কিন্তু সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্চে, আপনার চেয়ে বড়কে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্ম্মের ক্ষেত্র পৃথিবী জোড়া, এবং সেই উপলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূর বিস্তৃত। কিন্তু তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল "আমি", তার মন্ত্র ছিল জোর যার মুলুক তার; সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তি দেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউবা বলে স্বাজাত্য, কেউবা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউবা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউবা বলে মানবদেবতা, কিন্তু কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখ্‌তে চেষ্টা করে, এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আস্‌চে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চল্‌চে—কিন্তু একথা একদিন জান্‌তেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না;—প্রয়োজনবোধকে যত বড় নাম দেও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড় সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোলো এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই, শেষ পর্য্যন্ত কিছুই টিক্‌তে এবং টেকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুল্‌তে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাত-বেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুল্‌তে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্ব্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্ত্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্চে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনো দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকান্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু কখনই শুষ্ক হয়নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্ম্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি—কিন্তু তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোট করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি, যেন বুঝতে পারি যেন নিষ্কলঙ্ক তুষার-স্রুত এই পুণ্য স্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়চে এবং ভবিষ্যতের দিক্‌প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করচে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা! অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা! এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্ম্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্য্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্ত্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী!*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাগ্যচক্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এত দ্বিধা ও সঙ্কোচ সত্ত্বেও অত্যন্ত সহজ ভাবে তাঁহাদের বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল—তাহা যেন তাঁহাদের সম্মতি বা বাধার কোনো অপেক্ষা রাখিল না। এক বন্ধুর সাহায্যে ফ্র্যাঙ্কের এখন ভালো চাকরি জুটিয়াছে;

* ১২ই মাঘে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

—ইভাও মায়ের সম্পত্তি পাইবেন—অর্থের দিক দিয়া আর কোনো ভাবনার কারণ রহিল না।

এখন প্রতি রবিবারের সমস্ত দিনটা ফ্র্যাঙ্ক ইভাদের বাড়িতে কাটান—সেইখানেই আহারাদি করেন। তাঁহার সেই যে বিমর্ষ ভাব তাহা এখনো কাটে নাই—তিনি সর্ব্বদাই কেমন চুপ করিয়া থাকেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর প্রায়ই তাঁহারা দুই জনে অনেকক্ষণ নিরালায় কাটাইতেন। সে সময়টা প্রথম প্রথম নানারূপ আলোচনায় একরকম কাটিয়া যাইত—ইভা যেন কি-এক সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া অসীম উৎসাহ ও আশার সহিত ভবিষ্যৎ জীবনের মধুর কল্পনা ফ্র্যাঙ্কের চোখের সামনে চিত্রিত করিয়া তুলিতেন, ফ্র্যাঙ্কও তাহাতে মাঝে মাঝে সায় দিয়া যাইতেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই যেন তাঁহাদের মধ্যে একটা বিমর্ষ নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল—শেষে এমন হইয়া পড়িল যে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত চলিয়া যায় কাহারো মুখে কোনো কথা নাই, কোনো ভাষা নাই, কেবল উভয়ের হাতের উপর উভয়ে হাত রাখিয়া শুধু এক অসীম শূন্যতার পানে চাহিয়া থাকেন। হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে সে চমকও ভাঙিয়া যায়—হাত শ্লথ হইয়া আসে—আর সাহস হয় না আবার সে হাত চাপিয়া ধরিতে;—সাহসা বার্টির সেই মৃত্যুবিবর্ণ রক্তাক্ত মূর্ত্তি তাঁহাদের দুজনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়—অমনি বাহুবন্ধন টুটিয়া যায়, সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে! ইভার তখনই মনে হয় যেন তিনিও সেই পাপকাজের সহকারিতা করিয়াছেন। সেই চিন্তা সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ঘনাইয়া উঠিয়া এমনি বুকের কাছে ঠেলিয়া আসে যে মনে হয় যেন এখনই নিশ্বাসরোধ হইয়া আসিবে! তখন তাঁহারা ঘরের জানালা খুলিয়া দেন—শরীর শীতল করিবার জন্য জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া মুক্ত বাতাসের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন—চোখের সামনে সন্ধ্যার ধূসরতা জমিয়া উঠিতে থাকে;—ইভা সেই অন্ধকারের মধ্যে, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে ফ্র্যাঙ্কের বুকের উত্থান পতনের শব্দ শুনেন!

হায়, এখন সত্যই একটা ভয় তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে! এত ভালবাসা, এত প্রেম—তবু একটা আতঙ্কে ইভার প্রাণ শিহরিয়া উঠিত! ফ্র্যাঙ্ক খুন করিয়াছেন! খুন! রাগের মাথায় এমন কাজও তিনি করিতে পারেন। কী ভয়ানক!

না, না—তিনি নিষ্ঠুর নন;—তেমন অবস্থায় পড়িলে কে না সে কাজ করিত! তাঁহার দোষ গুরুতর নয়—নয়। তবে কেন ভয়? এমনি করিয়া ইভা নৈরাশ্যের মধ্য হইতে আশার পানে চাহিয়া বুক বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইয়া যাইত। ফ্র্যাঙ্ককে তিনি এত ভালোবাসেন, এত শ্রদ্ধা করেন—কিন্তু হায়, তবুও সেই যে কেমন একটা ভয় তাহা কিছুতেই যেন যায় না!

রবিবারগুলা এখন আর তেমন মধুর নয়—তাহার স্মৃতি লইয়া সমস্ত সপ্তাহটা এখন আর স্বপ্নের মতো কাটে না,—এখন রবিবারের নাম মনে আসিলেই আতঙ্কে বুক শুকাইয়া যায়—ইভা এখন ভয়ে ভয়ে রবিবারের প্রতীক্ষা করেন। এই শুক্র, এই শনি—বাপরে! আবার সেই রবিবার! ঐ ফ্র্যাঙ্ক আসিতেছেন;—ঐ শুনা যায় তাঁহার পদধ্বনি! অমনি বুক দুর দুর করিয়া উঠে! এত ভয় কিন্তু তবুও তো তাঁহার উপর ভালোবাসা কম হয় না!

এমনি ভয় লইয়া একদিন সন্ধ্যা বেলা তাঁহারা দুইজনে হাতে হাত রাখিয়া বসিয়া আছেন—কাহারো মুখে কোনো কথা নাই—উভয়ে নিস্তব্ধ। সমস্ত প্রকৃতিও আজ স্তব্ধ! যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের অপেক্ষা করিতেছে। আকাশ ভরিয়া মেঘ। ইভা আজ বড় বিষণ্ণ—প্রকৃতির এই বিমর্ষ ভাব তাঁহার বিষণ্ণতাকে তাঁহার আকুল নৈরাশ্যকে ক্রমশই বাড়াইয়া তুলিতেছে—তাঁহার প্রাণের মধ্যেও যেন একটা তুমুল ঝড় উঠিবার উপক্রম হইতেছে। আর পারিলেন না—একটা সান্ত্বনার জন্য ইভা উচ্ছ্বসিত হইয়া ফ্র্যাঙ্কের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—ভয়ের বাধা আর রহিল না। ফ্র্যাঙ্কের বুকে মুখ লুকাইতে তাঁহার রুদ্ধ অশ্রুর উৎস যেন খুলিয়া গেল!

তারপর তিনি গুমরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আর পারিনা ফ্র্যাঙ্ক! প্রকৃতির এ রুদ্র ভাব আর সয় না—আমাকে বড় কাতর করে তোলে। ঐ কালো কালো মেঘ দেখলে আমার প্রাণ যেন আঁৎকে ওঠে। ফ্র্যাঙ্ক, চল এ দেশ ছেড়ে পালাই—এ অন্ধকারে আর বাঁচিনে—চল ইটালি—সেখানে তবু আলো আছে, আলো!"

ফ্র্যাঙ্ক ইভাকে বুকের মধ্যে কেবল চাপিয়া ধরিলেন—সান্ত্বনার কোনো কথা কহিতে পারিলেন না। ইভা সে নীরবতা দেখিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন, কান্নার স্বরে বলিতে লাগিলেন—"ওগো অমন চুপ করে থেকোনা—কথা কও, কথা কও।"

ফ্র্যাঙ্ক ইভার এ কাতর আহ্বানে চেষ্টা করিয়াও তেমন উৎসাহের সহিত সাড়া দিতে পারিলেন না—শুধু বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—"হাঁ, আমারও এ জায়গাটা ভালো লাগে না।"

তাহার পর আবার সব নিস্তব্ধ। কেবল একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতা ইভার বুকের মধ্যে গুমরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি আকুল ভাবে ফ্র্যাঙ্কের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! এ দুর্গতি আর বহন করতে পারিনে—সেই কবে থেকে আরম্ভ হয়েচে—মনে আছে তোমার? সেই মলডির ঝড়, ঝঞ্ঝা, অন্ধকার!—সে ঝড় ঝঞ্ঝা অন্ধকারের যেন শেষ নেই! প্রকৃতির সে রুদ্রতা যেন সেই দিন থেকে আমার বুকের উপর চেপে বসে আছে। সেই দিন থেকে আকাশের ঐ কালো মেঘ দেখলেই মনে হয় যেন প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়েছে! সেই দিন থেকে আমার শরীরও ভেঙেচে—সেই যে ভিজে বাড়ি ফিরলুম তাইতেই কেমন ঠাণ্ডা লাগে—প্রথমে বুঝতে পারিনি, কাউকে সে কথা বলিনি কিন্তু সেই থেকেই আমার শরীর ক্ষয় হচ্ছে—এত দিন ধরে—"

ফ্র্যাঙ্ক কোনো কথা কহিলেন না। মল্‌ডিতে কি যেন একটা করুণ ঘটনা ঘটিয়াছিল তারই একটা ছায়া মনে জাগিতেছিল—কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে পড়িতেছিল না।

ফ্র্যাঙ্ককে তখনও চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ইভার বুক নৈরাশ্যের আকুলতায় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না—উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয়টা এই চারিদিককার স্তব্ধতায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—বুকের মধ্যে একটা উদ্দাম স্পন্দন জাগিয়া উঠিল।

চিত্তটা স্থির করিয়া লইবার জন্য ফ্র্যাঙ্ক কপালের উপর ধীরে ধীরে একবার হাত বুলাইয়া লইলেন। তাহার পর মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—"হাঁ ইভা! তোমাকে একটা কথা বলব বলব মনে করচি—আজই এখনই বলতে চাই।"

ফ্র্যাঙ্কের কথার স্বরের অস্বাভাবিকতায় ইভা চমকিয়া উঠিলেন। অশ্রুর অন্তরাল হইতে অবাক হইয়া ফ্র্যাঙ্কের পানে চোখ তুলিয়া চাহিলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন—"কি কথা ফ্র্যাঙ্ক?"

—"কথা বড় গুরুতর—একটু মন দিয়ে শুনবে?"

—"বল। শুনব।"

—"আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। বলচি কি, তোমায় আমি যদি মুক্তি দি তাহলে ভালো হয় না কি?"

ইভা কথাটা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না—অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন—"কেন ও কথা বলচ?" তাঁহার ভয় হইতেছিল বুঝিবা ফ্র্যাঙ্ক তাঁহার মনের আতঙ্কের কথা টের পাইয়াছেন।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"কেন বলচি? তোমার মঙ্গলের জন্যই বলচি। আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন জড়িত করবার আমার কোনো অধিকার নেই। আমি এখন ভগ্ন, জীর্ণ, স্থবির—আর তোমার তরুণ বয়স!"

ইভা মনের উৎকণ্ঠায় ফ্র্যাঙ্ককে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল তাঁহার যাহা কিছু আপনার আছে সব আজ হারাইতে বসিয়াছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"না, না। সে কথা শুনতে চাই না। আমিও তোমারই মতো জীর্ণ; ভগ্ন। আমি তোমার চিরদিনের দাসী—কেন আমায় পায়ে ঠেলচ? তোমারই সেবায় আমার জীবন ধন্য হবে। তুমি যখন ভগ্নোৎসাহ হবে—আমি তোমায় উৎসাহ দেব—তোমার চোখে যখন জল আসবে আমিই সে জল মোছাব—তোমার সকল দুঃখ সকল ব্যথা আমি বুক পেতে নেব—ফ্র্যাঙ্ক!

সে কী সুখ! সে কী আনন্দ! কী গভীর প্রেমে আমাদের জীবন কাটবে।"

ইভার কথাগুলি ফ্র্যাঙ্কের ব্যথিত চিত্তে যেন পদ্মহস্ত বুলাইয়া গেল। তন্দ্রার মতো একটা মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ইভারও হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল—ফ্র্যাঙ্কের মনে আশার সঞ্চার করিতে গিয়া আবার যেন তাঁহার সেই সব হারানো সুখস্বপ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল: না, না, যায় নাই—সে সুখের দিন আসিবে। ফ্র্যাঙ্ককে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন—যাহা হয় হোক! তাঁহাকে তিনি মুহূর্ত্তের তরে ছাড়িতে পারেন না—সেই তাঁহার জীবন—সেই তাঁহার আশা!

ফ্র্যাঙ্ক আবেগকম্পিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ইভা! তুমি অসীম করুণাময়ী! কিন্তু এত করুণার উপযুক্ত আমি নই। ভালো করে বিবেচনা করে দেখ—কথার কথা বলে উড়িয়ে দিওনা। ভেবে দেখ আমার হাতে পড়লে হয়ত তোমার অশেষ দুর্গতি হবে—জীবন মরুময় হয়ে উঠবে—এখনও সময় আছে—ভবিষ্যৎ জীবন এখনও আমাদের হাতে। এই বেলা ভালো করে ভেবে দেখ। আমি তো পারি না, কিছুতেই পারি না—এতেই তোমার জীবন আমি অসহ্য করে তুলেচি তার উপর তোমায় গ্রহণ করে আর তোমার দুঃখ বাড়াতে চাইনে। আমার কোনো ক্ষোভ নেই তুমি অনায়াসে তোমার কথা ফিরিয়ে নিতে পার।"

—"ওগো না, না, আমি ফিরিয়ে নিতে চাইনে।" বলিয়া ইভা কাতরধ্বনি করিয়া উঠিলেন—"আমি সে কিছুতেই পারব না। কেন তুমি এসব কথা বলচ? আমি বুঝতে পারচিনা।"

ফ্র্যাঙ্ক সস্নেহে ইভার হাতখানি ধরিয়া তাঁহার মুখের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"কেন বলচি? কারণ—কারণ এখন আমাকে তুমি ভয় কর।"

বৈদ্যুতিক স্পন্দনের মতো একটা বেদনা ইভার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। তিনি পাগলের মতো উদাস দৃষ্টিতে ফ্র্যাঙ্কের পানে চাহিলেন, প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"না, না—ভয় করি না। শপথ করে বলচি ভয় করি না। কে বল্লে ভয় করি। কেন তুমি এ সন্দেহ করচ? আমার কী দেখে তোমার এ কথা মনে হচ্চে? বিশ্বাস কর ফ্র্যাঙ্ক! আমি কথা দিচ্ছি—শপথ করে বলতে পারি তোমার সন্দেহ মিথ্যা—মিথ্যা! আমি ভয় করিনে।"

"হাঁ, হাঁ তোমার ভয় আছে।" ফ্র্যাঙ্ক ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন—"আমি বুঝতে পেরেচি তুমি ভয় কর—সেটা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু তবুও আমি বলি ভয়ের কোনো কারণ নেই, ইভা। আমি তোমার কাছে শিশুর মতো সরল, শান্ত, নিরীহ। আমাকে তুমি যেমন চালাবে তেমনি চলব—তোমার উপর আর কখনো আমার রাগ হবেনা;—সে রাগ আমার গেছে। তোমার পায়ের তলায় এখন পড়ে থাকতে পেলে শুধু তোমার মুখের পানে চেয়ে নীরবে জীবনটা কাটিয়ে দিই।" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক ইভার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া তাঁহার কোলে মাথাটি রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ইভা বলিতে লাগিলেন—"তবে ফ্র্যাঙ্ক, ভয় কিসের? তাই যদি হয় তবে কেন আমি ভয় করতে যাব? কেন তবে তুমি আমায় মুক্তি দেবার কথা বলচ?"

"কেন বলচি? তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারিনা—আমি বুঝতে পারচি আমারই জন্যে তোমার জীবন অসুখী!—সে খেদ আমি আর বহন করতে পারিনা। আমার বিশ্বাস তোমাকে যদি মুক্তি না দি—আমার সঙ্গে জড়িত করে রাখি তাহ'লে চিরজীবনের মতো তোমার দুঃখের অন্ত থাকবেনা।"

ইভার বুকের ভিতরটা দুর দুর করিতে লাগিল—সমস্ত দেহ যেন অবশ হইয়া আসিল। দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে তেমনি করিয়া সুস্পষ্ট ভাবে সকল ঘটনাগুলা তাঁহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

ইভা গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া স্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"শোনো ফ্র্যাঙ্ক! আমি যা বলি ভালো করে শোনো। আমার কিছুতেই মনে হয় না যে আমরা আরও দুঃখ পাব—যা কপালে ছিল তা হয়ে চুকেবুকে গেছে। এমন কী করেচি যার জন্যে চিরজীবনটাই আমাদের একটা গুরুতর শাস্তি বহন করতে হবে? কিছু না!

আমি আবার বলি—কিছু না। তবে কেন আমাদের জীবনটাকে নষ্ট হতে দিচ্ছ? হাঁ স্বীকার করি, আমি এক সময় তোমাকে সন্দেহ করেছিলুম, কিন্তু তার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করেচ—ব্যস, সে সব চুকে গেছে। বার্টিকে তুমি বন্ধু বলে জানতে, শেষে প্রকাশ হল সে একটা ঘোর বদমায়েস—তোমার সর্ব্বনাশ করেচে তাই তাকে হত্যা করলে। ব্যস, সেও চুকে গেছে। তার জন্যে আবার ভাবনা কিসের! যা হয়ে গেছে তার সঙ্গে সম্পর্ক কি? আমার জীবনের কোনো খানে তার কোন স্থান নেই। এই তো ব্যাপার! ফ্র্যাঙ্ক! ভেবে দেখ—এ সব কথা ভালো করে বিবেচনা করে দেখ—কল্পনায় দুঃখকে বাড়িয়ে তুলে জীবনটা দুঃখময় কোরো না। যা হয়েছে তা বিশেষ কিছু নয়। এখনও আমাদের শক্তি আছে—বয়স আছে—সত্যই আমরা বুড়ো হইনি। আবার আমরা নূতন করে জীবন আরম্ভ করতে পারি—চল এদেশ ছেড়ে চলে যাই—নূতন দেশে গিয়ে নূতন পথে জীবনের গতি ফেরাই। নূতন জীবন! ফ্র্যাঙ্ক, নূতন জীবন! হে আমার স্বামী, আমার দেবতা, আমার প্রিয়তম, আমার সর্ব্বস্ব!” বলিয়া ইভা ফ্র্যাঙ্কের মাথাটি বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন—তাঁহার চক্ষু দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—অমন যে পাংশুবর্ণ মুখ তাহাতে ক্ষণেকের তরে রক্তাভা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের চোখের পানে চোখ পড়িতে শিহরিয়া উঠিলেন, দেখিলেন তাঁহার সে কী উদ্বিগ্ন দৃষ্টি!

—“তুমি মানবী নও ইভা, তুমি দেবী! আমার মতো নরাধম তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করবার যোগ্য নয়। আমার পাপের অন্ত নেই। শোনো সত্য কথা।”

“কী সত্য কথা?”

—“বার্টি বদমায়েস নয়। সে সাধারণ লোক—দোষ তার সে দুর্ব্বলচিত্ত। সত্য কথা এই...শোনো ইভা—আমাকে বলতে দাও। আমি অনেক করে ভেবে দেখেচি—কারাগারে বসে বার বার করে আলোচনা করেচি—মরবার সময় আত্মরক্ষার জন্য সে যে সব কথা বলেচে সে সব আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তলিয়ে দেখেচি—তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে সে যা বলেচে তা সত্যি!”

“সত্যি! ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! আত্মরক্ষার জন্য সে কী বলেচে তা আমি জানিনা—কিন্তু এখনও আবার সেই বার্টি! সেই বার্টির প্ররোচনা এখনও আমাদের মিলন ভাঙবার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে—হা অদৃষ্ট!” বলিয়া ইভা নৈরাশ্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

—“না ইভা তা নয়! ভুল কোরোনা। বার্টির প্ররোচনা আমাদের মিলন ভাঙচেনা—মিলন ভাঙচে আমার পাপ!”

—“তোমার পাপ?”

—“হাঁ, আমার পাপ! সে আমাকে কিছুতেই ভুলতে দিচ্চেনা আমি কী কাজ করেচি;—দিনরাত মনে জাগিয়ে রেখে দিয়েচে—আমি ভুলতে পারচিনা, কিছুতেই পারচিনা! বার্টি অন্তিমকালে যা বলেছে তা মিথ্যা নয় ইভা, তা মিথ্যা নয়। সত্যই সে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। তার কোনো দোষ নেই। সে বলত এতটুকু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে সে জন্মাতে পারেনি—সে কি তার দোষ? সে যেসকল অপকর্ম্ম, হীনকাজ করেচে তার জন্যে সে নিজেকে আন্তরিক ঘৃণা করত। কিন্তু তবুও সেসব না করে পারেনি—কি করবে? না করলে যে উপায় ছিল না—অন্যরূপ করবার যে তাহার শক্তি ছিল না। আহা বেচারা সহায়হীন! আমি তাকে ক্ষমা করেচি—তার দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করেচি। কে না দুর্ব্বল? আমরা সবাই দুর্ব্বল—আমিও ত দুর্ব্বল!”

ইভা চীৎকার করিয়া বলিলেন—“হোক! কিন্তু তুমি হলে তো তেমন কাজ কখনো করতে না।”

—“না, তা করতুম না বটে—আমার প্রকৃতি অন্যরূপ। কিন্তু তবুও আমি দুর্ব্বল। আমার যখন রাগ হয় তখন আমার মত দুর্ব্বল কেউ নয়। সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই—সে কথা সত্য! সেই জন্যই তো তার অনুতাপে আমি দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমি এখন জীর্ণ, ভগ্ন—তোমার স্বামী হবার উপযুক্ত নই। হায়! আবার যদি বার্টিকে ফিরে পেতুম! এক সময় তাকে ভায়ের মতো ভালোবাসতুম—এখন আবার তাকে সেই রকম ভালোবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে—তার সব দোষ আমি ক্ষমা করেচি।”

ইভা বলিয়া উঠিলেন—“ফ্র্যাঙ্ক! নির্ব্বোধের মতো তুমি এ কী বলচ? এ তোমার ছেলেমানুষি! পাগলামি!”

—ফ্র্যাঙ্ক একটু করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—

"না ইভা, এ পাগলামি নয়, এই হচ্ছে জীবনের সত্য কথা!"

ইভা কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"হোক্ জীবনের সত্য কথা! আমি সে সব বুঝিনা। আমি অমন ভালোমানুষ নই। যে আমাদের জীবনের সুখ নষ্ট করেচে সেই দুরাত্মাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। আমি তাকে ঘৃণা করি—সে মৃত হলেও আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। কেন ঘৃণা করব না? সে মরেও আমাদের নিস্তার দেয়নি, তার স্মৃতি এখনও আমাদের পশ্চাতে দিন রাত ফিরে আমাদিগকে উত্যক্ত করে তুলেচে—তার প্ররোচনার ইঙ্গিতে এখনও তুমি কাজ করচ। কিন্তু সে হবেনা—হবেনা—আমি সে কিছুতেই করতে দেবনা!" বলিয়া ইভা মনের আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে ছিলা ছিঁড়িয়া গেলে ধনুক যেমন সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে তেমনি করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ফ্র্যাঙ্ককে দুই বাহু দিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি আর তোমাকে কিছুতেই ছাড়বনা। তুমি যদি জোর করে যেতে চাও—এই রইলুম ধরে, যাও দেখি?—এইখানে দাঁড়িয়ে দিনরাত তোমাকে আঁকড়ে থেকে দুজনে মরব, তবু ছাড়বনা—কিছুতেই তাকে দেবনা আমাদের পৃথক করতে। বেশ করেছ তাকে খুন করেছ। তুমি না মারলে আমি তাকে এমনি করে গলা-টিপে মারতুম।" বলিয়া ইভা হাত দুখানার এমনি ভঙ্গি করিতে লাগিলেন যেন সত্যই তাহার গলা টিপিতেছেন।

তখন বাহিরে রাত্রির অন্ধকার অল্পে অল্পে ঘনাইয়া আসিতেছিল।

ফ্র্যাঙ্ক ধীরে ধীরে নিজেকে ইভার বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া সমস্ত দেহের দ্বারা অবলম্বন দিয়া পতনোন্মুখ ইভাকে ধরিয়া রাখিলেন—অত্যধিক উত্তেজনায় তাঁহার দেহ অবশ হইয়া আসিতেছিল। তিনি ভয়ব্যাকুল দৃষ্টিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পানে চাহিয়া তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক ইভাকে ধরিয়া সোফায় বসাইলেন, তারপর তাঁহার পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়া প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে ডাকিলেন—"ইভা!"

ইভা সে ডাকের সাড়া দিলেন না। মেঘের দিক হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখ, দেখ কী মেঘ! যেন এখনই একটা বন্যায় বিশ্ব ভাসিয়ে দেবে।"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"হাঁ, মেঘ করেছে;—তাতে কি?"

ইভা গুমরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"না, আমি আর সহ্য করতে পারি না—ঐ ঝড় বৃষ্টি মেঘ আমাকে দারুণ পীড়িত করে তোলে। আমার বড় ভয় করচে। ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! রক্ষা কর, আশ্রয় দাও, কাছে সরে এসে।" বলিয়া ইভা ফ্র্যাঙ্ককে কাছে টানিয়া লইয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইতে লাগিলেন।

—"আমার বড় ভয় করচে। ওগো আমাকে ধর—আমাকে ঘিরে রাখ। ঐ এলো! এলো! আমার মাথার উপর পড়তে দিও না, দিও না। হে ভগবান! মিনতি করি, দেখো আমার মাথার উপর যেন না পড়ে!"

ইভা কাল্পনিক বজ্রপাতের ভয়ে আকুল হইয়া চারিদিকে আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন। দুই বাহু দিয়া ফ্র্যাঙ্ককে আঁকড়াইয়া কেবলই তাঁহার বুকের মধ্যে নিজেকে লুকাইতে লাগিলেন। ফ্র্যাঙ্ক কোনো বাধা না দিয়া তাঁহাকে তেমনি করিয়া বুকের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দিলেন।

হঠাৎ কোর্ত্তার পকেটে হাত ঠেকাতে ইভা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কী? পকেটে তোমার এ কী?"

ফ্র্যাঙ্ক ভয়কম্পিতস্বরে বলিলেন—"কৈ কী?"

—"এই যে।"

—"ও কিছু না।" ফ্র্যাঙ্ক আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—"ও কিছু না—একটা শিশি—ও আমার চোখের একটা ওষুধ! কদিন থেকে চোখটা একটু খারাপ হয়েছে।"

ইভা তাড়াতাড়ি সেটা বাহির করিয়া ফেলিলেন—গাঢ় নীল রংএর একটা ছোট শিশি কাঁচের ছিপি আঁটা—কোনো নাম নাই।

—"এ চোখের ওষুধ? কৈ আমি তো জানতুম না তোমার চোখে—"

কথা শেষ হইতে না দিয়াই ফ্র্যাঙ্ক বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ চোখের ওষুধ! দাও ওটা আমাকে।"

ইভা সেটা হাতের মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া

রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"না, এ আমি তোমায় হাতে দিচ্ছিনা। কেন তুমি অত চঞ্চল হচ্চ? ভয় নেই আমি ভাঙব না। এর কি কোনো গন্ধ আছে? আমি একবার খুলতে চাই—কিন্তু পারচি না, ছিপিটা বড় এঁটে গেছে।"

"ইভা! করচ কি! দাও, দাও, ফিরিয়ে দাও।" ফ্র্যাঙ্ক কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"মিনতি করে বলচি, ফিরিয়ে দাও।" বলিতে বলিতে তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিল। তিনি হাত বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"সত্যাই বলচি ওটা আর কিছু নয়—চোখের ওষুধ। কোনো গন্ধ নেই। দাও আমার হাতে। এখনই ছিটিয়ে পড়বে কাপড় চোপড় দাগী হয়ে যাবে।"

ইভা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না; পশ্চাৎ দিকে হাত লুকাইতে লাগিলেন। তারপর জোর করিয়া বলিলেন—"কখনোই না। এ চোখের ওষুধ নয়। তোমার চোখে কিছু হয়নি।"

—"হাঁ—সত্যি"—

—"না! তুমি আমার কাছে গোপন করচ। এ…এ আর কিছু—কেমন, নয় কি?"

—"ইভা! বলচি ফিরিয়ে দাও।"

—"আচ্ছা, চট্ করে কি এর কাজ হয়—না দেরী লাগে?"

—"ইভা! আবার বলচি দাও আমাকে।" ফ্র্যাঙ্ক ইতস্তত করিতে লাগিলেন কি করিবেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

তিনি তাড়াতাড়ি ইভার পিঠের উপর দিয়া হাত দিয়া তাঁহার হাত দুইটা ধরিতে গেলেন—কিন্তু যে হাতটা ধরিলেন সেটা ফাঁকা—ইভা মাথা ডিঙাইয়া তখন শিশিটা ফেলিয়া দিয়াছেন। মেঝের উপর ঝনাৎ করিয়া কাঁচ পড়িবার একটা শব্দ হইল। ফ্র্যাঙ্ক ছুটিয়া কুড়াইয়া লইতে গেলেন—কিন্তু ইভা দিলেন না—দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিলেন। বলিলেন—"থাক ফ্র্যাঙ্ক। কুড়িয়ো না। যাক—ভেঙে গেছে। এখন বল দেখি কেন তুমি ওটা সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিলে?"

"তুমি যা ভাবচ তা নয় ইভা।" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক তখনও নিজেকে সমর্থন করিতে লাগিলেন।

ইভা বলিলেন—"ভালো। তবে শিশিটা কিসের জন্যে?"

ফ্র্যাঙ্ক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে ইভার বারম্বার পীড়াপীড়িতে বলিয়া ফেলিলেন—"পান করতুম—তোমার আমার সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্তে পান করতুম—আজ রাত্রে।"

—"কিন্তু আর তো পারবে না।"

—"কেন? আবার তো কিনতে পারি।"

—"কিন্তু কেন তুমি আমাদের সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে চাও ফ্র্যাঙ্ক?"

—"তোমারই সুখের জন্যে ইভা! আমি এখনও তোমার পায়ে ধরে বলচি ইভা—আমাদের মধ্যে সব শেষ হতে দাও—কোনো বন্ধন আর রেখোনা। তাহ'লে আমি অনুভব করতে পারব যে আমার জন্যে তোমার জীবন আর অসুখী হয়ে নেই। তুমি এখনও সুখী হ'তে পারবে। আমার আশা গেছে—আমার জীবনের প্রত্যেক খুটিনাটি আমাকে সুখী হতে দেবেনা। আমার এই হতভাগ্য জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে কেন মিছে কষ্ট পাও?—আমাকে ত্যাগ কর ইভা, ত্যাগ কর। তা হ'লে তুমি সুখী হ'বে!"

—"না তোমাকে ত্যাগ করতে পারব না—আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়তে পারব না—তুমি যে কথা বল্লে—আজ রাত্রে যে কাজ করবে বল্লে তাতে আমি মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমায় ছেড়ে দিতে পারব না।"

—"কিন্তু কেন তুমি ভাবচ ইভা যে শুধু তোমারই জন্যে আমি সে কাজ করতে যাচ্ছি। দিনরাত্ ও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে—কতবার ভেবেচি চুকিয়ে ফেলি, কিন্তু পারিনি—তোমার কথা মনে হয়েছে আর পারিনি—তুমি যে আমায় ভালোবাস।"

—"শুধু ভালোবাসি! তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমিই আমার জীবন—তুমি না থাকলে আমিও নেই।"

—"না ইভা, আমি না থাকলে তুমি আর কারো সঙ্গে সুখী হতে।"

"কখনো নয়! আর কারো সঙ্গে নয় শুধু তোমারই।

শুধু তোমারই সঙ্গে মিলন—সে তো অন্যরূপ হবার যো নেই—সে যে বিধিলিপি !"

—"আ—বিধিলিপি ! বাটি বলত—"

—"বাটির নাম এনোনা।"

তখন ঘোর বৃষ্টি নামিয়াছে,—ঘরের দরজা জানালায় বাহিরের ঝড় আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

ইভা ভয়জড়িত অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"বাপরে ! এ ঝড়বৃষ্টির কি অন্ত নেই।"

ফ্র্যাঙ্কও যন্ত্রচালিতের মতো বলিয়া গেলেন—"উঃ ঝড় বৃষ্টির অন্ত নেই।"

শুনিয়া ইভা চমকিয়া উঠিলেন—ফ্র্যাঙ্কের মুখের পানে একবার বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—

—"অ্যাঁ, তুমিও একথা বলচ ? কেন ফ্র্যাঙ্ক ?"

—"তাতো জানিনা।" ফ্র্যাঙ্ক চমকিত হইয়া উঠিলেন —যেন কেমন হতভম্ব হইয়া গেলেন, বলিলেন—"তাইতো, কেন বল্লুম ?" বলিয়া পরস্পরে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া দুজনেই অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর ইভা ডাকিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক !"

—"কি ইভা ?"

—"আর আমাকে তুমি ছেড়ে যেতে পাবে না—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও নয়। তোমার জন্যে আমার বড় ভয় হচ্ছে।"

—"না ইভা, আর আমাকে বেঁধনা—আজ এখনই আমাদের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাক !"

—"না, না, না, ওগো না ! তুমি যেয়োনা। এস, আজকের এ মিলনকে আমরা অক্ষয় করে তুলি—যেন এ মিলনে আর মুহূর্ত্তের জন্যেও বিচ্ছেদ না থাকে—ওগো আনো আমাদের নয়নে আজ জীবনব্যাপী তন্দ্রা—পাতো শয়ন—থাকুক বাহিরে ও ঝড় বৃষ্টি !"

—"ইভা !"

—"বেশ দুজনে থাকব ! তুমি তো বল্লে তোমার জীবনের সমস্ত সুখ গেছে—আর ফিরে পাবে না—আমারও তো তাই ! তা যাক্—আমাদের ভালোবাসা তো আছে। নেই কি ফ্র্যাঙ্ক ?"

—"আছে বই কি ইভা।"

—"তবে আর কেন আমরা এ দুঃখের মাঝে জেগে থাকি ফ্র্যাঙ্ক ! দাও আমাকে একটি চুম্বন—তোমার কোলে মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর তুমিও ঢুলে পোড়ো।"

"এ সব কী বলচ ইভা !" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক জড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইভার কথা তিনি ভালো বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

ইভা উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"সে শিশিটা আমি ভেঙেচি—কিন্তু আবার তো তুমি আনতে পার ?"

ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত শরীরটা শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কেন ইভা ? এসব কী বলচ ?"

ইভা ফ্র্যাঙ্কের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন —তাঁহার চোখে মুখে আনন্দের একটা উজ্জ্বলতা খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কের গলাটি দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"দুজনের বুকে দুজনে মাথা রেখে মরা—সে কী আনন্দ ফ্র্যাঙ্ক ! কী ফল এ জীবন রেখে ? ঠিক বলেচ তুমি—এ জীবনে আর তুমি সুখী হতে পারবে না—আমিও পারব না। তবে কেন এ জীবন ? চল এ জীবনকে দুজনে অতিক্রম করে যাই—তারপর আছে অবিচ্ছিন্ন মিলন। সেই বেশ ! ভয় কি ? দুজনের বুকে দুজনে মাথা রেখে মরব ! তার চেয়ে আনন্দের কী আছে ? কয়েক ফোঁটা বিষ ! দুজনে এক সঙ্গে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দেব—তারপর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে মৃত্যু ! মৃত্যু ! মৃত্যু ! সে কী আনন্দ ! কী আনন্দ !"

ফ্র্যাঙ্ক শুনিতে শুনিতে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"না, ইভা, না। এমন কথা মনেও এনো না।"

ইভা ফ্র্যাঙ্কের পায়ের তলায় পড়িয়া মিনতির স্বরে বলিতে লাগিলেন—"দুটি পায়ে পড়ি ফ্র্যাঙ্ক ! বাধা দিয়ো না—আমাদের এ সুখে তুমি বাধা দিয়ো না। ভেবে দেখ দেখি, তার চেয়ে আমাদের কী আনন্দ হতে পারে—আমাদের এই মিলনে চারিদিক সূর্য্যাস্তের মতো গোলাপী রঙে ভরে উঠবে—সোনায় রূপায় ঝলসে উঠবে। এর

চেয়ে সৌন্দর্য্য আর কী চাও? ফ্র্যাঙ্ক সেই তো সুখ, সেই তো আনন্দ—জগতের লোক তো এই মিলনই আকাঙ্ক্ষা করচে—এই ভো স্বর্গ!”

ইভার উচ্ছ্বাসবাণী তখনও ফ্র্যাঙ্ককে টলাইতে পারিতেছিল না—কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইভার কথায় তাঁহার একটা লোভ আসিতেছিল—এ জীবনের পরপারে সে কী দৃশ্য ইভা দেখাইতেছেন! সেখানে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণ যে আপনি পাগল হইয়া উঠে! আর তাঁহার বাধা দিবার কোনো শক্তি রহিল না—কল্পনা স্বর্গের দিকে উড়িয়াছে কাহার সাধ্য বোধ করে! বরং ইচ্ছা হয় নীল আকাশে গা ভাসাইয়া সেইদিকে ছুটি!

ইভা ফ্র্যাঙ্ককে আর কোনো বাধা দিতে না দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। যেখানে শিশিটা পড়িয়াছিল কে যেন সেইখানেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গেল। তিনি নত হইয়া সেইটা উঠাইয়া লইলেন। শিশিটা জানালার পর্দ্দার উপর পড়িয়াছিল—সেই জন্য ভাঙে নাই—এক ফোঁটাও নষ্ট হয় নাই।

ইভা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন—“দেখ, দেখ ফ্র্যাঙ্ক! ভাঙেনি—অটুট রয়েছে। ভাগ্যচক্রের লীলা—নইলে ভাঙেনি কেন?”

ফ্র্যাঙ্কও দাঁড়াইয়া উঠিলেন—তাঁহার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া শিরায় শিরায় একটা কম্পন বহিয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিপি খুলিয়া ইভা অর্দ্ধেক শেষ করিয়া ফেলিলেন—তাঁহার অধরপ্রান্ত একটা আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ফ্র্যাঙ্ক চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“ইভা! ইভা!!”

ইভা কোনো কথা কহিলেন না—শুধু হাত বাড়াইয়া শিশিটা ফ্র্যাঙ্কের হাতে তুলিয়া দিলেন,—তাঁহার চিত্তে এতটুকু উদ্বেগ নাই—মুখে হাসির রেখা! ফ্র্যাঙ্ক অবাক হইয়া তাঁহার পানে চাহিলেন—তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহারা আর এজগতের নহেন—সেই স্বর্গের পথে এরই মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছেন! ফ্র্যাঙ্ক চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, মনে হইল বিশ্বের মাঝে কেহ কোথা নাই শুধু ইভা পাশে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন! আর বিলম্ব নয়—ফ্র্যাঙ্ক এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন—।

তখন ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝে দুজনে পাশাপাশি কণ্ঠ জড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তের জন্য চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ফ্র্যাঙ্কের বুকের স্পন্দনও সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে মিলাইয়া গেল। ইভা মাথা তুলিয়া চাহিলেন—তখন বাহিরে ভয়ঙ্কর ঝড় বহিতেছে—তাঁহার অন্তরের ভিতরও মৃত্যুর তুমুল ঝড় উঠিয়াছে! একবার বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে বজ্রশব্দ! সেই শব্দ কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিতে ছুটিতে ভয়ঙ্কর রবে ক্রমেই ইভার মাথার উপর আসিতে লাগিল।—যেন মৃত্যুর দূত শূন্যতার উপর দিয়া ভৈরব আনন্দে ছুটিয়া আসিতেছে!

ইভা মৃত্যুকাতর কণ্ঠে গুমরিয়া উঠিলেন—“ঐ আসচে! হা ভগবান, এখনও বজ্রনিনাদ!” বলিতে বলিতে অবসন্ন হইয়া ফ্র্যাঙ্কের বুকে ঢুলিয়া পড়িলেন!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘরের পাশে অন্ধকার পথে শুনা গেল কাহার ক্ষীণ চঞ্চল পদধ্বনি—কম্পিত কণ্ঠ হইতে দুইবার মাত্র শব্দ উঠিল—“ইভা, ইভা!” অমনি এক ঝটকা বাতাসে দ্বার খুলিয়া গেল কাহারো কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না—কেবল ঘরের মধ্য হইতে একটা হায় হায় শব্দ বাহির হইয়া আসিল! (সমাপ্ত)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রবাসী

(ওকুরা হইতে)

খাওয়া পরা দেখ্‌ছি হ’ল ভার,
ছেলের মুখ কেবল মনে পড়ে;
তাদের কথা বল্‌চ কিবা আর,
দূরে থেকেও সঙ্গ নাহি ছাড়ে!
খাওয়া পরা সকল দিছি ছেড়ে,
ছেলেগুলো সব নিলরে কেড়ে!

চোখের আগে সদাই বেড়ায় তারা,
চুরি ক’রে দু’টি চোখের ঘুম;
কি হ’বে আর আমার মাণিক হীরা?
কি হ’বে আর চন্দন ও কুঙ্কুম?
তারা যে মোর মাণিক হীরার সেরা,—
হর্ষকুসুম হাসিরাশি ঘেরা!

মিকাডোর নূতন খাতা

নূতন কবিতা পড়িয়া নূতন বৎসর আরম্ভ করা জাপান রাজদরবারের একটি প্রাচীন প্রথা। পূর্ব্বে, রাজা, রাণী এবং জাপানের বনিয়াদী বংশের শিক্ষিত লোকেরাই এই উপলক্ষে দরবারে একত্র হইয়া নিজ নিজ নূতন রচনা আবৃত্তি করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান মিকাডোর আমলে এই নিয়মের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন ইতরসাধারণের রচনাও রাজসভায় পঠিত হয়, এমন কি পুরস্কৃতও হইয়া থাকে। নববর্ষের একমাস পূর্ব্বে কবিতার বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দরবার হইতে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়; এবং এই বিজ্ঞাপনের ফলে প্রতি বৎসরেই চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কবিতা আসিয়া হাজির হয়। কোনো একজন লোকের একটির বেশী কবিতা পাঠাইবার নিয়ম নাই।

মিকাডোর খাস আমলাদের খাটুনি এই সময়ে অত্যন্ত বাড়িয়া ওঠে; তাহারা এই পঞ্চাশ হাজার কবিতার মধ্য হইতে বাছিয়া গুছিয়া হাজারখানেক কবিতা মিকাডোর সভাকবির কাছে পাঠায়। তিনি আবার এই হাজার কবিতার ভিতর হইতে বাছাই করিয়া মোট দশটি কবিতা মিকাডোর কাছে পাঠাইয়া দেন। শেষ যাচাই মিকাডোর হাতে।

নববর্ষে কবিতার দরবারে প্রথমে সম্রাটের স্বরচিত একটি কবিতা নিপুণ পাঠকের দ্বারা তিনবার পঠিত হয়; তাহার পর সম্রাজ্ঞীর কবিতা—তাহাও তিনবার পড়া নিয়ম। তাহার পর খ্যাতনামা কবিদের রচনা ও সর্ব্বশেষে সাধারণের শ্রেষ্ঠ দশটি রচনা মিকাডোর নির্দ্দেশ মত গুণানুসারে একবার করিয়া পঠিত হয়। যে কবিতাগুলি পঠিত হয় তাহার সকলগুলিই ক্রমশঃ গীত হইয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

এই সমস্ত কবিতা পাঁচ পংক্তির অধিক দীর্ঘ হইবার নিয়ম নাই; য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে জাপানী সনেট নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; জাপানী ভাষায় এগুলিকে "তান্‌কা" বলে। তান্‌কার পাঁচ পংক্তিতে সাধারণতঃ একত্রিশটি মাত্রা থাকে। নিম্নে নমুনাস্বরূপ দুইটি প্রাচীন তান্‌কার ইংরাজী অনুবাদের তর্জ্জমা দেওয়া গেল। ছন্দ, মাত্রা এবং ভাব সমস্তই বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

(১)

কুয়ার দড়িটি
বেড়িয়া ঝুম্‌কালতা
বেড়েছে নিশীথে;
আমি তৃষার্ত্ত হেথা,
জল ভিখ্ মাগি কোথা!

(২)

নিথর রাত্রি,
ফুট্‌ফুটে জ্যোৎসনা!
আকাশ-যাত্রী
হাঁসগুলি যায় গোণা!
পেঁজা মেঘে পাখা বোনা!

এইরূপ ছোট ছোট গীতিময় চিত্রে, ভাবের ফোটো-গ্রাফে জাপানী সাহিত্য উৎপূর্ণ। জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট এইরূপ সাত আট লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছেন।

জাপানী কবিতা জাপানী শিল্পের মত অনুভবের সামগ্রী; ইহা ইঙ্গিতে অনেকখানি বলে, ফুটিয়া বলে অল্পই। প্রাচ্য শিল্পচেষ্টার বিশেষত্বই এইখানে। একজন জাপানী কবি পাঁচ পংক্তির একটি তানকায় যে কথায় একটু আভাস মাত্র দিয়াই ভাব-সৌন্দর্য্যের গভীরতায় মন ভরিয়া তুলিতে পারেন, একজন পাশ্চাত্য কবি ঠিক সেই বিষয়টুকু অবলম্বন করিয়া লম্বা সনেট লিখিতে বসিয়া যান্; জিনিষটাও 'জলো' হইয়া ফিঁকা হইয়া একেবারে মাটি হইয়া যায়। ফোটা ফুলে ও মুকুলে যে তফাৎ ইহাদের মধ্যেও ঠিক সেই তফাৎ। এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। একবার একজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক জাপানের একজন শিল্পীকে জাপান শিল্প সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করেন। তাহাতে জাপানী ভদ্রলোকটি বলেন যে, তৎপূর্ব্বে তিনি নিজে সাহেবকে একটি প্রশ্ন করিতে চাহেন; সাহেব যদি ঐ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনিও সাহেবের সকল প্রশ্নের উত্তর আনন্দের সহিত দিতে সমর্থ হইবেন, নচেৎ নহে। সাহেব স্বীকৃত হইলে শিল্পী উহাঁকে দেওয়াল-সংলগ্ন একখানি ছবি দেখাইয়া উহার দিকে দশ মিনিট কাল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে অনুরোধ করিলেন, এবং ঐ সঙ্গে

ইহাও বলিয়া রাখিলেন যে এই দশ মিনিট কাটিলেই তিনি সাহেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন।

সাহেবকে যে ছবিখানি দেখিতে বলা হইয়াছিল তাহার উপরের কোণে দ্রাক্ষাস্তবকাবনম্র একটি আঙুরের শাখা এবং নীচের আর এক কোণে একটা শৃগালের মাথার কেবল পিছন দিকটা দেখানো হইয়াছে। ছবির বাকী অংশ শুধু নীলাম্বিত মেঘের বর্ণবিলাসে পরিপূর্ণ।

দশ মিনিট কাটিয়া গেলে শিল্পী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি শেয়ালের সমস্ত শরীরটা দেখিতে চান?" সমঝদার সাহেব বলিলেন "না, কোনো প্রয়োজন নাই; দর্শক ভাবুক হইলে তাহা কল্পনা করিয়া লইতে পারিবেন।" সাহেবের এই উত্তরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শিল্পী বলিয়া উঠিলেন "তবে তো আপনি প্রাচ্য শিল্পের একটা মূলতত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন; এখন বোধ হয় অতি সহজেই আমি আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইব।"

কবিতা ও চিত্রের মত সঙ্গীতেও জাপানীরা রাখিয়া ঢাকিয়া ভাবপ্রকাশের পক্ষপাতী, একটু আভাস দিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে মজবুত। শোনা যায় জাপানের কোনো কোনো ধর্ম্মোৎসবে "মৌন কন্‌সার্ট" বা "নীরব নহবৎ" নামে একটা অনুষ্ঠান আছে। এই সমস্ত পর্ব্বে যন্ত্রীরা যন্ত্র লইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত বাজাইবার অভিনয় করে মাত্র, বাজায় না। একটুও আওয়াজ শোনা যায় না, ইহারা বলে শব্দ শোনা গেলে আরাধনার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়। তবে "নীরব নহবৎ" অবশ্য সকল পর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় না এবং মিকাডোর নূতন খাতায় কেবল নীরব কবিদের রচনাই পুরস্কৃত হয় না।

প্রতি বর্ষে পণ্ডিত, ছাত্র, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, সৈনিক, সওদাগর, দোকানী, কারিগর সকলেই কবিত্বের এই বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়া থাকে। শুধু পুরস্কারের লোভেই যে দোকানী পসারী পর্য্যন্ত কবিতা লিখিতে বসে তাহা নয়। এই চিরপরিচ্ছন্ন, সৌন্দর্য্যপ্রিয় প্রজাপতির মত সুদর্শন জাতিটির পক্ষে সাহিত্য-সঙ্গীত-চর্চ্চা অত্যন্ত স্বাভাবিক; রসাত্মক বাক্যের ব্যবসায় ইহাদের মজ্জাগত। এক সময়ে ভারতবর্ষেও এইরূপ ছিল; তাই, সংস্কৃত নাটকে সাধারণ লোকের কথাবার্ত্তার মধ্যেও এত শ্লোকের ছড়াছড়ি; রাজা রাজড়ার তো কথাই নাই। কালিদাসের মত নিপুণ কবি যে কেবল কবিতা রচনার বাহাদুরী দেখাইবার জন্যই নাটকের যেখানে সেখানে শ্লোক জুড়িয়া দিয়াছেন একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; এরূপ করিবার কারণ এই, যে, কাব্যের চাষ ভারতবাসীর তখন প্রকৃতিগত ছিল এবং এইরূপ কথায় কথায় শ্লোক রচনা ও আবৃত্তি করা তখনকার সমাজে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার বলিয়াই গণ্য হইত। ইহা প্রাচ্য সভ্যতার লুপ্তপ্রায় বহু নিদর্শনের অন্যতম। লোভে পড়িয়া গরীব জাপানী নববর্ষের কবিতা লেখে না; কারণ জাপানের মিকাডো আরব্য-রজনীর হারুণ-অর্-রশীদের মত কুশলী কবির মুখগহ্বর মুক্তা দিয়া ভরিয়া দেন না। শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য জাপানের রাজদরবার হইতে যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহার মূল্য খুব বেশী নয়।

সাহিত্য-চর্চ্চার হাওয়া জাপান দেশে আজকাল জোরেই বহিতেছে। মিকাডোর আম্‌লারা পর্য্যন্ত কাব্য-পরীক্ষায় নিপুণ তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। উহারা বাংলা দেশের আম্‌লাদের মত ষত্বণত্ব বিবর্জ্জিত সাহিত্য-সঙ্গীত-কলাবিহীন অমানুষ "গদাই পাল" মাত্র নহে।

ভারতবর্ষে, জাপানের মত সাহিত্য-চর্চ্চার হাওয়া রাজদরবার হইতে বহিবার সম্ভাবনা নাই। আর বহিলেই বা কি? আমরা লাট সাহেবের আমলাদের কাছে আবেদন নিবেদন করিতে পারি, দরখাস্ত-পিটিশান্ পেশ্ করিতে পারি, কিন্তু প্রাণ ধরিয়া কবিতা পাঠাইতে পারি না, এমন কি ভারতীয় সদস্যদের কাছেও না, মাননীয় মহাশয়দের কাছেও না। "অরসিকেষ্" ইত্যাদি "মা লিখ মা লিখ।"

অবশ্য বাংলা দেশের মাসিকের মিকাডোরা নূতন খাতার অনুষ্ঠান করেন এবং সেজন্য কবিদের কাছে তাগিদও পাঠান হয়; এ অবধি ঠিক জাপানের মিকাডোর মত বটে। কিন্তু, ঐ খানেই দাঁড়ি। পাওনাদার দোকানীও নূতন খাতা উপলক্ষে মিষ্টান্ন দিয়া মিষ্টমুখের ব্যবস্থা করে, কিন্তু, মাসিকের মিকাডোদের নূতন খাতায় মিষ্ট হাসির অতিরিক্ত অন্য কোনো ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

যদি আমাদের এই মত "মোদকখণ্ডিকা" বা তাদৃশ কোনো সর্ব্বজনসম্মত প্রাচীন ন্যায়সূত্রের সাহায্যে কেহ খণ্ডন করিতে পারেন তবে আনন্দের সহিত তাহা পত্রস্থ করা যাইবে

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নবীন সন্ন্যাসী

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীশিক্ষার পরিণাম।

সে রাত্রে শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রমথনাথ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মোহিতকে কেমন লাগল?"

সুশীলা গম্ভীর ভাবে বলিল—"একটু ঝাল।"

প্রমথ সহসা মুখখানি শঙ্কাকুল করিয়া, পত্নীর চিবুক ধরিয়া, তাহার অধরপ্রান্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সুশীলা বলিল—"কি দেখা হচ্ছে?"

স্ত্রীর চিবুক ছাড়িয়া একটু পিছু হটিয়া, মাথাটি বিষণ্ণভাবে ঝুঁকাইয়া প্রমথ বলিল—"খেয়ে ফেলেছ? এত লুচি পোলাও ক্ষীর সন্দেশ খেয়েও তৃপ্তি হল না? শেষে আমার বন্ধুটিকে খেয়ে ফেল্লে? এখনও দুই কসে রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে! হায় হায়!"

সুশীলা এ কথা শুনিয়া হাসিয়া লুটাইতে লাগিল। চাবির গোছাসুদ্ধ অঞ্চলাগ্রভাগ তাহার স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত হইয়া চেয়ারের নিম্নে পড়িয়া গেল। বস্ত্র সম্বরণ করিয়া কোপযুক্ত স্বরে বলিল—"আমাকে রাক্ষসী বলা হল? আমি মানুষ খাই?"

"খাওনা যদি তবে ঝাল কি মিষ্টি বুঝলে কি করে?"

"ঝাল বল্লেই কি লঙ্কার ঝাল বোঝায় নাকি মশাই? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ডেপুটিগিরি করবে?"

প্রমথ যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"আঃ বাঁচা গেল। তা হলে আমার বন্ধু বেঁচেই আছে। সে ঝাল নয় ত কি ঝাল বল দেখি?"

"তোমার বন্ধুটি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। যেন শুষ্কং কাষ্ঠং। নোট—এটা রূপকচ্ছলে বলা হয়েছে।"

প্রমথনাথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল—"ওর মনটি যে নীরস, এমন কথা বলতে পারিনে। বরং একটু ভাবপ্রবণ। কিন্তু ওর সে ভাবপ্রবণতা আধ্যাত্মিক বিষয়ে,—ধর্ম্ম সম্বন্ধে। ওর মনটি কঠিনও নয়—তবে সবল বটে। ও যা কর্ত্তব্য বলে মনে করে, কিছুতেই তা থেকে বিচলিত হয় না।"

সুশীলা বলিল—"ওঁর ধারণা, বিবাহ করে সংসারী হলে সেটা অন্যায় কার্য্য হবে—এই ত?"

"তাই বটে।"

"কিন্তু উনি যদি কোনও কুমারীর রূপ গুণ দেখে মুগ্ধ হন?"

"প্রথমতঃ—ওর প্রকৃতি যে রকম, তাতে, ও যে কোনও মেয়েকে দেখে ভালবাসবে,—তা খুব অসম্ভব মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদিই তা হয়, তা হলেও মনের সে ভাবকে একটা অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা জ্ঞান করবে, আর, প্রাণপণ চেষ্টায় মন থেকে সে ভাবকে দূর করে দেবে।"

"যদি না পারেন?"

"যদি তাতেও অকৃতকার্য্য হয়, তা হলে ও নিজেই দূরে চলে যাবে।"

সুশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"অর্থাৎ স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ?"

"আমার বিশ্বাস ও তাই করবে।"

সুশীলা আপন মনে হাসিতে লাগিল। শেষে মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"হুঁ।"

"একটা হুঁ দিয়েই আমার এতগুলো কথার প্রতিবাদ করলে? আমার বন্ধুসম্বন্ধে আমি যা মত প্রকাশ করলাম, তোমার মঞ্জুর হল না?"

"না। তুমি মনে কর, তোমার বন্ধুটি প্রেম নামক ব্যাধি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারেন। আমার বিশ্বাস, পারেন না।"

"পারেন না?"

"না। এই ধর আমাদের চিনি। দেখতে শুনতেও ভাল, স্বভাবটিও বেশ স্নিগ্ধ। তুমি কি ভাব, মোহিত ওকে ভাল না বেসে থাকতে পারে?"

প্রমথ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল "অসম্ভব।

তোমাদের চিনি তোমাদের কাছে যতই মিষ্টি লাগুক—মোহিতের কাছে লাগবে না।"

"আচ্ছা, আমি যদি মিষ্টি লাগাতে পারি?"

"পাগল!—তুমি কি করে মিষ্টি লাগাবে?"

সুশীলা তাহার উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু দুইটি তরঙ্গায়িত করিয়া বলিল—"পারি গো পারি—সে বিদ্যা আমার আছে।"

"তুমি কি যাদুকরী?"

"আমি যাদুকরী কি না আজও তুমি জানতে পার নি?"

প্রমথনাথ স্ত্রীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল—"তুমি যাদুকরীই বটে!—কিন্তু মোহিতের প্রতি তোমার কোন যাদুই খাট্‌বে না। সে যাদু-প্রুফ।"

"যাদু-প্রুফ কি না দেখা যাবে। আমি যদি পারি?"

"কখনই পারবে না। সে বড় কঠিন ঠাঁই।"

"আচ্ছা তুমি দেখো, চিনির প্রেমে তোমার বন্ধুকে হাবুডুবু খাওয়াতে পারি কি না। অবিশ্যি তিনি যদি এখানে কিছুদিন থাকেন।"

"পারবে না।"

"আচ্ছা বাজি রাখ।"

"রাখ।"

"যদি পারি তবে আমায় একটি কটেজ পিয়ানো কিনে দেবে?"

"দেব। যদি না পার, তুমি আমায় কি দেবে?"

সুশীলা হাসিয়া হাসিয়া দুলিয়া দুলিয়া বলিল—"আমি তোমায় একখানি রেশমী রুমাল কিনে দেব।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল—"আহা তুমি কি দাতা! নেবার বেলায় পিয়ানো আর দেবার বেলায় শুধু একখানি রেশমী রুমাল?—আচ্ছা, সে রুমালে করে যদি একরাশ ভালবাসা বেঁধে দিতে পার, তবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

"তা দেব। কিন্তু আমার যাদুবিদ্যা প্রয়োগে, তোমায় সাহায্য করতে হবে।"

"আমি? আমি কি সাহায্য করব?"

"আর কিছু নয়, আমি যখন যা বলব, তোমায় তখন তা করতে হবে।"

"সুন্দরি, এ আর নতুন কথা কি? বিয়ে হয়ে অবধিই ত হুকুমে ওঠাচ্চ বসাচ্চ।"

"এবার শুধু ওঠা বসা নয়। বক্তৃতাও করতে হবে।"

"বক্তৃতা? কি সর্ব্বনাশ!—ডেপুটিগিরি পাবার একটু যা আশা হয়েছে—বক্তৃতা করলেই সে আশা লোপ হয়ে যাবে।"

"এ রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়, প্রেমনৈতিক বক্তৃতা। তাতে হবুডেপুটি বাবুর কোন আশঙ্কার কারণ নেই। আমি যা মৎলবটি করেছি—চমৎকার। একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর সেক্সপিয়ারের যোগ্য।"

"কি মৎলব, শুনি।"

"আমি নানা উপায়ে মোহিতের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে চাই যে চিনি মনে মনে গোপনে তাকে ভালবাসছে। তাতে ফল এই হবে যে মোহিতও চিনিকে ভালবাসতে আরম্ভ করবে। চুম্বক যে শুধু লোহাকে টানে তা নয়, লোহাও চুম্বককে আকর্ষণ করে।"

ইহা শুনিয়া প্রমথ কৌতূহলযুক্ত হইয়া বলিল—"কি করতে চাও?"

"কাল তুমি গিয়ে মোহিতকে কথায় কথায় বলবে, চিনি যে চায়ের এত ভক্ত ছিল, কি কারণে বলা যায় না, সে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে বসেছে চা আর খাবে না।"

প্রমথ শিহরিয়া বলিল—"কি সর্ব্বনাশ!—তুমি আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলাবে? এ ত প্রেমনৈতিক বক্তৃতা নয়—এ যে একেবারে দুর্নৈতিক।"

"না গো মিছে কথা হবে না। আজকে বাবার লেকচারে চিনি ভারি অভিমান করেছে। বলেছে, জন্মে আর চা খাবে না। অবিশ্যি মোহিত বাবু মনে করবেন, তাঁরই সদৃষ্টান্তে চিনি চা পরিত্যাগ করেছে।"

প্রমথ বলিল—"তাঁর মহদৃষ্টান্তে চিনি চা পরিত্যাগ করুক, দুধ চা পরিত্যাগ করুক, ক্রমে কেটলি, চা-দান সকলেই পরিত্যাগ করুক, তা হলে চা বেচারি দাঁড়ায় কোথা? সে যা হোক—আর কি কি ফন্দি করেছ শুনি।"

"দিন দুই পরে বলবে, চিনির কি হয়েছে বলতে পারিনে, রাতদিন কেবল অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবে।"

"এও মিছে কথা হবে। চিনিকে এত শীগ্‌গির কাব্যরোগে ধরবে, এমন ত কোন লক্ষণই নেই।"

"মিছে কথা হবে না, আমি সেটা সত্যি করে দেব।

আমি তাকে খুব শক্ত একটা হেঁয়ালি দিয়ে বলব, একদিনের মধ্যে যদি এর উত্তর বলতে পারিস্, তবে একটা সেলাইয়ের বাক্স পাবি। তোমার কোন কথা মিথ্যা হবে না, সে জন্য ভেব না।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল—"উঃ—রমণীর কি চাতুরী! এই—না আরও কিছু আছে?"

"পরদিন তুমি নিতান্ত সরলভাবে মোহিতের কাছে গল্প করবে, হঠাৎ ছাদে গিয়ে দেখি, চিনি পা ছড়িয়ে বসে আছে, আর কোলের উপর একখানি লাল চামড়ায় বাঁধা খাতা নিয়ে, পেন্সিল দিয়ে কবিতা লিখছে। এমনি ভাবে মগ্ন যে আমার পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত শুনতে পেলে না। পাছে তার চিন্তাস্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়, এই ভয়ে আমি পা টিপে টিপে নেমে এলাম।"

"তুমি বোধ হয় এটা সত্যি করাবার জন্যে তাকে বলবে, কথামালার ঐ বাঘ ও বকের গল্পটা পদ্যে লিখে ফেল?"

"তোমার যেমন বুদ্ধি! বাঘ ও বকের কবিতা লিখলেই হয়েছে আর কি। তা নয়। আমি বলব, তিলোত্তমা যদি কবিতা লিখতে জানত, তা হলে সে রাত্রে মন্দির থেকে ফিরে এসে, ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় বসে বসে, কি লিখত বল দেখি? সুধু মনের ভাবটুকু লিখবি, মানুষের নাম কি স্থানের নাম কি ঘটনার কোনও উল্লেখ, এ সব কিছু থাকবে না। যদি সেই রকম একপাতা কবিতা লিখতে পারিস তবে তোকে একখানা দুর্গেশনন্দিনী প্রাইজ দিই। এই রকম করে বঙ্কিম বাবুর সকল নায়িকার মুণ্ডপাত চিনিকে দিয়ে করাব। আর, মাঝে মাঝে সে খাতাখানি 'ভ্রমক্রমে' যে মোহিতের হাতে গিয়ে পৌঁছবে না, এমন কথা বলতে পারিনে। কিন্তু তুমি লালচামড়ায় বাঁধা খাতা আর পেন্সিলের লেখা কবিতা, এ দুটো উল্লেখ করতে ভুল না। আমার কাছে ঐ রকম একখানি শাদা খাতা আছে সেইখানিই তাকে দেব। তা হলে সনাক্ত সম্বন্ধে মোহিত বাবুর কোন সন্দেহ থাকবে না।"

প্রমথনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল—"এই?—না আরও ফন্দি আছে?"

প্রমথনাথের কণ্ঠস্বরে সুশীলার উৎসাহ বাধা প্রাপ্ত হইল। তথাপি সে বলিল—"আরও অনেক সময় মত বের করা যাবে। একটা ফন্দি ভেবে রেখেছি, করব কি না এখনও স্থির করতে পারিনি। মনে করেছি কবিতা টবিতা মোহিতকে দেখানো হয়ে গেলে, চিনিকে কানে কানে বলব, মোহিতের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। তার ফল এই হবে, মোহিতের দেখা পেলেই চিনির চোখ দুটি নত হয়ে যাবে, গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠবে। চিনি যে মনে মনে মোহিতকে ভাল বাসছে, এ কথা মোহিতের ধ্রুব বিশ্বাস হয়ে যাবে। তুমি কি বল?"

প্রমথনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল—"না, ছি!"

"তোমার মনে হয়, আগে আমি যে সকল ফন্দির কথা বল্লাম, তাই যথেষ্ট?"

প্রমথ পূর্ব্ববৎ বলিল—"না।"

"তবে।"

প্রমথ নীরব। সুশীলা বুঝিল, তাহার এ সমস্ত কৌশল-প্রয়োগ স্বামী পছন্দ করিতেছেন না। তথাপি পরিহাস করিয়া বলিল—"হ্যাগা—তুমি মুখখানি অমন পেঁচার মত করে রইলে কেন?"

প্রমথনাথের মুখ হইতে অন্ধকার অল্পে অল্পে তিরোহিত হইল। স্নেহভরে পত্নীর করযুগল ধারণ করিয়া বলিল—"ছি সুশীলা, ও সব মৎলব ছেড়ে দাও।"

সুশীলা তাহার বিষণ্ণ চক্ষু দুইটি নীরবে নত করিয়া রহিল।

প্রমথ বলিল—"না সুশীলা, সে কি ভাল হয়? আমাদের বোনটি কি বানের জলে ভেসে এসেছে যে তাকে পাত্রস্থ করবার জন্যে এ রকম ঘৃণিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে? ছলনার আশ্রয় আমরা কেন নেব?"

সুশীলা বলিল—"চিনিকে পাত্রস্থ করবার হিসেবেই আমি যে এ ফন্দিটি করতে চেয়েছিলাম, তা ঠিক নয়। বরং খেলার ছলেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি এখন বল্লে বলে আমার মনে হচ্ছে—এ খেলা বাঞ্ছনীয় নয়।"

প্রমথনাথ স্ত্রীর স্কন্ধে স্বীয় হস্তযুগল রক্ষা করিয়া বলিল—"খেলাচ্ছলে? না, সেক্সপিয়রের গল্প পড়ে, কার্য্যতঃ তার পরীক্ষা করবার জন্যে এ খেলা খেলতে চেয়েছিলে?"

"তাও কতকটা বটে।"

"উঃ—স্ত্রীশিক্ষার কি ভীষণ পরিণাম!"—বলিয়া প্রমথ হাসিতে লাগিল।

সুশীলা সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল—"যাও যাও—স্ত্রীশিক্ষার নিন্দে করতে হবে না। আমার এমন মজার খেলাটি তুমি মাটী করে দিলে। আমি বাস্তব জীবনে একটি উপন্যাসের লীলা দেখব মনে করেছিলাম—তোমার জ্বালায় শুধু হতে পেলে না। এমন ঠাণ্ডা মাথাওয়ালা স্বামী নিয়ে ঘর করা এক বিষম দায়।"—বলিয়া সুশীলা হাসিতে হাসিতে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

প্রমথ বলিল—"দেখ, হয়ত ছলনার আশ্রয় না দিয়েও, উপন্যাসের লীলা দেখতে পাবে। যদিও তার আশা খুবই কম। বাস্তবিক চিনিকে দেখে মোহিতের মন যদি আকৃষ্ট হয়, তবে হয়ত সে বিবাহ করতে সম্মত হতেও পারে। কিন্তু একটা আশঙ্কা এই—আগেই বলেছি—যদি মনের মধ্যেও সে রকম কোনও চাঞ্চল্য অনুভব করে—তবে হয়ত পালাবে।"

সুশীলা বলিল—"পালাবে কোথা? এ বাঁধন যদি একবার পড়ে, তবে কি পালিয়ে নিষ্কৃতি আছে; আবার এসে ধরা দিতে হবে। আমি শ্রীমতী সুশীলা দেবী আশীর্ব্বাদ করছি যেন পালাবার অবস্থাই ওর হয়।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চিনি কাহাকেও ভয় করে না।

পরদিন প্রভাতে মোহিত শুনিল, আগামী কল্য গুরুদাস বাবুর জন্মদিন। তদুপলক্ষ্যে কিছু পারিবারিক আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইতেছে। গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে নদীর উপরেই একটি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জঙ্গল আছে। সকলে সেইখানে গিয়া বনভোজন করিবেন। মোহিতকে সঙ্গে যাইবার জন্য গুরুদাস বাবু আগ্রহপ্রকাশ করিলেন। মোহিত সম্মত হইয়াছে—কিন্তু ব্যাপারটা তাহার মনঃপূত হইতেছে না। সে ভাবিতেছে—"এঁদের সবই দেখিতেছি ইংরাজি কাণ্ড কারখানা।"

বেলা ৮টার মধ্যেই দুইখানি গোরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া তাম্বুর সরঞ্জাম ও খানকতক চৌকি টেবিল প্রেরিত হইল। ভৃত্যেরা সেখানে পৌঁছিয়াই তাম্বু খাটাইয়া ফেলিবে। তাম্বু সাজাইবার জন্য একটা সিন্দুক ভরিয়া নানাবর্ণের ধ্বজা পতাকা ও সুতালি দড়ি পাঠান হইল। ঝাউ ও দেবদারু পাতা সেখানেই যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। ওবেলা প্রমথনাথ স্বয়ং গিয়া তাম্বু সাজাইবে।

উভয় বন্ধুতে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ উপস্থিত হইলে মোহিত হাসিয়া প্রমথকে বলিল—"তোমাদের সব ইংরাজি কায়দা দেখছি।"

প্রমথ বলিল—"কতকটা ইংরাজদের অনুকরণ বৈকি; উৎসব করতে ওরা বেশ জানে। বিশেষতঃ ওদের জন্মদিনের উৎসব প্রথাটি আমার বড় সুন্দর লাগে।"

"আমোদ প্রমোদ ছাড়া এ শ্রেণীর উৎসবের আর কোন সার্থকতা আছে?"

"আছে বৈকি। প্রীতির বিনিময়। যদিও কেবলমাত্র আমোদ প্রমোদটুকুও তুচ্ছ লাভ নয়।"

মোহিতলাল মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিল—প্রকাশ্যে কিছু বলিল না। সে ভাবিল—এ "মানবজীবন তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে কাটান কি জীবনের অপব্যবহার করা নয়?"

মোহিতকে নীরব দেখিয়া প্রমথ বলিল—"প্রীতির এই বিনিময় তোমার কাছে সুন্দর বলে মনে হয় না?"

মোহিত বলিল—"উৎসব ভিন্ন কি প্রীতির বিনিময় সম্ভব নয়?"

প্রমথ হাসিয়া বলিল—"তুমি আমায় ভালবাস আমি তোমায় ভালবাসি, এ অনুভূতি—এ ধারণাই যথেষ্ট নয়। মানুষের মন কেবলমাত্র তাতেই সন্তোষলাভ করে না। মাঝে মাঝে এমন একটা উপলক্ষ্য খোঁজে যাতে অন্তরের সেই ভালবাসাকে আকার দান করতে পারে। এ সকল উৎসব, প্রীতির সেই সাকার পূজা।"

মোহিত হাসিল। বলিল—"উত্তম। আমি সাকার পূজার বিরোধী নই।"

অন্যান্য আয়োজন করিতে করিতে স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারাদির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রমথনাথ অশ্বারোহণে সেই জঙ্গলে চলিয়া গেল। তাম্বু খাটান এবং সাজান অদ্য সন্ধ্যার মধ্যেই শেষ করিতে হইবে, কারণ কল্য প্রাতে চা পান করিয়াই নৌকাযোগে

ইহাঁরা যাত্রা করিবেন। সন্ধ্যার পর প্রমথনাথ ফিরিয়া আসিবে।

অপরাহ্নকালে চিনি ও তাহার ছোট ভাই বসন্ত উপরের ঘরে বসিয়া কাঁচি দিয়া রাশি রাশি রঙিন কাগজ কাটিতেছিল। লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী রঙের ঘুড়ির কাগজ—তাহাই কাটিয়া কাটিয়া, বলয়াকারে যুড়িয়া, শিকল প্রস্তুত হইবে। সেই শিকল তাম্বুর ভিতরে ও দ্বারদেশে টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। সুশীলা বসিয়া শিকল নির্ম্মাণ করিতেছিল।

কাগজ কাটা শেষ হইলে কাঁচিখানি আঙ্গুলের মধ্যে দুলাইতে দুলাইতে চিনি বলিল—"আচ্ছা বউদিদি, একটা ইয়ে করলে হয় না?"

"কি?"

"একখানা লাল কি সবুজ কাপড়ে ফুলের মালা গেঁথে দিয়ে,—'MANY HAPPY RETURNS' এই অক্ষরগুলি রচনা করলে হয় না? সেখানি তাঁবুর দরজার সামনে ঝুলবে?"

সুশীলা বলিল—"ওঃ—সে ত বড় চমৎকার হয়। লাল জমির উপর শাদা ফুল বড় সুন্দর মানাবে। তোর মাথায় বেশ বুদ্ধিটি এসেছে ত।"

"কি ফুলের মালা গাঁথা যায় বউদিদি?"

"বেলফুলের কুঁড়ি দিয়ে গাঁথলে বেশ হয়। কাপড়খানি জলে ভিজিয়ে রাখলে রাত্রে কুঁড়িগুলি ফুটেও যাবে। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে—কাল দিনের বেলায় সে ফুল ত সজীব থাকবে না—তার পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়বে।"

চিনি চিন্তিত হইয়া বলিল—"তা হলে কি হয়?"

"তার চেয়ে এক কায করনা কেন। কচি কচি দেবদারু পাতা সেলাই করে অক্ষর রচনা কর্ না। লাল জমির উপর মানাবেও বেশ—মেহনৎও কম—কাল সারাদিন সজীবও থাক্‌বে।"

"তবে তাই করব বউদিদি। কাপড় কোথা পাই?"

"আমার কাছে লাল শালুর একটা টুক্‌রো আছে। সেখানা নিয়ে আসি দাঁড়া।"—বলিয়া সুশীলা উঠিয়া গেল। ক্ষণপরে টুকরাটি হাতে করিয়া আনিয়া বলিল—"লম্বা চৌড়া আছে—বেশ হবে এখন। এইতে পেন্সিল দিয়ে প্রথমে অক্ষরগুলো লিখে নে। আমি বাগানে কাউকে পাঠিয়ে এক ঝুড়ি কচি দেবদারু পাতা আনাই।"

চিনি বলিল—"আমি বরং দেবদারু পাতার চেষ্টা দেখি—তুমি অক্ষরগুলো লেখ। আমার লেখা ত ভাল হবে না—লাইন বেঁকে যাবে।"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁঃ—তোর লেখা বেঁকে যাবে আর আমি বুঝি সোজা লিখতে পারি?"

চিনি আবদার ধরিল—"না বউদিদি—তোমার লাইন সোজা হবে—তুমি বেশ পারবে। তোমায় লিখতেই হবে।"

"না না—সে ছাই হবে। অক্ষর দেখে লোকে হাসবে। তার চেয়ে বরং তোর দাদা আসুন তিনি লিখে দেবেন।"

"তিনি কখন আসবেন! তাঁর আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তখন লিখে দিলে কখন আমি পাতা সেলাই করব? আরও কত কাজ রয়েছে।"

সুশীলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"তা হলে আর হয়না দেখছি।—হ্যাঁ, ভাল কথা, একটা উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুই পারবি? তোর ভয় করবে।"

"কি উপায় বউদিদি?"

সুশীলা মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"তুই পারবিনে। তোর সাহস হবে না।"

"কেন পারব না বউদিদি। বলই না উপায়টা—দেখি পারি কি না।"

"মোহিত বাবু ত রয়েছেন। তাঁকে গিয়ে যদি বলতে পারিস, তিনি এখনি লিখে দেন। কিন্তু তুই যে ভীতু!"

চিনি ওষ্ঠ ফুলাইয়া বলিল—"ওহ্—এ কথা এতক্ষণ বলনি কেন? এখনি গিয়ে লিখিয়ে আনছি। আমি কাউকে ভয় করিনে।"—বলিয়া চিনি গর্ব্বিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। শালুর টুকরাটি হাতে লইয়া ভাইকে বলিল—"বসন্ত আয় ত?"

সুশীলা বলিল—"বসন্ত বরং আগে দেখে আসুক মোহিত বাবু কোথা আছেন, কি করছেন।"

বসন্ত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মোহিত বাবু লাইব্রেরী ঘরের পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়া একখানা সংস্কৃত বহি পড়িতেছেন।

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল—"সেখানে আর কেউ আছে?"

"কেউ না।"

চিনি তখন বসন্তকে সঙ্গে লইয়া, অজ্ঞাতসারে কলির মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে অগ্রসর হইল।

মোহিত যে বারান্দায় বসিয়া গ্রন্থপাঠ করিতেছিল, তাহার নিম্নে কিয়দ্দূরে কলধ্বনি করিয়া নদীটি বহিয়া যাইতেছে। জলের উপরে এক ঝাঁক সারস পক্ষী উড়িয়া বেড়াইতেছিল। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া মোহিত বোম্বাই সংস্করণের কঠোপনিষৎ পাঠ করিতেছিল।

চিনি ও বসন্ত যখন বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল, মোহিত তখন এত নিবিষ্টচিত্ত যে তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইল না। মোহিতের সেই আনত চশমাবদ্ধ চক্ষু ও নিস্পন্দভাব দেখিয়া চিনির একটু একটু ভয় করিতে লাগিল। চিনি বুঝিল তাহার দাদার সঙ্গে এ লোকটির প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। তাহার দাদার প্রাণটি যেমন হাসি খুসিতে ভরা, এ লোকটিব তেমন নয়। চিনির প্রস্তাব শুনিয়া ইনি নিশ্চয়ই সেটা নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া মনে করিবেন এবং অবজ্ঞাভরে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। কি হয়? আসিয়া যখন পড়িয়াছে, ফিরিয়া গেলে বউদিদি বড় হাসিবেন। বলিবেন—"আমি সেইকালেই ত বলেছিলাম।"—ভীরু বলিয়া চিনির অপবাদ হইয়া যাইবে। সুতরাং সাহস সংগ্রহ করিয়া, কম্পিতস্বরে সে বলিল—"মোহিত বাবু।"

বালিকার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া মোহিত পুস্তক হইতে চক্ষু উঠাইল।

চিনি, চকিত হরিণীর মত চক্ষু দুইটি মোহিতের প্রতি স্থাপন করিয়া বলিল—"মোহিত বাবু, দাদা বাড়ী নেই বলে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে এসেছি।"

মোহিত পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিল—"কি?"

কম্পিত হস্তে শালুর টুকরাটি তুলিয়া ধরিয়া চিনি বলিল—"এই কাপড়খানা এনেছি, এতে Many Happy Returns of the Day লিখে দিতে হবে।"

বাঙ্গালীর মেয়ের মুখে, বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত ইংরাজী ভাষা মোহিত এই প্রথম শুনিল। শুনিয়া, তাহার মনে চকিতের মত একটা আনন্দ খেলিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে কি করিতে হইবে স্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"তার আর কষ্ট কি? আমায় কি করতে হবে বল।"

চিনির মনে হইল, মোহিতের স্বর মোটেই হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের মত কঠোর নহে; যেন তাহার দাদার কণ্ঠস্বরের মতই স্নেহজড়িত। তখন তাহার আশঙ্কা দূরে গেল। সাহস পাইয়া বলিল—"কাল বাবার জন্মদিন কি না, আমরা সবাই নৌকো করে তাঁকে নিয়ে কাল বনভোজন করতে যাব। সেখানে তাঁবু খাটান হয়েছে। এই কাপড়খানাতে কচি দেবদারুপাতা সেলাই করে' করে' লিখব—Many Happy Returns of the Day—লিখে এটা তাঁবুর দরজার উপর টাঙ্গিয়ে দিতে হবে। পেন্সিল দিয়ে অক্ষরগুলো এঁকে নিলে, পাতা বসাবার বেশ সুবিধে হয়। বউদিদিকে বল্লাম—তিনি বল্লেন তাঁর লাইন সোজা হবে না। তাই আপনার কাছে এসেছি।"

মোহিত বালিকার হস্ত হইতে কাপড়খানি লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিল—"তা বেশ, আমি লিখে দিচ্ছি। কিন্তু একটা রুল চাই যে।"

"আচ্ছা"—বলিয়া চিনি রুল আনিতে গেল।

রুল পেন্সিল আনিয়া চিনি মোহিতের হাতে দিল। তিনজনে তখন লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিল। মোহিত শালুখানি টেবিলের উপর বিছাইয়া বলিল—"পিন আছে? পিন দিয়ে কাপড় খানা টেবিলের উপর এঁটে নিলে ভাল হত।"

"পিন দিচ্ছি।"—বলিয়া চিনি পিতার দেরাজ খুলিয়া পিনের কৌটা বাহির করিয়া দিল।

কাপড়খানি টেবিলে আঁটিতে আঁটিতে মোহিত বলিল—"দেখ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। ইংরিজীতে না লিখলেই কি নয়?"

"তবে? বাঙ্গলায়?"

"তাই হলেই ভাল হয় না কি? আমাদের মাতৃভাষা ছেড়ে, বিদেশী ভাষায় আমরা কেন পিতা মাতার কুশল কামনা করব?"

"তা ঠিক। ওর কি বাঙ্গলা করা যায় বলুন দেখি? এ দিনের বহু বহু প্রত্যাগমন—না—না—এ ভারি অদ্ভুত শোনাল।"

মোহিত ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"কথা কথার অনুবাদ করলে ও রকম হবেই ত। শুধু ভাবটা নিতে হবে। আচ্ছা—'বিধাতা করুন'—ঈশ্বরের নামটা বাদ দিয়ে কায নেই—কি বল ?"

চিনি উৎসাহিত হইয়া বলিল—"নিশ্চয়ই নয়। 'বিধাতা করুন, এই দিনটি যেন'—তারপর ?"

মোহিত বলিল—"গদ্যের চেয়ে কবিতাই বোধ হয় শোনাবে ভাল। ধর যদি লেখা যায়—'বিধাতা করুন, এ দিন আবার'—কি মিল করা যায় ?"

চিনি উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্বরে বলিল—"ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে—'ফিরিয়া আসুক বহু বহুবার'—চমৎকার শোনাবে—

বিধাতা করুন, এ দিন আবার
ফিরিয়া আসুক বহু বহুবার।

আচ্ছা মোহিত বাবু, আপনি কি কবি ?"

মোহিত হাসিয়া বলিল—"আমি কবি— না তুমি কবি। আমি ত মেলাতে পারিনি, তুমিই মিলিয়ে দিলে। কবিযশটুকু তোমারই প্রাপ্য।"

চিনি হাসিতে হাসিতে বলিল—"না, তা নয়। প্রথম চরণটি আপনার কিনা—সবটাতেই আপনার দাবী।"

মোহিত তখন রুল পেন্সিলের সাহায্যে কাপড়ে অক্ষর রচনায় প্রবৃত্ত হইল। চিনি বলিল—"আপনি ততক্ষণ লিখুন, আমি বাগান থেকে দেবদারুপাতা সংগ্রহ করাবার চেষ্টা দেখি গে।"—বলিয়া সে চলিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার আসিয়া বলিল—"মোহিত বাবু, যদি হঠাৎ দাদা এসে পড়েন তবে অনুগ্রহ করে ওটা ঢেকে ফেলবেন।"

"কেন ?"

"কাল দাদাকে আশ্চর্য্য করে দিতে চাই। দাদা তাঁবু সাজাতে গেছেন কি না, তিনি ত আমাদের এ সব মৎলব কিছুই জানেন না। বউদিদিকেও বলতে বারণ করে দেব। কাল নৌকো থেকে সেখানে নেমে, আমি তাড়াতাড়ি আগে আগে গিয়ে, তাঁবুর দরজায় এটা বেঁধে দেব। দাদা পৌঁছে, দেখে একবারে অবা—ক্ হয়ে যাবেন। ভাববেন, এই কাল সন্ধ্যের সময় আমি তাঁবু সাজিয়ে গেলাম, এটা কোথা থেকে এল ?—আপনি তখন তাঁকে বলবেন,—বোধ হয় বনদেবী রাত্রে এসে টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছেন।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে চিনি পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * *

পরদিন অতি প্রত্যুষেই গৃহের সকলে জাগরিত হইলেন। একটু অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই গুরুদাস বাবু ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিয়া ফেলিলেন। স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি রাধাবল্লভ জীউর পূজায় বসিলেন। আজ তাঁহার জন্মদিনে প্রথমে ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা না করিয়া, আত্মীয়স্বজনের অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন না।

গুরুদাস বাবু পূজা ও স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন—তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতি বাহিরে অপেক্ষা করিয়া আছে। ইতিমধ্যে প্রমথ গিয়া মোহিতলালকে ডাকিয়া আনিল। মোহিত মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াই আসিল। সে ভাবিতে লাগিল—ইংরাজী কায়দা অনুসারে Many Happy Returns of the Day বলিয়া গুরুদাস বাবুর সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে হইবে ত? সে তাহার বড়ই অপ্রীতিকর হইবে। অথচ সে অতিথি, না করিলেও অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়। ভাল যন্ত্রণায় সে পড়িয়াছে!

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মোহিত যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিরক্তি সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া, হৃদয়খানি পুলকে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল।

পূজা সমাপন হইলে, গুরুদাস বাবু ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলে এস।"—তদনুসারে সকলে পূজার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গুরুদাস বাবু বলিলেন—"তোমরা সকলে প্রথমে নারায়ণ প্রণাম কর। মন্ত্র বল।"—বলিয়া গুরুদাস বাবু অল্পে অল্পে সকলকে বলাইতে লাগিলেন—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।"

মন্ত্র শেষ হইবামাত্র সকলে মিলিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন।

তাহার পর অভিনন্দনের পালা। প্রথমে গৃহিণী ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিলেন। "হয়েছে হয়েছে"

—বলিয়া গুরুদাস বাবু সাদরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। দুই জনের মধ্যে আর কোনও বাক্য বিনিময় হইল না। কিন্তু উভয়ের নয়নের ভাষা উভয়ে বুঝিলেন। তাহার পর যথাক্রমে প্রমথনাথ, সুশীলা ও চিনি ও বসন্ত তাঁহাকে প্রণাম করিল। পুত্রদ্বয়ের সহিত গুরুদাস বাবু নীরবে কোলাকুলি করিলেন। পুত্রবধূ ও কন্যার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া মনে মনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সর্ব্বশেষে মোহিত গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার সহিত কোলাকুলি করিয়া গুরুদাস বাবু বলিলেন—

—"বাবা, দীর্ঘজীবী হও।"

এতক্ষণে সূর্য্যোদয় হইল; সকলে বসিবার ঘরে গিয়া বসিলেন। সুশীলা ও চিনি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দুইটি থালায় কয়েক পেয়ালা চা ও কয়েক রেকাবি মোহনভোগ সাজাইয়া আনিল। প্রত্যেককে চা ও মোহনভোগ পরিবেষণ করিয়া, মোহিতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুশীলা বলিল—"মোহিত বাবু—আজকের দিনটে এক পেয়ালা চা খাবেন?"

সে কণ্ঠস্বর এমন মধুর, এমন চিত্তবিভ্রমকর, যে মোহিত আত্মরক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল। বলিল—"আচ্ছা দিন।"

প্রমথনাথ এই ব্যাপার দেখিয়া, প্রকাশ্যেই অল্প অল্প হাসিতে লাগিল, আর মনে মনে ভাবিল—সুশীলা যাদুকরীই বটে।

চিনিও এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিল না—"চা কেমন লাগছে মোহিত বাবু?"

মোহিত স্মিতহাস্যের সহিত বলিল—"চমৎকার!"

চা পান শেষ হইলে মেয়েরা পাল্কীতে এবং পুরুষগণ পদব্রজে নদীতীরে গমন করিয়া, নৌকারোহণ করিলেন। দুইখানি নৌকা ছিল। একখানিতে মহিলারা এবং অপরখানিতে পুরুষগণ যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব—

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক লোটস লাইব্রেরী। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২২ পৃষ্ঠা। এই পুস্তিকার লেখক কবিবরের 'নৈবেদ্য', 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি' কাব্যত্রয় আলোচনা করিয়া কবিবরের ঋষিত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক কবিবরের রচনার অন্তস্তলে অনুপ্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই; এবং এই জন্যই খেয়ার কোনো কোনো কবিতা তাঁহার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকিয়াছে। লেখক ভাসা ভাসা ভাবে বুঝিয়া ভাসা ভাসা ভাবেই লেখনী চালনা করিয়াছেন—তবু ইহাতেই কবিবরের কবিত্ব ও ঋষিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। কবির কাব্যত্রয়ের ক্রমনির্ণয় করিয়া ও তাহাদের মূল সুর ধরিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে কবিবরের জীবনবীণার এই ত্রিতন্ত্রী কি মোহন সুরেই বাজিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের গৌরব, শ্রেষ্ঠতম কবি। তাঁহার গভীরভাবের সন্ধান পাওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে; যিনি তাঁহার রচনার রসধারা বাধামুক্ত করিয়া সাধারণের সহজ-প্রাপ্য করিয়া দেন তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সংস্কার ও সংরক্ষণ—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, প্রণীত। সাম্য প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। ইহাতে সমাজসংস্কার বিষয়ক বিবিধ সন্দর্ভ একত্র করা হইয়াছে। লেখকের মতে সংস্কার করিতে গিয়া প্রাচীন রীতিকে সংহার না করিয়া প্রাচীনকে সংরক্ষণ করিয়া সংস্কার করা উচিত। ইহা প্রকৃত হিন্দুর মতো কথা। ভারতবর্ষের নিজস্ব বিশেষত্ব সংরক্ষণ করিয়াই সংস্কার বাঞ্ছনীয়। আমরা এ পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি, সমাজহিতৈষী মাত্রেই প্রীত হইবেন।

সেক্সপীয়ার—

প্রথম স্তবক।—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত। ১৩১ নং রাসা রোড, কালীঘাট হইতে প্রকাশিত। ডবল রয়াল ষোড়শাংশিত ১২৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা, মূল্য বারো আনা। ইহাতে মহাকবি সেক্সপিয়রের 'টেম্পেষ্ট' 'রোমিও ও জুলিয়েট', 'ভিনিস দেশের বণিক' ও 'রাজা লিয়র' নামক নাটকচতুষ্টয়ের উপাখ্যানভাগ গল্পের আকারে ল্যাম্ব-রচিত গল্পের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে। রচনা চলনসই। সেক্সপিয়র, ও নাটক চতুষ্টয়ের প্রধান প্রধান পাত্রপাত্রীর ভূমিকায় সজ্জিত বিলাতের বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চিত্রে পুস্তকখানি মণ্ডিত; ইহাতে পুস্তকখানির উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে। এ রকম বই ক্ষণিক বিলাসের জন্য প্রকাশিত হয় না, সাহিত্যদরবারে স্থায়ী আসন পাইবার আশা করিয়াই প্রকাশ করা উচিত; সুতরাং পুস্তকের ছাপা কাগজ ভালো হওয়া উচিত ছিল।

ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা—

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ, বেদান্তরত্ন, এম-এ, বিবৃত। মূল্য আট আনা। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় আমরা লেখকের স্বাধীন চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী মত প্রকাশের সৎসাহসের প্রশংসা করিয়াছিলাম। লেখক স্বাধীন চিন্তার আলোকে হিন্দুশাস্ত্র উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ধর্ম্মই অর্থ ও কামের উৎপাদক ও রক্ষক। গ্রন্থকারের বিশ্বাস হিন্দুর ধর্ম্মহীনতাই তাঁহার অর্থ-কাম-রাহিত্যের কারণ। দেশকালপাত্র ভেদে ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গ অনুষ্ঠানরীতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এককালে যাহা সদাচার থাকে তাহাই পরবর্ত্তী

কালে সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য পুরাতন ভক্ত হিন্দুসমাজ বহু বিষয়ে কলুষিত ও নির্জীব আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবার প্রতি অত্যাচার, জাতিভেদ, বিদেশপ্রত্যাগত স্বদেশীর জাতিনাশ, সাধারণ লোকের দুর্ব্বোধ্য দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃতে আরাধনার প্রথা প্রভৃতি আজকালকার সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে লেখক অকুতোভয়ে শাস্ত্রসঙ্গত স্বাধীন বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে হিন্দুসমাজ দেশের কি অনিষ্টসাধন করিতেছেন। অত্যুদার হিন্দুধর্ম্মকে এই সকল সঙ্কীর্ণতা, অজ্ঞতা ও কপটতার কবল হইতে বিমুক্ত করিতে পারিলেই আমরা মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া এই জীবনসংগ্রামের দিনে রক্ষা পাইব, নতুবা আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য। আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কার করিতে হইবে প্রাচীন শাস্ত্র ও প্রাচীন সমাজের সহিত যোগ রাখিয়া; নতুবা সংস্কারকেরা নুতনতর সমাজ গড়িয়া তুলিবেন, পুরাতন সমাজের সংস্কার হইবে না। এইরূপ অবস্থা হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের। ব্রাহ্মসমাজ ম্লেচ্ছসমাজ নহে—হিন্দুধর্ম্মের মহত্তম আদর্শে বর্ত্তমানের উপযোগী সংস্কারপূত সমাজ ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু ইহার সংস্কারচেষ্টা জাগ্রত হইয়াছিল বিদেশের অনুপ্রেরণায়, এবং বিদেশীশিক্ষায় উদ্বোধিত স্বাধীন চিন্তা ইহার মূল ভিত্তি হইয়াছিল। ইহাতে হিন্দুসমাজের প্রাচীন যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের ধর্ম্ম হইতে পারে নাই—ইহা শিক্ষিতসমাজের ধর্ম্ম হইতেছে মাত্র। এই ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব আছে বক্ষ্যমান পুস্তকপ্রণেতার মতো উদার হিন্দু ভট্টাচার্য্যের উপর। আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্যসমাজ স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই মহা অগ্রগামী ব্রাহ্মসমাজকে শাস্ত্রসম্মত সংযোগসূত্রে দেশের জনসাধারণের সহিত বাঁধিয়া দিলে রেলগাড়ীর এঞ্জিনের মতো ব্রাহ্মসমাজ সকল যাত্রীকে স্বাধীন চিন্তার তীর্থক্ষেত্র সকলে স্নান করাইয়া পবিত্র নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে পারিবেন। এই পুস্তক সকল হিন্দু পড়িয়া দেখিবেন এই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ।

সাহিত্যসেবী—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার, এম্-এ, প্রণীত। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৫ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই। এই প্রবন্ধটি গত বৎসর প্রবাসীতেই প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং ইহা লইয়া প্রবাসীতে আলোচনাও হইয়া গেছে। বিনয় বাবু আমাদের মাতৃভাষাকে জগতের শ্রেষ্ঠভাষাসমূহের সমকক্ষ করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত, কৃতবিদ্য ও বিদ্যোৎসাহী ধনীদিগকে এই উদ্দেশ্যে স্ব স্ব শক্তি নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রতিভাশালী লেখকেরা সাহিত্য-মন্দিরের পূজারী সেবক হইয়া বহু সাধনায় শ্রেষ্ঠরত্ন উপহার দিবেন এবং লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ তাঁহাদিগের সাধনলব্ধ রত্ন আহরণ করিয়া বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন। আমাদের দেশে যত সন্ন্যাসী ও নিষ্কাম কর্ম্মী আছে এত আর কোনো দেশে নাই। আমাদের দেশমাতা এখন এমনই সব কর্ম্মী সন্ন্যাসী তাঁহার সেবার জন্য চাহিতেছেন। আশা করি এই অভাব অচিরে মোচন হইতে দেখিব।

নদীয়া-কাহিনী—

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত মুখবন্ধ-সংবলিত। প্রকাশক—সাহিত্যসভা, কলিকাতা। ডিমাই অষ্টাংশিত ৪০০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য অনুল্লিখিত। এখানি নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন ইতিকথা, বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মালোচনা, প্রবাদকাহিনী, ব্যক্তিবিশেষের জীবনী, এবং সাহিত্য শিল্প লোকাচার সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র—ঠিক পূর্ণপরিণত ইতিহাস নহে। গ্রন্থখানি বহু শ্রমে সংকলিত। ভবিষ্য ঐতিহাসিকের শ্রম বহু পরিমাণে লাঘব করিয়া রাখিল। এইরূপ প্রাদেশিক ঐতিহাসিক চিত্র যাঁহারা বহু শ্রমে সংগ্রহ করিতেছেন তাঁহারা যে বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র একথা বলাই বাহুল্য। সকলে এক এক খণ্ড ক্রয় করিলে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করা হইবে। গ্রন্থমধ্যে ৩৫ খানি চিত্র আছে।

সহজে সংস্কৃত শিক্ষা—

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১২৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ের চটি মলাট। মূল্য নয় আনা। এখানি সংস্কৃত শিখাইবার direct methodএর বই। ইহাতে সংস্কৃত বাক্যের শিক্ষার সহিত সংস্কৃত পদরচনা, ব্যাকরণ ও পাঠমালা আয়ত্ত করিবার উপায় সুকৌশলে লিখিত হইয়াছে। রবি বাবুর 'সংস্কৃতসোপান' ছাড়া এমন একখানি আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীসম্মত সংস্কৃতশিক্ষার পুস্তক দ্বিতীয় দেখি নাই। স্কুল, চতুষ্পাঠীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ও অভিভাবকগণ এই পুস্তকনির্দ্দিষ্ট উপায়ে শিক্ষাদান প্রবর্ত্তিত করিলে অতি চমৎকার ফললাভ করিবেন। শ্রীযুক্ত রবি বাবু তাঁহার বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষাদান প্রবর্ত্তিত করিয়া আশ্চর্য্যজনক সফলতা লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকের সমাদর হইবে আশা করি।

বঙ্গ-বিধবা—

শ্রীসরোজিনী দেবী প্রণীত। ডবল ক্রাউন ২৪ অংশিত ৭৪ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। এই পুস্তিকার রচয়িত্রী বঙ্গবিধবাদিগকে শিক্ষা দিয়া ব্রহ্মচর্য্য, সেবা ও ধর্ম্মের কল্যাণময় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বিধবার এই আদর্শই শ্রেষ্ঠ ও অনুসরণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা সামাজিক পীড়নে প্রপীড়িত পরের গলগ্রহ তাহারা যদি পুনর্ব্বার বিবাহ করে তবে কি তাহারা নিন্দনীয় হইবে। রচয়িত্রীর সহিত এই বিষয়ে আমরা একমত নহি। ভাবগত আদর্শ দেখিতে চমৎকার, কিন্তু সংসারের কঠিন ক্ষেত্রে যে সেই আদর্শ অহরহ কলুষিত হইতেছে তাহার প্রতিরোধের উপায় বিধবাবিবাহ ছাড়া আর কিছু আছে কি না রচয়িত্রী তাহা আদর্শের প্রতি অতিরিক্ত মমতা বশতঃ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

ফোয়ারা—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স। ডবল ফুলস্কাপ ষোড়শাংশিত ২২৯ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে ললিত বাবুর সরস রসিকতা-সম্বলিত নিবন্ধনিচয় একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ললিত বাবু তাঁহার রসিক রচনার জন্য প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনপ্রিয়। গরুরগাড়ী হইতে তীর্থ পর্য্যন্ত, চুটকী সাহিত্য হইতে ইংরাজী সাহিত্য পর্য্যন্ত তিনি কৌতুকের চক্ষে দেখিতে পারেন এবং তিনি আরো পারেন তাহা সরস ভাষায় ফুটাইয়া প্রকাশ করিতে। তিনি হাসির আবডালে রাখিয়া অনেককে অনেক অপ্রিয় সত্য শুনাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কটূক্তি চিনির মোড়কে কুইনিনের বড়ির মতো রোগী নিরাপত্তিতে গিলিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে ১৬টি নিবন্ধ আছে। প্রকাশ করিবার সময় লেখক একটু ত্যাগ স্বীকার করিলে গ্রন্থখানি অধিকতর মনোজ্ঞ হইত—পদ্য রচনা লেখকের ক্ষেত্র নহে, এবং রসিকতা দুই এক স্থলে অশ্লীলতার ইঙ্গিতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া ফুটনোটে একেবারে নগ্নভাবে দেখা দিয়াছে। এজন্য অধ্যাপক লেখককে আমরা মার্জ্জনা করিতে পারি না। যাহাই হোক এই পুস্তক জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত বাঙ্গালীর অবসরকালকে হাস্যময় করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানেও পরাঙ্মুখ হইবে না।

পারিজাত—

শিশু-জীবনের পুণ্যকথা।—শ্রীবঙ্কবিহারী কর বিরচিত। ঢাকা ভারত মহিলা প্রেস হইতে প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ষোড়শাংশিত ৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা। ইহাতে একটী দশ বৎসর বয়সের বালিকার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যেই যে জ্ঞান, দয়া, প্রেম, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনির্ভরতা প্রভৃতি গুণ অসাধারণ ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারই পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে পড়াইলে তাহাদের নৈতিক কল্যাণ হইতে পারে। ইহাতে পরলোকগতা বালিকার একখানি চিত্র আছে।

আরবজাতির ইতিহাস—

শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক শেখ মফিজ-উদ্দীন আহমদ, দলগ্রাম, ভুষভাণ্ডার পোষ্টাপিস, রংপুর। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৩২৪+৷৵০+৷৵০। মূল্য দেড় টাকা। এখানি মাননীয় সৈয়দ আমীর আলী বিরচিত ইংরাজী ইতিহাস 'এ শর্ট হিষ্ট্রী অফ দি সারাসেন্‌স্' পুস্তকের বাংলা অনুবাদ। সেই পুস্তকে সারাসেন জাতির অভ্যুদয়, প্রতিষ্ঠা, সমাজ ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান বিষয়ের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত আছে। সেই পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করিয়া শেখজী বঙ্গভাষার সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা ও রচনাভঙ্গি সাধু হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কয়েকখানি চিত্র আছে।

বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু—

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত। প্রকাশক বি, ব্যানার্জি কোম্পানি। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৪৭৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য অতি সুলভ ১।০ মাত্র। এখানি বাংলাভাষার একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যতিরিক্ত যে-সমস্ত দেশজ, আরবী, পার্সী, উর্দ্দু, হিন্দী, পর্ত্তুগীজ, ডেনিস, ফরাসী, ইংরাজি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে সেইসকল শব্দ বহু পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া এই অভিধান সংকলন করিয়াছেন। এমন একখানি অভিধানের বঙ্গভাষায় বিশেষ অভাব ছিল, বিশেষত বিদেশীর বঙ্গভাষা শিক্ষায় এই অভিধান বহু সাহায্য করিবে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পুস্তকের পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বহু শব্দ উদাহৃত হইয়াছে; প্রদেশভেদে একই শব্দের অর্থ-তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গ্রন্থ একজনের চেষ্টায় নিখুঁত হওয়া অসম্ভব। চার বৎসর আগে যখন এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমি একখানি কিনিয়া তাহার আদ্যন্ত প্রত্যেক শব্দ পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে আমার সংযোগ বিয়োগ ও সংশোধন আবশ্যক মনে হইয়াছিল লিখিয়া রাখিয়াছিলাম; উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থকারকে উহা উপহার দিব, দ্বিতীয় সংস্করণে উহা তাঁহার কিছু সাহায্য করিলেও করিতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত সেই বইখানি হারাইয়া গিয়াছে। এখন শুধু এইটুকু মনে হইতেছে যে পার্সী উর্দ্দু শব্দের অর্থ নির্ণয়ে স্থানে স্থানে ভুল হইয়াছে। এবং অনেক শব্দের স্বরূপ নির্ণয় না করিয়া শুধু 'যাবনিক' সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই পুস্তকের শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইবে আশা করা যায়; তখন একজন পার্সী জানা বাঙালীর সাহায্য গ্রহণ করিলে পুস্তকখানির মূল্য বর্দ্ধিত হইবে মনে করি। বাংলা ভাষার অর্দ্ধেক শব্দ সংস্কৃত, সিকি পারসী আরবী, উর্দ্দু, হিন্দী, আর বাকি সিকির তিন ভাগ য়ুরোপীয় ও একভাগ নিতান্ত দেশজ—বোধ হয় অনার্য্য শব্দ। সুতরাং কোষ প্রণয়নে অন্তত ৪।৫ জন সুপণ্ডিত লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হয়। যে-সকল ছাত্র, বিদ্যালয়, পাঠাগার ও সাহিত্যসেবী এখনও এই সুন্দর কোষগ্রন্থখানি ক্রয় করেন নাই তাঁহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। চার বৎসরেও এমন পুস্তকের এক সংস্করণ বিক্রয় হয় না ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

(ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক)—শ্রীকৃষ্ণমোহন ধর প্রণীত ও প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। এই পুস্তকের প্রশংসা করিয়া আমরা প্রথম সংস্করণকে অভিনন্দন করিয়াছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। এমনিভাবে স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা বঙ্গদেশের ভূগোল ও ইতিহাস গঠনে যাঁহারা সাহায্য করিতেছেন তাঁহারা বঙ্গদেশের সুসন্তান। আমরা আশা করি পাঠকসাধারণ এই উপাদেয় গ্রন্থের যোগ্য সমাদর করিবেন।

নব বর্ণপরিচয়—

শ্রীদুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল, কর্ত্তৃক প্রণীত। ২০১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, আর্য্য সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন পয়সা। ইহাতে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিশুদিগকে কেবলমাত্র বর্ণমালা ও বর্ণসংযোগ শিক্ষা দিবার চেষ্টা আছে।

শৈব্যা—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত। ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ষোড়শাংশিত ১১২ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা। ইহা হরিশ্চন্দ্র রাজার পৌরাণিক সচিত্র উপাখ্যান। বিশেষভাবে শৈব্যার সতী-চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। রচনার ভাষা ভালো কিন্তু রচনা-ভঙ্গি আমাদের ভালো বলিয়া মনে হইল না। উপাখ্যান বর্ণনা করিতে করিতে গ্রন্থকারের স্বকীয় উচ্ছ্বাস, অভিমত ও বক্তৃতা এবং স্থানে অস্থানে পাঠককে সম্বোধন করিয়া বোধ দান সমস্ত রচনা ব্যর্থ করিয়াছে। যে-সকল লেখক পাঠককে নির্বোধ ঠাওরাইয়া প্রত্যক্ষ-ভাবে জ্ঞানশিক্ষা দিতে বসেন তাঁহাদের গুরুগিরি বড়ই অশোভন ও অসহ্য বোধ হয়।

অশ্রুকণা—

শ্রীনলিনীকান্ত দাস প্রণীত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ষোড়শাংশিত ২৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য চার আনা। পদ্য রচনা।

বামাসুন্দরী বা আদর্শনারী—

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন প্রণীত। ডবলক্রাউন ষোড়শাংশিত ১২০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। স্বর্গীয়া বামাসুন্দরীর চিত্র সম্বলিত। মূল্য আট আনা। বামাসুন্দরীর পবিত্র ও মহৎ জীবনের সহিত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আদর্শ নারী-জীবনের ঐক্য দেখাইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। নারীগণ ইহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

শাহজলাল—

শ্রীরজনীরঞ্জন দেব, বি-এ, প্রণীত। রায়নগর, শ্রীহট্ট। ডবল ফুলস্ক্যাপ ষোড়শাংশিত ৭৩ পৃষ্ঠা। এণ্টিক কাগজে ছাপা। প্রচ্ছদপট দুই রঙে ছাপা। মূল্য ছয় আনা মাত্র। হজরত শাহজলাল একজন মুসলমান সাধুপুরুষ। তিনি আরবদেশ হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারাই শ্রীহট্টে মুসলমান-ধর্ম্মের আলোক নীত হয়। এ পুস্তকে তাহারই ঐতিহাসিক আলোচনা ও কালনির্দ্দেশ আছে।

মালবিকাগ্নিমিত্র—

শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা কর্ত্তৃক অনুবাদিত। গুরুদাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ষোড়শাংশিত ১২১ পৃষ্ঠা। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভালো। সচিত্র। মূল্য বারো আনা মাত্র। ইহা মহাকবি

কালিদাসের অন্যতম নাটকের অনুবাদ। অনুবাদ যথাযথ হইয়াছে কিন্তু অনুবাদের ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নাই। প্রাদেশিক কথ্য ভাষার সঙ্গে সাধু লেখ্য ভাষার বিশৃঙ্খল সংমিশ্রণে রচনা অপাঠ্য হইয়াছে। গদ্য রচনাতেও একটি ধ্বনির ছন্দ আছে; তাহা নিপুণের কর্ণে ধরা পড়ে, যাঁহারা সেই ছন্দ-ঝঙ্কার রক্ষা করিয়া রচনা করিতে না পারেন তাঁহাদের সমস্ত রচনা পণ্ডশ্রম মাত্র। সংস্কৃত ও প্রাকৃত বাক্যের অনুবাদে সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলা ব্যবহার করিলে ভালো হইত। চিত্রগুলিও সুন্দর হয় নাই। যাত্রার দল ও বাঙালী ভাবের খিচুড়ি হইয়াছে। ছবিগুলিতে ঐতিহাসিকতা দান করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই; মালবিকাগ্নিমিত্র ইংরেজি আমলের চেয়ার জুড়িয়া বসিয়াছেন। এমন সব ব্যর্থ চিত্র না দিলেও ক্ষতি ছিল না। আজকাল ছবি বিনা বই অচল এভাবটা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, অথচ প্রকৃত কলা-কুশল চিত্রকর বঙ্গদেশে একান্ত দুর্লভ।

প্রেমরাজ্য—

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার প্রণীত ও প্রকাশিত, ২নং তারাচাদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১৫১ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৹ আনা। এখানি দৃশ্যকাব্য। প্রস্তাবনায় নট এই দৃশ্যকাব্যের যে আভাস দিয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিলেই এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে—গ্রন্থের আখ্যান ও রচনার নমুনা দুই পাওয়া যাইবে:—

গৌড়েশ গণেশ নামে রাজা গুণবান
লভেছিল জতিমল নামেতে সন্তান;
* * * * *
সনাতন হিন্দুধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন
জেলাল-উদ্দিন নাম করিলা গ্রহণ।
এই ইতিহাস-উক্তি ভিত্তি মাত্র করি
গঠিব যে প্রেমরাজ্য দেখ দয়া করি।

এই পুস্তকে যে কেহ সাহিত্যরস পাইবেন না তাহা গ্রন্থকার অকপটে স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই স্বীকারোক্তিকে বিনয় বলিয়া ভুল করিবার অবসর তিনি কিছুমাত্র দেন নাই—

অতি সংগোপনে বসিয়া নির্জ্জনে
ভুলিবারে মনঃকষ্ট।
করিয়া যতন করেছি অঙ্কন
এই প্রেমরাজ্য পট॥
কপালের ফেরে হৃদয় ভাণ্ডারে
ভাব রং গাঢ় নয়।
অঙ্কন মানসে যবে দাস বসে
ভয়ে করকম্প হয়॥
বিদ্যা বুদ্ধি তুলি জানত সকলি
এ মূর্খের সুলভ নয়।
কল্পনার ক্ষেত্রে রঙ্ ফলাইতে
নহে সে কৌশলময়॥
ইত্যাদি।

নবাব বেগম—

শ্রীভবতারণ বসু প্রণীত, প্রকাশক শ্রীকালিপদ বসু, ১৪।১ নং বেচু চাটুয্যে গলি, কলিকাতা। ডবল ফুলস্কাপ ষোড়শাংশিত ৫৯ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ আনা। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সর্গ বিভাগ দেখিয়া এখানিকে কাব্য বলিতে হয়; অথচ মধ্যে মধ্যে নাটকের লক্ষণও আছে। ইহা সিরাজদ্দৌলা নবাবের সমসময়কার ঘটনা লইয়া রচিত। নিষ্ফল প্রয়াস।

প্রীতি—

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী প্রণীত। ডবল শ্রীফুলস্কাপ ষোড়শাংশিত ৬৬ পৃষ্ঠা। এণ্টিক কাগজ; কাপড়ে বাঁধা। মূল্য অনুল্লিখিত। এখানি কবিতা পুস্তক। রচয়িত্রী ত্রিপুরার রাজকুমারী। ত্রিপুরার রাজপরিবার সাহিত্যসেবার জন্য প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় মহারাজের সুন্দর কবিত্বশক্তি ছিল। লক্ষ্মীর সন্তানেরা বাণীর মন্দিরে অর্ঘ্য সাজাইতেছেন ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। 'প্রীতি' পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। কবিতাগুলি সরস ও প্রাঞ্জল হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে কবিত্ব ও নূতন ভাবেরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণী—

ইহাতে এই সভার উদ্যম ও সফলতার বহু সাধু দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইল। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বহুবিধ বিষয়ে আলোচনা করিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছেন। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুরূপ। এই সভাকে পরিষদের শাখারূপে সংযুক্ত করিলে এই সভারও বলবৃদ্ধি ও পরিষদের ক্ষেত্রেরও প্রসার হয়। আমরা এই সভার উন্নতি কামনা করি; এবং আমাদের মনে হয় সভা পরিষদের সহিত সংযুক্ত হইলেই সমবেত চেষ্টায় দেশের অশেষবিধ কল্যাণ করিতে পারিবেন। একথাটা সভার নেতৃবৃন্দ ও পৃষ্ঠপোষক মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর একবার ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা—

শ্রীদুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত। কণিকা প্রেস, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় পুস্তক পাওয়া যায়। মূল্যের উল্লেখ নাই। ছাপা কাগজ কদর্য্য। গ্রন্থকারের বক্তব্য—রোগ প্রতিকারের জন্য কোনো ঔষধের আবশ্যক নাই; প্রকৃতির উপরে নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নিয়মিত করিলে সকল রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে প্রচারিত অনেক তত্ত্ব সত্য ও বিচারসহ। আবার অনেক কথা নিতান্ত গোঁড়ামি ও একদিকে ঝোঁকের নামান্তর সুতরাং ঠিক সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

রসায়নবোধ ও রামধনু—

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ঢাকা। এগুলি সাময়িক প্রকাশিত পুস্তক। উদ্দেশ্য—সহজ ও সুলভ উপায়ে রসায়ন ও জড়বিজ্ঞান এবং শিল্প স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও গৃহস্থালী শিক্ষা দেওয়া। ছাপা কাগজ ভালো না হইলে ইহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইবে না।

বুদ্ধ—

শ্রীবরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এল. প্রণীত। প্রকাশক কে, ভি, সেন, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৭৬ পৃষ্ঠা। এণ্টিক কাগজ; তিন রঙে ছাপা কার্ডবোর্ডের মলাট; ভিতরে একাধিক রঙিন ছবি; পাঠ্য রঙিন কালিতে ছাপা। মূল্য আট আনা মাত্র। শিশুদের জন্য লিখিত বুদ্ধদেব-চরিত। রচনার ভঙ্গি শ্রুতি-সুখকর নহে এবং বিশেষত্ববর্জ্জিত একঘেয়ে; এবং ইহাতে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে শিশুদের অপাঠ্য হইয়াছে।

আদুরে মেয়ে—

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত; প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স। ডবল ফুলস্কাপ ষোড়শাংশিত ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন আনা। ছড়ার বই। রচনার উদ্দেশ্য দুর্ব্বোধ্য এবং গ্রাম্যতা দোষে অপাঠ্য।

শ্রীসত্যনারায়ণ-ব্রতকথা—

স্বর্গীয় আদি রায় বিরচিত। খুলনা থালীশপুর হইতে শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

সটীক মথিলিখিত সুসমাচার—

আচার্য্য এ, জুসন কর্ত্তৃক লিখিত। বঙ্গীয় সণ্ডে স্কুল সম্মিলনী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। মূল্য মাত্র বারো আনা। মহাত্মা যিশুর জীবনচরিতের সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব জানিতে হইলে বাইবেল পাঠ করা উচিত; এবং মহাপুরুষের আদর্শ জীবন পর্য্যালোচনা করা সকল কল্যাণকামী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। বাইবেলের মধ্যে মথি, লুক ও জন লিখিত যিশু-সংবাদ অতি মনোরম ও বহুশিক্ষার আকর। এইসব :পুস্তক কোনো বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দ্বারা অনুবাদিত ও সম্পাদিত হইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতে পারে; নতুবা ইহার সাহেবী বাংলা লোকের শ্রদ্ধা অপেক্ষা বিদ্রূপ-প্রবৃত্তিকেই জাগ্রত করে। ঈশাপন্থী প্রচারকদিগের সৎ উদ্যম ব্যর্থ হইতেছে; তাঁহাদের অর্থের অসদ্ভাব নাই; স্বচ্ছন্দে এইসব পুস্তক সাহিত্যরসে সুন্দর করিয়া লোকের কাছে সমাদৃত করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীফলাহার-তত্ত্বম্—

পণ্ডিত শ্রীজগদ্বন্ধু বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিতম্। পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুমেন বঙ্গানূদিতঞ্চ। যশোহর হিন্দু পত্রিকাখ্য মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ। মূল্য দুই আনা। ফলাহার সম্বন্ধে রহস্যরচনা। অনুবাদ ফলাহারের মতো সুস্বাদ হয় নাই; কবিকুসুমের মালঞ্চের সব ফুলই নির্গন্ধ।

বিনিময় সুধা—

শ্রীবিমলাচরণ বসু প্রণীত। রঙ্গপুর লোকরঞ্জন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। প্রেসের নাম লোকরঞ্জন কিন্তু ছাপা কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতন। রচনা পদ্যে। কিন্তু তার না আছে ছন্দ, না আছে মিল, না আছে অর্থ।

মায়া-পুরী—

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্-এ. কর্ত্তৃক লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির উপক্রমণিকা। মূল্য চার আনা। জীব ও জগতের কি সম্বন্ধ তাহাই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতে সরসভাবে সমালোচিত হইয়াছে। যাঁহারা দর্শনবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ এ পুস্তক তাঁহাদের নিকটেও একেবারে দুর্বোধ্য নহে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—

শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সচিত্র। মূল্য ছয় আনা। বিষ্ণুমূর্ত্তি বহুবিধ; চিহ্নভেদে মূর্ত্তির নামভেদ হয়। এই পুস্তকে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিভিন্ন লক্ষণে বিভিন্ন নাম নিরূপিত হইয়াছে এবং চিত্র দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—

শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ, বি-এ, লিখিত। সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সচিত্র। মূল্য চার আনা। এটি সাহিত্য পরিষদের শোকসভায় পঠিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন অসাধারণ পণ্ডিত ও যথার্থ সাহিত্যসেবক ছিলেন এবং তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের সহিত শুদ্ধির সমাবেশ, তিনি শুদ্ধিরক্ষার জন্য সকল লেখককে উপদেশ দিতেন কিন্তু সে উপদেশ বন্ধুর উপদেশ, তিরস্কার নহে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি সমালোচনা ও একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কালীপ্রসন্নের বিশেষত্বের কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। সাহিত্যের শুদ্ধিরক্ষার প্রসঙ্গে লেখক লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান সময়ে উচ্চারণ অনুসারে শব্দ বানান করিবার এক নূতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সকল প্রথারই অতি মাত্রা আছে। সেদিন দেখিলাম একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় 'মত' কথার তয়ে ওকার দিয়া লেখা হইয়াছে। 'কোন' লিখিতেও নয়ে ওকার দেওয়া হইয়াছে। ... ক্রমে আমরা মনের ম-য়ে মদনের দ-য়ে, এবং বক্ষ ও দক্ষ শব্দের প্রত্যেক অক্ষরেই হয়ত ওকার দিয়া বসিব।" একথা 'প্রবাসী'কে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। এবং উপদেশচ্ছলে লেখক কালী-প্রসন্নের উক্তি স্বরূপে বলিয়াছেন "সম্পাদক কেবল তাঁহার পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির ভাষার শুদ্ধির জন্য দায়ী, তাহাই নহেন। প্রত্যেক পত্রেরই একটা সম্পাদকীয় বাঁধা সুর থাকা চাই লেখকেরা যাঁর যে সুরে ইচ্ছা লিখিয়া যাইবেন ঠিক নহে।" আমাদের মনে হয় এই মতটিই ঠিক নহে। পত্রিকার নিজের সুর মানে ত সম্পাদকের সুর। সম্পাদকের সুরে সকল লেখক কেন আত্মবিসর্জ্জন করিবেন? আমার যদি মনে হয় কাল্ ও কালো, ভাল্ ও ভালো, মত ও মতো, কুল ও কুলো, ফুল ও ফুলো, প্রভৃতি এক বানানের শব্দের উচ্চারণ ভেদে রূপভেদ করিলে পাঠের সুবিধা হয়; আমার যদি মনে হয় যে বাংলায় ইতঃপূর্ব্বে অপেক্ষা ইতিপূর্ব্বে, নিন্দক অপেক্ষা নিন্দুক, সৃষ্টি অপেক্ষা সৃজন শ্রুতিসুখকর ও অধিক প্রচলন হেতু অশুদ্ধ হইয়াও সাধুপ্রয়োগ; তবে সম্পাদক কোন অধিকারে আমার এইসব প্রয়োগে বাধা দিবেন। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক লেখকের রচনাভঙ্গির বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া সম্পাদকের চলা উচিত। নতুবা ত আগাগোড়া একজনের লেখার মতন একঘেয়ে হইয়া উঠিবে; পত্রিকার বৈচিত্র্য শুধু বিষয়ে নহে, রচনা ভঙ্গিতেও বটে। আর এক কথা, যাঁহারা মতো কোনো লেখেন তাঁহারা ঠিক ধ্বনির অনুসরণ করেন না, এক বানানের দুই শব্দকে পৃথক করেন মাত্র। আর যদি ধ্বনি অনুসারেই লেখা হয় তাহাতে ত সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এবিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন লাটিন ভাষা হইতে আধুনিক ইতালিয়ান ভাষার উদ্ভব; প্রভেদ কেবল ইতালিয়ান ভাষা ধ্বনির অনুগামী হইয়া লাটিনের স্বর পরিবর্ত্তন করিয়াছে। সংস্কৃত শব্দ যদি বাংলায় তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হয় হউক। আপত্তি হইবে - সর্ব্ব প্রদেশের লোকের বোধগম্য হইবে না। এ আপত্তির কোনো অর্থ নাই। দেশের রাজধানী সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রভূমি। সুতরাং রাজধানীর আশে পাশে এবং রাজধানীর ভাষার আদর্শে সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, রোধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। দুই শত বৎসর আগে ঢাকার কথা লিখিত ভাষার আদর্শ ছিল; পরে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাবে কৃষ্ণনগরের কথা আদর্শ হইয়াছিল; এখন যদি কলিকাতা সেই আদর্শ চালায় বাধা দিবার উপায় নাই। এবং এই জন্যই মনে হয় কলিকাতার চলিত কথা সাহিত্যে প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া ঢাকার ঈর্ষা বা আপত্তির বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো কারণ নাই।

নবযুগের সাধনা—

শ্রীকুলদাপ্রসাদ সান্যাল মল্লিক ভাগবতরত্ন বি-এ, প্রণীত। প্রকাশক লোটস লাইব্রেরী। মূল্য আট আনা। রাজর্ষি রামমোহন নবযুগের অগ্রদূত। তিনি বঙ্গের স্বাধীন চিন্তার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সংস্কার-পূত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ের

যুগ আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্দেশ্যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কার্য্য করিতেছেন এই পুস্তকে তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

উষা—

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। গুপ্তপ্রেস হইতে প্রকাশিত ১৭৭ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা। এখানি উপন্যাস।

কনক—

শ্রীবিনয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ২১৩ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা, মূল্য এক টাকা। এখানিও উপন্যাস।

মুদ্রারাক্ষস।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

(গল্প)

বৃদ্ধ বয়সে পত্নিবিয়োগ হওয়াতে বামনদাস একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধবয়সের এ দুঃখ অর্ব্বাচীন পুত্রগণ বুঝিল না, তাই যখন তাহারা তিন চারি দিন ধরিয়া ঈশান ঘটককে ক্রমাগত আসিতে এবং পিতার সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে দেখিল তখন অন্তরালে তাহারা ঈশানকে এমন শাসাইয়া দিল যে অতঃপর ঈশান আর বামনদাসের বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইতে সাহস করিল না।

সেদিন বদমায়েস প্রজা নিতাই প্রামাণিকের নিকট হইতে বহুদিনকার পড়ো খাজনা আদায়ের জন্য বামনদাস যখন স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া ছেঁড়া চটি ফটর ফটর করিতে করিতে বাহির হইল, তখন চৌধুরীদিগের বাগানের প্রকাণ্ড তালগাছের পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। গাঙ্গুলিদিগের পুষ্করিণীর পার্শ্বে যে অশ্বথ বৃক্ষ আছে, তাহারই সম্মুখে বামনদাস ঈশানের সাক্ষাৎ পাইল।

ঈষৎ হাসিয়া বামনদাস কহিল, "কি হে ঈশেন, আর ওদিক্কে যাও-টাও না যে?"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে যাব কি? ও বাড়ীতে মাথা গলালে আপনার ছেলেরা আমার পা ভাঙ্গবে বলেছে!"

বামনদাস কহিল, "যত কুলাঙ্গার জুটেছে! তা আমি আছি কেমন পা ভাঙ্গে দেখব না!"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে পা ভাঙ্গলে পর দেখা দেখিতে বিশেষ এসে যাবে না—তবে দুঃখ হচ্ছিল আপনার জন্যে—শরীরটা ক্রমেই যেন ভেঙ্গে পড়ছে—যত্ন আত্তি করছেন না বুঝি মোটে!"

বামনদাস ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তুমিও যেমন নিজের শরীরে আর যত্ন কে কবে করে থাকে, ঈশেন? গিন্নি কি তোয়াজেই রাখতেন—ছেলেপিলেরা কি কিছু বোঝে, না দেখে; নিজেদের নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত আছে!"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে, ঘোর কলি তবে আর বলেছে কেন? মোদ্দা এমন অযত্ন করলে শরীর আর কদিন টিঁকবে?"

"আর টিকেই বা লাভ কি, বল—এ যেন হালভাঙ্গা নৌকোখানা বানচাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি বইত নয়!" বলিয়া বামনদাস সহানুভূতি লাভের আশায় একটা হতাশা-মিশ্রিত হাসি হাসিল।

ঈশান কহিল, "বলেন কি, মশায়? আপনারা আছেন, তবু পর্ব্বতের আড়ালে আছি! তা একটা বিয়ে থা করে—"

"ঐ জন্যেই ত তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে চাই ঈশেন! একটি বিয়ে না করলে ত আর চলে না! সে যেমন আমাকে বুঝবে, চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে এমন কি ছেলে মেয়েরা পারে!"

"বটেই ত! বলে, দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে! তা ভারী একটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল!"

"কেন, কেন?"

"আজ্ঞে ঐ ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর এক শালী ছিল! চমৎকার মেয়ে, যেন দুর্গাঠাকরুণটি! আর বয়স, বলব কি মশায়, আপনার সঙ্গে মানাতো!"

"আহাহা! ঐ অমনটি হলেই ভালো হয়—হাজার হোক আমারও কিছু বয়স হয়েছে—এখন কি আর কচি মেয়ে মানুষ করা পোষায়! তা ছাড়া বুঝেছ আমি কেমনটি চাই?—এই দুদিনে আমাকে বুঝে নিতে পারে—আফিমটুকু ঠিক করে রাখলে, দুটো পান ছেঁচে দিলে, একটু গা-হাত-পা টিপে দিলে, দু ছিলিম তামাক—"

"আজ্ঞে হাঁ। ও আর আমাকে বলতে হবে না—অর্থাৎ আপনি চান এসেই একেবারে নিজের দখলটুকু বাগিয়ে ঠিক করতে পারে।"

"এই! এই! তুমি একটু দেখে শুনে লাগো দাদা—তোমায় বিশেষ রকম পরিতোষ করবো।"

ঈশান একটু মাথা হেলাইয়া আকাশের দিকে চাহিল—পরে কহিল, "কিন্তু মশায়, আমার একটি মিনতি আছে—আপনার বাড়ীতে আমি যেতে পারব না! যে সব ছেলে—আপনি বিবাহ করলে ছেলেপিলেও ত হবে তারা বিষয়ের অংশ নেবে—কাজেই এরা রেগে টং হয়ে আছে! বিয়ের কথা শুনলেই আমার পিঠে লাঠি হাঁকড়াবে! অথচ বাপের বিয়ে দেওয়াটা কত দরকার তা বুঝবে না! এই বুড়ো বয়সে সেবা যত্ন করে কে? তার জন্যেও ত—কি বলেন আপনি!"

বামনদাস কহিল, "কুপুত্র! কুপুত্র!" স্বরে একটা ভীতির আভাস জাগিয়া উঠিতেছিল। একটু কাশিয়া কহিল, "কিছু ভেবোনা দাদা— "

ঈশান কহিল, "না মশায় আপনার বাড়ী যেতে পারবো না, পথে ঘাটেই কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে এ সম্বন্ধে।"

বামনদাস কহিল, "তুমি একটু উঠে পড়ে লাগো দাদা—আবার সামনে ভাদ্র মাস আসছে, তিন মাস আর ও পাট হবে না! তুমি মনে করলেই সব হবে! বুঝেছো দাদা, এ ত গিন্নি মরেন নি, আমাকেই মেরে গেছেন।"

"বটেই ত, বটেই ত—তা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—যখন ঈশান ঘটক কথা দিয়েছে, তখন তার আর নড়চড় হচ্ছে না, এই বলে রাখলুম!"

"বেঁচে থাকো, দাদা,—চিরজীবী হও!"

ঈশান চলিয়া গেল। বামনদাস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঈশানের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইলে বৃদ্ধ নিতাই প্রামাণিকের উদ্দেশ্যে চলিল।

ইহার পর ঘোষেদের বাগানে, মিত্রদের বাড়ীর পাশে, গ্রামের বাবাঠাকুরতলায় ও ঈশানের ঘরে পরামর্শাদি এমন সবেগে চলিতে লাগিল যে ব্যাপারটা পুত্রগণের আর অগোচর রহিল না। এবং তাহারা ইহার পর এমন ভাব ধারণ করিল যে, বাধ্য হইয়া অবশেষে কলিকাতায় কালী দর্শনের নাম করিয়া বামনদাস একদিন গৃহত্যাগ করিল, ঈশান আসিয়া ষ্টেশনে বৃদ্ধের সহিত যোগ দিল। উভয়ে কলিকাতায় আসিল।

২

কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে এক মেসে আসিয়া দুইজনে একটি কক্ষ অধিকার করিল। ঈশান সারাদিন ট্রামে চড়িয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, ইডেন গার্ডেন দেখে, মধ্যে মধ্যে পাত্রীরও সন্ধান করিয়া ফিরে। বৃদ্ধ বামনদাস সারাদিন তামাকু ঢালিয়া সাজিয়া টানিয়া ঈশানের আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। মেসের সম্মুখ দিয়া ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া যায়, মাতাল হল্লা করে, দপ্তরীরা বই বাঁধে, বর্ষায় কলিকাতার রাস্তা নদীর মত হইয়া পড়ে, পাড়ার ছেলেরা সেই জলে কলার ভেলা ভাসায়, জানালার মধ্য দিয়া সে তাহাই দেখে। এমন করিয়াই দিন কাটিয়া যায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় ঈশান শশব্যস্তে আসিয়া কহিল, "দাদাঠাকুর!"

"কেন দাদা?"

ঈশান আবেগের সহিত কহিল, "চট্ করে পিরাণটা গায় তুলে একটা চাদর ঘাড়ে কর। কিনারা হয়েছে! এখনি যেতে হবে পাত্রী আশীর্ব্বাদ করতে,—সেই ভবানীপুরে!"

বৃদ্ধ বিস্মিতভাবে কহিল, "পাত্রী? কার—?"

ঈশান চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কার আবার, আপনার! বলেছি ঈশান যখন মনে করেছে, তখন ফস্কাবার জো কি! পাত্রীটি সুন্দরী, কুলীনের মেয়ে! বাপের পয়সার জোর নেই, এই আঠারোতে পা দিয়েছে—যেন আস্ত পরী গো দাদাঠাকুর, আস্ত পরী!"

সাজসজ্জা করিয়া বৃদ্ধ পাত্রী আশীর্ব্বাদ করিতে চলিল। পাত্রীটি সত্যই সুন্দরী! বিবাহের দিন স্থির হইল, ২৭এ শ্রাবণ। তার পূর্ব্বে ভালো দিন নাই।

কলিকাতায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। পাত্রী দেখাশুনায় বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল—ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, অগত্যা গাড়ী ভাড়া করিয়া বাসায় ফিরিতে হইল।

গাড়ীতে বসিয়া বামনদাসের তন্দ্রা আসিতেছিল—তন্দ্রার ঘোরে সে কত বিচিত্র মধুর স্বপ্ন দেখিতেছিল। যেন অগাধ সমুদ্রে সে ভাসিয়া চলিয়াছে—কূলকিনারা দেখা যায় না—তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—বুঝি জীবনের আশা ফুরাইল,—এমন সময় আলোকচ্ছটায় চারিধার ভরিয়া গেল—বৃদ্ধ প্রাণপণ

চেষ্টা করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখে, এক পরী উড়িয়া আসিতেছে! তাহারই পানে সে আসিতেছে!—সীমন্তে সিন্দূরের স্থলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে—মাথায় একরাশি আলোকের ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে—পরী তাহাকে উঠাইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে—সে যেমন পরীর কোমল সুন্দর হাত ধরিয়া জল ছাড়িয়া উঠিবে, অমনই কড় কড় শব্দে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল—আকাশের বুক চিরিয়া একটা আগুনের রেখা ছুটিয়া গেল—একটা তরঙ্গ আসিয়া সজোরে তার মাথায় ঘা দিল—মাথাটা কাঁপিয়া উঠিল! তন্দ্রা ভাঙ্গিলে বৃদ্ধ দেখিল, গাড়ীর কাঠে মাথাটা রীতিমত ঠুকিয়া গিয়াছে। চেতনাসঞ্চারে একটা কথা মেঘগর্জ্জনের মত বৃদ্ধের বুকের মধ্যে ধ্বনিয়া উঠিতেছিল—পাত্রী দেখিতে গিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে এক রমণীকে সে বলিতে শুনিয়াছিল, "বাহাত্তুরে বুড়ো—এখনও বিয়ের সখ! ও বুড়ো মিন্সে বরের বাপ, না ঠাকুদ্দা!" আর একজন কহিল, "না গো, এই বর!" সঙ্গিনী উত্তর দিয়াছিল, "মরণ আর কি! এমন মেয়েটা এই বুড়োর হাতে দেবে—তার চেয়ে থুবড়ো করে রাখলে না কেন!" এই কথাটাই বৃদ্ধের বার বার মনে পড়িতেছিল।

৩

গাত্রহরিদ্রার দিন অপরাহ্ণে ঈশান আসিয়া বলিল, "একটু মুস্কিল হয়েছে"। বামনদাসের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—সে কহিল, "কেন?"

ঈশান কহিল, "ওরা বলছিল, বিয়ে ত আমরা দোব—কিন্তু তারপর জামাইয়ের বয়স হয়েছে—যদি ভালোমন্দ হয়, তখন আমাদের রাইমণি কি জলে পড়বে—ছেলেরা মারধোর করে যদি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়—তার উপায় কি হবে?"

একটা ঢোঁক গিলিয়া বামনদাস কহিল, "তাই ত ঈশেন—শুভকার্যের সময় এ'ত মহাবিভ্রাট দেখছি! ভালোয় ভালোয় এখন—"

ঈশান কহিল, "মেয়ের মা অতশত কিছু বলেনি—মেয়ের এক মামা আছে, হুগলির আদালতে সে মোক্তারি করে—সেই আজ এসে ফ্যাসাদ বাধালে। আর বিশেষতঃ আপনার ছেলেগুলিও কিছু সত্যি শান্তশিষ্ট ত নয়!"

বামনদাস কহিল, "তাই ত উপায় কি করা যায় এখন, ঈশেন? তুমিই বলো দাদা? আমার ত শুনে আর হাত পা আসছে না। আহা এই দুটো দিন ভালোয় ভালোয় কোন মতে কেটে গেলে মার পূজো দিয়ে আসি যে আমি—"

ঈশান কহিল, "তা দেখুন, এক উপায় আছে! আমি ত আপনার মতের উপর নির্ভর না করেই এক কথা বলে এসেছি—সে মামার যা রোখ, বলে, এর একটা নির্ণয় না হলে বিবাহ হতেই পারে না—বলে, তার এক কুটুম্ব কে আছে কালনায় বাড়ী—সে এক পয়সা না নিয়ে বিয়ে করতে রাজি আছে—তার বয়স আপনার চেয়েও নাকি ঢের কম, তা ছাড়া তার ছেলে নেই, দুটি মেয়ে তার আবার একটির বিয়ে হয়ে গেছে—"

বামনদাস মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িল, "তাই ত তুমি কি বলেছ?" ঈশান কহিল, "দেখুন কর্ত্তা, চাল চালতে ঈশেন যে হঠবে এমন ঈশেন আমি নই। আমি অমনি বললুম 'সে কি কথা—কর্ত্তা ত দেশে ছেলেদের ত্যাজ্যপুত্র করে এসেছেন—তারা ওঁকে দেখে না, শোনে না—তাইত বিবাহ করছেন, নইলে বিবাহে ওঁর ইচ্ছাই ছিল না! তা বিবাহ যখন কচ্ছেনই, তখন স্ত্রীর জন্য ব্যবস্থা করবেন বই কি!' তা আমি ত একটা কথা বলে ফেলেছি!"

বামনদাস কহিল, "কি কথা, ঈশেন?"

ঈশান কহিল, "আজ্ঞে, আমি বলিছি, বিয়ের রাত্রে লেখাপড়ার কাগজ ঠিক করে রাখবেন—কর্ত্তা একখানা দানপত্র করে আপনাদের মেয়ের নামে সমস্ত বিষয় কড়ি লিখে দেবেন। এই ত কর্ত্তা আমি বলে এসেছি, এ কথা না বললে বিয়ে ত ভেঙ্গে যাচ্ছিল!"

বামনদাস কহিল, "বাঃ বেশ বলেছো, খাসা কথা। আর কি জানো ঈশেন, আমিও তাই ভাবছিলুম—বিয়ে করে একে নিয়ে যদি বাড়ী যাই, তাহলে ত ছেলেগুলো তিষ্টুতে দেবে না। তাই আমার ইচ্ছে এখানেই ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া করে না হয় থাকবো!"

ঈশান কহিল, "আরও এক কথা। ওঁরা বলে দিয়েছেন, বিবাহ কলকাতায় হবে না। মেয়ের মামার বাড়ী রিষড়ে—এখানে লোকজন আসায় খরচ আছে, তাই দেশেতে কাজটা হয় মেয়ের মামার সেইরূপ ইচ্ছা!"

"তা, তা বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই!"

ঈশান কহিল, "তা হলে গোটাকতক টাকা এখন দিতে হবে, আমাকে। টোপর, চেলির কাপড় এ সবগুলো কিনে আনতে হবে ত। সেদিন লগ্ন হল রাত্রি একটার পর! তা তিনটে অবধি সময় আছে! আমরা পৌণে দশটার গাড়ীতে বেরুবো, তাহলেই হবে!"

বামনদাস ঈশানের হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা তোমার উপরই সমস্ত ভার দিলুম। তুমিই হলে কর্ম্মকর্ত্তা! যা ভাল হয় করবে—পয়সা কড়ি তোমার কাছে সব দিচ্ছি, যাকে যা দিতে হয়, যা খরচপত্র দরকার সব তুমিই করবে! আমার জন্য দেশের কাজকর্ম্ম ফেলে যে রকম করে বসে আছ, তোমার ঋণ কোনকালে শোধ দিতে পারব না। তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে, তা বলতে পারি না! ভগবান তোমার ভালো করুন, দাদা!"

৪

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পরই একখানা সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ীর মাথায় ট্রাঙ্ক চাপাইয়া বামনদাস ও ঈশান হাবড়া ষ্টেশনে আসিল। বামনদাসের পরিধানে থান। চেলিখানা পরিয়া ষ্টেশনে আসিতে কেমন বাধিতেছিল। গায়ে গরদের কোট, গলায় কোটের নীচে ফুলের মালা!

হাবড়া ষ্টেশন তখন লোকে লোকারণ্য! চারিধারে আলো, চাৎকার, গোলমাল! বৃদ্ধ বামনদাসের মনে হইতেছিল যেন তাহার বিবাহের জন্যই চারিধারেই একটা মহা ধুম বাধিয়া গিয়াছে।

ঈশান তাহাকে হুইলারের বুকষ্টলের নিকট আনিয়া বলিল, "আপনি বসুন। আমি টিকিট কিনে আনছি, উঠবেন না যেন!"

বামনদাস কহিল, "বেশ দাদা, তুমি শীঘ্র এস, ট্রেনখানা যেন ফেল না হয়ে যাই।" কথাটা ভাবিতেও বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিতেছিল।

বৃদ্ধ বসিয়া ভাবিতেছিল, ভবিষ্যতের সুখের কথা! একটি নোলকপরা কচিমুখের মধুর হাসি, চুড়ি বালাপরা দুইখানি কোমল হস্তের মধুর স্পর্শ, অলক্তরঞ্জিত দুই খানি চরণের মলের রুনুঝুনু সঙ্গীত! শুষ্ক বৃক্ষ পত্রপল্লবে আবার সাজিয়া উঠিবে। নবোঢ়ার কত আদর আব্দার—ভাবিতেও বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল! বামনদাস আরও ভাবিতেছিল, মাথার চুলগুলা পাকিয়া গিয়াছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়—প্রাণটার মধ্যে এখনও রসের নির্ঝর শুখায় নাই ত! পাকাচুল কলপ লাগাইলেই কালো হইয়া যাইবে—আর দাঁত কয়টা বাঁধাইয়া লইতে কতক্ষণ! মনে একটা অনুতাপ জাগিয়া উঠিল, এই দুই দিনে যদি সুবিধা করিয়া দাঁত কয়টা বাঁধাইয়া লইতে পারিতাম, চুলগুলার রং বদলাইয়া লইতাম!

টিকিট কিনিতে গিয়া ঈশান এক গোলে পড়িয়াছিল। অত্যধিক বুদ্ধি খেলাইতে গিয়া এক টিকিট কলেক্টরের হস্তে পড়িয়া সে বিষম নিগ্রহ ভোগ করিল। কোন মতে হাতে পায় ধরিয়া পুলিশের হাত এড়াইয়া সে টিকিট কিনিতে ছুটিল!

ঈশানের বিলম্ব দেখিয়া বৃদ্ধ এদিকে অস্থির হইয়া পড়িতেছিল—তখন বাঁশী বাজাইয়া আরো দুই চারিখানা ট্রেন ছাড়িতেছিল—আসিতেছিল। অগণিত জনপ্রবাহ দেখিয়া বৃদ্ধ আকুল হইয়া উঠিতেছিল যদি ঈশান তাহাকে লইতে ভুলিয়া গিয়া থাকে—চারি ধারে লোক ছুটিয়া ট্রেনের দিকে চলিয়াছে। বৃদ্ধের মন ধৈর্য্য মানিল না, সে অশান্ত হইয়া উঠিল।

একটা কুলি আসিয়া কহিল, "মোট লেগা নেহি বুড়া বাবু—টাইম তো হো গিয়া, ট্রেন আভি ছুট্ যায়গা!" বৃদ্ধ কথাটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কুলির মস্তকে মোট চাপাইয়া ক্ষিপ্রগতিতে, ছুটিয়া একেবারে ট্রেনে আসিয়া চাপিল। কোন মতে স্থান সংগ্রহ করিয়া ঈশানের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। ট্রেন যথাসময়ে বংশী-ধ্বনির সহিত প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়া ছুট দিল।

বামনদাসের প্রথমটা তত ভাবনা হয় নাই—সে ভাবিল, রিষড়ায় নামিয়া ঈশানকে খুঁজিয়া লইবে! পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোককে কহিল, "মশায়, রিষড়া ষ্টেশনে অনুগ্রহ করে আমায় নামিয়ে দেবেন ত।"

ভদ্রলোকটি সবিস্ময়ে কহিল, "রিষড়া? আপনি রিষড়া যাবেন?"

"আজ্ঞে, হাঁ!"

"করেছেন কি, আপনি! এ যে পঞ্জাব মেল—এ'ত রিষড়ায় থামে না!"

"তবে" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কি হবে? কোথায় নামবো তবে!"

"আর কোথায় নামবেন—একেবারে বর্দ্ধমানে গিয়ে গাড়ী থামবে! তার আগে আর নামবার উপায় নেই!"

বর্দ্ধমান! বৃদ্ধের ধারণা ছিল, বর্দ্ধমান প্রয়াগের নিকট! সে কতদূর! সর্ব্বনাশ! হায়, হায়, এখন উপায় কি! একবার মনে হইল, চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়ে। ঈশানের উপর রাগ হইল—সে তাহাকে এমন করিয়া বসাইয়া রাখিয়া শেষে একেবারে মজাইল! হতভাগা, বদমায়েস! বামনদাসের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।

বাবুটি কহিলেন, "আপনি বুঝি হাবড়া ষ্টেসনে কখনো আসেন নি। কলকাতায় থাকেন না?"

বামনদাস কহিল, "আজ্ঞে না।"

বাবুটি কহিলেন, "কারুকে জিজ্ঞাসা করে গাড়ীতে উঠতে হয়। কুলি বেটা কি জানতো না কোথায় যাবেন আপনি!"

আর একটি ভদ্রলোক চশমা চোখে দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। চশমার উপর দিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি কহিলেন, "আরে এই হাবড়া ষ্টেশন এমনই হয়েছে যে—লোকাল ট্রেনগুলো কোন প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে ছাড়বে, যাদের রীতিমত ট্রাভেল করা অভ্যাস নেই, তারা ধারণা করতে গিয়েইত ট্রেন ফেল করে বসে।"

বামনদাসের চক্ষে সমস্ত জগৎটা ছোট একটা কৃষ্ণবিম্বে পরিণত হইল। নানা তর্ক বিতর্কের মধ্যে সে দিশাহারা হইয়া পড়িল। তখন ট্রেন দ্রুতগতিতে ছুটিতেছিল—মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ষ্টেশনগুলা ক্ষীণ আলোক লইয়া বাহিরের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির মত ক্ষীণভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বামনদাস ভাবিতেছিল, উপায় নাই, উপায় নাই—বিবাহের সমস্ত আশা বুঝি নির্ম্মূল হইল! হায়, রাইমণি!

ট্রেন আসিয়া বর্দ্ধমানে থামিলে, বাবুর দল বৃদ্ধকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল, কহিল, "ষ্টেশনে বলুন, সমস্ত ব্যাপার খুলে—তারপর ওদিককার ট্রেন এলে তাইতে করে রিষড়ে যাবেন।"

একজন বলিল "ছ সাত ঘণ্টা পরেই ট্রেন পাবেন!"

বামনদাস হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ষ্টেশনে সংবাদ লইয়া জানিল, ছয় সাত ঘণ্টা পরে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আছে—রিষড়া পৌঁছিতে ভোর হইয়া যাইবে! হতাশ-ভাবে বামনদাস একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। তাহার চোখের সম্মুখে বিবাহ-বাটীর ছবিখানা বায়স্কোপের ছবির মত ফুটিয়া উঠিল! শাখ বাজিতেছে—হুলুধ্বনি হইতেছে—চারিধারে লোক জন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ঘুরিতেছে—চেলির কাপড় পরা, সিঁথিময়ুর মাথায় অবগুণ্ঠিতা বধূ পিঁড়ির উপর মাটির পুতুলটির মত বসিয়া আছে! বর কোথায়? নাই, নাই—! সে বেচারা বর্দ্ধমান ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে বেঞ্চে পড়িয়া রহিয়াছে! কি গ্রহ!

৫

ভোরে আসিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন যখন রিষড়া ষ্টেশনে থামিল, তখন বৃদ্ধ শশব্যস্তে গাড়ী হইতে নামিল। সারারাত্রি জাগিয়া তাহার কোটরগত চক্ষু আরও কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। নামিয়াই দেখে, ঈশান দ্রুত ট্রেনের দিকে ছুটিয়াছে। বৃদ্ধের মৃতদেহে যেন নবপ্রাণ সঞ্চারিত হইল। বৃদ্ধ ডাকিল, "ঈশেন!"

ঈশান চমকিয়া ফিরিয়া কহিল, "কে? কর্ত্তা নাকি! এ কি, কোথায় ছিলেন, সারারাত্রি?"

"বর্দ্ধমানে!" বামনদাসের চক্ষে সত্যই জল আসিল।

তখন বাহিরে গিয়া বৃদ্ধ সকল কথা—দুর্দ্দশার আমূল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল! ঈশান বলিল, "বেশ—আমি টিকিট নিয়ে এসে দেখি, আপনি নেই! ট্রেনে উঠলুম—আপনাকে খুঁজে সাড়া পেলুম না! ভাবলুম বুঝি কোথায় আছেন, ঘুমিয়ে পড়েছেন! রিষড়া ষ্টেশনেও খুঁজে পেলুম না—আরো দুএকটা ট্রেন অপেক্ষা করলুম—আপনাকে পেলুম না! তখন এঁদের বাড়ীর দিকে চললুম! পথই কি চিনি! এ'কে জিজ্ঞাসা করে তাকে ধরে কোনমতে পৌঁছুনো গেল! আপনার কথা তুলতেই তারা ত অবাক! আমাকে 'জোচ্চোর' বলে সব তেড়ে এল। বলে, 'গায়ে হলুদ দিয়ে জাত নষ্ট কর'! কোথাকার ঘাটের মড়াকে ধরে এনে বর খাড়া

করা—' আমি ত গতিক বুঝে চম্পট দিলুম। তারপর টিপ টিপ্ করে বৃষ্টি সুরু হল, আমি না রাম না গঙ্গা বলে সটান্ ভিজে ষ্টেশনে এলুম! সারারাত্রি বৃষ্টির ছাট আর মশার কামড় সহ্য করে মশায়, সকালের ট্রেনে বাসায় ফিরছিলুম, এমন সময় আপনি ডাকলেন—"

বামনদাস কহিল, "অদৃষ্টের ভোগ সব দাদা! এখন একবার চল! খপরটা নেওয়া যাক! সে মেয়ের বিয়ে হল কি না!"

"হ্যাঁঃ, সেই বৃষ্টির রাতে বর জোগাড় করা সহজ ব্যাপার কিনা! তাহলে আর বিয়ে এদ্দিন আপনার জন্যে পড়ে থাকে? বর ত আর দোকানের মুড়ি নয় যে, খোলায় চাট্টি চাল ফেলে ভেজে নিলেই হল!"

ষ্টেশনে গাড়ী ছিল না। একখানা পাল্কীতে বামনদাস চড়িয়া বসিল, ঈশান পদব্রজে চলিল।

পাত্রীপক্ষের বাড়ীর কাছাকাছি রাস্তা দিয়া দুইজন লোক যাইতেছিল। ঈশান শুনিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিতেছে, "সেই রাত্রে কি সর্ব্বনাশ ভদ্রলোকের! ভাগ্যে গাঙ্গুলির ভাগনেটিকে পাওয়া গেল—নৈলে বুড়ো বর বেটা ত আচ্ছা নাকাল করেছিল। যা হোক ভদ্রলোকের জাতটা রইল।"

আর একজন বলিল, "আর মেয়েটারও গতি হল! নইলে সে বুড়ো বেটার হাতে দেওয়াও যা, ঘাটের মড়া ধরে দেওয়াও ত তাই!"

ঈশান ভাবিল, কথাটা ত ভালো নয়। কিন্তু কথাটা সে শুনিয়া চাপিয়া গেল।

এমন সময় অদূরে শঙ্খনিনাদ শুনা গেল।

বামনদাস কহিল, "ও কি ঈশেন, শাঁখ বাজে যে! ব্যাপারখানা কি?"

"আজ্ঞে, বড় সুবিধের বলে ত মনে হচ্ছে না!"

"কারুকে জিজ্ঞাসা করো দেখি!"

একটি বালক খাবার হস্তে দোকান হইতে ফিরিতেছিল। ঈশান তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও শাঁখ বাজে কোথায় জানো?"

বালক কহিল, "গাঙ্গুলির ভাগনের সঙ্গে ওদের রাইমণির কাল রাত্রে বিয়ে হয়েছে! এখন বরকনে বিদেয় হবে, বরণ হচ্ছে কি না—" বালক চলিয়া গেল।

বামনদাস ডাকিল, "ও ঈশেন, বলে কি? এখন উপায়।"

ঈশান কহিল, "পাল্কী ফেরানো যাক, ষ্টেশনের দিকে! ভাবনা কি, কর্ত্তা,—ঈশেন ঘটক বেঁচে থাকুক্—শ্রাবণে হলনা, অগ্রাণের প্রথম তারিখেই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ঘটে যাবে।"

পাল্কীওয়ালা ষ্টেশনের দিকে পাল্কী ফিরাইল। বামনদাস পাল্কীর মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইতেছিল! বিবাহবাটী হইতে শঙ্খের সঘন নিনাদ মুহুর্মুহু উত্থিত হইয়া তখন নিস্তব্ধ পল্লীটিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। এবং গতরাত্রের দুই একটা অতৃপ্ত পথের কুক্কুর নিস্ফল আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মিতে

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইস্লামপুরের জমীদারপুত্র সুবোধকুমার ভৈরব নদের জলে কাগজের নৌকা ভাসাইতেছিল। নৌকা যখন খানিক দূর ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন সে একটি কঞ্চি দিয়া নৌকাখানি টানিয়া তীরের কাছে আনিতেছিল। এমন্ করিয়া সে ও তাহার নৌকা গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গেল।

গ্রামের বাহিরে আসিয়া বালকের চমক ভাঙিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, পাখীরা কলরব করিতে করিতে কুলায়ে ফিরিতেছে, কৃষকেরা মাঠের কাজ সারিয়া লাঙ্গল কাঁধে বাড়ির দিকে চলিয়াছে। অপরিচিত স্থানে রাত্রি আসিল দেখিয়া সুবোধকুমারের প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার মা তাহার কাছে নাই,—সে মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

সুবোধকুমারের সমবয়স্ক একটি বালক একগোছা ছোলার শাক হাতে করিয়া সেইদিকে আসিতেছিল। সে সুবোধকুমারকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোত্থেকে এসেচ ভাই? কোথায় যাবে?"

সুবোধ বলিল, "আমি পথ ভুলে গেছি—আমি বাড়ি যাব।"

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

সুবোধ বলিল, "ইস্‌লামপুর জমীদারদের বাড়ি।"

বালক বলিল, "তুমি ভয় কোরো না, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব। এখন আমাদের বাড়ি আমার মা'র কাছে চল।"

অপরিচিত স্থানে বন্ধু লাভ করিয়া সুবোধ চক্ষের জল মুছিল। বালক সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

সে বলিল, "আমার নাম সুবোধকুমার।"

বালক বলিল, "আমারও ভাই তাই নাম। ভারি মজা না! আজ থেকে তুমি আমার মিতে।" সুবোধকুমারের মুখে হাসি ফুটিল।

সুবোধ তাহার মিতের হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়িতে আসিল। ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ির বাহিরে খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া বেগুনের ক্ষেত করা হইয়াছে, বাড়ির দেয়াল বাহিয়া কুমড়োর গাছ উঠিয়াছে। বাড়ির ভিতর উঠানের এক পাশে তুলসীমঞ্চে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। আর এক পাশে মাচার উপর শসা ঝুলিতেছে। ভিতরে দুইটি মাত্র ঘর—একটি ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর একটি ঘর অন্ধকার।

বালকদের গৃহপ্রবেশ-শব্দে একটি স্ত্রীলোক ত্রস্তপদে যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আরে হাব্‌লা এসেছিস্। আমি সন্ধ্যে থেকে ঘর আর বা'র কর্‌ছি। এত দেরী ক'রলি কেন! আমি ভেবে ভেবে মরছিলাম। সঙ্গে এ কে?"

হাব্‌লা বলিল, "মা সেই কথাটাই আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়। বল দেখি কে?"

মা বলিল, "আমি যদি তাই জান্‌ব, তবে জিজ্ঞাসা করব কেন!"

হাব্‌লা বলিল, "একটা আন্দাজ করে' বল না।"

হাব্‌লার মা বলিল, "ক্ষ্যাপা ছেলে, এতে কি আন্দাজ করব—তুই বল্‌না কে?"

"বল্‌ব, তবে বল্‌ব, এ আমার মিতে" এই বলিয়া হাব্‌লা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাব্‌লার মা হাব্‌লার মুখে সব শুনিয়া সুবোধকে আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেল। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কোন ভয় নেই বাছা, আমরা তোমায় বাড়ি দিয়ে আস্‌ব।"

হাব্‌লা বলিল, "মা, মিতে মা মা বলে কাঁদ্‌ছিল।" "বাছা আমার, বাবা আমার" বলিয়া হাব্‌লার মা সুবোধকে কোলের ভিতর টানিয়া লইল এবং স্বহস্তে তাহাকে খাওয়াইল—খানকতক শসা, একটু ছানা, একটু মোহনভোগ—বিধবার ঘরে আর কিছু ছিল না। খাওয়া হইলে হাব্‌লার মা পুত্রের হাত ধরিয়া এবং সুবোধকুমারের অনিচ্ছাসত্ত্বে তাহাকে কোলে করিয়া জমীদার-বাড়ি চলিল।

জমীদারবাড়িতে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। দরওয়ান, চাকরবাকর হাঁকডাকে গ্রামখানি সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। গালপাট্টাধারী আকালী সিং দীর্ঘ যষ্টি হস্তে "খোকাবাবু কিধার গিয়া" "খোকাবাবু কিধার গিয়া" বলিতে বলিতে একদিক দিয়া চলিয়াছে। চাকরবাকর লণ্ঠন হাতে আর একদিক দিয়া ছুটিয়াছে।

এমন সময় হাব্‌লার মা সুবোধকে কোলে করিয়া বাড়ির ভিতর হাজির। গৃহিণী এতক্ষণ সপ্তমে সুর চড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন, সুবোধকে দেখিয়া সুর নামাইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে হাব্‌লার মাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী উঠিলেন, চাবির গোছা ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে উপরে গেলেন এবং খানিক ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হাব্‌লার মা'র হাতে দুইটি টাকা দিতে গিয়া বলিলেন,—"ওগো ভালমানুষের মেয়ে, এই দু'টাকা দিয়ে তোমার ছেলেকে নতুন কাপড় কিনে দিও।"

হাব্‌লার মা অপমানিত বোধ করিয়া "আমরা ভিখিরি নইগো আমরা গেরস্ত ঘরের মেয়ে"—এই বলিয়া হাব্‌লার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সুবোধ ছুটিয়া আসিয়া হাব্‌লার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, এ আমার মিতে। একে আজ আমাদের বাড়ি থাকতে বল।"

গৃহিণী হাব্লার মা'র উত্তর শুনিয়া রাগে গস্ গস্ করিতেছিলেন, ঠাস্ করিয়া সুবোধের গালে চড় মারিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, মিতে পাতাবার আর লোক পাওনি? চল্ ওপরে চল্।" সুবোধ হাব্লার গলা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। হাব্লার চোখ ছল্‌ছল্ করিতেছিল, সে আস্তে আস্তে মা'র সঙ্গে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

তারপর হাব্লার সঙ্গে সুবোধকুমারের অনেকবার দেখা হইয়াছে। মাঠে, ঘাটে সুবোধ হাব্লার হাত ধরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা সমস্ত সকাল বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে। চাষাদের ক্ষেতে চাষাদের সঙ্গে আলু তুলিয়াছে, বাগানে ফুল তুলিয়াছে, নদীতে নৌকা ভাসাইয়াছে, পুকুরে মাছ ধরিয়াছে,—সুবোধের মা অনেক মারিয়া ধরিয়াও সুবোধকে পারিয়া ওঠেন নাই। সুবোধ জলখাবারের যাহা পয়সা পাইত, খাবার কিনিয়া মিতেকে খাওয়াইত,—তাহার মিতেও তাহাকে বাড়ি লইয়া গিয়া মাকে দিয়া লুচি ভাজাইয়া মোহনভোগ তৈয়ারি করাইয়া খাওয়াইত। বিধবার এই হাব্লা ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। তাহার কিছু ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা ছিল তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত।

এইরূপে যখন সুবোধের সঙ্গে হাব্লার বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে চলিয়াছে, তখন একদিন সুবোধ সন্ধ্যার সময় হাব্লাদের বাড়ি আসিয়া বৃষ্টির জন্য সকাল সকাল বাড়ি ফিরিতে পারিল না। সেদিন হাব্লা জেদ ধরিল, "মা, আজ মিতে আমাদের বাড়ি থাক্। তুমি আজ খিচুড়ি কর।" মা কিন্তু জমীদারগৃহিণীর স্বভাব জানিত, সেইজন্য একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হাব্লাও কিছুতে ছাড়িবে না। তার মা বলিল, "আমরা গরীবলোক, সুবোধ যদি আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়ি থাকে, তাহ'লে সুবোধকে ওর বাপমা দু'জনেই খুব বক্‌বেন, হয় ত মারবেন। সেটা কি ভাল?"

হাব্লা তাই শুনিয়া সুবোধের মুখের দিকে চাহিল। সুবোধ মারের ভয় করিলেও মিতের বাড়ি একদিন থাকিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

দুপুর রাতে হাব্লাদের বাড়িতে ডাকাত পড়ার মত গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। কেহ দরজা ভাঙে, কেহ পাঁচিল টপ্‌কাইয়া ওঠে। হাব্লার মা বাহির হইয়া দেখিল, সকলেই জমীদার-বাড়ির লোক। তাহারা হাব্লার মাকে দেখিয়া গালি দিয়া বলিল, "খোকাবাবু কোথায় আছেন শীগ্‌গীর বল্!" সুবোধ বাহির হইয়া তাহাদিগকে অনেক বকিল, কিন্তু তাহারা সুবোধের কথা মোটেই গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "মাঠাকুরুণ হুকুম দিয়েচেন মাগীর চুলের মুঠি ধরে' নিয়ে যেতে।" হাব্লার মা তাই শুনিয়া বলিল, "চল আমি যাচ্চি।"

সেই রাত্রে সুবোধ তাহার পিতার নিকট এমন মার খাইল যাহা তাহার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। সে মার খাইয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী হাব্লার মাকে বলিলেন, "ছোটলোক মাগী, তুই আস্তাকুঁড়ে পড়ে' থাকিস্—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা তুই জমীদারের ছেলেকে বাড়িতে রাখিস্।"

হাব্লার মা বলিল, "দিদি, আমরা ছোটলোক নই আমরা গেরস্ত।"

জমীদারগৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিলেন, "ওমা কি হবে! ছোটলোক নচ্ছার মাগী আমাকে বলে দিদি! আস্পর্দ্ধা কম নয়! তুই নাকি আমার ছেলেকে খিচুড়ি খাইয়েচিস্! ওমা কি ঘেন্নার কথা!"

হাব্লার মা বলিল, "দিদি, আমরাও ভাল জাতের মেয়ে—আমাদের বাড়ি খেতে দোষ কি।"

কথা শুনিয়া গিন্নি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ফের যদি আমার ছেলেকে তোরা ডেকে নিয়ে যাস্ ত তোদের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করব।"

সুবোধ চোরের মত তাহার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে তাহার ঘুম হইল না—সমস্ত রাত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাব্লা আর সুবোধের দেখা পায় না। সে সুবোধদের বাড়ির আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, নদীর ধারে গিয়া বসে, বাগানে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—কিন্তু সুবোধ আর আসে না। সে তাহার মিতের জন্য চারিখানি ঘুড়ি তৈয়ারি করিয়াছে, দুইখানি ভেলা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কঞ্চি

কাটিয়া ভাল ছিপ্ তৈয়ারি করিয়াছে। নদীতে ছিপ্ ফেলিয়া ভাবে সুবোধ এখনি পিছন হইতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিবে, —সে কিন্তু প্রথমেই বলিবে না যে, মিতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিয়াছে। সে প্রথমে হরিদাস, গৌরসুন্দর, নিতাইচাঁদ আরও কত কি নাম করিবে। তাহার পর বলিবে মিতে। তখন উভয়ের মধ্যে মস্ত হাসাহাসি পড়িয়া যাইবে। ছিপে বড় মাছ উঠিলে হাব্লা ভাবে, এ মাছটা মিতেকে দেখাইতে হইবে। তিন চার দিন বাড়িতে রাখিয়া মাছটা যখন পচিয়া যায়, দুর্গন্ধ ছোটে, তখন সে মাছটাকে ফেলিয়া দিয়া আসে। বাগানে গিয়া রাশি রাশি ফুল তোলে, টগর, বেল, মল্লিকা, জুঁই—বড় একটা মালা গাঁথে, ভাবে মিতের গলায় দেব। যখন ফুলগুলি শুকাইয়া যায় তখন হতাশ হইয়া মালাটি ফেলিয়া দেয়। আবার সন্ধ্যার সময় সুবোধের বাড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, যদি একবার দেখা পায় তবে ডাকিবে।

একদিন যখন হাব্লা লুকাইয়া সুবোধদের বাড়ির কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিল, সুবোধদের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। কেহ ডাক্তার আনিতে ছুটিয়াছে, কেহ ঔষধ আনিতে চলিয়াছে, কেহ "বরফ আন" বলিয়া চীৎকার করিতেছে—লোক জন ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। হাব্লা শুনিল, সুবোধের কলেরা হইয়াছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল,—সে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার মা'র নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, "মা মিতের কলেরা হয়েছে। চল মা দেখে আসি চল।"

সেদিন মা ও ছেলের কাহারও খাওয়া হইল না। দুজনে জমাদার-বাড়ি গিয়া জমীদার গৃহিণীর পায়ে ধরিল, বলিল, "আমরা সুবোধের শুশ্রূষা করব।" জমীদার-গৃহিণী আজ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। হাব্লা ও তাহার মা সুবোধের কাছে বসিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। তাহাদের শুশ্রূষার গুণেই সুবোধ যে, এ যাত্রা রক্ষা পাইল সকলেই তাহা একবাক্যে বলিতে লাগিল। হাব্লা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুবোধের কাছছাড়া হয় নাই।

সুবোধ যখন আরোগ্যলাভ করিল, তখন ডাক্তারকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল, এক শত টাকা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করা হইল এবং প্রায় চারি শত টাকা খরচ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার পূজা দেওয়া হইল। তখন গৃহিণী ভাবিলেন, হাব্লা ও হাব্লার মাকে কিছু দেওয়া হইল না। এই মনে করিয়া পাঁচটি টাকা হাব্লার মাকে দিতে গেলেন। হাব্লার মা বলিল, "দিদি, আমরা ওজন্যে আসি নি।"

আবার সেই দিদি! গৃহিণী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আমরা বাছা, ওর বেশী দিতে পারব না।" হাব্লা ও হাব্লার মা কোন কথা না কহিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এবার হাব্লার পালা। সে এই সাত আট দিন নিজের শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করে নাই। সে স্নান করে নাই, পেট ভরিয়া খায় নাই, রাত্রে ঘুমায় নাই। কলেরা সুবোধকে অব্যাহতি দিল কিন্তু তাহাকে চাপিয়া ধরিল। হাব্লার মা হাব্লার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

হাব্লা ঔষধ খাইতে চাহিত না, কেবল বলিত, "আমার মিতেকে একবার এনে দাও, আমি তাকে দেখ্ব।"

হাব্লার মা তিন চারি বার জমাদার-বাড়ি গিয়া সুবোধের মা'র নিকট অনুনয় বিনয় করিল, তাঁহার পায়ে ধরিল, কিন্তু কোন কিছুই খাটিল না। সুবোধের মা বলিলেন, "আমার সুবোধ তোমাদের বাড়ি যেতে পার্বে না বাছা, কেন বিরক্ত করচ। আমি বল্ছি সে যেতে পার্বে না।" হাব্লার মা কর্ত্তাকে গিয়া ধরিল, বলিল, "আমার ছেলে একটিবার সুবোধকে দেখ্তে চায়। সে একবার আমার সঙ্গে আসুক।" কর্ত্তা বাললেন, "সুবোধের শরীর খারাপ, যেতে পার্বে না।" হাব্লার মা হতাশমনে ফিরিয়া চলিল।

সুবোধ ঘরে বসিয়া হাব্লার মা'র সকল কথা শুনিয়াছিল। সে খিড়কির দরজা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে হাব্লার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। হাব্লার মা তখন অর্দ্ধেক পথে।

হাব্লা সুবোধকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিছানায় উঠিয়া বসিল। সুবোধ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল "মিতে।" হাব্লা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "মিতে।"

হাব্লার মা যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন সুবোধ হাব্লার মৃতদেহ বুকে করিয়া বসিয়া আছে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞানে সাহিত্য

জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্য্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্য্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড় এলোমেলো মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিম্বা কাঁদিতেছে। মৃদুস্পর্শ ও মৃদু আঘাত; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্লভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্ত্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্ত্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সঙ্কোচ। আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ—সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ—হাসির পরিবর্ত্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবল মাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাসগত, কতকটা খামখেয়ালী। এইরূপ বহুবিধ ভিতর বাহিরের আঘাতবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তিবলে বহুবৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি।

জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞান-সেবকের স্থান আছে?

এই সভা বাঙ্গলা দেশের সাহিত্য-সম্মিলন। ভারত-সাগর যখন আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাসিত মেঘকে আকাশে সঞ্চিত করিয়া তোলে, তখন সে আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তখন তাহার বক্ষের উপর বাতাস বহিতে থাকে, এবং একদিন তাহার এই মেঘ-সঞ্চয়কে সে আপনার বঙ্গ-উপকূলে পাঠাইয়া দেয়। অবিরাম বায়ু তাহাকে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে থাকে, দেখিতে দেখিতে দেশ দেশান্তর সফলতায় ভরিয়া উঠে।

তেমনি বাঙ্গলা দেশের চিত্তসাগর হইতে যে সকল উচ্ছ্বাস নানা আকার ধরিয়া এখানকার আকাশে সঞ্চিত হইতেছে, সে কি কোন দিক্‌প্রান্তে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাঙ্গলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্ব্বত্র গভীর ভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি এই সাহিত্য-সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। অলঙ্কার শাস্ত্রে সাহিত্যকে কোন্ বিশেষ শ্রেণীতে স্থান দিয়াছে তাহা লইয়া এখানে আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এখানে মনে হয় যেন আমরা সাহিত্যকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দর অলঙ্কার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

এই সাহিত্য সম্মিলন-যজ্ঞে যাঁহাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাঁহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন-সভার প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্ত্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

আপনারা জানেন পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে—তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপর দিকে, বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এককে দেখিতে পাই—আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।

আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সঙ্কীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

ফলতঃ জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্ব-ব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।

এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি, তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে পারে?

কবিতা ও বিজ্ঞান।

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাষে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন, মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে উদ্ভিদ্‌কে সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিকের দেখা, একথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই

পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া নাই। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি, অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই—কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর, এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মেলে, সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি দাবী করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান, এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখন কোন অংশে দুর্ব্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে, এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে, তখন মুহূর্ত্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন, এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।

অদৃশ্য আলোক।

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণ স্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীমরহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি কেবল মাত্র তাহার সম্বন্ধেই দু-একটী কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙ্গে রঞ্জিত আলোকসমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটী রং তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই সসীম আলোকের সাত সমুদ্র পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্তনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্ম্মানীর অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-উর্ম্মি সঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোক দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল, যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা একদিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচবর্ত্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণ ভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎবর্ত্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহু দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। ফলতঃ দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটা সপ্তকমাত্র আমাদের দৃষ্টেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই

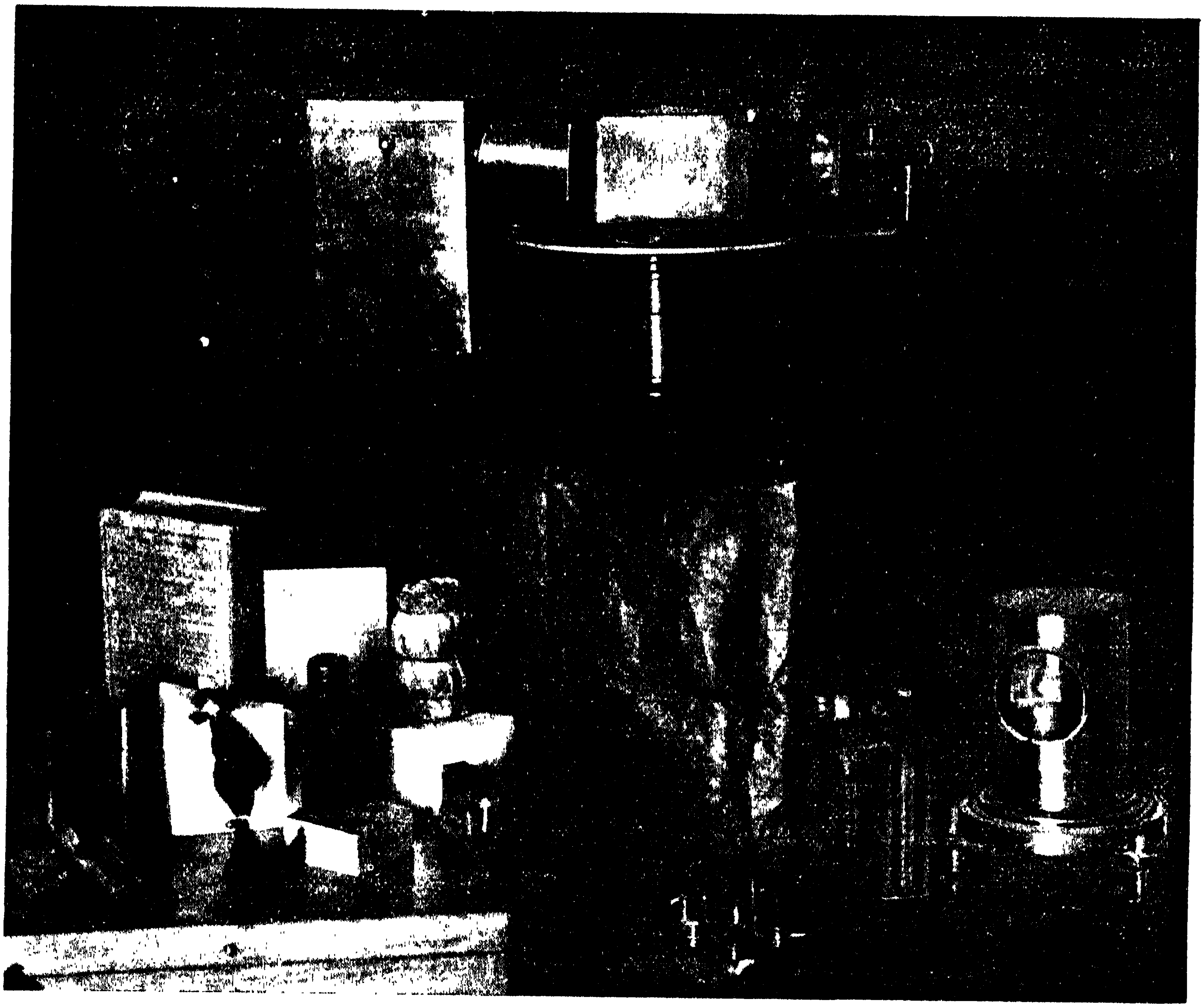

অধ্যাপক বসুর তড়িৎ-ঊর্ম্মি যন্ত্র।

ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্যরাজ্য। আমরা কতটুকু দেখিতে পাই? নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতি-রাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। দুঃসহ এই জ্যোতির ভার, অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই, সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস।

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেইজন্য রুদ্ধজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদ রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদজগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চাননা। বিখ্যাত বার্ডন সেন্ডাবসন বলেন যে কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ

বাহিরের আঘাত দৃশ্যভাবে কিম্বা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর-প্রমুখ উদ্ভিদ শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে বৃক্ষ স্নায়ুহীন, আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোন সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয় পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ-জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। আমাদের জীবনলক্ষ্মী উদ্ভিদজীবনের কোন ভার গ্রহণ করেন নাই। উদ্ভিদজীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ--সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস।

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয়, বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্ত্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় তাহা যদি ধরিতে ও মাপিতে পারি।

জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে—যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা 'নাড়ার' উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোন প্ররোচনায় কাগজ কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাতত অসম্ভব কার্য্যে কোন উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার একান্ত শোচনীয় তাহার সন্দেহ নাই। এক-লিপি সভার সভাগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত—অশিক্ষিত কিম্বা অর্দ্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ!

সে যাহা হউক মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক—প্রথমত গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান, দ্বিতীয়ত গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে আজ্ঞাপালন করান অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষ্যে আজ আমি সহৃদয় সভাসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি, এই জন্য বিচিত্র প্রকারের চিমটি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায়, তাহার কোন মূল্য নাই—ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

এখন বুঝিতে পারিতেছি তাড়াহুড়া করিলে, কিম্বা অতিরিক্ত আঘাত করিলে প্রকৃত কোন উত্তর পাওয়া যায় না। সকাল বেলা, আমাদের মত তাহাদের একটা জড়তা আইসে। সুতরাং উত্তর কতকটা অস্পষ্ট। দ্বিপ্রহরের গরমের সময় দুই চারিটা উত্তর দিয়া গাছ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যেদিন ঝড় কিম্বা অন্য দৈবদুর্য্যোগ ঘটে সেদিন গাছ মৌনভাব ধারণ করে। এসব বিরক্তির কারণ ত্যাগ করিয়া শুভ দিন ও ক্ষণ নিরূপণ করিলে, বহুঘণ্টাব্যাপী সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়।

গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোন হাত থাকিবে না, কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।

গাছের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তের ইতিহাস উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য। সে জন্য জানিতে চাই তাহার উপর প্রত্যেক অনুকূল, প্রত্যেক প্রতিকূল ঘটনার ছাপ—তাহার সহিত আলো ও অন্ধকারের ক্রীড়া, তাহার উপর পৃথিবীর টান ও ঝটিকার আঘাত। কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাত, কত প্রকারের সাড়া! এই স্থির এই নিশ্চলবৎ প্রতীয়মান জীবনপ্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রিয়া চলিতেছে। কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?

এই যে তিল তিল করিয়া বৃক্ষশিশুটী বাড়িতেছে, যে বৃদ্ধি চক্ষে দেখা যায় না, মুহূর্ত্তের মধ্যে কি প্রকারে তাহাকে পরিমাণের মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে পারিব? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়? আহার দিলে কিম্বা আহার বন্ধ করিলে কি পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইতে কত সময় লাগে? ঔষধ সেবনে কিম্বা বিষ প্রয়োগে কি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যাইতে পারে কি? বিষের মাত্রা প্রয়োগে কি ফলের বৈপরীত্য ঘটে?

তার পর, গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনরূপ সাড়া দেয় তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে কত সময় লাগে? সেই অনুভব-কাল ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্ত্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারা যায় তারপর বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পৌঁছে? স্নায়ুসূত্র আছে কি? যদি থাকে তবে স্নায়বীয় প্রবাহ কিরূপ বেগে ধাবিত হয়। কোন্ অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহের গতি বৃদ্ধি হয়, কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় নিবারিত অথবা নিরস্ত হয়? আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে? সেই গতি ও সেই গতির পরিবর্ত্তন কোন প্রকারে কি স্বতঃ লিখিত হইতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্পন্দনশীল পেশী আছে উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃ স্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে যখন মৃত্যুর প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয় সেই নির্ব্বাণ-মুহূর্ত্ত কি ধরিতে পারা যায়? এবং সেই মুহূর্ত্তে কি বৃক্ষ কোন একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?

এই সব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস বিবিধ যন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ হইলেই গাছের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হইবে।

"যদি গাছ তাহার লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত।" কিন্তু এই কথা ত দিবা-স্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য, কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্ম্মে পরিণত করিতে চাহি তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আব্দার এবং ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছে না। কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতা সঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধ

দ্বার ভাঙ্গিয়া যায় তখনই প্রকৃতিদেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা।

সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে সেস্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর! মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশ জনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, সমস্ত দুঃখ ধৈর্য্যের সহিত তাহারা বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতি লাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে—কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।

তরুলিপি যন্ত্র।

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্ব্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নির্ণীত হইবে; তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যু-রেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের একভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্ম্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদেরই কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এ দেশীয়। এখন গাছের সাড়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু চারিটা কথা বলিব।

গাছ, লাজুক কি অলাজুক?

তৎপূর্ব্বে তরুজাতিকে যে লাজুক ও অলাজুক—সসাড় ও অসাড়—বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে সেই কুসংস্কার দূর করা আবশ্যক। সব গাছই যে সাড়া দেয়, তাহা বৈদ্যুতিক উপায়ে দেখান যাইতে পারে। তবে কেবল লজ্জাবতী লতাই কেন পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়, সাধারণ গাছে দেয় না কেন? ইহা বুঝিতে হইলে ভাবিয়া দেখুন যে আমাদের বাহুর এক পাশের মাংসপেশীর সঙ্কোচনদ্বারাই হাত নাড়িয়া সাড়া দেই। উভয় দিকেরই মাংসপেশী যদি সঙ্কুচিত হইত তবে হাত নড়িত না। সাধারণ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকের পেশী আহত হইয়া সমভাবে সঙ্কুচিত হয়, তাহার ফলে কোনদিকেই নড়া হয় না। কিন্তু একদিকের পেশী যদি ক্লোরোফরম দিয়া অসাড়

হইতে দ্রুত। বৃক্ষে উষ্ণতায় স্নায়ুবেগ প্রায় সাতগুণ বর্দ্ধিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহে প্রারম্ভ কালে বৃক্ষস্নায়ুর এক স্থানে উত্তেজিত অন্য স্থলে অবসাদিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা বৃক্ষের স্নায়বীয় ধাক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়। স্নায়ু সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে, সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা, জীব ও উদ্ভিদে যে এসম্বন্ধে কোন ভেদ নাই তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

স্বতঃস্পন্দন।

জীবদেহের অংশ বিশেষে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ পেশী আছে যাহা আপনা আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। কোন ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। কিন্তু জীবস্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিদেও এইরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়; তাহার অনুসন্ধানফলে সম্ভবত জীব-স্পন্দন-রহস্যের কারণ প্রকাশিত হইবে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন। হৃদয় জানা কথাটি শারীরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি, কবিতার অর্থে নহে। সমস্ত ব্যাংটিকে লইয়া পরীক্ষা সুবিধাজনক নহে এজন্য তাঁহারা হৃদয়টিকে কাটিয়া বাহির করেন, পরীক্ষা করেন কি কি অবস্থায় হৃদয়গতির হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলেই স্পন্দনক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয় কিন্তু ঢেউগুলি খর্ব্বকায় হয়। শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ভৈষজ্য দ্বারা হৃদয়ের স্বাভাবিক তাল বিভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইথর প্রয়োগে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফরমের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিবিধ বিষপ্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য রহস্য এই যে, কোন বিষে হৃদয়স্পন্দন সঙ্কুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিস্পন্দিত হয়। বিষের এইরূপ পরস্পর-বিরোধী গুণ জানিয়া এক বিষ দ্বারা অন্য বিষ ক্ষয় হইতে পারে।

জীবের স্বতঃস্পন্দন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি প্রধান ঘটনা বর্ণনা করিলাম। উদ্ভিদেও কি এই সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়? নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া গাছও যে স্পন্দনশীল তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাইয়াছি।

বন চাঁড়ালের নৃত্য।

বন চাঁড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পত্রগুলি আপনা আপনি নৃত্য করিতেছে। লোকের বিশ্বাস যে হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। গাছের সঙ্গীতবোধ আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বন চাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোন সম্বন্ধ নাই। তরু-স্পন্দনের স্বতঃলিপি পাঠ করিয়া, জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেছি।

প্রথমত পরীক্ষার সুবিধার জন্য বন চাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে, স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নল দ্বারা উদ্ভিদ রসের চাপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে। তার পর দেখা যায় যে উত্তাপে স্পন্দনের সংখ্যা বর্দ্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইথর প্রয়োগে স্পন্দন ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়, কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাব মারাত্মক। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যে ভাবে স্পন্দন-শীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে কোন কোন

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA

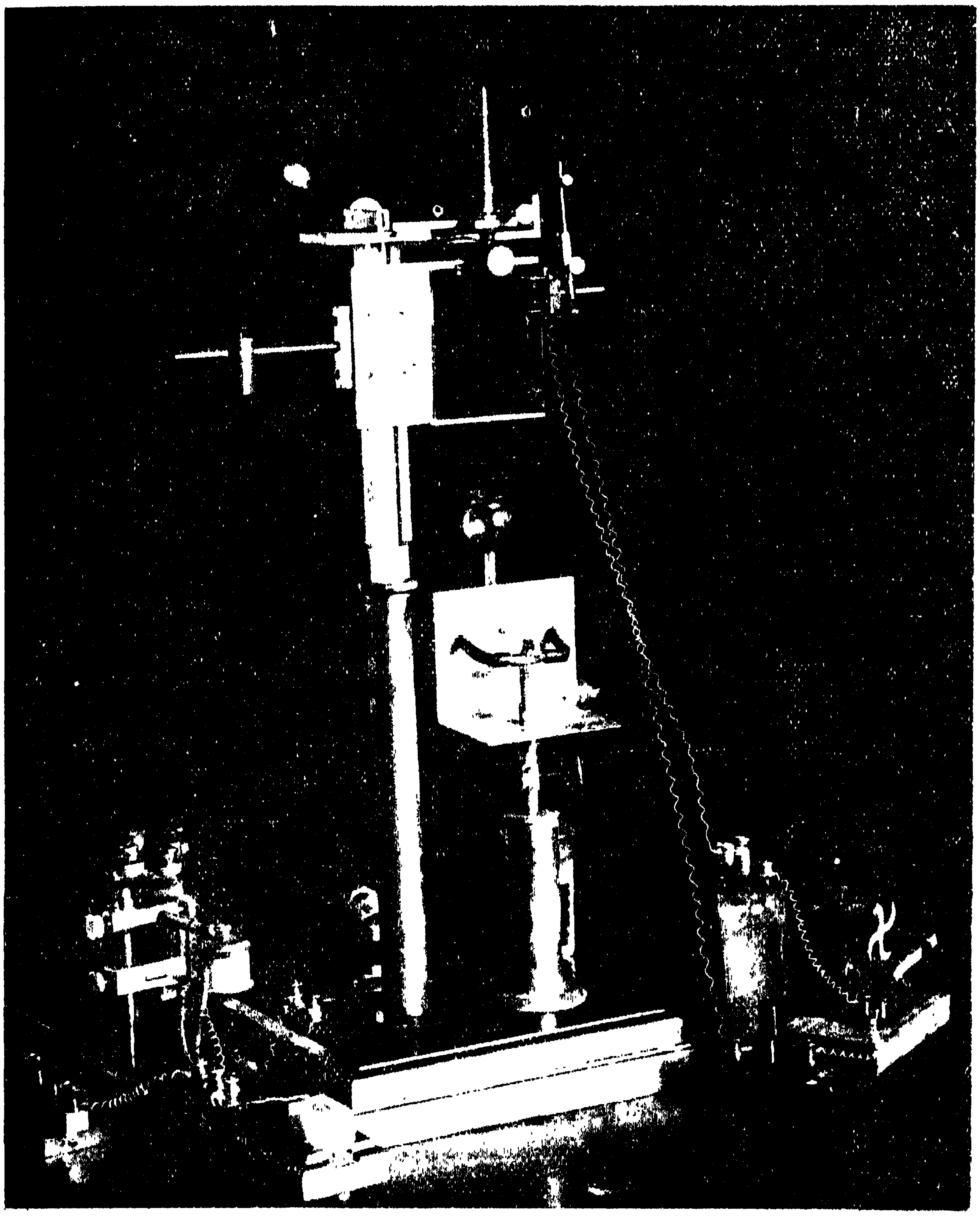

স্পন্দলিপি যন্ত্র।

উদ্ভিদপেশীতে আঘাত করিলে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে; উদ্ভিদ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এই রূপে আহার-জনিত বল, বাহিরের আলোক উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয়, তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে, সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃত পক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরুচ্ছ্বাস। যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন স্বতঃস্পন্দনেরও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পর বাহিরের উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছ অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি উথলিয়া উঠে, কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা বাহিরের উত্তেজনার কাঙ্গাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙ্গা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেক কাল সাড়া দেয় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বনচাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ।

ইথর প্রয়োগে নিশ্চলতা ও বাতাস দিয়া নিশ্চলতা দূর।

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থার জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতার আবশ্যক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে

হয় যে সেই অবস্থা স্বতঃস্পন্দনেরই একটি উদাহরণ বিশেষ। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে সেই অবস্থাভিলাষী সাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন কোন পথ—কামরাঙ্গা অথবা বনচাঁড়ালের পদাঙ্কানুসরণ—তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।

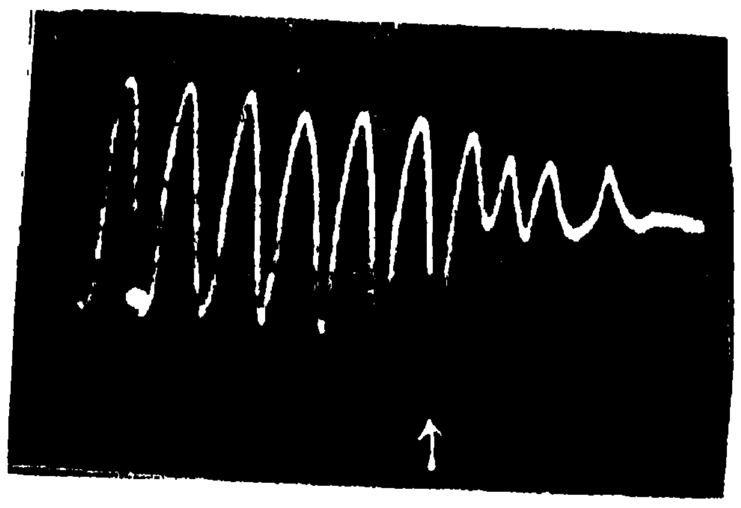

বিভিন্ন বিষের বিভিন্ন ক্রিয়া। একপ্রকার বিষে সঙ্কুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় স্পন্দন নিরোধ এবং মৃত্যু।

পরিপূর্ণ অবস্থাই যে স্বতঃস্পন্দনের কারণ তাহা বিবিধ। মানবিক ব্যাপারেও দেখা যায়। শিশু যখন মাতৃদুগ্ধ এবং স্নেহাতিশয্যে পরিপূর্ণ হয় তখন তাহার হাত পার স্বতঃস্পন্দন দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করে।

মৃত্যুর সাড়া

উদ্ভিদের জীবনে পরিশেষে এরূপ সময় আইসে যখন কোন আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত, মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্ত্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া, কিম্বা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের কথা। মৃত্যুর রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে, তখন গাছের জীবন তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই অন্তিম মুহূর্ত্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল আকুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বৈদ্যুতপ্রবাহ মুহূর্ত্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্ত্তিত হয়—উর্দ্ধগামী রেখা নিম্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীর মর্ম্মের কথা আজ তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইল। এতদিন তরুলতার সহিত মানুষের জীবনগত আত্মীয়তার সংবাদ কেবল কবিকল্পনার আভাষে প্রচারিত হইতেছিল,

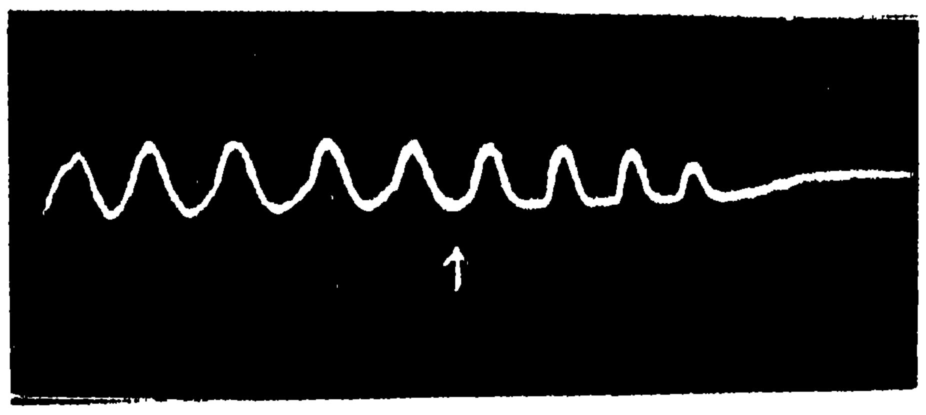

তীর চিহ্নিত সময়ে বিষপ্রয়োগ।

আজ কঠোর বিজ্ঞান, কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিল।

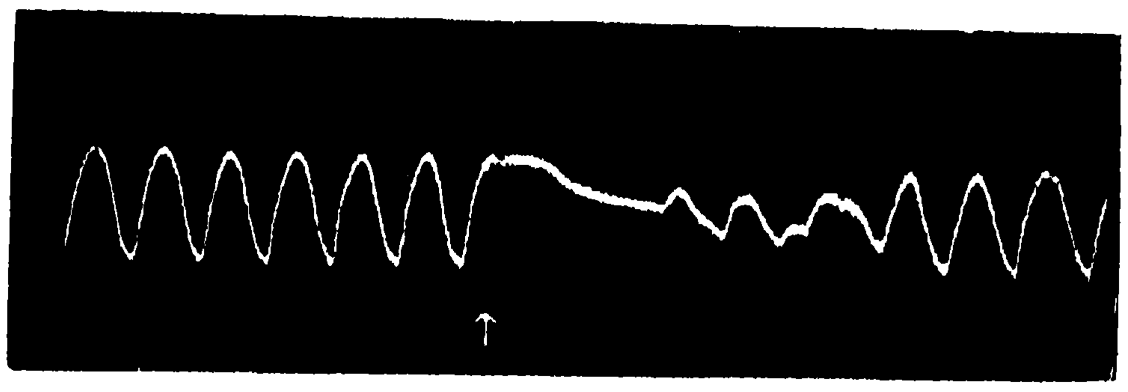

বরফ জলে উত্তাপ হরণ এবং স্পন্দনের নিরোধ।
বাহিরের উষ্ণতায় স্পন্দনের পুনরারম্ভ।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম "বৃক্ষজীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া"। কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয় সেটা যৌবনসুলভ অতিসাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইল।

উপসংহার।

আমি সম্মিলন-সভায় কি দেখিলাম, উপসংহার কালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্দ্ধ অন্ধকারে বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্ত্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম

আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্ম্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানা প্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি, কখন শিল্পকলায়, কখন সাহিত্যে, কখন বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্ম্মা বাঙ্গালী চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, এ আমাদের দেশের চিরকালের সংস্কার। দেবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষও সৃজন করিতে পারে এবং সংহারও করিতে পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্ব্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের নিজের মধ্যে কাজ করিতেছে। আমাদের জীবনে আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে; তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই, এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত, এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি, এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি!

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিভাষণ।

সহযোগী সাময়িক পত্রিকার পরিচয়

বঙ্গদর্শন (ফাল্গুন)—

'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু উভয় কবির তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ভারতচন্দ্র বহুপরিমাণে মুকুন্দরামের অনুকারী: অথচ মুকুন্দরামে যাহা স্বাভাবিক ভারতচন্দ্রে তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামের সৃষ্টি সজীব সরল, ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি কৃত্রিম কৌশলময়। লেখক এই মত উভয় কবির হরগৌরার চিত্র, রতিবিলাপ ও নারদের নষ্টামি লইয়া তুলনা করিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "মুকুন্দরাম, নামে কবি, কার্য্যত নাটককার। যাহা স্বাভাবিক—ভাব বা ভাষা দ্বারাই স্বাভাবিক, কবি অবিকল তাহা নিজ কাব্য মধ্যে বসাইয়া গিয়াছেন। তাহাতে সাজসজ্জা অর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্রতা তাঁহার ছিল না।" দীনেশ বাবুর এই উক্তির দ্বারা লেখক নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন। এই সব খাঁটি বাংলার কবির কাব্য এখন বড় কেহ পড়েন না এবং খাঁটি বাংলা কবি আর কেহ হইতেছে না বলিয়া লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে যাঁহারা আজকাল শিক্ষিত কবি তাঁহাদের মনের দ্বারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আসিয়া প্রবেশ যাজ্ঞা করিতেছে, তাঁহাদের আর খাঁটি বাঙালী থাকিবার জো নাই। অশিক্ষিত কবি যাঁহারা তাঁহারা খাঁটি বাঙালী কবি হইবেন কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের সুর যাহাতে না বাজিবে তাহা এই ব্যাপকতার যুগে তেমন সমাদৃত হইবে না। যাহাই হোক মোটের উপর প্রবন্ধটি সুচিন্তিত বটে কিন্তু সুলিখিত নহে। 'বাঙ্গালা ব্যাকরণের একাংশ' শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত। বাংলা শব্দের দ্বিরুক্তি বিষয়ে আলোচনা। সূত্রগুলির রচনা একটু কর্কশ ও জটিল হইয়াছে। ইহাতে

যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধানের পরিচয় আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'বরেন্দ্র ভ্রমণ' প্রবন্ধে বরেন্দ্রভূমিতে নূতন তত্ত্বানুসন্ধান সমিতির কার্য্যপরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বক্তব্য কিছুই নাই, ভাষার ফেনায় পায় পাঁচ পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ; অথচ অক্ষয়বাবুর স্বাভাবিক কবিত্বমণ্ডিত ওজস্বী ভাষাও এ প্রবন্ধে নাই। অনুরোধের লেখা এমনি নিষ্ফল হয়। শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক 'খাদ্য ও রন্ধন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশস্ত নিয়ম' নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অনেক কথাই পুরাতন হইলেও সকলেরই অনুধাবনযোগ্য। 'সমাজ বন্ধন' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বলিয়াছেন যে বড় বড় সংস্কার কার্য্যে হাত দিয়া আমরা প্রায়ই বিফল হইতেছি। অতএব আমাদের ছোট কাজে হাত দিয়া প্রথমে সমাজবন্ধন সুদৃঢ় করার চেষ্টা করা উচিত। ইহার জন্য প্রত্যেক সমাজপতি স্বার্থশূন্য ভাবে সামাজিক জনসাধারণের হিতচেষ্টা করিবেন এবং তাহার জন্য সর্ব্বসাধারণের দত্ত অর্থে পল্লীভাণ্ডার স্থাপিত হইবে এবং সকলের অনুমোদিত উপায়ে অর্থ ব্যয়িত হইবে। পুষ্করিণী পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি কর্ম্ম সমাজপতিদিগের অনুষ্ঠেয় হইবে। সঙ্কল্প সাধু সন্দেহ নাই। 'সূর্য্যমুখী' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখী চরিত্রের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের 'মানবের জন্মকথা' অতিশয় নীরস ও কঠিন হইয়াছে; সাধারণ পাঠক ইহার একবর্ণও বুঝিবে না; সুতরাং রচনা নিষ্ফল হইতেছে। শশধর বাবু বিজ্ঞান সাধারণবোধ্য করিতে সিদ্ধহস্ত; এ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। 'মথুরায় শ্রীমতী অনুরূপা দেবী লিখিত গল্প। শিক্ষিতা বালিকার সহিত কুলমর্য্যাদার খাতিরে অশিক্ষিত বরের বিবাহ এবং দরিদ্র বরের সহিত ধনীকন্যার বিবাহ যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন করে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গল্পটি কিন্তু সুগঠিত হইয়া উঠে নাই। 'ষড় দর্শন' শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ-লিখিত। ভালো মন্দ কিছুই বলিবার অধিকারী নহি। এবারকার বঙ্গদর্শনের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে একটিও কবিতা নাই।

মানসী (ফাল্গুন)-

মানসী প্রবন্ধ-গৌরবে শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রের পদবী লাভ করিবার উপযুক্ত হইতেছে। মানসীর প্রধান সৌন্দর্য্য তাহার কবিতা নির্ব্বাচনে। প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চমৎকার কবিতা 'আলো আঁধারে'। কবিতাটি যেন স্বচ্ছতরল সুধানির্ঝরিণীর মতন ভাবে ছন্দে, ধ্বনিতে ব্যঞ্জনায় তরতর করিয়া বহিয়া গিয়াছে। তারপর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ লিখিত 'বর্ষ-সমাগমে' মানসীর গত জীবনের সরস সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ভবিষ্যত কর্ম্মের ইঙ্গিত বেশ মুন্সিয়ানার সহিত লিখিত হইয়াছে। 'নির্ম্মাল্য' একটি কবিতা শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, বি,এ, লিখিত। কবিতাটি নবীন কবির বাণীমন্দিরের আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য; শব্দ দিয়া চিত্রিত ছবিখানি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 'সীতারাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক টুটকি লিখিয়াছেন। সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুরে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ ইষ্টকের প্রতিলিপি দর্শনীয় বটে। প্রবন্ধে ধ্বংসাবশেষের সম্বন্ধেই আলোচনা মুখ্য সীতারামের ইতিহাস ও চরিত্র প্রসঙ্গত আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন 'দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ' বাজাইয়াছেন। এ শঙ্খ 'কবিচিত্ত-জলধি মন্থনে হয়েছে বাহির'; যে বাঙালীর ঘরে 'পুত্র হলে শাঁখ বাজে। কন্যা হলে আঁধার ভবন।' সেই বাঙালীকে ধিক্কার দিয়া লজ্জা দিয়া কবির দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়াছে। কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন

> "পশি আজি বাঙালির কানে
> লজ্জা ঘৃণা জাগাইতে নারিবে কি ও অসাড় প্রাণে ?"

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে অশোকগুচ্ছের কবির প্রাণস্পন্দন প্রত্যেক পংক্তিতে অনুভব করা যায়। 'জীবন ও মৃত্যু' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, সাধারণ মৃত্যু হইলেই দেহের মৃত্যু হয় না। 'গঙ্গা যমুনা' গল্প, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ফরাশী হইতে অনুবাদিত; বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। 'উদয়গিরি' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত তথ্যশূন্য বর্ণনা; তবে ইহা ভাষার মাধুর্য্যে সুখপাঠ্য হইয়াছে। অক্ষয় বাবু বাংলায় 'ফিট' চালাইয়াছেন; কিন্তু আমরা 'ফুট' রাখিবারই পক্ষপাতী। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন 'রমেশচন্দ্র দত্ত' সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আদেশে রমেশচন্দ্রের মাতৃভাষা সেবায় মনোনিবেশ, বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ ও তাহার ইংরাজি অনুবাদ, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও তাহার ইংরাজি অনুবাদ সম্বন্ধে এবং বঙ্গভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি কৌতূহল উদ্রিক্ত করে পরিতৃপ্ত করে না; অধিকন্তু দীর্ঘ দীর্ঘ ইংরাজি বচন পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ও রচনার রসভঙ্গ যুগপৎ করে; দীর্ঘ ইংরাজি উদ্ধৃত বচনের বাংলা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। 'পেয়ালার প্রেম' শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক উর্দ্দু হইতে অনুবাদিত কবিতা—গানের মতন সুললিত ও ওমারখায়ামী ভাবে অনুস্যূত। 'নির্জীবের কথা' শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত চিত্র কিন্তু কিসের চিত্র তা লেখকই জানেন; লেখক বাক্যের জাল বুনিয়া ভাবের দৈন্য চাপা দিবার অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়াছেন। 'মায়ের মন' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী কর্ত্তৃক কবিতার ভাবানুবাদ; মায়ের মন বিশ্বপ্রকৃতির তুলনায় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'খুরদা' শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণ-কাহিনী; ব্যর্থ রচনা; পড়িতে কিছুমাত্র আগ্রহ উদ্রেক করে না, পড়িয়া কিছু লাভ হইল মনে হয় না; ভাষাও তেমনি সৌন্দর্য্যহীন। 'বিন্দাদা' শ্রীযুক্ত জলধর সেনের অফুরন্ত উপন্যাস, হোমিয়োপ্যাথি মাত্রায় চলিতেছে। 'দৈন্য' কবিতা; শ্রীমতী অমলা দাসের রচনা; আড়ষ্ট ও নীরস ও বিশেষত্ববর্জ্জিত। 'বৈদেশিকী' শিরোনামায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বিদেশী সাহিত্যের কথা সঙ্কলন করিয়াছেন। এবার গ্রীক দার্শনিক য়্যারিষ্টিপস ও বায়াসের 'রসভাষ' সঙ্কলিত হইয়াছে; ভাষা উৎকট ইংরাজি ধাঁচের এবং আড়ষ্ট, যেন স্কুলের ছেলের অনুবাদের কসরত; অধিকন্তু বারংবার বরট্ প্রত্যয় রচনাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে; তবে দার্শনিকদিকের রসভাষ উপভোগ্য। পরিশেষে গ্রন্থসমালোচনা ও 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' আছে। মুখপত্ররূপে একখানি রঙিন দৃশ্যপট মুদ্রিত হইয়াছে।

মৃণ্ময়ী (ফাল্গুন)—

প্রথমেই শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল সেন লিখিত 'বৈষ্ণব-তত্ত্বের আভাস'; বক্তব্য যে কি বুঝা গেল না। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'গীতগোবিন্দ' একাদশ সর্গ সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন; রচনা সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে; বিজয় বাবু সংস্কৃত নিয়মে বাংলা পদ্য রচনায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। 'প্রবাসীর পত্র', সিন্ধুপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ ও তিন্নভিল্লী সহরে ভ্রমণ উপলক্ষে ঐ সকল দেশের একটি সুখপাঠ্য বর্ণনা। 'রঘুবংশ ও উত্তরচরিতের মঙ্গলাচরণ' লইয়া শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন এম-এ, যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার বক্তব্য কি ও এত কথা বলার উদ্দেশ্য কি বুঝা গেল না; ভাষা ভয়ানক কটমটে ও সংস্কৃতগন্ধী এবং এমন পেঁচালো যে অর্থ সংগ্রহ করা দুষ্কর। 'জাগ্রত স্বপ্ন' নাম দিয়া সম্পাদক কতকগুলি মৃত ব্যক্তির জীবাত্মার সহিত জীবিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন; রচনাটি লেখকের মন্তব্যহীন বলিয়া কেমন অঙ্গহীন হইয়াছে,—শুধু সংবাদের সমষ্টি; এরকম সাহিত্যরসহীন রচনা পাঠককে তৃপ্তি দেয় না। 'আসামী

রূপকথা' শ্রীমতী ললিতা রায় লিখিত; লেখার দোষে গল্পটি একঘেয়ে ও অপাঠ্য হইয়াছে। 'ধূলি', পদ্য, শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা; এই একটি মাত্র কবিতাও কবিতা নামের অযোগ্য; এ আট লাইন না ছাপিলে বঙ্গভাষা কাঙাল হইয়া যাইত না। পরলোকগত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের 'কয়েকখানি পত্র' প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে মিত্রমহাশয়ের অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মোটের উপর মৃণ্ময়ীর এ সংখ্যায় একটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বা সুপাঠ্য প্রবন্ধ নাই।

দেবালয় (চৈত্র)—

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যন্ত্রী' নামক সনেট প্রথম আসন পাইয়াছে; কবিতাটি চলনসই। তবে স্থানে স্থানে ছন্দগত ত্রুটি আছে। শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় 'স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুরের মিল' কবিতা চলনসই। 'কর্ম্মযোগ' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেব-ঋণ, ঋষি ঋণ ও পিতৃ-ঋণ শোধের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক বলিয়া যাগযজ্ঞ তর্পণ-হোমের ব্যবস্থা করিয়াছেন; এই সব ব্যবস্থা আধুনিককালে চলিবে কিনা সন্দেহ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বন্দদেশীয় লোকের ইংরাজী হইতে 'বন্ধু পঞ্চক' অনুবাদ করিয়াছেন; এ অনুবাদ কিন্তু অনুবাদ-কুশল কবির যোগ্য ত হয়ই নাই বরং লজ্জার বিষয় হইয়াছে; ইহা ছাপিতে না দিলে ভালো হইত। 'বরোদা' শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনের রচনা, কেবল কতকগুলা সংবাদের সমষ্টি; দেশ দেখিবার মতন চোখ ও প্রাণ লেখকের নাই তার উপর আবার ভাষা এত শিথিল যে সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলায় খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। এসব শুধরাইয়া লওয়া সম্পাদকের কাজ। দেবালয় ডবল সম্পাদকের জয়ধ্বজা বহন করে কেন? 'চক্রধরপুর' আর একটি ব্যর্থ ভ্রমণকাহিনী; শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা; ইহাঁরও ভাষা শিথিল অধিকন্তু মুদ্রা-দোষে ভরা। এই সব নবীন লেখকেরা ভাষার প্রতি অবহিত না হইয়া যা খুসি তাই লিখিয়া মনে করেন সাহিত্য সৃষ্টি করিলাম; সকল কাজেই সাধনা ও সতর্কতার দরকার, কেবল বাংলার লেখক হওয়াটাই কি এত সোজা? বলিবার কিছু না থাকিলেও ভাষার বাহারে পাঠকের চিত্ত জয় করা যায়- ভাষা রূপ, ভাব প্রাণ; আগে রূপের পরিচয় পরে প্রাণের; উভয়ের সম্মিলন যিনি করিতে পারেন তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা কবি।

ভারতমহিলা (চৈত্র)—

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী 'সাহিত্যের শক্তি' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইতেছেন যে সাহিত্য জাতীয় জীবন গঠন করে; সৎ-সাহিত্য সৎপথে ও কু-সাহিত্য কুপথে চালিত করে; পুরাণ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী তাহার প্রমাণ। লেখকের মতে প্রকৃত কবি তিনি যিনি আমাদের সৌন্দর্য্যের চক্ষু খুলিয়া বিশ্বপ্রাণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। লেখকের মতে "এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত উল্লেখযোগ্যরূপে আর কেহ আমাদের দেশে ইহা শিক্ষা দিতে পারেন নাই।" 'মণ্ডন-পরাজয়' অতি কদর্য্য রচনা; বিষয় শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের তর্ক ও মণ্ডন-পত্নীর মধ্যস্থতা; অতি প্রাচীন ঘটনাকে কথোপকথনের আকারে কল্পনা মিশাইয়া বর্ণনা করা আমরা একেবারে কদর্য্যরীতি মনে করি। 'অসাবধানে শিশু-সংহার' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায় দেখাইয়াছেন যে আমাদের অগোচরে কত শত ছোটখাটো ঘটনা শিশুসংহারের আয়োজন করে। 'পরিবর্ত্তন' গল্প; ঘটনাচক্রে পড়িয়া নির্দ্দোষীও কিরূপ নিগ্রহ ভোগ করে তাহাই ইহার আখ্যায়িকার বিষয়; রচনায় কোনো বিশেষত্ব নাই; গল্পের উপাদানটি ছিল ভালো, পাকা হাতে পড়িলে গল্পটি সুপাঠ্য হইত। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মডার্ণ রিভিউ হইতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস' প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে পরমহংসদেবের আসল মহত্ত্ব উপলব্ধি হইবে; তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে দেবতা গড়িয়া মানুষের শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প রচয়িতাদের দর কষিয়া দেখিয়াছেন এবং রবি বাবুকে হাওয়ার্ড ওজন ধরিয়া অনেককে মাপিয়াছেন। তাহাতে তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছে এই যে, প্রভাত বাবু বাস্তবদর্শী রবীন্দ্রনাথ কল্পনাদর্শী, এক জন যেন সুন্দর নিখুঁত ফটো ও অন্যজন যেন উৎকৃষ্ট চিত্র; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গল্প অনন্যকরণীয়, তাহাতে রবি বাবুর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রভাত বাবুর প্রাঞ্জলতা একত্র পরিদৃশ্যমান, অধিকন্তু অপরূপ তীব্র আকস্মিক হাস্যরসে মণ্ডিত; অতএব বাবুর গল্পও করুণরসের সমাবেশ-নিপুণতায় রবীন্দ্রনাথের তুল্য। হায় বেচারা রবীন্দ্রনাথ। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল তিনি অন্ততঃ ছোট গল্পের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজ ভট্টশালী মহাশয় তাঁহাকে এ সিংহাসনেরও অংশদার জুটাইয়া দিলেন! ভট্টশালী মহাশয়ের এই সুদীর্ঘ রচনাটি বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাতে বিজ্ঞতা, দার্শনিকতা, অনুযোগ, মত প্রকাশ সবই আছে কিন্তু সেগুলি অ-মলা। তিনি নিজের কথার দ্বারাই নিজেকে বহুস্থলে খণ্ডিত করিয়াছেন। তাহার সুদীর্ঘ রচনার মধ্যে যে কয়টি বিষয়ে বিশেষভাবে আমাদের ভিন্ন মত আছে তাহা এই—(১) রবি বাবুর সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ভারতবর্ষে আর কেহ আছে বলিয়া জানি না; (২) সুরেন্দ্র বাবুর গল্প তিন চারটি চমৎকার, নিজস্ব সৌন্দর্য্যে ঝকমকে; বাকি গল্পগুলিতে লেখকের শক্তি সাধারণভাবেরই পরিচয় দিয়াছে; (৩) সৌরীন্দ্র বাবুর 'পরদেশী' বিদেশী শ্রেষ্ঠ লেখকদের বাছাবাছা গল্পের অনুবাদ; অনুবাদ কার্য্যেও নিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় আছে; ইহার নিন্দা করা অন্যায়। ভট্টশালী মহাশয় অনুবাদের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদ ব্যতীত কোনো ভাষা পুষ্ট হয় না, বিশ্বমানবের চিন্তাস্রোতের সহিত জাতীয় জীবনের সংযোগ সাধন হয় না। ইংরাজি সাহিত্যের তুল্য ঐশ্বর্য্যময় ভাষা জগতে দ্বিতীয় নাই; কিন্তু তাহাতে অনুবাদের পাচুর্য্য দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়, য়ুরোপের মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। লেখক বলেন ঋণ করিয়া কেহ কোনো দিন বড়লোক হয় না; ইহাও অর্থনীতির বিরুদ্ধ কথা। পঞ্চতন্ত্রের মৃত ইন্দুর ঋণ লওয়ার গল্প ছাড়িয়া দিলেও আধুনিক কালের ধনকুবের রকাফেলারের কথা ফ্যালনা নহে; তিনি বলেন, যে-পরিমাণ মূলধন ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে পারা যায় তাহাই লাভ; আমার যাহা নিজের পুঁজি ও আমি যত দূর পর্য্যন্ত ঋণ পাইতে পারি একত্র করিয়া মূলধন করা উচিত; আমার ঋণ পাইবার যোগ্যতা-টাই মস্ত মূলধন, সেটাকে নিষ্ফলভাবে পড়িয়া থাকিতে দেওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। লেখকের মতে 'ঘরের কথা' উল্লেখযোগ্য কিন্তু 'আলপনা' নহে কেন বুঝা গেল না। আলপনার গল্পগুলি চমৎকার না হইলেও তাহাতে গল্পের আর্ট আছে, ভাষার মাধুর্য্য আছে, যাহা ঘরের কথায় একান্ত অভাব। মণিলাল বাবুর 'কল্পকথা' অতি উৎকৃষ্ট গল্পের বই, কিন্তু তাহারও উল্লেখ দেখা গেল না। যাহাই হউক মোটের উপর এই আলোচনাটির মধ্যে বাংলা গল্পের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস ও লেখকদের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়; আর এরূপ স্থলে সকলে একমত হইবে তাহাও আশা করা যায় না। তবে, আমাদের এই নির্জ্জীব সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্য লইয়া কোনোই আলোচনা হয় না; ইহার মধ্যে যিনি সচেতন হইয়া ভুলও করেন তিনিও আমাদের প্রশংসাভাজন এবং এরূপ চেষ্টার লক্ষণ আনন্দ ও আশার কথা। 'পথপ্রদর্শক' শ্রীমতী ...মোহিনী ...

বিরচিত কবিতা; ইহার মধ্যে রবি বাবুর খেয়ার একটি ক্ষীণ সুর শুনিতে পাওয়া যায়; তথাপি কবিতাটি ভালো হইয়াছে। 'ছলনা' গল্প; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা; লেখা খুব উজ্জ্বল মধুর না হইলেও লেখক বেশ মুন্সিয়ানার সহিত গল্পটি সমাপ্ত করিয়াছেন, দুঃখের পূর্ব্বাভাস দিয়া নায়কের বিকলতায় উচ্ছ্বসিত বিদ্রূপহাস্যকে তিনি সংযত করিয়া দিয়াছেন। 'কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা' চিত্রপরিচয় মাত্র।

প্রকৃতি (চৈত্র)—

'জাগরণ' চলনসই কবিতা, স্থানে স্থানে যতিভঙ্গ হইয়াছে। 'কলিকাতায় ব্যোমযান' শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত তথ্যপূর্ণ রচনা। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকারের 'এক করতে আর' অসমাপ্ত রচনা। 'রাজা ও বয়স্য' পদ্য, ছন্দভঙ্গে পঙ্গু ও ভাষার কর্কশ বর্ম্মে আড়ষ্ট; উপাখ্যানটি কৌতুকপ্রদ। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় 'পরেশনাথের মন্দির' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন; জৈনধর্ম্ম ও ইতিহাসের একটু ফোড়ন সম্বরা আছে তাহাতেই একটু সুস্বাদ হইয়াছে। শ্রীমতী দুর্লভবালা দেবী 'একটী মহাপুরুষের সংক্ষিপ্তজীবনী' নাম দিয়া প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পৌত্র ও ভূদেব বাবুর জামাতা তারাপ্রসন্নের জীবনী ক্রমশ লিখিতেছেন; বক্ষ্যমান জীবনে শিক্ষনীয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু তেমন গুছাইয়া বলা হইতেছে না। শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস 'ব্যাঙের গল্প' লিখিয়াছেন; দেখিতেছি ব্যাঙেরাও আমাদের দেশে সাহেবী নামে পরিচিত হইতে লাগিল। ব্যাঙের স্বভাবের পরিচয় দিতে বসিয়া দেশী নাম ছাড়িয়া লেখিকা কেন বিদেশী নামের শরণ লইলেন জানি না। 'রাজরাজেশ্বর' 'প্রার্থনা' 'বষ শেষ' পদ্য; সবগুলিই কাঁচা হাতের প্রথম উদ্যম।

সাহিত্য (চৈত্র)—

শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কালিদাস ও ভবভূতি'র তুলনায় সমালোচনা এখনো চলিতেছে; এবারে সীতাচরিত্র তুলিত হইয়াছে; রচনার ভাষা বড় আড়ষ্ট ও নীরস হইতেছে। 'হিমারণ্য' স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতীর বড় তথ্যপূর্ণ সরস সুপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী; এমন সুললিত ভ্রমণকাহিনী খুব অল্পই দেখা যায়। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের নির্জলা সুখ্যাতি সমালোচনা নামে চালাইতেছেন; ইহা বোধ হয় মানসীর নাটক সমালোচনার প্রতিক্রিয়া। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত 'রাঙটকোট' প্রবন্ধে মালদহের হজরৎ পাণ্ডুয়ার পুরাতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদার অক্টোপাসের মতন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছেন; যে কাগজ খুলি তাহাতেই তাঁহার রচনা বিরাজিত; অত্যধিক রচনা অনুবাদ হইলেও সকলগুলিকে উৎকৃষ্ট করা যায় না; এখানে তিনি 'পণ্যের মূল্য' সম্বন্ধে অর্থনীতির আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষ 'নির্লজ্জ' গল্প লিখিয়াছেন; ইহার মধ্যে রবি বাবুর দৃষ্টিদানের আবছায়া দেখা যায়; মৌলিকতার চেষ্টাও আছে—'মুখখানা কাঁচা ফোড়ার মত লাল ও শক্ত হইয়া উঠিল' উৎকট হইলেও মৌলিক উপমা স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষের 'মাছধরা' একটি উৎকৃষ্ট বিদেশী গল্পের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ষবিদায়' মামুলি ধরণের কবিতা। সহযোগী সাহিত্যের মধ্যে হিংলাজ তীর্থের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৭শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা)—

এই সংখ্যার সকল প্রবন্ধগুলিই প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করার যোগ্য। প্রথমেই শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম,এ, বি,এস, সি লিখিত 'দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময়' প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে স্বাধীন অনুসন্ধানে সংগৃহীত আমাদের নিজের দেশের উদ্ভিদের অনেক তত্ত্ব আছে; উদ্ভিদ দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে কেমন করিয়া শত্রুকবল হইতে রক্ষা করে তাহার বৃত্তান্তটি কৌতূহল উদ্দীপক ও সুখপাঠ্য। তারপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম,এ, 'বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ' লইয়া আলোচনা করিয়া যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। 'বর্ণতত্ত্বের (anthropology) পরিভাষা' ইংরাজি হইতে বাংলা তৈরি করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শশধর রায়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ 'জ্ঞানদাসের জন্মভূমি' কাটোয়া বা নান্নুরের সন্নিকট বড় কাঁদড়া গ্রাম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস যথেষ্ট প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ বিশ্লেষণ করিয়া বহু তথ্য প্রচার করিয়াছেন; সম্প্রতি 'আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি' অথর্ব্ব বেদের সমকালে প্রমাণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন; শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 'বাঙলা বিশেষণ-রহস্য' আলোচনা প্রসঙ্গে বহু খাঁটি বাংলা বিশেষণ শব্দ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বিশেষত্ব ও অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাও বিশেষ গবেষণাত্মক ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

ভারতী (চৈত্র)—

মুখপত্র শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত 'বৈরাগী' রঙিন চিত্র; চিত্রখানি বেশ সুন্দর হইয়াছে; আর একটু স্পষ্ট হইলে ভালো হইত। প্রথম প্রবন্ধ 'প্রাচীন ভারতের লোক শিক্ষা'য় শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ-জায়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারত তাহার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা তাহার সন্তানদিগকে দিয়াছে এবং তাহা এখনো যাত্রায়, কথকতায়, কীর্ত্তনে সমাজের নিম্নতম স্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে; এবং শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভারতবর্ষের আছে। তাহা থাকিতে পারে কিন্তু এই বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতার দিনে শুধু পুরাণো পুঁজিতে চলিবে না, সে কথা লেখিকা ভাবের ঝোঁকে ভুলিয়া গিয়াছেন। লেখিকার ভাষা অতি সুন্দর ও ওজস্বী; কিন্তু পুনরুক্তি করিয়াও বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 'সন্ন্যাসী' গল্প লিখিয়াছেন; ইহা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবিকা' নামক গল্পের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া মনে হইল, এমন কি অনেক জায়গায় ভাষার ভঙ্গী চারু বাবুর রচনাভঙ্গী স্মরণ করাইয়া দেয়; অনুকরণ করিয়াও গল্পটি কিছু মাত্র ফুটে নাই। 'গুজরাতে অতিথি' রূপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন চার বৎসর অতিবাহিত করিয়াও দেশটির অন্তরঙ্গ পরিচয় পান নাই; ভাসা ভাসা সামান্য একটু বর্ণনা তিনি দিতে সক্ষম হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেন 'ইয়োরোপে সাহিত্য' বন্যার মতো দেশকে নিজের চাপে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক মেটারলিঙ্কের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি যে কথা বলিতে চান তাহা একটি সংস্কৃত শ্লোকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি—

> অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
> স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
> যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
> হংস যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

রচনাটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গৌহাটির নিকটবর্ত্তী 'ব্রহ্মপুত্রে উমানন্দ' মন্দিরের সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন। 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস এখনো চলিতেছে। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী 'অন্বেষণ' কবিতা লিখিয়াছেন; শুনিয়াছিলাম তাঁহারা অস্পষ্ট কবিতা ভালো বাসেন না, কিন্তু এ কবিতাটি সেই কিম্বদন্তি অস্বীকার করিতেছে; ভাব, ছন্দ, এমন কি ভাষাও রবি বাবুর লেখা হইতে ধার করা; সে খুঁত ধর্ত্তব্য নহে, কারণ যিনিই যত অস্বীকার করুন প্রবল প্রতিভার প্রভাব কাটাইয়া স্বতন্ত্র হওয়া সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়;

কবিতাটি আমাদের মন্দ লাগিল না। 'শতদল-রচয়িত্রী শ্রীমতী সরোজ-কুমারী দেবী' সম্বন্ধে সচিত্র সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে লেখিকার রচনার আলোচনা হইয়াছে; প্রবন্ধ বেশ সংযত ভাবেই লিখিত হইয়াছে। 'অতর্কিত' শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্প, বিশেষত্ববর্জ্জিত, আর্টহীন, নিষ্ফল রচনা। 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' শ্রীমতী সরলা দেবীর ইংরাজি প্রবন্ধের শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কৃত অনুবাদ। স্ত্রী-শক্তিকে শিক্ষায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সরলা দেবী এক আয়োজন করিতেছেন। একটি সমিতি ঐ নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের বিভিন্ন অংশের সর্ব্বত্র হইতে নারীসাধিত কার্য্যের সংবাদ সংগ্রহ করিবে এবং তাহাদিগকে নিত্য নূতন শুভকার্য্যের প্রেরণায় উৎসাহিত করিবে। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল এই উদ্দেশ্যে চারটি সঙ্কল্প করিয়াছেন—(১) অন্তঃপুরে শিক্ষা প্রচার; (২) পাঠ্যপুস্তক রচনা ও ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন; ইংরাজি সংগ্রন্থের অনুবাদ; (৩) নারীহস্তের শিল্পজাত বিক্রয়ের জন্য ভাণ্ডার স্থাপন; (৪) নারীগণের চিকিৎসা। উদ্যোগকর্ত্রীর সাধু উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউক এই প্রার্থনা। এই প্রবন্ধে 'সভাপত্নী' ও 'লাভ উঠাইতেছেন' লেখা হইয়াছে; সভাপত্নী অপেক্ষা সভানেত্রী ব্যবহার করিলে ভালো হইত; 'লাভ উঠানো' বাংলা নহে, হিন্দি। 'চয়নের' মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 'হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ ইউ কি' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পুস্তকের অনুবাদ করিতেছেন; বলা বাহুল্য ইহা ইংরাজি অনুবাদের অনুবাদ; অনুবাদ মন্দ হইতেছে না; লেখক ভাষার সৌষ্ঠব ও বর্ণাশুদ্ধির প্রতি একটু মনোযোগী হইবেন। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী দেখাইয়াছেন 'স্ত্রীসেনা' বহু প্রাচীন কাল হইতে আছে; সম্প্রতি ইতালি দেশে ভূগর্ভ-উৎখাত প্রাচীরগাত্রে নারী সৈন্যের সংগ্রামদৃশ্য খোদিত দেখা গিয়াছে। শ্রীভঃ—লিখিত 'ব্রঙ্কো বো-টো' ডাকাতের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের মনোজ্ঞ কাহিনী। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন, আর্ল রনাল্ডশের মত 'প্রাচ্যগৌরব' নামক প্রবন্ধে সংকলন করিয়াছেন; আর্লের মত এই যে, আবহমান কাল প্রাচ্যদেশ হইতেই জগৎ জ্ঞান, ধর্ম্ম, সম্পৎ সকলই লাভ করিয়াছে, ভবিষ্যতেও সেইখানেই মহামানবের শান্তিময় কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। 'আণ্ডামান দ্বীপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক নিবন্ধটি সুখপাঠ্য বহুতথ্যপূর্ণ। 'বারাণসী' ফরাসী হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ। ফরাশী পর্য্যটক সংক্ষেপে বারাণসীর একটি ফটোগ্রাফের মতন নিখুঁত চিত্র দিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-অনুশাসন লোককে জড় করিয়া ফেলে; সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যাহা বিশ্বাত্মার জ্ঞান ও প্রেমের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিত, অর্থাৎ সমস্ত বুঝিতে পারা ও সমস্তকে ভালো বাসাই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার বিলাতের বিখ্যাত চিত্রকর 'উইলিয়ম রদেনষ্টাইন' সাহেবের বর্ণনপ্রসঙ্গে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে য়ুরোপে শিল্পের দৈহিক চর্চ্চা ও ভারতে ভাবের চর্চ্চা হইয়াছে, এবং প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্ট শ্রেষ্ঠ; রদেনষ্টাইন এই ভাবপ্রধান চিত্রাঙ্কণরীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই ভারতে আসিয়াছিলেন, এবং মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 'বণ্টন' বিষয়ক অর্থনীতির আলোচনা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ইংরাজি বাংলা সংস্কৃত 'কাব্যে নিদাঘ-চিত্র' কিরূপ স্থান অধিকার করে; রচনা এলোমেলো, ভাষা প্যাঁচালো হইয়াছে। 'সার্থক দান' শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা মৃদুমধুর রসের পরিচয় দিতেছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'গান' ভালো হয় নাই। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস স্থির করিয়াছেন 'লক্ষ্মণ সেন' ত্রিহুত পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আবির্ভাব কাল সন হইতে ৫১৫ বাদ দিলে পাওয়া যায়। 'বর্ষ শেষ' সালতামামির সংক্ষিপ্ত হিসাব-নিকাশ। এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিত্বমণ্ডিত শব্দচিত্রিত বিদায়-অভিনন্দন দ্বারা 'বর্ষ বিদায়' করিয়াছেন।

সুপ্রভাত (ফাল্গুন)—

মুখপত্র শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ চিত্র 'শাজাহানের অন্তিমকাল' রঙিন; ছাপা সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 'সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ কর্ম্ম-পদ্ধতি' প্রবন্ধে চীন পরিব্রাজক ইৎসিং বর্ণিত ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্তের পরিচয় দিয়াছেন; এ সবই পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বণ। 'কাব্যে ধর্ম্মকথা' প্রবন্ধে শ্রীযু° অমৃতলাল গুপ্ত বলিতে চান, যে-কাব্য ধর্ম্মকথা বলে সেই কাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু ইহাই কি কাব্যের উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়? প্রসঙ্গক্রমে রবিবাবুর নৈবেদ্যের আলোচনা করিয়া ঐ কাব্যের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে; মোটের উপর প্রবন্ধটি কেমন নির্জ্জীব রকমের খাপছাড়া হইয়াছে। 'সন্ধ্যায়' শ্রীমতী নির্ঝরিণী দাসীর পদ্য, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত প্রার্থনা মাত্র। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু 'বঙ্গে শ্রমজীবী-শিক্ষার প্রথম কথা' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমজীবীর উন্নতি চেষ্টার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন; সমাজহিতৈষীদিগের ইহা পাঠ করিয়া দেখা উচিত। মালদহ সাহিত্যসম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরীর 'অভিভাষণ' মালদহের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের একটি সরস সুপাঠ্য রংদার রচনা। 'জয় না পরাজয়' শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গল্প রচিবার ব্যর্থ চেষ্টা; তত্ত্বকথা ও বক্তৃতা গল্প নহে। 'দীপালী' শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের চিত্র ও দীপালীর ইতিহাস, সুখপাঠ্য সরস চিন্তাশীল রচনা। শ্রীমতী উষাপ্রভা সেনের 'প্রত্যাবর্ত্তন' গল্প এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' শ্রীমতী সরলা দেবীর বক্তৃতার অনুবাদ; ইহার উদ্দেশ্য-পরিচয় ভারতীর সমালোচনায় দিয়াছি; সকলেরই এবিষয়ে চিন্তা করিয়া সহযোগিতা করা উচিত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসের 'দৈন্য প্রার্থনা' কবিতা; এটি পুণ্যাত্মা রাবেয়ার প্রার্থনা, কিন্তু লেখক তাহার উল্লেখ করেন নাই; এই প্রার্থনাটি বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাংলায় গদ্যে প্রকাশ করেন; এ কবিতায় তাহার ভাষা পর্য্যন্ত উঁকি মারিতেছে; তাহার ঋণ স্বীকার না করিয়াও রাবেয়ার নামোল্লেখ করিলে কবির যশোহানি হইত না। এই কবিতার ঠিক পাশেই শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা 'তিরোধান তিথি' বিশপ হীবারের রচনা অবলম্বনে; সত্যেন্দ্র বাবুর কবিতা সম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন তাঁহার কবিতা মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে; এক্ষেত্রে তিনি মূলের ঋণ না স্বীকার করিলেও পারেন; কিন্তু তাঁহার সেরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায় না, ইহা তাঁহারই গৌরবের বিষয়; কবিতাটি অশ্রুবিন্দুর মতন করুণ। 'প্রাচীন কাগজ সংগ্রহ' শিরোনাম দিয়া শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী একটি প্রাচীন অজ্ঞাত কবির একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীলীলা, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'জন্মদিনে' পদ্য লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা কবিত্ব ও বিশেষত্বহীন। 'ভ্রমণ' প্রসঙ্গে আগ্রা, এটাওয়া ও কানপুরের সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ বর্ণনা আছে; ভ্রমণকাহিনী আর একটু বিশদ না হইলে পাঠকের তৃপ্তিকর হয় না; এ যেন থলির মধ্যে হাতী পুরিবার চেষ্টা হইয়াছে।

কায়স্থপত্রিকা (ফাল্গুন)—

এ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য মাত্র একটি ব্যঙ্গচিত্র। তাহা আমরা এখানে *পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বঙ্গের হিন্দু—স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মানসপুত্র।' ইহার দ্বারা এই বুঝাইবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে বঙ্গে কেবল মাত্র সমাজের মস্তক ও চরণ—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র—আছে; অন্যান্য অবয়ব—ক্ষত্রিয় বৈশ্য—

[illegible]—[illegible]নন্দনের মানসপুত্র।

নাই। মস্তক কিন্তু মুদিতনেত্র—তাহার দর্শনশক্তি নাই, অথবা দেখিয়াও দেখে না।

ব্রহ্মবাদী (ফাল্গুন ও চৈত্র)

প্রথমেই শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'অন্বেষণ' কবিতা; ইহা কিন্তু ভারতীর পৃষ্ঠাতেও স্থান পাইয়াছে। এ কবিতাটি এমন অসাধারণ নয় যে একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া দরকার ছিল; একই বিষয় দুই পত্রিকায় দিবার সময় লেখকের এতটুকু বিবেচনা খরচ করা উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস প্রাচীন ও আধুনিক বচন উদ্ধৃত করিয়া 'আত্মার অমরত্ব' প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ধর্ম্মপদ' অনুবাদ করিতেছেন। 'মানবে অনন্তের প্রকাশ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর রচনা। 'পরিবর্ত্তন' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস জনসমাজের উপর ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অলক্ষ্য প্রভাব নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'পাওয়া' শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাসের অধ্যাত্মদার্শনিক সরল রচনা। 'এসহে' কবিতা, শ্রীযুক্ত কুসুমকুমারী দাস লিখিত। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস 'রাজনারায়ণ বসু' মহাশয়ের সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ 'ব্রহ্মভূত' প্রবন্ধে গীতোক্ত ব্রহ্মভূত শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুপাঠ্য।

নব্যভারত (মাঘ ও ফাল্গুন)—

শ্রীযুক্ত শশধর রায় 'মানব সমাজ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন "মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে চিনা। বাক্তাবাক্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহার বিরাট কল্প। বিজ্ঞান শাস্ত্র তাহাই আলোচনা করে। এ নিমিত্তই বিজ্ঞান ইহকালের এবং পরকালের বন্ধু।" 'পূর্ব্বস্মৃতি' শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের দীর্ঘ কবিতা মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট স্থানব্যাপ্তির তুলনায় 'আমরা কোথায়' এবং কত নগণ্য তাহাই বিজ্ঞানালোকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এরূপ প্রবন্ধ পাঠ করিলে কল্পনা ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয় বসু 'সাংখ্যসূত্র' বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া বাংলায় ব্যাখ্যা করিতেছেন; ইহার দ্বারা সাধারণ পাঠকের নিকট সাংখ্যসূত্র সহজবোধ্য ও ভীতিশূন্য হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'পালি সাহিত্য' সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছেন; অল্প পরিসরে বহু তথ্য ও অনুসন্ধান সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার এখানেও 'অর্থশাস্ত্র' খুলিয়া বসিয়াছেন; অর্থনীতি বাংলায় অল্পই আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং উহার বহুল আলোচনা বাঞ্ছনীয়; তবে উহা কেবলই বিদেশী অবস্থার উপর দেশী খোলস চড়ানো না হয়ে সে বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি ও দেশী অবস্থার পর্য্যবেক্ষণের শ্রমস্বীকার আবশ্যক। 'মৌন' শ্রীযুক্ত শশধর রায় রচিত হেঁয়ালি সনাতন পয়ারচ্ছন্দে লিখিত; যেমন উদ্ভট ভাব তেমনি উৎকট ভাষা, তেমনি সঙ্কট অব্যবসায়ীর কবিতা রচনার সাধ। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদারের 'ম্যালেরিয়ার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার" রসিকতা হৃদয়ঙ্গম হইল না, তাহাতে রসের নিতান্ত অভাব আছে বলিয়াই। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গোস্বামী 'মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত' প্রবন্ধে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন; গোস্বামী মহাশয়ের ব্যাখ্যা ভক্তবিশ্বাসী ছাড়া অপরের স্বীকার্য্য হইবে না, সুতরাং তাঁহার প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। 'মুদীর দোকান' শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাভাষায় প্রচলিত কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয় বিষয়ক পুস্তক; ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুহ যথেষ্ট অনুসন্ধান ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, বহু বাংলা কথার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; বাংলা অভিধান সঙ্কলনে এমনতর আলোচনা বিশেষ কাজে লাগে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিশ গজি শিরোনামযুক্ত 'একই ব্যাস কি মহাভারত ও ভাগবতের রচয়িতা?' প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে এ দুই পুস্তকের রচয়িতা এক ব্যক্তি নহেন; প্রমাণগুলি সহজ বুদ্ধির অনুকূল, প্রতিপক্ষের অলৌকিক যুক্তিপ্রয়োগ নহে। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত 'বিদ্যাসাগর' প্রসঙ্গে বিধবা বিবাহ কি কি কারণে সমাজের কল্যাণকর তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। রচনা কিন্তু সুলিখিত একেবারেই নয়; সকল স্থানের ভাষাপ্রয়োগ ও রচনাপ্রণালীও স্পষ্ট হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় 'ভক্ত শিশিরকুমার ঘোষ' মহাশয়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সাহা 'পঞ্জাব ভ্রমণ' সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন; লাহোর সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য কথা সহজ অনাড়ম্বর ভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র ঘোষ 'বৃত্রসংহার' সমালোচনায় মৌলিকত্ব দেখাইতে গিয়া একটি দুর্ভেদ্য জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন; ভাষাও নিতান্ত দীন ও পঙ্গু। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'ষড় বৃত্তি' রচনার 'প্রয়োজনিতা' কি বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চৌধুরীর 'দার্শনিক ও ভক্তগণের মুক্তি' প্রবন্ধে দার্শনিক কেমনতর মুক্তি চান এবং ভক্তই বা কেমনতর মুক্তি কামনা করেন তাহাই শাস্ত্রবচন দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমতী অপূর্ব্বাসুন্দরী দাসগুপ্তা 'স্বর্গগতা মনোমোহিনী দেবী' (কবি রজনীকান্ত সেনের মাতা) সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস স্থানের নামের ব্যুৎপত্তির 'লুপ্তোদ্ধার' করিতেছেন; উদ্যম প্রশংসনীয়।

প্রজ্ঞাপারমিতা।

অবলোকিতেশ্বর

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

বিবিধ ও সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আমেরিকা ভ্রমণকালে একজন মার্কিন চিত্রকর তাঁহার একখানি সুন্দর তৈলচিত্র আঁকিয়াছিলেন। আমরা এবার প্রবাসীতে ঐ চিত্রের প্রতিলিপি দিলাম। বলা বাহুল্য মূল চিত্রখানি নানাবর্ণে রঞ্জিত।

সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ মোজার্টের নাম অনেকেই জানেন। কথিত আছে যে শিশু মোজার্ট ছয় বৎসর বয়সেই নিজ অপূর্ব্ব শক্তিতে লোককে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। পনের বৎসর বয়সে তিনি একটি বিখ্যাত সঙ্গীত-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অকালপক্কতা ভবিষ্যতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বিকাশের সূচনা করিয়াছিল মাত্র। যেমন সঙ্গীতে সেইরূপ অন্যান্য অনেক বিদ্যাতেও মানুষের অল্পবয়সে বিস্ময়কর প্রতিভা ও পারদর্শিতার পরিচয় কখনও কখনও পাওয়া গিয়া থাকে। ইহার কারণ-নির্ণয় বৈজ্ঞানিকের কাজ। অনেকে পূর্ব্বজন্মের কথা বলিয়া আপনাদিগকে ও অন্য লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা দুইটি কারণে সন্তোষ উৎপাদন করে না। প্রথমতঃ, এই ব্যাখ্যা পরীক্ষণ বা পর্য্যবেক্ষণ-প্রসূত নহে, এবং পরীক্ষণ বা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহার যাথার্থ্যের পরখও করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, গোড়াতেই এই আপত্তি উঠে যে অতীতকালে ও বর্ত্তমানে আমরা একই সময়ে নানা দেশে অনেক অসামান্যশক্তিশালী মানুষ দেখিতে পাই। ইহাদের সকলেরই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া অসাধারণশক্তি-সম্পন্ন শিশু হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না; আমরা এরূপ অনেক শিশু দেখিতে পাই না, এরূপ শিশু কচিৎ দুই একটি দেখি মাত্র।

আমাদের দেশে সঙ্গীতে সম্প্রতি এইরূপ দুইটি শিশু দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে মদন নামক বালকটির কথা সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় একটি বালিকা; নাম মনোরমা, বয়স ছয় বৎসর। এই শিশুটি ভাগলপুরের উকীল বাবু উপেন্দ্রনাথ বাক্‌চি মহাশয়ের পৌত্রী। মনোরমা ৩½ বৎসর বয়সেই তাহার সঙ্গীতশক্তির পরিচয়

মনোরমা।

দিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে কলিকাতার অনেক ভদ্র গৃহের মজলিসে বিশেষজ্ঞ লোকদের সমক্ষে কঠিন কঠিন গান গাহিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে।

ভারতবর্ষের সরকারী শিক্ষাবিভাগে তিন শ্রেণীর চাকরী আছে, যথা, ইণ্ডিয়ান (ভারতীয়) এডুকেশন্যাল সার্ব্বিস, প্রভিন্‌শ্যাল (প্রাদেশিক) এডুকেশন্যাল সার্ব্বিস (শিক্ষা সম্বন্ধীয় কর্ম্ম), এবং সবর্ডিনেট (অধস্তন) এডুকেশন্যাল সার্ব্বিস। তন্মধ্যে যেটির নাম ভারতীয় তাহাতে কার্য্যতঃ ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয় না। ইহা শ্বেতচর্ম্মীদিগের জন্য রাখা হইয়াছে। এক আধজন দেশী লোক ইহাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। বিদ্যা, গবেষণাশক্তি, শিক্ষাদানকার্য্যে দক্ষতা, ভারতবাসীর যতই থাক না কেন, সে এই শ্রেণীর কাজ পাইবার অধিকারী নহে। পাইলে তাহা সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহমাত্র। বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ভারতবর্ষের কোন ইংরাজ অধ্যাপক অপেক্ষা বিদ্যায়, গবেষণাশক্তিতে, অধ্যাপনানৈপুণ্য বা চরিত্রে নিকৃষ্ট নহেন। কিন্তু তিনি

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

দুই যুগ ধরিয়া প্রাদেশিক শ্রেণীতেই কাজ করিতেছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশবাসীরা এই চমৎকার বর্ণভেদের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান্ শ্রেণীতে উন্নীত করা হইয়াছে। তাঁহার মত বাছা একজন লোককে উন্নীত করিয়া সর্ব্বসাধারণের অসন্তোষ দূর করিবার চেষ্টা মন্দ নয়। কিন্তু এই বর্ণভেদ প্রথাটাই খারাপ। ইহা সমূলে উৎপাটিত না হইলে আমরা কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

দক্ষিণ আফিকার ট্রান্সভাল প্রদেশে নূতন ভারত-বাসী যাইতে পারে না। আগে হইতে সেখানে যাহারা আছে, তাহারাও দাগী লোকের মত আঙ্গুলের ছাপ দিয়া নিজেদের নাম রেজিষ্টরী ভুক্ত না করিলে, তাহাদিগকে কয়েদ করা হয়, এবং অনেককে নির্ব্বাসিতও করা হই-য়াছে। তথাকার ভারতবাসীরা এই অপমানকর রাজ-বিধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন, এবং এই বিধি পালন না করিয়া "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" (Passive Resistance) নীতি অবলম্বন করায় দলে দলে জেলে যাইতেছেন, এ সকল সংবাদ সংবাদপত্র-পাঠকেরা জানেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সোধা নামক একজন ভারতবাসী এই প্রকারে কারারুদ্ধ হন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী রম্ভাবাঈ সোধা শিশুসন্তানগুলিকে লইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্য এক প্রদেশ হইতে নিরাশ্রয় অবস্থায় ট্রান্স্‌ভালে তাঁহার স্বামীর বন্ধুগণের আশ্রয়ে বাস করিতে আসিতেছিলেন।

শ্রীমতী রম্ভা বাঈ সোধা।

তখন তাঁহাকে "নিষিদ্ধ আগন্তুক" (Prohibited im-migrant) বলিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। তাহার পর আপীল হইয়াছে! আমরা এখনও ফল জানিতে পারি নাই। ভারতনারীগণের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে ইনিই প্রথমে কারাগারের অভ্যন্তর দর্শন করিলেন। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইবার চেষ্টায় আরও অনেকের এই সৌভাগ্য ঘটিবার সম্ভাবনা। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষের

উন্নতি হইবে কি? মূল্যবান্ বস্তু বিনামূল্যে কে কবে পাইয়াছে?

১৩১৬ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে (৮৩৭পৃষ্ঠা) আমরা "প্রজ্ঞাপারমিতা" মূর্ত্তির সম্মুখদৃশ্য মুদ্রিত করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যায় এই অনবদ্য প্রস্তরমূর্ত্তিখানির পার্শ্বদৃশ্য প্রকাশ করিতেছি।

পাঠকগণ জানেন, পুরাকালের ভারতবাসীরা ভারত-মহাসাগরের যব (জাভা), বলি, প্রভৃতি নানাদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল উপনিবেশে কখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, কখনও বৌদ্ধধর্ম্ম, কখনও বা যুগপৎ উভয়েরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই কারণে আমরা যবদ্বীপে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় প্রকারেরই মূর্ত্তি দেখিতে পাই। প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধমূর্ত্তি। ইহা যবদ্বীপ হইতে আনীত হইয়া এক্ষণে লীডেন নগরের রিজ্‌ক্স্ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুপুরাণে যেমন শিবের শক্তি পার্ব্বতী, তান্ত্রিক বৌদ্ধপুরাণে তেমনি আদিবুদ্ধের শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা। ইনি ঐশজ্ঞানরূপিণী। তিনি প্রকৃতি; আদি-বুদ্ধরূপ পুরুষের সহযোগে তাঁহা হইতে সমুদয় বোধিসত্ত্ব ও পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটির সম্মুখ ও পার্শ্বদৃশ্য পাশাপাশি রাখিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহার শান্ত যোগনিরত দেবভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা হৃদয়কে উন্নত পবিত্র করিতে পারি।

বর্ত্তমান সংখ্যায় অবলোকিতেশ্বরের যে চিত্র দিলাম, উহাও বৌদ্ধমূর্ত্তি। উহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটি ধাতব মূর্ত্তি। বুদ্ধদেবের নানা নাম ও রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। অবলোকিতেশ্বর তন্মধ্যে অন্যতম।

এই মূর্ত্তিটিতে শান্তি ও করুণা দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে।

গত মার্চ্চ মাসের সেন্সস্ অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে একাত্রিশ কোটি হইয়াছে। গত দশ বৎসরে শতকরা সাতজন লোক বাড়িয়াছে; বৃটিশ-শাসিত ভারতে বাড়িয়াছে শতকরা ৫·৪ জন, দেশীয় রাজ্যসমূহে বাড়িয়াছে শতকরা ১২·৯ জন। দেশীয় রাজ্যে অধিক পরিমাণে লোক বাড়িবার একটি কারণ, সরকার বলিতেছেন, এই যে ১৮৯৭ ও ১৯০৯ সালের দুর্ভিক্ষে এই রাজ্যগুলি বৃটিশ ভারত অপেক্ষা অধিক ভুগিয়াছিল, এখন তজ্জন্য বেশী বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, এই যে দেশীয় রাজ্যে এখনও বৃটিশ ভারত অপেক্ষা লোকের বসতি বিরল, তজ্জন্য লোক বাড়িবার যায়গাও আছে বেশী। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় একটা তথ্যে মনোনিবেশ করা হয় না,—দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিরল বসতির কারণ এই যে তথায় উর্ব্বরা ভূমি অপেক্ষা অনুর্ব্বর জমির পরিমাণ বেশী। বৃটিশ ভারতে জমির অবস্থা ইহার বিপরীত। ইহা সত্ত্বেও দেশী রাজ্যে লোক বেশী বাড়িবার কারণ বোধ হয় এই, যে, তথাকার লোকে হয়ত বৃটিশ প্রজা অপেক্ষা পিঠে সয় বেশী, কিন্তু পেটে খাইতেও পায় বেশী।

পঞ্জাবে শতকরা প্রায় ২ জন এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে শতকরা ১ জন লোক কমিয়াছে। এইসকল প্রদেশ বাঙ্গলা দেশে "পশ্চিম" নামে পরিচিত, এবং পশ্চিমের জলবায়ু বাঙ্গালীর চিরাগত বিশ্বাস অনুসারে সাতিশয় স্বাস্থ্যবর্দ্ধক। সেই পশ্চিম আজ প্লেগ ও ম্যালেরিয়ায় ক্রমশঃ উজাড় হইতে বসিয়াছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও ম্যালেরিয়ায় নদিয়া ও যশোর জেলার লোক বাড়ার পরিবর্ত্তে কমিয়াছে। নদিয়ায় দশ বৎসরে ৪০,৪৪৫ এবং যশোরে ৫৭৮০৯ লোক কমিয়াছে। এক একটা প্রদেশ বা জেলার স্বাস্থ্যোন্নতি দেশবাসীর চেষ্টায় নিশ্চয়ই হইতে পারিত, যদি তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত হইত এবং দেশের শাসনকার্য্যে তাহাদের মতই, সুসভ্য দেশসমূহের মত, প্রবল হইত। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, এবং দেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে আমাদের মতামত গ্রাহ্য করা হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় সরকার প্রতিকার করিলে কিছু হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতিকার মশা ও ইঁদুর মারিলে হইবে না। রোগের গোড়ায় ঘা দিতে হইবে। মানিয়া লইলাম যে মশা ও ইঁদুর রোগের বীজ নানাস্থানে ছড়ায়, মনুষ্যদেহে সঞ্চারিত করিবার আনুকূল্য করে। কিন্তু তাহারা ত রোগের বিষটার সৃষ্টি করে না। বিষটা আসে কোথা হইতে?

ইহাও জানা কথা, যে, রোগের বিষ শরীরে ঢুকিলেও, বিষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা পুষ্ট সবল দেহের আছে। সুতরাং আমাদের দেশে রোগের আক্রমণ নিবারণে অসমর্থ শীর্ণ দুর্ব্বল দেহের আধিক্য কেন হইল, তাহা নির্ণয় করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে, রোগের আতিশয্য এবং মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য কেমন করিয়া কমিবে?

আর একটা উপায় কল্পনা করা যাইতে পারে বটে। তাহা, সভা সমিতি করিয়া দেশবাসীদের নিজেদের দ্বারাই প্রতিকারের চেষ্টা। কিন্তু ইহা রাজবিধির অনুকূল অবস্থাতেও দুঃসাধ্য, প্রায় অসাধ্য হইত, এখন ত একেবারেই অসাধ্য। কারণ, এখন সব বড় বড় সমিতিই আইনবিগর্হিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং নূতন কিছু করিতে সকলেই ভয় পাইবে। করিলেও, সমিতি আর কিছু করুক বা না করুক, বোমা প্রস্তুত করিতেছে কি না, তাহার অনুসন্ধান পুলিশ ও পুলিশের গুপ্তচরেরা অহরহ লইতে থাকিবে।

সুতরাং এখন গবর্ণমেণ্টের হাতেই লোকের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। প্রতিকার করায় গবর্ণমেণ্টের এবং বেসরকারী ইংরাজদের স্বার্থও আছে। কারণ প্রজার সংখ্যা কমিয়া গেলে খাজনা আদায়ও কম হইবে। প্রজার সংখ্যা কমিয়া গেলে বেসরকারী বণিক্ ইংরাজ কারখানার জন্য যথেষ্ট কুলি মজুর পাইবে না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সৈনিক পঞ্জাব এবং আগ্রা অযোধ্যাদি প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকে। তথাকার সাধারণ লোক বেশী পরিমাণে মরিলে বা রোগে দুর্ব্বল হইলে, ভাল সৈন্য কোথায় পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়াই বা ইংরাজের রাজ্য রক্ষা হইবে?

তবে, অনেকে বলিতে পারেন যে খাজনা হ্রাস হইতেছে বা শীঘ্র হইবে, কুলি মজুরের অনাটন হইতেছে বা শীঘ্র হইবে, ভাল সৈন্য পাওয়া যাইতেছে না বা শীঘ্র যাইবে না, রোগের প্রাবল্য ও মৃত্যুর আধিক্য ভারতবর্ষে এখনও এ অবস্থায় পৌঁছে নাই। তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও কি সেই দুর্দ্দিন যতদিন না আসে, ততদিন প্রকৃত প্রতিকারের আন্তরিক চেষ্টা না করিয়া বসিয়া থাকা, সরকারী ও বেসরকারী ইংরাজের পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে? দয়া ধর্ম্মের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

সম্প্রতি যতগুলি প্রশ্ন সর্ব্বসাধারণের বিবেচনার্থ উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দেশে সার্ব্বজনিক শিক্ষাবিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। রোগ বল, দারিদ্র্য বল, সামাজিক কুপ্রথা বল, দুর্নীতি বল, কুসংস্কার বল, অধর্ম্ম বল, নরনারী, ধনী দরিদ্র, ভদ্র "ইতর", সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ব্যতিরেকে ভারতবাসীর উন্নতির পথের কোন বিঘ্নই দূরীভূত হইতে পারে না। সুতরাং সকলকেই শিক্ষা দিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে সভাসমিতি করিয়া ও চাঁদা তুলিয়া যে দেশময় পাঠশালা স্থাপন করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব। সুতরাং রাজবিধির প্রয়োজন। সস্তায় বা বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অনেকেই সন্তানগণকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শিক্ষা দিবে। কিন্তু কোন কোন স্থলে আইনদ্বারা বাধ্য করা দরকার হইতে পারে। মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে, যে যে স্থলে বাধ্য করা হইবে না বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত আইনে একটি ধারা নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও উপর জুলুম হওয়ার সম্ভাবনা কম। রাষ্ট্র রক্ষার ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য লোকের উপর একটু চাপ দেওয়ায় দোষ নাই। আদালতে সাক্ষ্য দিবার জন্য, জুরর এবং এসেসর হইবার জন্যও ত লোককে বাধ্য করা হয়। অধিকাংশ সভ্যদেশেই পিতামাতা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে বাধ্য। আমাদের দেশেও বড়োদা রাজ্যে এই নিয়ম কিছুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোথাও লোকে বিদ্রোহী হয় নাই, বা অতিমাত্রায় অসন্তোষ দেখা যায় নাই। আর বৃটিশ ভারতের লোকেই কি এত গাধা যে তাহারা নিজেদের মঙ্গল বুঝিবে না?

গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে সর্ব্বত্র যথেষ্টসংখ্যক পাঠশালা স্থাপন করিলেই ভাল হয়। কারণ ভারতবাসী দরিদ্র এবং আর তাহাদের ট্যাক্স দিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের এরূপ করিবার সম্ভাবনা বড় কম, নাই বলাই উচিত। সুতরাং গোখলে মহাশয় যে নূতন শিক্ষাকর স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করিতেছি। এই

কর যাহাতে দরিদ্রের স্কন্ধে না পড়িয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার লোকদের উপরই পড়ে, এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই হইবে। আমরা স্বদেশপ্রেমের চীৎকার অনেক করিয়াছি, এখন স্বার্থত্যাগ দ্বারা স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্‌, আয়ারলণ্ড, বেলজিয়ম, জার্ম্মানী প্রভৃতি নানা সুসভ্য দেশে প্রাথমিক সার্ব্বজনিক শিক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে টাকা দেওয়া হয় এবং প্রজারাও বিশেষ শিক্ষাকর দেয়। সুতরাং শিক্ষাকরটা নূতন জিনিষ নয়। গত বৎসর মুসলমান নেতারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের শিক্ষা-কন্‌ফারেন্সে গবর্ণমেণ্টকে মুসলমানদের উপর শিক্ষাকর বসাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হিন্দুরাই কি পশ্চাৎপদ হইবেন? অবশ্য গোখলে মহাশয় তাঁহার আইনের পাণ্ডুলিপিতে গবর্ণমেণ্টকে একেবারে নিষ্কৃতি দেন নাই। গবর্ণমেণ্টকে সার্ব্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের অধিকাংশ বহন করিতে হইবে, গোখলে মহাশয়ের এইরূপ অভিপ্রায়।

অনেকে বলিতে পারেন, অন্য দেশের কথা যাহাই হউক, আমাদের গরীবদেশে শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার গবর্ণমেণ্টেরই লওয়া উচিত। আমাদেরও মত তাই। কিন্তু সে ভার যদি গবর্ণমেণ্ট না লন, বা লইতে না পারেন, তাহা হইলে আমরা কি কিছুই করিব না? আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্ট যদি কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা না করেন, বা ঘোষণা করিতে বিলম্ব করেন, সে স্থানের সদাশয় অবস্থাপন্ন লোকেরা কি অনশন-ক্লিষ্ট লোকদের জন্য কিছু করেন না? নিশ্চয়ই করেন। লোকেরা অনাহারে মরিতেছে দেখিয়া তাঁহারা কখনও নিশ্চিন্ত থাকেন না। তাঁহারা চাঁদা করিয়া যথাসাধ্য লোকের প্রাণরক্ষা করেন। জ্ঞান এক হিসাবে অন্নের চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয়। কারণ আমরা দেখিতেছি, জ্ঞানের অভাবে লোকে দারিদ্র্যে, রোগে, দুর্নীতি আদির বশে, ক্লেশ পাইতেছে ও মারা যাইতেছে। জ্ঞানাভাবে সমুদয় জাতির এত দুর্গতি দেখিয়াও উদাসীন হইয়া থাকা কোনও সদাশয় বিবেচক লোকের কর্ত্তব্য নহে।

অনেকে মনে করেন, মুটে মজুর চাষার লেখা পড়া শিখিয়া কি হইবে? তাহারা লেখা পড়া শিখিলে আর মুটে মজুর চাষা পাওয়া যাইবে না। ইহার উত্তর এই যে জ্ঞান লাভ করিলে মুটে মজুর চাষা আরও ভাল মুটে মজুর চাষা হইবে, যেমন পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশসমূহে হইয়াছে। জ্ঞানের সুখ, সুবিধা ও শক্তি হইতে কোন লোকেরই বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়,—তা সে যে অবস্থারই লোক হউক। ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সুসভ্য দেশসমূহে সকলে লেখা পড়া জানা সত্ত্বেও মুটে মজুর চাষা পাওয়া যায়, এবং তাহারা আমাদের দেশের মুটে মজুর চাষা অপেক্ষা বুদ্ধির সহিত কাজ করে, ভাল ও বেশী কাজ করে, এবং বেশী শিল্পদ্রব্য ও শস্য উৎপাদন করে। তদ্ভিন্ন, ইহাও বিবেচ্য যে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে মানুষের হাতের কাজ এত বেশী পরিমাণে কলের দ্বারা হইতেছে যে এখন পাশ্চাত্য অনেক দেশে প্রত্যেক কাজের জন্য মুটে মজুরের প্রয়োজন হয় না; এমন কি ঘরকন্নার অনেক কাজও আর দাসদাসীদের দ্বারা করাইতে হয় না। আমেরিকায় একদিকে যেমন সহজে দাসদাসী পাওয়া যায় না, অপর দিকে তেমনি অনেক ঘরকন্নার কাজ কলে নির্ব্বাহ হওয়ায় দাসদাসীর অভাবও তত বোধ হয় না।

কিন্তু যদি বাস্তবিকই এমন হয় যে সকলে লেখা পড়া শিখিলে কেহ আর মুটে মজুর বা চাকরের কাজ করিতে চাহিবে না, তাহা হইলে আমরা নিজেই নিজের মুটে ও চাকরের কাজ করিয়া আরও মানুষের মত মানুষ, স্বাবলম্বী মানুষ, হইব। আমাদের আলস্য, আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা, বা বাবুআনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া কতকগুলি লোককে বংশানুক্রমে জ্ঞানহীন নরাকার পশু হইয়া থাকিতে হইবে, এরূপ মনে করা বা বলা সাতিশয় হেয়, এবং যারপরনাই নিন্দা ও লজ্জার কথা। ভগবান্ এরূপ ব্যবস্থা করেন নাই; এরূপ ব্যবস্থা কোন দেশে টিকিতেছে না, আমাদের দেশেও টিকিবে না।

তবে একথা ঠিক্ বটে যে সকল লোকেই লেখা পড়া শিখিলে ভদ্রনামধারী দুষ্ট লোকদের নিরক্ষর গরীব লোক-দিগকে অবাধে গালাগালি দিবার, প্রহার করিবার, অপমান করিবার ও ঠকাইয়া খাইবার সুবিধা বেশী থাকিবে না।

কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ভদ্র ও সৎলোকদের কোন আপত্তির কারণ নাই। ভদ্রনামধারী ছোটলোক ও দুষ্ট লোকদের ইহাতে আপত্তি হইবে বটে। কিন্তু প্রকৃত ভদ্র ও সৎ হওয়াই যখন আমাদের সকলের জীবনের লক্ষ্য, তখন এই আপত্তি খণ্ডনের চেষ্টা করা অনাবশ্যক। আর একটা আপত্তি এই যে সকলে লেখা পড়া শিখিলে সবাই কেরাণী, মাষ্টারী, ইত্যাদি চাহিবে। কিন্তু চাহিলেই ত পাওয়া যায় না। সুতরাং কার্য্যতঃ যে যে কাজের যোগ্য অবশেষে তাহাকে সেই কাজই করিতে হইবে।

১৮৭২ সালের তিন আইন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন নামে পরিচিত। এই আইন অনুসারে ব্রাহ্মদিগের বিবাহ রেজিষ্টারী হইয়া থাকে। এইরূপ বিবাহে বরকন্যাকে এই কথা বলিতে হয় যে তাঁহারা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ পার্সি বা ইহুদী ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মই হিন্দুবংশজাত, এবং অনেকে মনে করেন যে তাঁহারাও হিন্দু। এই জন্য অনেক ব্রাহ্ম আপনাদিগকে অহিন্দু বলিতে অনিচ্ছুক। এবং অনেকে তাঁহাদের ধর্ম্ম কি নহে তাহা বলা অপেক্ষা কি বটে, তাহা বলাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। এইজন্য কিছুদিন হইতে উক্ত আইনের সংশোধন বাঞ্ছনীয় বোধ হইতেছে। এই আইন অনুসারে, হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক থাকিলে বিবাহ হয় না, সেরূপ স্থলে বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে, যেমন কায়স্থ ব্রাহ্মণে, বিবাহ হইতে পারে। এই আইন অনুসারে বিবাহ করিয়া কেহ পত্নীর জীবিতকালে দারান্তর গ্রহণ করিলে সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। সুতরাং বহুবিবাহ নিবারণের ইহা একটি উপায়।

সম্প্রতি মাননীয় বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই আইন সংশোধনের জন্য একটি বিল ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে, বরকন্যাকে, আমি হিন্দু নই, বৌদ্ধ নই, ইত্যাদি বলিতে হইবে না। এই বিল আইনে পরিণত হইলে কেহ ইচ্ছা করিলে আপনাকে অহিন্দু না বলিয়াও জাত্যন্তরে বিবাহ করিতে পারিবে। এইরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইতিহাসাদিতে অনেক দেখা যায়। মনুতে এইরূপ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ব্যবস্থা আছে। নেপালে এখনও অনুলোম বিবাহ চলে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অনেক স্থানে এখনও কায়স্থ ও বৈদ্যের পরস্পর বিবাহ প্রচলিত আছে। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যাহা হউক, এই বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করায় অনেক হিন্দু ভূপেন্দ্র বাবুকে গালাগালি দিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহার ন্যায্য কারণ দেখিতেছি না। এই আইনটা কেবল একটা অনুমতি দেওয়া মাত্র, ইহাতে কাহাকেও এতদনুসারে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইতেছে না। অর্থাৎ এই আইন পাশ হইলে কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহাদের বিবাহ বৈধ (valid) এবং তাঁহাদের সন্তান বৈধ (legitimate) বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু এই আইন ইহা বলিতেছে না যে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে কায়স্থ-কন্যা বিবাহ করিতে হইবে। যাহারা এরূপ বিবাহ করিবে, তাহাদিগকে অহিন্দু বলিতে ও সমাজচ্যুত করিতে এখন যেমন হিন্দুদের অধিকার আছে, পরেও তেমনি থাকিবে। বিধবাবিবাহ আইন আছে বলিয়া প্রত্যেক হিন্দুবিধবা বিবাহ করিতেছেন না, বা প্রত্যেককে বিবাহ করিতে বাধ্য করাও হইতেছে না। ভূপেন্দ্র বাবুর বিল আইনে পরিণত হইলেই যে ঝুড়ি ঝুড়ি অসবর্ণ বিবাহ হইবে তা নয়। সুতরাং হিন্দুদের আশঙ্কা অমূলক। বরং তাঁহাদের একটা সুবিধা হইবে। ভূপেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত আইন অনুসারে সবর্ণ (যেমন ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, কায়স্থে কায়স্থে) বিবাহও করা চলিবে, অথচ বহুবিবাহ এই আইন অনুসারে দণ্ডণীয় থাকিবে। মেয়ের সতীন হয়, ইহা কেহ চায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকিয়া রীতিমত শাস্ত্রীয় বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই আইনেরও আশ্রয় লওয়া হয়, তাহা হইলে কন্যার সপত্নীসম্ভাবনা নিরুদ্ধ হইবে। ইহা কম লাভ নয়। আর একটা লাভ এই যে এখন কেহ অসবর্ণবিবাহ করিতে চাহিলে আপনাকে অহিন্দু বলিতে বাধ্য হন। ভূপেন্দ্র বাবুর আইনে, সমাজ যাহাই বলুন, রাজকীয় সেন্সসে তিনি হিন্দু বলিয়াই গণিত হইবেন। সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা কমিবে না। একথা বলিতেছি এইজন্য যে সম্প্রতি সেন্সসে নমঃশূদ্র আদিকে

হিন্দু সম্প্রদায় হইতে বাদ দিবার চেষ্টা করায় হিন্দুদিগের তরফ হইতে ঘোরতর আপত্তি হইয়াছিল। এই আপত্তি হইতে ইহাই বুঝা যায়, যে, হিন্দুবংশজাত কেহ পার্য্যমানে হিন্দুর শ্রেণী ও মোট সংখ্যা হইতে বাদ না যান, হিন্দুগণের ইহাই ইচ্ছা। সুতরাং ভূপেন্দ্র বাবু পরোক্ষভাবে সে ইচ্ছার আনুকূল্য করিয়া হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আর একটা লাভ এই হইবে যে বর কন্যা নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় বরপণ ও কন্যাশুল্ক কমিয়া যাইবে।

কলিকাতাস্থ ২।৪ রাধাবাজার লেনের স্মল ইণ্ডষ্ট্রীজ্ ডিভেলপমেণ্ট কোম্পানী তাঁহাদের নির্ম্মিত কতকগুলি কাল, লাল, নীল ও বেগুনী পেন্সিল আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। পেন্সিলগুলি উৎকৃষ্ট ও দরে সস্তা হইয়াছে। দেশের সকল লোকেরই এই পেন্সিল ব্যবহার করা উচিত।

এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা নামক সুবিখ্যাত ইংরাজী বিশ্বকোষের নূতন (একাদশ) সংস্করণ আপাততঃ কিছুদিন সস্তা দামে পাওয়া যাইবে। তাহার পর মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইবে। ইংরাজীতে ইহার মত উৎকৃষ্ট বৃহৎ সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ক কোষ আর নাই। প্রত্যেক কলেজ এবং উচ্চশ্রেণীর ইস্কুলে ইহা রাখা উচিত। অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থায় কুলায়, তাঁহাদের সকলেরই ইহা ক্রয় করিয়া পাঠ করা উচিত। তদ্ভিন্ন জ্ঞানান্বেষী সকলেরই যে ইহা কাজে লাগিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

আগামী ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেকোৎসব হইবে, তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট মোটামুটি দেড় কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকৃত ব্যয় সম্ভবতঃ আরও বেশী হইবে। তদ্ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির স্বতন্ত্র ব্যয় আছে। সমুদয় জড়াইয়া অন্যূন দুই কোটি টাকা সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু, দেশের রাজা, মহারাজা, নবাব ও ধনী লোকদের ব্যয় ত আছেই। ইংলণ্ডের রাজকীয় কোষ হইতে তথাকার অভিষেকোৎসবের জন্য অনধিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ভারতের সিকি ব্যয় হইবে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড অপেক্ষা চারিগুণ ধনী। আমাদের ধনশালিতা বাস্তবিক এইরূপ হইলে মন্দ হইত না। অথবা, এত ব্যয়ের অর্থ কি এই, যে, যাহার দারিদ্র্য যত বেশী তাহার দারিদ্র্য ঢাকিবার জন্য বাহ্যাড়ম্বর তত বেশী হওয়া দরকার? কিম্বা ইংলণ্ডের রাজভক্তি সন্দেহাতীত বলিয়া খরচ কম, আর ভারতের রাজভক্তি সন্দেহানতীত বলিয়া খরচ বেশী? অথবা আমাদের রাজভক্তি ইংরাজের রাজভক্তির চারিগুণ বেশী, ইহাও হইতে পারে। কিম্বা ইহা পরের ধনে পোদ্দারীর একটি দৃষ্টান্ত? কিম্বা ইহা বোকা ভারতবাসীকে বাহ্যাড়ম্বরে চমৎকৃত করিবার চেষ্টাও হইতে পারে। ইহার কারণ যে কি তাহা গবর্ণমেণ্ট বলিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। অভিষেকোৎসবে খরচ করিবার জন্য যখন ইংলণ্ডের চারিগুণ টাকা গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন, তখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের অর্দ্ধেক টাকাও কেন খরচ করিতে পারেন না, তাহা গবর্ণমেণ্ট বলিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। গবর্ণমেণ্টকে বলিতে অনুরোধ করিতেছি।

বর্ষ-বিদায়

হে অতীত-বর্ষ, ওগো, পরিচিত সুন্দর অতিথি,
আজি বিদায়ের ক্ষণে রচিব কি বিদায়ের গীতি?
নব বর্ষ রূপে যবে এসেছিলে আমাদের দ্বারে,
সে দিন অজ্ঞাত ছিলে আপনার রহস্যের ভারে;
তার পরে হ'ল যবে ধীরে ধীরে নব পরিচয়,
তখনি বাসিনু ভাল দিয়া তোমা আপন হৃদয়।
আজি বিদায়ের ক্ষণে ওগো বন্ধু, প্রণমি তোমায়,
যা দিয়েছ ভালবেসে ভাল করে দেখে নিই তায়।
বহু লাভ, বহু ক্ষতি, বহুবার জয় পরাজয়,
কত অশ্রু, কত হাসি, তোমা মাঝে পাইয়াছে লয়।
নৈরাশ্যের মাঝে আশা, কতবার দিয়ে গেছে সুখ,
অবসাদ আসি পুনঃ বজ্রাঘাতে ভাঙিয়াছে বুক।
হাসি, অশ্রু, লাভ, ক্ষতি, সমষ্টিতে আজি যায় দেখা
জীবনের মহাকাব্যে এক পত্র হয়ে গেছে লেখা,—
আজি তার হ'ল শেষ, ওগো বন্ধু, প্রণমি তোমায়,
নব বর্ষ এল দ্বারে, শেষ দেখা তোমায় আমায়!

শ্রীইন্দুবালা দেবী।

আলোচনা

বরাহমিহির।

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় আমার "বরাহমিহির" সম্বন্ধীয় আলোচনার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় প্রবাসীতে এজন্য অধিক স্থান ব্যয় করিবেন কি না সন্দেহে এবারে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিব।

শাস্ত্রী মহাশয় আমার মতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কারণ ভারতীয় প্রণালী অনুসারে আমি বরাহের সময় নির্ণয় করি নাই। ২৮৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বরাহ ছিলেন, ইহা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না, কারণ তাহা ইংরাজী মতে গণিত। পুরাণ-বর্ণিত সপ্তদ্বীপকে কবি-কল্পনা মনে করিয়াও তিনি যে ভারতীয় কোন কোন মতে শ্রদ্ধাবান ইহা অবশ্যই সুখের বিষয়। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিয়াছেন ৫০৫ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহির বর্ত্তমান ছিলেন। আমিও লিখিয়াছি পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকার চতুর্থ বরাহমিহির ৪২৭ শকে বা ৫০৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে তিনি আমার সহিত একমত হইয়াছেন। তবে তিনি ইঁহাকে চতুর্থ বরাহ বলিতে রাজী নহেন। ক্রমে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম বরাহের সময় (সম্বতের প্রথম ৫৮ খৃঃ পূঃ অব্দ) সম্বন্ধে তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন আপত্তি নাই ধরিয়া লইলাম। তবে তিনি ইঁহাকে প্রথম মুনি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। এ সম্বন্ধে তিনি প্রমাণ চাহিয়াছেন। প্রথম মুনি অর্থে উৎপলভট্ট "ব্রহ্মা" বলিয়াছেন। ব্রহ্মা প্রথম মুনি বা মুনি বলিয়া কোন গ্রন্থে কোন স্থানে বর্ণিত হইয়াছেন, এরূপ প্রমাণ আমি পাই নাই, সুতরাং উৎপলের কথা স্বীকার করিতে পারি না। বরং প্রথম মুনি যে কাহারও নাম নহে, উৎপলকে আমি তৎসম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিতে পারি। এক নামের একাধিক ব্যক্তি থাকিলে প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি দ্বারা তাহা প্রকাশ করিবার রীতি আছে—এ সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। বরাহ দুই বা তিন জন থাকিলে পরবর্ত্তী বরাহের পক্ষে নামোল্লেখ করা অপেক্ষা প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি বলায় কোন দোষের কারণ হয় না। সুতরাং প্রথম মুনি যে বরাহ নহেন, এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ প্রমাণ না দেওয়া পর্য্যন্ত আমার মতই বলবৎ থাকিবে। প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধান করিতে বসিয়া অনুমানবলে কোন কথা অস্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। আলোচনার ইহাই নিয়ম।

আমি বরাহমিহির-কৃত পৈতামহ সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থ দেখি নাই। সকল গ্রন্থ সকলের পক্ষে সহজপ্রাপ্যও নহে। কটক কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "আমাদের জ্যোতিষী" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বরাহমিহিরের পৈতামহ সিদ্ধান্তে শক ২ অব্দকে করণাব্দ ধরা হইয়াছে।" অতীত বা ভবিষ্যৎ কালকে কেহ করণাব্দ করিয়া করণ গ্রন্থ রচনা করে না। তাঁহার সময়ের কোন অব্দকে করণাব্দ করাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। এজন্য আমি স্থির করিয়াছি, ২ শকে আর এক বরাহমিহির ছিলেন, তিনি পৈতামহ সিদ্ধান্ত প্রণেতা। শাস্ত্রী মহাশয় একখানি পৈতামহ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখিলেই ইহার সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন। আমি ইঁহাকেই দ্বিতীয় বরাহমিহির বলিয়াছি।

তৃতীয় ও চতুর্থ বরাহমিহির লইয়াই শাস্ত্রী মহাশয় গোলযোগে পড়িয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা এক বরাহমিহিরের রচনা।" বাস্তবিক বর্ত্তমান বৃহৎসংহিতা পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকার বরাহমিহির কর্ত্তৃক সংস্কৃত, রচিত নহে। তিনি বৃহৎসংহিতার ৪৭ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন "দিব্যান্তরীক্ষাশ্রয়মুক্তমাদৌ ফলং-শস্তমশোভনঞ্চ। প্রায়েণ চারেষু সমাগমেষু যুদ্ধেষু মার্গাদিষু বিস্তরেণ ॥ ১। ভূয়ো বরাহমিহিরস্য ন যুক্তমেতৎ কর্ত্তুং সমাসকুদসাবিতি তস্য দোষঃ। * * * ব্রবীমাহং ন চেদিদং তথাপি মেহত্র বাচ্যতা।" অর্থাৎ "গ্রহচার, সমাগম, যুদ্ধ ও বীথী প্রভৃতিতে প্রায়শঃ দিব্য ও অন্তরীক্ষ বিষয়াশয়ী শুভাশুভ ফল সকল আমা কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। বরাহমিহিরের পক্ষে এই সকল বিষয়ের পুনঃ পুনঃ করণ যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তিনি সংক্ষেপকারী, ইহাই তাহার দোষ। * * * সুতরাং আমি তাহার আর উল্লেখ করিব না, কিন্তু উল্লেখ না করিলেও নিন্দা ঘুচিবে না।" এই "আমি" কে? ইনি সংক্ষেপকারী বরাহ মিহির নহেন। ইনি করণগ্রন্থ প্রণেতা বরাহমিহির। কারণ তিনি প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন "করণে ময়োক্ত" অর্থাৎ "মৎপ্রণীত করণ গ্রন্থে"। ১৭ অধ্যায়ে "তদ্বিজ্ঞানং করণে ময়া কৃতং সূর্য্যসিদ্ধান্তাৎ।" অর্থাৎ "আমি করণ গ্রন্থে সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে তাহা প্রণয়ন করিয়াছি" এখন শাস্ত্রী মহাশয় দেখিবেন কয়জন বরাহমিহির পাওয়া যাইতেছে—(১) সংক্ষেপকারী বরাহমিহির, (২) সংস্কারকর্ত্তা বরাহমিহির, (৩) যাঁহার গ্রন্থ দেখিয়া সংক্ষেপ করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রথম মুনি।

প্রথম মুনির কাল ৫৭ খৃঃ পূঃ পাইয়াছি। কারণ রচয়িতার কাল ৪২৭ শক বা ৫০৫ খৃষ্টাব্দ পাইয়াছি। সংক্ষেপকারী বরাহমিহিরের কাল নির্ণয় করা আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় স্বদেশী মতে তাঁহার সময় নিরূপন করিতে চাহেন, কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ স্বদেশীমতে ৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কর্কটের আদিতে অয়ন হইয়াছে। ৫০৫ খৃষ্টাব্দে যিনি করণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ৪৯৮ খৃষ্টাব্দেও তিনিই ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি সংক্ষেপকারী নহেন। সংক্ষেপকারী অবশ্যই তাহার পূর্ব্বে ছিলেন। আমার মতে আলোচ্য বিষয়ে স্বদেশী বিদেশী কোন মতেরই গোঁড়া হওয়া কর্ত্তব্য নহে, যাহা অভ্রান্ত তাহাই গ্রহণ করা উচিত। বিদেশী মতে এক্ষণে প্রতিবৎসর ৫০·২ বিকলা ক্রান্তিপাতবিন্দু ও অয়ন-বিন্দুর পশ্চাৎগতি হইতেছে। অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মানমন্দিরের সাহায্যে ইহা নির্ণীত হইয়াছে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে ৫৪ বিকলা গতি প্রচলিত। প্রথমতঃ অনুলোম প্রতিলোম গতি সম্বন্ধেই মতভেদ আছে, দ্বিতীয়তঃ কোন সময়ে কাহার দ্বারা এই গতি গণিত হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, কেহ পরীক্ষা করিয়াও দেখেন নাই। দেখিলেও ৫০·২ বিকলাই পাইবেন। অতএব ভ্রান্তমত ধরিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। ধরিয়া থাকিলেও এস্থলে যে মিল হইবে না তাহা উপরে দেখিয়াছি। সংক্ষেপকারী ও সংস্কারকর্ত্তা বরাহমিহিরকে এক মনে করিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকর্ত্তাগণ ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ বা ৪২০ শকে কর্কটের আদিতে অয়ন ধরিয়াছেন। তজ্জন্যই ভারতীয় মত ভুল, এবং সেই ভুল এখনও চলিতেছে। বর্ত্তমান পঞ্জিকায় আমরা ৯ই চৈত্র দিবারাত্রি সমান লেখা দেখিতে পাই, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার পূর্ব্বেই দিবারাত্রি সমান হয়। অতএব দেখা গেল স্বদেশী মতে সংক্ষেপকারী বরাহের সময় পাওয়া অসম্ভব। এখন পাশ্চাত্য পরীক্ষিত মতে কি হয় দেখা যাউক।

পাশ্চাত্যমতে ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্কটের আদিতে অয়ন হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ন কোন বিশেষ অব্দে হয় নাই। ২৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর্কটের

আদিতে দক্ষিণায়ন হইত।" তিনি কর্কটের আদি বুঝিতে পারেন নাই। ৪৯৮ -- ২৭৬ = ২২২ বৎসর পর্য্যন্ত কর্কটের আদিতে অয়ন হইতে পারে না। কর্কটের আদি অর্থ কর্কটের প্রথম বিন্দু। ইহাতে এক বৎসর মাত্র অয়ন হইতে পারে। সে বৎসর হয় ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ না হয় ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দ সংক্ষেপকারী বরাহমিহির কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ন হইতে দেখিয়াছেন—

অশ্লেষার্দ্ধাদ্দক্ষিণমুত্তরময়নং ধনিষ্ঠাদ্যং।
নূনং কদাচিদাসীদ্ যেনোক্তং পূর্ব্বশাস্ত্রেষু ॥১
সাম্প্রতময়নং সবিতুঃ কর্কটকাদ্যং মৃগাদিতশ্চান্যৎ ।২

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোন সময়ে অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্দ্ধভাগ হইতে দক্ষিণায়ন এবং ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে উত্তরায়ন প্রচলিত ছিল, নতুবা পূর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইবে কেন? কিন্তু এক্ষণে সূর্য্যের অয়ন কর্কটের আদি ও মকরের প্রথম হয়। (বৃহৎসংহিতা, ৩য় অধ্যায়)।

করণগ্রন্থ-প্রণেতা বরাহ মিহির পুনর্ব্বসুতে অয়ন দেখিয়াছেন—

অশ্লেষার্দ্ধাদাসীদ্যদা নিবৃত্তিঃ কিলোষ্ণ কিরণস্য।
যুক্তময়নং তদাসীৎ সাম্প্রতময়নং পুনর্ব্বসুতঃ ॥

পৌলিশসিদ্ধান্ত।

পুনর্ব্বসুর শেষ ৩।২০ কলা কর্কটরাশিভুক্ত এবং প্রথম ১০ অংশ মিথুন-রাশিভুক্ত। করণগ্রন্থ-প্রণেতা পুনর্ব্বসুর মিথুনভুক্ত ১০ অংশের মধ্যে অয়ন দেখিয়াছেন। তিনি বৃহৎসংহিতার সংস্কার করিয়াছেন। ৫০৫ — ২৮৫ = ২২০ বৎসর পর সংস্কার করা অসম্ভব নহে, বরং প্রয়োজনই হয়। সুতরাং পাশ্চাত্য বিশুদ্ধ গণনায় ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্কটের আদিতে অয়ন ধরিয়া সংক্ষেপকারী বরাহমিহিরের সময় ধরা অন্যায় হয় না।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "বৃহৎসংহিতা ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত, উক্ত সময়ের পরে রচিত হইতে পারে না।" তাঁহার একথা ঠিক। বৃহৎসংহিতা ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে এবং ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে সংস্কৃত হইয়াছে। কারণ সংস্কারকর্ত্তা বরাহমিহির ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে করণগ্রন্থ (পঞ্চসিদ্ধান্তিকা) রচনা করিয়াছেন। তাহার পরে বৃহৎ-সংহিতার সংস্কার করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত তাঁহার নিজ উক্তি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব --

প্রথম বরাহের সময় ৫৭ খ্রীঃ পূঃ।
দ্বিতীয় বরাহের সময় ৮০ খ্রীষ্টাব্দ।
তৃতীয় বরাহের সময় ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।
চতুর্থ বরাহের সময় ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

এসম্বন্ধে সম্ভবতঃ আর কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ইতি

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

দ্রষ্টব্য --এবিষয়ে অতঃপর আর কোনো আলোচনা পত্রস্থ করা হইবে না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান।

চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান নামক প্রবন্ধে হিন্দু ও গ্রীক জ্যোতিষের একটা বেশ আপোস মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্রচক্রটা হিন্দুদের নিজস্বের মধ্যে গণ্য করিয়া রাশিচক্রটা গ্রীকের দিকে রাখিয়া দুই দিকেরই মন রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু জ্যোতিষ এখন বেওয়ারিশ মালের মধ্যে গণ্য। যে যত দিতে পারেন, যে যত লইতে পারেন, আপত্তি করিবার কেহ নাই। "বেদে পৃথিবী সচলা" নামক একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশ জন্য পাঠাইয়াছি, প্রকাশ হইলেই ধীরেন্দ্র বাবু দেখিতে পাইবেন, গ্রীক দেশ যখন ঘোর অরণ্যে আবৃত, সে অরণ্যে যখন নরভুক মানুষ ও পশু ব্যতীত আর কিছু দেখা যাইত না, সেই সময় ঋষিগণ বেদে রাশির নাম করিয়া গিয়াছেন।

নক্ষত্রচক্রে প্রথমেই ২৮ নক্ষত্র ছিল না। প্রথমে ১২টি নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই ১২টি নক্ষত্রের নামানুসারে ১২ মাসের নাম হইয়াছে। পরে পূর্ণিমা অনুসারে ২৪টি নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তারপর ২৭ দিনে চন্দ্র একবার পৃথিবী ঘুরিয়া আইসে দেখিয়া ২৭ দিনের ২৭টি নক্ষত্র গণিত হইয়াছিল। কতকদিন পরে দেখা গেল, চন্দ্র ২৭ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ শেষ করিতে পারে না, আরও কিছু অতিরিক্ত সময় (৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট) লাগে, তখন অষ্টাবিংশ নক্ষত্র অভিজিৎ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।* এই সময়ে ২৭ নক্ষত্র-যুক্ত রাশিচক্র পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরে যখন অভিজিৎ বাদ পড়িয়া গেল, তখন রাশিচক্র পুনঃ প্রচলিত হইয়াছিল। ৩৬০ অংশে রাশিচক্র আর্য্যগণই, সেই প্রাচীনকালে, বিভাগ করিয়াছিলেন। (ঋগ্বেদ ১।১৫৫।৬ ও ১।১৬৪।৪৮ ঋক)।

প্রথমে দক্ষের অজমুণ্ডই ছিল (ঋগ্বেদ ১০।৮৫।১৪ ঋক)। তখন অশ্বিনী আদি নক্ষত্র ছিল। পরে বৃষমুণ্ড হইয়াছিল, তখন রোহিণী আদি নক্ষত্র ছিল (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)। এই সময়েই মহাকালরূপী মহাদেবের বৃষ (বৃষমুখ রাশিচক্র) বাহন কল্পিত হইয়াছিল। তাহার পরে অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সে ঘটনা কালিকাপুরাণে দক্ষযজ্ঞ বর্ণনাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় সতীর দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। দক্ষের শিরশ্ছেদের কথা নাই। সুতরাং তখন বৃষমুণ্ডই ছিল। পরে অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র হইলে দক্ষের (রাশিচক্রের) অজমুণ্ড হইয়াছিল। এই ঘটনা সতীর দেহত্যাগের সহিত যোগ করিয়া দক্ষ-মুণ্ড ছেদন ও সংযোগচ্ছলে শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি দক্ষযজ্ঞ কয়েক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও জ্যোতিষের রহস্য গুপ্ত আছে; যথা—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৮৩ ও ২৮৪ অধ্যায়। এই দুই উপাখ্যানে সতীর উল্লেখ নাই, দক্ষের শিরশ্ছেদও হয় নাই, অথচ ইহার মধ্যে জ্যোতিসতত্ত্ব নিহিত আছে। রামায়ণে বর্ণিত দক্ষযজ্ঞও কালনির্ণয়ে সহায়তা করে।

রাশিচক্র পরিষ্কার, তাহাতে গোজামিল নাই। ধীরেন্দ্র বাবু নিজেই গোজামিল করিয়াছেন। বৃশ্চিক রাশির আকার আকাশে দেখিয়া তিনি মূলাকে বৃশ্চিকের লাঙ্গুল বানাইতে চাহেন। কিন্তু লাঙ্গুলের অনুরোধে মাথাটা কাটিয়া ফেলা কি সঙ্গত? প্রাচীন আর্য্যগণ লাঙ্গুল অপেক্ষা মাথার মর্য্যাদাই অধিক বুঝিতেন, তাই বিশাখা লইয়া বৃশ্চিকের মাথা রক্ষা করিতে গিয়া লাঙ্গুল বাদ দিয়াছেন।

মকর রাশির বৈদিক নাম মৃগ (ঋগ্বেদ ১।১৫৪।২ ঋক)। মৃগের অর্থ আছে। অজ ও মকর নামেরও সঙ্গত অর্থ আছে, কিন্তু goat বা caper শব্দের সঙ্গত অর্থ নাই। আর্য্যগণের প্রদত্ত দ্বাদশরাশি ও নক্ষত্রের নাম সমস্তই বৈজ্ঞানিক অর্থযুক্ত। ইহার সহিত অপূর্ব্ব জীবনতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের রহস্য গুপ্ত আছে। ধীরেন্দ্র বাবু তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিলে বুঝিতে পারিবেন না।

চন্দ্রের উপাখ্যানও ঐরূপ একেবারে আষাঢ়ে গল্প নহে। বেদে ইহার মূল আছে। যথা—

যে বধ্বশ্চন্দ্রং বহতুং যক্ষ্মা যংতি জনাদনু।
পুনস্তান্যজ্ঞিয়া দেবা নয়ংতু যত আগতা ॥ ১০।৮৫।৩১ ঋক।

অর্থাৎ "চন্দ্র জগতে বিদ্যমান থাকিয়া যে বধূগণকে বহন করিতে করিতে যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়াছে, আবার সেই সমস্ত যজ্ঞশীলা দেবীগণকে বহন করতঃ যে স্থান হইতে আনিয়াছিল তথায় লইয়া যায়।" অর্থাৎ

চন্দ্র যে নক্ষত্রে উদয় হয়, সেই নক্ষত্রে থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করতঃ পূর্ব্বস্থানে আইসে এবং আর একটিকে লইয়া আবার ভ্রমণ করে, এইরূপে ২৭ নক্ষত্রকেই বহন করে। এইরূপ বহন করিতে করিতে যতই সূর্য্যের নিকটে আইসে ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ১৫ নক্ষত্র পর্য্যন্ত এইরূপ ক্ষয় হইতে হইতে যায়, তৎপরে আবার যতই সূর্য্য হইতে দূরে যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অবশেষে ১৫ নক্ষত্র ভ্রমণ হইলে আবার পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়ই চন্দ্রের যক্ষ্মা রোগ নামে রূপকে বর্ণিত হইয়াছে।

"স্বীয় ভ্রমণপথে চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রের যত নিকটবর্ত্তী হন এমন আর কোন নক্ষত্রের নহে।" ইহা ধীরেন্দ্র বাবু অবগত আছেন। রুহ ধাতুর অর্থ গমন করা। চন্দ্র সূর্য্য হইতে দূরে গমন করে, তৎপরে আবার নিকটে গমন করে। চন্দ্র কেবল রোহিণী (নক্ষত্রের) নিকট দিয়া গমন করে—আবার রোহিণী (অর্থাৎ চন্দ্রের গতি) চন্দ্রের ক্ষয় প্রাপ্তিরও কারণ; এই সুযোগে কবি নক্ষত্রের নামের সহিত যোগ রাখিয়া দ্ব্যর্থ বোধক এই গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন ধীরেন্দ্র বাবু কি বলিতে পারেন, ইহা "আষাঢ়ে গল্প মাত্র, নিছক কল্পনা।"

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

এক নিশ্বাসে যুগযুগান্তরের বিবদমান তত্ত্বের মীমাংসা

(১)

পিতা-পুত্র-সংবাদ।

পিতা—(প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী পুত্রের প্রতি) ওরে, তুই যে মনোযোগের সহিত লেখা পড়া কচ্ছিস্ না, চিরটা জীবন কি মূর্খ হয়ে থাকৃবি ?

পুত্র—বাবা, তুমি এম্-এ, কাকা ডি, এস্, সি, দাদা পি, এইচ, ডি, আর খোকা পড়ে বাল্যশিক্ষা। কিন্তু এ সকলের মধ্যে মূর্খতা ও বিজ্ঞতার কিছু পার্থক্য আছে কি ? সকলেই তো অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের ধারে উপলখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করছেন, যতই জানছেন ততই তো মনে করছেন কিছুই জানা হয়নি। অনন্ত বিদ্যাজলধি তো সকলেরই ধারণাশক্তির অনধিগম্য। পাহাড়ের সঙ্গে বালুকণার যে ভেদ, জ্ঞানসমুদ্রের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয় সর্ব্বোচ্চ বিদ্যার তা অপেক্ষাও অধিক প্রভেদ। সে সমুদ্রের তুলনায় সকলেই তো মূর্খ। তবে আর লেখা পড়া করি না বলে মূর্খতার দাবী একমাত্র আমারই হবে কেন ? নিউটনের Principia, ক্যাণ্টের Critique of Pure Reason, অথবা শঙ্করের শারীরিক ভাষ্যই আয়ত্ত করি আর মদনমোহনের শিশুশিক্ষাও অনায়ত্ত থাকুক ঐ অনন্ত বিদ্যামহার্ণবের সম্মুখে সকলেরই কিম্মত সমান। সকলেই তো, বাবা, মূর্খ !

পিতা—আরে, বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে আর পার্ব্বার যো নেই। তুই এ যুক্তি আবার কোথায় শিখ্‌লি ?

পুত্র—কেন, বাবা, কাল যে তুমি দাদাকে বোঝাচ্ছিলে, "ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, মানুষবুদ্ধির অগম্য, তাঁকে যে যা ভাবে, কিছুই ঠিক নয়—পৌত্তলিকের মূর্ত্তিপূজা আর ব্রহ্মজ্ঞানীর ধারণা, সেখানে সব এক। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণায় সকলেই সমান।" তা হলে, বলুন, আমার যুক্তিটার মধ্যে অবোধ্য এমন কি রইল ?

অতঃপর পিতার গম্ভীরভাবে ধূমপানে মনোনিবেশ।

(২)

মাতা-পুত্র-সংবাদ।

শিশু পুত্র—মা, তুমি বলেছিলে, রাগ করা অন্যায়। ওটা খৃষ্টানধর্ম্মের অনুমোদিত নয়। তবে, এই যে বাইবেলে রয়েছে—ঈশ্বর রাগ করেছিলেন ?

মাতা—এ কথা তুমি এখন বুঝতে পারবে না, রেখে দাও।

পুত্র—(কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া) মা, বুঝেছি। ঈশ্বর তো আর খৃষ্টান নন যে তাঁর পক্ষে রাগ করা অন্যায় হবে ! শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

অধমের দাবী

(সেখ সাদীর পারসী হইতে।)

কুসুম গুচ্ছ সুন্দর শোভে
স্ফটিক সিংহাসনে,
বৃন্ত ঘেরিয়া তৃণের গ্রন্থি
শোভিছে তাহারি সনে।
রুক্ষ-কণ্ঠে কহিনু তাহারে—
"আরে ও বেহায়া তৃণ—
কোথা' উঠেছিস্ ? কার পাশে বসি !
তোর এ স্পর্দ্ধা কেন ?
ফুলের মতন আছে কি বরণ
আছে কিরে তোর বাস !
আছে কিরে তোর মাধুরী তেমন
অধরে মধুর হাস ?"

* * *

"চুপ্ কর—চুপ্"— তৃণের গুচ্ছ
কহিল কাঁদিয়া মোরে—
"মহতের প্রাণ সম্পদে কিহে
বান্ধবে ঘৃণা করে !
নাহি বটে মোর মাধুরী তেমন
নাহি বটে মোর বাস,

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত আনন্দ কে কুমারস্বামী।

নাহি বটে মোর ফুলের মতন
অধরে মধুর হাস!
তথাপি মোরা কি লভিনি জনম
একই জননীর কোলে?
এক উদ্যানে, বর্দ্ধিত নহি,
একই অন্ন-জলে?"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

কবি-সম্বর্দ্ধনা

আগামী ২৫শে বৈশাখ রবিবার কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। রবীন্দ্রবাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী; তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া নানাভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার একপঞ্চাশৎতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সংবর্দ্ধনা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটী সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই; তাহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটী হইয়াছে। রবীন্দ্র বাবুর আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ত্রুটীর সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি।

রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান দান যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য্য করিবেন।

সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উৎসব দিবসে সাধারণ উৎসবের সঙ্গে কবিবরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে কোনো স্থায়ী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ বিষয়ে সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংবাদ পত্রে স্বীকৃত হইবে। সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৫৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে।

সমিতির সদস্যগণ

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
" জগদীশচন্দ্র বসু।
" ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।
" সারদাচরণ মিত্র।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
রায় " যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
" প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
(সমিতির সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
(সমিতির ধনরক্ষক)
ইত্যাদি ইত্যাদি

---

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাতৃমূর্ত্তি।

বটিসেলি কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

Three-colour blocks by U. Ray & Sons.

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১১শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

২য় সংখ্যা

গীতাপাঠের ভূমিকা

(২)

সাংখ্যের গোড়াতেই আছে, দুঃখনিবৃত্তি কি উপায়ে হইতে পারে তাহারই জিজ্ঞাসা—তাই গতবারে ঐ কথাটির পর্য্যালোচনা যত পারি সংক্ষেপে সমাধা করিয়া তাহারই উপরে আমার চরম বক্তব্য কথাটির গোড়া ফাঁদিয়াছিলাম। আজ যাহা বলিব তাহাও ভূমিকারই মধ্যে ধর্ত্তব্য।

শ্রোতৃবর্গের জানা উচিত যে, ভূমিকা সমগ্র অট্টালিকা নহে—তাহা ভিত্তিমূল মাত্র। ভিত্তিমূলের দোষগুণ-বিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র, আর অট্টালিকার দোষগুণ বিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। ভিত্তিমূলের দোষগুণ বিচারস্থলে কেবল একটিমাত্র জিজ্ঞাসা শোভা পায়; তাহা এই যে, ভিত্তিমূল দৃঢ় কি অদৃঢ়; তা বই ভিত্তিমূল সুশ্রী কি বিশ্রী, অথবা বাসের উপযোগী বা অনুপযোগী এরূপ জিজ্ঞাসা শোভা পায় না। কিন্তু ভিত্তিমূলের দৃঢ়তাসাধন গৃহ-নির্ম্মাতার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য। আমার হাতের এই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যটি চুকাইয়া ফেলিয়া মনকে হাল্‌কা করিবার জন্য—দুঃখনিবৃত্তি সম্বন্ধে গতবারে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম তাহা আর একটু বিস্তার করিয়া বলা আবশ্যক মনে করিতেছি; কেননা তাহা না করিলে সেদিনকার কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্যটি অনেকে অনেক প্রকার ভুল বুঝিবেন।

মনুষ্যের দুঃখ বেশীর ভাগ মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। শারীরিক রোগ বরং মনুষ্যের গায়ে সহে, কিন্তু মানসিক শোক হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহার বিষানল লোককে—বিশেষতঃ অবলা লোককে—পাগল করিয়া ছাড়ে। একে তো তাহাকেই সাম্‌লানো ভার, তাহাতে সে আবার সঙ্গী যুটাইয়া আনে শারীরিক রোগের দল-কে-দল। পাপজনিত আত্মগ্লানি আবার সকলকে জিতিয়াছে। তাহা যে কিরূপ ভয়ানক দুশ্চিকিৎস্য অন্তর্দাহ—মহাকবি সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ্ এবং তাঁহার সহপাপিনী লেডি ম্যাক্‌বেথ্ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আবার, প্রেমপীড়িত হৃদয়ের মর্ম্মাধিষ্ঠিত বিচ্ছেদানলের দহনজ্বালার সহিত মৃত্যুর যে কতটা নিকট সম্বন্ধ—ঐ মহাকবির রোমিও জুলিয়েট্ তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাকি রাখে নাই। তা ছাড়া—জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য আর এক প্রকার দুঃখ আছে—যে দুঃখে রাজপুত্র বুদ্ধদেব, মনুষ্যপুত্র ঈশা মহাপুরুষ, এবং ব্রাহ্মণপুত্র চৈতন্য-দেব গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এ দুঃখ মনুষ্যের আত্মার গোড়াঘ্যাঁসা দুঃখ। সহস্রের মধ্যে এক আধ জন অসামান্য মহাপুরুষের মনে এ দুঃখ যখন দাবানলের ন্যায় তেজ করিয়া উঠে, তখন আর আর সকল দুঃখকে কবলিত করিয়া তাহার শিখা আকাশাভিমুখে উদ্ধৃত হয়। এই অতলস্পর্শ গভীর দুঃখের প্রেরণায় পৃথিবীতে কার্য্য যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত কম্প-মান করিয়া বহুকালের সঞ্চিত স্তূপাকার আবর্জ্জনারাশি তাহার গাত্র হইতে দূরে অপসারিত করে। আত্মার এই

গোড়াঘাঁসা দুঃখের নিবৃত্তির নামই ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি—কেননা এই দুঃখ নিবারিত হইলেই মনুষ্যের আর কোনো দুঃখ থাকে না।

গতবারে গোড়াতেই আমি সাংখ্যদর্শনের উপক্রমণিকা এবং উপসংহারের মধ্য হইতে তাহার ভিতরের মর্ম্মকথাটি টানিয়া আনিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু কাহাকেই বা আমি বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা, কাহাকেই বা বলিতেছি সাংখ্যের উপসংহার, সে কথাটি আমার মনের মধ্যে চাপা রহিয়া গিয়াছে; তাহা ব্যক্ত করিয়া বলা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

আমাদের দেশের পণ্ডিতমহলে কাপিল দর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য, এবং পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। তা বলিয়া তাহা দুই সাংখ্য নহে—পরন্তু একই সাংখ্যের আগেরটি বীজ এবং শেষেরটি ফল। ভগবদ্‌গীতায় স্পষ্টই লেখা আছে "সাংখ্য যোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ" সাংখ্য স্বতন্ত্র এবং যোগ স্বতন্ত্র এ কথা বালকেরাই বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। "একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" সাংখ্য এবং যোগ এই দুই শাস্ত্রকে যাঁহারা একেরই অঙ্গীভূত করিয়া দেখেন তাঁহারাই যথার্থ দেখেন। ভগবদ্‌গীতার এই কথাটির মর্ম্ম শিরোধার্য্য করিয়া আমি কাপিল দর্শনকে বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা বা বীজ; যোগশাস্ত্রকে বলিতেছি সাংখ্যের উপসংহার বা ফল। বীজ হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফল ফলাইয়া তোলা হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন ফলার্থী ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মেটে না, তেমনি নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেশ্বর সাংখ্য ফলাইয়া তোলা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসুব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মেটে না। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের সমস্ত স্মৃতিপুরাণ এবং বিশেষতঃ পাতঞ্জল দর্শন, কপিল মুনির নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে সেশ্বর সাংখ্য ফলাইয়া তুলিয়া সাংখ্য দর্শনের সার্থক্য সম্পাদন করিয়াছে।

কপিল মুনির চরম বক্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিই আপনার অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সুখদুঃখাদি গুণ দ্বারা বন্ধন করে, এবং প্রকৃতিই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ করিয়া সুখদুঃখাদির হস্ত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন। প্রকৃতির দুই মূর্ত্তি বিদ্যা এবং অবিদ্যা। প্রকৃতি অবিদ্যামূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবকে সংসারপাশে বদ্ধ করেন এবং বিদ্যামূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবকে মুক্তি-ধামে পৌঁছাইয়া দ্যান্। অতএব মুমুক্ষুব্যক্তির পক্ষে বিদ্যার পথই অবলম্বনীয়। তত্ত্ববিদ্যাই ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু বিদ্যা পদার্থটা কি? কাপিল সাংখ্যের মতে তাহা আর কিছু না—প্রকৃতিকে আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা; আর উহার মতে, ঐপ্রকার বিদ্যার পরিপক্ক অবস্থায় জীবাত্মার বুদ্ধির অভ্যন্তরে যখন এইরূপ বিবেক উৎপন্ন হয় যে প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং সে আপনি স্বতন্ত্র, তখন তাহারই বলে জীবাত্মা সমস্ত সুখ দুঃখাদির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। প্রকৃতির আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাই পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র পন্থা। কপিল মুনির এই মোট মন্তব্য কথাটি যদি বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ কথাটিকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু উহাতে আমাদের দেশের তত্ত্ব-পন্থীদিগের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। কঠোপনিষদে আছে যে, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে,—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে; আবার, ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ। তাহা অপেক্ষা আরো ঘোরতর অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে যাহারা বিদ্যায় রত। প্রকৃত কথা এই যে, নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রদর্শিত শুষ্ক জ্ঞানের পথ পুরুষার্থরূপী চরম গম্যস্থানে পৌঁছিবার পক্ষে ব্যাঘাতজনক বই সুবিধাজনক নহে।

সাংখ্যের মতে বিদিতব্য তত্ত্ব সবিস্তারে বলিতে গেলে পঁচিশটি; সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনটি—ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত জগৎ এবং জ্ঞাতা পুরুষ। নিশাবসানে শয্যা হইতে গাত্রোত্তোলন করিবার সময় প্রতিদিনই আমরা ঐ তিনটি তত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; প্রতিদিনই প্রাতঃকালে আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়া উঠে, আর, সেই সঙ্গে কার্য্যরূপী ব্যক্ত জগৎ, কারণরূপী অব্যক্ত জগৎ এবং দর্শকরূপী আপনি এই তিনটি মৌলিক

তত্ত্ব আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনে সহজেই এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, এই যে প্রভূত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিদিনই উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে—ইহার প্রকরণ পদ্ধতিইবা কিরূপ? আর ইহার চরম উদ্দেশ্যই বা কি? প্রকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সাংখ্যের মোট সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যক্ত হইবার সময় জগৎ সূক্ষ্ম হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া স্থূল হইতে স্থূলে অনুলোমক্রমে অভিব্যক্ত হয়; এবং অব্যক্ত হইবার সময় স্থূল হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে প্রতিলোমক্রমে পর্য্যবসিত হয়। চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি আপনার অধিষ্ঠাতা দ্রষ্টাপুরুষের ভোগ এবং মুক্তির উদ্দেশেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হ'ন।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে জ্ঞাতা পুরুষ প্রকৃতির কে, যে, তাহার ভোগমোক্ষের উদ্দেশে কার্য্য না করিয়া প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না? সাংখ্য দর্শনে ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছে যে, দুগ্ধ পানের জন্য বাছুরকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিলে গাভীর স্তন হইতে যেমন আপনাআপনি দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে থাকে, সেইরূপ অধিষ্ঠাতা পুরুষের ভোগমোক্ষের উদ্দেশে প্রকৃতি স্বভাবতই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কপিল মুনির এ কথাটা সমীচীন নহে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বেদান্তদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতের কথা-প্রসঙ্গে ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে তিন প্রকার—বিজাতীয় ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে, ঐক্যও তিন প্রকার—বিজাতীয় ঐক্য, স্বজাতীয় ঐক্য এবং স্বগত ঐক্য। অচেতন বৃক্ষ এবং সচেতন জীবের মধ্যে প্রাণবত্তাঘটিত ঐক্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিজাতীয় ঐক্য, এবৃক্ষ এবং ওবৃক্ষের মধ্যে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বজাতীয় ঐক্য, আর, বৃক্ষ এবং শাখাপত্রের মধ্যে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বগত ঐক্য। শেষোক্ত স্বগত ঐক্য সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ঐক্য তাহাতে আর ভুল নাই। বাছুর যখন গোরুর গর্ভে বিলীন ছিল, তখন উভয়ের মধ্যে স্বগত ঐক্য ছিল আত্যন্তিক; আর বৎস প্রসবের পর হইতে সেই স্বগত ঐক্যের টান, সোজা কথায় রক্তের টান, উভয়ের মধ্যে নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে; এই জন্যই বাছুরকে দুগ্ধপানার্থে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে গোরুর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে থাকে। কিন্তু কপিল সাংখ্যে প্রকৃতি এবং জ্ঞাতাপুরুষের মধ্যে যখন ওরূপ স্বগত ঐক্যের বন্ধন স্বীকৃত হয় নাই, তখন কেন যে জ্ঞাতাপুরুষের ভোগমোক্ষ সাধনের জন্য প্রকৃতি হইতে জগৎকার্য্য অজস্রধারে প্রবাহিত হইতে থাকিবে—ইহার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাপিল সাংখ্যের ঐ অঙ্গহীন কথাটির অঙ্গপূরণের জন্য এযাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অপরাপর সমস্ত শাস্ত্রেই প্রকৃতি ঐশীশক্তিরূপে প্রতিপাদিত হইয়া আসিতেছে। কাপিল দর্শনের মত যাহাই হউক্ না কেন, কিন্তু আমাদের দেশের আর আর সকল শাস্ত্রেরই ভিতরের কথা এই যে, ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে মর্ম্মান্তিক প্রাণের টান রহিয়াছে, আর তাহারই প্রবর্ত্তনায় জগৎসংসারের কার্য্য চলিতেছে।

দর্শনমহলের বাদবিতণ্ডা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া আমরা যদি আমাদের প্রাণের টানের মধ্য দিয়া সাংখ্যের ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই তিনটি মূলতত্ত্বের প্রতি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করি, তাহা হইলে মাতৃক্রোড়স্থিত বালক যেমন মুখে কথা বলিতে না জানুক্ কিন্তু মনে মনে এটা বেস্ জানিতে পারে যে, আমি মাতৃক্রোড়ে রহিয়াছি, তেমনি আমরা নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থানকালে যখন আমাদের আপনা-আপনাকে লইয়া এই পরমাশ্চর্য্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, তখন আমরা আমাদের অন্তঃকরণের গোড়াঘ্যাঁসা অভাবের সহিত একযোগে পরমাত্মার পিতৃভাব এবং মাতৃভাবের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করি। এবিষয়ে আমি অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এইটুকু কেবল বলিতে ইচ্ছা করি যে, আমরা আমাদের আপনার অভাবের বলে এবং পরমাত্মার প্রভাবের বলে পরমাত্মার পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করি—তা বই, যুক্তি তর্কের বলে নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির দুই মূর্ত্তি বিদ্যা এবং অবিদ্যা, আর, এখনও বলিতেছি যে, বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই ঐশী শক্তির অন্তর্ভুক্ত। তাহার মধ্যে অবিদ্যা জীবাত্মার

অভাবের পরিচায়ক, বিদ্যা পরমাত্মার প্রভাবের পরিচায়ক। পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি বলিতে বুঝায়, আপনার অজ্ঞানময় অভাব এবং পরমাত্মার প্রজ্ঞানময় প্রভাব—এই দুই তত্ত্বের একসঙ্গে উপলব্ধি। কঠোপনিষদের সেই বচনটি যাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি—যথা, যাহারা অবিদ্যার উপাসক তাহারা অন্ধতিমিরে প্রবেশ করে, আবার, যাহারা বিদ্যায় রত তাহারা আরো ঘোরতর অন্ধতিমিরে প্রবেশ করে, এই বচনটির পরেই উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ—অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে। বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যাঁহারা একসঙ্গে জানেন, তাঁহারা অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন। পরমাত্মাকে ছাড়িয়া আমরা যে কিরূপ অজ্ঞান শক্তিহীন এবং নিরাশ্রয় এই তত্ত্বটি যখন আমরা নিভৃত নির্জ্জনে বসিয়া মনোমধ্যে উপলব্ধি করি, তখন তাহারই নাম মৃত্যুকে অতিক্রম করা, আর সেই সঙ্গে যখন পরমাত্মার প্রজ্ঞানময় আনন্দময় প্রভাব উপলব্ধি করি তখন তাহারই নাম অমৃত লাভ করা। পরমাত্মাকে ছাড়িয়া আমরা যে কিরূপ অসহায় এই অভাববোধটি যখন আমাদের মনে জাগিয়া ওঠে, তখন গাভীর স্তন হইতে যেমন স্নেহামৃত ক্ষরিত হইয়া ক্ষুধাতুর বৎসের অভাব ঘুচাইয়া দ্যায়, সেইরূপ পরমাত্মার প্রেমপূর্ণ প্রভাব হইতে করুণা অবতীর্ণ হইয়া আমাদের দুঃখ ঘুচাইয়া দ্যায়।

কাপিল সাংখ্যের উপদিষ্ট জ্ঞানপথ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ক্রমে যোগশাস্ত্রের একটি উচ্চ সাধন-পথে উপনীত হইলাম। কাপিল সাংখ্যের স্থূল মন্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে হইবে এরূপ কঠোর ভাবে যে, প্রকৃতি ভয়ে এবং লজ্জায় সাধকের নিকট হইতে সরিয়া পলাইতে পথ পাইবে না। যোগের স্থূল মন্তব্য কথা এই যে, মনকে এমন এক স্থানে দৃঢ়রূপে বসাইতে হইবে যেখানে স্থিতি করিলে কোনো দুঃখই সাধককে নাগাল পাইবে না। কিন্তু যোগ-শাস্ত্রের উপদিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট সাধনের পথ হ'চ্চে ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বরপ্রণিধান কাহাকে বলে'—ভোজরাজকৃত পাতঞ্জলভাষ্যে তাহা লিখিত হইয়াছে এইরূপ :—প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং ; প্রণিধান কি ? না বিশেষ প্রকার ভক্তি, বিশিষ্টরূপে উপাসনা এবং তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া তস্মিন্ পরমগুরৌ অর্পয়তীতি প্রণিধানং—বিষয়সুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই পরম গুরুর চরণে প্রণিহিত করা হইতেছে—এই অর্থে প্রণিধান। কাপিল দর্শনের সাধনাঙ্গকে মোটামুটি জ্ঞানযোগ বলা যাইতে পারে—পাতঞ্জল দর্শনের নিম্ন সোপানের সাধনাঙ্গকে কর্ম্মযোগ বলা যাইতে পারে ; এবং পাতঞ্জল দর্শনের উচ্চ সোপানের সাধনাঙ্গকে ভক্তিযোগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভগবদ্‌গীতাতে জ্ঞানযোগ হইতে কর্ম্মযোগে এবং কর্ম্মযোগ হইতে ভক্তিযোগে কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয় তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ যেমন অকৃত্রিম সরল মাধুর্য্যের সহিত বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবন-বৈচিত্র্য

২। শৈশব।

"ছোট ছোট শিশুগুলিকে আমার কাছে আসিতে দাও, কারণ ইহাদের সদৃশকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য।"

মহাত্মা যীশুর সকল উক্তির মধ্যে এই উক্তিটি আমার বড়ই মিষ্ট লাগে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল যীশুর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তিনি যেরূপ কোমল দৃষ্টি ও মুখভঙ্গী সহকারে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন আমি তাহা এখনও যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। বাস্তবিক শিশুর কচি মুখে যে সরলতা ও পবিত্রতা মাখান থাকে তাহার তুলনা জগতে আর কোথাও নাই। এই জন্যই ধর্ম্মপ্রাণ খ্রীষ্টীয় চিত্রকরেরা যীশুর যতগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে র‍্যাফেল্ কৃত ম্যাডোনার ক্রোড়স্থ শিশু যীশুর সুবিখ্যাত চিত্র সর্ব্বজনপ্রিয়। এই জন্যই যশোদার গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণের এত আদর। একজন সুকবি বলেন যে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি যেমন আকাশের কাব্য,

মহাদেবের নৃত্য।

(কাংড়া উপত্যকার একটি প্রাচীন চিত্র হইতে।)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

সেইরূপ পৃথিবীর বিচিত্র কুসুম-সম্ভার পৃথিবীর কাব্য। কিন্তু আমার চক্ষে পৃথিবীর শিশু-রূপী সচেতন ফুলগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তবে ইহাও স্বীকার করি যে কোরকে যত মাধুরী ও সৌন্দর্য্য দেখি, ফুটন্ত ফুলে অনেক সময়ে তাহা খুঁজিয়া পাই না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া পৃথিবীর নানাস্থানের লুপ্ত কীর্ত্তি ও ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু মানবচরিত্রের কতিপয় মৌলিক উপাদান এখনও যেমন, অতি প্রাচীনকালেও ঠিক সেইরূপ ছিল, ইহা বিশেষ গবেষণা ব্যতিরেকেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে। মহাকবি হোমার-রচিত "অডিসি" কাব্যে শিশু-ইউলিসিসের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, অধুনাতন শিশুচরিত্রের সহিত তাহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। হোমারের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন তিন সহস্র বৎসর-ব্যাপী কালান্তরাল সহসা বিলুপ্ত হইয়া গেল। মহাকবি কালিদাস দেড়হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে শিশু-চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও কিরূপ জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী!

"ক্বচিৎ স্খলদ্ভিঃ ক্বচিদস্খলদ্ভিঃ
ক্বচিৎ প্রকম্পৈঃ ক্বচিদপ্রকম্পৈঃ।
বালঃ স লীলাচলনপ্রয়োগৈ—
স্তয়োর্মুদং বর্দ্ধয়তি স্ম পিত্রোঃ॥

অহেতু হাসচ্ছুরিতাননেন্দু-
র্গৃহাঙ্গনক্রীড়নধূলিধূম্রঃ।
মুহুর্বদন্ কিঞ্চিদলক্ষিতার্থং
মুদং তয়োরঙ্কগতস্ততান॥"

এখনও শিশু যখন টলিতে টলিতে এবং মাঝে মাঝে পড়িতে পড়িতে চলে, তখন তাহার চলন দেখিয়া কোন্ পিতা-মাতার হৃদয় আনন্দ-রসে প্লাবিত না হয়? এখনও কোন্ শিশুর চাঁদমুখ অকারণ হাসিতে ভরিয়া যায় না? বাটীর উঠানে খেলা করিয়া কোন্ শিশুর অঙ্গ ধূলিধূসরিত হয় না? শিশু যখন মা বাপের কোলে উঠিয়া অর্থহীন আধ আধ কথা কহিতে থাকে, তখন তাঁহারা এখনও কি আহ্লাদে আটখানা হ'ন না? মৃচ্ছকটিক নাটক বোধহয় কালিদাসের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু উহাতে অপত্যস্নেহের যে বর্ণনা আছে এই বিংশতি শতাব্দীতে তাহার কি কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে?

"ইদং তৎ স্নেহসর্ব্বস্বং সমমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ।
অচন্দনমনৌশীরং হৃদয়স্যানুলেপনম্॥"

আহা! সন্তানস্নেহ গরীব বড়মানুষ বিচার করে না। গরীব শরীর স্নিগ্ধ করিবার জন্য উশীর চন্দনাদি কোথায় পাইবে? কিন্তু সে যখন তাহার শিশুটিকে বক্ষে ধারণ করে তখনই তাহার উত্তপ্ত হৃদয় জুড়াইয়া যায়। মানব-প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়া না গেলে শিশুর প্রতি ভাল-বাসা কখনও লোপ পাইবে না। শিশু "শয়নে স্বপনে, পুনু জাগরণে," সকল অবস্থাতেই সমভাবে প্রীতি-প্রদ। আনন্দের উৎস তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। লোককে মোহিত করিবার জন্য তাহাকে কখনও প্রয়াস পাইতে হয় না, কোনরূপ সাজগোজ বা কৌশল-প্রয়োগ করিতে হয় না। স্বয়ং ভূতধাত্রী প্রকৃতিদেবী তাহার নাট্যগুরু। শিশুর সুমধুর অঙ্গচালনা অভিনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর সার্ জষুয়া রেনোল্ডস্ কিরূপে মাধুর্য্য আঁকিতে শিখিতেন তাহা তাঁহার জীবনী-পাঠে জানা যায়। শিশুর ভাঙ্গা ভাঙ্গা গল্পে কোনও বাঁধুনি নাই, অথচ তাহা কি হৃদয়গ্রাহী! শিশুর গানে রাগ-রাগিণীর অঙ্গচ্ছেদ হইলেও তাহা কি সুমিষ্ট! শিশুর নৃত্যে কবে তাল কাটে? শিশুর সরল ভাষায় তাহার স্বচ্ছ প্রাণের অন্তস্থল পর্য্যন্ত প্রতিভাত হয়। শিশুর স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতা পাপপঙ্কিল স্বেচ্ছাচারিতা হইতে কত বিভিন্ন! শিশুর চাতুরীতেও সরলতার ছবি! শিশুর হাস্যময় পবিত্রমুখ দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কর্ডার্ নামক একজন কৃতদার ইংরাজ একটি সরলা রমণীকে প্রেমে মজাইয়া অবশেষে তাহাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইংলণ্ডের ন্যায়বিচারে তাহার ফাঁসি হয়। প্রাণদণ্ডের অল্পদিন পরে প্রকাশ পায় যে ঐ নারীহন্তা আত্মগ্লানিবশতঃ সমস্ত রজনী স্বীয় শয়নকক্ষে পদচারণা করিয়া অতিবাহিত করিত এবং প্রভাতে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে যতগুলি শিশু দেখিতে পাইত তাহাদিগকে আদর করিত এবং নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিত। হৃদয়বিহারী ভগবান্ ভিন্ন কে বলিতে পারে ঐ হতভাগ্য কেন এরূপ করিত? হয় ত সে নিষ্পাপ শিশুগুলির

মনোরঞ্জন করিয়া মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা পাইত।

আমি জীবনের শেষ-পথে দাঁড়াইয়াও শিশুর মায়া কাটাইতে পারিলাম না। আমার নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে, কিন্তু মায়ার শতগ্রন্থিতে বদ্ধ হইয়া আমার "চলিতে চরণ বাধে।" আমি আজীবন শিশুভক্ত, অধুনা দুইটি শিশু-দস্যু আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। একটি আমার দুই-বৎসর-বয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রী "টুনু" ও অপরটি আমার তিন-বৎসর-বয়স্কা পৌত্রী "কমলা"। ইহারা আমার হাঁটু বাহিয়া উঠিয়া যখন-তখন আমার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে; আমার পৃষ্ঠদেশে চড়িয়া অশ্বারোহণের সাধ মিটায়; তৈল মর্দ্দন-ব্যপদেশে আমার সমস্ত শরীর বিদলিত করে; ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি একটি দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি—সেটি আমার পুস্তকাগার ও লিখিবার পড়িবার ঘর। এখানেও আমার অব্যাহতি নাই। দস্যুদ্বয় আমাকে দুই দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করে, আমার লেখা-পড়া ঘুরাইয়া দেয়। আমি ইহাদিগকে শাসাইয়াছি তোমাদের কীর্ত্তি আমি একদিন কাগজে ছাপাইব। এরূপ ভয়প্রদর্শন সত্ত্বেও ইহারা আমাকে প্রতিদিন ইহাদের মৃণ্ময় ও দারুময় সন্তানবর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করে। আমি বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই প্রবন্ধে ইহাদিগের সম্বন্ধে কিছু না কিছু না লিখিয়া ক্ষান্ত হইব না।

ছোট ছোট ছেলেগুলির কুসুম-সুকুমার পদযুগল দেখিলেই আমার মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হয়, যে, এই ছোট ছোট পা দু'খানি সংসারের তপ্তবালুকাময়, কণ্টকাকীর্ণ, দীর্ঘ পথ চলিতে না জানি কতই শ্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইবে! ভগবান্ ইহাদিগকে রক্ষা করুন!

আবার এক একবার মনে হয়, পতিপ্রাণা বেহুলা-সুন্দরী মৃতপতিকে ক্রোড়ে করিয়া নদী-বক্ষে কলার মান্দাস ভাসাইয়া যেমন নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়াছিলেন ও অবশেষে ভগবান্ তাঁহার শুভ সঙ্কল্প পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই সকল শিশুগুলিও—যাহারা আমাদের মৃতকল্প দেশের সমগ্র আশা ভরসা সঙ্গে লইয়া তাহাদের ছোট ছোট দেহ-তরী দুস্তর সংসার-সাগরে ভাসাইবার উপক্রম করিতেছে—হয়ত অনেকেই নিরাপদে যাত্রা সাঙ্গ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু হায়! বিফল এ আশা! কুমারীরা ভাগীরথী-বক্ষে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপের ডালা ভাসাইয়া দেয় এবং তাহা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই ডুবিয়া যায়, সেইরূপ বংশের ও দেশের কত শত আশাপ্রদীপ প্রতিদিন অকালে নিবিয়া যায়! একজন ভাবুক বলেন, যে শিশু শৈশবেই দেহত্যাগ করে সেই প্রকৃত অমর শিশু। তুমি ছয় বৎসরের একটি পুত্ররত্নকে বহুপূর্ব্বে হারাইয়াছিলে। তাহার পরে তোমার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কেহ আর শিশু নহে, সকলেই যৌবন লাভ করিয়াছে। এখন তোমার হারানিধিটিই একমাত্র শিশুসন্তান।

আমরা মৃত্যুর জন্য শোক করি কিন্তু যৌবনে শৈশবের যে মৃত্যু হয় তাহার জন্য শোক করি না, কেন না তাহা রূপান্তর মাত্র। এটিও কিন্তু এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, কারণ রূপান্তর ঘটিবার পূর্ব্বে যাহা ছিল, ঠিক সেইটিত থাকে না। সন্তানের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বয়সের রূপ গুণ পিতামাতার স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হয়; কিন্তু মৃত্যু যে-শিশুটিকে স্পর্শ করে, তাহার ফোটোগ্রাফ্ পিতামাতার হৃদয়ে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়। সে ছবি জন্মেও মুছিবার নয়, তবে কালক্রমে তাহার উপর নূতন স্তর পড়িয়া তাহাকে ঢাকিবার চেষ্টা করে মাত্র। শোকের প্রথম আক্রমণ বড়ই ভীষণ ও অপরিহার্য্য; তখন মনে হয় যে এ অসহ্য যন্ত্রণার বুঝি কোনও কালে উপশম হইবে না। কিন্তু কালের কোমল অঙ্গুলি সঞ্চালনে অতি দুর্ব্বিষ শোকেরও তীব্রতার হ্রাস হয়। বিসুবিয়স্-নামক আগ্নেয়গিরির সন্নিহিত ভূভাগ অগ্ন্যুৎপাত-প্লুষ্ট হইয়াও কিয়ৎকাল পরে প্রচুর শস্যশালী হয়। সেইরূপ শিশু-হারা দম্পতীর শোকও কালে একটি সুধাময়ী স্মৃতিতে পরিণত হয়। এই স্মৃতির উদ্দীপনা যে সকল সময়েই হইয়া থাকে তাহা নহে। ইহা মাঝে মাঝে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় দেখা দেয় এবং হৃদাকাশের সমস্ত দূষিত বায়ু দগ্ধ করিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল ও পবিত্র করে। যাহারা মনে করে যে এরূপ অকাল-মৃত শিশুর জন্মই বিফল, তাহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী। এ সংসারে প্রেমের জন্ম, স্নেহের জন্ম, কখনও একেবারে

নিষ্ফল হয় না। শিশুটি যতদিন জীবিত থাকে অন্ততঃ ততদিন ত তাহার পিতা মাতা তাহাকে ভালবাসিয়া ও লালন পালন করিয়া নিজ হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন ও উৎকর্ষ-সাধন করেন; মৃত্যুর পরেও সে তাঁহাদের হৃদিস্থিত চিত্রশালিকায় একখানি সুন্দর চিত্ররূপে বিরাজ করে—যাহাকে কালের ক্ষয়কারী হস্ত ও সংসারের মালিন্য কখনও স্পর্শ করিতে পারে না।

কবিকুলতিলক কালিদাস ঠিক বলিয়াছেন যে সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে দম্পতীর প্রেম চক্রবাকমিথুনের ন্যায় পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সন্তান জন্মিয়া সেই প্রেমে ভাগ বসায়, কিন্তু তথাপি তাহা কত বাড়িয়া যায়!

"রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং
বভূব যৎপ্রেম পরস্পরাশ্রয়ং॥
বিভক্তমপ্যেকসুতেন তত্তয়োঃ
পরস্পরস্তোপরি পর্য্যচীয়ত॥"

মহাকবি ভবভূতিও তাই বলেন। তিনি বলেন সন্তান জনক জননীর অনন্যসাধারণ স্নেহপাত্র হইয়া উভয়কে এক সুখের বন্ধনে বাঁধে।

"অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি কথ্যতে॥"

বাস্তবিক যে গৃহে শিশুর হাস্য-কোলাহল শুনা যায় না সে গৃহ গৃহই নহে—তাহা অরণ্যের ন্যায় নিরানন্দ। গার্হস্থ্য-জীবন মানবাত্মার উন্নতি সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, এবং শিশুই গার্হস্থ্য-জীবনের প্রাণস্বরূপ। তাই মহাকবি গেটে বলেন যে আমরা নারীর নিকট যে শিক্ষা লাভ করি তাহাতে যাহা কিছু অপূর্ণ থাকে শিশুই তাহার পূরণ করে। সৃষ্টি-সংরক্ষক অপত্যস্নেহ মনুষ্যে যেমন, নিকৃষ্ট পশু পক্ষীর মধ্যেও সেইরূপ প্রবল। কিন্তু মনুষ্যের অপত্যস্নেহ যেরূপ বহুদিন স্থায়ী, ইতর জীবের অপত্যস্নেহ সেরূপ নহে। তাহার কারণ এই যে, মানবশিশু অনেক দিন পর্য্যন্ত অসহায় অবস্থায় থাকে; সুতরাং সে বহুকাল পিতা মাতার যত্নে লালিত পালিত হয়। এইরূপে ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী পারিবারিক সম্বন্ধের সূচনা হয়, এবং সমাজ বল, জাতীয়তা বল, শিক্ষা বল, সকলই এই মূল কারণ হইতে সমুদ্ভূত।

একজন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত বলেন যদি ভগবানের বিধানে শিশুর জন্ম আদৌ না হইত, কেবল এক নির্দ্দিষ্টসংখ্যক-কোটি অমর মনুষ্য চিরকালের জন্য এই পৃথিবীর অধিবাসী হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের দশা কি হইত? হয়ত আমরা অমরত্ব লাভ করিয়া অবাধে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারিতাম। কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, আশা, সুখ, দুঃখ, দৌর্ব্বল্য, শৈশব, বার্দ্ধক্যাদি জীবন-বৈচিত্র্যের অভাবে আমাদের হৃদয়ের শিক্ষা কিরূপে হইত? ফলতঃ আমাদের হৃদয় তখন আর এই বিচিত্র মানব-হৃদয় থাকিত না।

একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের বীজ কত ক্ষুদ্র! সেইরূপ ক্ষুদ্র মানব-শিশুও বহুদূরব্যাপী ভাবী জাতীয় গৌরবের এক একটি প্ররোহ স্বরূপ। প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী টর্নার "কার্থেজ-নির্ম্মাণ" নামক বিখ্যাত চিত্রের পুরোভাগে কতকগুলি শিশু ছেলেখেলার জাহাজ জলে ভাসাইতেছে এই আলেখ্যটি আঁকিয়া কার্থেজের ভাবী সামুদ্রিক আধিপত্য সূচিত করিয়াছেন।

এক একটি শিশু এক একটি কুলপ্রদীপ হইবে এইরূপ ভাবিয়া আমরা কয়জন শিশু-শিক্ষায় ব্রতী হই? আমি বহুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, যাহা তাঁহার কোনও মুদ্রিত জীবনচরিতে দেখি নাই। গল্পটি এই যে রামতনু বাবু যখন উত্তরপাড়ার সরকারী ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন একদিন ঐ বিদ্যালয়ের নিম্নতমশ্রেণীর জনৈক শিক্ষক একটি বালককে গুরুতর প্রহার করেন। এই সংবাদ রামতনু বাবুর কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি বালকটির সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিক্ষককে নিরতিশয় করুণস্বরে বলিলেন "আপনি কোন্ প্রাণে এই বালকটির গায়ে হাত তুলিয়াছিলেন? আপনি কি জানেন না যে এক একটি বালক এক একটি বংশধর?" কি সুন্দর কথা! বৈদিক ঋষিরা যেমন হোমের জন্য সম্যক্ সংযতচিত্ত হইয়া মন্ত্রপূত অরণি দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন করিতেন, শিশুর শিক্ষককে—বিশেষতঃ তাহার পিতা মাতাকে—সেইরূপ পূতাচার অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহারা যে বীজ বপন করিবেন তাহার পরিণাম কত সুদূরব্যাপী ইহা যেন তাঁহারা কখনও বিস্মৃত না হন। ক্রোধান্ধ হইয়া শিশুকে শাসন করিলে ঈপ্সিত ফললাভের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। শিশু যদি পিতা

মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা দেখে তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক শাসন সে দেবতার শাসন ভাবিয়া অবনতমস্তকে বহন করিবে এবং নিজের দোষক্ষালনে বিশেষ যত্নশীল হইবে। কিন্তু সে যদি ঐ শাসনে ক্রোধাদি দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন দেখিতে পায়, তাহা হইলে উহা তাহার চক্ষে কেবল পাশব শক্তির প্রয়োগ বলিয়া প্রতিভাত হইবে, এবং তাহার হৃদয়ে অবজ্ঞার উদ্রেক হইবে। এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ এই আখ্যায়িকাটি উল্লেখযোগ্য। একটি শিশুর জননী সন্তানের যাহাতে কুশিক্ষা না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। একদিন তিনি রন্ধনশালা হইতে শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার স্বামী ক্রোধকর্কশস্বরে স্বীয় ভৃত্যকে ভৎর্সনা করিতেছেন। তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িল যে তিনি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার শিশু সন্তানটিকে স্বামীর কাছে রাখিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। পাছে উল্লিখিত ব্যাপার দর্শনে শিশুটির কোনওরূপ নৈতিক অনিষ্ট ঘটে এই আশঙ্কায় তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন এবং স্বামীর সন্নিধান হইতে উহাকে বিচ্যুত করিয়া কেবল যে সন্তানকে ভাবী অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিলেন তাহা নহে, প্রকারান্তরে স্বামীকেও বিলক্ষণ শিক্ষা দিলেন। শিশুর স্বভাবসিদ্ধ সারল্যের সহিত যদি এইরূপ সৎশিক্ষার সংযোগ ঘটে তাহা হইলে সেই মণি-কাঞ্চনযোগে কি সুধাময় ফল ফলে!

এক একটি শিশুর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্য ও পরার্থপরতা দেখিলে অবাক হইতে হয়। আমাদের দেশে "দাতাকর্ণ" যেরূপ দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ, আরব দেশে "হাতেম তাই"-এরও সেইরূপ খ্যাতি। প্রবাদ আছে, যে, হাতেমের এক যমজ সহোদর বদান্যতায় হাতেমের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করাতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, তুমি এ দুরাশা ত্যাগ কর। তোমরা যখন উভয়ে স্তন্যপায়ী শিশু ছিলে, তখন হাতেমের ক্ষুধা বোধ হইলেও যতক্ষণ না একটি স্তন তোমার মুখে দিতাম সে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দ্বিতীয় স্তনটি মুখে ঠেকাইত না; কিন্তু তুমি যখন ক্ষুধার্ত্ত হইতে, তখন একটি স্তনে মুখ দিয়া অপরটি হাত দিয়া ধরিয়া থাকিতে, পাছে হাতেম তাহাতে মুখ দেয়।"

আমার এক পূজনীয়া মাতৃস্বসা ঠাকুরাণীকে মূর্ত্তিমতী পরার্থপরতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখন নিতান্ত বালিকা ছিলেন তখন আমার মাতামহ প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে কোন্নগরের বাটীতে আসিতেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে ঝড় উঠিবার সম্ভাবনা দেখিলে মাতৃস্বসা ঠাকুরাণী কাঁদিয়া আকুল হইতেন। পিতা বাটী আসিলেও তাঁহার কান্না থামিত না; কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "বাবা ত নিরাপদে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য নৌযাত্রীদের দশা কি হইবে?"

আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই তখন আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার বয়স দুই বৎসর মাত্র। তাঁহার ন্যায় শান্তপ্রকৃতি নারী প্রায় দেখা যায় না। আমরা উভয়ে যখন শিশু ছিলাম তখন তিনি কখনও আমার সহিত কলহ করেন নাই, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুরন্ত-স্বভাব ছিলাম বলিয়া যখন-তখন তাঁহার সহিত বিবাদ করিতাম ও তাঁহাকে প্রহার করিতাম। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া আমার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেন। আমার এরূপ আচরণ সময়ে সময়ে পিতৃদেবের কর্ণগোচর হইত, এবং তখন আর আমার নিস্তার থাকিত না। আমার বেশ স্মরণ হয়, বাবা আমাকে অন্তঃপুর হইতে বলপূর্ব্বক বহির্ব্বাটীতে লইয়া যাইতেন এবং দিদি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেন। বাবা দিদিকে বড় ভাল বাসিতেন এবং পাছে তিনি আমার সমুচিত শাস্তির প্রতিবন্ধক হন এই ভয়ে আমাকে একাকী বৈঠকখানায় পুরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রহার করিতেন। যতক্ষণ প্রহার চলিত ততক্ষণ দিদি গৃহের বহির্দ্দেশ হইতে একটি রুদ্ধ খড়খড়ির ভগ্ন পাখির ভিতর দিয়া ঐ ব্যাপার দেখিতেন এবং আর্ত্তস্বরে ও সজলনয়নে বাবাকে প্রহার হইতে বিরত হইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতেন। করুণাময়ী আর ইহজগতে নাই কিন্তু তাঁহার সেই করুণ ক্রন্দন এখনও যেন আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভগবানের কৃপায় আমাদের দেশের বালিকাদিগের মধ্যে এরূপ সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। বলিতে কি আমি কন্যা সন্তানের বিশেষ পক্ষপাতী। আমার ধারণা যে যদিও এদেশে কন্যা সন্তান পিতৃগৃহ হইতে ত্বরায় বিচ্যুত হয়, তাহার পিতৃপরিবারের প্রতি টান পুত্র সন্তানের অপেক্ষা অনেক বেশি দিন থাকে।

ভাবুকচূড়ামণি রস্কিন্ বলেন যে, মানুষ শৈশবের ক্ষীণ

অঙ্গুলি দ্বারা এমন এক একটি সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরে যাহা সে পূর্ণ বয়সে ধরিয়া রাখিতে পারে না। শিশু সহজসংস্কার প্রভাবে যত শীঘ্র শত্রু মিত্র চিনিয়া লইতে পারে এবং কে তাহাকে আন্তরিক ও কেই বা মৌখিক ভালবাসে যেরূপ বিনা তর্কে জানিতে পারে, একজন পূর্ণবয়স্ক লোক কদাচ সেরূপ পারে না। শিশুর সৌন্দর্য্য-বোধ প্রবীণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও তাহার সৌন্দর্য্য-ভোগের ক্ষমতা বোধ হয় অনেক বেশি। একটি সুন্দর বস্তু দেখিয়া শিশুর আশা সহজে মিটে না। পৌনঃপুন্য তাহার পক্ষে আদৌ বিরক্তিকর নহে। শিশু যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সবই সুন্দর দেখে। "সজ্জনই ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি" এই কবি-বচনটি ইংলণ্ডের কোন ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়া একটি শিশু তদুত্তরে বলিয়াছিল—"না মহাশয়! আমার জননীই ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি।" আমার নাতিনী কমলাকে কিয়দ্দিবস হইল আমি পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলাম—"তোমার দাদা অতি বিশ্রী।" তাহাতে সে আমাকে গম্ভীরভাবে বলিল—"দেখ্‌তে পাচ্ছি ত ভাল।" তখন আমি কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আমাকে কিসে ভাল দেখিলে?" সে পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"গোঁফ সাদা, বুকে চুল।" এই অদ্ভুত উত্তর শুনিয়া আমি অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলাম।

অনেকের ধারণা যে সূর্য্যালোকের আংশিক তিরোভাবে প্রবীণের মনে যে অনির্ব্বচনীয় গম্ভীর ভাবের উদয় হয় তাহা শিশুর বোধাতীত। এ সংস্কার ঠিক নহে। আমাদের প্রাচীন ভদ্রাসন বাটীতে দুর্গোৎসবের সময়ে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের উপর সামিয়ানা খাটান হইত। আমি পিতামহীর মুখে শুনিয়াছি যে আমার জেঠা মহাশয় শৈশবাবস্থায় একবার পূজার সময়ে মাতৃসমভিব্যাহারে মাতুলালয়ে গিয়া বাটী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন। পিতামহীর পিত্রালয়ে মহাসমারোহের সহিত পূজা হইত, কিন্তু উঠানের উপর পাল খাটান হইত না। জেঠামহাশয়ের অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার চক্ষে এ বাড়ী ঘোর দেখাচ্ছে না। আমার বেশ স্মরণ হয় যখন আমি নিজে শিশু ছিলাম তখন পূজার ধূপধুনার গন্ধে মনে কি এক অলৌকিক ভাবের উদয় হইত। সন্ধি-পূজার সময়ে ত্রিলোক-জননী দুর্গা নিমেষের জন্য আঁখি মেলিয়া ত্রিলোক দর্শন করেন, এই অন্ধবিশ্বাস-প্রণোদিত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম; মনে হইত যেন ত্রিনয়নীর নয়নে একবার পলক পড়িল! রোগের সময়ে কতবার রক্তাম্বর-পরিহিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখিয়া ডরাইয়া উঠিতাম! তখন স্বর্গ অন্তরীক্ষে অবস্থিত বলিয়া জানিতাম এবং অন্তরীক্ষও পৃথিবীর অনতিদূরে বর্ত্তমান মনে করিতাম। এখন আদ্যাশক্তিকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক, স্বর্গ হইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি! এখন বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের সেই সরল বিশ্বাসকে জন্মের মত হারাইয়াছি।

শিশু স্বীয় পিতাকে সর্ব্বশক্তিমান্ মনে করে। আমার একটি আড়াই বৎসরের কন্যা বিসূচিকা রোগে মারা যায়। সে যখন যাঁহার উপর বিরক্ত হইত তিনি যত বড় লোক হউন না কেন, তাঁহাকে অকুতোভয়ে শাসাইত, "আমি বল (বড়) বাবুকে ব'লে দেব।" তাহার এইরূপ অকুতোভয়তা দেখিয়া আমার এক পূজ্যপাদ গুরুজন তাহাকে "রাণী-ভবানী" বলিয়া ডাকিতেন। আমার এই "অমর" শিশুটি অল্পকাল পরে সংসার ছাড়িয়া যাইবে বলিয়াই বোধ হয় তাহার সংসারের সকল বস্তুতে অসাধারণ আসক্তি ছিল। বাসন-বিক্রেত্রীগণ যখন নূতন বাসনের বিনিময়ে আমার বাটী হইতে পুরাতন বস্ত্রাদি লইয়া যাইত তখন সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিত। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার বাটীর সন্নিহিত বাটী হইতে উত্থিত তাহার এক ক্রীড়া-সঙ্গীর রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "নির্ম্মল কেন কাঁদছে?" আমার একটি দৌহিত্রীর বয়স যখন তিন বৎসর, তখন সে তাহার ক্রীড়া-সঙ্গিনীগণের উপর অসন্তুষ্ট হইলে তাহাদিগকে শাসাইত, "আমি আমার বাবাকে ব'লে দিব, দেখো না তিনি তোমাদের কি দশা করেন।" আমি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কি দশা?" সে তৎক্ষণাৎ বলিল "পুড়িয়ে দেবে।" আমার মুখে এই গল্প শুনিয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার নাতিনীটিকে "বৈদিক ঋষি" নামে অভিহিত করেন।

শিশুর সঙ্গীতপ্রিয়তা ও চিত্রাদি-সূক্ষ্ম-শিল্প-প্রিয়তা কাহারও অবিদিত নাই। শিশুর প্রকৃতিসিদ্ধ মার্জ্জিত-রুচির দৃষ্টান্তও বিরল নহে। আমার বসিবার ঘরে এক-জোড়া ব্রাকেটের উপর ছোট ছোট দুইটি গ্রীক্ রমণীর নগ্ন মূর্ত্তি বিরাজমানা। ভাস্করের শিল্প-কৌশলে প্রত্যেক রমণীর একটি হস্ত লজ্জানিবারণে নিযুক্ত। সেদিন আমার নাতিনী কমলা ঐ মূর্ত্তিদ্বয় দেখিয়া বলিল—"অসভ্য!" আমি তাহার এই মন্তব্য শুনিয়া স্তব্ধ হইলাম। নগ্নতা অশ্লীল নহে, উহাকে উক্তরূপে ঢাকিবার চেষ্টা করাই তাহার চক্ষে অশ্লীল। কমলা পসারাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসকের ন্যায় আমাকে সদাসর্ব্বদা বিনামূল্যে পরামর্শ বিতরণ করে—যথা, "ময়লার গাড়ীতে চড়িও না, কাপড় ময়লা হবে"; "মঙ্গলা গোরুর কাছে যেও না, সে গোঁতায়, তার বাছুর রবিটি কিন্তু লক্ষ্মী", ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু দিন হইল আমি কমলাকে আদর করিয়া বলিতেছিলাম—"তোমার দাদা গরীব, টাকা-কড়ি কোথায় পাবে, তুমিই আমার টাকার সিন্দুক।" সে প্রথমে আমার আদরে গলিয়া গেল ও আমার কথায় সায় দিয়া বলিল, "হাঁ দাদা! আমার মাথার ভিতর ও গলার ভিতর অনেক টাকা আছে।" কিন্তু ক্ষণকাল পরে সে আমাকে বলিল, "না দাদা! মিছা কথা, আমার গলার ভিতর টাকা নেই—লক্ত (রক্ত)।" আমি তাহার শারীরতত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া হতবুদ্ধি হইলাম। আর একদিন কমলাকে বলিয়াছিলাম, "তোমার দাদা মরে যাক না।" তাহাতে সে বলিল, "না দাদা মরো না, তুমি মরে গেলে আমি কাকে দাদা বলব?" আমি বলিলাম, "কেন, তোমার দাদাকে?" তখন সে বলিল, "ছোড়দাদা ত ছোড়দাদা থাকবে, দাদা হ'বে কে?" আমি কমলার শেষ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারি নাই।

প্রতিদিন আহারান্তে আমাকে কিয়ৎকালের জন্য কমলাকে লইয়া শয্যাশায়ী হইতে হয়। ঐ সময়ে আমার লিখন পঠন একেবারে নিষিদ্ধ; যদি গোপনে একখানি পুস্তক পাঠ করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে কমলা তৎক্ষণাৎ উহা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করে। একদিন মধ্যাহ্ন কালে কমলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা খেয়েচ?" আমি তাহার প্রশ্নের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিলাম, "না দাদা!" আমার উত্তর শুনিবামাত্র সে বলিল, "মিথ্যা কথা! আমি যে দেখলুম তুমি খেলে।" আমি তখন বিনা বাক্যব্যয়ে কমলার সঙ্গে শয়ন করিলাম। গত শীতকালে কমলা প্রতিদিন সায়াহ্নে কিছুক্ষণের জন্য আমার শয্যার একদেশ অধিকার করিত। আমি লেপ মুড়ি দিতাম। তাহার গায়ে গরম জামা থাকিত বলিয়া সে আমাকে প্রতিদিন সতর্ক করিয়া দিত যেন আমার লেপখানি কোনওক্রমে তাহার গাত্র স্পর্শ না করে। একদিন দৈবাৎ আমার লেপের কিয়দংশ তাহার পায়ে ঠেকিয়াছিল বলিয়া সে আমাকে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিল, "তোমার লেপ যে আমার পায়ে ঠেকল, তুমি বোকা বুঝি?" শিশু এইরূপ অকপটে তীব্র সমালোচনা করিতে বিশেষ পটু। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী টুনু কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের উপর তাহাকে বলে, "তুমি বিচ্ছিরি"। বিশেষ রুষ্ট হইলে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিশেষণ প্রয়োগ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না।

শিশুর সরলতায় যে চাতুরীর লেশ নাই তাহা বলিতে পারি না। শিশুকে অনেক দিক্ ভাবিয়া চলিতে হয়। একদিন কমলার পিতা আমার হাতের একটি ব্রণ গালিয়া দেন। আমার হস্তে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া কমলা বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! তোমার হাত কে কাটিল?" আমি বলিলাম, "তোমার বাবা।" এই কথা শুনিয়া সে বলিল, "বাবা এলে আমি মারর্বো।" আমি তাহার সৎসাহস দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু দুই চারি মিনিট পরে সে আমাকে বলিল—"না দাদা! বাবাকে মারা হ'বে না, তা'হলে বাবা আমাকে যে তাঁর বিছানায় শুতে দেবেন না।" কমলা আমার ভ্রাতৃবধূকে বড় ভালবাসে ও তাঁহাকে "ভাল মা" বলে। সে তাঁহার সহিত তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে বড় ভালবাসে। সেখানে ছাপাখানা আছে বলিয়া সে ঐ বাটীর নাম রাখিয়াছে "ছাপাখানার মামার বাড়ী।" একদিন আমি কমলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে কি না? তাহাতে সে বলিল, "চুপ কর, ভাল মা টের

পেলে আর আমাকে ছাপাখানার মামার বাড়ী নিয়ে যাবে না।" সোহাগে বাড়াইবার জন্য সে আমাকে মাঝে মাঝে বলে "আমি তোমাকে ভাল বাসি না," কিন্তু সেই দণ্ডেই হাসিতে হাসিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরে। ইহাকেই বলে স্ত্রীজাতির অশিক্ষিতপটুত্ব। শিশুর চতুরতা সম্বন্ধে আমি আরো দুই একটি উদাহরণ দিব। অনেক বৎসর হইল, আমি একবার পীড়িত হইয়া কর্ম্ম হইতে একমাস অবসর গ্রহণ করি। আরোগ্যলাভ করিয়াও কিছুকাল বড় দুর্ব্বল বোধ করিতাম এবং একখানি চিত্তরঞ্জন উপন্যাস মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া সময় কাটাইতাম। তখন দারুণ গ্রীষ্মকাল। আমার পিপাসা-শান্তির জন্য আমার সহধর্ম্মিণী জামরুল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একখানি ছোট রেকাবীতে সাজাইতেন ও রেকাবীখানি আমার খাটের নিকটস্থ একটি টুলের উপর রাখিতেন। আমি পুস্তক পাঠ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড জামরুল চর্ব্বণ করিতাম। একদিন আমার একটি তিনবৎসর-বয়স্ক পুত্র আমাকে পুস্তক পাঠে ব্যাপৃত দেখিয়া চুপি চুপি রেকাবী হইতে জামরুল-খণ্ড আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হঠাৎ রেকাবীর দিকে নজর পড়াতে দেখিলাম আমার পুত্ররত্ন রেকাবীর অর্দ্ধেক খালি করিয়াছে। সে ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাকুক আমাকে অম্লানবদনে বলিল, "তুমি পড়িতেছ পড় না।" আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র শৈশবাবস্থায় পশু-বিষয়ক গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিত। সে তাহার পিতাকে প্রথমে একটি বাঘের গল্প বলিতে অনুরোধ করিত। বাঘের গল্প শেষ হইবামাত্র সে তাঁহাকে বলিত, "তোমাকে ভাল্লুকের গল্প বল্‌তে বল্লুম, তুমি বাঘের গল্প বল্লে।" ভল্লুকের গল্প শেষ হইলে, সে আবার বলিত, "তোমাকে হাতীর গল্প বল্‌তে বল্লুম, তুমি ভাল্লুকের গল্প বল্লে।" এইরূপে সে তাহার পিতার নিকট অনেকগুলি গল্প আদায় না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। আমি তাহার এই কৌতুকাবহ কৌশল দেখিয়া সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। বস্তুতঃ শিশুর চতুরতা বড়ই আমোদজনক। একজন ইংরাজ পর্য্যটক সুদূর তিব্বতের কোনও গ্রামে এক গৃহস্থের আবাসে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবিবরণে ঐ বাটীর দুইটি শিশুর কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। একটি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা ও অপরটি ছয়বৎসর-বয়স্ক বালক। ইহারা উভয়ে ইহাদের বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত এক গৃহে বাস করিত। সাহেব গৃহান্তর হইতে দেখিতেন যে ইহারা যতক্ষণ পিতামহীর সমক্ষে থাকিত ততক্ষণ অতি শিষ্ট শান্তভাবে বসিয়া বৌদ্ধ-বীজমন্ত্র (ওঁ মণিপদ্মে হুঁ) জপ করিত। বৃদ্ধা কোন কার্য্যগতিকে চক্ষের আড়াল হইলেই শিশু দুইটি নিজমূর্ত্তি ধরিত ও ঘর তোলপাড় করিত। বৃদ্ধার পদশব্দ শুনিতে পাইলে আবার পূর্ব্ববৎ জপে বসিত। শিশুদ্বয়ের এইরূপ আচরণ দেখিয়া সাহেব বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

আহা! শিশুর অভিমানও কি সুন্দর! কবি রামবসু মুগ্ধা নায়িকাকে সম্বোধন করিয়া যাহা গাহিয়াছিলেন তাহা শিশুর পক্ষেও বিশেষ খাটে—

"তোমার মানেতে নাই কৌশল
নাহি কোনও ছল, শতদল
ভাসে নয়নজলে।"

শিশুর অভিমানকে কখনও অবহেলা করিবে না। আমি শিশু-চরিত্র যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে অভিমানী শিশু অনেক সদ্গুণের আকর।

ছেলেদের হাসি কান্না শরৎকালের মেঘ-রৌদ্রের ন্যায় বড়ই মনোরম—এই আছে এই নাই। কতবার দেখি শিশুর মুখে হাসি চখে জল। একজন কবি বলেন যে ছেলেখেলা কেবল ছেলেদেরই ভাল লাগে। কিন্তু আমার দ্বিতীয় শৈশব আসিয়া উপস্থিত বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, আমি ছেলেখেলার বড় পক্ষপাতী। যদি ইতিহাস ও জীবনচরিত সত্য হয়, তাহা হইলে অনেক বড় বড় লোকও ছেলেখেলায় যোগ দিয়া আমোদ পাইয়াছেন, আমি কোন ছার! একজন উচ্চদরের নরতত্ত্ববিৎ বলেন যে আধুনিক বাল্যক্রীড়ায় অনেক প্রাচীন রীতি নীতির আভাস পাওয়া যায়। এ কথা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য না হইলেও, ছেলেখেলায় ও ছেলেদের ছড়ায় যে জাতীয় জীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমাদের দেশে ছোট ছোট মেয়েরা ক্রীড়াচ্ছলে সমস্ত গৃহকর্ম্ম কি পরিপাট্যের সহিত সম্পন্ন করে! সে দিন আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী টুনু ছেলের দুধ

গরম করিবে বলিয়া আমার শয়নকক্ষ হইতে একটা গুরুভার অয়েল-গ্যাস-ষ্টোভ্ টানিয়া বাহির করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ষ্টোভ্ জ্বালিবার স্পিরিটের বোতল উপরের তাকে ছিল, নতুবা একটা কাণ্ড করিত। টুনু একদিন আমার কাছে তাহার ছেলেটিকে আনিয়া বলিল "এ দুধ খাচ্চে না, একে অন্ধকারে ফেলে দাও।" আমাদের দেশের ছেলেখেলায় যেরূপ জাতীয় জীবনের ছবি দেখা যায় সেইরূপ সুদূর গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে এস্কিমো শিশুগণ ছোট ছোট "কয়াক্" বা তদ্দেশপ্রচলিত ডোঙ্গা নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করে। আমার মনে হয় যে যদি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের খেলানার একটা একজাই বা প্রদর্শনী করা যায় তাহা হইলে নরতত্ত্ব বিষয়ক অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়। মৃচ্ছকটিক-নাটক যখন রচিত হয়, তখন লোকে গো-শকটে চড়িয়া যাতায়াত করিত, সুতরাং ছেলেরাও মৃণ্ময় গো-যান লইয়া খেলা করিত। বৌদ্ধ সময়ে মঠের ও বর্ত্তমান আকারবিশিষ্ট রথের সৃষ্টি হয়। চিনির মঠ ও মাটির রথ ছেলেদের হাতে দেখিলেই আমার বঙ্গে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধপ্রভাব মনে পড়ে। সেইরূপ "বেনে-বউ" পুত্তলি দেখিলে আমার "মনসার ভাসান" ও "কবিকঙ্কণ-চণ্ডী" মনে পড়ে। মাটির পাল্কী অপেক্ষাকৃত আধুনিক খেলানা; বোধ হয় অল্পদিন পরে ছেলেরা মাটির মোটর-কার বা ট্যাক্সি-ক্যাব্ লইয়া খেলা করিবে।

শিশুর খেলা সম্বন্ধে একজন ইংরাজ কবি একটি সুন্দর সারগর্ভ গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একদিন তাঁহার মাতৃহীন শিশুপুত্রটি তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহাকে প্রহার করিয়াছিলেন এবং অন্যদিন শয়নের প্রাক্কালে তাহার যেরূপ মুখচুম্বন করিতেন তাহা না করিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার মনে এই আশঙ্কা হইল যে হয়ত মনঃক্ষোভে ছেলেটার ঘুম হইবে না। সন্তানকে সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সে নিদ্রায় অচেতন, কিন্তু তাহার নয়নপল্লব তখনও অশ্রুসিক্ত। শিশুটির চক্ষে জল মুছাইতে গিয়া তাঁহার নিজের চক্ষু হইতে দুই চারি ফোঁটা জল পড়িল। শয্যার পার্শ্বে একটি টেবিলের উপর একখণ্ড কাচ, এক টুক্‌রা রঙ্গীন পাথর, কয়েকটি মুদ্রা, খান ছয় সাত ঝিনুক ইত্যাদি ক্রীড়ার সামগ্রী সজ্জিত দেখিয়া বুঝিলেন শিশুটি কি উপায়ে নিজ ব্যথিত হৃদয়কে শান্ত করিয়াছিল। সেদিন নৈশ প্রার্থনাকালে তিনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রভো! আমরাও ত তোমাকে কতবার বিরক্ত করিয়া এই শিশুর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ক্রীড়ার আমোদে ভুলিয়া থাকি!" বাস্তবিক মানুষ শেষ দিন পর্য্যন্ত শিশুর ন্যায় অসার সুখে মত্ত থাকে, অবশেষে রুক্ষস্বভাবা ধাত্রীর ন্যায় মৃত্যু তাহার হস্ত হইতে খেলানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয়। আমি শিশু-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, শিশুর কল্পনাশক্তি এত অধিক যে ইহারা অনেক সময়ে কাল্পনিক বস্তুকে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করে। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স যখন তিন বৎসর, তখন সে কাল্পনিক ডাব কাটিবার সময় লোককে সরিয়া যাইতে বলিত, পাছে ডাবের জল ছিট্‌কাইয়া তাহাদের গায়ে লাগে। একবার একজন ভদ্রলোক কতকগুলি শিশুকে সঙ্গে লইয়া কিয়দ্দূর পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তাহাদিগকে শ্রান্ত ও চলচ্ছক্তিহীন দেখিয়া তিনি মহাবিপদে পড়িলেন। হঠাৎ তাঁহার শিশুদিগের স্বভাবসিদ্ধ কল্পনাশক্তির কথা মনে পড়িল। তখন তিনি পথের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ হইতে কতকগুলি ডাল সংগ্রহ করিয়া যষ্টি নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রত্যেক শিশুকে এক এক গাছি যষ্টি দিয়া বলিলেন, "তোমরা এই ঘোটকগুলিতে আরোহণ করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।" এই অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করিয়া তিনি শিশুগুলিকে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কল্পনার প্রাবল্যবশতঃ মানবশিশু অসভ্য মানবের ন্যায় অনুক্ষণ কাল্পনিক ভয়ে ভীত হয়। অসভ্য মানবের সহিত মানবশিশুর আরও অনেক বিষয়ে চরিত্রগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, কোনও নির্দ্দিষ্ট অসভ্যজাতির মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যটকেরা যে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ প্রচার করেন তাহার একটি মুখ্য কারণ এই, যে, শিশু যেমন অল্পক্ষণ চিন্তা করিলেই শ্রান্তিবোধ করে এবং তখন তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে তাহার যাহা মনে আসে সে তাহাই

বলে, অসভ্য মানবও ঠিক সেইরূপ করে। অসভ্য মানবের ন্যায় শিশু অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়, ইতর জীবজন্তুর গল্পপ্রিয়, স্বাধীনতাপ্রিয়, অলঙ্কারপ্রিয় ও আশুসুখপ্রিয়। শিশু ভবিষ্যতে বেশি সুখ পাইবার আশায় বর্ত্তমান অল্পসুখ পরিহার করিতে একেবারে অনিচ্ছুক। শিশু অসভ্য মানবের ন্যায় অনেক সময়ে কাপড় পরিতে নারাজ, কিন্তু সকল সময়েই অলঙ্কার ও অঙ্গরাগের পক্ষপাতী। অসভ্য মানবের ন্যায় শিশু অপরিচিত ব্যক্তি দেখিলেই তাহাকে প্রথমে শত্রু মনে করে। অসভ্য মানবের ন্যায় শিশুর ধূলা কাদায় যত অনুরাগ অঙ্গমার্জ্জনায় তত বিরাগ। অসভ্য মানবের ন্যায় শিশু চাকচিক্যশালী বস্তুর সমধিক পক্ষপাতী এবং পণ্যদ্রব্যের প্রকৃত মূল্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ ইহা বলা বাহুল্য। চলচিত্ততা, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতাও শিশুচরিত্রে অল্প বিস্তর পরিমাণে দেখা যায়, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে কি এক অপূর্ব্ব হৃদয়হারী সারল্য বিরাজ করে যাহার মধুরিমায় শিশুর সকল দোষ ঢাকা পড়ে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

বুদ্ধদেব

১

সহস্র কর্ম্মের মাঝে আজো মনে হয়
তোমার পবিত্র নাম হে চিরকরুণ;
প্রতি গিরিগাত্র আজো তব ছায়াময়
নির্ঝরের জলে তুমি আজিও তরুণ।

২

সে দিন কি ব্যথা তব বেজেছিল প্রাণে
নীরবে কাঁদিলে তুমি হে চিরসদয়,
মানবের সকাতর দুঃখময় গানে
পীড়িত করিল তব কোমল হৃদয়।

বুদ্ধদেব।

বোধিসত্ত্ব সমন্তভদ্র। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী।
আনন্দ। মহাকাশ্যপ।

৩

সেই স্তব্ধ নিশাকালে এ বিশ্বের তরে
গৃহচ্যুত তুমি দেব দীনতম বেশে,
অতুলিত ধন রত্ন তৃণজ্ঞান করে,
তারাদীপ্ত অন্ধকারে তুমি বনোদ্দেশে।

৪

প্রফুল্ল কুসুম সম প্রণয়িনী তব,
সুখের আবেশ ভরে নিদ্রায় কাতর;
সুপ্ত শিশু কোলে শোভে, সকলি নীরব,
এ বিশ্ব নিস্তব্ধ দুঃখে যেমন পাথর।

৫

আকাশে নক্ষত্ররাজি পাণ্ডুর মলিন,
বৃক্ষ লতা নতশিরে ফেলে অশ্রুজল;
কম্পমান সমীরণ পুষ্প গন্ধহীন,
আড়ম্বরে ঢাকে নভঃ জলদের দল।

৬

তার পরে অতিক্রমি দীর্ঘ বনপথ
অনাহারে অনিদ্রায় বিহ্বল চরণে,
উপনীত গয়াধামে, পূর্ণ মনোরথ,
জ্ঞানী বুদ্ধ দয়াবান বিদিত ভুবনে।

৭

তোমার মরমস্পর্শী উপদেশ যত,
অজ্ঞান পাপাত্মা জীবে করিল উদ্ধার;
হে মহান সে চিন্তায় শির হয় নত,
বিস্ময়ে পুলকপূর্ণ হৃদয় আমার।

৮

হে মহান প্রিয়তম তুমি ভারতের,
এই গর্ব্ব আমাদের থাক নিরন্তর;
হে শুভ, হে ধ্রুব তুমি প্রতি অভাগ্যের,
প্রণিপাত করি পদে জুড়ি দুই কর।

শ্রীপ্রভাসকুমার সেন।

নববর্ষ*

আজ নববর্ষের প্রাতঃসূর্য্য এখনো দিক্‌প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করেনি—এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমরা আশ্রমবাসীরা আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম প্রণামটিকে আমাদের অনন্তকালের প্রভুকে নিবেদন করবার জন্যে এখানে এসেছি। এই প্রণামটি সত্য প্রণাম হোক্!

এই যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ভ হল?

এই যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যূষটি আজ আকাশপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল—কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না;—আকাশভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল;—কুঁড়ি যেমন করে ফোটে, আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠল—তার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজল না। নববৎসরের উষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে—সেখান থেকে নিত্যনূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হচ্চে। এই জন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায় নি—আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি। এই জন্যেই বসন্ত যেদিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিণে বাতাসে নবীনতার আশিস মন্ত্র পড়ে দেয় সেদিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে তখনি অনায়াসে শুক্‌নো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে—ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়—এই যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ, এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়—কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

কিন্তু মানুষ ত পুরাতন আবরণের মধ্য থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আস্‌তে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয় বিদীর্ণ করতে হয়—বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না;—তার সেই অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মত আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে—এবং তার সেই প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়্গের মত দিকে দিগন্তে চকিত হতে থাকে।

মানুষ যদিচ এই সৃষ্টির বেশি দিনের সন্তান নয় তবু জগতের মধ্যে সে সকলের চেয়ে যেন প্রাচীন। কেন না সে যে আপনার মনটি দিয়ে বেষ্টিত;—যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরযৌবনের রস অবাধে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হচ্চে তার সঙ্গে সে একেবারে একাত্ম মিলে থাকতে পারচে না। সে আপনার শতসহস্র সংস্কারের দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে আবদ্ধ। জগতের মাঝখানে তার নিজের একটি বিশেষ জগৎ আছে—সেই তার জগৎ আপনার রুচিবিশ্বাস মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা পড়ে মানুষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে। শত সহস্র বৎসরের মহারণ্যও অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে,—যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষার-রত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে

* শান্তিনিকেতন আশ্রমে নববর্ষের উৎসবে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেল্‌তে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ নূতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুল্‌চে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারদিকের বিরাট প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাক্‌লেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জ্জনা সঞ্চিত হতে থাকে—প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলি বৃহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে মিলিয়ে যায় না—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। তাকে যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় সে তার স্বরচিত সযত্নপালিত অন্ধকার। সেই জন্যে এই অন্ধকারকে যখন বিধাতা একদিন আঘাত করেন সে আঘাত আমাদের মর্ম্মস্থানে গিয়ে পড়ে—তখন তাঁকে দুই হাত জোড় করে বলি, প্রভু, তুমি আমাকেই মারচ—বলি, আমার এই পরম স্নেহের জঞ্জালকে তুমি রক্ষা কর—কিম্বা বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড়িয়ে বলি তোমার আঘাত আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব, এ আমি গ্রহণ করব না।

মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন। সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করচে। প্রকৃতির কত লক্ষ কোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসঙ্গত সুসংহত করে না তুল্‌চে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণগুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা—ততক্ষণ তার যুদ্ধ-অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধজয়ের প্রধান অন্তরায়। একটি মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুল্‌চে ততক্ষণ তারা এলোমেলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে যাচ্চে এবং সুষমার পরিবর্ত্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারিদিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্চে।

সেই জন্যে বিশ্বজগতে যে নববর্ষ চিরপ্রবহমান নদীর মত অবিশ্রাম চলেছে, একদিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না এবং সেই জন্যই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো একটা বিশেষ দিন নেই—সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না—তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়—বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সেই জন্যে আমি বলচি, এই প্রত্যূষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই যে অরুণালোকের সহজ নির্ম্মলতা, এই যে পাখীর কাকলীর স্বাভাবিক মাধুর্য্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয়—যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ, যেন মনে না করি এ'কে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি, এই আলোকের নির্ম্মলতা আমারই নির্ম্মলতা, এই আকাশের শান্তি আমারই শান্তি;—মনে যেন না করি, স্তব পাঠ করে নামগান করে কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ করে আমরা যথার্থরূপে নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।

জগতের মধ্যে এই মুহূর্ত্তে যিনি নবপ্রভাতকে প্রেরণ করেছেন তিনি আজ নববর্ষকেও আমাদের দ্বারে প্রেরণ করলেন এই কথাটিকে সত্যরূপে মনের মধ্যে চিন্তা কর। একবার ধ্যান করে দেখ আমাদের সেই নববর্ষের কি

ভীষণ রূপ! তার অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টির মধ্যে আগুন জ্বলচে। প্রভাতের এই শান্ত নিঃশব্দ সমীরণ সেই ভীষণের কঠোর আশীর্ব্বাদকে অনুচ্চারিত বজ্রবাণীর মত বহন করে এনেছে।

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়—পাখীর গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে' আপন অধিকার লাভ করে—আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে' তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ববিধাতা সূর্য্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন, তেমনি মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন—তিনি তাকে সহজ জীবন দেন নি। সেই জন্যেই সাধনা করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়;—তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশু পক্ষী সহজেই পশু পক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

তাই বলচি আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে নববর্ষ পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে ত সহজ দান নয় আজ যদি প্রণাম করে তাঁর সে দান গ্রহণ করি, তবে মাথা তুল্‌তে গিয়ে যেন কেঁদে না বলে উঠি তোমার এ ভার বহন করতে পারিনে প্রভু,—মনুষ্যত্বের অতি বিপুল দায় আমার পক্ষে দুর্ভর!

প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপিত করেছেন, তাইত মানুষের ব্রত এত কঠোর ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনোমতেই তার নিষ্কৃতি নেই। বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, কর্ম্মের সাধনা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই জন্যই তার উপরে এত দাবি। এই জন্যে নিজেকে তার পদে পদে এত খর্ব্ব করে চল্‌তে হয়, এত তার ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসম্বরণ!

মানুষ যখনি মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে—তখনি বিধাতা তাকে বলেছেন, তুমি বীর! তখন তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মত আর ত সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চল্‌তে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, হে বীর, জাগ্রত হও! একটি দরজার পর আরেকটি দরজা ভাঙ, একটি প্রাচীরের পর আরেকটি পাষাণ প্রাচীর বিদীর্ণ কর,—তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না, ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক!

এই যে যুদ্ধে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তার অস্ত্র তিনি দিয়েছেন। সে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র—সে শক্তি আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন দুর্ব্বল কণ্ঠে বলি, আমার বল নেই, সেইটেই আমাদের মোহ। দুর্জ্জয় বল আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনিককে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করবার জন্যে তার পরাভবের প্রতীক্ষা করে নেই। আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শাণিত অস্ত্র সব ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলচে। সে সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপরে গিয়ে পড়চি, ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষত বিক্ষত করচে। এ সমস্ত ত সঞ্চয় করে রাখবার জন্যে নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণ হস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে; পথ কেটে বাধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বাহির হতে হবে। এস, এস, দলে দলে বাহির হয়ে পড়—নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনে আজ জয়ভেরি বেজে উঠছে—সমস্ত অবসাদ কেটে যাক্, সমস্ত দ্বিধা সমস্ত আত্ম-অবিশ্বাস পায়ের তলায় ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে যাক্—জয় হোক্ তোমার, জয় হোক্ তোমার প্রভুর।

না, না, এ শান্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্ন ভিন্ন বর্ম্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সাম্‌নে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মত গ্রহণ কর।

প্রভু, আজ তোমাকে কোনো জয়বার্ত্তা জানাতে পারলুম না। কিন্তু যুদ্ধ চল্‌চে, এ যুদ্ধে ভঙ্গ দেব না। তুমি যখন সত্য, তোমার আদেশ যখন সত্য, তখন কোনো পরাভবকেই আমার চরম পরাভব বলে গণ্য করতে পারব না। আমি জয় করতেই এসেছি—তা যদি না আস্‌তুম তবে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে এক মুহূর্ত্ত আমি দাঁড়াতে পারতুম না। তোমার পৃথিবী আমাকে ধারণ করেছে, তোমার সূর্য্য আমাকে জ্যোতি দিয়েছে, তোমার সমীরণ আমার মধ্যে প্রাণের সঙ্গীত বাজিয়ে তুলেছে—তোমার মহামনুষ্য-লোকে আমি অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছি ; তোমার এত দানকে এত আয়োজনকে আমার জীবনের ব্যর্থতার দ্বারা কখনই উপহসিত করব না। আজ প্রভাতে আমি তোমার কাছে আরাম চাইতে শান্তি চাইতে দাঁড়াইনি। আজ আমি আমার গৌরব বিস্মৃত হব না। মানুষের যজ্ঞআয়োজনকে ফেলে রেখে দিয়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধ বিশ্রামের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করব না। যতবার আমরা সেই চেষ্টা করি ততবার তুমি ফিরে ফিরে পাঠিয়ে দাও, আমাদের কাজ কেবল বাড়িয়েই দাও, তোমার আদেশ আরো তীব্র, আরো কঠোর হয়ে ওঠে। কেন না, মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাকবে তার এ লজ্জা তুমি স্বীকার করতে পার না। দুঃখ দিয়ে ফেরাও—পাঠাও তোমার মৃত্যুদূতকে ক্ষতিদূতকে। জীবনটাকে নিয়ে যতই এলোমেলো করে ব্যবহার করেছি ততই তাতে সহস্র দুঃসাধ্য গ্রন্থি পড়ে গেছে—সে ত সহজে মোচন করা যাবে না, তাকে ছিন্ন করতে হবে। সেই বেদনা থেকে আলস্যে বা ভয়ে আমাকে লেশমাত্র নিরস্ত হতে দিয়ো না। কতবার নববর্ষ এসেছে, কত নববর্ষের দিনে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেছি। কিন্তু কত মিথ্যা আর বল্‌ব, বারে বারে কত মিথ্যা সঙ্কল্প আর উচ্চারণ করব, বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কারকে আর কত রাশীকৃত করে জমিয়ে তুল্‌ব। জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক—সেই বেদনার বহ্নিশিখায় তুমি আমাকে পবিত্র কর। হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম্ করি—তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিন-বলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দ-সঙ্গীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তা হলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখ্‌তে পাব—তাহলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতি সুন্দরী

ফুল আজি তব গন্ধে হয়েছে সুরভি।
তব লজ্জা আঁকিয়াছে রাঙা করি রবি।
নদী আজি গাহে তব হৃদয়ের গান
সকরুণ সুরে। লভিয়াছে নব প্রাণ
সকল জগৎ। মোর দগ্ধ তপ্ত হিয়া
তোমার চরণ-প্রান্তে পড়িছে লুটিয়া
বিফল বেদনা ভরে। তোমার আহ্বান
ধ্বনিয়া তুলেছে আজি অভিনব তান
মৃদু মন্দ সুরে মোর হৃদয়-বীণায়।
দূরে কোন মায়াপুরে কভু দেখা যায়
নীরব তোমার হাসি। ছল ছল আঁখি
কভু রচে মায়াজাল বেদনায় মাখি।
অনন্ত আকাশখানি তব রূপে ভরি
অতৃপ্ত নয়ন দুটি করিতেছে পান।
কল্পনা এঁকেচে আজি তোমারে সুন্দরী
গোপন হৃদয়পটে ; প্রেম দেছে প্রাণ।

শ্রীহেমপ্রভা দত্ত।

অশোক ষষ্ঠী

চড়্ চড়্ করিয়া ঢাকে কাঠি পড়িবামাত্র অনেকে বলিল—"ঐরে চড়কের কাঠি পড়্‌ল! এইবারে সজনে ডাঁটা সব চোচাকলা হ'য়ে ফেটে যাবে। আমের কড়ারিতে আঁটি বাঁধ্‌বে!"—গৃহিণীরা বলিলেন "না গো এ ঢাকের শব্দ নয়, তার এখনো ক'দিন দেরী আছে। এ রায় বাড়ীর

ষষ্ঠী পূজোর ঢাক। মা ষষ্ঠী সেবার যে রক্ষা করেছেন রায়-গিন্নিকে। কত মানতের কত মাথা-কোটা ছেলেটি! কে বলেছিল যে বাঁচবে। সেই থেকে রায় গিন্নি জোড়া ঢাক দিয়ে মা ষষ্ঠীর পুজো দিচ্ছে।" এই বলিয়া নিজ নিজ বধূ ও কন্যাদের তাঁহারা ষষ্ঠীর পূজা গুছাইয়া লইবার জন্য ত্বরা করিতে বলিলেন।

গ্রামের প্রান্তে ষষ্ঠীতলা। একটি ছায়াবহুল বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গ্রামদেবীর বেদী প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ আরও দু একটি বট বা অশ্বত্থতলে কালীমাতা ওলাদেবী শীতলা-দেবী প্রভৃতির বেদী প্রতিষ্ঠিত আছে বটে কিন্তু সন্তানবতী গৃহিণীদের পক্ষপাতে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্না। বৎসরের প্রধান প্রধান ষষ্ঠী তিথিতে এখানে চাঁদের হাট-বাজার বসিয়া যায়। নবপ্রসূতি বধূ বা কন্যাকে লইয়া গ্রামের গৃহিণীরা এখানে ষষ্ঠীদেবীর পূজা দিতে আসেন। রমণীরা এই পথ দিয়া হাঁটিতে হইলেই তাহাদের সদাশঙ্কিত মাতৃহৃদয়খানি ষষ্ঠীদেবীর চরণে পাতিয়া দিয়া গলবস্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সন্তানের কুশল কামনা করে।

নবপল্লবে আপ্রান্ত ভূষিত হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষটি যেমন দলমল করিতেছে, তাহার তলে তেমনি বসনভূষণে সজ্জিতা যুবতী কিশোরী বালক বালিকারাও প্রাণের হিল্লোলে রমণীয় দেখাইতেছে। কত তরুণী পল্লবিনী লতাটির মত—ক্রোড়ে কুসুমকিঞ্জল্ক সম শিশু,—এই প্রথম নব সন্তান লইয়া ষষ্ঠীতলায় আসিয়াছে। তাহাদের মুখে আনন্দ ও ব্রীড়ার মধুর রাগ! কত গৃহিণী, কক্ষে বংশের দুলাল পৌত্র বা দৌহিত্র এবং সঙ্গে সারি সারি বধূ ও কন্যাদের লইয়া মা ষষ্ঠীর পূজা দিতে আসিয়াছেন; তাঁহাদের মুখে সৌম্যভাব এবং চক্ষে তৃপ্ত আশার আনন্দ-জ্যোতি। বালক বালিকারা স্নানান্তে মাতৃদত্ত বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া গাছের চারি ধারে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, এবং দেবীর নিকটেও শান্ত হইয়া না থাকায় মাতাদের নিকটে তিরস্কার লাভ করিতেছে। কোন মাতাকে গৃহিণীরা ভৎসনা করিতেছেন "ষাট্—ষাট্! আজকে বচ্ছরকার দিনে ছেলেকে কিছু বলতে নেই। একালের মেয়েদের তো পাণে ভয় নেই, দিন ক্ষণও বাছনা তোমরা বাছা।"

পুরোহিত সাড়ম্বরে পূজা আরম্ভ করিলে বালক বালিকার দল তখন শান্তভাবে বসিয়া পূজা দেখিতে লাগিল। ধূপ ধুনার গন্ধে দিগ্বগুল আমোদিত হইয়া উঠিল। রায়েদের ঢাক্ পৃষ্ঠের শ্বেত পাখা নাড়িয়া নাড়িয়া চড়্ চড়্ শব্দে ষষ্ঠীপূজার আরম্ভ-সংবাদ গ্রামে ঘোষণা করিল। নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে তরুতল ও বেদিকা পূর্ণ। তথাপি ভাগ্যবানদিগের বাটী হইতে বাঁকে বাঁকে দধি ছানা ফল মূল মিষ্টান্ন ইত্যাদি আসিতে লাগিল। অসূর্য্যম্পশ্যা পুরন্ধ্রীরাও আজ ষষ্ঠীতলায় সকলের সঙ্গে একত্র হইতেছেন।

পূজার শেষে পুরোহিত বালক বালিকা ও রমণীদের আশীর্ব্বাদী ফুল বিতরণ করিয়া বলিলেন "আপনারা অশোককলি খাবেন তার মন্ত্র জানেন ত? না জানেন ত শুনুন।" জনৈকা গৃহিণী বলিলেন "ষষ্ঠীর কথা বলা না হ'লে ত' আমরা কলি খাব না। আচ্ছা আপনার ভগ্নী তো আছেন, তাঁর কাছ থেকে ও মন্তরটা শুনে নেব আমরা, আপনি এখন আসুন।" গ্রামের জনৈক কিশোরী কন্যা বলিল "পাঁজীর ওই 'ত্বামশোক' ওই মন্তরটা তো!—ও আমরাই জানি!" গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন—"নে থাম্!" তারপর পুরোহিতকে বলিলেন "আপনার নৈবিদ্যি টৈবিদ্যি বাঁকা একটাকে দিয়ে আপনার বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি।"—তখন দক্ষিণা, পূজার বস্ত্র ইত্যাদি লইয়া পুরোহিত প্রস্থান করিলেন। গৃহিণীরা একবাক্যে বলিলেন "পুরুত পিসী, তুমি বাছা ষষ্ঠীর পাঁচালিটা আগে বল।" বালক বালিকারা চেঁচাইয়া উঠিল "না, 'কাঠের ঘোড়া কাঠের ঘুঁড়ী জল পিপি'র কথা আগে বলতে হবে।" তাহাদের তাড়া দিয়া থামাইয়া রমণীরা এক একটা ফল বা ফুল হাতে লইয়া কথা শুনিতে বসিলেন। পুরুত পিসী বলিতে আরম্ভ করিলেন—

জয় জয় বন্দ মা ষষ্ঠীর চরণ (সকলের প্রণাম)
আপনি ষষ্ঠিকারূপ ধরেন নারায়ণ।
ক্ষণরূপা ক্ষণে দেবী ক্ষণে নিশাচরী,
ক্ষণেতে ভৈরবী হন্ ক্ষণেতে কুমারী।
পুরোহিত কহে রাজা শুন গুণসার।
পুত্র বিনা রাজ্য ধন বিফল তোমার।
অভিমান করি রাজা পুরোহিতের স্থানে,
যজ্ঞ করেন নরপতি বিধির বিধানে।

ধূপ দীপ নৈবেদ্য ঘৃত মধু খেয়ে,
আপনি উঠিলেন ব্রহ্মা হরষিত হ'য়ে।
হইবে তোমার ছাওয়াল শুন হে রাজন,
এই আম্র মহিষীরে করাহ ভোজন।
দুই রাণী হস্তে রাজা ফল লয়ে দিলেন
অর্দ্ধ অর্দ্ধ ফল দোঁহে বাঁটিয়া খাইলেন।
পুত্র প্রসবেন তাঁ'রা কিছু দিনান্তরে
আনন্দিত বাদ্য বাজে পুরীর ভিতরে।
দুই খণ্ড পুত্র হইল দোঁহার উদরে
চরে গিয়া জানাইল রাজার গোচরে।
দুই খণ্ড মৃত পুত্র দেখি নরবর
বলে ব্রহ্মা কেন দিলে হেন ছার বর?
বর দিয়ে ব্রহ্মা মোর বাড়াইলে তাপ।
এইরূপে নরপতি করেন সন্তাপ।
খণ্ড শিশু ফেলাইল অশ্বত্থের তলে,
দিবস কাটিয়া গেল হেন গণ্ডগোলে।
"জরা" নামে ষষ্ঠিকা ভ্রমেন নিশাচরী,
খণ্ড শিশু জুড়িলেন দুই হাতে ধরি।
উঁয়া উঁয়া করি শিশু চুষিয়া আঙুল,
ক্ষুধার বেলায় হ'ল কাঁদিয়া ব্যাকুল।
"নাও নাও নরপতি আপন কুমার,
ছাগ মহিষে পূজা বাড়াও আমার।"
"কোনখানে দিব পূজা কহ ভগবতী!
কোনখানে দিব পূজা কহ পার্ব্বতী!"
"যেখানে ফেলেছ শিশু সেইখানে গিয়ে,
তরুতলে পূজা দিও ষষ্ঠী আরাধিয়ে,
ভারে নিও দধি দুগ্ধ কাঁদি নিও কলা
ছাগ মহিষ দিও আর দিও শত বালা।"
নাটোয়ায় নৃত্য করে গাওনে গায় গীত,
মরা ছেলে জিয়াইয়া পুরী হরষিত।
এবা কথা যেবা শোনে যাহার মন্দিরে
শোক দুঃখ পালায় তার ষষ্ঠিকার বরে।
জয় জয় জয় তার স্বামী পুত্র অক্ষয় অবার!*
"জয় দেবী জগন্মাতা জগদানন্দকারিণী,
প্রসীদ মম কল্যাণি ষষ্ঠী দেবী নমোঽস্তুতে।"

সকলে আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিল। তখন বালক বালিকারা চীৎকার ধরিল—"এইবার 'জল পি—পি!'" "আবার গোল্‌করে।—শোন্ সব।"—জনৈকা বর্ষিয়সী ষষ্ঠীর কথা বলিতে লাগিলেন—

এক বনে এক মুনি বহুযুগ হতে তপস্যা করেন। তাঁর তপে ভয় পেয়ে একদিন ইন্দ্র তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে এক অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিলেন। অপ্সরী বহু চেষ্টায় মুনির তপ ভাঙ্গলে মুনির ঔরসে তার গর্ভে এক কন্যা জন্মাল। কন্যা জন্মিবামাত্র অপ্সরী স্বর্গে চলে গেল। তখন মুনি অগত্যা মেয়েটিকে ফুলের মধু খাইয়ে মানুষ করতে লাগলেন। অশোক ফুলের সময় জন্মেছিল বলে মেয়েটির নাম রাখলেন অশোকা। শুক্ল পক্ষের চাঁদের মত মেয়েটি দিনে দিনে বাড়তে লাগ্‌ল। তার রূপের জ্যোতিতে সমস্ত বন আলো হয়ে উঠ্‌ল।

অশোকার ক্রমে যৌবনকাল এল। মুনি মেয়েটিকে রোজ কুটীরে বন্ধ করে রেখে প্রভাতে তপস্যায় যেতেন, সন্ধ্যার সময় কুটীরে ফিরে আস্‌তেন। সমস্ত দিন অশোকা একলাটি কুটীরে বন্ধ থেকে সন্ধ্যায় বাপকে পেয়ে তবে খেলা করতে পেত।

একদিন সেই দেশের রাজা বনে মৃগয়া করতে এসে পথ হারিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ক্রমে মুনির সেই কুটীরের দ্বারে এসে দেখ্‌লেন কেউ কোথাও নেই, কিন্তু কুটীরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক অপরূপ আলো প্রকাশ পাচ্ছে। সেই ফাঁক দিয়ে কুটীরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখ্‌লেন এক পরমা সুন্দরী কন্যা! তারই রূপের জ্যোতি বিদ্যুতের মত বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরুচ্চে! রাজা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে সেই কুটীরের দ্বারে বসে রইলেন। সন্ধ্যা হ'লে মুনি তপস্যা থেকে ফিরে এসে রাজাকে দেখে আস্তে ব্যস্তে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। অতিথি সমস্ত দিন অনাহারে দ্বারে বসে, মুনি তাড়াতাড়ি রাজাকে ফল জল খেতে দিলেন। রাজা বল্‌লেন "খাওয়ার কথা পরে, আগে বলুন কুটীরের ভেতরে ও কন্যাটি কার?" "ও কন্যাটি আমার।" "বিবাহিতা না অবিবাহিতা?" "অবিবাহিতা।" "আমি এদেশের রাজা, আপনি আমায় অপনার কন্যাটি সম্প্রদান করুন।" মুনি বল্‌লেন "আমার এ কন্যার নাম অশোকা, কখনো এ শোক পাবে না। তুমি রাজা, তোমার অনেক রাণী, তোমার সংসারে বহু অশান্তি, বহু ষড়যন্ত্র। তোমায় আমি অশোকা দিতে পারবনা।" রাজা বল্‌লেন "আমার অনেক রাণী আছে বটে কিন্তু আমি অপুত্র। আপনার এই সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যাটি আমায় দিতেই হবে। নইলে আমি এই অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যাব, প্রার্থী অতিথি ফিরে গেলে আপনার তপস্যার ফল নষ্ট হবে।" মুনি কি করেন অগত্যা রাজার সঙ্গে অশোকার বিবাহ দিলেন।

* এ পাঁচালির কবি কে তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু নদীয়া জেলায় বহুকাল হইতে এই ছড়াটি প্রচলিত আছে। মুখে মুখে ইহার অক্ষর ও চরণ সকল অনেক লুপ্ত হইয়াছে। আমরা যথাসাধ্য মোটামুটি রকম আন্দাজে সংশোধন করিয়া দিলাম।

অশোকাকে নিয়ে রাজা যখন পরদিন রথে চ'ড়ে রাজ্যে ফিরে যান্ তখন মুনি মেয়ের শোকে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্লেন "মা অশোকা! রাজার হাতে তোমায় সম্প্রদান ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। এই অশোক ফুলের বীচিগুলি তোমার হাতে দিচ্ছি, তুমি যত দূর যাবে দুধারে এই বীজগুলি ছড়াতে ছড়াতে যেও। তোমার হাতের বীজ অক্ষয় অমর, পথের দুধারে গাছ হ'য়ে থাকবে। যদি কখনো শোক পাও মা,—ওই পথের চিহ্ন ধরে এই তপোবনে চ'লে এস।" বাপ্‌কে ছেড়ে যেতে অশোকারও খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু সংসার যে কি রকম জায়গা তা না জানায় বেচারা বাপের ঐ উপদেশের অর্থ তখন সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারলে না। তথাপি তাঁর কথা মত অশোকের বীজগুলি রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে সে রথে চড়ে রাজধানীতে প্রবেশ করলে।

সর্ব্বাপেক্ষা যে মহল উৎকৃষ্ট সেই মহলে রাজা অশোকাকে রাখ্‌লেন, দাসদাসী লোকজন সকলে অশোকার কাছে যোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে লাগ্‌ল। রাজা আগের স্ত্রীদের পানে ফিরেও চান্‌না, অশোকাকে নিয়েই তিনি অস্থির। প্রাণের চেয়ে ভালবাসায় আদরে তাকে ঘিরে রাখ্‌লেন। রাজার ভালবাসায় অশোকা আজন্মের বন-কুটীর ও বাপের কথা ভুলেই গেল একেবারে। কেবল রাজার আগের রাণীরা হিংসায় জরজর হ'তে লাগ্‌ল। কি করে' অশোকার সর্ব্বনাশ করা যায় এই চেষ্টায় তারা ঘুরতে লাগ্‌ল।

কিছু দিন পরে অশোকা গর্ভবতী হ'ল। সোনায় সোহাগা পড়্‌ল, রাজার আনন্দের ও অশোকার আদরের সীমা নাই। পেটে বিষ মুখে মধু রাজার রাণীরা এসে অশোকাকে এত আদর দেখাতে লাগ্‌ল যে অশোকা ভাব্‌ল এদের চেয়ে আপনার বুঝি আমার কেউ নয়। তারা একদিন বল্‌লে "অশোকা! লোকের যখন ছেলে হয় তখন সাতপুরু কাপড় চোখে বেঁধে 'ঘুল্‌ঘুলির' মধ্যে মুখ দিয়ে থাক্‌তে হয়; তোমারও তাই থাক্‌তে হবে।" অশোকা বল্‌লে "আচ্ছা।"

রাণীরা ধাত্রীদেরও বহু অর্থ দিয়ে হাত করে রেখেছিল। দামামার শব্দে সন্তান প্রসব হওয়ার সংবাদ পেয়ে রাজা সভা ছেড়ে আস্তে ব্যস্তে আস্‌তে আস্‌তে অৰ্দ্ধ পথে দামামা নীরব হ'তে শুন্‌লেন। চাকর বাকর দাসদাসী চারদিকে যেন কাঠের পুঁতুল, কারু মুখে কথা নেই। "কি হ'ল? দামামা থাম্‌ল কেন?"—জিজ্ঞাসা করতে করতে রাজা সূতিকা ঘরের দ্বারে এসে দেখেন ধাত্রীরা সব যেন আড়ষ্ট নির্ব্বাক, রাণীরা গালে হাত দিয়ে ব'সে, অশোকাও নির্ব্বাক, তার কাছে একটি কাঠের পুতুল প'ড়ে রয়েছে। রাজা "কি সন্তান হল" জিজ্ঞাসা করায় রাণীরা সেই কাঠের পুতুলটি হাতে করে রাজাকে দেখালে। কোন দেবতার কোপে এরকম হ'ল ভেবে রাজা মহা দুঃখিত ভাবে সভায় ফিরে গেলেন।

কিছুদিন পরে অশোকা আবার গর্ভবতী হ'ল। রাণীরা যথানিয়মে তার চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে 'ঘুল্‌ঘুলির' মধ্যে মুখ দিইয়ে প্রসব করালে। রাজা এসে দেখ্‌লেন সেবারেও রাণী অশোকা একটি কাঠের পুতুল প্রসব করেছে। দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে রাজা ভাব্‌লেন "এ কি!"

তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম প্রতিবারেই অশোকা একটি করে কাঠের পুতুল প্রসব করতে লাগ্‌লেন। সকলে বলে "ওমা একি! এতো কখনো শুনিনি!" রাণীরা মুখ টিপে টিপে হাসে। রাজার ক্রমশঃ অশোকার উপরে ঘৃণা জন্মাতে লাগ্‌ল। "বনে হ'তে একি অদ্ভুত কন্যা বিয়ে করে আন্‌লাম! মানুষের এরকম হয় কি?" ছ'বার, সেবারও তাই? রাজা বর্দ্ধিত ঘৃণায় বল্‌লেন "এবারেও যদি পুতুল প্রসব করে ত আর ওর মুখ দেখ্‌ব না।" অশোকা ভাল জানে না মন্দ জানে না কেবল অবাক হ'য়ে ভাবে "এমন কেন হয়?" সাত্‌বার, এবারও সেই কাঠের পুতুল। রাজা সরোষে বল্‌লেন "ওকে এখনি প্রাসাদ থেকে দূর করে দাও—আর যেন ওর মুখ না দেখ্‌তে হয়।" রাণীরা অশোকার মাথা মুড়িয়ে ন্যাক্‌ড়া পরিয়ে রাজবাড়ী হ'তে দূর করে দিলে। রাজার ঘোড়াশালার ঘেসেড়ার বৌ অশোকার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে তাদের কুঁড়ের একধারে অশোকাকে জায়গা দিল। অশোকা ঘোড়ার লিদ্ ফ্যালে আর ঘেসেড়ার বৌ যা দ্যায় তাই খেয়ে দিন কাটায়।

চৈত্র মাস। চারিদিকে অশোক ফুল ফুটে গাছ সব

লালে লাল হ'য়ে রয়েছে। ঘোড়ার "লিদ্" ফেল্‌তে ফেল্‌তে অশোকা একদিন তাই দেখে মনে ভাব্‌লে "আমার বাবা যে বলে দিয়েছিলেন, অশোকা যদি শোক পাও এই তপোবনে চলে এস! দেখিদিখি সে পথ চিনে যেতে পারি কিনা!" এই বলে রাস্তায় বেরিয়ে দেখে তার হাতের অক্ষয় অমর বীজে পথের দুধারে বড় বড় অশোক গাছ হ'য়ে ফুলে ভেঙ্গে পড়্‌ছে। সেই চিহ্ন দেখে দেখে অশোকা ক্রমে তার সেই ছোট' বেলাকার তপোবনে গিয়ে পৌঁছল।

বনের মধ্যে মুনির সেই কুটীর, তার একপাশ দিয়ে সেই ক্ষীরধারা ছোট নদী ব'য়ে যাচ্ছে, তার কূলে—অশোকা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল ছোট বেলায় ঠিক্ সে যেমন খেলা ক'রে বেড়াত তেমনি—একটি মেয়ে বনের মধ্যে খেলা কর্‌ছে, তার আশে পাশে ফুলের ধনুক হাতে চাঁদের কিরণে গড়া শান্ত কার্ত্তিকের মত ছটি ছেলে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। এরা এবনে কোথা হ'তে এল? অশোকা যত তাদের ভাখে তত কি এক নূতন আনন্দে তার চোখ্ দিয়ে জল ঝরতে থাকে, স্তনে ক্ষীরের ধারা ছুট্‌তে থাকে।

বনের মধ্যে কোথা হতে একটা স্থাড়া মাথা স্থাকড়া পরা মানুষ এসেছে দেখে বালক বালিকারা ভারি খুসি হ'য়ে একটা নতুন খেলা পাওয়া গেল ভেবে কেউ অশোকার গায়ে ধুলো দিতে লাগ্‌ল, কেউ হাত ধরে টানাটানি বাধিয়ে দিলে। তাদের সে খেলার সে স্পর্শে অশোকার শরীরে যেন অমৃতসিঞ্চন হ'তে লাগ্‌ল। অশোকা বিভোর হ'য়ে তাদের সে খেলায় আপনাকে মগ্ন করে দিলে।

মুনি তপোবলে সবই জান্‌তে পার্‌ছেন,—যথাসময়ে কুটীরের দ্বারে এসে ডাক্‌লেন "অশোকা!"—অশোকা "বাবা" বলে এসে বাপের পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ল। ছেলে মেয়েরা ত অবাক্—"দাদা তোমায় 'বাবা' বলে এ কে?"—"যার সম্পর্কে আমি তোদের দাদা সে-ই এ!—তোমাদের মা, আমার মেয়ে!" "সে কি দাদা! চিরদিন আমরা তোমায় মাত্র জানি, মা তো জানি না! ইনি কি ক'রে আমাদের মা হলেন?" মুনি তখন সমস্ত বলে শেষে বল্‌লেন "হিংসুক রাণীগুলো তোমাদের ছ'ভাই আর এক বোন্‌কে একে একে তামার কুণ্ডে ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আমি যেখানে তপস্যা করি সেইখানে কুণ্ডগুলি একে একে ভেসে ভেসে এসে লেগেছিল। তোমরা আমার অশোকার সন্তান, তোমাদের ত "ক্ষয় ব্যয়" নেই। যেমন করে তোমাদের মাকে মানুষ করেছিলাম তেমনি ক'রে ফুলের মধু খাইয়ে তোমাদেরও মানুষ করেছি।"—এই কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে মেয়েটী ছুটে গিয়ে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। বড় ছেলেটি মুখ ভার করে বল্‌লে "তবু আমরা একটু পরীক্ষা কর্‌তে চাই। নদীর ওপারে আমরা যাই, এপারে উনি থাকুন, যদি ওঁর স্তনের ধারা আমাদের মুখে গিয়ে পড়ে তবে বুঝ্‌ব উনি সত্যই আমাদের মা।"—ছেলেরা সব নদীর ওপারে, এপারে অশোকার স্তনের সপ্তছিদ্র থেকে সপ্তধারা বাণের মত গিয়ে সাত ছেলে মেয়ের ঠোঁটের ওপর পড়্‌ল। 'মা মা' কর্‌তে কর্‌তে তারা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে এপারে এসে অশোকার কোলে বুকে পিঠে জড়িয়ে ধর্‌লে।

কিছুদিন পরে বড় ছেলে বল্‌লে "যে রাজা এমন বোকা তাকে একটু শিক্ষা দিতেই হবে। দাদা তুমি আমাদের ছ'টা কাঠের ঘোড়ায় এমন মন্ত্র প'ড়ে দাও যাতে তারা খুব দৌড়তে পারে আর আমাদের আদেশ মত থামে!" মুনি "তথাস্তু" বলে সেই মন্ত্র কাঠের ঘোড়ায় প'ড়ে দিলেন। ছয় ছেলে তখন কাঠের ছয় ঘোড়া ছুটিয়ে রাজধানীর দিকে চ'লে গেল।

অন্দরের পুষ্করিণীতে রাণীরা স্নান কর্‌ছেন। ছয় ছেলে পাঁচীল টপ্‌কে সেই পুকুরের ধারে গিয়ে সেই কাঠের ঘোড়ার কান ধরে জলের কাছে টেনে এনে "কাঠের ঘোড়া কাঠের ঘুড়ী জল পি—পি—" বলে চেঁচাতে লাগ্‌ল—আর—কাঠের ঘোড়া জল না খাওয়ায় ঘোড়াগুলোর ওপর যেন খুব রেগে রেগে তাদের বেতের চাবুক দিয়ে খুব মারতে লাগ্‌ল। রাণীরা ছেলেগুলোর এই বোকামী দেখে হেসে বল্‌লে "ওরে নির্ব্বুদ্ধি ছেলেরা! কাঠের ঘোঁড়া কখনো জল খায়?" ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠ্‌ল "হ্যাঁরে নির্ব্বুদ্ধি মাগীরা! মানুষের পেটে

কখনো কাঠের ছেলে হয়?" এই বলে জল ছুঁড়ে রাণীদের তারা নাস্তানাবুদ্‌ করে দিলে।

মনের অগোচর ত পাপ নেই! রাণীরা এই কথা শুনে আর উচ্চবাচ্য না করে উঠে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেল। রাজার কাছে খবর গেল, ক'টি দেবপুত্রের মত ছেলে কোথা দিয়ে অন্দরের পুকুরে এসে বড় উৎপাত করছে। রাজা গিয়ে দেখ্‌লেন তারা তেমনি কাঠের ঘোড়াগুলোর উপর নির্য্যাতন করছে আর চেঁচাচ্চে "কাঠের ঘোড়া—কাঠের ঘুড়ী—জল পি-পি?" রাজা বল্‌লেন "নির্ব্বুদ্ধি ছেলেরা! কাঠের ঘোড়া কখন' জল খায়?" "নির্ব্বুদ্ধি রাজা! মানুষের পেটে কখনো কাঠের পুতুল হয়?" রাজা চম্‌কে উঠে—"বল তোমরা কে?" —বলে যেমন ছেলেদের ধরতে গেলেন ছেলেরা অমনি কাঠের ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তপোবনের দিকে দৌড়ল। রাজাও ঘোড়ায় চড়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লেন।

সেই তপোবন—সেই মুনির কুটীরের কাছে এসে রাজা অবাক্‌ হয়ে চারিদিকে চাইলেন। দেখেন নদীর ধারে রাণী অশোকা অশোক গাছতলায় বসে আছে, মেঘের মত এক ঢাল্‌ চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই দেবপুত্রের মত শিশুগুলি কেউ তার কোলে কেউ তার আশে পাশে খেলা করে বেড়াচ্ছে। কেউ অশোকফুলে মালা গেঁথে অশোকার চুলে পরিয়ে দিচ্চে, অশোকা আবার নিজের চুল থেকে খুলে তাদের মাথায় পরিয়ে দিয়ে কোলে নিয়ে চুমু খাচ্চেন। রাজা আছড়ে গিয়ে অশোকার পায়ের কাছে পড়্‌লেন "বল অশোকা এ ছেলে মেয়েগুলি কার? যদি না বল তো আমি তোমার পায়ে এখনি হত্যা হব!" অশোকা আস্তে ব্যস্তে রাজার হাত ধরে তুলে বল্‌লেন "তোমার ছেলে তোমার মেয়ে।" রাজা আস্তে আস্তে অশোকার পাশে বস্‌লেন। ছেলে মেয়েরা 'বাবা' বলে তাঁর কোলে উঠল। রাজা হর্ষে বিষাদে চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে রাণীর কাছে সব কাহিনী শুন্‌লেন।

সন্ধ্যার সময় মুনি তপস্যা করে ফিরে এলেন। রাজা আর লজ্জায় তাঁকে মুখ দেখাতে পারেলন না। মুনি তাঁকে তখন অভয় দিলেন। কেবল বল্‌লেন "বাপু এই জন্যেই আমার অশোকাকে রাজার হাতে দিতে চাইনি। তুমি তখন শুন্‌লে না বাপু! নিজেও কষ্ট পেলে তার চতুর্গুণ কষ্ট অশোকাকে দিলে।"

সকালে রাজা কারুকে কিছু না বলে রাজধানীতে গিয়ে সেই হিংসুক রাণীদের হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেল্লেন। তার পর হাতীঘোড়া রথ সাজিয়ে নিয়ে তপোবনে গিয়ে স্ত্রী আর ছেলে মেয়েদের রাজ্যে নিয়ে এসে সুখে রাজত্ব করতে লাগ্‌লেন।

কথা সমাপ্ত হইলে সকলে আবার দেবীকে প্রণাম করিলেন। দধির সহিত নবশস্য ও ছয়টি অশোক-কলি ভক্ষণ করিয়া জননীরা তখন বালকদের ষষ্ঠীর প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। অগ্রে তাহাদের মস্তকে প্রসাদী ফুল ও ললাটে তৈলহরিদ্রা লেপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করা হইল, শেষে মিষ্টান্ন ফল ও জলপান দেওয়ার ধুম পড়িয়া গেল। শুধু বালক বালিকা বলিয়া নয় আচণ্ডাল সাধারণ সেখানে যে যে উপস্থিত ছিল সকলের কোঁচড়ে ষষ্ঠীর জলপান প্রসূতিরা নিজ হস্তে বিতরণ করিতে লাগিলেন। ছড়াভরা কলা, পান সুপারী ইত্যাদি ষষ্ঠীর দ্রব্য প্রসূতিরা অখণ্ড পোয়াতির—অর্থাৎ যাঁর একটি সন্তানও নষ্ট হয় নাই,—অভাবপক্ষে যাঁর প্রথম সন্তান বাঁচিয়া আছে এমন পোয়াতির—কোঁচড়ে দিলেন। ভারে ভারে দ্রব্য পুরোহিত-বাড়ী চলিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে মাতারা ষষ্ঠীতলায় পালুনি করিয়া অশোক ষষ্ঠীপূজা শেষ করিয়া হাতে কোলে ছেলে লইয়া হুলুধ্বনি দিতে দিতে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

জগৎ-স্বামী

ভেবেছিনু, এই জগতের পারে গিয়ে আমি
তোমার সনে মিল্‌ব বুঝি হে জগৎ-স্বামী।
ভেবেছিনু তোমার রূপে তোমার ধূপে মোরে
করায় বুঝি যোঝাযুঝি কেবল মায়া-ঘোরে,
দূর বিজনে আপন মনে স্তব্ধ তুমি রও,
আমার দুখে আমার সুখে কথাটি না কও।

কেমন করে সেই সুদূরে যাব তোমার পাশ,
কেমন করে ফেলব দূরে এ জীবনের আশ,
কেমন করে জগৎটিরে করব একাকার,
রূপের পুরী শূন্য করি আনব অন্ধকার,
আপন জোরে কেমন করে করব এরে লয়,
এইটি ভেবে চিত্ত আমার ক্ষিপ্ত পারা হয়।
টানাটানি হানাহানি করনু বহুক্ষণ,
ঘোর বিপাকে "আমিটাকে" দিনু বিসর্জ্জন।
"আমির" শেষে নূতন বেশে তুমিই দেখা দাও
আঁধার মাঝে আলোক হয়ে আনন্দ জাগাও।

শ্রীহেমলতা দেবী।

নির্ব্বাণ

শাক্যসিংহের ধর্ম্ম।

অনন্ত, অশেষ তরঙ্গ-ভঙ্গীময় ভবসাগরের অমৃতকূলে বসিয়া, জীবকে নিরন্তর জরা, মৃত্যু, রোগ, শোকের বিষময় জ্বালাতে জর্জ্জরিত দেখিয়া, যে ক্ষত্র-হৃদয়, স্নেহ ও সহানুভূতির অসীম গুণে, প্রস্তরবৎ দৃঢ়তা ধারণ পূর্ব্বক, বোধিতরুমূলে, অনন্ত ধ্যানে আত্মহারা হইয়া, জীবন মরণের গূঢ় তত্ত্বের শেষ মীমাংসা নির্দ্দেশ করিয়া, জগতে মানবপ্রতিভা-বিকাশের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, সে দেবগণেরও সুদুর্লভ হৃদয়ের শোভার নিকট সহস্র তারকার জ্যোতিও লজ্জিত! আমার এ ক্ষুদ্র লেখনী ও ক্ষুদ্রতর মন, সে হৃদয়ের অনুপম প্রতিভার অজস্র স্ফূর্ত্তি বর্ণন করিতে অক্ষম।

নির্ব্বাণ শব্দটী অতি সুন্দর রূপে শাক্যসিংহের ধর্ম্মকে ব্যক্ত করে।

অমর সিংহ নির্ব্বাণের প্রতিশব্দ "মুক্তিঃ" বলিয়াছেন। হেমচন্দ্র "বিশ্রান্তিঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নির্ব্বাণং —অস্তগমনম্।"—ইতি মেদিনী। বৌদ্ধগণ বলেন,— "নির্ব্বাণং পরমং সুখম্।"

যদি কোন একটি শব্দ সুন্দর ভাবে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম কি বুঝাইতে সক্ষম হয়, তবে উহা এই "নির্ব্বাণ"।

বুদ্ধমূর্ত্তি।
(জাপানের কামাকুরা নামক স্থানে অবস্থিত।)

আর একটী শব্দও কথঞ্চিৎ ঐ ধর্ম্ম ব্যক্ত করে, সেটী—"অ-হিংসা।"

অজ্ঞ জনেরা বলেন, নির্ব্বাণ মানে দীপ-নির্ব্বাণের মত আত্মার নির্ব্বাণ। তাহা নহে। জীবন মরণে পরিণত হওয়া নির্ব্বাণ নহে। জীবনের সমাপ্তিই নির্ব্বাণ, যাঁহারা বলেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত।

নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ দুঃখের নির্ব্বাণ, অ-শান্তি-নাশ, পূর্ণ সুখোদয়,—দুঃখের চির-সমাধি।

গীতা,—"শান্তিং নির্ব্বাণপরমাম্।" ৬।১৫।

"নির্ব্বাণ,—ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যের মূল। নির্ব্বাণ,—ধর্ম্মের শোভা।"—মিলিন্দ প্রশ্ন। ৪,৮,৭০,৭৪।

কবিকুলশ্রেষ্ঠ মিল্‌টনের ভাষাতে বলা যায়,—

"আহা! কিবা মনোহর দিব্য নির্ব্বাণ!
নহে শুষ্ক কঠোর, যথা মূর্খেরা করে জ্ঞান।
য়্যাপলো-তান-সম মধুর,
অমৃত-রসে সদা ভরপুর।"—কোমস্। ৪৭৫-৪৭৮।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন," এই বজ্রপ্রতিজ্ঞা লইয়া, ছয় বৎসর ক্রমাগত যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, যোগেশ্বর মহাদেব শাক্য সিংহ ভাবিয়া দেখিলেন, দুঃখের মূলে বাসনা। বাসনা হইতে কর্ম্ম। কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম-ফল। কর্ম্মফল হইতে দুঃখ। দুঃখ নিবারণ করিতে হইলে, কর্ম্মফল নাশ চাই। কর্ম্মফল নাশ করিতে হইলে, কর্ম্মত্যাগ প্রয়োজন। কর্ম্মত্যাগ কি প্রকারে হইবে, যদি বাসনা ত্যাগ না করা যায়? তাই ত্যাগ,—সন্ন্যাস,—বাসনা-বর্জ্জনই, "দুঃখহা," সুখদ নির্ব্বাণ লাভের এক মাত্র উপায়।

তিনি সমুদায় জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য,—জগতের সুখ বিধানের জন্য, সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন,—নিজের সুখ বা মুক্তির জন্য,—স্বার্থপরতার বশে, সংসার-ত্যাগ করেন নাই।

বুদ্ধের সাধন-প্রণালীকে "প্রাণায়াম" না বলিয়া "বাসনায়াম" বলা যায়।

তথাগত সারিপুত্তকে বলিয়াছিলেন,—"হে বন্ধু সারিপুত্ত! সকলে নিব্বাণ নিব্বাণ বলে। নিব্বাণ কি? লোভের নাশ,—ঘৃণার নাশ,—মায়ার নাশ। ইহাই, হে বন্ধু! নির্ব্বাণ!"

উপনিষদে অনেক স্থলে নির্ব্বাণ শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায়। একই অর্থ। কাম ক্রোধাদিই আমাদের দুঃখের বীজকারণ। জিতেন্দ্রিয় হইলেই, সম্যক জ্ঞান ও সুখ। যোগতত্ত্বোপনিষৎ,—"নির্ব্বাণং কুম্ভকং বিদুঃ।"—১৩। মুক্তিকোপনিষৎ,—"চূড়ানির্ব্বাণমণ্ডলম্।"—১।১৪। আরুণেয়োপনিষৎ,—"এবং নির্ব্বাণানুশাসনম্ বেদানুশাসনং। তন্নির্ব্বাণমনুশাসনম্।"—৫

উপনিষদ্-গাভি দোহন পূর্ব্বক,—ঋক্-দোহনকারী গোপাল-নন্দন উপদেশ করিয়াছেন,—

"কামক্রোধবিমুক্তানাম্ যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥"—গীতা।৫।২৬।

পুনরায় অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"—গীতা।৬।১৬-১৭।

এই যোগ ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ যে প্রণালীতে লভ্য, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণও সেই পথেই লভ্য। একই বস্তু,—একই লাভের উপায়।

মিলিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নির্ব্বাণের স্থান আছে কি?"

শাক্যসিংহ,—"হে রাজন্! নির্ব্বাণের স্থান নাই। অথচ নির্ব্বাণ আছে। যেমন অগ্নি আছে, অথচ উহার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই,—দুইটী কাষ্ঠখণ্ডে ঘর্ষণ করিলেই, অগ্নি দেখা দেন।"

মিলিন্দ,—"কোন দাঁড়াইবার স্থান নাই কি, যেখান হইতে নির্ব্বাণ দেখা যায়?"

তথাগত,—"হে রাজন্! আছে বই কি! সে স্থান সাধুতা!"

দূরদৃষ্টি লাভ করিতে হইলে, যেমন উচ্চ স্থানে আরোহণ করিতে হয়, তেমনি নির্ব্বাণের দর্শনলাভ করিতে হইলে ধর্ম্মশৈলের শিখর-দেশে আরোহণ করিতে হয়।

অহিংসাধর্ম্মপরায়ণ, ত্যক্ত-অসি ক্ষত্র-বীর শাক্যসিংহ বলিয়াছেন,—"হে ভিক্ষু! আমরা যুদ্ধ করি বলিয়াই আমরা ক্ষত্রিয়।"

ভিক্ষু,—"কিসের যুদ্ধ, মহাপ্রভু?"

দলবল,—"ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা,—উচ্চ লক্ষ্য,—চরম জ্ঞানের জন্য, সংগ্রাম করি বলিয়া, আমরা আমাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দি। আমরা বাসনার সঙ্গে,—কামাদির সঙ্গে যুদ্ধ করি।"

"পবিত্র হৃদয়,—বাসনা ও বাধাশূন্য হৃদয়ই নির্ব্বাণ দর্শন করে।"

ভিক্ষু—"নির্ব্বাণ কি প্রকারে জানা যাইবে?"

বুদ্ধ,—"অভাব ও দুঃখের অন্তর্ধান হইতে,—শান্তি,—নীরবতা,—পবিত্রতা হইতে।"

মহর্ষি ঈশাও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—"ধন্য পবিত্রহৃদয় যাহাদের! কারণ, তাহারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।"—মেথিউ।৫।৮।

পরা শান্তি কি প্রকারে সম্ভব হইবে? ধ্যানের দ্বারা,—চতুরঙ্গ ধ্যানের দ্বারা।

সুত্ত পিটক হইতে দেখা যায় যে, ধ্যানের আনন্দ বৌদ্ধধর্ম্মের যেমন অঙ্গীভূত, এমন আর কোন ধর্ম্মেরই নহে।

ধ্যান কি? প্রত্যহ, অনেকবার আত্মপরীক্ষা। এলো-মেলো চিন্তা নহে,—কেবল চুপ্ করিয়া বসিয়া, আমি কি,—কেমন,—কোথা হইতে আসিয়াছি,—কোথায় ফিরিয়া যাইব,—কেন আসিয়াছি,—কি কাজ হওয়া উচিত ছিল,—কি কাজ হইল, এই সমুদায় ও এই প্রকার বিষয় স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা। ধ্যান মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা,—চিন্তা,—চিন্তা,—চিন্তা বই ধ্যান আর কিছুই নহে।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ভৃগুবল্লী নামক তৃতীয় বল্লীতে আছে,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,—যেন জাতানি জীবন্তি,—যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব।"—প্রথম অনুবাক।১ শ্লোক।

মনঃস্থির পূর্ব্বক এই মনেতেই জিজ্ঞাসার নাম ধ্যান।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় ধর্ম্মবীর শ্রীচৈতন্য দেব, প্রাবৃট্‌কালীন গম্ভীর শোভায় মণ্ডিত বুদ্ধগয়ার মনোহারিত্ব সন্দর্শন করিয়া, শাক্যসিংহের সেই মহাপ্রেম ও মহাভাবের কণামাত্র হৃদয়ে লাভ করিয়া, গদ্গদশ্রুলোচনে জাহ্নবী-তীরে "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন" মন্ত্র জপিতে জপিতে, অবসন্নতনু হইয়া পড়িতেন এবং বুদ্ধের সেই অনন্ত-মাধুরী-পূর্ণ প্রেম ও দয়ার অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, পুণ্যবতী বঙ্গভূমিকে বর্ষাকালীন স্ফীতবক্ষা, পূতসলিলা জাহ্নবী-ধারার ন্যায় প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন,—

"উপজিল প্রেমবন্যা, চৌদিকে বাড়য়।
জীবজন্তু কীট আদি সকলে ডুবায়।"

চৈতন্যদেবও উপদেশ করিয়াছেন,—

"ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরিবে অন্তরে।"

এই ভাবনাই ধ্যান।

শাক্যসিংহ যে অষ্টাঙ্গ ধ্যান সাধন উপদেশ করিয়াছেন, তাহা এই:—

(১) সম্যক দৃষ্টি। (২) সম্যক সংকল্প। (৩) সম্যক বাক্য। (৪) সম্যক কর্ম্মান্ত। (৫) সম্যক ব্যায়াম। (৬) সম্যক জ্ঞান। (৭) সম্যক স্মৃতি। (৮) সম্যক সমাধি।

সম্যক অর্থাৎ ঠিক। ইংরাজিতে যাহাকে Right বলে,—অর্থাৎ যাহা হওয়া উচিত, তেমনি। অঠিক হইতে ঠিকে পৌছিলে,—অসত্য হইতে সত্যেতে উপনীত হইলে বা উপনীত হইবার চেষ্টা করিলে, যেমন ঠিক বুঝা যায়, করা যায়, জানা যায়, তাহারই নাম, সম্যক। পাতঞ্জলি-দর্শনেও সাধনের অষ্টাঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিদ্ধার্থের ধ্যান চতুষ্টয়ের এই এই ক্রম,—

(১) সমাধির প্রথমাবস্থায় তত্ত্বপ্রকাশ, সত্য কি, অসত্য কি, মনে এই প্রকার চিন্তার উদয়।

(২) চিত্ত বহু হইতে এক বিষয়ে, ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে উপনীত হয়।

(৩) তৃতীয় সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়। জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ বিরাগ, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ বিপদ, নিত্য অনিত্য, এই সমুদয় বোধ জন্মে। তাহার ফল মনের বৈরাগ্য।

(৪) চতুর্থ সমাধিতে আত্মার মরণ দূর ও অমৃত লাভ হয়। অহং ভাব বিদূরিত হয়, অ-মৃত, নির্ব্বাণ লাভ হয়।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়া বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদেও, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ী দেবীকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো। মৈত্রেয়্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"—৪।৫।৬।

চিন্তা করা, ভাবিয়া দেখা, বুঝা, ইহা ভিন্ন অমৃত-লাভের,—নির্ব্বাণ লাভের আর অন্য পথ নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।৩।৮।

চিন্তা, ভাবনাই, মুক্তি ও নির্ব্বাণ লাভের দিব্য রাজকীয় পথ।

এই প্রকারে, চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলে, বৌদ্ধ সাধক বুঝিবেন,—"ইহাই দুঃখ। ইহাই দুঃখের কারণ। ইহাই দুঃখের নাশ,—দুঃখের সমাধি,—দুঃখের নির্ব্বাণ। ইহাই দুঃখনাশের পথ ও সুখলাভের উপায়।" ইহাই নির্ব্বাণ,—দর্শন!

মন,—হৃদয়,—আত্মা, যেই, বাসনা-শূন্য হয়, অমনি উহা বেলুন-যোগে,—প্যারাসুট্ ধরিয়া,—চিদাকাশে উঠিল। ধ্যান চিত্তের ব্যোম-যান,—এয়ারো-প্লেন্,—মনো-প্লেন্। উহা সংসারী মানবের, ইন্দ্রিয়-সুখের ছাই-ভস্ম চিন্তার ময়লার সগড়-গাড়ি নহে।

এই দেহটাকে লইয়া, আমরা কতই অহঙ্কারে ব্যস্ত।

"আমি,—আমি,—আমি কর্ত্তা,"—ইত্যাদি লইয়াই আমি ব্যস্ত। এই "আমি, আমি," ও আমার বাসনা,—সুখ-চিন্তা ও চেষ্টা দূর হইলেই, দুঃখ দূর হইল,—লেঠা মিটিয়া গেল,—আমি বাঁচিলাম,—আমি অমর হইলাম।

"এই দেহটা আমি নহি," ইহা বুঝিলেই অমৃত-লাভের পথ আবিষ্কৃত হইল।

এই দেহাত্মবোধ দূর হইলেই, নির্ব্বাণের অমৃত-মন্দির, অমৃতধাম,—অমৃত নগর নয়নগোচর হইল।

এই জ্ঞান হইতেই নিস্যন্দিত সেই ভক্তিধারা, যাহাকে ভাগবৎ "অমৃত স্বরূপা চ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আমি দেহ নহি" বুঝিলেই বুঝিলাম, আমি মৃত্যুর অতীত,—আমি অ-মর,—অ-মৃতের সন্তান,—অ-মৃত,—Not-dead, Not-mortal, immortal! "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।—২১৫।

"এই দেহই 'আমি' এই বুদ্ধি সম্যক দূর হইলেই, আমি দেহ হইতে মুক্ত হইলাম। তখন সিদ্ধার্থের সহিত "আমি" দেখি যে, "আমি মুক্ত। আমি বাসনার মোহ হইতে মুক্ত, জীবনের মায়া হইতে মুক্ত। তখন, আর, জন্মের পর জন্ম,—জন্ম জন্মান্তর নাই।"

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—

"পূর্ণ-জ্ঞান-মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, আর এই জীবনের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হয় না।"

দীপের তৈল ফুরাইলে, যেমন দীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায়,—তেমনি, প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, আর পৃথক জীবনের আবশ্যকতা কোথায়? ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড যেমন বারিবর্ষণ করিয়া অন্তর্ধান করে, তেমনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইলে, জীব সংসার হইতে অপসৃত হয়। আর কেন?

বীতশোক নামক বৌদ্ধ বলিয়াছেন,—

"যিনি সকল বিষয়ের ভোগ-বাসনা হইতে নিজের হৃদয়কে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই মরলোক নিত্য-আনন্দ-উৎসব।"

ভোজবাজি, বা সাপ খেলান দেখিতে রাজবর্ত্মে বহু-লোক-সংঘট্ট হয়, কিন্তু তামাসা শেষ হইলে বা বুঝা গেলে, সকলেই আপন আপন স্থানে চলিয়া যায়, তেমনিই, কর্ম্মফল-সমূহ এই পঞ্চ খণ্ডরূপে, "আমি" হইয়া উপস্থিত। বাজি ফুরাইল,—বাজনা থামিল,—"আমিও" লোপ পাইলাম, "আমি" সমাপ্ত।

এই দেহে থাকিতে থাকিতেই যে বাসনা-মুক্তি, তাহারই নাম নির্ব্বাণ। এই দেহ ত্যাগ হইলে যে মুক্তি, তাহার নাম, পরি-নির্ব্বাণ।

নির্ব্বাণ মানে জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধি। লক্ষ্য সিদ্ধ হইলেই জীবনের শেষ। আর প্রয়োজন কি? শেষ বা মুক্তি, এই দেহে থাকিতে থাকিতে ঘটিলেই, তাহাকে নির্ব্বাণ বলে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন,—

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।"—৪।২।

—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কাম্য বস্তুর অনুসরণ করে ও চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্তপাশ মৃত্যুর মধ্যে পতিত হয়,—ধীর চিন্তাশীল ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ অমৃতকে জানিয়া, অনিত্য কাম্য বস্তুর বাসনা করেন না। ইহাকেই বলি বাসনা ত্যাগ,—নির্ব্বাণ!

এই দেহ থাকিতে থাকিতেই জীব এই নির্ব্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। উপনিষদেও এই সত্যের সাক্ষ্য রহিয়াছে। যথা, অথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষদে,—

"এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥" ২।১।১০।

হে সৌম্য! যিনি এই আত্মাকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন, তিনি এইখানে থাকিতে থাকিতেই অবিদ্যাগ্রন্থি বিক্ষিপ্ত করেন।

কঠ বলিতেছেন,—

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥ ৬।১৫।

—ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হইলে, এই মৃত্যুই অমৃত,—অমর হয়। ইহা সর্ব্ব বেদান্তেরই উপদেশ।

কেবল যে একজনই সেই নির্ব্বাণ লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। যিনি নচিকেতার ন্যায়,—শাক্যসিংহের ন্যায়, এই আত্ম-তত্ত্ব আয়ত্ত করিবেন, তিনিই এই নির্ব্বাণ, অ-মৃত,—শিবত্ব,—মঙ্গল,—অশেষ কল্যাণ লাভ করিবেন,—বুদ্ধ,—সম্বোধিত হইবেন!

কঠোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেবম্॥" ৬।১৮।

বুদ্ধের মুক্তির পথ পাপশূন্যতা। সুখ ও শান্তির এক-মাত্র উপায়, হৃদয় মনের পূর্ণ পবিত্রতা ও চরিত্রের প্রত্যেক কার্য্যের বিশুদ্ধতা।

অতাঙ্গলু-বংশে আছে,—"সাধুতা ব্যতিরেকে সুখ নাই।"—২১৪।

"সাধুই সুখী,—ধর্ম্মাত্মাই সুখী।"—ধর্ম্মপদ। ৫। ১৮।

মহাবগ্‌গে মহাপ্রভু শাক্যসিংহ বলিয়াছেন,—

"হে ভিক্ষুগণ! সকলই জ্বালাময়। কিসের অগ্নিতে জ্বলিতেছে? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, লোভের অগ্নিতে জ্বলিতেছে,—ক্রোধের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে, মোহের শিখায় দগ্ধ হইতেছে।"—১।২১।২।

সম্মুক্ত নিকায়োতে, তথাগত কোশলরাজকে বলিয়াছেন,—

"পাপের মূল তিনটী,—হানি, ক্লেশ ও দুঃখের কারণ তিনটী,—লোভো (লোভ),—দোষো (ক্রোধ),—মোহো (মায়া)।"—১।৩।৩।২-৬।

কর্ম্মের কুফল হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, বাসনা বর্জ্জন, কামাদি ইচ্ছা দমন ভিন্ন অন্য উপায় নাই; কার্য্যের কারণ বাসনা। বাসনা না থাকিলে, কর্ম্মের বৃক্ষ কোথায়? বৃক্ষ না থাকিলে ফল কোথায়?

শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ-আচরিত সাধন-প্রণালীর ব্যর্থতা পরীক্ষা করিয়া, আত্মপরীক্ষা ও ধ্যান রূপ আত্মানুশীলন মার্গ অবলম্বন করেন।

বুদ্ধের পথ "মাঝামাঝি"। কোন প্রকারের বাড়াবাড়ির দিকে চলিলে, সিদ্ধি বা মঙ্গল লাভ হয় না, ইহাই তাঁহার মত। গ্রীক্‌ দার্শনিকগণের ইহাই "সুবর্ণময় মধ্যপথ।" ইহাই গীতার যুক্তাহারাদির পথ।

শাক্যমুনি সংসার ও বৈরাগ্যের মধ্যপথকে ধর্ম্মের পথ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসার করিলেই চলিবে না,—সংসার ত্যাগ করিলেও চলিবে না,—সংসারে থাকিয়াই, নিজ-সুখ-কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার মত।

এমন গৃহী সন্ন্যাসী হ'তে হবে,
যে সব সন্ন্যাসী হার্ মেনে যাবে।

ইহাই বুদ্ধের সুগৃহীর আদর্শ।

বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী পুরাণাদিতেও এই আদর্শ। "যুক্তাহার, যুক্তবিহার, যুক্তনিদ্রা, যুক্তচেষ্টা, যুক্তকর্ম্ম, যুক্তস্বপ্ন, যুক্তজাগরণ," ইত্যাদি ও নির্লিপ্ত হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করার ভাব, এই বৌদ্ধ মার্গেরই অনুগমন।

উপনিষদিক কালেও রাজর্ষি জনক, রাজর্ষি প্রবাহণ, রাজর্ষি অজাতশত্রু প্রভৃতি ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি এই সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনেরই দৃষ্টান্ত।

হে সন্ন্যাসী ভ্রাতঃ!! স্থান ত্যাগ করিতে পার, মনকে ত্যাগ করিতে পার কই? "টুটত টুটত, সব টুট্ গই। ন টুটল মন্‌কি চাহা।"

শাক্যসিংহ বলিয়াছেন,—"সন্ন্যাসী হইলেও হয় না,—গৃহী হইলেও হয় না। নির্ব্বাণের পথে থাকিয়া গৃহী হইলেও হয়,—সন্ন্যাসী হইলেও হয়।" চাই কি? কৌপীন গ্রহণ বা ত্যাগ নহে,—"মনেতে দিয়ে ডোর কপিন, হ'তে হবে দীনের অধীন।"

বুদ্ধ এই শিক্ষা দেন যে,—আত্মজ্ঞান ও আত্মানুশীলন দ্বারা নিজের আত্মাকে শোকানুভবের অতীত করিতে হইবে,—নিজের হৃদয়কে বাসনা-শূন্য,—Vacuum-brake করিতে হইবে,—যেন সংসারের ধাক্কা ও চোট্ লাগিলেও, মর্ম্মস্থানে আঘাত না পৌঁছে!

দুঃখ আমাকে অভিভূত করিতে না পারিলেই তো আমি দুঃখের অতীত,—দুঃখের উপর হইলাম। হাঁ! জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, দারিদ্র্য আছে, জানি। তাহারা আমার পদতলে,—আমি তাহাদের হাতের মুঠোয় নহি,—তাহা হইলেই তো দুঃখের অভাব ও সুখের ভাব হইল!

"প্রভু, দুঃখে সুখানুভব করিতেন।"—ললিতবিস্তর। ১৩ অধ্যায়।

"অশেষ দুঃখের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে," ইহাই বুদ্ধের উপদেশ।—জাতক-ভূমিকা।

ইতিহাস, পুরাণ ও কাব্যে, বীর ও বীরাঙ্গনা এবং অবতারগণ চিরদিনই অশেষ ক্লেশ ভোগের মধ্য দিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন দেখা যায়। বাবর, আর্থার; রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা; যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী এবং অন্য পাণ্ডবগণ; নল, দময়ন্তী; সাবিত্রী, সত্যবান; দৈবকী, বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ; ভীষ্ম প্রভৃতি, অশেষ দুঃখ যাতনা হৃদয়ে বহিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তির যোগ্য হইয়াছেন।

দুঃখবিপদের সহিত কোস্তাকুস্তি না করিলে, স্নায়ু স্ফীত হইয়া উঠে না,—দেহ মনে বলসঞ্চয় হয় না। "গেড়্‌তে পড়্‌তে হাজার মেহন্নৎমে" কুস্তিগীর হওয়া যায়। শরীরের,—হৃদয়, মন, ও আত্মার বলের বৃদ্ধির জন্য, সংগ্রাম ও ব্যায়াম প্রয়োজন। ননীর পুতুল কখনও সংগ্রামে বিজয়ী হয় নাই। কালীয় নাগকে দমন করিয়া,

শ্রীকৃষ্ণ অবতারত্ব লাভ করেন। রাবণকে নাশ করিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ অবতার মধ্যে গণ্য হন্। পাইথনকে গলা টিপিয়া মারিয়া, শিশু হারকিউলিস্ বীরাগ্রগণ্য হন্। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত হইয়া, লম্পট, শঠ ও ধনাঢ্য ব্যক্তি কখনও ইতিহাসে ও প্রস্তরফলকে নামাঙ্কিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

শাক্যসিংহ সংসারটাকে রঙ্গিন-ঠুলি-পরা চক্ষে কেবলই আনন্দধামরূপে সন্দর্শন করিয়া, বিধাতার বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতায় অশ্রুপাত করেন নাই।

তিনি চক্ষুষ্মান ছিলেন,—দেখিলেন, জীবকুলের অশেষ দুঃখ। তিনি দেখিলেন,—(১) বার্দ্ধক্য, (২) রোগ, (৩) মৃত্যু ও হাহাকার এবং (৪) সন্ন্যাসী। আর বুঝিতে কিছু বাকি থাকিল না। সারথি ছন্দককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সব কি হে?" সারথি দেখিল, রাজপুত্র সংসারের কিছুই দেখেন নাই, জানেন না,—তাই বুঝাইয়া বলিল,—"প্রভু! দেহীর ইহাই সাধারণ গতি।"

অমনি, সেই শাক্য বীরের চিদাকাশে বিজলি চমকিয়া উঠিল! সিদ্ধার্থ বুঝিলেন! আর বুঝিতে বাকি রহিল না।

যে দিন শাক্যসিংহ বাসনার নির্ব্বাণ কামনায় এবং জরা মৃত্যু প্রভৃতির গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি লাভেচ্ছায় পতিপ্রাণা গোপাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রাজৈশ্বর্য্যে নিস্পৃহ হইয়া, মুক্ত অনাদি গগনতলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং মনোরাজ্যের অন্তরতম প্রদেশে, আত্মার নির্জ্জনতম কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক জ্ঞান ও প্রেমযোগে উপবিষ্ট হইয়া, গভীর সমাধিসাগরে নিমগ্ন হইলেন, সেই শুভ দিনে, ভারত-সমাজ-গর্ভে এক অলৌকিক প্রেমরূপ শক্তিবীজের সঞ্চার হইয়াছিল। ভারতের ভাগ্যে কখনও সে দিন আইসে নাই, ভবিষ্যতে যে আর শীঘ্র তাহা আসিবে, তাহার কোনও লক্ষণ বা আশা বিদ্যমান নাই।

সেই দিন মহাপ্রলয়ের মেঘাবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া, ভারতাকাশে বিদ্যুল্লতা চমকিয়া উঠিয়াছিল এবং বজ্রহাস্যে সমগ্র প্রাণিজগৎকে জানাইয়াছিল যে, "তোমরা আর হাহাকার করিও না। প্রভু বুদ্ধশরীর প্রেম মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অচিরেই নির্ব্বাণ ও অহিংসা ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে এবং তোমাদিগের শোক তাপের জ্বালার নির্ব্বাণ হইবে।"

আকাশের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত, এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত, এই ধ্বনি ও ইহার প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সম্বোধিত শাক্যসিংহ এই গ্রীষ্ম-প্রধানদেশে যে স্নেহময়ী প্রেমলতিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই নিত্য-নব-কুসুমিতা প্রেমবল্লরীর সুখদা ছায়াতে, আজ কতই অগণ্য নরনারী ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছেন! সেই অপূর্ব্ব প্রেমবল্লরীর পল্লব এবং উপপল্লবের শীতল আশ্রয়ে "চীন হইতে পেরু" পর্য্যন্ত সমুদয় মানব আজ কতই সুখে বিশ্রাম করিতেছেন!

শাক্য মুনি নিজের স্বার্থের জন্য,—সিদ্ধির জন্য, গৃহ, রাজ্য, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, সুখ সম্পদ ত্যাগ করেন নাই। কেন করিয়াছিলেন শুনিবে কি? জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য!

"অন্যের, অপরের হিতসাধনের নিমিত্ত, তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে গিয়াছিলেন।"—ফো-পেন্-হিং-টাই-কিং।২৪।

তিনি অঙ্ক কসিয়া, গণিত শিখাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজকগণের ন্যায়, না জানিয়া ব্রহ্মকে জানাইতে জ্ঞান নাই,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ," এমন পদার্থকে প্রকাশ করিবার বৃথা আয়াস করেন নাই। তিনি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ন্যায়, সত্যকে দেখাইয়া দিয়া,—যাহা দর্শাইবার দর্শাইলাম, বলিয়া প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত করেন, এবং যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিলাম, বলিয়া প্রতিজ্ঞার বিষয় প্রকট করেন। তিনি "যাহা বলিতেন, তাহা নিজেই আচরণ করিতেন।"—বংশসুত্ত। ৫।১৫।

তিনি ভাবিয়া, ভাবিয়া, ভাবিয়া, সত্যের খোঁজ পাইলেন। তিনি সত্যকে দেখিয়া, বুঝিয়া, জানিয়া, আয়ত্ত করিয়া, সাধন করিয়া, সত্য প্রচার করিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম হইল তথাগত।

তথাগত শব্দের অর্থ তথ্যে উপনীত, সত্যে যিনি উপনীত। তথাগত বলিয়াছেন,—

"'আমি' অন্তর্দ্ধান করিয়াছি এবং সত্য আমার মধ্যে বাস করিতেছেন।"—ব্রহ্মজালসুত্ত।

"আমি ভবনদীর পারে আসিয়াছি, বলিয়াই, অপরকে স্রোতে পার হইবার সাহায্য করি।

আমি মুক্তি লাভ করিয়াছি বলিয়াই, অপরকে মুক্তিদান করিতে পারি। সান্ত্বনা পাইয়াছি বলিয়াই, অপরকে সান্ত্বনা দিতে পারি এবং নিরাপদ স্থান নির্দেশ করি।

"আমি, সংসারের মুক্তির জন্য, সত্যের রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

"আমি সত্যের ধ্যান করি। আমি সত্যের সাধন করি। আমি সত্যের কথা কহি। আমি সদাই সত্যের বিষয় চিন্তা করি। আমি স্বয়ং সত্য হইয়াছি। আমি সত্য।" ৪২ সুত্ত।

"সত্যের আনন্দ ও সত্যের অমৃত, মানসিক জীবন অনুসন্ধান কর। সত্য প্রকাশ হইলে, 'আমি' অন্তর্ধান করে। সত্যেতেই নিত্য জীবিত থাকিবে।

"স্বার্থই মৃত্যু। সত্যই জীবন। আমিত্বে ও স্বার্থে জড়িত থাকাই নিত্য মৃত্যু। সত্যে জীবিত থাকাই নির্ব্বাণ সম্ভোগ বা অমর জীবন।

"উপদেশসমূহ পালন যেখানে, নির্ব্বাণ সেখানে।

"আমিত্বেই মরণ। সত্যেই জীবন।"—হার্ডির ম্যেমুয়েল।

"হে সিংহ। আত্মনাশের জন্য আত্মদমন শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। উহা আত্মরক্ষারই নিমিত্ত ব্যাখ্যাত হইল।

"হে সিংহ। বিজয়ী সেনাপতি অতি মহৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মজয়ী যিনি, তিনি আরও বড় বীর।

"হে সিংহ। আমি অহঙ্কার নাশ প্রচার করি,—কাম নাশ,—তৃষ্ণা নাশ,—মায়া নাশ।"—মহাবগ্‌গ।

"বাসনাই পাপের, দুঃখের মূল। বাসনা-মুক্তিই মঙ্গলের হেতু। এই অষ্টাঙ্গ পথই দুঃখহা।"—নিউমানের পালিগ্রন্থ।

এই দুঃখহা পরম সত্য অবগত হইয়াই সিদ্ধার্থ, বুদ্ধ, তথাগত, ধর্ম্মরাজা, মহাদেব, দলবল, প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সত্য লাভ করিলে, রিপুগণ লুপ্ত হয়। "যেখানে কামাদি রিপু বর্ত্তমান, তথায় সত্য থাকিতে পারে না।"—ফো শো-হিং-সাং-কিং।

সত্য জানা হইলেই, সে জ্ঞান মানুষকে আর পশু সাজিয়া কামাদির সেবায় রত থাকিতে দেয় না। সত্য মানবকে কামাদির বশ্যতা হইতে মুক্ত করে।

এই সত্য লাভ করিয়া, স্বয়ং মুক্ত, নির্ব্বাণযুক্ত হইয়া, তিনি মুক্তি পাইবার দুঃখহা অষ্টাঙ্গ পথ প্রচার করিলেন। সত্যচতুষ্টয় তৎসহ ঘোষণা করিলেন। যথা,—(১) দুঃখের মহৎ তত্ত্ব। (২) দুঃখের কারণ। (৩) দুঃখের অবসান। (৪) দুঃখের অবসানের উপায়।

এই সত্যচতুষ্টয় ঐ অষ্টাঙ্গ মুক্তিপথের পরম সহায়।

নির্ব্বাণ বৌদ্ধধর্ম্মের চরম মঙ্গল। নির্ব্বাণ পরমা সিদ্ধি।

বুদ্ধদেব দুঃখরূপ মহাসত্যের প্রতি চক্ষু মুদিত করিয়া, অন্য ধর্ম্মসাধকগণের মত ধর্ম্মের ধামাধরা সাধনপথে চলেন নাই। তিনি দুঃখ-দর্শনকেই প্রধান ও প্রথম মহৎ সত্য বলিয়াছেন। দুঃখ দূর ও তৎসাধনের উপায় অন্য দুইটী সত্য।

তাঁহার উপদেশ এই,—

"ভাব, ভাব, ভাব, এবং সত্যকে জানিয়া, দুঃখের বক্ষকে হৃদয়ে পাতিয়া লও,—কর্ম্ম যে শক্তিশেল হানিবে তাহাকে হাসিমুখে আলিঙ্গন কর,—দুঃখকে কণ্ঠের মণিহার কর,—মস্তকের ভূষণ ও মুকুট কর, দুঃখের সদ্ব্যবহার কর,—তবেই দুঃখ তাহার ভয়ানকত্বশূন্য হইবে।"

ওঃ! কি পুরুষকার ও আত্মহীনতা! বীরসাধন আর কাহাকে বলে! যদি বীর হইতে অভিলাষ কর, তবে এই সাধনের পথে চলিয়া জন্মভূমিকে সার্থক কর।

হৃদয় মনকে দুঃখবোধ করিতে না দেওয়াই দুঃখের প্রশ্নের মীমাংসা, কারণ দুঃখ থাকিবেই,—বিনষ্ট হইবে না। দুঃখ নষ্ট না হইলেও, দুঃখানুভববৃত্তি নাশ হইলেই তো ফল একই দাঁড়াইল,—আর দুঃখ পাইতে হইল না! দুঃখ দূর করিবার কি সুন্দর দার্শনিক মীমাংসা!

তাঁহার মুক্তি, দুঃখের হাত হইতে পূর্ণ ভাবে অব্যাহতি লাভ করা। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির উত্তেজনা হইতে মুক্তিই মুক্তি।

ইহাই নির্ব্বাণ। "নলিনী জলগত হইলেও, জলরাশি কর্ত্তৃক যেমন মলিনা হয় না, তেমনি কুপ্রবৃত্তির মধ্যেও নির্ব্বাণ সদা বিমল থাকে"।—মিলিন্দ-প্রশ্ন।৪।৮।৬৬।

নির্ব্বাণ বিনাশ নহে,—রিপুদমন। কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ এই নির্ব্বাণের ভাব ব্যক্ত করিয়া গাহিয়াছেন,—"জীবনের শান্তি, বিগতকাম।" শাক্যমুনি বলিয়াছেন,—"যাহার মন সম্পূর্ণ সংযত ও বিজিত, সেই সুখী।"—উদানবগ্‌গ। ৩১-৫-৬৪।

পূর্ণ আত্মদমনই অমৃত-ভবনের দ্বার,—অনন্তসুখের সুগম পথ,—উপনিষদের অমৃত,—বুদ্ধের নির্ব্বাণ,—ঈশার অমর জীবন।

নির্ব্বাণ জীবনহীনতা নহে,—মরণের বিপরীত,—অমৃত,—নব জীবন, দ্বিজত্ব!

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

যযাতির স্বর্গ প্রাপ্তি

[স্থান—তপোবন ।]

অষ্টক । সহসা একি এ দীপ্তি অন্তরীক্ষ-বুকে
জ্বলি উঠি, উল্কাসম ধরা অভিমুখে
আসিছে ছুটিয়া ;—একি কোন গ্রহ তারা
নভঃ-কেন্দ্র-চ্যুত হ'য়ে স্বর্গস্থান হারা
পুণ্যভ্রষ্ট আত্মা সম পড়িছে ধরায় ।
কি মহা অনর্থ আজি না জানি ঘটায়
ধরণীর বক্ষে ! একি—! এই তপোবন
লক্ষ্য করি ছুটি আসে, হের নাতাগণ !
তিষ্ঠ তিষ্ঠ !—শূন্যপথে কে আসে হেথায়,
দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কি,—বিপ্লব ঘটায়
কে আজ এ তপোবনে ! —তিষ্ঠ ওই খানে ।

যযাতি । কে নিবাবে মোরে ! তীব্র বেগে ধরাপানে
ধাইতেছি কোন্ মহা আকর্ষণ বশে
চ্যুত উল্কা সম !—আজি কাহার আদেশে
রুদ্ধ হ'ল গতি । হেন কার শক্তিবলে
এই মহা আকর্ষণ নাশি অবহেলে
আমারে করিল স্থির !—কেবা হেন জন ।
মুক্ত কর বাধা —এ মহান আকর্ষণ
আকর্ষে আমারে তীব্র,—বহিতে না পারি
হেথা আর ;—কেগো তুমি মহাশক্তিধারী,
তথাপি রাখিছ মোরে নিরোধি হেথায় ?

অষ্টক । কে তুমি গো দিব্যজ্যোতি দেব-ইন্দ্র প্রায়
মাণিক্য কিরীটধারী,—উজ্জ্বল বসন,
অম্লান মন্দারমালা, চর্চ্চিত চন্দন,
তিলক প্রশস্ত ভালে জ্বলে অগ্নি সম !
দেহজ্যোতি আলোকিছে দিগন্তের তমঃ,
দেব অংশুমালী যথা নাশে ধ্বান্তরাশি !
কে তুমি বরেণ্য দেব ! বুঝি স্বর্গবাসী
হবে কেহ ! কেন আজ মোদের ধরায়
আগমন তব প্রভু ?—

যযাতি । হে মুনি !—হেথায়
নহে কি আশ্রম কোন' পুণ্যাত্মা ঋষির ?
লইয়াছি মাগি এই কৃপা সুনাশীর,
পতিত হইব কোন' সাধুর আশ্রমে ।
পুণ্যচ্যুত হৃতস্বর্গ এ মূঢ় অধমে
জ্ঞান দানে প্রকৃতিস্থ করিবেন তিনি ।

অষ্টক । সুনাশী ? সে স্বর্গরাজ দেব-ইন্দ্র যিনি
তাঁর সনে পরিচিত কে তুমি মহান ?—

যযাতি । যে ভরতবংশ মাঝে নৃপতিপ্রধান
নহুষ মহেন্দ্রসখ, লভিলা জনম—
সেই পুণ্য বংশে জন্ম লভিলা অধম
যযাতি তনয় তাঁর ।

অষ্টক । রাজেন্দ্র যযাতি ।
চন্দ্রবংশ-কুল-রবি !—দিনকর-ভাতি
যাঁর পরাক্রমে ম্লান । দানেতে যাহার
পবিত্রী অধীনা । পুণ্য যশোগাথাভার
বহি যার ক্লান্ত বায়ু ! গিরি হিমাচল
আসমুদ্র ধরা ছিল যার করতল,
অধীন রাজন্যবর্গ ! যার পরাক্রমে
ধর্ম্ম নিরুদ্বেগ সদা । পুণ্য তপোবনে
যজ্ঞ শেষে উচ্চারিত যাহার কল্যাণ ।
হে দিব্যাত্মা !—তুমি সেই রাজেন্দ্র মহান ?

যযাতি । সেই বটে আমি । আজি সহস্র বৎসর
ছিনু স্বর্গভূমে, ইন্দ্র সম অধীশ্বর
মন্দার অমৃত আর স্বর্গাঙ্গনাগণে ।
কিনেছিনু স্বর্গখণ্ড মহাপুণ্য-পণে
আমি ধরণীর পতি । দেবেন্দ্র আপনি
বলেছেন নিজ মুখে আমারে বাখানি
স্বর্গ হ'য়েছিল ধন্য মোর বাস হেতু !
ত্রিদিব অম্বরে যার হেন যশকেতু
দীপ্তি পেত,—সেই আমি !

অষ্টক । কেন তবে আজ
তোমার সে ক্রীত স্বর্গে ওগো মহারাজ
না হল তোমার স্থান ?—ধরাপতি তুমি ?—
সত্য বটে । তাই আজো এই মর্ত্ত্য ভূমি
ভোলেনি তোমারে । আজো অশ্রুপূর্ণ চোখে
উচ্চারে তোমার নাম ! হায় ব্যথ শোকে

বহুদিন যাপিয়াছে অনাথার মত,
আজো ধরণীর সেই বৈধব্যের ব্রত
হয় নাই উদ্‌যাপিত ! হে ধরণীপতি !
কহ আজ কোন পাপে হেন অধোগতি
লভিতেছ স্বর্গ হ'তে ? কোন ত্রুটী হেতু
স্বর্গ রুদ্ধ করি দিল তার পুণ্য-সেতু
অবরোহণের পথ না করি প্রদান ?—
তুচ্ছ উল্কা সম ওগো পুণ্যাত্মা-প্রধান,
লভিতেছ শোচনীয় এহেন পতন ?
স্বর্গেরে যা দিয়েছিলে, হ'ল বিস্মরণ
মুহূর্ত্তে তাহারে স্বর্গ ! এ তুচ্ছ ধরায়
যাহা দিয়ে গেছ আজ বহু যুগ হায়
লুপ্ত হ'য়ে গেছে। তবু তব পুণ্যস্মৃতি
অম্লান উজ্জ্বল নিত্য ওগো নরপতি !

যযাতি। জানি না কি ত্রুটী হেতু স্বর্গচ্যুত আজ
হ'তে হল মোরে। তাই হে তপস্বীরাজ,
শুধাইব কোন' জ্ঞানী পুণ্যবান জনে
কোন দোষে দোষী আমি দেবেন্দ্র-সদনে।

অষ্টক। যদিও অজ্ঞান মোরা,—তবু হে রাজন,
পারি কিগো জিজ্ঞাসিতে তোমারে কারণ ?—

যযাতি। প্রাতে মন্দাকিনী-তীরে নন্দন কাননে
ভ্রমিতে আছিনু,—স্বর্গ-বসন্তপবনে
পড়িছে মন্দার ঝরি অপ্সরা-কুন্তলে।
ধাইছে ঝঙ্কারধ্বনি স্রোতস্বতী-কূলে
দিব্যাঙ্গনা-কলকণ্ঠ-সঙ্গীত-সম্ভূত,—
অদৃশ্য বীণার সনে। তাল দেয় দ্রুত
নূপুর গুঞ্জরি তাহে। সুধাপানোৎসবে
মত্ত সেথা দিব্যাত্মারা।—মহান গৌরবে
মোরে হেরি সম্মানিল প্রদানি আসন।
ক্ষণ পরে দেবরাজ করি আগমন
শুধালেন মৃদু হাসি,—"কহ নরপতি
কোন মহা পুণ্যপণে হেন দিব্যগতি
লভিয়াছ ?—নরশ্রেষ্ঠ, বক্ষে বসুধার
আছে কি গো পুণ্যবান তব সম আর ?"
কহিলাম সাহঙ্কারে "কীর্ত্তি মোর সম
ধরায় স্থাপেনি কেহ। যশোদীপ্তি মম
অম্লান উজ্জ্বল নিত্য ! মলিনা পৃথিবী
ধন্যা মোরে ধরি বক্ষে, মান্যা মোরে সেবি।
আমি শ্রেষ্ঠ নরকুলে প্রাতঃস্মরণীয় !"—
হাসিলা মহেন্দ্র। —ধিক্ ধিক্ !—স্বরগীয়
আকাশ-ভারতী শূন্যে হল উচ্চারিত।
কম্পিত আসন হ'তে হইনু স্খলিত
সে মুহূর্ত্তে। শুধালাম ব্যথিত বিস্ময়ে
একি মহা আকর্ষণ যায় মোরে লয়ে
নিম্ন পানে। একি মোর হল স্বর্গচ্যুতি ?
এই কি পতন ?—দেহ আজ্ঞা দেবপতি,
স্থিতি লভি যেন কোন' পুণ্য তপোবনে।
"তথাস্তু" ধ্বনিলা বাণী। সেই আকর্ষণে
ধাইতেছি ধরা পানে উল্কাখণ্ড প্রায়,
কে তুমি গো গতিহীন করিলে আমায় ?

অষ্টক। হে গর্ব্বান্ধ স্বর্গবাসী, কোন মহাপাপে
পাপী তুমি বুঝেছ কি ? তীব্র অনুতাপে
কর শীঘ্র পূত তব পতিত আত্মারে।
হেন দম্ভী হ'য়েছিলে যাহে বসুধারে
তুচ্ছ কর, তুচ্ছ কর ধরার মানবে ?
ধরণী সহিতে পারে,—স্বর্গ কেন সবে
হেন অহঙ্কার তব ? সর্ব্বংসহা ভূমি
সহে সর্ব্ব দোষ। হেথা স্থান পাবে তুমি।
তব সম কীর্ত্তিশালী ছিল না ধরায় ?
হে মোহান্ধ স্বর্গবাসী, জান না কোথায়
উচ্চারিলে হেন ভাষা ? যেথা দিব্যাক্ষরে
রয়েছে নহুষকীর্ত্তি লেখা স্তরে স্তরে।
পরাজয়ি ইন্দ্রে যেই শত বর্ষ কাল
লভেছিল ইন্দ্রপদ, ধরারি ভূপাল
সে নহুষ !—দুষ্মন্তাদি ভরত নৃপতি,
যার কীর্ত্তি বহি অঙ্গে ধন্যা বসুমতী
ধরিলা ভারত আখ্যা ! জন্মি বংশে যার
ধন্য হইয়াছ তুমি ! পুণ্যাত্মা ধরার
কে পারে করিতে সংখ্যা ?—পুত্র পুরু তব
স্থাপিয়াছে যেই কীর্ত্তি, বংশের গৌরব

বরে তার বহু যুগ! সূর্য্যবংশোদ্ভব
দিলীপ পার্থিবশ্রেষ্ঠ! রঘুকুলর্ষভ
রামচন্দ্রে কিগো হ'য়েছিলে বিস্মরণ?—
"তুমি শ্রেষ্ঠ" হেন শ্লাঘা করিলে যখন,
বুঝিলে কি—ধিক্ ধিক্ শূন্যে স্বর্গবাসী
কি ঘৃণায় ধিক্কারিল তোমা?

যযাতি। সত্য মানি
হে ঋষি বচন তব। আমি মূঢ় অতি।
কহ মোরে লভিব গো কোন অধোগতি
এই পাপে?

অষ্টক। চাহ কি গো পুনঃ স্বর্গবাস?

যযাতি। পতিত অধমে কেন করি উপহাস
হানিছ সুতীব্র শেল দীর্ণ বক্ষে তার।

অষ্টক। নহে উপহাস। রাজা জীবনে আমার
যদি কোন পুণ্য হ'য়ে থাকে উপার্জ্জিত
তোমারে করিনু দান,—না হও পতিত
স্বর্গ হ'তে তুমি নৃপ। ধর্ম্ম সাক্ষী কহি
মম পুণ্য কর্ম্মে আর ফলভাগী নহি।

যযাতি। একি অত্যদ্ভুত কার্য্য। ওগো ঋষিবর
নাহি কর এ সংকল্প।

অষ্টক। হের দৃষ্টান্তর
উশীনর-পুত্র শিবি, নিজ দেহ পণে
আশ্রিতে যে রক্ষা করে' ধর্ম্মরাজ সনে
আবদ্ধ বন্ধুত্ব-ডোরে, সেই শিবিরাজ
তোমারে সকল পুণ্য সমর্পেণ আজ।
পুণ্য বসু মহামতি, নৃপ প্রতর্দ্দন,
দৌহিত্র তোমার আমি, মোরা চারি জন
সর্ব্ব পুণ্যফল তোমা করিনু প্রদান,
মহান্ গৌরবে দেব লভ নিজ স্থান।

যযাতি। একি তেজোদীপ্তি শূন্যে! ধন্য ধন্য রব
ধ্বনিত চৌদিকে। শুন বৎস, নাহি লব
তোমাদের পুণ্যফল, নহি নীচমনা।
কৃপণের বৃত্তি এ যে। না করি কামনা
তুচ্ছ তৃণ কার কাছে। লব পুণ্যফল?

অষ্টক। দাও বিনিময়ে ওই শুষ্ক তৃণদল।—
তৃণ পণে কিন পুণ্য।

যযাতি। সম্ভবে না তাহা।
আমি বা কেমনে দিব নহে মোর যাহা
নিজ অধিকারভুক্ত—ধরার ও তৃণ
মানবের সম্পত্তি সে; নহেক অধীন
স্বর্গভ্রষ্ট এই মূঢ় ধরা-নিন্দুকের!—
যাইতে হইবে মোরে, দ্বার নরকের
উদ্ঘাটিত করি ডাকে দ্বারপালগণ।
বহু শত কৃমিজন্ম করিয়া গ্রহণ
এই ধরাবক্ষে, তবে প্রায়শ্চিত্ত হবে
মোর পাতকের।

অষ্টক। জেনো তব গতি লবে
এই চারিজন; নৃপ কোথা যাবে চল।
পঞ্চজনে এক সাথে ভুগি এক ফল
কাটাব গৌরবে কাল।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ধন্য ধন্য ঋষি!
স্বর্গেরে প্রদানো মান্য নিত্য সেথা বসি
সগৌরবে। এস মম রথে চারিজন।
ধন্য তুমি নপ্তা তরে যযাতি রাজন!
এস বন্ধু স্বর্গে পুনঃ! হে যতিপ্রধান!
এস সবে দিব্য রথে।

অষ্টক। দেব মঘবন্!
হয়েছে কি আমাদের কালপূর্ণ ভবে?

ইন্দ্র। নহে ঋষি! মহাপুণ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে
অকালে, শরীরধারী তোমা সবাকার।

অষ্টক। নাহি দেবরাজ হেন কামনা আমার
পুণ্যেরে প্রদানি বিনিময়ে স্বর্গ লভি!
যে করে সে ব্যবসায়ী, সে ত ফললোভী
বণিক সমান। স্বর্গে যাও দেবরাজ!
সামান্য তপস্বী মোরা, স্বর্গে কোন্ কাজ
আমাদের? যত দিন রব ধরা মাঝে
নিযুক্ত রহিব তার শত ক্ষুদ্র কাজে
ধরার সন্তান মোরা। অন্তে যেথা স্থান
নিত্য সত্য নিরঞ্জন করিবেন দান
সেই আমাদের গতি, স্বর্গ নাহি চাই!

যযাতি। হে ঋষিপ্রধান। যাহা উচ্চারিতে যাই
না আসে কণ্ঠেতে! ধন্য ধন্য আমি আজ
হেরি তোমাদের! স্বর্গ দেবতাসমাজ
হবে অবনতমুখ নরকীর্ত্তি হেরি!
হে মানব! বহুদিন আছিনু পাশরি
সবার মহিমারাশি, তাই জননীরে
করিয়াছি অপমান। ভক্তিনত শিরে
রহি মানবের কীর্ত্তি গান স্বর্গবাসে।
দেবতার থাক স্বর্গ, যেন নাহি আসে
তার তুচ্ছ ভোগসুখ, অনিত্য কল্পনা
মানব-কল্যাণপথে। বিসর্জ্জি কামনা
নির্লিপ্ত কল্যাণকর্ম্মী মানব কেবল
ধরণীর পুণ্য নাম করুক উজ্জ্বল!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

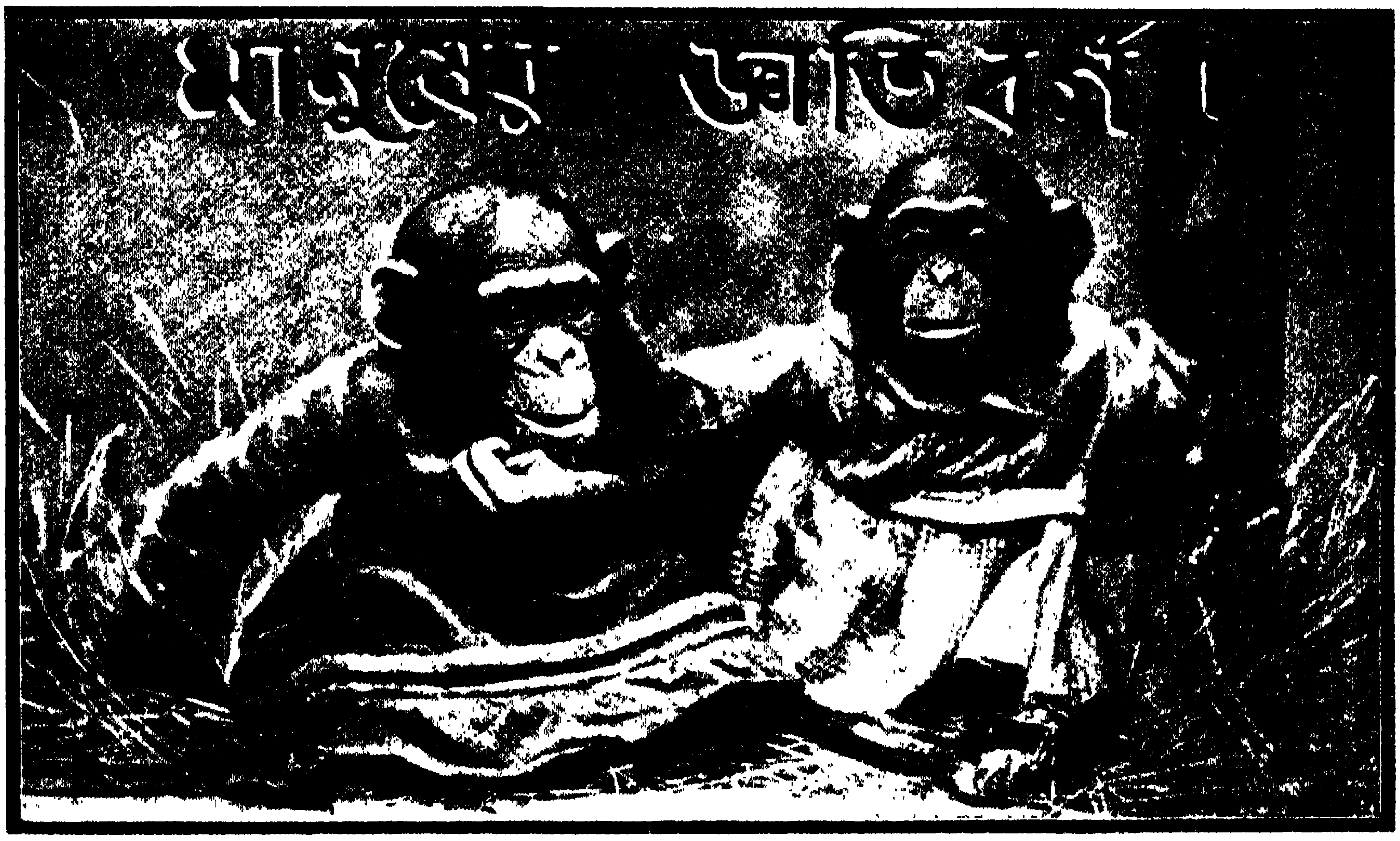

(লণ্ডন ম্যাগাজিন হইতে)

জীবজগতে মানুষ যে জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কাহারো কোনো সন্দেহ নাই। শারীরিক বলে বৃহদায়তন জন্তুদের অপেক্ষা হীন হইয়াও মানুষ বুদ্ধিবলে তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে এবং জগতের সমুদয় প্রাণীর নিকট শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পূজিত হইতেছে। তাই বলিয়া, মানুষ যে জগতের পশুশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র এরূপ মনে করিবারও কোনো কারণ নাই; প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, শরীরগত সাদৃশ্যে কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে মানুষের যথেষ্ট মিল আছে।

প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাহাদের কাহাকেও একথা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণসমূহ বাদ দিলে মানুষও অন্যান্য দশ রকম জন্তুজানোয়ারের ন্যায় একপ্রকার জন্তু। একটু অভিনিবেশ সহকারে তাহাদের মধ্যে মিল ও পার্থক্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আকৃতিগত সাদৃশ্যে লাঙ্গুলহীন উচ্চশ্রেণীর বানরের সঙ্গে মানুষের একটা খুব নিকট সম্বন্ধ সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিম্পাঞ্জি, গারলা, ওরাংউটান্ ও গিবন ইহারা এই মানবাকৃতি বানরশ্রেণীর দলে। অস্থিসংস্থান-বিদ্যার বলে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যাবতীয় ইতরপ্রাণীর মধ্যে বানরই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। জীবনীশক্তির হিসাবেও

এই কয় শ্রেণীর বানরের সঙ্গে মানুষের যথেষ্ট মিল আছে; ইহারা উভয় প্রাণীই একই প্রকারের রোগে আক্রান্ত হয়। মানুষের ন্যায় ইহাদেরও রাগ, ভয়, আনন্দ, কৌতূহল প্রভৃতিতে মুখের ভাবের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়।

বানর ও মানুষের মধ্যে এই সমুদয় সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া আধুনিক প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বানরকেও মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া 'শ্রেষ্ঠ জীব' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ের কঙ্কাল নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে বানর ও মানুষের মধ্যে জাতিগত কোনো প্রকার পার্থক্য নাই। এই কারণে তাঁহারা বলেন বানর ও মানুষ উভয়েই একই বংশের দুই শাখা; তাহাদিগকে মানবের পূর্ব্বপুরুষ না বলিয়া বরং 'জ্ঞাতি ভাই' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে।

শৈশবাবস্থায় এই সকল মানবাকৃতি বানরের সঙ্গে মানুষের মিল খুব স্পষ্ট ভাবেই লক্ষিত হয়; শৈশবে ইহাদের কোনো কোনোটিকে অল্পবয়স্ক নিগ্রো-সন্তানের ন্যায় দেখায়। সেই সময় ইহারা খুব শিষ্ট, শান্ত ও ভদ্র থাকে এবং চট্‌পট্ নানান বিষয়ে মানুষের অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে ইহাদের ব্যবধান ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; শৈশবের সদ্‌গুণসমূহ একে একে লোপ পাইয়া চিরদিনের মত অদৃশ্য হইয়া যায় এবং সে সকলের স্থানে ইহাদের ভিতরকার পশুত্ব ক্রমশই বিকশিত হইয়া উঠে। সেই সময় হইতেই ইহাদের শারীরিক গঠন ও মানসিক চরিত্র উভয়ই পশুত্বের দিকে অগ্রসর হয়। অন্য দিকে মানুষ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণসমূহ লাভ করিয়া ক্রমশই সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে থাকে।

মানবাকৃতি বানরদের মধ্যে শিম্পাঞ্জি সর্ব্বোচ্চ আসনে আসীন। অস্থিসংস্থান-বিদ্যার সাহায্যে ও ইহাদের মানসিক গুণসমূহ অবলোকন করিয়া আধুনিক প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ শিম্পাঞ্জিকে মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মতে গরিলা মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এখন বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে শারীরিক গঠন ও মানসিক বৃত্তিতে শিম্পাঞ্জি গরিলা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। পোষা শিম্পাঞ্জির চালচলন দেখিয়া তাহাদিগকে বেশ বুদ্ধিমান জীব বলিয়াই মনে হয়। আমরা অনেকেই আমাদের এই জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গে পরিচিত নহি—তাহাদের আচার ব্যবহার চালচলন স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অনভিজ্ঞ। নিম্নে তাহাদের সামান্য পরিচয় প্রদান করিলাম।

শিম্পাঞ্জি পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসী। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে ইহারা দুই শ্রেণীভুক্ত; এক শ্রেণী কালো, ও অপর শ্রেণী গোল মাথাবিশিষ্ট। প্রথম শ্রেণীর শিম্পাঞ্জির সমস্ত শরীর কালো বর্ণের লোমে আচ্ছাদিত। ইহাদের

চিন্তায় মগন!

মস্তকের চুল এমন পরিপাটি ভাবে বিন্যস্ত যে দেখিয়া বোধ হয়, কেহ যেন চিরুণী ব্রাসের দ্বারা তাহাদের চুলের এরূপ শোভা সম্পাদন করিয়া দিয়াছে। ইহাদের উপরের ঠোঁট লম্বা, কপোল প্রশস্ত ও নাসিকা চেপ্টা, কিন্তু চোখের

দৃষ্টির সঙ্গে মানুষের দৃষ্টির খুব সাদৃশ্য আছে। রাগ, ভয়, আনন্দ, কৌতূহল প্রভৃতি মানসিক ভাব সকল ইহাদের মুখ দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়; অতিরিক্ত আনন্দের সময় ইহারা বেশ একটু মুচ্‌কাইয়া মুচ্‌কাইয়া হাস্য করিয়া থাকে। পূর্ণ-বর্দ্ধিত অবস্থায় ইহাদের এই সকল ভাব সহজে অনুমান করা যায় না কিন্তু শৈশবাবস্থায় ইহা সকলেরই নিকট সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বন্যাবস্থায় ইহারা গভীর অরণ্যের ভিতর অবস্থান করে। ইহাদের খাদ্য সাধারণতঃ ফল ও মূলাদি। ইহারা একাকী অথবা দলবদ্ধ হইয়া বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। মৃত্তিকার উপর দিয়া চলিবার সময় ইহারা পা ও হাত উভয়ই ব্যবহার করে; কোনোরূপ অবলম্বন ধারণ না করিয়া কেবলমাত্র পশ্চাতের পায়ের উপর ভর দিয়া

অবাক!

সরলভাবে চলিতে পারে না—মাতালের ন্যায় এ পাশে ও পাশে টলিতে থাকে। ইহারা অধিকাংশ সময়ই মৃত্তিকার উপরে কাটায় কিন্তু তাই বলিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিতে তাহাদের তৎপরতার একটুও অভাব দেখা যায় না। বৃক্ষের অত্যুচ্চ ভাগে কাষ্ঠ পাতিয়া ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে এবং তাহার উপর কোমল লতা বিছাইয়া তাহাকে বাসোপযোগী করিয়া লয়। স্ত্রী-শিম্পাঞ্জি তাহাতে সন্তান প্রসব করে। ইহারা মনুষ্যভীত হইলেও বলবিক্রমে মানুষ অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহে; একজন খুব সাহসী ও বলিষ্ঠ পুরুষও গায়ের জোরে ইহাদের সমকক্ষ নহে।

শৈশবাবস্থায় শিম্পাঞ্জিকে বন হইতে ধরিয়া আনিলে ইহারা মানুষের বেশ পোষ মানে। কিন্তু ইউরোপের জলবায়ু ইহাদের আদবেই সহ্য হয় না। এ পর্য্যন্ত লণ্ডন নগরের চিড়িয়াখানায় যতগুলি শিম্পাঞ্জিকে ধরিয়া আনা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আট বৎসরের অধিক একটিও জীবন ধারণ করে নাই। ক্ষয়কাশ রোগই ইহাদের প্রধান শত্রু। সম্প্রতি লণ্ডন নগরের চিড়িয়াখানায় তাহাদের বাসস্থানের জন্য বিশেষ ভাবে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; তথায় তাহাদের দীর্ঘজীবন যাপনের আশা করা যায়।

শৈশবকাল হইতে শিক্ষা দিলে শিম্পাঞ্জি নানাপ্রকারে মানুষের অনুকরণ করিতে পারে—যেমন খাবার সময় কাঁটা চামচ ও পানপাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা। লণ্ডন নগরের চিড়িয়াখানায় তিন বৎসর বয়স্ক একটি শিম্পাঞ্জি ছুরির ফলা খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারিত এবং আদেশ করিলে সাদা জিনিষ ও কালো জিনিষ সঠিকভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিত। মানুষের দেখাদেখি পেন্সিল দ্বারা কাগজের উপর আঁকজুক করা তাহার একটা প্রধান আমোদের বিষয় ছিল কিন্তু তাহার এই অদ্ভুত লেখার ভিতর হইতে কেবল মাত্র 'ও' অক্ষরটি ব্যতীত অন্য কোনো অক্ষরই বোঝা যাইত না!

আর একটি শিম্পাঞ্জির কথা শুনা গিয়াছিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পোষাক পরিধান ও পরিবর্ত্তন করা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত নানাপ্রকার সৌখিন অলঙ্কার পরিধান করিয়া সে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিত। আহারের সময় হইলেই সে তাহার টেবিলটির উপর একখানা কাপড় বিছাইয়া লইত এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট চৌকিখানাতে উপবেশন করিয়া ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত। গ্লাস হইতে জল পান করিয়া সে কখনো ভিজা মুখে থাকিত না, একখানা তোয়ালে লইয়া মুখখানি উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিত। এ সমুদায়ই সে তাহার প্রভুর নিকট শিক্ষা করিয়াছিল।

শারীরিক বলে ও আকৃতিতে মানবাকৃতি বানরদের মধ্যে গরিলার স্থান সর্ব্বোচ্চে। ইহাদের কোনোকোনোটি

দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুট পর্য্যন্ত হয়, সাধারণতঃ ইহারা মানুষ অপেক্ষাও বড় হয়। ইহাদের বলিষ্ঠ ও দৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; ঝেঁকড়া ঝেঁকড়া লোম, প্রশস্ত ও বৰ্দ্ধিত কপোল এবং ধারালো দন্তের প্রতি দৃষ্টিমাত্রেই ইহাদের হিংস্র ও ক্রুর

একটি গরিলা-শিশু।

স্বভাবের পরিচয় সংক্ষেই পাওয়া যায়। আফ্রিকার নিবিড় অরণ্য ইহাদের বাসস্থান। শিম্পাঞ্জির ন্যায় ইহারাও বৃক্ষের উপর কাষ্ঠ পাতিয়া বাসা নিৰ্ম্মাণ করে; স্ত্রী গরিলা তাহাতে সন্তান লইয়া অবস্থান করে, আর পুরুষটী বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া তাহাদের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। চিতাবাঘ ইহাদের প্রধান শত্রু।

শিম্পাঞ্জির ন্যায় ইহাদেরও ইউরোপের জল বায়ু সহ্য হয় না। জাৰ্ম্মেনির একটি চিড়িয়াখানায় একটি গরিলা দেড় বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। সেটি বেশ শিষ্ট শান্ত ছিল এবং প্লেট হইতে হাত দিয়া আহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিল; সৰ্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা তাহার একটা বিশেষ গুণ ছিল। তাহার জন্য পাশের কক্ষে ফল প্রভৃতি খাবার দ্রব্য সঞ্চিত থাকিত; আহারের ইচ্ছা হইলেই সে চুপি চুপি সেই কক্ষটিতে প্রবেশ করিয়া চুপড়ি হইতে ফল প্রভৃতি টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইত। সেই সময় কাহাকেও আসিতে দেখিলে খাদ্যাদি ফেলিয়া দুই লাফে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত; কখনো কখনো বা লুণ্ঠন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাবধানে সম্মুখের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিত। সে যে ইচ্ছা করিয়াই এরূপ অনধিকার চর্চ্চা করিতেছে ইহা তাহার প্রত্যেক কাজে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইত।

ওরাং-উটান অথবা বনমানুষ বোর্ণিও সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসী। পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান

ওরাং-উটান ও তাহার “চতুর্ভুজ”।

হইলে ইহাদের উচ্চতার পরিমাণ প্রায় চার ফুট হয়। ইহাদের হাত এরূপ লম্বা লম্বা যে সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইলে হস্তদ্বয় প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করে। ইহাদের কপোল উচ্চ ও প্রশস্ত; সমস্ত শরীর লম্বা লম্বা ধূসরবর্ণের লোমে আবৃত। পূর্ণবৰ্দ্ধিত অবস্থায় ওরাং-উটানের চিবুক ও ঘাড়ের নিম্নভাগ লম্বা লম্বা দাড়িতে আচ্ছন্ন থাকে। ইহারা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট।

ডাক্তার ওয়ালেস্ (A. R. Wallace) সাহেব কিছুদিন বোর্ণিও দ্বীপের নিবিড় অরণ্যে অবস্থান করিয়া ইহাদের স্বভাব চরিত্র বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন।

অধিকাংশ সময়ই ইহারা মৃত্তিকার উপরে কাটায়, একমাত্র খাদ্যান্বেষণ ব্যতীত অন্য সময়ে ইহারা বড় একটা মৃত্তিকায় অবতরণ করে না। বৃক্ষের উপর বড় বড় পত্রে যে শিশিরকণা সঞ্চিত থাকে, সাধারণতঃ তাহাই পান করিয়া ইহারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠনদৃষ্টে ইহাদিগকে দ্রুতগমনে অশক্ত বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ইহারা যখন বৃক্ষের উপর দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে থাকে তখন তাহাদের সঙ্গে দৌড়িয়া পাল্লা দেওয়া একজন মানুষের পক্ষে অসাধ্য সাধন হইয়া ওঠে।

বদ্ধাবস্থায় ইহারা বেশ শান্ত শিষ্ট থাকে কিন্তু কোনো কারণে একবার কাহারো উপর ক্ষেপিলে আঁচড়াইয়া

ওরাংউটান 'উম্ পল' জিমনাষ্টিকের কসরৎ দেখাইতেছে।

কামড়াইয়া তাহাকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়ে। ইহারা নিতান্তই বোকা প্রাণী; মানুষের কোনো প্রকার অনুকরণে ইহারা একেবারে অসমর্থ।

গিবন বা উল্লুক মানবাকৃতি বানরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, খুব বড়গুলিও দৈর্ঘ্যে তিন ফুটের ঊর্দ্ধ হয় না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ইহাদের সুদীর্ঘ ভুজদ্বয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহারা শাখা হইতে শাখান্তরে এরূপ দ্রুতবেগে গমনাগমন করে যে তখন তাহাদের ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

গিবন নানাশ্রেণীভুক্ত। দক্ষিণ এসিয়ায়, বিশেষতঃ মালয় উপদ্বীপে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চাতের পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া চলিতে ইহারা অন্যান্য মানবাকৃতি বানরদের অপেক্ষা দক্ষ।

গিবন—ও তাহার সুদীর্ঘ হস্ত। তাহাকে খাওয়ান হইতেছে।

পোষা গিবন খুব নম্র ও স্নেহশীল থাকে। পূর্ণবর্দ্ধিত অবস্থায়ও ইহাদিগকে পোষ মানানো যায়। ষ্টারন্‌ডেল (R. B. Starndale) সাহেব তাঁহার একটি পোষা গিবন সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—আমার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে সে যেরূপ আনন্দ পাইত এমন আর কিছুতেই নহে; আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবিষ্ট মনে বসিয়া থাকিত। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা তাহার একটা বিশেষ গুণ ছিল। আমি তাহাকে প্রথম আনিয়া শয়ন করিবার জন্য একখানা কম্বল দিই, পরদিন প্রাতঃকালে দেখি সে সেই কম্বলখানাকে জড়াইয়া

মস্তক রক্ষার জন্য একটি উপাধান প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। কাজেই, পরদিন তাহাকে শয়ন করিবার জন্য আর একখানা কম্বল দিতে হইল। আমার এই গিবনটিকে দিল্লিতে পাঠাইবার কথা ছিল কিন্তু সমুদ্রের জলবায়ুতে রাস্তায়ই সে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া তাহাকে যথেষ্ট যত্নের সহিত চিকিৎসা করানো হইয়াছিল কিন্তু দিল্লি পর্য্যন্ত তাহাকে পৌছানো যায় নাই—রাস্তায়ই সে প্রাণত্যাগ করে।

আর একটি গিবনের কথা শুনা গিয়াছিল্ আহারের সময় হইলেই সে নিজের বসিবার চৌকিখানা তাহার প্রভুর নিকট টানিয়া আনিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইত।

বার্লিন নগরের চিড়িয়াখানায় একটি গিবন ছিল, কোনো স্ত্রীলোক নিকটে আসিলেই সে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কোলের উপর বসিয়া থাকিত। তিনি ইহাতে কোনো প্রকার বিরক্তি প্রকাশ না করিলে সে কোল পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা মাত্র করিত না সে ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে একত্রে এক শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইত কিন্তু তাহাদের কোনো প্রকার অনিষ্ট করিত না। শিষ্ট শান্ত হইলেও ইহারা একেবারে নিরীহ প্রাণী নহে, সময় সময় ইহাদিগকে তাহাদের প্রভুর উপরও অত্যাচার করিতে শুনা যায়।

এই সকল মানবাকৃতি বানর মানুষেরই ন্যায় সদ্‌গুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও ভিন্ন প্রকারের পরিবেষ্টনের (environment) মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাবে শৈশবের সদ্‌গুণাবলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পশু নামে পরিগণিত হইতেছে। কোনো কালে ইহারা তাহাদের পশুত্ব নাম ঘুচাইয়া বুদ্ধি ও জ্ঞানবলে তাহাদেরই স্বজাতি মানুষের সমকক্ষ হইতে পারিবে কি না কে জানে?

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

লাভ

পেয়েছি আজিকে তোমা পেয়েছি গো আজ!
কোথা তুমি, কোথা তুমি করি অন্বেষণ
আমারি অন্তরাগারে আজি মহারাজ!
এ কি তৃপ্তি, একি দীপ্তি করি নিরীক্ষণ!
প্রভু, এত কাছে আছ নিত্য সর্ব্বক্ষণ
আমি তা' পাইনি খুঁজে দেখিনি চাহিয়া,
বিশাল বসুধা-বক্ষে করিয়া ভ্রমণ,
ফিরিতে চেয়েছি ঘরে তোমারে লইয়া,
নিরাশ ভগন বক্ষে দেখি চুপে চুপে
গভীর ব্যথার মাঝে করিছ বিরাজ
হে সচ্চিদানন্দ মোর! চিদানন্দরূপে
হৃদয়কমল পরে রাজ অধিরাজ!
আজি ত বিরহ নাই, আজি সমুজ্জ্বল
অনন্ত আনন্দ আর মিলন কেবল!

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

মামা-ভাগ্নী

(ইংরাজি হইতে)

মিষ্টার র‍্যাগ্ বাড়ীর দরজার সামনে চৌকী ঠেস দিয়া ধূমপান করিতেছিল। সম্মুখবর্ত্তী রাস্তা বরাবর ঢালু হইয়া সমুদ্রের দিকে নামিয়া গিয়াছে। বাড়ী হইতে সমুদ্র একটি নীল জলের রেখার মত দেখা যায়। গ্রামের বড় ছেলেরা সব পাঠশালায়; ছোট ছেলেগুলি মিষ্টার র‍্যাগের তাড়না সত্ত্বেও তাহার সামনে রাস্তায় খেলাধূলায় ব্যস্ত। দুইবার একটা গোলা বুড়ার গালের পাশ দিয়া চলিয়া গেল—সেজন্য সে ছেলেদের উপর যে গালিবর্ষণ করিল ও চোখ রাঙ্গাইল তাহাতে কোন ফল হইল না।

এমন সময় পিছন হইতে কে বলিল, "নমস্কার মিষ্টার র‍্যাগ্!"

বুড়া ফিরিয়া দেখিল পরিচিত একটি যুবক তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। হাসি দেখিয়া তাহার রাগ আরো বাড়িয়া উঠিল, সে চোখ পাকাইয়া যুবকের দিকে চাহিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বলতো, কেন তুমি শুধু শুধু ছোঁড়াগুলোর উপরে রেগে মরছ? বেশ প্রফুল্ল চিত্তে

ওদের খেলাধুলো দেখে হাস না। একটু অভ্যাস করলে তুমিও হাস্‌তে শিখে যাবে।"

বুড়ো তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখ্ জর্জ্‌ গেল, তোর নিজের চর্কায় তুই তেল দেগে। তোর অনেক বাঁদ্‌রামী সহ্য করেছি, আর বেশী বাড়াবাড়ি করিস্‌নে। আর দেখ্, ফের যদি আমার বাড়ীর দেয়াল ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াবি তো ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

জর্জ্‌ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলে?"

মিষ্টার র‍্যাগ কোন উত্তর না দিয়া পাইপে ঘন ঘন টান দিতে দিতে পাহাড়ের তলদেশে যে একটি জেলে-ডিঙ্গি লাগিয়া ছিল অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে সেইটি দেখিতে লাগিল। জর্জ্‌ বলিল, "শুন্‌ছি তোমার একটি ভাগ্নী নাকি তোমার কাছে থাক্‌তে আস্‌ছে?"

মিষ্টার র‍্যাগ্ নিরুত্তর।

জর্জ্‌ কিছুমাত্র না দমিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আহা বেচারা! বলতো মিষ্টার র‍্যাগ্, সে কি তোমার মত—আমি বলছিলুম—সে কি—তোমার সঙ্গে তার কি কোন চেহারার মিল আছে?"

বুড়ার আর চুপ্ করিয়া থাকা চলিল না। সে বলিল "দেখ্ বেটা, আমার বয়স যদি আর বিশ বছর কম হত তা হলে আজ আমি তোর একটি হাড়ও আস্ত রেখে ছাড়তুম না।"

জর্জ্‌ এ প্রস্তাবে আপত্তি না করিয়া প্রশান্তবদনে বলিল, "আমিও তো তাই চাই। এখন তবে আসি মিষ্টার র‍্যাগ্। সমস্ত দিন তোমার সঙ্গে গল্প করবার আমার সময় নেই।"

বুড়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুই বিদায় হলেই আমার হাড় জুড়োয়।"

জর্জ্‌ চলিয়া যাইবার ভাণ করিতেছিল, এমন সময় দেখিল একটা ভাড়াটে গাড়ী পাহাড়ের উপর দিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে আর গাড়ীর মাথায় একটা প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক। গাড়ীটা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে গাড়ীর ভিতর হইতে একটি যুবতী মুখ বাহির করিয়া মিষ্টার র‍্যাগ্‌কে দেখিয়া হাত নাড়িতে লাগিল। যুবতীকে দেখিয়া বেশ অনুমান করা যায় যে মামার তরফ্ হইতে সে তাহার মুখের কমনীয়তা লাভ করে নাই। জর্জ্‌ অল্প একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া এম্‌নি ভাব প্রকাশ করিল যেন সে স্বভাবের সৌন্দর্য্যই দেখিতেছে। কিন্তু গাড়ী হইতে নামিয়া যুবতী যখন ভক্তিভরে মামাকে প্রণাম করিয়া মামার কাছে দাঁড়াইল, তখন জর্জ্‌ আর অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারিল না, অনিমেষলোচনে মেয়েটিকে দেখিতে লগিল।

"কি সুন্দর জায়গা মামা, আর এখানকার হাওয়া কেমন পরিষ্কার!"

চারিদিক দেখিতে দেখিতে এই কথা বলিয়া মিস্ মিলার্ মামাকে অনুসরণ করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

এদিকে বুড়ো গাড়োয়ানটা ভারি বাক্সটাকে টানা হেঁচ্‌ড়া করিয়া কোন ক্রমেই নাড়াইতে পারিতেছিল না। বাড়ীর ভিতরে যাইবার এমন সুযোগ ছাড়িবার পাত্র জর্জ্‌ নহে—সে গাড়োয়ানকে সরাইয়া অনায়াসে বাক্সটা নিজের কাঁধের উপর তুলিয়া ভিতরে গেল। মামা-ভাগ্নী তখন সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় যাইতেছে, জর্জ্‌ও ভাল-মানুষটির মত পিছু পিছু চলিল।

উপরের একটি ঘরের দরজা খুলিয়া মিষ্টার র‍্যাগ্ হাঁক্ দিল, "ওরে, এদিকে নিয়ে আয়।...ভালরে ভাল! তুই হতভাগা আমার এখানে কি কর্‌ছিস্? বাক্স নাবা, শীগ্‌গির্ নাবা বল্‌ছি। আমার কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি?"

মিস্ মিলার আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যেই তাড়াতাড়ি সরিবে অম্‌নি বাক্সটার কোণ মিষ্টার র‍্যাগের মাথায় সজোরে ঠুকিয়া গেল। বুড়ার গালাগালি চেঁচামেচি গ্রাহ্য না করিয়া জর্জ্‌ নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে বাক্সটা মেঝের উপর রাখিয়া মিস্ মিলার্‌কে বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাক্সটি কি এইখানেই থাক্‌বে?"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দরজার কাছে আসিয়া বুড়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "তুই বেরো আমার বাড়ী থেকে, যা বল্‌ছি, শীঘ্র দূর হ!"

যোড়হস্তে যুবক বলিল, "হঠাৎ না দেখ্‌তে পাওয়াতে

আপনার মাথায় বাক্সটার খোঁচা লেগে গেছে; আমি ইচ্ছে করে লাগাইনি মশায়। আমার অসাবধানতা মাপ করুন।"

মিষ্টার র‍্যাগ্ হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, "আমি কোনো ওজোর শুন্‌তে চাই না। তুই দূর হ।"

জর্জ্ বিনীত ভাবে বলিল, "দৈবাৎ লেগে গেছে। দোহাই আপনার মাপ করুন।"

মিষ্টার র‍্যাগ্ মুখ খিচাইয়া বলিল, "দৈবাৎ লেগে গেছে! কেবল আমার মাথায় লাগাবার মতলবে তুই যে বাক্সটা ঘাড়ে করে এনেছিলি তা আমি বেশ জানি। তুই আমার সাম্‌নে থেকে চলে যা।"

গেল্ যখন হেঁট মুখে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছে তখন ভাগ্নীর দিকে নজর পড়ায় মিষ্টার র‍্যাগ্ কি ভাবিয়া একটু হাসিয়া উচ্চৈঃস্বরে মিস্ মিলারকে জর্জ্ গেলের পরিচয় দিতে লাগিল, "জান বাছা, ঐ ছোঁড়াটা ভারি বদ্; ও একটা মাছধরা নৌকার মালিক আর সেই জাঁকে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। বদ্‌মায়েসীর জন্যে ছোক্‌রা যে কতবার আমার কাছে মার খেয়েছে তার ঠিক নেই।"

মেয়েটি মামার ক্ষীণ শরীরের প্রতি একবার কেবল সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিল। সে চাহনি বুড়ার চোখ এড়াইল না। সে বলিল, "আমি তাই বলে এখনকার কথা বল্‌ছি না, ও যখন ছোট ছিল তখনকার কথা বলছিলুম। এখন তোমার ঘর গুছিয়ে নিয়ে নীচে এসো, তারপরে তোমাকে বাকি ঘরগুলো আর বাগান দেখাব।"

মিস্ মিলারের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে গ্রাম্য যুবকদের মনে কোনো দ্বিধা রহিল না। ভাগ্যবান্ মিষ্টার র‍্যাগের সঙ্গে দিনের মধ্যে নিদেন্ পাঁচ মিনিটও দাঁড়াইয়া আলাপ করিতে খুব কেজো যুবকেরও এখন আর সময়াভাব ঘটে না। হপ্তা দুয়ের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তির প্রাবল্য দেখিয়া বুড়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু জর্জ গেলের স্বভাবের যেমন পরিবর্ত্তন ঘটিল এমন তো সচরাচর দেখা যায় না। সে আর আগেকার মত বুড়াকে তামাসা করে না; রাস্তায় দেখা হইলে নম্রতার সহিত নমস্কার করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু এত প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে মিষ্টার র‍্যাগ্‌কে খুসি করিতে পারিল না। বুড়া যতই তাহার সঙ্গে অশিষ্টব্যবহার করে সে কিসে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার গৃহে যাতায়াত করিতে অনুমতি পাইবে সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিল। এত করিয়াও শেষ বেচারা বিফলমনোরথ হইয়া বাড়ীর কাছাকাছি অনর্থক আনাগোনা করিয়া মিস্ মিলারের প্রতি তাহার অনুরাগ জনসমাজে প্রচার করিতে বিলম্ব করিল না। শোনা যায় জর্জ একদিন দুপুর বেলায় নাকি সাতান্নবার সেই বাড়ীটার চারদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল।

জর্জের বাপ জাহাজে কাজ করিত। একজন বৃদ্ধা বিধবা পিসি তাহার সংসার দেখিত। সে সম্প্রতি ভ্রাতুষ্পুত্রের পানাহারে দারুণ অরুচি দেখিয়া ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িল। জর্জ্ যখন দেখিল যে চারখানা রুটির জায়গায় দুখানি খাইতে তাহার কষ্ট বোধ হয় তখন সে মনে মনে কল্পনা করিল যে বড় বেশী দিন তাহাকে আর ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না—ব্যর্থ প্রেমের যাতনা হইতে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে ভাবিয়া সে কিছু সান্ত্বনাও অনুভব করিল।

অন্তরঙ্গ বন্ধু জোকে এ কথা বলাতে জো তো হাসিয়া বাঁচে না, "না হে, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করে ফেল্লে। আরো তো ঢের মেয়ে আছে। একজনকে না পাও আরেক জনকে বিয়ে কর—একই কথা।"

গেল্ বিমর্ষ ভাবে বলিল, "মেয়ের অভাব নেই জানি কিন্তু তার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।"

বন্ধু হাসিয়া বলিল, "সকলের চোখে তোমার ব্যবহারটা কেমন অসঙ্গত বলে ঠেক্‌ছে। লোকে কানাঘুষো করছে।"

গেলের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "করুক গে লোকে কানাঘুষো। তার জন্যে আমি সব সইতে পারি।"

জো গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যাই বল বাপু, এরকম করে কখনই তুমি তার মন পাবে না। মেয়েরা বেশ সপ্রতিভ লোক পছন্দ করে। অমন চোরের মত ভয়ে ভয়ে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়ালে সে তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না, বরং কাপুরুষ মনে করে তোমাকে ঘৃণা করবে। তার চেয়ে এক কাজ

কর না—র‍্যাগ্ বুড়ো বেরিয়ে গেলে তার সঙ্গে দেখা কর না ?"

এই অসমসাহসিকতার কথায় গেলের গায়ে কাঁটা দিল। সে স্পষ্টই স্বীকার করিল, "আমার ভাই অত সাহস নেই।"

খানিক চিন্তার পর জো বলিল, "সে এখানে আসবার আগে হাঁসপাতালে সেবিকার কাজ শিখ্‌বে স্থির করেছিল; তুমি তোমার পা বা অন্য যে কোন অঙ্গ যদি দৈবাৎ ভাঙতে পার তাহলে সে নিশ্চয় তোমার সেবা করতে ছুটবে। আমি জানি ঐ সব কাজ তার খুব ভাল লাগে।"

জর্জ্ বলিল, "যদি কখনো কোনো গতিকে পড়ে গিয়ে হাড় ভাঙ্গি সে তো ঢের দূরের কথা। আপাততঃ কি করে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারি সেই পরামর্শ দাও।"

জো বলিল, "তোমার যখন একটা বাইসিক্‌ল্ আছে তখন আর তোমার পক্ষে পড়াটা এমন শক্ত কোথায় ? ধর ঠিক তার বাড়ীর সাম্‌নে তুমি যদি হোঁচোট খেয়ে বাইসিক্‌ল্ সুদ্ধ উল্টে পড় ?"

গেল্ বলিল "আজ পর্য্যন্ত কখনো তো হোঁচোট খেয়ে পড়ি নি।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জো বলিয়া যাইতে লাগিল, "বুড়োটা সে সময় বাড়ী থাক্‌বে না, আর চার্লি ও আমি তোমাকে ধরাধরি করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাব; যখন তোমার জ্ঞান হবে, দেখ্‌বে সে তোমার মুখের দিকে চেয়ে চোখের জল ফেল্‌ছে।"

বন্ধুর কল্পনার দৌড় দেখিয়া গেল্ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর উত্তর দিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রস্তাবে জর্জকে সম্মত বিবেচনা করিয়া জো বলিল, "তা হলে কাল বেলা দুটোর সময় চার্লি আর আমি তোমার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করে থাকব ?"

খানিকক্ষণ কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়া শেষ জর্জ্ বলিল, "আর যদি সে সময় র‍্যাগ্ বাড়ী থাকে ?"

"থাকে তো দেখা যাবে। ঐ সময় তো রোজ সে আড্ডা দিতে বেরোয়।"

সারা সন্ধ্যা গেল্ নির্জ্জন একটা গলির ভিতর কি প্রকারে হঠাৎ হোঁচোট খাইতে হইবে প্রাণপণে তাই অভ্যাস করিতে লাগিল, আর রাত্রি নাগাদ এমনি অভ্যস্ত হইল যে গৃহে ফিরিবার পথে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাইসিক্‌ল্ সুদ্ধ নর্দ্দমায় গড়াগড়ি দিয়া এক গা কাদা মাখিয়া উঠিল। কাজটা সে যত শক্ত মনে করিয়াছিল, দেখিল ঠিক তত শক্ত নয়।

পরদিন ঠিক সময় গেল্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির হইল এবং পড়িবার উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারিত করিতে না পারায় তার মাথাটা মিষ্টার র‍্যাগের শানের সিঁড়ির উপর সবেগে ঠুকিয়া গেল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় বেচারা মাথা তুলিবার সেই চেষ্টা করিল কোথা হইতে পরম বন্ধু জো ছুটিয়া আসিয়া আবার মাথা নাবাইয়া ধরিল। চার্লিও সঙ্গে ছিল, সে ঠাট্টাচ্ছলে এক চপেটাঘাতের দ্বারা গেলের অজ্ঞানোৎপাদনের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিল।

গোলমাল শুনিয়া মিস্ মিলার নীচে আসিতেই জো গেল্‌কে দেখাইয়া বলিল "আমার এই বন্ধুটি পড়ে গিয়ে মাথায় লাগাতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।" চার্লিও যোগ দিল, "বাস্‌রে! পড়া বলে পড়া! মাথাটা এম্‌নি জোরে পড়েছে যে আধ মাইল তফাৎ থেকে লোকে শুনতে পেয়েছে বোধ হয়।"

মিস্ মিলার সন্তর্পণে গেল্‌কে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল যে মাথাটা এক জায়গায় ফুলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শরীর এত অবসন্ন যে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। ব্যস্ত হইয়া মিস্ মিলার বলিল, "তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ ? যাও, ডাক্তার ডেকে আনগে; দেরী কর না যেন।"

জোয়ের বন্ধুপ্রেম উথলিয়া উঠিল।

জো কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "এ অবস্থায় ওকে ফেলে যেতে আমার ভরসা হচ্ছে না। তার চেয়ে আপনি যদি দয়া করে ডাক্তারকে খবর দেন তো বড় উপকার হয়।"

ধরাশায়ী জর্জকে দেখিয়া আর ইতস্ততঃ না করিয়া মিস্ মিলার বাহির হইয়া পড়িল।

মিস্ মিলার যাইতেই গেল্ উঠিয়া বসিল। বিরক্ত হইয়া বলিল, "ডাক্তার আনতে পাঠালে কেন ? ডাক্তার এসে কি করবে ? সে এলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। আমাদের দুজনকে একলা রেখে তোমরা সরে পড়্‌লে না কেন ?"

জো। "সে ফেরবার আগে যাতে তোমাকে বিছানায়

নিয়ে ফেল্‌তে পাবি সেই জন্যে তাকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি।"

গেল। "বিছানায়?"

জো। "হ্যাঁ, দোতলায় গিয়ে তোমাকে বুড়োর বিছানায় শুতেই হবে। তাকে বল্‌ব আমরা ধরাধরি করে তোমাকে নিয়ে গিয়েছি। এখন আর বাজে বকে সময় নষ্ট কর না।"

ধাক্কা দিতে দিতে এই দুই হিতৈষী বন্ধু জর্জ্‌কে মিষ্টার র‍্যাগের শয়নকক্ষে লইয়া গেল।

যতক্ষণ জর্জ্‌ বন্ধুর আজ্ঞাপালন করিবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল ততক্ষণ জো ও চার্লি তাহার কাপড় জুতা খুলিয়া তাহাকে আপাদমস্তক লেপচাপা দিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। ছাড়া কাপড়গুলি কাছে একটা চৌকীর উপর ভাঁজ করিয়া রাখিল; কাজকর্ম্ম সারা হইলে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দুই জনে নিজেদের দক্ষতার আস্ফালন করিতে লাগিল।

জো বলিল "দেখ হে, তোমার জন্যে আমরা এত পরিশ্রম করলুম, তুমি যেন ডাক্তারকে দেখে ফস্‌ করে তাজা হয়ে উঠো না।"

চার্লি বলিল "যদি তারা তোমাকে বিছানা থেকে তুল্‌তে চেষ্টা করে, এমন চেঁচাবে যেন তোমাকে খুন করা হচ্ছে। চুপ্‌! চুপ্‌! ঐ বুঝি তারা আসছে।"

ডাক্তারকে লইয়া ফিরিবার পথে মিস্‌ মিলারের মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ভাগ্নীর মুখে সকল ঘটনা শুনিয়া রাগে অধীর হইয়া বুড়া গেলেদের উদ্দেশে গালি দিতে দিতে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আসিল। সেখানে তাহাদের দেখিতে না পাইয়া নিরস্ত হইতেছিল কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জো দোতলার বারাণ্ডা হইতে ঝুঁকিয়া মিষ্টার র‍্যাগ্‌কে থামিতে অনুরোধ করিল।

তিন লাফে বুড়া সিঁড়ি পার হইল; তার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া জো ও চার্লির মুখ শুকাইয়া গেল। বিছানার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র বুড়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

জো থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল, "আমরা ভালর জন্যেই ওকে এখানে এনেছি।"

মিষ্টার র‍্যাগ্‌ কি উত্তর দিতে গেল কিন্তু তাহার কথা বাহির হইল না, কেবল গলার ভিতর ঘড়্‌ঘড়্‌ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ডাক্তার ঘরে আসিলে সে বিছানা দেখাইয়া দিল। বন্ধু দুটি বেগতিক বুঝিয়া ধীরে ধীরে দরজার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল।

বহু কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মিষ্টার র‍্যাগ্‌ বলিল, "বেটাকে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, শীগ্‌গির নিয়ে যাও।"

বুড়াকে চুপ্‌ করিতে ইসারা করিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গেলের অচেতন শরীরটাকে নাড়াচাড়া করিয়া গম্ভীরভাবে জোকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ লোকটির কি করে এমন সাংঘাতিক আঘাত লাগ্‌ল?"

যতদূর বলা যুক্তিযুক্ত জো ডাক্তারকে বলিল। ডাক্তার বলিল "এখানে এনে খুব বুদ্ধির কাজ করেছ, তা নইলে কি হত বলা যায় না।"

মিষ্টার র‍্যাগ্‌ হাতমুখ নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল "যতই লাগুক্‌ আর যাই হোক, আমি কিছুতেই ও ছোঁড়াকে আমার বাড়ীতে থাক্‌তে দেব না।"

বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া ডাক্তার বলিল, "যেরকম অবস্থা দেখ্‌ছি ও তোমার আশ্রয়ে বেশীক্ষণ থাক্‌বেও না।"

এ কথা শুনিয়াও বুড়ার মমতা হইল না। "কতবার তোমাদের বল্‌ব যে ওকে আমি এখানে রাখ্‌ব না? মর্‌তে হয় তো ওর নিজের বাড়ীতে মর্‌তে বলগে।"

বুড়ার কথা গ্রাহ্য না করিয়া ডাক্তার ব্যবস্থা দিল, "ওকে যেন কোন মতে এখান থেকে নাড়ানো না হয়; এমন কি মূর্চ্ছা ভাঙ্‌লে রোগী উঠতে চাইলেও তাকে তোমরা আবার শুইয়ে দেবে।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া বুড়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "বটে! বাবুকে শুইয়ে রাখ্‌তে হবে! ও হতভাগার জন্যে আমার এ গেরো কেন রে বাপু! ও বেটা আমার কে যে ওর জন্যে আমার ঘর হাঁসপাতাল করে তুলব? ওর কাপড় পরিয়ে ওকে নিয়ে সকলে আমার বাড়ী থেকে বিদায় হও।"—

ডাক্তার সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল "ওকে নিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, আমি বলি বরঞ্চ, এ ঘর থেকে কাপড়

চোপড়গুলো অন্য কোথাও রাখ, তাহলে জ্ঞান হলেও রোগী ঘরের বাইরে যেতে পারবে না।”

ডাক্তারের বিধান শুনিবামাত্র আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে বন্ধু দুটি গেলের পোষাক ও জুতা জোড়াটির ভার গ্রহণ পূর্ব্বক আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

এতক্ষণ বুড়া রাগে অবাক্ হইয়া সব দেখিতেছিল, চীৎকার করিয়া করিয়া তাহার গলা ধরিয়া গিয়াছিল, শেষে ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, “কিন্তু, দেখ”—

বুড়ার কথায় বাধা দিয়া ডাক্তার বলিল, “পথ্য কেবল জল। আর কিছু যেন দিও না।”

মিস্ মিলার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তারের ব্যবস্থা শুনিয়া ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “শুধু জল, ডাক্তার সাহেব ?”

ডাক্তার বলিল “হ্যাঁ। জল যত চায় দিও—তাতে কোন অপকারের সম্ভাবনা নেই। দেখি; আজ হল মঙ্গলবার—শুক্রবারে আবার আস্‌ব, যদি কোন কারণ-বশতঃ সেদিন না আস্‌তে পারি, শনিবার নিশ্চয়ই আস্‌ব; কিন্তু আমি না আসা পর্য্যন্ত রোগীকে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল ছাড়া আর কিছু যেন খেতে দিও না।”

বিছানা নড়িয়া উঠিল দেখিয়া ভয়ে ভয়ে জো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, “ডাক্তার সাহেব রোগী যদি খাবার চায় ?”

ডাক্তার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল “চাইলেই যে দিতে হবে তার কোন মানে নেই। খাবারের জন্যে যদি বেশী অস্থির হয়ে ওঠে তো বল যে এই একটু আগেই সে খেয়েছে। কিছু বোঝবার মত তো ওর অবস্থা নয়, খেয়েছে শুন্‌লেই তাই বিশ্বাস করে চুপ্ করে পড়ে থাক্‌বে।”

ঘর থেকে সকলকে বাহির করিয়া নিঃশব্দে দরজা ভেজাইয়া ডাক্তার নীচে গেল।

গেল্ শুনিতে পাইল নীচে সবাই মিলিয়া কথা বলিতেছে; সাবধানে শয্যা ছাড়িয়া খড়খড়ি খুলিয়া দেখিল তাহার বন্ধুদ্বয় গল্প করিতে করিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছে। বাড়ীর লোকেরা কিসের আলোচনা করিতেছে দরজায় কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল। মিষ্টার র‍্যাগের ভারি গলা শোনা যাইতেছিল কিন্তু কথাগুলা ধরিতে পারিল না। এইটুকু বুঝিল যে ডাক্তারের সঙ্গে এমন একটা কি পরামর্শ চলিতেছে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে হাস্য উদ্রেক করে। ডাক্তার চলিয়া গেলে, বিছানায় পড়িয়া, ব্যাপারটা ক্রমেই কিরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে, গেল্ তাহাই ভাবিতে লাগিল।

বাসনের ঝন্‌ঝনানিতে গেল্ বেচারা জানিতে পারিল যে একতলায় জলযোগের আয়োজন হইতেছে। শুনিল, মিস্ মিলার মামাকে বাগান হইতে চলিয়া আসিতে বলিতেছে; খাবার সময় দুই জনে গল্প করিতে লাগিল। গেলের মনে হইল মামা ভাগ্নীর হাসি গল্প কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হইতেছে।

রাত্রি দশটার পর খাওয়া দাওয়া সারিয়া হাতে একটি আলো ধরিয়া মিষ্টার র‍্যাগ্ রোগীর ঘরে প্রবেশ করিল। মিস মিলার সিঁড়িতে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাকে ক হয় করিয়া বুড়া বলিল, “এইবার বেচারাকে এক গেল দিলে ভাল হয় না ?”

“জ্ঞান হয়ে থাকে তো দিলে ক্ষতি ? ?” “যদি, যদি তখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্নপ্রায়। শূন্যদৃষ্টি দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “অ ত পারিল যে

মিষ্টার র‍্যাগ্ চট্ করিয়া উত্তর দি া। তবু সে রাজপ্রাসাদে।”

মনে মনে বুড়াকে লইয়া যাইবার জন্য য ায়ে দিলুম, করিয়া গেল্ মুখে বলিল, “আমি-এখানে-কি ক

মিষ্টার র‍্যাগ্ বিদ্রূপের স্বরে বলিল “তা ন চাও না ? পরীরা তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে।”

যুবক ধীরে ধীরে বলিল, “আমার মনে পড়্‌ছে— —পড়ে গিয়েছিলুম—আমার কি কোথাও—লেগেছে ?”

বুড়ার মুখে যেন খই ফুটিতে লাগিল, “তুমি তো আপনি পড়ে যাওনি, পরীরা তোমার ভার সাম্‌লাতে না পেরে তোমাকে ফেলে দিয়েছিল কি না, তাই তোমার লেগেছে।”

গেল্ শুনিতে পাইল বাহিরে কে একজন হাসি চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে সে আরো দমিয়া গেল। চোখ বন্ধ করিয়া খানিক ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল,

"এ যে তোমার ঘর দেখ্‌ছি—এ ঘরে আমি কি করে এলুম মিষ্টার র‍্যাগ্‌?"

বুড়া বলিল "এ আমার ঘর কে বল্লে? এ মহারাজের শয়নকক্ষ। তিনি তোমার মর্ত্ত্যলোকে পতনের খবর পেয়ে তাঁর ঘর তোমার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন।"

বাহিরে হইতে কে বলিল, "আর তিনি ভাঁড়ারঘরে তিনটে চৌকী জুড়ে তার উপর শোবেন—যদি পারেন।"

বুড়ার সহাস্য মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "রোগীর খাবার কোথায়? যদিও এ অবস্থায় ও কিছু খেতে পারবে না তবু তো আমাদের চেষ্টা করে দেখ্‌তে হবে।"

এই বলিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া মিষ্টার র‍্যাগ্‌ সিঁড়ির লোকের সঙ্গে পথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। মুর্গির সুরুয়া না একটু রোষ্ট, কি দিলে ভাল ভ্য়। তর্কের পর সিদ্ধান্ত হইল যে একটু সুরুয়া ও কাছে ওয়াইন রোগীর উপযুক্ত পথ্য।

করিতে টু গেলাস ও বাটি রোগীর পাশে টেবিলের উপর

জো ব|র র‍্যাগ্‌ পুনর্ব্বার দরজার দিকে ফিরিয়া বলিল, পরিশ্রম করলুম; লে খবর দেওয়া যাক্‌ যে তার জন্যে আহার তাজা হয়ে উঠো

চালি বলিল কে সাবধান করিয়া দিল, "দেখো, বেশী তুল্‌তে চেষ্টা করে না।"

হচ্ছে। চুপ্‌! তাহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়া মিষ্টার

ডাক্তারবে অল্প পরিমাণে কিছু খাইতে অনুরোধ করিল। সঙ্গে সাক্ষাৎ ত বাকী রহিল না যে সকলে যথার্থ ঘটনা অধীর হইয়া তাহাকে লইয়া তামাসা করিতেছে। সে দরজা ড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায় পাই করিতে লাগিল।

দে অবশেষে স্পষ্টই বলিল, "আমি বেশ সুস্থ হয়েছি; এখন আমি বাড়ী যেতে চাই।"

মিষ্টার র‍্যাগ ব্যস্ত হইয়া বলিল "বাড়ী যাবে বৈকি? এত তাড়া কিসের?"

গেল্‌ সে কথা কানে না তুলিয়া বলিল "আমার পোষাক এনে দাও।"

এ কথায় বুড়া যেন আকাশ থেকে পড়িল। "পোষাক? কার পোষাক? তোমার গায়ে তো কিছু ছিল না।"

ঘুঁষা বাগাইয়া বিছানায় বসিয়া গেল্‌ বলিল, "দেখ্‌ বুড়ো—"

হাসির চোটে অবশিষ্ট দাঁত দুটি বাহির করিয়া বুড়া বলিল, "পরীরা তোমাকে এই অবস্থাতেই ফেলে দিয়ে গেছে। আর তোমাকে এমন ছবিখানির মত—" মনে হইল বাহিরে যেন কাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল আর নীচে সশব্দে একটা দরজা বন্ধ হইয়া গেল। এত সাবধানতাসত্ত্বেও বেশ বোঝা গেল যে কোন কুমারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে।

গেল আর রাগ্‌ মানিল না। একেবারে বিছানা ছাড়িয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ভাল চাও তো শীঘ্র আমার কাপড় এনে দাও বুড়ো।"

"এই আন্‌ছি" বলিয়া মিষ্টার র‍্যাগ্‌ দরজা ভেজাইয়া চলিয়া গেল আর যুবক তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। মিনিট দশেক পরে শুনিল মিষ্টার র‍্যাগ্‌ ও মিস্‌ মিলার কথা বলিতে বলিতে তাহার ঘরের দিকে আসিতেছে। আবার লেপ মুড়ি দিয়া জর্জ্জ শুইয়া পড়িল। ঘরের কাছাকাছি আসিয়া বড়ই দয়ার সহিত বুড়া বলিল, "লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন কাপড় চাচ্ছে; কাপড় পেলে আবার কি চেয়ে বসে তার ঠিক নেই।"

ব্যথিতস্বরে মিস্‌ মিলার বলিল, "আহা বেচারা!" মিষ্টার র‍্যাগ্‌ বলিল "কাপড় পেলে কেমন খুসী হয় দেখো এখন।" দরজা খুলিয়া বুড়া জর্জ্জকে একপাটি মোজা ও টুপি দেখাইয়া ব্যঙ্গ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু গেলের মুখ দেখিয়া বাক্যব্যয় না করিয়া তাড়াতাড়ি হাতের টুপি ও মোজা বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দরজার বাহিরে চাবি লাগাইল। যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গেল, "হুজুরের কোন আবশ্যক হলে ঘণ্টাটা বাজাবেন।"

বন্দী হইয়া জর্জ্জের পলায়নের পন্থা ছাড়া অন্য ভাবনা রহিল না। দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিল দরজা ভাঙ্গিবার নয়। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শেষে শ্রান্তদেহে বিছানায় শুইয়া সকাল পর্য্যন্ত ঘুমাইল।

সকালে চা পানান্তে আবার মিষ্টার র‍্যাগ্‌ গেলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল; কিন্তু এবার ঘরের বাহিরে থাকিয়াই কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। পাছে মামার প্রতি অত্যাচার

হয় তাই মামাকে রক্ষা করিতে মিস্ মিলার কাছাকাছি রহিল। এরকম অবস্থায় গেলের আবৃত হইয়া পড়িয়া থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই; সে নীরবে বুড়ার সকল বিদ্রূপ সহ্য করিল। তাহাকে রাগাইতে না পারিয়া মিষ্টার র‍্যাগ্ শাসাইয়া গেল, "তুমি কেমন আছ জানবার জন্যে লোকে বড় উৎসুক আছে, তাদের তোমার খবর দিয়ে আমি এখনি ফিরে আসছি।" গেল্ খড়খড়ি খুলিয়া দেখিল বুড়া মিথ্যা বলে নাই—রাস্তা জুড়িয়া প্রতিবেশীবৃন্দ তাহার ঘরের দিকে দেখিয়া আপনা আপনি কি বলাবলি করিতেছে আর হাসিতেছে। খড়খড়ি বন্ধ করিয়া গেল স্থির করিল যে রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, সকলে নিদ্রিত হইলে সে গায়ে লেপটা জড়াইয়া জানালা টপ্‌কাইয়া বাড়ী পলায়ন করিবে।

রাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া বুড়ো যখন পাড়ায় বেড়াইতে গেল, তখন গেলের দরজায় কে ঘা দিল।

গেল জিজ্ঞাসা করিল "কে?"

দরজা ফাঁক করিয়া গেলের পোষাক ঘরের মধ্যে কে ছুঁড়িয়া ফেলিল। এমন সৌভাগ্য যে তাহার হইবে, গেলের প্রথমে যেন বিশ্বাস হইল না। যখন দেখিল সত্যই কতকগুলা কাপড় পড়িয়া আছে—তাহার ভ্রম নয়—তখন আনন্দে ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া শিস্ দিতে দিতে কাপড় পরিল। কিন্তু নীচে নামিতে নামিতে রাস্তার লোকগুলার মুখ মনে পড়িয়া জর্জ কিছু বিষণ্ণ হইয়া গেল।

সিঁড়ির নীচে হাসিমুখে মিস মিলার জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন তো?"

গেলের মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে লজ্জায় চাহিতে পারিল না।

গেল্‌কে নিরুত্তর দেখিয়া মিস মিলার একটু বিরক্তভাবে বলিল, "বাঃ, বেশ ভদ্রলোক তো! এত সাহায্য করলুম তার জন্যে কি আমাকে একটু ধন্যবাদও দিতে নেই? মামার কাছে আমাকে কত বকুনি খেতে হবে। তাঁর মতলব ছিল আপনাকে শুক্রবার পর্য্যন্ত আট্‌কে রাখ্‌বেন।"

গেল্ ক্ষমাভিক্ষা করিয়া বলিল, "সকলে আমাকে কি সং ঠাওরাচ্ছে।"

মিস্ মিলার প্রতিবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়? ঘরে অল্প স্বল্প যা আছে নিয়ে আসি।"

গেল্ নিমেষের মধ্যে কেবল থালাখানি নিঃশেষ করিতে বাকি রাখিয়া মনোযোগপূর্ব্বক তাহার আচরণ সম্বন্ধে গৃহকর্ত্রীর বক্তৃতা শুনিতে লাগিল।

"তুমি সকলের হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছ" এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মিস্ মিলার ক্ষান্ত হইল। ম্লানবদনে গেল্ বলিল, "তবে আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।"

মিস্ মিলার হাসিয়া বলিল "আমি হলে গ্রামে থেকেই লোকের মুখ বন্ধ করি।"

গেল্ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিল, "না, আমি চলেই যাব। সমুদ্রের উপর জাহাজে কাজের চেষ্টা দেখ্‌ব।"

মিস্ মিলারের একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "তুমি না গেলেই ভাল হয়; লোকে হয় তো হাসে না, যদি তুমি—"

গেল রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল "যদি আমি কি?"

চোখ নীচু করিয়া মিস্ মিলার বলিল, "যদি, যদি তুমি—"

যুবতীর আরক্ত মুখ দেখিয়া গেল বুঝিতে পারিল যে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে দেরী হইবে না। তবু সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "যদি—কি মেরী?"

যুবতী মৃদুস্বরে বলিল, "আমি এতটা এগিয়ে দিলুম, বাকীটা তুমি বল, আর তুমি হলে পুরুষ মানুষ।"

গেল্ এক দমে বলিয়া ফেলিল, "তুমি কি বল্‌তে চাও মেরী, যদি আমরা বিয়ে করি?"

চমকিয়া মিস্ মেরী একেবারে দুই ইঞ্চি তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "বিয়ে! মাগো, লোকটা বলে কি। এ যে দেখ্‌ছি সত্যই পাগল!"

কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরে মিষ্টার র‍্যাগ্ বাড়ী আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাদের দুজনকেই পাগল ঠাওরাইয়া মহা দুঃখিত হইল।

শ্রীমাধুরীলতা দেবী।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতীয় জাতি সংগঠন।

ভারতীয় ইতিহাসের সেই প্রথম যুগে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় লোক, ভারতের উত্তরাংশে, একত্র সংমিশ্রিত হইয়া, একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইল। ইহাকে ভারতীয় জাতি,—কিংবা আরও যথাযথরূপে বলিতে গেলে—হিন্দু জাতি বলা যাইতে পারে।

১

যমুনা-প্রদেশ ও গাঙ্গেয় প্রদেশ-জয়।—আর্য্য ও আদিম বাসীদিগের মধ্যে সম্মিলন।—বর্ণভেদ সংস্থাপন।—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের বিশ্বাস, ব্রাহ্মণের জীবন।

পঞ্জাব হইতে, আর্য্যেরা প্রথমে যমুনা-প্রদেশে, পরে গাঙ্গেয় প্রদেশে প্রসারিত হইল।

তখনই প্রকৃত ভারতের আবির্ভাব:—গ্রীষ্মপ্রধান দেশসুলভ আব্‌-হাওয়া; নিত্য নিয়মিত মরসুম-বায়ুর প্রবাহ; প্রতি বৎসর, মৃত্তিকা হইতে দুইটি ফসল উৎপন্ন হয়; গম, যব প্রভৃতি শস্যের বদলে, চাউলই লোকের প্রধান খাদ্য; অরণ্যে, বটবৃক্ষ, বড় বড় লতা; বাঘ, কেউটে সাপ, অসংখ্য বানর ও টিয়াপাখী; বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে আরও নিবীড় বন,—অজগর সাপ ও গণ্ডার; শরৎকালে সর্ব্বত্র জ্বররোগ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব। নূতন জীবনের আরম্ভ। মাটীর কুটীর লইয়া কতকগুলি গ্রাম; নৌকার চলাচল আছে এইরূপ নদীর ধারে নব-প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি নগর। নগরের গৃহগুলি হয় ইটের নয় কাঠের। বড় বড় কালো মহিষ, চাষের ও শকটের ককুদবিশিষ্ট ছোট ছোট গরু, ছাগল ও হাতী; দেশীয় অধিবাসীরা সংখ্যায় অনেক; ইহার মধ্যে সকল জাতিরই লোক আছে; কতকগুলি অসভ্য বন্য; কতকগুলি দ্রাবিড়ীয়, ও মোগল জাতীয়—যাহাদের সভ্যতা তখনই কতকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্বেতকায় লোকেরা কৃষ্ণকায়দিগের মধ্যে ইতস্তত ছড়াইয়া ছিল; এক্ষণে তাহারা উপনিবেশ গঠন মানসে একত্র সম্মিলিত হইল। কোন কোন উপনিবেশের অধিবাসীরা একই বংশ হইতে উৎপন্ন; আবার কোন কোন উপনিবেশে, নৈকট্য বা স্বার্থসাম্য ছাড়া তাহাদের মধ্যে আর কোন বন্ধন ছিল না। এই সকল উপনিবেশ বর্ণবিশেষে পরিণত হইল। যেমন বংশ-বিশেষের মধ্যে, সেইরূপ বর্ণবিশেষের মধ্যেও, তাহাদের বিশেষ-বিশেষ নিয়ম, বিশেষ-বিশেষ যজ্ঞ, ও বিশেষ-বিশেষ দেবতা ছিল।

জাতীয় গর্ব্বনিবন্ধন ও কতকটা অবসাদজনক আব-হাওয়ার প্রভাবে, যে সকল ব্যবসায় নীচতাসূচক ও শ্রমসাধ্য, সেই সকল ব্যবসায় আর্য্যগণ ঘৃণিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সকল ব্যবসায় তাহারা ত্যাগ করিল, অথবা দস্যুদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিল। তখন হইতে দস্যুরা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। কিন্তু শূদ্রদিগের সংখ্যা তখন এত অধিক ছিল যে আর্য্যেরা তাহাদিগকে দাসরূপে পরিণত করিতে পারে নাই। শ্বেতকায়দিগের উপনিবেশগুলি, আদিমবাসীদিগের গ্রামসমূহের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইল। এই সকল গ্রাম,—তাহাদের শিকারের পশু, তাহাদের ধৃত মৎস্য, তাহাদের শ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রী শ্বেতকায়দিগের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। ইহারা নিজের ব্যবসা অনুসারে, শ্রেণীবিশেষে বিভক্ত হইল। ইহাদের এই শ্রেণীবিভাগও ক্রমে বর্ণভেদে পরিণত হইল। কালক্রমে আদিম অধিবাসীরা আর্য্যদিগের গার্হস্থ্য পদ্ধতি গ্রহণ করিল এবং আর্য্যগণও আদিমবাসীদিগের ব্যবসায় অনুযায়ী বংশবিভাগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। কৃষ্ণকায়দিগের প্রচলিত প্রথা ও শ্বেতকায়দিগের বদ্ধমূল পূর্ব্বসংস্কার—উভয়ই বর্ণভেদ ব্যবস্থায় আসিয়া পর্য্যবসিত হইল। এই বর্ণভেদের মধ্যে, উচ্চনীচতার দুর্লঙ্ঘ্য সোপান কঠোররূপে সংরক্ষিত হইল।

গৃহরক্ষিত অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধা ও দস্যুদিগের প্রতি অবজ্ঞা বশত আর্য্যগণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে উদ্বাহ বন্ধন বিষম অনাচার বলিয়া মনে করিত। কিন্তু দেশবায়ুর প্রখর উত্তাপের ফলে, আর্য্যগণ বংশ বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়াছিল; সুতরাং বর্ণসাঙ্কর্য্যে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রথমে রাজারাই দৃষ্টান্ত দেখাইল। আর্য্যবংশীয় রাজারা আদিমবাসী

দেশীয় রাজার কন্যাদিগকে রাজ-অন্তঃপুরে গ্রহণ করিতে লাগিল ; এইরূপে রাজ-অন্তঃপুর উপপত্নীর দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল।

***

কেবল একটি শ্রেণী, অনার্য্যের কলঙ্ক-স্পর্শ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, অন্তত স্বকীয় দুর্ব্বলতা গোপন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল :—সেই শ্রেণীই—ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণেরাই বংশপরম্পরাগত আর্য্য প্রথাদির রক্ষক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

ভাষা।—আদিমবাসীদিগের সংস্রবে আসিয়া ঋগ্‌বেদীয় বাক্‌পদ্ধতির অপভ্রংশ ঘটিল। আদিমবাসীরা অতি কষ্টে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রাদি শিক্ষা করিত ও ভাল-করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিত না। বিভিন্ন বাহ্যপ্রকৃতি ও বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আসিয়া, আর্য্যেরা নূতন-নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইল ; পক্ষান্তরে অনেক পুরাতন শব্দ বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইল। ইহা হইতেই, বিবিধ প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি—যাহা প্রাকৃত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণেরা বিশুদ্ধ বৈদিক রীতি অনুসারে কথা কহিতে প্রবল চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং কণ্ঠস্থ করিয়া বেদ-মন্ত্রদিগকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিল ;কেননা তখন কোন প্রকার লিপি-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। যাই হউক, শেষ তিনটি বেদ ও তাহার গদ্য-ভাষ্য "ব্রাহ্মণে" পরিলক্ষিত হয়,—পুরাতন আর্য্যভাষা, রূপান্তরিত হইয়া, একটা কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হইয়াছে—আরও কিছুকাল পরে ঐ ভাষা "সংস্কৃত" হইয়া দাঁড়ায়।

ধর্ম্ম।—যে সকল দেবতা পঞ্চভূতের রূপক মাত্র সেই সকল দেবতা কেবল সেই দেশেরই উপযোগী যেখানে মানুষ কর্ত্তৃক ঐরূপ কল্পিত হইয়াছে। যে শীত-ঋতু মধ্য-এসিয়ায় অতীব কঠোর তাহা গাঙ্গেয় প্রদেশে প্রীতিকর ; কত শীত-ঋতু অতিবাহিত হইল তাহা দেখিয়া, কোন বালিকার বয়ঃক্রম তখন গণনা করা হইত। বসন্ত-ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপের আবির্ভাব হইত ; বসন্তের সমাগমে একটা উৎসব করা আবশ্যক মনে করিয়া এই উপলক্ষে, আর্য্যগণ আদিমবাসীদিগের দেবতাদিগকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল ; তাহাদের মনে হইল, ঐ সকল দেবতাই দেশের প্রকৃত প্রভু ;—বিশেষত সেই শিব, যাহাকে দ্রাবিড়ীয়গণ লিঙ্গাকারে আরাধনা করিত। কিন্তু আর্য্য-দেবতারাও একেবারে বিস্মৃত হন নাই ; তাঁহারা পাছে রুষ্ট হন, আর্য্যগণ সে ভয়ও করিত।

পিতৃগণের পূজা ও গৃহরক্ষিত অগ্নির পূজা, প্রাচীন রীতিনীতি ও প্রথাদির প্রতি শ্রদ্ধা।—নূতন দেশে আসিয়া, আর্য্যগণ তাহাদের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার সম্যকরূপে রক্ষা করিতে পারিল না। তাহাদের সমস্ত জীবনটাকে অনাচার পরম্পর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই অনাচারের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কিরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডলাভ হইবে, শান্তি লাভ হইবে, ইহাই শিক্ষা করিবার জন্য তাহারা ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইল। যে ধর্ম্মের মধ্যে, সর্ব্বসাধারণের পূজা-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মণ সেই ধর্ম্মের পুরোহিত হইলেন। এই পুরোহিত সম্প্রদায় আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যজ্ঞানুষ্ঠানে, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য এক একটা বিশেষ কাজ নির্দ্দিষ্ট হইল। কাহারও কাজ, ভূমি পরিমাপ করা, কাহারও কাজ মন্ত্র পাঠ করা, কাহারও বা কাজ বলিপশুর অন্ত্রাদি-পরীক্ষা করিয়া কার্য্যের ফলাফল নির্দ্ধারণ করা। প্রত্যেক রাজ্যেই, পুরোহিতের পদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পদ। তাঁহার জ্ঞানের উপরেই, তাঁহার ধর্ম্ম-নিষ্ঠার উপরেই, রাজ্যের সৌভাগ্য নির্ভর করে।

স্বকীয় ধর্ম্মবিশ্বাস হইতেই, ব্রাহ্মণ এই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়ায় যে সকল আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল সেই সকল আচার ব্যবহার ভারতে সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণের নিয়ম সংযম ও পযত্নের আবশ্যক হইল। ইহা হইতেই ক্রিয়াকাণ্ডের উৎপত্তি ;—চিরপ্রথা-অনুসারে নিয়মাবদ্ধ সেই সব অঙ্গের ও মুখের ভাবভঙ্গীর অনুষ্ঠান। গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী, পরিচ্ছদ, খাদ্য প্রস্তুত করিবার ধরণ, স্নান করিবার ধরণ, ভোজন করিবার ধরণ, বিচরণ করিবার ধরণ, শয়ন করিবার ধরণ—এমন কি, জীবনের সমস্ত কাজ, কতকগুলা কৃত্রিম নিয়মে আবদ্ধ হইল।

নিয়ম-সংযমের সঙ্গে সঙ্গেই কষ্ট। নূতন দেশের নূতন আব্‌-হাওয়ার মধ্যে আসিয়া, প্রাচীন আচার ব্যবহার

সকল কষ্টকর বলিয়া, অনেক সময়ে মারাত্মক বলিয়া আর্য্যগণের মনে হইতে লাগিল। আর্য্যের জীবন, যেন একটা ধারাবাহিক অনাচার; ও ব্রাহ্মণের জীবন, যেন একটা ধারাবাহিক প্রায়শ্চিত্ত রূপে পরিণত হইল। এই জন্যই তাপসধর্ম্ম একটি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

কষ্ট হইতে বলের উৎপত্তি। প্রত্যেক বাক্যই মন্ত্র, প্রত্যেক কর্ম্মই যজ্ঞ। এই মন্ত্রবলে, এই যজ্ঞপ্রভাবে, দেবতারা ও প্রেতগণ মানুষের দাস হইয়া পড়িল। অনাচারী আর্য্যগণ, সর্ব্বত্রই দৈত্যদানব, সর্ব্বত্রই বৈর-নির্য্যাতনেচ্ছু ছায়ামূর্ত্তি সকল দেখিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহারা কতকগুলি সাহায্যকারী শরেণ্য দেবতাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এইরূপে দেশের সমস্ত লোক, ব্রহ্মের অবতার সেই ব্রাহ্মণকে পূজা করিতে লাগিল। মন্ত্রের পরেই, মন্ত্রের উদ্‌গাতা দেবতা হইয়া পড়িল। যে কৌলিক ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে পৃথক্ পুরোহিতশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, সেই ধর্ম্ম হইতেই আবার পুরোহিতের সর্ব্বময় প্রভুত্ব প্রসূত হইল।

⁂

অতএব ভারতীয় সভ্যতার এই প্রথম উদ্যমটাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, প্রথমে কল্পনা করিতে হইবে, শ্বেতকায়-দিগের এই সকল ক্ষুদ্র উপনিবেশগুলি অসংখ্য কৃষ্ণকায় লোকদিগের মধ্যে, যেন বিলীন হইয়া গিয়াছিল। এই কৃষ্ণকায়-অধ্যুষিত রাজ্যগুলি কোথাও বা আর্য্য-গণের শাসনাধীনে—কোথাও বা দ্রাবিড়ীয়দিগের অথবা মোগলদিগের শাসনাধীনে ছিল। আর্য্যসমাজ পুনর্ব্বার চতুঃশ্রেণীতে বিভক্ত হইল:—পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ, রাজা ও তাঁহার যোদ্ধৃগণ বা ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যে রত বৈশ্য, ও আদিমবাসী বা শূদ্র। এই সকল শ্রেণী, আবার অসংখ্য গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইল।

এই সকল তথ্য হইতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এতদিন আর্য্যগণ, যে আদিমবাসীদিগকে পশু অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করিত না, এখন তাহারা শূদ্র হইল; অবজ্ঞাত বর্ণ হইলেও—তবু একটা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইল। অতএব বর্ণভেদ প্রণালীর প্রতিষ্ঠাই, ভারতীয় জাতি গঠন-চেষ্টা এ সভ্যতাগঠন-চেষ্টার প্রথম নিদর্শন বলিতে হইবে।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্র ও সূর্য্য

চন্দ্র বলে "সূর্য্য তুমি কিসে বড় হও,
রজনী-তিমির নাশি বিদিত কি নও।"
সূর্য্য বলে "চন্দ্র তুমি বলিয়াছ ভালো
ভুলেছ কি আমার প্রসাদে তব আলো।"

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ।

---

* এই বর্ণভেদ প্রণালী গোড়ায় কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার নানা প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীই সমস্ত বর্ণভেদ প্রণালীর ভিত্তিস্বরূপ। Mr. Sherring (Natural history of caste) ও Mr. Schroeder (Indians litteratur und culture) এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আবার M. M. Ibbetson (Report on the census of the Panjab (1881) ও Nesfield (Caste system) বলেন, ব্যবসায়-বিভাগ হইতে অথবা বংশ-বিভাগ হইতে বর্ণ-ভেদ প্রথার উৎপত্তি (Risny, Ethnograph, Gloss.)। আবার Mr. Senart দেখাইয়াছেন, আর্য্যদিগের পরিবার-গঠনের মধ্যেই, বর্ণ-ভেদ প্রথার মূল অবস্থিত (Les castes dans L. Inde)। বেদে, বর্ণের অর্থ—বংশ; দুইটি বংশ, আর্য্যবংশ ও দাসবংশ। আর্য্যবর্ণের সূক্তিগুলির মধ্যে, তিন প্রকার শ্রেণীভেদ পরিলক্ষিত হয়—পুরোহিত (ব্রহ্ম, আরও অনেক পরে ব্রাহ্মণ), অভিজাতবর্গ (রাজন্) ও সাধারণ লোক (বিশ্); কিন্তু ঋগ্বেদের কতকগুলি বচনে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ স্বীকৃত হইলেও, উহা অনেক সময় প্রক্ষিপ্তাংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আরও কিছুকাল পরে, দেখা যায় ব্রাহ্মণ-সংহিতায়, বর্ণের অর্থ শ্রেণী; এইরূপ চারি শ্রেণী ভেদ;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

শ্রেণী ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা দেখাইবার জন্য আমি M. Senart হইতে (পৃ ১৫৪-১৫৫) নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিলাম। "বর্ণ বলিতে শুধু চতুর্বর্ণ বুঝায়, ইহার মধ্যে কোন কড়াক্কর ভেদ নাই; কেবল "হরিবংশের" এক স্থানে আছে—"বৈধ চতুর্বর্ণ।" অন্যান্য গৌণকল্পের বর্ণ; অর্থাৎ সঙ্কর-বর্ণ-সমূহ উক্ত চারিবর্ণের অনুরূপ নহে, পরন্তু বর্ত্তমান কালে আমরা যে সকল বর্ণ প্রচলিত দেখিতে পাই, উহা তাহারই অনুরূপ। উহাদের মধ্যেই প্রকৃত বর্ণভেদ। স্মৃতি গ্রন্থাদিতে আর একটি শব্দ "জাতি"র প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অর্থে বর্ণের অর্থ "জাতি, বংশ।" গাঙ্গেয় প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, আর্য্যগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে আরম্ভ করে"। শতপথ ব্রাহ্মণ (১১, ৪-২); কৌশীতকি উপনিষদ (১১,৭)।

এই যুগের যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহার প্রধান লক্ষণ—দীর্ঘকাল-ব্যাপী ব্যয়সাধ্য জটিল-ধরণের যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান। এরূপ অনেকগুলি বচন পাওয়া যায় যাহার দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে সে সময়ে নরবলি প্রথাও কতকটা প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে হিন্দু দেবতাগণও রূপান্তরিত হয়। রুদ্র হইলেন মহাকাব্য ও পুরাণাদির বর্ণিত সেই নৃশংস দেবতা "শিব-রুদ্র" এবং বিষ্ণু যাহা সূর্য্যের নামান্তর মাত্র সেই বিষ্ণু কোন কোন বচনে, একজন পৃথক্ দেবতা বলিয়া, দেবতাদের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (শতপথ)।

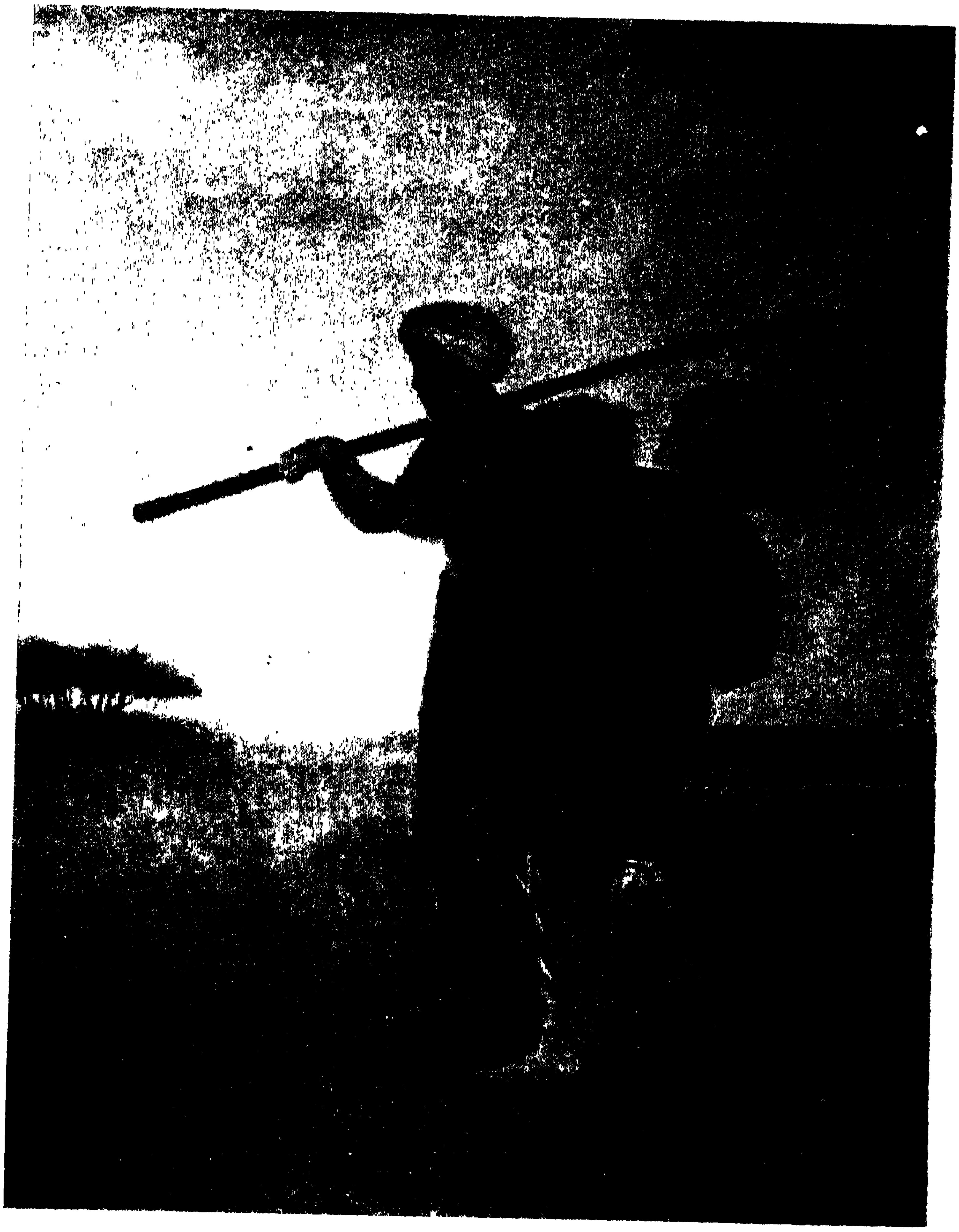

যাত্রী।

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের তৈল-চিত্র হইতে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

"সতীন"

তিন দিন হয় পূজার ছুটীতে শরৎ বাড়ী আসিয়াছে।

সুকুমারী এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। সে যতটুকু চাহিয়াছিল স্বামীর কাছে আজ তার চেয়ে ঢের বেশী আদর পাইয়াছে—তাই তাহার রমণীহৃদয়খানি অকুণ্ঠিত তৃপ্তির মধ্যে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

হাতে নির্দ্দিষ্ট কোনও কাজ ছিলনা; সকালে ডাক আসে, শরৎ পোষ্ট আফিসে চিঠি আনিতে যায়—দুপুর বেলাটা খুঁটানাটী লইয়া কাটায়; কোনও দিন বা একখানা নভেল লইয়া একটু পড়ে। বৈকালে পাড়ার এবাড়ী ওবাড়ী বেড়ায়।

সমস্ত দিনটাই রাত্রির অপেক্ষায় কাটিয়া যায়—রাত্রি যখন আসে, তখন তাহার জন্য প্রীতি ও তৃপ্তি লইয়াই আসে। ষোড়শী সুকুমারী সে প্রীতির উৎস- তাহার অকুণ্ঠ প্রেমই সে তৃপ্তির মূল।

দুপুর। হাতে কোনও কাজ নাই—নভেল পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। হাতের কাছে শরৎ সুকুমারীর ক্যাশ্‌বাক্‌সের চাবিটা পাইল—বাক্‌স খুলিবা মাত্র একটা সুমিষ্ট গন্ধে সমস্ত ঘরটা পরিপূর্ণ হইয়া গেল; যেন সুকুমারীর অমূর্ত্ত প্রেমটুকু গায়ে এসেন্স মাখিয়া শরতের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছোট বাক্‌সটা; ঢের জিনিষ তার মধ্যে। একটা ছোট্ট শ্বেতপাথরের বাক্‌স—কয়েকটা সুদৃশ্য কড়ি—একছড়া শুক্‌নো বকুলফুলের মালা, একটা গন্ধরাজ ফুল, কুশির কাঁটা, আরো কত কি।—আর কতকগুলি চিঠি। সবগুলি কেমন সুন্দর সাজানো—গুছানো।

শরৎ সুকুমারীকে কলিকাতা থাকিতে যে চিঠিগুলি লিখিয়াছে সেগুলি একটা সবুজ রেশমী ফিতা দিয়া বাঁধা—প্রত্যেকখানিতে নম্বর দেওয়া; আষাঢ় হইতে পূজার ছুটী পর্য্যন্ত, ৪৭ খানি;—শরৎ গণিয়া দেখিল। একখানি টানিয়া লইয়া একটু পড়িল।

অন্য একভাগে আর কতকগুলি চিঠি। একখানির উপর সুকুমারীর হাতের মোটা উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা "মা, তোমাদের জন্য আমার মন কেমন করে। আমাকে কবে নিয়ে যাবে?"

শরৎ পড়িয়া ভাবিল, সুকুমারীকে সঙ্গে করিয়া ছুটীতে একবার শ্বশুরবাড়ী বেড়াইয়া আসিবে।

পাশে আর কতকগুলি চিঠি, সেগুলি ভালো করিয়া গুছানো নয়। শরৎ টানিয়া লইয়া একখানি চিঠি পড়িল—আর একখানা পড়িল—তারপর আর একখানা। চিঠি পড়িয়া তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—দৃষ্টির সম্মুখে একখানি কালো যবনিকা কে যেন টানিয়া দিল। সমস্ত ঘরটা, খাট চেয়ার টেবিলগুলি, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহারি চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল!

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, শরৎ চিঠির তাড়ার মধ্য হইতে ৮।৯ খানি চিঠি বাহির করিয়া লইয়া বাকস চাবিবন্ধ করিল।

শুনা যায় মাটী খুঁড়িতে যাইয়া সাপ বাহির হইয়া অনেককে কামড়াইয়াছে। তুচ্ছ খুঁটানাটী করিতে যাইয়া শরৎ এমনি একটা দুষ্ট সর্প বাহির করিয়া বসিল, যাহা তাহাকে দংশন করিয়া তীব্র হলাহল ঢালিয়া দিল।

যাতনার তীব্রতায় শরৎ ভাবিল, সমস্ত বিশ্বসংসারটা বুঝি দানবের সৃষ্টি! এখানে একনিষ্ঠ প্রেম নাই, বিশ্বাস নাই; আছে শুধু প্রতারণা, আর বিশ্বাসঘাতকতা! বিশ্বাস করিয়া যে শাখা ধরিবে তাহাই ভাঙ্গিয়া যাইবে; মানুষগুলি সবাই মুখোস্ পরিয়া আছে, কাহাকেও চেনা যায়না।

শরৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সমস্ত প্রকৃতি আজ তাহার চক্ষে অসুন্দর, অকরুণ!

সুকুমারীর বিড়ালটা লেজ উঁচু করিয়া তাহার পায়ে গা' ঘসিয়া ঘুরিতে লাগিল—শরৎ বিরক্ত হইল; বিড়ালটার কোমলস্পর্শও যেন তাহার গায়ে কাঁটার মত বিঁধিল। সেটাকে এক লাথিতে দূর করিয়া শরৎ চলিয়া গেল। বিড়ালটা 'মিউ মিউ' রবে মানুষের নিষ্ঠুরতাকে ধিক্কার দিয়া, রান্না ঘরের দিকে ভর্জ্জিত মৎস্যের সন্ধানে প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রের গাড়ীতেই শরৎ কলিকাতার উদ্দেশে রওনা হইল। মাকে বুঝাইল, আইন পরীক্ষা দিতে হইবে—কলিকাতায় পড়ার সুবিধা হইবে। সুকুমারীকে কিছুই বলিল না! সুকুমারী বুঝিল, রাগ তাহার উপরেই। অপরাধ যখন খুঁজিয়া পাইল না—তখন সে আর কি

জাতিবিচার নাই, সে যাবতীয় পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া কোলে টানিয়া লইয়া থাকে।

এই শক্তিটি সম্বন্ধে বেশি কিছু জানিতে হইলে পরীক্ষা করা আবশ্যক। আমরা এইবার কয়েকটি পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম: একখণ্ড সীস তুলিয়া লও ও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া মাটীতে পড়িতে দাও। অঙ্গুলি হইতে মাটী পর্য্যন্ত আসিতে সীসখণ্ড কিছু সময় লইবে। উচ্চতা অপরিবর্ত্তিত থাকিলে এই সময় সকল কালেই এক। এখন যদি আর একটি বৃহত্তর সীসখণ্ড লইয়া দুইটিকেই একসঙ্গে পড়িতে দেওয়া যায় তাহারা উভয়ে একই সময়ে মাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এমনি মনে হইতে পারে যে যেটির অধিক ভার সেইটিই আগে মাটিতে পড়িবে, কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহা ঘটে না। এই পরীক্ষাটিই আরো অনেক পদার্থ লইয়া করা যাইতে পারে। একটি মার্বল্ লইয়া দেখিলে কিম্বা একখণ্ড কর্ক গ্রহণ করিলেও সেই একই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু একটি পালক লইয়া পরীক্ষা করিলে মনে হয় সেখানে এ নিয়মটির ব্যতিক্রম ঘটে। মনে এইরূপই হয় বটে, কিন্তু বস্তুত সেখানেও এই নিয়মটিই খাটিয়া থাকে। কোনো পদার্থ পতিত হইবার সময় বায়ু হইতে একটা বাধা পায়। পালক অতি হালকা বলিয়া অন্যান্য সকল পদার্থ অপেক্ষা পালকের গতিকে বায়ু বাধা প্রদান করিয়া সহজেই কমাইয়া দিতে পারে। কিন্তু পালকটি যদি একটি পয়সার উপর রাখিয়া তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পালকটি পয়সার মতই দ্রুত পতিত হইবে, কারণ তখন পালকটির ঠিক নীচে পয়সাটি বায়ুর বাধা সরাইয়া দিয়া পালকটির পতন সহজ করিয়া দিবে।

যদি পৃথ্বীপৃষ্ঠ হইতে ষোল ফুট্ ঊর্দ্ধে কোনো বস্তুকে তুলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা এই ষোল ফুট্ পতিত হইতে এক সেকেণ্ড সময় লইবে। বস্তুটি যাহাই হোক না কেন পতনের সময় সকল পদার্থের পক্ষেই এক। এমন কি যদি পালককে বায়ুর বাধার বাহিরে লইয়া গিয়া ১৬ ফুট পতিত হইতে দেওয়া যায় পালকটিরও নীচে পড়িতে এক সেকেণ্ড সময় লাগিবে। এ পরীক্ষা পৃথ্বীপৃষ্ঠের যে কোনো স্থানে করা যাউক না ফল সকল স্থানেই প্রায় সেই একই হইবে। কলিকাতাতেই হৌক, কিম্বা আন্দামান দ্বীপেই হৌক, প্রশান্ত মহাসাগরের উপর জাহাজে কিম্বা উত্তর কি দক্ষিণ মেরুতেই হৌক, সকল স্থানেই দেখা যাইবে যে বস্তুমাত্রেই ষোল ফুট ঊর্দ্ধ হইতে পৃথ্বীপৃষ্ঠে পতিত হইতে এক সেকেণ্ড সময় লইয়া থাকে।

কাজেই আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে পৃথ্বীপৃষ্ঠের যে কোনো স্থানে যে কোনো বস্তু একেবারে বাধাহীন হইলে এক সেকেণ্ডে ষোল ফুট পতিত হইবে। এখন দেখা যাউক পর্ব্বতের উপরে কি হয়। পর্ব্বতের উপর উঠিয়া পরীক্ষাটি করিলে দেখা যাইবে যে সেখানে কোনো বস্তু ১৬ ফুট পতিত হইতে যত সময় লয় তাহা অপেক্ষা পর্ব্বতের তলদেশে অল্প সময় লয়। পার্থক্য অতি সামান্য বটে কিন্তু তাহা ধরা যায়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি তাহার পৃষ্ঠ হইতে যতই ঊর্দ্ধে উঠা যায় ততই কমিয়া আসে। কিন্তু যতদূরেই উঠি না কেন পর্ব্বতের উপরেই উঠি কিম্বা বেলুনের সাহায্যেই শূন্যে উঠি সেখানে পৃথিবীর এই আকর্ষণ করিবার শক্তিকে কমিতে দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় না।

যতই ঊর্দ্ধে উঠা যাইবে এই আকর্ষণ ততই কমিবে। কতদূরে উঠিলে এই আকর্ষণ কমিতে কমিতে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইবে তাহা স্থির করা বড়ই কৌতূহলজনক সন্দেহ নাই। আমরা পৃথিবী হইতে পাঁচ কিম্বা ছয় মাইল ঊর্দ্ধের সংবাদ জানি, আমরা ৫০০ কি ৫,০০০ মাইল কি আরো বেশি দূরে উঠিলে কি হয় তাহাই জানিতে চাহিতেছি।

ধর কোনো দৈব বলে কোনো লোক পৃথ্বীপৃষ্ঠ হইতে হাজার হাজার মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ধরিয়া লও এখন সে ২,৫০,০০০ মাইল ঊর্দ্ধে গিয়াছে। সেখান হইতে যদি সে পৃথিবীকে দেখিতে চেষ্টা করে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইবে না। সমস্তই তাহার নিকট একাকার বোধ হইবে। আবার যদি তাহার ও পৃথিবীর মধ্যে একখানা মেঘ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তো কথাই নাই, কিছুই দেখিতে পাইবে না।

পৃথিবীর কিছু দেখিতে পাক আর না পাক সে একটা বড় কাজ এই করিতে পারিবে যে যে পরীক্ষা আজ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই সে তাহা পারিবে। তত উর্দ্ধেও পৃথিবীর আকর্ষণ পৌঁছায় কি না এবং যদি পৌঁছায় তাহার পরিমাণ কত পরীক্ষা দ্বারা সে তাহা স্থির করিতে পারিবে। ধর সে একটি মার্বল পাইয়া তাহাকে পতিত হইতে দিল। পৃথিবীর উপরে ইহার কি ফল হয় তাহা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু পৃথিবী হইতে ২,৫০,০০০ মাইল উর্দ্ধে মার্বলটি কিরূপ আচরণ করিবে তাহা বলিবার জন্য সার আইজাক নিউটনের প্রয়োজন হইয়াছে। নিউটনই বলিয়া গিয়াছেন যে এত উর্দ্ধেও পৃথিবীর আকর্ষণ পৌঁছায় এবং সেইজন্য ঐ মার্বেলটি ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবে। এখন নিউটনের এই কথাটির সত্যতা পরীক্ষা করিবার অবকাশ আমাদের আসিয়াছে। লোকটি মার্বেলটিকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহা তো পড়িতেছে না, যেখানে ছাড়িয়া দিয়াছে সেইখানেই রহিয়াছে! এই সময় বোধ হয় আমরা বলিতে চাহিব যে ঐ স্থানে পৃথিবীর আকর্ষণ নাই এবং নিউটনের কথা ঠিক নহে; কিন্তু দেখ মার্বেলটি ধীরে ধীরে নড়িতেছে, উহার গতি ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। ক্রমে গতি বাড়িতে বাড়িতে এখন উহা প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়াছে। উর্দ্ধে আকর্ষণ কমিয়া গিয়াছিল কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, কাজেই মার্বলটি অতি ধীরে নড়িতে আরম্ভ করিলেও তাহাকে নড়িতে হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপ পরীক্ষা কি সম্ভব? নিউটন্ এক উপায়ে ইহাও সম্ভব করিয়াছেন। চন্দ্র আমাদের নিকট হইতে ২,৪০,০০০ মাইল দূরে আছে। নিউটন্ পরীক্ষাটির জন্য চন্দ্রের ব্যবহার করিয়াছেন। চন্দ্র প্রতি সেকেণ্ডেই পৃথিবীর দিকে আসিতেছে। তাহার এই আগমনের পরিমাণ কত তাহা স্থির করিয়া লইয়া পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির পরিমাণ স্থির করা যায়। এইরূপ তথ্য হইতেই নিউটন স্থির করেন যে ২,৪০,০০০ মাইল দূরেও পৃথিবীর আকর্ষণ পৌঁছিয়াছে এবং সেস্থান হইতে কোনো বস্তুকে ছাড়িয়া দিলে তাহা পৃথিবীতে পতিত হইবে। সেখানে ১৬ ফুট আসিতে এক সেকেণ্ডের পরিবর্ত্তে এক মিনিট সময় লাগিবে।

এই সকল তথ্য লইয়া আলোচনা করিয়াই নিউটন্ মহাকর্ষণ সম্বন্ধীয় সত্যটি আবিষ্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পৃথিবীর যে আকর্ষণ তাহা শূন্য পথে দূর দূরান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুর মধ্যে দূরত্ব যত বেশি আকর্ষণও তত কম। ইহা হইতেই নিউটন্ যে নিয়মে দূরত্ব অনুসারে আকর্ষণ কমে সেই নিয়মটি আবিষ্কার করেন। পৃথিবী হইতে ২,৪০,০০০ মাইল দূরে চন্দ্রের নিকটে ষোল ফুট পতিত হইতে যে এক মিনিট সময় প্রয়োজন হয় এই তথ্যটি বড়ই প্রয়োজনীয়। ইহা হইতেই জানা যায় যে যতই দূরে যাওয়া যায় আকর্ষণ ততই কমে। আলোকময় পদার্থ হইতে যেমন যতই দূরে যাওয়া যায় আলোক ততই কম হয়, তেমনি আকর্ষণশীল বস্তু হইতে যতই দূরে যাওয়া যায় আকর্ষণও ততই কম হয়। আশ্চর্য্য এই যে এই উভয় ক্ষেত্রেই হ্রাসের মাত্রা একই নিয়মে হইয়া থাকে। নিয়মটি এই—আকর্ষণ পদার্থের দূরত্বের বর্গের অনুপাতে কমে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্থিত তাহার কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ কাজ করে। পৃথিবীর ব্যাস ৪০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে ইহার উপরিভাগ ২০০০ মাইল দূরবর্ত্তী। কেন্দ্র হইতে ২০০০ মাইল দূরে পৃথিবীর আকর্ষণ জানা আছে, পৃথ্বীপৃষ্ঠ হইতে ২০০০ মাইল উর্দ্ধে এই আকর্ষণের পরিমাণ কত হইবে তাহা উপরের নিয়মের সাহায্যে স্থির করা যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে এই স্থানটির দূরত্ব কেন্দ্র হইতে পৃথ্বীপৃষ্ঠের দূরত্বের দ্বিগুণ, কাজেই দূরত্বের বর্গের অনুপাতে আকর্ষণ কমে বলিয়া সেই স্থানে পৃথিবীর আকর্ষণ পৃথ্বী-পৃষ্ঠের আকর্ষণের চারিভাগের একভাগ হইবে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা যে আকর্ষণের কথা বলিতেছিলাম মহাকর্ষণ বলিতে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি বুঝায়। আমরা কেবল পৃথিবীর আকর্ষণের কথা বলিয়াছি, এবং বলিয়াছি যে এই আকর্ষণ শূন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে; কিন্তু মহাকর্ষণ শুধু পৃথিবীর নহে; তাহা এত সীমাবদ্ধ নহে। কেবল যে পৃথিবী অন্যান্য পদার্থ সকলকে আকর্ষণ করিতেছে এবং অন্যান্য পদার্থ সকল পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে তাহা নহে, সকল পদার্থই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। কাজেই মহাকর্ষণ বলিলে

যাহা বুঝিতে হইবে সংক্ষেপত তাহা এই যে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সেই আকর্ষণ দূরত্বের বর্গের অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই মহাকর্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়মটির প্রয়োজন নিঃশেষ করিয়া বলা অসম্ভব। শূন্য পথে গ্রহগুলির বিচিত্র গতি কেমন করিয়া সম্ভব হয় ইহা হইতেই তাহা জানা গিয়াছে। এই নিয়ম হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখার পূর্ব্বেই ব্যোমপথচারী পদার্থের অস্তিত্ব জানা যায়। তখনো নেপ্‌চুন্ গ্রহ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইংরাজ পণ্ডিত এ্যাডাম্‌স্ ও ফরাসী পণ্ডিত লেবেরিয়ার পরস্পর স্বাধীনভাবে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে মহাকর্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়মটির সহিত গ্রহ উপগ্রহগুলির গতি মিলাইতেছিলেন। তাঁহারা ইউরেনাস গ্রহের গতিতে একটা গোলমাল লক্ষ্য করেন। ইউরেনাসের পরেও যদি আর একটি গ্রহ থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের গোলমাল মিটিয়া যায়। তাহারা এইটি লক্ষ্য করিয়া পুনরায় গবেষণায় নিযুক্ত হন এবং শীঘ্রই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আরো একটি গ্রহ আছে। তারপর লেবেরিয়ার মহাকর্ষণের নিয়ম খাটাইয়া অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে নূতন গ্রহ নেপ্‌চুনের স্থান নির্দ্দেশ করেন ও অনেক অনুসন্ধানের পর গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বেও পৃথিবীর আকর্ষণ আছে এ কথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি। ইহাই যদি সত্য হয় তবে চন্দ্র আজো আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয় নাই কেন? এ প্রশ্ন একেবারে যুক্তিহীন নহে। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু পৃথিবী সূর্য্যে পতিত হইতেছে না কেন? সূর্য্য ও অন্যান্য তারাগুলির মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে তবে তাহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধাইতেছে না কেন? যদি এই সকল পদার্থের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে তবে তাহারা কেন একত্র হইবে না? এই সকল প্রশ্ন সত্ত্বেও আমরা সচরাচর এইরূপ সংঘর্ষের কথা শুনিনা এবং এই প্রকার কোনো বিপদপাতের কোনো আশঙ্কাও আমাদের মনে উপস্থিত হয় না। এগুলি কি তাহা হইলে মহাকর্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়মটির ব্যতিক্রম? জ্যোতিষশাস্ত্রের বাল্যাবস্থায় বোধ হয় সকলে এইরূপই মনে করিত যে এই প্রশ্নগুলির এখনো কোনো উত্তর নাই। অনেকে সত্য সত্যই এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে, কাজেই আমাদের এই সৌর জগৎ কিরূপে এই মহাসংঘর্ষণের বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে তাহা বলা আবশ্যক।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই যে সৃষ্টির প্রাক্কালে যদি পৃথিবী ও চন্দ্র নিশ্চলভাবে তাহাদের আপন আপন স্থানে রক্ষিত হইত তাহা হইলে চন্দ্র আসিয়া পৃথিবীতে পড়িত। ঠিক এইরূপেই যদি সূর্য্য ও সৌর জগতের সকল গ্রহগুলি বেগহীন অবস্থায় সৃষ্ট হইত তাহা হইলে গ্রহগুলি সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাবে ছুটিয়া গিয়া সূর্য্যের উপর পতিত হইত। কিন্তু এই গ্রহগুলির আপন আপন গতি আছে। আমাদের পৃথিবী গ্রহের উপগ্রহ চন্দ্রেরও আপনার একটা গতি আছে। এই গতিই ইহাদিগকে সূর্য্যে পতিত হইয়া ধ্বংস হওয়া হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছে।

পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র একটি বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্রের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে কাজ করিতেছে। ইহাতে কিরূপে চন্দ্রের গতি রক্ষিত হইতেছে দেখা আবশ্যক।

আমরা একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া একখানি চিত্রের সাহায্য লইলাম। চিত্রের ভিতরের বৃত্তটি পৃথিবীকে যেন মাঝামাঝি কাটিয়া লওয়ায় পাওয়া গিয়াছে। চিত্রের উপরিভাগে পৃথিবীর পৃষ্ঠে একটি পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের উপরে ক চিহ্নিত স্থানে একটি কামান বসাইয়া যদি কামানটি হইতে একটি গোলা ক খ অভিমুখে মাঝারি রকম বেগে ছুড়িয়া দেওয়া যায় তবে তাহা প্রথম খণ্ডিত রেখাপথে চ-তে পতিত হইবে। গোলাটি আরো একটু জোরে ছুড়িলে দ্বিতীয় রেখাপথে সেটি পৃথ্বীপৃষ্ঠে ছ-তে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু কামানটিকে অসম্ভব রকম বৃহদায়তন করিয়া লইয়া যদি আমরা গোলার বেগ আরো বাড়াইয়া সেকেণ্ডে কয়েক মাইলে দাঁড় করাই তাহা হইলে গোলাটি গ ঘ ঙ বক্র রেখায় চলিবে। পৃথিবীর আকর্ষণে ইহা ক খ রেখা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বক্রপথ গ্রহণ করিবে কিন্তু আপন বেগের জন্য পৃথ্বীপৃষ্ঠে পতিত না হইয়া গ ঘ ঙ বৃত্তাকার পথে গমন করিতে থাকিবে। এইরূপে গোলাটি সমগ্র গোলকটির চারিদিকে ঘুরিবে। এখন যদি পর্ব্বত ও কামানটিকে সরাইয়া ফেলা যায় তাহা হইলেই সেই

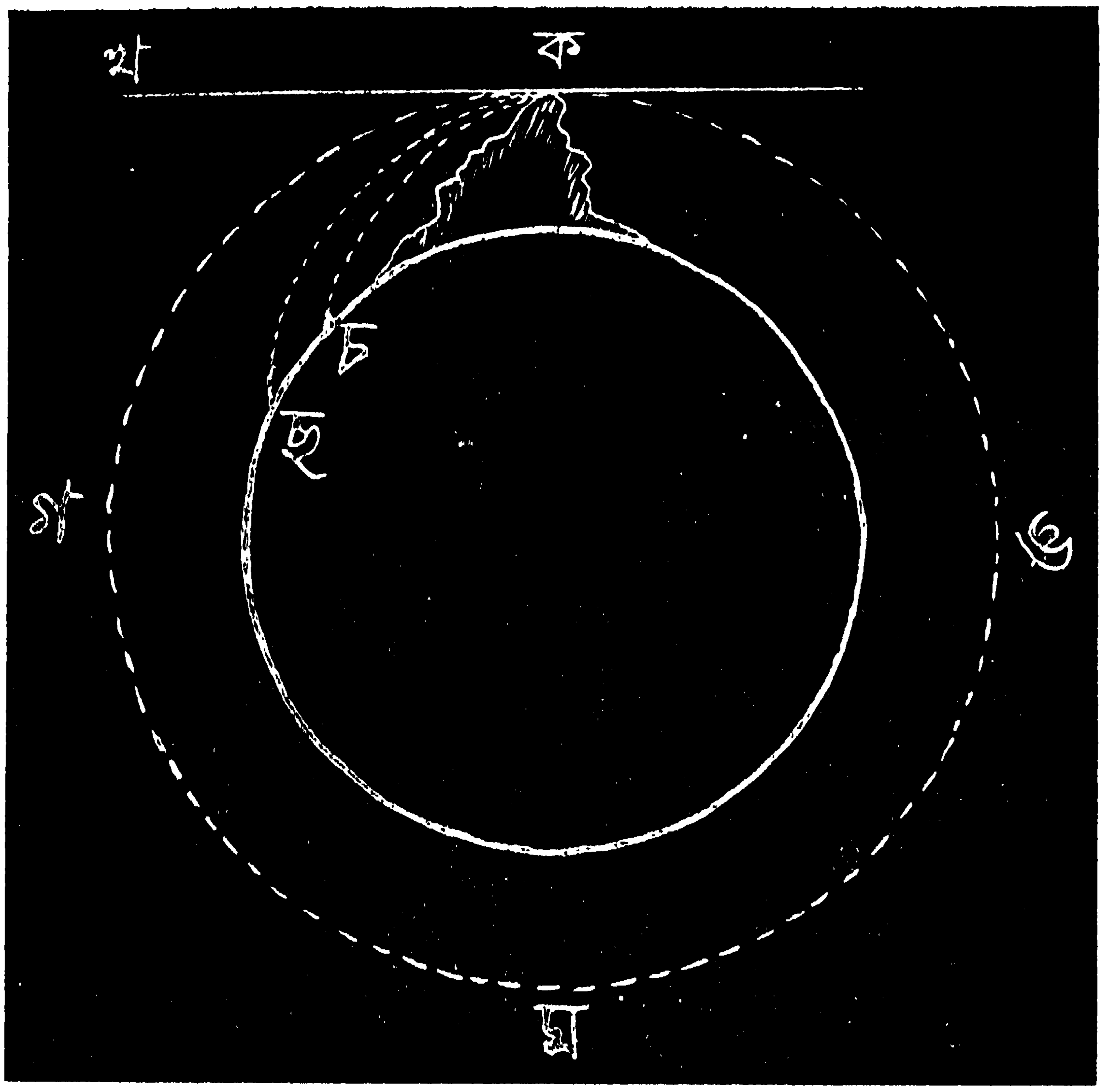

মহাকর্ষণ।

গোলাটি নির্ব্বিবাদে ও নিরাপত্তিতে মহাকর্ষণের জন্য ও আপনার বেগে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে।

এইবার কল্পনাকে আরো একটু তীক্ষ্ণ করিয়া লইয়া চন্দ্রের কথা ভাবিয়া দেখা যাউক। একটি অতি ভীষণ কামান কল্পনা কর। এই কামানটি হইতে ২,০০০ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলককে সেকেণ্ডে ৩,০০০ ফুট বেগে ছুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। শুধু এই কামান ও তাহার গোলাটিকে কল্পনা করিলেই চলিবে না; তাহা পৃথিবী হইতে প্রায় ২৪০,০০০ মাইল উর্দ্ধে বসানো আছে ইহাও কল্পনা করিতে হইবে। এখন এই গোলাটিকে ক খ অভিমুখে ছুড়িয়া দেওয়া যাউক। পৃথিবীর আকর্ষণে গোলাটি ক খ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক গ ঘ ঙ বক্রপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিবে এবং পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে তাহার ৪ সপ্তাহ সময় লাগিবে। কামানটিকে সরাইয়া লও, গোলাটি যুগ যুগান্ত ধরিয়া এই গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছুটিতে থাকিবে। তাহার এই গতিকে বাধা দিয়া থামাইয়া দিতে পারে এমন কোনো শক্তিই এখানে কাজ করিতেছে না। পৃথিবীর আকর্ষণ তাহাকে ক খ পথ হইতে টানিয়া আনিয়া ক গ ঘ ঙ বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

অনেকে হয় তো মনে করিবেন আমরা যে চিত্র অঙ্কন করিলাম তাহা একেবারে কাল্পনিক। কিন্তু ইহা সর্ব্বৈব কাল্পনিক নহে। আমরা কামানটির সন্ধান জানি না বটে কিন্তু গোলাটি আজো পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাইতেছি। চন্দ্রই সেই গোলা। চন্দ্রের গতি দেখিয়া বোধ হয় তাহা আমাদের চিত্রের গোলকটির মত পৃথিবী হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর যেরূপ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে গ্রহগুলির সহিত সূর্য্যেরও সেইরূপ সম্বন্ধ আছে, সেইজন্যই গ্রহগুলি অবিশ্রাম গতিতে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এখন বুঝা গেল কেন্দ্রস্থলে একটা আকর্ষণ থাকিলেও কোনো পদার্থ যথেষ্ট বেগে চালিত হইলে তাহার সেই কেন্দ্রের চারিদিকে একটা বৃত্তাকার গতিতে ভ্রমণ করিতে থাকা অসম্ভব নহে।

মহাকর্ষণের প্রভাবে চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে এবং গ্রহগণ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, কাজেই দেখা যাইতেছে মহাকর্ষণ একটি অতি প্রচণ্ড শক্তি। যে শক্তি পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগুলিকে আপন আপন পথে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া অবিশ্রাম ঘুরাইতেছে, যে শক্তি সৌরজগৎকে যেন একটি অখণ্ড পরিবার করিয়া রাখিয়াছে তাহা যে অতি প্রচণ্ড তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে বস্তুগুলি অতি প্রকাণ্ড বলিয়াই মহাকর্ষণ এত অধিক। আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই সমস্তই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু দুইটি বস্তুর কোনটিই যদি প্রকাণ্ড না হয় তাহা হইলে তাহাদের

মধ্যে আকর্ষণ অবশ্যই অতি ক্ষীণ হইবে। এখন দেখা যাউক আমরা আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারি এরূপ পদার্থ সকলের মধ্যে মহাকর্ষণের পরিমাণ কিরূপ। প্রত্যেকটি প্রায় ২৫ সের ওজনের দুইটি লৌহগোলক লও এবং সে দুটিকে এমন করিয়া রাখ যেন তাহাদের কেন্দ্র দুইটি পরস্পর এক ফুট্ দূরে থাকে। এই দুইটি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তবু এ দুটি নড়িবে না। পদার্থ দুইটির মধ্যে আকর্ষণ আছে সত্য কিন্তু তাহা এত কম যে কোনো চুম্বকের শক্তির সহিতও তাহার তুলনা হয় না। একটি চুম্বক একখণ্ড লৌহকে বেশ জোরেই আকর্ষণ করে, কিন্তু এই দুইটি সমান ভারবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাহা অতি অল্পই। মহাকর্ষণের জন্য এই গোলক দুইটি পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে চায় বটে কিন্তু অন্যান্য কারণে এই দুইটির পরস্পর নিকটবর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে। পদার্থ দুইটিকে যদি এমন করিয়া চাকার উপর স্থাপন করা যায় যে চাকার কোনো ঘর্ষণ না থাকে এবং গমনে কোনোরূপ বাধা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে এই বাধাহীন অবস্থায় গোলক দুইটি মহাকর্ষণের আদেশ পালন করিতে পারিবে; তখন তাহারা ধীরে ধীরে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে এবং সময়ে তাহারা পরস্পর পরস্পরে আসিয়া ঠেকিবে।

মহাকর্ষণ শক্তির পরিমাণ করা যায়; কিন্তু সে কার্য্যের জন্য বিপুল ভারসম্পন্ন পদার্থ গ্রহণ করা আবশ্যক। ১,১৬,৭৬,০০০ মণ ভারবিশিষ্ট দুইটি লৌহগোলক কল্পনা কর। গোলক দুটি নিরেট এবং তাহাদের প্রত্যেকটির ব্যাস ৫৩ গজ। গোলক দুইটি পরস্পর এক মাইল দূরে রক্ষিত হইয়াছে এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরকে মহাকর্ষণ-প্রভাবে আকর্ষণ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে পাহাড় পর্ব্বত কি অট্টালিকা কি আর কোনো কিছু থাকিলেও কিছুমাত্র আসে যায় না। কাচের মধ্য দিয়া যেমন আলোকরশ্মি অপ্রতিহত ভাবে যায় তেমনি যে কোনো পদার্থের ভিতর দিয়া মহাকর্ষণ অপ্রতিহতভাবে কাজ করিতে পারে; কোনো কিছু দ্বারাই এই আকর্ষণকে কমাইয়া দেওয়া যায় না। এই লৌহগোলক দুইটির প্রত্যেকটি অপরটিকে যে বলে আকর্ষণ করিবে (পদার্থ দুইটির পরিমাণ যদিও অনেক, তবু) তাহা বেশি নহে;—তাহা আধ সের পরিমাণ ভারের সমান। একটি ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুদ্র বলে সহজেই এই আকর্ষণকে প্রতিহত করিতে পারে। এখন ধর গোলক দুটির পরস্পরের দিকে আসিবার পথে কোনো বাধা নাই। কোনো দৈব উপায়ে মৃত্তিকার সহিত ঘর্ষণ-জনিত বাধা লোপ করিয়া দেওয়া গিয়াছে, তাহারা একেবারে সমতল ভূমির উপর রক্ষিত হইয়াছে। কোনো বাধা না থাকায় এখন গোলক দুটি মহাকর্ষণ-প্রভাবে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে কিন্তু আকর্ষণ অতি অল্প বলিয়া তাহাদের বেগ এতই অল্প হইবে যে আরম্ভের সময়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন তাহাদের গতি বুঝাই যাইবে না। তাহাদের মধ্যের দূরত্ব এক ফুট্ মাত্র কমিতে অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকটির ছয় ইঞ্চি মাত্র যাইতে অন্তত দেড় ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হইবে। অবশ্য ক্রমেই তাহাদের বেগ বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু তথাপি গোলক দুটি একত্র হইতে তিন চার দিন সময় লাগিবে।

যে মহাকর্ষণ এ ক্ষেত্রে এত ক্ষীণভাবে কাজ করিতেছে সেই শক্তিতেই বিশ্বাকাশের যাবতীয় পদার্থের গতি নিয়মবদ্ধ হইয়াছে। সেই শক্তিই পৃথিবীকে আপন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেয় না; সেই-ই সৌরজগৎকে একটি অখণ্ড পরিবার করিয়া রাখিয়াছে। গ্রহ, উপগ্রহগুলি আপন আপন কক্ষায় নিয়মিতরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং সূর্য্য তাহাদের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহাকর্ষণ-প্রভাবে সকলকে স্বস্থানে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। সৌরজগতের এই বাঁধন মহাকর্ষণের বাঁধন। এই সকল ক্ষেত্রে মহাকর্ষণের শক্তি যে এত অধিক তাহার কারণ এই যে এখানে আকর্ষণকারী এবং আকৃষ্ট বস্তুগুলি অতি প্রকাণ্ড; এক একটি এত প্রকাণ্ড যে শত চেষ্টাতেও তাহাদের আকার সম্বন্ধে আমাদের নির্ভুল ধারণা জন্মেই না। প্রকাণ্ড বলিলে আমরা এখানে কেবল আকার বুঝিতেছি না, বস্তুর পিণ্ডও (mass) বুঝিতেছি; যাহাতে তাহার ভার নির্ভর করে সেই পদার্থ সমষ্টিকেও বুঝিতেছি। মহাকর্ষণ সম্বন্ধে আর একটি নিয়ম আছে যে, যে বস্তুতে পদার্থের (matter) পরিমাণ যত বেশি অর্থাৎ যাহার

পিণ্ড (mass) যত বেশি তাহার আকর্ষণও তত বেশি। এক ঘন ইঞ্চি তুলা অপেক্ষা এক ঘন ইঞ্চি লৌহের আকর্ষণ অধিক, কারণ লৌহখণ্ডের পিণ্ড তুলাটুকুর পিণ্ড অপেক্ষা অধিক, সেইজন্য পৃথিবী তুলাটুকু অপেক্ষা লৌহখণ্ডকে অধিক বলে আকর্ষণ করিবে এবং সেইজন্য তুলাটুকু অপেক্ষা লৌহখণ্ডটির ভার অধিক।

পিণ্ডের সহিতই মহাকর্ষণের সম্বন্ধ, বস্তুর আকারের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। সমপরিমাণ পিণ্ডবিশিষ্ট তুলা ও লৌহখণ্ডের মধ্যে আকারের পার্থক্য যথেষ্ট পরিমাণেই থাকিবে কিন্তু তাহারা পরস্পরকে সমান বলেই আকর্ষণ করিবে। আমরা যে লৌহ গোলক দুইটির কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহাদের একটি কিম্বা দুইটিই যদি লৌহের না হইয়া, তাহাদের ভার অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া, সীসা, তামা, পাথর, কাঠ, জল কিম্বা বায়ুতেই প্রস্তুত হইত, তাহা হইলেও তাহাদের আকর্ষণে কোনোরূপ পার্থক্য ঘটিত না।

সৌরজগতে মহাকর্ষণ অহরহ যে মহাশক্তির পরিচয় দিতেছে পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দেশীয় কল

[মৈমনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলনের নিমিত্ত।]

বিদ্বৎ-সমাগমে বহু বিদ্যার প্রসঙ্গ উঠিবে। কিন্তু সরস্বতী কেবল বিদ্যার নহেন, কলারও অধিষ্ঠাত্রী।

বিশেষতঃ কলারও সাহিত্য আছে, এবং সাহিত্য-পরিষদে কলার সাহিত্যও সাহিত্য গণ্য হইতে পারে।

কিন্তু যখনই দেশের কলার সাহিত্য অনুসন্ধান করি, তখন সে অনুসন্ধান শূন্যে মিশিয়া যায়। গীত বাদ্য নৃত্য—এই ত্রিবিধ কলা মিলিয়া সঙ্গীত। সঙ্গীত কলা নাকি অমর। এই কলা ব্যতীত অন্য কলার সাহিত্য বঙ্গভাষায় নাই।

অনেকে বিদ্যা ও কলার প্রভেদ লোপ করিতে চান। শুক্রাচার্য* এই দুইএর প্রভেদ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা কলা-বিদ্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়া সোনার পাথর-বাটী, ও কাঁঠালের আম-সত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দেন। বিদ্যার প্রতি বিদ্বানের ভক্তি স্বভাবিক; কিন্তু তা বলিয়া কলা ও বিদ্যার প্রভেদ না রাখিলে বরোদার কলা ভবন বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হয়।

কলা-বিদ্যা নাই, এমন নহে। কলার বিদ্যা—ইংরেজীতে science of arts and industries, এক কথায় technology। কিন্তু কে না জানে কালেজে কালেজে science শেখানা হইতেছে। অথচ কারু হইতেছে না বলিয়া কলিকাতায় Technical Institute প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়াছে।

এই technical শব্দই দেখুন। ইহার মূলে সংস্কৃত তক্ষন্—সূত্রধার—দেখা যাইতেছে। সূত্র-শস্ত্র-প্রয়োগ-বিমুখ সূত্রধার কিছুই গড়িতে পারে না। বিদ্যালয়ের Text-book এ সূত্র আছে, শস্ত্র নাই। সূত্র ও শস্ত্র, উভয়ের প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়া তক্ষশালার উদ্দেশ্য।

তবে যাবতীয় কলা স্থূলতঃ দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। ললিত-কলা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তক্ষ-কলা জীবন-ধারণের উপায় চিন্তা করে। দেখা যায় দেশে ললিত-কলাবৎ সরস্বতীর পূজক, তক্ষকলাজীবী বিশ্বকর্মার সেবক। কারণ ত্বষ্টা দেবতার বিশ্বকর্মা, দেবতার তক্ষা ছিলেন। এমন তক্ষা, যিনি মার্তণ্ডের দেহ চাঁচিয়া তেজ খর করিয়াছিলেন।

যন্ত্র ব্যতীত কলা সাধিত হয় না। চিত্রকলাবতের যন্ত্র তুলী, বাদ্যকরের যন্ত্র বাদ্যযন্ত্র, সূত্রধারের যন্ত্র শস্ত্র। কলার—অঙ্গবিশেষের সমবায়ে দ্রব্য করণের—উপায়ের নাম কল; সংক্ষেপে, কলার সাধন বলিয়া কল। ইংরেজী instrument বাঙ্গালা যন্ত্র; ইংরেজী machine বাঙ্গালা কল। শাবল দিয়া গর্ত্ত করিতে পারা যায়; শাবল যন্ত্র। কিন্তু ঢেঁকী ও চরকা কল বলা যায়। বাঙ্গালায়, যন্ত্র সামান্য সাধন, কল অঙ্গ-সমন্বিত বিশেষ সাধন।

* যদ্‌যৎস্যাদ্‌বাচিকং সম্যক্‌কর্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকং।
শক্তো মূকোপি যৎকর্তুং কলাসংজ্ঞং তু তৎস্মৃতং॥

যে যে কর্ম বাচিক, তাহার নাম বিদ্যা। যাহা মূক ব্যক্তিও করিতে পারে, তাহার নাম কলা। বিদ্যা অনন্ত, কলা অনন্ত। তন্মধ্যে মুখ্য বিদ্যা অষ্টাদশ, মুখ্য কলা চতুঃষষ্টি। কলার দৃষ্টান্ত,—বস্ত্র-অলঙ্কার-সন্ধান, মদ্যকরণ, বৃক্ষাদিপালন, কাচকরণ, অস্ত্রশস্ত্র-নির্মাণ, ইত্যাদি।

সাহিত্য-সম্মিলনে ঢেঁকী ও চরকা দেখিয়া চমকিত হইবেন না। যেদিন উদূখল হইতে ঢেঁকীর উদ্ভাবন হইয়াছে, সে দিন দেশের উৎসবের দিন গিয়াছে। এখনও এই ভারতখণ্ডে উখলীর স্থানে ঢেঁকী সর্ব্বত্র বসে নাই।

ঢেঁকী সামান্য কল বটে, কিন্তু উদ্ভাবনে বহুকাল লাগিয়াছে। যন্ত্রবিদ্যার ভাষায় ঢেঁকী একটা দণ্ড। একটা বহু প্রচলিত, দেশের নানা ভাষায় প্রচলিত, শব্দ প্রয়োগ করিলে ঢেঁকী একটা লাদনা (lever), অঙ্কশলা উহার কীলী (fulcrum)। দুই বাহুর অনুপাত ১:৩। এই যে ১:৩ অনুপাত, ইহাই সুবিধাজনক। উখলীতে হাতের জোরে ধান ভানা হয়, ঢেঁকীতে মানুষের দেহের ভারে হয়। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৌশল হইতে পারে না। বস্তুতঃ ঢেঁকীর তুল্য সহজসাধ্য অথচ কার্য্যক্ষম (efficient) যন্ত্র বিরল।

এই ঢেঁকীর তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া পশ্চিমে লাঠা (বড় লাঠা) দিয়া কূপাদি হইতে জল তোলা হয়। উচ্চস্থ কীলীতে লাদনা খেলিতে থাকে। উহার হ্রস্ব বাহুর প্রান্তে দোণ (সং দ্রোণ), কিংবা কুড়ী (সং কুণ্ড) ঝুলিতে থাকে। দোণ পায়ের ঠেলায় নামে, বিপরীত বাহুর ভারে উঠে। এই হেতু দোণে প্রচুর জল উঠে। কুড়ী হাতের জোরে নামাইতে হয়। কাজেই কার্য্যক্ষমতাও অল্প। ঢেঁকীর অনুকরণে উৎপত্তি বলিয়া লাঠাকে ঢেঁকলীও বলে।

দেহের ভারে কাজ করিবার দেশীয় দৃষ্টান্ত মাদ্রাজের পাইকোটা। ইহাও জলতোলা কল। একটা লম্বা ঢেঁকী বলা যাইতে পারে। উচ্চে, কীলীতে অবস্থিত বাঁশের উপর দিয়া মানুষ এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের দুই অগ্রে বদ্ধ দোণ কিংবা কুড়ীতে পরে পরে জল উঠে। এই কল চালাইতে দেখিলে ভয় হয়; মনে হয় মানুষ উচ্চ হইতে পড়িয়া যাইবে। কিন্তু কলের কার্য্যক্ষমতায় অবাক্ হইতে হয়।

ঢেঁকী সামান্য কল, চরকা সেরূপ নহে। প্রথমে তাকুড় (সং তর্কুটী), তারপর চরকা। কিন্তু তাকুড় হইতে চরকা বহু দূরবর্ত্তী। যেদিন কর্ত্তন-চক্র ঘর্ঘর-শব্দে প্রথম ঘুরিয়াছিল, সেদিন ভারতবর্ষে আনন্দের রোল উঠিয়াছিল। প্রচুর ধান্য না পাইলে ঢেঁকী আসিত না, প্রচুর কার্পাস না জন্মিলে চরকা হইত না। সেত অর্থনীতির কথা। যন্ত্র-বিদ্যায়, একাধারে এত যন্ত্রের সুন্দর সমাবেশ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইংরেজী শব্দে চরকার অঙ্গের নাম করিতে হইলে ইহাতে pulley and bearing ত আছেই, crank and pin, combined driving pulley and flywheel ইত্যাদি আছে। ধন্য সেই প্রাচীন শিল্পী, যিনি এরূপ লঘু অথচ কার্য্যক্ষম যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। আধুনিক বিলাতী কর্ত্তনকল চরকার যত অনুকরণ করিতেছে, তাহাতে ততই সূক্ষ্ম সূত্র হইতেছে।

সে কালের কোন্ কল উৎকৃষ্ট না ছিল? কুম্ভকার যখন ভারী চাকায় নিজের শক্তি চালনা করিয়া সে শক্তিতে অল্পে অল্পে মৃৎমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, তখন বিস্ময়ে কে না তাহাকে ধন্য বলে। আশ্চর্য এই কুলালচক্র এদেশে যেমন আছে, প্রাচীন মিশরেও তেমন ছিল। শুধু কুলালচক্র নহে, মিশরে ঢেঁকলীও অদ্যাপি বহু প্রচলিত আছে।

গ্রাম্য কলায় তন্ত্র ও তৈলযন্ত্র অসাধারণ। দেশের তাঁতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিলে শিল্পীর প্রশংসা করিতে হয়। পায়ের চাপে ও হাতের টানে ও ঠেলায় যে কি সূক্ষ্ম শিল্প প্রকাশ হয়, তাহা আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি বলিয়া তাহার গৌরব বুঝি না। সানা বাঁধা, ব-তোলায় নৈপুণ্য অল্প লাগে না। অথচ সমুদয় অঙ্গযুক্ত একটা তাঁতের দাম দশটাকা মাত্র। কোন্ কাল হইতে যে তাঁত চলিতেছে, তাহা কে জানে। বিবর্ত্তনে, কি আকার হইতে যে তাঁত বর্ত্তমান আকার পাইয়াছে, তাহাও জানি না। কত শিল্পী কত দিন কত বৎসর একের পর এক করিয়া অঙ্গ জুড়িয়া তাঁতের বর্ত্তমান আকারে আনিয়াছেন, কত অসুবিধা ভোগ করিয়া কত পরীক্ষা ও কত বৈফল্যের পর এই আকার আনিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতেও মাথা ঘুরিয়া যায়।

তৈলযন্ত্র স্থূল বটে, কিন্তু একটা মুষল আবর্ত্তন করিতে করিতে যে প্রদক্ষিণ করিতে পারে, তাহা ঘনা বা ঘানী না দেখিলে সহজে বুদ্ধিতে আসে না। সাঁওতালেরা দুই খান সোজা কাঠের মধ্যে থলিয়াতে বীজ রাখিয়া চাপিয়া ধরে, বীজ পিষ্ট হইলে তৈল নির্গত হয়। কিন্তু ইহাকে ঘনার

পূর্বরূপ বলিতে পারা যায় না। মুনি ঋষি হৈয়ঙ্গবীন ও ইঙ্গুদী ফলে তৃপ্ত হইতেন, কিন্তু দেশের লোকের নিমিত্ত নিশ্চয় তৈলযন্ত্র ছিল।

আরও দেখি, মানুষের শক্তি সব কাজে কুলায় না। ঘনা বড়, ঘানী ছোট। ঘানীতে একটা গোরু, ঘনাতে দুইটা গোরু ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

গোরুর শক্তি লাঙ্গল ও গাড়ী টানায় ও ভার বহায় লাগাইতেছি। লাঙ্গল-টানায় গোরুর কেবল টানিবার শক্তি লাগে না। দেহের ভারও লাগে। গাড়ী টানাতেও তাই। এই কারণে মোটা ভারী গোরু বেশী লাঙ্গল টানে। গাড়ীতে দেখি, সমান ভূমিতে ভারী দ্রব্য গড়াইয়া লইতে অল্প শক্তি লাগে।

বঙ্গদেশে গভীর কূপ হইতে জল তোলা আবশ্যক হয় না। পূর্ববঙ্গে জমিতে জল-সেচনও আবশ্যক হয় না। কিন্তু বঙ্গ ভিন্ন ভারতের সর্বত্র কূপই গতি। ভারতের এক-তৃতীয়াংশ কৃষি এক কূপজলে চলিতেছে। পশ্চিমে মোঠের দোড়ী কপি-চাকার উপর দিয়া গোরু টানিয়া জল তুলিতেছে। দেহের ভারে কাজ করিবার এই এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। পঞ্জাবে রহট্ (সং অরঘট্ট) কোন কাল হইতে চলিত আছে, কে জানে। শঙ্করাচার্য ও ভাস্করাচার্য ঘটীযন্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কি কারণে জানি না, অরঘট্টের নাম Persian wheel হইয়াছে। চাকার উপর দিয়া ঘট-মালা চালাইয়া জল তোলায় শক্তি যে অল্প লাগে, তাহা রহট দেখাইয়া দিতেছে। অরঘট্ট নামে প্রকাশ যে অরা (Spokes) দীর্ঘ হইত এবং নদীর জলস্পর্শ করিত। অল্পপরিসর কিংবা গভীর কূপে প্রাচীন অরঘট্ট বসাইবার সম্ভাবনা ছিল না। দীর্ঘ অরার প্রান্তে ঘট বাঁধিয়া জলস্রোতে স্থাপন করিলে জলের শক্তিতে চক্র ঘুরে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জলপূর্ণ ঘট উঠে। এই কারণে বোধ হয় প্রাচীন অরঘট্ট একাধারে জলচক্র ও রহট ছিল।*

আশ্চর্য এই, সুতাকাটা চরকা নাম কেবল বাঙ্গালাতে আছে। ভারতের অন্যত্র যে নাম আছে, তাহা অরঘট্ট শব্দের অপভ্রংশ, যেন প্রথমে অরঘট্ট, পরে চরকার উৎপত্তি। বাঙ্গালা চরকা, ওড়িয়া অরট্, হিন্দী রহটা, তেলুগু রাট্। মরাঠীতে কিন্তু চরকী, এবং জলোত্তলন-চক্র রহাট। চরখা ও চরখী শব্দ হিন্দীতেও আছে, কিন্তু বোধ হয় সে নাম তত সাধারণ নহে। সুতাকাটা চরকার নাম রহটা দেখিয়া বোধ হইতেছে, চাকার উপর দিয়া ঘটমালা চালাইয়া জলতোলাও প্রাচীনকাল হইতে আছে। পঞ্জাবে গোরু দ্বারা রহট চালিত হয়। সেখানে দাঁতাল চাকা (crown and spur wheel) প্রয়োগে শক্তি-প্রেরণের দৃষ্টান্ত পাই।

দাঁতাল চাকার আরও দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষ দৃষ্টান্ত, কাপাস হইতে তূলা পৃথক করিবার যাঁতাই। তাহার মুহরী (মুখ), ইংরেজীতে spiral gearing.

দেশীয় কলের এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতেছি, কল কাঠ হইতে লোহাতে আসে নাই। মানুষ ছাড়িয়া কদাচিৎ গোরুর শক্তিতে পঁহুছিয়াছে। অর্থাৎ চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে য়ুরোপে কলের যে অবস্থা ছিল, এদেশের কলের সেই অবস্থা চলিতেছে।

দেশীয় কল মানুষের জোরে চালাইবার নিমিত্ত হইয়াছে। সে নিমিত্ত কাঠ যথেষ্ট। লোহা অনাবশ্যক ভারী হইত। সে কালে মানুষও সুলভ ছিল। যে কাজে মানুষের জোরে কুলায় নাই, সে কাজে গোরু লাগিয়াছে।

বিলাতী কলে লোহার ভাগই অধিক। কোন্ কোন্ কল, সব লোহায় গড়া। লোহার কল ভারী। চালায় অগ্নি। কোন কোন কল চালায় তাড়িত, কদাচিৎ জল।

যন্ত্র বলি, কল বলি, ওজস ব্যতীত চলে না। কাজ করিবার সামর্থ্যকে যন্ত্রবিদ্যায় ওজস্ বলে। যাহার সামর্থ্য আছে, সে ওজস্বী।* বাধা ঠেলিয়া গতি সম্পাদনের নাম

* হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধানে ঘটী যন্ত্রের নাম উদঘাটক, পাদাবর্তের নাম অরঘট্টক দিয়াছেন। বোধ হয় হাতে-টানা উদঘাটক, পায়ে-চালানা-অরঘট্টক. হেমচন্দ্র এই প্রভেদ করিয়াছেন। উদঘাটক একটা সামান্য কপি-চাকাও হইতে পারে। বোম্বাইতে রহাটা পায়ে চালান হয়।

* Energy বুঝাইতে শক্তি-শব্দ প্রয়োগ করিলে power বুঝাইবার শব্দ থাকে না। জোর=power সামান্য কথায় চলে। কিন্তু যখন বলি power of a horse and horse-power এক নয়, তখন জোর ও শক্তি দুইই লাগে। তা ছাড়া, ধীশক্তি, বিচারশক্তি, বাক্‌শক্তি প্রভৃতি শব্দে শক্তির অর্থ energy নহে।

'কাজ'। গতি না হইলে কাজ বলা যায় না। নিদ্রাবস্থায় হাত-পায়ের কাজ থাকে না। ভ্রমণে কাজ করা হয়, কারণ দেহটা একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইতে হয়। ভারী মানুষ বেড়াইয়া অধিক কাজ করে। কিন্তু দেহ জীর্ণ হউক, শীর্ণ হউক, ওজনই কাজের মূল। মন্থরগতিতে দুই ক্রোশ হাটিলে যে কাজ, যে ওজস ব্যয়, ক্ষিপ্রগতিতে দুই ক্রোশ হাঁটিলেও সেই কাজ, সেই ওজস ব্যয়। নদীর ঘাটে নামিয়া জল তুলিলে যত কাজ হয়, নদীর পাড় হইতে দোড়ী ঝুলাইয়া জল তুলিলেও তত কাজ। এক-সেরী দ্রব্য এক হাত উচ্চে তুলিলে এক সের-হাত কাজ বলা যায়। কলসী ও জল যদি দশসের হয়, এবং নদীর পাড় হইতে জল যদি আট হাত নীচে থাকে, তাহা হইলে আশী সের-হাত কাজ হইবে। ঘটীতে করিয়া তুলিলে জলে ঘটীতে দশসের তুলিলেও আশী সের-হাত কাজ হইবে।

কিন্তু যখন দেখি একজন এক মিনিটে, অপর জন দুই মিনিটে একই কাজ করিল, তখন বলি প্রথম ব্যক্তির শক্তি অধিক, দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বিগুণ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে কাজের পরিমাণ দেখিয়া শক্তির পরিমাণ হয়।* ইংরেজী গণনায় এক অশ্বশক্তি বলিলে নির্দিষ্ট পরিমাণে কাজ বুঝায়। বুঝায় মিনিটে ১১০০০ হাত-সের কাজ। ঘোড়ায় যে এত কাজ করিতে পারে, তাহা নহে।

এদেশে ঘোড়া সুলভ নহে। এদেশের গোরু ও মানুষ বিলাতের গোরু ও মানুষের তুল্য জোরাল নহে। নানা পরীক্ষার ফল আলোচনা করিয়া জানিয়াছি, সাত আট ঘণ্টা ধরিয়া এক অশ্বশক্তি কাজ পাইতে হইলে দেশের দশটা গোরু চাই। সে কাজ করিতে চল্লিশজন মানুষ লাগে। অর্থাৎ একটা গোরুর শক্তি পাইতে গেলে চারিজন মানুষ চাই। ইহা অপেক্ষা গোরু কিংবা মানুষ যে অধিক কাজ করিতে পারে না এমন নহে। যদি গোরু মিনিটে ১১০০ হাত-সের, এবং মানুষ ৭০০ হাত-সের কাজ করে, তবে খুব করে বলা যাইতে পারে।

যন্ত্রবিদ্যার এই মূল কথায় আসিবার প্রয়োজন সর্বদা দেখিতেছি। বিনা শক্তিতে কাজ হয় না, কলেও হয় না, এই তত্ত্ব এদেশে যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল। এই তত্ত্ব না জানিয়া অনেক কর্মকার মরুভূমির মরীচিকায় জলভ্রম করিয়াছেন, কল-কল্পনায় সময় অর্থ ও শক্তি বৃথা ব্যয় করিয়াছেন। একটা অস্পষ্ট জ্ঞান আছে যে কলে শক্তি কম লাগে।

ইহার বহু উদাহরণ অনেকে পাইয়া থাকিবেন। এক কর্মকার কলের লাঙ্গল করিয়াছিল। তাহার এবং গ্রামের লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল মানুষ সে লাঙ্গল ঠেলিয়া জমি চষিয়া ফেলিতে পারিবে। কিন্তু বুঝে নাই, যে লাঙ্গল টানিতে দুইটা গোরুর জোর লাগে, তাহা মানুষে পাওয়া যাইতে পারে না। চাকা বসাই, আর যাহাই বসাই, শক্তি-ব্যয় ন্যূন হয় না। বরং চাকার পরস্পর ঘষা-ঘষিতে শক্তি-ব্যয় অধিক আবশ্যক হয়। যদি গোরুর টানা-শক্তির পরিবর্তে তাহার দেহের ভার-শক্তি অধিক লাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে কলের লাঙ্গলে অধিক কাজ পাইবার আশা করা যাইতে পারে। কেবল গ্রাম্য কর্মকার কেন, সরকারী কৃষিবিভাগে বিলাতী লাঙ্গল এদেশে চালাইবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। এদেশের গোরুর জোর বিলাতের ঘোড়ার জোরের সমান মনে না হইলে এই সব পরীক্ষার প্রয়োজনই হইত না।

এক ব্যক্তি কলের ঢেঁকী করিয়াছেন। একজন লোক হাত দিয়া চাকা ঘুরাইয়া ধানের তুষ ছাড়ায়। কিন্তু জানিতে চাই, দেহের ভারে যে কাজ হইতেছে, সে কাজ হাতের টানায় আসিতে পারে কি?

অনাবৃষ্টির সময় বহু কৃষক দমকল আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু জানে না অল্প সময়ে যদি বেশী জল তুলিতে হয়, বেশী শক্তিও চাই। এক জন কি দুই জন মানুষ হাতের টিপনে জমির আবশ্যক জল কদাপি তুলিতে পারে না। সরকারী কৃষিক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, হাজার টাকায় দমকল কেনা হইয়াছে, গ্রাম্য কৃষক তাহাতে জল তোলা দেখিয়া দেশীয় সেঁঅনী ছাড়িবে। বড় দমকলে বেশী জল উঠে বটে, কিন্তু কত শক্তি লাগে?

এইমাত্র এক ভদ্রলোক এক কল্পনা বলিতেছিলেন।

---

* ইংরেজীতে এক পৌণ্ড ওজনের জিনিস এক ফুট উপরে তুলিলে এক ফুট-পৌণ্ড কাজ ধরা হয়। কিন্তু পৌণ্ড দেশে প্রচলিত হয় নাই, ফুট অপেক্ষা হাত আমরা সহজে বুঝি। ১৮ ইঞ্চিতে হাত ধরিলে এক সের-হাত—প্রায় ৩ ফুট-পৌণ্ড হয়।

ঘড়ীতে দম দিলে ঘড়ীর চাকা ঘুরে। অতএব একটা বড় ঘড়ী লাগাইয়া পাখা টানাইলে লোক লাগিবে না। সুবিধা বটে, কিন্তু যে পাখা টানিতে একজনা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে ততঘণ্টা টানিবার মোটা ও লম্বা ইস্প্রিং মুড়িতে একজন লোকও দরকার হইবে। একজনেও পারিবে কি না সন্দেহ।

ভুলের উৎপত্তিও বুঝিতে পারা যায়। একখান বড় পাথর নড়াইতে পারি না। কিন্তু শাবলের চাড়া দিয়া অক্লেশে দূরে লইতে পারি। পাথর নড়ানা কেন, সেকালের এক গ্রীক গাণিতিক গণিয়া বলিয়াছিলেন দাঁড়াইবার একটু স্থান পাইলে শাবল দিয়া পৃথিবীটা উল্‌টিয়া দিতে পারি।

শাবল দিয়া পাথর নাড়িতে পারা যায়। অতএব শাবল এমন যন্ত্র যে তদ্দারা মানুষের শক্তি বাড়িয়া যায়। এইরূপ জ্ঞান হওয়া আশ্চর্য নয়। বস্তুতঃ শক্তিপ্রয়োগে একটা কথা ভুলিয়া যাই। সে কথাটা সময়-ব্যয়। সময় দিলে অল্প শক্তিতে কাজ যত হয়, সময় না দিলে সে শক্তিতে তত কাজ হয় না। কাজের পরিমাণ ঠিক থাকে। সময় বাঁচাইতে চাহিলে শক্তি বাড়াইতে হইবে, শক্তি বাঁচাইতে চাহিলে সময় বাড়াইতে হইবে।

আর এক কথা আছে। গণিতে যাহা সুসাধ্য বলে, কাজে তাহা সুসাধ্য না হইতে পারে। কাজে যে সব স্থলে সুসাধ্য হয় না, তাহা আকিমিদিজের দম্ভ বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়। তিনি পৃথিবীর বাহিরে দাঁড়াইবার একটু স্থান চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বলেন নাই শাবল-খানা কত লম্বা চাই।

বিদ্যালয়ে বালকও ত্রৈরাশিক করে; বলে, যদি দশ জন আট ঘণ্টা খাটিয়া একশত দিনে একটা বাড়ী গাঁথে, তাহা হইলে একহাজার লোক খাটিলে বাড়ীখানা এক দিনে গাঁথা হইতে পারে, চারি লক্ষ আশী হাজার লোক জুটাইতে পারিলে এক মিনিটেই বাড়ী খাড়া হইবে!

শিল্পী ও বিক্রেতার নিকট এইরূপ ত্রৈরাশিক শুনিতে পাওয়া যায়। শিল্পী উৎসাহে ত্রৈরাশিক করে, বিক্রেতা বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে করে। প্রথম ঘণ্টায় চারি মাইল পথ চলা যাইতে পারে, কিন্তু পরে পরে আট ঘণ্টায় বত্রিশ মাইল পথ চলা যে-সে লোকের কর্ম নহে।

তবে কলে করে কি? কলে শক্তিপ্রয়োগের সুবিধা করে। দুইটা গোরু পিঠে করিয়া দুই মণ ভার বহিতে পারে, কিন্তু রাস্তা ভাল হইলে গাড়ীতে দশ মণ পারে। অতএব একই শক্তিতে কাজ পাঁচগুণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু যদি গাড়ীর গড়ার দোষ থাকে, চাকায় তেল না থাকে, তাহা হইলে দশ মণ ভার বহিয়া লইতে পারে না, গাড়ীর কার্যক্ষমতা কমিয়া যায়। চালক যত শক্তি প্রয়োগ করে, কলে তত শক্তি পাইলে কল উৎকৃষ্ট। কিন্তু এমন কল হইতে পারে না। কলের ভার, চাকা দোড়ী প্রভৃতির ঘষাঘষিতে শক্তির অপব্যয় হয়। ঘরের কথা ধরুন। ভাত রাঁধিতে যত তাপ আবশ্যক, পাচক হয়ত তাহার বিশগুণ তাপ প্রয়োগ করে। কতক তাপ হাঁড়ী উনান গরম করিতে ব্যয় হয়, কতক বায়ুতে চলিয়া যায়, হাঁড়ীতে লাগে না। উনানের দোষে কাঠ যে বেশী পুড়ে, তাহা গৃহিণী মাত্রেই জানেন।

শিল্পীর মাথা, কর্মকারের হাত একত্র না হইলে দেশে নূতন কল জন্মিবে না। প্রয়োজন না থাকিলে মূঢ়ও নড়ে না। দুঃখের বিষয় আমরা অভাব বোধ করিতে পারি না। অভাব বোধ করিতে না করিতে বিদেশী কর্মকার আমাদের ঘরে বহু কল পহুছাইয়া দিয়াছে। নগরে নগরে সেলাইর বিলাতী কল ঘর্ঘরশব্দে ঘুরিতেছে, যুবক 'বাইকের' বাতিকে মাতিয়াছে, নিষ্কর্মা 'গ্রামোফোনে' চাবি দিয়া পাড়াপড়শীর কান ঝালাপালা করিতেছে। এই সব দেখিলে বিদেশীর মনে হইবে, এদেশ কলের দেশ। কিন্তু কে না জানে যখন একটা পেঁচ আটকাইয়া যায়, তখন ঘর্ঘরানি ও পেঁ-পোঁ-আনি সব বন্ধ হয়। তখন ব্যবসায়ী বিশ্বকর্মার দোকানে শরণ লইতে হয়। পরের কাঁধে ভর দিয়া লম্বা হওয়া বেশীক্ষণ চলে না।

এমন কথা নয় যে, পৃথিবীর শ্রমবিভাগ উঠিয়া যাউক, যিনি 'বাইকে' চড়িবেন তিনি 'বাইক' গড়িয়া চড়ুন। কথাটা এই, সকল দিকেই শিল্পী ও কর্মকারের অভাব দেখিতেছি। পুরানা তাঁতে পরিণত করিতে অধিক

গুণী পণ্য আবশ্যক হয় না। তথাপি ঠক্‌ঠকি তাঁত এত অল্প চলিতেছে কেন?

ময়ূর পুচ্ছ দেহে সংযুক্ত না হইলে প্রয়োজনের সময়ে খসিয়া পড়িতে পারে। তখন দাঁড়কাকের দুর্দশা ও বিভ্রমের সীমা থাকে না।

বাহ্য আড়ম্বর নাই ধরিলাম। কৃষিই আমাদের অধিকাংশের জীবিকা। দিন দিন মুনিশ-জনের যেরূপ অভাব হইতেছে, কৃষিকর্মে কিছু কিছু কল না লাগাইলে কৃষিও অসাধ্য হইবে। গ্রামবাসী কৃষকমাত্রেই জানে ধান রোয়া ও ধান কাটার সময় সকলেরই লোক দরকার হয়। ধান-রোয়া কল ও ধান-কাটা কল যদি কেহ উদ্ভাবন করে, তাহা হইলে কৃষকের যে কত উপকার হয়, তাহা বলিতে হইবে না। বিলাতী কলের ভরসা বৃথা। সে কল বিলাতেই চলিতে পারে, এদেশে পারে না। কই সে অধ্যবসায়ী শিল্পী, যিনি অভাব বুঝিয়া কল্পনানেত্রে কল দেখিয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন? বিলাতী আদর্শও আছে, কই সে কর্মকার যিনি সে আদর্শকে এদেশের উপযোগী করিয়া দিবেন?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দুইটি তত্ত্ব সভ্য মানবের চিন্তাস্রোত পরিবর্তন করিয়াছে। এক, বিবর্তনতত্ত্ব; দুই, ওজসের স্থায়িত্ব-তত্ত্ব। মানুষের পূর্বপুরুষ বানর কিনা, কেবল সে বিতর্কে নহে, জ্ঞানের যাবতীয় ভাণ্ডারে বিবর্তনের কুঞ্চিকা লম্বিত হইয়াছে। যে পথ দিয়া য়ুরোপ বর্তমান স্থানে উঠিয়াছে, অবিকল সে পথ না ধরি, সোপান দিয়া উঠিতে হইবে। প্রভেদ এই, য়ুরোপ এক এক ধাপ উঠিয়া ক্লান্তি অপনোদনের বহুকালক্ষেপ করিয়াছে, এদেশ গন্তব্য দৃষ্টি করিয়া কালক্ষেপ সংক্ষেপ করিতে পারিবে। এক রাত্রে কলকৌশলে য়ুরোপ দক্ষ হয় নাই, এক রাত্রে এদেশও হইবে না। য়ুরোপে লোহার কাল; এদেশে কাঠের কাল অদ্যাপি চলিতেছে। এখন কিছুদিন লোহা ও কাঠ লইয়া না কাটাইলে, কাঠ বাঁশ হইতে একেবারে লোহা ধরিলে বিবর্তনের ক্রম ভঙ্গ হইবে।

এতদিন শক্তির অভাবও ছিল না। মানুষ, গোরু সুলভ ছিল। গ্রামে এখনও গোশক্তি সুলভ। সুতরাং মানুষশক্তির পরিবর্তে গোশক্তির প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্রশক্তি আরও সুলভ বটে, কিন্তু সে যন্ত্র নির্মাণ করিতে বিশ্বকর্মার কারখানা চাই। মোটা মোটা লোহা গড়া পেটা ঢালা চাঁচা কোঁদা প্রভৃতি কাজ সাধ্য না হইলে বাষ্পীয় যন্ত্র নির্মিত হইতে পারে না। তা ছাড়া জটিল কল মাঝে মাঝে বিগড়াইয়া যায়। কেবল শহরে কারিকর, দক্ষ কারিকর কলের দোষ শোধন করিতে পারে। সব কল কি শহরেই বসিবে?

যদি গ্রামে ছোটখাট কল চালাইতে পারা যায়, তাহা হইলে শহরের আবর্জনা কমিয়া যায়, গ্রামের লোকের শিক্ষা হয়, কৃষির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য নির্মাণ চলিয়া সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের জীবননির্বাহ হয়। আজি কালি রেল ষ্টীমার দ্বারা পণ্য বহনের সুবিধা হইয়াছে। সুতরাং শহরে পণ্য উৎপাদন না হইলে ক্ষতি হইবে না। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য গ্রামে উৎপন্ন হইয়া শহরে আসিতেছে। যে গ্রাম্যকলা সমাজের নাড়ী স্পন্দিত করিতেছে, তাহাকে অকস্মাৎ সংক্ষুব্ধ হইতে দিলে মঙ্গল হইতে পারে না। বহুকালের সমাজ-কলে একেবারে বহু শক্তি চালনা করিলে সে কল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে। বহু শক্তি-সম্পন্ন বাষ্পীয় যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রাণবায়ু প্রবল বেগে বহিতে দিলে দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে না।

ত্রয়স্ত্রিংশ কোটি দেবতার মধ্যে অগ্নি একা নহেন। বরুণ পবন তপন দেবের আরাধনা যদি য়ুরোপ আমেরিকায় হইতে পারে, এই দেবতার দেশে সে আরাধনায় কিছুমাত্র লজ্জার হেতু নাই। অগ্নির গুণ এই, অল্প স্থানে থাকিয়া বহু বল প্রকাশ করেন। বিশেষ গুণ এই যখন তখন যেখানে সেখানে ইহাঁকে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বরুণ দেব নদীরূপে আছেন বটে, কিন্তু কখন স্ফীত, কখন শীর্ণ হইয়া প্রায়ই মৃদুভাবে বিচরণ করেন। আমেরিকার নায়গারা জলপ্রপাতে লাখ লাখ অশ্বশক্তি লুক্কায়িত ছিল, মানুষের মত মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। এ দেশে কাবেরীর জলপ্রপাতে কত কাজ হইতেছে। জলপ্রপাত না থাকিলেও বঙ্গদেশে নদীস্রোত আছে। জলের বেগ তেমন হইলে, দুই এক অশ্বশক্তি সংগ্রহের কল করায় ব্যয়-বাহুল্য কিংবা কৌশল-বাহুল্য আবশ্যক হয় না।

নদী দিয়া প্রত্যহ ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে। পাখা ঘুরাইয়া ষ্টীমার চলে। নদীস্রোতে পাখা বসাইলে জলচক্র হইবে না কি?

বরুণ অপেক্ষা পবন লঘু-প্রকৃতি এবং কাম-চারী। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান ব্যতীত অন্যত্র পাঁচ মাস মাত্র ইহাঁর ভরসা করা যাইতে পারে। তাহাও সব দিন নয়, সব স্থানে নয়। ইহাঁর প্রধান দোষ, ইনি কখনও ভীম কখন শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন। তথাপি স্থানকাল বিবেচনা করিয়া চারি পাঁচ মানুষশক্তি অক্লেশে কাড়িয়া লইতে পারা যায়।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় তপনদেবের রুদ্রমূর্ত্তি নাই। বোধ হয় এই কারণে সে দেশে তপনতাপ সংগ্রহে লোকে মনোযোগী হয় নাই। এ দেশে আমরা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া তপনতাপ সর্বদা স্মরণ করিতেছি, প্রচণ্ড দেখিয়া ঘরে লুকাইতেছি। বিজ্ঞানবিৎ বলেন একসের জল এক শতাংশ উষ্ণ করিতে প্রায় এক সহস্র হাতসের কাজ আবশ্যক হয়, এবং কৌশলে সেই জল হইতে তত কাজ বাহির করা যাইতে পারে। তাপকে কাজে পরিবর্তন করিতে কিছু অপব্যয় হইবে। তথাপি এক শতাংশ উষ্ণ একসের জলে এক মানুষশক্তি লুক্কায়িত আছে। কই সে বৈজ্ঞানিক, কই সে শিল্পী, যিনি রৌদ্র ধরিবার কৌশল দেখাইয়া দিবেন?

মানুষের জোরে চলিবার কল মানুষের ইচ্ছায় চলে, থামে। যখন অন্যশক্তি লাগাইতে যাই, তখন চালকের সঙ্গে সঙ্গে চালিতের রূপ পরিবর্তন আবশ্যক হয়। সে পরিবর্তনেও শিল্পী আবশ্যক। কিন্তু লোকে কথায় বলে ঘোড়া হইলে ঘোড়ার চাবুকের জন্য আটকায় না।

কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

বাজিপ্রভু দেশপাণ্ডে

শুভ্র মেঘের বলাকামালা মাথায় করিয়া ভীমতুঙ্গ সহ্যাদ্রির শিখরশ্রেণী ভীমা, নীরা, কৃষ্ণা ও গোদাবরীর নীরধারায় বিজড়িত হইয়া যে শ্যাম হাস্য-রেখায় ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিলে মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়;—কিন্তু তাহার শ্যাম অঙ্গে প্রতিপালিত হইয়া যে সমস্ত বীর পুরুষ চিত্ত-সৌন্দর্য্যে দিক প্রভাসিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহিনী শুনিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ইহার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; বাজিপ্রভু দেশপাণ্ডে এই বীরবৃন্দের

বীরবর বাজিপ্রভু দেশপাণ্ডে।

মধ্যে অন্যতম। মহারাষ্ট্রের গৌরবময় ইতিহাসের কিয়দংশ তাঁহার শোণিত-অক্ষরে লিখিত হইয়াছে।

শিবাজির অভ্যুদয় ও স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা তৎকালে সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশকে কিরূপ উদ্বোধিত ও আশাপ্রণোদিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা তৎকালের জাতীয় সাহিত্য অক্ষরে অক্ষরে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। মহারাষ্ট্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—মহারাষ্ট্রের স্বরাজ্যের অভিযান আগত হইয়াছে, এই কথা শোনা যাইত। মহারাষ্ট্র কবিগণও পুরাণ গাথা পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন ছন্দে স্বরসংযোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাজেই শিবাজির উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সহজে উন্মুক্ত হইয়াছিল।

শিবাজির প্রতি ভবানীর অনুগ্রহ, ভূগর্ভে নিহিত অভূতপূর্ব্ব সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্তি প্রভৃতি জনরব মহারাষ্ট্রের জাতীয় চিত্তকে আরো প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। একে

একে অরণ্যের সমস্ত সর্দ্দারই শিবাজির আনুগত্য স্বীকার করিল, কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইল একমাত্র সর্দ্দার বাজিপ্রভু। কিন্তু শিবাজি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বলক্ষয় করিতেও স্বীকৃত হইলেন না; তথাপি বাজিপ্রভুর অভিযান শিবাজির মহৎ সংকল্পের সম্মুখে বিরাট বাধারূপে দণ্ডায়মান হইল। বাজিপ্রভু শিবাজির সমস্ত চেষ্টাকে বাতুলের দুর্বুদ্ধি বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিবাজি যেন কাহার ইঙ্গিতে অবিচল হইয়া রহিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এমন দিন আসিবে যেদিন এই বীর পুরুষ জননী জন্মভূমির জন্য প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

সত্যই একদিন শিবাজির ইচ্ছা পূর্ণ হইল। পথিমধ্যে একদিন বাজিপ্রভু শিবাজিকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কি এক অচিন্তনীয় কারণে বাজিপ্রভু এই প্রথম শিবাজির সৌম্য আনন সন্দর্শন করিয়া যুদ্ধের মধ্যস্থলে শিবাজির পদতলে স্বীয় তরবারি রাখিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক শিবাজিকে মহারাষ্ট্রের একচ্ছত্র নায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বাজিপ্রভু সেই অবধি শিবাজির একজন অন্তরঙ্গ সহায়ক ও পার্শ্বচররূপে স্থান পাইলেন, এবং এই বাজিপ্রভুর বীরবত্তায় ও যুদ্ধকুশলতায় শিবাজি অনেক যুদ্ধে বিজয়ী হইতে লাগিলেন।

কনকগিরির যুদ্ধে আফজল খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক শিবাজির ভ্রাতা সাম্ভোজিকে হত্যা করায় এবং তৎপর ভবানী গণ্ডকী দেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন ও নিরীহ তুলজি গ্রামবাসী হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করায় শিবাজির রোষবহ্নি দ্বিগুণ বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে পঞ্চ সহস্র সাদি, সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও বহু সংখ্যক কামান লইয়া বলদৃপ্ত আফজল খাঁ মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হইলেন। বিজয়গড়ের সুলতানের নিকট আফজল খাঁ প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছিলেন, যে, শিবাজিকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিবেন এবং তৎবিনিময়ে আফজল খাঁ মহারাষ্ট্র প্রদেশের জায়গীর লাভ করিবেন। শিবাজি তখন রায়গড় হইতে দুই সহস্র সৈন্যসহ প্রতাপগড়ের দুর্গে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। আফজল খাঁ পার্ব্বত্য দুর্গ জয় করা অসম্ভব মনে করিয়া কৌশলে শিবাজিকে বন্দী করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং একজন ব্রাহ্মণকে তদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু অবশেষে শিবাজির চাতুর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া নিজেই প্রাণ হারাইলেন।

আফ্‌জল খাঁর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া মোগল-সেনাপতি সিদ্দি যোহর ও ফজেল খাঁ বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া মহারাষ্ট্রের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বিপুল সেনাবাহিনীর বেগ প্রতিরুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া ও শত্রুকর্ত্তৃক পশ্চাৎধাবিত হইয়া শিবাজি পানহালার দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। সিদ্দি ও ফজেল খাঁ সৈন্য দ্বারা পানহালা দুর্গ সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তাঁহারা চার মাস কাল দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখিলেন। দুর্গের রুদ্ধ কপাট উন্মোচন করা তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইলেও অত্যল্প কালের মধ্যে দুর্গে আহারের অসংস্থান ঘটিয়া উঠিল। বাহির হইতে দুর্গ-অভ্যন্তরে রসদ সংগ্রহের কোন উপায়ই বিদ্যমান ছিল না। শিবাজি তখন বুঝিতে পারিলেন শত্রুপক্ষ কি কৌশলে তাঁহাদের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হইয়াছে। সাগর সন্তরণ করিয়া পার হওয়া সম্ভব কিন্তু ঘন পরিবেষ্টিত মোগল সৈন্যের সীমা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। রসদ অভাবে শিবাজির ও সৈন্যগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। শিবাজি স্বীয় সেনামণ্ডলীর রক্ষার চিন্তায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থির করিলেন গভীর রাত্রে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিতে হইবে, নয় ত মরিতে হইবে। একদিন নিশীথ যামিনীর ঘন অন্ধকারের মধ্যে একে একে সমস্ত সৈন্য দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া শত্রু শিবির পার হইয়া গেল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই মোগল সৈন্যে এ ব্যাপার অবগত হইল এবং পলায়িত শত্রু-সৈন্যের পশ্চাতে সবেগে ধাবিত হইল। শিবাজির আজীবনের সমস্ত চেষ্টা উদ্যম বুঝি আজ ক্ষণকালের মধ্যে অন্তর্হিত হয়;—সম্মুখে সঙ্কীর্ণ রঙ্গন গিরিবর্ত্ম—শিবাজির পলায়নের একমাত্র পথ। রঙ্গন গিরিবর্ত্ম দৈর্ঘ্যে ছয় মাইল;—যদি গিরিবর্ত্মে শত্রুসৈন্য পশ্চাতে ধাবিত হয়, তবে মুহূর্ত্ত

মধ্যে মোগল সেনামণ্ডলীর কামানের অনল উদ্গারে সমস্ত মহারাষ্ট্রসৈন্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে। শিবাজি আসন্ন বিনাশের চিন্তায় হতাশ হইয়া পড়িলেন, বিষাদের কালিমা-রেখা তাঁহার বদনমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল।

বাজিপ্রভু স্বীয় প্রভুর এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন—প্রভু চিন্তা কি জন্য! আপনি সৈন্যমণ্ডলী লইয়া অগ্রসর হউন। যতক্ষণ না আপনি দুর্গে পৌছিয়া কামানধ্বনি দ্বারা আপনার নিরাপদ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবেন ততক্ষণ আমি কয়েকজন সৈন্য লইয়া এই গিরিবর্ত্ম রক্ষা করিব একজন মোগলকেও এই গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিতে দিব না।

শিবাজি তাঁহাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন এবং তৎপর বলিলেন—বাজি! মরিতে হয় মহারাষ্ট্র গৌরবের জন্য আমরা সকলেই মরিব।

বাজি বলিলেন—না প্রভু, আমি আপনাকে রক্ষা করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্র জাতিকে রক্ষা করিব। আপনি সত্বর সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হউন। মহারাষ্ট্র জাতির কল্যাণের ভার আপনার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

অগত্যা শিবাজি দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অত্যল্পকালের মধ্যে প্রবল সাগর-তরঙ্গের ন্যায় মোগল সেনাবাহিনী রঙ্গনগিরিবর্ত্মের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু একি! ক্ষুদ্র একটী মনুষ্য অত্যল্প কয়েক জন সৈনিক লইয়া ঝঞ্ঝাবেগে গমনোদ্যত বিপুল মোগল সেনাবাহিনীর শক্তিকে পশ্চাৎপদ করিয়া দিতেছে।

যতক্ষণ না শিবাজি নিরাপদে দুর্গে পৌছিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন ততক্ষণ বাজিপ্রভু অসীম সাহসে এই বিপুল সেনা-তরঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ কামান-ধ্বনি শ্রুত হইল—শিবাজি নিরাপদে দুর্গে পৌছিয়াছেন আর ভয় নাই, কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইয়াছে, এবার মৃত্যুকে সহাস্যে আলিঙ্গন করিতে হইবে। অসংখ্য সৈন্যের শির ভূপাতিত করিয়া বাজিপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গিগণ রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন।

মোগল সৈন্য বুঝিল, খাঁচার পাখী শিবাজি পলায়ন করিয়াছে, এখন আর চেষ্টা বৃথা।

মহারাষ্ট্র জাতির জীবন রক্ষা করিয়া বাজিপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গিগণ অনন্তকালের বক্ষে মাথা লুকাইলেন।

ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বাজিপ্রভুকে গ্রীসের লিওনিডস ও রঙ্গন গিরিবর্ত্মকে থার্ম্মাপলির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রবীর বাজিপ্রভুর পুণ্য নাম ইতিহাসে অমর ও ধন্য হইয়া আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

আসামের আবর জাতি

সম্প্রতি সাহেব খুন করার জন্য আসামের আবর জাতির বিষয় সকল সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হইতেছে; তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের আলোচনা বৃটিশ পার্লামেন্টে পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এহেন জাতির বিবরণ জানিতে সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমরা নিম্নে কর্ণেল ডাল্টনের বঙ্গের জাতিতত্ত্ব বিষয়ক উপাদেয় গ্রন্থ ও এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা প্রভৃতি হইতে আবর-বিবরণ সংকলন করিয়া দিলাম।

ইংরাজ সরকারের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ এই প্রথম নহে। ১৮৪৮ সাল হইতে ইহাদের সহিত সংঘর্ষ চলিতেছে। ১৮৯৩-৯৫ সালে প্রথম আবর অভিযান প্রেরিত হয়। ইহারা মধ্যে মধ্যে বৃটিশ সিপাহী বা পুলিশ-দিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে, এবং ইংরাজ সরকার তাহাদের হত্যা করিয়া, গ্রাম ধ্বংস করিয়া, সম্পত্তি লুট করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন, তবু তাহাদের চৈতন্য হয় না। এমনি দুর্দ্দান্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি তাহারা। সম্প্রতি রাষ্ট্রকর্ম্মচারী (Political officer) নোয়েল উইলিয়ামসন সাহেব ও ডাক্তার গ্রীগরসন ৪০ জন সহচর সঙ্গে লইয়া বন্ধুভাবে আবর রাজ্য পরিদর্শন করিতে যান। কিন্তু বিদেশীর এই অকারণ বন্ধুত্ব অসভ্যজাতির ভীতি উৎপাদন করে এবং ১২০০ আবর অকস্মাৎ নিরস্ত্র যাত্রীদিগকে আক্রমণ করিয়া বধ করিয়াছে। দুইজন কুলি মাত্র অনেক কষ্টে প্রাণ লইয়া এই দুঃসংবাদ বহন করিয়া ইংরাজ রাজত্বে ফিরিয়াছে। ডেপুটি কমিশনর মিলিটারী পুলিশ লইয়া বিদ্রোহী আবরদিগকে

দমন করিতে গিয়াছেন; বর্ষার পর রীতিমত সমর-অভিযান প্রেরিত হইবে স্থির হইয়াছে; তখন তাহারা মর্ম্মান্তিকভাবেই বুঝিবে যে তাহাদের পার্ব্বত্য দেশ, শিলাদুর্গ, বিষদিগ্ধ বাণ, দীর্ঘ তরবারি কিছুতেই তাহাদিগকে বৃটিশ প্রতিহিংসার কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। তখন তাহাদের আবর নাম নিরর্থক হইয়া উঠিবে।

আবর আসামী শব্দ, উহার অর্থ স্বাধীন। প্রাচীন আসামের রাজগণ ইহাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই বলিয়া ইহারা এই গৌরবসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাংলা কথিত ভাষায় বর্ব্বর অর্থে আবর শব্দ ব্যবহৃত হইতে শুনা যায় এবং দুর্দ্দান্ত অশ্বকে আবট বলা হয়। আবরেরা নিজেদের বলে পাদম। এই আবর সম্প্রদায়ের মধ্যে পাদম, মিরি, ডোফলা ও আকা চারটি শাখা। পাদমেরা সচরাচর বর আবর নামে পরিচিত। বর আবর মানে শ্রেষ্ঠ আবর অথবা যাহাকে ইংরাজিতে বলে Abor proper. দিবং বা দিহং নদী ও দির্জমো নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান ইহাদের বাসস্থান। এই স্থান লখীমপুর ও দিব্রুগড়ের উত্তরের পার্ব্বত্য ভূমি। প্রত্যেক শাখার সামাজিক অনুষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবেই হয়; কদাচিৎ কখনো বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে সকল শাখা একত্র মিলিত হইয়া নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে সমাজশাসন হয়।

এক এক গ্রামে বিশ ত্রিশ ঘর লোকের বাস। কোনো কোনো গ্রামে বেশিও থাকে। ঘরগুলি প্রায় সমান আকারের, ৫০ ফুট আর ২০ ফুট; বাহিরে বারান্দা থাকে কিন্তু ভিতরে উঠান থাকে না। এক একটি ঘর এক একটি দম্পতি বাস করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু বালিকাদের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারাও পিতামাতার সঙ্গে থাকে, কিন্তু বালক ও যুবকদিগকে সেরূপে থাকিতে দেওয়া হয় না। তাহাদের জন্য বারোয়ারি ঘর থাকে, সেখানেই সকলকে থাকিতে হয়। বারোয়ারি ঘরের দেশী নাম মোরং। এগুলি খুব দীর্ঘ হয়; দুইশত ফুট লম্বা ঘরে ১৬।১৭টা চুল্লী থাকে। এবং এক এক মোরঙ্গে ৩০০ যুবক ও অসংখ্য বালক বাস করে; মেঝেতে জায়গা না হইলে আড়ার উপর টং বাঁধিয়া থাকে। বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, অনাথ ব্যক্তিরা মোরঙ্গে সরকারি খরচে প্রতিপালিত হয়। কোনো যুবক বিবাহ করিলেই পৃথক ঘর তোলে, তখন তাহাকে সমাজ হইতে সাহায্য করা হয়। সকলের সাহায্য ও শ্রমবিভাগ হেতু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নূতন বরকনের গৃহ ও গৃহস্থালী পাতা হইয়া যায়। ঘরগুলিতে শিল্প-নৈপুণ্যেরও পরিচয় দেওয়া হয়। জমি হইতে চার ফুট উঁচু একটি বাঁশের মাচান হয় ঘরের মেঝে; দেয়াল ও দরজা তক্তার; চালের ছাউনি শুকনো খড়ের বা বুনো কলা-পাতার; চাল মেঝে পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়ে; পাহাড়ে দেশের জোর বাতাস প্রতিরোধ করিবার জন্যই এমন ঢাকাঢুকি দিয়া ঘর তৈরি করা দরকার হয়। মিরিগণ এই ঘরকে চঙ্গ-গড় বলে এবং মাচানের নীচে শূকর প্রভৃতি পশুর খোঁয়াড় করে। আকাদিগের ঘর আরো সুগঠিত হয়; তাহারা ঘরের মেঝেও তক্তা পাটাতন দিয়া করে এবং তিব্বত ভুটান হইতে তাম্রপাত্র আনিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যবহার করে।

গ্রামের চতুর্দ্দিকে ইহারা বাঁশের ঝাড় ও কাঁঠাল গাছ রোপণ করিয়া গ্রাম বেড়া দেয়; মাঝে মাঝে সুন্দর তাল-কুঞ্জও দেখা যায়।

গ্রামের সকল মোড়ল বা গাম মোরং ঘরের মধ্যস্থলের চুল্লী ঘিরিয়া বিচার বিতর্ক করিতে বসে। বোকপাং প্রধান ও সভাপতি; লোইতেম প্রজাতন্ত্রের উকিল বক্তা; জুলং যুদ্ধসচীব; জলুক প্রতিবাদী। ইহারা প্রত্যহ মোরঙ্গে মিলিত হইয়া সামাজিক কার্য্য নিষ্পন্ন করে; এই গুরুভার বহনের জন্য সাধারণ ব্যয়ে ইহাদিগকে প্রচুর মদ্য সরবরাহ করা হয়। গ্রামের তুচ্ছতম কার্য্যও মোরঙ্গে পরামর্শ বিনা অনুষ্ঠিত হয় না। সমাজতন্ত্রকে ইহারা রাজ বলে। রাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার সমান; দাসগণের রাজে কোনো অধিকার নাই। গামগণ রাজের হিতার্থ কার্য্য করে এবং গামদিগের কোনো হুকুম শীঘ্রই ছেলেদের দ্বারা ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া যায়; ইহারা মিহি গলায় চীৎকার করিয়া বাড়ী বাড়ী সংবাদ দিয়া ফিরে।

গামেরা নিজেদের জন্য কোনো উপহার লইতে পারে না। কোনো উপহার সরকারি খাজনাখানায় সাধারণ সম্পত্তিরূপে জমা দিতে হয়। জরিমানা বা বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিও এইরূপে সাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

ইহাদের সমাজ এতদূর বিশুদ্ধ সাধারণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেহ কোনো অপরাধ করিলে তাহা জাতীয় লজ্জার কারণ বলিয়া গণ্য হয় এবং সমস্ত গ্রামিকগণ সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে, দোষী ব্যক্তিকে তাহার ব্যয় বহন করিতে হয়। কোনো স্বাধীন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইতে পারে না; দাস বা দাসপুত্রদের হইতে পারে। কোনো দাস স্বাধীন কন্যাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিলে তাহার প্রাণদণ্ড করা হয়।

মোরঙ্গে যুবকগণ পালা করিয়া রাত্রে পাহারায় নিযুক্ত থাকে, এবং শত্রুর আক্রমণ, বা অগ্নি প্রভৃতির আশঙ্কা বুঝিলে সকলকে জাগ্রত করিয়া বিপদের প্রতিকার চেষ্টা করে। ইহারা চোরের ভয় করে না; সাধারণতন্ত্রে কেহ কাহারো কিছু চুরি করিবে না, এই দৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের আছে।

মাঝে মাঝে শিশুরা হারাইয়া যায়। খবর পাইলেই যুবকেরা নির্ব্বাক শৃঙ্খলার সহিত অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়; রাত্রেও মশাল জ্বালিয়া অন্বেষণ করে। চুলিকাটা মিশমিরা প্রায় ইহাদের ছেলে চুরি করে। মাঝে মাঝে জঙ্গলেও হারাইয়া যায়। আবরেরা বলে বনদেবতা চুরি করিয়াছে; এবং বনের গাছ কাটিয়া বনদেবতাকে গৃহহীন করিবার ভয় দেখাইয়া ছেলে আদায় করে।

ইহাদের বিশ্বাস মানুষের যত কিছু পীড়া ও দুর্ভোগ সমস্তই দেবতার কোপের ফল। এজন্য কাহারো পীড়া হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয় না; সেই পীড়ার দেবতাকে পূজা দেওয়া হয়। এবিষয়ে ইহারা সাধারণ হিন্দুদিগেরই মতো কুসংস্কারাপন্ন। ইহাদের বিশ্বাস রিগম নামক একটি পর্ব্বতে এই সব দেবতাদের বাস, সেই পর্ব্বতচূড়ায় চড়িয়া কেহ আর ফিরিয়া আসে না। ইহারা হিন্দুর মতন এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস করে এবং তাঁহাকে পিতা বিধাতা জানিয়া পূজা করে; পুনর্জন্ম মানে এবং ইহজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে পরজন্মে সুখ দুঃখ লাভ হয় স্বীকার করে; এ সমস্তই হিন্দুর সংসর্গে লাভ করা মনে হয়। মৃত্যুকে তাহারা যম বলে। ১৯০১ সালের আদম সুমারিতে মাত্র ২৩১ জন আবর বৃটিশ প্রজা ছিল, অপর সকলেই তিব্বতীয় সরকারের প্রজা। ইহাদের মধ্যে ৫৩ জন হিন্দু, ৭ জন বৌদ্ধ, বাকি ২৬১ জন ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী। হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্ম ইহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস কিছুমাত্র সংস্কৃত করিতে পারে নাই।

ইহাদের পুরোহিত নাই। কোনো কোনো লোকের দৈবজ্ঞান স্ফুরণ হয়, তাহারাই লোকের শুভাশুভ নির্ণয় করে। ইহাদিগকে দেওদার বলে। শূকরের যকৃৎ বা মোরগের অন্ত্র দেখিয়া ইহারা শুভাশুভ গণনা করে। দেওদার শব্দ ফার্সী ভাষা হইতে গৃহীত বোধ হয়; ফার্সীতে উহার অর্থ হইতে পারে ভূতদ্রষ্টা।

কাহারও পীড়া বা মৃত্যু উপলক্ষে পার্ব্বত্য মিথুন গাভী বা শূকর বলি দেওয়া হয়। বলিদত্ত পশুমাংস বৃদ্ধ স্থবিরগণ ভিন্ন অন্য কাহারও আহার করা নিষিদ্ধ।

মিরিগণ ব্যাঘ্রমাংস খাইতে ভালোবাসে; তাহাদের বিশ্বাস ব্যাঘ্রমাংস খাইলে পুরুষ বলবান ও সাহসী হয়। স্ত্রীলোক পরুষ হইয়া যায় বলিয়া ব্যাঘ্রমাংস স্ত্রীলোকের অখাদ্য।

অদনীয় মাংস বদল করিয়া ইহারা কাহারো নিকট যে প্রতিজ্ঞা করে তাহা অলঙ্ঘ্য; এই ব্যাপারকে সেঙ্গমুঙ্গ বলে।

ইহাদের বিশ্বাস সমস্ত মানবসমাজ এক আদিমাতার সন্তান। আদিমাতার দুই পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ সাহসী শিকারী ও কনিষ্ঠ ধূর্ত্ত ফন্দিবাজ। ছোটটিই মায়ের আদুরে ছেলে; মাতা কনিষ্ঠকে লইয়া পশ্চিম দেশে চলিয়া যায় এবং সঙ্গে ঘরকন্নার যাবতীয় সামগ্রী, অস্ত্র শস্ত্র, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতিও লইয়া যায়; ইহাতে পূর্ব্বদেশে এ সকলের অত্যন্ত অভাব ঘটে। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে মাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ধাতু হইতে দা গড়িতে, লাউ দিয়া বাঁশী তৈরি করিতে এবং নীল ও শাদা রঙের মালা করিতে শিখাইয়া যায়। সেই জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্তান এই পাদমেরা; এবং ইহারা তাহাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নিকট এই সব শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তারপর আর কিছুই উন্নতি করিতে পারে নাই; ইহারা সেই আদি পুরুষের নির্দ্দেশ অনুসারে ললাটে ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত করে। ইংরেজ প্রভৃতি পশ্চিম দেশের জাতিগণ কনিষ্ঠের বংশধর, এজন্য উহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে যন্ত্রে এত উন্নত।

বাস্তবিক পাদমদিগের শিল্পসামগ্রী নাই বলিলেও চলে।

লম্বা সোজা তরোয়াল, দা, বা বাঁশের চাঁচ বা গোঁজ ইহাদের চাষের উপাদান; উহারই সাহায্যে কোনো মতে জমি আঁচড়াইয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহারা বীজ বপন করে। কিন্তু ইহাদের শ্রমসহিষ্ণুতা এবং ভূমির উর্ব্বরতা যথেষ্ট বলিয়া কখনো ইহাদের খাদ্যাভাব ঘটে না। ইহাদের চাষে চাল, তুলা, তামাক, জনেরা, আদা, লঙ্কা, ইক্ষু, কুমড়া, পেঁয়াজ ও বিবিধ রসালো মূল উৎপন্ন হয়। ইহারা পর্য্যায়ক্রমে এক একটি ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন করে; কোনো ভূমি অনুর্ব্বর হইয়া আসিলে তাহা পতিত রাখিয়া অন্য বহুদিনের পতিত জমিতে চাষ আরম্ভ করে; পারক পক্ষে বন নষ্ট করে না। প্রত্যেকের জমির সীমা প্রস্তর চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট থাকে। ক্ষেত্রখামার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া পশুর অত্যাচার নিবারণ করা হয়।

ইহারা উর্দ্ধস্থিত ঝরণা হইতে পয়োনালী গড়িয়া বা বাঁশের নলের দ্বারা জল ইচ্ছামত স্থানে লইয়া যায়। জলের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও ইহারা স্নান করে না; ইহারা বলে ময়লা শীত নিবারণ করে এবং সেই জন্য ইহারা নোংরা হইয়া থাকিতে ভালোবাসে। নদীর উপর বেতের ঝোলা পুল তৈরি করিয়া নদী পারাপারের ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক বৎসর এই পুল রীতিমত মেরামত করা হয়।

আবরেরা মিশমি অপেক্ষা দীর্ঘতর জাতি কিন্তু দেখিতে কুশ্রী ও নোংরা। উহাদের গঠন মঙ্গোলীয় ছাঁচে; গায়ের রং মেটে, স্বর গভীর ও বরণ; উচ্চারণে একটি ধীর মাত্রাযুক্ত সুর আছে।

ধোবা আবর।

ধোবা আবর—পূর্ণ পরিচ্ছদ ও বরাহদন্ত-শোভিত শিরস্ত্রাণে সজ্জিত।

পুরুষেরা সাধারণত উদল গাছের বাকলে তৈরি একখানি কাপড় কোমরে জড়াইয়া পরে। ইহা পাতিয়া বসা ও গায়ে দেওয়াও চলে। বাঙালীর যেমন সামনে কোঁচা,

ইহারা তেমনি করিয়া পশ্চাতে কোঁচা ঝুলায়, যেন একটি চামরের লেজ। এই লেজ গুটাইয়া রাত্রে বালিশের কাজ চলে। যখন পূর্ণ পরিচ্ছদে সুশোভিত হয়, তখন আবরদিগকে খুব জাঁকালো দেখায়। গায়ে হাতকাটা কোট পরে; ইহা ইহারা নিজেরাই বোনে; কেহ কেহ লম্বা তিব্বতী আলখেল্লা পরে। রাজ কার্য্যের সময় ইহারা ভালুকের চামড়া, মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং-করা চামর, শূকর-দন্ত

স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ইহারা চুল চারিদিকে থর কাটিয়া ছোট করিয়া ছাঁটে এবং উল্কি পরে। পুরুষেরা ভ্রূর মধ্যস্থলে ত্রিশূল চিহ্ন পরে; স্ত্রীলোকদের নাকের নীচেই ঠোঁটের খাঁজের উপর ত্রিশূল চিহ্ন থাকে এবং উহার দুই ধারে মুখের উপরে ও নীচে ডোবা কাটে; এই ডোবার সংখ্যা সাধারণত সাতটি করিয়া।

স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ লাল নীল ডোবা কাটা দুখানি কাপড়। একখানি কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত আচ্ছাদন

বর আবর যুবতী—এই চিত্রে কেশপ্রসাধন, ভূষণ ও পরিচ্ছদ ধারণের রীতি ও গলগণ্ড দেখা যাইতেছে।

এবং পাখীর বড় বড় ঠোঁট দিয়া সাজাইয়া বেতে বোনা টুপি মাথায় পরে। যুদ্ধের সময় এই সুরক্ষিত টুপি শিরস্ত্রাণের কাজ করে।

ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র—তীরধনুক, বল্লম, ছোরা, দীর্ঘ সরল তরবারি। ইহারা তীরের ফলায় বিষ লাগাইয়া ব্যবহার করে।

বর আবর রমণী—দ্বিবস্ত্র-পরিহিতা।

করে; অপরখানি রক্ষাবরণরূপে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। বক্ষ অনাবৃত রাখা ইহারা লজ্জার কারণ মনে করে না। গলায় দীর্ঘ পুঁতির মালা কোমর পর্য্যন্ত লম্বিত হয়, এবং কানের পাটা অসম্ভব রকমে বিস্তৃত

করিয়া গহনা পরে। পায়ের গিঁটের কাছে বেতে বোনা একরকম গহনা পরে। যাহাদের যৌবনের অহঙ্কার আছে তাহারা কোমরের ঘুনসিতে তিনটি হইতে বারোটি পর্য্যন্ত ঝিনুকের আকারের, কাজ করা, পিত্তলের চাকতি পরে; সম্মুখেরটির ব্যাস ছয় ইঞ্চি আন্দাজ, পাশেরগুলি ক্রমশ ছোট হইয়া নিতম্বের উপরকারগুলি তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়। এই গহনা চলিবার সময় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ করে। শিশু বালিকারা এই কোমরের গহনা ছাড়া অঙ্গে আর কোনো আবরণই রাখে না। সময়ে সময়ে যুবতীরাও এই গহনা ভিন্ন সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বিচরণ করে। নাচের সময় এই গহনা ছাড়া সমস্ত কাপড় চোপড় খুলিয়া যুবতীরা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে। বিহু উৎসবের সময় ইহাদের নাচের ধুম লাগে। মিরি রমণীগণ পিত্তলের কোমরপাটার বদলে বেতের বোনা কোমরপাটা পরে; ইহার দ্বারা নিতম্বদেশ আবদ্ধ হওয়ায় উহারা একটু খঞ্জ ভাবে চলে; ইহারাও সময়ে সময়ে এই কোমরপাটা ভিন্ন অন্য আবরণ অঙ্গে রাখে না।

আবর রমণীগণ নিকৃষ্ট চীনা ছাঁচের। ইহাদের মুখশ্রী মিশমি রমণীগণের ন্যায় লালচে বা সুন্দর নহে। অনেকেরই গলায় গলগণ্ড থাকে। গলগণ্ড আবরদিগের প্রধান রোগ; কিন্তু গলগণ্ড হওয়া ইহারা সৌন্দর্য্য ও গর্ব্বের বিষয় মনে করে। ইহাদের জলের প্রতি বীতরাগ ও অদ্ভুত কেশপ্রসাধন ইহাদিগকে আরো কুৎসিত করিয়া রাখে।

স্ত্রীলোকদিগকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের সহিত সশ্রদ্ধ ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরাও স্বামীদের সম্মান করে; আসামী স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে গালাগালি দেয় বলিয়া ইহারা তাহাদিগকে হীন চক্ষে দেখে। ইহারা স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে এবং কখনো স্বামীকে রূঢ় কথা বলে না। ইহার কারণ প্রণয়সঞ্চার হইলে যুবকযুবতীর ইচ্ছানুসারে ইহাদের বিবাহ হয়, এবং এই জন্যই ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ নাই। যাহারা একাধিক বিবাহ করে তাহারা সমাজে নিন্দনীয় হয়। মিরি ও ডফলাগণের মধ্যে একাধিক স্ত্রী বা একাধিক স্বামী গ্রহণ প্রচলিত আছে; স্বামীর মৃত্যুর

বর আবর পুরুষ (এই চিত্রে তামাক খাইবার নল, বেতে বোনা টুপি, গলগণ্ড, হাতকাটা জামা প্রভৃতি দেখা যাইতেছে)।

পর স্ত্রীগণ উত্তরাধিকারী পুত্রের সম্পত্তি হয় এবং স্বীয় জননী ব্যতীত অপর স্ত্রীলোককে সে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করে।

কখনো কখনো পিতামাতাও বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। একটি ভোজ দিলেই বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। প্রণয়ী যুবক তাহার প্রণয়িনী ও প্রণয়িনীর অভিভাবককে মেঠো ইঁদুর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি লোভনীয় সুখাদ্য উপহার দিয়া তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। টাকার খাতিরে নিজেদের সন্তানদের সুখশান্তি নষ্ট করা ইহারা ঘৃণ্য ব্যাপার মনে করে।

মিরিদিগের বিবাহপ্রথা ভিন্নরূপ। বৎসরের মধ্যে কোনো এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল অবিবাহিত যুবক যুবতিকে এক ঘরে বাস করিতে দেওয়া হয়; সেই সময়ে যে সকল যুবক যুবতীর প্রণয়সঞ্চার হয় পরে তাহাদের বিবাহ হয়।

আবর কন্যা নিজের গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের বিশ্বাস যদি কেহ এমন পাপকার্য্য করে তবে সূর্য্য চন্দ্র আর উদয় হইবে না, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ওলটপালট হইয়া যাইবে। যদি কদাচ এরূপ অপকর্ম্ম সংঘটিত হয়, তবে ইহারা বলি দিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া দোষ শান্তি করে। কিন্তু ডফলা ও আকাগণ অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির সহিত বিবাহ সম্পর্ক দূষণীয় মনে করে না।

আবরেরা তিব্বতীয়দিগের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করে। কিন্তু একথা তাহারা স্বীকার করে না। তিব্বতী পোষাক, তৈজস, পিত্তলের তামাক খাওয়ার নল, প্রভৃতি সামগ্রী কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়।

মৃত্যুর পর ইহারা গোর দেয়। কিন্তু পার্ব্বত্য ভূমি খুঁড়িয়া গোর দেওয়া কঠিন, এজন্য পাথর দিয়া ছোট্ট একটি ঘরের মতন করে এবং তাহার মধ্যে মাথা ও হাঁটু একত্র গুটাইয়া মৃতদেহ বসাইয়া দেয় ও উপর হইতে একখানা পাথর চাপা দেয়।

"আয়ারপাটা"

হিমালয়গর্ভস্থ কুমায়ুঁ নামক পার্ব্বত্যপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুগঙ্গা, অলকনন্দা, মন্দাকিনী প্রভৃতি স্বর্গ-নদী-বিধৌত এই উত্তরাখণ্ড, ব্রহ্মপুরী, বদ্রীনাথ, কেদার-নাথ, রুদ্রনাথ, মহাপন্থ, ভৈরবঝম্প, গোপেশ্বর, পাণ্ডুকেশ্বর, পঞ্চপ্রয়াগ, জোষিমঠ প্রভৃতি পুরাণপ্রসিদ্ধ তীর্থাদিতে পরিপূর্ণ। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। কোথাও আকাশচুম্বী গিরিশিখর, কোথাও পাতালস্পর্শী খাত বা গহ্বর, কোথাও বিবিধ পুষ্প-তৃণ-শস্পমণ্ডিত বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র, কোথাও বা সুরঙ্গসম সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট, কোথাও মহাদ্রুমরাজি-পরিবৃত নিবিড় বনভূমি, কোথাও বা উদ্ভিদ্‌বিহীন মসৃণ শৈলপ্রদেশ ;—একদিকে শ্যামল উপত্যকা ভূমি, অপর দিকে তুষারধবল শিখরমালা ; এক দিকে বিশালবপু গিরিরাজের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য, অপর দিকে ভীমনাদী জলপ্রপাত ও গিরিনদীর কলরোল—ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় প্রকৃতির এই লীলা নিকেতনটীকে বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যমুখরিত এবং দেব-ঋষি-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত ও অপ্সরা-গণের প্রকৃতই বাসোপযোগী করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পাষাণহৃদয়-ভেদী অসংখ্য প্রস্রবণ, পদ্মাকর এবং স্বচ্ছসলিল সরোবরের বাহুল্য দর্শনে মনে হয় বিশ্বশিল্পী তাঁহার চিত্রশালিকার উৎকৃষ্ট দৃশ্যপটগুলির ন্যায় এ চিত্রপটেও যেন গাঢ় মনোনিবেশ করিয়া ইহাকে •মুনিমানসবিমোহন এবং সর্ব্বজনের নয়নাভিরাম করিয়া দিয়াছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত তুষার-কিরীটিনী "নন্দাদেবী" ইহারই অন্তর্গত এবং জেলা আলমোড়ার সীমাভুক্ত। সাগরবক্ষ হইতে নন্দাদেবী পঁচিশ হাজার ছয়শত একষট্টি ফুট উচ্চ। ইহা শিবশূলাকৃতি তেইশ হাজার চারিশত ফুট উচ্চ সুপ্রসিদ্ধ ত্রিশূল পর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই উন্নত ত্রিশূল দ্বারা নাকি অন্নপূর্ণার প্রাসাদ "নন্দাকোট" রক্ষিত হইতেছে। নন্দাদেবীর চতুর্দ্দিকস্থ তুষাররাশি যখন বায়ুসংযোগে মেঘের ন্যায় সঞ্চালিত হয় তখন পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ অন্নপূর্ণার (নন্দাদেবীর) রন্ধনশালার ধূম দেখিতে পাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকে। এই দেবলোকের দক্ষিণবর্ত্তী গিরিমালা গর্গাচল নামে বিখ্যাত। গর্গাচল কোথাও ৬০০০, কোথাও ৭০০০ এবং কোথাও বা ৯০০০ ফুট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মহামুনি গর্গের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। জেলা নয়নীতালের এক ষষ্ঠাংশ গর্গাচলের মধ্যে অবস্থিত। নয়নীতাল নগর ও সরোবর গর্গাচলের একটী উপত্যকাভূমি শোভিত করিয়া আছে। সরোবরটী প্রায় অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত এবং ইহার ব্যাস দুই মাইলের কিছু উপর। ইহা সাগর পৃষ্ঠ হইতে ছ হাজার তিনশত পঞ্চাশ ফুট উচ্চে অবস্থিত এবং ৯৩ ফুট বা ৬২ হাত গভীর। নয়নীতালের সর্ব্বোচ্চ পাহাড় "চীনা"র একাংশ "শেবকা ডাণ্ডা" ইহার উত্তরে ; এবং আয়ারপাটা দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বমান, ইহার চতুর্দ্দিকের সঙ্কীর্ণ সমতল ভূমিতে ও পর্ব্বতগাত্রে রাজপথ, হর্ম্ম্য, ক্রীড়ালয়, বিপণি প্রভৃতি বিরাজিত। সরোবরের পশ্চিমদিকের সমতল ক্ষেত্রে রঙ্গভূমি, ও পশ্চিম উপকূলে মন্দির। ইহার পূর্ব্ব প্রান্ত গর্গাচলের

নয়নীতাল ও নয়নাদেবীর মন্দির।

প্রান্তসীমার দ্বারা বেষ্টিত। নয়নীতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন্দা। নন্দা দুর্গারই নামান্তর। দেবীপুরাণ মতে—

"নন্দতে সুরলোকেষু নন্দনে বসতেঽথবা।

হিমাচলে মহাপুণ্যে নন্দাদেবী ততঃ স্মৃতা॥"—৩৭ অঃ।

কথিত আছে অতি পূর্ব্বকালে আলমোড়া হইতে নন্দাদেবীকে আনিয়া সরোবরের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে একটী কুটীর মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তদবধি ইহা তীর্থে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা নিবিড়-অরণ্য-সমাকীর্ণ হিংস্রজন্তু-সমাকুল ছিল। হস্তি ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির উপদ্রবে এস্থান এমনই সঙ্কটময় ছিল যে যাত্রীসমূহ দল বাঁধিয়া উৎকট বাদ্যধ্বনি ও ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গমনাগমন করিত এবং পূজা উৎসবাদি সমাধা করিয়া দিবসের মধ্যেই ফিরিয়া যাইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৮৪২ অব্দে এই স্থান জনৈক ইংরাজ রাজপুরুষের নয়নপথে পতিত হয় এবং তখন হইতে এখানে বসবাসের সূত্রপাত হয়। ক্রমে ইহা যুক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হয় এবং পথঘাট, বাসগৃহ, কর্ম্মালয়, বিদ্যালয়, পণ্যশালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে থাকে। ১৮৮০ অব্দের ভূমিস্খলনে সপুরোহিত নন্দাদেবীর মন্দির, সার্দ্ধশতাধিক নরনারী এবং প্রায় দুলক্ষ টাকার সম্পত্তি নিমেষের মধ্যে সরোবরগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। একমাত্র নন্দাদেবীকে সরোবরকূলে পাওয়া যায়। দৈবলব্ধ দেবীকে তখন সরোবরের পশ্চিম উপকূলে নবনির্ম্মিত পাষাণ মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মন্দিরপাদমূল হইতে সরসী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া উত্তর দক্ষিণের অভ্রভেদী পর্ব্বতমূল ধৌত করিয়া চলিয়াছে। এবং অতিরিক্ত জলরাশির দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাত ও ক্ষীণকায়া 'বালিয়া' নদীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই অনতিবিস্তীর্ণা সরসীর ক্রোশার্দ্ধলম্বিত উত্তরদক্ষিণ বাহুর সমান্তরাল পর্ব্বতদ্বয় ক্রমবক্রতানুরেখায় পূর্ব্বপশ্চিমে মিলিত হওয়ায় তন্মধ্যবর্ত্তী এই জলরাশি আকর্ণ-বিস্তৃত নারীনয়নের মত দেখা যায়। তাহার পূর্ব্বপশ্চিমের

এই মিলনপ্রান্ত যেন দুই নয়নকোণ বলিয়া মনে হয়। এবং নেত্রপল্লবাকৃতি এই উভয় পার্শ্বস্থ শ্যামশৈলরেখার মধ্যবর্ত্তী ঘনকেশজালকল্প উইলো-তরুবেষ্টিত লীলাতরঙ্গায়িত সুগভীর কৃষ্ণজলরাশি, উচ্ছলিত-যৌবনা তরলায়তনয়নার নিবিড়-পক্ষ্মশোভী ঘনকৃষ্ণ নয়নতারার মতই শোভা পায়। মধ্যাহ্নের সূর্য্য ও পূর্ণিমার চন্দ্র সেই নয়নতারার মধ্যমণি বলিয়া মনে হয়। এই নয়নাকৃতি সরসীর নামেই বিশালাক্ষী নন্দাদেবীর নাম হইয়াছে "নয়নাদেবী" বা "নয়নানাম্নী"। নন্দা এখানে দেবীর রাশনাম সুতরাং সর্ব্বসাধারণের পরিচিত নহে। 'নয়না' দেবীর পুরাণপ্রসিদ্ধি নাই বলিয়াই কি ইনি নন্দাদেবীর সহিত অভেদ কল্পিত হইয়াছেন ? আলমোড়ার নন্দাদেবী এখনও আলমোড়াতেই বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু হিমালয়ের দক্ষিণে ও কুরুক্ষেত্রের উত্তর ভাগে দেবী নন্দা নামে খ্যাতা সুতরাং দেবী-পুরাণের—

"কুরুক্ষেত্রোত্তরং ভাগং হিমবদ্দক্ষিণেন চ।
নন্দাদেবী কুলাঙ্গাস্ত দেব্যাস্তত্র প্রপূজয়েৎ।"

এই বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে "নন্দা" নয়না দেবীর নামান্তর হওয়াই চাই।

সে যাহা হউক নাম-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে পৌরাণিক জগতের বাস্তবস্পর্শে অনেক সময় কৌতূহলাবিষ্ট ও পুলকিত হইতে হয়। আমরা একদা গর্গাচল-চূড়ায় বনভোজনে বসিয়া শুনিয়াছিলাম ইহারই বিলাতী নাম "গাগররেঞ্জ"! গর্গাচলই যে গাগররেঞ্জ যদি প্রথমেই শুনিতাম তাহা হইলে বাল্যকালে য়ুরোপীয়-লিখিত ভূগোলসূত্রের পর্ব্বতপর্য্যায়ে সংস্কারবিরুদ্ধ নাম কণ্ঠস্থ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হইত না। গাগররেঞ্জ অপেক্ষা গর্গাচল দুরূহোচ্চার্য্য হইলেও সংস্কারসঙ্গত, সুতরাং সুখপাঠ্য। নাম-বিকারে বিকৃত 'ইণ্ডিয়া'র ভূগোল ভারতের বলিয়া মনকে বুঝাইতে হয়। দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য যেমন আমাদের কানের ভিতর দিয়া মানসনেত্রে সহজেই পতিত হয়, ডেক্যান বলিলে সেস্থলে "জিওগ্রাফী" ও "ম্যাপের" ভিতর দিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব লাগে। প্রথমটী যেমন সুখস্মৃতি জাগাইয়া তুলে দ্বিতীয়টী তাহা পারে না। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস আছে; বহু পুরাতন সংস্কার তাহার সহিত জড়িত আছে; কিন্তু ডেক্যানের তাহা নাই। দাক্ষিণাত্যকেই ডেক্যান বলে বলিয়াই ডেক্যানের ইতিহাস।

নয়নীতাল, নয়নাদেবী ও গর্গাচলের যখন নামরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল তখন সরোবরের দক্ষিণে প্রসারিত সুপ্রসিদ্ধ পর্ব্বত "আয়ারপাটা"র অন্তরালেও কোন পৌরাণিক নাম প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া স্বতঃই মনে হইল। তখন একদিন আহারান্তে আয়ারপাটা ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। আয়ারপাটা সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৭,৪৬১ ফুট উচ্চ। ইহা ঘনবনাবৃত। ইহার মধ্যে মধ্যে মনুষ্যবাস থাকিলেও ইহার অধিকাংশভাগ নিবিড় অরণ্যময় ও শ্বাপদসঙ্কুল। ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রসাদে অধুনা এখানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, প্রাসাদ, পথ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইলেও ইহার বন্যভাব ঘুচিতেছে না। আয়ারপাটার আকৃতিও ভীষণ। রজনীতে যখন সরোবরজলে ইহার বিশাল ছায়া পতিত হয় তখন ইহাকে কোন ভীমকায় দৈত্য বলিয়াই মনে হয়। দক্ষিণাপথ যেমন ডেক্যানে পরিণত হইয়াছে অসুরপথ বা অসুর-পত্তন তদ্রূপ আয়ারপাটা হয় নাই ত? আমার সঙ্গের পার্ব্বতীয় বন্ধু পণ্ডিত ভৈরবদৎ তেওয়ারীর নিকট শুনিলাম ইহার পার্শ্ববর্ত্তী এবং সরোবরের পশ্চিমস্থ পর্ব্বতের নাম "দেওপাটা"। সন্দেহ তখন আশায় পরিণত হইল এবং পরদিন উভয়ে দেওপাটা দেখিতে গেলাম। আয়ারপাটা অসুরপথ বলিয়া পূর্ব্বধারণা ছিল বলিয়াই কি না জানি না কিন্তু দেওপাটাকে অরণ্যবিরল এবং রমণীয় বলিয়া মনে হইল। এই পর্ব্বত সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৭৯৮৭ ফুট উচ্চ। ইহার পরপারে বদ্রী, কেদার, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় প্রধান প্রধান তীর্থ, স্বর্গনদী এবং পুরাণ-বর্ণিত দেবলোক অবস্থিত। সুতরাং দেওপাটা দেবপথ বা দেবপত্তনের অপভ্রংশ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইতিহাসে দেখা যায় পশ্চিমের খাস উত্তরাখণ্ডী গাড়হ্‌বালী-দিগের সহিত দক্ষিণের ও পূর্ব্বের কুমায়ুনীদিগের ঘোর শত্রুতা ছিল। এমন কি কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে সংস্কার এখনও গত হয় নাই। ইহাও যেন আয়ার-পাটাকে অসুরপথ বা অসুরপত্তন বলিয়াই নির্দ্দেশ করে। কিন্তু একটী কথা আছে। ভারতীয় আর্য্যগণ উত্তর-

পশ্চিমের দেবপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করত এই সকল স্থানে প্রথম বাসস্থাপন করিয়া ইহাকে দেবপত্তনে পরিণত করেন নাই ত? এবং পরে যখন দক্ষিণে উপনিবেশ স্থাপন করেন অথবা দক্ষিণের পথ দিয়া আর্য্যাবর্ত্তে গমন করেন তখন তাঁহাদের উপনিবেশ বা গমনপথের নিদর্শক স্বরূপ দক্ষিণের এই পর্ব্বতকে 'আর্য্যপত্তন' বা 'আর্য্যপথ' নামে অভিহিত করেন নাই ত? নয়নীতালে আসিবার বর্ত্তমান রেলপথ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আয়ারপাটার ভিতর দিয়াই গমনাগমনের পথ ছিল। এই পথ এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস দেবপথই দেওপাটা এবং আর্য্যপথই আয়ারপাটা হইয়াছে। প্রকৃত তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিকের চিন্তা ও অনুসন্ধানের বিষয়।

এই আর্য্যপথের একটী সুগভীর উপত্যকা ভূমির বর্ত্তমান নাম "স্লিপীহলো"। চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতশিখর হইতে এই অরণ্যসমাকুল স্থানটী পাতালপুরী বলিয়া মনে হয়। বহু বর্ষ পূর্ব্বে এখানে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কিছুকাল সাধন করিয়াছিলেন। অধুনা এখানে সাহেব কেরাণীদিগের জন্য সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর এই নিস্তব্ধ গম্ভীর সাধনাশ্রমটী পল্লী-কলরব-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে নয়নীতালে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হয় সিপাহী বিদ্রোহের সময় সাহেবদিগের সহিত প্রাণরক্ষার্থ পলায়িত কয়েকজন বাঙ্গালীই নয়নীতালের প্রথম প্রবাসী। তাঁহাদের মধ্যে—অধুনা মুজফ্‌ফরনগরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম ছিলেন। যাঁহারা জন্মভূমিতে প্রকাশিত "আমার জীবনচরিত" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট ইনি সুপরিচিত। ১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর জেনারেল ট্রুপ সাহেব লিখিয়াছিলেন—

"I have known Babu Durga Das Banerji since 1856, when his regiment was stationed at Bareilly on its return from Burmah, he was well respected by all his Officers. At the time of the mutiny he was looted by the rebels, and on his escape to Naini Tal from Bareilly he was taken prisoner by Moulvi Fuzlul Huck, the chief man of Khan Bahadur Khan at the foot of the hills, and was ordered to be blown away by gun, but by some means he was saved, and arrived safe at Naini Tal. I recommended him to Mr. Alexander for some Civil appointment as he said he was tired of the Military service (so I was very). Mr. Alexander promised to give him a Tesildarship but as his services were required to assist in the raising of a New Cavalry Corps at the foot of the hills he was made over to Colonel Crossman, with whom he was present at the actions of Churpoora, Sittergunge, Buharee and Russoolpore, and was wounded. I have never heard of a Bengalee being so brave.

He is a respectable, honest and clever man. I can recommend him for the highest situation in any Office."

"আমি ১৮৫৬ সাল হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানি। সে সময় তাঁহার সৈন্যদল বর্ম্মা হইতে ফিরিয়া বেরেলিতে অবস্থান করিতেছিল। তাঁহাকে সকল সেনানায়কই সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। সিপাহিবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা ইঁহার সর্ব্বস্ব লুঠ করে এবং ইনি বেরিলি হইতে নয়নীতালে পলায়ন করিয়াও সেখানে খাঁ বাহাদুর খাঁর সর্দ্দার মৌলবী ফজলুল হক কর্ত্তৃক পর্ব্বতপাদমূলে বন্দী হন। তাঁহাকে তোপের গোলায় উড়াইয়া দিবার হুকুম হয়; কিন্তু তিনি কোনো গতিকে বাঁচিয়া যান এবং নয়নীতালে পৌছেন। তিনি আমারই মতন যুদ্ধকার্য্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমি শ্রীযুক্ত আলেকজন্দার সাহেবকে সুপারিশ করি যে ইঁহাকে কোনো রাজস্ব বিভাগে কার্য্য দেওয়া হোক। আলেকজন্দার সাহেব তাঁহাকে তহশীলদারী দিতে স্বীকার করেন। কিন্তু পর্ব্বতপাদমূলে নূতন একটি অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠনের আবশ্যক হওয়াতে তাঁহাকে কর্ণেল ক্রশম্যানের নিকট প্রেরণ করা হয়, এবং কর্ণেলের সহিত ইনি চুরপুরা, সিত্তরগঞ্জ, বুহরী, রসুলপুর প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং অবশেষে আহত হন। এমন সাহসী বাঙ্গালীর কথা আমি আর শুনি নাই।

ইনি সম্ভ্রান্ত, সৎ ও চতুর ব্যক্তি। আমি ইঁহাকে যেকোনো আপিসের শ্রেষ্ঠতম পদের জন্য সুপারিশ করিতে পারি।"

সরকারী কার্য্য উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালীকে এখানে পাঁচ ছয় মাসের জন্য প্রতি বৎসরই আসিতে হয়। কেহ কেহ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যও আগমন করেন। সামরিক বিভাগের একটী দপ্তর বার মাস এখানেই থাকা হেতু কতিপয় বাঙ্গালীকে স্থায়ীভাবে এখানে অবস্থান করিতে হয়। স্থানীয় জমীদারবর্গের অগ্রণী রায় বাহাদুর কৃষ্ণসার বংশধরগণের শিক্ষার জন্য জনৈক বাঙ্গালী যুবক সম্প্রতি নয়নীতালে প্রবাসী হইয়াছেন। নয়নীতালের উপকণ্ঠে সোঽহং স্বামীর আশ্রম ব্যতীত বাঙ্গালীর স্থায়ী বাসের কোন সন্ধান পাই নাই। আলমোড়া মায়াবতীতে ৺রামকৃষ্ণ মিসনের একটী কার্য্যালয় আছে। বহু বর্ষ পূর্ব্বে আলমোড়ায় একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি

সর্ব্বসাধারণে "আলমোড়ার স্বামীজি" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাস নয়নীতালে বাড়ী ঘর করিয়া কোন বাঙ্গালীই এ পর্য্যন্ত স্থায়ী হন নাই। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর বিশেষ যত্ন চেষ্টা ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত নয়নীতালের এ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুলটী বাঙ্গালীর নাম এখানে চির জাগরূক রাখিবে। প্রতিষ্ঠাতার একখানি প্রতিকৃতি বিদ্যালয়গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। নয়নীতালের "শৈল সাহিত্য সমিতি" প্রবাসী বাঙ্গালীর মাতৃভাষানুরাগের নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার
　　আলোকে বসতি যার,
প্রলয়ের শেষে ত্রিদশ-আলয়
　　সৃজিল যে আরবার,
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া
　　বাজায় যে ওঙ্কার,
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
　　তাহারে নমস্কার।

শ্রী রূপে কমলা ছায়া সম যার
　　আদরে ও অনাদরে,
মালা দিল যারে সরস্বতী সে
　　আপনি স্বয়ম্বরে,
কৌস্তুভ আর বনফুলহার
　　সমতুল প্রেমে যার,
যার বরে তনু পেয়েছে অতনু
　　তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে
　　ভাবনার জটাভার,
চির নবীনতা শিশুশশী রূপে
　　অঙ্কিত ভালে যার,
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
　　যাহার কণ্ঠহার,
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
　　চরণে নমস্কার।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
　　ধরেছে যে জন বুকে,
শমীতরু সম রুদ্র অনল
　　বহিছে শান্ত মুখে,
মন্থন যেই করিছে মথন
　　অতীতের পারাবার,
অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি'
　　তাহারে নমস্কার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ফটোগ্রাফী

কিছু দিন হইল বিলাতের ফটোগ্রাফী মহলে একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয়—ফটোগ্রাফী আদৌ 'আর্ট্' বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না। প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল না, হওয়া সম্ভবও বোধ হয় না। চিত্ররচনার কোন প্রক্রিয়াবিশেষ 'আর্ট্' পদবাচ্য কি না, এ বিষয়ে আন্দোলন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তুলিকার সাহায্যে কাগজে রং লেপিয়া চিত্রাঙ্কন করা যায়; কিন্তু এই রং লাগান ব্যাপারটার মধ্যে 'আর্ট্' আছে কি না সেটা কেবল "ফলেন পরিচীয়তে।" 'আর্ট্' জিনিষটা তুলি কাগজ রং বা ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার মধ্যে থাকে না, শিল্পীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাবসম্পদেই তাহার জন্ম। শিল্পীর নিকট তুলি, পেন্সিল, বা ফটোগ্রাফীর সরঞ্জাম শিল্পরচনার, অর্থাৎ ভাবকে শিল্পরূপে প্রকাশ করিবার, যন্ত্র বা উপায় মাত্র। ভাব যতক্ষণ মৌন থাকে, যতক্ষণ তাহা রেখা বর্ণাদি দ্বারা ব্যক্ত না হইয়া ভাবরূপেই অন্তরে সঞ্চিত থাকে, ততক্ষণ তাহাকে শিল্প বলা যায় না।

এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে। তুলি, পেন্সিল বা কলম ত শিল্পীর আয়ত্তাধীন—এগুলিকে শিল্পী রেখাঙ্কন ও বর্ণপ্রয়োগার্থ যথারুচি ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু ফটোগ্রাফীর লেন্স্ বা প্লেট ত তাঁহার ইচ্ছা অনিচ্ছার অনুগত নহে। অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে শিল্পীর

প্রভাতের আলো।

ব্যক্তিগত কেরামতির স্থান কোথায়? আপত্তিটার মূলে যুক্তিযুক্ততা রহিয়াছে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক 'আর্ট' হিসাবে ফটোগ্রাফীর ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ বলিতে হইবে।

'ফটোগ্রাফী' বলিতে সাধারণতঃ দৃষ্টবস্তুর "চেহারা তোলা" বুঝায়। ইহাই ফটোগ্রাফীর মূল কথা—অনেকের পক্ষে এখানেই তাহার চরম পরিণতি। ফটোগ্রাফীর প্রথম সোপানে উঠিয়াই আমরা নিরীহ আত্মীয় স্বজনের মুখশ্রীকে অনায়ত্তবিদ্যার পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করি—এবং মনে করি ফটোগ্রাফীর চূড়ান্ত করিতেছি! দুঃখের বিষয় এই আদিম অবস্থার উপরে উঠা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু যাঁহারা ইহার মধ্যে উচ্চতর আদর্শের অনুসরণ করেন, তাঁহারা জানেন যে ফটোগ্রাফী বিদ্যার অনুশীলনে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যায়।

'সুন্দর' বস্তু বা দৃশ্যের যথাযথ ফটোগ্রাফ লইলেই তাহা 'সুন্দর' ফটোগ্রাফ হয় না; কারণ, আমাদের চোখের দেখা ও ফটোগ্রাফীর দেখায় অনেক প্রভেদ। জিনিষের গঠন ও আকৃতি ফটোগ্রাফে চাক্ষুষ প্রতিবিম্বেরই অনুরূপ হইলেও প্রাকৃতিক বর্ণবৈচিত্র্য ফটোগ্রাফে কেবল ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য মাত্রে অনূদিত হইয়া অনেক সময় ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সাধারণতঃ হরিৎ পীতাদি উজ্জ্বল বর্ণ ফটোগ্রাফে অত্যন্ত ম্লান দেখা যায় এবং নীল ও নীলাভ বর্ণগুলি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং আকাশের নীলিমা ও মেঘের শুভ্রতা সাধারণতঃ একই রূপ ধারণ করায় সাদা কাগজ হইতে তাহাদের পার্থক্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে প্রকৃতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল কারুকার্য্য সাধারণ ফটোগ্রাফে একঘেয়ে কালীর টানের মত মিলাইয়া যায়। অবশ্য ফটোগ্রাফীর বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় এ সকল দোষের

সংশোধন অসম্ভব নহে, এবং বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ফটোগ্রাফে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিবারও উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া আর একটি গুরুতর সমস্যা ও অন্তরায় রহিয়াছে। শিল্পী যখন প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্য চয়নে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন তিনি অনেক অবান্তর বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া চলেন—অনেক আনুষঙ্গিক অন্তরায়কে ত্যাগ করিয়া কেবল সৌন্দর্য্যটুকু আস্বাদ করেন। কিন্তু ফটোগ্রাফীর নির্ব্বিচার দৃষ্টিতে সুন্দরও নাই, অসুন্দরও নাই আমার মন কতটুকু চায় বা না চায় তাহার সহিত সে কোন সম্পর্কই রাখে না, সুতরাং তাহার পক্ষে নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব। এই জন্য ফটোগ্রাফের বিষয় নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্কতা ও বিচার আবশ্যক—এবং ফটোগ্রাফীর চক্ষে বিষয়টাকে কিরূপ দেখাইবে তাহাও জানা প্রয়োজন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আড়ম্বরে যদি শিল্পীর আসল বক্তব্যটাই চাপা পড়িয়া যায়, তবে শিল্পের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে। সুতরাং চিত্রে মূল বিষয়গুলিকে যাহাতে যথাযথ প্রাধান্য দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিরূপ ভাবে কোন্ স্থান হইত ছবি তুলিলে দৃশ্যের প্রধান উপাদানগুলি সুসংস্থিত হয়—অর্থাৎ তাহারা পরস্পর বিরোধের দ্বারা চিত্রকে খণ্ডিত না করিয়া একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের ভাব আনয়নের সহায়তা করে—কোন্ সময়ে, কিরূপ আলোকে ও অবস্থায় ফটো লইলে মূল বিষয়টি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা :—কিরূপে অনাবশ্যক বিষয়ের আতিশয্যকে দমন করা যায়—সেগুলিকে বর্জ্জন করিয়া, ছায়ায় ফেলিয়া বা focus করিবার সময় স্পষ্টতার ইতর বিশেষ করিয়া, অথবা অন্য কোন উপায়ে—কিরূপে তাহাদের প্রাধান্যকে সংযত করা যায়—ইত্যাদি নানা বিষয়ে সম্যক বিচারশক্তি লাভ করা অনেক অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ।

আমরা হাল্কাভাবে শিল্পচর্চ্চা করি বলিয়াই শিল্প আমাদের আয়ত্ত হয় না। কেবল শিল্পের কথাই বা বলি কেন? বিজ্ঞান শতমুখে ফটোগ্রাফীর ঋণ স্বীকার করিতেছে। বিজ্ঞানের এমন ক্ষেত্র নাই ফটোগ্রাফী যেখানে নূতন আলোক বিস্তার করে নাই, মানুষের জ্ঞানকে দৃঢ়তর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা করে নাই। ইহা কেবল অক্লান্ত উৎসাহ ও অনুরাগেরই ফল।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেকেই ফটোগ্রাফীর চর্চ্চা করিতেছেন। আশা করা যায় তাঁহাদের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল নহে, যাঁহারা এই আশ্চর্য্য বিজ্ঞান-শিল্পকে কেবল কৌতুহলের ব্যাপার মাত্র মনে করেন না। তাঁহারা যদি তাঁহাদের ফটোগ্রাফী সাধনার কিছু কিছু নিদর্শন "প্রবাসী"তে প্রেরণ করেন তবে তাহা হইতে বাছিয়া প্রতিমাসে দু একটি ছবি "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইবে। "প্রবাসী"র পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা ফটোগ্রাফীর অনুশীলন করেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ দেখিতে পাইব, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীসুকুমার রায়।

জন্মদুঃখী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্তন্য বিক্রয়।

লোকে কথায় বলে "শৈশবে রাজার ছেলে এবং গরীবের ছেলেতে কোনো তফাৎ নাই; স্বয়ং দেবতারা শিশুদের রক্ষক।" কিন্তু বার্ব্বারার ছেলে নিকোলার উপর যে কোন দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টি ছিল তাহা বুঝিয়া ওঠা ভারি কঠিন।

সহরের বাহিরে পাকা রাস্তার উপর টিন-মিস্ত্রির দোকান ঘর। সেই ঘরখানিতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত টিম্ টিম্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিত এবং সময়ে সময়ে নগর-যাত্রী আগন্তুকের দল অন্যত্র রাত্রিবাসের সুবিধা করিতে না পারিলে উহারি মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইত। কত মাতাল আসিয়া হল্লা করিত, হাঙ্গামা করিত, পরস্পর মারামারি করিতে করিতে শিশু নিকোলার দোলা উল্টাইয়া ফেলিত; কখনো বা নেশার ঝোঁকে তাহার উপরেই আড় হইয়া পড়িত।

নিকোলার মা বার্ব্বারা পল্লীগ্রামের মেয়ে, যেমন গঠন তেমনি রং, তেমনি স্বাস্থ্য। তাহার মুখ নিটোল, বুক

পিঠ পরিপুষ্ট, দাঁত টাটকা দুধের ফেনার মত। গ্রামের হাটে যাহারা গরু বেচিতে আসিত তাহাদের মুখে সহরের গল্প শুনিতে শুনিতে সহর দেখিবার জন্য তাহার মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহার কিছুদিন পরে সে গতর খাটাইবে বলিয়া সহরে চলিয়া আসিল।

সহরের সঙ্গে কিন্তু সে কিছুতেই খাপ্ খাইতে পারিল না। বার্ব্বারার পক্ষে নগরে বাস করা গরুর পক্ষে সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠার মত দুঃসাধ্য বোধ হইতে লাগিল। সে বাজারে বাজারে ঘাস বিচালির স্তূপ দেখিয়া বেলা কাটাইত এবং সহরের ঘাস যে তাহার দেশের ঘাসের মত নয় এ কথা সে পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছেই বড় গলা করিয়া বলিতে ছাড়িত না।

কিন্তু সে যে এই রকম করিয়া সমস্ত সকাল বেলাটা নষ্ট করিবে তাহার মনিবের ঠিক সে রকম কল্পনা ছিল না। সুতরাং স্বভাবতঃ বদ্‌মেজাজী না হইলেও, বার্ব্বারাকে প্রায়ই মনিব বদ্‌লাইতে হইত। বার্ব্বারা চোর নয়, কুচরিত্রা নয়, তাহার প্রধান দোষ সে সহরের লোকের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে না, সহরে চাকরী করিতে হইলে যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন বার্ব্বারার তাহাব কিছুই নাই।

কিন্তু সমাজ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সে কলে ফেলিয়া অকেজো লোকের প্রকৃতি বদ্‌লাইয়া তাহাকে নিজের কাজে খাটাইয়া তবে ছাড়ে। সে বার্ব্বারাকেও ছাড়িল না, পাড়াগেঁয়ে বার্ব্বারাকে সমাজ সহরের কাজে লাগাইল। বার্ব্বারা 'ছেলের-ঝি' হইল।

এই উন্নতির যুগে, নাচ, ভোজ ও হুজুগের হিড়িক্ ক্রমে এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে যে বড় ঘরের মেয়েদের পক্ষে ছেলের-ঝি ভিন্ন একদণ্ড চলা অসম্ভব।

এখন ডাক্তারেরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন "ইহাই তো প্রকৃতির নিয়ম—গরুর মত দুধ যোগাইবে আবার সেই সঙ্গে মানুষের মত বুদ্ধি খরচ করিয়া কাজ করিবে এমন তো হইতে পারে না। শিশুর স্নায়ু সবল করিতে হইলে যে শ্রেণীর লোকের রক্ত ভাল এবং স্বভাবতঃ স্নায়ু সবল তাহাদের স্তন্যের বন্দোবস্ত কৃত্রিম উপায়েও শিশুর মঙ্গলের জন্য করা উচিত।"

সুতরাং কৌমুলী ভীর্গ্যাং সাহেবের সদ্যজাত যমজদের জন্য একজন অসাধারণ রকমের স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ছেলের-ঝির খোঁজ চলিতেছিল।

কৌমুলী সাহেবের মাহিনা-করা ডাক্তার, ভীর্গ্যাং-গৃহিণীর মন যোগাইবার জন্য, ছেলের-ঝির খোঁজ করিতে-ছিলেন। একদিন তিনি একগাল হাসিয়া শ্রীমতী ভীর্গ্যাংকে বলিলেন "পাওয়া গেছে, চমৎকার ছেলের ঝির সন্ধান পাওয়া গেছে। চমৎকার স্বাস্থ্য। মহম্মদকে পর্ব্বতে যেতে হল না, পর্ব্বতই মহম্মদের কাছে হাজির। তার গা থেকে গোহালের গন্ধ এখনো সম্পূর্ণ যায়নি। ঐ রকমই তো চাই; বিশেষ যখন গরুর দুধেও ফুকো চলছে তখন এরকম দুগ্ধভাগ্য তো সৌভাগ্যের কথা। বয়সও অল্প, কুড়ির বেশি নয়।"

বার্ব্বারা যখন রাস্তার কলে জল লইতে কি কাপড় কাচিতে আসিত তখন সে স্বপ্নেও জানিত না যে সে একজন বড় ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এবং অল্পদিনের মধ্যেই সহরের মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক হইতে চলিয়াছে।

বড় লোকের ছেলের ঝি একজন বিশিষ্ট লোক, সে অনেক গরীবের উপর ভক্তির দাবী রাখে। ছেলের ঝি মনিবের ছেলে মানুষ করিতে গিয়া নিজের ছেলেকে স্তন্যে এবং স্নেহে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হয়। সে দমের গদিতে শুইতে পায়, ভাল মন্দ খাইতে পায়, মনিবের কাছে আব্দার জানায়, এবং দাস দাসীদের উপর আধিপত্য করে। শেষে যখন দুধ ছাড়িয়া যায় এবং মনিবের গৃহে নূতন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন নূতন ছেলের ঝি আসিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করে এবং অন্নে মারে।

কিন্তু গরীবের মেয়ে যদি তাহার একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি—তাহার বুকের রক্ত—স্তনের দুধ তাহার নিজের ছেলেকে দেওয়াই ভাল মনে করে, সে স্বতন্ত্র কথা। সে যদি নিজের ভাল মন্দ না বোঝে, সমাজের ভদ্র লোকদের কাজে না লাগে তবে পরিণামে তাহারই অদৃষ্টে দুঃখ আছে, ইহা আমাদের সমাজতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের মত।

বার্ব্বারা এমনি বোকা যে প্রথম প্রথম সে সমাজতত্ত্বের

এই গোড়াকার কথাটা মোটেই কানে তুলিত না,—এমনি একগুঁয়ে।

রাস্তার মোড়ে গাড়ী রাখিয়া ডাক্তার সাহেব ইহারি মধ্যে তিন চার দিন টিন-মিস্ত্রির দোকানে আসিয়া বার্ব্বারার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিবারেই মাহিনা বাড়াইয়া বলিয়াছেন, কত বুঝাইয়াছেন, বার্ব্বারা বাগ্ মানে নাই। বর্ত্তমানে বার্ব্বারার যে সামান্য রোজগার তাহাতে ছেলে মানুষ করা যায় না, ডাক্তার সাহেব তাহাও বলিয়াছেন। কৌঁসুলী সাহেবের বাড়ীতে চাকরী লইলে যে মোটা টাকা মাহিনা পাইবে তাহার অতি সামান্য অংশ টিন-মিস্ত্রির হাতে মাসে মাসে দিলেই সে নিজের ছেলের মত করিয়া বার্ব্বারার ছেলেটির তত্ত্বাবধান করিবে। ইহা ছাড়া সে ছেলেকে একেবারে ছাড়িয়া যদি নাই থাকিতে পারে, মাঝে মাঝে যদি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয় তবে মাঝে মাঝে—চাই কি প্রতিমাসেই সে জন্য একবার করিয়া ছুটিও পাইতে পারে। ডাক্তার সাহেব সে বন্দোবস্তেরও ভার লইতে প্রস্তুত আছেন।

ডাক্তার সাহেব মিষ্ট কথা জোরের সঙ্গে বলিতে জানিতেন। তাঁহাকে দেখিলে বার্ব্বারার নিজের বাপের কথা মনে পড়িত। ক্রমশঃ তাঁহার গাড়ী আসিতে দেখিলেই বার্ব্বারার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইত। সাপ দেখিলে পাখী যেমন করিয়া নিজের অসহায় শাবকগুলি পক্ষপুটে ঢাকিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহার গতি নিরীক্ষণ করে বার্ব্বারাও তেম্নি ডাক্তারের গাড়ী দেখিলে তাড়াতাড়ি ছেলের দোলা আগ্লাইতে যাইত।

ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠা ছাড়া ডাক্তারের প্রশ্নের সে অন্য জবাব জানিত না। কথাবার্ত্তা যাহা বলিবার তাহা টিন-মিস্ত্রির গৃহিণীই বলিত। যতক্ষণ তাহাদের কথা চলিত বার্ব্বারা কেবল ছেলেকে বুকের ভিতর লুকাইয়া সহর ছাড়িয়া পলাইবার ভাবনাই ভাবিত।

শেষে কিন্তু ডাক্তার সাহেব এত বেশী টাকা কবুল করিলেন এবং এম্নি আপনার জনের মত ব্যবহার করিলেন যে বার্ব্বারা প্রায় তাঁহার কথায় স্বীকারই হইয়া পড়িল। ডাক্তার সাহেব তাহার ছেলেটিকে নিজে কোলে করিয়া আদর করিতে করিতে যখন বলিলেন "এমন সুন্দর ছেলেকে উপায় থাকতে কষ্টের মধ্যে ফেলে রাখতে পারে এমন নিষ্ঠুর কেউ নেই। পয়সার অভাবে এই কচি ছেলে শীতে খিদেয় কষ্ট পাবে, এ একেবারে অসহ্য।" তখন বার্ব্বারা একেবারে গলিয়া গেল।

খানিক পরে একজন প্রতিবেশী আসিয়া ঠিক ঐ কথাই বলিল। পয়সার অভাবে ঔষধ-পথ্যের অভাবে এই গরীবের বস্তিতে গত দুই বৎসরের মধ্যে কত শিশুই যে অকালে মারা গিয়াছে তাহারই বর্ণনা করিতে বসিল। টিন-মিস্ত্রির গৃহিণীর মুখেও ঐ একই কথা!

বার্ব্বারা ছেলের কাছটিতে নীরবে বসিয়া সমস্তই শুনিল। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল দম বুঝি বা বন্ধ হইয়া যাইবে। এক একবার ভাবিতেছিল দেশে ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু সেখানে এই অনাথার ভার কে লইবে?

সে আত্মসংবরণ করিল।

সেই রাত্রে তাহার কান্নার বেগ এতই বাড়িয়া উঠিল, যে, বাড়ীওয়ালা বিরক্ত হইবে ভাবিয়া, সে আস্তে আস্তে রাস্তায় বাহির হইয়া অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পাইয়া সে কতকটা যেন ঠাণ্ডা হইল।

পরদিন সকালে বার্ব্বারা এবং একজন পাড়ার মেয়ে রাস্তার কলের* কাছে দাঁড়াইয়া একখানা প্রকাণ্ড সদ্যধৌত চাদরের দুই মুড়া দুইজনে ধরিয়া নিংড়াইতেছে এমন সময়ে টিন-মিস্ত্রির দোকান-ঘরের সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল এবং জরির পোষাক পরা কোচম্যান গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে বার্ব্বারার সঙ্গিনী বলিয়া উঠিল "এই তোমার শেষ কাপড় কাচা দিদি, এখানকার বরাৎ তোমার উঠল; ঐ দেখ কৌঁসুলী সাহেবের গাড়ী।"

বার্ব্বারা এমনি জোরে মোচড় দিল যে চাদরে এক বিন্দুও জল রহিল না। আর ভাবিবার সময় নাই। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

বার্ব্বারা ঘরে গিয়া ছেলেটিকে জামা পরাইল, তাহার মুখ মুছাইল। অথচ সে যে কি করিতেছে সেবিষয়ে তাহার হুঁশ্ ছিল না।

এদিকে কোচম্যানটা টিন-মিস্ত্রির হাতে কয়েকটা যে টাকা গুঁজিয়া দিয়াছিল তাহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। লোকটা সেই সজ্জাহীন দরিদ্রের ঘরে নাক যেন সর্ব্বদা উঁচু করিয়াই আছে। অথচ বার্ব্বারা তাহার দিকে তাকাইলেই "তাড়াতাড়ি নেই" বলিয়া আশ্বস্ত করিতে ত্রুটি করে না। "কৌসুলী সাহেবের বাড়ী আটটার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না, যথেষ্ট সময় আছে।" এই কথা বলিয়া সে পকেট হইতে ঘঁড় বাহির করিয়া দেখিল। যখনি সে ঘড়ির দিকে তাকায় বার্ব্বারা তখনি ছেলেটির দিকে চায়। হুকুম আসিয়াছে, তলব পড়িয়াছে, কোলের ছেলে ফেলিয়া যাইবার সময় পর্য্যন্ত মাপা হইয়া গিয়াছে।

শিশু ঘুমাইয়া পড়িল। যদি জাগিয়া ওঠে—ভারি মুস্কিল হইবে, তখন বার্ব্বারা তাহাকে কোলছাড়া করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না।

"তাড়াতাড়ি নেই"—কোচম্যান আবার তাহার রূপার ঘড়িটা বাহির করিয়া বলিল "তাড়াতাড়ি নেই।"

কোচম্যানের তাড়াতাড়ি না থাকিলেও বার্ব্বারার বিশেষ রকম তাড়াতাড়ি ছিল। সে আবিষ্টের মত কাহারো দিকে না চাহিয়া যন্ত্রের মত গাড়ীর ভিতর গিয়া বসিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইলে তাহার যেন চমক ভাঙিল।

গ্রীষ্মের সময়ে কৌসুলী সাহেবের পরিবারের সঙ্গে ছেলের ঝি বার্ব্বারাও হাওয়া খাইতে গেল। ঠেলা গাড়ীতে শিশু দুটিকে লইয়া সে রাস্তায় বাহির হইলেই লোকে বলাবলি করিত "একেই তো বলি ছেলের-ঝি! কী স্বাস্থ্য!" বার্ব্বারার এই সুখ্যাতিতে কৌসুলী-গৃহিণীও মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

কিন্তু এই নূতন ঝিটিকে লইয়া মাঝে মাঝে ইহাঁদের ভারি মুস্কিলে পড়িতে হইত। মাঝে মাঝে সে কেমন বিমর্ষ হইয়া থাকিত, অন্ন জল ছুঁইত না, মনিবের ছেলে দুটিকে কাছে লইয়া, তাহার স্তন্য-বঞ্চিত মাতৃক্রোড়-চ্যুত নিজের ছেলেটির কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিত।

ভারি মুস্কিল! ছেলের-ঝির মন ভাল না থাকা ভারি মুস্কিলের কথা। মন ভাল না থাকিলে শরীরও ভাল থাকেনা, সঙ্গে সঙ্গে স্তন্যও বিষ হইয়া ওঠে, শিশুদেরও শরীর খারাপ করে।

কৌসুলী-গৃহিণী উহার মন খুসি রাখিবার জন্য নূতন নূতন চাটনী আচার খাওয়াইতে লাগিলেন, রকম রকম কাপড় জামা বখ্‌শিস্ করিলেন এবং প্রত্যহ উহার ছেলের খোঁজখবর করিবার জন্য চাকরবাকরের উপর কড়া হুকুম জারি করিয়া দিলেন।

বার্ব্বারা অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল, যে, তাহাকে অত্যন্ত বাড়াইয়া তোলা হইতেছে। সেই যেন বাড়ীর কর্ত্রী। ভাল খাইতে পায়, ভাল পরিতে পায়, অথচ কাজ কিছুই করিতে হয় না। সে দেখিল তাহার কাজ-করা কড়া হাত ক্রমশ ভদ্র লোকের মত নরম হইয়া উঠিতেছে। সে আরও বুঝিতে পারিল, যে, দিন রাত্রি কাছে কাছে থাকিয়া, হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, মনিবের এই যমজ দুটির উপর তাহার কেমন যেন মায়া বসিয়া যাইতেছে।

কৌসুলী পরিবার হাওয়া খাইয়া সহরে ফিরিবার কিছু দিন পরে বার্ব্বারা একদিন ছেলেকে দেখিতে যাইবার ছুটি পাইল। তাহার সেই পরিচিত পথটি এখন অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়া মনে হইতেছিল। মনিব-বাড়ী ফিরিয়া প্রথমেই যে তাহার জুতার কাদা সাফ্ করিয়া লইতে হইবে এই কথাই সে ভাবিতেছিল।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ছেলেকে দেখিতে পাইবে ভাবিয়া তাহার শরীর রোমাঞ্চিতও হইতেছিল। মাঝে মাঝে কান্নাও পাইতেছিল। কিন্তু, উপায় কি? যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে, এখন ছেলের দুধের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, সে দুধের দাম দিতে পারে।

বেড়ার পাশ দিয়া ঘুরিবার সময় দোকান-ঘরখানি চোখে পড়িতেই তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার বুক কেমন কাঁপিয়া উঠিল।

এমন সময়ে তাহার জল আনিবার, কাপড় কাচিবার সঙ্গিনীটির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। সে বার্ব্বারাকে এক নিশ্বাসে পাড়ার ছোট বড় সকল খবর দমকলের মত অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল। টিন-মিস্ত্রির দোকানে সম্প্রতি ভারি হাঙ্গামা গিয়াছে। বার্ব্বারাকে সে সকল কথা খুলিয়াই বলিবে। হাজার হউক সে হইল সই, তাহার ভাল তাহাকে তো দেখিতে হয়। টিন-মিস্ত্রিরা মনে করে লোকের চক্ষু নাই, কেউ কিছু বুঝিতে পারেনা।

এদিকে কিন্তু উহাদের সর্ব্বস্ব বন্ধক পড়িয়াছে, বৃষ্টি আট্‌কাইতে ভাঙা জানালায় দিবার মত একখানা টিন পর্য্যন্ত ঘরে নাই। কেমন করিয়া যে সংসার চলে তাহা ভগবান জানেন। লোকে বলে বার্ব্বারা তাহার ছেলের জন্য যে টাকা পাঠায় তাহার জোরেই নবাবী। ছেলেটাকে তো ফেন খাওয়াইয়া রাখিয়াছে, কাঁদিলে, নাকি একটু একটু মদ গেলাইয়া অজ্ঞান করিয়া রাখে। হাঙ্গামার পর হইতে পুলিশ বসিয়াছে বলিয়া কেহ তো আর ওখানে মাথা গলায় না।

"আমার পরামর্শ যদি নাও, সই, তবে ছেলেটাকে হল্‌ম্যান্ ছুতারের কাছে রেখে যাও,—ঐ যে যার জেটির ধারে ঘর। ভারি খাঁটি লোক। আমার মুখে ছেলেটার কষ্টের কাহিনী শুনে বেচারা ভারি সেদিন দুঃখ কচ্ছিল।"

হল্‌ম্যান্ ছুতার! হল্‌ম্যান্ ছুতার! বিমর্ষভাবে দোকান-ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বার্ব্বারার কানে ঐ নামটাই বারবার বাজিতেছিল।

ঘরে ঢুকিয়া বার্ব্বারা দেখিল তাহার আদরের নিকোলা কতকগুলা ময়লা কাঁথার মধ্যে শুইয়া আছে। অযত্নে তাহার শরীর শীর্ণ, বর্ণ ফ্যাকাশে। চোখের দৃষ্টি সদাই যেন সশঙ্ক। বার্ব্বারা তাহাকে কোলে লইতে গেলে সে কাঁদিতে লাগিল; নিকোলা তাহার মাকে চিনিতে পারিল না, বার্ব্বারার অবস্থাও প্রায় ঐরূপ।

ছেলের এই অবস্থা দেখিয়া রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সে টিন-মিস্ত্রির স্ত্রীকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিল। কিন্তু ঠিক ঐ সঙ্গে, নিকোলার গা মুছাইয়া দিতে দিতে তাহার মনিব-দের ছেলের তুলনায় তাহার নিজের ছেলেকে কেমন অদ্ভুত, কুৎসিত মনে হইতেছিল। এখন তাহার পক্ষে এই নোংরা ছেলেটাকে হাতে করিয়া মানুষ করা যে এক রকম অসম্ভব তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

সে যাই হোক্, মনিব-গৃহিণীকে বলিয়া, নিকোলাকে কালই হল্‌ম্যান ছুতারের বাড়ীতে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এ যদি সে না করে তবে তাহার নাম বার্ব্বারা নয়।

সে কাঁদিয়া কাটিয়া মুখ চোখ লাল করিয়া মনিব-বাড়ী গিয়া হাজির হইল, এবং মনিব-গৃহিণী তাহার নিকোলা সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্তে রাজী হইলে তবে ঠাণ্ডা হইল।

এমনি করিয়া নিকোলার হল্‌ম্যান ছুতারের বাড়ীতে থাকাই সাব্যস্ত হইয়া গেল।　　　　(ক্রমশ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নবীন সন্ন্যাসী

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরুদ্দেশ যাত্রা।

গোপীকান্ত বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে যখন শঙ্খঘণ্টার ভীষণ নিনাদের সহিত দেবীর আরতি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল, তখন একবার তিনি মনে করিলেন, যাই প্রণাম করিয়া আসি। কিন্তু বহুলোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে তাঁহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। যাই যাই করিয়া আর যাইতে পারিলেন না। নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আরতি শেষ হইলে গোপীকান্ত বাবু দেওয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে বলিলেন—"দেওয়ান জি, একটু বিশেষ কাজে আজই রাত্রে আমায় কল্‌কাতা রওয়ানা হতে হবে।"

শুনিয়া দেওয়ান বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আজই রাত্রে?"

"হ্যাঁ, আজই যেতে হবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বেরুব। পাল্কী তৈরি করতে বলে দেবেন।"

দেওয়ান লোকটি বৃদ্ধ। অমাবস্যার দিন বাবু বাড়ী হইতে বাহির হইবেন, ইহা শুনিয়া তিনি চমকিত হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন—"তা, আজকের দিনটে থেকে গেলে হত না?—অমাবস্যার দিনটে—"

বাবু বলিলেন—"অমাবস্যা হলে কি হয়, দিনটে আজ ভাল—দেবীপক্ষ কি না। পাঁজি দেখেছি। লেখা আছে আজ রাত্রি ন'টার পর যাত্রা শুভ, পশ্চিমে নাস্তি। তা, কল্‌কাতা ত ঠিক পশ্চিম নয়, পশ্চিম-দক্ষিণ। ভারি জরুরী কাজে যাচ্ছি। কল্‌কাতার কাছে আমার এক বন্ধুর একখানি বাগান-বাড়ী আছে, তার দাম অন্ততঃ দশ হাজার

টাকা। সেখানা খুব সস্তায় বিক্রী হচ্ছে—বলতে গেলে জলের দামে। হাজার দুই টাকা হলেই বোধ হয় পাওয়া যায়। কল্‌কাতায় যাওয়া আসা ত প্রায়ই আছে—সেখানে গেলে পরের বাড়ীতে গিয়েই উঠতে হয়, তাই অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা আছে সেখানে একটা দাঁড়াবার স্থান করি। তা এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তবিল থেকে দু হাজার টাকা আমায় এনে দিন—দশ টাকার নোট হলেই ভাল হয়।”

দেওয়ানজি বলিলেন—“যে আজ্ঞে, নোটেই এনে দিচ্চি। সেখানে কি বেশী বিলম্ব হবে?”

“না,—বেশী বিলম্ব হবে না।”

“চোরবাগানেই গিয়ে কি ওঠা হবে?”

“সেটা এখন ঠিক বলতে পারছিনে। আপনি টাকা-গুলি প্রস্তুত রাখবেন। আমি আহারাদি করে রাত্রি ন’টার পরই যাত্রা করব। আমি বাড়ী থাকছিনে—মোহিতও নেই। কাল বৈকালে মার বিসর্জ্জন সম্বন্ধে যা কিছু করতে হয় আপনিই করবেন। সকল ভারই আপনার উপর।”

“যে আজ্ঞে”—বলিয়া দেওয়ানজি প্রস্থান করিলেন।

তখন রাত্রি আটটা। গোপীকান্ত বাবু আহারাদির জন্য অন্তঃপুরে গেলেন না। সেখানে সুলোচনার সেই জেরা, কোথায় যাইতেছ, কেন যাইতেছ—ইত্যাদি, তিনি এখন সহ্য করিতে পারিবেন না। ক্ষুধাও কিছুমাত্র নাই—আহারের ভান করিতে হইবে মাত্র। তাই তিনি বাহিরের ঘরেই খাবার আনিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

আহার শেষ হইলে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অন্যান্যবার কলিকাতা যাইবার সময় যে ভৃত্যকে সঙ্গে লইতেন, সেও প্রস্তুত হইতেছিল কিন্তু বাবু তাহাকে বলিলেন—“তোকে এবার আর যেতে হবে না।”—শুনিয়া সে মনক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।

কল্যাণপুর হইতে রেল ষ্টেশন ছয় ক্রোশ পথ। ষোল জন বেহারা ও দুই জন মশালধারী সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে দিয়া পাল্কী উড়াইয়া লইয়া চলিল। দুই ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল।

পাল্কী নামানো হইলে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল গোপী-কান্ত বাবু বাহির হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এমনও ঘটিয়া থাকিতে পারে, সন্ধ্যার পর পুলিস হয়ত আমাকে ধরিবার জন্য কল্যাণপুরে আসিয়াছিল। সেখানে শুনিয়াছে, আমি ষ্টেশনে যাইতেছি। বাড়ীতে আমার লোকবল দেখিয়া, এইখানেই গেরেপ্তার করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।—এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

অবশেষে তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া দেখিলেন, রাত্রি তখন এগারোটা। আর আধ ঘণ্টা পরেই গাড়ী আসিবে। তাঁহার সঙ্গে কেবলমাত্র একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ ছিল। একজন বেহারা সেটা হাতে করিয়া লইল। গোপীকান্ত বাবু তখন অন্ধকারপ্রায় প্ল্যাটফর্মে গিয়া একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু ভয় কিছুতেই ছাড়ে না। ভাবিতে লাগিলেন, যদি ধরিতেই আসে, সঙ্গে ত টাকা রহিয়াছে, টাকা দিয়া মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিবেন। গদাই পাল বলিয়াছে, পৃথিবী টাকার বশ—পুলিসের ত কথাই নাই। অন্ধকারে জুতার শব্দ পাইলেই চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্যমনস্ক হইবার জন্য ব্যাগ হইতে চুরট বাহির করিয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। গোপীকান্ত বাবু তখন উঠিয়া, বুকিং আফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন, ভাবিলেন, টিকিটের কেরাণিটি চেনালোক না হইলেই মঙ্গল। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লোকটি অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবা, বিবর্ণ কালো আলপাকার একটি কোট গায়ে দিয়া টিকিট বিক্রয় করিতেছেন। মুখখানি দেখিয়া পরিচিত বলিয়া মনে হইল না। কাছে গিয়া বলিলেন—“আমায় একখানা কল্‌কাতার সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট দিন।”

যুবকটি ফিরিয়া, দন্তবিকাশ করিয়া বলিলেন “একি! বাঁড়ুয্যে মশাই যে! কেমন আছেন? প্রাতঃপ্রণাম।”—বলিয়া নতমস্তকে করপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ইহা দেখিয়া গোপীকান্ত বাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া বলিলেন—“ভাল আছি। আপনার কুশল ত?”

“আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে। আমায় ‘আপনি’ বলে কথা কচ্ছেন, আমায় কি চিন্‌তে পাচ্ছেন না?”

"কৈ, না।"

"আজ্ঞে, আমার নাম শিবু। শিবচন্দ্র সরকার। ছেলেবেলায় আপনার ছোট ভাই মোহিতের সঙ্গে একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তাম। মোহিতের সঙ্গে আপনাদের বাড়ীতে কত গিয়েছি, খেলা করেছি, খেয়েছি—হেঁ হেঁ।"—বলিয়া তিনি আবার দন্তবিকাশ করিলেন।

গোপীবাবু বলিলেন—"তা হবে—অনেক দিনের কথা হল কি না—স্মরণ হচ্ছে না।"

"আমাদের বাড়ী হল গিয়ে মাঝের গা—বকুলগঞ্জের বাবুদের এলাকার মধ্যে। আপনার কল্যাণপুর থেকে বেশী দূর নয় ত, বেশী দূর নয়। অনেক ভাগ্যে আপনার সঙ্গে আজ দেখা হয়ে গেল। সেই ছেলে বেলা দেখেছিলাম—সে কি আজকের কথা? আমি এই তিন মাস হল এখানে বদলি হয়ে এসেছি। আর মশাই—রেলের চাকরীতে আর সুখ নেই। ভূতগত খাটুনি। এক পা রেলে—এক পা জেলে, কখন কলিসন হয়ে যায় কিছুই বলা যায় না—হলেই শ্রীঘর। যদি মাইনে বেশী হত—তা হলেও বা বুঝতাম, পেটে খেলে পিঠে সয়। এই ধরুন আজ পাঁচ বচ্ছর ধরে চাকরী করছি—পঁচিশটি টাকা মাইনে। মাইনে আজ কাল বেটারা বাড়াতেই চায় না। রাত জেগে জেগে হাড় কালি হয়ে গেল মশাই—হাড় কালি হয়ে গেল। আমাদের নতুন বড় সাহেবটি যে হয়েছেন—"

এতক্ষণ যাত্রিগণ অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে টাকা পয়সা মুঠা করিয়া, টিকিটের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার তাহারা কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল।—"বাবু—টিকিট দ্যান্ না—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?"—"বাবু—গাড়ী যে এসে পড়ল"—বলিয়া যুগপৎ চীৎকার করিতে লাগিল।—"আঃ—চেঁচিয়ে যে মাথা ধরিয়ে দিলি বাপ্!—দিচ্ছি, সবুর কর্ না"—বলিয়া যুবক আবার আরম্ভ করিল—"হ্যাঁ কি বলছিলাম? আমাদের এই নতুন বড় সাহেবটি। একবারে পাজির পা ঝাড়া মশাই পা ঝাড়া। গত মাসে আমার তিনদিনের মাইনে কেটে নিয়েছে। হয়েছিল কি জানেন?—"

যাত্রিগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া স্বর পঞ্চমে তুলিল। এদিকে বাহিরেও ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সিগ্‌ন্যালম্যান্ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ফুকারিল—"বাবু—গাড়ী ডাউন্ মাঙ্গতা।"

"ওঃ—ট্রেন বুঝি এসে পড়ল। (উচ্চৈঃস্বরে) ডাউন্ দো। আপনার কলকাতার একখানা সেকেণ্ড ক্লাস? সিঙ্গিল না রিটার্ণ? সিঙ্গিল?—আচ্ছা।"—বলিয়া বাবুটি গোপীকান্ত বাবুকে টিকিট দিয়া, অন্যান্য যাত্রীর প্রতি মনোযোগ করিলেন। সকলে টিকিট পাইবার পূর্ব্বেই, ট্রেন আসিয়া পড়িল। তখন বাবুটি বিস্তর দোহাই সত্ত্বেও সজোরে টিকিট জানালার দ্বার বন্ধ করিয়া, টুপীটা মাথায় দিয়া, লণ্ঠনহস্তে ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া গেলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া গোপী বাবু দেখিলেন, সে কামরায় আর কেহ নাই। দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। নিজেকে আপাততঃ নিরাপদ মনে হইল।

বাহিরে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। তারাগুলি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। খোলা জানালা দিয়া শীতল বায়ু আসিতে লাগিল। আলো ঢাকিয়া দিয়া, বেঞ্চের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া, বুকের উপর বাহুদ্বয় শৃঙ্খলিত করিয়া গোপীকান্ত বাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে যেন তাঁহার বক্ষস্পন্দন কতকটা স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইল। ললাটের ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া আসিল। তখন তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন।

গোপীকান্ত বাবু ভাবিতে লাগিলেন—"আজ তাহারা কেহ থানায় যায় নাই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। হয় ত আজ পরামর্শ ও উপায়চিন্তা করিতেই তাহাদের দিন গিয়াছে। সম্ভবতঃ কল্য প্রাতে থানায় যাইবে। তা, কল্য প্রাতে গদাই পালও থানায় উপস্থিত হইবে। টাকার জোরে গদাই নিশ্চয়ই একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিবে। গদাই লোকটা খুব চালাক চতুর আছে—মামলা মোকর্দ্দমাও বেশ বোঝে। কিন্তু দারোগা যদি না শোনে? যদি টাকায় বশীভূত না হইতে চাহে? তাহা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই এজেহার লিখিয়া লইয়া তদন্ত আরম্ভ করিবে। কল্যাণপুরে আসিয়া শুনিবে আমি কলিকাতায় গিয়াছি। কলিকাতার ঠিকানা পাইবে না। অন্যান্যবার আমি কলিকাতায় গেলে কোথায় উঠি, আমার

কর্ম্মচারীরা নিশ্চয়ই দারোগাকে বলিবে না। তবে একটা কথা—মোহিত যদি সন্ধান বলিয়া দেয়। যদি কেন নিশ্চয়ই সে চোরবাগানের ঠিকানা বলিয়া দিবে। দারোগা হয় ত সন্ধ্যার গাড়ীতে, আমায় ধরিবার জন্য কলিকাতা রওয়ানা হইবে। সে যখন কলিকাতায় পৌঁছিবে, আমি তখন বহুদূরে।”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, গাড়ীর আলোড়ন ও শীতল বায়ুর প্রভাবে, গোপীকান্ত বাবুর নিদ্রাবেশ হইল। তখন তিনি ব্যাগটি মাথায় দিয়া শয়ন করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

প্রতিভা (বৈশাখ)—

ঢাকা হইতে এই পত্রিকাখানি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, সম্পাদকের নামোল্লেখ নাই। প্রথমেই শ্রীযুক্ত যশোদালাল বণিকের সনেট 'প্রতিভা,' তাহাতে কবিত্ব ও প্রতিভা ছাড়া বাল্মীকি আছে, ব্যাস আছে, চণ্ডীদাস আছে। তারপরেই শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষের 'উদ্বোধন', প্রতিভার উদ্বোধনত নয়ই, কবিতারও নয়; কবির বীণার তারে অব্যবহারে মর্চে পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সাংখ্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার সংক্ষিপ্ত বাংলায় কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী' অনুবাদ করিতেছেন; ইহা উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু 'কন্যার প্রতি' কবিতায় স্নেহ ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তাহা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় চড়াইয়া তাঁহার কন্যার প্রতি স্নেহলেশহীন পাঠকদিগকে শাস্তি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য ও সাহিত্য-সমাজ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে হাহুতাশ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া কান্নাও পায় হাসিও আসে; সাহিত্যেরত কাণাকড়ি সংবাদ নাই, আগাগোড়া পশ্চিমবঙ্গের ঈর্ষাবিজৃম্ভিত আক্ষেপ; লেখকের আক্ষেপের কারণ পশ্চিম বঙ্গ সাহিত্যে কত উন্নত, সেখানে কত বড় কবি, এখনো কত উদীয়মান লেখক, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কিছু নাই কিছু নাই! লেখকের নিজের মতন লেখকেরা যাহা লিখেন তাহা প্রকাশিত হওয়া এতদিন পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদকদের কৃপাসাপেক্ষ ছিল; আজ নিজেদের পত্রিকা পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন এবং সম্পাদককে সদুপদেশ দিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কাজ নাই, পূর্ব্ববঙ্গের কাণা-মামাদের লইয়াই তিনি পত্রিকা চালান। উদ্দেশ্য সাধু—চাচা আপন বাঁচা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নীতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের কয়েকটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; এত দিনে কি লাট কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের বিষবৃক্ষ ফলবান্ হইতেছে? পূর্ব্ববঙ্গ কি পশ্চিমবঙ্গ হইতে পৃথক্ সত্যই? বঙ্গের সাহিত্য কি আবার পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদে বিভিন্ন? পূর্ব্ব-বঙ্গের সাহিত্যিকগণ কি কখনো পশ্চিমবঙ্গে স্বীকৃত ও সম্মানিত হন নাই? পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্য কি পূর্ব্ববঙ্গের সম্পত্তি নহে? এই অক্ষম অথচ ঈর্ষাবিজৃম্ভিত রচনা পড়িয়া আমরা লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ 'পদার্থবিদ্যা' সম্বন্ধে কোন দেশে কখন কাহার দ্বারা কতটুকু জ্ঞান প্রচারিত হইয়াছিল তাহার একটি বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কৌতূহলোদ্দীপক ও তথ্যপূর্ণ। 'কোনও অদৃশ্য বিহঙ্গের প্রতি' কোনও অদৃশ্য লেখকের অদৃশ্য অর্থপূর্ণ আড়ষ্ট হেঁয়ালি। 'সেপ্পুকু' শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাপানী হারাকিরির বিবরণ ইংরাজি হইতে সঙ্কলন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বাগচি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে 'পুষ্করিণীতে মৎস্য চাষ' সম্বন্ধে বড় তথ্যপূর্ণ উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; যাঁহাদের নিজের পুকুর আছে বা পুকুর লইয়া মৎস্য চাষের সুবিধা আছে তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন; মৎস্য চাষের উপায় খুব সহজ অথচ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। 'বিশ্বরূপ' শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের কবিত্বহীন প্রার্থনা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরকখনি প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তের কবিতা 'বসন্তে' আরম্ভ হইয়াছে এইরূপে—

> আবার বসন্ত এল আবার ভরিল প্রাণ,
> আবার বকুল-মালে ব্যাকুল অলিকুলে
> ভেঙে দিল প্রেমিকের কি মধুর অভিমান।
> আবার বসন্ত এল আবার ভরিল প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের কি অন্যায়! এই সব মহাকবির মুখের কথা ছিনাইয়া লইয়া আগেই তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন—

> কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান!
> কখন বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরাফুল,
> কখন যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান।
> কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান!

ইহার উপর টিপ্পনি অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা কলেজের সন্নিহিত প্রাচীন স্থানসমূহ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু রচনাপ্রণালী আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না; প্রাচীন হাতকথা গল্পের মতন করিয়া লেখাতে সরস হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়াছে; ঐ সব তথ্য কোন নজির অনুসারে প্রামাণ্য তাহা উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিক ভাবে লিখিলে অধিকতর উপযোগী হইত মনে হয়; মোটের উপর প্রবন্ধটি সুপাঠ্য হইয়াছে। নলিনী বাবুর প্রবন্ধের পাশেই নলিনী বাবুর বিপক্ষে ও কবিবর নবীনচন্দ্রের স্বপক্ষে ওকালতনামা লইয়া শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন 'বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে নবীনচন্দ্র' কোন্ স্বত্বস্বামিত্বের অধিকারী তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; অযোগ্য উকিলের হাতে পড়িয়া কবিবরের যেটুকু অধিকার ছিল সেটুকুও আছে কিনা সন্দেহ হইতেছে। সমস্ত প্রবন্ধে কোথাও নবীনচন্দ্রের কবিত্বের পরিচয় লেখক দিতে পারেন নাই, কিন্তু আস্ফালন করিয়াছেন অনেক। 'মাণিকলাল এণ্ড সন' গল্প; লেখকের নাম নাই; গল্পের উপাখ্যান ইংরাজি হইতে লওয়া হইলেও লেখায় বেশ কৃতিত্ব ও সরস মৌলিকতা আছে; রচনাভঙ্গিতে সন্দেহ হয় লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার অথবা তাঁহার চমৎকার অনুকারী কেহ; গল্পের মধ্যে রূপসীর শেষ চরিত্র প্রথম চরিত্রের পার্শ্বে একেবারে অসম্ভব ও বিসদৃশ হইয়াছে; ঐটুকুই গল্পের খুঁত। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গোস্বামী 'মনই পরম আশ্রয়' বলিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা অবোধ্য। 'ভালবাসার জয়' বোকাসিও হইতে গৃহীত ক্ষুদ্র গল্প, বিশেষত্বহীন। অবশেষে সম্পাদকীয় মন্তব্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গে ঢাকার প্রাধান্য লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশ

করা হইয়াছে এবং বঙ্গভঙ্গ অনেকটা ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতন শুভকর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। জগতে নিরবচ্ছিন্ন অকল্যাণ নাই. সকল অশুভ হইতেই কাহারো কাহারো স্বার্থসিদ্ধি হয়; কিন্তু যাহারা জাতীয় অকল্যাণকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কারণ বলিয়া আনন্দ-প্রকাশ করে, তাহারা অমানুষ, অশ্রদ্ধেয়।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (বৈশাখ)—

ইহা ঢাকার আর একখানি নূতন কাগজ। ইহার বিশেষত্ব এখানি দ্বৈভাষিক,—ইংরাজি অর্দ্ধেক, বাংলা অর্দ্ধেক, হরগৌরী মিলন কি তেল-জলের মিলন তা বলা আজকাল বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। তবে ব্যাপারটি অপূর্ব্ব রকমের বটে। সম্পাদকও যুগলমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র। উভয়েই সরকারের নিমক-হালাল চাকর; লেখকও অধিকাংশ সরকারের মুখাপেক্ষী; সুতরাং সুলভসমাচার, বিশ্ববার্ত্তা যেমন সাপ্তাহিক, এখানি তেমনি মাসিক সরকারী পোষ্য। ইংরাজি অংশের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। বাংলা অংশের পরিচয় আমাদের কষ্টিপাথরে এইরূপ বোধ হয় প্রথমে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দেবের কেতাব হইতে ধার করা একখানি ত্রিবর্ণের হিমালয় দৃশ্য, এ ছবি ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যেরও সাড়ম্বর বিজ্ঞাপনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। এবার তৃতীয় মুদ্রণ। প্রথমে ইহাকে দ্বৈভাষিক লিখিয়া ইহার মর্য্যাদাহানি করিয়াছি বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। ইহা ত্রৈভাষিক বোধ হয়—জোর করিয়া আর কিছু বলিব না, বহুরূপীদের চেনা দুষ্কর। প্রথমেই সংস্কৃত শ্লোকে 'মঙ্গলাচরণম'। তারপর সম্পাদকীয় 'অবতরণিকা'; ইহাতে পত্রিকার নাম, অবয়ব ও উদ্দেশ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্নি ও জল, আলোক ও অন্ধকার বিরুদ্ধধর্ম্মীকে একত্র সম্মিলিত করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায় ইহার নাম সম্মিলন; কিন্তু কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ, ইহাদের সম্মিলন উভয়েরই ব্যক্তিত্বের হানিকর হওয়ার আশঙ্কা। ইংরাজি গুরু, বাংলা শিষ্য, সেইজন্য অবয়ব হরহরি বা গঙ্গা-যমুনার সংযোগ; উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে সাহিত্যচর্চ্চা, কিন্তু শিখণ্ডীর পশ্চাতে অর্জ্জুনের আশঙ্কা আছে কি না সময়ে টের পাওয়া যাইবে। 'গীত-গৌরাঙ্গ' পরলোকগত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অপ্রকাশিত পুস্তক ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছে; ইহা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনী। ইহাতে কালীপ্রসন্নের ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য্য ও বিশেষত্ব পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিশ্বকর্ম্মাপ্রকাশ নামক গ্রন্থ ও পুরাণাদি হইতে দেখাইতেছেন যে 'বিশ্বকর্ম্মা' কাল্পনিক নাম নহে, ঐ নামে কোনো দক্ষ শিল্পী পুরাকালে বিদ্যমান ছিলেন এবং তৎপ্রবর্ত্তিত শিল্প ও স্থাপত্যপদ্ধতি এপর্য্যন্ত প্রচলিত আছে; উড়িষ্যার মন্দির সকল বিশ্বকর্ম্মা-পদ্ধতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন; এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় স্থপতিবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'পদ্ম' কবিতায় স্বভাব-কবির মাধুর্য্য ও সারল্য নাই এবং তাহার স্বকীয় বিশেষত্ব দাশুরায়ী ভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; ছদ্মবেশী পদ্মকে উপলক্ষ করিয়া কবি কোনো ছদ্মবেশী মানুষকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায়ের 'উকার বনাম ওকার' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য; কিন্তু ইহার মধ্যে লেখক একটি উদ্দেশ্য অনুযায়ী ক্রম রক্ষা করিতে পারেন নাই; ইংরেজি, ফার্সী ও বাংলার প্রাদেশিক উচ্চারণের উকার ও ওকার একত্র করিয়া খিচুড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন; লেখক উচ্চারণানুকূল বানানের বিরোধী, কিন্তু সেরূপ বানান যে স্থলবিশেষে আবশ্যক হয় তাহা একটু চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। যেমন—তুমি কর (বর্ত্তমান), তুমি করো (ভবিষ্যৎ), ইত্যাদি। যাহাই হোক মোটের উপর প্রবন্ধটি পড়িলে চিন্তাশীলের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিবার যথেষ্ট খোরাক জুটে। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার 'ঈশাখাঁর কামান' আবিষ্কারের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিখিয়াছেন; ইহাতে বাংলার অতীত গৌরব-ইতিহাসের এক অংশের পরিচয় পাইয়া মন পুলকিত হইয়া উঠে; এই কামানগুলিতে বঙ্গাক্ষর খোদিত আছে; সর্ব্বসুদ্ধ ৭টি কামান কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 'ভোগই মৃত্যু' পদ্যে তত্ত্বকথা, কবিতা নহে। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের গল্প 'পাপের ফল' অসমাপ্ত; কিন্তু মুখপাতেই বিশেষত্ব ও আর্টের অভাবে গল্পটি কিছুমাত্র কৌতূহল উদ্রেক করে না। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সম্মিলন' কবিতা চলনসই। শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী দাস গুপ্তা 'কবি রজনীকান্ত ও তাহার একটি বাল্য কবিতা'র পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহার পরেই কবির তিনটি কবিতা 'সন্ধ্যা,' 'নিশীথে' ও 'প্রভাত' বিশ্বপতির স্নিগ্ধ প্রকাশের কাছে ভক্তের আত্মনিবেদন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় 'গত বৎসরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াছেন; ১ম, বিবিধ ধূমকেতু ও নক্ষত্র এবং একই বৎসরে দুইটি চন্দ্রগ্রহণ ও দুইটি সূর্য্যগ্রহণ; ২য়, রেডিয়াম ধাতুর প্রকৃতি; ৩য়, ব্যোম-যান। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'অযোধ্যার রাজগণ কি সূর্য্যবংশীয়?' প্রশ্ন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে তাহারা সূর্য্যবংশীয় নহেন, বৈবস্বত মনুর বংশধর। ময়মনসিংহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ 'অভিভাষণ' বিশেষত্বহীন, নূতন কথা বা কাজের কথা কিছুই নাই।

মহিলা (পৌষ)—

প্রায় সমুদয় প্রবন্ধই এমন একটা অসাহিত্যিক ভঙ্গিতে লেখা যে পাঠ করা কষ্টকর হয়। চিন্তাশীলতা বা শৃঙ্খলার পরিচয় কোথাও নাই। 'ওডেসি' উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তাহাও ক্রমশপ্রকাশ্য এবং অতি অল্প মাত্রায় প্রকাশিত।

কুশদহ (বৈশাখ)—

স্থানীয় পত্রিকা। উল্লেখযোগ্য কিছু নাই।

মৃণ্ময়ী (চৈত্র)—

'বৈষ্ণব ছন্দের আভাস', 'গীতগোবিন্দ' চলিতেছে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রত্নাবলী নাটকের উপাখ্যান অংশ লিখিতেছেন, কিন্তু ইহাতে মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইতেছে না। কবিতাগুলির মধ্যে একটিও উল্লেখযোগ্য নহে। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মার 'মিকির জাতি', উল্লেখযোগ্য। 'বায়ুমণ্ডলে' পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার কথা, যাহা পাঠশালার ছেলেরাও জানে, আলোচিত হইয়াছে।

মানসী (চৈত্র)—

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'আপ ভালা তো জগৎ ভালা' পদ্য, অতি সাধারণ ধরণের, ও কবির নিজস্ব বিশেষত্বও ইহাতে পরিস্ফুট নহে। শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সাদীর কবিতার ভাবেই অনুপ্রাণিত, হাফিজের নহে; তবে তাঁহার কবিতায় যে হাফিজের ভনিতা তাহা হাফিজ পাঠে কবির সোঽহং ভাবের পরিচায়ক; একথা আমরা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারিলাম না; কোনো ভাষা না জানিয়া তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভবে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু 'ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু নূতন কথা কিছু বলেন নাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কাঞ্চনফুল' কবিতাটি ভাষায় ছন্দে কবিত্বে মনোরম হইয়াছে, কিন্তু প্রবাহটি যেন চেষ্টাকৃত এবং

অতিরিক্ত দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী 'সামাজিক সমস্যা' প্রসঙ্গে বিলাত প্রত্যাগতের পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া হিন্দুসমাজের বোধ ও বিচারহীন ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন 'রমেশ চন্দ্র দত্ত' কৃত ঋগ্বেদ অনুবাদ প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু ও শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; বঙ্কিমবাবুর স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক প্রবন্ধাংশ যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা উপভোগ্য; তিলকের উক্তির বঙ্গানুবাদ দেওয়া উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসুর পদ্য 'তিল,' যাহা দেখিয়া কবি হাফিজ সমরকন্দ ও বুখারা বকশিশ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের চিত্ত কিন্তু ভুলিল না, লেখক সুন্দরীর তিলকে ভাষার মুকুরে সুন্দর করিয়া প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই। 'ফিনিয়া' শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প। 'কবি-সম্বর্দ্ধনা' কবিবর রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা-বিষয়ক নিবেদন ও সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা। 'মাতৃহীন' শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প; বিলাতপ্রবাসে বাঙালী ছাত্রজীবনের চিত্র, চিত্রগুলি ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনার মতো সুখপাঠ্য; আখ্যানভাগে একটি একনিষ্ঠ প্রণয়ের যে চিত্র আছে তাহা যেমন বিশুদ্ধ তেমনি করুণ, গল্পটী অনাড়ম্বর স্নিগ্ধভাবে অনুপ্রাণিত। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৈদেশিকী' বার্ত্তা সঙ্কলন করিয়া দেখাইয়াছেন যে বহু মনস্বীর মতেই আমিষ ভক্ষণ উচিত নহে; এ তত্ত্ব নূতন না হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তির মতগুলি বেশ কৌতুকপ্রদ; লেখকের ভাষায় রসিকতার চেষ্টা কখনো বা উৎকট কখনো বা ন্যাকামির সমীপবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে; রস জিনিষটি জোর করিয়া রচনায় ভরা যায় না।

বঙ্গদর্শন (চৈত্র)—

'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' কবির চিত্রাঙ্কণ প্রতিভার তুলনায় লেখক দেখাইয়াছেন যে একজন স্বাভাবিক ও অপরজন কৃত্রিম হইলেও চিত্রাঙ্কণ কার্য্যে উভয়েই বিশেষ দক্ষ; এই প্রবন্ধে কবির চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 'ভারতে ইংরাজের পদার্পণ' কবে প্রথম হইয়াছিল তাহার একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসুর 'কুন্তী-ব্রাহ্মণ-সংবাদ' পদ্য-নাট্য; কিন্তু ইহার মধ্যে কবিত্ব সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই, রচনাও চেষ্টাকৃত, ছন্দ আড়ষ্ট। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বলিতে চান যে 'নব্য ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ বিলাতী সমাজের অনুকরণে গঠিত। ব্রাহ্মসমাজের পাঁচটি প্রধান মত নিরাকার উপাসনা, জাতিভেদ বর্জ্জন, যৌবন বিবাহ, বিধবা বিবাহ ও স্বাধীনতা—ইহার মধ্যে নিরাকার উপাসনা, জাতিভেদ-বর্জ্জন ও বিধবা বিবাহ লেখকের মতে নিশ্চয়ই বিলাতীর অনুকরণ, এসব জিনিষ আমাদের দেশের নয় ও উহা শ্রেষ্ঠ আদর্শও নহে; ঔপনিষদিক উপাসনা বা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত উপাসনা ঠিক ভবে ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেন নাই, এ উপাসনা খৃষ্টানী উপাসনার নকল; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে ভেদ সূচনা করিয়াছে তাহা সমাজের কল্যাণকর এবং গুণমূলক নহে; বিধবা বিবাহ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে খর্ব্ব করিতেছে, ইত্যাদি। লেখক অনেক স্থলে নিজের মনের মতো সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া তর্ক ফাঁদিয়াছেন, ইংরাজিতে যাহাকে বলে Begging the question. সমালোচনা প্রসঙ্গে সকল মত আলোচনা করিয়া খণ্ডন করা অসম্ভব, সংক্ষেপে আমরা তাঁহার মূল মতগুলি আলোচনা করিয়া দেখাইব যে লেখকের কুসংস্কার তাঁহাকে কতদূর ভ্রান্ত করিয়াছে। নিরাকার উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে বিলাতী প্রভাব থাকা সম্ভব, কিন্তু বিলাতী বলিয়া কোনো জিনিষ একেবারে পরিহার করিবার কাল কি এখনো আছে? ব্রাহ্মধর্ম্ম মানেই ত Universal religion—জগতের সকল সত্য, সকল সাধু, সকল সুরীতি ব্রাহ্মসমাজের মান্য এবং ইহাই তাহার গৌরবের বিষয়; স্বাধীনচিন্তাই এই ধর্ম্মের ভিত্তি,—এই কথাই আচার্য্য প্রচার করেন, সে প্রচারকার্য্য বেদীতে বসিয়াই হোক বা আসনে বসিয়াই হোক বা দাঁড়াইয়াই হোক ফল সমান, মণ্ডলী উপাসনাই ব্রাহ্মদের একমাত্র উপাসনা নহে, তাঁহারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উপাসনাও নিত্য নিয়মিত করিয়া থাকেন, যিনি না করেন তিনি কর্ত্তব্য অবহেলা করেন; মণ্ডলী উপাসনার উপকারিতা এই যে পরস্পরের সহযোগিতায় ধর্ম্মভাব সুস্পষ্ট ও জাগ্রত হইয়া উঠে, নানা লোকের চিন্তার সংস্রবে আসিয়া নিজের চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ ও মার্জ্জিত হয়। মণ্ডলী-উপাসনা আমাদের দেশে ছিলই না, একথা কেমন করিয়া প্রতিপন্ন হইল? মহানির্ব্বাণতন্ত্রের স্তোত্রে "বয়ন্ত্বাম্ ভজামো বয়ন্ত্বাম্ স্মরামঃ" প্রভৃতি বাক্যে বহুবচন প্রয়োগেই বুঝা যায় যে তান্ত্রিকগণের উপাসকমণ্ডলী ছিল। আর একটা দৃষ্টান্ত, বৈষ্ণবগণের একত্র বসিয়া কীর্ত্তন। ইহা কি মণ্ডলী-উপাসনার একটি প্রকারভেদ নহে? ব্রাহ্মরা না হয় একটু পাশ্চাত্য ভাবই লইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণ হয়না যে কোন প্রকারে মণ্ডলীগত উপাসনা ভারতে ছিলনা। লেখক বৌদ্ধ ও জৈনগণের সাধকমণ্ডলীর বৃত্তান্ত জানেন কি? হিন্দুসমাজের হরিসভাগুলি একটুও পাশ্চাত্যভাব লয় নাই কি? "যত দোষ নন্দ ঘোষ।" লেখকের মতে হিন্দুদিগের একাকী উপাসনাই শ্রেষ্ঠ সুতরাং পালনীয়। কিন্তু হিন্দুর একাকী উপাসনা কাহাকে বলিব? মন্দিরে গিয়া অবোধ্য মন্ত্র পড়িয়া দুটা ফুল ফেলিয়া ঘণ্টা নাড়িয়া প্রস্থান, না, গঙ্গার ঘাটে সহস্র লোকের কোলাহল ও হাঙ্গর কুম্ভীরের ভয়ে সচকিত জপ? ইহাতে চিত্তবিক্ষেপ হয় না, যত চিত্তবিক্ষেপ হয় বুঝি মন্দিরে সংযত শুদ্ধ হইয়া ধ্যান করিবার সময় ব্রাহ্মদের? আবার নিরাকার উপাসনা অসম্ভব কে বলিল? ব্রহ্ম যেমন একদিকে অবাঙ্‌মনস গোচরঃ, তেমনি আবার অপর দিকে যে তিনি চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, তিনিই ওষধিতে বনস্পতিতে অগ্নিতে জলেতে, বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট, অথচ জল, অগ্নি, বায়ু তিনিই নহেন; তাঁহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত, সূর্য্য সঞ্চারিত, ও মৃত্যু ধাবিত হয়, তিনি যে অন্তরতম, তিনি ভূর্ভুবস্ব প্রসব করেন এবং তিনিই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে প্রেরণ করেন—তিনি যেমন বাহিরে তেমনি অন্তরে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশমান। এবিষয়ে যে চিন্তা না করিয়াছে তাহাকে বুঝানো অসম্ভব। দ্বিতীয় প্রস্তাবের উত্তর আমাদের কিছু দিতে হইবে না, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে অসন্তোষ জাগিয়াছে তাহা দেখিয়াই লেখকের চৈতন্য হওয়া উচিত ছিল। বর্ণাশ্রম "ধর্ম্ম" গুণমূলক একটুও নহে বলিয়াই ত পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছেন, এবং বর্ত্তমানে নমশূদ্রগণ ব্রাহ্মণেরও চাকরী এবং ব্রাহ্মণেরও অন্ন গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না। তৃতীয় বিষয়ে বক্তব্য এই ব্রাহ্মসমাজ পূতসংযমশীলা ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে যেমন ভক্তিশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, অক্ষমা দুর্ব্বলপ্রকৃতি বা অসহায়া বিধবার পত্যন্তর গ্রহণও তেমনি আবশ্যক মনে করেন, করেন না কেবল তথাকথিত আদর্শের খাতিরে অবলার প্রতি নির্য্যাতন; বিধবার পক্ষে পুনর্বিবাহই শ্রেয়ঃ এ কথা লেখকের স্বকল্পিত, ব্রাহ্মসমাজের মত নহে। বিধবাদিগকে শিক্ষা দিলে দেশের সেবা হইতে পারে, ইত্যাকার বাক্যের শ্রাদ্ধ ও ন্যাকামি আমরা ঢের শুনিয়াছি। বাপুহে, কথায় চিঁড়ে ভিজে না; এই ভাবের কাজ আমরা কবে কে কতটুকু করিয়াছি বা এখন করিতেছি, বলিতে পারি কি? বিপত্নীকদিগকেও ত শিক্ষা দিলে দেশের সেবা হয়। তাহাদের বেলা, ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্তাব কর না কেন?

কখনও কর নাই কেন ? সতী পত্নীর সহমরণের প্রশংসা সবাই করে, কিন্তু কোনও সৎপতি এপর্য্যন্ত স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার চিতায় নিজেকে পুড়াইল না। দুনিয়া বাস্তবিকই এক আজব চিড়িয়াখানা ! এই একটি চিন্তালেশহীন অক্ষম রচনার আলোচনায় আর অধিক বাক্য-ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। শ্রীস্থঃ 'রাজর্ষি রামমোহন' উদ্দেশে সনেট লিখিয়াছেন ; 'মানবের জন্মকথা' ও 'ষড়দর্শন' চলিতেছে। 'পতিতা' শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্দ্র মজুমদারের গল্প ; প্রথম অংশে রবিবাবুর গল্পের ছায়া পড়িয়াছে, শেষাংশ প্রথমাংশের সহিত খাপ খায় নাই। গল্পের উপাখ্যান স্থগঠিত নহে, ভাষাও স্থললিত হয় নাই ; গল্পের মধ্যে চাষা সমাজের একটি চিত্র অদ্ধস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই উপভোগ্য।

তত্ত্ববোধনী-পত্রিকা (বৈশাখ) —

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা 'নববর্ষ'। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ' ধারাবাহিক দার্শনিক প্রবন্ধ। 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার সার মর্ম্ম, পাঠ করিলে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কি স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের পূর্ব্বানুবৃত্তি ও অসমাপ্ত উপদেশ। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী 'সাধু বাক্য' সংকলন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মধ্য যুগের সাধক 'দাদূ' সম্বন্ধে পরিচয় দিয়াছেন ; ইহা তত্ত্বজিজ্ঞাস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট উপভোগ্য বোধ হইবে ; এক দিন ছিল যখন আমাদের দেশে নিরক্ষর জোলা কবীর, মুচি দাদূ, মুদি নানক প্রভৃতি নিরাকার উপাসনা প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন, আর আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দাগ-মারা বাবুরাও ইহা অসম্ভব বলিয়া কুতর্ক তুলিতে লজ্জা ও দ্বিধা বোধ করেন না ; ইহার কারণ আমাদের দেশ হইতে চিন্তার কারবার এবং সত্যানুরূপ আচরণ অনেক কারবারের সঙ্গে বহু পরিমাণে লোপ পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সুফী ধর্ম্ম' সম্বন্ধে সংকলন করিয়াছেন ; সুফী ধর্ম্মসম্প্রদায়ও স্বাধীন চিন্তার জন্য প্রসিদ্ধ ; এই প্রবন্ধে তাঁহাদের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নববর্ষের প্রার্থনা' কবিতা, সরস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'যন্ত্র ও জীব' সুলিখিত প্রবন্ধ।

ভারতী (বৈশাখ) —

প্রথমেই শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত রঙিন চিত্র —হরপার্ব্বতী। তারপর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নববর্ষ' কবিতা, বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। তার পাশেই শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বর্ষবরণ' কবিত্বে বৈচিত্র্যে পশ্চাৎ দৃশ্যের তুলনায় আসল চিত্রের মতো চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিতাটি একখানি সঞ্চরমান বায়োস্কোপের চিত্রের মত সুন্দর হইয়াছে ! 'বিবাহ' সম্পাদিকার ক্রমশপ্রকাশ্য গল্প, প্রথমেই পুলিশ স্বদেশী হাঙ্গামার সূত্র ধরিয়া উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে কেমন করিয়া চাপায় তাহা দিয়াই গল্প আরম্ভ হইয়াছে। 'কালোর আলো' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কবিত্বময় শব্দচিত্রের ভিতর দিয়া ভারতীয় কলাপদ্ধতির স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্য ও রস অল্প পরিসরে দেখাইবার উপায় নাই। তাঁহার আসল বক্তব্য এই যে ভারতের আর্ট ধ্যান ধারণার ফল, বাহিরের আকারের সেবা নহে, যিনি এক, যিনি রস, যিনি আনন্দ-ঘন, যিনি মূরত বীচ অমূরত, তাঁহাকে প্রকাশ করাই ভারতের সাধনা। এমন প্রবন্ধ মাসিক পত্র কদাচিৎ অলঙ্কৃত করে। এই সংখ্যায় শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস শেষ হইল। স্বস্তি। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রার্থনা' কবিতা বা গান, তাঁহারই রচনার মতন হইয়াছে বলা ছাড়া আর কোনো ষ্টাণ্ডার্ডে বুঝাইবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত নিরুপমচন্দ্র গুহের 'আমেরিকায় গ্রীষ্মাবকাশ' কৌতূহলোদ্দীপক সুখপাঠ্য বর্ণনা। শ্রীমতী সরলা দেবী 'যোগাযোগ' প্রবন্ধে বলিতে চাহিয়াছেন যে কর্ম্মযোগেই মানুষ মানুষের সঙ্গে ও ভগবানের সঙ্গে নিজেকে যোগযুক্ত করে। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল সমগ্র নারীসমাজকে যুক্ত করিবার আয়োজন করিয়াছেন, সকল নারীকে এই মহাশৃঙ্খলের এক একটি গ্রন্থি হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। নারীগণ এই নববর্ষে এই ব্রত গ্রহণ করুন যে প্রত্যহ তাঁহারা অন্তত একঘণ্টা পরিবারস্থ বা গ্রামস্থ বালিকাদিগকে কিছু না কিছু লেখা-পড়া, শিল্প, আলপনা প্রভৃতি শিক্ষা দিবেন। লেখিকার সাধু উদ্দেশ্য সকলে জয়যুক্ত করুন। 'অকৃতজ্ঞ' শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের গল্প, চলনসই। 'মাঙ্গলিক' শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর পদ্য না মিল গদ্য বিশেষ সন্দেহ আছে ; এমন আড়ষ্ট পদ্য লেখার চেয়ে সরল গদ্য লেখা ঢের ভালো। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'জাপানী আকৃতি ও প্রকৃতি' সম্বন্ধে অনেক কৌতুকপদ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 'চয়ন' বিভাগে মোপাসার গল্প 'আমার জুলকাকা' শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ ; এটি মোপাসার খুব উজ্জ্বল রকমের গল্প নয় এবং অনুবাদের ভাষা বেশ স্বচ্ছন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন 'মানবের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুমান সঙ্কলন করিয়াছেন ; বায়ুমণ্ডলে অম্লজান বাষ্প কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা আশঙ্কা করিতেছেন যে কালে মানব সপ্তারু জাতীয় সরীসৃপ হইয়া ক্রমে লোপ পাইবে এবং তখন উদ্ভিদের একাধিপত্য হইবে ; প্রবন্ধটি সুলিখিত ও সুখপাঠ্য হইয়াছে ; লেখকের ভাষার মধ্যে একটি বেশ স্বচ্ছ বেগ আছে যাহাতে বক্তব্য সর্ব্বত্র পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক দোদে প্রণীত 'জ্যাক' নামক উপন্যাস 'মাতৃঋণ' নামে অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 'ভারত ও বিলাত' তুলনায় সমালোচনা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'মানবদেহের ক্রমবিকাশ' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। 'রাজকন্যা' সম্পাদিকার নাট্য-উপন্যাস ; ক্রমশপ্রকাশ্য ; প্রথম দফা ভাল বোধ হইল না এবং তাহাতে লেখিকার পরীক্ষার একটু চাপ আছে। 'চীন ভ্রমণ' শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্রের ইংরাজি হইতে সংকলন, কৌতূহলোদ্দীপক ও বহু তথ্যপূর্ণ।

নব্যভারত (চৈত্র)

এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ :—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা 'কবে মানুষ মরে গেছে' ; এই কবিতাটির অর্দ্ধেক বাদ দিয়া ও দুই চারিটা কথা বদলাইয়া দিয়া প্রকাশ করিলে কবিতাটি অনিন্দ্য হইত ; যাহা আছে তাহাও একখানি করুণ চিত্রের মতো সুন্দর। 'অমৃতসর' শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সাহার ভ্রমণকাহিনী, বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ অনাড়ম্বর রচনা বলিয়া সুখপাঠ্য। একটি ফার্সী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ছাপার দোষে অপাঠ্য হইয়াছে। 'আত্মতত্ত্ব' নাম দিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অধ্যাত্মশক্তি বিকাশের ফলে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর আত্মা কর্ত্তৃক লেখানো প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু এ প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুর ভাষার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না ; এ রকম ভৌতিক কাণ্ড সহসা বিশ্বাস না করিয়া বিলাতী সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটীর মতন খুব সাবধান বিচার বিতর্কে সাচ্চা করিয়া প্রকাশ করা উচিত ; নগেন্দ্র বাবু প্রবীণ ধর্ম্মাত্মা, তাঁহার উক্তি অবিশ্বাস করিবার নহে, কিন্তু তিনি নিজের কাছে নিজে প্রতারিত হইতেছেন কি না তাহা তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। যে প্রবন্ধ বঙ্কিম বাবুর আত্মার লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভাষা, ভাব চিন্তা

ও বিচারপ্রণালী সমস্তই নগেন্দ্র বাবুর মতন বলিয়া সন্দেহ হইতেছে, হয় ত তিনি নিজের ভাবাবেগ ও কল্পনার নিকট প্রতারিত হইতেছেন।

ভারতমহিলা (বৈশাখ)—

'নববর্ষ' শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ লিখিত; ইহা ভাষার ঐশ্বর্য্যে উপভোগ্য হইয়াছে। 'আমাদের শিশু' কেমন করিয়া পালন করা উচিত সে সম্বন্ধে শ্রীমতী শতদলবাসিনা বিশ্বাস অনেকগুলি নিয়ম ও উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'সদ্য-বিধবা' শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের উদ্দেশ্যহীন কবিতা; ইহা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার প্রতিধ্বনি। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস' সম্বন্ধে ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্তের 'কাশী-ভ্রমণ' উপলক্ষ্যে পথের বর্ণনাটি কৌতূহলোদ্দীপক ও হাস্যরসে ভিয়ানো। 'আঁখির ভাষা' শ্রীমতী কুসুমকুমার দাসের কবিতা, চলনসই। 'পত্নী-প্রেম' শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসুর ব্যর্থ গল্পরচনার চেষ্টা; গল্পের প্লটটিতে ভারতমহিলাতেই কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত ভূতের ঘটকালি নামক গল্পের ছায়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাসের 'জীবে দয়া' সুলিখিত ও বহুতথ্যপূর্ণ স্বাধীন অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ; কিন্তু প্রবন্ধের নামটি প্রবন্ধের ঠিক ভাবপ্রকাশক হয় নাই; ইহাতে অনেক জীবের প্রকৃতি আলোচিত হইয়াছে। শ্রমণ শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী 'কুলবধূ সুজাতা' সম্বন্ধে জাতকথা পালি হইতে প্রকাশ করিয়াছেন; সুলিখিত ও পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'শুভগ্রহ' ক্রমশ প্রকাশ্য কৌতুকনাট্য। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ভারতের গিরি-মন্দির' প্রবন্ধের দীর্ঘ ভূমিকার মধ্যে মুরুব্বিয়ানা যথেষ্ট আছে, তা ব্যাকরণই জবাই হোক বা অর্থই না হোক থামিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার নাই; "নীলাম্বুময়ী জলধির উন্মাদ তটভূমে" লেখকের ব্যাকরণ আছাড় খাইয়াছে; "একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে পাশ্চাত্য জাতির আহ্বান ব্যতীতই আমরা জাগরিত হইয়াছি"—দুইবার নিষেধে যে একবার স্বীকার হয় এতত্ত্ব বোধ হয় লেখকের জানা নাই; লেখক "কাজের তন্দ্রালস ভাব-প্লাবলো এখন আর ভাসিলে চলিবে না, এখন জাগ্রত মহিমার পরিপূর্ণতায় আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে" বলিয়া মুরুব্বিয়ানার সহিত কতকগুলি কথা একত্র জুড়িয়া দিয়াছেন তাহার অর্থ কিছু নাইবা হইল। এরূপ অসাবধানতার সহিত যাঁহারা রচনা করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা রাখেন তাঁহাদিগের সাহসকে বলিহারি। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'আচার্য্য জগদীশচন্দ্র'কে পদ্যে বন্দনা করিয়াছেন। রচনা কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় 'ভূগর্ভ' সম্বন্ধে পরিচয় দিতেছেন; ক্রমশ প্রকাশ্য। শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় 'চীনদেশে বিবাহপ্রথা' বর্ণনা করিয়াছেন; অনেক জ্ঞাতব্য কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য বেশ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

দেবালয় (বৈশাখ)—

এবার কোনো প্রবন্ধই উল্লেখযোগ্য নহে। উহারি মধ্যে সুকবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা 'চারি কন্যা' চলনসই, লেখকের নিজস্ব বিশেষত্বে সুপাঠ্য, তবে সকল স্থানের অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী 'হিন্দু ও গ্রীক' প্রবন্ধে বকিয়াছেন অনেক, কিন্তু বক্তব্য একটুও পরিষ্কার করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন গ্রীক অর্থাৎ য়ুরোপ ও হিন্দুর সমন্বয় ও সম্মিলন না হইলে কাহারই কল্যাণ নাই। উপসংহারে বলেন—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল জ্ঞান, বিবেকানন্দ কর্ম্ম, রবীন্দ্রনাথ ভক্তি, ইঁহাদের তিনের সমন্বয় রাজা রামমোহন, এবং সকলেই আদর্শ হিন্দু ও গ্রীকের পুনঃসম্মিলন হইতে পারেন; কিন্তু রাজা রামমোহন আগে জন্মিয়া পরবর্ত্তী তিনের সমন্বয় কেমন করিয়া হইলেন? এই তিনজন রাজা রামমোহনের বিশ্লিষ্ট অংশ বরং বলা চলে।

কহিনুর (বৈশাখ)—

ইহার সকল লেখকেরই ভাষা বেশ শুদ্ধ, বরং সংস্কৃতশব্দবহুল; কিন্তু রচনাভঙ্গী কষ্টকৃত ও অতিরিক্ত অলঙ্কারযুক্ত। প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেরই বক্তব্য অল্প, কিন্তু ভূমিকায় অবান্তর বক্তৃতা সুদীর্ঘ। শ্রীযুক্ত শেখ আবদুল জব্বার 'মহর্ষি নেজাম উদ্দিন' কেমন করিয়া দস্যুতা ত্যাগ করিয়া মহর্ষি হইয়াছিলেন তাহার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন; এই আখ্যায়িকার সহিত মহাকবি বাল্মীকির আদি জীবনের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ 'প্রাচীন ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' উদ্ঘাটন করিয়া চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী ফতেয়াবাদের এক মসজিদ-ফলকে উৎকীর্ণ আরবী লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া সুলতান হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পিতা রাস্তিখাঁর কাল নির্ণয় করিয়াছেন ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের সমকাল। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়ের ক্রমশপ্রকাশ্য গল্প 'দুর্যোগ' হিন্দুমুসলমানে বন্ধুত্ব লইয়া আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের ছায়াপাত দেখা যায়। শ্রীযুক্ত শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহাম্মদ 'আরবজাতির ইতিহাস' সংকলন করিতেছেন; এবার আব্বাস-বংশীয় খলিফাগণের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হামেদ আলী আব্বাস বংশের পরবর্ত্তী নৃপতিবংশের অন্যতম মন্ত্রী 'খাজা হাসেন নিজামোলমোলুক' সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে ইঁহার প্রতিভা বা বিশেষ মহত্ত্বের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম 'ঐতিহাসিক সংগ্রহ' করিয়া বলিয়াছেন যে দিল্লীর শেষ সম্রাটের পুত্র কোটা রাজ্যে ফকিরবেশে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন; ইহা কোটানিবাসী এক মৌলবীর উক্তি। ইহা কিন্তু অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। লেখকের স্বদেশ-প্রীতি অনুকরণীয়; এ স্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—"ভারত আমাদের পক্ষে আজ শ্মশান হইলেও ইহা আমাদের পুণ্য তীর্থবৎ দর্শনীয়; ইহার ভস্মরাশি প্রসাধন সামগ্রীবৎ ব্যবহৃতব্য, সে বিষয়ে সম্ভবত কোন মুসলমানেরই সংশয় উপস্থিত হইবার নহে। শ্মশানের মত এমন মহা সম্মিলন-ক্ষেত্র জগতে আর নাই।—এখানে জাতি বর্ণের ভেদ নাই, ধনীদরিদ্রে বৈষম্য নাই, ইতর ভদ্রে ভ্রুকুটি ভঙ্গী নাই......" 'রত্নচয়ন' নাম দিয়া পারস্য পুস্তক হইতে শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ এয়াকুব আলী নীতিমূলক আখ্যায়িকা চয়ন করিয়াছেন; এরূপ এলোমেলো ভাবে না করিয়া কোনো একখানি পুস্তক ধরিয়া ধারাবাহিক অনুবাদ করিলে লোকের তৃপ্তি ও সাহিত্যের উপকার অধিক হয় মনে করি। ৭ সংখ্যায় একটি কবিতাও উল্লেখযোগ্য নাই। পরিশেষে ফার্সী শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে যেখানে পারস্যবাসী ও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ই বা উ উচ্চারণ করেন, ভারতীয় উচ্চারণে সেখানে এ বা ও করা হয়, এ রীতি শ্রুতিকটু ও ঠিক নয় বলিয়া নিন্দনীয়; এ বিষয়ে লেখকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

গৃহস্থ (চৈত্র)—

ইহা বৈষ্ণবদিগের সাম্প্রদায়িক পত্রিকা বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত নয়। কোনো প্রবন্ধেই সাহিত্যরস নাই এইটুকু বলা যায়। অধিকাংশ প্রবন্ধই ক্রমশ প্রকাশ্য। মুখপত্র একখানি তিনরঙে ছাপা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির সাধারণ পট, ছাপাও ভালো হয় নাই।

ব্রাহ্মণ (মাঘ)—

এখানিও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। সাহিত্যরসের

একান্ত অভাব। 'সনৎ-সুজাত-সংবাদ' ক্রমশ অনুবাদিত হইতেছে, ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

প্রজাপতি (বৈশাখ)—

ষটকালীর পত্রিকা। উল্লেখযোগ্য কোনো রচনা নাই।

উদ্বোধন (চৈত্র)—

স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একই ব্যক্তির সম্বন্ধে ক্রমাগত আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিবার ঝোঁক থাকিলে অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতসারে কল্পনা সত্যের আসন গ্রহণ করে, সে জন্য সংগ্রহকারের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 'আচার্য্য শঙ্কর ও চৈতন্য দেবের মত তুলনা' করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ব্রহ্ম ও শঙ্কর মতের ব্রহ্ম এক পদার্থ নহে। শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত 'মহর্ষি ফ্র্যানসিস'-এর জীবন-কাহিনী সংকলন করিতেছেন। আর কোনো প্রবন্ধ বা কবিতা উল্লেখযোগ্য নহে।

কায়স্থ পত্রিকা (চৈত্র)—

'কায়স্থপরিচয়' ও 'কায়স্থ কন্যার বিবাহ' জাতিগতভাবে উল্লেখযোগ্য। চিত্রগুপ্ত হইতে কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ক কাব্য 'চিত্রগুপ্ত ও ইরাবতী' কৌতুককর। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মার্ত্তরঘুনন্দনের মানসপুত্র 'পা-মুণ্ড' চিত্র দেখিয়া এক ছড়া লিখিয়াছেন, তাহাতে বিশেষত্ব কিছুমাত্র নাই।

কৃষক (ফাল্গুন)—

শস্যের অনিষ্টকারী কীট, নারিকেল চাষ, কুপৌ (orchids) ফুল, ও বিবিধ ফল সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। সবগুলিই কৃষিতত্ত্ব হিসাবে সুখপাঠ্য।

সুপ্রভাত (চৈত্র)—

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাজের নূতন আদর্শ' পুরাতনের সহিত তুলনায় এই স্থির করিয়াছেন যে ব্যষ্টি সমষ্টিকে আর গ্রাহ্য করিতে চাহিতেছে না, সমাজের বা একেশ্বর রাজার শাসন আর জনসাধারণ মান্য করিতে চাহিতেছে না, তাহার কারণ সকলের ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হইয়াছে, এবং বিশ্বমানব যে এক ও সম-অধিকারী এই জ্ঞান জন্মিয়াছে। কিন্তু বিশ্বমানবের মহাভাব তখনই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইবে যখন বিশ্বমানব বিশ্বাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইবে, যিনি এক তাঁহাকে জানিলেই সব একাকার হইয়া যাইবে।—প্রবন্ধটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক 'খাদ্য বিচার ও খাদ্য পাক' সম্বন্ধে কয়েকটি স্থূল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন কাহার কিরূপ খাদ্য উপকারী, কিরূপে অল্প খরচে অধিক পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা যায় এবং কি উপায়ে পাক করিলে খাদ্য অধিকতর স্বাস্থ্যের উপযোগী হইবে।—এই প্রবন্ধটিতে বহু কাজের কথা আছে। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী 'বিদ্যাসাগর কথা' আলোচনা প্রসঙ্গে স্বর্গগত মহাপুরুষের কয়েকটি আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার সরকার 'গৌড়-ভ্রমণ' উপলক্ষ্যে গৌড়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের আংশিক ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ফো-কো-কি' অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লেখক প্রাচীন গ্রন্থ সকলের অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন; কিন্তু এক সঙ্গে অনেকগুলিতে হাত দেওয়াতে আমাদের আশঙ্কা হয় কোনোটিকেই সুন্দর করিতে পারিতেছেন না। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'কর্ত্তব্য ও প্রেম' গল্প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহাতে গল্পত্ব কিছু মাত্র নাই; কোনো ঘটনা-বর্ণনাই ছোটগল্প নহে। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র 'ধর্ম্মসমাজে মহিলার কাজ' নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত মহিলাপ্রভাব সমাজ ও ব্যক্তির উপর অল্প নয়; এই মহাশক্তি সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়োজিত হইলে মহাকল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম; এই সঙ্কল্প লইয়া ভারত-মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সমিতি প্রথমত শিক্ষাবিস্তারের ব্রত গ্রহণ করিয়া অসহায়া নারীদিগকে কি উপায়ে সাহায্য করিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মহৎ ও উহা সুলিখিত। 'শঙ্খ' শ্রীযুক্ত রসময়রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী স্পেনদেশের ধর্ম্মশালা 'ইউলালিয়া' কেমন করিয়া খৃষ্টানবিদ্বেষীদের উপেক্ষা করিয়া নির্য্যাতিত খৃষ্টানদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে হত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলন করিয়াছেন; লেখকের নিজের উচ্ছ্বাস বাদ দিয়া লিখিলে ভালো হইত। 'সন্ধ্যা' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের চলনসই গল্প। 'ভ্রমণ' প্রসঙ্গে এবার কানপুরের বর্ণনা আছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহারাষ্ট্র সেনাপতি সদাশিব রাও ভাউ কর্ত্তৃক দিল্লীর অধিকার বৃত্তান্ত অবলম্বনে 'মহারাষ্ট্র গৌরবের একটী চিত্র' লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু 'অমিয়-কুমার' পদ্য লিখিয়াছেন। কাহারও হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মাত্রই প্রকাশ্য নহে ইহা লেখক ও সম্পাদক উভয়েরই স্মরণ রাখা উচিত।

"কারেস্পির কাঁচি"।

বেদব্যাখ্যা-পদ্ধতি

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশে বেদের চর্চ্চা ছিল না। হয় ত এটা বঙ্গদেশের কলঙ্কের কথা; কলঙ্ক হউক, অগৌরব হউক, কথাটা সত্য। বেদ বা বৈদিক ব্যাকরণের কথা দূরে থাকুক্ পাণিনি পড়িতে হইলেও বাঙ্গালার পণ্ডিতকে কাশীতে যাইতে হইত। ইউরোপীয়েরা যখন বেদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন, তখন বঙ্গদেশের কুত্রাপি একখানি বেদ বা বৈদিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই। বড় বড় অধ্যাপক পণ্ডিতেরা স্মৃতি এবং পুরাণের শ্লোকগুলিকে বেদমন্ত্র নামে অভিহিত করিতেন। বৈদ্যুতিক টিকির ব্যাখ্যাকার শশধর চূড়ামণি অর্ব্বাচীন যুগের সংস্কৃত শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। তিনি পর্য্যন্ত বিবাহের বয়সের কথা লইয়া ১৮৯০ সালের উত্তেজিত আন্দোলনের সময় বেদমন্ত্রের নামে এমন কয়েকটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন, যাহা কোন বৈদিক সাহিত্যে নাই এবং থাকিতে পারে না। তাঁহার নিজের উদ্ধৃত শ্লোকের ভাষা দেখিয়াও তাঁহার বুঝিবার শক্তি ছিল না যে সে

ভাষা বৈদিক নহে, অথচ তিনি খাঁটী ঋগ্বেদের নামে আওড়াইয়াছিলেন :—

স্বর্গদ্বীপ নমস্তেঽস্তু নমস্তে বিশ্বতাপন

নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বম্ দিবাকর।

বঙ্গের হাস্যরসের কবি 'কল্কি অবতারের' শেষ অঙ্কে লিখিয়াছেন যে কল্কিদেব বাঙ্গালার পণ্ডিতদিগকে বেদ আবৃত্তি করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক মাথা চুলকাইয়া আবৃত্তি করিলেনঃ—

খনা বলে চাচী,

বাড়ী থেকে বেরিও না, যদি পড়ে হাঁচি।

বাঙ্গালার টোলের পণ্ডিতেরা বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যের সহিত অপরিচিত ছিলেন, অথচ পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির সাহায্যে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত যখন ঋগ্বেদের ভাষান্তর করিতে লাগিলেন, তখন অনেক টোলের প্রভুরা ধর্ম্মলোপের শঙ্কায় চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দত্তজ মহাশয়ের অনুবাদে অনেক ভ্রান্তি ও ত্রুটি আছে, কিন্তু তিনি দেশের লোকের একটা প্রাচীন কুসংস্কার দূর করিয়া গিয়াছেন। না জানি বেদ কি এবং উহাতে না জানি কত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাই বা আছে, অনেক লোকের এই প্রকার ধারণা ছিল। বেদের অনুবাদ প্রকাশের পর অন্ততঃ সে ধারণাটুকু দূর হইয়াছিল।

বেদের মন্ত্রে যাহাই থাকুক, উহার ঐতিহাসিক মূল্য অতি অধিক। অতি সূক্ষ্মভাবে উহার ভাষা ও ভাব বিশ্লেষণ করিয়া লইতে পারিলে অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে সুস্পষ্ট করা যায়। পাণিনির ব্যাকরণে যতটুকু বৈদিক ব্যাকরণ আছে, তাহা একালের বেদ শিক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইউরোপে ছান্দস ভাষার বিশ্লেষণে অনেক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে; তথাপি বৈদিক সাহিত্যের অনেক স্থান এখনও সুবোধ্য হইতে পারে নাই।

অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত সাহিত্য এবং নিরুক্তাদির সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ এবং নিরুক্ত রচনার যোগে ছান্দস ভাষা অধিকতর সুবোধ্য ছিল বিশ্বাস করিতে পারি। সে যুগেও যখন ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হইয়াছিল, তখন এযুগে বেদব্যাখ্যা আদৌ সুসাধ্য নহে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সায়নাচার্য্য বেদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। সায়ন আধুনিক যুগের লোক বলিয়া অনেক পণ্ডিত তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে চাহেন, কিন্তু সায়ন যখন অধিক পরিমাণে প্রাচীন, নিরুক্ত, ব্রাহ্মণ, অনুক্রমণি, বৃহদ্দেবতা প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া টীকা লিখিয়াছিলেন, তখন সায়নকে উপেক্ষা করা সুবিধার কথা নয়। ব্রাহ্মণ এবং নিরুক্ত প্রভৃতির যুগে খাঁটী বৈদিক ধর্ম্মই উচ্চশ্রেণীর আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ছিল। সায়নের টীকা এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণাদির ব্যাখ্যা অনুসরণ করিলে অন্ততঃ পক্ষে ব্রাহ্মণ এবং নিরুক্তের যুগের বৈদিক ধর্ম্ম কি ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেটুকু কম লাভ নয়। হইতে পারে যে একালের আর্য্যসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ, এবং থিয়সফি সম্প্রদায়ের মহাত্মারা বেদসৃষ্টি যুগের বৈদিক অর্থ বেশি পরিমাণে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। হইতে পারে যে এ কালের এ জ্ঞানীদিগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আদৌ যথার্থ ব্যাখ্যা নয়; কাজেই সন্দেহের কথার বিচার দূরে রাখিয়া প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য অবলম্বনে বৈদিক দেবতা এবং বৈদিক ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, প্রথমতঃ তাহাই গ্রহণ করিলে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারা যায়।

ছান্দস ভাষার প্রকৃতি দেখিয়া সকল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ছান্দস বা বৈদিক ভাষা কথাবার্ত্তা কহিবার প্রাকৃত ভাষা ছিল। তাহা হইলে ঐ ভাষায় সন্ধিবন্ধনের বিশেষ কড়া নিয়ম ছিল না এবং পদে পদে অধিক দুরন্বয় হইত না, ইহা সহজেই মনে হয়। যাস্কের নিরুক্তে যে সকল নিয়ম নির্দ্দেশ আছে, পদপাঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের যে পদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে এবং আজিও দক্ষিণ প্রদেশে বেদ পাঠের যে রীতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাতে ঐ অনুমান বিশেষরূপে সমর্থিত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের এবং প্রথম অনুবাকের প্রথম ঋক্‌টী উদ্ধৃত করিতেছি। এই ঋক্‌টীর ছন্দ গায়ত্রী অর্থাৎ উহাতে আট অক্ষর বিশিষ্ট তিনটি চরণ আছে, পদপাঠের নিয়ম অনুসারে পদ এবং চরণ বিভাগ করিয়া ঋক্‌টী উদ্ধৃত করিতেছি :—

অগ্নিম্ ঈলে পুরোহিতম্
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্
হোতারম্ রত্নধাতমম্।

দুরন্বয় না করিয়া যদি প্রতিচরণ স্বতন্ত্র রাখা যায়, তাহা হইলে এই প্রকারে সহজ অর্থ হয়, যথা—অগ্নিকে আহ্বান স্বরূপ স্তুতি করি; তিনি পুরোহিত (অর্থাৎ যিনি পুরোহিত তাঁহাকে)। তিনি যজ্ঞের দেব; তিনি ঋত্বিক্; তিনি হোতা এবং তিনি রত্নের আধারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (আধার)। এই সহজ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ "পুরোহিতং যজ্ঞস্য", "দেবং", ইত্যাদি রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ পকার দুরন্বয় যে উপযুক্ত নহে, তাহা একটু বিচার করিয়া বুঝাইতেছি।

প্রথম ঋক্‌টী হইল প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্। এই প্রারম্ভের সূক্তটীকে পুরঃ+অনুবাক্ বলিতে হইবে। পুরোঽনুবাকের অর্থ হইল মুখবন্ধ। তাহার পর কথা এই যে সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিকে আহ্বান করিয়া অগ্নি দ্বারা অন্য দেবগণকে আহ্বান করাইতে হয়। যজুর্ব্বেদ, ব্রাহ্মণ এবং বৃহদ্দেবতাদি গ্রন্থে এ কথা সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে। এইটুকু স্মরণ রাখিয়া অর্থবিচার করিতেছি। ঈড্ ধাতু স্তুতি অর্থে বটে; কিন্তু কি প্রকারের স্তুতি? ঋগেদের তৃতীয় মণ্ডলে ৪৮ সূক্তে তৃতীয় ঋকে ঈড্ ধাতুর অনুরোধজ্ঞাপক স্তুতি অর্থ অতি সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদের মধ্যে এমন স্পষ্ট অর্থ পাইয়া ধাতুর অন্য অর্থ করিব কেন? সকল দেবতার পূজার আয়োজনের পূর্ব্বে অগ্নিকে আহ্বান করিয়া স্থাপন করা হইতেছে; এবং অগ্নিই যে সকল দেবতাকে আহ্বান করিয়া আসিবেন, তাহা ইহার পরবর্ত্তী ঋক্ ও সূক্তগুলিতেও পাই। এরূপ স্থলে অনুরোধজ্ঞাপক স্তুতি ধ্বনিত হয়।

পুরোহিত—কোন এক রাজা যখন যজ্ঞ করিবেন, তখন রাজা এবং যজ্ঞের মধ্যে যজ্ঞকারী ঋত্বিকের ব্যবধান থাকিত। সে সময়ে রাজার কাছে প্রথমে পুরঃস্থাপিত হইলেন ঋত্বিক্ এবং তিনিই হইলেন রাজার পুরোহিত। কিন্তু এখানে পুরোহিত অর্থ Priest নহে; কেবল পুরঃস্থাপিত অর্থই ধরিতে হইবে। আরও দেখুন যে পরে ঋত্বিক্ কথা আছে, একটা ঋকে অযথা পুনরুক্তি দোষ স্বীকার করিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। রাজার বেলাই ঋত্বিক্ পুরোহিত হয়েন; এ কথা সায়নের ব্যাখ্যাতেও আছে। এখানে যখন প্রতিনিধির যজ্ঞ সূচিত নয় এবং রাজা বক্তা নহেন বক্তা যজ্ঞকারী মধুচ্ছন্দা, তখন সায়নাচার্য্যের এই বিকল্প অর্থই লইতে হইবে যে—"যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগে আহ্বনীয় রূপেণ অবস্থিতম্।" এ অর্থ করিলে আর "যজ্ঞস্য পুরোহিতম্" বলা চলে না। "যজ্ঞস্য দেবং" বলা চলে, কেন না অগ্নি যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্য দেবতাদিগকে আনয়ন করেন।

ঋত্বিক অগ্নিকে আহ্বান করেন, কিন্তু এখানে অগ্নি সকল দেবকে আহ্বান করিবেন বলিয়া হইলেন ঋত্বিক্। ঋত্বিকের মধ্যে আবার হোতা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। ইনি আহ্বানও করেন এবং ঘৃতাদি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিবিধানও করেন; কাজেই শব্দগুলির বিশেষ উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া গেল।

সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত রত্নধাতম অর্থে প্রভূতরত্নধারী লিখিয়াছেন। ব্যাকরণের প্রত্যয়ে এরূপ দর যোজনা ছিল না। দৃষ্টান্ত স্থলে পরে বৈদিক প্রত্যয়গুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব। রত্ন-ধা অর্থ হইল রত্নের আধার। তম প্রত্যয়ের দ্বারা এই অর্থ হইল যে অগ্নি রত্ন-ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এখন সমগ্র ঋকের এইরূপ অর্থ হইল, যথা অগ্নিকে অনুরোধসূচক স্তুতি দ্বারা আহ্বান করি; তিনি আহ্বনীয় রূপে পূর্ব্বে অর্থাৎ সম্মুখভাগে অবস্থিত; তিনি যজ্ঞের দেবতা; তিনি (সাধারণ ভাবে) ঋত্বিক্ হইয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন এবং (বিশেষ ভাবে) হোতা হইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেবগণকে তৃপ্ত করেন; তিনি রত্নের আধারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আধার অর্থাৎ তাঁহাকে পূজা করিলে অনেক রত্ন লাভ হয়। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দুই বন্ধু

অন্ধ ও দরিদ্র দুটি বন্ধু ধরা 'পরে,
নিয়াছে বিধির শাপ দুই ভাগ করে'।
জন্মান্ধ দেখেনা মুখ বিশ্ব মানবের।
মানবে দেখেনা মুখ নিঃস্ব দরিদ্রের।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা

[কোনো বিষয়ের আলোচনা যে মাসে মূল বিষয় প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, ঠিক তাহার পরবর্ত্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত না হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। আলোচনার পর মূল বিষয়ের লেখকের উত্তর পত্রস্থ হইলে, আর সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা চলিতে পারিবে না। লেখকগণ আলোচনা যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবেন; দীর্ঘ আলোচনা ছাপা আমাদের পক্ষে দুষ্কর। —প্রবাসী সম্পাদক।]

হিন্দুর জ্যোতিষ ও পুরাণ

পৌরাণিক আখ্যায়িকার ব্যাখ্যায় আমিও জ্যোতিষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার জানা ছিল, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের নানা প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। আমি যাহাকে আষাঢ়ে গল্প মনে করি একজন যে তাহার জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। ধাতুগত অর্থের জোরে অনেক ব্যাখ্যা হইতে পারে সুতরাং বিনোদ বাবু যে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধিরূপ আষাঢ়ে গল্পের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য্য হই নাই। উহা লইয়া বিবাদ করিবারও কোন প্রয়োজন দেখি না। কেন না, তাহাতে আমার মূল মতের কোন হানি করিবে না। ইহা কেহই বলিতে পারেন না, যে, পৌরাণিক গল্পের মধ্যে আষাঢ়ে গল্প নাই, সুতরাং রোহিণীতে গতি অর্থ ঘটাইলে আমার মূল প্রবন্ধের কোন দুর্গতি ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে বৃশ্চিক রাশিতে যে গোঁজামিল নাই তাহা আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। মস্তক হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত সবটা লইয়াই তো নামের সার্থকতা সুতরাং লেজটা কাটিয়া ফেলিয়া নামটা রাখিলে যাহারা লাঙ্গুল সুদ্ধ সবটা রাখিয়াই নামকরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ঋণ গ্রহণের একটা সুস্পষ্ট প্রমাণই পাইতেছি। আর্য্যগণের মুণ্ডপ্রিয়তা তাহাদিগকে সে দায় হইতে রক্ষা করিবে না। যাহা হউক "বেওয়ারিশ মাল" হিন্দু জ্যোতিষের যে এতকাল পরে একজন সুদক্ষ অভিভাবক মিলিয়া গেল ইহাতে হিন্দুজগৎ যে আনন্দে নৃত্য করিবে তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু ওয়ারিশ মহাশয় আপনার ওয়ার্ডের (Ward) স্বত্ব রক্ষার জন্য এত অধিক ভ্রান্ত মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, যে, তাহাতে যে তাঁহার অন্য সকলের স্বত্বের উপর অনধিকার প্রবেশ ঘটিয়াছে তাহা তাঁহার বোধগম্যই হয় নাই। ঋগ্বেদের একটা কথার—যে কথার শত ব্যাখ্যা থাকিতে পারে সেই কথার জোরে গ্রীকদিগকে রসাতলে পাঠাইয়া দেওয়া চলে কি? বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত মনিষীগণ মানবের চিন্তাজগতের উপর আধিপত্য করিতেছেন, তাঁহারা যে জাতিকে বর্ত্তমান সভ্য জাতিদিগের তুলনায় ও বিদ্যা বুদ্ধিতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন * তাহাকে হঠাৎ নরভুক্ মানুষ ও পশুর কক্ষাভুক্ত করিয়া দেওয়া অতি-সাহসিকতার কার্য্য, সন্দেহ নাই। তবুও যদি হিন্দু ও গ্রীকের পৌর্ব্বাপর্য্যে হিন্দুর প্রাচীনত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত হইত তবে না হয় এ সাহসিকতার একটা অর্থ বুঝিতাম। কিন্তু গ্রীকের অর্ব্বাচীনতা সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে মিসর, বেবিলোন, ক্যাল্‌ডিয়া, চীন প্রভৃতি নিঃসন্দেহ রূপে হিন্দুর পূর্ব্ববর্ত্তী। গ্রীক্ সম্বন্ধে বিরাট্ মতদ্বৈধ। যেখানে বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে বিবাদ সেখানে আমাদের মত পণ্ডিতন্মন্যমানদিগের হঠাৎ একটা মত দিয়া ফেলা নিতান্তই সুরুচিবিরুদ্ধ। আমি তো নক্ষত্রচক্র-বিষয়ে হিন্দুর মৌলিকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু ম্যাগ্‌ডোনেল্ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহারা গ্রীক অপেক্ষা হিন্দুসভ্যতার প্রাচীনতায় বিশ্বাস করেন এবং দর্শনাদি সম্বন্ধে গ্রীকের উপর হিন্দুর প্রভাব স্বীকার করেন, তাঁহারাও জ্যোতিষ বিষয়ে হিন্দুর মৌলিকতা অস্বীকার করিয়াছেন। ম্যাগডোনেল হিন্দুর জ্যোতিষের বিকাশে গ্রীকপ্রভাবই যে কেবল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার মতে ঐ ২৮ নক্ষত্রযুক্ত চক্রও হিন্দুগণ ক্যাল্‌ডিয়া হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং রাশিচক্র তো একেবারেই গ্রীকের অনুবাদ। * আমি এ বিষয়ে ডাক্তার থিবোর অনুসরণ

* The Greek language contains all the philosophy, and nearly all the wisdom of antiquity.—*Buckle's History of Civilisation.*

Greece, the centre of all the riches of the human intellect.—*Guizot's History of Civilization.*

Within the narrow limits and scanty population of the Greek States should have arisen men who, in almost every conceivable form of genius, in Philosophy, in epic, dramatic and lyric poetry, in written and spoken eloquence, in statesmanship, in sculpture, in painting, and probably also in music, should have attained almost or altogether the highest limits of human perfection.—*Lecky's History of European Morals.*

Judged by the standard of intellectual development alone, we of the modern European races have, in fact, no claim to consider ourselves as in advance of the ancient Greeks, all the extraordinary progress and promise of the modern world notwithstanding.—*Benjamin Kidd's Social Evolution.*

The ablest race of whom history bears record is unquestionably the ancient Greeks.

The average ability of the Athenian race is, on the lowest possible estimate, very nearly two grades higher than our own; that is, about as much as our race is above that of the African Negro.—*Galton's Hereditary Genius.*

এখন কেহ হয়তো বলিবেন, যে ইঁহারা হিন্দুসভ্যতা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, সুতরাং ইঁহাদের কথা গ্রাহ্য নহে। কথাটা মানিয়া লইয়াই যাঁহার হিন্দু ও গ্রীক্—উভয় সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই এবং যিনি Universal Races Congressএর প্রথম অধিবেশনের প্রথম বক্তা হইয়া চলিয়াছেন তাঁহারই অভিমত উপস্থিত করিতেছি। তিনি হিন্দুর অতিচারী দাবীকে সংযত হইতে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

Good sense would seem to give co-ordinate and complimentary places to Greece and India in respect of degree or measure of civilization, while in the matter of historic value and significance Greece indubitably comes first, though India would seem to be a good second.—*Dr. Brojendronath Seal.*

* Of Astronomy the ancient Indians had but slight independent knowledge. It is probable that they derived their early acquaintance with the twenty-eight divisions of the moon's orbit from the Chaldeans through their commercial relations with the Phoenicians, Indian astronomy did not really begin to flourish till it was affected by that of Greece.

Thus in Varaha Mihira's Hora Castra the Signs of the Zodiac are enumerated either by Sanskrit names translated from the Greek or by the original Greek names, as Ara for Ares, Heli for Helios, Jyau for Zeus.—*Sanskrit Literature.*

করিয়াছি। কিন্তু নক্ষত্রচক্র সম্বন্ধেও যে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্ক আছে তাহাও এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি যে লিখিয়াছিলাম হিন্দুগণ আপনাদের নক্ষত্রচক্র আবিষ্কার করিয়াছেন, এই "আপনাদের" কথাটার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। জগতে তিন জাতির মধ্যে নক্ষত্রচক্র দেখা যায়, ইঁহারা চীন, ভারত, ও আরব। কিন্তু নক্ষত্রচক্র কে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা মীমাংসা করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণ বিবাদ করিতেছেন। সকল পণ্ডিতের সকল মতামত এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব হইবে না। মোটামুটী কথাটা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। বিয়ট (Biot) বলেন নক্ষত্রচক্রের উৎপত্তি চীনে। পরে হিন্দু ও আরবগণ তাহা আপনাদের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার ও বার্জেস (Maxmuller ও Burgess) সিদ্ধান্ত করিতে চান যে ইহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। কিন্তু ছোট সেডিলট (Sedillot) বলিয়াছেন যে আরবগণ ইহার আবিষ্কর্ত্তা। ওয়েবার (Weber) কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার মতে মধ্য এসিয়ার কোনস্থানে, হয়তো বেবিলোনে, ইহার উৎপত্তি। সেখান হইতে সুবিধামত ইঁহারা সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বেবিলোনের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোথায়ও নক্ষত্রচক্রের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য এই সকল মতামত বিশেষ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া ডাক্তার থিবো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইঁহারা তিনজনে হয়তো পরস্পর নিরপেক্ষভাবে নক্ষত্রচক্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এইজন্যই আমি "আপনার" কথাটা লাগাইয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে ওয়েবারের মত সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয় নাই। এখনও প্রমাণ মেলে নাই এই মাত্র বলা যায়। তবে হারান (Harran) প্রভৃতি যে সমস্ত স্থলে চন্দ্রের পূজা প্রচলিত ছিল সেই সব স্থান তত্ত্বানুসন্ধানকারিগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত ডাক্তার থিবোর মতই গ্রাহ্য বলিয়া মনে করি।

কিন্তু ইহাতে আমার সঙ্গে বিনোদ বাবুর বিবাদের অবসান হইতেছে না। আমি কোথায় বলিয়াছি যে হিন্দুগণ গ্রীকদিগের নিকট হইতে রাশিচক্র গ্রহণ করিয়াছেন? আমি যাহা বলি নাই তাহারি চাপে আমাকে নিষ্পেষিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ প্রণালীটা যে প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার একটা প্রবল অস্ত্র তাহা প্রবন্ধ লেখা রূপ ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান ব্যবসায়ে বহু বার টের পাইয়াছি। বিনোদ বাবু আমার প্রবন্ধটা পাঠ করিয়াছেন কি? হিন্দু জ্যোতিষ যে গ্রীক জ্যোতিষের প্রতিবিম্ব না, আমি তাহারি সমর্থন করিয়াছি। তাহাতে কি গ্রীকের নিকট হইতে হিন্দুর ঋণ গ্রহণটা প্রতিপাদিত হইল? আমার প্রবন্ধ অতি উপরি উপরি ভাবে পাঠ করিলেও স্কুলের বালকেও বুঝিতে পারিবে বেবিলোন্ হইতে ঋণ গ্রহণই আমার অভিপ্রেত। সুতরাং গ্রীককে রসাতলে পাঠাইলে আমার কথার উত্তর হয় না। বেদের চাপে গ্রীকের প্লীহা ফাটিতে পারে, বেবিলোনের নাগাল পাওয়া যাইবে না। যে সময়ে পঞ্চনদকূলে কোল ও দ্রাবিড়গণ রাজত্ব করিতেছিলেন,* যে সময়ে বেদের বরুণদেব ভ্রূণ মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ এবং যে সময়ে ঋগ্বেদের ঋষিদিগের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বাসস্থান খুঁজিয়া হয়রান হইতেছিলেন (তিলক মহাশয়ের Arctic Home in the Vedas দ্রষ্টব্য), সেই সময়ে ক্যালডিয়গণ পারস্যোপসাগরের উপকূলে ইফ্রিতিসের মোহানায় সুরম্য এরিদু নগরীতে মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ ইয়া দেবতার পূজায় রত ছিলেন, সে আজ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সাড়ে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আমি এই ইয়া দেবতারই দোহাই দিয়াছি। বেদের ধমক আমার নিকট পৌঁছাইবে না। বেদের পৃথিবী সচলা হউন আর অচলাই হউন বিনোদ বাবুর অতদূর অগ্রসর হইবার অধিকার নাই। ঋগ্বেদ আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ হইলেও মানবজাতির আদি গ্রন্থ নহে। আমাদের হাতে যে মালমসলা আছে তাহাতে আর্য্যজাতির ভারতপ্রবেশ ঠেলিয়াও খ্রীষ্টপূর্ব্ব পনেরো শত বৎসরের ওপারে লওয়া চলিবে না। লইলে তাহা ইতিহাস হইবে না। এই পনের শত বৎসরের মধ্যেও অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর জোর করিয়া যোগ করা হইয়াছে। লিখিত গ্রন্থের কথা যদি ধরি তবে তো পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন পুঁথি মেলা ভার। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন মিসরের পেপিরাস ও ক্যালডিয়ার কিউনিফরম্ সিলিন্ডার* পুস্তক শত শত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত পুঁথির বয়স কত? য়্যাকেডিয়-রাজ প্রথম সারগোনের সময়কার যে সমস্ত প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাদের বয়স তিন হাজার আট শ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। ইউরোপের যাদুঘরসমূহে প্রায় দশহাজার ইষ্টক ফলক সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত ইষ্টক ফলকের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া ইহাদিগের অর্থ যখন যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইবে তখন জগতের লোকের আর সন্দেহ থাকিবে না যে ফলিত জ্যোতিষ য়্যাকেডিয়

নির্ণয় করিবে? ইউরোপীয় আর্য্যসভ্যতা হইতে ভারতীয় আর্য্যসভ্যতা যে এত ভিন্ন ইহাই তাহার একটা প্রধান কারণ। জগতের ইতিহাসের মানচিত্রটা আর্য্য আপনার হাতে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইউরোপে গ্রীক্-আর্য্য—ভারতে হিন্দু-আর্য্য। কিন্তু মানচিত্রটা আর বেশী দিন শ্বেত থাকিতেছে না। বিশ্বমানবের গাত্রে আর্য্যেতর কিন্তু আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতা সকলের দানের দাগ দিন দিন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। এখন কি কেহ মিসর, বেবিলোন, য়্যাসিরিয়ার ঋণ অস্বীকার করিতে পারে? এই ভারতেই একটা আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতা ছিল, ভারতীয় সভ্যতা তাহার কাছে ঋণী। আর্য্যগণের ভারত প্রবেশের বহুপূর্ব্ব হইতে দ্রাবিড়গণ বাণিজ্যসূত্রে বিদেশের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করিতেন। এই সূত্রে সংগৃহীত বহু রত্ন আর্য্যগণ আত্মসাৎ করিয়া নব সভ্যতার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, এ কথা গ্রাহ্য না করিলে ভারতের ইতিহাস হইবে না। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের মধ্যেও যে এত বিভিন্নতা, তাহার কারণ এই যে আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য-প্রভাব বেশী, দাক্ষিণাত্যে ঐ প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব বেশী। ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। ইহার অতি সামান্য খবর আজ পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ইহা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশের জন্য তত্ত্বান্বেষীদিগের চেষ্টার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে।

* যাঁহারা মনে করেন আর্য্যগণ অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদের মত কোল ভীলদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। আর্য্যগণ যেরূপ সভ্যতা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা কদাচিৎ কম মূল্যবান আর একটী সভ্যতার সঙ্গে এখানে তাঁহাদের সংঘর্ষ হইয়াছিল। সেই সভ্যতাটাকে বিনাশ করিয়া নহে কিন্তু তাহার সংমিশ্রণে হিন্দু-আর্য্য (Hindu-Aryan) সভ্যতার উৎপত্তি। সে সভ্যতার কত রত্ন ইহার গাত্রে রহিয়াছে, তাহা কে

* কিউনিফরম্ অক্ষর একটী শরের অগ্রভাগ; বসাইয়া, শোয়াইয়া, দুই মুখ একত্র করিয়া, এইরূপ নানা অবস্থানে শব্দের সৃষ্টি হয়। কাদা দিয়া টালি প্রস্তুত কর, তাহার উপর বক্তব্য লিপি বদ্ধ কর, দুই মুখ ঘুরাইয়া একত্র করিয়া দাও, cylinder পুস্তক হইল। তারপর আগুনে পুড়াইয়া রাখিয়া দাও, লাইব্রেরী অগ্নিভয় জলভয় হইতে মুক্ত হইল। পাঁচ হাজার বৎসর মাটির নীচে প্রোথিত থাকিলেও একটী অক্ষর নষ্ট হইবে না।

জ্যোতিষীদিগের নিকট হইতে জগতের লোক গ্রহণ করিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকিয়া নিনেভার লাইব্রেরী আজ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইরেকে (Erech) পুরোহিতদিগের যে লাইব্রেরী পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বিতীয় সারগোল নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পরিবর্দ্ধিত। তাহার বয়স ২০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। এই লাইব্রেরীতে যে পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে প্রাচীন য়্যাকেডিয় ভাষার অনেক পুস্তকের নব্য য়্যাসিরিয়্যান্ ভাষার সঙ্গে সমান্তরাল স্তম্ভে অনুবাদ রহিয়াছে এবং সেই প্রাচীন ভাষা বুঝিবার সহায়তার জন্য তাহার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রাচীন য়্যাকেডিয় ভাষার সঙ্গে নব্য য়্যাসিরিয় ভাষার সম্বন্ধ কি? যেমন বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার সম্বন্ধ। অর্থাৎ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে কোনও য়্যাসিরিয় রমেশচন্দ্র য়্যাকেডিয় ঋগ্বেদ অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন। এখন পাঠক মহাশয় য়্যাকেডিয় পুস্তকের প্রাচীনতা নির্ণয় করিয়া লউন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আর্য্যগণ আপনাদের ভ্রমণপথে দুই একটা রত্ন ফেলিয়া আসিয়াছেন। দুই একটী রত্ন আবার কুড়াইয়া আনাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। য়্যাকেডিয় বেদ যে আমাদের ঋগ্বেদের মসলা সরবরাহ করিতে সমর্থ, সে বিষয়ে পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ঋগ্বেদের ঘাড়ে বিংশ শতাব্দীর জীবন তত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব চাপাইয়া দিলে তাহার সে ভার বহনের সক্ষমতা আছে কিনা তাহা আগে বিচার করিতে হইবে। যে ভাষায় এক শ্লোকের আড়াই শত বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহার মাতামহীর মুখ দিয়া যা' তা' বলাইয়া লওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্গত কিনা তাহাই বিবেচ্য। বুদ্ধি থাকিলে ভাষাকে দিয়া ইচ্ছানুসারে সবই বলান যাইতে পারে। কালিদাসকে জব্দ করিবার জন্য তাহার মূর্খ পিতাকে সভায় আনিয়া প্রশ্ন করা হইল। প্রশ্ন শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় পিতা বলিলেন, "পুরারে বাবারে" বাবা, তুমি সমস্যা পূরণ করিয়া দাও। কালিদাস অর্থ করিলেন এক প্রকাণ্ড সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা, যাহার আরম্ভ "পুরা রেবা বারে।" কিন্তু অর্থটা শুনিয়া বাবার চক্ষু স্থির না হয়। আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রের গতি অনুসন্ধান করা কঠিন কার্য্য নহে। সুতরাং একাধিক জাতি কর্ত্তৃক নিরপেক্ষভাবে নক্ষত্রচক্রের আবিষ্কার অসম্ভব না হইলেও রাশিচক্র সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। নক্ষত্ররাজির মধ্যে সূর্য্যের গমনাগমন নিরূপণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার, তাহার পশ্চাতের শিক্ষার একটা ইতিহাস চাই। সেজন্য সভ্যতামার্গে কিঞ্চিৎ অধিক অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। আমরা ঋগ্বেদে যে শিক্ষা ও সভ্যতার উন্মেষ দেখিতে পাই তাহার সঙ্গে রাশিচক্রের উদ্ভাবন সমঞ্জস হইবে না। সমগ্রের সঙ্গে অংশের সঙ্গতি দেখাইতে না পারিলে, জীবনবৃক্ষের অন্যান্য শাখার উন্নতির সঙ্গে মিল দেখাইতে না পারিলে তত্ত্বটী গ্রহণীয় হইবে না। চিত্রকর দুই বৎসরের শিশুর হস্ত পদাদি অবয়বের সঙ্গে বয়স্কের মস্তক যদি জুড়িয়া দেন তবে সমগ্র বস্তুটা বাস্তব না হইয়া কল্পিত হইয়া উঠে। একটা শ্লোকের ইচ্ছানুরূপ ব্যাখ্যা সহজ কিন্তু সেই ব্যাখ্যাত তত্ত্ব যদি তাহার আবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত না হয় তবে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। অন্যদিকে আবার বৈদিকযুগ হইতে ব্রাহ্মণ ও সূত্রযুগের মধ্য দিয়া সিদ্ধান্তযুগ পর্য্যন্ত রাশিচক্রের একটা অভিব্যক্তি দেখাইতে হইবে। ঋগ্বেদে ঘুমাইয়া সিদ্ধান্তযুগে চক্ষু মেলিলে হিসাব মিলিবে না। সুতরাং ঋগ্বেদের ঘাড়ে যা তা চাপাইলে চলিবে না। তবে যদি কেহ বলেন, ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদের অজানা কিছু ছিল না, তবে আমি পরাজয় স্বীকার করতঃ লেখনীকে বিশ্রাম দিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতেছি। এ কথাটা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে যুগে দশবৎসরের মধ্যে সাইক্লোপিডিয়ার নূতন সংস্করণ করিতে হয় সে যুগে শতবৎসরের পুরাতন তত্ত্বের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করতঃ দন্ত বাহির করিয়া গর্ব্ব প্রকাশের অবসর নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

দাঁড়কাক

মধ্যাহ্নে অনলবৃষ্টি করে রুষ্ট জ্যৈষ্ঠের ভাস্কর;
সন্তাপিতা ধরিত্রীর কষ্টশ্বাস বহে তপ্ত বায়ু;
এ কুক্ষণে, নাড়ি ডানা, যেন কোন জ্যোতিষী তৎপর,
রুক্ষ রবে, দাঁড়কাক, গণিছ কি মানবের আয়ু?
উচ্চ কর পুচ্ছখানি শীর্ষখানি কর তুমি নত,—
প্রতি ডাকে উঠ পড়, পুনঃ পুনঃ ঢেঁকিটীর মত।

শিখীর পেকমলীলা, চিত্তহারী প্রমত্ত নর্ত্তন;
মরালের কলস্বন, মনোহর মদালস গতি;
খঞ্জনের মঞ্জুবাণী, সুচপল শরীর কম্পন;
তুমি কি জানিবে, বৃদ্ধ, স্থূলবুদ্ধি উদাসীন অতি?
জাননা বিভ্রমপূর্ণ কোকিলের ভদ্রোচিত ভাষা;
স্পষ্ট কথা কহ শুধু, যেন নিরক্ষর বিজ্ঞ চাষা।

বসি কোন গৃহশিরে, নিদারুণ ব্যোমভেদী রবে,
আকেন্দ্র কম্পিত করি গৃহস্থের সন্দিগ্ধ হৃদয়,
বিস্ফারিত করি চক্ষু, সঘনে ডাকিয়া উঠ যবে,
সে তোমারে কহে কত "দুষ্টভাষী, ক্রূর, দুরাশয়!"
বুঝিতে পারে না মূর্খ, এ যে তার চিত্তগত ভ্রম;
তুমি যদি থেমে থাকো, থামিবে কি সর্ব্বভুক্ যম?

ডাকো তবে ডাকো, কাক! তব রবে মম হর্ষোদয়,
তব রবে সমাচ্ছন্ন চিত্তাকাশ ধরে ঘোর ছায়া;
সহসা হতাশ-হৃদে জেগে উঠে শব্দ শূন্যময়,
ভুলে যাই অকস্মাৎ সংসারের ক্ষণস্থির মায়া।
তব শব্দ শুনি আমি বুকে মাখি প্রীতি আর ভীতি,—
শ্মশানে সন্ন্যাসীমুখে যেন, সুগম্ভীর নৈশ গীতি।

শ্রীরঘুনাথ সুকুল।

পুস্তক-পরিচয়

সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার কৃত। লেখক বলেন বাংলা ভাষাকে জগতের সর্ব্বভাষার সমকক্ষ ও উচ্চতম চিন্তা প্রকাশের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তার টীকা দেওয়া আবশ্যক। সাহিত্য সৃষ্টি ও পুষ্টি করিবার জন্য একটি বৃত্তিকোষ সংস্থাপিত করা উচিত। এ উদ্দেশ্যে বহুল অর্থের প্রয়োজন; বিদ্যোৎসাহী ধনীদিগের সাহায্য প্রার্থনীয়। কবিবর রবীন্দ্রনাথের একপঞ্চাশৎতম জন্ম উৎসব উপলক্ষে তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য এই উদ্দেশ্যে 'রবীন্দ্রবৃত্তি' নামে একটি সাহিত্যের সাহায্যকোষ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই শুভ অনুষ্ঠানে সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনীয়। চাদার টাকা উৎসব-সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামে, ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় পেরিতব্য।

অন্ন-সংস্থান—

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কৃত। কেমন করিলে এই জীবন-সংগ্রামের দিনে আমাদের এই নিরন্ন দেশে দরিদ্রের অন্নসংস্থান হইতে পারে ইহাতে তাহারই আলোচনা ও উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দেশভ্রমণ—

শ্রীমৌলিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের মূকবধির ছাত্র, দেশভ্রমণ করিয়া ভ্রমণকাহিনী লিখিয়াছেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয়। রচনা শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল; লেখকের চিন্তা ও দর্শন শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতি-বিকাশ—

শ্রীপীতাম্বর সরকার সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ২৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। যাহাতে সাধারণের নিকট কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালন-ব্যবসায়ী হালবৈ, হলধর প্রভৃতি জাতি বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হয় সেই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের আদেশ, ঐতিহাসিক তথ্য এবং সামাজিক রীতিনীতি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে অনুসন্ধান, শৃঙ্খলা সাধন, স্বাধীন চিন্তা প্রভৃতির যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইহা পাঠ করিলে অনেক চিন্তা করিবার উপকরণ পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অধ্যায়—অন্নগ্রহণবিধি, স্ত্রীধর্ম্ম, পতিতবিধি, যজ্ঞোপবীততত্ত্ব, জাতিবিভাগ। এই পুস্তকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অনেক কুসংস্কার ও প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি অকারণ মমতা খণ্ডিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

প্রেমের স্বপন—

শ্রীরেবতীরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য চার আনা। পদ্য পুস্তক। সাহিত্য জাতিকে উদ্বোধিত করিবার জন্য রচিত উচ্ছ্বাস। লেখক স্বজাতিকে শিক্ষায় আচারে উন্নত হইয়া জাতীয় প্রেমের শিখা জ্বালিয়া বিশ্বপ্রেমের আরতি করিতে আহ্বান করিতেছেন। একজন পাগলের স্বপ্নকাহিনীর ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ আশা প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তকে কবিত্বের সম্ভাবনা দুরাশা। উদ্দেশ্য সাধু এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

কন্যাদায়—

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত। মূল্য চার আনা। হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতির সংস্কার বিষয়ে আলোচনা। পণগ্রহণপ্রথা, স্ত্রীশিক্ষা, বাল্য বিবাহ, কুলীন কন্যার অবস্থা, যৌবন বিবাহ ও স্বামী স্ত্রী নির্ব্বাচন প্রথা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি অতি ধারভাবে আলোচিত হইয়াছে। লেখক মধ্যপন্থী। সকল স্থলে আমাদের সহিত তাঁহার মত না মিলিলেও আমরা লেখকের স্বাধীনচিন্তার ও সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। এ পুস্তকে পড়িবার ও পড়িয়া ভাবিবার অনেক কথা আছে।

চিন্তা-সলিলে—

শ্রীসুধাংশচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য আট আনা। এখানি সন্দর্ভ পুস্তক। ইহাতে দশটি সন্দর্ভ আছে। ১। ঈশ্বর আলোতে না অন্ধকারে। ২। ত্যাগ। ৩। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু মানব-চরিত্রের কষ্টিপাথর। ৪। স্বার্থ। ৫। স্ত্রী ও সহধর্ম্মিণী। ৬। ধর্ম্মে ভেল ও ট্রেডমার্ক। ৭। জাতিভেদ। ৮। আগে যাহা না হ'লে নয় পরে আপনি যাহা হয়। ৯। মূঢ়ের জন্য কুসংস্কার আবশ্যক। ১০। বড় মানুষ্যেতেও কিছু-কিছু আছে। লেখকের রচনাভঙ্গিতে একটু উৎকেন্দ্রিকতা দোষ আছে, সেই জন্য সকল স্থলে তাঁহার সহিত একমত হওয়া যায় না। তৎসত্ত্বেও লেখকের স্বাধীন চিন্তা ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা ও অকপট প্রকাশ প্রশংসনীয়। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীতি হইয়াছি। দেশে স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক সুলক্ষণ ও আশার কারণ।

ভারতের শক্তিপূজা—

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ অংশিত ১২৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। মাতৃভাবে ভগবৎ আরাধনা ও সর্ব্বস্ত্রীমূর্ত্তিতে মহাশক্তির প্রকাশ স্বীকার ভারতের বিশেষ সাধনার ফল। এ পুস্তকে এ বিষয়েই প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতকে আধুনিক চিন্তাপ্রণালার ঢনকাম করিয়া দার্শনিক ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে গুরুপাক ও দুষ্পাঠ্য হইয়াছে, নতুবা ইহাতে বহু বিবদমান তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে।

কালাপাহাড়—

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু প্রণীত। ঢাকা আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ৯১ পৃষ্ঠা: এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা; রেশমী কাপড়ে সুদৃশ্য বাঁধা; সচিত্র। মূল্য বারো আনা মাত্র। কলিকাতার বাহিরে এমন দৃষ্টিরঞ্জক বাংলা বই এত সস্তায় প্রকাশ করা প্রকাশকের প্রশংসার কথা; পুস্তকে ছাপার দস্তর-বিষয়ক ত্রুটি যাহা আছে তাহা ছাপাখানার বাহিরের লোকের চোখে পড়িবে না। এখানি উপন্যাস; কালাপাহাড়ের ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনা মিশাইয়া তৈরি; কোনো চরিত্র পূর্ণভাবে না ফুটিলেও, একাধিক স্থলে অসঙ্গতি থাকিলেও, মোটের উপর বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। স্বাধীনচিন্তার অনুসরণ করিয়া সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যা গ্রন্থকার দার্শনিকতার ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, অথচ তাহা উৎকট ও দুষ্পাঠ্য হয় নাই; লেখকের উদার মত ও সত্যের সহিত পরিচয় উপভোগ্য; লেখকের মতের এক বিষয়ে আমরা প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি—ঈশ্বর বিশ্বরূপ বলিয়া সকল মূর্ত্তিই সেই অমূর্ত্তের খণ্ড প্রকাশ বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্বরূপকে বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া খণ্ডিত ক্ষুদ্র করিব কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই গ্রন্থের সমধিক সমাদর হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব, ইহাতে একাধারে নভেল পাঠের কৌতুক ও শিক্ষা লাভ হইবে।

সেফালিগুচ্ছ—

শ্রীমতী সুকুমারী দেবী প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত, সুন্দর পরিষ্কার ছাপা, সুদৃশ্য বাঁধা, মূল্য মাত্র বারো আনা।

এখানি কবিতা গ্রন্থ। কাব্যরচনায় গ্রন্থরচয়িত্রীর এই প্রথম চেষ্টার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা বা কষ্টকল্পনা নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। স্বচ্ছ সরল প্রাণের কথা সরসভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, কোথাও অস্পষ্টতা বা জটিলতা নাই। ছন্দের বৈচিত্র্যের মধ্যে কবিত্বেরও অসদ্ভাব নাই। কিন্তু অনেক কবিতা অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়া রসকে সংহত হইতে দেয় নাই। আমরা এই নূতন লেখিকাকে সাদরে বঙ্গসাহিত্যসমাজে অভ্যর্থনা করিতেছি।

জ্যোতিঃ—

শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। মূল্য দশ আনা। ইহাতে ভগবদ্‌বিষয়ক সরল ভক্তি নিষ্ঠা-নির্ভরতা-পূর্ণ অনেকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। সকলগুলিই কবির অন্তরটিকে প্রকটিত করিয়াছে। লেখিকার ইহা প্রথম প্রকাশ। কবিত্বের সহিত তত্ত্বের সম্মিলন সুন্দর স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়াছে। ইঁহাকেও আমরা সাদরে বঙ্গ সাহিত্যসমাজে অভ্যর্থনা করিতেছি।

মুদ্রা-রাক্ষস।

মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ' প্রথম খণ্ড। অনুবাদক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃ ২৮৭; মূল্য ৩৲।

বৈদিক সাহিত্যে শতপথ ব্রাহ্মণের স্থান অতি উচ্চ। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ইহারই অন্তর্গত। বহুদিন পূর্ব্বে Sacred Books of the East নামক গ্রন্থাবলীতে শতপথ ব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'অদ্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম-এ, মহাশয়ের প্রেরণায় ও উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ইচ্ছায় এবং দীঘাপতিয়ার স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম-এ, বাহাদুরের উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে'। অনুবাদ করিবার ভার পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি অনুবাদ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার; অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থের ভাষা এবং ভাব উভয়ই কঠিন, বিষয়টীও অতি নীরস এবং গ্রন্থও অতি বিস্তীর্ণ। কিন্তু কুমার বাহাদুর যখন অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন এবং শাস্ত্রী মহাশয় যখন অনুবাদ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তখন আশা করা যায় বঙ্গভাষাতেও শতপথ ব্রাহ্মণ অনূদিত হইবে।

বৈদিক দেববাদ কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া উপনিষদের ব্রহ্মবাদে পরিণত হইয়াছে এবিষয় যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহাদিগের পক্ষে বেদের ব্রাহ্মণাংশ বিশেষতঃ শতপথ ব্রাহ্মণ পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

'সরল সঙ্গীত ও হারমোনিয়ম শিক্ষক,' প্রথম ভাগ। শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার, এম-এ, প্রণীত। মূল্য এক টাকা দশ আনা। কুমিল্লায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই একখানি গ্রন্থ দ্বারা একসঙ্গে সঙ্গীত এবং হারমোনিয়ম উভয়ই শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইতেছে এবং গ্রন্থকার আশা করেন যে, "নূতন শিক্ষার্থীরা এই গ্রন্থসাহায্যে হারমোনিয়ম ও সঙ্গীত অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারিবেন।" এ কথা শুনিয়া আমরা ভীত হইয়াছি। পুস্তকের আদ্যোপান্ত খুঁজিয়া প্রথম শিক্ষার্থীর নিতান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র অথবা কণ্ঠবিষয়ক সাধন সকলের একটিও পাওয়া গেল না। এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া যে সঙ্গীত 'অনায়াসে' শিক্ষা হইবে, না জানি তাহা কিরূপ! সেরূপ সঙ্গীতের হাত হইতে ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

পুস্তকখানির চেহারা অতি সুন্দর, এবং লেখাও বেশ সহজ এবং সরস। ইহাতে জ্ঞাতব্য কথা অনেক আছে। গ্রন্থকার যে ইহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মূল বিষয়ের অবহেলায় এই পরিশ্রমের সমস্তই পণ্ড হইল, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। শিশুদিগকে বানান এবং হস্তলিপি শিক্ষা না দেওয়া যেরূপ, সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর প্রাথমিক সাধনসকল পরিত্যাগ করাও সেইরূপ। তাহার উপরে আবার যন্ত্র ধরিতে না ধরিতেই তাহাকে রাগ রাগিণী শিখাইতে গেলে নিতান্তই অবিচার হয়। সেই পরিচয়ও আবার সকল স্থলে ভ্রমশূন্য হয় নাই। এমন কি, সপ্তকের সাতটি সুরের পরিচয়ও হিন্দু সঙ্গীতের হিসাবে শুদ্ধ হয় নাই!

শিক্ষার্থীকে অর্দ্ধ মাত্রা অপেক্ষা সূক্ষ্ম মাত্রা শিখাইবার বিশেষ কোন চেষ্টা এই পুস্তকে দেখা গেল না। স্থলে স্থলে এক মাত্রার ভিতরে তিনটি সুর লিখিয়াই তাহাদের পরিচয় শেষ করা হইয়াছে। গ্রন্থের স্বরলিপি-পদ্ধতিটি গ্রন্থকারের স্বরচিত, প্রচলিত কোন পদ্ধতির সহিত তাহার ঐক্য নাই। সুতরাং আধমাত্রা পর্য্যন্ত কষ্টে শিখিয়া যে অতি অসম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিবে, তাহাও কোন কাজে আসিবে না, কারণ প্রচলিত স্বরলিপি সকল অন্যরূপ।

উ।

Two Essays on General Philosophy and Ethics—দ্বিতীয় সংস্করণ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার হীরালাল হালদার, এম্ এ, পি-এইচ্ ডি, প্রণীত। ৯১২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি উত্তম। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

এই গ্রন্থ প্রথমে প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে Indian Messenger নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা দুইখণ্ডে বিভক্ত। এক অংশে ঈশ্বরবাদের দার্শনিক ভিত্তি এবং এক অংশে ধর্ম্মনীতির দার্শনিক ভিত্তি আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে তাঁহার ঈশ্বরবাদের দার্শনিক ভিত্তি বিষয়ক মতামত অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তন এখানে পরিবর্দ্ধনের নামান্তর মাত্র। তাঁহার বর্ত্তমান মত প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ নহে কিন্তু উহা প্রাচীনের অনুসরণ করিয়াই বর্দ্ধিত হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তনে কোনও দোষ নাই। উহা চিন্তা-শক্তির সজীবতার এবং সত্য দর্শনের অন্যতম লক্ষণ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে পরিবর্ত্তিত মতানুসারে এই গ্রন্থ পরিবর্ত্তন করিতে গেলে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইবে এবং গ্রন্থকলেবর বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হইয়াছে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। অবশ্য, গ্রন্থকার যাহা বিশ্বাস করেন না, এমন কোন কথা ইহাতে নাই। যাহা লেখা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আরও বেশী লেখা উচিত ছিল, কিন্তু লেখা হয় নাই। ইহাই গ্রন্থকারের আক্ষেপের কারণ। যাহা হউক, অধ্যাত্মবাদের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, উহার পূরাপূরি একটা ব্যাখ্যা দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং গ্রন্থখানি যে ভাবে আছে, তাহাতেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অধিকতর সাহায্য করিবে, ইহাই আমাদের ধারণা।

আজকালকার দিনে শুনা যায় যে আমাদের অভিজ্ঞতার (Experienceএর) মধ্যে যাহা আছে তদতিরিক্ত আর কিছু আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য নই। "আকাশে দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্টিকে যতদূর সাধ্য লইয়া গিয়াও ঈশ্বর তো মিলিল না" সুতরাং ঈশ্বর আমার অভিজ্ঞতার বাহিরের বস্তু। আমার অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, সেখানে তো কোনও নিত্য আত্মার সাক্ষাৎকার পাইলাম না—কেবল

আমার মনের ভাব ও ভাবপরম্পরার সম্বন্ধ—আর তো কিছুই নাই। ইঁহারা ইন্দ্রিয়ঘটিত অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং ইন্দ্রিয়ঘটিত অভিজ্ঞতার প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রথম অংশে মানবের অভিজ্ঞতাকেই বিশ্লেষণ করিয়া এই আত্মতত্ত্বকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। একার্য্যে তিনি এতটা কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, যে, অপক্ষপাতে বিচার করিবার যাঁহাদের শক্তি আছে, তাঁহারা গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত না হইলেও স্বীকার করিবেন যে সাধারণতঃ অভিজ্ঞতা বলিতে যাহা বুঝায়, উহার মধ্যে তাহা অপেক্ষা আরও কিছু আছে। তিনি দেশকাল ঘটনা কার্য্যকারণ প্রভৃতির বিশ্লেষণের দ্বারা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে, সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে, সকল সম্বন্ধের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধকর্ত্তা বর্ত্তমান, যাহাকে ছাড়িয়া এ সকলের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র—মায়া (abstraction) "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া"—এই কথা তুলিয়াই অভিজ্ঞতাবাদী তাহার অভিজ্ঞতার বড়াই করেন এবং আত্মাছাড়াই অভিজ্ঞতা বলিয়া একটা বস্তু খাড়া করিতে সমর্থ হন। তিনি যে অভিজ্ঞতা জিনিষটাই বুঝেন না—গ্রন্থকার ইহা বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই আত্মা কোন্ আত্মা? এই প্রশ্ন তুলিয়া গ্রন্থকার উত্তর দিয়াছেন—ইহা কোনও ব্যক্তিগত আত্মা নহে। কেন না, এই ব্যক্তিগত আত্মারও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। যে আত্মা জগৎব্যাপারে জগৎকার্য্যের ব্যাখ্যারূপে আমাদিগের অভিজ্ঞতার মধ্যে আবির্ভূত হয় তাহা বিশ্বাত্মা (universal)। ব্যক্তিগত আত্মাসকল তাহারই অনুপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং একই সঙ্গে এই গ্রন্থে সাধারণ Pantheism ও জড়বাদ নিরাকৃত হইয়াছে এবং তাহার স্থানে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

মানুষ যে অনন্তের অনুপ্রকাশ—এই খানেই আমরা ধর্ম্মনীতির ভিত্তি পাইতেছি। মানুষ যে মূলতঃ অনন্তের সঙ্গে এক হইয়াও কার্য্যতঃ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—ইহারই মধ্যে তাহার নৈতিক জীবনের প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে। এই যে মানবজীবনের মধ্যে একটা বিরোধ—অনন্ত হইয়াও সান্ত—এই বিরোধ পরিহার করিবার চেষ্টা অর্থাৎ ঐ আদর্শের অনন্তকে আপনার মধ্যে কার্য্যগত জীবনে পরিণত করিবার যে চেষ্টা তাহাই তাহার নৈতিক জীবন। এই আদর্শকে জীবনে পরিণত করিবার জন্য মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। যাহাতে আত্মা পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হয় তাহা করাই আত্মার পক্ষে ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম। সুতরাং ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে আবদ্ধ হইয়া থাকা অধর্ম্ম। কেন না, তাহাতে আত্মার খর্ব্বতা সাধিত হয়। মানুষ যখন জগতের সঙ্গে আপনাকে এক মনে করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখনই সে প্রত্যেক কার্য্যে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার সুবিধা পায়। সেইজন্য আদর্শ ব্যক্তিগত না হইয়া সামাজিক হইবে। এখানে সন্ন্যাসের স্থান নাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। ব্যক্তি ও সমাজ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। একই অখণ্ড বস্তুর দুই দিক্। সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে উভয়ের স্বার্থের কোনও বিভিন্নতাই নাই। ব্যক্তি যেমন সমাজ ছাড়িয়া মানুষ হইতে পারে না তেমনই আবার যে সমাজ ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যোদ্যমকে আট্ ঘাট্ বাঁধিয়া নিয়মিত করিয়া দেয় সে নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করে। কেননা, সমাজের উন্নতি ব্যক্তিরই মধ্যে দিয়া হয়। গ্রন্থকার অতি পরিষ্কার ভাবে অল্পের মধ্যে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি সর্ব্বপ্রথম এই Two Essays হইতেই সমাজতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তার সূত্র লাভ করিয়াছিলাম এবং এই সূত্র ধরিয়াই নব প্রকাশিত "সংস্কার ও সংরক্ষণ" পুস্তকে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এবিষয়ে এখানে বেশী লেখা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক, গ্রন্থকার স্বল্পায়তনের মধ্যে আপনার এই আত্মবিকাশবাদ বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীমতের মধ্যে দুইটী প্রধান—ব্যক্তিগত বিবেকবাদীবাদ ও সুখবাদ। ইহাদের প্রতিবাদ করিয়াও তিনি দেখাইয়াছেন, যে, মূলে উভয়ের মধ্যেই সত্য আছে এবং সে সত্য তিনি নিজের মতের অন্তর্ভূত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই খানে সুবিজ্ঞ গ্রন্থকারকে দু একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহার বিদ্যা আছে এবং অন্যকে সে বিদ্যার অংশভাগী করিবার ক্ষমতাও আছে। তিনি শিক্ষক। ভাষার উপর তাঁহার দখল সামান্য নহে। এরূপ স্থলে আমরা Two Essays লইয়া বিদায় হইতে প্রস্তুত নহি। আমরা স্বীকার করিয়াছি, যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে অন্য আকার না দেওয়া ভালই হইয়াছে। কিন্তু উচ্চ দর্শন-মন্দিরের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দেওয়াই কি তাঁহার মত বিদ্বান্ ব্যক্তির এক মাত্র কাজ? ক্ষুধা জাগাইয়া খাইতে দিবার শক্তি সত্ত্বেও না দেওয়া কি অন্যায় নহে? এই উচ্চতত্ত্বের শিক্ষক দেশে বহু নাই। যে অল্পসংখ্যক কয়জন আছেন গ্রন্থকার তাঁহাদের অন্যতম। এরূপস্থলে স্বোপার্জ্জিত বিদ্যাধনকে কৃপণের ন্যায় স্বীয় হৃদয়-গহ্বরে সঞ্চিত করিয়া রাখা অন্ততঃ তাঁহার স্বপ্রচারিত নীতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে যাইতেছে, আমরা একথা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়া বিদায় লইতেছি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

চিত্র-পরিচয়

মাতৃমূর্ত্তি।

মানুষের মন পরমেশ্বরকে মাতৃভাবে আরাধনা করিবার জন্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে উন্মুখ। এই মাতৃভাবে উপাসনা হিন্দুধর্ম্মে যেমন অনির্ব্বচনীয় ও বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোনো ধর্ম্মে হয় নাই। হিন্দু সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে, স্বাস্থ্যে আনন্দে সেই জগন্মাতারই অস্তিত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার বিবিধ রূপ কল্পনা করিয়াছে। মানবচিত্তের দুরবগাহ রহস্য এমনি যে সে শুধু মায়ের কাছে স্নেহ পাইয়া তৃপ্ত নহে, মা হইয়া আবার ভগবানকে স্নেহ করিতে চায়। এই বাৎসল্য-ভাবের উপাসনাও হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। হিন্দু, যশোদা রূপে তাহার প্রাণের গোপালকে সমস্ত স্নেহধারা ঢালিয়া দিয়া ধন্য হয়; শিশুর যে আনন্দলীলা সে নিত্য নিত্য নিজের গৃহাঙ্গনে দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তাহার যে আনন্দ, তাহা সে পরমদেবতাকে নৈবেদ্যরূপে নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারে না। যশোদা হিন্দুর চিরন্তন মা ও গোপাল চিরন্তন শিশু!

সেমিটিক জাতিদিগের মধ্যে এই মাতৃভাব বা বাৎসল্য-ভাবের উপাসনাপদ্ধতি বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এজন্য য়িহুদি, খৃষ্টীয়, বা মহম্মদীয় ধর্ম্মে এই ভাবের অভাব দেখা যায়। কিন্তু মানবাত্মা ত শুধু শাস্ত্রের দোহাই মানিয়া তৃপ্ত হয় না; নিজের তৃপ্তির জন্য উপায় তাহাকে বাহির করিতেই হয়, শাস্ত্র যদি সে উপায় করিয়া দিতে পারে তবে ত কথাই নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর-অবতার; তাঁহার মাতা মানবী মেরি। ইহাতে খৃষ্টপন্থীগণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে—মেরিকে ঈশ্বরের মাতা করিয়া তাহাদের বাৎসল্য মেরির মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। মেরি খৃষ্টানের চিরন্তন মাতা ও যিশু তাহাদের চিরন্তন শিশু!

খৃষ্টপন্থীদিগের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় মেরির মাতৃমূর্ত্তি পূজা করে। তাঁহার মূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। কত শত শিল্পী এই মাতৃ-মূর্ত্তির পরিকল্পনা দ্বারা অমর হইয়া গিয়াছেন। কত তক্ষণ কত অঙ্কন এই মাতৃভাব শিলায় ও বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়া ধন্য হইয়াছে, উহা মানবের বুভুক্ষু স্নেহধারাকে তৃপ্ত করিবার অমৃত-পরাবার রূপে যুগযুগান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানুষের চিত্তবৃত্তির সার্থকতা তখনই যখন তাহা পরমেশ্বরের নৈবেদ্যরূপে প্রকাশিত হয়। শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধ ও করুণা বাৎসল্য প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি সার্থক হয় সত্য শিব সুন্দরের ধ্যানে ও যোগে।

বটিসেলি-অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তিখানি এইরূপ একখানি সার্থক চিত্র। ইহা সুন্দর, ইহা মনোরম!—শুধু বাহ্য আকারে নয়, অন্তরের পরিচয়েও। ইহা বাস্তবিকই সত্য শিব সুন্দরের মাতৃমূর্ত্তি! ভগবানের জননীকে শিল্পী শুধু শারীরিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার মাতৃমূর্ত্তি গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতায় সম্ভ্রমের সামগ্রী; ইনি এমন মা যিনি সন্তানের জন্য সদা শঙ্কিত; যিনি সন্তানের বিপদ অন্তরে অনুভব করিয়া ম্রিয়মাণ; যিনি দেখেন অনেক, বুঝেন বেশি, কিন্তু কহেন কম। এই অনবদ্য করুণামূর্ত্তি দেখিয়া মন ভক্তিরসে আপনি ভরিয়া উঠে, সম্ভ্রমে মস্তক আনত হয়।

বটিসেলির চিত্র সম্বন্ধে পেটার বলেন যে বটিসেলি সেইরূপ নরনারীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে ভালো বাসিতেন যাহাতে সৌন্দর্য্য ও শক্তি ভাবের মাধুর্য্যে অভিষিক্ত অথচ দুঃখের ছায়ায় বিষণ্ণ।*

আমাদের প্রকাশিত চিত্রখানি বটিসেলির এই সকল গুণ চমৎকার ভাবে প্রকাশ করিতেছে।

মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য।

মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য হিন্দুর একটী চমৎকার কল্পনা। এই বিশ্ব চরাচর মহাদেবের নৃত্যতালে স্পন্দিত হইতেছে; তিনিই প্রাণরূপে, চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, শক্তিরূপে, আনন্দরূপে নিখিলবিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন; সূত্রে মণিগণের ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে বিধৃত হইয়া আছে; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে মহাদেবেরই নৃত্যলীলা পরিদৃশ্যমান।

মুদ্রিত চিত্রখানির ভাব, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য অসাধারণ। পরিকল্পনার বিরাটত্ব ও সৌন্দর্য্য চমৎকার। এ চিত্রখানি কাঙ্গড়া প্রদেশের চিত্রাঙ্কন রীতির উৎকৃষ্ট নমুনা। এখানি শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংগৃহীত। আসল চিত্রখানি রঙিন। আমাদের একবর্ণে মুদ্রিত প্রতিলিপিতে মূলের বর্ণসৌন্দর্য্য না থাকিলেও ইহার ভাব ও রচনাগত সৌন্দর্য্য সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

দেবতাত্মা ও দেবভূমি হিমালয়ের কৈলাসশিখরে কর্পূর-ধবল মহাদেব নৃত্য করিতেছেন; তাঁহার বসন ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ভূষণ সর্প—সুন্দর শিবের সঙ্গে ভয়ানকের সম্মিলন! তাঁহার সম্মুখে নন্দী-ভৃঙ্গির নায়কতায় সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিবিধ বাদ্যে নৃত্যের সহিত তাল দিতেছে। ইহাদের পশ্চাতে অগ্নি-দেবতা। চিত্রের বাম ভাগে মুনিঋষিবেষ্টিত দেবতামণ্ডলী। নীচের দিকে মুনিঋষিগণ স্তব করিতে-ছেন; মধ্যস্থলে একজন অপ্সরা—সংযম ও বিলাস একত্র সমবেত হইয়া মহাদেবের নৃত্যলীলা সম্ভোগ করিতেছে। ইহাদের উপরেই বীণাপাণি বাগ্‌দেবী। তাঁহার পশ্চাতে দেবর্ষি নারদ—ভক্তির অবতার। সরস্বতীর উপরে বেদপাণি ব্রহ্মা করতাল বাদ্য দ্বারা তাল দিতেছেন, সরস্বতী

* Botticelli's interest is with men and women, in their mixed and uncertain condition, always attractive, clothed sometimes by passion with a character of loveliness and energy, but saddened perpetually by the shadow upon them of the great things from which they shrink.—Pater in his *Renaissance*.

ব্রহ্মার শক্তি। তাঁহার পশ্চাতে বলরূপী ষড়ানন কার্ত্তিক তানপূরা বাজাইতেছেন। তাঁহার উপরে সিদ্ধিরূপী গণেশ মন্দিরা বাজাইতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু ও তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী। ইহাঁদের উপরে সূর্য্য চন্দ্র যম ও ঋষিগণ। ইহাঁরা সকলে মিলিত হইয়া মহাদেবের নৃত্যে তাল দিতেছেন। চিত্রের দক্ষিণ ভাগের মধ্যস্থলে মহাদেবের শক্তি পদ্মাসনে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে বসিয়া অনাসক্ত ভাবে বিশ্বের মুকুরে আপনারই রূপ প্রতিফলিত দেখিতেছেন; কল্পবৃক্ষ তাঁহার মস্তকে ছায়া দান করিতেছে; শিবশক্তির চতুর্ভুজে বর ও অভয় এবং পাশ ও অঙ্কুশ—অঙ্কুশের দ্বারা অশান্তি ও পাপকে তিনি তাড়না করেন ও পাশ দ্বারা তিনি মানবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া বরাভয় দান করেন। ভাসমান মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া হিমশিখরগুলি আচ্ছন্ন করিতেছেন।

চিত্রখানির প্রত্যেকটি মূর্ত্তি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; সমস্তই বিরাট, সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত, কোথাও স্থূলতা জড়তা অস্পষ্টতা নাই। পুরুষ ও স্ত্রী সকল মূর্ত্তিগুলিই প্রাণের হিল্লোলে সজীব, সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, ভাবে সুমধুর। এই চিত্রখানি গভীর পর্য্যবেক্ষণের সামগ্রী, হাল্কা দৃষ্টিতে ইহার সৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি হইবার নহে।

যাত্রী।

তীর্থযাত্রী পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিয়া তীর্থ সন্দর্শনে চলিয়াছে। তীর্থরাজের মুখের পানে চাহিয়া তিমির রাতে সে বাহির হইয়াছে, পথের অন্ত দেখা যাইতেছে না, ধূ ধূ মাঠ তপ্ত বালু হানিতেছে, কোথাও আশ্রয় নাই, জনমানব নাই; ভারের চাপে পিঠ কুঁজা হইয়া গিয়াছে; তবু চলিয়াছে—তীর্থ দর্শন না করিয়া তাহার ক্ষান্ত হইবার জো নাই। সঙ্গে সহধর্ম্মিণী ছায়ার মতন তাহার পাশে পাশে চলিয়াছে; উভয়ে বড় পাশাপাশি, বাহুবন্ধনে আশ্লিষ্ট; কিন্তু পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য বদ্ধ সেই তীর্থের দিকে,—তীর্থে গিয়া শ্রীমুখ দেখিয়া জীবন সফল সার্থক করিতে হইবে,—এই চিন্তায় মন পরিপূর্ণ, মুখভাব চিন্তাকুল অথচ দৃঢ়, শ্রমকাতর অথচ অটল!

মানুষ এই সংসার-ক্ষেত্রের তীর্থযাত্রী। তীর্থরাজের শ্রীমুখ দেখাই তাহার পরম পুরুষার্থ। দুঃখ বিপদ মাথায় বহিয়া যাত্রা সমাপ্ত করিতে হইবে, সহায়—আত্মশক্তি ও দৃঢ় নিষ্ঠা, এবং সঙ্গী—সহধর্ম্মিণী।

এই চিত্রখানিতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ভাব, যাত্রীদ্বয়ের পরস্পর নির্ভরের ভাব, ও অন্তহীন যাত্রাপথের সঙ্কেত বড় সুন্দর ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেব প্রজ্ঞা, মৈত্রী ও করুণার অবতার, জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মানব। য়ুরোপখণ্ডে যিশুমাতার চিত্র যেমন শিল্পীদিগের আদরের বস্তু, এসিয়াখণ্ডে বুদ্ধমূর্ত্তি সেইরূপ। এই বুদ্ধমূর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান ও হীনযান নামক দুই সম্প্রদায়ের লোক বিভিন্ন ভাবে কল্পনা করিয়া থাকে। মহাযান ধর্ম্মমতের প্রধান ও প্রাচীন ব্যাখ্যাকার অশ্বঘোষ-প্রণীত মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হয়; তাহা কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ঐ পুস্তকের চীন ভাষায় অনুবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। ঐ পুস্তকের মতানুযায়ী একজন চীন চিত্রকর যে বুদ্ধমূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সৌন্দর্য্যে ও ভাবে এবং রচনাপারিপাট্যে অতি মনোরম। মহাপুরুষ বুদ্ধদেব পদ্মাসনে বসিয়া জ্ঞান উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে মৈত্রীরূপিণী সমন্তভদ্র ও প্রজ্ঞারূপিণী মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধের শক্তি এবং ভক্তিরূপী আনন্দ ও দানরূপী মহাকাশ্যপ বিরাজিত; প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখভাবে তাহার স্বভাব চমৎকার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রজ্ঞালব্ধ মৈত্রী ও সংযমে যে সকরুণ শান্তি আনয়ন করে এই মূর্ত্তিগুলি তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

কামাকুরা বুদ্ধের জাপানী নাম দাই-বুৎসু অর্থাৎ বুদ্ধদেব। এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ব্রঞ্জ ধাতুর ঢালাই; বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢালাই করিয়া ঝালিয়া জোড়া ও বাটালি দিয়া চাঁচিয়া জোড় বেমালুম করা। এই মূর্ত্তির মাপ নিয়ে দেওয়া গেল—

	ফুট	ইঞ্চি	
উচ্চতা	৪৯	৭	প্রায়।
বেড়	৯৭	২	"
মুখের দৈর্ঘ্য	৪	৫	"

	ফুট	ইঞ্চি	
কান হইতে কান পর্য্যন্ত মুখের প্রস্থ	১৭	৯	প্রায়।
কপালের শ্বেত ফোঁটা ...	১	৩½	„
চক্ষুর দৈর্ঘ্য	৪	০	„
কানের দৈর্ঘ্য	৬	৬½	„
নাকের দৈর্ঘ্য	৩	৯½	„
মুখবিবর	৬	২	„
হাঁটু হইতে হাঁটুর বিস্তার ...	৩৫	৮½	„
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের বেড় ...	৩	০	„

ইহার চোখ দুটি খাঁটি সোনার; কপাল ও মাথার ফোঁটাগুলি রূপার।

এই মূর্ত্তি প্রকাণ্ড হইলেও নিখুঁত, জাপানীর ধর্ম্মভাব ও শিল্পচাতুর্য্যের চমৎকার নিদর্শন। ইহার গঠনের বিশালতা, আকার-সৌষ্ঠবের সৌন্দর্য্য এবং মুখভাবের প্রশান্ত সরলতা ও ধ্যানপরতা এই মূর্ত্তিটিকে নয়নানন্দকর করিয়া রাখিয়াছে।

এই বৎসর বুদ্ধস্মৃতির ২৫০০তম উৎসব। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ-গয়াতে তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হইয়াছিল, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বারাণসীতে তিনি প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় তিনি ষাট জন অর্হৎকে প্রচার কার্য্যে ব্রতী করিয়া দিক্‌দেশে প্রেরণ করেন।

আমরা কোনো মহাপুরুষের উৎসব তখনি ততটুকু পূর্ণাঙ্গ করিতে পারি যখন আমরা যে পরিমাণে তাঁহার মহৎভাবে অনুপ্রাণিত হই। বুদ্ধদেবের মৈত্রী, করুণা, সংযম, জ্ঞান, শান্তি আমরা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া মানুষ হইতে পারিলেই তাঁহার স্মৃতির সম্মান ও পূজা করা হইবে।

প্রভাতের আলো।

ইহা কলিকাতা ইডেন গার্ডেনের একাংশের ফটোগ্রাফ। ইহা ফটোগ্রাফ হইলেও ইহাতে সৌন্দর্য্য ও আর্ট যথেষ্ট আছে। তরু-কুঞ্জের এধারে ছায়া ও অপর পারে আলোকের খেলা এবং মধ্যস্থলে খণ্ড আলোকের ঝিকিমিকি অতি রমণীয়। ছবিখানি চোখ হইতে দূরে ধরিয়া দেখিলে ইহার সমগ্র সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে, যেন একখানি পরিকল্পিত চিত্রের মতন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাময়িক ও বিবিধ প্রসঙ্গ

গ্রীষ্ম আরম্ভ হইবার পর হইতেই দেশের নানা স্থান হইতে জলকষ্টের হাহাকার উত্থিত হয়। জলাভাবে, এবং দূষিত, কর্দ্দমাক্ত, মলিন জলপানে, মানুষ ও গবাদি পশুর মধ্যে নানা সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়। বৎসরের পর বৎসর এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রতিকারের সমুচিত উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না।

যে সকল স্থানের লোকেরা স্রোতস্বিনী নদীর জল পান করিত, তাহাদের মধ্যে এখনও অনেকের সে সৌভাগ্য আছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, কোথাও বা নদীতে চড়া পড়ায় জলকষ্ট হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে মৃত্তিকাদি উত্তোলন করিয়া তাহাতে আবার স্রোত বহান ব্যক্তিবিশেষের বা গ্রামবিশেষের পক্ষে দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলাই বোধ হয় ঠিক্। এরূপ কাজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারাই সম্ভবে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট করিবেন কি?

সহস্র সহস্র গ্রামে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিস্তর পুষ্করিণী আছে। তাহার অধিকাংশই এখন শুষ্ক বা সামান্য পরিমাণে ময়লা জলে পূর্ণ। এই পুকুরগুলির জলে পূর্ব্বে লোকের স্নান-পানের সুবিধা হইত, চাষের কাজেরও সুবিধা হইত। এগুলি দেশের লোকেই খনন করাইয়াছিল, কিন্তু এখন পঙ্কোদ্ধারও হইতেছে না কেন? ইহা কি মোটের উপর দেশব্যাপী দারিদ্র্যবৃদ্ধির একটি চিহ্ন; না কেবল বাছিয়া বাছিয়া পুকুরের মালিকেরাই গরীব হইয়া গিয়াছেন, আর সকলে সম্পৎশালী হইয়া উঠিতেছেন? যদি রাজপুরুষদের চিত্ততোষক এই মতটি ধরিয়া লওয়া যায় যে দেশে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা হইলে পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার হইত; অন্ততঃ নূতন ধনী লোকদের দ্বারা নূতন পুকুরও অনেকগুলি খনিত হইত। কিন্তু নূতন পুকুর খনন বড়ই কম হইতেছে।

পুরাতন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার ও নূতন পুকুর খনন না হওয়ার আর একটি কারণ থাকিতে পারে। ইহা বলা যাইতে পারে যে দেশে ধন পূর্ব্ববৎই আছে বা বাড়িয়াছে, কিন্তু কোনও কারণে এইরূপ কাজে আর লোকের মন নাই। সেকালের লোকেরা কেহ বা চাষাদিতে নিজের

এবং প্রজাদের সুবিধার জন্য, কেহ বা লোকহিত দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ার্থ, কেহ বা উভয়বিধ কারণে, পুকুর কাটাইত। এখন তাহা হইলে হয় লোকেরা নিজেদের স্বার্থ বুঝে না, কিম্বা লোকহিতকর কার্য্য দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিতে চায় না। এই দুই কারণই কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইতে পারে। কিন্তু ইহাও সত্য যে আজকাল রাজপুরুষদের দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অনুষ্ঠিত নানা স্মৃতিচিহ্ন, তামাসা এবং প্রদর্শনী আদিতে, এবং রাজপুরুষদের অভ্যর্থনার জন্য দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকদিগকে খুব বেশী টাকা দিতে হয়। যে টাকাটা দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয় হইতে পারিত, তাহা এখন রাজপুরুষদের মনস্তুষ্টির জন্য খরচ করা হয়।

তাহার পর আজ কাল ধনীলোকেরা নানা কারণে আর গ্রামে বাস করেন না। সাধ্যায়ত্ত হইলেই তাঁহারা কলিকাতা বা অন্য সহরে বাস করেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে গ্রামের লোকদের সুখদুঃখের অংশী হইবার সম্ভাবনা ও প্রয়োজন উভয়ই কমিয়া আসিতেছে। এরূপ স্থলে তাঁহাদের দ্বারা গ্রাম্য লোকদের উপকারের আশা কোথায়?

অথচ গ্রামগুলিই ত দেশের সর্ব্বস্ব। গ্রামেই অধিকাংশ লোক বাস করে, গ্রামেই সমুদয় দেশবাসীর খাদ্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং গ্রামগুলির স্বাস্থ্য ও সুবিধা বৃদ্ধির অকপট চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। গ্রামবাসীরা একবার ভাল করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখুন, একযোগে কাজ করিলে তাঁহাদের স্বাবলম্বন দ্বারা কূপ পুষ্করিণী খনন কতদূর হইতে পারে।

আগে মানুষ বাঁচিবে, তবে ত তাহার মঙ্গল চেষ্টা করিবে? তজ্জন্য দেশের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি এবং লোকের অকালমৃত্যু নিবারণ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ। সমগ্র ভারতবর্ষে বৎসরে হাজারকরা ৩৮ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বিলাতে কিন্তু হাজারকরা বার্ষিক মৃত্যুসংখ্যা ১৫ জন মাত্র। অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুসংখ্যার হার বিলাতের আড়াই গুণ। ভারতবর্ষের মৃত্যুর হার এত অধিক হইবার কারণ এই যে এদেশে শিশুদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী, আবার প্রৌঢ়দের মধ্যেও মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী। যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বার্দ্ধক্য বলা যায়, সে অবস্থায় পৌঁছিবার সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই ঘটে। আমাদের দেশে মৃত্যুসংখ্যা কমাইতে হইলে প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া ও তৎসদৃশ জ্বর, ওলাউঠা ও অন্যান্য উদরের পীড়া, এবং প্লেগ, এই কয়টি কারণ নিবারণের চেষ্টা করা প্রয়োজন। জল নিঃসারণের ভাল উপায়, উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের অভাবপূরণ, ও যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, প্রধানতঃ এইগুলি হইলে তবে মানুষ স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে। এইগুলির ব্যবস্থা করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টকেও স্বাস্থ্যরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য অধিকতর অর্থব্যয় করিতে হইবে, দেশের লোককেও করিতে হইবে। এইজন্য দেশের ধনবৃদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু কেবল ধনবৃদ্ধি হইলেই হইবে না। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে হইলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি বুঝিতে হইলে, এবং ঐ নিয়মগুলি পালন করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। সুতরাং দেশমধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হইলে মঙ্গল নাই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই শিক্ষিত হওয়া চাই।

যদি এই শিক্ষাদানের কোনও একটি উপায় সম্বন্ধে আমরা আপত্তি করি, এবং ঐ উপায়ের প্রতিকূল সমালোচনা করি, তাহা হইলে শুধু আপত্তি এবং সমালোচনা করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, এরূপ মনে করা বিজ্ঞজনোচিত নহে। আমাদের দেখান উচিত, যে আর অন্য কি উপায়ে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে যথাসম্ভব অল্পসময়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে। এই উপায়টি একটি মনগড়া উপায়মাত্র হইলে চলিবে না। উহা যে কার্য্যতঃ অবলম্বিত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট ও প্রকৃতিপুঞ্জ উভয়েরই উহাতে সম্পূর্ণ না হউক অন্ততঃ কতকটা মত হইতে পারে, তাহাও দেখাইতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এরূপ বলিলে চলিবে না যে গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে বিনা বেতনে সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা দান করুন। দেখাইতে হইবে যে আমাদের গবর্ণমেণ্ট অন্ততঃ ১০।১৫ বৎসর মধ্যেও ইহা করিতে ইচ্ছুক বা সমর্থ হইবেন।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই আমাদের ধারণা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ইচ্ছা কিম্বা সামর্থ্য শীঘ্র হইবে না। ইউরোপের যে সকল দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা. প্রচলিত আছে, তথায় গবর্ণমেণ্ট যাহা সাহায্য করেন, তদতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্থানীয় লোকদিগকে স্বতন্ত্র টেক্স দিতে হয়। অনেকে বলিবেন যে সে সব দেশের লোক আমাদের চেয়ে বেশী ধনী, সুতরাং তাহাদের পক্ষে অতিরিক্ত টেক্স দেওয়া সম্ভব, কিন্তু গরীব আমাদের পক্ষে আর টেক্স দেওয়া সম্ভব নয়। ইহার উত্তরে আমরা স্বদেশবাসীদিগকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে বলিব। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা গরীব, তাহারা সহজে আর টেক্স দিতে অসমর্থ, কিন্তু ইহা সত্য নহে যে জমীদারেরা ও অন্যান্য শ্রেণীর সচ্ছল অবস্থার লোকেরা আর টেক্স দিতে পারেন না। স্বদেশের হিতার্থ বিলাস ও আরামের জিনিষে খরচ কমাইয়াও আমাদের শিক্ষা-টেক্স দেওয়া উচিত। কারণ শিক্ষা ব্যতিরেকে আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই, এবং আমরা অতিরিক্ত টেক্স না দিলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা টেক্স দিতে রাজী হইলেও যদি গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে স্বীকৃত না হন, তখন শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে; তখন যদি কেহ বলে যে দেশকে অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাহা অসত্য হইবে না। দ্বিতীয় কথা এই যে ইউরোপে ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশের লোকেরা যেমন ধনী গবর্ণমেণ্টও তদ্রূপ ধনী। ঐ সকল ধনী দেশের ধনী গবর্ণমেণ্টও স্থানীয় লোকের প্রদত্ত টেক্সের সাহায্য ব্যতিরেকে সার্ব্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং আমাদের গরীব দেশের অপেক্ষাকৃত গরীব গবর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন? সুতরাং আমাদিগকে টেক্স দিতেই হইবে। অনেকে বলিবেন যে, টেক্স হইলেই উহা ধনী দরিদ্র সকলেরই স্কন্ধে পড়িবে। সকলেরই স্কন্ধে পড়িবে, এইরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি কি? সমুদয় টেক্স কি সকলকেই দিতে হয়? ইন্‌কম্ টেক্স বা আয়কর কি সকলকেই দিতে হয়? রোড্‌সেস্ আদি কি সকলকেই দিতে হয়? মিউনিসিপ্যাল টেক্সগুলি কি সকলকেই দিতে হয়?

শ্রীযুক্ত গোখলে কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা আইনের পাণ্ডুলিপির সমর্থন জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে সাধারণ প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল, তাহাকে আমরা অতি শুভলক্ষণ মনে করি। আশা করি ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ সভা হইবে। আমরা কেহই দেশভক্ত নহি, একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। কিন্তু দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক নিরক্ষর, ইহা যে কি লজ্জার কথা, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিব না? এই কলঙ্কের জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করিয়াই কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব? তাহাতেই কি জন্মভূমির মানসিক দারিদ্র্যজনিত অপমান ক্ষালিত হইবে? না, কেবল আমাদের আর্য্য পিতামহগণের জ্ঞান-গরিমা সম্বন্ধে আস্ফালন করিলেই হঠাৎ ভারতের সমুদয় জীর্ণ পর্ণকুটীরগুলিতে জ্ঞানের সামান্য মাটীর প্রদীপও জ্বালিতে আমরা সমর্থ হইব?

ঢাকার শরৎ ঘোষ নামধারী একজন পুলিস্ ইন্‌স্পেক্টরকে খুন করিবার জন্য ২টী বাঙ্গালী যুবক তাহাকে গুলি করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয়। শরৎ ঘোষকে গুলি লাগিয়াছিল, কিন্তু সে মরে নাই। আসামীরা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলে, এবং ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে যে গুলিমারাটা শরৎ ঘোষের কোন আত্মীয় ও আত্মীয়াঘটিত ব্যাপারের ফল। সে যাহা হউক, ঢাকার জজের বিচারে তিনজন জুরর আসামীদিগকে নির্দ্দোষ এবং দুইজন দোষী বলেন। জজ শেষোক্ত দুইজনের মতাবলম্বী হইয়া মোকদ্দমাটির শেষ মীমাংসার জন্য হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। হাইকোর্টের বিচারে আসামীরা নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইয়াছে। হাইকোর্ট বলেন যে এই মোকদ্দমার নথী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পুলিস থানার ডায়েরীতে গুলিমারার প্রথম খবর যে সময়ে প্রাপ্ত বলিয়া লেখা হইয়াছে, তাহা মিথ্যা করিয়া লেখা হইয়াছে; এবং এই

নথী পরিবর্ত্তন আসামীদের পক্ষ হইতে করা হয় নাই। তবে কে করিয়াছে? থানার ডায়েরীতে মিথ্যা কথাই বা কে লিখিল? এই সকল প্রতারক মিথ্যাবাদী লোকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দণ্ড দিলে, গবর্ণমেণ্টের কোন অখ্যাতি হইবে না, লোকের রাজভক্তিও মোটেই কমিবে না। যে সকল দুরাত্মা নির্দ্দোষলোককে খুনের অপরাধে দণ্ডিত করিতে চায়, তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়?

"হাওড়া গেঙ্গ কেস্" মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বহুসংখ্যক যুবককে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন ও উদ্যোগ করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। ইহারা প্রায় সকলেই খালাস পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে বৎসরাধিক কাল হাজতে পচিতে হইয়াছে, এবং তাহাদের অভিভাবকদিগকে মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। সুতরাং এই নিরপরাধ লোকদিগের শাস্তি খুব হইয়াছে। সুখের বিষয় কেবল এই মাত্র যে হাইকোর্টের সুবিচারে তাহাদের দণ্ড আরও গুরুতর হয় নাই, এবং তাহাদিগকে "অপরাধী" বলিয়া দাগী হইতে হয় নাই। আসামীদের মধ্যে এক জন মারা পড়িয়াছে, ও এক জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে। হাইকোর্ট তাহাদিগকে নিরপরাধ স্থির করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই এক জনের মৃত্যু ও এক জনের দুরারোগ্য রোগ, মোকদ্দমার সহিত একেবারে অসংস্পৃষ্ট নহে। সে যাহা হউক, বাকী এতগুলি লোক যে এত দিন কারাগারে পচিল, এত মনঃকষ্ট পাইল, এত অর্থব্যয় করিতে বাধ্য হইল, গবর্ণমেণ্টের চারিলক্ষাধিক টাকা খরচ হইল, তিন জন হাইকোর্টের জজকে কয়েক মাস ধরিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা সাক্ষ্য শুনিয়া সময় নষ্ট করিতে হইল, এবং এইরূপে তাঁহাদিগের কালক্ষয় হওয়ায় হাইকোর্টে অনেক মোকদ্দমা জমিয়া গেল, এই সকল অনর্থের জন্য দায়ী কে? কে ইহার বিচার করিবে? মানুষে করুক আর নাই করুক, ভগবান্ নিশ্চয়ই করিয়াছেন। যে সকল পাপাত্মা অর্থের জন্য মিথ্যা সৃষ্টি করিয়াছে ও বলিয়াছে, তাহাদের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

ইহাও অত্যন্ত অনিষ্টকর যে যাহারা বাস্তবিক ডাকাইতি করিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িল না। ইহাতে তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল।

ইংরাজ বড় বীর জাতি। বীর মানে অবশ্য যোদ্ধা, কারণ যুদ্ধ ছাড়া আর কোন্ রকমে মানুষ সাহস দেখাইতে পারে? কিন্তু মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ না ঘটিলে বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ হয় না। এই জন্য বোধ হয় ইংরাজ রাজপুরুষগণ মহারাষ্ট্রে ও বঙ্গে যুদ্ধোদ্যমকারী কতকগুলি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া খুব খুসী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় জগদ্বাসী-দিগকে ইহা বলিয়া আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে, দেখ আমরা একবারে নিরস্ত্র নির্জীব দেশ শাসন করি না; অস্ত্র সংগ্রহ করে, যুদ্ধ করে এমন লোকদিগকে অধীনে রাখিয়াছি।" দুঃখের বিষয় তাঁহারা, ব্যাপারটা যে ভীষণ না হইয়া হাস্যকর হইতে পারে, তাহা সন্দেহ করেন নাই। কথায় বলে, ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দ্দার। এই যুবকেরাও তাহাই। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম অপরাধে নাসিক জেলায় ১৯০৯ সালের জুন মাসে তথাকার জজ একটি যুবককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। সে, একাই, একটি কবিতা রচনা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল! অন্য কোন অস্ত্র সংগ্রহ করে নাই। না জানি সে কেমনতর ভীষণ সাঙ্ঘাতিক মন্ত্রপূত কবিতা! বঙ্গের বীরেরা আয়োজন হিসাবে এই মহারাষ্ট্রের যুবক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহারা নাকি প্রায় ১২ গণ্ডা লোক জুটাইয়াছিল। কয়েকটা তীরের ফলা, এবং কয়েকটা রিভল্‌ভারও যোগাড় করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় হাইকোর্টের জজেরা এই আয়োজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষে যথেষ্ট মনে করেন নাই। যাহাই হউক, যাহারা কবিতা, তীরের ফলা, ও রিভল্‌ভারকে যুদ্ধের যথেষ্ট উপকরণ মনে করে, বীরত্ব ও যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা খুবই উচ্চ। তীতুমীর আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার যশঃ নিশ্চয়ই রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় ম্লান হইয়া যাইত।

আফিং-বাণিজ্য সম্বন্ধে চীনের সঙ্গে ইংলণ্ডের সহিত একটি বন্দোবস্ত-পত্রে উভয় পক্ষের দস্তখত হইয়া গিয়াছে। যদি উভয়পক্ষ এই বন্দোবস্ত মত চলেন তাহা হইলে ২।১ বৎসরের মধ্যেই চীনদেশে আফিঙ্গের চাষ ও বিক্রয় উভয়ই বন্ধ হইয়া যাইবে। এক সময় ইংলণ্ড যুদ্ধ করিয়া চীনকে ভারতবর্ষের আফিং কিনিতে বাধ্য করিয়াছিল। সুতরাং সেই ইংলণ্ডের পক্ষে আজ এরূপভাবে চীনে আফিং ব্যবহার বন্ধ করিবার সহায়তা করা শুভ চিহ্ন বটে,—যদিও ইংলণ্ড আফিং-বিরোধীদলের আন্দোলনে এইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটু কথা আছে। চীনে আফিং বেচিয়া বেশ আয় হইত। আফিঙ্গের ব্যবসায় বন্ধ হইলে সেই আয়ের পথ বন্ধ হইবে। ভারতীয় রাজকোষের এই ক্ষতির পূরণ ইংলণ্ড করিবেন কি? করা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু করুন বা না করুন, আমরা পাপের টাকা চাইনা, আমরা মানুষকে পশুর অধম করিয়া ধনশালী হইতে চাইনা। ইহা অপেক্ষা করভারপীড়িত হইয়া মরাও ভাল।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের প্রস্তাবিত সাহিত্যিক-সহায়কভাণ্ডার স্থাপিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের নিশ্চয়ই উপকার হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে যেন অনুরোধ উপরোধ, সুপারিশ, এবং আশ্রিতপালনের ভাবটা আসিয়া না জুটে। কোন কোন ধনী ব্যক্তি মাসিক পত্র পোষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সুফল ফলিয়াছে কি? শুধু টাকা হইলেই হয় না। রাজনৈতিক আতঙ্কে অবিকৃত-চিত্ততা, পক্ষপাতশূন্যতা ও সুবিবেচনা চাই। একথা বলিবার কারণ এই যে সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী কোন বিদ্যামন্দিরেও এই সব গুণের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় নাই, অন্যায় সুপারিশের একান্ত অভাবও প্রমাণিত হয় নাই। স্বদেশ-সেবা বড় শক্ত কাজ।

গত বৈশাখী পূর্ণিমায় শাক্যসিংহের বুদ্ধত্ব লাভের ২৫০০ তম বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মহৎ-জীবনের শিক্ষা ভারতবাসীর, সমগ্র মানবজাতির, গৌরবের ধন। কিন্তু কেবল গৌরব করিলে কি হয়? তাঁহার শিক্ষা আমাদের আত্মার পুষ্টিসাধন করিলে তবেই আমরা কৃতার্থ ও ধন্য হই। তাঁহার বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মত আমরা না লইতে পারি, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বজীবের হিতকল্পে উৎসৃষ্ট জীবন, সকলেরই অনুকরণীয়।

বুদ্ধোৎসব অসাম্প্রদায়িক ভাবে সকল দেশবাসী দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কারণ সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে, মানবের হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেই আপনাকে তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞাতি বলিয়া মনে করিতে পারেন।

বৈশাখের প্রবাসীতে আমরা যে রঙীন ছবি খানি দিয়াছি, তাহার ঠিক্‌ নামকরণ হয় নাই। উহার প্রকৃত বিষয় রামচন্দ্র কর্তৃক হরধনুভঙ্গের পর রাম ও সীতার মাল্য-বিনিময়।

এই ছবিখানি দেখিলে মনে হয় যেন ইহা অজণ্টাগুহার বা অপর কোন স্থানের কোন প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি। অনেকের এই প্রাচীনত্বসূচনা ভাল লাগে না। আমরা কিন্তু ইহাকে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক মনে করি। একটা দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইতে পারে। আমরা জানি, কোন যুগের চলিত কথাবার্ত্তা বা গদ্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না এমন অনেক অপ্রচলিত পুরাতন শব্দ ঐ যুগেরই কবিতায় পাওয়া যায়। কবিকল্পনাসৃষ্ট কাব্যজগৎ যেন আমাদের অতিপরিচিত আটপৌরে জগৎ হইতে পৃথক্‌ ও দূরবর্ত্তী আর একটি সুন্দর রাজ্য; প্রাচীন কথার প্রয়োগ পরোক্ষ ভাবে এইরূপ ভাবের উদ্রেক করে ও এই ধারণা বদ্ধমূল করে। চিত্রেও যদি কোন উপায়ে এই দূরত্ব সূচিত হয়, তাহা হইলে তাহা ভালই। প্রাচীন বিষয়ের অনেক আধুনিক ছবিতে নরনারী ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদ আধুনিক সৌখীন বাবু ও মহিলাদের ফোটগ্রাফের মত মনে হয়। কোন কোন ছবিতে যেন যাত্রার দলের বা থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মূর্ত্তি ও পরিচ্ছদ অনুকৃত হইয়াছে মনে হয়। এরূপ ছবির ভক্তও অনেকে আছে! কি কবিতা, কি চিত্রশিল্প উভয়ের প্রধান লক্ষ্য রসের উদ্রেক; উহা করুণ, শান্ত, বীর, প্রভৃতি রস হইতে পারে। কোন চিত্রের রাম বা সীতাকে আধুনিক সৌখীন নরনারী বা যাত্রার দলের লোক মনে হইলে হাস্যরসের উদ্রেক হইতে পারে বটে; অন্য রসের কথা বলিতে পারি না।

যথোচিত রসোদ্রেক হিসাবে নন্দলাল বাবুর সীতা-রামের মাল্যবিনিময়ের চিত্রটি আমাদের বিবেচনায় একটি সফল রচনা হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতার একটি বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা স্বামীর সাজ্ঘাতিক পীড়া হওয়ায় নিজ পরিহিত বস্ত্র কেরোসিন তৈলাক্ত করিয়া স্বেচ্ছায় পুড়িয়া মরেন। তাহার মিনিট পনের পরে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। ইহাতে অনেকে মহিলাটিকে “সতী” বলিয়া তিনি যে স্থানে আত্মহত্যা করিয়াছেন, সেই স্থানটির পূজা করিতেছেন। যাঁহারা এইরূপে আত্মহত্যা করেন, তাঁহাদের পতিপ্রেম, সাহস ও যন্ত্রণা-সহিষ্ণুতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রকারে আত্মহত্যা করাই যে এই সকল গুণের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার ইহা আমরা স্বীকার করি না। সহমরণ, অনুমরণ, বা অগ্রমরণ ব্যতীত পতিপ্রেম দেখান যায় না, বা পতিপ্রেম দেখাইবার উহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা ইহাও আমরা স্বীকার করি না। মরিলেই পতির প্রতি, তাঁহার জীবনব্রতের প্রতি, তাঁহার ঔরসজাত সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য করা হইল, কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইহা মনে করিতে পারেন না। যাঁহারা বিধবাদের পুড়িয়া মরার এত প্রশংসা করেন, তাঁহারা বিপত্নীক হইলে পত্নীপ্রেমের পরিচয় স্বরূপ পুড়িয়া মরেন না কেন? না, যন্ত্রণাপূর্ণ তথাকথিত উচ্চ আদর্শটা নারীদের জন্য রাখাই বেশী সুবিধাজনক? এইরূপ লেখার জন্য অনেকে আমাদিগকে অহিন্দু বলিয়া গালি দিবেন। কিন্তু অহিন্দু কে তাহা শাস্ত্রের বিধি না জানিলে বলা বৃথা। এই জন্য আমরা রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীতে উক্ত মহাত্মার সংগৃহীত সতীদাহ বিষয়ক শাস্ত্রবচনাদির বিচার পাঠ করিতে সকলকে অনুরোধ করি। উহার উপর কথা বলিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহারা আর্য্যত্বের বড়াই লইয়াই থাকুন।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, “কুন্তলীন প্রেসে” শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কীচক-গৃহ-গমনে আদিষ্টা সৈরিন্ধ্রী

শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্তৃক প্রবাসীর জন্য অঙ্কিত চিত্র হইতে।

Three-colour blocks by U. Ray & Sons. *Kuntaline Press, Calcutta.*

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১১শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩১৮

৩য় সংখ্যা

গীতাপাঠের ভূমিকা

হোমরের ইলিয়াড ওলিম্পস্ হইতে পারে কিন্তু তাহা হিমালয় নহে। কাব্যজগতের হিমালয় একা কেবল মহাভারত। রামায়ণ? রামায়ণ বড় জোর বিন্ধ্যাচল। রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ। বশিষ্ঠ মুনি বিশ্বামিত্র রাজার মুখের সামনে তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া এই যে একটি কথা স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং" "ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ধিক বল ব্রাহ্মণের তপোবলই বল" এই কথাটিই রামায়ণের মূলমন্ত্র। ত্রেতাযুগে যে পরশুরাম পৃথিবীকে একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য দূরে হাত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই রামায়ণই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। দশরথ রাজার অযোধ্যাপুরী ব্রাহ্মণদিগের বেদাধ্যয়নে ত্রিসন্ধ্যা শব্দায়মান সে মহাপুরীতে ক্ষত্রিয়বীরদিগের ধনুষ্টঙ্কারের কোনো সাড়াশব্দ নাই। রামায়ণের ক্ষত্রিয়কুলতিলক সবেমাত্র দশরথ এবং জনক; তাহার মধ্যে দশরথ রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে জোড়হস্ত, জনকরাজা ব্রাহ্মণেরই সামিল; তা বই, দোঁহার স্বভাব চরিত্রে ক্ষত্রিয়ের কোনো বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে দেখা যায় ঠিক্ তাহার বিপরীত। রামায়ণে বিশ্বামিত্র রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও অনেক তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহাভারতে দ্রোণাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে শস্ত্রকে সার করিয়া কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় পদবীস্থ মহারথী হইয়া আপনাকে পরম শ্লাঘান্বিত মনে করিয়াছিলেন। রামায়ণে বাল্মীকি মুনি ক্ষত্রিয়বলকে হনুমান সাজাইয়া মনে মনে খুবই হাস্য করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; মহাভারতের রচয়িতা ক্ষত্রিয়বলকে দেবতুল্য ভীষ্মে মূর্ত্তিমান করিয়া তাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছেন; তা ছাড়া ক্ষত্রিয়বল যে কিরূপ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী মহাবল—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আগাগোড়া তাহারই জ্বলন্ত কাহিনী।

অর্জ্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অবতার, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আধিদৈবিক অবতার। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দুই ভার আপনার হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন: অর্জ্জুনের রথ চালাইবার ভার, এবং অধর্ম্মের প্ররোচনা বাক্যের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মপথে চালাইবার ভার। শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে অশ্বের রাশ এবং দক্ষিণ হস্তে অর্জ্জুনের মনের রাশ অপ্রমত্তভাবে ধরিয়া থাকিয়া "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এই বাক্যটিকে জগজ্জনের সমক্ষে ফলবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মনুষ্যের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পৃথক্ তিনটি পথ আছে—জ্ঞানের পথ, কর্ম্মের পথ, এবং ভক্তির পথ; তা ছাড়া, একটি মাঝের পথ আছে যাহা ঐ তিন পথের ত্রিবেণীসঙ্গম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শেষোক্ত সঙ্গমতীর্থের পথে চালাইবার অভিপ্রায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রদর্শিত জ্ঞানের পথ হইতে যাত্রারম্ভ করিলেন। বলিলাম সাংখ্যশাস্ত্রের প্রদর্শিত জ্ঞানের পথ—কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে,

সাংখ্যদর্শনের মতামত। মানুষের গায়ের উত্তরীয় বস্ত্র যেমন মূলেই মানুষ নহে, তেমনি সাংখ্যদর্শনের মতামত মূলেই সাংখ্যশাস্ত্রের ভিতরকার কথা নহে। যাহা সাংখ্যশাস্ত্রের ভিতরের কথা তাহা বেদান্তশাস্ত্রেরও ভিতরের কথা। পক্ষান্তরে, সাংখ্যশাস্ত্রের দার্শনিক মতামত এবং বেদান্তশাস্ত্রের দার্শনিক মতামত দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সাংখ্যদর্শন এবং বেদান্তদর্শনের মধ্যে যে জায়গাটিতে মতের অনৈক্য সে জায়গাটি বাদ প্রতিবাদে এরূপ জটিলতাচ্ছন্ন যে, তাহার মধ্যে তোমার আমার ন্যায় সহজ মনুষ্যের দন্তস্ফুট হওয়া ভার; পরন্তু উভয়ের ঐক্যস্থানটিতে বেদান্ত এবং সাংখ্য যেন ঝিনুকের দুইটি কপাট, আর, সেই কপাটের অন্তরালে অমূল্য তত্ত্বজ্ঞানের মুক্তা সংগোপিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে সাংখ্যশাস্ত্রের সেই সার কথাটিই অর্জ্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে সাংখ্যবেদান্তের মর্ম্মগত ঐক্য স্থানটির মোটামুটি ভাবের সংস্বল্প আভাস প্রদর্শন করা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

আমি যদি বলি যে, "গীতাশাস্ত্র আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি," তবে "আমরা" এই যে একটি শব্দ আমি মুখে উচ্চারণ করিলাম এ শব্দটি "আমি" শব্দের বহুবচন তাহাতে তো আর ভুল নাই? তবেই হইতেছে যে, উহার অর্থ অনেক "আমি।" কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমি তো আর অনেক নহি; এই একঘর লোকের মধ্যে আমি একজনমাত্র বই না; "আমি" শব্দের বহুবচন বসিবে তবে কোথায়? তাহার বসিবার স্থান সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? তবে জ্ঞানচক্ষু কিসের জন্য? শোনো তবে বলি: যাহাকে আমি বলিতেছি "আমি" তাহা আমার জ্ঞানের সঙ্গে অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছে, একদণ্ডও সে আমার জ্ঞানের সঙ্গ ছাড়া নহে। আমার জ্ঞান যেখানে যায় সেও সেই খানে যায়। আমার জ্ঞান যখন তোমাতে যায় তখন সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আটপহুরিয়া সঙ্গীটি তোমাতে দেখা যায় তুমির মধ্যে আমি দেখা যায়। আমার জ্ঞানের এই আটপহুরিয়া সঙ্গীটির এক মূর্ত্তি আমি আমাতে দেখিতে পাই, তাহার আর এক মূর্ত্তি তোমাতে দেখিতে পাই, তাহার কবিমূর্ত্তি কবিতে দেখিতে পাই, তাহার শাস্ত্রী মূর্ত্তি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে দেখিতে পাই, এমন কি তাহার অর্দ্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্ত্তি পশু পক্ষীতেও দেখিতে পাই, তাহার সুষুপ্তমূর্ত্তি তরুলতাতেও দেখিতে পাই; তা শুধু না—আমার মধ্যেই, আমার জ্ঞানের সেই আটপহুরিয়া সঙ্গীটির একমূর্ত্তি দেখিতে পাই প্রাতঃকালের ভজনমন্দিরে, আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই মধ্যাহ্নকালের ভোজনমন্দিরে; আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই অপরাহ্নকালের কর্ম্মক্ষেত্রে; আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই সায়ংকালের বন্ধুসহবাসে; আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই রাত্রিকালের বিরামশয্যায়। এ তো দেখিতেছি নানা রঙের নানা আমি; অথচ আবার, "আমি" বলিতে একই সাদা রঙের আমি বুঝায়, তা বই নানা রঙের আমি বুঝায় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, একই সাদা রঙের আমির পক্ষে নানা রঙের আমি হওয়া কিরূপে সম্ভবে? বেদান্ত বলেন—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনি এক অদ্বিতীয় আত্মাতে নানাত্বের ভ্রম হয়। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন ভ্রম বলিয়া যে একটা পদার্থ তাহা আসিবেই বা কোথা হইতে থাকিবেই বা কাহার আশ্রয়ে? বেদান্তদর্শন ইহার উত্তর দ্যান এই যে,—ভ্রম "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং" অর্থাৎ ভ্রম আছে যে তাহাও নহে, নাই যে তাহাও নহে; ভ্রম অস্তিনাস্তি দুয়ের বা'র; তাহা কি যে তাহা বলা যায় না। বেদান্তদর্শন আরো বলেন এই যে, সেই যে ভ্রম বা অবিদ্যা যাহা অস্তিনাস্তি দুয়ের বা'র, তাহা অনাদিকাল জীবকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবেই পূর্ণব্রহ্মও অনাদি, অপূর্ণ জীবও অনাদি, ভ্রমও অনাদি। সাংখ্য বলেন যে, একই চন্দ্র যেমন জলের তরঙ্গে প্রতিবিম্বচ্ছলে নানারূপে ইতস্তত হয়, তেমনি প্রকৃতির বহু বা বিচিত্র কার্য্যকলাপের সাক্ষী স্বরূপ আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনার সেই বুদ্ধিগত প্রতিবিম্বের সহিত আপনাকে জড়াইয়া মনে করেন যে, বুদ্ধি অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াদির এই যে সকল কার্য্য এ সকল কার্য্যের আমিই কর্ত্তা, কিন্তু বাস্তব পক্ষে তিনি কোনো কার্য্যেরই কর্ত্তা নহেন—কার্য্য যাহা করিবার তাহা প্রকৃতিই করে। সাংখ্যের এই যে

একটি কথা "চেতন পদার্থের প্রতিবিম্ব" এ কথাটি কবিতার হিসাবে শুনিতে অতি মনোহর, কিন্তু বিজ্ঞানের হিসাবে এক প্রকার সোনার পাথরবাটি – ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যাহাই হউক না কেন– সাংখ্য বেদান্তের এই সকল চিত্তবিভ্রান্তকারী মতামত এবং বাদপ্রতিবাদের পর্দার আড়ালে উঁকি দিয়া দেখিলে একটি অমূল্য সত্যের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পুরাতন আচার্য্যেরা ভাবের চক্ষে সেই সার সত্যটি দেখিতে পাইয়া তাহার নাম দিয়াছেন "অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত।" অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত যে কাহাকে বলে, তাহার একটা মোটামুটি রকমের আভাস প্রদান করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব; তা বই, তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়া বলিবার অবকাশও আমার নাই, সামর্থ্যও আমার নাই।

মনে কর একজন অসামান্য ওস্তাদ গায়ক গান গাহিতেছেন এমনি চমৎকার, যে, তাহা শ্রবণ করিয়া ঘরসুদ্ধ লোক বলিতেছে যে, এমন মধুর কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত আমরা কোথাও শুনি নাই। একটি প্রবাদ আছে যে, আপনি না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না। গায়ক আপনি মাতিয়াছেন বলিয়াই তিনি শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু গায়ককে কে মাতাইয়া তুলিল? ইহার উত্তর এই যে অন্য কোনো ব্যক্তি গায়ককে মাতাইয়া তোলে নাই গায়ক আপনিই আপনাকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। গায়ক আপনারই কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা আপনি পান করিতে করিতে আপনিই মাতিয়া উঠিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে অন্যকে মাতাইয়া তুলিতেছেন। এখানে দ্বৈতের ভাব দুই ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে অবিকল সমান। নাটমন্দির যেমন গুণী গায়ক এবং গুণগ্রাহী শ্রোতা এই দুয়ের সম্মিলনস্থান, গায়কের মনোমন্দিরও তেমনি গুণী গায়ক এবং গুণগ্রাহী শ্রোতার সম্মিলনস্থান; কেননা গায়ক আপনার গানের আপনি কর্ত্তা শুধু না— পরন্তু আপনার গানের আপনি কর্ত্তা এবং আপনি শ্রোতা দুইই একাধারে। দ্বৈতভাব তো দুই ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া গেল সমান; অদ্বৈতভাব কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ? অদ্বৈতভাবও দুই ক্ষেত্রেই সমান। গায়কের মনোমধ্যে একই ব্যক্তি যেমন গানের কর্ত্তা এবং গানের শ্রোতা, নাটমন্দিরেও তেমনি একই গান যাহা গায়কের কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে তাহাই শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের মন হইতে বাহির হইতেছে। চুম্বকের সান্নিধ্যে লোহা যেমন চুম্বক হইয়া যায়, তেমনি শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের মন গায়কের সঙ্গে গানে যোগ দিয়া গায়ক হইয়া উঠিতেছে। গান এমনি জমিয়া গিয়াছে যে, গায়ক শ্রোতৃবর্গের সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া আপনার গানের আপনি রসাস্বাদন করিতেছেন, আর শ্রোতৃবর্গ গায়কের সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া গানের ফোয়ারা ছুটাইতেছেন। অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত শুধু কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞানের কথা নহে। তাহা সমস্ত জগতের প্রাণের কথা। উপনিষদে আছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তি; আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" নিশ্চয়ই আনন্দ হইতে জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবনধারণ করে এবং আনন্দেতেই অভিনিবিষ্ট হয়। এষহ্যেবানন্দয়াতি। গায়ক যেমন আপনার গানে আপনি মাতোয়ারা হইয়া সভাসুদ্ধ লোককে মাতাইয়া তোলেন, পরমাত্মা তেমনি আপনার আনন্দে আপনি ভোর হইয়া নিখিল জগৎকে আনন্দায়মান করেন। আর একটি কথা এই যে, জনসমাজের ভাগ্য যখন এইরূপ সুপ্রসন্ন হয় যে, বড়'রা ছোটোদিগকে স্নেহচক্ষে দেখিতেছে, ছোটোরা বড়দিগকে ভক্তিচক্ষে দেখিতেছে, সমানে সমানে নানাসূত্রে প্রীতি এবং সদ্ভাব ঘনীভূত হইতেছে, তখন নানা যন্ত্রের নানা ধ্বনির মধ্য হইতে যেমন নব নব রাগের সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত জাগিয়া ওঠে, তেমনি নানা জনের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে মহাশ্চর্য্য একাত্মভাব জাগিয়া ওঠে। সেই এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যসুন্দর মঙ্গলরূপী আত্মার ভাব আপনাতে এবং লোকসমাজে ফুটাইয়া তোলাই সাধনের প্রধান লক্ষ্য; আর সেই এক অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা সাধনের পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে সর্ব্বকালে জাগ্রত রহিয়াছেন এই সত্যটির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য।

সাংখ্যদর্শনের এই যে, "আত্মা অজর অমর এবং স্থির" শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে অর্জ্জুনকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন। যদি বল যে, তাহার প্রমাণ কি?

তবে তাহার উত্তর এই যে, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার বস্তু, তা বই তাহা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবার বস্তু নহে। প্রমাণ শব্দের লৌকিক অর্থ মাপা। পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিবার সময় ক্রেতা দোকানের পুঁজি হইতে একখানি পছন্দসই বস্ত্র বাছিয়া লইয়া তাহা প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার ধার ঘেঁসিয়া এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত আপনার দক্ষিণ হস্ত উত্তরোত্তরক্রমে আরোপ করিয়া বলেন যে,'এ বস্ত্রখানি এত হাত লম্বা। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তোমার দক্ষিণ হস্ত ক-হাত লম্বা; তবে তিনি হাসিয়া বলিবেন "একহাত লম্বা।" তাঁহার এ কথায় সন্তোষ না মানিয়া পার্শ্বস্থিত কোনো তর্কালঙ্কার যদি বলেন যে, "ঐ বস্ত্রখানি ক-হাত লম্বা তাহা যেমন তুমি মাপিয়া দেখিলে, তোমার দক্ষিণ হস্ত যে এক হাত লম্বা তাহা তুমি আমাকে সেইরূপ করিয়া মাপিয়া দেখাও" তবে ক্রেতা তাঁহাকে কি বলিবেন তাহা জানি না; কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার ন্যায় তর্কচূড়ামণিদিগের সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে একটি কথা বলিয়াছেন তাহা আমি অনেক বার অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি; সে কথা এই;

মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥

প্রমাণ ক্রিয়াতে বল সঞ্চার করিতেছে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে যাহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন- সেই সকল মহা পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন—কি? না, ইন্ধন কাষ্ঠে (অর্থাৎ জ্বালানে কাঠে) দাহিকাশক্তি সঞ্চার করে যে অগ্নি সেই অগ্নিকে ইন্ধন কাষ্ঠ দিয়া দগ্ধ করিতে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে যে সকল সার সার জ্ঞানের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে—শ্রোতৃবর্গের উচিত যে, তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন। কেননা শ্রদ্ধাই জ্ঞানের প্রথম সোপান।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আরম্ভমুহূর্ত্তে যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য অনুনাদিত করিয়া দশ শত বীরের দশ শত শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, আর, তাহার পরক্ষণেই ভেরী পণব আনক গোমুখ প্রভৃতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল, তখন কুরুসৈন্য দলে দলে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া—শস্ত্র চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে অর্জ্জুন ধনুক বাগাইয়া ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কাঁহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে একবার তাহা আমি নিরীক্ষণ করিতে চাই উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর।" অর্জ্জুনের এই কথামতে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহামহা রথীদের সম্মুখ ভাগে রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন "দেখ এই কুরু-সবে একত্রে সমবেত।" অর্জ্জুন কি দেখিলেন? দেখিলেন পিতৃগণ পিতামহগণ আচার্য্যগণ মাতুলগণ ভ্রাতৃগণ পুত্রগণ পৌত্রগণ ভাই বন্ধু সুহৃদগণ যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান। দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া বিষণ্ণবদনে বলিলেন "এই সব আত্মীয় স্বজনকে, কৃষ্ণ, যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুখাইয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে কম্প ধরিয়াছে, গাত্র শিহরিয়া উঠিয়াছে, গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, অঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, আমার মস্তক বিভ্রান্ত হইতেছে; আর দৈব লক্ষণ দেখিতেছি বিপরীত বিপরীত। আত্মীয় স্বজনকে রণে হত্যা করিয়া মঙ্গল কিছুই দেখিতেছি না। আমি বিজয় চাহি না, কৃষ্ণ, রাজ্য চাহি না, সুখ সমৃদ্ধি চাহি না। কি হইবে আমার রাজ্যে, কি হইবে ভোগ বাহুল্যে, কি হইবে বাঁচিয়া থাকিয়া? যাহাদের জন্যে আমার রাজ্যের প্রয়োজন, ভোগৈশ্বর্য্যের প্রয়োজন, সুখ সমৃদ্ধির প্রয়োজন তাহারাই—পিতৃপিতামহ আচার্য্য ভাই বন্ধুরাই ধন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান—ইহাদের হস্তে যদি আমার মৃত্যু হয় সেও ভাল তথাপি ইহাদের আমি মৃত্যু কামনা করি না; পৃথিবী কোন্ ছার, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যও ইহাদের হত্যাকার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিয়া কি আমার লাভ হইবে, জনার্দ্দন! এই সকল আততায়িগণকে হত্যা করিলে লাভের মধ্যে পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান সন্ততিগণকে সবান্ধবে হনন করা কোনো ক্রমেই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিয়া কোন্ প্রাণে আমরা সুখী হইব। এরা সবে লোভে হতচেতন হইয়া যদি বা দেখিতেছে না—কিন্তু কুলক্ষয় এবং মিত্রদ্রোহ যে কি ভয়ানক পাপ আমরা তো তাহা জানি! উঃ কি মহাপাপ করিতে আমরা

রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব দান।

শ্রীযুক্ত রবিবর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি অনুসারে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

প্রবৃত্ত হইয়াছি ! রাজ্যসুখের লোভে পড়িয়া আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া দিয়া এবং প্রতিবিধানের কোনো চেষ্টা না করিয়া কৌরবগণের হস্তে যুদ্ধে নিহত হওয়াই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।” এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিয়া শোকের আবেগে বসিয়া পড়িলেন। অর্জ্জুনকে এইরূপ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণ-লোচন এবং বিষাদাচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন “যুদ্ধস্থলে আর্য্যবিগর্হিত স্বর্গের পথরোধকারী এ পাপ কোথা হইতে তোমাতে আসিয়া উপস্থিত হইল? এরূপ হতোদ্যম ভাব কাপুরুষদিগকেই শোভা পায়, তোমাকে শোভা পায় না কৌন্তেয়। ক্ষুদ্রজনোচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া ওঠ, পরন্তপ।” অর্জ্জুন বলিলেন “ভীষ্ম এবং দ্রোণ উভয়েই আমার পূজার্হ তাঁহারা যদি বা আমার প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করেন কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি কেমন করিয়া শস্ত্র নিক্ষেপ করিব? মহানুভাব গুরুগণকে হত্যা করিয়া রক্তকলুষিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করা অপেক্ষা গুরুহত্যা পাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করা শতগুণ শ্রেয়। এ যুদ্ধে আমার পক্ষে জয় ভাল কি পরাজয় ভাল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে হত্যা করিয়া বাঁচিয়া সুখ নাই তাহারাই যুদ্ধার্থে সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার স্বাভাবিক বলবীর্য্য কৃপা-দৌর্ব্বল্যে পর্য্যাকুলিত হইয়াছে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি কি আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে নিশ্চিত মতে বলো আমি তোমার প্রণত শিষ্য, আমাকে শিক্ষা প্রদান কর। যে শোক আমার সর্ব্বশরীর শোষণ করিতেছে—তাহার উপশম হইবে কেমন করিয়া তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমি যদি পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হই তাহাতেই বা কি, আর, আমি যদি স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করি তাহাতেই বা কি—এ শোক কিছুতেই শান্তি মানিবার নহে। আমি যুদ্ধ করিব না।” এই বলিয়া অর্জ্জুন বাক্যে ক্ষান্ত হইলেন।

উভয় সেনার মধ্যে অর্জ্জুনকে এইরূপ বিষাদে ম্রিয়মাণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে সাংখ্যশাস্ত্রের কয়েকটি সার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন “অশোচ্য-দিগের জন্য শোক করিতেছ, অথচ মুখে জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করিতেছ; এটা জেনো স্থির যে, লোকের মরণ বাঁচনে পণ্ডিতেরা শোক করেন না। শরীরধারীর শরীরে শৈশব যৌবন জরা যেমন অবশ্যম্ভাবী, দেহান্তরপ্রাপ্তিও তেমনি অবশ্যম্ভাবী; ধীর ব্যক্তি তাহাতে মুহ্যমান হ'ন না। আত্মা কোনো কালে জন্মেনও নাই মরেনও না,—শরীর হত হইলে আত্মা হত হ'ন না। শস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইয়া নষ্ট করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, অচল, সনাতন। ইহাকে এইরূপ জানিয়া পণ্ডিতেরা ইহার জন্য শোক করেন না। অতএব সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয় দুইই সমান জানিয়া যুদ্ধে কৃতসংকল্প হও তাহা হইলে পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এ যাহা তোমাকে আমি বলিলাম এ বুদ্ধি সাংখ্যের মধ্যে পাওয়া যায়, তা ছাড়া আরো এক প্রকার বুদ্ধি যোগের মধ্যে পাওয়া যায় যে বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে কর্ম্মবন্ধন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে। সে বুদ্ধি কিরূপ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।”

এখানে একটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত যে, বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, শুনিতেছেন অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ যদি আর কেহ হইতেন, আর, অর্জ্জুন যদি সামান্য একজন শোক-সন্তপ্ত গৃহস্থ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলেন তাহার একটি কথাও যদিচ অসত্য নহে, কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও বিদ্যুতের আলোক যেমন একগুণ অন্ধকারকে দশগুণ করিয়া তোলে, তেমনি বক্তার মুখ-বিনিঃসৃত জ্ঞানের কথা শ্রোতার একগুণ প্রাণের বেদনাকে দশ গুণ করিয়া তুলিত, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। যে মানুষ স্নেহের পাত্রটিকে বা প্রাণতুল্য প্রিয় বন্ধুকে জন্মের মতো হারাইয়া জগৎসংসার অন্ধকার দেখিতেছে—তত্ত্বজ্ঞানের কথা তাহার নিকটে নিতান্তই বাজে-কথার সামিল। সে বলিবে যে, “আত্মা জন্মমৃত্যুবিহীন নিত্য নির্বিকার তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনো প্রয়োজন নাই—যাহাকে আমি হারাইয়াছি তাহাকেই আমার প্রয়োজন।” ইহার উত্তরে উপদেষ্টা যদি বলেন যে, “অনিত্য বস্তুর উপরে প্রীতি স্থাপন করিলে সকলেরই এইরূপ

দশা হয়, তোমার শুধু নহে।" এ কথার উত্তরে সে ব্যক্তি মুখে না বলুক্- মনে মনে নিশ্চয়ই বলিবে যে, "নেই মামা অপেক্ষা কানামামা ভাল; চিরস্থায়ী অন্ধকার অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী আলোক ভাল: অবিনাশী আত্মা হইয়া অনন্তকাল বিচ্ছেদযন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা এক মুহূর্ত্ত যদি আমি সেই হাসিমুখখানি আর একবার চক্ষে দেখিতে পাই তবে কি ধন না লাভ করি; সে ধনের তুলনায় স্বর্গই বা কি, আর মোক্ষই বা কি, সবই আমার নিকটে তৃণতুল্য।" এ রোগের ঔষধ যদি কিছু থাকে তবে, সে ঔষধ বিবেক, বৈরাগ্য এবং সংযম। অবিবেকী ব্যক্তি যে ক্ষণিক সুখের তুলনায় আত্মাকে অবিনাশী অন্ধকার মনে করিবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। রাম সংস্কৃত ভাষার ক-অক্ষরও জানে না এরূপ স্থলে শ্যাম যদি তাহাকে সরস সংস্কৃত পদ্য পাঠ করিয়া শুনায়— তবে রাম তো বলিবেই যে, "আমার কানের কাছে সঙস্কিড়িমিড়ি করিও না।" প্রকৃত কথা এই যে আত্মা শুধু যে কেবল আছে মাত্র তাহা নহে—আত্মা জ্ঞান প্রেম এবং আনন্দের খনি। পৃথিবী কত যে যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া আত্মাকে পাইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অবিদিত নাই। আত্মা পৃথিবীর অন্ধকারের আলো- মরুভূমির উদ্যান। আত্মাকে পাইয়া পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত ধন রত্ন একদিকে আর, আত্মা একদিকে- আত্মার তুলনায় সে সব ধন রত্ন অকিঞ্চিৎকর ছাই ভস্ম। আত্মা যদি কেবল আছে মাত্র হইত তাহা হইলে আত্মাকে জানিবার জন্য কাহারো কোনো মাথাব্যথা হইত না। বেদান্তশাস্ত্র বলেন যে, আত্মা অস্তি, ভাতি এবং প্রিয় এই তিন সাধনের ধন একাধারে। অস্তি কিনা আত্মার স্থির প্রতিষ্ঠা, ভাতি কিনা আত্মার জ্ঞানালোক, প্রিয় কিনা আত্মার প্রেমামৃত। পুষ্করিণীতে পঙ্ক জমিয়া তাহার জল যখন অব্যবহার্য্য হয়, তখন পুষ্করিণীকে যেমন ঝালানো আবশ্যক, তেমনি, বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযম দ্বারা আত্মার পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক; তা নহিলে আত্মা সাধকের ভোগে আসিতে পারে না। মোট সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যেমন ব্যাকরণ অলঙ্কার কাব্য সাহিত্য সবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তেমনি সমগ্র আত্মাতে জ্ঞান বীর্য্য প্রেম আনন্দ সবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে; এটা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানা উচিত যে, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ-জ্ঞানকে আয়ত্ত করা চাই কারক বিভক্তি সর্ব্বনাম উপসর্গ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিধিমতে পরিচয় লাভ করা চাই; তাহার পরে সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া ব্যাকরণজ্ঞানকে কিরূপে ভাষার ব্যবহারকার্য্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হাতে কলমে করিয়া শেখা চাই; তা নইলে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদনে বিদ্যার্থী ব্যক্তির অধিকার জন্মিতে পারে না। বিদ্যার্থী ব্যক্তি যদি আচার্য্যকে বলেন যে, "একে তো ব্যাকরণ শাস্ত্রে কোনো রসকস নাই তাহাতে আবার শব্দের ইটকাট জড়ো করিয়া বাক্যের ভিত গাঁথিয়া তোলা এক প্রকার রাজমজুরের কাজ—তাহাতে আমার মন যাইতেছে না, আমি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক পাঠ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাই আমাকে অধ্যয়ন করা'ন" তবে এটা যেমন বিদ্যার্থী ব্যক্তির দুরাকাঙ্ক্ষা, তেমনি সাধক যদি আচার্য্যকে বলেন যে, "তত্ত্বজ্ঞান অতিশয় নীরস, শমদমাদির সাধন অতিশয় কঠোর; এ সকলেতে আমার মন যাইতেছে না—যাহাতে আমি আধ্যাত্মিক প্রেমানন্দ হাত বাড়াইয়া পাইতে পারি, সেই বিষয়ে আমাকে সদুপদেশ প্রদান করুন," এটাও উহা অপেক্ষা বেশী বই কম দুরাকাঙ্ক্ষা নহে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে সাধনের পাঁচটি সোপান-পংক্তি উত্তরোত্তর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপঃ প্রথম পইটা শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় পইটা বীর্য্য, তৃতীয় পইটা স্মৃতি, চতুর্থ পইটা সমাধি, পঞ্চম পইটা প্রজ্ঞা। গীতার প্রথম উপক্রমেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহার প্রতি শ্রদ্ধাই সাধনের প্রথম পইটা, যদিচ সে কথাটি হোমিওপাথিক বটিকার ন্যায় বিন্দু পরিমাণ; সে কথা এই যে, আত্মা জন্মমৃত্যুবিহীন নিত্য নির্ব্বিকার। সংক্ষেপে- আত্মার ধ্রুব অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সাধনের প্রথম পইটা। এ বিশ্বাস লোকের মুখে শোনা কথায় বিশ্বাস নহে- পরন্তু আপনার অন্তরতম প্রদেশের জানা কথায় বিশ্বাস। পরিব্রাজক যেমন এটা নিশ্চয় জানে যে সে যখন গন্তব্য পথে চলিতেছে তখন আকাশস্থিত চন্দ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে

না—সাধক তেমনি এটা নিশ্চয় জানিতেছেন যে, তাঁহার শরীর মন এবং বাহিরের বস্তু সকল যখন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন সেই পরিবর্ত্তনের সাক্ষীরূপী আত্মা উহাদের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন না—আত্মা স্থির রহিয়াছেন। এ কথা অন্যের মুখে শোনা কথা নহে—পরন্তু সাধকের আপনার অন্তরের জানা কথা। এইরূপ আপনার অন্তরের জানা কথার উপরে ভরপূর বিশ্বাস স্থাপন করাই সাধনের প্রথম পইটা। দ্বিতীয় পইটা বীর্য্য, অর্থাৎ জ্ঞানের কথাকে কার্য্যে ফলাইয়া তুলিতে হইলে যেরূপ বীরত্বের প্রয়োজন হয় সেইরূপ বীরত্ব। ভাব এই যে, শমদমাদির সাধনে এবং অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে অপ্রতিহত উদ্যম এবং উৎসাহই সাধনের দ্বিতীয় পইটা। তৃতীয় পইটা স্মৃতি; ভাব এই যে, শমদমাদি এবং নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন যখন অভ্যাস গতিকে সাধকের স্মরণে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায় তখন আত্মাতে একপ্রকার অনুপম আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রসন্নতার সঞ্চার হয়; এইরূপ আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রসাদই সাধনের তৃতীয় পইটা। সাধনের চতুর্থ পইটা সমাধি অর্থাৎ একাগ্রতা। ভাব এই যে, সাধকের মনে যখন আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রসাদ পরিস্ফুট হয়, তখন সাধকের মন লক্ষ্য-বিষয়ে অবিচলিত ভাবে নিবিষ্ট হয়। এইরূপ লক্ষ্য বিষয়ে মনের স্থৈর্য্যই সাধনের চতুর্থ পইটা। পঞ্চম পইটা প্রজ্ঞা, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান। ভাব এই যে, আতস পাথরের অর্থাৎ magnifying glassএর মধ্য দিয়া সূর্য্য রশ্মিকে কোনো দাহ্য পদার্থের উপরে কেন্দ্রীভূত করিলে সেই দাহ্য পদার্থের ভিতরে যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরবাহির অগ্নিময় করিয়া তোলে—তেমনি, আত্মশক্তিসহকারে মন লক্ষ্য বস্তুতে তদ্গতভাবে নিবিষ্ট হইলে সেই লক্ষ্য বস্তুতে জ্ঞানাগ্নি প্রবেশ করিয়া লক্ষ্য বস্তুকে জ্ঞানময় করিয়া তোলে। এইরূপ অবস্থায় সাধকের পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান সকল বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করে এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বজগৎ দর্শন করে; ইহারই নাম যোগ; ইহাই সাধনের পঞ্চম পইটা;—সাধক যখন এই পঞ্চম পইটাতে উত্তীর্ণ হ'ন তখন তাঁহার মনে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। গীতা শাস্ত্রে দুইরূপ আনন্দের উল্লেখ আছে;—প্রথম, মাঝপথের আনন্দ বা সাধনের আনন্দ; দ্বিতীয়, গম্যস্থানের আনন্দ বা সিদ্ধিলাভের আনন্দ। মাঝপথের আনন্দ উল্লিখিত হইয়াছে এইরূপ:—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥"

সাধক রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনাকে আপনার বশে রাখিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করে। আত্মপ্রসাদে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লক্ষ্য বস্তুতে স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়। ভাব এই যে, বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযম দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে আত্মার সহজ আনন্দ আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়, আর সেই সহজ আনন্দের গুণে সাধক যাহাতে মন বসাইতে ইচ্ছা করেন তাহাতেই তাঁহার মন ভরপূর নিবিষ্ট হয়। এই গেল সাধকের মাঝপথের আনন্দ। গম্যস্থানের আনন্দ উল্লিখিত হইয়াছে এইরূপ;

সুখমাত্যন্তিকং যৎ তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

সেখানে অর্থাৎ যোগের অবস্থায় সাধক বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ যে কাহাকে বলে তাহা জানিতে পা'ন; আর সেখানে স্থিত হইলে সাধক তত্ত্ব হইতে বিচলিত হ'ন না। সেখানে সাধক যাহা লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা অপর কোনো লাভকেই তিনি অধিক মনে করেন না; আর, সেখানে স্থিত হইয়া গুরু বিপদেও বিচলিত হ'ন না। আনন্দ সম্বন্ধে মাঝে এ যাহা আমি কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম, ইহা পঞ্চম পইটার কথা। গোড়ায় আমি যাহা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি তাহা সবেমাত্র প্রথম পইটার কথা। গীতার দ্বিতীয় পইটায় কঠোর কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের বিধেয়তা উপদিষ্ট হইয়াছে। যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হ'ন এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দূরবীণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত। আগামী বারে কঠোর কর্ত্তব্য সাধনের পদ্মানদী পার হইবার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্‌রূপ

মারাঠি হিন্দি প্রভৃতি অধিকাংশ গৌড়ীয় ভাষায় শব্দকে আড় করিয়া বলিবার একটা প্রথা আছে। যেমন হিন্দিতে "কুত্তা" সহজরূপ, "কুত্তে" বিকৃতরূপ। "ঘোড়া" সহজরূপ "ঘোড়ে" বিকৃতরূপ। মারাঠিতে ঘর ও ঘরা, বাপ ও বাপা, জীভ ও জীভে ইহার দৃষ্টান্ত।

এই বিকৃতরূপকে ইংরাজী পারিভাষিকে oblique form বলা হয়; আমরা তাহাকে তির্য্যক্‌রূপ নাম দিব।

অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার ন্যায় বাংলাভাষাতেও তির্য্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত আছে।

যেমন বাপা, ভায়া (ভাইয়া), চাঁদা, লেজা, ছাগলা, পাগলা, গোরা, কালা, আমা, তোমা, কাগাবগা (কাকবক), বাদলা, বামনা, কোণা ইত্যাদি।

সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় এই তির্য্যক্‌রূপের প্রচলন অধিক ছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত প্রাচীন বাক্য হইতে বুঝা যাইবে। "নরা গজা বিশে শয়।"

"গণ" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ "গণা" কেবলমাত্র "গণাগুষ্ঠি" শব্দেই টিঁকিয়া আছে। "মুড়া" শব্দের সহজরূপ "মুড়" "মাথামোড় খোঁড়া" "ঘাড় মুড় ভাঙা" ইত্যাদি শব্দেই বর্ত্তমান। যেখানে আমরা বলি "গড়াগড়া যুমচ্ছে" সেখানে এই "গড়া" শব্দকে "গড়" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। "গড় হইয়া প্রণাম করা" ও "গড়ানো" ক্রিয়াপদে "গড়" শব্দের পরিচয় পাই। "দেব" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ "দেবা" ও "দেয়া"। মেঘ ডাকা ও ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে "দেয়া" শব্দের ব্যবহার আছে। "যেমন দেবা তেমনি দেবী" বাক্যে "দেবা" শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলায় কাব্যভাষায় "সব" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ "সবা" এখনো ব্যবহৃত হয়। যেমন আমাসবা, তোমা সবা, সবারে। কাব্যভাষায় "জন" শব্দের তির্য্যক্‌রূপ "জনা"। সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে "জন" শব্দের যোগ হইলে চলিত ভাষায় তাহা অনেক স্থলেই "জনা" হয়। একজনা, দুইজনা ইত্যাদি। "জনাজনা" শব্দের অর্থ প্রত্যেক জন। আমরা বলিয়া থাকি "একো জনা একো রকম।"

তির্য্যক্‌রূপে সহজরূপ হইতে অর্থের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা ঘটে এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। "হাত" শব্দকে নির্জ্জীব পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহার কালে তাহাকে তির্য্যক করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন জামার হাতা, অথবা পাকশালার উপকরণ হাতা। "পা" শব্দের সম্বন্ধেও সেইরূপ "চৌকীর পায়া।" "পায়া ভারি" প্রভৃতি বিদ্রূপসূচক বাক্যে মানুষের সম্বন্ধে "পায়া" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সজীব প্রাণী সম্বন্ধে যাহা খুর, খাট প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাই খুরা। কান শব্দ কলস প্রভৃতির সংস্রবে প্রয়োগ করিবার বেলা "কানা" হইয়াছে। "কাঁধা" শব্দও সেইরূপ।

খাঁটি বাংলাভাষার বিশেষণ পদগুলি প্রায়ই হলন্ত নহে একথা রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা ব্যাকরণে প্রথম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ "কাণ" বাংলায় তাহা "কানা"। সংস্কৃত "খঞ্জ" বাংলায় খোঁড়া। সংস্কৃত "অর্দ্ধ," বাংলা আধা। শাদা, রাঙা, বাকা, কালা, খাঁদা, পাকা, কাঁচা, মিঠা ইত্যাদি বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। "আলো" বিশেষ্য, "আলা" বিশেষণ। "ফাঁক" বিশেষ্য "ফাঁকা" বিশেষণ। "মা" বিশেষ্য, "মায়া" (মায়া মানুষ) বিশেষণ। এই আকার প্রয়োগের দ্বারা বিশেষণ নিষ্পন্ন করা ইহাও বাংলাভাষায় তির্য্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মারাঠিতে তির্য্যক্‌রূপে আকার ও একার দুই স্বরবর্ণের যেমন ব্যবহার দেখা যায় বাংলাতেও সেইরূপ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে আকারের ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি মাত্র শব্দে বদ্ধ হইয়া আছে; তাহা সজীব ভাবে নাই, কিন্তু একারের ব্যবহার এখনও গতিবিশিষ্ট।

"পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়" এই বাক্যে "পাগলে" ও "ছাগলে" শব্দে যে একার দেখিতেছি তাহা উক্তপ্রকার তির্য্যক্‌রূপের একার। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর তির্য্যক্‌রূপ কোন্ কোন্ স্থলে ব্যবহৃত হয় আমরা তাহার আলোচনা করিব।

সামান্য বিশেষ্য। বাংলায় নাম সংজ্ঞা (Proper names) ছাড়া অন্যান্য বিশেষ্যপদে যখন কোন চিহ্ন থাকে না, তখন তাহাদিগকে সামান্য বিশেষ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যেমন, বানর, টেবিল, কলম, ছুরি, ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিশেষ্য পদগুলির দ্বারা সাধারণভাবে সমস্ত বানর টেবিল চৌকি ছুরি বুঝাইতেছে, কোনো বিশেষ এক বা একাধিক বানর টেবিল চৌকি ছুরি বুঝাইতেছে না বলিয়াই ইহাদিগকে সামান্য বিশেষ্য পদ নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা আবশ্যক ইংরাজি common names ও বাংলা সামান্য বিশেষ্যে প্রভেদ আছে। বাংলায় আমরা যেখানে বলি "এইখানে ছাগল আছে" সেখানে ইংরাজিতে বলে "There is *a* goat here" কিম্বা "There are goats here"। বাংলায় এস্থলে সাধারণভাবে বলা হইতেছে ছাগলজাতীয় জীব আছে। তাহা কোনো একটি বিশেষ ছাগল বা বহু ছাগল তাহা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই কিন্তু ইংরাজিতে এরূপ স্থলেও বিশেষ্যপদকে article যোগে বা বহুবচনের চিহ্নযোগে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইংরাজিতে যেখানে বলে "There is a bird in the cage" বা "There are birds in the cage" আমরা সেখানে উভয়স্থলেই বলি "খাঁচায় পাখী আছে"—কারণ, এস্থলে খাঁচার পাখী এক কিম্বা বহু তাহা বক্তব্য নহে কিন্তু খাঁচার মধ্যে পাখী নামক পদার্থ আছে ইহাই বক্তব্য। এই কারণে, এ সকল স্থলে বাংলায় সামান্য বিশেষ্য পদই ব্যবহৃত হয়।

এই সামান্য বিশেষ্যপদ যখন জীববাচক হয় কেবল তখনই তাহা তির্য্যক্‌রূপ গ্রহণ করে। কখনো বলি না, "গাছে নড়ে," বলি "গাছ নড়ে।" কিন্তু "বানরে লাফায়" বলিয়া থাকি। কেবল কর্তৃকারকেই এই শ্রেণীর তির্য্যক্‌রূপের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু তাহার বিশেষ নিয়ম আছে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্য বিশেষ্যপদ কর্ত্তৃকারকে তির্য্যক্‌রূপ ধারণ করে। "এই ঘরে ছাগলে আছে" বলিনা কিন্তু "ছাগলে ঘাস খায়" বলা যায়। বলি "পোকায় কেটেছে," কিন্তু অকর্ম্মক "লাগা" ক্রিয়ার বেলায় "পোকা লেগেছে।" "তাকে ভূতে পেয়েছে" বলি, "ভূত পেয়েছে" নয়। পাওয়া ক্রিয়া সকর্ম্মক।

কিন্তু এই সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক শব্দটি এখানে সম্পূর্ণ খাটিবে না। ইহার পরিবর্ত্তে বাংলায় নূতন শব্দ তৈরি করা আবশ্যক। আমরা এ স্থলে "সচেষ্টক" ও "অচেষ্টক" শব্দ ব্যবহার করিব। কারণ প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সংস্রবে উহ্য বা ব্যক্তভাবে কর্ম্ম থাকা চাই কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর ক্রিয়ার কথা বলিতেছি তাহার কর্ম্ম না থাকিতেও পারে। "বানরে লাফায়" এই বাক্যে "বানর" শব্দ তির্য্যক্‌রূপ গ্রহণ করিয়াছে, অথচ "লাফায়" ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই। কিন্তু "লাফানো" ক্রিয়াটি সচেষ্টক।

"আছে" এবং "থাকে" এই দুইটি ক্রিয়ার পার্থক্য চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, "আছে" ক্রিয়াটি অচেষ্টক কিন্তু "থাকে" ক্রিয়া সচেষ্টক—সংস্কৃত "অস্তি" এবং "তিষ্ঠতি" ইহার প্রতিশব্দ। "আছে" ক্রিয়ার কর্তৃকারকে তির্য্যক্‌রূপ স্থান পায় না—"ঘরে মানুষে আছে" বলা চলে না কিন্তু "এ ঘরে কি মানুষে থাকতে পারে" এরূপ প্রয়োগ সঙ্গত।

আসা এবং যাওয়া ক্রিয়াটি যদিও সাধারণত সচেষ্টক, তবু তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়মটি ভালরূপ খাটে না। আমরা বলি "সাপে কামড়ায়" বা "কুকুরে আঁচড়ায়" কিন্তু "সাপে আসে" বা "কুকুরে যায়" বলি না। অথচ "যাতায়াত করা" ক্রিয়ার অর্থ যদিচ যাওয়া আসা করা, সেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। আমরা বলি "এ পথ দিয়ে মানুষে যাতায়াত করে, বা যাওয়া আসা করে" বা "আনাগোনা করে।" কারণ, "করে" ক্রিয়াযোগে আসা-যাওয়াটা নিশ্চিত ভাবেই সচেষ্টক হইয়াছে। "খেতে যায়" বা "খেতে আসে" প্রভৃতি সংযুক্ত ক্রিয়াপদেও এ নিয়ম অব্যাহত থাকে—যেমন, "এই পথ দিয়ে বাঘে জল খেতে যায়।"

"সকল" ও "সব" শব্দ সচেষ্টক ও অচেষ্টক উভয় শ্রেণীর ক্রিয়া সহযোগেই তির্য্যক্‌রূপ লাভ করে। যথা, এ ঘরে সকলেই আছেন বা সবাই আছে।

ইহার কারণ এই যে, "সকল" ও "সব" শব্দ দুটি বিশেষণ পদ। ইহারা তির্য্যক্‌রূপ ধারণ করিলে তবেই বিশেষ্যপদ হয়। "সকল" ও "সব" শব্দটি হয় বিশেষণ, নয় অন্য শব্দের যোগে বহুবচনের চিহ্ন—কিন্তু "সকলে" বা "সবে" বিশেষ্য। কথিত বাংলায় "সব" শব্দটি বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে দ্বিগুণ ভাবে তির্য্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হয়—

প্রথমত "সব" হইতে হয় "সবা" তাহার পরে পুনশ্চ তাহাতে এ যোগ হইয়া হয় "সবাএ"। এই "সবাএ" শব্দকে আমরা "সবাই" উচ্চারণ করিয়া থাকি।

"জন" শব্দ "সব" শব্দের ন্যায়। বাংলায় সাধারণতঃ "জন" শব্দ বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়। একজন লোক, দুজন মানুষ ইত্যাদি। বস্তুত মানুষের পূর্ব্বে সংখ্যা যোগ করিবার সময় আমরা তাহার সঙ্গে "জন" শব্দ যোজনা করিয়া দিই। পাঁচ মানুষ কখনই বলি না, পাঁচজন মানুষ বলি। কিন্তু এই "জন" শব্দকে যদি বিশেষ্য করিতে হয় তবে ইহাকে তির্য্যক্‌রূপ দিয়া থাকি। দুজনে, পাঁচজনে ইত্যাদি। "সবাএ" শব্দের ন্যায় "জনাএ" শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে—এক্ষণে ইহা "জনায়" রূপে লিখিত হয়।

বাংলায় "অনেক" শব্দটি বিশেষণ। ইহাও বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে "অনেকে" হয়। সর্ব্বত্রই এ নিয়ম খাটে। "কালোএ (কালোয়) যার মন ভুলেছে শাদাএ (শাদায়) তার কি করবে।" এখানে কালো ও শাদা বিশেষণপদ তির্য্যক্‌রূপ ধরিয়া বিশেষ্য হইয়াছে। "অপর" "অন্য" শব্দ বিশেষণ, কিন্তু "অপরে" "অন্যে" বিশেষ্য। "দশ" শব্দ বিশেষণ, "দশে" বিশেষ্য (দশে যা বলে)।

নামসংজ্ঞা সম্বন্ধে এপ্রকার তির্য্যক্‌রূপ ব্যবহার হয় না—কখনো বলি না, "যাদবে ভাত খাচ্চে।" তাহার কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; বিশেষ নাম কখনো সামান্য বিশেষ্য পদ হইতে পারে না। বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে "রামে মারলেও মরব রাবণে মারলেও মরব।" বস্তুত এখানে "রাম" ও "রাবণ" সামান্য বিশেষ্য পদ—এখানে উক্ত দুই শব্দের দ্বারা দুই প্রতিপক্ষকে বুঝাইতেছে। কোন বিশেষ রাম রাবণকে বুঝাইতেছে না।

তির্য্যক্‌রূপের মধ্যে প্রায়ই একটি সমষ্টিবাচকতা থাকে। যথা "আত্মীয়ে তাকে ভাত দেয় না।" এখানে আত্মীয়-সমষ্টিই বুঝাইতেছে। এইরূপ "লোকে বলে।" এখানে "লোকে" অর্থ সর্ব্বসাধারণে। "লোক বলে" কোনো মতেই হয় না। সমষ্টি যখন বুঝায় তখন "বানরে বাগান নষ্ট করিয়াছে" ইহাই ব্যবহার্য্য—"বানর করিয়াছে" বলিলে বানর দল বুঝাইবে না।

সংখ্যাসহযোগে বিশেষ্যপদ যদিচ সামান্যতা পরিহার করে তথাপি সকর্ম্মক রূপে তাহাদের প্রতিও একার প্রয়োগ হয়, যেমন "তিন পেয়াদায় যুক্তি করে গর্ত্তে ঢুকল," এমন কি "আমরা" "তোমরা" "তারা" ইত্যাদি সর্ব্বনাম বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্যপদ বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও সংখ্যার সংস্রবে তাহারা তির্য্যক্‌রূপ গ্রহণ করে। যেমন, "তোমরা দুই বন্ধুতে" "সেই দুটো কুকুরে" ইত্যাদি।

অনেকের মধ্যে বিশেষ একাংশ যখন এমন কিছু করে অপরাংশ যাহা করে না তখন কর্ত্তৃপদে তির্য্যক্‌রূপ ব্যবহার হয়। যথা "তাদের মধ্যে দুজনে গেল দক্ষিণে"—এরূপ বাক্যের মধ্যে একটা অসমাপ্তি আছে—অর্থাৎ আর কেহ আর কোনো দিকে গিয়াছে না বাকি কেহ যায় নাই এরূপ বুঝাইতেছে। যখন বলি "একজনে বল্লে, হাঁ" তখন "আর একজন বল্লে না" এমন একটা কিছু শুনিবার অপেক্ষা থাকে। কিন্তু যদি বলা যায় "একজন বল্লে, হাঁ" তবে সেই সংবাদই পর্য্যাপ্ত।

তির্য্যক্‌রূপ হলন্ত শব্দে একার যোজনা সহজ, যেমন বানর বানরে। (বাংলায় বানর শব্দ হলন্ত)। অকারান্ত, আকারান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের সঙ্গেও "এ" যোজনায় বাধা নাই—"ঘোড়াএ" (ঘোড়ায়) "পেঁচোএ" (পেঁচোয়) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত অন্য স্বরান্ত শব্দে "এ" যোগ করিতে হইলে "ত" ব্যঞ্জনবর্ণকে মধ্যস্থ করিতে হয়। যেমন "গরুতে," ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষে যখন ব্যঞ্জনকে আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ স্বর থাকে, তখন "ত"কে মধ্যস্থরূপে প্রয়োজন হয় না। যেমন উই, উইএ, (উইয়ে), বউ, বউএ (বউয়ে) ইত্যাদি। একথা মনে রাখা আবশ্যক বাংলায় বিভক্তিরূপে যেখানে একার প্রয়োগ হয়, সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রই বিকল্পে "তে" প্রয়োগ হইতে পারে। এই জন্য "ঘোড়ায় লাথি মেরেছে" এবং "ঘোড়াতে লাথি মেরেছে" দুইই হয়। "উইয়ে নষ্ট করেছে" এবং "উইতে" বা "উইয়েতে নষ্ট করেছে।" হলন্ত শব্দে এই "তে" বিভক্তি গ্রহণকালে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনে পুনশ্চ একার যোগ করিতে হয়। যেমন "বানরেতে," "ছাগলেতে"।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নির্ব্বাণ

উপনিষদে যে জীবনের আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই পরাকাষ্ঠা বুদ্ধেতে। উপনিষৎসমূহ, দর্শনাদি, কবিগণ, যাহা কেবল কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত,—শাক্যসিংহ তাহাই জীবনে প্রকৃত সাধন করিলেন। তিনি যাহা সাধন করিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন। তিনি যাহা মনে চিন্তা ও হৃদয়ে অনুভব করিতেন, আমাদের মত কেবল তাহাই প্রচার করেন নাই। বংশসুত্তে আছে,—"যাহা বলিতেন, তাহা করিতেন।"—৫।১৫।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে,—

"ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখম্।" অর্থাৎ যোগাগ্নিময় শরীর হইলে, রোগ জরা, দুঃখ থাকে না।—২।১৩।

ইহাই কি নির্ব্বাণ নহে?

উপনিষদের নানাস্থানে আত্মার যে অবস্থার কথা বর্ণিত আছে, তাহার সহিত নির্ব্বাণের কোনও প্রভেদ নাই। যথা,—ছান্দোগ্য। ৭।২৬।২; ৮।৪।১; ৮।৭।১,৩; ৮।১৫।১। বৃহৎ। ৪।৪।২২,২৩। শ্বেত। ১।৭,৮,১২; ৩।১২,১৪,১৫। কঠ। ২।১১; ৩।৮; ৬।১৪,১৫। ঈশ। ১,৬,৭। প্রশ্ন। ৪।৫; ৬।১৬। মুণ্ডক। ২।১।১০; ২।২।৮; ৩।২।৭। প্রভৃতি।

নির্ব্বাণ শব্দটী মুক্তিব্যঞ্জক। শাক্যমুনির পূর্ব্বে বেদান্তে, ও পরে পুরাণ ও তন্ত্রাদিতেও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ শব্দ হইতেই "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে।

জীবনের অশেষ দুঃখের ভিতরে সুখের কল্পনা ও আশা না রাখিলেই, দুঃখের অভাব হইল। সুখের আশাই যদি না থাকে, তবে দুঃখ জন্মিবে কোথা হইতে?

সেই সিদ্ধপুরুষ বলিয়াছেন,—

"আমি-র স্বার্থ ও সুখ-বাসনা দমন করিতে পারিলেই পূর্ণ সুখ,—আনন্দ।"—উদানবগ্‌গ। ৩০।৫।২১।

বুদ্ধের শিষ্যগণ সদাই জপেন,—"অনাত্মা দুঃখম্ অনন্তং।" অর্থাৎ, এই দেহ আত্মা নহে। দেহকে আত্মা জ্ঞান করা, অনন্ত দুঃখের কারণ।" মানবের একমাত্র কার্য্য, ঐ অনন্ত দুঃখকে ব্যর্থ হইতে না দিয়া, তাহার সুব্যবহার করিয়া, তাহাকে সার্থক করা।

ত্রিপিটক এবং ধর্ম্মপদগ্রন্থে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও গৃহস্থের ধর্ম্ম উত্তম রূপে বিবৃত হইয়াছে।

শাক্যসিংহ গুরুর মূর্ত্তিমেয় স্বরূপে, নিজের প্রাধান্য রক্ষা ক[illegible] নি[illegible] করেন নাই।

[illegible] পাপে পরিণত হয়।"—[illegible] ৪৫।[illegible] "[illegible] যেন অহঙ্কৃ[illegible] না হয়েন, [illegible] সুখ [illegible]—ভুভতক [illegible] ৫।৩।

[illegible]কার [illegible]জকগণের মত [illegible] বক্ষ ভাবে [illegible]য় ও তৃণাদপি সুনীচ [illegible] কহেন নাই। তাঁহার "খাঁটি বিনয়" ছিল [illegible] অ[illegible] জীবকে, "বিনয় ও নম্রতা সাধনে [illegible] দিবার [illegible]ক ছিলেন না।—ফো-শো-হিং-স্যান-[illegible] ৫[illegible]।২৪।

[illegible]নীয় কিছুই ছিল না। [illegible] গুরু[illegible] লুকোচুরির লোক ছিলেন না। তি[illegible] শিখাইতেন। তাঁহার থল[illegible] ক[illegible]তা ছিল না,—অন্তরে [illegible] এক ছিল। কার্লা[illegible] ব[illegible]ছেন,—"মহত্ত্বের প্রধান[illegible] অকপটতা।"

[illegible]ক্যসিংহের শিক্ষাপ্রণালী বিচিত্র ছিল। কেহ কে[illegible]প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর না দিয়া, প্রশ্নের পর প্র[illegible]রা, প্রশ্নকর্ত্তারই মুখ হইতে প্রশ্নের উত্তর নির্গত কর[illegible]ন। সভ্য জগৎ শি[illegible] এই প্রশ্নোত্তরপ্রণালীকে সক্রে[illegible] মহাত্মার নামেই [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু সুধী মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মহর্ষি সক্রেটীসের পূর্ব্বেই শাক্যসিংহ এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং পূর্ব্বদেশীয় পণ্য দ্রব্যের সহিত, পূর্ব্বদেশীয় বিদ্যা, ধর্ম্ম ও ভাব পশ্চিম দেশে তখন যাইত, বলিয়া, মনে হয় যে, সক্রেটীস মহোদয় এই প্রশ্নোত্তররূপ শিক্ষাপ্রণালী সূর্য্যোদয়ের দিক্ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পালী, সংস্কৃত, তিব্বতীয়, চীন, ব্রহ্ম, সিংহলী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" চড়াইয়াছেন।

শাক্যসিংহের ধর্ম্মের লক্ষ্য, দুঃখনাশ ও সুখোদয়। উদানবগ্‌গের উপদেশ এই,—"স্বার্থপরতার নাশই সুখ।" ৩০।৫।২৬।

সিদ্ধার্থ বলিয়াছেন।—"আমি-র মূল উৎপাটন কর।" জাতক। ২৫।

জাভার বরবোদর মন্দিরের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি।

নাগার্জ্জুনের শিক্ষা এই,—"উচ্চতম নীতি ক্রমশঃ শিক্ষা কর।"—পত্রাবলী। ৫।৫৩।

ললিতবিস্তরে আছে,—"পাপী কখনই সুন্দর হয় না।"—১২।

"ধর্ম্মকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার জ্ঞান করেন।"—ফো-সো-হিং-সান্-কিং। ৫।১,৭৭৪।

"প্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—'সাধু চিন্তা ব্যতিরেকে অন্য সুগন্ধি ব্যবহার করিও না।'—শ্যামদেশীয় বৌদ্ধনীতি।

"ত্যাগ বিদ্যা অনুশীলন কর।"—ফো-সো-হিং-সান্-কিং। ৫।১,৪৪২।

এই ভাব হইতেই গৃহত্যাগ ও প্রব্রজ্যার ভাব ভারতে এত প্রবল হইয়াছে। বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। হিন্দু স্মৃতিতেও চতুর্থাশ্রমের উদ্দেশ্য প্রব্রজ্যা। কিন্তু সে প্রব্রজ্যা, "পঞ্চাশ উর্দ্ধে" অরণ্যায়ন। শাক্যসিংহের প্রব্রজ্যা সকল বয়সেই হইত। সুকুমার শিশু রাহুলকে ভিক্ষু বেশে সাজানতে, তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, যোগেশ্বর পুত্রের নিকট এই ভিক্ষা চাহিলেন যে, পিতা মাতা বা গুরুজনের বিনা অনুমতিতে নাবালককে কেহ সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে পারিবে না। শাক্যসিংহের সমাজেই প্রথমতঃ সন্ন্যাসিনী হইয়া নারীগণ জগতের সম্মুখে উদিত। তৎপূর্ব্বে জগতে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক রমণীগণ ভিক্ষুণী হইতেন না। বরং গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ হিন্দু রমণীর পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা ছিল। ধর্ম্মার্থে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণের গৃহত্যাগ হইতেই ব্রজগোপীগণের গৃহত্যাগ প্রভৃতি কথা ও ভৈরবীগণের সন্ন্যাসিনী হওয়ার প্রথা ভারতে প্রচলিত। দিগম্বর দিগম্বরী শব্দ বুদ্ধের পরবর্ত্তী সাহিত্যে দেখা যায়। "নগ্ন ক্ষপণক" বৌদ্ধ শ্রমণ বই আর কিছুই নহে।

শাক্যসিংহ কৌপীনকে রাজমুকুট অপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতের বিরোধী ব্রাহ্মণগণ, এমন কি শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত, গর্ব্বিত মস্তক কৌপীনের নিকট অবনত করিয়াছেন এবং শঙ্কর বলিয়াছেন,—"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।"

ইহাতেই কৌপীনীগণের এতই গৌরব! ইহাতেই "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ" হয়। এই কৌপীনের সম্মুখেই কত গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত রাজমুকুট নতজানু,—ধূলায় ধূসরিত। মোটরগাড়ি,—চৌঘুড়ি এই কৌপীনের নিকট যুক্তপাণি। প্রকৃত কৌপীন কেবল বাহিরের বস্ত্র নহে,—সাধু বৈষ্ণবগণ, বৌদ্ধ শ্রমণগণ বলেন,—

"মনেতে দিয়ে ডোর কপিন্ হতে হবে দীনের অধীন॥"

সামবেদীয়া কেন উপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোক এই,—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।"—২।

এই অমৃতের কথায় উপনিষৎ পূর্ণ। পুরাণাদি এই অমৃত-কথায় পূর্ণ। তন্ত্রাদিও সংস্রার বিগলিত সুধার ধারায় নিমজ্জিত। কামকে, মদনকে, মারকে ভস্ম না

করিলে, এই অমরবাঞ্ছিত সুধার অধিকারী কেহ হইতে পারেন না।

কাম নষ্ট না হইলে, বুদ্ধের "সত্য" ও "প্রেম" কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। নিমাই কেবল বুদ্ধের এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অবতার পদবাচ্য হইয়াছিলেন। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিমাইয়ের এই ভাব বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ :
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।

এবং—

"কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।"

অন্যত্র—

"আত্মেন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা ধরে কাম নাম।"

প্রেম কি ?—

"তাঁহা নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ।"

ইহাকেই গোপিনীগণের প্রেম বলে,—পাশ্চাত্য দর্শনের "প্লেটোনিক প্রেম" বলে।

শাক্যসিংহের নির্ব্বাণের লক্ষ্যই এই,—

অ-হিংসা ও প্রেম। উপনিষদ্ শব্দের গূঢ় অর্থ, অহিংসা।—বৃহদারণ্যক। ৫।৫।৩ ও ৪।৪।২২।২৩। ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্ব্বশেষ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শাক্যমুনির প্রেম কেমন? "সর্ব্বজীবে দয়া ও স্নেহ করিবে।" ফো সো-হিং-সান্-কিং।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদে আছে,—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥—৬।

আত্মাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তু আত্মাতে না দেখিলে, কি এমনই সর্ব্বজীবে দয়া সম্ভবে?

সামবেদীয় কেনোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি"।—১৩।

জ্ঞানীরা সর্ব্ববস্তুতে সেই আত্মাকে দেখিয়া, ইহলোক হইতে উপরত হইয়া, অমৃত হন্। শাক্যসিংহ এই জ্ঞান লাভ না করিলে, এত প্রেম কোথা হইতে পাইলেন যে, বিষধর সর্পকে পর্য্যন্ত তাঁহার সুবিশাল হৃদয়ে স্থান দিলেন? কত ভুজঙ্গই বোধিতরুমূলে তাঁহার বক্ষে ও কণ্ঠে স্থান ও বিশ্রাম লাভ করিত! ইহা হইতেই হিন্দু-প্রতিভা মহাদেবের কণ্ঠে সর্পমালা পরাইয়া দিয়াছেন! ভুজঙ্গ-ভূষণ শাক্যবীরসিংহ পরবর্ত্তীকালে কণ্ঠে বিষভরা মহাদেব রূপে চিত্রিত। "সর্পের জীবনও পবিত্র।" ললিতবিস্তর।১। ইতিহাসে আর একটী এমন জ্ঞান ও প্রেমের উক্তি আছে কি?

সর্ব্বজীবের মধ্যে সেই বৃহদারণ্যক উপনিষদের সূত্র—আত্মাকে দর্শন না করিলে, কি প্রকারে এত প্রেমের উৎস অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইল?

এই প্রকার গভীর, প্রকৃত, নিশ্চয়, সংশয়রহিত ভাবে, জীবন্ত, প্রাণময়, প্রেমময় সত্তাকে আকাশময় পূর্ণ না দেখিলে, কে সর্ব্বজীবে এমন প্রেম প্রচার করিয়া বলিতে পারেন,—"নিজ জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া, মুমূর্ষু সন্তানের পার্শ্বে উপবিষ্টা জননীর ন্যায়, সর্ব্বজীবের প্রতি অসীম প্রেম ও মৈত্রী সাধন করিতে হইবে।"—মিত্তসুত্ত। ৫।৭।

ইতিহাসে এমন প্রেমপ্রচারের আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

শত্রুর গুণচিন্তা, শাক্যসিংহের সাধনের প্রধান অঙ্গ। শত্রুর মনে ক্লেশ হইবে বলিয়া, যুদ্ধে জয়লাভ করাও নিষেধ।

"দয়ার ভিখারীকে জয় করা অন্যায়।" ললিতবিস্তর। ৩। "জয় হিংসাজনক।"—ধর্ম্মপদ। ৫।২০১।

"সংসারের সমুদায় বস্তুর প্রতি প্রেমে পূর্ণ,—অন্যের হিতার্থে ধর্ম্ম সাধন,—এই প্রকার ব্যক্তিই সুখী।" কা-খিউ-পি-ইউ। ৩৯।

সর্ব্বজীবে কি প্রকার দয়া?

"সর্ব্ব জীবই যেন একমাত্র সন্তান।"—ললিতবিস্তর। ১৩।

"যাহারা তোমার হন্তা, তাহাদিগকেও ক্ষমা করিবে।"—ঐ।

হন্তারকের জন্য মহর্ষি ঈশার প্রার্থনা, ইহারই প্রতিধ্বনি।

"কোন ব্যক্তি তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা দেহকে খণ্ড খণ্ড করিলেও, যেন একটীও ক্রোধের চিন্তা মনে উদয় না হয়,—মুখে যেন একটীও কটু বাক্য নির্গত না হয়।"—ফো-সো-হিং-সান্-কিং। ৫.২,০৪৬।

"শত্রুকে বলের দ্বারা জয় কর, তাহার শত্রুতা বর্দ্ধিত হইবে। প্রেমের দ্বারা জয় কর, তাহা হইলে আর শোক অর্জ্জন করিতে হইবে না।"—ঐ।৫।২,২৪১।

"যাহা তোমাকে অসুখ দেয়, অন্যের প্রতি তাহা করিও না।"—উদানবগ্গ। ৫।৫।১৮।

"অন্যের সাহায্যের জন্য, তিনি জীবন ধারণ করেন।" মিলিন্দ পঞ্হ। ৪।১।৭০।

"এই নশ্বর, মরণশীল দেহের প্রতি এত মমতা কেন? জীবের হিতার্থে কর্ম্ম করাই জ্ঞানীর চক্ষে জীবনের সার্থকতা।"—কথাসরিৎ-সাগর। ২৮।

"আমার যাহা কিছু আছে,—আমার দেহ পর্য্যন্ত কি অপরের হিতার্থে নহে?" নাগানন্দ। ১ পরিচ্ছেদ।

"বুদ্ধের সম্প্রদায়ের কেহ যেন ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন জীবের জীবন নষ্ট না করেন,—সামান্য কীট বা পিপীলিকারও নহে।" মহাবগ্‌গ। ১।৭৮।

"ইহাই আমার শিক্ষা,—সামান্য জীবের প্রতি,—এমন কি দয়ার বশে সামান্য কীটের জীবন রক্ষাও, প্রেমকারীর পক্ষে সুফল প্রসব করিবে।" ত্‌সা-তো হম্‌-কিং। সূত্র।২।

"অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তুর প্রতিও বুদ্ধ স্নেহযুক্ত।"—কুল্লবগ্‌গ। ৫।২১৭।

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"—টা-চোয়াং-ইয়ান্‌-কিং-লুন্‌। ২৭।

যে শাক্যসিংহকে গালি দিয়া যাইত, তাহাকে তিনি "হে প্রিয় পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কে বলিবে, এত প্রেম নিরীশ্বর, এমন প্রেম নিরীশ্বর?

অথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার পূর্ণ মাত্রা এমন আর কাহাতেও লক্ষিত হয় না।

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্‌বিদ্বান্‌ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।" ৩।১।৪।

এই প্রাণময় আত্মাকে সর্ব্বভূতেই দর্শন করিয়া, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যিনি কোন কথাই কহেন না, যিনি আত্মক্রীড়, আত্মরতি, সৎকার্য্যশীল, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ।

শাক্যসিংহের মত ব্রহ্মবিৎ আর কে? আমি ত এমন ব্রহ্মজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ আর দ্বিতীয় কাহাকেও জানি না।

তবে কেন, বুদ্ধকে নিরীশ্বর ও বৌদ্ধধর্ম্মকে নাস্তিক-বাদ বলা হয়?

ইহার উত্তর বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতরে নাই। ইহার উত্তর ব্রাহ্মণগণের অশেষ ঈর্ষা, অহঙ্কার ও প্রতিহিংসায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের লোপ করিয়াছিল। তাই, ব্রাহ্মণেরা নিঃক্রিয় করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি সাধারণ লোকের অভক্তি জন্মাইবার জন্য, এতৎ উভয়েতে নিরীশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন। বীরভূমের গৌরব জয়দেব কবি, বুদ্ধদেবের স্তোত্র গাহিতে যাইয়াও, এই ব্রাহ্মণ্য ভাব লুকাইতে পারেন নাই,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতম্‌।"

বলিয়া প্রশংসা করিতে যাইয়াও, শ্রুতির ও যজ্ঞের নিন্দা করার কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। বিশেষতঃ ছাগাদি পশুনাশ নিবারণ করিয়া, ব্রাহ্মণভোজনের রস-কণ্টক হইয়াছিলেন এবং পুরোহিতগণের অন্নে ধূলি দিয়াছিলেন বলিয়া, বুদ্ধকে নিরীশ্বর অপবাদ সহ্য করিতে হইয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, জগতের ইতিহাসে, বুদ্ধের তুল্য সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞ আর দ্বিতীয় দেখা যায় নাই।

শাক্যসিংহ যেমন "জ্ঞ" এমন আর কেহই নহেন।

"সম্যক প্রযুক্তাস্থ ন কম্পতেজ্ঞঃ।" প্রশ্নোপনিষৎ।৫।৬।

শাক্যসিংহ ব্রহ্মকে জানিয়া শুনিয়া, "জ্ঞ" হইয়া, বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

মৌনীই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। শাক্যমুনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও মৌনী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবিষয়ে অবাক হইয়া, বাক্য মনের অগোচরকে জানিয়াছিলেন। সে জানার গভীরতা সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না। নারদভক্তিসূত্র তাহাকে, "মূকাস্বাদনবৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৫৩।

বলিবেন কাহাকে? শুনে কে? বুঝে কে?

প্রেম ও জ্ঞানের গভীরতম অনুভূতি অবাক। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বলিয়া শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন সে ব্রহ্মকে জানিয়া, বকিবে কে?

বুদ্ধদেব যদি এই ব্রহ্মকেই না জানিলেন, তবে কঠোপনিষদের "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি", (২।১৫), কথার সার্থকতা কোথায়? তবে ব্রহ্মচর্য্য আচরণই বা কেন? ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিলেই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, ব্রহ্মজ্ঞান।

সামবেদীয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, সত্যকাম নামক শিষ্য, ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক, আচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, আচার্য্য তাঁহার মুখ দেখিয়া বলিলেন,—

"ব্রহ্মবিদিব বৈ সৌম্য ভাসি।" ৪।৯।২।

"হে সৌম্য! তুমি যেন ব্রহ্মবিৎ হইয়াছ বলিয়া বোধ হইতেছে।"

চারিশত কৃশাঙ্গী গাভী লইয়া বনে গমন করিয়া, তাহাদের সন্তানাদি সহ সংখ্যা এক সহস্র হইলে, জাবালতনয় সত্যকাম গুরুগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবা মাত্রই, ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ মুখে প্রকাশ পাইল। ছান্দোগ্য। ৪।৪ হইতে ৪।৯।

কামলতনয় উপকোশল ব্রহ্মচারী হইয়া, ঐ সত্যকামের শিষ্য হইলে, দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপদেশ পাইলেন না, তথাচ, আচার্য্য একদিন তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—

"ব্রহ্মবিদ্ ইব সৌম্য তে মুখং ভাতি। কো নু ত্বানুশশাসেতি?"

"হে সৌম্য! তোমার মুখ ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায় জ্যোতিযুক্ত দেখিতেছি। কে তোমাকে উপদেশ করিলেন?" ছান্দোগ্য।৪।১০।—৪।১৪।২।

ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা যোগী সম্বন্ধে বলে,—

"যোগীকা, রোগীকা, ভোগীকা জান,
আঁখ মে নিশান; আউর, আঁখ মে পছান। —কবীর।

চক্ষু ও মুখ অন্তরের ভাবের দর্পণ।

বৈষ্ণব সাধকেরা বলেন,—

"ও গো! মনের মানুষ হয় যে জনা,
নয়নে তার যায় গো জানা।"

পারসিক কবি সাদিতে আছে যে, একদা তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার যোগানন্দের আস্বাদ পাইবার মানসে, তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে সকল ফল খাও, তাহা আমাদের জন্য আনিবে।" তিনি গল্পচ্ছলে বলিয়াছেন যে, "উদ্যানে যাইবার সময় মনে করি যে বন্ধুগণের জন্য ফল আনিব,—ঐ উদ্দেশ্যে উদ্যানে প্রবেশ করি,—বৃক্ষতলে যাই,—বৃক্ষে আরোহণ করি, ফল সংগ্রহ করি। কিন্তু মুখে ফল দিলেই, সব ভুলিয়া যাই,—বন্ধু, ফল, রস, আমি, সংসার। কেবল এক অসীম, অতুল আনন্দরসে মগ্ন হই। তাহার বর্ণনা হয় না।"

এই ত ব্রহ্মরসাস্বাদের কথা!

আরও একটী কথা। শাক্যসিংহ ঈশ্বর শব্দ কখনও ব্যবহার করেন নাই। কারণ, যেসকল শব্দ লইয়া এত মারামারি, দ্বেষাদ্বেষি, সেসকল শব্দ ও কথা কহিতে তিনি মানা করিয়াছেন। "ঈশ্বর" শব্দ লইয়া সংসারে যত মারামারি, দ্বেষাদ্বেষি এমন আর কিছু লইয়াই নহে। পৃথিবীর যত যুদ্ধ ধর্ম্ম লইয়া, এমন অন্য আর একটী বিষয় লইয়া হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণকে নাশের চেষ্টা করিয়াছেন,—বৌদ্ধগণকে অশেষ নির্য্যাতন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছেন,—মুসলমানগণ কাফেরগণকে নিঃশেষ করিবার নিরন্তর চেষ্টায়, কতই জিহাদ্ লড়িলেন,—খৃষ্টীয়ানগণ মুসলমান লোপ করিবার জন্য কতই ক্রুসেড্ যুদ্ধ করিলেন,—প্রটেষ্টাণ্ট ও কেথলিক খৃষ্টানগণ পরস্পরের রক্তস্রোতে ধরণীকে ধৌত করিলেন,—এই প্রকার নিত্য হিংসা ও অপ্রেম ও প্রাণিনাশ কতই যে, ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া হইতেছে ও হইবে, কে তাহার গণনা করে? জাতীয় জীবনে যেমন, ব্যক্তির জীবনেও তেমন। ঈশ্বর কি ও তৎপূজা কি প্রকার হওয়া উচিত, ইহা লইয়াই অশেষ হানাহানি, মনোমালিন্য, অপ্রেম, হিংসা, ঘৃণা, মানব-ইতিহাসকে দীর্ঘনিশ্বাস ও ক্রন্দনে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

এই সকল কারণে আমার মনে হয়, ঈশ্বরের নাম না করিয়া শাক্যসিংহ ভালই করিয়াছেন,—মনোবিজ্ঞানের অতুল জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাই বলিয়া, তিনি কি নিরীশ্বর? না।

কারণ, ঈশ্বর মানে যা, তাহাই তিনি প্রচার ও সাধন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরলাভের যাহা এক মাত্র উপায়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রচার ও সাধনে শাক্যসিংহ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কঠোপনিষৎ বলেন,—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পাদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥" ১৫।

—সমুদয় বেদ যে পূজনীয় পুরুষকে কীর্ত্তন করেন,—সমুদয় তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে,—যাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়,—তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি,—তিনি ওঁ।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" ৩।১।৮

জ্ঞান শুদ্ধি দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইলেই, ধ্যানেতে এই আত্মার দর্শন হয়।

ইহার সহিত মহর্ষি ঈশার বাক্যের কেমন সুন্দর মিল!

"বিশুদ্ধ হৃদয় যাঁহাদের, তাঁহারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিবেন।" মেথিউ। ৫।৮।

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।" মুণ্ডক,—

এবং,—

"যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।" ৩।১।৫।

নির্ম্মলচিত্ত যতিগণ যাঁহাকে দর্শন করেন, তিনি সত্য, তপস্যা, সম্যক জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লভ্য।

যদি তাহাই হয়, তবে কি বুদ্ধদেব ব্রহ্মলাভ করেন নাই? যদি মহর্ষি ঈশা ও কঠ, মণ্ডুকাদি উপনিষদের বাক্য ব্যর্থ না হয়, তবে, নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

সাধারণ প্রাকৃত জনগণের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানী সম্বন্ধে ধারণা ভ্রমমূলক। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্মের জাত-শত্রুগণের মতও অন্যায়। এবং সেই কারণেই উহা অগ্রাহ্য। ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে, উপনিষৎ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধ স্বয়ং একস্থানে বলিয়াছেন, "আমি ব্রহ্মলোকে উপনীত।"

উপনিষৎ বলেন, সত্যই ব্রহ্ম।

"এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমেতি।"—ছান্দোগ্য। ৮।৩।৪।

এই ব্রহ্মেরই নাম সত্য। সত্যই ব্রহ্ম।

সত্যই ব্রহ্ম। অন্য ব্রহ্ম নাই। "সত্য শব্দটী তিন অক্ষর,—স, ত, য,। স=অমৃতময় পুরুষ। ত=মর্ত্ত্য জীব। য=এই উভয়ের যোজক। যিনি প্রত্যহ এই শব্দটী বিদিত হয়েন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" ঐ। ৮।৩।৫।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন,—

"সত্য জানিলে সর্ব্ব লোকে জয় হয়। এই হৃদয়ই ব্রহ্ম। তিনিই সত্য। সত্যই তিনি।" ৫।৪।১ এবং ৫।৫।২।

সত্যকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। ব্রহ্মকে দেখা, জানা, চেনা, লাভ করাই,—স্বর্গলোক প্রাপ্ত হওয়া। এই সত্য,—এই তত্ত্ব জানিয়াছিলেন বলিয়াই শাক্যসিংহের নাম, তথাগত।—ছান্দোগ্য দেখ।—৮।১৫।১।

সত্যই ব্রহ্ম। সত্যই জীবন্ত, অনন্ত, অক্ষয়, অজর, অমর, নিত্য। সত্যই প্রাণময়, জীবন্ত, প্রেমময়, আকাশ-ময়। ইহাঁতেই আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয়। ইহাঁতেই মুক্তি।

এই "সত্যকেই জান, মুক্তিলাভ হইবে," বলিয়া মহর্ষি ঈশা উপদেশ করিয়াছেন। জন্। ৮।৩২।

শাক্যসিংহ, পুরোহিতগণের ন্যায় গুরু সাজিতে চাহেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"তুমি নিজেই তোমার মুক্তি সাধন কর,—নিজের পরিশ্রম ও যত্নে।" মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত। ৬। ভারত কবে আবার এই স্বাবলম্বন-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নবজীবন লাভ করিবে জানি না।

সত্য ভিন্ন আর মুক্তিদাতা কে? সেই সত্য আছেন বলিয়াই, আমি আছি,—আমি সত্য। নচেৎ আমি অনিত্য, নাই,—ভস্মান্ত।

যে ব্রহ্ম সত্য নহেন, সে ঈশ্বর লইয়া কি করিবে?

সত্যকেই যখন গ্রহণ করিলে, তখন অন্য কি শব্দ বর্জ্জন বা গ্রহণ করিলে, তাহাতে আসে যায় কি? বস্তু পাইলেই হইল। বাক্য লইয়া এত যোঝাযুঝি কেন?

যিনি সত্যবান, তিনি ব্রহ্মবান। যিনি সত্যহীন, তিনি ব্রহ্মহীন।

সত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সত্য। অন্য ব্রহ্ম নাই। অন্য সত্য নাই। অন্য ঈশ্বর নাই।

শাক্যসিংহ কেবল নির্ব্বাণ প্রচার করেন নাই। তিনি প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রেম ভিন্ন নির্ব্বাণ কোথায়?

তিনি কেবল প্রেমও প্রচার করেন নাই। তিনি প্রেমেতে অহঙ্কার, অজ্ঞান ও আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-ইচ্ছার "মহানির্ব্বাণ" প্রচার করিয়া, মহাদেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন,—"দেবানামপি সুদুর্লভ", নির্ম্মল, প্রেমপূর্ণ হৃদয় লাভ করিয়াছিলেন। প্রেমেতে আত্ম-সুখেচ্ছার নির্ব্বাণ ব্যতীত, অসুখ, অশান্তি ও অতৃপ্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই,—অমৃত লাভের,—জরা, মৃত্যু, রোগ, শোকের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আর অন্য উপায় নাই,—আর অন্য পন্থা নাই,—আর অন্য গতি নাই।

হে ভ্রাতঃ! ভারতের অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে শাক্যসিংহের ও বৌদ্ধধর্ম্মের কি যোগ ছিল ও সম্বন্ধ আছে, একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

ভালবাসা

বিশ্বময় ভ্রমিলাম ভালবাসা খুঁজে।
দ্বারি দ্বারে ভিক্ষা করি ধরে ঘাড় গুঁজে।
ভগ্ন প্রাণে কেঁদে বলে ফিরিলাম ঘরে,
দেখি প্রেম হাসে বসি' আপন অন্তরে।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যা।

রবীন্দ্রনাথ*

আমার উপরে এই জন্মোৎসবে আপনারা যে ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা আমি গ্রহণ করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম। সূর্য্যের বহির্মণ্ডলের বিকীর্ণ আলোক ও উত্তাপ তরঙ্গে আমাদের পৃথিবী জীবধাত্রী হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার ভিতরে যেখানে সমস্ত উত্তাপ সঞ্চিত সেই বাষ্পপিণ্ড ঘোর অন্ধকারাবৃত। অথচ সেই ভিতরের সংবাদ না জানিয়া যে বাহিরের বর্ণচ্ছটাতেই মগ্ন থাকে, জ্যোতিঃশাস্ত্রের রহস্য তাহার নিকটে কোন দিনই উদ্ঘাটিত হয় না। আমাদের দেশের সাহিত্য-সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র স্বরূপ যাঁহার জীবনচরিত ও কাব্য আলোচনার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, ভরসা করি তাঁহার অন্তর-লোকের কোন রহস্য উদ্ঘাটনের প্রত্যাশা আমার নিকটে কেহই করিবেন না।

আমি প্রবন্ধ আরম্ভে বিনয়ের অবতারণা করিয়া প্রথা-রক্ষা করিতেছি, এ কথা কেহ না মনে করেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্র বাবুর জীবনে এবং কাব্যে এত বিচিত্র ভাবের সমাবেশ আছে যে তাহার নানান্ মহালায় প্রবেশদ্বারের চাবি সকল সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের অধিকাংশের ন্যায় নিতান্ত একটানা পথে একরঙা এক ভাবের জীবন যদি তাঁহার হইত তবে আমি কোন সঙ্কোচের কথাই পাড়িতাম না।

আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিচিত্রতার স্বাদের জন্য কবির চিত্তে এমন সুগভীর আকাঙ্ক্ষা কি করিয়া জাগিল, তাহা আমার কাছে বিস্ময়কর। আমাদের দেশের সমাজের জীবন নানা কারণে অত্যন্ত ক্ষুদ্র,—কৃত্রিম লোকাচারের বন্ধন তো আছেই—কিন্তু ক্ষুদ্রতার আসল কারণ এদেশে কর্ম্মক্ষেত্র নিতান্ত সঙ্কীর্ণ—সেইটুকুর মধ্যে মানুষের বিচিত্র শক্তিকে ভাল করিয়া ছাড়া দেওয়া যায় না—তাহাতে আমাদের জীবনের লীলা ব্যাঘাত পায় বলিয়া আনন্দের অভাব ঘটে। শুধু তাই নয়। আমাদের হৃদয়ের ভাব বাহিরের ক্ষেত্রে নানারূপে আপনাকে সৃষ্টি করিতে চায়;—সেই সৃষ্টি করিতে গিয়াই সে যথার্থ পরিণতি লাভ করে, সে বল পায়, তাহার বাড়াবাড়ি সমস্ত কাটিয়া যায়, সে আপনার ঠিক ওজনটি রক্ষা করিতে শেখে—এক কথায় সে রীতিমত পাকা হইয়া ওঠে। কিন্তু যে সমাজে মানুষের চিত্ত বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিবার এমন প্রশস্ত স্থান ও বিচিত্র অধিকার না পায়, সে সমাজে ভাবুকতা আপনার পরিমাণ হারাইয়া ফেলে, হয়, সে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পঙ্গু হইয়া নিতান্ত গ্রাম্য হইয়া থাকে, নয় সে আপনাকে অসঙ্গতরূপে স্ফীত করিয়া অদ্ভুত প্রমত্ততার মধ্যে ছুটিয়া যায়। যেখানে জীবনের ক্ষেত্র দূরবিস্তৃত সেখানে মানুষের কল্পনা নিয়তই সত্যের সংস্রবে আপনাকে সুবিহিত আকার দান করিতে পারে,—যতদূর পর্য্যন্ত তাহার শক্তির অধিকার ততদূর পর্য্যন্ত সে ব্যাপ্ত হয় এবং কোন্‌খানে তাহার সীমা তাহাও আবিষ্কার করিতে তাহার বিলম্ব ঘটে না।

সঙ্গীত, শিল্প, চিত্রকলা, সৌন্দর্য্য, মানুষের সঙ্গ, ভাবের আলোচনা, শক্তির স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি জিনিষ বাহির হইতে ক্রমাগত উত্তাপ দিতে থাকিলে আমাদের প্রকৃতি যে শোভায় সৌন্দর্য্যে একটি আশ্চর্য্য বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহা আমরা অন্যদেশের অন্য কবিদের জীবন-চরিতে দেখিয়াছি। কেবল আমাদেরই দেশে এ সকলের অভাব যে কত বড় অভাব এবং এই সকল প্রাণের উপকরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকা যে কত বড় শূন্যতা তাহা আমরা ভাল করিয়া অনুভব করিতেও পারি না।

কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের আগুনকে চিরকাল ছাইচাপা দিয়া রাখা যায় না। যখনই সে বাহির হইতে খোঁচা পায় তখনি সে শিখা হইয়া জ্বলিয়া উঠিতে চায়। এই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমাদের এই বহু দিনের সুপ্তদেশ এক-দিন সহসা বৃহৎ পৃথিবীর আঘাত পাইয়াছে। যে পশ্চিম মহাসমুদ্রতীরে মানুষের মন সচেতন ভাবে কাজ করিতেছে, চিন্তা করিতেছে ও আনন্দ করিতেছে সেইখানকার মানসহিল্লোল আমাদের নিস্তব্ধ মনের উপর আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সে কি চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারে? আমাদের মনের এই যে প্রথম উদ্বোধনের চঞ্চলতা ইহা ত নীরব হইয়া থাকিবার নহে। যত দিন সুপ্ত ছিলাম ততদিন আপনার মনের নানা অদ্ভুত স্বপ্ন

* ২৫শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে কবিবরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে

লইয়া দিব্য রাত কাটিতেছিল কিন্তু যখন জাগিলাম, যখন শয়নঘরের জানালার ফাঁকের মধ্য দিয়া দেখিলাম জীবনের উদার-বিস্তীর্ণ লীলাভূমিতে মানুষ দিকে দিকে আপনার বিচিত্রশক্তিকে আনন্দে পরিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তখন স্বপ্নের বন্ধন ও পাথরের দেয়ালে আর ত বাঁধা থাকিতে ইচ্ছা হয় না। তখন বিশ্বের ক্ষেত্রে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

বিশ্বকে মানুষের জীবনকে নানা দিক দিয়া উপলব্ধি করিবার এই ব্যাকুলতাই কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে উৎসারিত করিয়াছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আপনার জীবনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে যে জীবনকে পাওয়া যাইতেছে না অথচ দূর হইতে যাহার পরিচয় পাইতেছি নিজের অন্তরের ঔৎসুক্যের তীব্র আলোকে তাহা দীপ্যমান হইয়া দেখা দেয়। কবির ব্যাকুল কল্পনার শতধা বিচ্ছুরিত নানাবর্ণময় রশ্মিচ্ছটায় প্রদীপ্ত জগদ্দৃশ্যই আমরা তাঁহার কাব্যের মধ্যে দেখিতে পাই। একদিক হইতে যে অবস্থাকে প্রতিকূল বলিয়াই মনে করা যাইত কবিত্বের পক্ষে তাহাও অনুকূল হইয়াছে। কাপড়ের আবরণের মধ্যে খাঁচার পাখীর গান আরো বেশি করিয়া স্ফূর্ত্তি পায় তাহা দেখা গিয়াছে; এ ক্ষেত্রেও বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণভাবে যোগের অভাবই আমাদের কবির বিশ্ববোধকে এমন অসামান্যভাবে তীব্র করিয়া তাহাকে নানাছন্দের অশ্রান্ত সঙ্গীতে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের দেশের অন্তরতম চিত্তে এই বিশ্বের জন্য বিরহ বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। সে অভিসারে বাহির হইতে চায় কিন্তু এখনো সে পথ চেনে নাই—সে নানা দিকে ছুটিতেছে এবং নানা ভুল করিতেছে। অনেক ঠেকিয়া তাহাকে এই কথাটি আবিষ্কার করিতে হইবে যে, নিজের পথ ছাড়া পথ নাই—অন্যপথের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষকালে নিজের রাজপথটি ধরিতে হয়।

কবির কাব্যের মধ্যেও আমরা তাঁহার সেই বিশ্ব-অভিসার-যাত্রার ভ্রমণের ইতিহাস দেখিতে পাই। তিনি তাঁহার অনুভূতির আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন, মনে করিয়াছেন এইবার যাহা চাই তাহা পাইয়াছি—কিন্তু সেই বেগের দ্বারাই তিনি দ্রুতগতিতে তাঁহার পাওয়ার অন্তে গিয়া ঠেকিয়াছেন—তখন আবার তাহা হইতে বাহির হইবার জন্য বেদনা এবং নূতন পথে প্রবেশ। আমরা তাঁহার সমস্ত কাব্য-গ্রন্থাবলীতে ইহাই দেখিয়াছি—বিশ্বউপলব্ধির জন্য উৎকণ্ঠা এবং বারম্বার তাহার বাধা হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রয়াস।

এমনি করিয়া ঠেকিতে ঠেকিতে চলিতে চলিতে অবশেষে কবি এক সময়ে ভারতবর্ষের পথ এবং তাহার মধ্য দিয়া আপনার পথটি পাইয়াছেন ইহাই তাঁহার কাব্যের শেষ পরিচয়। সেই বিপুল ধর্ম্মসাধনার পথ বাহিয়া তাঁহার জীবনের ধারা সাগরসঙ্গমে আপনার সঙ্গীত পরিসমাপ্ত করিতে চাহিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই পথটি দেশাচারের সঙ্কীর্ণ কৃত্রিম পথ নহে, তাহা সত্যপথ। এই জন্য সকল দেশের সকল সত্যের সঙ্গেই তাহার সামঞ্জস্য আছে। তাহা যদি না হইত তবে কবির কাব্য বিশ্বজনীন সার্থকতার মধ্যে স্থান পাইত না তাহা সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার মরুভূমির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

যাহারা সংস্কারগত ভাবে বা পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণের প্রতিক্রিয়াবশতঃ ভারতবর্ষের ধর্ম্মের পথটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষেরই মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছেন। নানাদেশাগত বিপুল ভাবধারার পরস্পরের সহিত সম্মিলনের বৃহৎ প্রয়াসের মাঝখানে ভারতের ইতিহাসের ভিতরের চিরন্তন অভিপ্রায়ের ধারাটিকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না। সুতরাং ভারতবর্ষের অতীত তাঁহাদের কাছে চির-অতীত, বর্ত্তমান কেবল দেশাচার ও লোকাচারের জড়সমষ্টি, তাহার কোন প্রবাহ নাই;—এবং ভবিষ্যৎও তাঁহাদের কাছে আকাশ-কুসুম মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে এই একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে তিনি বরাবর নিজের স্বভাবের অন্তর্নিহিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, সেই তাঁহার স্বভাবের মধ্যেই তাঁহার কবি-প্রকৃতি, তপস্বী প্রকৃতি, ত্যাগী-প্রকৃতি, ভোগী-প্রকৃতি, পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে করিতে ক্রমশই পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া লইতেছে। সেই প্রকৃতিটির মধ্যে অনুভূতি যতই

তীর হোক, ভোগপ্রবৃত্তি যতই প্রবল হোক, তাহারই মধ্যে কোন বিশেষ একটি দিকে সমস্ত প্রকৃতিকে আবদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে ভিতর হইতে বরাবর একটা ঠেলা ছিল। সেই জন্য নদীর বাঁকের মত ক্রমাগত একটা হইতে অন্যটায়, একরস হইতে অন্যরসে তাঁহার স্বভাব আপনার সার্থকতাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে এবং অবশেষে ধর্ম্মের মধ্যে আপনার সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে বলিয়া আপনারই ভিতর হইতে ভারতবর্ষের চিরন্তন সমন্বয়াদর্শকে সে আবিষ্কার করিয়াছে।

আমি জানি, কাব্যের মধ্যে একই কালে অংশ এবং সমগ্র এ দুয়েরই সমান গৌরব। গাছের যেমন শাখা, পল্লব, ফুল ও ফল একটা হইতে অন্যটা অভিব্যক্ত হইলেও প্রত্যেকটিই যখন দেখা দেয় তখন তাহাকেই চরম বলিয়া মনে হয়, তেমনি জীবনের যে অবস্থাই কবিতায় প্রকাশ পাক না কেন কবিতার মধ্যে তাহার একটি সম্পূর্ণতার ভাব আছে। তাহার চেয়ে সম্পূর্ণতর যে কিছু আছে, সে যে একটা ভাবী সমগ্রতার অপেক্ষা রাখিতেছে সে কথা হিসাবের মধ্যে না আনিলেও ক্ষতি হয় না। কারণ এই পরিণতির প্রত্যেক অংশে অংশেই সমস্ত বিশ্বমানবমন তাহার সঙ্গে সায় দেয়। দেশকালপাত্রের মধ্যেই কিছুকে একান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখা কবিতার দেখা নয় এই জন্য কবিত্বের দৃষ্টি যখনই যাহাকে দেখে তাহাকে পূর্ণ করিয়া দেখে —তাহাকে মানুষের নিত্য অনুভূতির ক্ষেত্রে আনিয়া দেখে —তেমন করিয়া যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে সে বর্জ্জন করে। সেই জন্য যে অবস্থাগুলি জীবনের মধ্যে চরম নহে, যাহাকে ছাড়াইয়া চলিতে হয়—সেগুলিও কবিত্বের অমরাবতীতে অমৃতপানে নিত্যরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করে। জীবনে এক সময়ে যে প্রেমের জোয়ার অনির্ব্বচনীয় আবেগে সমস্তকে পূর্ণ করিয়া দেখা দিয়াছে তাহার কাল উত্তীর্ণ হইলে সে ভাঁটার মুখে সরিয়া যাইতেও পারে কিন্তু কাব্য যখন সেই জোয়ারের পরম মুহূর্ত্তের পরিপূর্ণ সুরটিকে ধরে তখন তাহা বিশ্বমানবের নিত্যকালের সুর হইয়া বাজিতে থাকে, তাহার মধ্যে সংসারের অবশ্যম্ভাবী দশাবিপর্য্যয়ের আশঙ্কা কোন দ্বিধার বাধা জন্মাইয়া দেয় না।

আমরা একই কালে সেই অংশ এবং সমগ্র, এ দুইকেই যদি দেখিবার চেষ্টা করি তবে একই সময়ে দৌড়াইব এবং বিশ্রামও করিব এমন অসম্ভব পণ করিয়া বসিব। চলার মধ্যে যেটুকু থামা আছে সমগ্র কাব্যের আলোচনার কালে অংশের সৌন্দর্য্য সেইটুকুই ধরা দিবে।

আমি তো মনে করি কবির কাব্যরচনা ও জীবনরচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই কাব্যে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সেই জন্য জীবনের ভিতর হইতে কাব্যকে যদি দেখি, অথবা কাব্যের ভিতর হইতে যদি জীবনকে দেখি, তাহাতে কবিতার ব্যক্তিগত দিক্‌টার উপরেই বেশি ঝোঁক দেওয়া হইবে না। কারণ কবিতা জিনিসটাই ব্যক্তিগত নহে, এবং কবির যথার্থ জীবনও তাঁহার আপনার একলার জিনিস নহে। তিনি যেন সচ্ছিদ্র বংশখণ্ডের মত, অন্য জিনিসে যে ছিদ্র কাজের পক্ষে ব্যাঘাতকর হয়, বংশখণ্ডে সেই ছিদ্রই বিশ্বসঙ্গীত প্রচার করিয়া থাকে।

সেই জন্য আমি যখন বলিলাম যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনা কোনো বাহিরের শাস্ত্রের সংস্কারকে অবলম্বন করে নাই, তাহা তাঁহার সমস্ত জীবনের ভিতর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তখন এই কথাই বলিলাম যে এখানেও বিশ্বমানবের চিত্তের বিচিত্র তারের সম্মিলিত আনন্দময় সুর শুনিবার আকাঙ্ক্ষাই চলিতেছে—জীবনের সকল বিচিত্রতাকে পরিপূর্ণ একের মধ্যে পাইবার আকাঙ্ক্ষা।

গীত-সঙ্গতে যেমন নানা বাদ্যযন্ত্র বাজে, নানা সুরে—প্রত্যেকটিই তাহার চরম সঙ্গীতকেই প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত অথচ সেই সমস্তকে মিলাইয়া এক বিপুল একতান সঙ্গীত শোনা যায়, ঠিক সেই রকম রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত বিচিত্রতা আপনার চরমতম সুরকে প্রকাশ করিয়াও পরম ঐক্যের রাগিণীর মধ্যেই আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার কাব্যের খণ্ডতার চেয়ে তাহার সমগ্রতার মূর্ত্তিই বেশি করিয়া দেখিবার বিষয়।

এখানে তাঁহার অপ্রকাশিত পত্র হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলে আমার কথাটি পরিস্ফুট হইবে:—

"আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই চিরজীবনের সাধনা। যা মুখে বলছি যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি তা আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেও পারিনে। এদিকে আমাদের

জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইট নিয়ে গড়ে তুলচে। জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজন রহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে—প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে হ'লে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজন ব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। বুঝতে পারি যেমন গ্রহনক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধ'রে তৈরি হ'য়ে উঠচে, আমার ভিতরেও তেমনি একটা সৃজন চল্‌চে- আমার সুখ দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করচে।"

কবি রবীন্দ্রনাথ যদি গোড়া হইতেই ধর্ম্মের পথে আপনাকে চালনা করিতেন, তাহা হইলে আমরা একতারার একটি তারের সুরই তাঁহার নিকট হইতে পাইতাম, জীবনের নানা তারের নানা বিচিত্র সঙ্গীত পাইতাম না। তিনি যে প্রবৃত্তির পথকে রুদ্ধ করেন নাই, এই জন্যই তাঁহার কবি প্রকৃতি সমস্ত প্রবৃত্তিকে তাহার একটি বড় সামঞ্জস্যের অন্তর্গত করিয়া বিশ্ব হইয়া উঠিবার চেষ্টা পাইয়াছে। আমাদের দেশের আধুনিক ধর্ম্মসাধনা নিবৃত্তির পথেই প্রধানতঃ চলে, বাহিরকে বিশ্বসংসারকে জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভোগে, সকল জায়গায় অস্বীকার করিবার দরুণ প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা যে বাহিরে সেই চরিতার্থতা তাহাকে লাভ করিতে দেয় না। প্রবৃত্তিগুলিকে পরিপূর্ণ ভাবে বাহিরে আসিতে দিলেই যে তাহারা বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা পায় এবং জীবনকে বিশ্বের সঙ্গে বৃহতের সঙ্গে সত্যসম্বন্ধযুক্ত করিতে পারে, সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখিব যে তাঁহার প্রকৃতি বার বার প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহাকে বিশ্বের মধ্যে সমগ্রের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক অবস্থার কাব্যের মধ্যে এই বিশ্ব যাত্রার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন রহিয়াছে।

যখন "সন্ধ্যা সঙ্গীতে" আপনার হৃদয়াবেগের জটিল অরণ্যের মধ্যে আপনারই ভিতরে আপনি অবরুদ্ধ থাকিবার বেদনায় কবি পীড়িত, তখনও "সংগ্রাম সঙ্গীত" "আমি-হারা" প্রভৃতি কবিতায় ক্রন্দন বাজিয়াছে—আমার অবরুদ্ধ হৃদয় জগৎকে হারাইতে বসিয়াছে :—

"বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার।
* * *
ঊষার মুখের হাসি লয়েছে কাড়িয়া
গভীর বিরামময় সন্ধ্যার প্রাণের মাঝে
দুরন্ত অশান্তি এক দিয়েছে ছাড়িয়া।
* * *
ফুল ফুটে আমি আর দেখিতে না পাই
পাখী গাহে মোর কাছে গাহেনা সে আর।"

যখন "ছবি ও গান" প্রভৃতিতে কল্পনার মোহাবেশের মধ্যে থাকিয়া তাহারি রঙে সব জিনিসকে রঙীন করিয়া দেখিতেছেন, "কড়ি ও কোমলে" "চিত্রাঙ্গদা"য় সৌন্দর্য্যের আবেগ এক অনির্ব্বচনীয় রহস্যে হৃদয়কে দোলা দিতেছে অথচ ভোগ-প্রবৃত্তি তাহাতে মিশিয়া একটি মোহ রচনা করিতেছে—তখনও এই বেদনা শেষাশেষি জাগিতেছে যে বাসনা সমস্ত ম্লান করিয়া দিল, তাহার জন্য বৃহতের সঙ্গে যোগের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। সেই বেদনাতেই কবি বলিতেছেন-

"ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে দাঁড়াও সরিয়া
ম্লান করিয়োনা আর মলিন পরশে।
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে।
* * *
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস
যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ।"

তারপর "মানসী"তে আপনার ব্যক্তিগত আবরণের মধ্যে যখন প্রেমকে নিবিড় করিয়া তাহাকে তাহারই মধ্যে একান্ত করিয়া দেখিতেছেন, তখনও ভিতরে ভিতরে ঐ এক ক্রন্দন জাগিতেছে, যে, প্রেম সব নয়, সমস্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে তাহার যেটুকু স্থান সে তাহা ছাড়াইয়া অত্যন্ত একান্ত হইয়া উঠিতে চায়!

"বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা।
* * *
ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে
অতি সঙ্গোপনে
সুখে দুঃখে, দিবসে নিশীথে,
বিপদে সম্পদে
জীবনে মরণে
বিশ্ব জগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিয়াছে ফুটি
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?"

এই যেমন তাঁহার প্রথম বয়সের তেমনি তাঁহার শেষ

বয়সের কাব্য "ক্ষণিকা"তেও সৌন্দর্য্যের সন্ন্যাসী কবি যখন ভোগ-ক্ষুব্ধ যৌবনকে ছাড়াইয়া ভার-শূন্য প্রাণে বাংলা গ্রাম্যপ্রকৃতির বুকের মধ্যে একটি স্থিরশান্তির ঘর বাঁধিতেছেন, একটি "অকূল শান্তি বিপুল বিরতির" মধ্যে সমস্ত সৌন্দর্য্যকে সহজ করিয়া সরল করিয়া ব্যাপ্ত করিয়া বিরল করিয়া দেখিতেছেন, তখন শেষের দিকে ক্রমেই একটি নিবিড়তর স্পর্শে একটি অতলের অতলে নিমগ্ন হইবার উপক্রম চলিতেছে :-

"পথে যতদিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।"

এইরূপে দেখা যাইতে পারে যে কেবলি এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে আসিবার এই যে একটি ভাব রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের মধ্যে দেখা যায় তাহার কারণই ঐ, যে, তাঁহার কবি-প্রকৃতি আপনার সমস্ত বিচিত্রতাকে কেবলি উদ্ঘাটন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে, এবং কেবলি তাহাদের ছিন্নবিচ্ছিন্নতার মধ্যে তাহাদের বিরোধের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য একটি বৃহৎ ঐক্যকে অনুসন্ধান করিয়াছে। এ যেন ভারতবর্ষের আপনাকে খর্ব্ব করিয়া সকলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধনার সঙ্গে ইউরোপীয় প্রবৃত্তিমূলক সাধনা মিলিত হইয়া এক অভিনব বৈচিত্র্য রচনা করিয়াছে।

সকলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধনা সর্ব্বমেবাবিশন্তি আধুনিক ধর্ম্মোপদেশসমূহে যে কথাটির প্রতি রবীন্দ্রবাবু সকলের চেয়ে বেশি জোর দেন এবং যে সাধনাটি তাঁর মতে বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরই, সেই কথাটির উল্লেখ করিলাম বলিয়া এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক।

আমার মনে হয় সকল কবির জীবনের মধ্যেই একটি মূলসুর থাকে। অন্যান্য সকল বৈচিত্র্য সেই মূলসুরের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া একটি অপরূপ রাগিণী নির্ম্মাণ করে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই মূলসুরটি কি? সেটি প্রকৃতির প্রতি একটি অতি নিবিড় অতি গভীর প্রেম। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি প্রেম নানা কবির মধ্যে নানা ভাবে বিরাজমান। ইহার প্রেমের স্বরূপটি কি?

তাঁহার লেখা হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলেই আপনারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন :

"প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব ক'রে। এই তৃণগুল্মলতা, জলধারা, বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্ত্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণপর্য্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়ছে যেখানেই ঝঙ্কার উঠছে সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হ'ত, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্তদেশকাল স্পন্দমান হ'য়ে না থাকত তাহ'লে কখনই এই বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হ'ত না। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই ব'লেই আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হ'য়ে উঠ্‌ত।"

প্রকৃতির সঙ্গে যোগের এই ভাবটিকে রবীন্দ্রবাবু উত্তরকালে বিশ্ববোধ নাম দিয়াছেন, সর্ব্বানুভূতি বলিয়াছেন। সমস্ত জলস্থল আকাশকে সমস্ত মনুষ্যসমাজকে আপনার চৈতন্যে অখণ্ডপরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই সর্ব্বানুভূতি।

আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এই সর্ব্বানুভূতিই কবির জীবনের ও কাব্যের মূলসুর; অন্যান্য সমস্ত বৈচিত্র্য সৌন্দর্য্য, প্রেম, স্বদেশানুরাগ, সমস্ত সুখ দুঃখ বেদনা এই মূলসুরের দ্বারা বৃহৎ এবং বিশ্বব্যাপী একটি প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকল কাব্যের মধ্যেই যেখানেই জীবন কোন প্রবৃত্তির ভিতরে বাধা পড়িতেছে, সেখানেই আপনার অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া আপনার চেয়ে যাহা বড় তাহাকে পাইবার কান্না লাগিয়াই আছে, এই মূলসুরের মধ্যেই সেই ক্রন্দনের অর্থ নিহিত। এই সুরই কবির জীবনের সকল বিচিত্রতাকে গাঁথিয়া তুলিয়াছে এই সুরই বারম্বার ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছাড়াইয়া বিরাটের সঙ্গে তাঁহার জীবনকে যুক্ত করিয়াছে।

এইবার তাঁহার জীবনচরিত ও কাব্য এই উভয়কেই একত্রে মিলাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের ভিতরের এই তত্ত্বটি উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের সকলের চেয়ে বড় স্মৃতির বিষয় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার যে একটি নিকট আত্মীয়তার যোগ ছিল, তাহারই আনন্দ! তিনি বলেন,

যখন তিনি নিতান্ত বালক বাড়ীর চাকরের হেপাজতে থাকিতেন, তখন যোড়াসাঁকোর বাড়ীর দক্ষিণ দিকের জানালার নীচে একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল, সেই পুকুরের পূর্ব্বধারে প্রাচীরের গায়ে একটি প্রকাণ্ড চিনে বট এবং দক্ষিণ প্রান্তে এক সারি নারিকেল গাছ ছিল। ভৃত্য তাঁহাকে ঘরে আবদ্ধ থাকিতে বলিয়া কাজে যাইত, সমস্ত দিন সেই পুকুর দেখিয়া তাহার সময় কাটিত। সেই ডালপালাওয়ালা ঘন বট তাঁহার কাছে কি রহস্যময় ছিল! এক এক দিন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সুদূর বিস্তৃত কলিকাতা সহরের নিস্তব্ধ বাড়ীগুলার দিকে চাহিয়া তাহার ভিতরের নানা রহস্যের কল্পনায় সেই বালকের মন উন্মনা হইয়া উঠিত, মাঝে মাঝে চিলের সুতীব্র তীক্ষ্ণ স্বর, ফিরিওয়ালাদের বিচিত্র সুরের হাঁক বিশ্বের সঙ্গে নূতন পরিচয়ের আবেগে সমস্ত চেতনাকে স্পন্দিত তরঙ্গিত করিত।

পরবর্ত্তীকালে এই বাল্যজীবন স্মরণ করিয়া তিনি যে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই :-

"আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা একটু একটু মনে পড়ে, কিন্তু সে এত অপরিস্ফুট যে ভাল করে ধরতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তাম, মনে করতাম কি একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। * * * পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তায় শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্দ্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্ত্তিতে আমাকে সঙ্গদান করত।"

অতি অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যালয়ে যান, কিন্তু হায়, পৃথিবীর অধিকাংশ কবির ন্যায় "জননী বীণাপাণির পদ্ম বনটির প্রতি শিশুকাল হইতেই তাহার লোভ ছিল, কিন্তু তাঁহার কমল সরোবরের তীরে গুরুমশায়-অধিরাজিত যে বেত্রবনটা কণ্টকিত হইয়া আছে, সেটাকে তিনি অত্যন্ত বেশি ডরাইতেন।" বিদ্যালয়-জীবনের স্মৃতি যে তাঁহার কাছে কিরূপ সুখকর তাহা গল্পগুচ্ছের "গিন্নি" গল্পটি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। নর্ম্মাল বিদ্যালয়েরই এক পণ্ডিত একটি ছাত্রকে তাহার বাড়ীতে আপন ভগ্নীদের সঙ্গে পুতুল খেলিতে দেখিয়া ক্লাসে তাঁহাকে ঐরূপ বিদ্রূপ সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বৎসর তাঁহার ক্লাসে একটি কথারও উত্তর দিতেন না, তাঁহার অভদ্র আচরণ তাঁহাকে এমনি পীড়া দিয়াছিল। অথচ বাংলাভাষার পরীক্ষায় যখন তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিলেন তখন উক্ত পণ্ডিত কোনমতেই তাহা বিশ্বাস করিতে রাজি হইলেন না।

যাহাই হোক্ বিদ্যালয়ের জীবন তাঁহার কাছে "দুঃসহ জীবন" ছিল। বিদ্যালয়ে তাঁহার পড়াশুনা যে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু বিদ্যালয়ে পড়াশুনা না করিলেও বাল্যকাল হইতে বাংলা পড়িবার অভ্যাস থাকায় বিচিত্র বাংলা পুস্তক কবে শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখনকার দিনে এমন বাংলা বই নাম করা শক্ত যাহা তিনি পড়েন নাই। ইহাতে তাহার কল্পনার খোরাক নিঃসন্দেহ জুটিয়াছিল এবং ভাবপ্রকাশও অনেকটা পরিমাণে বাধাহীন হইয়া আসিয়াছিল।

বাংলা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে যখন পড়া চলিতেছে, তখন ইহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ তখন কল্পনার অতীত। হিমালয় দেখিবেন! এতবড় সৌভাগ্য!

যাত্রার পথে বোলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরের জগতের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়, তাহার পূর্ব্বে গঙ্গার তীরে একটা বাগানবাড়িতে কিছুদিনের জন্য বড় আনন্দে যাপন করিয়াছিলেন মাত্র। কবির নিজের কাছে গল্প শুনিয়াছি যে বোলপুর ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতনে রাত্রিকালে পাল্কী করিয়া আসিবার সময়ে তিনি কিছুই চাহিয়া দেখেন নাই পাছে "রাত্রে নূতন দৃশ্যের অস্পষ্ট আভাস চোখে পড়িয়া প্রাতঃকালের নবীন কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির কিছুমাত্র রসভঙ্গ করে।"

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া এলাহাবাদ কানপুর প্রভৃতি নানাস্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে অমৃতসরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে ডালহৌসি পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পাহাড়ের অধিত্যকা-উপত্যকা-দেশে স্তরে স্তরে তখন চৈত্রের সোনার ফসল বিস্তীর্ণ,—দুর্গম গিরিপথ, কলধ্বনিমুখরিত ঝরণা, কেলুবন এ সমস্ত পার্ব্বত্য ছবি দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখের আর শ্রান্তি রহিল না।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছু কাল পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স বারো। তাহার পর হইতে তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো আরো দুরূহ হইয়া পড়িল। এবং ক্রমশ তাঁহার গুরুজন এই বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্ত হইলেন। পাহাড়ে থাকিতে পিতার নিকটে অল্প কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, কিছু ইংরাজী, কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ঋজুপাঠ, কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞান। কিন্তু বাংলা পড়ায় তাঁহার বিরাম ছিল না। এই সময়ে তাঁহার কোন অধ্যাপক তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে কুমারসম্ভব শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ প্রভৃতি তাঁহাকে তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতেন। বাড়ীতেও সাহিত্যচর্চ্চার অভাব ছিলনা। ৺অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে ছিলেন ভরপুর। তাঁহার মুখে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের কল্পনা প্রবণ চিত্ত বিস্তর খোরাক সংগ্রহ করিত। ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গেও ইহাঁদের বাড়ীর বিশেষ একটি প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং বালক বয়স হইতেই সাহিত্য চর্চ্চার আবহাওয়ার মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন।

যেমন সাহিত্যচর্চ্চা তেমনি গীতচর্চ্চা। বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত গান শুনিয়া ও তৈরি করিয়া সুরের অনির্ব্বচনীয়তার রাজ্যে তাঁহার মন ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

কবি অল্প বয়স হইতেই অনেক রচনা করিয়াছেন, সে সকলের উল্লেখ আমরা করিব না। তাঁহার ষোল বৎসর বয়সের সময় তাঁহাদের বাড়ি হইতে "ভারতী" কাগজখানি প্রথম বাহির হয়, তাহাতে কবির অনেক বাল্যরচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

"ভারতী" দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিলে রবীন্দ্রনাথ সতের বৎসর বয়সে বিলাত যাত্রা করেন। তাহার পূর্ব্বে আমেদাবাদে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিছু কাল বাস করেন। শাহীবাগের বাদশাহী আমলের প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে ছিল তাঁহাদের বাসা—প্রাসাদের পাদমূলে সাবরমতী (সুবর্ণমতী) নদীর ক্ষীণ স্রোত প্রবাহিত—প্রকাণ্ড ছাদ বিচিত্র কক্ষ এবং তাহাদের প্রবেশের বিচিত্র পথ—সবটা জড়াইয়া ভারি রহস্যময় একটি স্থান। এই প্রাসাদের স্মৃতি অবলম্বনেই ভবিষ্যতে "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটি রচিত হয়।

এইখানে অবস্থান কালে কবির ইংরাজী শিক্ষা অনেকটা আপনা-আপনি অগ্রসর হয়, ইংরাজী সাহিত্যের দুরূহ গ্রন্থ সকল তিনি পাঠ করিতেন এবং তাহার ভাব অবলম্বনে বাংলায় রচনা প্রকাশ করিতেন।

আঠারো বৎসর বয়সে "ভগ্নহৃদয়" প্রকাশিত হয়। তারপরেই "সন্ধ্যা সঙ্গীত"। তখন ইংলণ্ড হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যা-সঙ্গীত কতক কলিকাতায় লেখা এবং কতক চন্দননগরের বাগানবাড়িতে। গঙ্গাতীরের উপর "ঘাটের সোপান বাহিয়া পাথর বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ অলিন্দ পাওয়া যাইত, বাড়িটি তাহার সঙ্গেই সংলগ্ন।" সেখানে একদিন বর্ষার দিনে "ভরাবাদর মাহভাদর" বিদ্যাপতির পদটিতে সুর বসাইয়া সমস্ত বর্ষা সেই সুরে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। সূর্য্যাস্তে অনেক দিন তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এবং রবীন্দ্রনাথ নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গানের পর গানে সূর্য্যাস্তের সোনার উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন, অনেক স্বপ্নপুষ্ট জ্যোৎস্না-রাত্রি ছাদের উপর কাটিয়া গিয়াছে। হিমালয় ভ্রমণের পরে এমন আনন্দময় স্থান আর কোথাও তিনি পান্ নাই।

গদ্যে তখন ভারতীতে "বিবিধ প্রসঙ্গ" বাহির হইতেছে, "বৌ ঠাকুরাণীর হাট"ও লেখা চলিতেছে।

"সন্ধ্যা সঙ্গীতে"ই সর্ব্বপ্রথমে নিজের সুর আবিষ্কার করিবার আনন্দ কবি অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার ভাষা, ছন্দ ও ভাব হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ছন্দ এলো মেলো, কিন্তু ধার করা নয়। অনুকরণ ছাড়াইয়া যে একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে ফুটিয়াছিল তাহা ইহার সমস্ত অসম্পূর্ণ প্রকাশের মধ্যেও প্রকট।

নব যৌবনের আরম্ভে অন্তরে যখন হৃদয়াবেগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে অথচ বিশ্বজগতের সহিত তাহার যথোচিত যোগ ঘটিতেছে না হৃদয়ের অনুভূতির সহিত জীবনের অভিজ্ঞতার যখন সামঞ্জস্য হয় নাই তখন নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার যে অধীরতা তাহাই "সন্ধ্যা সঙ্গীতে"র কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

৺মোহিত বাবু তাঁহার সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে এই শ্রেণীর কবিতার "হৃদয়ারণ্য" নাম দিয়াছিলেন। আবেগগুলা সত্য হইলেও বাস্তব জগতে তাহাদের কোন অধিকার ছিল না বলিয়া তাহারা বাড়াবাড়ির মধ্যে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছিল, অসুস্থ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল। প্রায় কবিতার নাম হইতেই তাহা বুঝা যায় "আশার নৈরাশ্য", "সুখের বিলাপ," "তারকার আত্মহত্যা", "দুঃখ আবাহন" ইত্যাদি। কেবল কান্না ঃ

"বিরলে বিজন বনে বসিয়া আপন মনে
ভূমি পানে চেয়ে চেয়ে একই গান গেয়ে গেয়ে
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
* * *
বসিয়া বসিয়া সেথা বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে একই গান একই গান একই গান।"

অথচ আশ্চর্য্য এই, যে ইহারই মধ্যে ভিতরে ভিতরে আর একটা বেদনা ছিল এবং ইহার বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম ছিল, আপনার সেই প্রথম বাল্যকালের সহজ সুন্দর ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই রকম আনন্দিত হইবার জন্য, আপনার "সুকুমার আমি"কে আবার ফিরিয়া পাইবার জন্য। "পরাজয় সঙ্গীত" "আমি-হারা" প্রভৃতি কবিতা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় ঃ

"কে গো সেই, কে গো হায় হায়
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয়-মাঝারে
দুলিতরে অরুণ দোলায় ?
সচেতন অরুণ কিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি ?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি
সে আমার সুকুমার আমি।"

তারপরে

"প্রতিদিন বাড়িল আঁধার
পথ মাঝে উড়িলরে ধূলি,
হৃদয়ের অরণ্য আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।
* *
ধূলায় মলিন হ'ল দেহ
সভয়ে মলিন হ'ল মুখ,
কেঁদে সে চাহিল মুখ পানে
দেখে মোর ফেটে গেল বুক।
* *
অবশেষে একদিন, কেমনে কোথায় কবে
কিছুই যে জানিনে গো হায়
হারাইয়া গেল সে কোথায়!
* *
হারায়েছি আমার আমারে
আজ আমি ভ্রমি অন্ধকারে।"

ইহার পরেই "প্রভাত সঙ্গীত।" কিন্তু তাহার সঙ্গে এ ভাবের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। প্রভাত সঙ্গীতে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দকে যেন হঠাৎ ফিরিয়া পাইলেন।

"আপন জগতে আপনি আছিস
একটি রোগের মত"—

সেই অসুস্থ অবসাদের ভাব একেবারে কাটিয়া গেল। নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল এবং সে অন্ধকার হৃদয়-গুহা ভেদ করিয়া বাহির হইল।

"বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক রেখা।
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,
থর থর করি কাঁপিছে বারি,
টলমল জল করে থল থল
কল কল করি ধরেছে তান।"

সন্ধ্যা সঙ্গীত হইতে অকস্মাৎ এরূপ ভাবব্যতিক্রমের একটু বিশেষ ইতিহাস আছে। সেটি দিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে আমি প্রবন্ধের গোড়াতে যে বলিয়াছি যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরতম যোগের অনুভূতি কবির কাব্যের সুর, তাহার সত্যতা কোথায়।

কবির ভাষাতেই সে ইতিহাসটি দিই ঃ—

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটার পূর্ব্ব প্রান্তে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে যেমনি আমি সূর্য্যোদয় দেখিলাম অমনি আমার চোখের উপর হইতে যেন পর্দ্দা উঠিয়া গেল। একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার আচ্ছন্ন হইয়া গেল—আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র তরঙ্গিত হইতে লাগিল। * * আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিলাম। * * আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিলনা। পূর্ব্বে যাহাদের সঙ্গ আমার পক্ষে বিরক্তিকর ছিল তাহারা কাছে আসিলে আমার হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদের গ্রহণ করিতে লাগিল। রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী তাহাদের শরীরের গঠন তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে সৌন্দর্য্যময় বোধ হইত। সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া যাইত। রাস্তা দিয়া একটি যুবক আর একটি যুবকের কাঁধে হাত দিয়া যখন হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত তখন তাহা আমার কাছে একটি অপরূপ ব্যাপার বলিয়া ঠেকিত—বিশ্বজগতের অফুরান রসের ভাণ্ডার হাসির উৎস যেন আমার চোখে পড়িত। কাজ করিবার সময়ে মানবশরীরে যে আশ্চর্য্য গতিবৈচিত্র্য

প্রকাশিত হয় পূর্ব্বে তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে একটি বৃহৎভাবে মুগ্ধ করিতে লাগিল।"

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখাসখী বসিয়া চোখোচোখী
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
* * *
পরাণ পূরে গেল হরষে হ'ল ভোর
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর!
* * *
যে দিকে আঁখি যায় যে দিকে চেয়ে থাকে
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে!"

আমার খুব বিশ্বাস যে "প্রভাত সঙ্গীতে"ই কবির সমস্ত জীবনের ভাবটির ভূমিকা নিহিত হইয়া আছে। অংশের মধ্যে সম্পূর্ণকে, সীমার মধ্যে অসীমকে নিবিড়রূপে উপলব্ধি করাই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের সাধনা—আমি পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে এই সর্ব্বানুভূতিই তাঁহার কাব্যের মূলসুর এবং এই ভাবটি সঙ্গীতের প্রেরণা হইতে একটি নূতন চেতনার মত তাঁহার মধ্যে বরাবর কাজ করিয়া আসিয়াছে। যদি একথা সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে, যে দৃষ্টির এই আকস্মিক আবরণ উন্মোচন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই আনন্দময় উপলব্ধি, এইটি প্রথমে অখণ্ড ভাবে দেখা দিয়া, তারপরে জীবনের বিচিত্রতার খণ্ড খণ্ড পথ বাহিয়া আবার ঐ অখণ্ড সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি লাভ করিবার দিকে শেষ বয়সে কবিকে তপস্যায় নিযুক্ত রাখিয়াছে।

প্রভাত সঙ্গীতের আর একটি মাত্র কবিতার আমি এখানে উল্লেখ করিতে চাই। সেটি প্রতিধ্বনি। সেটি দার্জ্জিলিঙে লেখা। তখন এই আবরণোন্মুক্ত দৃষ্টিটি হারাইয়াছেন। কবিতাটির ভাব এই যে, বস্তুজগতের অন্তরালে যে একটি অসীম অব্যক্ত গীতজগৎ আছে, যেখানে সমস্ত জগতের বিচিত্রধ্বনি সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়া "অনাহত শবদে" নিরন্তর বাজিতেছে—তাহার আভাস, তাহার প্রতিধ্বনি প্রত্যেকটি খণ্ড সৌন্দর্য্যে খণ্ড সুরে পাওয়া যায়—সেইজন্যই তাহারা প্রাণের মধ্যে এমন সুতীব্র একটি ব্যাকুলতাকে জাগায়। বস্তুত পাখীর গান পাখীরই নয়, নির্ঝরের কল শব্দ নির্ঝরেরই নয়, তাহা সেই মূল সঙ্গীতেরই নানা প্রতিধ্বনি—এইজন্যই জগতের যে সকল সুর ধ্বনিত হইতেছে এবং যাহারা ধ্বনিত হইতেছেনা সকলে মিলিয়া আমাদের মনে একই সৌন্দর্য্য-বেদনাকে জাগাইয়া তুলিতেছে। আমরা নানা প্রতিধ্বনি শুনিতে শুনিতে সেই মূল সঙ্গীতকে শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি।

"তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর
* *
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া
তোরে আমি ভাল বাসিয়াছি
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি।
* * *
দেখা তুই দিবি নাকি? না হয় না দিলি
একটি কি পূরাবিনা আশ?
কাছে হতে একেবারে শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছ্বাস।
অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান
ঝটিকার বজ্র গীতস্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
চেতনার নিদ্রার মর্ম্মর,
বসন্তের বরষার শরতের গান
জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহাঅন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহতপনের
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানিরে হতেছে মিলিত!
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে,
সেই মহা আঁধার নিশায়
শুনিবরে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত
তোর মুখে কেমন শুনায়।"

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি—হৃদয়াবেগকে সুরের অনির্ব্বচনীয় ভাষায় ব্যক্ত করাই তাঁহার চিরজীবনের কাজ। গানের সুরে কবির কাছে জগতের একটি অপরূপ রূপান্তর ঘটে। হঠাৎ চোখে-দেখা জগৎ ক্ষণকালের জন্য যেন সুরের জগৎ কানে শোনা জগৎ হইয়া উঠে—সমস্ত বিশ্বস্পন্দনকে কেবল আলোকরূপে বস্তুরূপে না দেখিয়া তাহাকে একটি অপরূপ সঙ্গীতের মত যেন কবি অনুভব করিতে থাকেন। একটা চিঠিতে আছে:—

"অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চির বিরহবিষাদ আছে, সে এই সন্ধেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কি একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়,—সমস্ত জলেস্থলে আকাশে কি একটি

ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা—অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণ নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় তাহলে কি একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর করুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত বেজে ওঠে। আসলে তাই হচ্ছে। কেননা জগতের যে কম্পন আমাদের চোখে এসে আঘাত করচে সে আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করচে সে শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্ট চিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্ম্মনি (harmony)কে মনে মনে একটি বিপুল সঙ্গীতে তর্জ্জমা করে নিতে পারি।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যে অনেকে একটা অস্পষ্টতা অনুভব করেন সে এই সুরের আবেগের জন্য। "সঙ্গীত স্রোতে ভেসে যাই দূরে খুঁজে নাহি পাই কূল"। তাহার কারণ গানের সুর আমাদের মনে যে সৌন্দর্য্যকে জাগায় তাহাকে কোন সঙ্কীর্ণ কথার দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম তবে সুরের প্রয়োজনই ছিল না। সেইজন্য সুরে যখন কোন অনুভূতি বাজে তখন তাহার চারিদিকে একটি অনির্ব্বচনীয়তার হিল্লোল খেলিতে থাকে সে যাহা বলে তাহার চেয়ে ঢের বেশি না বলার দ্বারা বলে—গানের প্রকাশ সেইজন্য কথার প্রকাশের পরবর্ত্তী সপ্তকে লীলা করিতে থাকে।

এই গান যে কেবল কাব্যে, তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যেই ইহা কাজ করিয়াছে দেখিতে পাই। তাঁহার দৃষ্টিটাই গানের দৃষ্টি খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্য সহচররূপে অখণ্ডকে দেখা। সুর যেমন প্রত্যেক কথাটির মধ্যে অনির্ব্বচনীয়কে উদ্ঘাটন করে, তাঁহার হৃদয়, সেই রূপ, সমস্ত দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপরূপকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে চায়। আমার মনে হয় তাঁহার অধিকাংশ গদ্যগল্পগুলিও এই রকম এক একটি গীত। তাহা এক একটি ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঘটনার মূলগত এক একটি বিশ্বব্যাপী সুরের অনুরণনে পাঠকের মনকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে চায়।

প্রভাত সঙ্গীতের পর "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক একটি নাটক লিখিত হয়। এই নাটকের নায়ক এক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে ভালবাসিয়া তাহাকে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল। তাহার তখন এই উপলব্ধিটি হইল যে সীমার মধ্যেই অসীমতা, প্রেমের বন্ধনেই যথার্থ বন্ধনমুক্তি। যে জগৎকে তাহার অত্যন্ত বিরূপ ও ক্ষুদ্র লাগিয়াছিল তাহাই তাহার কাছে আনন্দময় হইয়া দেখা দিল।

আমার নিজের বিশ্বাস যে নাটকের কাহিনীটি যেমনি হৌকনা ইহাও একপ্রকার প্রভাতসঙ্গীতেরই অনুবৃত্তি। এক সময়ে যে তাঁহার প্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছিল, আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হইয়া তিনি বেদনা পাইতেছিলেন, সেইটা কাটিয়া গিয়া পুনরায় বিশ্বের আনন্দলোকের সঙ্গে মিলিত হইবার আত্মকাহিনীর একঅংশ এই নাটকের মধ্যে আছে।

"ছবি ও গানের" অধিকাংশ কবিতা এই সময়েই লিখিত হয়। "কড়ি ও কোমল" তাহার পরে। কবিতা এই সময় হইতেই অনেকটা সংহত আকার ধারণ করিয়াছে,—চিত্রগুলি নির্দিষ্ট, হৃদয় ভাবগুলিও স্পষ্ট এবং ভাষা ও ছন্দ নিয়মিত। কিন্তু এই সময়ের সকল কবিতার মধ্যেই কল্পনার একটা স্বপ্নাবেশ লাগিয়া আছে। কল্পনার রঙে সমস্ত সৌন্দর্য্যকে একটু বিশেষ ঘের দিয়া লইবার ও ভোগ করিবার একটি ভাব ইহাদের মধ্যে আছে। বাস্তব বলিতে যাহা বুঝায়, এ কবিতাগুলি তাহা নয়—বাস্তব জগতের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ অল্পই। ইহাদের মধ্যে আপনারই কল্পনার রসকে বাহিরের জিনিসে স্থাপিত করিয়া দেখিবার একটি আনন্দ আছে। যেটুকু বিশেষ ভাবে ভোগের সীমায় আসিয়া ধরা দেয়, কল্পনার রঙে রঙীন হইয়া হৃদয়কে তৃপ্ত করে, সেইটুকু চুনাইয়া লইবার একটি প্রয়াস। সৌন্দর্য্য ভোগের একটি বিশেষ অবস্থার কাব্য ছবি ও গান, এবং কড়ি ও কোমল। এই দুই কাব্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে ছবি ও গানে কল্পনার ভাগটা বেশি, কড়ি ও কোমলে হৃদয়াবেগ বেশি।

মোহিতবাবু-সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে এই সময়কার অধিকাংশ কবিতাকে "যৌবন স্বপ্ন" নামের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। পক্ষীদের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে তাহাদের মিলনের কাল উপস্থিত হইলে তাহাদের ডানাগুলি বিচিত্র রঙেচঙে মণ্ডিত হইয়া উঠে তেমনি হৃদয়বৃত্তির মুকুলিত অবস্থায় একটি স্বপ্নাবেশ আছে—একটি স্বর্ণআভাময় মোহ তখন নানা বিচিত্র কল্পনার ছবিতে এবং সুরে আপনাকে

প্রকাশ করিতে থাকে। এ সম্পূর্ণরূপে বাস্তব নহে, এ অনেক পরিমাণে স্বপ্নই। কিন্তু এই—

"মধুর আলস মধুর আবেশ
মধুর মুখের হাসিটি
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি"র

রাজ্য বড় মোহময়।

যাঁহারা সৌন্দর্য্যের এই মোহকে ভোগলালসা নাম দিতে চান এবং সেইজন্য এই সকল শ্রেণীর কবিতাকে অপবাদ দিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে কোন মতেই মিলিতে পারিলাম না। মানুষের মনে অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ভোগের ইচ্ছা আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, একথা মানিনা। ভোগের সমস্ত ক্ষণিকতা ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্য্যের একটি অসীমমুক্ত রূপ আছে সেই রূপটিকে সত্য-ভাবে দেখিতে পাইলেই ভোগের লালসা আপনি ক্ষয় হইয়া যায়। এই জন্য মানবের দেহে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে একটি প্রাণময় মনোময় অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের প্রকাশ আছে তাহার লোকাতীত রহস্যময় পরম বিস্ময়কর সুরটিকে যদি ধরিতে পারি তবে রক্তমাংসময় স্থূলবস্তুই একান্ত সত্যরূপে আমাদিগকে আকর্ষণ করে না—তখন তাহার অন্তরতম অনন্ত সত্যটিই আমাদিগের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিবার জন্য আবির্ভূত হয়। মানবদেহের এই নিবিড় সৌন্দর্য্যের সুরটিকে কবি তাঁহার বীণা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে পারেন না। এ সুর বিধাতার জগতে বাজিতেছে, এ সুর কবির বীণাতেও বাজিয়া উঠিবে। কেবল দেখিবার বিষয় এই যে এই সুর বিশ্বসঙ্গীতের অন্য সকল তানকে অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন করিয়া নিজেকেই একান্ত প্রবল করিয়া না তোলে। আমাদের ভোগস্পৃহার নিগূঢ় উত্তেজনাবশতই সেই অপরিমিত প্রবলতার আশঙ্কা আছে। সেইজন্যই প্রবৃত্তির পাল এবং নিবৃত্তির হাল, এই দুইয়ের সহযোগেই তবে সৌন্দর্য্যের তরীটিকে সত্যের পথে ঠিক বিনাবিপদে চালনা করা সম্ভবপর হয়।

আমি জানি "কড়ি ও কোমলে"র অনেকগুলি কবিতা এবং "চিত্রাঙ্গদা" অনেকের কাছে ইন্দ্রিয়াসক্তির কাব্য বলিয়া নিন্দনীয় হইয়াছে। উক্ত কাব্যদ্বয়ে ভোগের সুর যে কিছুমাত্র লাগে নাই, তাহা আমি বলিনা, কিন্তু সেই সুরই উঁহাদের মধ্যে একান্ত নহে। বরং তাহাকে চরমস্থান না দিবার এবং তাহার সীমা নির্ণয় করিয়া দেখাইবার একটি ভাব ঐ দুই কাব্যেরই মধ্যে প্রবল। চিত্রাঙ্গদার রূপটা যে বাহিরের জিনিস, ক্ষণিক বসন্তের প্রদত্ত একটি অস্থায়ী সৌভাগ্যের মত তাহা বিশেষ করিয়া নাট্যের মধ্যে ঘটাইবার একটু উদ্দেশ্য আছে। বাহিকরূপ এবং অন্তরের মানুষ এ দুয়ের দ্বন্দ্ব যে কি প্রবল তাহা আর কোন উপায়ের দ্বারাই দেখান যাইত না। আমিতো বরং মনে করি যে "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যখানি সৌন্দর্য্যকে বাহিরের দিক্ হইতে ভোগের একটা মস্ত প্রতিবাদ। ইহাতে ভোগকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা হইয়াছে, ভোগের অবসাদকে এবং শূন্যতাকেও তেমনি করিয়া দেখান হইয়াছে।

"সংসার পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ
কোথা পাব কুসুম লাবণ্য দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা!"

সেই সমস্ত অসম্পূর্ণতা খণ্ডতার মধ্যেই প্রেমের যে "এক সীমাহীন অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ" বিদ্যমান, সেই জায়গাটাতেই কি জোর দিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যের মায়াময় আবরণকে কবি চিত্রাঙ্গদার ছিন্ন করিয়া ফেলেন নাই?

"কড়ি ও কোমলে"র শেষের দিকেও ভোগকে একেবারে দলিত করিয়া তাহার কারাগার হইতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য বারম্বার একটি ক্রন্দন আছে।

"কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এবাতাস
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ!"

সেইজন্যই স্পষ্টই বুঝা যায় যে কবির সৌন্দর্য্যসাধনায় ভোগ কখনই একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

সৌন্দর্য্যের বেলা যেমন দেখা গেল, প্রেমের বেলাতেও ঠিক তাই। "মানসী"র প্রেমের কবিতাগুলিতে যদিচ প্রেমের জীবনের খুব গভীরতার পরিচয় আছে, যে প্রেম আপনার "জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা" বলিবার জন্য ব্যাকুল, যে প্রেমের ধ্যাননেত্রে "যতদূর হেরি দিক্‌দিগন্তে তুমি আমি একাকার," যে প্রেম আপনাকে জন্মজন্মান্তরে অনন্ত বলিয়া জানে—তথাপি সে প্রেম যে জীবনের সব নয় তাহাকে যে চরম করিয়া তোলা চলে না, এমন একটা ভাব

"মানসী"র অধিকাংশ কবিতার মধ্যে বারম্বার প্রকাশ পাইয়াছে।

"নিষ্ফল কামনা"র কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। "নিষ্ফল প্রয়াসে"র মধ্যেও সেই একই কথা। "আঁখির অপরাধ" কবিতাটিতে প্রেম যে সমস্ত হরণ করিয়া একটি মূর্ত্তির মধ্যেই বাঁধা পড়িয়া গেছে—সেই মূর্ত্তির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছেঃ

"ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া।
যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া॥"

এই "মায়ার খেলা" হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কি তীব্রঃ -

"যাক সব যাক। পারিনে ভাসিতে কেবলি মূরতি-স্রোতে
লহ মোরে তুলে আলোক-মগন মূরতি-ভুবন হ'তে।
আঁখি গেলে মোর সীমা চ'লে যাবে, একাকী অসীম ভরা
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।"

একবার এই আঁখির জগৎ মুছিয়া গেলে তারপর আবার সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহার নবীন নির্ম্মলতায় যখন প্রকাশ পাইবে তখনই এই বেদনা মুছিয়া যাইবে, এই আশ্বাসের কথা 'আঁখির অপরাধ' কবিতাটির শেষে আছে।

তবেই দেখা যাইতেছে, যে সৌন্দর্য্য ও প্রেম যেখানেই সমগ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া বাসনার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ঘুরিয়া মরিয়াছে, সেখানেই কবির চিত্তে বেদনা জাগিয়া সেই বাসনাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য লড়াই করিয়াছে। সেই "ভৈরবী গানে"র

"মন উদাসীন ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল পরশে সকল জীবন
বিকলি।"

সমস্ত মানসীর মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া সেই ভৈরবীর বৈরাগ্যের বিকল-করা সুর শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা আমার বিশ্বাস।

"মানসী"র মধ্যে যে সকল ব্যঙ্গ কবিতা স্থান পাইয়াছে, যথা "বঙ্গবীর" "দেশের উন্নতি" "ধর্ম্মপ্রচার" প্রভৃতি, তাহাদের মধ্যেও একটি বেদনা আছে। আমাদের দেশের চারিদিকের ক্ষুদ্র কথা ক্ষুদ্র চিন্তা ক্ষুদ্র পরিবেষ্টন ক্ষুদ্র কাজকর্ম্ম কবিকে তখন বড়ই আঘাত দিতেছিল। নিজেরও কেবলি অনুভূতিময় জীবনের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া থাকিবার জন্য একটা আপনার সঙ্গে আপনার সংগ্রাম চলিতেছিল—খুব একটা বড় ক্ষেত্রে আপনার সুখদুঃখের বিরাট প্রকাশ দেখিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—"দুরন্ত আশা" কবিতাটি হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়ঃ -

"ইহার চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুয়িন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
* * *
নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ ঊর্দ্ধ নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন ছায়ে
সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে, গুপ্ত গৃহকোণে।"

এই সময়ের একটু ইতিহাস দেওয়া দরকার। মানসীর অধিকাংশ কবিতাই গাজিপুরে লেখা। কবির ইচ্ছা হইয়াছিল যে পশ্চিমের কোন রমণীয় স্থানে তিনি একটি নিভৃত কবিকুঞ্জ রচনা করিয়া জীবনটিকে সৌন্দর্য্যের স্রোতে ভরা কবিত্বের হাওয়ার মধ্যে ভাসাইয়া দেন। কিন্তু সেখানে গিয়া কিছু দিন কাটানোর পরেই তিনি অনুভব করিলেন যে এ সৌন্দর্য্যের কল্পলোকের মধ্যে চিত্তের তৃপ্তি নাই। কর্ম্মহীন জীবনের একটা অবসাদ তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল।

"রাজা ও রাণী"তে প্রধান নায়ক বিক্রমের একান্ত ভোগপ্রধান প্রেমের অমন ভয়ানক পরিণাম অঙ্কিত করিবার কারণ সে প্রেম আপনাকে খাইয়া এবং আপনার সমস্ত নিত্য আশ্রয়কে খাইয়া আপনি বাঁচিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল- মঙ্গল কর্ম্মে বৃহৎ ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া সফল হইয়া উঠে নাই। নিদারুণ দুঃখের প্রলয়ঘাতে সেই ভীষণ প্রেমের নাগপাশ হইতে মানুষ মুক্তি লাভ করে ইহাই এই নাটকের শেষ কথা।

রবীন্দ্রনাথ গাজিপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার সঙ্কল্প হইয়াছিল যে একটা গোযানে করিয়া গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া একেবারে পেশোয়ার পর্য্যন্ত পর্য্যটনে দীর্ঘকালের মত বাহির হইয়া পড়িবেন। "শূন্যব্যোম অপরিমাণ মদ্যসম করিতে পান"। এমন সময়ে মহর্ষি তাঁহাকে জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কাজের নামে প্রথমে কবি একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সম্মত হইয়া জমিদারীতে গেলেন। তখন হইতেই শিলাইদহের জীবনের আরম্ভ।

কেবল ভাব আপনার মধ্য হইতে আপনি খোরাক

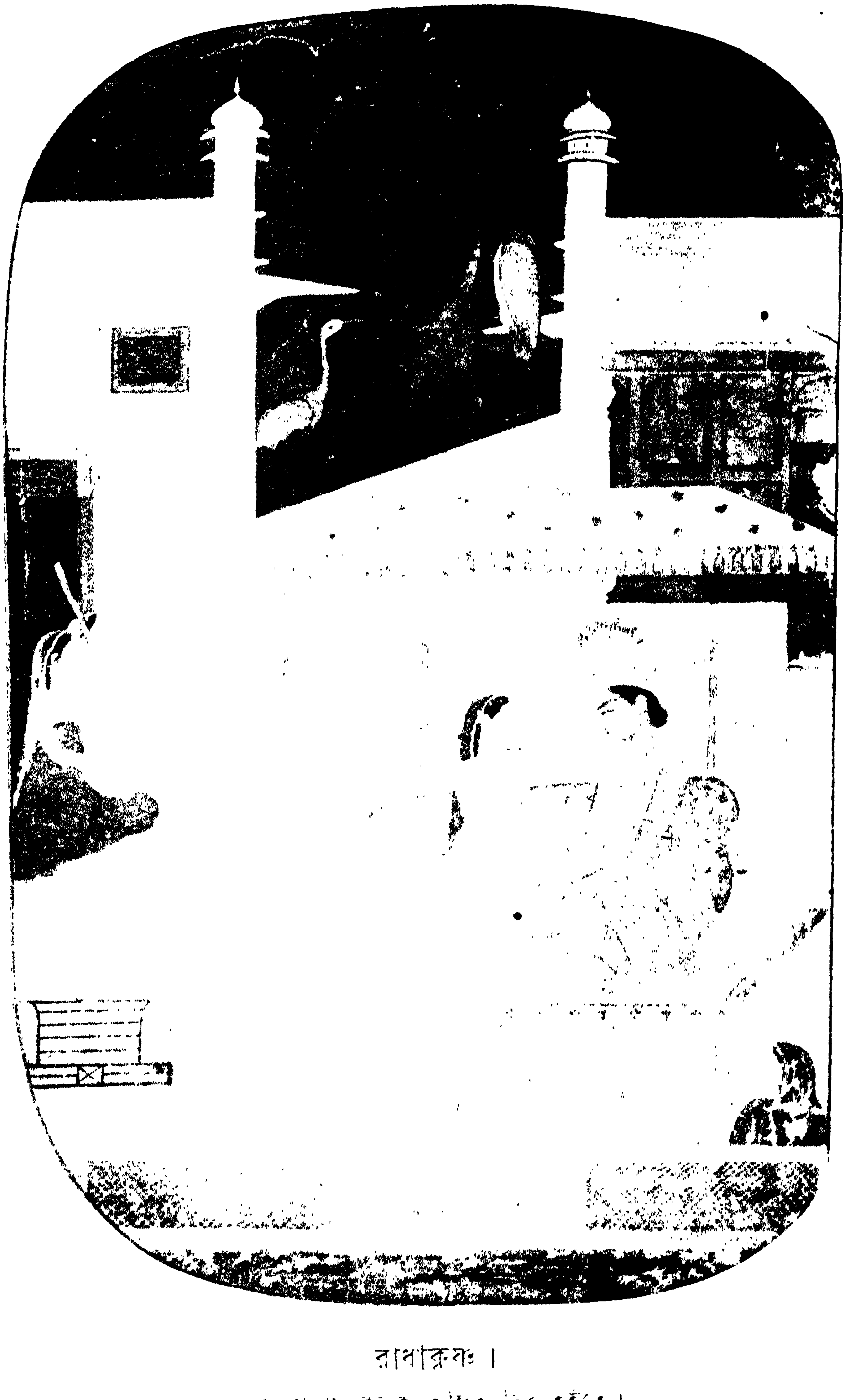

রাধাকৃষ্ণ।

[illegible] কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

সংগ্রহ করিয়া যখন প্রাণধারণের চেষ্টা করে, তখন সে ক্রমেই বাস্তবসম্পর্কশূন্য একটা অলীক জিনিস হইয়া পড়ে। এই যে কাজ হাতে আসিল, বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার সুখ দুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিতে লাগিল, ইহাতে দেখিতে দেখিতে কবির রচনা ব্যক্তিত্বের বন্ধন ছাড়াইয়া বাস্তব সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। অনুভূতিগুলির প্রকাশ ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া উঠিল।

'সাধনা'র এই সময়েই জন্ম। ১২৯৮ সাল তখন কবির ত্রিশ বৎসর বয়স। এই সময় হইতেই গল্পগুচ্ছের সূত্রপাত। 'সাধনা'র পূর্ব্বে তাঁহার "বিবিধ প্রসঙ্গ" "আলোচনা" প্রভৃতি কিছু কিছু গদ্য রচনা বাহির হইয়াছিল "বালকে"ও ভ্রমণবৃত্তান্ত ও কিছু কিছু প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল গদ্য ভাব কিম্বা ভাষার দিক্ হইতে বড় স্থান অধিকার করিতে পারে না। সাধনাতেই প্রথম পঞ্চভূতের ডায়ারী, গল্প, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি অনেক গদ্য রচনা বাহির হয়। ইহার কারণ সর্ব্বাঙ্গীন মানসোৎকর্ষের একটা ক্ষুধা পূর্ব্বে এমন করিয়া জাগে নাই দেশ বিদেশের সকল প্রকার চেষ্টা ও চিন্তার প্রবাহের সঙ্গে নিজের যোগ রক্ষা করিবার কোন তাগিদ্ই পূর্ব্বে ছিল না। সাধনার সময়কার রচনা বিচিত্র দিকে—সাময়িক ইংরাজি মাসিক পত্রিকা হইতে সার সঙ্কলন, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, রাজনীতির আলোচনা, সমাজতত্ত্ব প্রতি মাসে মাসে গল্প ও কাব্য বাদে এই প্রকারের বিবিধ গদ্য রচনা সাধনাতে প্রকাশিত হইত। যথার্থই সেটা একটা সাধনার কাল ছিল।

সমাজের ক্ষুদ্র আচার বিচার, লোকাচারের অন্ধ অনুবর্ত্তিতাকে তখন সাধনায় কবি সুতীব্র আঘাত দিতেন। সোনারতরী কাব্যের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু চিহ্ন আছে। এবং রাজনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মের দায়িত্বহীন নাকি সুরের নালিশ, —রাজদ্বারে "আবেদন এবং নিবেদনে"র লজ্জাকর হীনতাকেও কবি কম আঘাত করিতেন না।

অথচ এ সময়ের জীবনটি প্রকৃতির একটি অতি নিবিড় উপভোগের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ছিল। নৌকাবাসের জীবন—নদীতে নদীতে ভ্রমণ—কখনো জনশূন্য পদ্মার বালুচরে কখনো গ্রামের ধারে বোট বাঁধিয়া থাকা। "ছোট খাট গ্রাম, ভাঙ্গা চোরা ঘাট, টিনের ছাতওয়ালা বাজার, বাঁখারির বেড়া দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল কুল খেজুর সিমুল কলা আকন্দ ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড়জঙ্গল, ঘাটে বাঁধা মাস্তুলতোলা বৃহদাকার নৌকার দল, নিমগ্নপ্রায় ধানের" মধ্য দিয়া নৌকাযাত্রা কি চমৎকার পরিপূর্ণ দিনগুলি তখনকার, তাহা কেবল কবিতা হইতে নহে, তাঁহার গল্পগুচ্ছ এবং সেই বয়সের অনেকগুলি চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারি। বস্তুতঃ অধিকাংশ গল্পই প্রকৃতির এক একটি অনুভাবকে প্রকাশ করিবার আবেগেই লিখিত। বাংলা গ্রাম্য জীবনের যে সকল ছবি যে সকল ঘটনা চোখে পড়িতেছিল বা কানে আসিতেছিল তাহাকে গল্পের সূত্রে ধরিয়া প্রকৃতির ভাবের দ্বারা গাথিয়া তুলিয়া প্রকাশ করাই গল্প লিখিবার ভিতরের কারণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ধরা যাক্ "অতিথি" গল্পটা। সেটা একটি যাত্রার দলের ছেলের গল্প -সে কোথাও বাঁধা পড়িতে চাহিত না। অবশেষে জমিদার মতি বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহের দিনে হঠাৎ পলায়ন করিল। গল্পটা কিছুই নহে, বিশ্ব প্রকৃতির চঞ্চল অথচ নির্লিপ্ত একটি ভাবকে ঐ একটু গল্পের সূত্রের মধ্যে ধরিবার একরকমের চেষ্টা।

শিলাইদহের একটা চিঠির খানিকটা অংশ এখানে তুলিয়া দিলাম।

> "আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না ক'রে ছোট ছোট গল্প লিখ্‌তে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য্য হ'লে বোধহয় পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। * * গল্প লেখ্‌বার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখ্‌ব তারা আমার দিন রাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভ'রে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে; বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময়ে পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচটি লাইনে কেবল এইকথা ব'লেছি যে, কাল বৃষ্টি হ'য়ে গেছে আজ বর্ষণ অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শীকার চল্‌ছে।"

তবেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির একটি সুন্দর ছায়ারৌদ্রমণ্ডিত শ্যামল বেষ্টনের মধ্যে মানুষের জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে গাঁথিবার আবেগ গল্পগুলির আসল উৎপত্তির উৎসস্বরূপ। সোনার তরীর কবিতাগুলির মধ্যেও বাহিরের সঙ্গে অন্তরের, মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্পূর্ণ

মিলনের ভাবটি জাগ্রত। বিচ্ছিন্ন কোন ভাবের মধ্যে, আপনার মন-গড়া কল্পনার মধ্যে জীবনকে খণ্ডিত করিবার মিথ্যাকে এবং ব্যর্থতাকে সোনার তরীর প্রায় সকল কবিতায় প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রথম কবিতা—"সোনার তরী"র ভিতরের কথাটিই তাই। সৌন্দর্য্যের যে সম্পদ জীবনের নানা শুভ মুহূর্ত্তে একটি চির পরিচিত অথচ অজানা সত্তার স্পর্শের ভিতর দিয়া ক্রমাগতই জীবনের ভিতরে সঞ্চিত হইয়াছে তাহাকে নিজের ভোগের গণ্ডী দিয়া রাখিতে গেলেই সে পলায়ন করে সে যে বিশ্বের সে যে সকলের। "পরশপাথরে"ও সেই একই কথা। পরশপাথরই নানা সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া জীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিতেছে সেই বাস্তব সত্য ছাড়িয়া কল্পনায় তাহার অন্বেষণ করিতে গেলে কোন দিনই তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। "বৈষ্ণব কবিতার" মধ্যেও সেই একই ভাব। বাস্তব প্রেমের মধ্যেই দেবত্ব নিহিত প্রেমকে বাস্তব ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া অপ্রকৃতের মধ্যে স্থাপন করা যায় না। "দুই পাখী" "আকাশের চাঁদ" "দেউল" প্রভৃতি সকল কবিতার ভিতরেই আপনার কল্পনার দিক্ হইতে বিশ্বের দিকে বাস্তবের দিকে পরিপূর্ণ অনুভূতি লইয়া প্রবেশ করিবার সাধনার সংবাদ "সোনার তরী" কাব্যখানির আদ্যন্ত মধ্যে পাওয়া যায়। "পুরস্কার" কবিতাটিতে

"শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়নে
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভ'রে আসে আঁখি জল
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীত মাখা
সুন্দর ধরা তল।"

ইত্যাদি শ্লোকে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে অথবা "দরিদ্রা" কবিতাটিতে যে সকরুণ অশ্রুসজল ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পরবর্ত্তী "স্বর্গ হইতে বিদায়ে"র ভাবের অনুরূপ।

"দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভাল বাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভাল লাগে
বেদনা-কাতর মুখে সকরুণ হাসি
দেখে, মোর মর্ম্মমাঝে বড় ব্যথা জাগে।
আপনার বক্ষ হ'তে রস রক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস্ সন্তানের দেহে—
অহর্নিশি মুখে তার আছিস্ তাকিয়ে
অমৃত নারিস্ দিতে প্রাণপণ স্নেহে।
কত যুগ হ'তে তুই বর্ণ গন্ধ গীতে
সৃজন করিতেছিস্ আনন্দ আবাস
আজো শেষ নাহি হ'ল দিবসে নিশীথে
স্বর্গ নাই, রচেছিস্ স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদে কোমল
সকল সৌন্দর্য্যে তোর ভরা অশ্রুজল।"

"স্বর্গ হইতে বিদায়" নামক রবীন্দ্রবাবুর যে পরমাশ্চর্য্য কবিতাটির উল্লেখ করিলাম তাহার ভিতরের ভাবটি এই:—

স্বর্গে কেবলমাত্র আনন্দ, তাহার মধ্যে কোথাও কোন দুঃখের ছায়ামাত্র পড়ে না। সে আনন্দ যে পৃথিবীর আনন্দ নহে পৃথিবীর ইহাই গৌরব—মানব জীবনের ইহাই গৌরব। পৃথিবীতে আমাদের যে সবই হারাইতে হয়, সেই জন্যই আমাদের এখানকার প্রেম আমাদের এখানকার আনন্দ এত নিবিড় স্বর্গে লক্ষ লক্ষ বৎসর চক্ষের পলক টুকুর মতও নহে, কারণ সেখানে কোন বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর জীবনের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তের দেখাশোনা, কথাবার্ত্তা, মেলামেশা, কি বেদনাময়, প্রেমের দ্বারা কি নিবিড় রহস্যময়। তাই

"স্বর্গে তব বহুক অমৃত
মর্ত্তে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি।"

"সোনার তরী"র "পরশপাথর" "দেউল" প্রভৃতি কবিতায় যে বাস্তব জগৎ হইতে জীবন হইতে বিমুখ হইবার ভাবের প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত-পক্ষে আমাদের দেশের মজ্জাগত বৈরাগ্যেরই প্রতিবাদ। জগৎটাকে মায়াছায়া, সংসারকে অনিত্য, স্নেহ প্রেমকে মোহ বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য আমরা পরশপাথরের সন্ন্যাসীর মত সকল হইতে বিচ্ছিন্ন একটা কাল্পনিক ভাবের মধ্যে থাকিয়া মাটী হইতে উপড়াইয়া ফেলা গাছের মত শুকাইয়া মরি। সেই শুষ্কতার সাধনাকেই আবার আমরা অদ্বৈতের সাধনা—মুক্তির সাধনা বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি। যেন অদ্বৈত একটা মনের ভাব মাত্র, তাহার বাস্তবিক সত্তা কিছুই নাই।

জগতে যাহা কিছু আমরা পাই তাহাকে যে হারাইতেই হইবে, সমস্তই যে একে একে মৃত্যুর হাতে ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহার বেদনা যে কি সুতীব্র তাহা "যেতে নাহি দিব"

"প্রতীক্ষা" প্রভৃতি কবিতা পড়িলেই বুঝা যাইবে। তথাপি আমাদের দেশের প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া কবি ইহাকে মায়ামোহ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া বৈরাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারিলেন না। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য ক্ষণিক বলিয়াই, স্নেহ প্রেমের সমস্ত সম্বন্ধ অনিত্য বলিয়াই কবির কাছে তাহা পরম রহস্যময়। ক্ষণিক না হইলে এমন আশ্চর্য্য হইতেই পারিত না। এই যে ক্ষণকালের জন্য চাহিয়া দেখা এ দেখার মধ্যে কি অপরিসীম করুণা! এ দেখার অন্ত কোথায়? এ দেখা তাই বলে, "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল"।

এই ক্ষণিক মেলামেশার মধ্যে যে একটি অপরূপ ব্যাকুলতা উদ্বেল হইয়া উঠে, লক্ষযুগ ধরিয়া হইলে এমনটি কি কখনো হইত? এ মেলামেশাও তাই "নিমেষে শতেক যুগ করি মানে।"

"একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ
পড়িবে নয়ন পরে অন্তিম নিমেষ।
পরদিনে এই মত পোহাইবে রাত
জাগ্রত জগত পরে জাগিবে প্রভাত।
* * * *
সে কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে
যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।"

একটা চিঠির মধ্যে আছে—

"প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য এক এক সময়ে কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায়, জানিনে, তখন যেন সদ্যোজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মুখবর্ত্তী দৃশ্যকে এবং বর্ত্তমান ঘটনাকে অনন্তকালের চিত্রপটের উপর প্রতিফলিত দেখ্‌তে পাই। * * আমি অনেক সময়ই এক রকম ক'রে জীবনটাকে এবং পৃথিবীটাকে দেখি যাতে ক'রে মনে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, সে আমি হয়ত আর কাউকে ঠিক বোঝাতে পারব না।"

আর একটা চিঠির খানিকটা অংশ এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"আমার বিশ্বাস আমাদের সব স্নেহ সব ভালবাসাই রহস্যময়ের পূজা—কেবল সেটা আমরা অচেতন ভাবে করি—ভালবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি।"

এইবার সোনার তরী ও চিত্রার "জীবন-দেবতা" কবিতাগুলির সম্বন্ধে কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। সেই কথা বলিয়াই আজিকার মতো শেষ করিব।

আমি সেই কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের আরম্ভ করিয়াছি। আমি দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছি যে যখন প্রবল অনুভূতি এবং কল্পনা কোন একটি খণ্ডের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিতে চায় যেমন বাহ্য সৌন্দর্য্যে বা মানব প্রীতিতে ধরা যাক্—তখন কিছুকালের মত সেই খণ্ডতা তাহার কাছে সব হইয়া উঠে, অনুভূতি এবং কল্পনা তাহাকেই আপনার ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে। ইংরাজী অনেক প্রেমের কাব্যে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু কবির মূল সুর কিনা সর্ব্বানুভূতি, সেই জন্য খণ্ড হৃদয়াবেগ আপনার ইন্ধনকে আপনি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়া খণ্ডতার বাধাকে বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে বাধ্য হয়। "কড়ি ও কোমলে" "মানসী"তে আমরা সেই ছবিই দেখিয়া আসিয়াছি।

অথচ অংশের মধ্যেই সম্পূর্ণতার তত্ত্ব নিহিত হইয়া আছে। শারীরিক সৌন্দর্য্য সেই জন্য অনির্ব্বচনীয়, মানব প্রেম অনির্ব্বচনীয়, কবি কোথাও বিস্ময়ের অন্ত পান না, তাঁহার কাছে "সমস্তই রহস্যময়ের পূজা।"

সমস্ত অংশকে খণ্ডকে অসম্পূর্ণকে যখন সেই পরিপূর্ণ সমগ্রের মধ্যে অখণ্ড করিয়া উপলব্ধি করা যায়, তখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সব বিচিত্রতা এক জায়গায় গিয়া মিলিয়াছে, সব ভাঙাচোরা এক জায়গায় অক্ষত সুন্দর হইয়া আছে। আমাদের জীবনের মধ্যে এই দ্বিতীয় জীবন এই অন্তরতর জীবনকে কি জীবনের কোন শুভ মুহূর্ত্তে আমরা অনুভব করি নাই? নহিলে এত বারবার আঘাত কিসের জন্য? যেখানেই বিচ্ছিন্নতা সেখানেই ক্রন্দন। সেই কান্না যে কবির সমস্ত জীবন ভরিয়া। সেই পরিপূর্ণ সব-মেলানো আনন্দময় গভীরতর জীবন সৃষ্টির মধ্যেই বিষাদের অশ্রুলীলাও এমন সুমধুর হইয়া ফুটিয়াছে। সেই পূর্ণ জীবন যাঁহার অখণ্ড আনন্দ অনুভূতির মধ্যে রহিয়াছে তিনিই জীবন দেবতা।

আমি জানি এ জিনিসটা অনেকের কাছে মিষ্টিসিজ্‌ম্ বা হেঁয়ালী। কিন্তু খণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণতার বোধটাই একটা মস্ত হেঁয়ালী, যদিচ হিগেলীয় দর্শনশাস্ত্র এবং আমাদের বৈষ্ণব ভেদাভেদ দর্শনশাস্ত্র সেই তত্ত্বটিকেই প্রামাণ্য করিবার জন্য বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছে। অচিন্ত্য অদ্বৈতই

যদি আছেন এই হয়, এবং নানাত্ব-বুদ্ধি যদি কেবল মায়া হয়, তবে সে মায়াও অদ্বৈতের মধ্যে এক জায়গায় আছে একথা না মানিয়া কোন উপায় নাই। এই মুহূর্ত্তেই সেই নির্ব্বিকার শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত অদ্বৈতস্বরূপের মধ্যে আমি আমার খণ্ডতা, বিকার, অসত্য, অন্যায় সমস্ত লইয়াই আছি,—আমি আছি একটি অনন্ত আছের মধ্যে বিলীন হইয়া আছে। নহিলে অদ্বৈত আপনাতে আপনি থাকিবেন কোথায়? সেইজন্য ইউরোপে আধুনিক দার্শনিকমহলে কথা উঠিয়াছে, যে আমরা আমাদের সমস্ত খণ্ডতার ধারণা গুলিকে চিন্তার দ্বারা বিশেষ একটা নাম এবং রূপ দিই, আমরা যেন মনে করি যে চেতনা জিনিসটা একটা স্থিতি শীল পদার্থ। চেতনার নিত্য গতিশীলতার মধ্যে আমরা যদি আমাদের সমস্ত চিন্তিত ধারণাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখি, তবে দেখিব যে তাহাদের কোন নামে বা রূপে আবদ্ধ করিবার জো নাই। তাহাদের মধ্যে একটি অনন্তত্বের ভাব নিত্য বিদ্যমান। তখন সকল খণ্ডতাকে অখণ্ডের মধ্যে সকল বৈচিত্র্যকে একের মধ্যে সকল বিকার বিকল্পকে নির্ব্বিকার আনন্দের মধ্যে পর্য্যবসিত করিয়া দেখা সম্ভবপর হইবে।

বস্তুতঃ আমাদের চেতনার প্রবাহ জাগরণ-সুষুপ্তির জোয়ার ভাঁটার মধ্য দিয়া আমাদিগকে গানের মত একবার অহং বোধের খণ্ড চেতনার বিচিত্র তানের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেছে এবং আর একবার সমস্ত বিচিত্রতার সমাপ্তি বিশ্বচৈতন্যের অখণ্ডসমের মধ্যে বিলীন করিতেছে—এই ভেদাভেদের ছন্দেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশ্বসঙ্গীত রচিত হইয়া উঠিতেছে। সাধনার দ্বারা আমরা একই কালে এই বিচিত্রকে এবং এককে, তানকে এবং সমকে একত্রে মিলাইয়া বিশ্ব-বোধে এবং আত্ম-বোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারি। বুঝিতে পারি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশ্বের বিচিত্র রূপ প্রলয়ের মূর্চ্ছনার তানে তানে অসংখ্য আকারে বিকীর্ণ হইতেছে, আমাদের চেতনা সেই অসংখ্যের অন্তহীন সূত্র-গুলি গণনা করিয়া শেষ পাইতেছে না এবং তৎসঙ্গেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃজনের পরিপূর্ণ সঙ্গীত অখণ্ডতার মধ্যে সমস্ত বিলীন করিয়া দিয়া অনন্তের আনন্দকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তুলিতেছে।

বিশ্ব-জীবনে যে ভেদাভেদের লীলা-রূপ দর্শনশাস্ত্র দেখিতে পাইতেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে কবি সেই একই জিনিস উপলব্ধি করিতেছেন। একি রকম? না,—সৌরজগতে যে আকর্ষণ বিকর্ষণের শক্তি বিচিত্রভাবে কাজ করিতেছে, সেই শক্তিই অণুপরমাণুর মধ্যেও ক্রিয়াশীল—বিশ্বের সর্ব্বত্র এই একই নিয়মকে দেখিতে পাওয়া যেমন, ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বজীবনের লীলাকে প্রত্যক্ষ করা ঠিক তেমনিই। বিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহা আমরা এই জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া অনুভব করিতে না পারি।

সুতরাং এই যে আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরন্তন জীবন উপনিষদে কথিত একই বৃক্ষে নিষণ্ণ দুই পক্ষীর মত পাশাপাশি লাগিয়া আছে বলা গেল, ইহাকে হেঁয়ালী মনে করিবার কোন তাৎপর্য্যই আমি খুঁজিয়া পাই না। অনন্তকে সকল সীমার মধ্যে নিজের জীবনে এবং বিশ্বে—পূর্ণরূপে অনুভব করা আমাদের দেশে ঘরের কথা। আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে আমাদের মধ্যে যে একজন সুখ দুঃখ ভোগ করে মাত্র সে একজন—সুখ দুঃখের ভিতর হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া জীবনকে ক্রমাগত বড়র দিকে অনন্তের দিকে যে আর একজন নিয়তই সৃষ্টি করিয়া তোলে তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। একজন বিচ্ছিন্ন এক একটি সুর আর একজন অখণ্ড রাগিণী। এ দুইই এক—ইহাদের মধ্যে সত্যকার কোন বিচ্ছেদ নাই। রাগিণীর মধ্যে যেমন সুর অবিচ্ছেদে রহিয়াছে, চিরন্তন জীবনের মধ্যে ক্ষণিক জীবন তেমনিই রহিয়াছে।

সেইজন্যই জীবনে বাল্যের সেই বিশ্ব-জগতের পরম রহস্যময় অনুভূতি, সেই শরতের প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে বাড়ীর বাগানে গিয়া উপস্থিত হওয়া, কি যেন একটা আশ্চর্য্য নূতনত্ব উদ্ঘাটিত হইবে ভাবিয়া আনন্দ, সেই ঘাসের উপরে ফোঁটা ফোঁটা শিশির এবং বাগানের ভিজে গন্ধ এবং তাহারি উপরে অজস্রবিস্তীর্ণ কাঁচা সোনালী শরতের রৌদ্রের অনির্ব্বচনীয় মোহ—এ অনুভূতির সুর সেই সাক্ষীজীবনের সেই চিরন্তনজীবনের অখণ্ড রাগিণীর মধ্যে রহিয়া গেছে। বাল্য তাঁহারি মধ্যে পূর্ণ হইয়া আছে।

"অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী
মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্য্যের শশী

মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্লযূথী-বনে
বহু বাল্যকালে দেখা হ'ত দুই জনে
আধ চেনাশোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকামূর্ত্তি, শুভ্র বস্ত্র পরি
উষার কিরণধারে সদ্যঃ স্নান করি
বিকচ কুসুম সম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে—
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারাগার হ'তে—

বাল্যে এই যিনি অনন্ত বাল্য, যৌবনের নানা প্রেম সম্বন্ধের মধ্যে গভীরতর বাসনা ও বেদনার মধ্যেও তিনিই কি ধরা দেন নাই? ঐ যে পত্রাংশ পূর্ব্বেই তুলিয়াছি "আমাদের সব স্নেহ সব ভালবাসাই রহস্যময়ের পূজা" সকল মানুষের ভিতর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে কি সেই প্রেমাস্পদ রহস্যময়ের আবির্ভাব হয় নাই? সেই সাক্ষীজীবনের মধ্যেই যৌবনের সমস্ত আবেগ পূর্ণ হইয়া আছে।

"তারপরে একদিন—কি জানি সে কবে
* *
চমকিয়া হেরিলাম খেলা-ক্ষেত্র হ'তে
কখন্ অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মত! * * *
ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গৃহিণী
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! কোথা সেই
অমূলক হাসি অশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বর সম; হাসিখানি স্থির—
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত, পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মত।" * * *

বাল্যের যৌবনের এই প্রবল সৌন্দর্য্যের ও প্রেমের অনুভব যদি কেবল বিচ্ছিন্ন হৃদয়াবেগ মাত্র হইত, যদি এই সাক্ষীজীবনের মধ্যে ইহাদের কোন অখণ্ডতা না থাকিত তবে সৌন্দর্য্যবোধের কোন তাৎপর্য্যই থাকিত না। তবে জীবনের মধ্যে এসকল সুখদুঃখের খেলার কোন অর্থই ছিল না। সেই সাক্ষীজীবন সেই এক জীবন সেই নিত্য পরিপূর্ণ জীবন আমাদেরি মধ্যে আছেন এবং আমাদেরি ভিতরে তাঁহার একটি অপরূপ অপূর্ব্ব কাব্যকে রচনা করিতেছেন, এই কথা জানার জন্যই বাহিরেরও ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধ সমস্ত বিচিত্র সৌন্দর্য্যমালা সেই একের মধ্যে গ্রথিত হইয়া একটি মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতেছে:—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনক বর্ণে
রাঙ্গিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি,
সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙ্গা চরণের তলে
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ,—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি?"

মানস সুন্দরী বা মানস মূর্ত্তির অর্থ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু আলোচ্য কবিতাটিতে কেবল মানস মূর্ত্তি নহে বাস্তব মূর্ত্তিতেও সকল অনুভূতি এবং সকল সৌন্দর্য্যের সমঞ্জসীভূত এবং সারভূত জীবন-দেবতাকে জড় চক্ষে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা যেন প্রকাশ পাইয়াছে। বৈষ্ণবেরা যে নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি বলেন সকল সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তির ভিতরে যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ ভগবান আপনাকে প্রত্যক্ষ চোখে দেখা দেন বলেন, জানিনা সেই রকম ভাবে এই সমস্ত বাহিরের বিচিত্র সৌন্দর্য্যকে অখণ্ডভাবে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, না, বাস্তবিকই একটি বিশেষ নারীমূর্ত্তির মধ্যে সমগ্রকে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে?

পরবর্ত্তী কোন কবিতায় যে কবি বলিয়াছেন:—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

তাহার ভাব এ নয় যে অনন্তভাব আপনাকে একটি মাত্র রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে চান—প্রত্যেক খণ্ড-রূপের মধ্যেই তাঁহার ভাতি তাঁহার পরিপূর্ণ প্রকাশ।

আর বাস্তবিকই "জীবন-দেবতা" শীর্ষক সকল কবিতার মধ্যে আমাদেরি জীবনের মধ্যে যে আর একটি জীবনের

কথা বলা হইয়াছে তাঁহাকে কোন বিশেষ একটি মূর্ত্তিতে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় নাই। কারণ জীবন দেবতার স্বরূপই হচ্ছে বিশ্ববোধ। তিনি কি না জীবনের সমস্ত ভালমন্দ সমস্ত ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়া জীবনকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং তিনিই আবার কবির কাব্যে উপস্থিতকে চিরন্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত জিনিসকে বিশ্বের সঙ্গে, খণ্ডকে সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত করিয়া কাব্যকেও তাহার ভাবী পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন।

"অন্তর্যামী" কবিতাটিতে এই দুই দিক দিয়া জীবনে এবং কাব্যে জীবন দেবতার সৃজনলীলার আশ্চর্য্য রহস্য বর্ণিত হইয়াছে।

"একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে ? * * *
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝিনা জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।"

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কাব্য রচনা করে সে যেটুকু সীমার মধ্যে আপনার বলিবার কথাকে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে, এই কৌতুকময়ী জীবন-দেবতা সেই সীমাবদ্ধ ছোট কথারই মধ্যে আপনার নিত্য বাণীর সুর যখন মিশাইয়া দেন তখন কবি অবাক হইয়া যান। এ বিস্ময় কেবলি কাব্যে নয় জীবনেও ;

"একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
যে পথে বাহির হইনু হেলায়
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে—
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্
কোথা যাব আজ নাহি পাই ঠিক্
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।"

জীবনকেও তো দেখা গিয়াছে এই জীবন-দেবতাই ক্রমাগত ছোট দিক্ হইতে আরামের দিক্ হইতে পরম দুঃখের মধ্যে উপনীত করিতেছেন— সে যখনই কোন একটি বিশেষ দিকে একটি প্রবৃত্তির মধ্যে বাঁধা পড়িতেছে তখনই বেদনার দ্বারা সেই সীমা বিদীর্ণ করিয়া তিনি তাহাকে আবার সমস্ত বিশ্ব জগতের সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন —"কড়ি ও কোমল" "মানসী" প্রভৃতি সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাব্যেই তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি।

এই জীবন-দেবতাকে আর একটি হৃদয়ের গভীরতম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে —আমাতে কি তুমি তৃপ্ত ? অর্থাৎ যদিচ বলা হইল যে ইনি জীবনের বিচিত্র মাল মসলা জড়ো করিয়া জীবনের ভিতর হইতে একটি পরিপূর্ণতাকে একটি বিশ্বব্যাপী সার্থকতাকে কাব্যের মধ্যে প্রকাশমান করিতেছেন তথাপি তাঁহার সঙ্গে একটু নিবিড় যোগ আছে কিনা। উপনিষদে কথিত দুই পাখীর মতন যাহার জীবন লইয়া এই রচনাকার্য্য চলিতেছে তাহার অনুভূতির মধ্যে সার্থকতার কি কোন আনন্দ বাজিতেছে না ? তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—আমার মধ্যে কি তুমি তৃপ্ত ? আমি যে নানা সুখ দুঃখের আঘাতে ক্রমাগত আপনাকে গলাইয়া আমার শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি তোমাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি তাহা কি তুমি লইয়াছ—আমার সমস্ত আনন্দোচ্ছ্বাস আমার সমস্ত দুঃখবেদনা কি তুমি গ্রহণ করিয়াছ ? আমি যেখানে "অকৃত কার্য্য অকথিত বাণী অগীত গান বিফল বাসনারাশি" লইয়া আসিয়াছি আমার সেই ব্যর্থতাও কি তোমার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে ?

"ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম ?
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
* * *
লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ,
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম্ম আমার কর্ম্ম
তোমার বিজন বাসে ?
* * *
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝ'রে প'ড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি ?"

এক একবার আশঙ্কা হয় যে এ জীবনে যাহা কিছু ছিল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়াছে কিন্তু জীবন-দেবতার এই লীলার কি এই জীবনেই আরম্ভ? কত জন্মজন্মান্তর যুগযুগান্তর ধরিয়া এই খেলা চলিয়াছে জীবনকে ক্রমাগত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তিনি তাহার অর্থকে বিপুল বিপুলতর করিতেছেন।

"আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে,
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে?"

এই জীবনের ধারাটিকে সকল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অনাদিকাল হইতে এই জীবন দেবতা বহন করিয়া আনিতেছেন। অনন্ত সৃষ্টির মাঝখানে এই একটি বিশেষ ধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত। জীবনে জীবনে এই বিশেষের সঙ্গে এই জীবন দেবতার নূতন নূতন লীলা।

"জীবন-কুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নূতন জীবন-ডোরে।

আমিত্বের এ এক নূতন তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ফুটিয়াছে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই যে একটি বিশেষ আমি, সমস্ত বিশ্ব-অভিব্যক্তি-ধারার মধ্যে ইহার একটি স্বতন্ত্র ধারা রহিয়া গেছে। এই আমির ক্ষেত্রে এই বিশেষের মধ্যেই জীবন-দেবতার বিশেষ লীলা, নানার মধ্য দিয়া বিচিত্রের মধ্য দিয়া সেই এক জীবন সেই সাক্ষীজীবন ইহাকে বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন—সে সৃষ্টির কোন দিন অবসান নাই।

সেইজন্য সমস্ত জগতের তরু-লতা পশুপক্ষীর সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির যে নাড়ীর যোগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার ভিতরেও কবির এই একটি ভাব আছে যে যিনি এই বর্ত্তমান জীবনকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করিতেছেন তিনিই সমস্ত বিশ্ব-অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া, সেই প্রথম বাষ্পনীহারিকা পৃথিবীর আদিম তরুলতা হইতে আরম্ভ করিয়া সরীসৃপ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি বিচিত্র প্রাণীপর্য্যায়ের ভিতর দিয়া কবিকে এই বর্ত্তমান মানব জীবনের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়াছেন। বিশ্ব বোধের একটি দিক্ যেমন অন্তরের সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্যবোধ প্রেমকে বিশ্বব্যাপী অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করা, "জীবন দেবতা" কবিতাগুলির মধ্যে যাহা দেখিলাম তেমনি এও আর একটা দিক্—যে, নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া প্রবাহিত জীবন-ধারারও একটি বিশেষ অখণ্ড সূত্র অনাদিকাল হইতে রহিয়া গেছে, ইহা সমস্ত জিনিসের মধ্যে অনুভব করা :—

"আজ মনে হয় সকলের মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি,
জনতা বাহিয়া চির দিন শুধ
তুমি আর আমি এসেছি।"

"বসুন্ধরা" "প্রবাসী" "সমুদ্রের প্রতি" প্রভৃতি কবিতায় এই জলস্থল আকাশের সঙ্গে একাত্মকতার ভাবটিই প্রকাশ পাইয়াছে।

"তৃণে পুলকিত যে মাটীর ধরা
লুটায়ে আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।

* *

এ সাত মহালা ভবনে আমার
চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।"

এই জায়গায় একটা চিঠির কিয়দংশ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্ব্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা কর্‌ছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটীতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে [illegible] কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে—এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেল্‌চে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান ক'রেছিলাম, নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলাম—এই আমার মাটীর মাতাকে এই আমার মস্তক শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান ক'রেছিলাম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হ'ত। * * তারপরেও নব নব যুগে এই

পৃথিবীর মাটীতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি ক'রে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

আমার মনে হয় সোনার তরীতে এবং বিশেষ ভাবে চিত্রাতে ও চৈতালীতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন খুব একটি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

জীবন দেবতার কথা বলিলাম—প্রেম, সৌন্দর্য্য-বোধ সমস্তই এই জীবন-দেবতার বৃহৎভাবের দ্বারা কত বড় বিশ্বব্যাপকতা লাভ করিয়াছে তাহা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। স্বর্গ হইতে বিদায়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আর একটিমাত্র কবিতার কথা বলিব। সে কবিতাটি "উর্ব্বশী"।

সৌন্দর্য্য বোধের মধ্যে ভোগপ্রবৃত্তির মোহাবেশ মিশিয়া যে বেদনাকে জাগাইয়াছিল তাহা আমরা "কড়ি ও কোমলে" "চিত্রাঙ্গদায়" দেখিয়া আসিয়াছি। "উর্ব্বশী" এবং "বিজয়িনী" যে দুইটি কবিতা চিত্রায় আছে তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যকে সমস্ত মানব সম্বন্ধের বিকার হইতে সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার বিশুদ্ধিতায় তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে।

আপনারা মনে রাখিবেন যে "চিত্রা"র এ সকল কবিতাই "জীবন-দেবতা"র অখণ্ডভাবের অন্তর্গত। ক্ষণিকের মধ্যে বিচ্ছিন্নের মধ্যে অখণ্ডের উপলব্ধি "জীবন দেবতা"র ভিতরের কথা। অনিত্য স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধকে অনন্তরহস্যময় করিয়া দেখিবার কথা "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাটিতে বলা হইয়াছে বলিয়া তাহা "জীবন-দেবতার"ই ভাবের অন্তর্ভুক্ত কথা। এবং জগতের বিচিত্রচঞ্চল সৌন্দর্য্য যে সকল সম্বন্ধাতীত এক অখণ্ড সৌন্দর্য্যে নিবিড়লীন, "উর্ব্বশী"র এ কথাও "জীবন দেবতা"র ভাবের অন্তর্গত।

বাস্তবিক "উর্ব্বশী"র ন্যায় সৌন্দর্য্যবোধের এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। সৌন্দর্য্য সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তা। জগতের কোন্ রহস্যসমুদ্রের গোপন অতলতার মধ্যে তাহার সৃষ্টি। সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য্যের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার বিদ্যুৎ-চঞ্চল আঁচল দোলানোর আভাস পাওয়া যাইতেছে

"তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
* * *
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।"

ইহারি নৃত্যের ছন্দে ছন্দে সিন্ধুর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত, শস্যশীর্ষে ধরণীর শ্যামল অঞ্চল কম্পিত, ইহারি স্তনহারচ্যুত মণিভূষণ অনন্ত আকাশে তারায় তারায় বিকীর্ণ, বিশ্ব-বাসনার বিকশিত পদ্মের উপরে ইহার অতুলনীয় পাদপদ্ম স্থাপিত।

"সুরসভাতলে যবে নৃত্যকর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি!
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা,
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!"

পাঠকেরা এই জায়গায় "প্রতিধ্বনি" কবিতাটি স্মরণ করিবেন। আমি সেখানে বলিয়াছি যে সুর যেমন প্রত্যেক কথাটির মধ্যে অনির্ব্বচনীয়কে উদ্‌ঘাটন করে, রবীন্দ্রনাথের হৃদয় সেইরূপ, সমস্ত দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপরূপকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে চায়। উর্ব্বশী সেই সমস্ত রূপের মধ্যে অপরূপের দৃষ্টি। এ এক আশ্চর্য্য কাব্য-সৌন্দর্য্যের এমন সুতীব্র অথচ নির্ম্মল অনুভূতি অন্যত্র দেখি নাই।

এইখানে আজিকার মত শেষ করিলাম। এইবার আমরা যেখানে যাত্রা করিব সেখানে এই কাব্যজীবনের সঙ্গে একটা বিচ্ছেদের সূত্রপাত। কেন? আমাদের তো মনে হয় এইখানে কবি তাঁহার কবিত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন মানুষের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এমন সত্য প্রবেশ, জীবনকে মৃত্যুকে প্রেমকে সৌন্দর্য্যবোধকে এমন এক অখণ্ড জীবনের সূত্রে পরিপূর্ণ করিয়া দেখা, ইহার মধ্যে অভাব কোথায়?

জীবনেরও এমন পূর্ণ আয়োজনটি! জমীদারীর কাজ—তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অমন সুন্দর উপভোগ নদীর উপরে বোটে করিয়া দিন রাত্রি আনন্দে যাপন "সাধনা"র সম্পাদকতা করা, গদ্যে পদ্যে বিচিত্র রচনা কার্য্য সকল দিক্ হইতে এমন আয়োজন আর কোথায় মিলিবে? "চৈতালী"র কবিতাগুলি এবং এই সময়কার চিঠিগুলি পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় কি

মাধুর্য্যের স্রোতের মধ্যে এই সময়ের প্রত্যেকটি দিন এবং প্রত্যেকটি রাত্রি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়াছে।

একটা চিঠিতে আছে ঃ

"আমি প্রায় রোজই মনে করি এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব। যদি করি আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটীর উপরে বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে * * প'ড়ে থাকতে পারব ?"

আর একটি চিঠির খানিকটা দি।—

"আমার এই পদ্মার উপরকার সন্ধ্যাটি আমার অনেকদিনের পরিচিত—আমি শীতের সময় যখন এখানে আসতুম এবং কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরী হ'ত আমার বোট ওপারের বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত— ছোট জেলে ডিঙ্গি চ'ড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখন এই সন্ধ্যাটি সুগভীর অথচ সুপ্রসন্ন মুখে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকত আমার জন্যে একটি শান্তি একটি কল্যাণ একটি বিশ্রাম সমস্ত আকাশময় প্রস্তুত থাকত সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরকার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন নিতান্ত অন্তঃপুরের ঘরের মত বোধ হ'ত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক—সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে যা ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা বল্লেও কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্ব্বদা মৌন এবং সর্ব্বদা গোপন সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হ'য়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে। * * আমাদের (দুটো) জীবন আছে একটা মনুষ্যলোকে আর একটা ভাবলোকে—সেই ভাবলোকের জীবন-বৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি।"

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালীর এই মাধুর্য্যরসপূর্ণ জীবনের সঙ্গে কথা, কল্পনা, ক্ষণিকা প্রভৃতি পরবর্ত্তী কাব্যের জীবনের যে বিচ্ছেদ তাহা এমন গুরুতর যে এ দুইটাকে দুইজন স্বতন্ত্র লোকের জীবন বলিলেও অন্যায় হয় না। কিন্তু এক জীবন হইতে অন্য জীবনে যাইবার যে গভীরতর কারণগুলি আছে, আপাতঃবিচ্ছেদের মধ্যেও যে সত্য বিচ্ছেদ কোথাও নাই—পরে তাহারি আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। এ জীবনের কাহিনী এখানেই শেষ, সুতরাং এইখানেই তাহা শেষ করা গেল।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

২

ব্রাহ্মণদের শিক্ষাধীনতা হইতে রাজারা আপনাদিগকে বিমুক্ত করিল। রাজাদিগের ধর্ম্ম :- বীর পূজা, রাম, কৃষ্ণ। দাক্ষিণাত্যবিজয়। ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলি চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক কর্ত্তৃক এক সাম্রাজ্যের অধীনে আনীত হইল। চন্দ্রগুপ্ত (৩১৫—২৯১), অশোক (২৬৩—২২২)।

এমন এক সময় আসিল যখন ব্রাহ্মণের আধিপত্য শুধু একটি মাত্র রাজ্যে বদ্ধ রহিল না, পরন্তু ঐ আধিপত্য, বংশানুক্রমে বিশেষ অধিকারে পরিণত হইল। ঋষিদের বংশধরেরা সকল ব্যবসায়েরই কাজ করিত: তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুরোহিত, কতকগুলি গৃহস্থ; পুরোহিতেরা পরাক্রমশালী সর্ব্বজনসম্মানিত; গৃহস্থেরা দুর্দ্দশাপন্ন, ও উহারা নীচ ব্যবসায়ের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আর্য্যগণ কর্ত্তৃক গাঙ্গেয়প্রদেশ বিজিত হইবার ৫।৬ শতাব্দী পরে, ব্রাহ্মণেরা অনেকগুলি শাখাবর্ণে বিভক্ত হয়। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উচ্চ, কি নীচ, সকলকেই ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করিতে বাধ্য করিয়া উৎপীড়ন করিত। তখনকার সমৃদ্ধিশালী ও পুষ্টাঙ্গ জনসমাজের মধ্যে, এই সকল প্রাচীন প্রথা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে ব্রাহ্মণদিগের অপরদিকে রাজাদিগের প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষা; এই দুই উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। প্রাচীন আর্য্য দলপতিদিগের বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য ছিল, তাহাদের অসংখ্য প্রজা ছিল। পরে, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। সমস্ত হিন্দ-য়ুরোপীয়দিগের ন্যায়, আর্য্যেরাও, বংশসমূহের স্বাতন্ত্র্য ও সাম্য স্বীকার করিত; যুদ্ধের জন্য দলপতি নির্ব্বাচন করিত। যখন রাজসিংহাসন বংশানুক্রমিক হইয়া উঠে, তখনও বংশবিশেষের কুলপতি বলিয়াই রাজারা রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইত। কিন্তু দেশের আদিম নিবাসী দলপতি যথেচ্ছাচারী ছিল। কালক্রমে, বৈশ্যেরা শূদ্রদিগের সহিত মিশিয়া গেল; কি আর্য্য কি দ্রাবিড়ীয় সকল রাজারাই স্বেচ্ছাতন্ত্রী হইয়া উঠিল। রাজাদিগের বিরুদ্ধে ধনশালী ব্রাহ্মণেরা দলবদ্ধ হইল: কোন কোন জনপদের মধ্যে —যেখানে ব্রাহ্মণেরা বিস্তৃত ভূখণ্ডের স্বত্বাধিকারী ছিল সেই সমস্ত ভূখণ্ড লইয়া তাহারা এক একটা ব্রাহ্মণিক রাজ্য

সংগঠিত করিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের মধ্যে শোণিত-প্লাবী ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। প্রায় সর্ব্বত্রই রাজাদিগেরই জয় হইল, কিন্তু তথাপি রাজারা শত্রুদিগকে একেবারে উচ্ছেদ করিতে পারিল না।

রাজাদিগের বিজয়লাভে, দুইটি ফল প্রসূত হইল। প্রথমত একটি নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে রাজারা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের পূজা আবার খাড়া করিয়া তুলিল। বীরপুরুষেরা বিষ্ণুর অবতার হইল। বিশেষত দুইটি বীর লোকপ্রিয় ছিল: একটি আর্য্যবীর—রাম: আর একটি কৃষ্ণকায় অনার্য্য বীর কৃষ্ণ। তাহাদের কাহিনী, পৌরাণিক সৌর উপাখ্যানের দ্বারা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আদিমবাসীদিগের কোন একটি দেবতার সহিত কৃষ্ণ একীভূত হইয়াছিল: কৃষ্ণপূজা, আর্য্য ও শূদ্রকে একত্র সম্মিলিত করিল। গাথা এই পূজার ভিত্তিমূল: সকল বীরের উদ্দেশেই গাথা রচিত হইত। তাহা হইতেই মহাকাব্যের উৎপত্তি। (১)

তাহার পর দেশবিজয়ের দ্বিতীয় যুগ। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করা, অথবা গঙ্গা-যমুনার মধ্য-প্রবাহ-পরিষিক্ত হিন্দুভূমি পরিত্যাগ করা একটা বিষম অনাচার। রাজারা এই নিষেধ মানিলেন না। শত শত বৎসরের আচারনিষ্ঠার পর, দুঃসাহসিক উদ্যমের যুগ আসিল। পশ্চিমে, রাজস্থান ও গুজরাট ও পূর্ব্বদিকে, বঙ্গদেশ আসাম ও উড়িষ্যা বিজিত হইল। পরে বিন্ধ্যাচলের সীমা লঙ্ঘিত হইল। আর্য্যেরা, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীয় রাজা সকল বশীভূত করিল, অথবা তাহাদের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইল; ষষ্ঠ শতাব্দীতে, আর্য্যেরা আপনাদিগকে সিংহলে প্রতিষ্ঠিত করিল। (২) সিংহল-দেশ আর্য্য-সভ্যতা গ্রহণ করিল; পক্ষান্তরে, দ্রাবিড়ীয়দের পরিপুষ্ট সভ্যতা হিন্দুদিগের ভাবভক্তিতে ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালীতে কতকটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল। প্রস্তরগৃহনির্ম্মাণ-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুরা কতকগুলি নূতন দেবতার পূজা গ্রহণ করিল; আত্মার যোনিভ্রমণের বিশ্বাসটিও গ্রহণ করিল; তা'ছাড়া উহারা যুদ্ধবিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইয়া কতকটা শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠিল, সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন স্থাপনে উহাদের রুচি জন্মিল; কিছুকাল পরে, এই রুচি, দরাউস-শাসনাধীন পারস্যের প্রভাবে ও সেকেন্দরের শাসনাধীন গ্রীসের প্রভাবে আরও দৃঢ়ীভূত হয়।

যুদ্ধবিগ্রহ, আবিষ্ক্রিয়া, নূতন নূতন জ্ঞান -জাতির সংগঠনে, সমাজের রূপান্তর সাধনে অনেকটা সহায়তা করে। যাহারা প্রভূত সম্মান ও ধনৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল সেই সব দুঃসাহসিকদিগের মধ্যে সকল বর্ণেরই লোক দৃষ্ট হয়; প্রাচীন রাজবংশদিগের সিংহাসনে শূদ্রেরা অধিষ্ঠিত হইল। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সমাজসংস্কারকেরা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—

"মানুষের পদমর্য্যাদা স্বকীয় কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। জন্মের দ্বারা পদমর্য্যাদা লাভ হয় না।

পশুদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য—বর্ণে, আকারে, চলনে, আহারে। মনুষ্যদিগের মধ্যে সেরূপ কোন পার্থক্য নাই।

জন্মের দ্বারা যেমন ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, সেইরূপ জন্মের দ্বারা কোন নীচ বর্ণও মনুষ্যপদবী লাভ করিতে পারে না।

যে মহিষ চরায় সে পশুপালক; যে দ্রব্যের বিনিময় করে সে বণিক; যে যজ্ঞ করে সে যজমান; এই সকল লোক ব্রাহ্মণ নহে। কিন্তু যে সাধু, যে ধার্ম্মিক, যে নিঃস্বার্থ, তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

(১) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম সম্বন্ধে, ক্ষত্রিয়-উচ্ছেদকারী ব্রাহ্মণ পরশুরামের সম্বন্ধে, Lassen, Muir, Zumner কর্ত্তৃক কতকগুলি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (অথর্ব্ব বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ)। M. Senart তাঁহার বর্ণভেদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে, সমস্ত তর্কযুক্তির সারসংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে, আর একটি প্রমাণ, আরও আধুনিক কালে, মৃচ্ছকটিক নাটকের একটি দৃশ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিষ্ণু পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে, বিশেষত কৃষ্ণ পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য: তিনি বলেন ভারতবাসীদিগের প্রধান দেবতা, Bacchus (শিব) ও Hercules (কৃষ্ণ)। সমস্ত গাঙ্গেয় প্রদেশে ইঁহাদের পূজা প্রচলিত ছিল।

অধ্যাপক ভাণ্ডারকার মহাভাষ্যের মধ্যে কৃষ্ণের দেবত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি বচনের উল্লেখ পাইয়াছেন। পূ-খৃ দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি মহাভাষ্যের রচনাকাল নির্দ্দেশ করেন (Dutt, Civilization in Ancient India, II, P. 101); M. Bose বলেন, প্রাচীন যুগের দ্বাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণলীলার নাটক অভিনীত হইত।

(২) আধুনিক যুগের ৪৬০ শতাব্দীয়, পালিপদ্যে রচিত মহাবংশ নামক সিংহল দেশীয় ইতিহাস। এই ইতিহাসে যে সকল তারিখ ও ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা বহুদিন যাবৎ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। অধুনা তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ হইতেছে।

সে ব্যক্তি আর্য্য নহে, মহৎ নহে,—যে প্রাণিগণকে কষ্ট দেয়। সেই ব্যক্তিই মহৎ যাহার জীবের প্রতি দয়া আছে।" (৩)

ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা, সামান্য ব্যক্তিরা, চক্রবর্ত্তী পদলাভের জন্য, রাম ও কৃষ্ণের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল; উচ্চবর্ণদিগের বিশেষ-অধিকার সকল রহিত করিয়া দিবে, নিপীড়িত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিবে,—এইরূপ রাজা হইবার জন্য তাহারা অভিলাষী হইল। ছয় শতাব্দীব্যাপী অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহের পর, একজন নীচ জাতীয় দুঃসাহসিক, প্রাচ্যভারতে মগধের সিংহাসন দখল করিয়া বসিল। সে চন্দ্রগুপ্তনামে দেশ শাসন করিতে লাগিল (৩১৫—২৯১)। তাহার পৌত্র অশোক (২৬৩ বা ২৫৯ হইতে ২২২ পর্য্যন্ত) সমস্ত ভারতের রাজা বা রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন। অশোকের রাজত্বকাল, ভারতীয় সভ্যতা ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ বলিয়া পরিচিহ্নিত। রাষ্ট্রিক একতা কিয়ৎ বৎসর মাত্র স্থায়ী হইলেও সেই অবধি ভারতের সমস্ত লোক, একই প্রকার ধর্ম্মতন্ত্রের, একই প্রকার সমাজতন্ত্রের প্রভাবাধীনে আনীত হয়।

৩

ক্ষত্রিয়দিগের তত্ত্ববিদ্যা। উপনিষদ ও সূত্র। বিশ্বব্রহ্মবাদ। যোনি-ভ্রমণবাদ। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্ম। শৃঙ্খলা স্থাপন। লোকপ্রিয় মতবাদ। জাতক।—অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ।

এই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টার সহিত বস্তুত নৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় প্রচেষ্টার মিল দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র-সমূহের অধিকারী ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল মন্ত্র ক্ষত্রিয়দিগের নিকট প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হইল; যুক্তির উপর যে সকল বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত, ঐ সকল বিদ্যা অনুশীলন করিতে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগকে নিষেধ করিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা তাহাদের নিজের ধর্ম্ম, নিজের তত্ত্ববিদ্যা অর্জ্জন করিবার জন্য অভিলাষী হইল। অবশেষে ব্রাহ্মণেরা সেই ক্ষত্রিয় প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যা একটু রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিল। (৪)

এই নূতন তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলি উপনিষদ ও সূত্রসংহিতা। উহার মধ্যে বন্য জাতিদিগের কুসংস্কারের সহিত, দ্রাবিড়ীয়দিগের দৃঢ়চিত্ততা ও স্থূলবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়; এবং দেখা যায়, ভারতীয় আব্ হাওয়ার প্রভাবে আর্য্যদিগের চিন্তাশক্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল; উহার মধ্যে কোন বাস্তব তথ্যের কথা নাই, কোন সুস্পষ্ট যুক্তির অবতারণা নাই, কেবলই অতি-সূক্ষ্মতা, ধ্যানসমাধি, যোগানন্দের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস, ও নানা প্রকার উদ্ভট কল্পনা। (৫)

দুইটি মতবাদ।

উহার মধ্যে একটি, আর্য্য ও ব্রাহ্মণদিগের মতবাদ—মন্ত্র মাহাত্ম্য। যাহা হইতে নর অমর উভয়েই শক্তি আহরণ করে সেই মন্ত্র পদার্থটা কি? ইহা সেই প্রাণের নিঃশ্বাস, যাহা প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক জীব, আপনার অন্তরে উপলব্ধি করে: ইহা সেই "আমি"—"আমি" ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই "আমি" সেই আত্মা এক ও অদ্বিতীয়; এই এক পদার্থই মায়াপ্রভাবে বহুধা প্রতীয়মান হয়। এই আত্মা পদার্থটা কি? "ইহা সেই সত্তা যাহার মধ্যে আর সকল সত্তা বিলীন হইয়া আছে; সেই মহাসমুদ্র যেখানে সমস্ত নদী গিয়া নিমজ্জিত হয়।...একটি লবণখণ্ড গ্রহণ কর। উহাকে জলে নিক্ষেপ কর, ঐ দেখ, লবণ দ্রবীভূত হইল। জল লবণের আস্বাদ প্রাপ্ত হইল। এই প্রকার, সেই নিত্য অসীম সত্তা বিশুদ্ধ ও নির্ব্বিকার।...যেমন চক্রের নাভিদেশে অর সকল সমর্পিত থাকে, সেইরূপ সকল জীব, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল মনোবৃত্তি, সকল আত্মা সেই পরমাত্মাতে সমর্পিত রহিয়াছে।" (৬)

এই যে পরমাত্মা যাহা হইতে প্রত্যেক জীবাত্মা নিঃসৃত হইয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, কেহ বা

(৩) সুত্তনিপাত ও ধম্মপদ।

(৪) উপনিষদের তত্ত্ববিদ্যায় ক্ষত্রিয়দিগের যে অনেকটা হাত ছিল, ব্রাহ্মণদিগের এক-চেটিয়া পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে তাহারা যে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, তাহারাও কতকগুলি বেদমন্ত্র রচনা করে। তাহারাও যে পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিত তাহারও কতকগুলি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এরূপ কতকগুলি রাজার পৌরাণিক উপাখ্যান আছে, এবং বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতেও এই সম্বন্ধে অনেকগুলি বচন পাওয়া যায়।

(৫) এইখানে গ্রন্থকার সাধারণ-য়ুরোপীয়-সুলভ বাস্তব-তথ্য-সীমাবদ্ধ স্থূলদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে, শোপেনহৌয়র, মোক্ষ-মূলর, Victor Cousin প্রভৃতি য়ুরোপীয় মনীষিগণ এই মতাবলম্বী নহেন। তাঁহারা উপনিষদের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন।—অনুবাদক।

(৬) বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

আধিভৌতিক তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। যে সকল দার্শনিক আরও নির্ভীক, তাহারা এই ঐকান্তিক অদ্বৈতবাদকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, দ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়; একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য। আবার কোন কোন দার্শনিক আরও বেশী অগ্রসর; তাঁহাদের মতে, প্রকৃতি এক ও অখণ্ড নহে, উহা নিত্য-পরমাণু-সমূহের অনিত্য-সমষ্টি মাত্র(৭)। পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়াদি, বেদনা ও জ্ঞান এই সমস্তের সংযোগ ভিন্ন জীবাত্মা আর কিছুই নহে।

উপনিষদ ও সূত্রাদিতে, আর একটি মতবাদ দৃষ্ট হয়। আর্য্যগণ যখন দ্রাবিড়দিগের যোনিভ্রমণবাদ পুনর্ব্বার আলোচনা করিল তখন তাহারা এই মতবাদকে, মায়াবাদের সহিত একীভূত করিয়া, জন্মান্তরবাদে পরিণত করিল। ভ্রম, পাপ, দুঃখ এই সমস্তের একই হেতু:—সে কি?—না, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ আত্মার মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান। মায়াকারাগারের বন্দী জীবাত্মা, ক্ষণিক ধনমানের আসক্তি-শৃঙ্খলে আরও আবদ্ধ হইয়া পড়ে; স্বয়ং অবিনশ্বর হইলেও,

(৭) ঋগবেদের দশম সূক্তিতে (৯০। ৯১) এই দর্শনতন্ত্রের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে দৃষ্ট হয়; এই সূক্তিটি প্রক্ষিপ্ত, ঋগবেদ সংহিতার বহুকাল পরে রচিত; কারণ, উহাতে অন্য দুই বেদের উল্লেখ, ঐ দ্বিতীয় বেদের প্রথম-সূক্তিগুলির উল্লেখ, ও শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ আছে। ঐ সূক্তিটি বহুমস্তকবিশিষ্ট, বহুচক্ষুবিশিষ্ট, বহু পাদবিশিষ্ট পুরুষের বর্ণনা করিতেছে; যাহা কিছু অতীতে হইয়াছে, যাহা কিছু ভবিষ্যতে হইবে সমস্তই ঐ পুরুষ। দেবতারা ঐ পুরুষকে বলি দিলেন। তাঁহার বিক্ষিপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে, বেদ, অশ্ব, গবাদি উৎপন্ন হইল। এবং তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, চরণ হইতে শূদ্র উদ্ভূত হইল...ইত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের আর একটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি:

"সকলেই যেন মনে করে ব্রহ্মেতেই এই দৃশ্যমান জগতের আরম্ভ ও শেষ; ব্রহ্মেতেই এই জগতের প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে...সেই সর্ব্বভূতের আত্মাই আমার অন্তরাত্মা, একটি চাউল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, একটি সর্ষপ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। আবার এই অন্তরাত্মা দ্যুলোক ভূলোক, আর আর সমস্ত লোক অপেক্ষাও বৃহৎ।"

এই অংশটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, জানা উচিত যে, হিন্দুদের মতে এই আত্মাপুরুষ, একটি সর্ষপ অপেক্ষা বড় নহে; মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় ইহা মানুষের অন্তরে অবস্থিত; আমাদের হৃদয়ের স্পন্দনাদি এই পুরুষের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষ যখন মরে, এই আত্মাপুরুষ তাহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তখনই দেহান্তরে প্রবিষ্ট হয়। ইহা হইতেই যোনিভ্রমণবাদের উৎপত্তি। এই আত্মাপুরুষ আবার শূন্যে গিয়া আবির্ভূত হয়। অতএব ভারতীয় বিশ্বব্রহ্মবাদের এই প্রাথমিক তত্ত্বটি—নিতান্ত "ছেলেমানুষি" ও স্থূল ধরণের মতবাদ। (M. Barth-এর গ্রন্থ দেখ "Religions of India," বিশেষত পৃষ্ঠা ৭০—(গ্রন্থের ইংরাজি সংস্কার)।

জীবাত্মা ভূলোক, স্বর্গ, নরক—প্রভৃতি স্থানে, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। এই মায়াজাল হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়—ধ্যানসমাধি। যখনই জীবাত্মা সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ আত্মার মধ্যে অভেদভাব বুঝিতে পারে, তখনই তাহার সকল সংশয় দূর হয়, তাহার সকল কামনা অন্তর্হিত হয়। অবশ্য মানুষ তখনও কর্ম্ম করে, অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে—তাহার পূর্ব্বকৃত্যের কর্ম্মফল তাহার হইয়া কর্ম্ম করে। কিন্তু তাহার কর্ম্মাদি তাহার আত্মাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। তখন ব্রহ্মের সহিত তাহার যোগ নিষ্পন্ন হইয়াছে।(৮)

ধ্যানসমাধির দ্বারা মানুষ সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও ভৌতিক অভাব বিস্মৃত হয়; ইহা হইতেই সন্ন্যাসধর্ম্মের উৎপত্তি। দেখা যায়, বলি-উৎসর্গের ভাবটাই উত্তরোত্তর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথম প্রথম যজ্ঞের দেবতা ও মৃত পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ড দান করা হইত। যাহারা এইরূপ পিণ্ড দান করিত, দেবতা ও পিতৃগণ তাহাদের বশীভূত হইতেন। পরে এই যজ্ঞব্যাপার একটা স্বতন্ত্র শক্তি হইয়া দাঁড়াইল; তখন খাদ্যের দ্বারা শুধু ক্ষুধিত দেবতারা আকৃষ্ট হইত না, পরন্তু

(৮) ইহা উপনিষদের ও বৌদ্ধধর্ম্মের মতবাদ। ইহার পারিভাষিক শব্দার্থ এইরূপ: মায়া কি? না, বিভ্রম; সংসার কি? না, জীবনের আবর্ত্ত; পুনর্ভব কি? না, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ; কর্ম্ম কি? না, আত্মার সেই অবস্থা যাহা হইতে পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। যোগ কি?—না, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্মিলন (যাহা কর্ম্মকে ধ্বংস করে), এই যোগ হইতেই তাপসের নাম যোগী হইয়াছে। মোক্ষ কি?—না, চরম মুক্তি; নিরীশ্বর সম্প্রদায়দিগের মতে—নির্ব্বাণ।

নিরীশ্বর সম্প্রদায়দিগের মতে ও বৌদ্ধধর্ম্মের মতে, এই আত্মা, এই "আমি", ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিক তত্ত্বসমূহের অথবা "স্কন্ধ" সমূহের সাম্য হইতে প্রসূত। এই স্কন্ধের অন্তর্ভূত ছয় শ্রেণীর বেদনা, ছয় শ্রেণীর সংজ্ঞা, ৫২ শ্রেণীর সংস্কার এবং প্রজ্ঞা।

কর্ম্মবাদের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়:—"একই ঋতুতে, অল্প শস্যই ফলপ্রসূ হয়। সেইরূপ, এই জীবনে অল্প কর্ম্মই ফলপ্রদ হয়। যে অবভাসকে আমরা জীব বলি তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাহাতে কি আসিয়া যায়? গাছের সঙ্গে তাহার বীজ মরে না এবং পক্ষী নিহত হইলেও তাহার অণ্ডের ফলবত্তা নিবারিত হয় না। জীবাত্মারূপ মায়া-বিভ্রম অন্তর্হিত হইলেও, কর্ম্মের বীজ থাকিয়া যায়; তাহা হইতেই শুভ অশুভ ফলজনিত দণ্ডপুরস্কারের ভোগ হয়; স্বর্গ, নরক বা পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জীবসমূহের অন্তর্নিহিত এই বীজই কর্ম্ম।"

কপিল-কৃত নিরীশ্বর ও দ্বৈতাত্মক দর্শনই সাংখ্যদর্শন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের অদ্বৈত পরমার্থদর্শন যে বেদান্ত, তাহারই বিরুদ্ধ পক্ষ এই লৌকিক দর্শন সাংখ্য।

অভিচারের দ্বারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অপদেবতারাও মানুষের বশীভূত হইত। অবশেষে যজ্ঞ, মন্ত্রের সহিত একীভূত হইয়া পরব্রহ্মে পরিণত হইল। যজ্ঞকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে আয়ত্ত করা যায়; রূপান্তরিত করা যায়, পুনর্ব্বার সৃষ্টি করা যায়।(৯)

বিশ্বব্রহ্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ এই দুই মতবাদ হইতে কতকগুলি সামাজিক পরিণাম প্রসূত হইল।

ধ্যানসমাধি মুক্তির স্থান অধিকার করায় এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রাচীন যজ্ঞের স্থান অধিকার করায়, ব্রাহ্মণের সাহায্য অনাবশ্যক হইয়া পড়িল।

বর্ণসমূহের মধ্যে কোন ভেদ নাই —জন্মান্তরবাদে এইরূপ বুঝাইয়া যায়। কারণ, মৃত্যুর পর একজন শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে, ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে পারে। এবং এই জন্মান্তরবাদ আর্য্যদিগের বংশ-পূজার উপর আঘাত করিল। এই বংশপূজা এই বিশ্বাসটির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে, মৃত্যুর পরে পিতা সন্তানের মধ্যেই জীবিত থাকেন; কিন্তু স্বয়ং পিতাই যদি মৃত্যুর পর অন্য বংশে পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহা হইলে কি হইবে?

পরিশেষে, সন্ন্যাসধর্ম্ম ধর্ম্মবীরের বীরত্ব হইয়া দাঁড়াইল; এই বীরত্বের অনুষ্ঠানে সকলেই যোগ দিতে পারে। ইহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য রহিল না শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিঠুরের আবেদন

(শেখ সাদীর মূল পারসী হইতে)

বয়াৎ।

আঁখিতে নাহিক লোর বুঝিনা বেদনা
হ'তে পারি পাষাণ সমান,
তা'বলে কি অশ্রুবিন্দু তব করুণার
জুড়াবে না ব্যথিতের প্রাণ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

---

(৯) Arriani Indica দেখ—Strabo, Geographica দেখ; মনু দেখ; Oldenberg-এর বুদ্ধ দেখ। তা ছাড়া এই বিষয়ে উপনিষদ ও মহাকাব্য পুরাণাদিতে অনেক বচন পাওয়া যায়।

জন্মদুঃখী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরের ঘর।

কষ্টে যাহাদের শিশুকাল কাটিয়াছে এবং আদর যাহারা যথেষ্ট পায় নাই তাহাদের পক্ষে ছেলে বেলার কথা ভুলিয়া যাওয়াই মঙ্গল। শৈশবের ক্ষত সারিয়া ওঠে শীঘ্রই, কিন্তু দাগ ঘুচে না।

ছুতার গৃহিণী বলে "যে দিনই ছেলেটা এ বাড়ীতে পা দিয়েছে সেই দিনই বুঝতে পেরেছি যে ও চোরের আড্ডায় মানুষ হ'য়েছে। ওর চারিদিকে চোখ। যখন কথা কইতে শেখেনি তখন থেকেই হাড়ে হাড়ে বজ্জাৎ, তখন থেকেই অবাধ্য। এই দেখলুম দিব্বি চুপ চাপ ক'রে ঘুমুচ্চে —আর আমি যেই চোখ বুজিচি অমনি চৌকীদারের মত চেঁচাতে আরম্ভ করেচে। হাড় পাজী, হাড় পাজী।"

হলম্যানদের যাহারা জানিত তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিত "হলম্যানদের পক্ষে ছেলেটাকে আশ্রয় দিয়ে লাভ না থাক্ ছেলেটার লাভ আছে। এমন ঘরে ঠাঁই পাওয়া ভাগ্যের কথা।" ছুতার গৃহিণীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে মতভেদ ছিল না। এই ঝরঝরে, থরথরে মাছের চোখের মত চক্ষুবিশিষ্ট, লম্বা, ছিপছিপে স্ত্রীলোকটিকে দেখিলেই মনে হয়, ভাবের আতিশয্যে লাভ লোকসানের কথা ভুলিয়া যাইবার পাত্র সে একেবারেই নহে।

বার্ব্বারা বৎসরে যে দুই চার বার নিকোলাকে দেখিতে আসিত (এখন তাহার পক্ষে ইহার বেশী আসা দুর্ঘট, কারণ ভীর্গাং-পরিবার এখন প্রায়ই সহরের বাহিরে বাহিরে হাওয়া খাইয়া বেড়াইত) প্রত্যেক বারেই সে দেখিতে পাইত নিকোলা ক্রমশ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া না উঠুক অন্ততঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। সে যতক্ষণ হলম্যানের বাড়ী থাকিত ততক্ষণই কেবল নিকোলার একগুঁয়েমি এবং দুষ্টুমির ইতিহাস ছুতার গৃহিণীর মুখে শুনিত। টিনমিস্ত্রির ঘরে থাকিয়া, অকেজো টিনের চাদরের মত নিকোলার স্বভাবটা নাকি একেবারে বাঁকিয়া তেউড়িয়া গিয়াছে।

সে বেশ হাঁটিতে পারে, অথচ, কেমন যে স্বভাবের দোষ এখনো হামা দিয়াই চলিবে। এদিকে আবার, হলম্যান-গৃহিণী একটু পাশ ফিরিয়াছে কি অমনি একটা না একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। হয় জল ঘাঁটিতেছে, নয় পেয়ালা শান্‌কির গোছা ধরিয়া টানিতেছে, না হয় সদরের ঘণ্টার দড়িটা ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে। বিড়ালের খাবার প্রায়ই তো বাটি সুদ্ধ উল্টাইয়া রাখে। কাজেই বেত গাছটাকেও নীচু করিয়া চোখের সামনে ঝুলাইয়া রাখিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। কারণ এখন হইতে ভয় না দেখাইলে এ ছেলে একেবারে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিবে। পরের ছেলে মানুষ করিয়া তোলা যে কি বিষম ব্যাপার তাহা অন্ততঃ বার্ব্বারার বুঝিতে পারা উচিত।

মনে যতই ব্যথা লাগুক বার্ব্বারা এ সমস্ত কথার কোনো জবাব খুঁজিয়া পাইত না। কাজেই সে ছুতারের ঘরে নিজের ছেলেকে দেখিতে আসিয়াও বেশীক্ষণ বসিতে চাহিত না। অপ্রিয় কথা উঠিলেই ছুতা করিয়া উঠিয়া পড়িত। হলম্যানদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার এক বিষয়ে একটু উপকার হইয়াছিল। সে অনেক চোখা চোখা কথা শিখিয়াছিল; বর্ত্তমান মনিবের সঙ্গে কোনো কারণে বনিবনাও না হইলে তাহার পক্ষেও যে বলিবার কথা অনেক আছে ছুতার গৃহিণীর দৃষ্টান্তে সে তাহা বেশ ভাল করিয়াই শিখিয়াছে।

এদিকে নিকোলার বয়স বাড়িতে লাগিল কিন্তু একগুঁয়েমি কমিল না। হলম্যান-গৃহিণীর মুষ্টি প্রয়োগের সঙ্গে সময়ে সময়ে হলম্যানকেও যোগ দিতে হইত। সে বেচারা সহজে এই দুশ্চিকিৎসায় রাজী হইত না; গৃহিণীর গঞ্জনা যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত কেবল তখনি নিঃসহায় নিকোলার পৃষ্ঠে দুই চারিটা চড় চাপড় মারিত। একাজটা ক্রমশঃ গৃহিণীর গৃহকর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। সুতরাং নিকোলার নিগ্রহ হলম্যানের অভিধানে গৃহিণীর গৃহকর্ম্মের সহায়তার নামান্তর হইয়া পড়িল।

হলম্যান্ লোকটি নিরীহ, অল্পভাষী। সে রোজ সকালে কাজে যাইত এবং বৈকালে মন্থর গতিতে বাড়ী ফিরিত। দরজার কাছে আসিয়া, জুতা ঝাড়িয়া, একটু ইতস্তত করিয়া বাড়ী ঢুকিত। নিজের বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে তাহার যে কি ধারণা তাহা হলম্যানের মুখ দেখিয়া বুঝিবার জো ছিল না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে গৃহিণী হিসাবে শ্রীমতী হলমান একখানি অমূল্য রত্ন, উহাকে মাথায় করিয়া রাখিলেও উহার যথেষ্ট মর্য্যাদা করা হয় না।

গরীয়সী গৃহিণীর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নিত্য নিয়ত ভাবিতে ভাবিতে বেচারা হলম্যানের বুদ্ধি শুদ্ধি প্রায় লোপ পাইবার মত হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ এ বিবাহে যে এই রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে অনিবার্য্য, তাহা দুই জনেই বেশ জানিত। শ্রীমতী হলম্যানকে একবার দেখিলেই কিম্বা একবার উহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেই এ ব্যাপারটা বোঝা শক্ত হইবে না। হলমান নিজের রোজগারের টাকায় সংসার চালায় অথচ কেমন করিয়া এমন হয় ইহার মধ্যে এইটুকুই বোঝা কঠিন।

পত্নীভাগ্য যাহার এমন অনন্যসাধারণ, সে যে মাঝে মাঝে বে এক্তার অবস্থায় বাড়ী ফেরে এই ব্যাপারটাই পাড়ার লোকের কাছে আবার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ।

নিকোলাকে পালন করিবার ভারগ্রহণের কয়েক বৎসরের মধ্যেই হলমান ছুতারের ঘরে এক দৈবঘটনা ঘটিল, বুড়া বয়সে ছুতার গৃহিণী একটি কন্যা সন্তানের জননী হইল। সুতরাং পরের ছেলেকে আর বেশী দিন ধরে স্থান দেওয়া উচিত কি না, ইহা লইয়া স্ত্রীপুরুষে তর্ক চলিতে লাগিল। শেষে নিয়মিত মাসহারার মোহই জয়ী হইল। স্থির হইল, নিকোলা যেমন ছিল তেমনি থাকাই ভাল; তাহাকে খুকীর সেবায় লাগানো যাইবে। সে বসিয়া থাকে, না হয় খুকীর দোলার দড়িটা ধরিয়া মাঝে মাঝে দোল্ দিবে। খুব হাল্কা কাজ, ছোট ছেলেদের উপযুক্ত কাজ, একটু শিখিলেই বেশ পারিবে। কিন্তু ছুতার-গৃহিণীর এই ন্যায্য আশাও ঠিক পূর্ণ হয় নাই। এই হাল্কা কাজেও নিকোলার গাফিলি। গৃহিণী কার্য্যান্তরে যাইবার সময় নিকোলাকে দোলার কাছে রাখিয়া যাইত কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিত নিকোলা জানালায় দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া রাস্তায় ছেলেদের খেলা দেখিতেছে। সময়ে সময়ে বেচারা দরজা খোলা রাখিয়া একেবারে রাস্তায়

নামিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন ব্যাপারও ছুতার-গৃহিণী দেখিয়াছে। এমন অসাবধান! লক্ষ্মীছাড়া পরের ছেলেটার হাড় কয়খানা গুঁড়াইয়া না দিলে উহার চৈতন্য হইবে না।

নিকোলার আর্ত্তচীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া যখন উপর তলার ভাড়াটিয়াদের ঝি মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগা আজ আবার কি হয়েছে? ছেলেটা অমন ক'রে কাঁদচে কেন?" তখন ক্ষণকালের জন্য হাত বন্ধ রাখিয়া ছুতার গৃহিণী মুখ খুলিয়া দিল। সে বলিল, পরের কথা, পরের দরদ তাহার ভাল লাগে না; অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে: পরের জ্বালায় সে জ্বালাতন, সে হতভাগাটাকে ঘরে বন্ধ রাখিয়া দেখিয়াছে, উহাকে খাইতে না দিয়া দেখিয়াছে, বকিয়া দেখিয়াছে, মারিয়া দেখিয়াছে, কিছুতেই ছোঁড়া বাগ্ মানে না। কোনো কাজের ভার দিয়া যদি নিশ্চিন্ত হইবার জো আছে। যে একগুঁয়ে সেই।

ইহার পর ছুতার গৃহিণী এক নূতন ফিকির আবিষ্কার করিল। সে নিকোলাকে ভূতের ভয় দেখাইয়া দোলা ছাড়িয়া যাইতে বারণ করিয়া দিল। সে বলিয়া রাখিল "দ্যাখ্, ঐ মশারির চালে শয়তান বসে আছে, তুই কি করিস্ না করিস্, দোলা ছেড়ে উঠিস্ কি না উঠিস্, সে সব দেখ্‌তে পাচ্ছে।"

বেচারা ছেলেমানুষ ভয়ে আর হাত পা নাড়িতে পারিত না। বাতাসে মশারি নড়িলেই তাহার মনে হইত শয়তান মাথা তুলিয়া তাহাকে দেখিতেছে। মাঝে মাঝে বাহিরের কলরবে সে জানালায় না গিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু যেমনি শয়তানের কথা মনে পড়িত অমনি এক দৌড়ে নিজের জায়গায় গিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিত।

যখন দোল্ দিবার প্রয়োজন ফুরাইল তখন নিকোলা হল্‌ম্যান্-কন্যা উর্সিলাকে খেলা দিবার এবং চোখে চোখে রাখিবার চাকরি পাইল। কিন্তু রাস্তায় পা দিবার হুকুম ছিল না। হল্‌ম্যান-গৃহিণী আগে হইতে খুব শাসাইয়া রাখিয়াছে, নিকোলা এখন আর সাহস পায় না। সে গৃহিণীর নিষেধ না মানিয়া দেখিয়াছে, নিকোলা ঠেকিয়া শিখিয়াছে। এখন তাহার পক্ষে নিষেধ মাত্রেই লোহার বেড়ী এবং বেতের বাড়ীর সমান হইয়া উঠিয়াছে। গণ্ডীর বাহিরে পা দেওয়া তাহার চক্ষে এখন সকলের চেয়ে গুরুতর পাপ। শ্রীমতী হল্‌ম্যানকে ধন্যবাদ! এই রকম না করিলে ছেলেটা কোন্ দিন বিপদ ঘটাইয়া বসিত; রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হইয়া অসাবধানে মেয়েটাকে এত দিন হয় গাড়ী চাপা দিয়া নয় তো সরকারী কূয়ায় ডুবাইয়াই মারিত।

উর্সিলা যে তাহার নিজের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর জীব নিকোলার এই রকম একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। উর্সিলাকে লোকে এক চোখে দেখে নিকোলাকে দেখে আর এক চোখে: ইহা সে বরাবর দেখিয়াছে।

যদিও উর্সিলার জন্য সে অনেক সহ্য করিয়াছে তবু কতকটা উহার জন্য অতটা সহিয়াছে বলিয়াই উর্সিলাকে নিকোলার আপনার বলিয়া মনে হইত। উর্সিলার উপর উহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। কথাটা নূতন ঠেকিতে পারে কিন্তু কথাটা খাটি। উর্সিলার সকল ভার যে তাহারই উপর ন্যস্ত এই ভাবটা ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সে উহাকে আশ্চর্য্য রকম ভালবাসিত; শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত বলিলেও ভুল হয় না। যখন হল্‌ম্যান গৃহিণী উর্সিলাকে লাল রঙের ঘাগরা এবং ফুলদার টুপি পরাইয়া দিতেন তখন নিকোলার মুখে হাসি ধরিত না। নিকোলা ক্ষুদ্র উর্সিলার কোনো কথায় 'না' বলিতে পারিত না। উর্সিলার হুকুম সে হল্‌ম্যান গৃহিণীর হুকুমের চেয়ে কম জরুরি মনে করিত না। উর্সিলা মুঠি মুঠি ধূলা নিকোলার মাথায় দিত, নিকোলা হাসিয়া কুটি কুটি হইত। এইরূপ খেলিতে খেলিতে বালিকা বাহানা করিয়া জুতা জামা খুলিয়া দিতে বলিত। যদি নিকোলা তাহার কথা শুনিয়া খুলিয়া দিল, তবে বাড়ীতে তাহাকে প্রহার খাইতে হইত; আর যদি না দিল, তবে উর্সিলা কাঁদিয়া কাটিয়া এমনি অনর্থ করিত যে, তাহাকে অকারণে কাঁদানোর অপরাধে নিকোলা সেই প্রহারই লাভ করিত।

নিকোলা অনির্ভরের উপর ভর করিয়াছিল, সংশয়ের মাঝখানে বাস করিতেছিল। সে চোরকুঠারির দিকে এমনি ভয়চকিত ভাবে চাহিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল যে ঐ জিনিষটা নজরে পড়িলেই, কোনো দোষ না করিলেও নিজেকে তাহার দোষী বলিয়া মনে হইত। তাহার বাল্য-জীবন এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

ছুতার গৃহিণী বলিত "ও যে পাজী তা' ওর চোখ দেখেই বোঝা যায়।" কথাটা মিথ্যা নয়, পাছে কিছু অন্যায় করিয়া ফেলে এই ভয়ে নিকোলার দৃষ্টি সদাই শঙ্কিত।

শাস্ত্রে বলে "সৎপ্রতিবেশী ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান।" বর্ত্তমান যুগে প্রতিবেশীই নাই, তা সৎ আর অসৎ। আমরা কেহ কাহারও প্রতিবেশী নই। নীচের তলায় ভাড়াটিয়া উপর তলার ভাড়াটিয়াকে চিনে না, এ বাড়ীর লোক ও বাড়ীর লোকের খোঁজ রাখে না। সুতরাং নিকোলার নির্য্যাতনে কেহ বড় একটা কথা কহিত না। প্রতিবেশীর নূতন পিয়ানো শিক্ষা যেমন করিয়া বরদাস্ত করা যায় ইহারা তেমনি করিয়া নিকোলার চীৎকার সহ্য করিত। এমন হতভাগা ছেলেকে যে শুধরাইবার অন্ততঃ চেষ্টাও হইতেছে এজন্য হয়তো কেহ কেহ বা মনে মনে খুসীই ছিল। নিকোলা ও উর্সিলা এক সঙ্গে বাড়ীর সম্মুখে ফুটপাথের উপর পায়চারি করিত; লোকে উর্সিলাকে বন্ধ ভাবে 'গুডমর্ণিং' বলিত; কিন্তু নিকোলাকে ঐ রকম কিছু বলা তাহারা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করিত।

হলম্যানেরা যে বাড়ীতে ভাড়াটিয়া ছিল, রাঁধুনি মারীন্ সম্প্রতি ঐ বাড়ীর একটা ঘরে উঠিয়া আসিয়াছে। সে ধর্ম্মিষ্ঠা ছুতার-গৃহিণীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চরিত্রের কোনো খবর রাখিত না, সুতরাং সে এমন একটা কাজ করিয়া বসিল যাহা শ্রীমতী হলম্যানের মতে অনধিকার চর্চ্চা। মারীন্ অনভিজ্ঞ সুতরাং তাহাকে মার্জ্জনা করিলেও করা যাইতে পারে।

স্থূলাঙ্গী মারীন্ একদিন সন্ধ্যাবেলায় লণ্ঠন হাতে কাঠকয়লা কিনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বোঝাই নৌকার মত হেলিয়া দুলিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে এমন সময় সিঁড়ির নীচে অন্ধকার চোরকুঠারির দিক হইতে একটা কান্নার আওয়াজ তাহার কানে পৌঁছিল। তাহার মনে হইল, যে লোকটা ফোঁপাইতেছে তাহার কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন গলা ধরিয়া গিয়াছে, আর যেন স্বর বাহির হইতেছে না, যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

ক্ষীণকণ্ঠের ভাঙা আওয়াজে মারীনের মন গলিয়া গেল, সে স্থির থাকিতে না পারিয়া লণ্ঠনের আলোকে শব্দের অনুসরণ করিয়া চোরকুঠারির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে ঝুঁকিয়া মারীন্ জিজ্ঞাসা করিল "ভিতরে কে গা? ঘরের ভিতর কে কাঁদে?"

হঠাৎ কান্নার শব্দ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

মারীন্ দরজায় ধাক্কা দিতেই ভিতর হইতে একটা চীৎকারধ্বনি উঠিল। মারীন্ আলো নামাইয়া শিকলটা খুলিয়া ফেলিল।

"আরে! এই অন্ধকারে এমন জায়গায় এই কচি ছেলেটাকে কে শিকল দিয়ে গেছে?" লণ্ঠনের আলোকে মারীন্ দেখিল নিকোলা, সভয়ে তাহারই দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে।

"ও! তুমি! মারীন্! আমি বলি শয়তান। শয়তান অমনি ক'রে দরজায় ধাক্কা দেয়।"

"তোর 'ভূতুড়ে' কথা রাখ, বাছা! এখনো আমার বুকের ভিতর কাঁপছে।"

"আমাদের গিন্নি বলে তাই বল্‌ছি"। হঠাৎ নিকোলা ঔৎসুক্যের সঙ্গে মারীন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাগা, গিন্নি যা' বলে সে কি সত্যি? না, আমি চিনির ঠোঙায় হাত দেব বলে আমায় ঐ কথা বলে ভয় দেখায়?"

"ও! তাই বুঝি তোকে আট্‌কে রেখেছে?"

"না গো না, আমি চুরি করি নি; নিলেও বলে চুরি করিচি, না নিলেও বলে চুরি করিচি, এইবার থেকে সব খেয়ে টেয়ে শেষ ক'রে রাখ্‌ব। দেখনা, এই দেখনা, সেদিন কাঁচের বাটির ঢাকনিতে একটু খানি চিনি লেগেছিল সেইটুকু আমি জিবে দিইছিলুম, তা' আমাকে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলে, এইবার থেকে লুকিয়ে সব শেষ ক'রে রাখ্‌ব। মজা দেখ্‌তে পাবে।" নিকোলা রাগে গন্ গন্ করিতে করিতে বলিল "সব খেয়ে রাখ্‌ব, চুরি ক'রে খেয়ে রাখ্‌ব, টেরটি পাবে।"

হঠাৎ মারীনের কাপড় ধরিয়া নিকোলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো তুমি থাক, তুমি যেয়ো না, আমার অন্ধকারে বড় ভয় ক'রে; অন্ধকার হ'লেই শয়তান আস্‌বে; যেয়ো না। থাক।"

মারীন্ ভারি মুস্কিলে পড়িল, সে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, নিকোলাকে ছাড়িয়া দিতে তাহার

সাহস হইল না। সে নিকোলার হইয়া না হয় ছুতার-গৃহিণীকে দু'কথা বলিবে।

নিকোলা বলিল, "না, না, তুমি কিছু বলতে যেয়োনা, তাহ'লে আবার আমায় মারবে।"

তবে আর উপায় কি? মারীন এই কচি ছেলেকে অন্ধকারে একলা ফেলিয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া সে নিকোলাকে বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা, তবে আয় আমার সঙ্গে, আজ রাত্তিরটা আমার ঘরেই ঘুমুবি; কেমন?"

এবার নিকোলা হল্‌ম্যান-গৃহিণী কি বলিবে সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়াই একেবারে দুই হাতে মারীনের বস্ত্রপ্রান্ত চাপিয়া ধরিল। মারীন নিকোলাকে লংবোটের মত পিছনে বাধিয়া মন্থর গতিতে জাহাজের মত বন্দরে ফিরিল।

তোরঙ্গ খুলিয়া মারীন তাহার পুরাণ গরম কাপড়-গুলি বাহির করিয়া, বেঞ্চির উপর বিছাইয়া নিকোলাকে শুইতে দিল। আনন্দে বালক তাহার সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল। তাহাকে এমন যত্ন কেহ কখনো করে নাই।

তাহা ছাড়া এই রাঁধুনির ঘরের দেয়ালে কত নূতন জিনিস্, কত চক্‌চকে টিনের বাসন। আবার একটা বিড়ালও আছে, এ বিড়ালটাকে সে কতবার দেখিয়াছে, কিন্তু এযে মারীনের তাহা সে জানিত না। সে গুঁড়ি মারিয়া বিড়ালটাকে ধরিতে গেল। ঐ যা, টেবিলে ধাক্কা লাগিয়া কেটলিটা উল্‌টিয়া পড়িয়া গেল। ভয়ে নিকোলা ঘর ছাড়িয়া পালায় আর কি! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মারীন্ তো তাহাকে ধমক দিল না, মারিতেও গেল না। এ ভারি আশ্চর্য্য! নিকোলা ঐ চক্‌চকে টিনের বাসনগুলা দেখিয়াও এত আশ্চর্য্য হয় নাই, মারীনের ঘরে বিড়ালটাকে দেখিয়াও না।

বাতের ব্যথায় অনেকক্ষণ ধরিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে মারীন ঘুমাইয়া পড়িল। সহসা একটা চীৎকার শব্দে সে জাগিয়া উঠিল।

"কি? কি? কি হ'য়েছে? নিকোলা! নিকোলা!" মারীন্ তাড়াতাড়ি পোড়া বাতির মুড়াটুকু জ্বালিয়া দেখে নিকোলা উঠিয়া বসিয়া হাত পা ছুড়িতেছে। ঝাঁকানির চোটে ঘুম যখন ভাল করিয়া ভাঙিল তখন বেচারা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "ওরা আমায় কাট্‌তে এসেছিল।"

নিকোলাকে ঠাণ্ডা করিয়া বাতি নিবাইয়া, পুনর্ব্বার ঘুমের আয়োজন করিতে করিতে মারীন ভাবিতেছিল তাহার যে সন্তান হয় নাই সে জন্য সে খুব খুসী আছে, মাথার উপর কোনো ঝুঁকি নাই। তবে একটা না একটা জ্বালা মানুষ মাত্রেরই আছে, এই দেখ না, যার সন্তানের জ্বালা নাই তার আছে বাতের ব্যথা।

পর দিন সকালে যখন হল্‌ম্যান্ গৃহিণী মারীন্‌কে তাহার অনধিকার চর্চ্চার জন্য বাড়াসুদ্ধ লোকের সম্মুখে দশ কথা শুনাইয়া দিল তখন মারীন অপরাধীর মত একেবারে চুপ করিয়া রহিল। নিকোলার দৌরাত্ম্যে হলম্যানদের প্রত্যেককে প্রত্যহ যে কি যন্ত্রণা ভুগিতে হয় এবং কি জন্য যে উহাকে প্রতিদিনই শাস্তি দিতে হয়, হলম্যান-গৃহিণী তাহা এমনি করিয়া বর্ণনা করিল যে কাহারো আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শ্রীমতী হলম্যান্ সব সহিতে পারে, কেবল সংসারে বিশৃঙ্খলা সহিতে পারে না, বেচাল দেখিতে পারে না। তাহার কাছে থাকা সত্ত্বেও কাহারও অশিষ্ট স্বভাব ঘোচে নাই— এর চেয়ে নিন্দার কথা সে কল্পনাও করিতে পারে না।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় নীচের তলায় কাঠ কাটিতে কাটিতে মারীন্ যখন হল্‌ম্যানদের ঘর হইতে নিকোলার কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল তখন আর তাহার উপরে যাইতে পা উঠিল না। যতক্ষণ কান্নার শব্দ শুনিতে পাইল ততক্ষণ বেচারা নীচেই রহিল। সে এমন করুণ কান্না আর কখনো শুনিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। শাস্তি সুবিচারের ফলেই হোক আর অবিচারের ফলেই হোক্ মারীন্ কান্না সহিতে পারে না।

সেইদিন হইতে মারীনের ঘর নিকোলার আশ্রয়ের বন্দর হইয়া উঠিল। শাসনের ঝড়ে সে অনেক সময় এইখানে লুকাইয়া বাঁচিয়া যাইত। সে ইঁদুরটির মত এককোণে বসিয়া কাঠের ছোট ছোট নৌকা কুঁদিত। হল্‌ম্যান্‌কে টিফিন খাওয়াইতে গিয়া সে প্রায়ই এই সব অকেজো কাঠের টুকরা কুড়াইয়া আনিত।

নিকোলার শিশুজীবন যে নিরানন্দেই কাটিয়াছে একথা বলিলে একটু অত্যুক্তি হইবে। নিকোলা হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর কাছে যেমন প্রহার খাইয়াছে মাঝে মাঝে তেমনি

প্রশংসাও পাইয়াছে; অবশ্য সে প্রশংসা ঠিক তাহার নিজের প্রশংসা নয়, তাহার নৈতিক উন্নতির জন্য ছুতার গৃহিণী স্বয়ং যে কি পরিশ্রমটাই করিয়াছেন তাহারি প্রশংসা।

ছয় মাস অন্তর নিকোলার খরচের জন্য হলম্যান্-পত্নীকে কৌসুলী সাহেবের বাড়ী যাইতে হইত। নিকোলা কি ছিল এবং তাহার যত্নে কি হইয়া উঠিয়াছে সে বর্ণনাটাও সেই সময়েই হইত। কৌসুলী সাহেবের যে গাড়ীখানা করিয়া হাটের জিনিস যাইত, মাঝে মাঝে নিকোলাও সেইটাতে চড়িয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ছুটি পাইত।

যেদিন সে মার কাছে যাইত, সে দিন পূর্ব্বাহ্নে, হল্‌ম্যান গৃহিণী তামার পাত্র যেমন তেঁতুল দিয়া, বালি দিয়া মাজিয়া ঘষিয়া লাল করিয়া তোলে তেমনি নিকোলাকেও মাজিয়া ঘষিয়া লাল করিয়া তুলিত। সে যতক্ষণ গাড়ীতে থাকিত গাড়োয়ানকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিত। সে দিন আর তাহার মুখের একদণ্ড বিশ্রাম থাকিত না। সবলের চেয়ে কৌসুলী সাহেবের কালো ঘোড়াটাই নিকোলার কাছে কৌতূহলের সামগ্রী ছিল। সেইটেই সাহেবের সব চেয়ে ভাল ঘোড়া? না, ইহার চেয়েও ভাল ঘোড়া আছে? সে কি রেলগাড়ীর চাইতে জোরে চলে? না রেলগাড়ী তার চেয়ে জোরে চলে? সে কার চাইতে এবং কিসের চাইতে আগে যাইতে পারে?… ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর গাড়ী মোড় ফিরিয়া একেবারে কৌসুলী সাহেবের রন্ধনশালার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইত। ইস্! ঘোড়াটা কি শীঘ্রই দৌড়ায়।

তারপর একজন চাকর আসিয়া নিকোলাকে ঘরের পর ঘরের ভিতর দিয়া তাহার মার কাছে লইয়া যাইত।

"ওরে, ওর জুতোয় কাদা, জুতোয় কাদা: বলি, তোদের কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? ওকে ঐ কাদা পায়ে এখানে এনে হাজির করিচিস্?" বাৰ্ব্বারা নিকোলাকে উঁচু করিয়া তুলিয়া একেবারে একখানা চৌকীর উপর বসাইয়া দিল। রুটি, মাখন, দুধ, প্রভৃতি খাইতে দিয়া বার্ব্বারা চলিয়া গেল: যাইবার সময় বলিয়া গেল "খাওয়া হ'লে এইখানে স্থির হ'য়ে বসে থেকো, আমি এখন লিজি আর লাড্‌ভিগের কাপড়ে সাবান দিতে চল্লুম।"

বার্ব্বারা যাইতে না যাইতে লাড্‌ভিগ্, লিজি নিকোলার কাছে হাজির; বয়সে নিকোলা তাহাদের সমান। তাহারা নিকোলার সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছে, মেয়েটির দুই হাতে দুইটা বড় বড় পোষাক-পরা পুতুল। ছেলেটি একটা মস্ত কাঠের ঘোড়া দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া আনিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা ঘরের চারিদিকে ঘোড়দৌড় আরম্ভ করিয়া দিল। লাড্‌ভিগ্ ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল, নিকোলা তাহার ঘোড়ার দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। অনেক বার টানিয়া শেষে নিকোলা নিজে একবার চড়িতে চাহিল, লাড্‌ভিগ নামিতে রাজী হইল না। নিকোলা দড়ি ফেলিয়া রাগ করিয়া লাড্‌ভিগের একটা পা ধরিয়া তাহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল।

"হতভাগা, ঝির ছেলে, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা?" "ঝির ছেলে? তুমি ঝির ছেলে!" বলিয়া নিকোলা লাডভিগ্‌কে যেমন ধরিতে গেল অম্‌নি সে ছুটিয়া খাটের পিছনে দাঁড়াইয়া বালিশ ছুঁড়িতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া বার্ব্বারা ছুটিয়া আসিল এবং নিকোলাকে খুব খানিক বকিয়া শেষে বলিল "লিজি লাড্‌ভিগ্ যা' বলে তাই শুনবি, বুঝিচিস্? ওরা হ'ল কৌসুলী সাহেবের ছেলে; ওদের গায়ে হাত তুল্‌তে গিয়েছিস্? বুড়ো ছেলে, লজ্জা করে না!"

তারপর লাড্‌ভিগ্‌কে কোণে বসাইয়া তাহার কোটের ধূলা ঝাড়িয়া আদর করিয়া বার্ব্বারা বলিতে লাগিল "এমন ছেলে কেউ দেখেনি! এমন ভাল ছেলে কি আর হয়? একটু বস, বাবা আমার, মাণিক আমার, দেখ দেখি, নতুন ইস্তিরি করা কলারটা একেবারে ভেঙে ছাই ক'রে দিয়েছে। নিকোলা, লাড্‌ভিগের জামাটা ধর, আমি ওর কলারটা বদ্‌লে দিই।"

বার্ব্বারার আদরে খুসী হইয়া লাড্‌ভিগ্ মারামারির কথা ভুলিয়া গেল এবং নিকোলাকে তাহার গির্জ্জায় যাইবার নূতন পোষাক দেখাইবার জন্য বার্ব্বারাকে দেরাজ খুলিতে বলিল।

নিকোলা অবাক হইয়া লাড্‌ভিগ্ ও লিজির জামা কাপড় দেখিল, কত রকমের পুতুল দেখিল, বাজনা দেখিল, ছবি দেখিল। দেরাজ বন্ধ করিবার সময় বার্ব্বারা বলিল "ওরা লক্ষ্মী বলে, শান্ত বলে এই সব পেয়েছে।"

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া নিকোলা ভাবিতে লাগিল "এরা নিশ্চয়ই খুব—খুব ভাল, সেইজন্য এত সব খেল্‌বার জিনিস্ পেয়েছে, আর সেই জন্যে" নিকোলার চক্ষে জল আসিতেছিল "আর সেই জন্যে আমার মা আমার চাইতে এদেরি বেশী ভালবাসে।" নিকোলার মন দমিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে তিনটা বাজিয়া গেল, কৌসুলী সাহেবকে কাছারী হইতে আনিবার জন্য যে গাড়ী সহরে যাইবে নিকোলাকে সেই গাড়ীতেই পৌঁছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বাব্বারা নিকোলাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে লিজি লাড্‌ভিগও গেল। "শান্ত হ'য়ে থাকিস্, নিকোলা, বুঝিচিস্, দৌরাত্মি করিস্ নে। হল্‌ম্যানরা যা বলে শুনিস্। দেখ, দেখ, অমন ক'রে পা ঠুক্‌চিস্ কেন, গাড়ীর বার্ণিস যে সব চ'টে যাবে। কোথায় পা রাখ্‌লে, দেখ, ওরে গদিতে যে কাদা লাগ্‌বে। ওরকম চুলবুল করিসনে, যতক্ষণ গাড়ীতে যাবি, চুপ্ করে বসে যাবি, নড়িস চড়িসনে, বুঝিচিস? লাড্‌ভিগ্ কেমন, লিজি কেমন, ওরা তো তোর মতন নয়, কেমন গাড়ীতে বসে যায়; না লাডভিগ? না লিজি?" গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

দিনটা ভালই কাটিয়াছিল, উপরন্তু আসিবার সময় নিকোলা একখানা বড় 'কেক' উপহার পাইয়াছিল, সেটা খাইতেও চমৎকার, কিন্তু গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিবার কিছুক্ষণ পরে নিকোলা চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে সারাটা পথ কেবল কাঁদিল।

তারপর দিন সকালে নিকোলা যখন উর্সিলাকে বাড়ীর সম্মুখে টহলাইতে ছিল তখন হল্‌ম্যান গৃহিণী বাড়ীওয়ালীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিতেছিল তাহার কিছু কিছু নিকোলার কানে গেল।

"ভাল বল্‌তে হয় বই কি, খুব ভাল; আমরা গরীব; বলতে গেলে, আমাদের পাঁচ পাতের কুড়িয়ে খেতে হয়, তাই আমরা ঠাঁই দিইচি। ভদ্রলোকের পক্ষে খুব আশ্চর্য্যি, নিজের ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে দাঁড়াতে দেওয়া খুবই আশ্চর্য্যি। ছোঁড়ার ভাগ্যি; নইলে কোথাকার কে তার ঠিক নেই; বাপ নাকি বিবাগী হ'য়ে গেছে; ভগবান জানেন। লোকের কাছে তো মার পরিচয়েই ওর পরিচয়।"

পথের ধারে একটা মুরগীর মাথা পড়িয়াছিল, রাগে অপমানে নিকোলা সেটা জুতা দিয়া এমনি করিয়া মাড়াইল যে সেটা একটা ডবল পয়সার মত চেপ্টা হইয়া গেল।

ভূতের ভয় দেখাইয়া যখন আর কাজ হাসিল হইত না তখন হলম্যান-গৃহিণী নিকোলাকে পাঠশালায় পাঠাইবার ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। উহার ধারণা পাঠশালাই ছেলে 'ঢিট্' করিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট স্থান।

নিকোলার এ সম্বন্ধে ধারণাটা বেশ সুস্পষ্ট ছিল না। যে ভাবে কথাটা পাড়া হইত, তাহাতে জায়গাটা যে অভাবনীয় রকম ভয়ানক, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

শেষে সত্যই তাহাকে ইস্কুলে পাঠানো ঠিক হইয়া গেল। আগামী সপ্তাহে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে।

বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, নিকোলা গণিয়া দেখিল মোটে আর চারটি দিন বাকী। এই কয়দিন সে উর্সিলাকে তাহার আদরের সিলাকে একদণ্ডও কাছ ছাড়া করিবে না। দেখিতে দেখিতে কয়টা দিনই কাটিয়া গেল, এখন তাহার হাতে আছে কেবল রবিবারের সন্ধ্যাটা।

চায়ের সময় নিকোলা সিলার মুখে শুনিল, যে, সে ইস্কুলে যাইবার দিন এক সুট নূতন কাপড় পাইবে। কথাটাতে সে যেন একটু সান্ত্বনা লাভ করিল। সে রাত্রে ঐ কথা ভাবিতে ভাবিতে বেচারা ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে কিন্তু নিকোলাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। হলম্যান গৃহিণী কত খুঁজিল, উদ্দেশে কত লোভ দেখাইল, কত ভয় দেখাইল, কিন্তু কোন মতেই নিকোলার সাড়া পাওয়া গেল না; সে একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে।

রন্ধন শেষ করিয়া মাবীন্ ঘরে ঢুকিতে গিয়া হঠাৎ নিকোলাকে তাহার তক্তপোষের নীচ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সে উহাকে কিছু খাওয়াইল এবং হল্‌ম্যানদের কাছে ফিরিয়া যাইতে বলিল। নিকোলা, কিন্তু, অন্ধকার হইবার আগে ফিরিতে কিছুতেই রাজি হইল না।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন নিকোলা গুটি গুটি বাহির হইয়া পড়িল। নদীর কিনারা দিয়া চলিতে চলিতে একখানা খালি নৌকা তাহার চোখে পড়িল; সে সেইটার উপর চড়িয়া বসিল এবং সেটাকে খানিকক্ষণ দোলাইল।

তারপর হেমন্তের কুয়াসার ভিতর দিয়া আসিয়া বান্‌হাউসের তারের বেড়ায় ঠেশ্ দিয়া দাঁড়াইয়া দূর হইতে তাহার অনেক দিনের বাস গৃহের দিকে তাকাইয়া রহিল। হল্‌ম্যান্ ফিরিয়া আসিল, এবং অভ্যাস মত একটু ইতস্তত করিয়া ঘরে ঢুকিল, ঘরে আলো জ্বালা হইল, সিলা শুইতে গেল; নিকোলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিতে লাগিল। সেই অন্ধকার বাড়ীর আলোকিত ক্ষুদ্র জানালা তাহার কাছে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির রক্ত চক্ষুর মত ভয়ানক বোধ হইতেছিল। ঐখানে তাহার অমার্জ্জনীয় অপরাধের শাস্তি উদ্যত হইয়া আছে তাহা যেন সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল।

তাহার পর আলো নিবিয়া গেল।

সেই দিন গভীর রাত্রে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে, বান্‌হাউসের চৌকিদার লণ্ঠন লইয়া সদ্য নামানো স্তূপাকার মালের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে আরাম করিতে গেল। সে নিকোলাকে দেখিতে পাইল না। অথচ বালক সম্মুখেরি কয়েকটা বস্তার আড়ালে যেখানে জল কাদার দিনে ব্যবহার্য্য কয়েকখানা তেরপল এবং লম্বা তক্তা জমা করা ছিল—সেইখানে লুকাইয়া হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছিল।

নিকোলা ঘুমাইয়া আপনাকে ভুলিয়াছিল, সব দুঃখ ভুলিয়াছিল, সে এক রকম নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিল। এখন তাহার কাছে ইস্কুলের ভয় নাই, হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর ভয় নাই, সে এখন সকল ভয়ের অতীত; সে একে বালক, তাহার উপর সে নিদ্রিত।

এই একদিনের অভিজ্ঞতায় নিকোলা বুঝিল যে হল্‌ম্যানের বাড়ীর বাহিরেও তাহার আশ্রয় আছে। এখন হইতে সে এই কালো কালো তেরপলগুলিকে বন্ধুর চক্ষে দেখিতে লাগিল। হল্‌ম্যান্-গৃহিণীর তাড়াইয়া দিবার ভয় এবং তাড়নার ভয় তাহার কাছে আর আগেকার মত ভয়ঙ্কর রহিল না।

সে যাহাই হউক, ইস্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি হইতে হইল, কিন্তু সেখানে ছুতার-গৃহিণী-বর্ণিত বধমঞ্চের মত প্রহারমঞ্চ বলিয়া কোনো জিনিস যে নাই, ইহা জানিয়া সে আশ্বস্ত হইল।

নূতন বুট জুতায় পা ঢোকানো যেমন কষ্টকর, প্রথম প্রথম নিকোলার কাছে লেখা পড়া শেখাও তেমনি কষ্টকর বোধ হইয়াছিল।

অনেক জিনিস সে বুঝিত, অনেক জিনিস বুঝিত না। যাহা সে না বুঝিত, সে তাহা হাজার বুঝাইলেও বুঝিত না। বরং উল্টা হইয়া যাইত, মাথার ভিতর সমস্ত গোলমাল হইয়া যাইত, কান্না আসিত। সে কেবল পিছাইয়া পড়িত, আবার ছুটির পর বন্ধ থাকিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া কোনো রকমে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। নিকোলার সহপাঠীদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু বেশ ভাল ছেলের মত সব মুখস্থ করিয়া ফেলিত। হায়! সবাই তাহার চেয়ে ভাল!

শাস্তিই পাক আর পড়াই না পারুক্ বাড়ীর চেয়ে নিকোলার ইস্কুলই ভাল লাগিতে লাগিল। বাড়ীতে তাহার সন্ধ্যাটা আর কাটিতে চাহিত না; বিশেষ, সে পড়া করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য হল্‌ম্যান্-গৃহিণী তাহার কাছেই চোখ পাকাইয়া বসিয়া থাকিত; সুতরাং সে সাহস করিয়া একটিবার সিলার দিকে চাহিতেও পারিত না, কথা কওয়া তো দূরের কথা।

হল্‌ম্যানের কথা ছাড়িয়া দাও, সে কিছু দেখিয়াও দেখিত না, শুনিয়াও শুনিত না। সে সেল্‌ভিগের দোকানে একটি চমৎকার ঔষধের সন্ধান পাইয়াছিল; উহারই গুণে সে শ্রীমতী হল্‌ম্যানের সমস্ত তিরস্কার অক্লেশে পরিপাক করিতে সমর্থ হইত।

সে প্রত্যহ কাজ সারা হইলেই সেল্‌ভিগের দোকানে গিয়া হাজির হইত, এবং ঘড়ির কাটা সাতটার কাছাকাছি হইলেই একেবারে দড়িছেঁড়া হইয়া বাড়ীমুখো ছুটিত। মদের দোকানে আসিয়াও হল্‌ম্যান্ ঘড়ি ধরিয়া চলিত বলিয়া অন্যান্য মাতালেরা উহাকে 'মিলিটারী ম্যান্' ও 'হু-কাম-দার' বলিয়া ঠাট্টা করিত। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কবির প্রতি

হে তাপস! হে কবি সুন্দর!
সেথা তব ধ্যানের আসনে
অঞ্জলি রচিয়া দুই কর
ছিলে বসি কোন মহা ক্ষণে।

স্তব্ধ কাল, রাত্রি আর দিন
মৌন ছিল নিঃশব্দ আকাশে,
দূরে সিন্ধু অজানা অসীম
আনন্দ আহ্বান তার আসে !
আজি তব হৃদয়-আলোকে
ফুটেছে বিশ্বের শতদল।
হেরিছেন তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বরাজ, আনন্দবিহ্বল !
গভীর এ মরমের মাঝে
চাহি আমি, কিবা আছে তোর ?
শুনি সেথা অপরূপ বাজে
তব সুরে দুঃখগান মোর !

শ্রীসুশীলা দেবী।

"কবি-সম্বর্দ্ধনা"

যেদিন গগনভালে উদেছিলে নবীন তপন
বিস্মিতা মোহিতা ধরা মেলি শত তৃষিত লোচন
চেয়েছিল তব মুখে, শুচি রুচি স্বর্ণ আলোক
প্লাবিয়া অম্বরতল ছেয়েছিল পুলকে ভূলোক !
সচকিত জাগরিত শত পাখী নবীন প্রভায়,
"একি ছন্দ ! একি ভাষা !" কলস্বরে সবে গান গায় !
"একি রূপ ! একি জ্যোতি !" মূক পাদপের বক্ষ টুটে
শতবর্ণ গন্ধময় ভাবরাশি ফুল হয়ে ফুটে !
মধ্যাহ্ন শরদাকাশে একচ্ছত্র যুগ-অধীশ্বর !
আকর্ষি স্বকীয় তেজে হে রবীন্দ্র প্রদীপ্ত ভাস্কর
কবি-গ্রহ-দলবলে, চলেছিলে কোন্ মহাপথে
বোঝেনি তখন কেহ, শুধু ধরা তৃপ্ত মনোরথে
সুখোষ্ণ কিরণজালে ছিল সুপ্তা শ্যাম স্নিগ্ধ দেহে,
আকর্ষি সহস্র করে, গূঢ় তার রূপ রস স্নেহে
ছিল যাহা চিরদিন লুক্কায়িত রোমাঞ্চ পুলকে,
ভাষার আলোকে তাহা প্রকাশিলে দ্যুলোকে ভূলোকে।
হেরে আজ বিশ্ববাসী সাথে লয়ে এ সৌর জগৎ
অচিন্ত্য অয়নে কোন্ মহা তেজে চলে তব রথ।
কাঞ্চনশৃঙ্গের চূড়া সায়াহ্ন পশ্চিমাকাশে হেলা,
নাহি ভয় হয় যদি স্বল্পস্থায়ী অঘ্রাণের বেলা !
নাহি শোক নাহি মৃত্যু হের আজ গগনের কোলে
দীপ্ত বৃহস্পতি শুক্র রবি তেজে সোম ওঠে জ্বলে।
খণ্ডে অংশে রূপান্তরে অমর সে রবির কিরণ
গ্রহ উপগ্রহ বেশে উজলিছে সাহিত্যগগন।
সঞ্জীবনী ধারা পানে বীতশোকা অমৃতা ধরণী
হেরে তপোবন-শিরে কি নব প্রভায় দিনমণি !
হোমধূমে-দীপ্ত দিক, বেদধ্বনি তুলিছে ঝঙ্কার
শুনিয়া মহান্ গান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সবিতার।
"মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে নাহি অন্য পথ, তমসের পারে
মহান্ত পুরুষ যিনি, জানি আমি হেরি আমি তাঁরে !"
তব হস্তধৃত দীপে উর্দ্ধশিখা করিছে ইঙ্গিত
আহ্বানিয়া বিশ্বজনে উর্দ্ধ পানে, ওগো পুরোহিত !
দাও তুলি আজি এই ধরণীর দীন অর্ঘ্য, রবি !
পদে তাঁর, কবি তুমি যে মহাকবির প্রতিচ্ছবি।

বঙ্গমহিলা।

"অর্ঘ্য"

(শ্রদ্ধাস্পদ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত।)

শেষ হবে বাল্য খেলা, কৈশোরের সোনার স্বপন
আঁখিকোণে লীন,
সেই এক মহা লগ্ন জীবনের নব উদ্বোধন,
প্রথম যে দিন
বঙ্গের সাহিত্যকুঞ্জ যেই পিক পাপিয়ার তানে
সতত মুখর,
মৃদু অতি পশেছিল, দীনা বঙ্গ বালিকার কানে,
সে মধুর স্বর !
ভেবেছিল মূঢ়মতি, আপন অস্ফুট কল্পনায়
শুনিয়া সে গান,
বহু দূরে শূন্য পুরে, বুঝি সুর গায়কেরা গায়,
ললিত সুতান।

এঁকেছিল কল্পনাতে, বুঝি কোথা "নৈবেদ্য" সাজায়ে,
সিদ্ধ বিদ্যাধর,
"তুমি যদি দাও বীণা" বলিতেছে উপাস্যের পায়ে
"গা'ব নিরন্তর!"
ভেবেছিল, এ বুঝি সে শূন্যগামী চাতকের স্বর,
চন্দ্রলোক তলে,
ভেবেছিল সে ঝঙ্কার ত্রিদিবের সঙ্গীত মধুর
এ মহীমণ্ডলে।
দেখিনু প্রত্যক্ষ সত্যে, কি আনন্দ! ভাগ্যে বাঙ্গালীর,
মিথ্যা সে স্বপন,
আর্য্য "ঋষিপুত্র" করে বাজে বীণা মধুর গম্ভীর
সুধা প্রস্রবণ।

দেব!
নিভৃত এ শ্যামকুঞ্জে শুভক্ষণে উঠেছিল বাজি',
তোমার বাঁশরী;
দিনে দিনে অভিনব চারু সাজে উঠিতেছে সাজি'
বঙ্গভাষা মরি!
এ বাঁশরী না বাজিলে ভাষার সে জীবনের স্রোত,
যেত বুঝি থামি',
প্রমত্ত তরঙ্গভঙ্গে চূর্ণ করি' শত অবরোধ
আসিত না নামি'।
ধন্য মাতা বঙ্গভূমি, স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল তলে যাঁ'র,
বীণা পুত্রবর
"কৃত্তিবাস," "কাশীদাস", "মুকুন্দ", "প্রসাদ", "চণ্ডীদাস,"
"ভারত", "ঈশ্বর",
সে সব বীণার তান ধীরে যবে শূন্যে হ'ল লীন,
বঙ্গের প্রাঙ্গনে,
মধুকণ্ঠ "মধু", "হেম", "দীনবন্ধু", "বঙ্কিম", "নবীন",
গাহিল সুস্বনে।
অস্ত সে "রজনীকান্ত", নীরব হয়নি বঙ্গভূমি,
তবু কবিবর!
"শান্তি-নিকেতনে" বসি', শিষ্য সঙ্গে, হে তাপস, তুমি
তুলিতেছ স্বর!
সাধনা-সংযত কণ্ঠ, দিন দিন মধু হ'তে মধু,
তোমার ঝঙ্কার,
দীর্ঘজীবী হও তুমি, প্রার্থনা করিছে বঙ্গবধূ,
বঙ্গ-অলঙ্কার!
কোথা তুমি মহাত্মন্! দিগন্তবিস্তৃত যশোশিখা
ভাস্বর ভাস্কর!
বাঙ্গলার এক প্রান্তে কোথা আমি ক্ষীণা খদ্যোতিকা,
মূর্খ, নিরক্ষর!
তবু আজি বাঙ্গলায় নিরখিয়া তোমার সম্মান,
হর্ষোদ্বেল চিতে,
অযোগ্য সাহস ভরে আসিয়াছি লজ্জাত্রস্ত প্রাণ,
তোমারে নমিতে!

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

কবি ও যোগী

কবি ভালবাসে ছবি যোগী বাসে যোগ,
কবিতে যোগীতে কভু এক নহে ভোগ।
কবি চাহে আপনারে বাজাইতে ছন্দে,
যোগী চাহে মিলাইতে "একের" আনন্দে।
কবি দেখে তালে তালে বাজে বিশ্বসুর,
যোগী দেখে সবি "একে" আছে ভরপুর।
কবি চাহে রূপ মাঝে হইবারে লয়,
রূপের অভাবে তার প্রাণ নাহি রয়।
যোগী চাহে সর্ব্বরূপ করিয়া মন্থন,
উঠে যে অমর সত্য আত্মা মহাধন,
তারি মাঝে আপনারে করিতে বিলীন;
কবিতে যোগীতে এই ভেদ চিরদিন।
একদিন যোগীসনে পেল কবি দেখা,
ললাটে দেখিল তার যোগানন্দ লেখা,
বলিল, হে যোগী তুমি পাও কোন্ রস
চিত্ত যাহে নিত্য তব হয় হেন বশ?
যোগী কন, তারে আমি কহিতে না জানি
রূপারূপ যোগে সেথা নাহি ফুটে বাণী।
শুনিয়া কবির চিত্তে ভাতিল যে ছবি
কবি হল যোগী, তাহে যোগী হল কবি।

শ্রীহেমলতা দেবী।

গারো জাতির বিবরণ

(Major A. Playfair-রচিত "The Garos" ও Colonel Dalton-রচিত The Ethnology of Bengal নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত)

গারো হিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণ সীমা। ইহার উত্তর এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া, দক্ষিণে ময়মনসিং এবং পূর্ব্বে খাসিয়া পর্ব্বত। এই প্রদেশ গারোজাতির বাসস্থান। ১৯০১ সালের গণনা অনুসারে গারোদিগের মোট সংখ্যা ১৬০৪৩৬।

গারোদিগের রং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ নহে, তবে খাসিয়া দিগের অপেক্ষা বিশেষ কালো। তাহাদের আকৃতিতে মঙ্গোলিয় জাতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের মুখ খাটো এবং গোলাকার। ললাট ভ্রূরেখা অতিক্রম করিয়া বেশী প্রসারিত হয় না। নাসিকার খর্ব্বতা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমুদায় মুখমণ্ডল যেন পিটাইয়া চ্যাপটা করা। চুল কখন কখন খাড়া দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কোকড়ান। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ই খাটো। উচ্চতায় পুরুষ গড়ে ৫ ফুট ১½ ইঞ্চি এবং স্ত্রীলোক ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি। মোটা মানুষ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোকেরা মধ্যবয়স অতিক্রম করিলেই শ্রীহীনা হইয়া পড়ে। অল্প বয়সে সুস্থ-সবল গারো স্ত্রীলোক দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। বহুসংখ্যক ভারী কানের গহনার ভারে কানে টান পড়িয়া কখন কখন কান কাটিয়া গিয়া মুখখানি আরও বিকৃত করিয়া তোলে।

পুরুষের মুখে দাড়ি গোপ প্রায়ই থাকে না, টানিয়া তুলিয়া ফেলে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক একভাবেই চুল রাখে, কেহই প্রায় চুল কাটে না।

ইহাদিগের প্রকৃতি বড় মিষ্ট। সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদিগের প্রকৃতি বিকৃত হইয়া যাইতেছে, নহিলে স্বভাবতঃ ইহারা সরল অমায়িক ও সত্যবাদী। ব্যবহারে কোন প্রকার সঙ্কোচ নাই অথবা অস্বাভাবিক অবনত হইবার ভাব নাই অথচ কিছু মাত্র ঔদ্ধত্যও নাই। স্বভাবতঃ ইহারা মিষ্টপ্রকৃতি অকপট ও সত্যপ্রিয়। ইহারা বেশ আতিথেয়। কিন্তু একবার ইহাদের সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলে এমনি বাঁকিয়া বসে যে কিছুতেই আর ফিরান যায় না। ইহারা স্ত্রীলোকদিগকে খুব সম্মান করে এবং স্ত্রীলোকেরাই ইহাদের সমাজ ও সংসারের কর্ত্রী, পুরুষেরা আজ্ঞাবহ মাত্র।

গারো পুরুষ।

ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে বিশেষ পটু নহে। স্নান বা বস্ত্র পরিবর্ত্তন বা ধৌতকরণ সহজে করিতে চাহে না। এই কারণে ইহাদিগের মধ্যে চর্ম্মরোগের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শুনা যায় উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলেও গারোরা নিয়মিতভাবে কাজ করিতে চাহে না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে ইহাদের অভাব বড় কম সুতরাং পারিশ্রমিকের জন্য লালায়িত নহে। গৃহজাত মদ্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে আসক্তি নাই। আফিং গাঁজা খায় না এবং জুয়াও খেলে না; কদাচিৎ ধূমপান করে। বৃহৎ ভোজের পরে কিঞ্চিৎ মদ্য সহ নৃত্যগীত হইলে ইহারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করে

গারোদিগের পোষাক অতি সামান্য রকম। পুরুষেরা ছয় ইঞ্চি চওড়া সাত ফুট লম্বা লাল ডোরা দেওয়া নীলবর্ণ ধুতি কোমরে জড়াইয়া পরিধান করে। ফুট দেড়েক কাপড় সামনে রাখিয়া দেয়, ইহা কোঁচার কাজ করে এবং সময়ে সময়ে গামছা বা রুমালের কাজও করে। মাথায় নীল কাপড়ের পাগড়ী বাঁধে। কোন বিশেষ উপলক্ষ্য উপস্থিত হইলে লাল আসামী সিল্কের পাগড়ী বাঁধিয়া থাকে। পাগড়ী দিয়া মাথার টিকি ঢাকা দেওয়া রীতি নয়, মাথার মধ্যস্থল সর্ব্বদা অনাবৃত রাখাই রীতি। শীতকালে গায়ে চাদর উঠে, অন্য সময় গা খালিই থাকে।

গারো স্ত্রীলোক—বৃদ্ধা।

বর্ত্তমান সভ্যতার স্রোতে অনেক পুরাতন পরিত্যক্ত কোট গারো পাহাড়ে উপস্থিত হইতেছে। এবং এই পরিত্যক্ত কোট গারোদিগের লোভনীয় পরিচ্ছদ হইয়া উঠিতেছে। গারো রমণীরা নীলবর্ণের কাপড় কোমরে জড়াইয়া পেটি-কোটের মত করিয়া পরে, কাঁধের উপর চাদরের মত করিয়া একখানি কাপড় পরে যাহাতে কোমর হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে অনাবৃত বক্ষঃস্থলে থাকিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করে না। সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থাতেও থাকে এবং যদি তাহারা পা জড়ো করিয়া উঠা বসা করে তবে উলঙ্গ থাকাতে কেহই লজ্জা বা নিন্দার কারণ অনুভব করে না। এইপ্রকার নগ্নতা ও স্বাধীনতা সত্ত্বেও রমণীগণ সচ্চরিত্রা ও সাধ্বী পত্নী হয়। নৃত্যগীতাদি বিশেষ উপলক্ষ্যে স্ত্রীলোকেরা ভিন্ন পোষাক পরিয়া থাকে। এই পোষাক রংকরা সিল্কের দ্বারা প্রস্তুত হয়। ডান হাতের নীচে দিয়া কোমর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বাম হাতের উপর গেরো দিয়া বাঁধিয়া রাখে, ইহা হাঁটু পর্য্যন্ত পড়ে। আর কোমরে সেই ঘাঘরার মত পোষাক পরা থাকে। নৃত্যের সময় পুরুষের পোষাকে বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায় না। মাথায় মোরগ এবং ভীমরাজের পালক পরে এবং কখন কখন ধানের শীষ গুচ্ছ করিয়া কানে পরে। গারো পর্ব্বতে ময়ূরের অভাব নাই কিন্তু ময়ূরের পালক অশুভজনক বলিয়া পরে না। পুরুষের মত স্ত্রীলোকেও মাথায় পাগড়ী বাঁধে।

গারোদিগের অলঙ্কার নাই বলিলেও চলে। পুরুষেরা দুই কানে পিতলের মাকড়ি পরে। এক একজন পুরুষ এক এক কানে ৩০।৪০টা মাকড়ি পরিয়া থাকে। সচরাচর ১২।২০টা পর্য্যন্ত মাকড়ি সকলেই পরিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই গলায় হার পরিয়া থাকে। এই হার লাল কাচের মুগা ও কাঠি গাঁথিয়া প্রস্তুত হয়। স্ত্রী-লোকেরা কানে যে মাকড়ি পরে তাহা আকারে বৃহত্তর এবং সংখ্যায় অধিকতর। এক একজন স্ত্রীলোকের এক কানেই ৫০টা পর্য্যন্ত মাকড়ি দেখা যায়। অনেক সময় কানের নীচের পাতা মাকড়ীর ভার বহিতে অক্ষম হইয়া কাটিয়া পড়ে। কানের পাতা খসিয়া পড়িলেও মাকড়ির অব্যাহতি নাই, দড়ি বা সুতো দিয়া মাথার সহিত বাঁধিয়া রাখে। কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে স্বামীর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত, কেহ কেহ আমরণ, মাকড়ি পরিত্যাগ করে। প্রাচীনকালে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের কান হইতে মাকড়ি ছিঁড়িয়া লওয়া একটী বিশেষ শাস্তি ছিল। পূর্ব্বে মাকড়িগুলির ব্যাস

ছয় ইঞ্চি এবং সংখ্যায় ৫০।৬০টী হইত; এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ৫০।৬০টী মাকড়ি ধরিয়া টানিলে শাস্তি নিতান্ত লঘু হইত না।

স্ত্রীলোকেরা কোমরে একপ্রকার কাঠের বা বাঁশের মালা গাঁথিয়া কোমরবন্ধের মত করিয়া পরে; ইহাতে তাহাদের ঘাঘরা বা পেটিকোট আঁটিয়া রাখিবারও সুবিধা হয়। পিতল এবং কাঁসার বালা স্ত্রীলোক এবং পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে। নৃত্যের সময় একপ্রকার অদ্ভুত মস্তকের অলঙ্কার পরিয়া থাকে। লম্বা বাঁশের চিরুণীর সহিত ছয় ইঞ্চি লম্বা নীল রংএর কাপড় জড়াইয়া এই অদ্ভুত সামগ্রী প্রস্তুত হয়। এই চিরুণী চুলে গুঁজিয়া দিলে পিরিলি পাগড়ির মত নীল কাপড়টুকু পিঠের উপর আসিয়া পড়ে। নাচিবার সময় এই কাপড়টুকু উড়িয়া উড়িয়া কিয়ৎ পরিমাণে শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

গারো অধিবাসীদিগের মধ্যে সমস্ত জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের ১ভাগ দাস। দাসদিগকে নোকোল ও স্বাধীন অধিবাসীদিগকে নোকোবা বলে। দাস ও স্বাধীনের স্বাতন্ত্র্য খুব সতর্কতার সহিতই রক্ষিত হয়; স্বাধীন ব্যক্তি দাস দুহিতাকে বিবাহ ত করেই না, উপপত্নীরূপেও গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে অযত্ন করা হয় না, কারণ দাস দাসীর সংখ্যার উপরই সামাজিক প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে।

ইহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস কি তাহা ইহাদের মুখে জানিবার কোনো উপায় নাই। তবে অনুসন্ধানে যাহা জানা যায় তাহা এই যে তাহাদের পরমেশ্বরের নাম ঋষি শালগঙ্গ; তিনি স্বর্গে (রঙ্গ) থাকেন। তাঁহার পত্নীর নাম আপঙ্গমা বা মনিম। তাঁহাদের দুই সন্তান; পুত্র কেঙ্গরা বার্মা অগ্নি ও জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর পিতা; কন্যা মিনিং মিজা মানবজাতির আদি মাতা। নুস্তু স্বয়ম্ভু, নিজে এক ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহা হইতে উদ্ভূত; তিনি তৎপূর্ব্বে মঙ্গলাল (পদ্ম)-গর্ভে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু সেখানে বাস করা কষ্টকর মনে হওয়ায় তিনি পাতালপতি হীরামনের নিকট হইতে পৃথিবী চাহিয়া লইয়া তাহাতেই নিজের ও সন্তানসন্ততির আসন স্থাপন করিয়াছিলেন; প্রথমে তাঁহার গর্ভ হইতে নদীসকল নির্গত হইল এবং নদীতে মগর (কুম্ভীর) সৃষ্টি করিলেন; তারপর ঘাস ও কাশ; তারপর হরিণ; তারপর মৎস্যকুল, ব্যাং, সাপ, গাছ, মহিষ, হাঁস, পুরোহিত এবং তিনটি কন্যা প্রসব করিলেন। নুস্তুদেবতার জন্মবৃত্তান্ত ব্রহ্মার জন্মের সহিত যথেষ্ট সদৃশ।

গারো স্ত্রীলোক যুবতী।

নুস্তুর প্রথমা কন্যার সন্তান ভুটিয়া; এজন্য তাহারা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বংশ। দ্বিতীয়ার সন্তান গারো, সুতরাং তাহারাও কুলীন কম নন। তৃতীয়ার সন্তান ফিরিঙ্গি। আর বাঙালীর জন্মের ঠিক নাই। বাঙালীর প্রতি ইহাদের এমনই বিদ্বেষ।

গারোরা পুনর্জন্ম ও মনুষ্য অদৃষ্টের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব স্বীকার করে। গ্রহশান্তির জন্য শ্বেতমোরগ বলি দেওয়া হয় এবং দেবকোপ প্রশমনের জন্য মদ, ভাত ও ফুল দিয়া পূজা করা হয়। ইহাদের দেবতার কোনো

মূর্ত্তি বা মন্দির নাই; বাড়ীর সম্মুখে কঞ্চিসুদ্ধ একটা বাঁশ পুঁতিয়া তাহার কাছে পূজা ও বলি দেওয়া হয়।

পুরোহিতের নাম কমাল; ইহা বোধ হয় ফার্সী অর্থে ব্যবহৃত হয়; ফার্সী কমাল শব্দের অর্থ পূর্ণতাপন্ন (perfect)। যে কেহ পূজামন্ত্র মুখস্থ করিতে পারে সেই পুরোহিত হইতে পারে, এই পদ বংশগত নহে। তাহারা বলিদত্ত প্রাণীর অস্ত্র দেখিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে।

ইহাদের বাসগৃহ ও বাসরীতি আবরদেরই মতো।

ভোজের সময় নিমন্ত্রিতগণ পংক্তি করিয়া বসে এবং পরিবেষণকর্ত্তা নিকটে আসিলেই হাঁ করে এবং পরিবেষণকর্ত্তা একহাতা খাদ্য তাহার মুখবিবরে ঢালিয়া দিয়া যায়। এইরূপে তাহাদের মধ্যে সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় ঢালিয়া দেওয়া হয়, এবং নিমন্ত্রিতদের বসিয়া বসিয়া পালাক্রমে হাঁ করা ও গেলা ছাড়া আর কোনো কষ্টই করিতে হয় না।

গারোরা সর্ব্বভুক। কেবল দুধ তাহাদের অখাদ্য। জাত বিচার বা ছুত বিচার খাওয়া সম্বন্ধে নাই। অনেকে মদ খাইয়াই জীবনধারণ করে।

কোনো গারো আপন গোত্র (মাহারী) সম্ভূতা কন্যা বিবাহ করিতে পারে না। গারোদের দায়াদাধিকার কন্যাগত; পুত্রগণ পিতামাতার সম্পত্তি পায় না, তাহারা নিজেদের পত্নীদের সম্পত্তি হইতে খোরপোষ পায়। গারোগণ নিজের খুড়ি ও খুড়তুত ভগ্নীকে এক সঙ্গেই বিবাহ করিতে পারে; মা ও মেয়ে উভয়কেই একজনে বিবাহ করার দৃষ্টান্ত গারোদের মধ্যে প্রচুর। সম্পত্তি বেহাত হইয়া যাইবার ভয়ে অনেক সময় শিশু বালক বালিকারও বিবাহ দেওয়া হয়। যে সকল যুবতী কোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত তাহাদিগকে প্রায় আমরণ অনূঢ়াই থাকিতে হয়। বিবাহে কন্যাই স্বামী মনোনীত করে এবং তাহাকেই প্রথমে বিবাহ প্রস্তাব করিতে হয়। মনোনীত পাত্রকে কন্যা একটি নিভৃত সঙ্কেত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলে এবং খাদ্যসামগ্রী লইয়া সেখানে যায়; সৌভাগ্যে আনন্দিত বরও তাহার অনুগমন করিতে কদাচিৎ অবহেলা করে; তাহাদের সেই নিভৃত সঙ্কেত স্থানে আর কাহারো কৌতূহলী দৃষ্টি পড়া একেবারে নিষিদ্ধ; দুতিন দিন পরে তাহারা ফিরিয়া আসিলেই তাহাদের বিবাহ হইয়াছে ধরিয়া লওয়া হয়। যদি কখনো কোনো পুরুষ কোনো রমণীকে নিজের প্রণয়-বেদনা জানায় বা বিবাহপ্রস্তাব করে এবং রমণী যদি তাহাতে নারাজ হইয়া আত্মীয়দের কাছে বলিয়া দেয় তাহা হইলে সেই পুরুষকে জরিমানা স্বরূপ মদ্যমাংসের ভোজ দিতে হয়। কিন্তু রমণী প্রস্তাব করিলে এবং পুরুষ অস্বীকার করিলে রমণীর কোনো দোষ হয় না।

গারোদের চাষের যন্ত্র কোদাল, দা, ও কুড়ুল। কুড়ুল ছাড়া গারো এক দণ্ড থাকে না। এই যৎসামান্য হাতিয়ার লইয়া গারোরা ধান, তুলা, জোয়ার, লঙ্কা, দাল, তরকারি প্রভৃতি উৎপন্ন করে এবং হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সমস্ত জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং যতদিন না সকলে সমবেত হয় ততদিন (১০।১২ দিন পর্য্যন্ত) মৃতদেহ বাড়ীতেই পচিতে থাকে এবং জ্ঞাতিগণ ভোজ খাইতে থাকে। তারপর মৃতদেহ দাহ করিয়া আবার জ্ঞাতিভোজ দিয়া দগ্ধ অস্থি নদীতে ফেলিয়া দেয়।

মৃত ব্যক্তির প্রতি বয়সলিঙ্গনির্ব্বিশেষে সম্মান দেখানো হয়।

পূর্ব্বে কোনো সদ্দারের মৃত্যু হইলে তাহার অনুচরেরা তাহার সম্মানের জন্য একজন বাঙালীর মাথা কাটিয়া আনিত এবং নিজেদের বাহাদুরীর নিদর্শন স্বরূপ মাথার খুলিটা সাজাইয়া রাখিত। এখন ইংরাজ-শাসনে বাঙালীর মাথা কাটার সম্মান হইতে গারোদিগকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী।

আসামী ভাষা

১। নবীন।

প্রাচীন ভাষা শিক্ষার সুবিধা এক যে তাহা লোকমুখে শিখিতে হয় না। সাহিত্যের ভাষা যেমন পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইয়া যায়, কথ্য ভাষা তেমন যায় না। কথ্য ভাষা শুনিয়া শিখিতে হয়, পুথী পড়িয়া শেখা এক প্রকার

অসম্ভব। কারণ কথ্য ভাষার পরিবর্ত্তনশীল ধ্বনি লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় না।

উপস্থিত প্রবন্ধ-লেখকের ভাগ্যে আসাম দর্শন ঘটে নাই, আসামীর মুখে ভাষা শোনার সুযোগ হয় নাই। এই কারণে পরে যাহা লিখিতেছি, তাহা নির্ভয়ে লিখিতে পারিতেছি না। দুই চারি খান পুথী পড়িয়া যে জ্ঞান হইতে পারে, তাহাই সম্বল। এই জ্ঞান আসামী ও বাঙ্গালা ভাষার প্রভেদ বুঝিতে যথেষ্ট হইতে পারে; কিন্তু এমন ভুল হওয়া আশ্চর্য নহে, যাহাতে আসামী পাঠকের হাস্য আসিতে পারে। 'অসমীয়' ভাষা কোন দিকে চলিয়াছে, তাহা দেখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, পরন্তু সে ভাষার নিন্দা কিংবা স্তুতি অভিপ্রায় নহে।

৺ হেমচন্দ্র বড়ুয়া-মহাশয় আসামী ভাষার এক কোষ এবং ব্যাকরণ লিখিয়া সে ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই কোষে ঋাদি এবং ৱাদি শব্দ নাই। অন্তঃস্থ ব আসামীতে ৱ লেখা হয়। বাঙ্গালায় যেখানে ওয়া আসামীতে সেখানে ৱা লেখা হয়। কোন্ কোন্ সংস্কৃত শব্দের অন্তঃস্থ ব আসামীতে ৱ আকারে দেখিতে পাই। বাঙ্গালা ও আসামী অক্ষরের এই এক প্রভেদ ব্যতীত আর এক প্রভেদ আছে। আসামীতে র অক্ষরের আকার ৰ (পেটকাটা ব)। এই আকার প্রাচীন বাঙ্গালা পুথীতে পাওয়া যায়। ব অক্ষরে হুল জুড়িয়া ওড়িয়া র অক্ষর। ৰ অক্ষর উদ্‌ভাবনায় বাঙ্গালা ওড়িয়া আসামী নিকৃষ্ট বলিতে হইবে। ঋ-অক্ষরের সহিত সাদৃশ্য থাকিয়াও নাই।

"সংস্কৃত আদি ভাষাত "ড"-ৰ কঠিন "ৰ"-ৰ নিচিনা (নিদর্শন, সদৃশ) এটা (একটা) উচ্চারণ আছে; যেনে, সং ষোড়শ, বড়ৱা। কিন্তু সৰহ (সর্ব) ভাগ অসমীয়াৰ মুখত ড, সাধাৰণ "ৰ"-ৰ দৰে হে (মতনই) উচ্চাৰিত হয়। * * জ, ঝ, এই দুটা আখৰো (অক্ষরও) অসমীয়াত একে দৰেই উচ্চাৰিত হয়।* * * আমাৰ ভাষাত যেনেকৈ (যেমন করি—যেমন) শ, ষ আৰু স এই কেইটা আখৰৰ উচ্চাৰণৰ একো (এক ও, কিছুমাত্র) প্রভেদ নাই, তেনেকৈ (তেমন করি—তেমন) চ ছ, ই ঈ আৰু উ ঊ ইইতৰো (ইহাদেরও) প্রত্যেক যোৰৰ (জোড়ার) একো বিভিন্নতা নাই; এতেকে (এই কারণে) শব্দৰ মূল ঠিক কৈ (করিয়া) ৰাখিবৰ প্রয়োজন ন হলে (হইলে) স, চ, ই আৰু উ মাথোন (মাত্র) ব্যৱহাৰ কৰা উচিত।"

এই উচিত অনুচিতের নিয়মে পড়িয়া বর্তমান আসামী ভাষার শব্দ পুরাতন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। সাহিত্য ভাষার আদর্শ ধরিয়া রাখে। সাহিত্যের ভাষা শিথিল হইলে আদর্শ শিথিল হয়, নানা জনে স্ব স্ব ইচ্ছামত লিখিয়া ভাষায় বিপর্যয় উৎপাদন করে। ফলে আসামী ভাষায় কতকটা তাহা ঘটিয়াছে। নতুবা পূর্ব-আসামী ভাষা পশ্চিম আসামীর তুল্য থাকিত। এ বিষয় পরে লেখা যাইতেছে।

সংস্কৃত শব্দের আসামী ভ্রংশের রীতি জানিলে পাঠকের সুবিধা হইতে পারে। বাঙ্গালাতেও এইরূপ ভ্রংশের দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু তাহার অনেকাংশ গ্রাম্য বিবেচিত হয়। যে যে স্থলে বাঙ্গালা হইতে বর্তমান আসামীর অধিক প্রভেদ, সে সে স্থল মাত্র লিখিত হইতেছে। সকল স্থল লিখিবার প্রয়োজন হইবে না। কোন্ কোন্ স্থলে বড়ুয়া মহাশয়ের প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিতে পারিলাম না।

১। শ ষ স স্থানে চ। যথা, সং মসূর আং মচুৰ; সং আদর্শ বাং আর্শি আং আচী; সং নিদর্শন আং নিচিনা (তুল্য)। এইরূপ, বিটিষ স্থানে বৃটিচ। (ইহার বিপরীত, সং উচ্চ আং ওখ। মৈথিলীতে ষ স্থানে খ উচ্চারিত হয়। বোধ হয় উচ্চ শব্দে ষ আছে মনে করিয়া অপভ্রংশে ওখ)।

২। শ ষ স স্থানে হ। যথা, সং মানুষ আং মানুহ্, পশু পহু, রস রহ, রাজস্ব রাজহ, বিষ বিহ। (ষ স্থানে খ হইলে মৈথিলীর প্রভাব পাইতাম)।

৩। অ আ এ। যথা, সং অঙ্গার আং এঙ্গার, সং আ নাভি (নাভি পর্যন্ত) আং এনাই।

৪। অ আ ও। বাং যাওয়া আং যোৱা, বাং কহা আং কোৱা, বাং পানে (প্রতি) আং পোনে। বাং টা আং টো (যেমন একটো)।

৫। উ ও। যথা, সং উপরি আং ওপরে; সং উপচ, উপজন ধাতু আং ওপচ, ওপজ ধাতু। (উপরকে ওপর, ভিতরকে ভেতর, বাহিরকে বের বলা কলিকাতার ভাষায় আছে)।

৬। ঝ, হ্য জ। যথা, সং বুধ (বাং বুঝ)—আং বুজ; সং বাহ্য— আং বাজ। সং সমাধি হইতে আং সমাজিক শব্দ স্বপ্ন অর্থ পাইয়াছে।

৭। ড় র। সং মুণ্ড— বাং মুড়া—আং মুর।

। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটা লুপ্ত হয়, কিংবা পৃথক

হয়। যথা, শিক্ষা—শিকা, বৃদ্ধি—বৃধি, সম্বল—সমল, স্ত্রী—তিরী। যুক্ত—জুগুত; যত্ন—যতন।

৯। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনও লুপ্ত হয়। যথা, সং গোচর—ওচর; সং খম্পা (উদ্ খাম্পা) খং; ন পারে নোয়ারে, সং ব্যঞ্জন আঞ্জা; সং দ্যুতি—জুই (অগ্নি)। সমাসবদ্ধ এক শব্দের ক লুপ্ত হয়। যথা, একবার এবার, এক গোছা—একোছা।

১০। অনেক শব্দ সানুনাসিক হইয়াছে। টলমল—টলং ভলং; বার্ত্তা মাত (কথা, ভাষা); মাত্র মাথোন; স্রোত সোঁত, পিষ্ট পাত্ পিং; নিশ্চেষ্ট ছিদাং; প্রবন্ধ—বাং ফন্দি, আং পাং; বিলম্ব—পলং।

১১। বানানের প্রভেদে অনেক শব্দ হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না। যথা, সহিতে—সইতে সৈতে; জ্বর জর; জ্বল জল; করি (করিয়া) কই—কৈ, লগি (লাগিয়া) লই লৈ; হই আছে—হৈছে। কৈ, লৈ এখন কারক বিভক্তি স্বরূপ প্রযুক্ত হইতেছে। মৈথিলীতেও এই দুই শব্দ আসামীর মতন আছে। অই স্থানে ঐ লেখা বাঙ্গালাতেও আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথীতে কৈল, কৈয়া, কৈল (কহিল) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

১২। শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষরে আ থাকিলে গ্রাম্য ওড়িয়াতে প্রথম আ স্থানে অ হয়। আসামীতেও হয়। যথা, বাং কাকা আং ওং ককা; বাং দাদা—আং ওং দদা; রাজা রজা; বাঙ্গালী—বঙ্গালী; কাকাল—ককাল। সং বাস—বাং বাসা, ওং বসা, আং বহা। সং শালা (বাং চালা) আং চরা (বসিবার ঘর)। এই প্রভেদের কারণও পাওয়া যায়। হিন্দী মৈথিলীতে অ আ স্বর পৃথক হয় নাই। বাঙ্গালা ওড়িয়া আসামীতে হইয়াছে। কিন্তু পূর্বকালের অ আ উচ্চারণ এই সকল শব্দে কিছু কিছু রক্ষিত হইয়াছে। সং কর্মকার বাঙ্গালায় কামার, অর্থাৎ ম বর্ণের রেফ-লোপে পূর্ব স্বর দীর্ঘ, আ হইয়াছে, আসামী ও গ্রাম্য ওড়িয়াতে হয় নাই। এইরূপে, কর্মকার—ওং আং কমার। সং বর্দ্ধকি বাং বাঢ়ই—বাড়ই, হিং ওং বঢ়ই, ওং বঢ়েই, আং বাঢ়ই (লেখা হয় বাঢ়ৈ)। এখানে ব স্থানে বা হইয়াছে।

১৩। কোন্ কোন্ অপভ্রষ্ট শব্দ ওং আং-তে সমান। যথা, সং উদক (আর্দ্র)—ওং আং ওদা; সং যস্মিন্ (কালে)—প্রাচীন ওং যেসন, আং যেসনি যৈসানি, প্রাচীন বাং যৈছন; সং ওষ্ঠ—ওং ওঠ, আং ওঁঠ, বাং ঠোঁঠ। (বিপরীত, স্বপ্ন—স্বপন—হোপন—আং টোপনি)। সং বধূ—বউ। বউ শব্দ আসামী ওড়িয়াতে মাতা অর্থে চলিত হইয়াছে। বোধ হয়, পিতৃ-বধূ হইতে এই ভাব আসিয়াছে। হিং ওং-তে বহু—বাং বউ। সং বপ্র—হিং বাপ; বাং বাপ, বাপা, বাবা; ওং বপা, বোপা; আং বাপ, বোপাই। পিতা বাৎসল্যে পুত্রকে বাপা, বাবা, বাপু বলে। আদরে বাপু বাং-তে কেবল বাৎসল্যে লাগে, আং-তে মান্য ব্রাহ্মণে। প্রাচীন ওড়িয়া (৫০০ বৎসর পূর্বের) এবং বাঙ্গালায় বাৎসল্যে বাবু শব্দও আছে। যেমন বাপা হইতে বাবা, তেমন বাপু হইতে বাবু। বাবু শব্দের মূল অর্থ, আদরণীয় পিতা (ইং-তে যেমন Rev. Father)। ইহা হইতে অর্থ মান্য, আদরণীয়। আসামীতে এই অর্থে পণ্ডিত ব্রাহ্মণে বাপু প্রযোজ্য হইয়াছে। এখনকার চলিত 'মৌলভী' শব্দেও মূল অর্থ চাপা পড়িয়াছে, ভদ্র মুসলমান মাত্রেই মৌলভী হইতেছেন। যাহা হউক, বাবু শব্দে নিন্দা কিছুই নাই। সং রাজকুমারী হইতে আসামীতে কুঅরী—রাণী অর্থ পাইয়াছে, কিন্তু কুমারীর অর্থ যেমন তেমন আছে। এইরূপ বহু শব্দ প্রত্যেক ভাষায় পাওয়া যায়। বাং-তে কুমার, কোঙর—রাজকুমার ও পুত্র। পরে প্রদত্ত শব্দের তালিকা হইতে আসামীতে দ্বংশের রীতি আরও স্পষ্ট হইবে।

'গ্রামারে' আসামী বাঙ্গালা এক বলা যাইতে পারে। গ্রিয়ার্সন সাহেবের মতও তাই। আধুনিক কালে দুই একটা নূতন শব্দ বিভক্তি স্বরূপ প্রযুক্ত হইয়া পুরাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে। হেমচন্দ্র-বড়ুয়া-মহাশয়ের আসামী ব্যাকরণে পাই, বিলাক, বোর, হঁত বহুবচনের বিভক্তি। তন্মধ্যে 'হঁত' হয়ত শেষ স্বর অনুনাসিক করিবার রীতি হইতে আসিয়া এখন গ্রাম্য বিবেচিত হইতেছে। ক্রিয়াপদ করিবোঁ, পদ্যে করিবোহোঁ পাই। হঁত-এর ত পাদপূরণে। 'বোর' হয় ত বড় হইতে। অনেক অর্থে বড়, বাঙ্গালা প্রয়োগেও আছে। বিলাক শব্দের মূল নির্ণয় কঠিন। আর্বী ফার্সী বে-বাক (বাকি না থাকা) হইতে পারে। বাং কে তে বিভক্তি স্থানে আসামী ক,

ত; সম্বন্ধে বাং এর স্থানে র। প্রাচীন আসামীতে 'হন্তে' বাং 'হইতে'; এখন প্রায়ই 'পরা' দেখিতে পাই। ঘর হইতে—আং ঘরর পরা। 'ঘরের পরে আসিয়া বলিল' (ঘরের উপরে—ঘরে) এইরূপ প্রয়োগ বঙ্গের স্থানে স্থানে আছে। 'আমি' 'তুমি' বাস্তবিক মান্যে বহুবচন। প্রাচীন বাঙ্গালা আহ্মি তুহ্মি। ওড়িয়াতে আম্ভে তুম্ভে এইরূপ। হিন্দীতে হাম তোম। কালে বহুবচন একবচন মনে হইয়া বাঙ্গালাতে আমরা তোমরা, ওড়িয়াতে আম্ভেমানে তুম্ভেমানে, গ্রাম্য হিন্দীতে হামলোগ তোমলোগ। আসামীতে আমি অদ্যাপি বহুবচন, কিন্তু তুমি একবচন হইয়া বহুবচনে তোমালোকে হইতেছে। তুমি একবচন জ্ঞান হইবার পর মান্যে আপনি বা আপন—আং আপোন আসিয়াছে।

ক্রিয়াবিভক্তিতে আসামী ও প্রাচীন বাঙ্গালা এক। প্রাচীন বাঙ্গালায় করিলেন, আছেন ইত্যাদি নান্ত পদ প্রায় পাওয়া যায় না। আরও প্রাচীন বাঙ্গালায় করিলেন্ত ছিল। বর্তমান আসামীতে সম্ভ্রম-জ্ঞাপক বিভক্তি নাই। অথচ ক্রিয়ার বহুবচনের রূপে একটা 'হক' যুক্ত হইয়া থাকে। 'যদি তিনি করিতেন' আসামীতে করিলেহেঁতেন, অর্থাৎ করিলেহেঁ-তেন বা করিলে-তেন, করিঁ-তেন, ওড়িয়া করন্তা।

কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে দুই একটা বিশেষ আছে। স্বার্থে ইয়া উয়া আসামীতে অধিক বসে। সং দীর্ঘ হইতে বাঙ্গালা ওড়িয়া ডাগর, আং ডাঙ্গর, স্বার্থে ডাঙ্গরীয়া।* এইরূপ, বড় হইতে বড়ুয়া, মাসিক হইতে মাহেকিয়া। কর্তৃবাচ্যে সং তৃ হইতে প্রথমার একবচনে তা, যেমন কর্তা। আসামীতে তা স্থানে ওঁতা, স্ত্রীলিঙ্গে অঁতী। যথা, করে যে সে—করোঁতা; লেখে যে লেখোঁতা, ধরে যে—ধরোঁতা। স্ত্রীলিঙ্গে করঁতী, লেখঁতী, ধরঁতী। দুই পাচটা শব্দ ব্যতীত এই রূপ বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং সং তৃ স্থানে ঈয়া প্রত্যয় আসিয়াছে। যথা, করে যে—সে করীয়া; লেখে যে—সে লেখীয়া, ইত্যাদি। আসামীতেও কর্তৃবাচ্যে দুই লিঙ্গেই আ হয়। যেমন, করোঁতা বা করা, খাওঁতা বা খোয়া, দিওঁতা বা দিয়া। তদ্ধিত-প্রত্যয় নি আছে।

* এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। মেদিনী কোষে ডঙ্গর, ডিঙ্গর শব্দ আছে। অর্থ, সেবক, ধূর্ত। রাজসেবক বলিয়া ডাঙ্গরীয়া? কত কাল হইতে এই শব্দ চলিত আছে?

স্থান ও ক্ষুদ্র অর্থে এই প্রত্যয় হয়। যথা, নল ব্যাপ্ত স্থান নলনি, পত্র-স্থান পাতনি। কৃৎ নি বাঙ্গালা অনির তুল্য। যেমন শিখ ধাতু হইতে আং শিকনি।

না অর্থে ন না নি মু নে নো হয় এবং প্রায়ই ক্রিয়ার পূর্বে যায়। ওড়িয়াতেও ন না নি (উচ্চারণে ন কখন কখন নো হয়) এবং ক্রিয়ার পূর্বে বসে। বাঙ্গালায় দুই এক স্থলে না ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন, না জানি।

এখন বর্তমান আসামী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে। আসামী ভাষায় রচিত শতস্কন্ধ রামায়ণ হইতে।

সীতা বোলে শুনা (১) রঘুবংশ শিরোমণি।
রাক্ষস শকান বন তুমি সি শুণনি॥
কিন্তু এক পুরুষার্থ (২) দেখায়ো আমাক।
বধিয়োক শতস্কন্ধ বীর রাবণক॥
তার বধ লিখিয়াছে মোহোর হাতত।
তাহাক সংহরা (৩) লোক নাহি জগতত॥
সীতার শুনিয়া বাণী দেব রঘুরায়।
প্রভাতত মাতলিক আনিলা মতাই (৪)॥
শুনিয়ো মাতলি রথ সাজ এতিক্ষণ।
একবার পৃথিবীক করো প্রযতন (৫)॥
প্রণাম করিয়া সারথিয়ে বোলে বাক।
ধনুশর কিবা লাগে কহিয়ো আমাক॥
রামে বোলে ন লাগয় বহুত অস্ত্রক।
শীঘ্র করি রথখান সাজি আনিয়োক॥
ততিক্ষণে রথ আনি ত্বরিতে যোগাইলা।
প্রণাম করিবে আসি লক্ষ্মণে দেখিলা॥
প্রণাম করিয়া বোলে দদা (৬) দেব হরি।
কোন স্থানে যোয়া তুমি মোক ছদ্ম করি॥
রামে বোলে শুনা বাপু প্রাণর ভয়াই।
পৃথিবীক পর্যটন (৭) করিবো লীলাই (৮)॥
ইত্যাদি।

এই পুথির শেষে কবি 'রাম আরু সীতার কথোপকথন' দিয়াছেন। যথা,

সীতা। প্রভু আপুনি যত আছি রাক্ষসবিলাক শকান কাষ্ঠ। কিন্তু এটা কথা আপুনি বাব (৯) শতস্কন্ধ রাবণক মারক গে (১০)।

১ শুনহ শুন।
২ পুরুষত্ব স্থানে ভুল করিয়া।
৩ সংহারে সমর্থ।
৪ বাতাই ডাকাইয়া।
৫ পর্যটন।
৬ দাদা।
৭ পর্যটন।
৮ লীলায়।
৯ বরং।
১০। মারন গিয়া।

তেহে মর (১১) মুনিসাহঁ (১২) আরু বীরত্ব বুজিব পারিম। আপোনার কিমান প্রতাপ তার হলে মোর হাতত হে মৃত্যু লেখিছে।

রাম।—তেনে হলে ময় কাইলৈ (১৩) মারিম গৈ। সারথি তুমি বেগতে রথখান আনা।

সারথি।—প্রভু আপোনার বাক্য শিরোধার্য্য। ধনুশর আনিব লাগিবনে।

রাম।—শর ধনু অলপ লবা (১৪)।

সারথি।—প্রভু রথ আনিলো। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণে দেখে।

লক্ষ্মণ।—দদা আপুনি যুদ্ধর সাজেরে ওলাল (১৫) মোক এরি (১৬) কলৈ (১৭) বা যাই।

রাম।—ভাই মই আরু এবেলি (১৮) পৃথিবী ফুরি (১৯) আহো (২০)।

ছাপার ভুল, ভাষার ভুল কিছু কিছু আছে। তথাপি ভাষার প্রকৃতি বাঙ্গালার মতন বোধ হইবে। গদ্য সাহিত্যের ভাষা এইরূপ,

লরা ছোয়ালী-বিলাকে সাধু কথা শুনিব লৈ বর ভাল পায়। তেওঁ বিলাকর অভাব যৎকিঞ্চিৎ গুচাবর মনেরে এই গল্পকিটা গোটাই ছপা করালোঁ। গল্পকিটাত ধেমালি আরু উপদেশ দুইরো সমাবেশ আছে। বিশেষতঃ পঞ্জাবী আর কাবুলী সাধু কিটা পঢ়িলে বুজা যাব যে সেই বিলাক দেশর মানুহ সকল মুরত টাঙোন-মরা জাতর গোয়াঁর মানুহ ন হয়। সিহঁতর ভিতরতো জ্ঞানচর্চা আছে। আমার দেশের বহুত ন-জনা মানুহর কিন্তু সিহঁতর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ বিধ ধারণা। ('সাধু কথার জোলোঙা' নামক পুথীর পাতনি)।

ভাঙ্গা বাঙ্গালায় লিখিলে উহা এইরূপ হইত—

লড়াকা-লড়কী (ছাওয়াল-ছাওয়ালী) উপকথা শুনিতে বড় ভাল পায়। তাহাদের অভাব যৎকিঞ্চিৎ ঘুচাইবার মনে এই গল্প কটা গোটাইয়া ছাপা করানু। গল্প কটাতে খেলা আর উপদেশ দুইএরই সমাবেশ আছে। বিশেষতঃ পঞ্জাবী আর কাবুলী কথা পড়িলে বুঝা যাবে যে সে সব দেশের মানুষ কেবল মুণ্ডে ঠেঙ্গা-মারা জাতির মানুষ নহে। তাহাদের মধ্যেও জ্ঞানচর্চা আছে। আমাদের দেশের বহু না-জানা মানুষের কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্নবিধ ধারণা।

এখানে উপরে উদ্ধৃত 'পাতনি'র (মুখপত্রের) দুই একটা শব্দ দেখা যাউক।

'লরা-ছোয়ালী'- হিং লড়কা, আং লরা। ছোয়ালী প্রাচীন বাঙ্গালা ছাওয়াল পাই, এখনও স্থানে স্থানে এই শব্দ চলিত আছে। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে ছাওয়ালী পাই নাই। 'বিলাক' শব্দটি বহুবচন-জ্ঞাপক হইতেছে। 'সাধুকথা'— যে কল্পিত কথায় সৎ উপদেশ আছে। ইহা হইতে উপ-কথা অর্থ হইয়াছে। 'শুনিবলৈ'—শুনিব লাগি। 'বর' —বড়। 'ভাল পায়'—আমরা আজি কালি বলি, ভাল বাসে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ভাল পায়' ছিল। ওড়িয়াতেও 'ভল পায়'। প্রায়ই 'সুখ পায়'। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও 'সুখ পায়' ছিল। 'তেওঁ' বিক—প্রাচীন বাং তেহঁ। ইহা হইতে তেআঁ তেওঁ। আসামীভাষা অত্যধিক ওকার-প্রিয়। বঙ্গদেশেরও স্থলবিশেষে অ স্থানে ও উচ্চারণ প্রবল। 'গুচাবর' ঘুচাইবার। ঘ স্থানে গ হইয়াছে। ওড়িয়া ঘুচিবা, হিন্দী ঘুসনা, মরাঠী ঘুসণেঁ। এইরূপ, 'বুজা যাব' বুঝা যাব। 'মনেরে' মনে; ওড়িয়া মনরে। মানএ স্থানে মনরে, কিন্তু মনেরে লেখা বাঙ্গালায় 'ঘরেতে' লেখার তুল্য। 'ধেমালি'—দম্ভ+আলি। বাঙ্গালাতে 'দামাল ছেলে' বলা যায়। দামালের ভাব দামালি, আসামীতে ধেমালি। ওড়িয়া ঢগ-ঢমালি অর্থে বাঙ্গালা 'ছড়া' তুল্য। আসামীতে ধেমালি অর্থে ক্রীড়া। 'মানুহ' মানুষ। (সাধুকথার জোলোঙা সাধু কথার জোলোঙ্গা উপকথার ঝোলা। ঙ্গ স্থানে ঙ লেখার কারণ পাই না)।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, লোকের মুখে ভাষা না শুনিলে ভাষায় জ্ঞান হয় না। পূর্ব-আসামী লেখক যাহাই বলুন, কথ্য ভাষা কখনও অবিকল লিখিতে পারেন না। তা ছাড়া, প্রাচীনের সহিত নবীনের এত বিচ্ছেদ ঘটিল কেন, তাহাও সমস্যা বোধ হয়। এক আসামী ভদ্রলোকের নিকট ইহার যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা দীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত হইল।

"প্রাচীন কামরূপীয় ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত আর্য্য ভাষা মূলক, সুতরাং ইহা বাঙ্গালা ভাষার শাখা হউক আর নাই হউক, বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইহার সাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। শ্রীধর কন্দলী, ভট্টদেব, শঙ্কর দেব, মাধব দেব, অনন্ত কন্দলী প্রভৃতি মহাত্মাগণ সেই দেশীয় ভাষায় পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় সাহিত্যাদিতে লিখিত ভাষা এবং কলিকাতা অঞ্চলের আজি-কালিকার কথিত ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ, সেই প্রাচীন লিখিত পুস্তকের ভাষাও কামরূপের ইদানীন্তন সাধারণ কথিত ভাষারও প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। বাঙ্গালায় যাইতেছি- যাচ্ছি, পাই-লাম—পেলুম, ইত্যাদি; সেইরূপে কামরূপেও নামানে—নাম্‌নে, নাপলো,—নাপ্‌লো ইত্যাদি; ঈদৃশ প্রয়োগও আবার প্রধানতঃ নিষেধার্থক 'ন'এর সহিত ক্রিয়ার যোগ হইলেই হয়, অন্যথা, অল্পই হইয়া থাকে। এই বাণিজ্য-যুগে ঈদৃশ সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ প্রায় সর্ব্ব দেশেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপর আসামেও কথোপকথন সময়ে কেহ কেহ এতাদৃশ সংক্ষিপ্ত কথা বলিয়া থাকে যেমন 'ইবিলাক'—'ইব্ল্যাক' (এইগুলি), 'সিবিলাক'—'সিব্ল্যাক' (সেইগুলি) 'এই খিনিতে'—'এখিন্তে', 'নিচিনা', 'নেচেনা'—'নিচ্‌না' 'নেচ্‌না' (ন্যায়) ইত্যাদি। কিন্তু তত্রত্য লোকদিগের সচরাচর প্রত্যেক বর্ণে যতি ও চন্দ্রবিন্দু দিয়া উচ্চারণ করাই স্বাভাবিক রীতি, যথা,—সঁ-পঁ-তিঁ (সম্পত্তি,) তুঁ-রিঁ-মুঁ-রিঁ

১১ মুই।
১২ মনুষ্যত্ব।
১৩ কালিই।
১৪ লইবা।
১৫ উরিল, অবতরিল।
১৬ এড়িয়া।
১৭ কোন্ স্থান লাগি। ১৮। একবার। ১৯। ফিরি। ২০। আসি।

এদিক ওদিক), কাঁ-নীঁ-য়াঁ-সেঁ-ওঁ (মঙ্গল কামনায় ভোজ বা ফলাহার দিয়া আফিংখোরের সৎকার), মূঁ-র্তিঁ (মূর্ত্তি) ইত্যাদি।

কিন্তু ইদানীন্তন "অসমীয়া ভাষার" সহিত সেই পূর্ব্বতন বা অধুনাতন কামরূপীয় ভাষার বিস্তর প্রভেদ। নব্য অসমীয়া লিখকগণ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি দুরবগাহ বিষয়ও গদ্যে-পদ্যে, অতি সহজ কথায় অনায়াসেই লিখিয়া থাকেন। সেই কামরূপীয় ভাষার সাহিত্যের জোরে "অসমীয়া" ভাষার প্রাচীনত্ব ও উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন বটে কিন্তু তাঁহারা সেই প্রাচীন সাহিত্য প্রদর্শিত উৎকৃষ্ট ও মার্জ্জিত ভাষার আদর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন নিকৃষ্ট আদর্শ গ্রহণ করিয়া কি প্রাচীন কি অধুনাতন নিম্ন আসামের ভাষার সহিত বিস্তর প্রভেদ জন্মাইতেছেন। লিখক মহাশয়গণ লিখিতে বসিয়াই যা তা লিখিয়া যান, তাঁহারা যে নিম্ন আসামের জন্যও লিখিতেছেন, সে কথা আদৌ তাঁহাদের মনে উদিত হয় না, কিংবা স্মরণ হইলেও তাঁহাদের ধারণা যে, তাঁহারা লিখনীদ্বারা সাগর মন্থন পূর্ব্বক যে অমৃতধারা বর্ষণ করিবেন, নিম্ন আসামীয়েরা নীরবে নির্ব্বিচারে তাহা আকণ্ঠ পান করিবার জন্য বাধ্য। যাহা হউক কামরূপীয় ও লিখিত "অসমীয় ভাষার" এই প্রভেদের প্রসর প্রতিদিন বিস্তৃততর হইতেছে। নব্য অসমীয়া লিখক ডাঙ্গরীয়াগণ যাহাই মনে করুন না কেন, এই অভিনব 'অসমীয়া ভাষা' যে অবনতির দিকে আর্য্য ভাষা হইতে অনার্য্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং নিম্ন আসামবাসীদের বিশেষ অনিষ্টকর হইতেছে -ইহা তাঁহারা নিজে সম্প্রতি স্বীকার না করিলেও বা বুঝিতে না পারিলেও নিম্ন আসামীয় বা অন্য কোন বুদ্ধিমান নিঃস্বার্থ লোকের স্বীকার না করিবার বা না বুঝিবার কারণ দেখি না। 'কীর্ত্তন', 'দশম', 'কথাগীতা,' 'কথা ভাগবত' এবং কামরূপীয় ভাষার অন্যান্য প্রাচীন পুস্তক পাঠ করিলেই এই কথা প্রতিপন্ন হয়। উক্ত পুস্তকগুলিতে অবিকৃত সংস্কৃত আর্য্য ভাষার শব্দাধিক্য থাকায় আসামীগণের মত বাঙ্গালীদিগেরও উহা বোধগম্য হইত, কিন্তু আজি-কালিকার উপর-আসামের অবিশুদ্ধ গ্রাম্য কথা-পরিপূর্ণ 'অসমীয়া ভাষা,' তদভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীদিগের ত কথাই নাই, নগাওঁ, বিশেষতঃ, কামরূপ গোয়ালপাড়া নিবাসী শিক্ষিত মহাশয়দিগের পক্ষেও চীন-দেশীয় কথা। বলা বাহুল্য যে তৎকালে 'অসমীয়া ভাষা' একটি কল্পনাতীত বিষয় ছিল, শিবসাগরে অবস্থিত পাদ্রী সাহেবদের অসমীয়া ভাষার অভিধান ও দু'এক খানা পুস্তিকা দেখিয়া ৺হেমচন্দ্র বড়ুয়ার মস্তিষ্কে তাহার বীজ প্রথমে উপ্ত হয় বলা যাইতে পারে, পরে তাহাই অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া 'অসমীয় ভাষা' নাম প্রাপ্ত হয়। এই নূতন 'অসমীয়া ভাষাকে' আসামের ভাষা না বলিয়া লক্ষ্মীমপুর, শিবসাগর এবং অংশতঃ দরঙ্গের ভাষা বলাই যুক্তি সঙ্গত। এই 'অসমীয়া ভাষায়' প্রাচীন লিখকদিগের আর্য্য ভাষার শব্দগুলিকে, হয় অতিশয় বিকলাঙ্গ করিয়া ব্যবহার করা হইতেছে, অথবা যতদূর সম্ভব, সেইগুলিকে "অসমীয়া ভাষার" উপত্যকা হইতে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে অবিশুদ্ধ বিকৃত এবং সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য লক্ষ্মীমপুর ও শিবসাগরের অনার্য্য শব্দগুলিকে স্বজাতীয় ভাষার আমলে সাদরে গ্রহণ ও অভিনন্দন করা হইতেছে। অহিফেন-সেবনের ফলেই হউক, চীন দেশের নিকটবর্ত্তী বলিয়াই হউক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক উক্ত স্থান নিবাসী ডাঙ্গরীয়াদিগের অধিকাংশেরই উচ্চারণ অত্যধিক সানুনাসিক হইয়া থাকিবে, এবং সেই জন্যই বোধ হয়, ইঁহারা লিখিবার সময়েও প্রায় প্রত্যেক কথার উপরেই চন্দ্রবিন্দুর হাট-বাজার বসাইয়া থাকেন। এইরূপ চন্দ্রবিন্দুবহুল শব্দজাত উচ্চারণ করা নিম্ন আসামীয়দিগের এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জগতের যে জাতি যখন বলবীর্য্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্প-সাহিত্যে উন্নতিলাভ করে তখন সেই জাতির জাতীয় ভাষাও সেইরূপ উজ্জ্বল ও উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাস পাঠ করিলেই ইহা সম্যক অবগত হওয়া যায়। ভারতীয় আর্য্যদিগের বীরত্ব ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ উন্নতির যুগে, তাহাদের মধ্যে আর্য্য সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; কালক্রমে তাহা হইতে সেই ভাষা, অশিক্ষিত অবলা ও ভৃত্যাদির মধ্যে বিকৃত হইয়া স্বতন্ত্র একটা দুর্ব্বল 'প্রাকৃত' অর্থাৎ মূর্খদিগের ভাষায় পরিণত হয়। ভারতীয়দিগের শারীরিক অবনতি, শিক্ষার অবনতি এবং অপরাপর কারণবশতঃ সেই দুর্ব্বল প্রাকৃত ভাষাও অধিক দুর্ব্বলতা ও 'অতি প্রাকৃতত্ব' বা 'মহা প্রাকৃতত্ব' প্রাপ্ত হইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্য জাতীয় ভাষার সহিত অল্লাধিক মিশ্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভাষায় পরিণত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাকে কেবল অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকেরাই অতিকষ্টে জীবিত রাখেন। অধুনা শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ উন্নতির সহিত ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের সেই "মহাপ্রাকৃত" দুর্ব্বলতর ভাষা, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, পুনর্ব্বার ক্রমশঃ সংস্কৃতাভিমুখী হইয়া শক্তিশালী হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষা ইহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। এই ভাষা এখন প্রাকৃতের অবস্থা পরিহার করিয়া সংস্কৃতের ন্যায় সমুন্নত সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালে কামরূপের ভাষাও সেই "মহা-প্রাকৃত" বা 'অতিপ্রাকৃত' অবস্থায় ছিল এবং তৎকালের কামরূপীয় লিখকগণ এই ভাষাতেই পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে উপর-আসামের ভাষা কিরূপ ছিল তাহা ভাল জানি না; তবে আজি-কালির তত্রত্য ভাষা হইতে অনুমিত হয় যে, হয় সে স্থানে কামরূপীয় 'মহা-প্রাকৃত ভাষার' ও অপভ্রংশ ও ডিব্রু-শিবসাগরের সন্নিহিত নাগা মিরি মিশমি প্রভৃতি অনার্য্য জাতীয় ভাষাসম্ভূত এক প্রকার "মহা-মহা-প্রাকৃত" বা "অত্যতি-প্রাকৃত" ভাষাই কথিত হইত, না হয় সে স্থানে অন্য মিশ্রিত ভাষা প্রচলিত ছিল। এই কথিত ভাষার কোন প্রকার লিখিত সাহিত্য বা কোন বিশেষ নাম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কয়েক বৎসর অতীত হইল ৺হেমচন্দ্র বড়ুয়া ডাঙ্গরীয়া অসমীয়া ভাষার একখানা "হেমকোষ" অভিধান লিখেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ভাষার অনুবাদক ছিলেন; সুতরাং দেশীয় ভাষার শব্দরাশি সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হন। গৌহাটীতে অবস্থান কালে অনেক প্রাচীন পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকেও একত্র নিবদ্ধ করেন। এই কোষে নিম্নলিখিত শব্দ আছে (১) সর্ব্বত্র ব্যবহৃত— (বোধ হয় উপর আসাম ছাড়া —সাহিত্যাদিতেও এখন আর এইগুলি স্থান পায় না) সংস্কৃত শব্দ। বলা বাহুল্য যে 'হেমকোষে' এইরূপ সংস্কৃতমূলক শব্দের সংখ্যাই অধিক —কিন্তু নব্য অসমীয়া লিখকেরা সেইগুলির অর্থ বুঝেও না শিখেও না, সুতরাং কেবল মাতৃঅঙ্কে শিক্ষিত (২) গ্রাম্য ভাষাকেই সাহিত্যাদিতেও ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৩) কামরূপের পুস্তকাদিতে ব্যবহৃত কতক শব্দ। কামরূপীয় অনেক শব্দ এইগুলির মধ্যে দুই চারিটি শব্দের 'ফুটনোটে' তিনি কামরূপীয় Dialect র শব্দ বলিয়া লিখিয়াছেন। (৪) উপর আসামের অনার্য্য-দিগের অনেক শব্দ; (৫) কতকগুলি বিদেশীয় শব্দ; এবং (৬) সংস্কৃত-মূলক কামরূপীয় কতকগুলি শব্দ, নাসা কর্ণ কর্ত্তিত হওয়ার পর যেগুলি 'অসমীয়া ভাষার' আমলে গৃহীত হইয়াছে, অথবা, কামরূপের সম্পর্ক ব্যতিরেকে যেগুলি ছিন্ন-নাসা-কর্ণ অবস্থায় উপর আসামে প্রবেশ করিয়াছে। এই ছয় প্রকার বিভিন্ন শব্দের সমষ্টি লইয়া 'হেমকোষ' অভিধান গ্রথিত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় একটা কথা আছে -"যার শিল, তার নোড়া, তারই ভাঙ্গিব দাঁতের গোড়া" এখানেও তাহাই হইয়াছে। ৺হেমচন্দ্র

বড়ুয়া ও তাঁহার শিষ্যগণ যে কামরূপীয় ভাষা ও তাহার প্রাচীন সাহিত্যাদি লোককে দেখাইয়া "অসমীয়া ভাষার" প্রাচীনত্বের প্রমাণ করিয়া গর্ব্বিত হন, সেই কামরূপীয় ভাষাকে Dialect বলিতে তিনি সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার মতে হইল 'অসমীয়া ভাষা' আর কামরূপের ভাষা একটা Dialect ! "অহো কালস্য কুটিলা গতিঃ !" যাহা হউক উপর্য্যুক্ত অকৃতজ্ঞতা দোষ সত্ত্বেও 'হেমকোষ'-কারের যত্ন প্রশংসনীয়; লোকমুখে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত অধিকাংশ শব্দ সংগ্রহ করিয়া তিনি সমগ্র আসামের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন বলা যাইতে পারে।

যদি আজি-কালিকার অসমীয়া লিখক ডাঙ্গরীয়ারা 'হেমকোষ'স্থ অবিকৃত বিশুদ্ধ শব্দগুলি পরিহার করিয়া অশুদ্ধ বিকৃত অনার্য্য শব্দ গুলির প্রতি অত্যাদর না দেখাইতেন, যদি "মহামহা প্রাকৃত ভাষা" হইতে আরও অতি প্রাকৃতের দিকে অগ্রসর না হইয়া বিশুদ্ধ আর্য্য ভাষার দিকে অগ্রসর হইতে জানিতেন, যদি বঙ্গভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য মানসেই হউক বা আর্য্যভাষার প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ বশতঃই হউক কিম্ভূতকিমাকার নূতন নূতন অশুদ্ধ ও অবোধ্য শব্দ গঠিত না করিয়া আবশ্যক সংস্কৃত শব্দনিচয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতেন, 'পরগনীয়া' সকলের ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্যই নব্য 'অসমীয়া ভাষা' ও সাহিত্যের অস্থি মজ্জা বলিয়া সত্যের খাতিরে বুঝিতে পারিতেন, ও যদি হেমচন্দ্র বড়ুয়ার অসঙ্কলিত বিশুদ্ধ শব্দগুলি অদূরদর্শিতা বশতঃ অযত্ন না করিয়া সংগ্রহপূর্ব্বক প্রাচীন সাহিত্যের মত ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলেই নিম্ন আসামীয়দিগের আপত্তির কারণ থাকিত না। কামরূপীয়-ভাষাকে Dialect বলাতে, কিম্বা 'নিমাত নীরব' কামরূপীয়গণের Dialectও নাই বলিলে তাহাদের কার্য্যতঃ কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি হইত না; কারণ, এইরূপ অবস্থায়, নিম্ন আসামীয় শিক্ষিতদিগকেও এখন 'অসমীয়া ভাষা' বুঝিতে গলদঘর্ম্ম হইতে হইত না, অন্ততঃ কামরূপীয় পাঠশালা ইস্কুল প্রভৃতির কোমলমতি ছাত্রদের মস্তক ভক্ষিত হইত না। তাহাদিগকে নিজের বিশুদ্ধ ভাষার পরিবর্ত্তে অবিশুদ্ধ নিরাকার 'অসমীয়া ভাষা' শিক্ষা করিতে হইত না, পরমাণুময় আসামীয়া ভাষা বলিতে বলিতে শেষে বাগযন্ত্র লোপের ভয় থাকিত না। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা [illegible] করাতে যত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এখন তাহার দ্বিগুণ পরিশ্রম করিয়াও অনেকস্থলে অকৃতকার্য্য হইতে হইত না। কিন্তু এ সকল ভাবিয়া দেখিবার লোক নাই, নিম্ন আসামীয় ছেলেদের মস্তক রক্ষা করিবার কেহই নাই।

এই কথা পূর্ব্বেই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে কামরূপীয় ভাষার প্রাচীন সাহিত্য বা আজি কালিকার তথাকথিত অসমীয়া ভাষার প্রাচীন সাহিত্য পুস্তকগুলি নগাওঁ কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার লিখকগণ দ্বারাই লিখিত ও তৎ তৎ স্থানেই এই ভাষা উন্নতি প্রাপ্ত, সুতরাং ইহার সহিত অধুনাতন নিম্ন আসামের ভাষারই মিল। কিন্তু অন্যে পরে কা কথা ইদানীং নগাওঁর কথাও পুরাতন আখ্যা পাইয়া অনাদৃত হইতেছে।

ডিব্রু-শিবসাগরীয়া সকলেরই অসন্দিগ্ধ ধ্রুব বিশ্বাস যে বিলাক, (plural ending), তেখেত (There, but used in the sense of ভবান্), তাহানিয়েই (long ago), তেনি (In that direction), তেনে (So), তেনেকুরা (Similar), তেবা হি (Excessive), তেহেত (a little farther off), ঘরলৈ যাওঁ (গৃহং গচ্ছামি), বড়ুয়াইতর (বড়ুয়াদের), ঈদৃশ শব্দগুলি অতি বিশুদ্ধ। কিন্তু নিম্ন আসামের তাহার (তেষাং), তুঁহার (সম্ভ্রমার্থে ও তুচ্ছার্থে যুষ্মাকং, প্রাকৃত তুহ্মে ?), তাহান (সম্ভ্রমার্থে ও তুচ্ছার্থে-তে), ঘরক যাওঁ (গৃহং গচ্ছামি), বড়ুয়াথের (বড়ুয়াদের), বস্তুগিলা (বস্তুগুলি), ক—হে (where ho !), অ হে (সংস্কৃত—ইহ—হে !), স হে (where ho !), স হে (there ho !), সেনে (So), সেনেকুরা (Similar), এই শব্দগুলি এক একটি 'কুইনাইনে'র হিমালয়। বলা বাহুল্য যে ডিব্রু-শিবসাগরেও কথিত ও লিখিত ভাষার বিস্তর প্রভেদ। শ্রীযুক্ত বেণুধর রাজখোয়া E. A. C. ডাঙ্গরীয়ার 'দর্পণ' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানা পড়িলেই এই কথার কিঞ্চিৎ প্রতীতি হইবে। এখানে দুই একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হইল যথা, কথিত নৈঁরয়ণ, তৈঁরা দেঁবী, নেঁ যাঁং, নেঁ—খাঁং; লিখিত নারায়ণ, তরা-দেবী, নে যাওঁ, নে খাওঁ ইত্যাদি। নীচে শব্দের একটি ক্ষুদ্র তালিকা দিলাম। ইহা হইতে তাহাদের নিন্দনীয় কামরূপীয় 'Dialect' এবং আজি-কালির নব্য আসামীয় সাহিত্যের 'ভাষার' উৎকর্ষাপকর্ষ প্রভেদ এবং এতদুভয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার সহিত তারতম্য বোধগম্য হইবে।*

(ক) সংস্কৃত ও কামরূপীয়ের আ অসমীয়াতে অ।

গুরুবর্ণের পূর্ব্বস্থিত অ বাঙ্গালার ন্যায় কামরূপীয়ে আ হয়।

সংস্কৃত।	কামরূপীয়।	লিখিত অসমীয়া।
অগ্রপশ্চাৎ	আগাপাচা আগাপিচা	অগাপিচা
আনয়নং আনয়ঃ	আনা	অনা
আনকঃ	আনা	অনা
কাণঃ	কাণা	কণা
কর্ম্মকার	কামার	কমার
কল্লঃ	কালা	কলা
কার্পাসং	কাপাহ	কপাহ
কাম্যকুব্জং	কাণোজ	কণোজ
চক্রং	চাকা	চকা
চণ্ডালঃ চাণ্ডালঃ	চাড়াল চাণ্ডাল	চণ্ডাল
চন্দ্রাতপঃ	চান্দোবা	চন্দোবার
জ্ঞা	জানা	জনা
তারা	তারা	তরা
দমাঃ দামরঃ	দামরা	দমরা
নাগা	নাগা (পুং)	নগা (পুং)
	নাগিনী নাগানী (স্ত্রীং)	নাগিনী (স্ত্রীং)
পঞ্জরং	পাঁজা	পঁজা
পাগলঃ	পাগলা	পগলা
প্রগ্রহঃ	পাঘা	পঘা
প্রায়শ্চিত্তং	পারাচিত	পরাচিত
বণ্টনং	বাঁটা বাণ্টা	বঁটা
বন্ধ্যা	বাঁজা বাঁজী	বঁজা বাঁজী
বিনাশঃ	বিনাচ (গর্ভস্রাব)	বিনচ
বিধাতা	বিধাতা	বিধতা
ভ্রস্জ	ভাজা	ভজা
ভাণ্ডাগারঃ	ভাণ্ডার	ভঁরাল

* শব্দগুলি আমি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিলাম। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

সংস্কৃত।	কামরূপীয়।	লিখিত অসমীয়।
ভ্রাতৃজঃ	ভাতিজা	ভতিজা
মানকঃ	মানকচু	মনাকচু
যাচ্ঞা	যাচা	যচা
রাজা	রাজা	রজা

(খ) অ আ স্থানে লিখিত অসমীয়ে এ।

সংস্কৃত।	কথিত কামরূপীয়।	লিখিত অসমীয়।
অন্তরালঃ	আড়াল	এরাল
অন্ধকারঃ	আন্ধার আঁধার অন্ধকার	এন্ধার
অন্ধঃ	আধা	এধা
আর্দ্রকং	আদা	এদা
আমঃ (নূতন)	আয়	এয়
আচারঃ	আচার	এচার
অস্থানং	আঠাই	এঠাই
কচ্চরঃ	কাচা	কেচা
কন্থা	কাথা	কেথা
কর্কটঃ	কাকড়া	কেকোরা
কষায়ঃ	কাহা	কেহা
কেতকী	কেতকা	কেতেকা
নাগরী	নাগরা নাগারী	নাগেরা

(গ) ই স্থানে এ।

সিন্দূরং	সিন্দূর সিদূর	সেন্দূর
নিম্ব	নিমু	নেমু
উন্দুরঃ	উন্দুর ইন্দুর	এন্দুর

(ঘ) উ স্থানে ও।

দুয়োর	দুয়োর	দোয়োর
উপরি	উপরি, উপর	ওপর
কুষ্মাণ্ডঃ	কুমড়া	কোমোরা
নু	নু (যথা, কিয়নু)	নো (কিয়নো)
তাম্বুলং	তামূল	তামোল

(ঙ) অই স্থানে ঐ।

নদী	নদী	নৈ
	লাগি লগি	লৈ
সহিত	সহিতে	সৈতে সতে

(চ) অনুনাসিক বর্ণ স্থলে চন্দ্রবিন্দু।

শান্তিঃ	শান্তি	শাঁতি
কান্তিঃ	কান্তি	কাঁতি
পণ্ডিতঃ	পণ্ডিত	পঁড়িত
পিণ্ডং	পিণ্ড	পিঁড

(ছ) য-ফলা স্থানে ই।

সংস্কৃত।	কামরূপীয়।	লিখিত অসমীয়
সামান্য	সামান্য	সামাইন
বাক্যং	বাক্য	বাইক

(জ) সংযুক্ত ব্যঞ্জন বিপ্রকৃষ্ট।

সর্ব্ব	সর্ব্ব	সরব
শক্ত	শক্ত	শকত
অযুক্ত	অযুক্ত	অজুগুত
ধর্ম্ম	ধর্ম্ম	ধরম
শ্রাদ্ধঃ	শ্রাদ্ধ	শরাধ
শব্দঃ	শব্দ	শবদ
বহুমূল্য	বহুমূল্য	বহুমূলীয়া
ক্রোধঃ	ক্রোধ	কোরোধ
ধ্রুবং	ধ্রুব	ধ্রুপ
বার্ত্তা	বার্ত্তা বার্ত্তা	বাতরি বাত্রা
ছাত্র	ছাত্র	ছাতর
কাঙ্কি (ক+অঙ্কি)	কাঙ্কি	কাহানি
যদাঙ্কি (যস্মিন অঙ্কি)	যাঙ্কি	যাহানি

(ঝ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত।

বুদ্ধিঃ	বুদ্ধি	বুধি
ভিন্ন	ভিন্ন	ভিন
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিমান	বুধিয়ক
শিক্ষা	শিক্ষা শিক্ষনি	শিকনি
চক্ষু	চক্ষু	চকু
নিশ্চয়	নিশ্চয়	নিচয়
পশ্চিম	পশ্চিম	পচিম
নাগকেশর	নাগেশ্বর	নাহর

এইরূপ কথিত কামরূপীয় ও লিখিত অসমীয় ভাষায় নানা শব্দের প্রভেদ আছে। এখানে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

কথিত কামরূপীয়।	লিখিত অসমীয়।	অর্থ।
মাকড়া	মকরা	মাকড়সা
ঠনকা	চনকা	ঠনকা
মরিবার	ধকাবর	মরিবার
মা-মরীয়া বাপ-মরীয়া	মাউরা	পিতৃমাতৃহীন
মরদ	মটা	মরদ
শাশুর	সাথার	হেঁয়ালী
হুকা	ধপাত খোরা	হুকা
তামাকু	ধপাত	তামাক
মহারি	আঠুরা	মশারি
বায়না	বইনা	বায়না
ফেলান	পেলোরা	ফেলান
বয়া	বেয়া	বদ
পান্তা (ভাত)	পইতা	পান্তা
বর (বিবাহের)	দরা	বর

একই শব্দ উপর ও নিম্ন আসামে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলে কিরূপ অসুবিধা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

শব্দ।	কামরূপে অর্থ।	লিখিত অসমীয়ে অর্থ।
সরহ	সহজ	প্রচুর
বাপু	বালকের প্রতি	পণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রতি
বউ	জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া	মাতা
চহকী	অভিজ্ঞ কৃষক	ধনবান ব্যক্তি
পিতা	ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে	
বাপা	নিম্নশ্রেণীর মধ্যে	বোপাই ব্রাহ্মণাদি সকলের মধ্যে
চমু	ঋজু	সংক্ষিপ্ত

ব্যাকরণেও প্রভেদ আছে।

কথিত কামরূপীয়।	লিখিত অসমীয়।	অর্থ।
লাগি, লগি	লৈ	লগি
না পায়	নে পায়	পায় না
নাক-কাটা (পুং)	নাক-কটা (পুং)	
নাক-কাটী (স্ত্রী°)	নাক কাটী (স্ত্রীং)	
বগলা পুং, বগলী স্ত্রী°	বগলী (পুং স্ত্রী°)	বক
চিলা পুং, চিলনী স্ত্রীং	চীলনী (পুং স্ত্রীং)	চীল
ছাগল পুং, ছাগলী স্ত্রীং	ছাগলী (পুং স্ত্রীং)	
কাউর পুং, কাউরী স্ত্রীং	কাউরী (পুং স্ত্রীং)	কাক
গেল (ক্রিয়া)	গল	গেল
করিলাক	করিলেক	করিলেক
বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমন্ত	বুধিয়ক	

এই স্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে ইদানীন্তন লিখকেরা সংস্কৃত শব্দ যে মোটেই প্রয়োগ করেন না তা নয়, তবে এত অল্প ব্যবহার করেন যে, তাদৃশ শব্দের ব্যবহার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকের ভাষার কথা না বলিয়া কেবল মাসিক পত্রিকার কথা বলিলে এই আর্য্য-ভাষা-বিদ্বেষ বিষয়ে নাবালিকা 'ডিব্রুগড়িয়াণী' 'মাহিলী' 'আলোচনী'কেই অগ্রগণ্যা বোধ হয়। 'কলিকতাণী' 'বাঁহী'র সুর কখনও সপ্তমে কখনও পঞ্চমে নানা সুরে মুখরিতা। আসামের এই সংস্কৃত বর্জ্জন যুগে, যত দূর সম্ভব 'তেজপুরীয়াণী' 'উষা দেবী'ই সংস্কৃতকে সমাদর করিয়া থাকে, কিন্তু কুদৃষ্টান্ত ও সঙ্গদোষে, ইঁহারও আর্য্যবিদ্বেষ দোষ ঘটে না কি ইহাই শঙ্কার বিষয়। যাহা হউক আজি-কালি আসামের মাসিক পত্রিকার মধ্যে এইখানিই উৎকৃষ্ট।

আর একটী কথা এখানে বলিয়া রাখি যে উপরি লিখিত তালিকায় নিম্ন আসামের যে শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ও তাদৃশ শব্দ কেবল সাধারণ কথোপকথনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, চিঠি পত্রাদি কিছু লিখিতে হইলে তথায়, অন্ততঃ যাহারা সামান্য লেখাপড়া জানে, তাহারা অধিক সুসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে, যেমন—

নিম্ন আসামে

কথিত।	লিখিত।
মামা	মাতুল
আই, মাই, মা	মাতৃদেবী
খুড়া	পিতৃব্য মহাশয়
বামুন	ব্রাহ্মণ
শূদ্দুর	শূদ্র
চৈৎ	চৈত্র
চান্দোয়া	চন্দ্রাতপ
	ইত্যাদি।

কিন্তু উপর আসামে আর্য্যগণ প্রায় অধিকাংশ ডাঙ্গরীয়া অন্ততঃ আজি-কালি, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অর্থাৎ অবিকৃত শব্দকে বিকৃত ও বিকৃতপূর্ব্ব শব্দকে অধিক বিকৃত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। এইরূপে যদি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ শব্দগুলির অনুকরণ কার্য্য ক্রমশঃ চলিতে থাকে তাহা হইলে বাগযন্ত্রের সহিত এই ভাষার শব্দসমূহের পরমাণু মাত্র অবশিষ্ট থাকে কিনা সন্দেহ। সংযুক্ত বর্ণ-বিশিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় আজি কালির মধ্যে নাকি অনেক ছাত্রকে মহা ফাঁপরে পড়িতে দেখা যায়, কয়েক বৎসর পরে তাদৃশ শব্দোচ্চারণে তাহারা যে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইবে এ কথা স্থির।

দুঃখের বিষয়, কেহ ভাবেন না সমস্ত জাতিটাকে এইরূপ দুর্ব্বল ও কোমলতম ভাষা দেওয়া উচিত কিনা, একটা জাতির বাগযন্ত্রকে দুর্ব্বল ও লুপ্তকরা যুক্তি-সঙ্গত কিনা। আরও দুঃখের কথা, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া নিবাসী কোন কোন মহাশয় তাহাদের বিশুদ্ধতর ভাষা ত্যাগ করিয়া 'নিরাকার' শূর্পনখা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিতে লজ্জা বোধ করেন না। নিজের সঙ্গে নিম্ন আসামীয়দিগকে অধঃপাতিত না করাইয়া উপর দিকে উঠাইবার চেষ্টা করাই ডাঙ্গরীয়াদিগের কর্ত্তব্য। সর্ব্ব-বিষয়ে বাঙ্গালীর অনুকরণ করিয়া, কেবল ভাষার বেলায় নেকামি করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সহিত সাদৃশ্য লাভ করিবে, এই আশঙ্কায় নিজের সহিত নিম্ন আসামীয়দিগের সর্ব্বনাশ সাধন করা কখনই ন্যায় সঙ্গত নয়। নব্য আসামীয় লিখকমহাশয়গণ মাতৃভাষার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ কিসে সেই ভাষার উন্নতি পুষ্টি ও বলাধান হয় তাহা সম্যক্ বিবেচনা করিবার অবসর পাইতেছেন না; কিন্তু অদূরদর্শিতা ও অত্যধিক আত্মপরতায় হিতে বিপরীত ঘটাইতেছেন,—তাঁহারা মাতৃ-ভাষাকে কোমল হইতে কোমলতর করিতে গিয়া তাহার কঠিন অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতি অংশ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল সুকোমল মাংসটুকু অবশিষ্ট রাখিতে সংযুক্ত-বর্ণ-বিশিষ্ট বহু অক্ষরাত্মক শব্দগুলিকে প্রায় ব্যবকলন করিয়া কেবল ক্ষুদ্রতম শব্দগুলি ব্যবহার করিতে যত্ন করিতে-ছেন। ইহার ফল কি হইতেছে ও হইবে, তাহা বুঝিয়া লউন।

ডফ্লা আবর প্রভৃতি কয়েকটি পার্ব্বত্য জাতি ব্যতীত আসামের অন্যান্য জাতি আর্য্যবংশ সম্ভূত; সুতরাং আর্য্য ভাষার প্রতি ইহাদের আগ্রহাতিশয্য হওয়া স্বাভাবিক। শিষ্ট বাক্যও আছে—"যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাঽসৌ দুরতিক্রমঃ"। কিন্তু তাহা না হইয়া, দেশে বিশুদ্ধ সুসংস্কৃত আর্য্য ভাষার অস্তিত্ব সত্ত্বেও নিরতিশয় বিকৃত অবিশুদ্ধ ভাষার জন্য এই আর্য্যগণের এত উৎকট আগ্রহ কেন ইহাই একটী বিষম সমস্যা। তাঁহারা জাতীয় ভাষার ক্ষেত্রটাকে "চুরা পাতনি" (আস্তাকুড়) করিয়া প্রায় আবর্জ্জনা দ্বারা পূর্ণ করিতেছেন।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরে যখন আসামীয়ভাষা আর্য্যভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিবে তখন কোন বিদেশীয় সমালোচক আসিয়া তাৎকালিক ভাষা দর্শনে যদি অসমীয়া জাতিকে

অনার্য্য জাতি বলিয়া ঘোষণা করে তাহা হইলে আসামীয় মহাশয়গণ নিজেকে শতমুখে সিংহ বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহারা যে সিংহ নন, তাহা কি "বাগ্ দোষাৎ" প্রমাণিত হইবে না? বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী-দিগের এই কথাটা একবার নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর হইতেছে না।

যদি এই সমালোচনা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, তাহা হইলে আসামীয় মহাশয়গণের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন আমার কথাগুলি পড়িয়া রুষ্ট না হন; তাঁহাদিগের অপেক্ষা এই পত্রলিখক অসমীয়া ভাষার উন্নতির জন্য যে কম আগ্রহান্বিত তা নয়; বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষার লিখকগণ যাহাতে ভাষার অবনতির নিম্নপথে না গিয়া প্রকৃত "জাতীয় ভাষার" উন্নতির পথে অগ্রসর হন সেই কথা স্মরণ করিলে রোষের কারণ থাকিবে না। লেখ্য ভাষা নিম্ন আসামেও গ্রহণীয় হইবে কিনা লিখকগণ তাহা স্মরণ করিয়া লিখিবেন। তাহা হইলেই প্রবীণ মহাশয়গণের গোয়ালপাড়াতে অসমীয় ভাষা প্রচলনের চেষ্টা ফলবতী হওয়ার আশা করা যাইতে পারে। যদি ভাষার আদর্শ সংস্কৃতাভিমুখী না হয়, তবে সেই চেষ্টা ফলবতী না হইয়া "লাভঃ পরঃ গোবধঃ" হওয়ারই সম্ভাবনা।"

পত্র-লেখক মহাশয় শেষে লিখিয়াছেন,

"কামরূপ ও গোয়ালপাড়া ছাড়া আসামের আর চারি জেলাতে বহুদিন হইতে সংস্কৃতের চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃতের চর্চ্চা নাই, এবং যতদূর অবগত আছি, পূর্ব্বেও ছিল না। আজি-কালি কামরূপের দুই এক অধ্যাপক আসিয়া উপর আসামে টোল স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইতে এখনও বিশেষ ফল দৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, সংস্কৃত চর্চ্চার অভাবই অসমীয়া ভাষার সংস্কৃত-বিদ্বেষের একতম প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ব হইতেই কামরূপীয়দিগের আগ্রহ বাঙ্গালা ভাষার দিকে ছিল। কাজেই কি সংস্কৃত শিক্ষিত, (দুই একজন ব্যতীত) কি ইংরাজী শিক্ষিত, তাহারা এতদিন অসমীয়া ভাষার প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া আসিতেছিলেন। এই সুবিধাতেই উপর আসামীয় লিখকের হাতে পড়িয়া অসমীয়া ভাষা নিম্নদিকে চলিয়া কামরূপীয় ভাষা বা সংস্কৃতমূলক ভাষা হইতে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাতৃ ভাষা শিক্ষণীয় বিষয় হওয়ায় কামরূপীয়-দিগের উভয় সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।"

পত্র-লেখক মহাশয় নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। হয় ত স্থানে স্থানে অত্যুক্তি ও তীব্রতার দোষে পড়িয়াছেন। আসামী ও বাঙ্গালা ভাষা এক বলি আর না বলি, সংস্কৃত ভাষার বিবর্তনে কোন ভাষা কোন দিকে চলিয়াছে, তাহা বুঝা স্পষ্ট হইতেছে।

প্রথম প্রবন্ধে প্রাচীন আসামী ও ওড়িয়া ভাষার দৃষ্টান্ত তুলিয়াছি। এখন আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের ভাষার কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ উপসংহার করি। লেখক দেশ-প্রচলিত সহজ ওড়িয়ার পক্ষপাতী। পুস্তকের নাম 'ভাগবত টুঙ্গী' (আসামের 'নাম ঘর')। বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,

আম্ভমানঙ্ক (আমাদের) গ্রামরে গোটিএ (একটা) ভাগবতটুঙ্গী অছি। টুঙ্গীর ইতিহাস আম্ভেমানে (আমরা) সবিশেষ অবগত নোহুঁ। অধুনা টুঙ্গীরে তালপত্র পোথী খণ্ডিএ সুদ্ধা (একখানিও) নাহিঁ। মারীভয় ও বসন্ত রোগর প্রাদুর্ভাব সময়রে টুঙ্গীরে 'সপ্তাহ ভাগবত' করিবাকু (করিবার হেতু) 'ভাগবতটুঙ্গী' নামটি কেতেক পরিমাণরে সার্থকতা লাভ করি এছি। সময়রে অতিথি, অভ্যাগত, বাবুভয়া (বাবু-ভাইয়া), সরকারী লোক আসিলে এঠারে (এ ঠাইএ) স্থান পান্তি। প্রায় প্রতিদিন গ্রামর ১০।১৫ জন সন্ধ্যা সময়রে এঠারে একত্র হোই ক্ষমতা অনুসারে নানাদি বিষয় আলোচনা করন্তি।"

ওড়িয়া সাহিত্যের ভাষায় এইরূপ সংস্কৃত শব্দ আছে তা বলিয়া যে সে ভাষার অবনতি হইতেছে, এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। ওড়িয়াতে 'রজা' শব্দ থাকিলেও রাজা না লিখিয়া কেহ রজা লেখেন না। কিছুকাল পরে রজা শব্দ সাধারণ লোকে ভুলিয়া যাইবে। বঙ্গের কোন কোন স্থানে ড় উচ্চারণে র হয়, শ ষ স স্থানে হ হয়। তা বলিয়া কেহ বাঙ্গালা ভাষার পঙ্গুত্ব কামনা করেন না। মাতৃভাষা সকলেরই ভক্তি ও সমাদরের সামগ্রী। কিন্তু মাতৃভাষা অর্থে আমার তোমার মাতার ভাষা নহে। যে ভাষার জন্য আমি বাঙ্গালী, সেই ভাষা আমার মাতৃভাষা। তা ছাড়া, মাতৃভাষারও যে দিন দিন পরিবর্তন হইয়া থাকে, তাহা শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা মাতার ভাষা তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর পিতামহী ও মাতামহী যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ভাষা হস্তপদাদির ন্যায় প্রকৃতিদত্ত নহে, ভাষা শিখিতে হয়। মানুষ যদি একা একা থাকিত, যদি সমাজের মঙ্গলকামনা না করিত, তাহা হইলে নিজের ইচ্ছা প্রবল রাখিয়া ভাষাতেও স্বাতন্ত্র্য দেখাইতে পারিত।

পরিশেষে আসামী পাঠকের প্রতি পুনর্বার নিবেদন যে, গৃহকন্দল সৃষ্টি করিতে কিংবা নিজের পাণ্ডিত্য প্রকট করিতে এই প্রবন্ধ লিখি নাই। কৌতূহল পরিতৃপ্তি হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাতে দোষারোপ করিলে তিলকে তাল করা হয়। তা ছাড়া, দ্বেষাদ্বেষ-শূন্য হইয়া এত বিষয়ের বিচার চলিতেছে, একটা ভাষার প্রকৃতি নিরূপণ অসম্ভব কি?

কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

ইতর প্রাণীরা কি বুদ্ধিমান জীব ?

(উইণ্ডসর ম্যাগাজিন হইতে)

ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি ভ্রান্ত আছে ; যেমন আমরা মনে করি তাহাদের মধ্যে কোনো-প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি নাই- তাহারা যে সকল কাজ করে তাহাতে যুক্তি তর্কের লেশমাত্র নাই, ভাব ও চিন্তার কোন সংশ্রব নাই—তাহারা তাহাদের সহজসংস্কার বলেই জীবনের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যায়, এই জন্য তাহাদের মানুষের মতো চিন্তা ও কল্পনার কোনোপ্রকার আশ্রয় লইতে হয় না। এমন কি তাহাদেরও যে মানবের ন্যায় স্নেহ মমতা, দয়া ভক্তি, ন্যায় অন্যায় বোধ আছে একথা বলিলে আমরা নিজদের অপমানিত বোধ করি। আমাদের এইরূপ বিশ্বাসই তাহাদের প্রতি আমাদের অত্যাচার বর্ব্বরতার সীমাকেও লঙ্ঘন করিয়াছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মানবে ও পশুতে এরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করিবার কোনো ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা কেবল মাত্র সহজসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই জীবনের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস, প্রাণিগণের কার্য্যাবলীর বিশেষ পর্য্যালোচনার অভাবের ফল মাত্র ; নতুবা পশুবুদ্ধিতে ও মানববুদ্ধিতে এমন কোনো প্রভেদ নাই যাহার জন্য আমরা পশুর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধকে খাদ্যখাদক ব্যতীত আর কিছু বিবেচনা করিতে পারি না। জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অসভ্য লোকদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করিয়া দেখিলে কোনো কোনো বিষয়ে তাহাদিগকে অসভ্য লোকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। তাহাদের ব্যবহারে অনেক সময় এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাহা তাহাদের সহজ সংস্কারের ফল নহে, সেগুলিতে স্পষ্টই তাহাদের বুদ্ধি ও বিচারক্ষমতা প্রকাশ পায়। চার্লস ই ব্রাঞ্চ (Charles E. Branch) সাহেব উইণ্ডসর ম্যাগাজিনে জীব জন্তুদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির কয়েকটা উদাহরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই সকল প্রমাণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে সহজসংস্কার ব্যতীতও বুদ্ধি খাটাইয়া জীব-জন্তুরা অনেক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারে।

বিড়াল সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকলেরই কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তাহাদের যন্ত্রণায় দুগ্ধ মৎস্য কিরূপ সাবধানের সহিত রাখিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন ; এই সকল লোভনীয় খাদ্য আত্মসাৎ করিতে বিড়ালের বুদ্ধির অসাধারণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ এম হ্যাকেট সনপ্লেট (M Hachet-Sonplet) সাহেবের একটি বিড়াল ছিল। সে রুদ্ধ-দুয়ার খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্যদ্রব্য অপহরণ করিতে পারিত। কিছুদিন পূর্ব্বে "সাইন্টিফিক এমেরিকান" পত্রিকায়, নেলসন বিগ সাহেব, বিড়ালের দুয়ার খোলা সম্বন্ধে একটি চাক্ষুষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি রাস্তা দিয়া চলিবার সময় একটি বিড়ালকে দুয়ার খোলা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দেখিতে পান। সেই দরজাটি উপরের দিকে শিকল দ্বারা আটকানো ছিল। বিড়ালটি একবার দরজাটি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া লইল। তারপরে চট করিয়া দরজাটির অগ্রভাগে উঠিয়া পা দিয়া ঠেলিয়া শিকলটি খুলিয়া দিল।

বিড়াল দরজার খিল খুলিয়া খাবার চুরি করিতে যাইতেছে।

নেলসন সাহেব তখনই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে বিড়ালটি কখনও তাহার নিকট হইতে এরূপ কার্য্যের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই, ইহা সম্পূর্ণই সে তাঁহার নিজের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবন করিয়াছে। এই বিড়ালটি নাকি পূর্ব্বে পূর্ব্বে আরো অনেকবার এরূপভাবে তাহার চুরিবিদ্যার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে।

এম, হ্যাকেট সনপ্লেট সাহেবের জীবশালায় একটি সিংহ ছিল। তিনি সেই সিংহটি দ্বারা সিংহের বুদ্ধিবৃত্তি কেমন

তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি একটি বৃহৎ খাঁচার মধ্যে একটি ছোট কাঠের বাক্সের ভিতর কিছু মাংস পুরিয়া তাহার উপরের ডালাটি আলগা করিয়া রাখিয়া দেন। সিংহটিকে খাঁচার ভিতর ছাড়িয়া দিলে, সে প্রথম প্রথম কাঠের বাক্সটি দেখিয়া ভয় পাইতেছিল কিন্তু তাহা অল্পক্ষণের জন্য। কিছুক্ষণ পরে সে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বাক্সটির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। নিকটে আসিতেই ভিতরের মাংসের গন্ধে সে চঞ্চল হইয়া উঠিল কিন্তু কোথায় মাংস আছে তাহা সে প্রথমেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে মাংসের অনুসন্ধানে বাক্সটির চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘ্রাণ লইতে লাগিল। পশুদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল; বাক্সটির ভিতরেই যে মাংস আছে ইহা বুঝিতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। যখন সে ইহা বুঝিতে পারিল, ভিতরের মাংস বাহির করিবার জন্য সে বাক্সটিকে ভাঙ্গিবার চেষ্টামাত্র করিল না—উপরের ডালাটিকে কামড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে সেটি টানিয়া তুলিল।

উপরোক্ত দুইটি ঘটনায় বিড়াল ও সিংহ যে তাহাদের সহজসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিয়াছে তাহাতো বলা যায় না; তাহা হইলে মানুষের প্রত্যেক কার্য্যকেই তো সহজ সংস্কারের ফল বলিতে হয়। এই সকল কার্য্য তাহাদের পর্য্যবেক্ষণা ও উদ্ভাবনী শক্তিরই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বানরকে আমরা কেবল মাত্র অনুকরণেই দক্ষ বলিয়া জানি, তাহারা যে মানুষের মতো বুদ্ধি খাটাইয়া কোনো কাজ করিতে পারে ইহা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। এম, হ্যাকেট সনপ্লেট সাহেব মানুষ হইতে নিকৃষ্ট প্রাণী পর্য্যন্ত কে কিরূপ বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে পারে তাহা অনেক দিন হইতে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার এই পরীক্ষায় মানুষের পরেই উচ্চশ্রেণীর বানরের স্থান প্রমাণিত হইয়াছে। মানুষের এমন কোনো অভ্যাস-সাধ্য (mechanical) কাজ নাই যাহা বানর করিতে না পারে। চিত্রে জুতা মোজা কোট পেনট পরিহিত যে বানরটি ট্রাইসিকেলে উপবিষ্ট আছে তাহাকে কেবল মাত্র একবার ট্রাইসিকেলে চড়িতে দেখানো হইয়াছিল। ইহার পর হইতে সে নিজে নিজেই

বানরের ট্রাইসিকেল চালান।

ট্রাইসিকেল চড়িতে ও চালাইতে পারিত। চলিবার সময় রাস্তায় কোনো বাধা উপস্থিত হইলে সে সম্মুখের চাকাটি ঘুরাইয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু এরূপ করিতে কখনো তাহাকে শিখানো হয় নাই।

বানরের পরেই কুকুর বিড়াল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী প্রাণী। মানুষের কার্য্যের অনুকরণের পক্ষে ইহাদের শারীরিক গঠন যথেষ্ট প্রতিকূল হওয়ায় ইহারা সকল বিষয়ে মানুষের অনুকরণ করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু কোনো বিষয় তাহাদের উপযোগী করিয়া দিলে তাহারাও বানরের ন্যায় মানুষের অনুকরণে যথেষ্ট তৎপরতা প্রদর্শন করে। কুকুর অবশ্য বানরের ন্যায় সাধারণ ট্রাইসিকেলে চড়িতে পারিবে না কিন্তু তাহাদের বসিবার উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিলে ইহারা স্বচ্ছন্দে ট্রাইসিকেল চড়িতে ও চালাইতে পারে। সনপ্লেট্ সাহেব লিখিয়াছেন তিনি স্বচক্ষে একটি কুকুরকে ট্রাইসিকেল চালাইতে দেখিয়াছেন। বলা বাহুল্য সেই

ট্রাইসিকেলটি বিশেষভাবে তাহারই জন্য উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

রিগ সাহেব লিখিয়াছেন একদল কুকুরকে লইয়া নাকি একটি ফুটবল পার্টি তৈরি করা হইয়াছিল। অবশ্য আমাদের ফুটবলের সঙ্গে তাহাদের বলের যথেষ্ট পার্থক্য আছে, ট্রাইসিকেলের ন্যায় বলটিকেও তাহাদেরই উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই স্থানে কুকুরের বলখেলার একটি চিত্র প্রদর্শিত হইল।

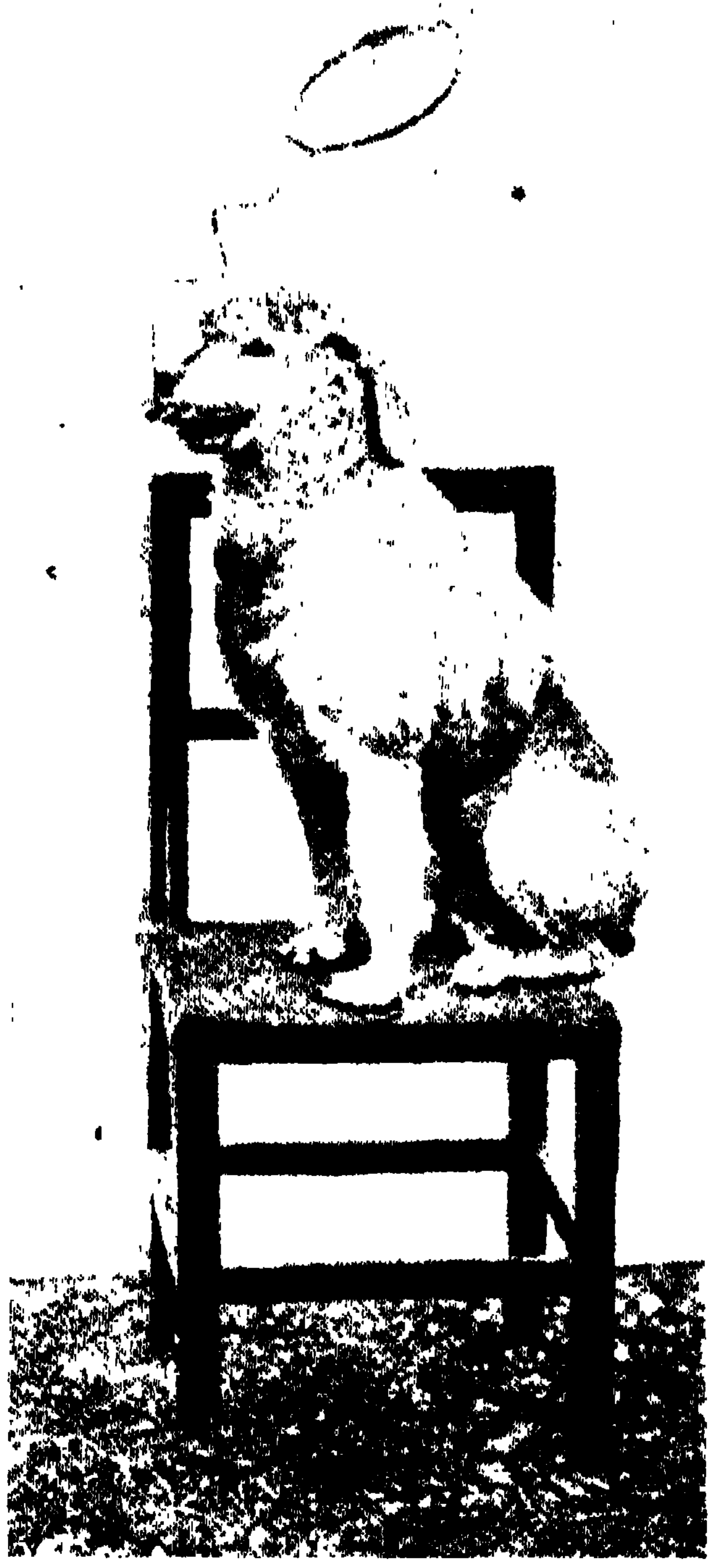

কুকুরের বলখেলা।

কুকুরের কসরৎ।

শৃগালের বুদ্ধির কথা কে না জানে? হিতোপদেশের গল্প বাদ দিলেও তাহাদের দুষ্টবুদ্ধির প্রমাণ খুঁজিতে অধিক দূর যাইতে হয় না। শৃগালেরা কুকুরছানা চুরি করিতে যে বুদ্ধি প্রদর্শন করে তাহা মানুষেরও অনুকরণযোগ্য। কুকুরছানা চুরি করিবার সময় ইহারা কখনও একাকী আসে না; দুইটির মধ্যে একটি কিছু দূরে অবস্থান করে, অন্যটি কুকুরীটিকে প্রলোভিত করিয়া দূরে লইয়া যায়, সেই অবসরে দূরে অবস্থিত শৃগালটি, একটি একটি করিয়া কুকুরছানাগুলিকে পার করে। ইঁদুরও ডিম চুরি করিবার সময় কম কৌশল প্রদর্শন করে না। একটি ইঁদুর ডিমটিকে বুকের উপর চার পায়ে সাপটাইয়া ধরিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে; অন্য একটি ইঁদুর ডিম সুদ্ধ সেই ইঁদুরটিকে টানিয়া নিজেদের বাসস্থানে লইয়া যায়।

সনপ্লেট সাহেব বলেন বন্য পশুদের বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। তিনি একটি বুনো খরগোশ ও পোষা খরগোশকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বুনো খরগোশ পোষা খরগোষ অপেক্ষা তাড়াতাড়ি মানুষের অনুকরণ করিতে পারে। তিনি একটি বুনো খরগোশকে কিছু দিন অভ্যাসের জোরে সৈনিক খেলা (Soldier's play) শিখাইতে পারিয়াছিলেন।

খরগোশের সৈনিকখেলা।

হাতী ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর বুদ্ধির কথা সুপরিচিত।

উপরে যে কয়েকটি সামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল তাহা পাঠ করিয়া জীবজন্তুদিগকেও

মানুষের ন্যায় বুদ্ধিমান প্রাণী ব্যতীত আর কি বলা যায় ? অবশ্য, তাহারা সুসভ্য মানুষের ন্যায় কোনো প্রকার উচ্চ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে না, এবিষয়ে মনুষ্যবুদ্ধিতে ও পশুবুদ্ধিতে যে অপরিসীম প্রভেদ আছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই—পশুরা একমাত্র আহারসংগ্রহকার্য্যে নিজেদের বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করিতে সমর্থ।

যেহেতু তাহারা বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচারক্ষমতায় আমাদের সমকক্ষ নহে এই জন্যই কি ইতরপ্রাণীদের প্রতি আমাদের নিষ্ঠুরাচরণ এইরূপ জঘন্য নৃশংস আকার ধারণ করিয়াছে ? এখনো তো ফিজিদ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি প্রদেশের বর্ব্বর জাতিরা শ্রদ্ধাভক্তি, লজ্জাপবিত্রতা, স্নেহমমতা প্রভৃতি উচ্চভাব সকল হইতে বঞ্চিত হইয়া পশুজীবন যাপন করিতেছে, তাহাদিগকে তো আমরা উদরপূর্ত্তি অথবা শিকারের ক্ষণিক আনন্দের জন্য দলে দলে গুলি করিয়া নিহত করি না। তাহাদিগের প্রতি এইরূপ বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করিতে যদি আমরা সঙ্কোচ বোধ করি পশুদের বেলায় কেন ইহার অন্যথা হইবে ?

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

জয়পুর-প্রবাসী বাঙ্গালী

জয়পুর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল প্রবাসীবাঙ্গালী গৌরব মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি-এ, মহাশয় গত জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটী রত্ন হারাইলেন। সর্ব্বসাধারণের নিকট মেঘনাথ বাবু তত পরিচিত না থাকিলেও সাহিত্যক্ষেত্রে এবং শিক্ষা বিভাগে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ইনি ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের সময় মেঘনাথ বাবুর বৃদ্ধপিতামহ রামনিধি তর্কভূষণ বঙ্গের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মাতামহ পণ্ডিত রামমাণিক্য তর্কালঙ্কারও একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পিতার নাম রামকমল ভট্টাচার্য্য। মেঘনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু ২৮ বৎসর বয়সেই একজন উচ্চদরের নৈয়ায়িকের প্রসিদ্ধি লইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। মাননীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়,

মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

সি, আই, ই, মহোদয় ১৮৯৩ সালে মেঘনাথ বাবুকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"I have to add that Babu Meghnath comes of a very learned family of Bengal Brahmins. His ancestors on both sides were pundits of great renown, distinguished for piety and knowledge of various departments of Sanskrit learning. His grandfather on the mother's side Rammanikya Vidyalankara was a profound Sanskrit scholar. Meghnath Babu produced a very favourable impression on all who knew him by his excellent character and demeanour."

"মেঘনাথ বাবু বঙ্গীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতৃমাতৃ উভয়কুলই সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। মেঘনাথ

বাবুর সহিত যে কেহ পরিচিত হয় সেই তাঁহার চারিত্র ও আচরণে মুগ্ধ হয়।"

মেঘনাথ বাবুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রাতাও প্রবাসী। দ্বিতীয়, রঘুনাথ হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রাদেশান্তর্গত টিহরীর রাজার প্রধান অমাত্য ছিলেন এবং তৃতীয় ভ্রাতা যদুনাথ ভট্টাচার্য্য দেরাদূনের চা বাগানের ম্যানেজার। চতুর্থ ভ্রাতা বঙ্গের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মেঘনাথ বাবু সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনি ১৮৫৪ অব্দে ভাটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ও অল্পবয়সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, পরিবারবর্গ এক প্রকার সহায়হীন হইয়া পড়েন। এই সময় ইহাদের পিতৃবন্ধু বঙ্গের বিদ্যাসাগর কিছুকালের জন্য ইহাদের যাবতীয় সাংসারিক ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করেন। এই সময় রঘুনাথ মাইকেল মধুসূদনের নিকট এবং যদুনাথ দেরাদূনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অগ্রজদ্বয় সংসার প্রতিপালনার্থ এবং কনিষ্ঠদ্বয়ের লেখাপড়ার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ চাকরী করিতে প্রবৃত্ত হইলে, হরপ্রসাদ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিলেন এবং মেঘনাথ নৈহাটীর ভার্ণাকুলর স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ১৮৬৮ অব্দে মেঘনাথ বাবু যোগ্যতার সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চার বৎসরব্যাপী মাসিক চার টাকা বৃত্তি সহ হুগলি কলেজে এণ্ট্রেন্স ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৭২ অব্দে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি সহ এফ্-এ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। তিনি ১৮৭৪ অব্দে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৮৭৭ অব্দে হুগলি কলেজ হইতেই বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পরবৎসরে Inductive Sciences, Inductive Logic, Botanic Physiology, Organic Chemistry, Paloeobotany ও Physical Geography প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয় সহ উদ্ভিদবিজ্ঞানের (বট্যানি) এম্ এ পরীক্ষা দান করেন। কিন্তু এই সময় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন সম্ভবতঃ Systematic Botanyর কাগজে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মধ্যে তিনি কিছুদিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহপাঠীর মধ্যে অনেকেই বঙ্গের কৃতী সন্তান এবং বিদ্যা ও যশের ভাগী হইয়াছেন।

১৮৭৯ অব্দে মেঘনাথ বাবু হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের গণিত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার শিক্ষা-কৌশল ও কার্য্যদক্ষতায় কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছিলেন, ছাত্রগণও তাঁহার অমিয় ও সদয় ব্যবহারে এবং অধ্যাপনার সুপ্রণালীতে তদ্রূপ উপকৃত, ভক্তিযুক্ত ও অনুরক্ত হইয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব বাবু, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৩ অব্দে মেঘনাথ বাবু মহারাজা জয়পুর কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে বৃত হইয়া রাজস্থান-প্রবাসী হন। এখানে তাঁহাকে উভয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে এবং কখন বা ইতিহাসেও শিক্ষা দিতে হইত। ১৮৮৭ অব্দে যখন দুই বিভাগের কার্য্যই তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় তখন হইতে তাঁহাকে অত্যধিক শ্রম করিতে হইয়াছিল। ১৮৯২ অব্দের দৈনিক কার্য্য-তালিকায় দৃষ্ট হয় তিনি ৫½ ঘণ্টার মধ্যে ৭টী শ্রেণীর ছাত্রকে বিবিধ দুরূহ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, যথা,—

1st hour	Mathematics	3rd & 4th year classes.
2nd ,,	Do.	2nd year class.
3rd ,,	Physics & Chemistry.	1st & 2nd year classes.
4th ,,	Mathematics	1st year class.
5th ,,	Do.	Entrance Class.

আবার ১৯০০ অব্দের কার্য্য তালিকায় প্রকাশ তিনি ৫½ ঘণ্টায় কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষার্থী ৯টী শ্রেণীর ছাত্রকে গণিত, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান (mechanics) এবং ইতিহাসে শিক্ষাদান করিতেন, যথা,—

1st hour	Mathematics	2nd year Class,	C. U.
2nd ,,	Additional Do.	1st ,,	A. U.
3rd ,,	Physics	1st & 2nd ,,	C. U.
4th ,,	History and Chemistry	1st & 2nd ,,	C. U.
5th ,,	Mechanics Mathematics	1st year Class, B. A. Class,	A. U. C. U.

এই গুরুভারাক্রান্ত দীর্ঘ তালিকা সত্ত্বেও তাঁহার অধ্যাপিত

বিষয়গুলিতে ছাত্রগণের পরীক্ষায় আশাতিরিক্ত কৃতকার্য্যতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাৎসরিক পরীক্ষাফলের তালিকা হইতে দেখা যায়, যে দিন হইতে তিনি এই কলেজে পদার্পণ করিয়াছেন তদবধি তাঁহার অধ্যাপিত বিষয়ে প্রেরিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রায়ই একাধিক ছাত্রকে অকৃতকার্য্য হইতে হয় নাই ইহা তাঁহার আন্তরিকতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, গভীর পাণ্ডিত্য, শ্রমশীলতা, শিক্ষাদান কৌশল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। এই বহুবর্ষব্যাপী অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্যে যখন দেখি তিনি স্থানীয় শিক্ষাবিভাগের টেক্সটবুক কমিটির সভ্য ও কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হইয়া শিক্ষাপ্রণালীর বিবিধ উন্নতির সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, যখন দেখি, তিনি কখন ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তকের হিন্দী অনুবাদ, কখন পাটীগণিতের হিন্দী ও উর্দ্দু অনুবাদে ব্যাপৃত আছেন, এবং এ সকল সত্ত্বেও সময়ে সময়ে বাঙ্গালা সাময়িক ও সংবাদ পত্রে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া সুদূর প্রবাসেও মাতৃভাষার অনুশীলনে যুবার উদ্যম প্রদর্শন করিতেছেন, তখন প্রকৃতই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির প্রতি প্রশংসাপূর্ণ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া থাকি—অবাক্ হইয়া যাই।

অধ্যয়নাবস্থাতেই মেঘনাথ বাবুর বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে; এবং বঙ্কিম, ভূদেব, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সাহিত্যরথিগণের সহিত বন্ধুত্ব হয়। জয়পুর কলেজে অবস্থান কালে বঙ্গবিশ্রুত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত ইহাঁর হৃদ্যতা জন্মে। চন্দ্রনাথ বাবু ১৮৭৮-৯ অব্দে জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জয়পুরের জল বায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় তিনি অল্পদিনেই এই কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। মেঘনাথ বাবুর আকৈশোর এইরূপ মাতৃসাহিত্যসেবীদিগের সহিত বন্ধুত্বই তাঁহার গুরুভারাক্রান্ত নিত্যকর্ম্মের অনবকাশের মধ্যেও মাতৃভাষা ও সাহিত্যানুশীলনের অন্যতম কারণ। তিনি ভূদেব বাবুর উৎসাহে এডুকেশন গেজেটে মিশর, পারস্য, গ্রীক, মীডিয়া প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। জয়পুরে আসিবার পর তিনি স্থানীয় অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে গভীর গবেষণা পূর্ণ কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য* শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির ন্যায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) তাঁহার বিশেষ অনুশীলন ও আদরের সামগ্রী ছিল। শব্দ সমালোচন নামে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত পারস্য ও আরবী শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ তিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন। আশা করি তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণ সেগুলি পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের হিতসাধন করিবেন। মেঘনাথ বাবু "Sastri's Beginner's History of India" পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ, "ভারত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক হিন্দী পুস্তক এবং "গণিতকা প্রথম পুস্তক" (হিন্দী ও উর্দ্দু) ব্যতীত কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে "আর্য্যনারী গাথা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভারতীয় বীরনারীদিগের উদ্দীপনাপূর্ণ কাব্যময় ইতিহাস। এই পুস্তক তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে কতদূর আদর পাইয়াছিল, ১৮৮৮ অব্দের Calcutta Review পত্রের সমালোচনা পাঠে তাহা জানা যায়।

মেঘনাথবাবু কি গৃহে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই সমাদৃত ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাহার সহিত আলাপ করিয়া কেহই অপ্রীত ও অপ্রফুল্ল হইয়া ফিরিতেন না। জীবনে তাঁহার শত্রু ছিল বলিয়া শুনা যায় না। স্বদেশীয় ব্যতীত পঞ্জাব ও অযোধ্যাবাসী প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সুখী হইতেন। তাঁহার সুরুচিসঙ্গত সরস বাক্যালাপ সকলের কর্ণে মধুবর্ষণ ও হৃদয়ে আনন্দদান করিত। অত্যন্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন তিনি অবসর লইয়া দেশে গমন করেন। সেই সময় জয়পুর

* পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার এক বৎসরাধিক পূর্ব্বে মেঘনাথ বাবু বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্যের জীবনী ও প্রতিকৃতি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য আমায় পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় দেশীয় রাজ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র কাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা প্রবাসীতে যথাসময়ে প্রকাশ করা হয় নাই।

কলেজের ভূতপূর্ব্ব (এখন যাহারা কৃতী হইয়াছেন) ও বর্ত্তমান ছাত্রমণ্ডলী সমবেত হইয়া তাঁহাকে যে সুদীর্ঘ বিদায় অভিনন্দন পত্রে হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় রাজপুত জাতি তাঁহাকে কি চক্ষে দেখিতেন। সে দীর্ঘ পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিবার স্থান এখানে নাই, কিন্তু তাহা হইতে সুদূর প্রবাসে তাঁহার কর্ম্মজীবনের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া উক্ত পত্রের কতিপয় স্থলমাত্র উদ্ধৃত হইল :

Your connection with the Maharaja's College dates as far back as 1883 A. D. In this Institution, with the whole-hearted devotion of a conscientious young man, you put your energy and soul into the noble work of Education. Your vast erudition, deep knowledge, indefatigable energy, genuine sympathy and high moral principles have left an indelible mark upon our hearts and lives. When we look back on the life we have passed together and recall the memory—of course a very strong one—of your long and devoted services in the cause of education, of your delightful and valuable lectures, of your kind behaviour and of your amiable disposition, we feel ourselves strongly inclined to make a public declaration of the feelings that surge up in our bosom on this memorable occasion.

It would be idle to attempt to recapitulate the long and faithful services you have rendered to our august master, the Maharaja Sahib, as Professor of Mathematics to the celebrated Institution, happily styled after him,—the Maharaja's College. Your services have covered an extensive space of 28 years, and have been of the most ardent and zealous type imaginable. We reflect with pride and intense satisfaction on the numerous occasions on which your students adequately trained for the Examinations of the Indian Universities, have won, both for themselves and for you, distinction, glory and renown at the various examinations held from time to time.

Nor can we ever forget the humour, the sprightliness, and the grace, that has ever attended on your class-room lecture. Sir, there are only a few who know how to introduce an element of charm into a lecture that would otherwise be tedious, dull and disgusting. You are among those blessed few, for your humorous nature has always made the subject dealt with, fascinating and charming, and has thus chained the attention of your pupils to it. Of all those that presume to mould the youthful mind and impart sound education in the higher departments of Learning, your claim, we think, to honour and distinction in this splendid qualification stands highest. Besides a dazzling success in the University Examinations and the credit your students have got with the University,—an evident proof of your indefatigable exertions and high-class teaching-skill—most of them have turned out honest enthusiastic workers, and loyal and devoted servants to the state.* * * *

Perhaps it is a source of delight to you, Sir, that most of your pupils are, at the present day, occupying posts of distinction, honour and responsibility in the state, and are discharging their duties with loyalty and zeal to His Highness, the Maharaja Sahib, from whom so many bounties and favours are flowing. The Maharaja's College owes to you a 'debt immense of endless gratitude.' A good name, it has been said, is better than wealth, and the pyramid of legitimate fame set up by you during a course of time extending over 28 long years can never, we think, by any conceivable agency, be shaken up.

* * * * * * * * * you have realised the ancient ideal of a Guru in more ways than one, and many are the eyes that are moistened, and many are the hearts that are swelling at the thought of the coming separation from you. * * * * * *

ইহার ভাবার্থ এই—

'মহারাজার কালেজের সহিত ১৮৮৩ সাল হইতে আপনার সম্পর্ক। এই বিদ্যালয়ে আপনি আপনার সকল শক্তি ও পাণ্ডিত্য, সহানুভূতি, অমায়িক ব্যবহার ও নৈতিক চারিত্র দ্বারা সেবা করিয়াছেন। আপনার পাঠনা রসিকতায় সরস, জ্ঞানে জীবন্ত, পাণ্ডিত্যে প্রগাঢ়। আপনার ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সম্মানিত হইয়া আপনার নিকটই চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইতেছে। আপনাকে দেখিলে প্রাচীন গুরুমূর্ত্তি স্মরণ হয়। আপনি অর্থ অপেক্ষা সুনাম শ্রেষ্ঠ ধন মনে করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। আজ বিদায়ের দিনে আমাদের হৃদয় ভাবাবেগে পূর্ণ ও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিতেছে।"

মেঘনাথ বাবুর অভাবে জয়পুরের শিক্ষাবিভাগ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং রাজপুত যুবকগণ যে একজন সদ্‌-গুরু হারাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি দুইবৎসর প্রাণঘাতী ব্রাইটস্ রোগে কষ্ট পাইয়া বিগত শীতের সময় ৬ মাসের ছুটী লইয়া দেশে যান এবং রাজপুতানার দারুণ শীত হইতে রক্ষা পান। কিন্তু গত ২৯ জানুয়ারি ভাটপাড়ার বাড়ীতে অবস্থিতিকালে, হঠাৎ হৃদরোগের আক্রমণে ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি আপনার ন্যায়ই মেধাবী,

সুশিক্ষিত ও সংস্বভাব তিনপুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া পরিবারবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। বঙ্গের এই সুসন্তান শিক্ষা ও সাহিত্য-জগতের অকপট ও নীরব কর্ম্মী ছিলেন। আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা তাঁহাতে আদৌ ছিল না বলিয়াই আজ দেশের অনেকেই তাঁহাকে জানেন না কিন্তু প্রবাসে তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রাণপাতী কীর্ত্তির জন্য রাজা, প্রজা, ছাত্র ও বন্ধুগণের প্রীতি, ভক্তি, ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সুখস্মৃতি রাজস্থানের মরুভূমিকে চিরসরস করিয়া রাখিবে এবং সেই দূরদেশে বাঙ্গালীর নাম চির গৌরবান্বিত হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বিক্রমপুরের বিখ্যাত 'বাউলিয়া' বৃক্ষ

বিক্রমপুরের অন্তর্গত হলদিয়া একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণ সীমান্তবর্ত্তী একটী 'হিজল' বৃক্ষ দর্শক মাত্রেরই হৃদয়ে বিস্ময়োদ্রেক করে। এই বৃক্ষটি অতীব প্রাচীন। সাধারণের নিকট ইহা 'বাউলিয়া' বৃক্ষ নামে পরিচিত। আড়াইশত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন কাগজ পত্রে ও হাতচিঠায় এ বৃক্ষটি 'কুন্তলী' বৃক্ষ নামে আখ্যাত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় এক 'কানি' জমি যুড়িয়া এই বিরাট তরুসম্রাট আপনার বিস্তৃত দেহখানি লইয়া বিজমান আছেন! এই বৃক্ষের সহিত নানা বিবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত। ইহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে এই বৃক্ষের নীচে 'বাউল' সম্প্রদায় ভুক্ত একজন সাধু বাস করিতেন তাঁহার নাম হইতেই ইহা 'বাউলিয়া' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই বৃহৎ বৃক্ষের দ্বাদশটী শাখা চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ ইহার 'বারলিয়া' হইতে 'বাউলিয়া' নামোৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করেন। আমাদের মতে পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তটিকেই অধিকতর সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রত্যেকটী শাখাই ভিতরে ফাঁপা। কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বর্ষার জলাগম না হয় সে পর্য্যন্ত ইহার শাখাগুলি মাটির সহিত মিশিয়া যায়, আর বর্ষার সময়ে শাখাগুলি জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই ভাসিয়া ওঠে—সে সময়ে এ স্থানে প্রায় ৭।৮ হাত জল হয়। কেন এরূপ হয় এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে

বিক্রমপুরের বিখ্যাত বাউলিয়া বৃক্ষ।

পারেন নাই। কয়েক বৎসর যাবত প্রাকৃতিক বিপ্লবে এই গাছটি চিরিয়া দুই ভাগ হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। তবুও বৃক্ষটি পূর্ব্ববৎ সজীবই রহিয়াছে। বৃক্ষটির মূলদেশে 'কানের' ন্যায় দু'টা ক্ষুদ্রাকৃতি ছিদ্র দৃষ্ট হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বৃক্ষটিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত দেখিয়া থাকেন এবং উভয় জাতিই দেবতা জ্ঞানে ইহাতে তৈলসিন্দূর বিলেপন ও দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকেন। উন্মুক্ত মাঠের মাঝখানে এই বৃহদাকৃতি বৃক্ষটির অবস্থান অতি সহজেই অজ্ঞাত পথিককে ইহার সমীপে আহ্বান করে। 'হিজল' জাতীয় বৃক্ষ কোথাও এত বড় হইতে দেখা যায় না – সেজন্যই সর্ব্বাপেক্ষা ইহার বিশেষত্ব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সঙ্গিনী*

(গল্প)

আমাদের বাড়ীর পাশে মুনসেফ প্রকাশ বাবুর বাড়ী। তাঁহার মেয়ে কনকলতার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। সারাদিন দুইজনে এক জায়গায় খেলা করিতাম। হঠাৎ একদিন প্রকাশ বাবু বদলি হইয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। কনককে অনেক করিয়া চিঠি লিখিতে বলিয়া দিলাম, সেও আমাকে সেই কথা বলিল। সন্ধ্যার পর দুইজনের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল; মনটা ভারি খারাপ হইল। কিছুদিন কোন কাজে মন লাগিত না। কনকের জন্য কিছুতেই আর তেমন খেলায় আমোদ ছিল না। কিছুদিন আমাদের পত্র লেখালেখিও চলিল। তারপর কনক পত্রলেখা বন্ধ করিল। আমি দুইচারিখানা পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না। তখন আমিও লেখা বন্ধ করিলাম। কতদিন কত মাস কত বৎসর এমন কাটিয়া গেল। আমিও কনকের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলাম।

(২)

আমার মামার বিবাহের জন্য মামার বাড়ী গিয়াছি। মামা বিবাহ করিতে গেলেন, আমরা সব সমবয়সীতে জুটিয়া মতলব আঁটিতে লাগিলাম নূতন মামী আসিলে কে কি বলিয়া প্রথম আলাপ করিব—কিছুতেই আর ঠিক হয় না! অনেক রাত হইয়া গেল আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সব চুলবাঁধিয়া গা ধুইয়া খাবার খাইয়া ভালো কাপড় চোপড়ে সাজিয়া গুজিয়া নূতন মামী আসিবে বলিয়া রাস্তার দিকের বারান্দায় শাঁক হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। দোরে জুড়ি আসিয়া লাগিল। একটি সুন্দর টুকটুকে মেয়ের সঙ্গে মামা নামিলেন। ঐ মামী এসেছে বলিয়া শাঁক বাজাইতে বাজাইতে তাড়াতাড়ি আমরা নীচে নামিয়া গেলাম। বরণ টরণ হইয়া গেলে ঘোমটা খুলিয়া দেখি নূতন মামী আমারি শৈশবসঙ্গিনী কনকলতা!

শ্রীবেলা দেবী।

* এই গল্পটি একটি দশ বৎসরের বালিকার লেখা।—প্রবাসী সম্পাদক।

মেঘ

১

আমি মহাবীর গরজি গভীর
আসিতেছি রোষ ভরে,
ঘন বিদ্যুৎ খর তরবারি
চমকে আমার করে।

২

করো না কো ভয়; আমি সদাশয়
রক্ষা করিব সৃষ্টি,
তরল বিশিখে বিদ্ধ করিব
ঘোর রিপু অনাবৃষ্টি।

৩

তটিনীনিচয় জননী আমার
জনক আমার সিন্ধু,
স্নিগ্ধ করিব দগ্ধ বিশ্ব
বরষি করুণাবিন্দু।

৪

ফুটাইব ফুল বিবিধ মুকুল,
শস্য করিব পুষ্ট;
প্রহরণ ঘোর অশনিতে মোর
মরিবে যাহারা দুষ্ট।

৫

আমার বিজয় বৈজয়ন্তী—
উড়ায়ে ইন্দ্রধনু,
আমার জনক- জননী গভে
মিশে হব আমি অণু।

৬

চলে যাব আমি, বিমল আসারে
বিকশিত করি বিশ্ব,
আবার আসিব বরষেক পরে
ধরি সেই ঘোর দৃশ্য।

শ্রীরঘুনাথ স্থকুল।

খণ্ডগিরির যৎকিঞ্চিৎ

অগ্রহায়ণের শিশিরসিক্ত রাত্রিশেষে ভুবনেশ্বরের রাজপথে আমাদের গো-যান দুইখানি দ্রুতবেগে চলিতেছিল। তখনও মন্দিরের দেউড়ি খোলা হয় নাই এবং পথের দুই দিকে চালা ঘরগুলির দুয়ার বন্ধ; সবে মাত্র পূর্ব্বাকাশে উষার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

গাড়ী ভুবনেশ্বর ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল; সম্মুখেই জগন্নাথের রাস্তা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, কি অসীম আগ্রহভরে ভগবানের দর্শনলালসায় সেই পথে যাতায়াত করিতেন! মনশ্চক্ষে তাঁহাদের শ্রমণশীল ক্লান্তমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, পাটলবর্ণের ধূলায় তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুভব করিলাম। যুগযুগান্তের পুণ্যস্মৃতিময় এই পথের ধারে ধারে এখন লোহার রেল বসিয়াছে। রেলের উপর পুরীর যাত্রী এখন ঝড়ের বেগে যায়, পুনরায় ঝড়ের বেগে নির্ব্বিঘ্নে ঘরে ফিরিয়া আসে; পথের ধূলায় তীর্থযাত্রাকাহিনীর অবশেষ আর কিছুই পড়িয়া থাকিতে পায় না!

গাড়োয়ান গাইতে গাইতে চলিল, "যমুনা জলত যাব দূতী সঙ্গ করি'।" প্রেমের যে অমৃতধারা স্মরণাতীত কালে বৃন্দাবনের তমালকুঞ্জ নিষিক্ত করিয়া দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, উৎকলের বালুকারাশির মধ্যেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই! দুই দিকে ছোট বড় শিলাস্তূপ অনেক, কঙ্করময় মাঠের মধ্যে নানাজাতীয় বৃক্ষ নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছিল। বিপরীত দিক্ হইতে পাথরে বোঝাই দুই-একখানি গোরুর গাড়ী আসিতেছিল। প্রভাত-বায়ু শীতল, কিন্তু তাহাতে শীতের তীব্রতা ছিল না। একখানি শীতবস্ত্র গায়ের উপর টানিয়া দিয়া অদ্ধশয়ান ভাবে দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

ক্রমে খণ্ডগিরি দৃষ্টিগোচর হইল। দুই দিকে পাহাড়, মাঝখানে রাস্তা। দ্বিখণ্ডিত বলিয়াই কি নাম খণ্ডগিরি? বামের পাহাড়ের শিখরদেশে ক্ষুদ্র মন্দিরটি উদ্ভিজ্জরাশির মধ্যে নীরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটি ছোট চূনকাম করা ডাকবাংলা ছাড়াইয়া গাড়ী পাহাড়ের পাদমূলে দাঁড়াইল। আমরা নামিয়া পড়িলাম এবং গা মোড়া দিয়া গোযান বিধ্বস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্কার করিয়া লইলাম।

গাড়োয়ান "অপর্ত্তি দোলাই" বলিয়া হাঁক দিতেই গুহার অধিপতির বৃদ্ধ চৌকিদার আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, সে কথা আর ব্যক্ত করিতে হইল না; চৌকিদার আগে আগে চলিল, সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার অনুসরণ করিলাম।

দক্ষিণের পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। এ অংশের নাম উদয়গিরি। সম্মুখেই একখানি কুটীরে একটি সাধু যথেষ্ট পরিমাণে খড়ম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি দেখাইয়া তিনি পয়সা চাহিলেন। এ কাষ্ঠপাদুকাসমূহ নাকি "মহাত্মাদের" ছিল, এখন অধিকারী নাই, দর্শকগণকে পাদুকামাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া ইঁহারা উত্তরাধিকারীর উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেয়। সাধুর সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক দেখিলাম, তিনি বোধ হয় সাধ্বী।

"বাঘ গুম্ফা"য় আসিলাম। একটি প্রকাণ্ড বাঘের মুখ হাঁ করিয়া আছে। জীয়ন্ত বাঘের মুখ হইতে কখনও অক্ষত শরীরে ফিরিবার ভরসা রাখি না, তাই মনের সাধে শার্দ্দূলের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ কাটাইলাম। তেজস্বী কোন বাঘ যদি এ ব্যাপার জানিতে পারিত, নকলগড় রক্ষায় বদ্ধপরিকর কুম্ভের মত নিশ্চয় সে আমাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিত!

ইহার পর ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকগুলি গুহা দেখিলাম। চৌকিদার প্রত্যেকটির নাম ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত

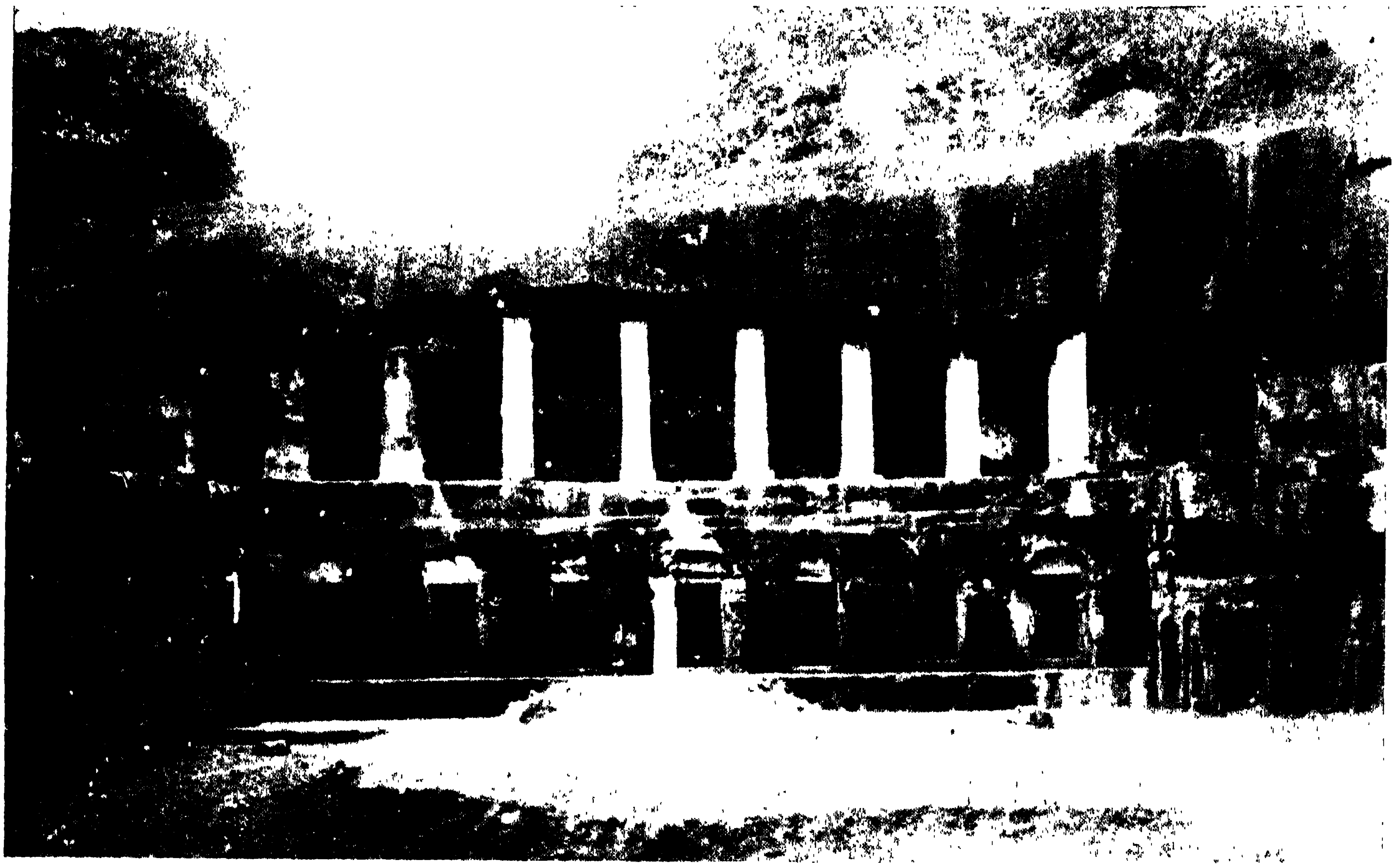

রাণীগুম্ফা—উদয়গিরি।

করিল। সে ইতিহাস অতি সরল, প্রচলিত কোন পুরাবৃত্তের মত নাম ধাম এবং সাল তারিখে কণ্টকিত নহে। যেমন—"হস্তিগুম্ফা"য় রাজার হাতী থাকিত, "রাণীহংসপুরে" রাণীরা বাস করিতেন, ইত্যাদি।

হস্তিগুম্ফার সম্মুখে দুইটি দ্বিরদমূর্ত্তি খোদিত। শুনিলাম, ভিতরে একজন ধ্যানমগ্ন যোগী আছেন। বাঘের কবলে একজন সন্ন্যাসীর প্রাণবিয়োগ ঘটার পর গুহার ভিতর তপশ্চর্য্যা রহিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই যোগী নাকি বিশেষভাবে পুরীর রাজপুরুষদিগের অনুমতি পাইয়াছিলেন। আমরা সঙ্কীর্ণ পথে প্রায় হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। যোগীর দেহ নিস্পন্দ, নেত্র পলকহীন। আমরা প্রণাম করিলে তিনি আমাদের মাথায় হাত দিয়া আমাদিগকে নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একটি গুহা দ্বিতল, ছাদের কোন অবলম্বন নাই। আমরা সেটার উপর উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কিন্তু বৃদ্ধ চৌকিদার নির্ভয়ে সেখানে উঠিয়া আমাদের শঙ্কা দূর করিয়া দিল। গুহার ভিত্তিগাত্রে কতকগুলি পুতুল,—উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন; সেগুলির বিন্যাসভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় একটি আখ্যায়িকার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। যদি কোন যাদুকর পাষাণে ভাষা দিতে পারিত, তবে না জানি কোন্ বিস্মৃত যুগের কাহিনী গিরিকন্দরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

একটি গুহার বাহিরে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রকৃতির ধ্বংসক্রিয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার সম্মুখে গাড়ীবারাণ্ডার মত থামওয়ালা ছাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন গঠনপ্রণালীর অনুকরণ হইলেও এ অংশ কোন্ যুগের প্রক্ষিপ্ত তাহা স্থির করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

গুহা হইতে গুহান্তরে যাইবার জন্য কোথাও কোথাও সোপানশ্রেণী আছে। আমরা কখনও সিঁড়ি দিয়া, কখনও সিঁড়ির অভাবে উল্লম্ফনাদির সাহায্যে উদয়গিরি হইতে নামিয়া আসিলাম। এইবারে খণ্ডগিরিতে উঠিতে হইবে। উদয়গিরির মত খণ্ডগিরি আরোহণ তাদৃশ সুখসাধ্য নহে,—পাহাড় প্রায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দূর উঠিয়া

একটা গুহা পাওয়া গেল ; এখানে যেসব মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, সম্ভবতঃ সেগুলি বৌদ্ধ যুগের। উদয়গিরিতে এরূপ ধর্ম্মমূলক ভাস্কর শিল্পের পরিচয় নাই। বোধ হয় খণ্ডগিরি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

গিরিচূড়ার কাছাকাছি একটা কূপ আছে ; জল অপরিষ্কার এবং সবুজবর্ণ দেখাইতেছিল। চৌকিদারের নির্দ্দেশক্রমে তীর্থযাত্রীর প্রথামত অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া মাথায় দেওয়া গেল। ক্রমাগত চড়াই উৎরাই করিয়া সকলেই কিছু পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, বিশেষতঃ বৃদ্ধ চৌকিদার আর নড়িতে পারিতেছিল না। শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। প্রসঙ্গক্রমে অপর্ত্তি দোলাই নিজের কথা পাড়িল। খণ্ডগিরির পরিদর্শকরূপে কিছু নিষ্কর জমি সে ভোগ করে, অধিকন্তু লোকে গুহা দেখিতে আসিয়া তাহাকে কিছু কিছু পারিতোষিক দিয়া থাকে। ইহাতেই তাহার বেশ দিন গুজরান হইতেছে। জীবন-পথের সঙ্গিনীটি তাহাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই, কারণ ছেলেরা সকলেই "লায়েক"। সে ভবের হাটে কেনা বেচা শেষ করিয়া খেয়ার আশায় ঘাটে বসিয়া আছে।

খণ্ডগিরির শিখরদেশে অনতিনিবিড় অরণ্য, শুনিলাম সেখানে সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে বাঘ বাহির হয়। অজ্ঞাত-কুলশীল একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া কয়েকজনে লাঠি তৈয়ারি করিয়া লইলাম। বাঘ সত্যই সম্মুখীন হইলে যষ্টি-প্রহারে পঞ্চত্ব পাইবে, এমন ভরসা অবশ্য করি নাই ; তবে দূর হইতে লাঠির গন্ধেও ত পলায়ন করিতে পারে। দ্রব্যগুণের কথা ত বলা যায় না !

এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকটা ফলবান আমলকী গাছ দেখিতে পাইলাম। লাঠির চোটে বাঘ মরিল না, কিন্তু আমলকী ঝরিল বিস্তর ! বহু পুরাতন গিরিশৃঙ্গে যে ফল জন্মিয়াছে তাহার আস্বাদে প্রত্নতত্ত্বের বিশেষত্ব থাকিতে পারে, এইরূপ একটু আশা ছিল, কিন্তু কয়েকটা আমলকী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল সেগুলির আস্বাদন নিতান্ত আধুনিক রকমের,—অম্ল কষায় রসে মুখ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

শিখরদেশে মন্দির। ভিতরে দেবতার মূর্ত্তি আছে, কিন্তু পূজার্চ্চনার নিদর্শন কিছু পাইলাম না। উদয়গিরির সেই থড়মওয়ালা বাবাজী আবার এখানে আসিয়া হাত পাতিলেন। বাবাজীর সহিত এই মন্দিরের কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কোন কিছু নির্ণয় করিতে না পারিলেও কিছু দিতে হইল।

গিরিশিখর হইতে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, সুবিস্তীর্ণ মাঠের সুদূরপ্রান্তে ভুবনেশ্বরের বিশাল মন্দিরচূড়ায় প্রভাত বায়ুহিল্লোলে রক্তপতাকা উড়িতেছে। মনে মনে কহিলাম, হে গিরি, হে মন্দির, যুগযুগান্তর হইতে তোমরা উভয়ে উভয়ের সাক্ষী। এমনি করিয়া চিরদিন দু'জনে দু'জনকে নয়নে নয়নে রাখিও।

নীচে নামিয়া আসিয়া অপর্ত্তি দোলাই বালীর কাগজের একখানি বৃহৎ খাতা বাহির করিল। তাহাতে দর্শকেরা নিজ নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গদ্যে, পদ্যে, মিত্রাক্ষরে, অমিত্রাক্ষরে কত ভাবের উচ্ছ্বাস ! সে খাতাখানি ব্রিটিশ মিউজিয়মে না হউক, অন্ততঃ কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হওয়ার যোগ্য। অপর্ত্তি ছাড়িল না, আমরা "ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর" গোছের কয়েক পংক্তি লিখিয়া দিলাম। এইবার চৌকি-দারের দক্ষিণার পালা। ভূমিকা স্বরূপ অপর্ত্তি দোলাই খণ্ডগিরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বলিল, "যে যায় খণ্ডগিরি, সে খায় খণ্ডখিরি।" খণ্ডখিরি সামগ্রীটি কি জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল ; শুনিলাম ইহা একরূপ পায়স মাত্র। বিদ্যাদিগ্গজের "আতপ চাউল ঘৃতের পাক" মনে পড়িয়া গেল। অধিকন্তু অপর্ত্তি বলিল, খণ্ডগিরি দর্শনের ফলস্বরূপ বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণে এ পায়স খাইতে পাওয়া যায় না, নিজে দুগ্ধ তণ্ডুলাদি কিনিয়া খণ্ডগিরিতে আসিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় ! অপর্ত্তির হাতে রজত মুদ্রা গুঁজিয়া দিলাম ; সে লাঠিগাছটি মাথার উপর ঘুরাইয়া নৃত্য করিতে করিতে উচ্চধ্বনি করিতে লাগিল, "আনন্দ কর, আনন্দ কর, হরি বল, হরি বল !"

আমাদের গাড়ী ভুবনেশ্বরের দিকে ফিরিল। বিটপি-শ্রেণীর অন্তরালে খণ্ডগিরির শ্যামল কান্তি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে লাগিল। গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, যষ্টিহস্তে অপর্ত্তি দোলাই গিরিমূলে দাঁড়াইয়া

আছে ; বয়সের ভারে তাহার শীর্ণ দেহখানি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, অস্থিমাংসাবরণ কঙ্কালকে আর যেন ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অতীতের সমাধি খণ্ডগিরি—তাহার বিচিত্র প্রহরী ক্ষণকাল মধ্যেই আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে মুছিয়া গেল।

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, এম-এ।

প্রতীক্ষা

(গল্প)

বৈকালে সমস্ত কর্ম্ম সারিয়া বাগানে ফুল তুলিতেছিলাম। গোলাপ, বেল ও চামেলি লইয়া মালা গাঁথিয়া ঘরের জানালায় টাঙ্গাইয়া রাখিলাম। সৌরভে ঘর ভরিয়া গেল। দক্ষিণের জানালার নিকট আমাদের ফুলের বাগান, খোলা জানালা দিয়া পুষ্প সৌরভ আসিতে লাগিল। বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া যখন বসিলাম তখন দিনের শেষ, সন্ধ্যার ম্লান আলোয় আকাশ ছাইয়াছে। আমাদের বাড়ির সম্মুখে খোলা বিস্তৃত মাঠ। আমি সেই দিকে এক মনে চাহিয়া আছি আর প্রতীক্ষা করিতেছি তাঁহার। আর একটু পরে তিনি আসিবেন বলিয়া প্রাণে আনন্দ হইতেছে কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে বিষাদ পূর্ণ হইয়া ছিল। পূর্ব্বে তিনি প্রত্যহ আমাদের বাড়িতে আসিতেন। কয়েক দিন হইতে দেখিতেছি তিনি আগেকার মত রোজ আর আসেন না, আসিলেও বেশিক্ষণ থাকেন না। কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলেন যে "ভাল একটা কাজের সন্ধানে ফিরিতেছি তাই সারাদিন ব্যস্ত ! আমার অপরাধ লইও না, ক্ষমা কর।" এমন মিনতির স্বরে এমন চলছল নয়নে চাহিয়া তিনি এই কথাগুলি সে দিন বলিলেন যে, আমি তাঁর প্রতি বৃথা সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া মরমে মরিয়া গেলাম, অনুতাপে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তারপরে কয়েক দিন তিনি আর আসেন নাই। হঠাৎ কাল এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে তাঁর সহিত দেখা। তিনি আমাকে দেখিয়া একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি আমার নিকটে আসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, এ কয়দিন কাজের ভিড়ে যাইতে পারি নাই। আমি হংকং-এ একটি কর্ম্ম পাইয়াছি। বেতন ৫০০৲ টাকা, সেখানে তিন বৎসর থাকিতে হইবে। আগামী পরশ্ব শেষ রাত্রে জাহাজে উঠিব। কাল সন্ধ্যাকালে তোমার সহিত দেখা করিতে যাইব। এত শীঘ্র এই কাজটি পাইলাম যে তোমাকে ইহার পূর্ব্বে এ বিষয় একটু জানাইবারও সময় পাই নাই। যাহা হউক, কাল সন্ধ্যা বেলায় তোমার নিকট গিয়া সব বলিব।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি একটিও কথা বলিতে পারিলাম না ; নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া শুধু তাঁর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কথা বলিতে গিয়া স্বর বন্ধ হইয়া গেল। এত শীঘ্র, এমন হঠাৎ তিনি চলিয়া যাইবেন তাহা ত ভাবিতেই পারি নাই। এত দিনের বন্ধুকে এমন করিয়া বিদায় দিতে হইবে! অব্যক্ত যাতনায় ও অজানিত আশঙ্কায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

বন্ধু গৃহের সে আমোদ উল্লাসের মধ্যে আর থাকিতে পারিলাম না, তাঁর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম। আজ সারাদিন তাঁহারই প্রতীক্ষায় আছি ; কখন সন্ধ্যা হইবে, কখন তিনি আসিবেন। তিনি যাহা খাইতে ভাল বাসেন তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া, তিনি যে ফুল ভালবাসেন তাহাতে গৃহ সাজাইয়া, তিনি যে রঙের পোষাকে আমায় দেখিতে ভালবাসেন তাহা পরিধান করিয়া তাঁহারই অপেক্ষায় আছি। আজ স্থির করিয়াছি বিচ্ছেদের প্রাক্কালে তাঁহাকে সুমধুর কথায় তুষ্ট করিব। এই কয় মাস হইতে তিনি আমার প্রতি যে অবহেলা দেখাইতেছেন, যে জন্য তাঁর প্রতি কত অভিমান করিয়াছি, কতদিন ভাল করিয়া কথা বলি নাই, কতদিন নির্ম্মম ভাবে তাঁকে ফিরাইয়া দিয়াছি, আজ তার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিব। আজ আর কোন কথা নয়, আজ কেবল মিষ্ট কথা, কেবল সহানুভূতি ও সান্ত্বনা, কেবল আশার কথা। আজ আমার প্রাণের বেদনা তাঁকে আর জানাইব না, আজ আমার দুঃখে তাঁকে দুঃখিত করিব না। আজ শুধু তাঁর উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁর বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয় আনন্দিত এবং আশান্বিত করিয়া তুলিব, যেন প্রবাসে তিনি আমার অশ্রু-সজল মুখ মনে না করিয়

হাসি মুখ মনে করেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তাহা বুঝিতেও পারি নাই। হঠাৎ বাগানের ফটক খোলার শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। ঐ তিনি বিদায় চাহিতে আসিতেছেন! আমাকে তবে বিস্মৃত হন নাই। অপূর্ব্ব পুলক-স্পন্দনে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁকে আগাইয়া লইয়া আসিব বলিয়া উদ্ধশ্বাসে বারাণ্ডা হইতে নামিলাম। কিন্তু কৈ তিনি? এ যে বাগানের মালি! সে বাজারে গিয়াছিল, দ্রব্যাদি লইয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। আমি লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে গেলাম। ঘরে গিয়া ঘড়িতে দেখি ৭॥০টা বাজিয়া গিয়াছে। ওঃ তিনি ৮টায় আসিবেন বলিয়াছিলেন বটে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭॥০টার সময় আমার ছোট ভাইবোনেরা আমার কাছে পড়িতে আসিত, কিন্তু কি জানি সেদিন আর আসিল না। একলা নিঃসঙ্গ বসিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল এই অসীম জগতে যেন আমি একলা! আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, প্রাণ বড়ই অশান্ত হইয়া উঠিল। তখন সেতারে সুর দিয়া গান ধরিলাম "হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে।" আটটা বাজিল। এখনি ত তিনি আসিবেন। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। মা যেখানে বসিয়া ভাই বোনদের সহিত গল্প করিতেছিলেন এবং ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতেছিলেন সেখানে গিয়া সেলাইর বাক্স হইতে আমার ছোট ভাইর জন্য যে মোজা সেলাই করিতেছিলাম তাহা তুলিয়া লইলাম। মা বলিলেন, "নীলিমা, আজ উহা নাই করিলে, কাল করিয়ো।" আমি লজ্জিত মুখে, নতনেত্রে বলিলাম, "না, মা, শুধু বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছে না, ততক্ষণ সেলাই করি।" মা আর কিছু বলিলেন না, শুধু গভীর স্নেহের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি সেলাই লইয়া আবার বসিবার ঘরে আসিলাম, তখন ৮॥০ টা। এখনও তিনি আসিলেন না। দেখিয়া দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু ভাবিলাম তিনি দীর্ঘপ্রবাসে যাইতেছেন, সমস্ত আবশ্যক জিনিষ পত্র কেনা, গোছগাছ করা প্রভৃতিতে দেরী হইয়া গিয়াছে। তাঁকে সাহায্য করিবার ত আর কেহ নাই, সব কাজই যে একলা তাঁকে করিতে হয়। কতক্ষণ সেলাই করিলাম বলিতে পারি না, হঠাৎ বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বারাণ্ডায় গেলাম, দেখি বাগানের শুষ্ক পাতার উপর দিয়া আমাদের কুকুরটা যাইতেছে। ভগ্নপ্রাণে ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম, সেলাই দূরে ফেলিয়া দিলাম। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা আমি বড় ভালবাসি। Excursion হইতে আমার প্রিয় কয়েক ছত্র বাহির করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য, এতদিন যাহা প্রাণকে মাধুর্য্যে ভরিয়া ফেলিত, আজ তাহা নিতান্ত নীরস বোধ হইতে লাগিল। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই কয়েক ছত্র হইতে অত সুধার আস্বাদন পাইতাম কি করিয়া! ৯॥০টা বাজিল, এক অব্যক্ত বেদনায় নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহখানি তখন একেবারে নীরব, ভাই বোনদের কলরব থামিয়া গিয়াছে। তবে কি তিনি আসিবেন না? অত আবেগের সহিত আমাকে যাহা বলিলেন, সবই কি তবে মিথ্যা? না, না, তিনি আসিবেন, আমাকে তিনি কি প্রতারণা করিতে পারেন? এ চিন্তাও যে অসহনীয়! নিশ্চয়ই কাজের ঝঞ্ঝাটে এত দেরী হইয়া গিয়াছে। তবে দুঃখ এই, এত দেরী করিয়া আসিবেন, বেশীক্ষণ তাঁকে কাছে রাখিতে পারিব না। সেই কোন অজানা, অচিন দেশে যাইবেন, আর দেখা হয় কি না!

বেদনা ভরা আকুলতা লইয়া পুনরায় বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলাম। বাহিরে চাহিয়া দেখি প্রকৃতি যেন চারিদিকে আকুল ক্রন্দন তুলিয়াছে, আকাশের চাঁদের আলোয় যেন একটা করুণ প্রবাহ বহিতেছে। বাতাসে কাতর মর্ম্মরধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে। ঐ না দূরে একটি লোক দেখা যায়! তাহার আকৃতি ত ঠিক তাঁরই মত, না! হাঁ, তিনিই ত! আমি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম, বক্ষের স্পন্দন বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল তিনি যেন ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হাঁ, ঠিক তিনিই ত, তাঁরই স্বর যে শুনিতে পাই। কিন্তু কই, না, তিনি ত আমার কাছে আসিলেন না! তবে কি তিনি একান্তই আসিবেন না? এতক্ষণে বুঝিলাম আমার সব আশা ফুরাইয়াছে। তথাপি উঠিতে পারিলাম না, সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। মর্ম্মন্তুদ যাতনা হৃদয় ভাঙ্গিয়া পিষিয়া দিতে লাগিল। এই ভাবে কতক্ষণ

ছিলাম জানিনা, হঠাৎ মার স্নেহ-কোমল, সুমধুর, ব্যথিত কণ্ঠস্বর কর্ণে বাজিল। তিনি বলিলেন, "নীলিমা, অনেক রাত হইয়াছে, শোও গিয়া।" তাইত, এখনও এখানে বসিয়া আছি? কিসের আশায়, সে কোন নিষ্ঠুরের জন্য? তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। দূরে গির্জ্জায় ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল। সপ্তমীর চন্দ্র কখন পশ্চিমে হেলিয়া ডুবিয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিক তখন অন্ধকার। আমি ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কি করিয়া যে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আমার ঘরে গেলাম বলিতে পারি না। মনে হইল যেন শূন্য দিয়া উপরে উঠিলাম। তখনও নিজের অবস্থা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় পাই নাই। ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যার নিকট নতজানু হইলাম। শয়নের পূর্ব্বে প্রত্যহ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাই তাঁকে ডাকিতে বসিলাম। কিন্তু কোন কথা মনে আসিল না, কিছুই উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। মনে হইল, প্রাণ ফাটিয়া এখনি বাহির হইয়া পড়িবে। মুদ্রিত নেত্রে যোড় করে শুধু বসিয়া রহিলাম। এতক্ষণ এক ফোঁটা জলও চোখে আসে নাই, এখন অবিরলধারে অশ্রু আসিয়া আমার চক্ষু প্লাবিত করিয়া দিল। তাইত, আমি অশ্রুজল ফেলিব না ত ফেলিবে কে? আমি যে জীবনের সর্ব্বস্বকে হারাইয়াছি! আমার প্রিয় যে আমাকে বিস্মৃত হইয়াছে! এতদিনের অবহেলা পাষাণের ন্যায় সহিয়াছি এবং তার নানা কারণ বাহির করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়াছি। কিন্তু আজিকার এই অবহেলা ত তুচ্ছ করিতে পারি না, কেননা আজ যে বিদায়ের দিন। বিদায়ের দিনেও কি তিনি একটু সময় করিয়া আসিতে পারিলেন না? না, তাঁর অতল বিস্মৃতিই আজিকার তাচ্ছিল্যের কারণ। এতদিন সহিয়াছি, আজ আর পারিলাম না। আজ তাই প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অশ্রুপ্রবাহ বাধা মানিতেছে না। জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত মাধুর্য্য লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রহিল তাঁর নিদারুণ স্মৃতি, কেবল শূন্য, কেবল হাহাকার! আমার নিকট জীবনের আর অস্তিত্ব নাই। উহা কেবলই শূন্য,—শূন্যময়। কাল হইতে জীবনের বাকি যে কয়টা দিন রহিল, তাহা কেবল বিরাট অসীম শূন্য। কাল হইতে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবার আমার আর কেহ রহিল না। মাথা নত করিয়া জীবন-বিধাতাকে প্রণাম করিলাম। বাহিরে বায়ু তখন হাহা করিয়া ফিরিতেছিল।*

রতন।

পতিব্রতা

প্রথম আখ্যান

সতী

হরিদ্বারে, যেখানে গঙ্গা হিমাচল হইতে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তাহার সম্মুখে কনখল প্রদেশ। প্রজাপতি দক্ষ এই কনখল প্রদেশের রাজা ছিলেন।

রাজা দক্ষের অতুল প্রতাপ। ঐশ্বর্য্যে এবং বীর্য্যে পৃথিবীতে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাহার উপর তিনি আবার মহাতপস্বী। তিনি যে কত যজ্ঞ, কত দান, এবং কত ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। সেই জন্য লোকে বলিত, "ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে রাজা দক্ষের সহিত কাহারও তুলনা হয় না।"

দক্ষের রাজধানী কনখল সৌন্দর্য্যে অমরাবতীকেও পরাজিত করিত। বহুসহস্র বৎসর অতীত হইলেও কনখলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এখনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইহার অদূরে গিরিরাজ, শিখরের পর শিখর তুলিয়া, স্থির মেঘমালার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। মধ্য দিয়া গঙ্গার স্রোত মহাকায় সর্পের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া তর তর বেগে নিম্নদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কনখলে গঙ্গার যে কি অপূর্ব্ব শোভা তাহা বর্ণন করিবার নয়। জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ; নদীতলস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। জল কোথাও পারদের ন্যায় শুভ্র, কোথাও মেঘের ন্যায় নীল, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আর্য্যঋষিগণ কেন গঙ্গার মহিমায় এত মুগ্ধ তাহা যিনি বুঝিতে চান, তাঁহাকে কনখলের ও হরিদ্বারের গঙ্গা দর্শন করিতে বলি।

গঙ্গার যে স্রোত কনখলের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত, তাহার নাম নীলধারা। রাজা দক্ষের মণিমুক্তা-মণ্ডিত

* ইংরাজী হইতে।

প্রাসাদ এই নীলধারার তটে অবস্থিত ছিল। নদীস্রোত বর্ষাকালে সেই প্রাসাদের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত এবং প্রাসাদবাসিগণ তাহার অবিরাম কুলুকুলু সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেন।

রাজা দক্ষের অনেকগুলি কন্যা ছিলেন। সরোবর যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মদলে এবং আকাশমণ্ডল যেমন জ্যোতির্ময় তারকাদামে সুশোভিত হয়, দক্ষরাজার ভবনও তেমনই রাজকুমারীদিগের অতুলরূপে শোভাময় হইত। কন্যাদিগের লোকবিমোহনরূপ দেখিয়া রাজমহিষীর আনন্দের সীমা ছিলনা।

রাজকন্যারা, প্রতিদিন, নীলধারায় স্নান করিতে আসিতেন। নদীর স্নিগ্ধসলিলে অবগাহন করিয়া সকলে জলক্রীড়া করিতেন; নদীর বালুকাময় পুলিনে ছুটাছুটি করিতেন এবং স্রোত হইতে নীল, পীত, লোহিত নানা বর্ণের উপলখণ্ড কুড়াইয়া গৃহে লইয়া যাইতেন; দেখিয়া রাজা রাণী হাসিতেন, বলিতেন,

"আমাদের ঘরে কত মণি মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে, তোমরা এ পাথরগুলা লইয়া কি করিবে, মা?"

রাজকন্যারা কিছু বলিতেন না, কিন্তু তাঁহারা মণিমুক্তা ফেলিয়া, সেই পাথরগুলা লইয়া, আপনাদিগের খেলাঘর সাজাইতেন।

রাজকুমারীরা ক্রমে বড় হইলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষ মহাসমারোহ করিয়া তাঁহাদিগের বিবাহ দিলেন। মনের মত কুটুম্ব ও চাঁদের মত জামাই পাইয়া রাজা রাণীর আনন্দের সীমা রহিলনা। বিবাহের পর রাজকন্যারা, একে একে, শ্বশুরালয়ে গিয়া সুখে সংসার করিতে লাগিলেন।

দক্ষরাজের কেবল একটী কন্যা অবিবাহিতা রহিলেন। তাঁহার নাম সতী। সতী সকলের ছোট সুতরাং পিতামাতার বড় আদরের। রাজা রাণী মনে করিতেন সতী একটু বড় হইলে সকলের চেয়ে সমারোহ করিয়া এবং সকলের চেয়ে সুপাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবেন।

সতীর রূপ গুণের কথা কি বলিব? রাজকন্যারা সকলেই অনুপম সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু সতীর সহিত কাহারও তুলনা হইতনা। সতীর রূপ তাঁহার অঙ্গের বর্ণে, তাঁহার চক্ষু কর্ণের গঠনে ছিলনা। সতীর রূপ ছিল তাঁহার ভাবে, সতীর রূপ ছিল তাঁহার জ্যোতিতে; যে তাঁহাকে দেখিত, সে অনিমেষ হইয়া যাইত। সাধু সন্ন্যাসীরা বালিকা সতীকে দেখিয়া বিশ্বজননীর রূপ ধ্যান করিতেন এবং উদ্দেশে, ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন।

সতীর প্রকৃতিও অন্য রাজকন্যাদিগের প্রকৃতি হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল। অন্য রাজকন্যারা বেশভূষা, অশন বসন লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সতীর সে সকলের প্রতি একবারেই দৃষ্টি ছিল না। রাজকন্যাদিগের মধ্যে কেহ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণের বসন, কেহ পদ্মপত্রশ্যাম অঙ্গাবরণ ভাল বাসিতেন, কিন্তু সতী ভাল বাসিতেন গৈরিক বর্ণের বসন, গৈরিকরঞ্জিত অঙ্গাবরণ। অন্য রাজকন্যাদিগের কণ্ঠে শোভা পাইত গজমুক্তাহার, করে শোভা পাইত হীরকখচিত কঙ্কণ, কিন্তু সতীর কণ্ঠে বিরাজ করিত স্ফটিকরচিত মাল্য, করে বিরাজ করিত রুদ্রাক্ষগঠিত বলয়। অন্য রাজকন্যারা অঙ্গে লেপন করিতেন মৃগমদ, চন্দন, কিন্তু সতীর ললাটে শোভা পাইত পিতার যজ্ঞকুণ্ডের ভস্ম। দাসীরা কত যত্নে, কেশ রচনা করিয়া দিত, কিন্তু সতীর কেশ অযত্নে ভূতলে লুণ্ঠিত হইত; রুক্ষস্নানে কখনও কখনও তাহাতে জটা বাঁধিত। রাজমহিষী সতীর ভাব দেখিয়া বড় দুঃখিতা হইতেন। কিশোরী কুমারীকে শরীর সম্বন্ধে সেরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে দেখিলে কোন্ মাতা ধৈর্য্য রাখিতে পারেন? তিনি কখনও কখনও, বিরক্ত হইয়া সতীকে বলিতেন,—

"সতি! তুমি ক্রমে বড় হইতেছ, কিন্তু তোমার এ কিরূপ ভাব? তুমি ভাল কাপড় পরনা, ভাল গহনা পরনা, সকল দিন মাথার চুল পর্য্যন্ত বাঁধনা। আইবড় মেয়ে এমন ভাবে থাকিলে লোকে যে তোমায় পাগল বলিবে, কেহ তোমায় লইয়া ঘর করিতে চাহিবে না।"

সতী হাসিতেন, মাতাকে বলিতেন, "বেশত! আমি তোমার কাছে থাকিব।" কিন্তু মনে মনে বলিতেন, "যিনি কাপড় পরা ও চুল বাঁধা দেখিয়া আমার বিচার করিবেন, আমাকে যেন তাঁহার ঘর করিতে না হয়।"

রাজা দক্ষও সতীর ভাব দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেন; কিন্তু সতী সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, মমতাময়ী, আনন্দময়ী

দেবী; তাই তিনি তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সতীর একটা দোষ ছিল, সতী বড় অভিমানিনী, অল্পেই সতীর নীলপদ্মের মত চক্ষু দুটী জলে ভাসিয়া যাইত। তাই তিনি সতীকে লক্ষ্য করিয়া রাণীকে বলিতেন, "মেয়েটা আমার পাগলী, বিধাতা করুন, যেন কোন পাগলের হাতে না পড়ে।"

ক্রমে সতী বিবাহযোগ্যা হইলেন। তখন রাজা দক্ষ পাত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার ভ্রাতা দেবর্ষি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন,

"নারদ! তুমিত সর্ব্বত্র যাও, ধনী দরিদ্র, গৃহী সন্ন্যাসী এমন লোকই নাই, যাহার সঙ্গে না তোমার পরিচয় আছে। আমার সতীর জন্য একটা সুপাত্র দেখিয়া দাও দেখি।"

"যে আজ্ঞা", বলিয়া নারদ বাহির হইলেন এবং বহু অন্বেষণের পর কনখলে ফিরিয়া আসিয়া রাজা রাণী উভয়ের সাক্ষাতে বলিলেন,

"আমি আপনাদের সতীর জন্য একটা অতি সুপাত্র স্থির করিয়া আসিয়াছি। সতীর যোগ্য তেমন পাত্র আমার চক্ষুতে আর পড়ে নাই।"

দক্ষ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রটী কে?" নারদ বলিলেন, "কৈলাসপুরীর রাজা।"

শুনিয়া দক্ষের ললাট একটু কুঞ্চিত হইল; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রাণী বলিলেন,

"কৈলাসপুরী? সে ত বহু দূর, অতি দুর্গম দেশ, সতীর আমার সেখানে বিবাহ হইলে আমিত তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইব না, সর্ব্বদা তাহার সংবাদ লইতে পারিব না।"

নারদ বলিলেন, "রাণি! তোমার কিসের অভাব যে ইচ্ছা করিলে দূর বলিয়া তুমি সতীর সংবাদ লইতে পারিবে না? আর তোমার সর্ব্বদা দেখা বড়, না, সতীকে সুপাত্রে দেওয়া বড়? সতী যদি তোমার সুখী হয়, তবে তুমি সর্ব্বদা তাহাকে না দেখিলেই বা ক্ষতি কি?"

রাজা রাণী উভয়েই ভাবিলেন কথাটা ঠিক। দক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রের বিদ্যা বুদ্ধি কিরূপ?"

নারদ। "তাহার তুলনা হয় না। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র এমন কোন শাস্ত্র, কোন বিদ্যা নাই, যাহা তাঁহার অগোচর। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি কিরূপ, এই বলিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্বয়ং বশিষ্ঠ তাঁহার নিকট ত্রয়ীতে,* পরশুরাম তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদে এবং আমি তাঁহার নিকট গান্ধর্ব্ববেদে উপদেশ গ্রহণ করি।"

দক্ষের মুখ উজ্জ্বল হইল। তিনি বলিলেন, "পাত্রের বলবীর্য্য?"

নারদ। "পিণাক ধনুতেই তাহার পরিচয়। তাহাতে গুণ আরোপণ দূরে থাকুক, পৃথিবীতে আর কেহ এ পর্য্যন্ত তাহা উত্তোলন করিতে পারে নাই। ত্রিপুরাসুর পিণাক নিক্ষিপ্ত শরাঘাতেই নিহত হইয়াছিল।"

রাণী বলিলেন, "পাত্রটী দেখিতে কেমন?"

নারদ। "সে কথা কি বলিব? তেমন শালদ্রুমের মত দৃঢ়োন্নত দেহ, তেমন আজানুলম্বিত ভুজ, তেমন আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন, তেমন রজতগৌর বর্ণ, তেমন সদাপ্রসন্ন বদন আর কাহারও দেখি নাই। সে রূপ কেবল সতীরই দক্ষিণে শোভা পায়।"

সতীর সখী বিজয়া কার্য্য উপলক্ষে রাণীর নিকট আসিয়াছিল এবং সতীর বিবাহের কথা হইতেছে বুঝিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। এই কথার পর বিজয়া ছুটিয়া সতীর নিকট গিয়া বলিল, "সতি! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তুমি এতদিন উদ্দেশে যাহাকে পূজা করিতেছ, সেই কৈলাসপতিরই সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে।"

সতী কোন কথা বলিলেন না। কেবল আপনার উভয় হস্তের চম্পককলিকানিভ অঙ্গুলিগুলি সংযুক্ত করিয়া উত্তরাস্যে একটী প্রণাম করিলেন।

এখানে রাণী নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রের ধন সম্পদ কিরূপ?"

নারদ বলিলেন, "রত্নগর্ভ কৈলাস তাঁহার রাজত্ব, যক্ষরাজ কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী।"

আর অধিক পরিচয় দিতে হইল না। কোন্ রত্নপ্রিয়া রাণী কুবেরের নাম না শুনিয়াছেন? হীরা, মুক্তা, মরকত, বৈদূর্য্য, মাণিক্য, কুবেরের ন্যায় কাহার গৃহে আছে? সেই কুবের যাহার ভাণ্ডারী তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কি সীমা

* ত্রয়ী—ঋক্‌, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ।

করা যায়? রাণী বলিলেন, "পাত্রের পিতা, মাতা, ভাই, বোন কে আছেন?"

নারদ সহাস্য বদনে বলিলেন, "পাত্রের অইটাই কেবল দোষ, কোনও কুলে কেহ নাই। তা রাণি! ওটা একদিকে যেমন দুঃখের অন্য দিকে তেমন নিতান্ত অসুখেরও নয়। বিবাহ মাত্রই আমাদের সতী কৈলাসের সর্ব্বেশ্বরী হইবে।"

রাণী নারদের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন। নারদ বলিলেন, "রাণি! পাত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আমার কর্ত্তব্য। দোষ হউক, গুণ হউক, শুনিয়া আপনারা বিচার করিবেন, পরে আমাকে দোষ না দেন। পাত্রটী সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; গৃহ এবং শ্মশান, চন্দন এবং চিতাভস্ম তাঁহার নিকট সমান। সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন; কিন্তু তাঁহার চিন্তা পার্থিব কোন বস্তুর জন্য নয়, জগতের কল্যাণের জন্য। শ্মশানে শবাস্থি পরীক্ষায়, অরণ্যে উদ্ভিজ্জের গুণাগুণ বিচারণে এবং গিরিগুহায় খনিজ দ্রব্যের তত্ত্ব নিরূপণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়। তত্ত্বনিরূপণের জন্য তিনি কালকূট পানে এবং বিষধর ধারণে কুণ্ঠিত নহেন। ইহারই জন্য তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী এবং রাজা হইয়াও ভিক্ষুক। আমি পাত্রের দোষ গুণ, আচার অনাচার সমস্তই বলিলাম, শুনিয়া আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন্।"

শুনিয়া দক্ষের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি পুনঃপুনঃ শিরঃ কম্পন করিতে লাগিলেন। রাণীর এক প্রবীণা পরিচারিকা তথায় উপস্থিত ছিল। রাণীকে চিন্তিতা দেখিয়া সে বলিল, "রাণি মা! আপনি ভাব্‌বেন না। মা বাপ না থাক্‌লে অাইবড় অনেক ছেলেই অমন হয়। ঘর সংসারের দিকে মন থাকে না, কেবল ঘাটে মাঠে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের সতী যদি মেয়ের মত মেয়ে হয়, তবে এক মাসের মধ্যে জামাইকে সংসারী করে তুল্‌বে।"

শুনিয়া রাণী আশ্বস্তা হইলেন, বলিলেন, "সর্ব্বগুণ কোথায় পাব? মেয়েকে সুপাত্রে দেওয়া বাপ মায়ের কর্ত্তব্য, আমরা তাই দেবো, তার পর মেয়ের কপাল। পাত্রটী যখন রূপে, গুণে, ধনে অতুল্য, তখন সতীকে তারই হাতে দেওয়া আমার মন। এখন মহারাজের যা ইচ্ছা।"

দক্ষ বলিলেন, "রাণি! বিধাতার যা ইচ্ছে, তা আমি বুঝেছি। আমার ভয় ছিল মেয়েটা যেমন পাগলী তেম্‌নি কোন পাগলার হাতে পড়্‌বে। ঠিক্ তাই হ'ল। তা তোমার যখন মন হয়েছে তখন এই পাত্রই স্থির হোক্।"

আর অধিক আলোচনা করিতে হইল না। কৈলাস পতির সঙ্গে সতীর বিবাহ স্থির হইল। রাজা দক্ষ মহা সমারোহে সতীর বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শুভদিনে সতীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। রাজভবন উজ্জ্বল আলোকমালায়, ততোধিক, রাজকুমারীদিগের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময় হইল। নারদ পাত্রের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সমস্তই প্রমাণিত হইল। জটাজূটের মধ্য হইতেও তাঁহার পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মুখ এবং বিভূতিরাগের মধ্য হইতেও তাঁহার রজতগৌর বর্ণ শোভাবিকাশ করিতেছিল দেখিয়া রাজমহিষী এবং রাজকুটুম্বিনীগণ মুগ্ধা হইলেন। পুরবাসিনীগণ একবাক্যে বলিলেন যে সতীর যোগ্য বরই বটে। একটী বিষয়ে কেবল রাজমহিষীর কিছু ক্ষোভ রহিল। নারদ যে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়াছিলেন তাহা কি অলীক? বিবাহের দিনেও তাঁহার কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, অঙ্গে বিভূতিরাগ এবং কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। সতীর জন্য তিনি আপনারই ন্যায় বেশ ভূষা আনিয়াছিলেন। রাণী ভাবিলেন, "একি! এমন দিনেও যদি তিনি সতীকে কিছু বস্ত্রালঙ্কার না দিলেন তবে কবে দিবেন? কিন্তু নারদও মিথ্যা বলিবার লোক নহেন; তবে কি নারদ প্রকৃত অবস্থা জানেন না?"

রাণীকে উদ্বিগ্না দেখিয়া সমাগতা কুটুম্বিনীদিগের মধ্যে একজন বলিলেন,

"ছেলের মা বাবা, আত্মীয় কুটুম্ব যখন নাই, তখন তাহাকে বিবাহের বেশে কে সাজাইয়া দিবে? ছেলে ত আর নিজে সাজিয়া আসিতে পারে না, বার মাস যেমন থাকে, তেমনই আসিয়াছে, আপনি ভাবিবেন না।"

অপরা কেহ বলিলেন, "সতীর কপালে ধনসম্পদ থাকে, নিশ্চয়ই হবে। আপনার রাজার সংসার, অভাব কি? এমন একটা মেয়ে কেন, দশটা মেয়ে পালন করতেও ত আপনার কষ্ট হবে না।"

এ কথাটা রাণীর বড় ভাল লাগিল না। তিনি

নারদকে বলিলেন, "নারদ! তুমি যে পাত্রের এত ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়াছিলে, কিন্তু তাহার প্রমাণ ত কিছু দেখিলাম না। আমার সতীকে দু'গাছি কঙ্কণও ত দিলেন না। বিবাহের মেয়েকে রুদ্রাক্ষের মালা! একি? আমার মেয়ে ত সন্ন্যাসিনী নয়।"

নারদ বলিলেন, "রাণি! আমার কথা মিথ্যা হইবার নয়। আপনার সতী সত্যই রাজরাজেশ্বরী হইয়াছে। এখন কিছু বলিবেন না, অপেক্ষা করুন, সতী যখন স্বামীর ঘর করিয়া আসিবে, তখন দেখিবেন সতীর কি বেশ-ভূষা, তখন বুঝিবেন আপনার জামাতার কি ঐশ্বর্য্য!"

শুনিয়া রাজমহিষী এবং রাজকুটুম্বিনীগণ আশ্বস্তা হইলেন।

পাত্রের বিবাহকালীন বেশভূষা এবং তাহার অনুযাত্রিগণের ভাবভঙ্গী দর্শনে রাজা দক্ষও বড় তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য জামাতা ও কুটুম্বেরা আসিয়াছিলেন কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ রথে; কিন্তু তাঁহার নূতন জামাতা আসিয়াছিলেন এক মহাশৃঙ্গ, বিপুলদেহ বৃষভে। অন্যান্য জামাতৃগণের সঙ্গে আসিয়াছিল, স্বর্ণ বেত্রধারী, সুবেশ, সুরূপ কিঙ্কর। কিন্তু তাঁহার নূতন জামাতার সঙ্গে আসিয়াছিল, ত্রিশূলধারী, উলঙ্গপ্রায়, বিকৃত-মুখ নন্দী। বরযাত্রিগণের বিকট আকার এবং অদ্ভুত ভাব দেখিয়া কনখলবাসিগণও সন্ত্রস্ত ও বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিল, রাজা এ কিরূপ কুটুম্ব করিলেন! কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে বুঝাইলেন, "ইহা কিছু নূতন নয়, পাহাড়িয়াদিগের ভাবই এইরূপ!" পাত্রের সদানন্দময় ভাব, সরল মধুর ব্যবহার এবং চির প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শনে পৌরবর্গের সকল ক্ষোভ ক্রমে দূর হইল।

রাজা, রাণী এবং পুরবাসিগণের মনের ভাবও এইরূপ! সতীর মনের ভাব কিরূপ তাহা কি বলিবার আবশ্যক করে? সাধু সন্ন্যাসিগণের মুখে যাহার কথা শুনিয়া সতী যাহাকে ইষ্টদেবরূপে হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতেছিলেন, আজ তিনি পতিরূপে সতীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন, সতীর মনের ভাব কি বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা আছে? চারি চক্ষু মিলিত হইবার পর হইতেই সতী সম্পূর্ণরূপে আপনাকে কৈলাসপতির চরণে অর্পণ করিলেন। সেই চারুচন্দ্র মুখ, সেই রজতগিরিনিভ দেহ, সেই পরিঘবৃহৎ বাহুদ্বয়, সেই প্রাসাদদ্বারসদৃশ বিশাল বক্ষস্থল, সেই কোকনদনিন্দিত চরণ সতীর ধ্যানজ্ঞান হইল। সতী অন্তরে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "প্রভু! সতীর "প্রভু! সতীর জন্ম তোমারই জন্য। বিধাতা করুন যেন তোমার সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যা হই।"

বিবাহের পর সতী কৈলাসপুরীতে আগমন করিলেন। সতীর আগমনে কৈলাস অভিনব শ্রী ধারণ করিল। কুসুমে অধিক সৌরভ, বিহগের সঙ্গীতে অধিক মাধুর্য্য অনুভূত হইল। সন্ন্যাসী কৈলাসপতি সতীকে পাইয়া সংসারী হইলেন। ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে সতী পতির অর্দ্ধাঙ্গ লাভ করিলেন।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে একবার বসন্তসমাগমে কৈলাস অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। অবিরাম তুষার-পাতে কৈলাসের তরুলতাগণ পত্রপুষ্পহীন ও শোভা-শূন্য হইয়াছিল, ঋতুরাজের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ তাহাদিগকে আপাদমস্তক নবকিশলয়ে সুশোভিত করিল। গিরিবর শুভ্র তুষারবাস পরিত্যাগ করিয়া শ্যামল শৈবালবস্ত্র পরিধান করিলেন। শ্বেত, লোহিত, পাটল বিবিধ বর্ণের কুসুম-রাজি গুচ্ছে গুচ্ছে বিকশিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠ, বক্ষঃ এবং পাদদেশ মণ্ডিত করিল। বিগলিত তুষাররাশি হইতে শত শত নির্ঝর উৎপন্ন হইয়া অবিরাম ঝর ঝর নিনাদে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইল। শীতভীত প্রাণিগণ এতদিন কৈলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনে কৈলাস পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠিল। কৈলাসের উপবনসমূহ পুনর্ব্বার ভ্রমরঝঙ্কারে মুখরিত এবং চিকোর ও মুনালের কণ্ঠস্বরে শব্দায়মান হইল। স্বভাবভীরু কস্তূরী মৃগ নবজাত শৈবালাঙ্কুরের লোভে উপত্যকাপ্রদেশ হইতে পুনর্ব্বার তথায় আগমন করিল এবং চমরীবৃষ শিলাখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হইয়া নাসারন্ধ্র প্রসারণ পূর্ব্বক বসন্তানিলের সুখস্পর্শ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ঋতুরাজের আগমনে কৈলাসের তরুলতা, পশুপক্ষী সকলেই আবার নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন জীবন লাভ করিল।

পর্ব্বতের একটী দুরারোহ শিখরে কৈলাসপতির স্ফটিক-

শুভ্র প্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল। মহাকায় দেবদারুসমূহ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া প্রাসাদটীকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিল। চতুর্দ্দিক স্নিগ্ধ, প্রশান্ত ও রমণীয়। তপোবনের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উপবনের সৌন্দর্য্য সম্মিলিত হওয়াতে স্থানটী একাধারে তপশ্চর্য্যার ও গার্হস্থ্য সুখভোগের উপযোগী হইয়াছিল। প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে একটী প্রাচীন দেবদারু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান, তাহার নিম্নে স্বভাবনির্ম্মিত শিলাময় বেদী। সায়াহ্নে তাহার উপর ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে কৈলাসপতি উপবিষ্ট, বামে দক্ষদুহিতা সতী। একটী বনলতা দেবদারুটিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছিল। সন্ধ্যানিলে তাহার বিটপগুলি সঞ্চালিত হওয়াতে মধ্যে মধ্যে দুই একটী কুসুম দেবদম্পতীর অঙ্গে পতিত হইতেছিল। যেন তরুলতাদ্বয়, ভক্তিভরে, তাঁহাদিগকে পুষ্পাঞ্জলিদানে পূজা করিতেছিল। কৈলাসপতির মস্তকে জটাজুট, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিরাগ, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। সতীরও বেশভূষা পতির অনুরূপ। তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বসন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষদাম, করে রুদ্রাক্ষবলয়, আলুলায়িত কেশভার তাঁহার গ্রীবা, পৃষ্ঠ, কটিদেশ আবৃত করিয়া শিলাসনে লুণ্ঠিত হইতেছিল। উভয়ের অবিদূরে করে বিশাল ত্রিশূল ধারণপূর্ব্বক নন্দী দণ্ডায়মান ছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ দেবদম্পতীর মুখে পতিত হওয়াতে তাহা অতি সুন্দর দেখাইতেছিল; নন্দী নির্নিমেষে, আনন্দোৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাহা দেখিতেছিলেন। পিতৃবৎসল পুত্র যে ভাবে পিতামাতাকে, অনুরক্ত প্রজা যে ভাবে রাজা ও রাজ্ঞীকে এবং ভক্ত সাধক যেভাবে ইষ্ট দেবদেবীকে দর্শন করেন, নন্দী সেই ভাবে দেবদম্পতীকে দর্শন করিতেছিলেন। কৈলাসপতি সতীর সঙ্গে জীবের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। উপবনের পশুপক্ষী, তরুলতা পর্য্যন্ত নিঃশব্দ নিস্পন্দ হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল। তাঁহাদিগের বামে কিরণচ্ছটায় পর্ব্বতশিখর উজ্জ্বল করিয়া দিবাকর অস্তমিত হইতেছিলেন। কৈলাসপতি সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সতীকে বলিলেন:—

"দেবি! ঐ দেখ, যে সূর্য্য এতক্ষণ প্রোজ্জ্বল কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছিল, এখন আর তাহার সে তেজ, সে দীপ্তি নাই। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাহা তেজোহীন হইয়া অদৃশ্য হইবে। পৃথিবীতে মানবের জীবনও এইরূপ। আজ যাহা জ্ঞানে, গৌরবে সমুজ্জ্বল, কাল তাহা কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইবে, কিন্তু মানব এমনিই ভ্রান্ত যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ দুঃখকেই চিরস্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করে।"

সতী বলিলেন, "প্রভু! দিবাকরের যেমন অস্ত আছে, উদয় আছে, মানবজীবনেরও কি সেইরূপ আছে?" কৈলাসপতি বলিলেন, "আছে বৈ কি! যাহাকে সাধারণ লোক মৃত্যু এবং জন্ম বলে, জ্ঞানীর নিকট তাহাই অস্ত এবং উদয়। কিন্তু দিবাকরের দৈনিক উদয়াস্তের সহিত তাহার জ্যোতির যেমন কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না, মানব জীবন সেরূপ নয়। প্রত্যেক নরজন্মের সঙ্গেই মানব উত্তরোত্তর জ্ঞানলাভ করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর হয়। কেবল যাহারা ধর্ম্মহীন তাহারাই দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে।"

সতী। ধর্ম্মহীন জীবের কি তবে গতি নাই? তাহারা কি চিরদিনই অধোগমন করিবে?

কৈলাসপতি। না দেবি! কখনই নয়। জীবে এবং শিবে পার্থক্য নাই। কর্ম্মগুণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলেই অনন্ত উন্নতি বা শিবত্ব প্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় দূরে অতি মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইল। এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন স্বরতরঙ্গে কৈলাসপুরী প্লাবিত করিয়া কে গাহিতেছে,

> কি শোভা কৈলাসধামে,
> দক্ষ-দুহিতা বামে,
> বিরাজিত প্রভু প্রমথেশ;
> শিরে জটাভার
> কণ্ঠে ফণীহার
> বিভূতি-ভূষিত বেশ।

সে স্বর সতীর আজন্ম পরিচিত, শুনিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি হর্ষগদ্গদ কণ্ঠে কৈলাসপতিকে বলিলেন, "প্রভু! এ স্বর আর কাহারও নয়, দেবর্ষি নারদ শুভাগমন করিতেছেন।" সঙ্গে সঙ্গে

সুপস্মিত প্রভায় দশদিক উজ্জ্বল করিয়া দিব্যমূর্ত্তি নারদ তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। পরস্পর যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভ্যর্থনার পর দেবর্ষি নিকটস্থ শিলাতলে উপবেশন করিলে সতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি! কনখলের সংবাদ কি? বাবা মা দিদিরা সকলেই ভাল আছেন ত?"

নারদ। সংবাদ উত্তম। তোমার বাবা, মা, দিদিরা সকলে কুশলে আছেন।

সতী। বাবা এতদিন আমার সংবাদ লন নাই কেন?

নারদ। তোমার পিতা বড় ব্যস্ত, তিনি এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন। ভূভারতের ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ইতর মহৎ সকলকেই তিনি সে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিবেন। বোধ হয় সেই বিপুল যজ্ঞের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত আছেন বলিয়া তিনি তোমার সংবাদ লইতে পারেন নাই।

সতী আনন্দসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি, আপনি কি পিতার আদেশে আমাকে সেই যজ্ঞে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন?"

নারদ। না মা! আমি যে এখানে আসিব তোমার পিতামাতা কেহই সে কথা জানেন না। আমি এই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, অনেক দিন তোমায় দেখি নাই, তাই নিজেই তোমায় দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।

সতী। পিতা এত বিপুল আয়োজন করিতেছেন, দেশ দেশান্তর হইতে লোককে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তবে আমাদিগকে সংবাদ দিলেন না, নিমন্ত্রণ করিলেন না কেন?

নারদ। সে কথার উত্তর আমি কি দিব মা? তোমার পিতার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। শুনিয়াছি এ যজ্ঞে তিনি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন না।

সতী বিস্মিতা হইলেন, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি! আমাদিগের অপরাধ কি?"

নারদ। শুনিয়াছি কৈলাসপতির ব্যবহারে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়াছেন। তাই সেই অপমানের প্রতিশোধার্থ তিনি তাহার অপর আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন, কেবল তোমাদিগকে করিবেন না।"

সতী। মা কি এ সংবাদ জানেন?

নারদ। জানেন। তিনি বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাপতি কিছুতেই তাহার অনুরোধ রক্ষায় স্বীকৃত হন নাই। মহিষী অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু মা! আর এ সকল কথার আলোচনায় ফল নাই। আমার অন্য কার্য্য আছে, আমি বিদায় হই।

নারদ এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন সতী বিনীত বচনে কৈলাসপতিকে বলিলেন, "প্রভু! পিতা আপনার ব্যবহারে অপমানিত বোধ করিয়াছেন, এ কথার অর্থ কি?"

কৈলাসপতি বলিলেন, "দেবি! আমি তাঁহার অবমাননা করি নাই। কাহারও অপমান করা আমার প্রকৃতি নয়। প্রকৃত কথা এই যে কিছুদিন পূর্ব্বে কোন নিমন্ত্রণসভায় অপর দেবগণের সঙ্গে আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রজাপতি সভায় আগমন করিলে অপর সকলে তাঁহাকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি নাই। শুনিয়াছি সেই অবধি তিনি আমার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং আমাকে অপমানিত করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও, এই ভয়ে আমি এতদিন তোমাকে কোন কথা বলি নাই।"

সতী। প্রভু! আমার একটি প্রার্থনা আছে; আপনার অনুমতি পাইলে আমি একবার কনখলে যাই। পিতাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া আসি।

কৈলাসপতি। দেবি! অপর সময় হইলে যাইবার বাধা ছিল না। কিন্তু এখন তুমি যাইলে হয়ত ক্রোধে তিনি তোমার অপমান করিতে পারেন।

সতী। আমার অপমান! আমি ত তাঁহার নিকট কোন অপরাধই করি নাই।

কৈলাসপতি। সতি! তুমি একান্ত সরলস্বভাবা! তুমি প্রজাপতিকে চেন না। আত্মাভিমানের প্রাবল্যে এমন অসঙ্গত কার্য্যই নাই, যাহা তিনি করিতে না পারেন। যখন তাঁহার ধারণা হইয়াছে, তখন সুযোগ পাইলে আমাকে, আমার অভাবে তোমাকে অপমান করিতে তিনি কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবেন না। কেবল

আমাদিগকে অপমান করিবার জন্যই তিনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বিনা নিমন্ত্রণে এই যজ্ঞে যাওয়া তোমার কর্ত্তব্য কি না ভাবিয়া দেখ।

সতী। প্রভু! আমি আপনাকে কি বুঝাইব? দুহিতার পিতৃগৃহে যাইতে নিমন্ত্রণের অপেক্ষা আছে কি? বিশেষতঃ দেবর্ষি বলিতেছিলেন, মা আমাদের জন্য অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া অপমানের ভয়ে তাঁহার নিকট না যাওয়া আমার পক্ষে কর্ত্তব্য কি?

কৈলাসপতি। দেবি! এ কথার উপর আর কথা নাই। যখন তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন যাও। অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিও। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই যজ্ঞের পরিণাম তোমার, আমার, প্রজাপতির, কাহারও পক্ষে শুভজনক হইবে না।

যথাসময়ে নন্দী সতীর কনখল গমনের আয়োজন করিয়া দিলেন। সতী পিতৃগৃহে গমনের জন্য বেশভূষা পরিধান করিলেন না। যে তপস্বিনী বেশে কৈলাশে অবস্থিতি করিতেন, সেই বেশেই কনখলে গমন করিলেন। তাঁহার করে ত্রিশূল, কণ্ঠে স্ফটিকমালা, করে রুদ্রাক্ষ বলয়, অঙ্গে বিভূতিরাগ, ললাটে ভস্মতিলক, কেশদাম আগুলফলম্বিত অবেণীবদ্ধ, পরিধান গৈরিক বসন। কনখলবাসীদিগের মধ্যে যাহারা সতীকে বাল্যে দেখিয়াছিল, নবোদিতা ঊষার ন্যায় তাঁহার এই তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল এবং ভূনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সতী কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রাসাদের যে নিভৃত কক্ষে রাজমহিষী ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দুঃখাবসন্না জননীকে দেখিয়া অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "মা, আমি এসেছি।"

সঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায় সে স্বর রাজমহিষীর কর্ণে প্রবেশ মাত্র তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং সতীকে দেখিবা মাত্র তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, "মা আমার এসেছ", "মা আমার এসেছ" এই বলিয়া বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। উভয়ের চক্ষুর জলে উভয়ের বক্ষ, স্কন্ধদেশ প্লাবিত হইল। সতী বলিলেন, "মা, আমি একবার বাবাকে দেখিয়া আসি।" মহিষী বলিলেন, "না মা! মহারাজ এখন যজ্ঞসভায় আছেন, এখন সেখানে গিয়া কাজ নাই।"

"মা! আমি অনেক দিন বাবাকে দেখি নাই, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি" এই বলিয়া রাজমহিষী আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সতী দ্রুতপদে যজ্ঞসভার দিকে ধাবিতা হইলেন।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থিত বিস্তৃত প্রান্তরে যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। নানা দিগ্দেশ হইতে সাধু, সন্ন্যাসী, এবং দর্শকগণ তথায় সমাগত হইয়াছেন। রাজা দক্ষের অসীম ঐশ্বর্য্য; আয়োজনের অবধি নাই। উপরে কৌষেয় বসন নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ, নিম্নে যজ্ঞের বেদী। ঋত্বিকগণ বেদীর উপর মণ্ডলাকারে উপবেশন করিয়াছেন, মধ্যে প্রজাপতি দক্ষ। পবিত্র হোমধূম চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছে, অনবরত আহুতি দানে অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া দক্ষের মুখ আরক্তবর্ণ হইয়াছে। সতীকে দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সসম্ভ্রমে পথ প্রদান করিলেন; সতী নিকটে যাইয়া পিতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য ঋত্বিকের কণ্ঠে বেদমন্ত্র নীরব এবং হোতার আহুতিপ্রদানোদ্যত হস্ত নিশ্চল হইল। প্রজাপতি ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নেত্র সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, সতী করপুটে তাঁহার সম্মুখে বেদীতলে দণ্ডায়মানা আছেন। সতীকে দেখিবা মাত্র তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি স্নেহগদ্গদ স্বরে বলিলেন, "সতি! মা আমার এসেছ?"

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, আরক্ত মুখমণ্ডল অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় লোহিত হইল। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, "সতি! তুমি এখানে কেন? কে তোমায় এখানে আসিতে বলিল?" বিষাক্ত শরের ন্যায় পিতার সেই কর্কশ স্বর সতীর মর্ম্মদেশ ভেদ করিল। জন্মাবধি পিতার নিকট তিনি এরূপ ভাষা কখনও শুনেন নাই। নয়নের উদ্গত অশ্রু সংযম করিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা! আমি অনেক দিন আপনাকে দেখি নাই, তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

সতীর সেই করুণ কথাগুলি সভাস্থ সকলের হৃদয় আর্দ্র করিল কিন্তু দক্ষ পূর্ব্ববৎ কঠোর স্বরে বলিলেন,

"সতি! কে তোমায় আসিতে বলিল? আমি ত তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই।"

সতী। মাতাপিতাকে দেখিতে আসিবার জন্য সন্তানের পক্ষে নিমন্ত্রণের প্রয়োজন কি? আমি বিনা নিমন্ত্রণেই আসিয়াছি।

দক্ষ। এ কথা প্রজাপতি দক্ষের কন্যার উপযুক্ত নয়। বিধাতা তোমাকে যে নির্লজ্জের হস্তে দিয়াছেন, এ তাহারই গৃহিণীর উপযুক্ত।

সতী। বাবা! অকারণে আপনি তাঁহাকে নির্লজ্জ বলিয়া গালি দিতেছেন কেন?

দক্ষ। নির্লজ্জ বলিলে গালি! আকাশ যাহার বসন নির্লজ্জ বলিলে তাহাকে গালি দেওয়া হয় না। অনাচারী বলিয়া স্বর্গপুরীতে যাহার স্থান নাই, গৃহ এবং শ্মশান, চন্দন এবং চিতাভস্ম, অমৃত এবং বিষ যাহার নিকট সমান তাহাকে নির্লজ্জ বলা আমার অকর্ত্তব্য হয় নাই। সে উন্মত্ত।

সতী। বাবা! তিনি নির্লজ্জই হউন, আর উন্মত্তই হউন, তিনি আমার দেবতা! আপনি তাঁহার নিন্দা করিবেন না।

দক্ষের সর্ব্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উত্তেজনায় তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

সতী বলিলেন, "বাবা! আপনি প্রসন্ন হউন, আমাদিগকে ক্ষমা করুন। যদি আমরা কোন অপরাধ করিয়া থাকি বলুন, আমাদিগের অপরাধের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

দক্ষ। প্রায়শ্চিত্ত আছে। প্রায়শ্চিত্ত তোমার মৃত্যুতে। যে দিন শুনিব তুমি মরিয়াছ সেই দিন বুঝিব সেই অধমের সহিত আমার সম্পর্ক লোপ হইয়াছে। যাহার সহিত সম্পর্ক নাই, তাহার প্রতি রাগ দ্বেষ থাকিবে না।

সতী। বাবা! তাহাই হইবে। যদি আমার মৃত্যু হইলে আপনি অরাগ, অদ্বেষ হন, আমাদিগের অপরাধ বিস্মৃত হন, তবে তাহার অপেক্ষা আমার পক্ষে সুখের মৃত্যু আর কি হইতে পারে? আমি আপনার আদেশ পালন করিব।

সতী এই বলিয়া যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে যোগাসনে উপবেশন করিলেন। উত্তরাস্য হইয়া আপনার পরিধেয় গৈরিক বসন দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া চিত্রাপিতের ন্যায় সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে সতীর অঙ্গ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইল, তাহার প্রভায় হোমকুণ্ডের অগ্নি নিষ্প্রভ হইল এবং সেই জ্যোতিঃ সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র নিঃসৃত জ্যোতির সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশে বিলীন হইল। ভগ্ন দেবী প্রতিমার মত সতীর মৃতদেহ যজ্ঞস্থলের মধ্যে ভূতলে পতিত হইল।

দক্ষযজ্ঞের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। মাতৃহন্তাকে পুত্র যে ভাবে নিহত করে, কৈলাসপতির অনুচরগণ আসিয়া সেইভাবে সানুচর দক্ষকে নিহত করিল। যেখানে দক্ষের মণিমুক্তাখচিত প্রাসাদ ছিল, এখন সেখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। যেখানে সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেখানে একটা ক্ষুদ্র কুণ্ড মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। কনখলের আর সেই পূর্ব্ব শোভা সম্পদ নাই। অধিবাসিগণ আশাহীন, উৎসাহহীন, শ্রীভ্রষ্ট; সতীর অবমাননারূপ পাপের ফলে যেন তাহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কেবল ভাগীরথী পূর্ব্বের ন্যায় এখনও কল কল নিনাদে তাহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেই অতীত কাহিনী জগতে প্রচার করিতেছেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা*

মানবের ইতিহাসে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রাণপণে আন্দোলন করিতেছেন, ফলে হয়ত এক অভিনব রাষ্ট্র বা প্রবল পরাক্রান্ত সামরিক জাতির সৃষ্টি হইল। অথবা হয়ত সমাজের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক উন্নতি বিধান করিয়া স্বদেশকে উচ্চতর সোপানে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য

* ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত। বৈশাখ, ১৩১৮।

রাজা বা প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিতে দেখিতে এক বিচিত্র কর্ম্মকাণ্ডবিশিষ্ট অভিনব ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া প্রাচীন দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মজীবনকে নূতন ভাবে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। অনেক সময়ে কতকগুলি বিষয় লইয়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব বাধে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্ধি স্থাপিত হয়। কোনও এক রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হইল, অথচ বিশ্বব্যাপী তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইয়া সমগ্র ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় সীমাগুলির পরিবর্ত্তন সাধন করিল। কোনও দুই নরপতি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবদ্ধ রহিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যান্য সমাজ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে রাষ্ট্র সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। আবার বিজ্ঞানচর্চ্চা, জ্ঞানানুশীলন, শিক্ষার গণ্ডিবিস্তার প্রভৃতি মানসিক জগতের কার্য্য লইয়া দার্শনিকেরা ব্যস্ত আছেন,—ফল হইতেছে স্বরাজ, স্বাধীনতা ও প্রজাসাধারণের স্বায়ত্তশাসন। এদিকে রাষ্ট্রনীতিকেরা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের প্রণালী নির্দ্দেশ, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়, শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য ও অধিকার নির্দ্ধারণ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত, কিন্তু সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সংশয়বাদ ও বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রবেশলাভ করিয়া নব যুগের সূচনা করিতেছে। সূত্রপাতে যাহা দেখা যায় শেষে অনেক সময়ে তাহার কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এই রূপে শিল্পের উন্নতি ও ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিবার আশায় উৎসাহিত হইয়া লোকে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, অথবা অল্প কালের মধ্যেই সমাজশক্তির নূতন সমাবেশ হইয়া রাষ্ট্রের আকৃতি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। আবার অনেক সময়ে রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনই উদ্দেশ্য রহিয়াছে; কিন্তু ফল হইয়াছে—ব্যবসায়ে সম্পদ্ লাভ। একজন ইচ্ছা করিলেন ধর্ম্মে ঐক্য, ফলে হইল শিল্পের সর্ব্বনাশ। কখন বা প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার বর্দ্ধিত করিবার এবং রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বদেশহিতৈষিগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এমন সময়ে অল্প কালের মধ্যেই সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ঐক্য ঘোষিত হইল। কোনও এক দেশের রাজা করিলেন ভুল, ফল হইল অন্য এক রাষ্ট্রের বিপ্লব এবং রাজতন্ত্রের খর্ব্বতা সাধন। দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধিল কিন্তু স্বতন্ত্র এক স্বাধীন রাজ্য খণ্ডীকৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রভুক্ত হইয়া গেল।

মানব জগতের মধ্যে প্রকৃতির এইরূপ খেয়াল দেখিয়া মানবায় উন্নতি অবনতির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কিনা স্বভাবতই মনে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতন, ধর্ম্মের প্রচার, শিল্পের বিনাশ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতার লোপ, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি মানবের সকল ব্যাপারই যদি অদ্ভুত এবং আকস্মিক ঘটনার ফলে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে কোন লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কোন আশায় উৎসাহিত হইয়া মানব জীবন সংগ্রামে বহির্গত হইবে? উন্নত লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতি কি উপায়ে তাহার মর্য্যাদা ও গৌরব স্থায়ী করিবে? কোন্ সহায় অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎপদ ও অবনত সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে? কর্ম্মিগণের আন্দোলনসমূহের কোন ফল আছে কি না? ধর্ম্মপ্রচারক, সমাজসংস্কারক, স্বদেশ হিতৈষিগণের যত্নের মূল্য কি?

মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরূপ বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর আমরা ঐতিহাসিকের নিকট আশা করি। কিন্তু আজ কাল জ্ঞানচর্চ্চা শ্রমবিভাগ নীতির অতিশয় অধীন হইয়া পড়িয়াছে। জটিল সমস্যাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র আলোচনা প্রণালী অবলম্বনের প্রতি সাহিত্যের গতি ধাবিত হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন বিজ্ঞান গুলি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই সঙ্কীর্ণতা ইতিহাসালোচনায়ও প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর বিবরণরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ইতিহাস-ক্ষেত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ আজকাল রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী, সন্ধি-বিগ্রহ, রাজ্যবিস্তার, রাজ্যক্ষয়, জয়পরাজয়, এক রাষ্ট্রীয়তার বিকাশ ও লোপ প্রভৃতি বিবিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি আলোচনার জন্যই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডিতেই তাঁহাদের সমগ্র শক্তি ও সময় প্রয়োগ করেন। পরিবার, সমাজ, শিল্প, ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রের উপর মানবের যে যে কার্য্য হইয়া থাকে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-সমূহের ফলে মানবের জীবন যে যে বিচিত্র উপায়ে রূপান্তরিত হয় সেই সমুদয়ের আলোচনার জন্য

ঐতিহাসিকেরা স্বতন্ত্র কর্ম্মিগণের বিশিষ্ট যত্নের উপর নির্ভর করেন।

এই শ্রমবিভাগনীতির ফলে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া অতি সত্বরই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে বটে; এবং ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা বিধানে যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এরূপ অনৈক্যবশতঃ সমগ্র ক্ষেত্র জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা আবিষ্কারের পক্ষে অসুবিধা হয়। ইতিহাস ইহার ফলে প্রকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞান গঠনের ভিত্তি ও উপকরণসমূহ প্রদান করিয়া মানব জগতের বিশেষ এক বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সমগ্র মানবের আশা ভরসা, উন্নতি অবনতি, লাভালাভ প্রভৃতির নিয়মগুলি আয়ত্ত করিবার দিকে বিশ্ব জগতের মনোযোগ শিথিল হইয়াছে।

মানব কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় জীব নহে। সুতরাং একমাত্র রাষ্ট্রই মানবের লক্ষণ বা পরিচয় এবং সুখ দুঃখের পরিমাপক নহে। মানবের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান, বৃত্তি ও প্রবৃত্তির পরিচয় গ্রহণ না করিলে মানবের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। এজন্য সমগ্র মানব জীবনের আলোচনা না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে এবং মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশাদি ইঙ্গিত করিতে অসমর্থ হইবে। জীবনীশক্তির বিকাশ ও জীবনের বিবিধ অভিব্যক্তির নিয়ম আলোচনা করিবার জন্য যে স্বতন্ত্র প্রাণ-বিজ্ঞান ও জীবনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে পদে পদে ঐতিহাসিককে সেই বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাণবিজ্ঞানই প্রকৃত ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই মানবজীবনের গতি, মানবসমাজের ক্রমবিকাশ, মানবচিত্তের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট ও নিশ্চিত হইতে পারিবে।

জীবনীশক্তির সহায়ক এবং জীবনের পরিপোষক কতকগুলি শক্তি ও পদার্থের দ্বারা প্রাণিমণ্ডলের অন্তর্গত প্রত্যেক জীবের বিকাশ সাধিত হয়। এই পদার্থগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাণী পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর অধীনতা স্বীকার করে। পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগৎ জীবের কেবল পরিপোষকমাত্র নহে। ইহা তাহার কর্ম্মক্ষেত্র, বিকাশ ও বংশবিস্তারের নিকেতন। সুতরাং জীবের সহিত বেষ্টনীর সম্বন্ধই তাহার জীবনের সকল অবস্থার নিয়ন্তা।

আলোক, তাপ, জল, বায়ু, আহার্য্য প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ও শক্তি সমুচ্চয়ে এই বেষ্টনীর সৃষ্টি তাহাদের মধ্যে সকলগুলিই প্রত্যেক জীবের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় নহে। আবার এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই এমন কতকগুলি শক্তি ও পদার্থ আছে যাহার দ্বারা জীবের অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে। প্রত্যেক জীবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য বহুবিধ জীবেরও সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বের সর্ব্ববিধ প্রতিকূল ও অনুকূল শক্তির সমন্বয়ের ফলেই প্রত্যেক জীব তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে। এজন্য প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতিও এই সমুদয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আকৃতিবৈচিত্র্য, রং পরিবর্ত্তন, বিভিন্ন গঠনপ্রণালী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাবভঙ্গী, সন্তানরক্ষা পদ্ধতি সকল বিষয়ই এইরূপ বেষ্টনীর প্রভাবে পরিচালিত হয়। জলজ ও স্থলজ জীবের আবাসভূমি বিভিন্ন, ইহাদের জীবনধারণ প্রণালীও বিভিন্ন। এজন্য ইহাদের আকৃতির মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আবার স্থলজ প্রাণী-সমূহও বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রতিকূল ও অনুকূল শক্তি-পুঞ্জের মধ্যে থাকিয়া বিকাশলাভ করে বলিয়া বিভিন্ন আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কোন এক জীবের জীবনধারণ ও বংশবিস্তার কেবলমাত্র তাহার নিজের উপর নির্ভর করে না। ফলতঃ সকল বিষয়ই বেষ্টনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সমগ্র বিশ্বের সর্ব্ববিধ শক্তিগুলি যেভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়া নিজের অঙ্গীভূত করিবার যে সমুদয় প্রয়াস চলিতেছে, এবং নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেষ্টনীর প্রভাবে যেরূপ পরিচালিত হইতেছে, সকলগুলির ফলেই প্রত্যেক জীবের জীবন ও পুষ্টি। অন্যান্য জীব তাহাদের নিজের পুষ্টিসাধনের জন্য যে প্রয়াস করিতেছে, জীবসমূহের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সখ্যের প্রভাবে জীবজগতের যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাকৃতিক বিশ্বে এই জীবনধারণ লইয়া অনবরত যে সংগ্রাম চলিতেছে এবং তাহার দ্বারা যে বিচিত্র শক্তির পরস্পর

বিকাশ ও বিনাশ সাধিত হইতেছে, তাহাতে সকলগুলির ফল পুঞ্জীভূত হইয়া এক একটা জীবের জীবনে ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিতেছে। কোন জীবই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক কার্য্য সমগ্র বিশ্বের অপরবিধ কার্য্যকলাপের অধীন। প্রত্যেকের জীবন মরণ ও স্বাধীনতা অন্যান্য সকলের জীবন মরণ ও স্বাধীনতার সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাণিজগতের এই মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিলে কোন জীবের জীবনের কোন অবস্থাই সুবোধ্য হইতে পারে না।

মানবজীবনও এইরূপ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। মানবের পুষ্টি বিকাশ ও স্বাধীনতা বিশ্বের সর্ব্ববিধ শক্তিপুঞ্জের পরস্পর বৈরিত্ব ও মৈত্রীর উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতের প্রতিকূল ও অনুকূল উপকরণের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ফলেই মানবের বিকাশ, পুষ্টি ও স্বাধীনতা।

মানবের সমাজসৃষ্টি, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, শিক্ষার ব্যবস্থা, সাহিত্যচর্চ্চা, বিজ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, প্রতিষ্ঠান, গঠন, সকল কার্য্যই এই বেষ্টনীর দ্বারা পরিচালিত হয়। পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিসমূহের পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া মানবজীবনের বিবিধ অভিব্যক্তি পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদ্ ও ইতর জীবজন্তু যেমন বেষ্টনীর প্রভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপান্তর লাভ করে, বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া জীবনের বিবিধ লক্ষণ প্রকটিত করে এবং আকৃতির পরিবর্ত্তন বিধান করে, মানবও সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির পরিচয় প্রদান করে, জীবনধারণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে এবং বিভিন্ন আকৃতিতে জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও পারম্পর্য্য রক্ষা করে। রাষ্ট্র, ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ মানবের এই জীবনের অভিব্যক্তি—অবস্থাভেদে এই অভিব্যক্তিগুলির মৌলিক ও আকৃতিগত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া মানব এই সমুদয় অঙ্গের বিভিন্নতা সাধন করে। সুতরাং বেষ্টনী ও জীবনসংগ্রাম যেমন উদ্ভিদাদি নিকৃষ্ট জীবের গঠন, জীবন, গতিবিধি, বিকাশ, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে, সেইরূপ এই বিশ্বের পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলির দ্বারা এবং জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনেই মানবের সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন, বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সাধিত হয়। সুতরাং মানবের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বা ধর্ম্মপ্রচার, উপনিবেশ স্থাপন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠা সকল ব্যাপারই সমগ্র বিশ্বের সর্ব্ববিধ শক্তির কার্য্যের ফলে সাধিত ও নিষ্পন্ন হয়। কোন জাতির জীবন, মরণ, স্বাধীনতা, পুষ্টি ও বিকাশ তাহার স্বকীয় প্রয়াস, স্বকীয় ইচ্ছা ও প্রয়োজন মাত্রের উপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার দ্বারা সমগ্র মানবসমাজের ভারকেন্দ্র যে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই বিশ্বব্যাপী ঘটনাচক্রের দ্বারাই প্রত্যেক জাতির উন্নতি, অবনতি, ধ্বংস ও উৎপত্তি, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং কোন এক জাতির কোন এক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক, চিন্তাসম্পর্কীয় সর্ব্ববিধ আদান প্রদানের ফলে জগতের শক্তিগুলি যেরূপভাবে সজ্জিত রহিয়াছে সেই বিরাট শক্তিসমুচ্চয়ের সংঘটনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে।

পৃথিবীর কোন পদার্থ অস্বীকার করিয়া কোন মানবই থাকিতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক মানবকে অপর সকল মানবের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। এজন্য প্রত্যেক মানবকে তাহার শত্রু ও মিত্রের সংখ্যা গণনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। কোন্ কোন্ চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি কোন এক অবস্থায় মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির অনুকূল, এবং কোন্ কোন্ চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি তাহার প্রতিকূল, এই সমস্যের স্থিরীকরণই জীবনসংগ্রামের প্রধান কার্য্য। ইহারই উপর তাহার জীবনধারণোপযোগী এবং উন্নতি বিধায়ক আয়োজনসমূহ নির্ভর করে।

মানবসমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক জাতির উৎকর্ষ অপকর্ষ

সমগ্র মানবেতিহাসের পরিণতির গৌণ লক্ষণ ও পরিচয়। কোন জাতি তাহার নিজের জীবন ও স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে যাহা মুখ্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করে তাহা বিরাট মানব সমাজের সাধারণ জীবনপ্রবাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। যদি কোন দেশের ভাষার উন্নতি বা অবনতি সাধিত হয়, অথবা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই লাভ ও ক্ষতির দ্বারা সেই সমাজের স্বকীয় ভাগ্য গঠিত হইয়া যাইবে বটে ; কিন্তু এই বিকাশ ও বিনাশ বহু জাতির অভ্যুদয় ও পতনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

প্রাচীন জগতে ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া বিরাজ করিতেছিল। এই সমুদয় সভ্যজাতির উৎকর্ষ অন্যান্য সভ্য ও অসভ্য জাতির উৎকর্ষ ও অনুৎকর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের জল বায়ু, আহার্য্য প্রদানের শক্তি, শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ প্রভৃতি বিচিত্র কারণে কোন দেশের স্বাধীনতা, কোন জাতির পতন, কোন সমাজের পরাধীনতা এবং কোন জনপদের অধোগতি সাধিত হইয়াছিল। ইহারই ফলে বিরোধ, সংগ্রাম, সন্ধি, মিলন, বিবাহ, ধর্ম্মগ্রহণ, ধর্ম্মত্যাগ, রাজ্যলাভ, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মানবীয় সকল বিষয়েরই গতি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দিগের প্রত্যেক কার্য্যে তাহাদের এই জাতিগত সংঘর্ষণ, মিলন ও বিরোধের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পারস্য সম্রাটের রণনীতি এবং বিবিধ অনার্য্য ভাষাভাষিগণের গতিবিধি অনুসরণ করিত। রোমীয়দিগের ভাগ্য ফিনিসীয়, গ্রীক এবং বহু অপরিচিত সমাজের ক্রিয়াকলাপ ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বিচিত্রভাবে গঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষও এইরূপে চীন, তিব্বত, গ্রীক-রাজ্য ও বিবিধ অনার্য্য দেশের লোকসমাজের রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মবিষয়ক এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলেকজাণ্ডার যে সমুদয় রাজ্য নূতন গঠন করিয়াছিলেন তাহারা যেরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বেষ্টনীর মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছিল সেইরূপ শক্তি অনুসারে পার্থক্য লাভ করিয়া পরবর্ত্তীযুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিল্প সম্পর্কীয় উৎকর্ষের সূচনা করিয়াছিল। প্রত্যেক প্রাচীন জাতির জাতীয়তা ও বিশেষত্ব এইরূপে অন্যান্য জাতির জাতীয়তা ও বিশেষত্বের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই স্বাতন্ত্র্য ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের ন্যায় মধ্য যুগেও মানবজাতির কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহাও এইরূপ পরস্পর সংঘর্ষ ও মিশ্রণের ফল। যে সকল অসভ্য, অনার্য্য বা বর্ব্বর জাতি সভ্যজগতের পার্শ্বে থাকিয়া উন্নত জাতিসমূহের যুগপৎ সাহস ও ভীতির কারণ হইয়াছিল, যাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া সভ্য সমাজ এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে নাই তাহারাই নূতনভাবে নূতন শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতির সঙ্গে সমকক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। জীবন সংগ্রামের ফলে একদিকে টিউটন সমাজ অন্ন-সংস্থানের জন্য অন্যান্য সমাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নূতন আবাস নূতন জনপদ সন্ধানের নিমিত্ত বহির্গত হইল। অপর দিকে আরব মরুভূমির এক প্রচারক নূতন দেবতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, আর অমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ একীকৃত হইয়া ধর্ম্মের জন্য দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল। নববলে বলীয়ান্ এই দুই সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য স্থানের অধিবাসিবৃন্দ আকস্মিক উৎপাতের প্রভাব সহ্য করিতে বাধ্য হইল। ফলে এসিয়া ও ইউরোপের প্রাচীন জনপদগুলি নূতনভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া নূতন সভ্যতা গঠনের সূত্রপাত করিল।

ইউরোপ ও এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সীমাগুলি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রোমীয় সাম্রাজ্যের অধোগতি, নূতন রাষ্ট্রের গঠন, ইংলণ্ড ফ্রান্স স্পেন প্রভৃতি বিচিত্র দেশের স্বাধীনতা লাভ, বিবিধ ধর্ম্মসংগ্রাম, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎপত্তি স্বাধীনতা ও বিদ্রোহ, মুসলমান্ রাষ্ট্রের সৃষ্টি, বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও স্বাধীনতা লোপ—সকল বিষয়ই এক মানব-কলেবরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। নূতন জাতির স্বাধীনতা প্রাচীন জাতির পরাধীনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। পূর্ব্বে যাহারা বর্ব্বর নামে অভিহিত হইত তাহারা যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিকে ক্রমে ক্রমে করতলগত করিয়া প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যের বিনাশ সাধন করিতেছিল, এসিয়াতে সেইরূপ এক নগণ্য-জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সমগ্র সভ্যজগতের বিভিন্ন

রাষ্ট্রগুলি পদানত করিয়া নূতন নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতেছিল। ভারতীয় প্রদেশগুলির মুসলমান বিজয়, টিউটন কর্তৃক ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি বিজয়ের অনুরূপ। কোন দেশের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা কেবলমাত্র সেই দেশবাসী লোকের উপর নির্ভর করে নাই। জাতীয় উন্নতি অবনতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব সমগ্র মানব-সমাজের সাধারণ বিকাশের ফল।

আধুনিক কালে স্বাধীনতা বা প্রজা সাধারণের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে কয়েকটা দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে তাহাদেরও ভাগ্য এইরূপে পারিপার্শ্বিক শক্তি সমূহের পরস্পর সহায়তা ও আততায়িতার ফলে সংগঠিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ওলন্দাজ জাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়া ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জগতে নূতন শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়াছিল। কিছুকাল হইতে স্পেন সাম্রাজ্যের অবনতি হইয়া আসিতেছিল। ইহার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ভোগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ফ্রান্সের নরপতিগণ ইহাকে খর্ব্বাকৃতি ও খণ্ডীকৃত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। এই সময়ে ফরাসী নরপতি ইউরোপের অন্যান্য জাতির শক্তিনাশ পূর্ব্বক স্বকীয় আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সুতরাং স্পেন-সম্রাটের স্বাভাবিক শত্রু হইয়া পড়িলেন। জর্ম্মান সম্রাট্ স্পেনীয় সম্রাটের কুটুম্ব ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একমত ছিল না। এই ধর্ম্ম লইয়া ইংলণ্ডের অধীশ্বরী এলিজাবেথের সঙ্গেও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। এদিকে ফিলিপের ধর্ম্মনীতির নির্য্যাতন প্রভাবে স্পেন-সাম্রাজ্য হইতে শিল্পনিপুণ ব্যবসায়ীরা দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থশক্তি হীন হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু যে সময়ে উৎপীড়িত ওলন্দাজেরা উপযুক্ত বীরপুরুষদিগের নেতৃত্বে স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, সেই সময়ে ফ্রান্সের সহিত মনোমালিন্য ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সমর বাধিয়া স্পেনের শক্তি বিভক্ত হইল। কাজেই স্পেনের অবনতি, ফ্রান্সের অভ্যুদয়, ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠা, ওলন্দাজদিগের ধর্ম্ম ও দেশ রক্ষা এক বৃন্তে বহু ফলের ন্যায় গ্রথিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ইহাদের কোনটাই অপরগুলির সহিত সম্বন্ধহীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্পেনের অধোগতি এবং ওলন্দাজদিগের স্বাধীনতা যেমন সমগ্র ইউরোপখণ্ডের এক স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তেমনি ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র ইউরোপকে যথেচ্ছাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য অরেঞ্জ বংশীয় উইলিয়ম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহারই একটা গৌণ ফল স্বরূপ ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্যচ্যুতি এবং প্রজাসাধারণের স্বায়ত্ত শাসন সংঘটিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের এই গৌরবময় বিপ্লব ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে ইংরাজ জাতির স্বকীয় প্রয়োজন সাধনের জন্য সাধিত হয় নাই। সমগ্র ইউরোপ এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যে এমন কি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের নেতা স্বয়ং পোপও তাহারই পৃষ্ঠপোষক ইংলণ্ডের রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জার্ম্মান সম্রাট্ তখন তুরস্কের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত, স্পেনের শক্তি অনেক দিনই খর্ব্ব হইয়াছে। চতুর্দ্দশ লুই এই সুযোগে সমগ্র ইউরোপ গ্রাস করিবার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে এরূপ কোন সমাজের তখন অস্তিত্ব ছিল না। এক ক্ষুদ্র সমাজের অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন বীরপুরুষ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন ; কিন্তু অর্থ ও সেনাবলের অভাব। সুতরাং ইংলণ্ডে যে সমস্ত বৈষয়িক ও সামাজিক সুবিধা আছে, তাহার প্রয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এইজন্য ইংলণ্ডে রাজায় প্রজায় যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহার মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে মানবের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কাজেই ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা উইলিয়ামের জীবনসংগ্রামে প্রধানতম লক্ষ্য হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার নূতন ধর্ম্মের প্রচার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধর্ম্ম-আন্দোলনের শেষ অধ্যায় প্রকটিত হয়। কেবল মাত্র মানবকে নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য ইউরোপের কোন দেশেই প্রাচীন ও নবীন ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব ঘটে নাই। পোপের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক ক্ষমতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া ইউরোপের অন্যান্য নরপতি ও অধিবাসিবৃন্দ যেরূপ ভাবে সম্মিলন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মী

স্বকীয় স্বাধীনতা ও অর্থলাভ এবং বৈষয়িক উন্নতি বিধানের চেষ্টায় যেরূপ আন্দোলন করিতেছিলেন, তাহার ফলে ইউরোপের কর্ম্মক্ষেত্রে জাতিগুলি বিভক্ত ও সজ্জিত হইয়া পরস্পর শক্তিপ্রয়োগ করিতেছিল। ইহাতে কেবল মাত্র ধর্ম্মপ্রচারকেরই স্থান ছিল না, ফ্রান্স জার্ম্মানি এমন কি সুদূর সুইডেনও ধর্ম্মসংগ্রামের আবর্ত্তে পতিত হইয়া নূতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সংঘটনের ব্যবস্থা করিতেছিল। যখন সন্ধি স্থাপিত হইল, তখন দেখা গেল কেবল মাত্র ধর্ম্মের ব্যবস্থাই করা হয় নাই, অধিকন্তু স্পেন, ফ্রান্স, প্রসিয়া, সুইডেন, হলাণ্ড প্রভৃতি সকল দেশেরই রাষ্ট্রীয় সীমাগুলিও নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

সুইডেনের অভ্যুদয় ও ক্রমিক অবনতি, প্রসিয়ার বিকাশ ও ক্রমোন্নতি এবং রুষিয়ার সমৃদ্ধিলাভ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষণের ফলে সাধিত হইয়াছিল। ইউরোপে যখন স্পেন ও জর্ম্মানবংশীয় নরপতিগণের স্থান অধিকার করিয়া ফরাসী জাতি উন্নত হইতেছিল, সেই সুযোগেই প্রসিয়া ও রুষিয়ার অভ্যুদয় ঘটিতেছিল। জর্ম্মানেরা ফরাসী ও তুরস্কীয়দিগের সহিত যখন কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল, সেই সময়ে ইউরোপের সুদূর প্রান্তবাসী স্লাভনীয় জাতি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃ আয়ত্ত করিয়া, রুসিয়া ও প্রসিয়া যেমনই ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনে নবশক্তিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইল, তেমনই সুইডেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া ও তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। জর্ম্মান সম্রাটের অবনতি, ধর্ম্ম-সংস্কারের সংগ্রাম, নূতন নূতন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালাভ একই আন্দোলনের বিভিন্ন ফল।

তুরস্কের অধীনতা হইতে আধুনিক গ্রীসের উদ্ধার এইরূপে সমগ্র ইউরোপেরই সমবেত শক্তির ফলে সাধিত হইয়াছে। অল্পদিন হইল জর্ম্মানি ও ইটালীতে যে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও ইংলণ্ড, তুরস্ক, রুষিয়া ও ফ্রান্সের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত-প্রসূত। আধুনিক জর্ম্মানির সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা, ইটালীর জাতীয় গৌরব, ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র স্থাপন সকলগুলিই পরস্পরাপেক্ষ। কোন বিপ্লবই স্বাধীনভাবে সাধিত হয় নাই। হাঙ্গারি দেশও যে ধীরে ধীরে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র এই দেশের অধিবাসিবৃন্দের বীরত্বের প্রভাবে নহে। রুষিয়া, অষ্ট্রীয়া ও তুরস্কের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বহুদিন হইতে চলিয়াছে, তাহারি মীমাংসা হইয়াছে -অষ্ট্রীয়াকে জর্ম্মান প্রদেশ হইতে বিতাড়িত ও বিজিত হাঙ্গারি প্রদেশের সহিত সমভাগ্য করিয়া। তুরস্ক যে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এখনও ইউরোপের মানচিত্রে স্বকীয় বিশেষ স্থান রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ রুষিয়ার সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরোধ। মধ্যযুগে যেমন রোমান ক্যাথলিক জগতের বিধাতা পোপও বৈষয়িক স্বার্থের বশীভূত হইয়া বিরুদ্ধ ধর্ম্মোপাসক নরপতিগণকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাহায্য করত প্রবল পরাক্রান্ত রোমান ক্যাথলিক সম্রাট্কেও হীন করিবার চেষ্টা করিতেন, আধুনিক কালেও সেইরূপ খৃষ্টান রুষিয়াকে খর্ব্ব করিবার জন্য, ইউরোপের অন্যান্য খৃষ্টানজাতি মুসলমান তুরস্কের এবং এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের বন্ধু হইয়া উঠিয়াছেন।

প্রকৃত কথা এই—যেমন কোন ব্যক্তি সমগ্র প্রাকৃতিক ও মানবীয় জগৎকে অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র নিজ শরীরের ও মনের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া এক দণ্ডও জীবিত থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই তাহাকে বেষ্টনী হইতে নিজের উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কলেবর ও চিত্ত পুষ্ট করিতে হয়, এবং যতদিন তাহার এই শক্তি থাকে ততদিন তাহার জীবনের বিকাশ, সেইরূপ কোন জাতিই অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তাহাদের সহিত নিজের সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া একদণ্ডও মানব-জগতে স্থির থাকিতে পারে না। কোন জাতির স্বাধীনতা ও উন্নতি কেবলমাত্র সেই দেশীয় বীর পুরুষগণের চেষ্টা, তাহাদেরই বাহু ও চারিত্র বলে সাধিত হইতে পারে না। সকলকেই সম-সাময়িক জগতের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক শক্তিগুলির সমাবেশ পর্য্যালোচনা করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও গতি স্থির করিতে হয়। এই উপায়ে সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্ববিধ শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক জাতির বিচিত্র ভাগ্য গঠিত হয় বলিয়া অনেক সময়ে বহু ঘটনা আকস্মিক ও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে

জাতীয় উন্নতি অবনতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মের অভাব নাই।

রাষ্ট্রশাসনপ্রণালীও এইরূপে পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জের দ্বারাই গঠিত হয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি মানবের সুবিধার জন্য: সুতরাং রাষ্ট্রকে অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। এই কারণে রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুরূপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রকৃতিপুঞ্জের রাষ্ট্রীয় অধিকার অনেক বেশী হইবার কারণ এই যে বিদেশীয় শত্রু হইতে এই দুই দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইতে হয় না, ইহারা প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারাই সুরক্ষিত। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা অত্যধিক ছিল বলিয়া চতুর্দ্দশ লুইকে, সমীপবর্ত্তী জাতিসমূহ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য, শাসনপ্রণালী অতি কঠোর করিতে হইয়াছিল। প্রসিয়াও যখন প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল তখন ইহার চতুঃপার্শ্বেই শত্রু বিরাজমান। এজন্য প্রসিয়ার নরপতিগণকে প্রথম হইতেই অতি সাবধানে রাজকার্য্য সমাধা করিতে হইত। ইহার ফলে প্রজার অধিকার খর্ব্ব ও শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইউরোপের মধ্য যুগে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হইবার প্রধান কারণ এই যে, সকল রাষ্ট্রের ঐক্য ও স্বাধীনতা প্রবল পরাক্রান্ত রাজার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অনৈক্য ধনী সম্প্রদায় ও ভূম্যধিকারীদিগের রাজালিপ্সা খর্ব্ব করিয়া নূতন রাষ্ট্রীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এইরূপ প্রবল রাজতন্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল। সুতরাং কি ফ্রান্স, কি ইংলণ্ড, কি স্পেন, এবং পরবর্ত্তী কালে প্রসিয়া এবং রুশিয়াও ধর্ম্ম, শিক্ষা, ব্যবসায়, সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রজার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু ভারত মহাদেশের বিভিন্ন সমাজগুলিকে রাষ্ট্রীয় বিধানের দ্বারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবার সুযোগ ছিল না বলিয়া, এখানে প্রাচীন গ্রাম্য জীবনের স্বাধীনতা ও সামাজিকতা রক্ষা পাইয়াছিল।

বিদেশীয় রাষ্ট্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সাবধান হইতে হয়, সেইরূপ স্বদেশীয় বিদ্রোহ-দমন ও অশান্তি নিবারণের জন্যও সকল শাসনকর্ত্তাদিগের প্রস্তুত হইতে হয়। স্পার্টার কঠোর শিক্ষানীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আন্তর্দেশিক হেলট জাতির শত্রুতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যে স্থানে প্রজা অতিশয় দুর্দ্দান্ত অথবা যে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতি মুহূর্ত্তেই লুপ্ত হইতে পারে সেই দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে অতিশয় কঠোর ব্যবস্থা করিতে হয়। যে জাতির মধ্যে বহুবিধ অনৈক্য, মতভেদ এবং অশান্তির কারণ বর্ত্তমান, যে দেশের অধিবাসীবৃন্দ কখন একমত হইয়া কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হয় নাই, তাহার রাজা যথেচ্ছাচারী না হইলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন না। ফরাসীবিপ্লবের ফলে নেপোলিয়নের আবির্ভাব, কিন্তু নেপোলিয়ন কার্য্য আরম্ভ করিলেন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া। এই জন্যই যখন কোন বিপ্লবের আশঙ্কা করা হয় তখন রাজনীতি প্রজার সাহানুভূতি পরিত্যাগ করিয়া ভীতিসঞ্চারকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রতিপদে সামরিক আইন, বিনা বিচারে দণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা না করিলে দুর্দ্দান্ত প্রজা ভীত ও শান্ত হইতে পারে না। আবার এই জন্য যখন কোন বিপ্লব সফল হয়, তখন বিপ্লবকারীদিগকে অতি কঠোর রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। তাহা না করিলে প্রতিক্ষণেই পুরাতন রাষ্ট্রীয় দল সুযোগ পাইয়া নূতনের বিনাশ সাধন করিতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে যতবার রাষ্ট্র পরিবর্ত্তন হইয়াছিল প্রত্যেক বারই এইরূপ পুরাতন দলের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য নির্য্যাতন নীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এমন কি যাহারা ধর্ম্মমত, সামাজিক মত অথবা রাষ্ট্রীয় উন্নতি বিধান বিষয়ে নূতন নূতন সম্প্রদায় গঠন করিবার ইচ্ছায় শিষ্য ও ভক্ত সমবেত করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদিগকেও এইরূপ কঠোর শাসননীতি অবলম্বন করিতে হয়। স্বকীয় পুষ্টিসাধনের জন্য শক্তি সংহত ও সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রথম অবস্থায় সেবকগণের মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ প্রদান করিলে সম্প্রদায় একেবারে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ক্যাল্‌ভিনের ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং জেসুইট ক্যাথলিকগণের মধ্যে এইরূপ কঠোর শিক্ষা ও শাসন নীতি প্রচলিত হইয়াছিল।

পারিপার্শ্বিক প্রভাবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সীমা এবং

রাষ্ট্রীয় আকৃতি ও প্রকৃতিই গঠিত হয়, এমন নহে। অন্যান্য জীবের জীবন এবং বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হয়, মানবজীবনের অন্যান্য অভিব্যক্তিগুলিও সেইরূপ রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির ন্যায় দেশ কাল ও বেষ্টনীর বিবিধ শক্তিপুঞ্জ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সপ্তম শতাব্দীতে মহম্মদ এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তখন রোমীয় ও পারস্য সাম্রাজ্য কতগুলি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টিমাত্র রূপে অতিশয় হীনাবস্থায় রহিয়াছিল। বিভিন্ন জাতিসকল মহম্মদের নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইল। এই ঐক্যে যে রাষ্ট্রীয় শক্তি গঠিত হইয়াছিল তাহার ফলে এসিয়া ও ইউরোপের বহু রাষ্ট্র বিধ্বস্ত হইয়া নূতন মসলমান সাম্রাজ্যের গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। এইরূপে এক ধর্ম্মমত বেষ্টনীর প্রভাবে প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল। যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মও এইরূপে প্রথম অবস্থায় উপাসক মণ্ডলীর মধ্যেই ধর্ম্মমত রূপে পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ এরূপ বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব লাভ করিয়াছিল যে রোমীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার সময়ে খৃষ্টান সম্প্রদায়ই প্রকৃত রাষ্ট্রের স্থান অধিকার করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করিল, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহে অভ্যাগত টিউটন বিজেতৃগণকে সর্ব্ববিধ উপায়ে সাহায্য করিয়া নূতন নূতন শাসনপ্রণালীবিশিষ্ট রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। এবং অটো দি গ্রেটের ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মান সাম্রাজ্য এইরূপ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহায়তাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কালে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আধিপত্য এতই প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইউরোপের সকল দেশের রাজা এবং সম্রাট্‌গণ ধর্ম্মসমাজের নেতা পোপের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। এই ধর্ম্মসমাজের রাষ্ট্রীয় প্রতাপই মধ্য যুগে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং সংগ্রামসমূহের মূলীভূত কারণ। কেবলমাত্র নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অভাব পূরণ করিবার জন্যই মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমসাময়িক জগতের সামাজিক, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব মোচনের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় নাই বলিয়াই এই দুই ধর্ম্ম-সমাজ সামরিক ও বৈষয়িক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া মানবজগতের উন্নতিবিধানে সহায়তা করিয়াছিল। আমাদের দেশেও বাবা নানকের শিখ্‌ সম্প্রদায় ধর্ম্মের অভাব মোচনের জন্য উত্থিত হইয়া ক্রমে অত্যাচার দমন এবং রাষ্ট্রীয় শান্তি ও সুব্যবস্থা বিধানের জন্য বৈষয়িক মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় রণ সমাজ, মিস্‌ল্‌ ও খাল্‌সাতে পরিণত হইয়াছে।

বেষ্টনীর প্রভাবে জীবন সর্ব্বত্র একই রূপে অভিব্যক্ত হয় না। কেবল মাত্র রাষ্ট্র ও ধর্ম্মই জীবিত সমাজের লক্ষণ নহে। মানবজীবন কখনও কলাবিদ্যায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও সংগ্রামে, কখনও বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিকাশ লাভ করে। এই বেষ্টনীর প্রভাবেই দার্শনিকগণ কালে কালে বিচিত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যুগধর্ম্মের উপযোগী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গ্রীক জগতের দর্শনবাদ রোমীয় দর্শনবাদের অনুরূপ নহে। মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় ও দার্শনিক গবেষণা আধুনিক চিন্তার প্রতিকৃতি নহে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমস্যার মীমাংসা করিতে হইয়াছে বলিয়া মনু, অ্যারিষ্টটল, বেকনের মধ্যে পরস্পর বৈসাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে। যেখানে কোন অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে, সেইখানেই জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া মানব কখনও রাষ্ট্রীয়, কখনও সামাজিক, কখনও সাহিত্যিক, কখনও ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলন করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে। বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের দ্বারা যেমন রাষ্ট্রের বিচিত্র আকৃতি ও প্রকৃতি গঠিত হয়, তেমনি বিচিত্র ভাব ও প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মানব বিচিত্র আন্দোলন করে। রাষ্ট্রীয় অবসানেও জীবনের অবসাদ হয় না। জীবনীশক্তি ধর্ম্মের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কখনও শিল্পে, কখনও ব্যবসায়ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া সাহিত্যে, কখনও বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের আন্দোলনে পরিস্ফুট হয়। এই জন্য একই আদর্শ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে প্রজাসাধারণের আয়ত্ত সাধন ও অধিকার বিস্তার, ব্যবসায় ও বৈষয়িক ব্যাপারে সাম্যবাদ সোস্যালিজম্‌) ও (প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণতা, ধর্ম্মে জীবমাত্রের আত্মার বিকাশ, সাহিত্যে ভাবুকতা এবং কলাক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয়তার আকার ধারণ করে। ইহারই ফলে ফরাসীবিপ্লব-প্রসূত রাষ্ট্রীয় শক্তি সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া

নিম্ন জাতির অধিকার ঘোষণা করিয়াছে, সাহিত্যকে আধ্যাত্মিক ও আবেগময় করিয়া তুলিয়াছে, ধর্ম্মকে মানবের উপকার ও লোকহিত ব্রতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং মানবের সাধারণ চিন্তাপ্রণালীকে এক অপূর্ব্ব সাহস ও বিচিত্র শক্তি প্রদান করিয়া বিবিধ বিজ্ঞানের পুষ্টি সাধন করিয়াছে।

সুতরাং প্রাণ বিজ্ঞানমূলক ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষা এই যে কোন জাতির কোন ঘটনাই সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত নহে। সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞানচর্চ্চা, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, স্বাধীনতালাভ, দেশজয় —সকলই বিভিন্ন জাতির সর্ব্ববিধ আন্দোলনের অধীন। জাতীয় আকৃতি ও প্রকৃতিগুলি পরস্পর সংগ্রাম ও সংঘর্ষণে পরিপুষ্ট হয়। এই সংগ্রাম ও সংঘর্ষণ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, এই জন্য বিভিন্ন কালে মানবসমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন সজ্জ ও জাতির রূপ গ্রহণ করে। কোন অভিব্যক্তির রূপ, আকৃতি ও প্রকৃতি স্থায়ী নহে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। বেষ্টনীর পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া মানব যতদিন বিভিন্ন আন্দোলনের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবে, ততদিন মানবের নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আন্দোলনেও জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে।

কিন্তু মানবের সহিত অন্যান্য জীবের একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। বেষ্টনীর প্রভাবে সকল জীবই গঠিত হয় এবং জীব বেষ্টনীকে ব্যবহার করিয়া পরিপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু একমাত্র মানবই নিজের বেষ্টনী নিজে সৃষ্টি করিয়া লইয়া নিজের ইচ্ছামত বিকাশ সাধনের আয়োজন করিতে পারে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলিকে নিজের অনুকূল করিয়া লইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বিধানের শক্তি একমাত্র মানবেরই আছে। মানব চেষ্টা করিয়া অনায়ত্তকে আয়ত্ত করিতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পদানত করিয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, দেশকালকে খর্ব্ব করিয়া নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে পারে; সমাজকে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উন্নীত করিয়া নূতন ভাব, নূতন ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা অঘটন ঘটাইতে পারে। মানবের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি অসাধ্য সাধন করিয়াছে। অধ্যবসায় ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা অনুপযুক্তকে উপযুক্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। ইংলণ্ডের আলফ্রেড, ফ্লোরেন্সের লোরেঞ্জো, ফ্রান্সের নরপতিগণ, বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রচারকেরা, রোমান ক্যাথলিক জেস্যুট সম্প্রদায়, প্রসিয়ার ফ্রেডরিক, রুশিয়ার পিটার ও ক্যাথেরিন এইরূপে মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন কালে নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়া মানবকে নূতন নূতন কর্ত্তব্যের অধিকারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই মানবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে নূতন অবস্থায় আনীত হইয়া নবযুগের অভিনব বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছে এবং মানবজাতিকে নূতন সমস্যায় নিক্ষিপ্ত করিয়া নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে।

সুতরাং কোন সময়ে কোন জাতি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে, অথবা পৃথিবীর কোন উদ্দেশ্য কোন রাষ্ট্রবিপ্লবে বা ধর্ম্মপ্রচারে সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা কেবলমাত্র বেষ্টনীর শক্তি সমুচ্চয়ের উপর নির্ভর করে না। পারিপার্শ্বিকভাব ও শক্তিসমূহই এবং জাতিগুলির পরস্পর সংঘর্ষণই প্রত্যেক জাতির চরিত্র গঠন করিয়া দেয় বটে; কিন্তু এই সংঘর্ষণ ও সংগ্রামের স্বাভাবিক ফলগুলিকে পরিচালিত করিবার সামর্থ্য ও উপযোগিতাই যুগোপযোগী বিপ্লব ও অবস্থা সংঘটনের কারণ। কেন একই সময়ে এক সমাজের উন্নতি, অপর সমাজের অবনতি, একস্থানে শিল্প নাশ, অন্য স্থানে ধর্ম্ম-প্রচার, এক দেশের রাজ্যলাভ, অন্য দেশের সাহিত্য প্রতিষ্ঠা, এবং কেন বিভিন্ন কালে একই জাতির বিভিন্ন আচরণ ও আন্দোলন সংঘটিত হয়, তাহার জন্য এইরূপ ক্রিয়াশীল শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ই দায়ী। পারি-পার্শ্বিকের ব্যবহার করিয়াই মানব ক্রমশঃ বৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু কোন সময়ে ভারত, মিশর, গ্রীস্, কোন সময়ে রোম, কখনও মুসলমান, কখনও স্পেন উন্নত জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই জন্যই ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রুশিয়া ও জার্ম্মানি বিভিন্ন অবস্থায় ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সময়োপযোগী সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। এজন্যই কখনও নাস্তিকতা, কখনও একেশ্বরবাদ, কোথাও খ্রীষ্টধর্ম্ম, কোথাও ইসলাম,

কোথাও সাম্রাজ্যনীতি, কোথায়ও ব্যবসায়নীতি, কখনও প্রজাতন্ত্র, কখনও রাজতন্ত্র মানবের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। এজন্যই বহুবার হাঙ্গারি জার্ম্মানি ও ইটালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

ফলতঃ কোন্ চিন্তা, কোন্ আদর্শ জগতে কখন প্রভাবান্বিত হইবে তাহা আকস্মিক বা দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করে না। মানবের পুরুষকারই এই ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বেষ্টনী সৃষ্টি করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তই মানব পুরাতনের প্রয়োগ করিয়া নূতনের উদ্ভাবন করিতেছে, এবং পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলি আয়ত্ত করিয়া ইহাদেরই সাহায্যে ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। মানবসমাজের চিন্তা ও কর্ম্ম শক্তিগুলি যেরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন বিধান করিয়া বর্ত্তমান যুগের কোন্ "বর্ব্বর" জাতি জগতের ভারকেন্দ্র নূতন স্থানে সন্নিবেশিত করিবার সূচনা করিতেছে এবং এই আন্দোলনের ফলে যে নূতন শক্তির সমাবেশ হইবে তাহা ব্যবহার করিবার জন্য কোন্ সমাজের কোন্ মহাবীর প্রস্তুত হইতেছেন তাহাই এখন মানবজাতির ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। জগতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে ব্যক্তি সুযোগ-সমূহ ব্যবহার করিয়া অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এবং পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন করিয়া নূতন বেষ্টনী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন সেই প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষই ভবিষ্যৎ মানবসমাজের অগ্রদূত। যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভাব ও শক্তিসমূহ নিজের প্রয়োজন মত প্রয়োগ করিয়া নূতন অবস্থা সংঘটনের সূত্রপাত করিবার উপযুক্ত একজন মাত্র ব্যক্তি থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত মানব-সমাজ যুগে যুগে দেশে দেশে বিচিত্র অবস্থায় বিচিত্র তথ্যের আলোচনা ও বিচিত্র আন্দোলনের পুষ্টিসাধন করিয়া বিচিত্র সত্যের আবিষ্কার করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানব-জাতির আশা অটুট থাকিবে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার,
অধ্যাপক, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা।

নবীন সন্ন্যাসী

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভয়বিহ্বল।

নিদ্রাযোগে গোপীকান্ত বাবু স্বপ্ন **দেখিলেন**, যেন তিনি কলিকাতা চৌরঙ্গির রাস্তায় অলসভাবে পদচারণা করিতেছেন। সারি সারি ইংরাজি দোকানগুলিতে বিবিধ পণ্য দ্রব্য দেখিলে অন্তঃকরণে ক্রয়-বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। একটা সোনা রূপার দোকানের বিস্তৃত বহির্ভাগ স্ফটিকাবৃত—ভিতরে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ঘড়ি, চেন, আংটি, ব্রোচ, নেকলেস প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। মাঝে মাঝে একটা করিয়া বিদ্যুতের গোলক জ্বলিতেছে। দ্রব্যগুলির গঠন ও পালিস দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। গোপীকান্ত বাবু সেইখানে দাঁড়াইয়া লুব্ধনেত্রে জিনিষ-গুলি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় নিজ পকেটের মধ্যে যেন কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, একজন গাঁটকাটা তাঁহার মনি-ব্যাগটি হাতে করিয়া ছুটিয়াছে। গোপীকান্ত বাবু 'চোর চোর' করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার পা যেন জড়াইয়া জড়াইয়া যাইতে লাগিল। চৌরঙ্গির ফুটপাথে কে যেন রাশি রাশি বালি ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে ছুটিতে গেলে পা বসিয়া যায়। হঠাৎ দেখিলেন, যেন দুই দিক হইতে দুইজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি হতভম্ব হইয়া বলিলেন—"মহাশয় আমাকে ধরেন কেন? ঐ চোর পলাইতেছে উহাকে ধরুন।"—ইন্‌স্পেক্টরদ্বয় যেন তাঁহাকে এক গুঁতা দিয়া বলিল—"কে চোর কে সাধু পরে প্রমাণ হইবে—এখন থানায় চল।" বলিয়া তাঁহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া, টানিতে টানিতে লালবাজার থানায় লইয়া গিয়া পুলিস কমিসনর সাহেবের নিকট হাজির করিল। সাহেবের সেই মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, চক্ষু বুজিয়া হাই তুলিলেন, এবং তিনবার তুড়ি দিয়া বলিলেন—"যতক্ষণ না স্বীকারোক্তি করে—ইহাকে নাগর দোলায় চড়াইয়া দাও।" পুলিস-আপিসের উঠানে যেন একটা বৃহৎ

নাগরদোলা ছুলিতেছিল—তাহাতে সাহেব বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ অনেকেই আরোহণ করিয়া আছে। যাহারা স্থান পাইয়াছে তাহারা শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে যাহাদের স্থানাভাব—তাহারা বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। গোপীকান্ত বাবু যে বাক্সটায় উঠিয়াছিলেন, তাহাতে যথেষ্ট গদি আঁটা স্থান থাকায় তিনি শয়ন করিলেন। অল্প নিদ্রাবেশ হইবা মাত্র যেন নাগরদোলা হঠাৎ থামিয়া গেল ঝাঁকনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সত্য সত্যই জাগিয়া শুনিলেন বাহিরে ষ্টেশনের কুলিরা হাঁকিতেছে "দমদমা।"

গোপীকান্ত বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিয়া জানালা দিয়া প্ল্যাটফর্মের পানে চাহিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমটা মনে হইল, —এ দুঃস্বপ্ন ভয়হেতুক। পুলিস পুলিস চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন তাই নিদ্রিতাবস্থাতেও পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বোধোদয়ের মন্তব্য মনে পড়িল—স্বপ্ন অলীক কল্পনা মাত্র। আমরা জাগ্রতাবস্থায় যে সকল বিষয় চিন্তা করি, রাত্রে তাহাই স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। ব্যাগটা খুলিয়া, একটি চুরট বাহির করিয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন গোপীকান্ত বাবুর মনে হইতে লাগিল, বোধোদয়ের কথা বাস্তবিকই কি ঠিক?—স্বপ্নে দেবতারা আমায় সাবধান করিয়া দিতেছেন ইহাও ত হইতে পারে। হয়ত বা সেখানকার পুলিস আমাকে গেরেপ্তার করিবার জন্য কলিকাতার পুলিস কমিসনারকে তার দিয়াছে কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র আমার হাতে হাতকড়ি পড়িবে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে হয়ত বা তাহারা আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহা যদি হয়, তবেই ত সর্ব্বনাশ। কেন আমি দমদমায় নামিয়া পড়িলাম না? এখন ত আর উপায় নাই। গাড়ী কয়েকমিনিট পরেই শিয়ালদহে পৌঁছিয়া যাইবে। সেখানে প্ল্যাটফর্ম্মে হয়ত সত্য যমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুলিস সার্জ্জণ্ট দাঁড়াইয়া আছে। আমার এই টিকিট দেখিলেই বুঝিতে পারিবে আমি সেথান হইতে আসিতেছি—অপর পরিচয়ের আবশ্যক হইবে না। কি করি টিকিটখানা ফেলিয়া দিব? বলিব এখন যে যশোর হইতে আসিতেছি—কিম্বা বনগ্রাম হইতে আসিতেছি টিকিট হারাইয়া গিয়াছে। খুলনা হইতে ডবল ভাড়া লইবে—তা লউক।—এই ভাবিয়া গোপীকান্ত বাবু টিকিটখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া, জানালার বাহিরে সেখানি ধরিয়া হাত হইতে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সেই সময় একটা দমকা বাতাস আসিয়া, টিকিটখানা ভিতর দিকে উড়াইয়া গোপী বাবুর পদতলে ফেলিল।

ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন। ভাবিলেন বুঝিয়াছি। পুলিস এখনও ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছে নাই। বরং হারাণো টিকিটের দ্বিগুণ মাসুল জমা করিবার গোলমালে যে বিলম্ব হইত, সেই সময়ের মধ্যে পুলিস আসিয়া পড়িত। ভগবান আমায় রক্ষা করিয়াছেন। আমি ষ্টেশনে নামিয়াই কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া যাইব। হাওড়া ষ্টেশনেও যাইবার প্রয়োজন নাই। বরং দুই তিনটা ষ্টেশন পার হইয়া গিয়া, পশ্চিমের গাড়ীতে চড়া যাইবে।

দেখিতে দেখিতে খুলনা মেল আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে দাঁড়াইল। গোপী বাবু সভয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহাকে ধরিবার কোনও উদ্যোগ দেখিতে পাইলেন না। তখন নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একজন গাড়োয়ান তাঁহাকে বলিল—"কোথা যাবেন বাবু?"

গোপী বাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"শ্রীরামপুর।"

"আসুন বাবু—দেড় টাকা ভাড়া লাগবে। এখান থেকে হাওড়ার দেড় টাকা ভাড়া বাঁধা আছে। সেকেন কেলাস গাড়ী বাবু"

গোপী বাবু বলিলেন—"হাওড়া কেন? রেলে যাব না।" এমন সময় আরও দুই তিন জন গাড়োয়ান আসিয়া —"কোথা যাবেন বাবু—ঐ আমার গাড়ীতে আসুন"—বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

পূর্ব্বোক্ত গাড়োয়ান —"পাঁচসিকে দেবেন?—এর কমে পাবেন না"—বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ব্যাগটা লইল। গোপী বাবু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িল।

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া একটিও নক্ষত্র দেখা যাইতেছে না। পথ-

পার্শ্বস্থ গ্যাসের লণ্ঠনগুলি ভাল আর জ্বলিতেছে না—এখনি নিবিয়া যাইবে। গাড়ী ঠনঠনিয়ার মোড় পার হইতে না হইতেই ঝড় উঠিল। সে বিষম ঝড়—ঘোড়ার গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। ধূলার চোটে গোপীকান্ত বাবুর চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি অনেক কষ্টে গাড়ার জানালাগুলা তুলিয়া দিলেন। মিনিট পাঁচেক পরেই প্রবলবেগে বারিপতন আরম্ভ হইল। গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়া জলের ছাট আসিয়া গোপী কান্ত বাবুর পিরাণ ভিজাইয়া দিল। ঘোড়া পায় পায় চলিতে লাগিল। এইরূপে অৰ্দ্ধঘণ্টা কাটিলে, বৃষ্টিটা একটু কমিল। গোপীকান্ত বাবু ভাবিলেন—এতক্ষণ হয় ত হাওড়ায় পৌছিয়াছি। একটা জানালা নামাইয়া দেখিলেন --বামদিকে সারি সারি কাঠের গোলা তাহার পশ্চাতে রেল, তাহার পশ্চাতে গঙ্গা।

তখনও বেশ বৃষ্টি পড়িতেছে। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন "কোচম্যান---এ কোথা আনলে?"---জলে গোপীকান্ত বাবুর মাথা ভিজিয়া গেল।

কোচম্যান কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। গোপী বাবুর স্বর সে পুরু কম্বল ভেদ করিয়া তাহার কর্ণে পৌছিল না।

অৰ্দ্ধমিনিট পরে গোপীকান্ত বাবু আবার মাথা বাহির করিয়া বলিলেন--"কোচম্যান ও কোচম্যান।"

কোচম্যান বলিল- "তাড়াহুড়ো কচ্ছেন কেন বাবু—এখনও ঢের সময় আছে।"--বলিয়া সে শ্রান্ত অশ্বযুগলকে চাবুক মারিল। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

গোপীকান্ত বাবু ভাবিলেন—মাথা যাহা ভিজিবার তাহা ত ভিজিয়াছে। কোথায় লইয়া যাইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোন্নগর যাইতে হইলে বামদিকে গঙ্গা থাকিবার ত কথা নয়—দক্ষিণে থাকিবার কথা। তাই আবার তিনি মাথা বাড়াইয়া বলিলেন--"কোচম্যান—ও কোচম্যান—এ কোথা নিয়ে চল্লে?"

বলিতে বলিতে গাড়ী দাঁড়াইল। গোপী বাবু বলিলেন—"এ কোথায় আনলে?"

"এই ত বাবু হাটখোলার ঘাট।"

"হাটখোলার ঘাট?—হাটখোলার ঘাটে কেন আনলি?"

"এইখান থেকেই ত ইষ্টিমার ছাড়ে।"

গোপীকান্ত বাবু বলিলেন—"ইষ্টিমার ছাড়ে!---ইষ্টিমার কি?"

গাড়োয়ান বলিল --"ইষ্টিমার, ইষ্টিমার! কলের জাহাজ। আগিন্ বোট---ধুঁয়াকস্।"

"কলের জাহাজ ছাড়ে ত আমার কি? আমি যে শ্রীরামপুর ভাড়া করলাম?"

"বাঃ---আপনি বল্লেন রেলে যাব না। মানুষ যদি রেলে না যায় তা'হলে ইষ্টিমারে যায়। এইখান থেকে সাড়ে সাতটায় ইষ্টিমার ছাড়বে।"

গোপী বাবু রাগিয়া বলিলেন---"ওরে মুখ্যু! --রেলে যাব না বলেছিলাম তার মানে সমস্ত পথ ঘোড়ার গাড়ীতে যাব।"

গাড়োয়ান জিহ্বা ও তালুতে ঘোড়া তাড়ান শব্দ করিয়া বলিল—"সমস্ত পথ ঘোড়ার গাড়ীতে শ্রীরামপুর যাবেন---পাঁচসিকে ভাড়ায়! সত্যযুগ আর কি! এখন নামবেন কি না বলুন।"

এই সময় ষ্টিমার বংশীধ্বনি আরম্ভ করিল। গোপীকান্ত বাবু নামিয়া পড়িয়া, গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া, টিকিট আপিসে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন -"মহাশয় এ জাহাজ কোথা কোথা দিয়ে যাবে?"

বাবুটি বলিলেন—"হুগলি হয়ে কালনা।"

"আচ্ছা—আমায় একখানা হুগলির টিকিট দিন।"

টিকিট লইয়া গোপী বাবু ষ্টিমারে আরোহণ করিলেন। এ জাহাজখানির নাম হংসেশ্বরী। আরও কয়েকবার বংশীধ্বনি করিয়া হংসেশ্বরী ছাড়িয়া দিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী ঠাকুর।

গোপী বাবু দ্বিতীয় শ্রেণী ক্যাবিনের টিকিট লইয়াছিলেন। ক্যাবিনে গিয়া দেখিলেন, সেখানে অত্যন্ত গরম। তাই ব্যাগটি সেখানে রাখিয়া, উপর ডেকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে দুইখানি বেঞ্চি পাতা আছে—তাহাই মধ্যম শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা ডেকের উপর কেহ কম্বল পাতিয়া, কেহ মাদুর বিছাইয়া, কেহ

শুধু কাষ্ঠের উপর বসিয়া আছে। কেহ গল্প করিতেছে—কেহ তামাক খাইতেছে—কেহ বা শূন্যমনে তীরভূমির দিকে চাহিয়া আছে। মধ্যম শ্রেণীর দুইখানি বেঞ্চিতে সাত আট জন ভদ্রলোক বসিয়া।

গোপীকান্ত বাবু জাহাজের রেলিং ধরিয়া তীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অৰ্দ্ধঘণ্টায় কলিকাতা শেষ হইয়া জাহাজ উত্তরপাড়ার ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় কিয়ংক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শ্রীরামপুর-শ্রীরামপুরের পর শেওড়াফুলি ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইতে বেলা নয়টা বাজিল। গোপীকান্ত বাবু এতক্ষণ মাঝে মাঝে উপর ডেকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, মাঝে মাঝে ক্যাবিনে গিয়া বসিতেছিলেন। এখন তাঁহার মন হইতে পুলিসভীতি অনেকটা তিরোহিত। ভাবিতেছিলেন,—"কলিকাতার কমিসনার আমার সম্বন্ধে যদি টেলিগ্রাম পাইয়াও থাকে, আর আমার সন্ধান করিতে পারিতেছে না। এখন হুগলিতে গিয়া রেলে চড়িতে পারিলেই নিশ্চিন্ত।"

শেওড়াফুলি ঘাটে আসিয়া জাহাজ লাগিলে, গোপী বাবু রেলিং ধরিয়া যাত্রীদের নামা ওঠা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে,—একজন সন্ন্যাসী উঠিতেছেন। তাঁহার মস্তকে দীর্ঘ জটা, বেণীর আকারে আবদ্ধ। মুখমণ্ডলের অধিকাংশই গুম্ফ ও শ্মশ্রুর জঙ্গলে আবৃত। অল্প যাহা দৃশ্যমান ছিল, সেটুকু ভস্মমাখা। বক্ষ পৃষ্ঠ ও বাহুযুগলও ভস্মাবৃত। বামস্কন্ধে একটা ঝুলি—বামহস্তে একটা চিমটা ও একখানা ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম এবং দক্ষিণ হস্তে একটি তাম্রনিৰ্ম্মিত কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসীঠাকুর উপর-ডেকে আসিয়া দর্শন দিলেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুৰ্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, যাত্রিগণের একটা সংক্ষিপ্ত চক্ষুপরিচয় করিয়া লইলেন। পরে, পূৰ্ব্ব-মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া, পৰ্দ্দায় পৰ্দ্দায় স্বর তুলিয়া, উৰ্দ্ধমুখে বলিলেন—"তারা—তারা—তারা।" তাঁহার স্বর যেন ক্রোধব্যঞ্জক—শুনিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে—বুঝি তারা মা সন্ন্যাসীঠাকুরের নিকট কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধী—দেবী তজ্জন্য সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

জাহাজসুদ্ধ লোক সন্ন্যাসীঠাকুরের ভাবভঙ্গি দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল—কেবল মধ্যম-শ্রেণীর বেঞ্চিতে উপবিষ্ট দুই তিনজন নব্য যুবক মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। সন্ন্যাসীঠাকুর বক্রনয়নে একবার তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহাদেরই অনতিদূরে বাঘছালখানি বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। যাত্রিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল—"ঠাকুর প্রণাম হই।" "জিতা রও" বলিয়া বাবা তাহাদিগকে আশীৰ্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর ও চক্ষুর ভঙ্গি একপ্রকার যেন তাঁহার আন্তরিক কথা—"ভস্ম হও।"

কিয়ংক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবার পর, সন্ন্যাসীঠাকুর ঝুলিটি হইতে কিঞ্চিৎ গাঁজা ও একটি সরু ছোট কলিকা বাহির করিলেন। বাম করতলে গাঁজাটুকু রাখিয়া, দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা সজোরে মৰ্দ্দন করিতে লাগিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীঠাকুরের প্রতি চাহিয়া রহিল। ইত্যবসরে নব্যযুবক কয়টি সরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীঠাকুরের আসনের অনতিদূরে বসিয়াছিল। একজন বলিল "ঠাকুর, আপনি গাঁজা খান কেন?"

প্রথমে মনে হইল, কথাটা যেন ঠাকুরের কানে যায় নাই কারণ তিনি বালকের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, আপন মনে গাঁজা ডলিয়া যাইতে লাগিলেন। অপর সকলে যুবকের প্রতি ভৎসনাপূর্ণ কটাক্ষ করিল। প্রায় অৰ্দ্ধ মিনিট পরে, প্রশ্নকারী যুবকের প্রতি নিজ রক্তবর্ণ চক্ষুযুগল স্থাপন করিয়া, গম্ভীর চাপা গলায় ঠাকুর বলিলেন—"কি বল্লে?"

ঠাকুরের ভঙ্গি দেখিয়া যুবকের মনে একটু শঙ্কা উপস্থিত হইল।

সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"জিজ্ঞাসা করছিলাম—গাঁজাটা কেন খাওয়া হয়—ওর কি কোনও বিশেষ গুণ আছে?"

যুবকের সন্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঠাকুরের বিরক্তি যেন কতকটা প্রশমিত হইল। পূৰ্ব্ববৎ চাপা গলায় বলিলেন—"মনস্থির হয়।"—বলিয়া, গাঁজাটুকু কলিকায় সাজিয়া, অগ্নিসংযোগ করিলেন। ঘন ঘন কয়েক টান টানিয়া,—একটা লম্বা গোছের টান দিলেন—অবশেষে মুখগহ্বর হইতে অজস্র ধূমোদ্গার করিয়া, কলিকাটি নামাইয়া বলিলেন—"কেউ প্রসাদ পাবে?"

গোপীকান্ত বাবুর এ অভ্যাসটি ছিল—কিন্তু অত্যন্ত গোপনে এ কার্য্য করিতেন। প্রসাদ পাইবার লালসা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। আবার মনে হইল, এমন প্রকাশ্য স্থানে, এতলোকের সম্মুখে, গাজা খাইব? তাহার পর মনে হইল, তুমিও যেমন এখানে কেউ বা আমাকে চেনে? আমি *যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক জমিদার—তাহা কেউ বা জানে?* এই বিবেচনা করিয়া, অবনত মস্তকে তিনি ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া, গাজার কলিকাটি লইলেন।

গোপী বাবু প্রসাদ পাইতে লাগিলেন—আর সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গোপী বাবু কয়েক টান টানিয়া কলিকাটি সন্ন্যাসীর হাতে দিবা মাত্র তিনি বলিলেন "তোমার কপালে রাজদণ্ড দেখছি।"

কথাটা শুনিয়া গোপী বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন —"এর অর্থ কি বাবা?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"যে ব্যক্তির কপালে রাজদণ্ডের চিহ্ন থাকে, সে হয় জেলে যায় নয় রাজা হয় অর্থাৎ রাজসম্পদ পায়। তোমার হাতটা দেখি।"

ত্রস্তভাবে গোপী বাবু নিজের হাত বাড়াইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে সেখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিলেন। শেষে বলিলেন— "তুমি বড়ই মনের কষ্টে আছ।"

গোপী বাবু বলিলেন "আজ্ঞা হাঁ।" তাহার মনে হইতে লাগিল—এত লোকের সম্মুখে সন্ন্যাসী ঠাকুর বেশী কিছু বলিয়া না বসেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"ঠাকুর যা যা আজ্ঞা করেছেন তা যথার্থ।" বলিয়া নিজ হাতখানি সরাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িলেন।

"ঠাকুরের এখন কোথা থেকে আগমন হচ্চে?"

"তারকেশ্বর—বাবা তারকনাথকে দর্শন করতে গিয়ে ছিলাম।"

"কোথায় যাওয়া হবে?"

"হুগলি। সেখানে আমার একজন শিষ্য আছে। তাকে একবার দর্শন দিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরুব।"

"কোথা কোথা যাওয়া হবে?"

"বৈদ্যনাথ—গয়া—কাশী—প্রয়াগ। আরও পশ্চিমে যাব। তুমি কোথা যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে—আমিও ত তীর্থদর্শন করব বলেই বেরিয়েছি।"

"পূর্ব্বে কখনও পশ্চিম গিয়েছ?"

"আজ্ঞা না।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর ঝুলি হইতে একটু গাজা বাহির করিয়া গোপী বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"সাজ।"

গোপী বাবুর মনে সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রতি ভক্তি উছ লিয়া উঠিতেছিল। এই আদেশে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া, গাজাটুকু লইয়া তাহা মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন—"পূর্ব্বে কখনও পশ্চিম যাওনি?"

"আজ্ঞা না।"

"তবে আমার সঙ্গে চল না কেন?"

"ঠাকুরের যদি সে অনুমতি হয় তাহলে আমার বিশেষ সৌভাগ্য।"

"তুমিও কি হুগলি হয়ে যাবে?"

"আজ্ঞে হাঁ। আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হব।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর গাজার কলিকাটি হাতে করিয়া বলিলেন—"আজই?"

"আজ্ঞে হাঁ। আজই আমার না বেরুলেই নয়।"

ঠাকুর কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিলেন। দুই চারি টান টানিয়া বলিলেন "তাই ত আমি যে আজই রওয়ানা হতে পারি এমন ত বোধ হয় না। আমার সে শিষ্যটি বাড়ী আছে কি না তা ত জানিনে। তীর্থে যেতে হলে শুধু হাতে যাওয়া ত চলে না।"

গোপী বাবু বলিলেন "এইমাত্র যদি বাধা হয়—তাহলে ঠাকুরের বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই।" বলিয়া গোপী বাবু পকেট হইতে এক মুঠা টাকা বাহির করিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর টাকাগুলি উঠাইয়া রাখিয়া, অস্ফুটস্বরে গোপী বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গাজার কলিকাটি নিবিয়া গিয়াছিল। তাহা পুনঃ প্রজ্বলিত করিয়া দুই চারি টান দিয়া গোপী বাবুকে প্রসাদ দিলেন।

জাহাজের অন্যান্য যাত্রিগণ নিজ নিজ হাত দেখাইবার জন্য তখন ঠাকুরকে ঘিরিয়া ধরিল। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ) —

'বেদান্তবাদ' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী বেদান্ত শব্দের অর্থ কি তাহারই আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গত বেদান্তের প্রধান গ্রন্থ উপনিষৎ নামের অর্থ বিচার করিয়াছেন। উপনিষৎ মানে বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, যে সভায় ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য আলোচিত হয়, এইরূপ বহু মত আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। 'বিজয়া' কবিতা, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর লিখিত। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নববর্ষ' আহ্বান করিয়া কর্তব্যের হিসাবনিকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'প্রেমের লক্ষণ কি কি?' প্রশ্ন করিয়া ছয়টি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১) সহবাসের ইচ্ছা, (২) প্রেমাস্পদের সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতি প্রেম, (৩) সেবা, (৪) প্রেমাস্পদের কথা বলিতে ভালোবাসা, (৫) অনুকরণ, (৬) স্বার্থত্যাগ; এই ষড়্‌বিধ লক্ষণ সাধন করিলেই প্রকৃত ভগবৎ প্রেম লাভ করা যায়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বর্ষ শেষ' ও 'অন্তরের নববর্ষ' আধ্যাত্মিক ভাবের কবিত্বময় রচনা; ইহার সংক্ষিপ্তসার করা অসম্ভব; আভাসে ইহাদের বক্তব্য এই যে শেষ হয় নূতনকে পাইবার জন্যে এবং নূতন আসে মঙ্গলকে বহন করিয়া। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতা পাঠের ভূমিকা' চলিতেছে। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সুফী ধর্ম্মমত' সুন্দর সরসভাবে বিবৃত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল' সমাপ্ত হইল। 'দাদু' সাধকের বহু দোঁহা ও সরল ভাষায় অনুবাদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রকাশ করিতেছেন; মধ্য যুগের এইসব মহা সাধকের রত্নাবলী বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া ও বাঙালী পাঠকের সহজ প্রাপ্য করিয়া ক্ষিতিমোহন বাবু মহৎ কার্য্য করিতেছেন।

ভারতী ; জ্যৈষ্ঠ ।—

প্রথমেই শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটাপ্পা অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি 'মহাভারত লিখন' বিষয়ক রঙিন চিত্র। চিত্রখানি সুন্দর, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির এতদ্বিষয়ক চিত্র দেখিয়া এখানিকে প্রাণহীন নির্জীব মনে হইতেছে। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর কবিতা 'বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ' একটি কবিত্বময় সুন্দর ভাব লইয়া রচিত, কিন্তু কবি ভাবটিকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য ভাবটি বেশ সুপ্রকাশ হইতে পায় নাই। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'ধাতব পদার্থের তাড়িত বিশ্লেষণ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; পরিশিষ্টে কতকগুলি ইংরাজি পরিভাষার বাংলা শব্দ দিয়াছেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'বিয়ে বাড়ী' চিত্র, সুখপাঠ্য; কিন্তু সংক্ষিপ্ত করিবার একটি প্রয়াস গোড়া হইতেই সুস্পষ্ট থাকাতে চিত্রটির অনেক সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে; এরকম জিনিষের বাহুল্যই সৌন্দর্য্য, এবং সেই বাহুল্য খর্ব্ব করা মানেই সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করা; যে চিত্রে যত খুঁটিনাটি খবর থাকিবে, সে চিত্র তত মনোজ্ঞ হইয়া উঠিবে। সম্পাদিকার কৌতুক নাট্য 'রাজকন্যা' চলিতেছে; এই দফায় রাজ কন্যার অতিবিজ্ঞ ধরণের বক্তৃতা বড় বেমানান হইয়াছে, লেখিকার উদ্দেশ্য নাটকীয় পাত্রপাত্রীর মুখের কথায় অতিরিক্ত স্পষ্টভাবে উঁকি মারিতেছে; ইহা আর্টের অনুমোদিত নহে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 'প্রতিষ্ঠালাভ' গল্প লিখিয়া সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশের বিলম্বকে পরিহাস করিয়াছেন। সাধু। তিনি বলিতে চান যে সম্পাদকেরা এমনি নির্ব্বোধ যে নামাজাদা লেখকের গুণহীন লেখাও ছাপেন, কিন্তু প্রতিভাশালী নূতন লেখকের রচনা, প্রতিপত্তি নাই বলিয়া, ছাপান না। কিন্তু এই সব লেখকেরা যেন তেন প্রকারেণ একবার নামডাক করিতে পারিলে তখন আর বিলম্ব ঘটে না। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি' প্রবন্ধে নূতন কথা কিছুই বলিতে পারেন নাই; এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্র বাবুর যে পত্রখানি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাই সুন্দর, হাস্যরসে অভিষিক্ত। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষের কবিতা 'জন্ম ও মৃত্যু' সার উইলিয়ম জোন্সের অনুকরণে লিখিত; তুলসী দাসের একটি দোঁহাতেও ঠিক এই ভাবটি পাওয়া যায়—

> তুলসী যব জগমে আয়ো, জগ হাসে তোম রোয়।
> এইসী করণী কর চলো কি তোম হসো জগ রোয়॥

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লীনার কাহিনী' ফরাসী হইতে অনুবাদ; যেমন বিষয়টি সুন্দর, অনুবাদও তেমনি চমৎকার; ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধ সময়ের ঘটনা অবলম্বনে গল্প, ইহার মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যাহা আমাদের বুকের মধ্যে বড় গভীর বেদনার মতো বাজে। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মাতৃঋণ' চলিতেছে ও চলিবে; অনুবাদ সুন্দর হইতেছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'মৃত্যুর পরেও আণবিক জীবন' বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ; এবিষয়ে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে অন্য পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় 'প্রাচীন নগর ভারহাট' সম্পর্কীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন; বহু জ্ঞাতব্য ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে; ভারহাট জব্বলপুর লাইনের উচহারা ষ্টেসন হইতে ছয় মাইল ও এলাহাবাদ হইতে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচীন কৌশাম্বীর সামন্ত রাজা বরদাবতী; ধ্বংশাবশেষের মধ্যে বৌদ্ধ কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করিলেন; এই আইন আদালতের চোখরাঙানির দিনে সব কথা খুলিয়া প্রাণ দিয়া কি এই ইতিহাস লিখিতে পারিবেন?

সুপ্রভাত (বৈশাখ) —

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 'মহৎ ও ক্ষুদ্র' কবিতা সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রনাথ দত্তের 'নববর্ষে' কবিতাও সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 'পাদুকা' কিরূপ হওয়া উচিত তাহারই আলোচনা করিয়া বলিতে চান বিলাতী ধরণের জুতা আমাদের দরিদ্র ও গরম দেশের উপযুক্ত নয়, স্যাণ্ডাল জাতীয় হাওয়াদার জুতাই পরিধেয়। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী 'পাকক্রিয়া' সম্বন্ধে শারীর তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন এবং যে পক্করসে আমাদের খাদ্য পরিপাক হয় তাহার স্বরূপ ও কার্য্যশক্তি বর্ণনা করিয়াছেন; প্যানক্রিয়াস সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে কোথা বলে, লেখক একটু জিজ্ঞাসু হইলেই তাহা জানিতে পারিতেন। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষালের 'সাম্য' প্রবন্ধ আগাগোড়া বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াই পরিপুষ্ট। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর 'অনঙ্গের শাসন' শেলীর Love's Philosophy কবিতার পদ্যানুবাদ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পর পর ইহার অনুবাদ করিয়াছেন; ইহাদের পরে ইহার অনুবাদে হাত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'অংশীদার' গল্পের ঘটনাটি বেশ সমঞ্জস হয় নাই; ভাষাটি উজ্জ্বল ও উপভোগ্য। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী 'দ্বিপত্নীক' উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো। শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায়ের 'পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা' বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভে আধুনিক বিশেষজ্ঞদিগের মতামত সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত 'পত্রাবলী' কৌতূহলজনক। 'ভ্রমণ প্রসঙ্গে এবার এলাহাবাদের

বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ; ইহার মধ্যে এলাহাবাদের স্বরূপ স্পষ্ট হয় নাই।

ভারতমহিলা (জ্যৈষ্ঠ)—

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্তের 'সত্যং শিবং সুন্দরং' প্রবন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে ভগবানের ঐ তিন স্বরূপ মানবাত্মার তিনটি বৃত্তির দ্বারা অনুভাব্য—জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রেম। জ্ঞান সত্যস্বরূপকে জানে, প্রেম তাঁহাকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করে এবং ইচ্ছা মঙ্গলভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাসের 'জীবে দয়া' প্রবন্ধটি অতি উপাদেয়, স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণের বর্ণনা ও জীবজন্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা অতীব কৌতূহলজনক ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় 'ভূগর্ভ' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিতেছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর গল্প 'নির্ব্বন্ধ' টেনিসনের এনক আর্ডেনের উপাখ্যান, নাম বদল করিয়া লেখা। সম্পাদিকার রচনা 'সাহিত্য-সেবা ও বঙ্গনারী' ময়মনসিংহ সম্মিলনে পঠিত; নামেই উহার বক্তব্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মৌলবী সেখ আবদুল জব্বার 'বিদুষী গুলবদন বেগম' বাবর শাহের দুহিতা, সম্রাট আকবরের পিতৃষ্বসা, সম্রাট হুমায়ুনের ভগিনী ও জীবনী-রচয়িত্রী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন; গুলবদন-বিরচিত হুমায়ুন-নামা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'ভারতের 'গিরিমন্দির' প্রসঙ্গে কেনেরি গুহার পরিচয় লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্তের 'কাশী ভ্রমণ' মনোরমা নাম্নী সঙ্গীতনিপুণা বালিকার পরিচয়েই পরিসমাপ্ত, অন্য খবর এবার নাই।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (জ্যৈষ্ঠ —

শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের 'জাতীয় উৎকর্ষ' সুলিখিত সাময়িক প্রবন্ধ; তিনি বৈজ্ঞানিক কারণ দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে সমাজে সবর্ণ অসবর্ণ এমন কি সজাতীয় বিজাতীয় বিবাহের ব্যবস্থা না করিলে জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য। সমাজহিতেচ্ছু সকলেরই ইহা পাঠ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্ন সংস্থান' পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পূর্ব্বেই তাহা প্রবাসীতে সমালোচিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রবীণ ঐতিহাসিক, বহুকাল পরে পুনরায় সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইলাম। তিনি বলিতেছেন যে 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' মালদহের হজরত পাণ্ডুয়া ত নয়ই, পাবনা বা বগুড়া জেলার মহাবর্দ্ধন, বা বর্দ্ধনকোটীও নহে; হুয়েন সাঙের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে বগুড়ার অন্তর্গত পুণ্ডরীয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ধ্বংসাবশেষ। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন 'সাহিত্য সম্মিলন' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ও তথ্যবহুল বর্ণনা দিয়াছেন; ইহার ভাষাও বেশ কবিত্বময় ও স্বচ্ছ।

প্রতিভা (জ্যৈষ্ঠ) —

কবি 'রজনীকান্তের আত্মজীবনী' প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস 'বালিকা বিদ্যালয় ও বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' এই বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শুধু বালিকা বিদ্যালয় থাকিলেই বালিকার শিক্ষা হয় না, বালিকার বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া দরকার, অভিভাবকদের মনেও বালিকাশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা উপলব্ধি হওয়া দরকার। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী টেনিসনের ডোরা কাব্যের অনুবাদ করিতেছেন, নাম দিয়াছেন 'সুধা'; আসল জিনিষটিকে নষ্ট করা হইতেছে; বর্ত্তমান সময়ে কাশীরাম দাসের পয়ারছন্দ, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ছন্দরচনার পর, নিতান্ত অচল। 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' প্রবন্ধে লেখক, ইতিহাস কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্দেশ্য ও প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই য়ুরোপীয় মনীষিগণের মত উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন; ইহা ঐতিহাসিকগণের অবশ্য পাঠ্য। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'ত্যাগ' এমন হইয়াছে যে নিন্দাও করা যায় না, প্রশংসাও করা যায় না; প্রথমাংশ বেশ, ভাষাও কবিত্ব ও ভাবপূর্ণ, কেবল শেষাংশটায় বড় বেশি চড়া করিয়া সুর বাঁধা হইয়াছে। সংগ্রহ বিভাগে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্নসংস্থান', শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের 'জাতীয় উৎকর্ষ' ও আওরংজীবের নৌবল সংস্থাপনের নিষ্ফল-প্রয়াস সম্বন্ধে 'ঐতিহাসিক গল্প' সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'পারসী ও আরবী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে অক্ষরান্তরীকরণ' কিরূপ ভাবে হওয়া উচিত তাহারই একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; ইহা বিশেষজ্ঞদের আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত; আমাদের কয়েকটা কথা মনে হইয়াছে, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর হইলেও সুধীজনের বিচারের জন্য আজি পেশ করিতেছি : পেশের উচ্চারণ সর্ব্বত্র ও এবং জেরের উচ্চারণ এ কেন হইবে? অধিকাংশ স্থলেই উ এবং ই হওয়া উচিত; পদের অন্তস্থিত লুপ্ত হ বিসর্গ দ্বারা প্রকাশ করা উচিত; যেমন জেরাহ্ না জেরাঃ? গেরেফ্ত না গিরিফ্ত? গোফ্ত না গুফ্ত্? কি রকম বানান লেখা উচিত? পার্সীর চারটি স, চার পাঁচটি জ, দুটি তিনটি ত বাংলাতেও পৃথক চিহ্নে বিশেষিত করার আবশ্যক আছে কি? উহাদের উচ্চারণের প্রভেদ কতটুকু? এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত। 'বুদ্ধের দাস' ছোট গল্প, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভঙ্গীতে অজ্ঞাতনামা লেখকের লিখিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন 'ময়মনসিংহে সাহিত্য সম্মিলন' সম্বন্ধে প্রতিবেদন দিয়াছেন; প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির বিবরণ এমন ভাবে আর কোনো প্রতিবেদনে সংগৃহীত হয় নাই। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা শ্রীমতী কুসুম-কুমারী দেবীর 'কোন সদ্যোজাত শিশুর প্রতি' কবিতা বয়স হিসাবে বেশ হইয়াছে, কিন্তু রচনার মধ্যে বয়স্ক লোকের মেরামত আছে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে প্রতিভা প্রচার করিয়াছেন প্রতিভার গ্রাহকবর্গ মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা' সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-লেখককে পুরস্কৃত করা হইবে। আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রতিভা নিজ নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

বাণী (চৈত্র —

উল্লেখ যোগ্য 'মহাভারতের গঠন' শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের 'রাজবংশী জাতি'। শ্রীযুক্ত হরিনাথ পালিতের 'মালদহের সাক্ষাপূজা ও গ্রাম্য দেবতা।'

উদ্বোধন (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)—

'মাইকেলের ভাষা' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু বলেন যে মাইকেল ভাষা সম্বন্ধে য়ুরোপীয় কবিগণেরই আদর্শ অনুসরণ করিয়া-ছিলেন; এবং ইচ্ছা করিয়াই ভাষা কঠিন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষার প্রধান গুণ তেজোময়ত্ব, সজীবত্ব। দ্বিতীয় গুণ যুক্তাক্ষরের সদ্ব্যবহার; যুক্তাক্ষর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায়; কিন্তু মাইকেল যুক্তাক্ষর ব্যবহারে ভারতচন্দ্রের মতো কৃতী নহেন। প্রধান দোষ ভাষার কৃত্রিমতা, ইচ্ছা করিয়া কঠিন করিবার জন্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া আভিধানিক শব্দ ব্যবহারে ভাষা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় দোষ কর্কশতা; উহা কৃত্রিমতারই ফল; সুতরাং এক বীররস ছাড়া অন্য রস প্রকাশের অনুপযুক্ত। তৃতীয় দোষ ব্যাকরণদুষ্ট পদপ্রয়োগ ও শব্দের মনগড়া অর্থ কল্পনা করা। ইচ্ছানুরূপ ক্রিয়াপদ গঠন আর একটি দোষ। পঞ্চম

দোষ গ্রাম্যতা। ষষ্ঠ দোষ যমক অনুপ্রাসের অপব্যবহার। সপ্তম দোষ এক কথার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার। অষ্টম দোষ দুরন্বয়। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ বীর ও অদ্ভুত রস প্রকাশের পক্ষে চমৎকার উপযোগী হইলেও লঘু ভাব প্রকাশে অসমর্থ, ইহাতে আনন্দের তরঙ্গ খেলে না। যতিভঙ্গ দোষ মাইকেলের ছন্দের প্রধান দোষ। তার পর বৈচিত্র্যহীনতা, ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ছন্দেরও পরিবর্ত্তন করা তাঁহার উচিত ছিল।

আমাদের বক্তব্য এই যে মাইকেল দরিদ্র বাংলার এক অসাধারণ সম্পদ। তাঁহার সকল দোষ সত্ত্বেও তিনি মহাকবি এবং বঙ্গভাষা তাঁহার দানে সৌভাগ্যশালিনী। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এরূপ প্রতিভাসম্পন্ন কবি বাংলায় আর কেহ প্রাদুর্ভূত হন নাই।

নব্যভারত (বৈশাখ)—

পূর্ব্বানুবৃত্ত প্রবন্ধ ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো নূতন প্রবন্ধ এ সংখ্যায় নাই।

কহিনূর (জ্যৈষ্ঠ)—

শ্রীযুক্ত মহম্মদ কে চাদ 'মোসলেম গণিতজ্ঞগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' যাহা দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য; কিন্তু আগাগোড়া ইংরাজি হরপে নাম ছাপা হইয়াছে কেন বুঝিলাম না; আরবী নামের উচ্চারণ বাংলাতে লেখাই উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হকের 'খরুড় শাহ' বৰ্দ্ধমানের এক ফকীরের কাহিনী। শ্রীযুক্ত আবদুল লতিফের 'আরব মহিলার তেজস্বিতা' ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা। চয়নের মধ্যে সাদীর বোস্তাঁ হইতে হাতেমতাইয়ের কাহিনী, ও হজরত মহম্মদের উপদেশ-বাণী সংগৃহীত হইয়াছে।

বিজয়া (বৈশাখ) —

'আসাম, গোয়ালপাড়া এবং আসামী ভাষা' এবং 'রাজবংশী-জাতির ভাষা' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

কুশদহ (জ্যৈষ্ঠ)। প্রীতি (বৈশাখ) ছাত্রগণ দ্বারা পরিচালিত। গৃহস্থ (বৈশাখ)। মহিলা (বৈশাখ)। নিৰ্ম্মাল্য (বৈশাখ)। কায়স্থ পত্রিকা (বৈশাখ)। পতাকা (বৈশাখ)। প্রজাপতি (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ)। কৃষিসম্পদ (বৈশাখ)। ধৰ্ম্মপ্রচারক (ধনু)। যমুনা (বৈশাখ)। আলোচনা (বৈশাখ)। আলোক—(বৈশাখ)—ছাত্র-সমাজের পত্রিকা। পল্লীচিত্র (বৈশাখ), ব্রাহ্মণ (বৈশাখ)। ঐতিহাসিক চিত্র (বৈশাখ)। কৃষক (বৈশাখ)।

দেবালয় (জ্যৈষ্ঠ)—

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর 'হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ' নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে জাতিভেদ বা আচার বা প্রতিমাপূজা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ নহে কারণ এই সমস্ত অন্য ধর্ম্মেও অল্পবিস্তর বিদ্যমান দেখা যায় এবং হিন্দুধর্ম্মেও শিথিলতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই; এই মত তিনি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন। লেখকের মতে হিন্দু-দিগের উপাসনামূলক বিশ্বাসসমূহের এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যে তাহা অন্য ধর্ম্মে একান্ত দুর্লভ;—তাহারা ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার করুণাকে সীমাবদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক এজন্য হিন্দুর অসংখ্য অবতার, এমন কি হিন্দুর মতে যত্র জীব তত্র শিব; এবং সেইজন্যই হিন্দুর উপাসনা ও মুক্তির পথ অবতার বিশেষেই সীমাবদ্ধ নহে, এবং বিরুদ্ধ-ধারণা-পোষণকারী ব্যক্তিগণও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে। শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষ 'সন্ন্যাসী' গল্পে গী দে মোপাসার একটি গল্পের ভাব না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; সেই গল্পটির অনুবাদ প্রথম বৎসরের 'বাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠজনের ঋণ স্বীকার করিতে লজ্জা করা উচিত নয়, তাহাতে মৌলিকতা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব বাঁচিয়া যায়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 'আধ্যাত্মিক জাতিবিচার' প্রবন্ধে বলিতে চাহিয়াছেন যে মানুষের গুণ দেখিয়া যেমন জাতি বিভাগ হইয়াছিল, আত্মারও প্রকৃতি দেখিয়া সেইরূপ জাতিবিভাগ করা যায়; কিন্তু সেই জাতিভেদে সামাজিক জাতিভেদ করা যায় না।

সাহিত্য (জ্যৈষ্ঠ)—

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত মীমাংসাভাষ্য-প্রণেতা 'শবর স্বামী ও তাঁহার যুগ' সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' দেখিয়া ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত মহা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি; ইহা আমাদের নিকট ত বিভীষিকা বলিয়া মনে হইল না; বহু চিন্তনীয় বিষয় এই প্রবন্ধে সমাহৃত হইয়াছে; আমরা লক্ষ্য করিয়াছি রসিকতায় স্থানে স্থানে একটু রসাধিক্য হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে অশ্লীল বা কুরুচি বলা যায় না, এবং ঐরকম কথাও যদি বাদ দিয়া চলিতে হয় তবে ঘর সংসার করা কঠিন, পবিত্র গোময় লেপন করিয়া ধরণীর শ্যাম শোভা মুছিয়া সমাধিস্থ হইয়া থাকিতে হয়। আমরা জানিনা মুদ্রিত প্রবন্ধ পঠিত প্রবন্ধ হইতে কোন অংশে পৃথক কিনা। প্রবন্ধের মধ্যে লেখক অনেক নিতান্ত কথা কথা লেখ্য কথার সহিত মিশাইয়াছেন; দুএকটি শব্দ প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি অভিধানে সংস্কৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেগুলিকেও লেখক অশুদ্ধ বলিয়াছেন, যেমন কুহেলিকা; আরো প্রচলিত শব্দ ব্যবহার এবং নূতন শব্দ প্রচলন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমাদের স্থানে স্থানে মতভেদ আছে, সবিস্তার আলোচনার স্থান আমাদের নাই। মোটের উপর বলিতে গেলে প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত এবং পাঠ করিলে ভাবিবার খোরাক যথেষ্ট পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের দুটি কবিতা 'পেঁপে সুন্দরী' ও 'আমার কবিভ্রাতার সাতটি নন্দিনী'; শেষেরটি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের 'হিন্দী সাহিত্য' প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন হিন্দীকাব্য প্রসিদ্ধ চাঁদ কবির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পৃথ্বীরাজ রাসোর যে পরিচয় দিবার সূত্রপাত করিয়াছেন ও তাহা হইতে যে সব ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয় হইয়াছে।

মানসী (বৈশাখ)—

'শেখ গাহড়বাল' শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; উহার সংক্ষিপ্তসার দুষ্কর বলিয়া আমরা সে চেষ্টায় বিরত হইলাম। শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর শৰ্ম্মার সনেট 'বৌদিদি' একখানি পবিত্র স্নেহ-প্রীতির বর্ণচিত্র, সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'পরিবেশন' অতিরিক্ত দীর্ঘ অথচ গল্পত্ব কিছুই নাই; কিন্তু উহার মধ্যে আমাদের বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের কয়েকখানি ছবি সম্পূর্ণাঙ্গ না হইলেও মন্দ হয় নাই; সেই ছবির স্থানে স্থানে লেখকের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় এই নিষ্ফল রচনাটিকেও সৌন্দর্য্যদান করিয়াছে। গল্পটির নামের বানান ভুল হইয়াছে, পরিবেশন অশুদ্ধ, শুদ্ধ বানান পরিবেষণ।

অর্ঘ্য (চৈত্র)—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনসিংহ' শিখ-ইতিহাসের একটি চিত্র, উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের 'মার্ব্বেল পাথরের পাহাড়' মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনী। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস গুপ্তের 'সাহিত্যের কথা' সাহিত্যসেবীর অনুধাবনযোগ্য। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-চন্দ্র দাস গুপ্ত ও বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ফার্সী ইতিহাস-গ্রন্থ

'খুলাসৎ-উৎ-তওয়ারিখ' ধারাবাহিক ভাবে অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার ও বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের উপকার করিতেছেন। 'মোগল চিত্র' মেনুসি-লিখিত শাজাহান-সম্পর্কীয় কয়েকটি ঘটনার অনুবাদ, উল্লেখ-যোগ্য। মোটের উপর অর্চ্য পত্রিকায় অনেক পাঠযোগ্য বিষয় থাকে দেখা যাইতেছে।

শিল্প ও সাহিত্য। চৈত্র—

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী য়ুরোপীয় প্রথায় 'বর্ণ চিত্রণ' কেমন হওয়া উচিত তাহার একটি ধারাবাহিক পরিচয় য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগের রচনারীতি হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। ইহা কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ; কিন্তু এত অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ করিলে পাঠকের ধৈর্য্যহানিজনিত অতৃপ্তি আসে। 'তত্ত্ব-চিন্তামণি' ৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ক্রমশপ্রকাশ্য প্রবন্ধ; প্রাচীন বিখ্যাত লেখকের রচনা বলিয়া কৌতূহলোদ্দীপক।

মুকুল, প্রকৃতি, সোপান—

শিশুদিগের উপযোগী পত্রিকা। ইহার মধ্যে মুকুল প্রাচীনতম। সকলগুলিতেই কবিতা, গল্প, জাতিতত্ত্ব, প্রভৃতি বহু শিক্ষণীয় ও কৌতুককর বিষয় আছে। কবিতাগুলি ছন্দোভঙ্গে পঙ্গু। শিশু সাহিত্যে এরূপ ত্রুটি অত্যন্ত অন্যায়।

রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—

অতিরিক্ত সংখ্যায় শেরপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়া একটি সুসম্বদ্ধ পূর্ণাঙ্গ বাংলার ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিয়া দিতেছে। শেরপুরের স্থাপত্যের নমুনাগুলি সুন্দর ও এক বিশেষ নিজস্ব প্রণালীর বলিয়া মনে হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। তাহার সভাপতি কে হইবেন, এখন তাহা স্থির করিতে হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির কলিকাতাস্থ সভ্যগণ অধিকাংশের মতে স্থির করিয়াছেন যে পার্লেমেণ্টের সভ্য শ্রমজীবীদলের নেতা জেমস রামজে মাকডন্যাল্ড সাহেবকে নির্ব্বাচিত করা হউক। দেশস্থ সকল কংগ্রেস্ কমিটির মত হইলে তিনিই নির্ব্বাচিত হইবেন।

এক্ষণে দুটি বিষয়ের বিচার করা উচিত। প্রথমতঃ ভারতবাসী ব্যতীত অন্য কাহাকেও সভাপতি করা উচিত কি না। দ্বিতীয়তঃ, রামজে ম্যাকডন্যাল্ড সাহেবকে করা উচিত কি না।

ভারতবাসী যদি এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়, কিম্বা কোন বিশেষ বৎসরে উপযুক্ত ভারতবাসী পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বিদেশী লোককে করা যাইতে পারে। যদি ভারতবাসীর রকম বার আনা যোগ্যতা থাকে, এবং বিদেশীর ষোল আনা থাকে, তাহা হইলেও ভারতবাসীকেই সভাপতি করা উচিত। কারণ, ইহা আমাদের কংগ্রেস্, ইহার উদ্দেশ্য স্বায়ত্ত শাসন লাভ; সুতরাং ইহার কাজেই যদি আমরাই কার্য্যতঃ আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে আমরা কোন মুখে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করিব?

এখন যোগ্যতার বিচারে দেখা যাইতেছে যে ভারতবাসী বহুবার এই কার্য্য করিয়াছে, এবং বিশেষ যোগ্যতার সহিত করিয়াছে। কংগ্রেসের প্রত্যেক ইংরাজ-সভাপতি বা যোগ্যতম ইংরাজ-সভাপতি ভারতবাসী প্রত্যেক সভাপতি বা যোগ্যতম ভারতবাসী সভাপতি অপেক্ষা দক্ষতার সহিত কংগ্রেসের কাজ চালাইয়াছেন, ইহা কেহই বলিতে পারেন না।

ভারতবাসী সভাপতি নিজের প্রাণের কথা, স্বজাতির আদর্শের কথা, বাগ্মিতার সহিত বলিলে দেশময় যে ফলের আশা করা যায়, যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, বিদেশী সভাপতির কথায় সেরূপ একবারও হয় নাই। এক্ষেত্রে সেরূপ হইবার কথাও নয়। কেন নয়, তাহা পাঠকেরা বুঝিয়া লউন।

বর্ত্তমান বৎসরেও যোগ্য ভারতবাসীর অভাব নাই। নাম করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক নাম সকলেই জানেন।

সরকারী সকল কাজ কর্ম্মে সকল বিভাগে ইংরাজ কর্ত্তা। দেশের নেতারা ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন সকল বিভাগ না হউক, অনেক বিভাগের কাজ সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীর দ্বারা চলিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় নেতাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না। কিন্তু বেসরকারী এই যে কংগ্রেস্, ইহা ত সম্পূর্ণরূপে আমাদের জিনিষ। ইহাতে দেশী সভাপতি দ্বারা বেশ কাজ (অর্থাৎ যে শ্রেণীর কাজ কংগ্রেসে হয়) হইয়াছে। তবে কেন, এক্ষেত্রেও ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আপনাদিগকে স্থাপন করি? জাতীয় চরিত্রদোষে ও অকর্ম্মণ্যতাপ্রযুক্ত জাতিবিশেষের পরাধীনতা অনিবার্য্য হইতে পারে; কিন্তু পরাধীনতা কখনও গৌরবের জিনিষ হয় না।

যাহা আমাদের আয়ত্তাধীন, সেরূপ ব্যাপারেও ইংরাজের অধীনতা স্বীকার কেন করিতে যাই ?

ইহার উত্তর এই, যে, ইংরাজকে সভাপতি করিলে তাঁহার সাহায্য পাওয়া যাইবে। বার্ক, ব্রাইট্, ফসেট্, ব্রাড্‌লা, প্রভৃতি ইংরাজেরা ভারতের উপকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ত কংগ্রেস্ বা তদ্বিধ কোন সমিতির সভাপতি করিতে হয় নাই। কটন ও ওয়েডারবর্ণ কংগ্রেসের সভাপতি হইবার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবন্ধু ছিলেন। হিউম্ কখন সভাপতি হন নাই, হইবেনও না। অথচ তিনিও এক প্রাচীন ভারতবন্ধু। মহাত্মা ম্যাক্‌কার্ণেস্ ভারতীয় পুলিসের দোষোদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া নিজ দলের ও নিজ দেশের লোকের বিরাগভাজন হইলেন ; তাঁহার আইন ব্যবসায়ে পসার কমিয়া গুরুতর আর্থিক ক্ষতি হইল। ইনি ত কখন কংগ্রেসের সভাপতি হন নাই, হইবার প্রত্যাশাও রাখেন না। কেয়ার হার্ডী, ওগ্রেডী, প্রভৃতি পার্লেমেণ্টের সভ্যও কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কবিহীন, অথচ তাঁহারাও ত ভারতবর্ষের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং কোন ইংরাজকে সভাপতি না করিলে তাঁহার সাহায্য পাওয়া যায় না, বা করিলে বেশী সাহায্য পাওয়া যায়, ইহা একটা বাজে কথা। বরং আমরা আমাদের সব কাজ নিজেরাই স্বাবলম্বী হইয়া করিতে পারিলে খাঁটি ইংরাজের মনে বেশী শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারি।

সাহায্য সম্বন্ধে ইহাও বলা কর্ত্তব্য মনে করি যে আমাদের উন্নতির অবশ্য-অবলম্বনীয় উপায় স্বাবলম্বন ও নিজের চেষ্টা। বিদেশীরা সাহায্য করেন ভালই। কিন্তু বিদেশীর কর্ত্তৃত্ব বা নেতৃত্ব আমাদিগকে বড় জাতি করিবে, ইহা মনে করা বাতুলতা মাত্র।

সত্য বটে বায়রন্ গ্রীসের সাহায্য করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ; কিন্তু গ্রীকেরা শ্বেতকায়, খৃষ্টান, ইউরোপীয়, এবং গ্রীস্ ইংরাজের অধীন দেশ ছিল না। ইত্যাদি। তা ছাড়া কংগ্রেস্ জিনিষটাও মোটেই স্বাধীনতা-সমর নহে ; কংগ্রেসের নেতারা তেমন অর্ব্বাচীন নন। সুতরাং গ্রীস্ প্রভৃতির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্বপক্ষ সমর্থনার্থ আমাদের নেতারা ব্যবহার করিতে পারেন না।

ম্যাক্‌ডন্যাল্ড্ সাহেবের সপক্ষে শেষ যুক্তি এই যে তিনি শ্রমজীবীদলের নেতা, এবং শ্রমজীবীদল ক্রমে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। তাহা সত্য, কিন্তু এই শক্তি তাহারা, তাহাদের নেতাকে আমাদের সভাপতি না করিলে, আমাদের অনুকূলে প্রয়োগ করিবেনা, সভাপতি করিলে করিবে, এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে ? শ্রমজীবীরা নিজেদের সংগ্রাম লইয়াই ব্যস্ত। তাহারা যে কার্য্যকর পরিমাণে আমাদের জন্য শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে পারিবে, তাহার প্রমাণ কোথায় ? ভারতে শিল্পের উন্নতি হইলে বিলাতী জিনিষের কাট্‌তি কমিবে। তাহাতে বিলাতী শ্রমজীবীদের পকেটেও হাত পড়িবে। অথচ আমরা শিল্পোন্নতি দ্বারা ধনী হইতে না পারিলে আমাদের রাজনৈতিক শক্তি বাড়িবেনা, এবং রাজনৈতিক শক্তি না পাইলে আমরা ভারতবর্ষীয় শিল্পের অবনতিকারী আইনগুলির উচ্ছেদ করিয়া শিল্পোন্নতি করিতেও পারিবনা। এরূপ স্থলে বিলাতী শ্রমজীবীদলের ভারতবর্ষের প্রতি সাহানুভূতির ভিত্তি কতটা দৃঢ়, তাহা ভাবিবার বিষয়।

এবম্বিধ নানাপ্রকার কারণে আমরা বিদেশীকে, ইংরাজকে, ম্যাক্‌ডন্যাল্ড সাহেবকে সভাপতি করার বিরোধী। ম্যাক্‌ডন্যাল্ড সাহেবের নামে অরুচি হইবার আর একটি কারণ হইয়াছে। তিনি ভারতভ্রমণ করিয়া গিয়া একটি বহি লিখিয়াছেন ; তাহার নাম The Awakening of India। তাহাতে বাঙ্গালীর অনেক প্রশংসা এবং কিছু নিন্দা আছে। তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাহাতে তিনি বিনা কারণে, কোনও প্রতিকূল মন্তব্য না করিয়া, লঘুচিত্ততার সহিত, বাঙ্গালীর একটি জঘন্য কুৎসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এই :—

"It is he who is supposed to have said that within a few hours of the British withdrawal from India there would not be a rupee or a virgin left in Bengal—or something to that effect." ১৫ পৃষ্ঠা।

কথাটা কে বলিয়াছে, এবং সে ঠিক্ কি বলিয়াছে, তাহাও সাহেব মহোদয় নিশ্চিত জানেন না ; অথচ এত বড় একটা ঘোর জাতীয় কলঙ্কের কথা অম্লানবদনে লিখিয়া ফেলিলেন ! কেন ইংরাজ আসিবার আগে কি বাঙ্গলাদেশে কোন সতী কোন কুমারী ছিলেন না, না দেশে একটাও টাকা ছিল না ! এবং একমাত্র বাঙ্গালীই কি পরাধীন হইয়াছে, না, অতীত ইতিহাসে বাঙ্গালাদেশই

সর্ব্বাপেক্ষা সহজে ও শীঘ্র পরাজিত হইয়াছে? নেতা মহাশয়েরা এই লোকটিকে সভাপতি করুন, কিন্তু আমরা আমাদের বক্তব্য বলিয়া খালাস!

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৪২১৪ জন বালক ও ৩৪টি বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহা হইতে বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা বেশ বুঝা যায়। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬৩১ জনের মধ্যে ৮টী মাত্র বালিকা। ইহাও স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তৃতির অন্যতম প্রমাণ।

আমরা একবার লিখিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষের কলেজগুলির মধ্যে কলিকাতার সিটিকলেজে ছাত্র-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বি-এ পরীক্ষায় দেখিতেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত ভারতবাসীর পরিচালিত কলেজগুলির মধ্যে সিটি কলেজ, সাধারণ পাশ ও সম্মানের সহিত পাশ উভয় প্রকারের পাশ করা ছাত্রের সংখ্যায় প্রথম স্থানীয় হইয়াছে। বি এ পাশের মোট সংখ্যায় সরকারী বেসরকারী সব কলেজের মধ্যে সিটি কলেজ তৃতীয় স্থানীয় হইয়াছে।

যশোর খুলনায় মুসলমান নমঃশূদ্রে দাঙ্গা হইয়াছে। এ সব ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান কোন পক্ষেরই লাভ নাই। মূর্খেরা কখন ইহা বুঝিবে? নমঃশূদ্রেরা হিন্দুদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইতে চান। এই বিপদের সময় কে তাঁহাদিগকে সাহায্য ও আশ্রয় দিয়াছিল, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন।

রায়গড় দুর্গে শিবাজীর সমাধি বেমেরামত অবস্থায় ক্রমশঃ ধ্বংসোন্মুখ হইতেছিল। এখন গবর্ণমেণ্ট উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন; কিন্তু শিবাজী-উৎসবের লীলাভূমি মহারাষ্ট্রের মুখের চুনকালী এই সংবাদের আলোকে হঠাৎ লোকচক্ষুর গোচর হইয়া পড়িল।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ বক্‌রীদ দাঙ্গা ও লুটের সময় মেছুয়াবাজারের ধনী পান্নালাল মুরারকরের বাড়ী লুট ও স্ত্রীলোকেরা অপমানিত হয়। ধৃত আসামীদের বিচার হইয়া অনেকের যথোচিত দণ্ড হইয়া গিয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, বিচারের সময় অনেক অপূর্ব্ব কাহিনী সাক্ষীদের মুখে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার দৈনিক কাগজগুলির রিপোর্টারগণের এবং কোন কোন সম্পাদকের কৃপায় সে সব কথা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল না। অথচ কত জঘন্য মোকদ্দমার অপাঠ্য বৃত্তান্তও বাহির হয়!

চিত্র-পরিচয়

পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীবেশে বিরাট রাজার অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিরাট রাজার শ্যালক ও সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া আপনার ভগিনী রাণীর নিকট দ্রৌপদীকে প্রার্থনা করে। কিন্তু রাণী আশ্রিতকে অধর্ম্মপথে প্রেরণ করিতে প্রথমে অস্বীকার করিলেও শেষে ভ্রাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বীকৃতা হন। রাণী সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী ছল করিয়া দ্রৌপদীকে কীচকের গৃহে খাদ্যসামগ্রী লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। দ্রৌপদী কীচকের স্বভাব অবগত ছিলেন। একদিকে প্রভুনিয়োগে যাইতে বাধ্য, অপরদিকে কীচকের নিকট অপমানিতা হইবার ভয়ে কাতর,—দ্রৌপদী উভয়সঙ্কটে পড়িয়া চিন্তা করিতেছেন। এই দ্বিধা ও চিন্তার ভাবটি লইয়াই নিপুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর সৈরিন্ধ্রীর চিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন, এবং সেই উভয়সঙ্কটের কঠিন ভাবটি যে তাঁহার নিপুণ তুলিকাস্পর্শে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা চিত্রে নয়নসন্নিবেশ করিবামাত্র স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। আকৃতিটিরও সংস্থান ও বস্ত্রবিন্যাস সুন্দর হইয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্রখানি প্রসিদ্ধ শিল্পী রাজা রবিবর্ম্মার পুত্র শ্রীযুক্ত রামবর্ম্মা কর্তৃক পরিকল্পিত ও অঙ্কিত, বিষয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব দান। রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র ঋষিকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া যখন পথে দাঁড়াইয়াছেন, তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে তাঁহাকে দানের দক্ষিণা

দেওয়া হয় নাই; তখন রাজা আপনার পত্নীপুত্রকে এক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করিয়া ঋষির দক্ষিণা শোধ করিলেন। এই অবস্থাটি লইয়া এই চিত্রটি পরিকল্পিত হইয়াছে। ক্রেতা ব্রাহ্মণ রাজপুত্র রোহিতাশ্বকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং রাণী শৈব্যাকে সত্বর তাহার অনুগমন করিতে কঠোর ভাবে আদেশ করিতেছে। রাণী শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতেছেন, যাইতে তাঁহার পা উঠিতেছে না; মাতাকে রোদন করিতে দেখিয়া ও একজন অপরিচিত পুরুষকে কঠোর ভাবে তাহাকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া ভীত রোহিতাশ্ব মাতার নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেছে। কঠোর সন্ন্যাসী বিশ্বামিত্র উদাসীন ভাবে দাঁড়াইয়া; এবং রাজা হরিশ্চন্দ্র পরিপূর্ণ হৃদয়-বেদনা দমন করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে ভগবানকে স্মরণ করিতেছেন—রাজার মুখে ত্যাগের দীপ্তি, শোকের কারুণ্য ও সংযমের দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজার এই দুরবস্থা দেখিবার জন্য সকল গৃহের অলিন্দবাতায়ন জনাকীর্ণ, রাজপথের জনপ্রবাহ স্তম্ভিত।

এই চিত্রের পশ্চাদ্দৃশ্য বাড়ীগুলিও প্রাচ্যস্থাপত্য অনুযায়ী সুচিত্রিত; কিন্তু অত্যন্ত প্রকাশমান হওয়াতে আসল বিষয়টিকে একটু ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। মোটের উপর চিত্রখানি সুন্দর ভাবোদ্দীপক ও শিল্পীর দৃঢ়তাপূর্ণ রচনাশক্তির পরিচায়ক।

তৃতীয় চিত্রখানি প্রাচীন চিত্রকর মোলারাম কর্ত্তৃক অঙ্কিত, রাধাকৃষ্ণের চিত্র। ইহা কীটদষ্ট ও বিবর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবেরা রাধাকৃষ্ণকে জীবাত্মা পরমাত্মা রূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। জীবাত্মা পরমাত্মার যোগে যে আনন্দ তাহাই ভূমানন্দ। ভক্তগণ সেই মিলনানন্দে তন্ময় হইয়া সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেছেন, শুকশারী পিঞ্জরে বসিয়া সেই কথারই আলোচনা করিতেছে। এই ভাবটিই লইয়া চিত্রকর বোধহয় এই চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া থাকিবেন। রাধাকৃষ্ণের ভাবতন্ময় দৃষ্টি এবং সঙ্গীতকারিণীদিগের উদাসীন ভাব এই ধারণারই সমর্থন করে।

ধরমপুর স্বাস্থ্যনিবাস

ধরমপুর শিমলা পাহাড়ের নিম্নপ্রদেশে অবস্থিত। কালকা হইতে ট্রেনে ধরমপুর যাইতে দুইঘণ্টা লাগে, ধরমপুরেই রেল ষ্টেসন আছে। এই স্থান সমুদ্রতল হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চ; এখানকার শীত শীতকালেও তত তীব্র নয় এবং

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

হাওয়াও বেশি পাতলা নয়। এখানে দেবদারু বন যথেষ্ট। এই সব কারণে এই স্থানটি যক্ষ্মারোগীর পক্ষে সবিশেষ উপকারী। এই স্থানটির নাম ধরমপুর কেন হইয়াছিল জানি না, কিন্তু এখন ইহা বাস্তবিকই ধরমপুর হইয়া উঠিয়াছে। নরসেবার তুল্য ধর্ম্ম আর নাই। উৎকট যক্ষ্মারোগগ্রস্ত নরনারীর স্বাস্থ্যলাভের জন্য ধরমপুরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম! সেবাধর্ম্মী কয়েকজন মহাশয় ব্যক্তির উদ্যোগ ও সাহায্যে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। তাঁহাদের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের শ্রীযুক্ত মালাবারী ও শ্রীযুক্ত দয়ারাম গিডুমলের উদ্যোগে এবং সেবাসদনের সেবিকা ভগিনীদিগের সহযোগিতায় ইহার আরম্ভ; তারপর গোয়ালিয়রের মহারাজা ও ওয়াডিয়া সম্পত্তির অছিগণ পঁচিশ হাজার করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন; তৎপরে পাটিয়ালার বদান্য মহারাজা আশ্রমের জন্য জমি ও একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন

ধরমপুর রেল ষ্টেসন।

এবং আরো একলক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রথম হইতেই আশ্রমের কার্য্য পঞ্জাবপ্রবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অতি সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইতেছে; প্রয়াগপ্রবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই আশ্রমের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই আশ্রমটি সম্পূর্ণভাবে দেশীয় লোকের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের মতো এত বড় প্রকাণ্ড মহাদেশে একটি মাত্র স্বাস্থ্যনিবাস কিছুই নয়; অন্তত প্রতি প্রদেশে এরূপ এক একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আজকাল বদ্ধ বায়ুতে বাধ্য হইয়া কাজ করা সভ্যতার অঙ্গ হইয়াছে; আমাদের এই গরম দেশে জামাজোড়া আঁটিয়া ঠিক দুপ্রহর বেলায় কারখানায়, আপিসে, স্কুলে বন্ধ থাকা এখন অনিবার্য্য দস্তুর; ইহার ফলে আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগ অতিশয় প্রবল ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। পুরুষেরা তবু আপিস স্কুলে যাতায়াতের সময়ও একটু খোলা জায়গার মুখ দেখিতে পায়, উহারই মধ্যে একটু মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শ লাভ করে, কিন্তু মহিলাদের অবস্থা আরো শোচনীয়; পুরুষদের অসভ্য ও অভদ্র আচরণে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা রুদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, এবাড়ী ওবাড়ী যাতায়াত করিতেও গাড়ী পাল্কীর দরকার। ইহার ফলে মহিলাদের মধ্যেও এই রোগ প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে এবং তাহা সন্তানদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া কত পরিবারকে দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। কত উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ যুবক যুবতী অকালে মৃত্যু লাভ করিয়া দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডের কবি কীট্‌স্ ও ফ্রান্সিস টমসনের ন্যায়, বাংলার তরু ও অরু দত্তের ন্যায়, চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় কত কত অফুটন্ত ভাবরাশি হারাইয়া আমরা কাঙাল হইতেছি, তাহার কি ঠিক ঠিকানা আছে! গণনায় স্থির হইয়াছে, ইংলণ্ড অপেক্ষা এখানকার যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা অধিক। যে জাতি নিজেদের ধ্বংসের পথ রোধ করিতে সচেষ্ট না হয় তাহাদের সর্ব্বৈব বিনাশ অবশ্যম্ভাবী! আমাদের সৌভাগ্যের কথা, যে, এদিকে নজর পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

মহারাজা পাটিয়ালা

ধরমপুর স্বাস্থ্যনিবাস।

যে সকল মহাত্মারা এই সকল বিষম ক্ষয় রোগগ্রস্ত নরনারীর কল্যাণের জন্য যে স্থান ঋষি তপস্বীর পুণ্য-স্মৃতিতে পবিত্র সেই দেবতাত্মা হিমালয়ের ক্রোড়ে ধরমপুরে সেবাধর্ম্মের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। এই তীর্থস্থান প্রত্যেক ধর্ম্ম-পিপাসু লোকেরই শ্রদ্ধার ক্ষেত্র।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি হিমালয়ে বাস করিলে মনের প্রফুল্লতায় শারীরিক রোগ আর থাকিতে পারে না। তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতে সূর্য্যালোকের বিচিত্র বর্ণলীলা, প্রশান্ত কোলাহলহীন গম্ভীর দিবসগুলি, দেবদারু তরুকুঞ্জের অনন্ত বিস্তার, স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শ, রোগীর দেহমনের পরম রসায়ন। এখানে রেল হওয়াতে খাদ্যসামগ্রীরও অসদ্ভাব নাই; অধিকন্তু ভেজালহীন খাঁটি দুগ্ধ প্রচুর পান করিয়া রোগী স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে আরক্তিম নিটোল হইয়া উঠে।

প্রথম বৎসরেই ভর্ত্তি হইবার জন্য পাঞ্জাব হইতে ১৪৭, যুক্তপ্রদেশ হইতে ২৮, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ হইতে ২৪, বাংলা হইতে ১২, মান্দ্রাজ হইতে ৪, এবং ব্রহ্মদেশ হইতে ২ জন রোগী দরখাস্ত করিয়াছিল। ধরমপুর হইতে যে দেশ যতদূরে সে দেশ হইতে রোগীর দরখাস্ত তত অল্প। তবু সব দেশের ও সব জাতির লোকই যে ইহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। রোগীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হিন্দু। ইহা বোধ হয় আমাদের সমাজে বাল্য বিবাহের বিষময় ফল। হিন্দু সমাজের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

গত বৎসর স্থানের অকুলান হেতু শতকরা ২৫ খানি দরখাস্ত মাত্র মঞ্জুর করিতে পারা গিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এইরূপ স্বাস্থ্যনিবাসের আরো কত অভাব আছে।

ধরমপুরে একটি দেবদারু বনের মধ্যে জায়গা সাফ করিয়া রোগীদের থাকিবার কুটীর, পথ, চৌবাচ্চা, প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার আরো বিস্তৃতি ও উন্নতি হইবার যথেষ্ট স্থান আছে, কেবল এখন টাকার দরকার। কুটীরগুলি এমন ভাবে তৈরি যে প্রত্যেক রোগী দু একজন আত্মীয় সঙ্গে লইয়া পৃথক ভাবে থাকিতে পারে; অনেক রোগীর সঙ্গেই আত্মীয় আছেন এবং তাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক রূপে স্বাস্থ্যনিবাসের বহু কাজ করিয়া দিতেছেন। বর্ত্তমানে

আশ্রমে মহিলা রোগী অনেক আছেন। একটি পার্সী মহিলা সুস্থ হইয়া এই আশ্রমেই সেবিকার ব্রত গ্রহণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। একজন বাঙালী মহিলাও সেখানে আছেন।

এইখানে আসিলে দেখা যায় যে মানুষ জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে এক। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্সী সকলেই এক রোগে সমান যন্ত্রণায় ভুগিতেছে এবং একই আবহাওয়ার দ্বারা বিশ্বমাতা পদ্মহস্ত বুলাইয়া তাহাদিগকে ব্যাধিমুক্ত করিয়া দিতেছেন।

অনেকের এই রোগের সূত্রপাত পাঠ্যাবস্থাতেই হয়, পরে ধরা পড়ে। এজন্য স্কুলে স্কুলে চিকিৎসক দ্বারা রীতিমত পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ছাত্রদিগের মধ্যে মধ্যে ওজন করিলে কাহারো শারীরিক ক্ষয় হইতে থাকিলে শীঘ্র ধরা পড়িতে পারে। যক্ষ্মার অপর নাম ক্ষয় রোগ।

প্রত্যেক প্রদেশেই এক একটি যক্ষ্মা প্রতিষেধক আশ্রম থাকা উচিত। রোগের সূত্রপাত হইবামাত্র চিকিৎসা আরম্ভ হইলে সে রোগী ত ভালো হয়ই, অধিকন্তু সে নিজ পরিবারে ঐ রোগ সংক্রমিত করিতে পারে না। পরিণত যক্ষ্মা রোগে শৈলবাস ও দেবদারু বনের বাতাস নিতান্ত হিতকারী। এই হিসাবে ধরমপুর স্থানটি সুনির্বাচিত হইয়াছে।

ধরমপুর স্বাস্থ্যনিবাসের পরিচয় যত বিস্তৃত হইতেছে, রোগীদের সেখানে ভর্ত্তি হইবার আগ্রহ তত বাড়িতেছে। কিন্তু এখনো অর্থের ও ঘরের যথেষ্ট অভাব আছে। সাধারণ ও বদান্য জমিদারদের সাহায্যের এই একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা এই আশ্রমের উন্নতিকল্পে কিছু দিতে চান, তাঁহারা তাঁহাদের দেয় চাঁদা ভারতহিতৈষী পাদ্রী শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেবকে পাঠাইলে আশ্রমে পৌঁছিবে। এণ্ড্রুজ সাহেবের ঠিকানা Rev. C. F. Andrews, Delhi.

পুস্তক-পরিচয়

মেঘনাদ বধ কাব্য—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ১৯১০। ডিমাই অষ্টাংশিত ৩৯৩+৮+২০ পৃষ্ঠা। ৭খানি চিত্র। উত্তম কাগজ, পরিষ্কার ছাপা, কাপড়ে বাঁধা। মূল্য তিন টাকা। মেঘনাদ বধের, শুধু মেঘনাদ বধের কেন বোধ হয় কোনো বাংলা গ্রন্থের, এমন সটীক ও সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। প্রত্যেক সর্গের ঘটনাভাগ, পাঠান্তর, শব্দার্থ, ব্যাকরণ, ব্যাখ্যা, মাইকেলের বিশেষ রচনারীতির পরিচয়, য়ুরোপীয় কবিদের রচনার সহিত মাইকেলের ভাব ও রচনা সাদৃশ্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত, কাব্যের চরিত্র সমালোচনা, ভৌগোলিক পরিচয়, ভূমিকা, পরিশিষ্ট প্রভৃতি অতি নিপুণতা ও পাণ্ডিত্য সহকারে লিখিত হইয়াছে। ইহা শিক্ষক, ছাত্র উভয়েরই উপকারে আসিবে। চিত্রগুলি সাধারণ রকমের হইয়াছে, আর্টের পরিচয় নাই।

মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ

শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম এ, দ্বারা মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ২১০।৩১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (১৩১৮)। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ২৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১॥০, কাগজের মলাট ১০০। মেগাস্থেনীস গ্রীক রাজ সেলিউকাসের দূত হইয়া পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আসিয়াছিলেন, সে আজ দুহাজার বৎসরের কথা। মেগাস্থেনীস ভারতপ্রবাসকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, আচার, রীতি, আচরণ, ভৌগোলিক সংস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা এখন সেই সুদূর অতীতের ইতিহাস উদ্ধারের এক শ্রেষ্ঠ উপকরণ বলিয়া পণ্ডিতদিগের নিকট সমাদৃত। ১৮৪৬ সালে জর্ম্মান অধ্যাপক শোয়ানবেক লাটিন ভাষায় লিখিত একটি উপাদেয় দীর্ঘ ভূমিকা সহ মেগাস্থেনীসের মূল গ্রীক ভারত বিবরণ প্রকাশিত করেন। ১৮৮০ সালে ম্যাকক্রিণ্ডল্ সাহেব সেই সংস্করণের ইংরাজি অনুবাদ করেন ও স্থানে স্থানে টীকা সংযুক্ত করেন। অধ্যাপক রজনীকান্ত শোয়ানবেক সাহেবের প্রকাশিত মূল গ্রীক ভারত-বিবরণ ও শোয়ানবেক লিখিত লাটিন ভূমিকা অনুবাদ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে ম্যাকক্রিণ্ডল্ সাহেবের টীকারও অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই বর্ত্তমান বাংলা সংস্করণকে শোয়ানবেক, ম্যাকক্রিণ্ডল্ ও রজনীকান্ত এই তিন পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ত্রিবেণী-সঙ্গম বলা যাইতে পারে। গ্রন্থশেষে তিনটি পরিশিষ্ট আছে—(১) গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। (২) ভৌগোলিক নির্ঘণ্ট ও তাহাদের আধুনিক নাম ও সংস্থান। (৩) স্মরণীয় বিষয় সমূহের নির্ঘণ্ট। কেবল মাত্র এই পরিশিষ্ট পাঠেই প্রাচীন ভারতের যে জ্ঞান হয় তাহা অমূল্য। সেকালে চৌর্য্য, মিথ্যা-কথন বিরল ছিল, ও দাসত্ব অজ্ঞাত ছিল; বিদ্বান ও পণ্ডিতগণ রাজাদের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিতেন; লোকেরা স্বাধীন, সৎ, শান্ত, ন্যায়পরায়ণ ও সাহসী ছিল; দেশে বিদ্যা ও কলা চর্চ্চার অসদ্ভাব ছিল না। প্রাচীন ভারতের এইরূপ কত পুণ্যময় পরিচয় বিদেশীর লেখনী অকপটে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে আপনার দেশের অতীত গৌরবকাহিনী পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকারের প্রস্তাবে ও পরম বদান্য বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কাশিমবাজারের সহায়তায় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের নাম সংযুক্ত করিয়া যে সংগ্রহ প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অগ্রদূতরূপে এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়া পরবর্ত্তী সাফল্যের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে; এই পুস্তক প্রকাশে বঙ্গভাষার সম্পদ বর্দ্ধিত হইল। ছাপা ও বাঁধাই পরিষ্কার।

ভারতীয় বিদুষী—

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৭, মূল্য দশ আনা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিশ

ষ্ট্রীট। এই পুস্তক সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই। বাংলা ভাষার যে বইয়ের বৎসরে একবার নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা দরকার হয় সে বই যে বহুপরিচিত ও পাঠক-সমাদৃত তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের বিজ্ঞাপনার্থ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই পুস্তকে প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে প্রাচীন ভারতের শেষ যুগ পর্যন্ত দীর্ঘকালের মধ্যে প্রাদুর্ভূত বিদুষীগণের একটি সুশৃঙ্খল ও কবিত্বরসমধুর বর্ণনা দিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি যাহাতে ছোট ছোট বালিকারাও পাঠ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে বর্তমান সংস্করণে বহুস্থান পরিবর্জন ও পরিমার্জন করা হইয়াছে।

পদ্মাপুরাণ

বংশীদাস রায় বিরচিত। শ্রীরমানাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩১৮। ডবল ক্রাউন ১৬ অংশিত ৬৬১+৭+৩/০। সচিত্র। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১।৷০ টাকা। দ্বিজ বংশীদাস প্রায় ৩০০ বৎসরের প্রাচীন কবি। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাতুয়ারী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এই কাব্য মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনী লইয়া লিখিত। এই প্রাচীন উৎকৃষ্ট কাব্যখানির সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া সম্পাদকগণ ও প্রকাশক বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে একটি ভূমিকা ও পরিশিষ্টে প্রাচীন শব্দার্থ দেওয়া হইয়াছে।

চন্দ্রধর—

শ্রীরামদয়াল দাস কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট হইতে প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৩১৭। মূল্য।০ আনা। এখানি মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনী গদ্যে উপাখ্যানের আকারে লিখিত; লেখক চাঁদ সদাগরকে অটল মনুষ্যত্বে ভূষিত বীররূপে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষা সরল।

আমি কে!

শ্রীপ্রমথনাথ বড়াল কর্ত্তৃক প্রণীত ও রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত। মূল্যনির্দ্দেশ নাই।

স্বধর্ম্ম—

শ্রীমৎ লক্ষ্মণ মজুমদার প্রচারিত। শ্রীআনন্দাচরণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক রথেড়াং, আকায়েব, ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত। ১৩১৭। মূল্য ১৲ টাকা। ইহা সংস্কৃত, বাংলা, গদ্য পদ্য, মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বহু উপায়ে লিখিত। ভাষা ভয়ঙ্কর, বক্তব্য দুর্বোধ্য।

হীরক-কণা—

শ্রীআবদুল হাকিম সঙ্কলিত। শ্রীনওয়াব আলী আহমেদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ময়মনসিংহ মুসলমান বোর্ডিং হাউসে প্রাপ্তব্য। মূল্য চার আনা। ১৯১১। ইহাতে হজরত মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অমূল্য উপদেশের কিয়দংশ সংগৃহীত হইয়াছে।

ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ (প্রথম খণ্ড) —

২৮।৩ বিডন রো, কলিকাতা হইতে কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ডিমাই অষ্টাংশিত ২৪৮+ন পৃষ্ঠা। মূল্য ২।৷০ টাকা। ১৩১৮। ইহা বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ, ডাক্তারী ও কৃষিগ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়া এবং নিজের ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতায় লিখিত হইয়াছে। চাষের ক্ষেত্র, সার, প্রণালী, বস্তু প্রভৃতি বহু বিষয়ক বিবরণ সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে; রচনার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক ক্রম ও উদ্ভিদবিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিবার চেষ্টা আছে। দেশারকমে যাঁহারা বাগানি শিক্ষা করিতে চান ইহা তাঁহাদেরও কিছু কাজে লাগিতে পারে।

বৈজ্ঞানিক পাক-প্রণালী —

ডা. শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক প্রণীত। ২০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কার্ত্তিক প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছই আনা। কি উপায়ে পাক করিলে অল্প খরচে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য পাক করা যাইতে পারে, পাকের উদ্দেশ্য কি এবং খাদ্য কিরূপ হইলে পুষ্টিকর হয় ইত্যাদি বহুবিষয় সংক্ষেপে এই পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ইকমিক কুকার নামক চুল্লীর পরিচয় ও উপকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে কতকগুলি আমিষ নিরামিষ খাদ্য ও তাহার পাকপ্রণালী সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

Bengali made Easy —

কাশী যোগাশ্রম হইতে স্বামী সেবানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত সাড়ে চার আনা, অগ্রিম ডাকটিকিটে প্রেরিতব্য। ১৯১১। ইংরাজির সাহায্যে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকা প্রণীত হইয়াছে। বাংলা শব্দগুলি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, পরিশিষ্টে বাংলা অক্ষরের সঙ্গে পরিচয়ের ব্যবস্থা আছে। বাংলার প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ ও পাদটীকায় তাহার তরজমা অর্থ, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণ, বাংলার চলিত কথায় শব্দের রূপবিকৃতি প্রভৃতিও দিতে ভুল হয় নাই। এই বইখানি ক্ষুদ্র হইলেও অন্য প্রদেশবাসীদের বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুসমাজ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকাশক শ্রীশ্রীকালী ঘোষ, ৫৬ মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩১৬ ও ১৩১৭ সাল. দুই পয়সার টিকিট পাঠাইলে ১ম খণ্ড বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। ইহাতে হিন্দুসমাজের চিন্তা করিবার বহু বিষয় বহুদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে আলোচিত হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক হিন্দুরই পাঠ করিয়া চিন্তা করা উচিত। ইহা হিন্দুভাবে লিখিত।

মোহনভোগ—

শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স। ১৩১৭। মূল্য ছয় আনা। এখানি শিশুরঞ্জন পুস্তক। ছবির সঙ্গে কবিতায় লেখা। মলাটে ও ভিতরে মোট তিন খানি রঙিন ছবি আছে, এক রঙের ছবিও অনেক আছে, ছবির মধ্যে একখানি প্রসিদ্ধ চিত্রকর মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্ত্তৃক প্রবাসীর জন্য অঙ্কিত ও প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবির প্রতিলিপি অথচ কোথাও সে ঋণস্বীকার নাই। অন্য ছবিগুলি চলনসই। পদ্য রচনা শিশুদের উপযোগী শিক্ষা ও কৌতুকে মিশানো, কিন্তু ছন্দোভঙ্গে পঙ্গু এবং অনাবশ্যক বিষয়ের সমাবেশে ভারাক্রান্ত।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১১শ ভাগ | শ্রাবণ, ১৩১৮ | ৪র্থ সংখ্যা
১ম খণ্ড

বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ

বুদ্ধদেব যে শূন্যবাদী ছিলেন না তাহা আমরা কয়েকটা প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি। অদ্য আমরা দেখাইব যে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আত্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

'ইতিবুত্তকং' নামক পালি গ্রন্থে লিখিত আছে যে এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন:—

> যস্স রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা;
> তম ভাবিতত্তঞ্ঞতরম্ ব্রহ্মভূতম্ তথাগতম
> বুদ্ধম্ বেরভয়াতীতম আহু সব্বপহায়িনন্তি।
>
> —২।৯। (৬৮)।

"যাহার রাগ, দ্বেষ এবং অবিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে, তাহাকে ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, 'ব্রহ্মভূত', তথাগত এবং বৈর ও ভয়াতীত, এবং সর্ব্বত্যাগী বুদ্ধ বলা হয়।"

'ব্রহ্মভূত' শব্দের অর্থ কি? যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন, যিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই 'ব্রহ্মভূত' বলা হয়। এই অর্থেই বুদ্ধকে ব্রহ্মভূত বলা হইয়াছে।

সুত্তনিপাত নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে এক সময়ে সেল নামক একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোতম প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন কি না এই বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে গোতম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন:——"আমি

চক্র—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছি। ... যাহা অভিজ্ঞেয় তাহা আমি জ্ঞাত হইয়াছি, যাহা সাধন করিতে হইবে তাহাতে আমি সিদ্ধ হইয়াছি; যাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি; হে ব্রাহ্মণ! সুতরাং আমি বুদ্ধ হইয়াছি। ... আমি 'ব্রহ্মভূত' এবং 'অতুলনীয়', আমি মারের সেনা প্রমর্দ্দন করিয়া অমিত্র-সমূহকে বশীভূত করিয়া অকুতোভয় চিত্তে আনন্দ ভোগ করিতেছি।"

> ব্রহ্মভূতো অতিতুলো মারসেনপ্পমদ্দনো
> সব্বামিত্তে বসীকত্বা মোদামি অকুতোভয়ো।
>
> সেলসুত্ত, ১৪। (৫৬১)।

এখানেও বুদ্ধকে 'ব্রহ্মভূত' বলা হইয়াছে। কেবল 'ব্রহ্মভূত' কথাটাই যে এখানে রহিয়াছে তাহা নহে, লক্ষণ সমূহেও দেখা যাইতেছে যে তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন - সুতরাং 'ব্রহ্মভূত' শব্দের অর্থ 'ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত'ই।

'দীঘনিকায়' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে এক সময়ে বুদ্ধ এইপ্রকার বলিয়াছিলেন "মানুষ চারিপ্রকার। এই পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানব নিজেকে নিগ্রহ করে (অত্তন্তপ), এবং নিজেকে পরিতাপ দিবার জন্য নিযুক্ত। এই পৃথিবীতে আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা অপরকে নিগ্রহ করে (পরন্তপ) এবং অপরকে পরিতাপ দিবার জন্য নিযুক্ত। এই পৃথিবীতে আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা নিজেকেও পরিতাপ দেয় ও 'আত্ম-পরিতাপন' কার্য্যে নিযুক্ত এবং অপরকেও পরিতাপ

দেয় ও ‘পর-পরিত্রাপন’ কার্য্যে নিযুক্ত। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা ‘আত্মন্তপ’ও নহেন এবং ‘আত্ম-পরিতাপন’ কার্য্যেও নিযুক্ত নহেন; ‘পরন্তপ’ও নহেন এবং ‘পর-পরিতাপন’ কার্য্যেও নিযুক্ত নহেন। যাহারা ‘আত্মন্তপ’ও নহেন এবং পরন্তপও নহেন তাঁহারা এই দৃষ্ট জগতেই বাসনা-বিরহিত, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, প্রশান্তচিত্ত, সুখপ্রাপ্ত এবং ‘ব্রহ্মভূতাত্মা’ হইয়া বিহার করেন—

"সো অনত্তন্-তপো অপরন্-তপো দিট্‌ঠে ব ধম্মে নিচ্ছাতো নিব্বুতো সীতিভূতো সুখপটিসম্বেদী ব্রহ্মভূতেন অত্তনা বিহরতি।"

—সঙ্গীতি-সুত্তন্ত ১।৪৭।

‘ব্রহ্মভূতেন অত্তনা’=‘ব্রহ্মভূতেন আত্মনা’ অর্থাৎ ব্রহ্মভূতাত্মরূপে। বুদ্ধের মতে মুক্তাত্মা ‘ব্রহ্মভূতাত্মা’ রূপে বিহার করেন।

‘মজ্‌ঝিম নিকায়’ নামক গ্রন্থেও পূর্ব্বোক্ত রূপ চারি শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইয়াছে Trenckner's edition, কন্দরকসুত্তম, পৃঃ ৩৪১ দ্রষ্টব্য। ভাব উভয় স্থলেই এক, ভাষায় যাহা পার্থক্য আছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। ‘সঙ্গীতি সুত্তন্ত’ হইতে আমরা যতটুকু পালি ভাষা উদ্ধৃত করিয়াছি ততটুকুতে ভাষাগতও কোন পার্থক্য নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

(প্রথম পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি)

একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই এই নব দর্শনতন্ত্র অবলম্বন করে নাই; পরন্তু কতকগুলি রূপক ও দৃষ্টান্ত-কথার দ্বারা ইহা জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়ে। শ্রমণ নামক অ-ব্রাহ্মণ সুধীগণ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। আরণ্য আশ্রমে, তপোনিরত সন্ন্যাসীদিগের সহিত, যোগীদিগের সহিত, আত্মসংযম-অভিলাষী রাজারা, বণিকেরা, রমণীরা, বালকেরা অবস্থিতি করিতে লাগিল।(১) যাহারা ধর্ম্ম-জীবন অবলম্বন করে নাই তাহারাও এক প্রকার অজ্ঞাতপূর্ব্ব চিত্তপ্রসাদ লাভ করিল। সকলেই আর এক চক্রবর্ত্তীকে, একজন বুদ্ধকে প্রার্থনা করিতে লাগিল যিনি প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন, যিনি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই একই সান্ত্বনা ও একই আশা প্রদান করিবেন। চক্রবর্ত্তী রাজার ন্যায় বুদ্ধ, সৌর আখ্যায়িকার বীরগণের সহিত একীভূত হইল। এবং বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বুদ্ধজীবনের আশ্চর্য্য ঘটনা সকল কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।(২)

বহু ধর্ম্মসংস্কারক আপনাদিগকে বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন; তন্মধ্যে কোন একজন, প্রকৃত বুদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হইয়া ছিলেন: তিনি সিদ্ধার্থ গৌতম, কপিলবস্তুর রাজার পুত্র, শাক্যবংশীয়,—বোধ হয় শক জাতি হইতে উৎপন্ন। (৫৫৭ ৪৭৭ ?)

(১) জাতক (যুবানজয় ও কুলসুত্তসম)। Dr. Richard Fick-এর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। Die Social Gliederung im Nordöstlichen Indien zu Buddha's Zeit এই গ্রন্থে কারিকর ও বণিকদিগের মধ্যে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বচনগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। III ৩০০; II ১৩৯; III ৩৮১; IV ৩৪২ ইত্যাদি।

(২) সৌর উপাখ্যান, বৈদিক দেবতা, কৃষ্ণের উপাখ্যান যাহা একই সময়ে রচিত হয়, উপনিষদের তত্ত্ববিদ্যা এবং জাতকে যে সকল ঐতিহ্য যে সকল বিশ্বাস, যে সকল লোকপ্রসিদ্ধ কাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছে, ঐ সমস্তের সহিত এই উপাখ্যানটি একসূত্রে সম্বদ্ধ। বুদ্ধ উপাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রধান কাহিনী। প্রথমটি জন্ম-কাহিনী: বুদ্ধ একজন চক্রবর্ত্তী রাজার পুত্র; তাঁহার জননীর নাম মায়া; একটা মায়া কাননের মধ্যে মায়াদেবী অলৌকিকভাবে একটি পুত্র প্রসব করেন। দ্বিতীয় কাহিনী—তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ। পুত্রকে সতত বিষণ্ণ দেখিয়া রাজা উদ্বিগ্ন হইলেন এবং পুত্রকে বিলাসসামগ্রীপূর্ণ একটি প্রাসাদের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু রাজকুমার চারিবার অনুমতি লইয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হন। তিনি প্রথমবারে, একজন বৃদ্ধকে, দ্বিতীয়বারে একজন কুষ্ঠরোগীকে, ও তৃতীয়বারে, একটি শবযাত্রা দেখিতে পান। তিনি মনে মনে ভাবিলেন:—"কি ভয়ানক! মানুষদের মধ্যে জরা আছে, রোগ আছে, মৃত্যু আছে। এই সকল দুঃখ দর্শন করিয়া তাহাদের কেবল বিরক্তিই জন্মে; ইহার জন্য তাহারা কখনো চিন্তা করে না, কখনো অনুতাপ করে না।" শেষবার যখন প্রাসাদ হইতে বাহির হন, তখন একজন ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলেন।—ভিক্ষু বলিয়া উঠিল:—"আমি কে?—আমি ভিক্ষু। ভিক্ষু সকল সময়েই প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত।—আমি কে?—আমি ভিক্ষু। ভিক্ষু সকল সময়েই মরিবার জন্য প্রস্তুত। যে ধনের অন্ত নাই আমি সেই পরম ধনের ভিখারী।" এই কথাগুলিতে রাজকুমারের মনের গতি ফিরিয়া গেল। তিনি প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া, তপশ্চর্য্যার উদ্দেশে অরণ্যে গমন করিলেন। তৃতীয় কাহিনী—মারের সহিত ও দানব-সৈন্যের সহিত বুদ্ধের সংগ্রাম। ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হন। (ললিতবিস্তর ও বুদ্ধচরিত দ্রষ্টব্য)।

উপনিষদের শেষ আচার্য্যদিগের ন্যায়, গৌতমও মায়াবাদ, জন্মান্তর বাদ, মায়ান্ধ দোষকলুষিত দুঃখপীড়িত জীবের সংসার আবর্ত্তে দুঃখ ভোগ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিলেন ; তাহাদিগেরই ন্যায় গৌতম নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেশ দিলেন। কিন্তু উপনিষদের আচার্য্যেরা দার্শনিকের কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, গৌতম ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে শুধু দুঃখের উৎপত্তি আবিষ্কার করিলেন তাহা নহে, দুঃখ হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায় তাহারও উপায় নির্দ্দেশ করিলেন।

নিম্নে তাঁহার একটি উপদেশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "তখন অতিলৌকিক যোগ দৃষ্টির দ্বারা আমি সমস্ত জীব পরম্পরা দেখিতে পাইলাম, উহারা আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে ; আবার প্রত্যাগত হইতেছে, এবং প্রত্যাগমনার্থ পুনর্ব্বার প্রস্থান করিতেছে। উহাদের মধ্যে আর্য্য অনার্য্য সুন্দর কুৎসিত সকল প্রকার লোকই আছে, কেহ বা সুখী, কেহ বা দুঃখী ; যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তাহার অবস্থাও সেই কর্ম্ম-ফলের অনুযায়ী হইয়াছে।

আমি এইরূপ দর্শন করিলাম। আমি মনকে একাগ্র করিলাম। আমি প্রথম সত্যটি আবিষ্কার করিলাম :- জন্ম মাত্রই দুঃখ।

পরে, দ্বিতীয় সত্যটি জীবন তৃষ্ণাই দুঃখের মূল।

তাহার পর, তৃতীয় সত্যটি তৃষ্ণার উচ্ছেদেই দুঃখের নিবৃত্তি।

তদনন্তর চতুর্থ সত্যটি- মধ্য পথই মোক্ষের পথ।" ১

এই মধ্যপথ যাহা তাপসধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী- এই মধ্য পথই মঠ ধর্ম্ম। গোড়ায় অবাধ চিন্তার প্রয়োজন-বোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভারতীয় দর্শন, অবশেষে এমন একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিল, যাহার মুখ্য নিয়ম বাসনা বর্জ্জন। এই সম্প্রদায় বর্ণ ভেদ-প্রথা হইতে মুক্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু মঠের অভ্যন্তরে বদ্ধ হইয়া পড়িল। একতা স্থাপনের দিকে, দলবন্ধনের দিকে, সেই সময়ে সমস্ত ভারতের মধ্যে যে একটা প্রবণতা দেখা দিয়াছিল সেই প্রবণতার দ্বারা চালিত হইয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম মণ্ডলীবন্ধনে প্রবৃত্ত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপাসক সম্প্রদায় ছিল, পরিষৎ ছিল, মঠাধ্যক্ষ ছিল, প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ (bishop) ছিল, এবং সম্ভবত জ্যেষ্ঠসমাজপতিও (patriarch) ছিল। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মসংহিতাও ছিল, ভিক্ষুশ্রেণীর নিয়মাদি ছিল, মনস্তত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ ও গ্রন্থাদি ছিল। এই ধর্ম্মসংহিতা পালিভাষায় রচিত। মগধরাজ্যে যে লোক ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহারই সাহিত্যিক রূপ এই পালি। দেবতার অভাবে, বৌদ্ধধর্ম্ম একটি ত্রি তত্ত্বের (trinity) আশ্রয় গ্রহণ করে ; সেই ত্রি তত্ত্ব বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ।

ভিক্ষু ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে, জনসাধারণের জন্যও একটি ধর্ম্ম গঠিত হয়। গৃহস্থ বৌদ্ধ নিজ বর্ণের নিয়ম ও প্রথাদি রক্ষা করিয়া চলিত ; এবং নিজ গৃহ দেবতাদিগেরও পূজা অর্চ্চনা করিত।

নির্ব্বাণ লাভের উচ্চ আশা তাহাদের ছিল না, নরকে না যাইতে হয়, স্বর্গে গতি হয়, অথবা এই পৃথিবীতেই কোন উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে - এইটুকু হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। দৈনিক নীতি উপদেশই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। দৃষ্টান্ত কথার ছলে ভিক্ষুরা বৌদ্ধ গৃহস্থদিগকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিত। উহারা বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ উহাদের নিকট বলিত। জাতক গ্রন্থে এই সমস্ত লোকপ্রিয় কাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছে। উপকথা ; অধিকাংশ য়ুরোপীয় উপকথা এই গ্রন্থ হইতে উৎপন্ন। শৃগালের গল্প, বাঘের গল্প, সিংহচর্ম্মধারী গর্দ্দভের গল্প প্রভৃতি। প্রাচ্য-জাতির যাহা অতিশয় প্রিয়, সেই সব দুঃসাহসিক অদ্ভুত কর্ম্মের বর্ণনা। ধর্ম্মঘটিত পৌরাণিক কথা। উহাতে ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব পদার্থের অসারতা ও পবিত্র মৈত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। কোথাও, একটা খরগোশ আপনার মাংস দিয়া কোন ক্ষুধাক্লিষ্ট পথিকের ক্ষুধাশান্তি করিয়াছে ; কোথাও বা, একটা ভারুই পাখী আপনার শাবকদের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, কোথাও, কোন অগ্নিপ্রজ্বলিত দ্বীপে একটা নদীকে লইয়া যাইবার চেষ্টায় একটা হরিণ সেই নদীর জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। কোথাও বা কতকগুলি পুণ্যকীর্ত্তি সিদ্ধপুরুষ স্বকীয় ভ্রাতৃগণের সুখসম্বর্দ্ধনে নিরত ; উহাদের শেষ বংশধর

(১) মজ্ঝিম নিকায়ো, IV, ৮, ৪৮, ৪৯, Karl Eugen Neumann কৃত জর্ম্মান-অনুবাদ। ঐ সঙ্কলনের I, ৯, ৪৯, ৫ IV, ৭, ৮— এইগুলিও দ্রষ্টব্য।

দেশান্তর; তিনি পূর্ব্বেই সর্ব্বস্ব দান করিয়া বসিয়াছেন; এই সময়ে একজন ভিক্ষু আসিয়া ভিক্ষা চাহিল, এখন কেমন করিয়া তাহাকে ভিক্ষা দিবেন? ভিক্ষু বলিল, তোমার শিশু সন্তানকে আমি ভিক্ষা চাহি।— আচ্ছা উহাকে গ্রহণ কর। মৈত্রীর দ্বারা অপত্য-স্নেহ বিজিত হইল এই কথা ঘোষণা করিয়া পৃথিবী তিনবার কম্পিত হইলেন। জাতকের মতবাদটি এই:—জন্মান্তরবাদ বিভিন্ন বর্ণের অসমতা অপনীত করে; কি মনুষ্য, কি জন্তু, কি পশু, প্রত্যেক জীবের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল: সাধু শূদ্রগণ পরজন্মে রাজ পদ লাভ করিবে; অসাধু ব্রাহ্মণ ও অসাধু রাজারা নীচবর্ণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে: যে বুদ্ধ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে—কখন বিদ্যুৎ, কখন বৃক্ষ, কখন পশু, কখন শূদ্র, কখন ব্রাহ্মণ, কখন রাজা হইয়া জন্মিয়াছিলেন,—সেই বুদ্ধ তাঁহার দুঃখের দ্বারা, তাঁহার প্রযত্নের দ্বারা, তাঁহার পুণ্যের দ্বারা, তাঁহার অক্ষয় প্রেমের দ্বারা মনুষ্যদিগকে এই কথাটি বলিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন: "জীবন দুঃখময়, সে দুঃখ অপ্রতিবিধেয়। এক দিনের ধনসম্পদের জন্য কেন তোমরা বিবাদ করিতেছ? আমি মোক্ষের পথ প্রাপ্ত হইয়াছি; সে কি? না, ভবতৃষ্ণা বিসর্জ্জন।"

এই সাম্য ও মৈত্রী সম্বন্ধীয় দুইটি মতবাদ সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দাসবংশোদ্ভব প্রথম সম্রাট অশোক, বৌদ্ধধর্ম্মকে রাষ্ট্রধর্ম্মরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রস্তর খোদিত অনুশাসনগুলিতে এই কথাটি পরিঘোষিত হইয়াছে যে, মনুষ্য ও ইতর প্রাণীদের প্রতি মৈত্রী প্রদর্শনই, ইহলোকে ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভের একমাত্র উপায়।(৪)

*
* *

যদি দেখা যায়, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে, শান্তি সুশৃঙ্খলা ও ভৌতিক সমৃদ্ধির প্রভাবে, লোকের স্বভাবে মৃদুতা আসিয়া ঈদৃশ নীতিতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে কি কতকটা প্রমাণ হয় না যে, আব্‌হাওয়া ও আদিমবাসীদিগের সংসর্গ প্রভাবেই আর্য্যগণ হীনবীর্য্য ও কোমলপ্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছিল? পূর্ব্বে যাহারা সমৃদ্ধি সম্পদে পূর্ণ শত শরৎকাল পর্য্যন্ত বাঁচিতে ইচ্ছা করিত তাহারাই এক্ষণে মৃত্যুর জন্য চিরমৃত্যুর জন্য লালায়িত। কর্ম্ম, বাসনা, চিন্তা এসমস্ত তাহাদের নিকট অপরাধ বলিয়া দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আর্য্যগণ ভারত জয় করিয়াছিল, পৃথিবীর মধ্যে তাহাদের সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল; এক্ষণে কিনা তাহাদের একমাত্র ধ্যান হইল:—শূন্যতা, নির্ব্বাণ, অস্তিত্ব, বিলোপ। এইরূপ বিষাদ ও নৈরাশ্যমূলক মতবাদের উপর কোন জাতির একতা পৃথিবীর ইতিহাসে

(৪) বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই আদিম রূপটি হীনযান নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে কোন দেবতাও ছিল না, মূর্ত্তিপূজাও ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ, শ্রমণ বা ভিক্ষুদিগের উদ্দেশেই উপদেশ প্রদান করিতেন, আরও কিছুকাল পরে ভিক্ষুণী সম্প্রদায় গঠিত হয়। প্রাচীন যুগের চতুর্থ শতাব্দীতে কিরূপ নিয়ম ছিল দেখ। দীক্ষার্থীগণ, ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, দীক্ষাগ্রহণের সময় এই কথাগুলি আবৃত্তি করিত:— "আমি বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতেছি। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—ইহাই বৌদ্ধ ত্রি-তত্ত্ব। পরে ঐ নবব্রতীগণ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিত: "আমি জীবহিংসা করিব না। আমি চুরী করিব না। আমি পরদারগমন করিব না। আমি মিথ্যা কথা বলিব না। আমি সুরাপান করিব না। আমি বিধিনির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়া কিছুই আহার করিব না; আমি বাদ্য বাজাইব না; আমি নৃত্য করিব না; নাট্যাভিনয় স্থলে উপস্থিত থাকিব না। মাল্য অলঙ্কারাদি ধারণ করিব না, গাত্রমর্দ্দনার্থ তৈলাদি ও কোন প্রকার সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিব না।" তৃতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধদিগকে কেবল ৮টি প্রতিজ্ঞা করিতে হইত,—হত্যা না করা। চুরী না করা। মিথ্যা কথা না কহা। সুরাসক্ত না হওয়া। পরদারগমন না করা। নিষিদ্ধ ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণ না করা। অলঙ্কার ও সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার না করা। মাদুরে শয়ন করা।" গৃহস্থ ভক্তদিগকে উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে কেবল প্রথম পাঁচটি প্রতিজ্ঞা পাঠ করিতে হইত।

গুরুতর কার্য্যগুলির মধ্যে, "প্রতিমোক্ষ" বা সাধারণ পাপখ্যাপন ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে ভিক্ষুগণ, দুই দুইজন করিয়া, নিম্নস্বরে পাপ খ্যাপন করে। তাহার পর, প্রত্যেক ভিক্ষু, পর্য্যায়ক্রমে অন্য ভিক্ষুর পাপ মার্জ্জনা করে। ভিক্ষুমণ্ডলী হইতে চিরকালের জন্য বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য চারিটি গুরুতর অপরাধ। যথা,—পরদারগমন, হত্যা, চৌর্য্য, সাধুতার জন্য আত্মগরিমা; কতকগুলি মার্জ্জনীয় অপরাধে, অপরাধী কিছুকালের জন্য ভিক্ষুমণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে; আবার কতকগুলি অপরাধে, ন্যূনাধিক কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

হীনযানের মতে, নির্ব্বাণের পথে উপনীত হইবার চারিটি ধাপ:— যাহারা সুপথে প্রবেশ করে সেই গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের এক ধাপ, যে সকল ধর্ম্মশীল ভিক্ষু পৃথিবীতে একবার মাত্র ফিরিয়া আসিবেন—তাহাদের এক ধাপ; যে সকল সিদ্ধপুরুষ নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, যাহারা মর্ত্তলোকে আর প্রত্যাগমন করিবেন না তাহাদের এক ধাপ; যে সকল অর্হৎ ইহজন্মেই নির্ব্বাণ লাভ করেন, তাঁহাদের এক ধাপ। "এমন কি, দেহ-নাশের পূর্ব্বেই, অর্হৎ কালের উপর আর নির্ভর করেন না। তখনও যে তিনি জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হন—তাহার কারণ, যেমন, তৈলহীন প্রদীপে যতক্ষণ বর্ত্তিকা আর্দ্র থাকে ততক্ষণই দীপটি জ্বলিতে থাকে—তাহার পরেই নিবিয়া যায়, সেইরূপ শীঘ্রই তাঁহার শরীর মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আর তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইবে না।" (সুত্ত নিপাত।)

কেবল এই একবারমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

৪

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ভারতীয় জনসমাজ। হিন্দুজাতি।—রীতি-নীতি- পল্লীগ্রাম।—নগর।—রাজাদিগের দরবার। রাজশক্তি। রাজ্যশাসন।—বিচার কার্য্য।—রাজস্ব।—বিভিন্ন বর্ণ।—দাস।—পরিবার। নারীগণের অবস্থা।

তৎকালে সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল এক্ষণে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

গাঙ্গেয় উপত্যকা-প্রদেশে, কালের যে কাজ তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। আর্য্য, দ্রাবিড়ী, কোলারীয়, মোগল পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া একটি পৃথক জাতিতে—হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়। এই জাতি মিশ্র হইলেও, উহার অবান্তর ভেদগুলিকে একটা বিশেষ ছাঁচের মধ্যে আনিতে পারা যায়। পুরুষেরা উচ্চতায় মধ্যম প্রমাণ, পাত্‌লা নমনীয় গঠন, কষ্টসাধ্য কর্ম্ম করিতে অসমর্থ, মল্ল ও বাজীকরের হিসাবে উৎকৃষ্ট। রমণীরা ক্ষুদ্রাকৃতি, পাত্‌লা সুগোল গঠন, বক্ষ ও নিতম্বদেশ পরিপুষ্ট। পুরুষ ও রমণী—উভয়েরই রং শ্যামল, প্রায়ই কালো: রাজারাও এক্ষণে তাঁহাদের সাদা রঙের জন্য গর্ব্ব করিতে পারেন না; তাহাদের ঘনশ্যামবর্ণ, নীলপদ্মকে স্মরণ করাইয়া দেয়, এক জাতীয় কপোত-কণ্ঠকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহাদের দীর্ঘ পক্ষ্মবিশিষ্ট বাদাম-আকৃতি পটল-চেরা চক্ষু; সুরেখান্বিত স্থূল ভ্রূযুগল, স্থূল ওষ্ঠ। উচ্চবর্ণের মধ্যে, ডিম্বাকৃতি কপোল, মুখাবয়বগুলি মানান-সই, নাসিকা চাঁচা ছোলা সরু। নীচ বর্ণের মধ্যে—মুখ চ্যাপ্‌টা, নাক খাঁদা। এই জাতি বুদ্ধিমান, মৃদুপ্রকৃতি, দুর্ব্বলচরিত্র, বাচাল, চতুর: প্রায়ই অলস ও ভীরু, কিন্তু দুঃখ-সহিষ্ণু, প্রায়ই বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর, কুসংস্কারাবিষ্ট, ও কামাতুর। বাগ্মিতা, কবিত্ব, দর্শন, শিল্প—এই সকল বিষয়ে সুনিপুণ। কতকগুলি বিজ্ঞানের অনুশীলনে উহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও সাধারণত উহাদের বিজ্ঞানের প্রতিভা নাই।(৫)

পরিচ্ছদ অতি সাদাসিধা। পুরুষদিগের পরিধেয় একটি পাগড়ী, একখণ্ড বস্ত্র কটিদেশে আবদ্ধ, আর এক খণ্ড, উত্তরীয় আকারে বাম স্কন্ধের উপর বিন্যস্ত। ব্রাহ্মণদিগের বক্ষের উপর যজ্ঞসূত্র তীর্য্যকভাবে লম্বমান; মস্তক মুণ্ডিত, মস্তকের চূড়াদেশে কেশগুচ্ছ বা শিখা। স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় একটি কাঁচুলী, একটা অ-সেলাই ঘাগরা (শাড়ী)। ধনীদিগের মধ্যে, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য; কণ্ঠমালা, সোনার কান-বালা, সোনার নথ, পায়ে নূপুর, হাতে বলয়, পাগড়ীর মাথায় পালোক গুচ্ছ বা শিরোভূষণ; ক্ষত্রিয়েরা তূণ ধারণ করে; যুদ্ধে বর্ম্ম পরিধান করে।

মহিষ কিংবা গরুর দ্বারা বাহিত শকটই তখনকার সচরাচর ব্যবহৃত যান। রাজারা হাতীতে চড়িয়া কিম্বা পাল্কী করিয়া যাতায়াত করেন; তাঁহারা রথে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করেন, সারথী রথ চালনা করে।

পল্লীগ্রাম। গাঙ্গেয় সমভূমি প্রদেশে গ্রামগুলি ছায়াময়; তাল, সুপারী, ডুমুর-জাতীয় বিভিন্ন বৃক্ষ ছায়াদান করে। পর্ব্বতে, অরণ্যে আশ্রম সকল অধিষ্ঠিত; সেইখানে যোগীরা নিষ্ঠুর তপশ্চরণ করিয়া থাকে, বল্কল পরিধান করিয়া পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া তাহাদের ভগিনীরা কৃষ্ণসার, ময়ূর ও শুকপক্ষী পালন করে। কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা বিদ্ধ মৃণ্ময় প্রাচীরে নগরগুলি পরিবেষ্টিত। এই পরিবেষ্টনের বাহিরে, অস্পৃশ্য বর্ণের অন্তভূত লোকদিগের বাস; সেই সকল ডোম ও চণ্ডাল শবদাহ করে, পশুদের মৃতদেহ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করে, প্রাণদণ্ডে অপরাধীকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া বধ করে। পরিবেষ্টনের অভ্যন্তরে, দরিদ্রদিগের অঞ্চল; কদলী রোপিত অঙ্গনের মধ্যে, কতকগুলি খোড়ো ঘর, মাটীর ঘর। ধনাঢ্যদিগের অঞ্চল; কতকগুলি 'তলা' বিশিষ্ট বং কর্‌রা কাঠের বাড়ী; অশ্বখুরাকৃতি গবাক্ষগুলা সূচাগ্রবিন্দুতে পর্য্যবসিত; কতকগুলি অলিন্দ ও কতকগুলি গরাদেওয়ালা বারাণ্ডা (৬)।

প্রত্যেক ব্যবসায়ের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র রাস্তা; এবং

---

* হিন্দু ভীরু ও বিশ্বাসঘাতক হইলে, হিন্দু সিপাহীর দ্বারা ইংরাজ ভারত অধিকার করিতে পারিতেন না। এবং য়ুরোপীয়ের তুলনায়, হিন্দু নিষ্ঠুর হওয়া দূরে থাকুক, একটু বেশী মাত্রায় দয়ালু বলিয়াই মনে হয়। অন্যান্য চরিত্র-লক্ষণ সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। —অনুবাদক

(৫) এই বর্ণনায় যাথার্থ্য নিরূপণ করিবার জন্য, ভারহুৎ ও সাঞ্চির মূর্ত্তিশিল্প এবং অজন্তা প্রভৃতির বর্ণ-চিত্র দ্রষ্টব্য; জাতক, মনু, মেগাস্থেনীস, আরিয়েন—প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য; এবং সমসাময়িক ভারতের প্রচলিত চরিত্র-আদর্শ ও রীতিনীতির সহিত তুলনা করা আবশ্যক।

(৬) সাঞ্চির খোদিত প্রস্তরাদি, বৌদ্ধ গুহাসমূহের গঠনরীতি ও জাতকের বর্ণনাদি দ্রষ্টব্য।

ব্যবসায়গুলিও বিভিন্ন প্রকারের। সোনার কাজ, রূপার কাজ, পিতলের কাজ, লোহার কাজ, বাঁশের কাজ, গজদন্তের কাজ, শিংএর কাজ, শাঁখের কাজ, এইরূপ কত কাজ। ক্ষৌম বস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র, কৌষেয় বস্ত্র, জরির কাজ করা পরিচ্ছদ, সুগন্ধদ্রব্য, লাক্ষা, ঔষধদ্রব্য, বিভিন্নপ্রকার যান, সঙ্গীতযন্ত্র, অস্ত্র, অলঙ্কার—এই সকল জিনিস তৈয়ারী হইয়া থাকে। মধু, মোম, চিনি, গরম মশলা, নীল এসকল জিনিস্ লোকের অজ্ঞাত ছিল না। যেসকল নগর নদীতটের উপর নির্ম্মিত, নৌকার দ্বারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ রক্ষিত হইয়া থাকে; বিন্ধ্যাচল দিয়া, রাজস্থানের মরুভূমি দিয়া সার্থবাহগণ যাতায়াত করে। (৭)

বাজার। সোজা-সোজা রাস্তা। দোকান ঘরগুলি নীচু। এইখানে নিপুণ কারিগরেরা সাদাসিধা যন্ত্রের সাহায্যে, খাবার বাসন, মাটির ঘটাদি ও অলঙ্কার তৈয়ারী করে। রাস্তায় জনতা। পর্য্যটনকারী দোকানদার, বাজিকর, দৈবজ্ঞ, ভল্লুক-প্রদর্শক, সাপুড়ে। পীতবস্ত্র পরিহিত বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা বাজরা কিংবা চাউল ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিতেছে। এদিকে, দেবালয়ের সম্মুখে, নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ভক্তদের নিকট প্রণামী আদায় করিতেছে, কিংবা ভিক্ষা করিতেছে।

চীৎকার শব্দ করিতে করিতে ভিড় ঠেলিয়া, ঐ দেখ একদল বরযাত্রী চলিয়াছে। সামান্য গৃহস্থেরা এই বিবাহের দায়ে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ দেখ, দীর্ঘ পরিচ্ছদধারিণী একদল নর্ত্তকী। উহাদের নূপুর, বাজুবন্দ, ও কটিবন্ধ হইতে লম্বমান ঘুংঘুর ঘন্টিকা রুণুঝুনু বাজিতেছে। কিঞ্চিৎ অর্থ লাভের জন্য, এই দরিদ্র নর্ত্তকীরা রাস্তায় নৃত্য করিয়া থাকে। নামজাদা বারাঙ্গনাদিগের অট্টালিকা আছে, দাসদাসী আছে, গাড়ী আছে, পাল্কী আছে, ঘোড়া আছে, হাতী আছে।(৮)

নদীর ধারে কিংবা পাহাড়ের উপর রাজার রাজধানী। প্রায়ই দেখা যায়, গৃহমণ্ডপগুলি ইটের কিংবা কাঠের। অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে (পাটনা) কতকগুলি প্রস্তরময় কীর্ত্তিমন্দির। লোকে বলে, ঐসকল মন্দির দৈত্য-গঠিত; প্রকোষ্ঠগুলি সূক্ষ্ম খোদাইকার্য্যে বিভূষিত, অথবা নিপুণ কারুকর্ম্মবিশিষ্ট কাঠের কাজে সমাচ্ছন্ন।(৯)

প্রাসাদের সন্নিকটে, একটি উদ্যান। কতকগুলি জলাশয়। তথায় নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম ও রক্তপদ্মের বিশাল পত্রের তলদেশে কুম্ভীরেরা নিদ্রা যাইতেছে। লতিকাবেষ্টিত তরুরাজি। এই লতিকারা "তরুগণের তৃষাকুলা বল্লভা।" কোন কোন বিশেষ দিনে, ঐসকল তরুদিগের পূজা হইয়া থাকে। সেই সময়ে উহাদিগকে পুষ্পমালো বিভূষিত করা হয়। বট, তাল, অশোক। সমস্ত ফলের গাছ;—কদলী, আম, কাটাল। সমস্ত ফুলের গাছ; শ্বেত-পুষ্পকোরকবিশিষ্ট মাধবী, অলিকুলসমাচ্ছন্ন মল্লিকা, কুন্দ। বিহঙ্গকূজন-মুখরিত বৃক্ষের শাখাপল্লব ধরিয়া বানরেরা ঝুলিতেছে। কোকিল, টিয়া, ঘুঘু, পবিত্রবর্জ্জিচঞ্চু ময়ূর, চন্দ্রকিরণপায়ী চকোর। এইসকল উদ্যানে রাজারা স্বকীয় প্রেয়সীর সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে ভ্রমণ করেন। "একজন বলিলেন দেখ। এই কুরুবক আমার প্রিয়তমার রঞ্জিত অঙ্গুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়; গায়ে লাল-লাল ফুটকী, দারটি কৃষ্ণবর্ণ। এইবার অশোকের মুকুল ফুটিবে। আম্রতরু শ্যামল পুষ্পে আচ্ছন্ন, উহাদের পেলব চূড়াগুলি সুরভিত রেণু বহন করিতেছে। সর্ব্বত্রই বসন্ত ঋতুর মহিমা প্রকাশ পাইতেছে; শৈশবের মুকুল, যৌবনের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি।"(১০)

প্রাসাদের বহিরঙ্গণে, বারাঙ্গনা, সৈনিক ও আগন্তুকের জনতা। প্রাসাদের ভিতর, সমস্ত কার্য্য রমণীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে; মৃগয়া-যাত্রাকালে, অস্ত্রধারিণী রক্ষিকা সকল রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলে। প্রাচ্যদেশীয় অপূর্ব্ব বিলাসলীলা;—অলঙ্কার-বিভূষিত হস্তী ও অশ্ববৃন্দ, শিবিকা, গো-যোজিত যান। বিদূষক, বামন, নর্ত্তকী, গায়ক, ঐন্দ্রজালিক। লাব, কুক্কুট ও তিত্তির পক্ষীর লড়াই;

(৭) III, ২৮৬ (জাতক—Fausboll-এর সংস্কার।)

(৮) জাতক, শ্যামতী নাম্নী বারাঙ্গনার নিকট বুদ্ধের গমন বিষয়ক উপাখ্যান এবং মৃচ্ছকটিক নাটক দ্রষ্টব্য।

(৯) সিয়ুকী (VIII)।

(১০) উর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রত্নাবলী

সিংহ, বাঘ ও হাতীর লড়াই। দিনের মধ্যে অনেকবার, বৈতালিকেরা রাজমহিমা কীর্ত্তন করে।(১১)

***

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, ভারতবর্ষ একশত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অশোক উহাদিগকে অন্তঃপ্রদেশরূপে অথবা করদ রাজ্যরূপে আপনার সাম্রাজ্যের সহিত সম্মিলিত করেন। কেবল চারিটি রাজ্য স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল: সিংহল ও মধ্যভারতের রাজ্যগুলি। উত্তরভাগে, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—আসাম, নেপাল, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান এবং হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত আফ্‌গানিস্তান। অশোকের মৃত্যুর পর, তাঁহার অধিকৃত রাজ্যসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহার বংশ, ৫০ বৎসরকাল রাজ সিংহাসন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আধুনিক যুগের তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজ্যের প্রাধান্য বজায় ছিল।

সে সময়ে, রাজার ঐকান্তিক ক্ষমতা ছিল। অবশ্য চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক রীতিমত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন: কিন্তু তাঁহার নির্ব্বীর্য্য উত্তরাধিকারিগণ সমস্ত ক্ষমতা ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

একটি সংস্কৃত নাটক, যাহার সময় নিরূপণ করিতে পারা যায় নাই—সেই নাটকে, এমন কি, চন্দ্রগুপ্তও অক্ষম নৃপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজা নন্দ কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য, চাণক্য ব্রাহ্মণ ঐ দুঃসাহসিক আগন্তুককে রাজসিংহাসন দিলেন কিন্তু রাজার ক্ষমতা দিলেন না। শেষে চন্দ্রগুপ্ত বিদ্রোহী হইলেন। একটা লোকপ্রিয় উৎসব হইবার কথা ছিল:—রাজা সেই উৎসবে আমোদ আহ্লাদ করিবেন বলিয়া আশা করিতেছিলেন। রাত্রিসমাগমে,—দীপালোকিত গৃহসমূহের মধ্য দিয়া উৎসব মত্ত জনতা গমন করিবে—ইহা দেখিবার জন্য রাজা প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিলেন। একটিও দীপ নাই, কোন হাঁক-ডাক নাই। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—"একি! আমি যে আদেশ করিয়াছিলাম, আজ প্রজাগণ উৎসব-আমোদ করিবে। কৈ, তাহারা ত উৎসব-আমোদ করিতেছে না।" "মহারাজ! মন্ত্রী উৎসব রহিত করিয়াছেন।" "কেন তিনি রহিত করিলেন, আমার নিকট আসিয়া তাহার হেতু নির্দ্দেশ করুন।" মন্ত্রী আসিলেন। প্রথমে মন্ত্রীর স্তুতি-বাদাদি করিয়া পরে "মনের ঝাল" প্রকাশ করিলেন:

রাজা। (সকোপে) ঠাকুর! আপনি প্রত্যেক বিষয়েই আমার ইচ্ছায় বাধা দেন—আমি দেখ্‌ছি, এ আমার রাজ্য নয়—এ আমার কারাগার।

চাণক্য। যে রাজারা রাজকার্য্য নিজে দেখেন না, তাদের সম্বন্ধে এই সব দোষ ঘট্‌তেই পারে। যদি তোমার এসব সহ্য না হয়, তাহলে তুমি এখন হতে নিজেই কেন শাসনকার্য্যের ভার গ্রহণ কর না।

রাজা। আচ্ছা, আমি এখন হতে রাজকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করব।

চাণক্য। সে ভাল কথা। আমিও তাহলে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হতে পারি। পরে কুপিত হইয়া:

দেখ, বৃষল! তুমি পরগুণদ্বেষী।

কোপে বিকম্পিত-শিখা
হস্তের অঙ্গুলী-অগ্রে করিয়া মোচন,
সর্ব্বজন সমক্ষেতে কে করিল
রিপু-নাশ-প্রতিজ্ঞা ভীষণ?
সেই সে প্রতিজ্ঞা পালি'
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নন্দরাজকুলে
রাক্ষসেরি সম্মুখে—
কে বলতো পশুসম বধিল সমূলে?

অপিচ:—

সুদীর্ঘ নিষ্কম্প পক্ষ
গৃধ্রগণ চক্রাকারে উড়িছে আকাশে,
ঢাকিয়া ভানুর প্রভা
চিতাধূম মেঘাচ্ছন্ন করে দিক দশে,
শ্মশানের জীবগণে
বিতরি আনন্দ, নন্দ-দেহ-চিতানল
অদ্যাপি নেবেনি দেখ
বহু বসা হব্য লভি' এখনও উজ্জ্বল॥

রাজা। এও অন্যে করেছে।

চাণক্য। অন্য কে শুনি?

রাজা। নন্দকুল-বিদ্বেষী দৈবের দ্বারাই এ কাজ হয়েছে।

(১১) মুদ্রারাক্ষস ও অন্যান্য নাটক দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মোৎসাহী বৌদ্ধ রাজাদিগের প্রাসাদাঙ্গনে পশু পক্ষীর লড়াই নিষিদ্ধ ছিল।

চাণক্য। মূর্খের নিকটেই দৈবের প্রমাণ গ্রাহ্য।

রাজা। যারা জ্ঞানবান তারা নিরহংকারী।

চাণক্য। (ক্রোধ অভিনয় করিয়া) বৃষল! বৃষল! আমাকে তুমি সামান্য ভৃত্যের ন্যায় দমন করতে চাও? এই দেখ, রুদ্ধশিখা মোচন করতে আবার আমার হস্ত ধাবমান। (ভূমিতে পদাঘাত)।

আরোহিতে প্রতিজ্ঞায়
এ চরণ আবার ধাবিত।
নন্দ বিনাশের পর
যে রোষাগ্নি ছিল প্রশমিত
(আসন্ন মরণ না কি)
পুন তা' করিছ প্রজ্বলিত? (১২)

রাজ্যশাসনতন্ত্র সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন। অশোকের শাসনাধীনে, কতকগুলি সচিব ছিল, ৪ জন রাজপ্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা ছিল, উচ্চনিম্ন পদানুসারে বিবিধ কর্ম্মচারী ছিল: কাহারও উপর শাসনকার্য্যের ভার, কাহারও উপর পূর্ত্তকর্ম্মের ভার, কাহারও উপর নীতিধর্ম্মের ভার। এমন কি, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান করিবার জন্যও কর্ম্মচারী ছিল; সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ। সৈন্যসংখ্যা ৬ লক্ষ: পদাতিক, অশ্ব, রথ, গজ।

শাস্ত্রতঃ রাজাই ভূস্বামী; তাই রাজস্ব ও রাজকর একত্র মিশিয়া গিয়াছিল। শস্যের চতুর্থাংশ রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইত।

অশোক, খাল খনন করাইয়াছিলেন, দুই ধারে গাছ বসাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কূপ খনন করাইয়াছিলেন, মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজা নিজেই বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; অনেক সময় তাঁহার সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের হস্তে বিচারের ভার ন্যস্ত হইত। আইনের মূলতত্ত্বগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল গ্রন্থ হইতে রাজবিধি সংকলন করিতেন, আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে কতকগুলি সূত্রমাত্র সংকলন করিতেন। ভারতে কখনই এমন একটি রাজবিধির সংহিতা ছিল না, যাহার অনুসারে বিচার করিতে বিচারকর্ত্তা একান্তই বাধ্য। বিচারালয়ে বিশেষরূপে ফৌজদারী মোকদ্দমারই বিচার হইত। দেওয়ানী মোকদ্দমা আদালতের রীতি অনুসারে হইত না, প্রত্যেক বর্ণের স্বকীয় প্রথা-অনুসারে নিষ্পন্ন হইত।(১৩)

সত্য নির্ণয়ের জন্য বিচারকর্ত্তা সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেন, পীড়ন করিতেন, অথবা অপরাধীদিগের সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমের পরীক্ষা করিতেন। সামান্য অপরাধেও নিষ্ঠুর প্রাণদণ্ড বিধান করিতেন। অশোকের শাসনলিপিতে দয়াধর্ম্ম বিঘোষিত হইলেও, আইনের কঠোরতার কিছু মাত্র লাঘব হয় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অকৃতজ্ঞের প্রতিদান

(সেখ সাদীর, মূল পারসী হইতে)

অসীম অনন্ত নীল নির্ম্মল আকাশ
স্নেহ-নীরে সিক্ত করে তপ্ত ধরাতল,
ধরণী লভিয়া শান্তি প্রতিদান তারে
দেয় তুচ্ছ ধূলিরাশি নিয়ত কেবল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

---

(১২) (মুদ্রা-রাক্ষস তৃতীয় অঙ্ক—শেষভাগ)। রাজপ্রতিনিধিগণের রাজধানী তক্ষশীলা (Huen Tsang দ্রষ্টব্য), উজ্জয়িনী (আরও কিছু পরে দেখা যাইবে), সুবর্ণগিরি, তোসলী কলিঙ্গের অন্তঃপ্রদেশ, (বোধ হয় এখন সেই স্থানে বর্ত্তমান জোগড় (Jaugada) নগর অবস্থিত)। রাজপ্রতিনিধির নীচে "রাজ্জুক" "rajjukas," অথবা কোটি সংখ্যক অধিবাসীর শাসনকর্ত্তা; "প্রাদেশিক"—প্রদেশের শাসনকর্ত্তা (কেহ কেহ বলেন, "প্রাদেশিক"—বংশানুক্রমিক ক্ষুদ্রনৃপতি এবং "রাজ্জুক," ধর্ম্মসংক্রান্ত কর্ম্মচারী, বৌদ্ধধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করাই তাহাদের কাজ)। অশোকের শিলালিপিতে এই সকল পদের উল্লেখ দেখা যায় যথা;—Magistrate ("মহামাত্র"), "ধর্ম্মমহামাত্র;" বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধারণ করাই ধর্ম্মমহামাত্রের কাজ। অশোকের শিলালিপিসমূহ দ্রষ্টব্য (বিশেষত M. Senartএর গ্রন্থে); McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian এবং The Invasion of India by Alexander the Great as described by Arrian, Q. Curtius, Diodorus, Plutarch ও Justin.

(১৩) গৌতম (XI. ২১) বলেন, কৃষক, বণিক, পশুপালক, কুসীদগ্রাহী, শিল্পী—ইহাদের সকলেরই নিজ নিজ প্রথা আছে; রাজার নিকটেও উহা প্রামাণিক (R. Fick কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, পৃ, ১৭২)।

শ্রীকৃষ্ণ।

কাংড়া রাজপুত চিত্রশিল্পপদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

আর্য্য ভারতে গোগ্রাস ভূমি

আর্য্য ভারতে লোকের মাটীর ক্ষুধা আজকালের মত প্রবল ছিল না। সেকালের লোকেরা গোগ্রাসের জন্য ভূমি রক্ষা করিতে কৃপণতা প্রদর্শন করিতেন না। মুলুক জুড়িয়া জনশূন্য পাহাড় বন জঙ্গলের মালিক হইবার আজকালের ন্যায় তাহাদের তীব্র পিপাসা ছিল না। জঙ্গল ভূমিতে গোচারণ মানসে প্রবেশ অধিকার লাভ করিবার জন্য রাজা অথবা অপর কোন লোক বিশেষকে জমা নজর দিতে হইত না। পাহাড় অথবা বন জঙ্গলের তাহারা কাহাকেও মালিক বলিয়াই স্বীকার করিত না। সে-সকল সাধারণের সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত ছিল। লোক বিশেষের এমন কি স্বয়ং রাজারও কোনরূপ স্বত্ব স্বামিত্ব ছিল না।

"অটব্যঃ পর্ব্বতাঃ পুণ্যাস্তীর্থা ন্যায়তনানি চ
সর্ব্বাণ্যস্বামিকান্যাহুর্নহি তেষু পরিগ্রহঃ॥"
উশানঃ সংহিতা ৫ম অঃ ১৬।

প্রাচীন সংহিতাকার বলিতেছেন বন, পর্ব্বত, পুণ্যতীর্থ এবং সাধারণের পূজার স্থান এ সকলকে অস্বামিক বলা হয়। কারণ তাহাতে ব্যক্তি বিশেষের দান বা পরিগ্রহের অধিকার নাই। অবিকল এই কথা মহাভারতেও পাওয়া যায়। শান্তি পর্ব্বের অনুশাসন ভাগে ভীষ্মদেব বলিতেছেন—

"অটবী পর্ব্বতাশ্চৈব নদ্যস্তীর্থানি যানি।
সর্ব্বাণ্যস্বামিকা নাহুর্নহি তব পরিগ্রহঃ॥"
৩৫ অঃ ১০১ অনুশাসন দান ধর্ম্ম।

আবহমান কাল ভারতবাসিগণ ঐ সকল পতিত বনজঙ্গলে স্ব স্ব গো মেষ মহিষাদি চরাইতেছিল। গোগ্রাসের জন্য কখনও কোন ভাবনা ছিল না। অতি পুরাতন বৈদিক সময়েও দেখা যায় বনজঙ্গল এবং পর্ব্বত মধ্যে রক্ষক সঙ্গে রাশি রাশি গবাদি পশুবৃন্দ অবাধে বিচরণ করিত। সামবেদীয় ছান্দগ্য উপনিষদ পাঠে আমরা দেখিতেছি ঋষিবর হাবিদ্রুমত গৌতম স্বশিষ্য সত্যকাম জাবালাকে দীক্ষা প্রদান করিয়াই কৃশ এবং দুর্ব্বল দেখিয়া চারিশত গোরু পৃথক করতঃ তাহার হস্তে তাহাদের ভার ন্যস্ত করিয়া বলিলেন—"হে সৌম্য ইহাদের পশ্চাত পশ্চাত অনুগমন কর।" গুরুর আদেশে সত্যকাম গোরুগুলি লইয়া যাইতে যাইতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন এগুলি এক সহস্র না হওয়া পর্য্যন্ত আমি গৃহে ফিরিব না। তিনি বহু বর্ষকাল প্রবাস করিলেন। অবশেষে গোরুর সংখ্যাও এক সহস্র হইল।

"তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যো বাচে মাঃ সোম্যানুব্রজেতি তা অভিপ্রস্থাপয়ন্ বাচ না সহস্রেণাবর্ত্তেয়েতি। সহ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেতুঃ।"
:—৫ চতুর্থ প্রপাঠক॥

মহাভারত পাঠে আমরা জানিতেছি যে সুরগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা মানসে অসুর গুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুসেবার উদ্দেশে বনে বনে গুরুর গোধন চরাইতেন। হিংসাপরায়ণ অসুরগণ ঐ বিদ্যায় অসুরদিগের একাধিকার রক্ষার্থ নির্জ্জন বনে তাহাকে একাকী পাইয়া বধ করিয়াছিল।

"গা" রক্ষন্তং বনেদৃষ্ট্বা রহস্যেকমমর্ষিতাঃ।
জঘ্নু বৃহস্পতেদ্বেষাৎবিদ্যারক্ষার্থমেবচ॥
:৯ অঃ ৩০ সম্ভব আদিপর্ব্ব।

বশিষ্ঠের নন্দিনী নামক বিখ্যাত হোমধেনু তাঁহারই আশ্রমের চতুর্দ্দিকে অরণ্যে মনের সুখে নির্ভয়ে বিচরণ করিত।

কালক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাদির নিকটবর্ত্তী বন জঙ্গল ক্রমে আবাদ হইতে লাগিল। সুবিধা-মতন নিকটবর্ত্তী বনজঙ্গলে গোচারণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া গোগ্রাস ভূমির গুরুত্ব তাহারা ভুলিলেন না। লোকসংখ্যা এবং আবাদ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই গোগ্রাসের জন্য পতিত জমি রক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইল। সংহিতাকার বলিতেছেন :—

"গ্রামেচ্ছয়া গোপ্রচারা ভূমি রাজবশেনবা॥"
১৬৯ অঃ ২ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা॥

নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল যে গ্রামবাসী লোকদিগের ইচ্ছা মতই হউক বা রাজাদেশেই হউক গোচারণের জন্য পৃথক ভূমি রক্ষিত হইবে। সংহিতাকারগণ শুধু এইরূপ সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। কি পরিমাণ ভূমি গো প্রচারের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে তাহারও নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন।

ধনুঃশতং পরীনাহো গ্রাম-ক্ষেত্রান্তরে ভবেৎ।
দ্বে শতে কর্ব্বটস্য স্যান্নগরস্য চতুঃশতম্॥
১৭০ অঃ ২ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা॥

একধনুতে চারি হাত। প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে গ্রাম এবং কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে ঐরূপ এক শত ধনু অর্থাৎ চারি শত হাত প্রশস্ত ভূমি, জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামে দুই শত ধনু বা আট শত হাত প্রশস্ত এবং নগরের চতুর্দ্দিকে ১২০০ হাত প্রশস্ত ভূমি গোগ্রাসের জন্য রক্ষিত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত এই বিধির অনুরূপ বিধি কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত আকারে আমরা মনুসংহিতাতেও বিধিবদ্ধ দেখিতে পাই।

ধনুঃশতং পরিহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতাস্ত্রয়োবাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু॥ ২৩৭॥
তত্রাপরিবৃতং ধান্যং বিহিংস্যুঃ পশবো যদি।
ন তত্র প্রণয়েদ্দণ্ডং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম॥ ২৩৮॥
বৃতিং তত্র প্রকুর্ব্বীত যামুষ্ট্রো ন বিলোকয়েৎ।
ছিদ্রঞ্চ বারয়েৎ সর্ব্বং শ্বশূকর মুখানুগম॥ ২৩৯॥

মনুসংহিতা অষ্টম অধ্যায়।

একটি সামান্য যষ্টি সজোরে নিক্ষেপ করিলে যতদূর যাইয়া তাহা পড়িবে সেই পরিমাণ স্থানের নাম এক শম্যাপাত। প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে শত ধনু কিম্বা তিন যষ্টি নিক্ষেপ বা শম্যাপাত পরিমাণ প্রশস্ত স্থান এবং প্রত্যেক নগরের চতুর্দ্দিকে তাহার ত্রিগুণ পরিমাণ স্থান গোগ্রাসের জন্য পতিত থাকিবে। সেই গোগ্রাস জমির সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র যদি উপযুক্ত বেড়া দ্বারা রক্ষিত না থাকে এবং গবাদি পশু সেই সকল ক্ষেত্রের ধান্যাদি শস্য নষ্ট করে তবে রাজা সেই সকল পশুর রক্ষককে কোন দণ্ড দিবেন না। ঐ রূপ স্থানে বেড়া দিতেই হইবে, এবং সেই বেড়া এই পরিমাণ উচ্চ হইবে যে উষ্ট্রও তাহার উপর দিয়া গলা বাড়াইয়া দৃষ্টি করিতে না পারে, এবং সেই বেড়ার ছিদ্র এত ছোট হইবে যে কুকুর কি শূকরও তাহার ভিতর দিয়া মুখ প্রবেশ করাইতে না পারে।

আমরা সকলেই কৃষি এবং গোপালন-লব্ধ অন্নে পরিপুষ্ট; কিন্তু গোচারণের জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। তাহার পরিবর্ত্তে আছে এক খোঁয়াড়। যাহারা পথ বা বাগান করে তাহারা উপযুক্ত বেড়া দিয়া শস্য রক্ষা করিতে অনেকেই অপারগ। গোরুরও চরিবার কোন উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। তৈল, দাউল, খড় আদি কিনিয়া গোপালন করিতে পারে, গোপালকেরও সেরূপ ক্ষমতা নাই। হয় গোরুগুলি অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে গৃহে বা গৃহপ্রাঙ্গণে বদ্ধ থাকিবে, না হয় মাঠে যাইয়া কৃষকের ক্ষতি করিয়া খোঁয়াড়ে প্রেরিত হইবে। ইহাতে লাভ কেবল খোঁয়াড় রক্ষকের। আমাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফল—কৃষক এবং গোপালক উভয়েরই সর্ব্বনাশ কিন্তু তাহাতে একমাত্র খোঁয়াড় রক্ষকেরই "ভাদ্র মাস"।

যদিও প্রাচীনগণ গোপালনের জন্য গোগ্রাস জমির বিশেষ ব্যবস্থা নিয়তই করিতেন তথাপি একথা বলিতে পারা যায় না যে তাঁহারা গোরুর অপরাপর খাদ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সুশ্রুত বলিতেছেন:—

"ইক্ষুভক্ষক মাসপর্ণভক্ষকোদ্ধশৃঙ্গগোদুগ্ধং পক্বমপক্বম্বা হিতকারকং।"

ইক্ষুভক্ষক এবং মাষকলাইভক্ষক গোরুর দুগ্ধ পক্কই হউক আর অপক্কই হউক উপকারী। ভাবপ্রকাশ নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে:—

"পলাল তৃণকার্পাসবীজজং রোগিণো হিতং।"

ভাবপ্রকাশ পর্ব্বখণ্ড ২য় ভাগ।

খড়, ঘাস এবং কার্পাসবীজ ভক্ষণ করিলে গোরুর যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা রোগীর উপকারী। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রাচীনগণ ইক্ষু, মাষকলাই এবং কার্পাসবীজ গোরুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষক ক্লোবার (clover) ঘাষ, মটর প্রভৃতির (Papillionacene) এবং কার্পাসবীজের প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ সকলের বিশেষ উপকারিতা প্রাচীন ভারতবাসিগণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বোধ হয় গোরুর খাদ্যের জন্য তাঁহারা ইক্ষু এবং মাষকলাইর চাষও করিতেন। বিলাতী ক্লোবারের (clover) পরিবর্ত্তে তাঁহারা মাষকলাই এবং খেসারি প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। সে যাহা হউক গোগ্রাসের জমি যে আবহমান কাল ভারতবাসিগণের গোপালনের প্রধান ভিত্তি হইয়া আসিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পুরাকালে কৃষক এবং গোরক্ষকদিগের গৃহ ধনধান্যে নিয়ত পূর্ণ থাকিত।* তাহাদের পক্ষেও বরং সাধারণ গোগ্রাস ভূমি ভিন্নই গোপালন চলিতে পারিত; আধুনিক প্রাচ্য কৃষি ও গোপালনজীবী যাহাদের একটী কৃষিক্ষেত্র এক

* ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ।
শেরতে বিবৃত দ্বারা কৃষি-গোরক্ষজীবিনঃ॥
রামায়ণ।

চাষে ২৫।৩০ দ্রোণ জমিতে ফসল হয় তাহাদের পক্ষেও সাধারণ গোগ্রাস ভূমি ভিন্নই গোপালন-ব্যবসায় চালনা সম্ভবপর। কিন্তু আমাদের দেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি ও গোপালন-ব্যবসায়ী দেশের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান তাহাদের পক্ষে প্রতি গ্রামে সাধারণ গোগ্রাস জমি ভিন্ন কৃষি কিম্বা গোপালন-ব্যবসায় চালনা অসম্ভব। নগদ পয়সা দিয়া ঘাস, খড়, খৈল, দাইল, ক্ষুদ ইত্যাদি গবাভক্ষ্যদ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে ক্রয় করিয়া গোপালন ব্যবসায় সততার সহিত চালনা করিয়া লাভবান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। যাহাদের কৃষি বা গোপালন সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই তাহারা অন্ধকারে বসিয়া অনেক সময় কৃষক এবং গোপালন-ব্যবসায়ীর প্রচুর পরিমাণ লাভ হয় এরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু একটা গোবৎসকে উপযুক্তরূপে কার্য্যোপযোগী করিতে বহু সময়, যত্ন এবং অর্থের প্রয়োজন। ৩।৪ বৎসরের সেবা যত্নের কমে একটা গো-বৎস কখনও কার্য্যোপযোগী হইতে পারে না। একটা গো-বৎসকে তিন বৎসর পালন করিয়া চতুর্থ বৎসরে দোহনোপযোগী গাভী করিতে যে খাদ্যের প্রয়োজন তাহার মূল্য মাসিক কত লাগিতে পারে? গরীবের খরচ কম লাগিবে, ধনীর খরচ বেশি লাগিবে একথা বলা চলে না। প্রচলিত বাজার দরে উভয়েরই সময় ও পরিশ্রমের একই দর ধরিতে হইবে। যে কোন ব্যবসায়ের খরচের হিসাবের বেলায় ধনী নির্দ্ধনের কথা উল্লেখেরও অযোগ্য। আমার নিজের হাতে ভারাৰ্পিত হইলে মাসিক আমার কত খরচ করিতে হইত? বিস্তারিত হিসাবে প্রবেশ না করিয়া আমরা গড়ে মাসিক ২৲ টাকা হারেই এই তিন চারি বৎসরের খরচ ধরিতেছি। মোট খরচ ৭৫৲ কি ১০০৲ টাকার কম হইবে না। অপর দিকে বাঙ্গালার একটা সাধারণ গাভী দৈনিক দুই এক সেরের বেশি দুধ দেয় না, এবং বাজারে তাহার মূল্যও ২৫৲ ৩০৲ টাকার বেশি হইবে না। কোন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী এজন্য মারাত্মক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবে? আমরা সকলেই অতি বুদ্ধিমান। “যায় শত্রু পরে পরে” করিয়া দেশের ধনী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলেই গোপালন হইতে পশ্চাৎপদ হইয়াছি। আমরা সকলেই বুদ্ধিমান, দেশে গোপালন থাকুক আর না থাকুক, আমাদের কি আসে যায়, নগদ পয়সা দিয়া দুধ কিনিয়া খাইব বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। আবহমানকাল দেশে গোগ্রাসের জন্য যে সকল ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা আত্মসাৎ করাতে আমাদের ক্ষতি কি? বরং বিশেষ লাভেরই ব্যাপার। “দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।” তাই আমরা ধনী মানীরা যে যেখানে সুবিধা পাইয়াছি প্রাচীন গোচারণ এবং গোবাট ভূমি বিনা বাক্যব্যয়ে আত্মসাৎ করিয়াছি। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে গোপালনের ভার নিতান্ত মূক, দুর্ব্বল, দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা ধনী ও মানী, আমাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কে সাহস করিবে? আমরা আপনাদিগের নির্দ্দোষিতা সাধারণে প্রদর্শন করিবার জন্য মাঝে মাঝে গোরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা করিলেই ত সকল পাপ ধুইয়া যাইবে। না হয় মাঝে মাঝে দুই এক টাকা চাঁদা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উক্ত সভায় দেওয়া যাইবে। “যত দোষ নন্দ ঘোষ”, গরীব গোয়ালার ঘাড়ে আমরা সমস্ত দোষ ফেলিতেছি: নিষ্ঠুর গোয়ালা কেন অনাহারে অযত্নে বাছুর মারিয়া ফেলে, কেন সে গোরুর উপযুক্ত যত্ন এবং রোগ হইলে চিকিৎসা শুশ্রূষাদি করে না, কেন সেই নিষ্ঠুর গোয়ালা ৩০ টাকা দামের একটা গাভী লাভ করিবার জন্য একটা বাছুরের উপর ১০০৲ টাকা খরচ করে না? অপরাধ গুরুতরই বটে। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিল

> “রাজন সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি
> আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি।”

“মহারাজ, তুমি সরিষাপ্রমাণও পরের ক্ষুদ্র দোষটি দেখিতেছ, কিন্তু বিল্বপরিমাণ তোমার নিজের বড় বড় দোষ দেখিয়াও দেখ না।”

প্রাচীন গোগ্রাস আত্মসাৎকারী ধনী মানী আমরাই যে প্রকৃত পক্ষে গোরুর অনাহারের ও অযত্নে মৃত্যুর কারণ, আমরা দেখিয়াও তাহা দেখিতেছি না। গরীব গোয়ালা কি করে, নিজে গায়ে খাটিয়া অথবা চুরী চামারী করিয়া, রাত্রিকালে পরের ক্ষেত বা বাগান খাওয়াইয়া, ফুকা গোদোহন করিয়া, দুধে জল কিম্বা জলে দুধ দিয়া কোন প্রকারে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে। এমন

অবস্থায় প্রকৃত গোপালন যাহাকে বলে তাহা এ দেশে সম্ভবপর নহে। অতীতের দৃঢ় ভিত্তিতে যদি আমরা এই গব্য ব্যবসায়কে পুনরায় স্থাপিত করিতে না পারি, তবে এ ব্যবসায় এ দেশে চলা একরূপ অসম্ভব। ভারতের প্রাচীন গোগ্রাস জমির পুনরুদ্ধার আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। স্বদেশহিতৈষিগণ গোগ্রাস জমির পুনরুদ্ধারে সত্বর যত্নবান হউন। নতুবা স্বাস্থ্যকর দুগ্ধ যাহা এখন দুষ্প্রাপ্য তাহা একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

রবীন্দ্রনাথ

আমি বিগত প্রবন্ধে প্রশ্ন মাত্র তুলিয়াছিলাম যে "সোনার-তরী" ও "চিত্রা"র কবি-জীবন হইতে বিদায় লইবার ভিতরকার কি কারণ কবির মধ্যে ঘটিয়াছিল?

আমরা দেখিয়াছি যে কবি-জীবনের সম্পূর্ণতার পক্ষে যে সকল আয়োজন উপকরণ আবশ্যক তাহার কিছুরই তাহার অভাব ছিল না। জমিদারী ব্যবস্থার একটা বড় কাজ হাতে ছিল; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে নদীবক্ষের উপর নৌকাবাস এবং সেই সঙ্গে "সাধনা"র জন্য বিচিত্র ভাবের পড়াশুনা ও রচনা কার্য্য চলিতেছিল,—কাজ, ভাবের চর্চ্চা ও প্রকৃতির সঙ্গ—কিছুই বাদ পড়ে নাই। তবে শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবে জীবনের ধারাটাকে প্রবাহিত করিয়া দিলে ক্ষতি কি ছিল?

নানা কারণে ১৩০২ সালে "সাধনা" কাগজখানি উঠিয়া গেল। তখন "চৈতালী"র আরম্ভ হইয়াছে—১৩০৩ এর চৈত্রের মধ্যেই "চৈতালী"র অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়াছে।

এই সময়ের কতগুলি চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারি এই জীবনের মধ্যে কবি অসম্পূর্ণতা কোথায় বোধ করিতেছিলেন। কেবলমাত্র কবির বা শিল্পীর জীবনের মধ্যে, আপনার দিকে, আপনার ভোগের দিকে সমস্ত টানিয়া রাখিবার ভাব আছে। সেই জন্য অধিকাংশ কবির জীবনে ক্যারাটাই প্রধানতঃ দেখিবার বিষয়, জীবনটা নয়। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে জীবনের বিচিত্রতার মধ্যে কবিদের যেমন প্রবেশ এমন কোন মহাপুরুষেরও নয়—কল্পনার তীব্র আলোকের দ্বারা ইঁহারা মানব-প্রকৃতির যত জটিলতা যত রহস্যের ভিতরে গিয়া পৌঁছেন এমন আর কেহই যাইতে পারেন না—তথাপি ইঁহাদের জীবনটা সকল হইতে নির্লিপ্ত আপনার ভাবলোকের মধ্যেই অবস্থান করে। তাহার কারণ জীবনকে কবিরা সৃষ্টির দিক্ হইতে দেখেন, তাই পুরাপুরি বাস্তবের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ভালোয় মন্দে উত্থানে পতনে জীবনকে বড় করিয়া শক্ত করিয়া সত্য করিয়া গড়িবার সাধনা তাঁহাদের অবলম্বন করা কঠিন হয়। ততটুকু বাস্তব ইঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন, যতটুকু নহিলে ভাব আপনার জোর পায় না, আপনার প্রতিষ্ঠা পায় না। ব্রাউনিঙের মিডিভ্যাল গায়কের ন্যায় শিল্পীদের জীবনে কল্পনায় অকস্মাৎ সমস্ত বাস্তব আপনার সীমারূপ পরিহার করিয়া অখণ্ড-অনন্ত-স্বর্গলোকে উঠিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কল্পনার পরিপূর্ণ মুহূর্ত্তের অবসানে অবসাদের অতলতায় তলাইয়া যায়—জীবনের চারিদিকে তখন আনন্দের কোন বার্ত্তাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সেই জন্য আমার মনে হয় যে শিল্প-প্রাণ জীবন কখনই আধ্যাত্মিক জীবনের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না—শিল্প মানুষের চরম আশ্রয় নহে। আত্মার যাত্রাপথে সমস্ত খণ্ড আশ্রয় একে একে খসিয়া পড়িতে বাধ্য।

অথচ ইহাও দেখা যায় যে মানুষ যখনই কোন খণ্ড সত্যকে নিত্য সত্যের আসন দেয়, তখন তাহার পক্ষ হইয়া অনেক বাজে ওকালতি করিয়া থাকে। ইউরোপেও একদল শিল্পী আর্টের বাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না—ধর্ম্মকে "ডগ্‌মা" অর্থাৎ মত মাত্র মনে করিয়া ইঁহারা বলিতে চান যে আর্টই জীবন্ত ধর্ম্মের প্রকাশ—কারণ সমস্ত জিনিসকে তাহার নিত্য সত্যে ও নিত্য সৌন্দর্য্যে দেখাই আর্টের প্রধানতম কাজ।

রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে এই আর্টের জীবনের খুব ভিতরে ছিলেন বলিয়া এ সকল কথা ঠিক এই দিক্ দিয়াই ভাবিতেন। তাহার প্রমাণ একটি পত্রে পাই:—

"সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে, * * সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই * * আমি যথার্থ এবং সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম ব'লে জ্ঞান এবং অনুভব করি। * * * আমার যে ধর্ম্ম এটা নিত্য ধর্ম্ম, এর উপাসনা নিত্য উপাসনা, কাল

রাস্তার ধারে একটা ছাগমাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপর ব'সেছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপর ঘেঁসে পরম নির্ভয়ে গভীর আরামে প'ড়েছিল—সেটা দেখে আমার মনে যে একটা সুগভীর রস-পরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হ'ল আমি সেইটেকেই আমার ধর্ম্মালোচনা বলি—এই সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বামাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি—এ ছাড়া অন্যান্য যা কিছু dogma আছে যা আমি কিছুই জানিনে এবং বুঝিনে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখিনে তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হইনে।"

অথচ শিল্প, দর্শন, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই যে অধুনা ক্রমশঃ মিলিবার পথে চলিয়াছে এবং এ সকল ভিন্ন ভিন্ন সাধনার সমন্বয় করাই যে পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ হইয়া উঠিতেছে, ইউরোপীয় কোন কোন ভাবুকের লেখায় আজ কাল এমনতর আভাস পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, খুব সম্প্রতি নানা কারণে ইউরোপীয় মন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে বৈচিত্র্যকে সাজাইলেই তাহাকে মেলানো হয় না—তাহাতে বৈচিত্র্যের ভেদচিহ্নগুলি সমানই থাকিয়া যায়। একমাত্র আধ্যাত্মিকতার অখণ্ড বোধের মধ্যেই সমস্ত ভেদের বিলোপ এবং সমস্ত বৈচিত্র্যের মিলন ঘটিতে পারে।

কবিরের বচন আছে ;

"জো তন পায়া   খণ্ড দেখায়া
তৃষ্ণা নহী বুঝানী।
অমৃত ছোড়   খণ্ড রস চাখা
তৃষ্ণা তাপ তপানী।"

অর্থাৎ "যে তনুলাভ করিয়াছে সে খণ্ড দেখিয়াই চলিয়াছে, তাহার তৃষ্ণা আর মিটে না। অমৃত ছাড়িয়া সে খণ্ডরসই পান করিতেছে, তৃষ্ণা তাহাকে সন্তপ্ত করিয়াই চলিয়াছে।"

খণ্ডতাকে জোড়া দিয়া বড় আকার দান করিবার দিকে আপনার চেষ্টাকে প্রয়োগ করিবার জন্য ইউরোপে শিল্পসাধনাও অন্যান্য সাধনার ন্যায় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। সে "অমৃত ছোড় খণ্ডরস চাখা"। হয়ত তাহার ভিতরকার কারণ, ইউরোপ যে ধর্ম্ম পাইয়াছে তাহার অসম্পূর্ণতা—যে জন্য উত্তরোত্তর বিকাশমান জ্ঞানের সাধনা ও সৌন্দর্য্যের সাধনার সঙ্গে সে ধর্ম্ম আপনার যোগকে স্থাপিত করিতে অক্ষম হইয়া বরাবর বাহিরেই পড়িয়া গেছে। বাস্তবিকই খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্বের অভাব থাকিবার জন্য সে কিছুই মিলাইতে পারিতেছে না,—ভেদবুদ্ধির দ্বন্দ্বযুদ্ধে তত্ত্বের রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে—সেই জন্যই আধুনিক কালে কি আর্টে, কি দর্শনে খৃষ্টধর্ম্মকে নূতন করিয়া গড়িয়া সকল বিরোধের মিলন সেতুস্বরূপ দাঁড় করাইবার জন্য পুনরায় ইউরোপের মধ্যে বিপুল প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে।

আমার এত কথা বলিবার অভিপ্রায় আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, আর্টের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি যদি আধ্যাত্মিক জীবনে না হয় তবে মাঝখানের অভিব্যক্তিটাই আমরা দেখিতে পাই খুব জাঁকালো রকম—তখন এমন একটা নদীর দীর্ঘ বিচিত্র ধারা আমরা দেখি যাহার কোন শান্তি-সমুদ্রের মধ্যে অবসান ঘটে নাই—হঠাৎ এক জায়গায় যাহার ধারা বালুমরুর মধ্যে শোষিত হইয়া গেছে।

সুতরাং আর্টের ভিতর হইতে মানবজীবনের পরিপূর্ণতার আদর্শ দেখিতে পাইলেও এ ভুল যেন না করি যে ইহাই পর্য্যাপ্ত,—ধর্ম্মের আর কোন প্রয়োজন নাই সে "ডগমা" অথবা শুষ্ক মত মাত্র। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে অনুভূতি এবং প্রকাশ এক জিনিস এবং জীবন অন্য জিনিস। আর্টের প্রকাশও এক জায়গায় থামিয়া নাই জীবনের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে সেও বিচিত্র হইয়াই চলে। আর্টের স্বাভাবিক পরিণাম আধ্যাত্মিকতায় ছাড়া হইতেই পারে না, নদীর যেমন স্বাভাবিক অবসান সমুদ্রে।

আমার বিশ্বাস "সোনার তরী" ও "চিত্রা"র জীবন হইতে বিদায় লইবার প্রধান কারণ কেবলমাত্র শিল্পময় জীবনের অসম্পূর্ণতা কবিকে ভিতরে ভিতরে বেদনা দিতেছিল।

ইহার সঙ্গে আর একটি কারণও আমার মনে হয়, বড় কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব। অবশ্য পরিপূর্ণ জীবনের অভাববোধেরই তাহা অন্তর্গত। জমিদারী ব্যবস্থার কর্ম্ম খুব বড় করিয়া করিলেও তাহাতে সম্পূর্ণ আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। সে কর্ম্মের মধ্যে স্বার্থের একটা সঙ্কীর্ণ দিক আছে, সুতরাং অনেক বিষয়ে আপনাকে কষ্ট দিয়া এবং আপনার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিতে বাধ্য হইতে হয়। যে কর্ম্ম সমস্ত মানুষের যোগে সম্পন্ন হয়, যাহা কোন সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ নহে, যাহার ফল দূর ভবিষ্যতের মধ্যে নিহিত, যাহার নিকটে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া

মানব মঙ্গলের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তেমন একটি বিস্তীর্ণ কর্ম্মের ক্ষেত্র কবির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশে নাকি তেমন কোন বৃহৎ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠান নাই, সেই জন্য আমরা পরে দেখিতে পাইব যে তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় সেই রকম একটি কর্ম্মক্ষেত্র, একটি তপস্যার ক্ষেত্র রচনা করিতে হইয়াছে।

"সাধনা" কাগজখানিতে রবীন্দ্রনাথের যে অত উৎসাহ ছিল তাহারও প্রধান কারণ, সকল দিক হইতে দেশকে ভাবাইবার ও মাতাইবার একটা আকাঙ্খা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন—সকল বিষয়েই একজন লোকের একাধারে লেখনী চালনা করার মত বিস্ময়কর ব্যাপার কোন দেশের কোন সাহিত্যিকের জীবনের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ।

দেশে কোন বড় অনুষ্ঠান কি প্রতিষ্ঠান ছিল না এ কথা বলা অন্যায় হইবে। কনগ্রেস কনফারেন্স প্রভৃতি ছিল। কিন্তু ইহাদের প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা বা অনুরাগ ছিল না, সেই জন্য ইহাদের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইতে তিনি কখনই আগ্রহ বোধ করেন নাই। প্রথমতঃ দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, পশ্চিমের ইতিহাসের অন্ধ অনুকরণের উপরেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ দেশের কর্ম্মের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ ছিল না, কেবল "আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নতশির।" সুতরাং এমন শূন্য ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কর্ম্মের অভাবের দীনতাকে দূর করা চলে না বলিয়াই কনগ্রেস কনফারেন্স প্রভৃতির উপরে "সাধনা" সম্পাদন কালে কবির সুতীব্র একটি অবজ্ঞা ছিল।

আমার তো কবির পূর্ব্ব জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই দুইটিই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়—আর্টের জীবনে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি মিলিতেছিল না, এবং একটি বড় ত্যাগের ক্ষেত্রে আপনাকে উৎসর্গের দ্বারা জীবনকে বড় করিয়া পাইবার তৃষ্ণা জাগিতেছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে "চিত্রার" সময়ের দু একটি চিঠির ভিতরেও এই কথার সাক্ষ্য পাই। একটা চিঠির কিছু অংশ এইখানে দিলাম:—

"হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তিতে মানুষের কোন ভাল হয় না, তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হ'য়ে কেবল অল্প সুখ উৎপন্ন করে এবং কেবল আয়োজনেই সময় চ'লে যায়, উপভোগের অবসর থাকে না। কিন্তু ব্রত যাপনের মত জীবন যাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখও প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর জিনিস নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মনন শক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়, যা কিছু পাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয় তাহ'লে হৃদয়টাকে সর্ব্বদা আধপেটা খাইয়ে রাখতে হয় নিজেকে প্রাচুর্য্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়। * * কেবল হৃদয়ের আহার নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিস পত্রও আমাদের অসাড় ক'রে দেয়—বাইরে সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভাল রকমে পাওয়া যায়।

* * * * *

কিন্তু তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তবু বিধাতা যখন বলপূর্ব্বক আমাকে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করিয়েছেন তখন বোধ হয় আমার দ্বারা তিনি একটা বিশেষ কিছু ফল পেতে চান—শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পুড়ে ঝুড়ে সবশেষে বোধ হয় এ জীবনের থেকে একটা কিছু কঠিন জিনিস থেকে যাবে। মাঝে মাঝে তার আবছায়া রকম অনুভব পাই।"

"কল্পনা", "কথা", "কাহিনী," "ক্ষণিকা"—এ কাব্যগুলি প্রায় একই সময়ের লেখা—১৩০৪ হইতে ১৩০৬।৭ এর মধ্যে। ১৩০৮ এ "নৈবেদ্য" প্রকাশিত হইয়াছে। "কল্পনা", "কথা" প্রভৃতিতে দেশবোধের সূচনা মাত্র আছে; নৈবেদ্য হইতে তাহার প্রকৃত আরম্ভ। "কল্পনা" "কথা" প্রভৃতি রচনার মধ্যে বর্ত্তমানের বন্ধন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে এবং কাব্য-পুরাণের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

এই চেষ্টার ভিতরে একটি বেদনা আছে। সন্ধ্যার ছায়াটি পড়িয়া আসিয়াছে, রূপকথার রাজপ্রাসাদের ভগ্নমহালামালার ন্যায় পশ্চিমদিগন্তে অস্তমান রবির সিন্দূররাগ অস্পষ্টপ্রায়, অন্ধকার সমুদ্রের উপরে শুভ্র-পালখচিত স্বপ্নতরীর মত দু একটি তারা ভাসিয়া উঠিতেছে—সেই সময়ে অজানালোকের সৌন্দর্য্যরহস্যের অস্পষ্ট-আভাসের যেমন একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি চির পরিচিত দিবসের বিদায়ের একটি ম্লান বিষাদ—"কল্পনায়" অতীতকালের স্বপ্নসৌন্দর্য্যনয়নের মধ্যে সেই রকমের একটি মিশ্রিত পুলকবেদনা জড়িত হইয়া আছে।

সত্যই সন্ধ্যা আসিয়াছে—"চিত্রা", "সোনার তরীর" জীবনের কাছে বিদায়! এখন নূতন জীবনের যাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু হায়, কোন্ পথে

কোন্ ভাব-লোকে যে নূতন করিয়া উড়িতে হইবে তাহার কোন ঠিক ঠিকানা নাই।

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে,
দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা।"

বাস্তবিক বড় একটি সকরুণ বিষাদের সঙ্গে 'কল্পনা'য় বার বার পিছন ফিরিয়া গতজীবনের সমস্ত প্রিয় জিনিসগুলির দিকে কবিকে তাকাইতে হইতেছে :—

"কোথারে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথারে সে নীড় কোথা আশ্রয়-শাখা।"

"ভ্রষ্টলগ্ন" কবিতাটিতে আপনার সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে গূঢ়-নিবিষ্ট মাধুর্য্যময় জীবনটি রূপকথার রাজবালার নানা সাজসজ্জা, অলঙ্কার, প্রসাধন, সখীদের নানা মধুর লীলার রূপকে মণ্ডিত হইয়া যখন বার্থতার কান্না কাঁদিতেছে তখন তাহার মধ্যে বড় একটি করুণা আছে! যে নূতন জীবন "নবীন পথিকের" মত রাজপথে দেখা দিতেছে, ইচ্ছা থাকিলেও সেই প্রাসাদের শত সহস্র বেষ্টন ভেদ করিয়া তাহার কাছে আত্ম-পরিচয় দেওয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না, লগ্ন বারবার ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে,—শেষ কালে হতাশ প্রাণ কাঁদিয়া বলিতেছে :—

"রয়েছি বিজন রাজপথ পানে চাহি
বাতায়ন তলে ব'সেছি ধূলায় নামি,
ত্রিযামা যামিনী একা ব'সে গান গাহি
হতাশ পথিক সে যে আমি সেই আমি।"

পূর্ব্ব জীবনকে বিদায় দিবার এই দীর্ঘনিশ্বাস সকল কবিতার মধ্যেই আছে।

"বিদায়" কবিতাটিতে যখন "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে" তখন মনে জাগিতেছে :—

"অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি,
অমিয় রচন সোহাগ বচন
অনেক রয়েছে বাকি।"

"অশেষ" কবিতাটিতেও ঐ ক্রন্দন। সমস্ত কাজ কর্ম্ম চুকাইয়া যখন জীবনের বিশ্রামের সময় উপস্থিত তখন কেন —"আবার আহ্বান?" কত দিন বসিয়া বসিয়া কত বিচিত্র আয়োজনে জীবনটিকে এক রকম করিয়া পূর্ণ করা গেছে—তাহার স্বাভাবিক পরিণাম ছিল একটি সুন্দনিরল বিশ্রামের মধ্যে—কেন সেই বিশ্রাম হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নূতন পথে আবার ঠেলিয়া দেওয়া?

"রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।"

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে কবির জীবনের তরফ হইতেই এ সকল কবিতাকে যে পড়িতে হইবে তাহা মনে করা ভুল। "অশেষ" কবিতাটি যে কবির জীবনের এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইবার প্রকাশ করিতেছে মাত্র তাহা নহে। আমরা যেখানেই যে আশ্রয়কে শেষ মনে করিয়া দাঁড়ি টানিতে চাহিয়াছি সেখানেই সেই শেষের মধ্যে অশেষের ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে—সে কি কর্ম্মে, কি ধর্ম্মে, কি রাষ্ট্রচেষ্টায়, কি শিল্পসৃষ্টিতে, কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে—আমাদের কোথাও থামিবার জো নাই মত হইতে মতান্তরে, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ভাঙাগড়া কত বিদ্রোহ বিপ্লবের মধ্য দিয়া, কত বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সত্যের আবিষ্কারে আমাদিগকে ক্রমাগতই যাত্রা করিতে হইতেছে। সেই জন্যই কোন পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন,—

Out of the fruition of success shall come forth something which will make a greater struggle necessary—

কৃতকার্য্যতার সার্থক মূর্ত্তির ভিতর হইতে এমন কিছু বাহির হইয়া পড়িবেই পড়িবে যাহা গভীরতর দ্বন্দ্বকে জাগাইয়া তুলিবে।

জীবনে আমাদের খণ্ড-সফলতার ক্ষণ-সমাপ্তির মধ্যে অনেকবার ক্রন্দন করিয়া বলিতে হয় :—

"আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।"

"কল্পনা"র এই বিদায়ের বিষণ্ণ সুর অকস্মাৎ "বর্ষশেষে"র ঝড়ের কবিতায় কবির বীণাতন্ত্রে 'খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্জনায়' আহত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল। পুরাতন ক্লান্ত বর্ষের বিদায়ের

সঙ্গে সঙ্গে কবিরও পুরাতন কাব্য-জীবনকে বিদায় দেওয়া হইল।

প্রতি বৎসরে যে "নূতন" বসন্তের আবেশ হিল্লোলে মর্ম্মরিত কূজনে গুঞ্জনে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেবার বর্ষশেষের ঝড়ের দিনে সে ভাবে তাহার আবির্ভাব হয় নাই। জীবনেরও মধ্যে সেই ঝড়েরই মত সে নূতনের কি আশ্চর্য্য কি ভয়ঙ্কর আবির্ভাব!

"রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়
বজ্রমন্দ্রে কি ঘোষিলে, বুঝিলাম নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়!"

ফলের মত জীর্ণ পুষ্পদলকে ধ্বংস ভ্রংশ করিয়া পুরাতন জীবনের পর্ণপুটকে দীর্ণবিকীর্ণ করিয়া এই "নূতন" জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশিত। তাহার উদার আমন্ত্রণে সমস্ত বিতর্ক বিচার সমস্ত বন্ধন ক্রন্দন সমস্ত খিন্ন জীবনের ধিক্কার লাঞ্ছনাকে একেবারে দূরে অপসারিত করিয়া প্রাণ ছুটিয়া বাহির হইয়াছে:—

"লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ ভাগ
কলহ সংশয়
সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।
যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ-প্রান্তের
এক পাশে রাখ মোরে নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।"

"বৈশাখ" কবিতাটির মধ্যেও এই রুদ্রের আহ্বান:—

"জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নি-শিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।"

দুঃখসুখ আশা ও নৈরাশ্যের দ্বারা ক্রমাগত জীবনকে খণ্ডিত করিয়া আপনার দিকে তাহাকে টানিয়া রাখিবার যে বেদনা কবিকে পীড়ন করিতেছিল, সেই আপনার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সমস্ত 'কল্পনার' কবিতাগুলির মধ্যে কি কান্না! সেই আপনার সমস্ত সুখ দুঃখের উপরে বৈশাখের রুদ্র-রৌদ্র-বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যের গেরুয়া অঞ্চল পাতিয়া দিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষাই "হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখের" গম্ভীর ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগের এবং তাহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিবার আকাঙ্ক্ষার আভাস 'কল্পনা'র অনেক কবিতার মধ্যে বিদ্যমান। "মাতার আহ্বান", "ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ" প্রভৃতি কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বদেশ-বোধ এখনও অতি ক্ষীণ। কেবল আপনার পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদজনিত যে বিষাদ ও বৈরাগ্য কবির অন্তরে নামিয়াছে—তাহাই যেন একটা বড় বাণী বলিবার উপক্রম করিতেছে—'বর্ষশেষের' রুদ্র-ক্রন্দনচ্ছন্দে যে বাণীর খানিকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বিশ্বের মূলে ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্য যে দুই রূপ এপিট ওপিটের মত পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর লাগিয়া আছে, তাহার প্রথমটির সঙ্গে এতদিন কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, দ্বিতীয়টির ছবিও যে তাঁহার জানা ছিলনা তাহা নহে—কিন্তু এখনকার মত এমন মুখামুখি পরিচয় হয় নাই! "বর্ষশেষে" সেই শেষোক্ত রূপই "নূতন" হইয়া কবির নিকটে পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল, "বৈশাখে" সেই রূপই তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু লইয়া তাহার যজ্ঞকুণ্ডে সমস্ত সুখদুঃখকে আহুতি দেওয়াইল। এ রূপ অন্নপূর্ণার রূপ নয়, এ রূপ শিবের রূপ, এ রূপ রিক্ততার রূপ!

"ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল ক'রেছ
আরো কি তোমার চাই!
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী চলেছ
কি কাতর গান গাই।"

এই পরমরিক্ত কাঙালরূপ আমাদের জীবনকেও নিঃশেষে রিক্ত না করিয়া ছাড়েন না। জীবনকে যতক্ষণ ইঁহার কাছে ফেলিয়া না দিই ততক্ষণ সে কি ক্ষুদ্র, কি বন্ধনে জর্জ্জরিত—তাহার ভার কি দুঃসহ—তাহার চারিদিকে কোথাও কোনো ফাঁক নাই—আপনাকে লইয়া তাহার কি কান্না! অথচ ভোগের মধ্যে কবির জীবন অত্যন্ত বেশি জড়িত বলিয়া সহজে এই রিক্ততাকে বরণ করিবার শক্তিও তাঁহার নাই—তিনি কেবলই কাঁদিয়া গাহিতে থাকেন:—

"সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী!
কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল!
আমি আসি যাই যতবার চোখে পড়ে মুখ তার
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবিলো।"

সেইজন্য ইতিহাসের মধ্যে যেখানে মানুষ অনায়াসেই ত্যাগ করিয়াছে, বিনা বিতর্কে বৃহৎ ভাবের আনন্দে প্রাণ দিয়াছে,

—সেইখানে মানুষের শক্তির সেই বৃহৎ লীলাক্ষেত্রে মানুষের বিরাট্ মূর্ত্তিকে দেখিবার জন্য কবির চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

'কথা' কাব্যটির প্রায় সকল ঐতিহাসিক চিত্রগুলিই এই ত্যাগের কাহিনী। বৌদ্ধযুগে এবং শিখ্ ও মারাঠা জাতিদের অভ্যুদয়কালে মধ্যযুগে ভারতবর্ষের উপর দিয়া ধর্ম্মের বড় বড় প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস তাহার কথা অল্পই লিখিয়া থাকে, তাহার কারণ ভারতবর্ষের অন্তরতর জীবনের ভিতর হইতে ইতিহাস এখনও তৈরি হইয়া উঠে নাই। ঐ সকল যুগে ভারতবর্ষ তখনকার জাতীয় জীবনবীণাকে ত্যাগের সুরে খুব কঠিন করিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সে কি রকমের ত্যাগ? যে ত্যাগের আবেগে নারী আপনার লজ্জা ভুলিয়া একমাত্র পরিধেয় বসন প্রভু বুদ্ধের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, আপনার ভোগের উৎসৃষ্ট অংশ হইতে কিছু দেওয়াকে ত্যাগ মনে করে নাই—যে ত্যাগ নৃপতিকে ভিখারীর বেশ পরিধান করাইয়া দীনতম সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে—পূজারিণী রাজদণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া পূজার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে—যে ত্যাগের আনন্দে ভক্ত অপমানকে বর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, শূরেরা বীরেরা প্রাণকে তৃণের মতও মনে করেন নাই সেই সকল ত্যাগের কাহিনীই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ জাগাইয়া তুলিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার পূর্ব্বে কবির ঐতিহাসিক চেতনা জিনিসটারই অভাব ছিল। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতকে একটা বড় কালের অভিপ্রায়ের মধ্যে ফেলিয়া বিশ্বমানবের বড় বড় ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার কোন চেষ্টা তাঁহার রচনায় পূর্ব্বে লক্ষিত হয় নাই। তাহার কারণ আমাদের জাতীয় জীবনের পরিধি তখন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল—আমাদের নাটকে উপন্যাসে আমরা "ঘোরো" দিক্ হইতেই মানবজীবনকে চিত্রিত করিতাম—আমাদের দেশে ধর্ম্মে ও সমাজে যে সকল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদেরও কারণকে খুব দূরে দেশের অতীত ইতিহাসের অন্তর্গত করিয়া দেখিতে পাইতাম না, মনে করিতাম তাহা যেন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি—সাহিত্য সমালোচনাও করিতাম এমন ভাবে যাহাতে সাহিত্য জিনিসটাও একান্তই লেখক বিশেষের সম্পত্তির মত হইয়া উঠিত—তিনি ইচ্ছা করিলেই যেন তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন—সমস্ত দেশের মানসাকাশে যে ভাবহিল্লোল জাগিয়া উঠে তাহাই যে জমাট বাঁধিয়া সাহিত্য-রূপ ধারণ করে—সমস্ত দেশের সকল চেষ্টা ও চিন্তার সঙ্গে সাহিত্যকে এমন করিয়া যুক্ত করিয়া দেখিতেই জানিতাম না।

রবীন্দ্রনাথ যদিচ নিজের অন্তরতর অভাববশতঃ প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি একথা নিঃসন্দেহ জানিতে হইবে যে সমস্ত দেশে এইদিকে একটা নাড়াচাড়া চলিতেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা উগ্র প্রতিক্রিয়া অনেক দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল—আমাদের সমাজ যে ব্যক্তি-প্রধান নয়, আমাদের দেশে ব্যক্তি যে সমাজের অধীন এ সকল কথা বলিয়া সমাজের গৌরব গান নব্য হিন্দুদলের মধ্যে গাওয়াও হইতেছিল অতিমাত্রায়—অর্থাৎ দেশ যে একটা কাল্পনিক পদার্থমাত্র নহে, একটা সত্য বস্তু ইহা অনুভব করিবার একটা আয়োজন চলিতেছিল।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক জীবনের কথা বলিবার সময়ে এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। কবির নিজের জীবন আপনার পথ আপনি কেমন করিয়া কাটিয়া চলিয়াছে তাহাই আমরা দেখিতেছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে মহাকাল চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না—এদেশের মধ্যেও নানা ছোটখাট আন্দোলন উদ্যোগে একটা পরিবর্ত্তন স্রোত অনেক মানুষের হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

"কল্পনা" ও "কথা ও কাহিনীর" মধ্যে যেমন এই এক ভাবের অবিচ্ছিন্ন ধারা দেখা গেল—"ক্ষণিকার" মধ্যেও মোটামুটি এই ভাবেরই ধারা বহিয়া চলিয়াছে; তথাপি এ কাব্যখানির বিশেষ একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। একটি উজ্জ্বল কৌতুকলীলার তরঙ্গে ক্ষণিকার সমস্ত কবিতাগুলি টলমল্ করিতেছে—এমন স্বচ্ছ এমন অনায়াস প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের আর কোন কাব্যের মধ্যে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার মধ্যেও পূর্ব্বোল্লিখিত কাব্যগুলির ন্যায় গতজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের একটা কান্না আছে কিন্তু—

"তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল?
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।"

আমার মনে হয়, সূর্য্যাস্ত এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের সন্ধি স্থলে আকাশ যেমন অকস্মাৎ অত্যন্ত সুতীব্ররূপে রাঙা হইয়া উঠে, সেইরূপ ক্ষণিকায় নির্ব্বাপিত কবিজীবনশিখা আকস্মিক ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁদিয়া আপনাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিয়াছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। "ক্ষণিকা"তেই প্রথমে কবি বাংলা কথিত ভাষা ব্যবহার করেন। কথিত ভাষায় একটা সুবিধা এই যে তাহা কৌতুক কিম্বা করুণাকে ব্যঞ্জিত করিবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। ঠিক "মনের-কথা-জাগানে" ভাষা। সংস্কৃতের স্থূল শব্দের দ্বারা কৌতুক করা চলে না। দ্বিতীয় সুবিধা এই, যে, কথিত ভাষায় হসন্তওয়ালা শব্দ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়া ছন্দটাকে খুব বাজাইয়া তোলা যায়—সুর পদে পদে হসন্তের উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া কলধ্বনি করিতে থাকে। যথা:—

দীঘির্ জলে ঝলক্ ঝলে
মাণিক্ হীরা
শর্ষে ক্ষেতে উঠ্ছে মেতে
মৌমাছিরা।

ক্ষণিকা হইতে কবিতার এই রচনা-ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া আজ পর্য্যন্ত কবি তাহাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

'ক্ষণিকা' এই নামের দ্বারা এবং মুখবন্ধের প্রথম কবিতাটিতেই কবি যেন বলিতে চান যে তিনি কেবল ক্ষণিকের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত—

"ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন।"

কিন্তু কথাটা কি সত্যই তাই? জীবন-দেবতার কবি কি অনন্তের অনুভূতিকে বিদায় দিয়া ক্ষণিক সুখের উৎসবকেই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন? এখানেও

"তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।"

কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক বড় গম্ভীর প্রকৃতির, এ সকল কৌতুকের চাপল্য তাঁহারা সহ্য করিতে অক্ষম। ইহার মধ্যে যে একটি মুক্তপ্রাণের হাওয়া বহিয়াছে, সৌন্দর্য্যমুগ্ধ প্রকৃতির একটি ভারশূন্য লঘু আনন্দ-লীলা যে খেলিয়া গিয়াছে সে খেলায় যোগ দিতে ইহারা চাননা—ইহাদের বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য তাহাতে রক্ষা হয় না।

"ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
পথেই যদি করিস্ মাতামাতি,
থলিঝুলি উজাড় ক'রে ফেলে
যা আছে তোর ফুরাস্ রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা ক'রে সুরু
পাঁজিপুঁথি করিস্ পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের পরে লাগাস্ ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।"

এ কী অদ্ভুত রকমের কথাবার্ত্তা! ইহার মধ্যে যে একটি কথা আছে, অনেক দিনের সঞ্চিত নানা আবর্জ্জনার যে ভার চিত্তের উপরে জমিয়া তাহাকে সহজ আনন্দে যোগ দিতে দিতেছে না।

"সেই বুক-ভাঙা বোঝা নেবনারে আর তুলিয়া
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া"—

সে কথাটা চাপাই পড়িয়া গেছে—এ রকম কৌতুকের আস্ফালনের ভিতর হইতে সেই অন্তরের কথাটুকু বাহির করা তাই শক্ত, গম্ভীর প্রকৃতির লোকদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

কবি আপনিই বলিয়াছেন:—

"গভীর সুরে গভীর কথা—
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।"

ক্ষণিকার প্রথম ভাগে সকল কবিতার মধ্যেই নিজের বেদনাকে এই ঠাট্টা করিয়া ওড়ানোর একটা ভাব আছে। আপনার মনের সঙ্গে একটা "বোঝাপড়া" আছে—কাজ কি,—পিছন ফিরিয়া তাকাইবার, আপনার সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি গণনা করিবার,—

"মনেরে আজ কহ যে
ভালমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"

তাই ভোগের জীবন এবার গতপ্রায়। আপনাকে আর নানার মধ্যে ঘুরাইবার আকাঙ্ক্ষা নাই—ভারবর্জ্জিত, মুক্ত, সহজ এবং আনন্দিত হইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল।

"তোমরা নিশি যাপন কর
এখনো রাত রয়েছে ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহ
ঘুমতে যাই ঘুমতে যাই!"

যৌবনের আবেগে "ছিন্ন রসারসি" অনেকবার যে সিন্ধুপানে ভাসিয়া যাওয়া গিয়াছে—সে তীব্র আবেগ শান্ত হইতেই কবি গ্রামের প্রান্তে-কূলের কোলে, বটের ছায়া তলে ঘাটের পাশে বাসা বাঁধিলেন। "বোঝা পড়া"র শেষে কাব্যটির এইখানেই যথার্থ আরম্ভ। এইখানে অকাজে কবি ভারশূন্য প্রাণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—

"গাঁয়ের পথে চ'লেছিলেন
অকারণে
বাতাস বহে বিকাল বেলা
বেণুবনে।"

কখনো মনটিকে কল্পনায় দূর বৃন্দাবনের মধ্যে ঘুরাইয়া সেখানকার মধুর গোষ্ঠলীলাকে উপভোগ করিতেছেন, কখনো "কালিদাসের কালের" লোধ্র কুরবক শৌরসেনীর কল্পনাকে গাঁথিয়া তুলিতেছেন, কখনো

"নীলের কোলে শ্যামল যে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘের'
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা—"

সেইখানে সৌন্দর্য্যের বাণিজ্যে বাহির হইয়া পড়িতেছেন-দেশকালের কোন বাধাই নাই। গ্রামের কত সৌন্দর্য্য যে চক্ষে পড়িতেছে—"ভাঙন-ধরা কূলে আ-ঘাটাতে ব'সে রৈলে বেলা যাচ্ছে ব'য়ে" সে সময় আপনারই অন্তরের তৃপ্তিতে এমন ভরপুর যে আর কিছুরই প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে না—

"ভাঙন-ধরা কূলে তোমার
আর কিছু কি চাই?
সে কহিল ভাই,
নাই নাই নাই গো আমার
কিছুতে কাজ নাই!"
"আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ।"

শরৎকালের নদীর বালুচরে চখাচখীর নির্জ্জন ঘর, সন্ধ্যায় বধূর দ্বারে "অতিথির" ঝিনিঝিনি শিকল নাড়ার শব্দে ত্রস্তব্যস্ত ভাব, মনের-কথা-জাগানে বাতাসখানির স্পর্শ, ওপরের ঝাউএর অবিরাম শব্দে আকাশে অতি সুদূর বাঁশীর তানে কাতর একটি বিরহ-বেদনার ব্যাপ্ত বৈরাগ্য, জলার্থিনী দুটি বোনের গুঞ্জন ধ্বনি ও কলহাস্য, মেঘলা দিনে ময়না পাড়ার মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ—নব বর্ষায় শত বরণের ভাবউচ্ছ্বাস কলাপের মত ক'রেছে বিকাশ—নদীকূলে, কেতকীবনে, নবঘন প্রাসাদে; বকুলতলে বর্ষা প্রকৃতির কত বিচিত্র রূপ:—

"ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে"
ওগো নবঘন নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি
তড়িৎশিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে?"

এত বিচিত্র সৌন্দর্য্য, কোন দেশের কোন গীতি-কবির গানে কি এমন স্বচ্ছ এমন উজ্জ্বল প্রকাশে ধরা দিয়াছে! ক্ষণিকার শেষের দিকে বিপুল বিরতিপূর্ণ এই একটি ব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমরা ক্রমেই নিবিড়তর গভীরতর লোকে প্রবেশ করি। প্রকৃতির "আবির্ভাব" কল্পনার "বর্ষশেষে"র নূতনের আবির্ভাবেরই মত

"উত্তাল তুমুল ছন্দে
নবঘন বিপুল মন্দ্রে"

জলভরা বর্ষায় তাহার গান শেষ করিল।

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলো চুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ার
সঘন সজল বিশাল মায়ায়
আকুল ক'রেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।"

বসন্তের যে সমস্ত বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যের আরাধ্যা দেবীকে পূর্ব্বে কবি আহ্বান করিতেন সে আয়োজন ভাঙিয়া চুরিয়া গেছে—ক্ষণিকার সর্ব্বত্র অতি সামান্য বিষয়ে নিতান্ত তুচ্ছতার মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের আবাহন

'এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ-আলোকে এস ধীরে ধীরে
এই বেতসের বাঁশীতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ!"

এই গভীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে কবি আসিয়া পড়িলেন, এইখানেই "নৈবেদ্যের" আরম্ভ—এইখানেই প্রকৃতি ছাড়িয়া প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি তাঁহার পরিচয় অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিল।

"অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী
খেলা হ'ল সমাধান।
চপল চঞ্চল লহরীর লীলা
পারাবারে অবসান।"

বিচিত্রতার জীবনের এইখানেই শেষ এবং একের সঙ্গে একের গভীরের সঙ্গে গভীরের মিলনের আরম্ভের এইখানেই সূত্রপাত। তাই ক্ষণিকার শেষ কবিতা "সমাপ্তি"তে জিজ্ঞাসা হইতেছে:—

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রু জলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা?
রুধিয়া দিয়েছি তব বাতায়ন
বিছান রয়েছে শীতল শয়ন
তোমার সন্ধ্যা-প্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।

আমরা দেখিতেছি যে "কল্পনা"তে "ক্ষণিকা"তে পূর্ব্ব জীবনের সৌন্দর্য্যভোগের অবশেষকে যেন একেবারে ঝুলি ঝাড়িয়া নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইল। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় নাড়ী কাটার যে বেদনা শিশু পায়, পূর্ব্ব জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের সেই প্রকারের বেদনা এই কাব্যগুলির মধ্যে রহিয়া গেছে। "তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয় সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়"—পূর্ব্বে একটি পত্রাংশে যে এই কথাগুলি বলা হইয়াছিল 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা'ই সেই কথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। 'কল্পনা'র কারুখচিত প্রাচীন কালের সৌন্দর্য্যের সুনিপুণ রচনার নীচে এবং 'ক্ষণিকার' কৌতুকহাস্যোজ্জ্বল তরল সৌন্দর্য্যপ্রবাহের তলায় যে পূর্ব্ব জীবনের, আর্টের জীবনের একটি সমাধি তৈরি হইয়াছে, সে খবর ঐ দুই কাব্যের ভিতর হইতে কে পড়িতে পারে? ঐ দুই কাব্যে বেদনার মেঘ অতি নিবিড় বলিয়াই অলঙ্কারের রশ্মিচ্ছটা অমন আশ্চর্য্য ভাবে বিচ্ছুরিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

কবিজীবনকে নিঃশেষিত করিয়া যে নূতন আধ্যাত্মিক জীবনে কবি জন্মলাভ করিলেন তাহার পরিপুষ্টির স্তন্যদুগ্ধ ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শে—"কথার" মধ্যে যাহাকে নানা কাহিনীতে প্রকাশ করিয়া আসা হইয়াছে।

নৈবেদ্যে সেই প্রাচীন তপোবনের ঋষিদের সাধনার আদর্শকে জীবনের মধ্যে সত্য ভাবে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে।

"তাঁহারা দেখিয়াছেন—বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হ'তে আনন্দ নির্ঝর,
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্ম্মরিয়া করে যাতায়াত;
গিরি উঠিয়াছে ঊর্দ্ধে তোমারি ইঙ্গিতে
নদী ধায় দিকে দিকে তোমারি সঙ্গীতে,
শূন্যে শূন্যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা যত
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত।
তাঁহারা ছিলেন নিত্য এ বিশ্ব আলয়ে
কেবল তোমারি ভয়ে তোমারি নির্ভয়ে
তোমারি শাসন গর্ব্বে দীপ্ত তৃপ্ত মুখে
বিশ্ব ভুবনেশ্বরের চক্ষুর সম্মুখে।"
* * *
আমরা তোমার আছি—কোথায় সুদূরে
দীনহীন জীর্ণ ভিত্তি অবসাদ পুরে
ভগ্ন গৃহে; সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে
কুব্জ পৃষ্ঠে নত শিরে; সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জ্জনী সঙ্কেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া, লইয়াছি শিরে পেতে
সহস্র শাসন-শাস্ত্র" * *

নৈবেদ্যের সময় হইতে অর্থাৎ ১৩০৮ সালে বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতার ভার গ্রহণের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক জীবনের আরম্ভ।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা এখানে বলা দরকার। আমরা অন্য প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি যে প্রবল অনুভূতি এবং কল্পনার যোগে সমস্ত জিনিসকে দেখিবার দরুণ যখনই কোন খণ্ডতার মধ্যে কবি গিয়া পড়েন—হোক্ তাহা বাহ্য সৌন্দর্য্য, হোক মানব প্রেম, হোক্ স্বদেশানুরাগ—তখন সেই খণ্ডতাকে খণ্ডতা বলিয়া জানিবার কোন উপায় তাঁহার থাকে না। জীবনের অন্যান্য সকল দিক্‌কে আচ্ছন্ন করিয়া সে বড় হইয়া এবং একান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এইটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াও অমনিই সুরু হয়। খণ্ডতাকে বিদীর্ণ করিয়া আবার তাঁহার সর্ব্বানুভূতি আপনাকে

সমগ্রের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে নির্বাধ ও মুক্ত করিতে সক্ষম হয়।

স্বাদেশিক জীবনেও এই কাণ্ডটিই হইয়াছে। কেবল যে প্রাচীন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ তাঁহার নিজের জীবনের পূর্ণতার পক্ষে প্রয়োজন ছিল বলিয়া সেই আদর্শটুকুই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। স্বদেশ তাঁহার কল্পনানেত্রে তাহার অতীত ও বর্ত্তমান, তাহার হীনতা ও বিকৃতি, তাহার আশা ও নৈরাশ্য সমস্ত লইয়াই অখণ্ডরূপে দেখা দিয়াছিল। দেশের সেই অখণ্ড ভাবরূপ তাঁহার সমস্ত চিত্তকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করাতেই হিন্দু সমাজকেও সেই ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার একটা উদ্যোগ তাঁহার মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল।

আমি এই সময়ে কোন কোন বিশিষ্ট লোকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি অন্ধভক্তিবশতঃ কবি বৈরাগ্য এবং সংসার-বিমুখতার সাধনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করিয়া তাহারই একটি ক্ষেত্রের জন্য বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অবশ্য এই সময়েই বোলপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়—১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে।

আমি কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহিনা যে আমাদের দেশের আধুনিক সন্ন্যাসের আদর্শ, "কামিনী কাঞ্চন বর্জ্জনের" আদর্শ, কবিকে কোনদিন কিছুমাত্র অধিকার করিয়াছিল। তার প্রমাণ নৈবেদ্যেই আছে :—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়-
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমার শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন—সে নহে আমার
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

আমি অন্য প্রবন্ধের ভূমিকায় বলিয়াছি যে কবির জীবনে আধ্যাত্মিকতার এই নূতন ভাবটি আকাশ হইতে হঠাৎ পড়া কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়—তাহা তাঁহার কবি-জীবনেরই স্বাভাবিক পরিণতি এবং আশা করি যে যাহারা আমার এই সমগ্র প্রবন্ধটি অনুধাবন করিবেন তাঁহারা সেই পরিণতির ক্রমগুলিও একে একে চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাইবেন স্পষ্টরূপে এবং নিঃসন্দিগ্ধ রূপে।

কবির পক্ষে প্রয়োজন ছিল বিচিত্রতার জীবনকে এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে একসঙ্গে মেলানো ভোগ এবং ত্যাগের সামঞ্জস্যের একটি সাধনার পথ আবিষ্কার করা।

আমি বলিয়া আসিয়াছি যে একটা বড় মঙ্গলের ক্ষেত্র, ত্যাগের ক্ষেত্র, এই কারণে তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। দেশের কোথাও যখন এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা, তখন তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় এই বোলপুরে সেরূপ একটি ক্ষেত্র গড়িয়া লইতে হইল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন চতুরাশ্রমধর্ম্মের আদর্শ, তপোবনের আদর্শ, সংসার এবং পরমার্থ, ভোগ এবং ত্যাগ, এই পরস্পর বিপরীত জিনিসের সমন্বয় কি করিয়া সাধিত হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। আধুনিক কালের পক্ষে যে এই আদর্শের উপযোগিতা সকলের চেয়ে বেশি, সে কথা জগতে নানা জায়গাতেই আজ উঠিয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষেও সে কথা প্রথম ধ্বনিত হইল কবিকণ্ঠে এ এক আশ্চর্য্যের ব্যাপার।

ইউরোপে আজকাল কথা উঠিয়াছে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া যে সমাজ রচনার চেষ্টা ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল তাহা মিথ্যা তাহা কখনই ভিত্তি হইতে পারে না। সমাজকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সমষ্টি বলিয়া জানা ভুল সমাজ একটি অবিচ্ছিন্ন কলেবর অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার ভিতরে সম্বদ্ধ। সোশ্যালিজম প্রভৃতির আন্দোলনের দ্বারা এই আদর্শের দিকেই প্রধাবিত। মিল, হর্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিদদের তাই আধুনিক ইউরোপ ব্যক্তি তন্ত্রের গোঁড়া বলিয়া গাল দিয়া থাকে।

কেবল বৈজ্ঞানিক ভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া জড়শক্তির মত মনুষ্য সমাজের নানা বিচিত্র শক্তিগুলিকে সাজাইয়া তোলা যায় না—ষ্টেট্ গড়ার বৈজ্ঞানিক আদর্শও

ইউরোপে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। মানুষ তো কেবল প্রয়োজন সাধনের কল মাত্র নহে—সুতরাং ব্যবহারিক দিক দিয়া তাহার রাষ্ট্র রচনা করিতে গেলেই, রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের মধ্যে যে প্রবল সংঘাত বাধিয়া যাইবে তাহার কোন সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। নূতন ধর্ম্মের আন্দোলনের ভিতর দিয়া সেই কথাটা ইউরোপের চেতনার মধ্যে পৌঁছিয়াছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বেশ সহজ এবং অঙ্গাঙ্গিযোগ কি ভাবে সাধিত হইতে পারে—ইউরোপের তাহাই এখন একটা বড় সমস্যা।

ইউরোপীয় দর্শন, সাহিত্য, আর্ট, সমাজনীতি—সমস্তের ভিতর দিয়াই এই সমন্বয়াদর্শ কাজ করিতেছে দেখিতে পাই।

কবি রবীন্দ্রনাথও ভারতবর্ষে এই আদর্শকেই তাহার প্রাচীন তপস্যার ভিতর হইতে নিজের জীবনের প্রয়োজনের ক্ষুধায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম এবং সমাজ, পরমার্থ এবং সংসার আধুনিক কালে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ধর্ম্মকে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় এবং সমাজকে আধ্যাত্মিকতাশূন্য আচারপরায়ণ মাত্র করিয়া আমাদের দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য আমরা বলি যে সংসার করিতে গেলে আচারের বন্ধনকে স্বীকার করিতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে গেলে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। এই দুই কি উপায়ে মিলিতে পারে এবং সমস্ত দেশ এই দুইকে সম্মিলিত করিবার সাধনার দ্বারা কিরূপে বলিষ্ঠ হইয়া পুনরায় জাগ্রত হইতে পারে তাহা দেশের চক্ষের সামনে কবি প্রাণপণে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সুতরাং যাহারা মনে করেন যে তাঁহার তপোবন রচনার কল্পনা সংসার-বিমুখতার নামান্তর, তাঁহারা ভারতবর্ষের আদর্শকে কবি কি চক্ষে দেখেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধেও তাই তাঁহারা কতগুলি অমূলক কল্পনাকে মনের মধ্যে পোষণ করিয়া ইহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রক্ষা করেন নাই এবং ইহার কাজকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য অণুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই।

তাঁহার "তপোবন" নামক একটি প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে কি আদর্শ যে তাঁহার মনের মধ্যে কাজ করিয়াছিল তাহা পরিস্ফুট হইবে :—

"ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে, সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়- বোধের যোগ।

* * *

অতএব আমরা যদি মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, তবে এটা মনে স্থির রাখ্‌তে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল কালেজের পরীক্ষার পাস করা নয়—আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হ'য়ে। আমাদের স্কুল কালেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা, বোধের তপস্যা নয়।

* * *

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা—প্রবৃত্তি অসংযত হ'য়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হ'য়ে যায়।

এইজন্যে ব্রহ্মচর্য্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক—ভোগ বিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়—যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে দেয়, তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চল্‌চে যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্ম্মল,—যেখানে সামাজিক সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা ব'লেছে তাই লাভ করবার স্থান।"

এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শ চারি আশ্রমধর্ম্মের আদর্শের অংশমাত্র। কবিকে যেখানে প্রাচীন ভারতবর্ষ মুগ্ধ করিয়াছিল সে ঐ চতুরাশ্রমের আদর্শ।

"ততঃ কিম" নামক প্রবন্ধে তিনি এই আদর্শটিকে ফলাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এখানে দিলাম :—

"জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা। * * *

গ্রহণ এবং বর্জ্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এ দুটাই সমান সত্য—একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে। * * শঙ্কর ত্যাগের অন্নপূর্ণার ভোগের মূর্ত্তি—উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দু সমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন। * * শিব ও শক্তি, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল * * ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ জানিত **সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে,** মানুষের চির-অবলম্বন নহে- সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন কর্ম্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।

দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত—পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ণ—ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংস্কার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

ত্যাগ করিতেই হইবে, ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয় শিক্ষা নানা গ্রন্থ শিক্ষা ছিল না, তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য্য।"

আমি যে লেখাটি হইতে যে যে স্থান উদ্ধার করিলাম তাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ কবি কি বুঝিয়াছিলেন তাহা পরিষ্কার বোধগম্য হইবে। একথা যেন কেহ না মনে করেন যে স্বাদেশিকতার প্রথম মত্ততা তাঁহার কাটিয়া গেছে বলিয়া এ আদর্শও তাঁহার মন হইতে সরিয়া গেছে। বস্তুতঃ উপনিষদের—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

—এই মহা বাক্যটি যেমন তাঁহার পিতার জীবনে মূলমন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল তাঁহার জীবনেও এই আদর্শেরই প্রভাব কাজ করিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, আমাদের সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে এই আদর্শটি রহিয়াছে, যাহার জন্য সমাজ, বন্ধন না হইয়া মুক্তির কারণ হয়, আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বৃহৎ জীবনক্ষেত্রে এই ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত পূর্ণ করিয়া দেখিবার আদর্শকে কবি প্রত্যক্ষ করিলেন। সংসারকে পূরাপূরি গ্রহণ করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিলে তাহাকে সংসার ত্যাগ করা বলেনা। সংসারকে অতিক্রম করা মানেও এ নয় যে সংসারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকিবে না—সংসারকে অতিক্রম করার অর্থ সংসারকে ব্রহ্মের মধ্যে সত্য করিয়া জানা। তেমন করিয়া জানিতে গেলে বন্ধন এবং মুক্তি এক কথা হইয়া পড়ে, ভোগ এবং ত্যাগে কোন বিচ্ছেদ থাকেনা।

আমি যদি ভুল বুঝিয়া না থাকি তবে এই কি তাহার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভিতরকার কথা নয়? কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মবন্ধনকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উপলব্ধিকে প্রত্যক্ষ করার সাধনাই কি এ আশ্রমের মর্ম্মের মধ্যে নাই? বস্তুতঃ আমি এখানকার কর্ম্ম অংশটুকুকে এই বড় সাধনার অঙ্গীভূত বলিয়া জানি, সেইজন্য ইহাকে কোন দিনই প্রাধান্য দিইনা। এখানে বিশ্বপ্রকৃতির উদার সহবাসে এবং মঙ্গল কর্ম্মে মন নির্ম্মল হইয়া জলস্থলআকাশে, সমস্ত মনুষ্যলোকে সর্ব্বত্র আপনার চেতনাকে প্রসারিত করিয়া দিবে এবং ব্রহ্মের দ্বারা সমস্তই পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিবে—কোন সামাজিক সংস্কারের দ্বারা নহে, কোন জাতিগত বিরোধ বুদ্ধির দ্বারা নহে। এ আশ্রমের আকাশ, দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর, তরুলতা সেই বিরাট অনুশাসনকে প্রচার করিতেছে, যে, যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া সত্য করিয়া জান।

যে সুবৃহৎ ধর্ম্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কবি প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে স্বাদেশিকতার একটা প্রবল উত্তেজনা এক সময়ে মিশিয়াছিল কেন, এখানে এ প্রশ্নটি ওঠা স্বাভাবিক। আমি পূর্ব্বেই একরকম করিয়া ইহার উত্তর দিয়া আসিয়াছি। আমি বলিয়াছি যে স্বদেশের একটি অখণ্ড ভাবরূপ তাঁহার চিত্তকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করাতে তিনি হিন্দু সমাজকে কেবল তাহার বিকৃতি ও দুর্ব্বলতার দিক্ হইতে না দেখিয়া আপনার অখণ্ড ভাবের দ্বারা খুব বৃহৎ খুব মহৎ করিয়া দেখিয়াছিলেন। ভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া সব জিনিসকে দেখা কবির প্রকৃতিসিদ্ধ। এ দেখাকে নিন্দা করা চলেনা, কারণ সত্যকে তাহার অন্তরতম জায়গায় দেখিতে গেলেই সমস্ত বাহ্য আবরণকে ভেদ করিয়া দেখিতে হইবে, তথাপি ভাব যদি বাস্তবমূলক না হয়, তবে সে অসত্যকেই সত্যের স্থানে বসাইয়া ফেলে। তখন অনুভূতি মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, কোনটা গ্রহণীয় এবং কোনটা বর্জ্জনীয় তাহা বিচার করিবার সাধ্য থাকেনা। সমাজকে যাহা শিথিল ও জড়প্রায় করিয়াছে, ইহার প্রকৃত মহত্ত্বকে যাহা অবরুদ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বড় আদর্শের সঙ্গে তাহাও একীভূত হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া সবে।

ভাবের সঙ্গে বাস্তবের বিচ্ছেদ এই জন্যই কোন ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নহে।

তাঁহার আধুনিক উপন্যাস "গোরা" যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই অবস্থারই একটি চিত্র গোরা-চরিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু গোরার ন্যায় কবি রবীন্দ্রনাথকেও এ অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল এবং যাইবার প্রয়োজনও ছিল। প্রয়োজন ছিল বলিতেছি কেন তাহার কারণ আছে। আমাদের দেশের আধুনিক কালে সকলের চেয়ে বড় সমস্যাটা কি তাহা আলোচনা করিলেই আমার এরূপ কথা বলিবার তাৎপর্য্য নির্ণীত হইবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে আমাদের এই স্বপ্নদেশ যখন জাগিয়া উঠিল, তখন আমাদের প্রাচীন সমাজ আচারবিচারের সহস্র বেষ্টন তুলিয়া বিশ্ব হইতে আমাদের চিত্তকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ইহাই আমরা অনুভব করিলাম। আমাদের দেশের ইতিহাসের যে বিপুলধারা বিচিত্র জাতির বিচিত্র আদর্শের সমন্বয়ে পরিপুষ্ট হইয়া এক যুগ হইতে অন্যযুগে এতাবৎকাল সমানবেগে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার সেই স্রোত একসময়ে বন্ধ হইলে আমরা তাহার পূর্ব্ব ইতিহাসের কোন সংবাদই পাইলাম না,—জীর্ণ লোকাচারের শৈবালবন্ধনে অচল অসাড় তাহার জীবনহীন ভাব দেখিয়া আমরা ভাবিলাম যে আমাদের দেশে প্রাণের বুঝি চিরকালই এমনিতর অভাব। দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকিল না।

সুতরাং আমরা পশ্চিমের সভ্যতার দ্বারা অভিভূত হইয়া সমাজকে ভাঙিলাম। আমরা বলিলাম ব্যক্তির স্বাধীনতা দিতে হইবে—ব্যক্তি যাহা জ্ঞানপূর্ব্বক বুঝিবে তাহাই সে আচরণ করিবে—সমাজ তাহাকে শাসন করিলে সে শাসন তাহার অস্বীকার করাই কর্ত্তব্য।

ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে বটে, কিন্তু তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের সূত্রে সকলের ঐক্য থাকার জন্য সেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ দাঁড়ায় না, মানুষে মানুষে সকল বিষয়েই সম্মিলিত হইয়া সকল প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী ও পাকা করিয়া গড়িয়া তোলে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য নাই—সমাজকেও যখন আমরা ভাঙিলাম তখন দেখিতে দেখিতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। একদল লোকে বুলি ধরিল, সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন নাই শুধু নয়,—হিন্দু সমাজের মত আদর্শ সমাজ কোথাও হইতে পারেনা—ইহার সকল প্রথা সকল আচারেরই সার্থকতা আছে।

এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাতে প্রমাণ হয় যে সমাজের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি একেবারে ক্ষীণ হইয়া যায় নাই।

"গোরা" যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সমাজের এই সকল বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাত সেই উপন্যাসটিতে কেমন আশ্চর্য্য শক্তির সঙ্গে দেখান হইয়াছে। তাহাতে আধুনিক কালের যে সমস্যাটি আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই, যে, ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজের বহুতর ভাগবিভাগে আমাদের দেশ শতধা বিচ্ছিন্ন কিন্তু তাহাদের ঐক্যদান করিবার জন্য কোন শক্তি এদেশে কাজ করিতেছে না। আমাদের দেশের মধ্যে সৃজনীশক্তির কোন প্রকাশ নাই। আমরা যাহা কিছু গড়ি তাহা সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার সীমা ছাড়াইয়া যায়না—ব্যক্তিগত মতামত কেবলি ফাটল ধরাইয়া ভিত্তিকেই দীর্ণ করিতে থাকে আমাদের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি উপস্থিত এবং অনাগত সমস্ত দেশবাসীর একত্রিত চিত্তের মিলন-মন্দির স্বরূপ হয়না, তাহার মধ্যে বিশ্বমানবের রূপ প্রকাশ পায়না।

এ সমস্যা বাস্তবিকই জীবন মৃত্যুর সমস্যা। যে দেশের মর্ম্মের মধ্যে সৃজনীশক্তি দুর্ব্বল, বাহিরের আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটে। জগতের বহুতর জাতিকে এইরূপ কারণে বিলুপ্ত হইতে দেখা গেছে।

সমস্যাটা এত বড় গুরুতর ইহা অনুভব করিয়াই রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজকে স্বাদেশিকতার একটা পরিপূর্ণ ভাবের দ্বারা বড় করিয়া অনুভব করিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন সজোরে।

তাঁহার মনে হইত,—বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধে এ কথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—যে, ইউরোপীয় জাতিদের যেমন নেশন সকল স্বাতন্ত্র্যকে সকল বিচ্ছেদকে একটা ঐক্য দিয়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে জোরালো করিয়া রাখিয়াছেন,

আমাদের তেমনি বহুকালের একটা সমাজ আছে—তাহার ভালোমন্দ বিচার পরে হইবে, কিন্তু তাহাকে প্রাণ দিয়া খাড়া করিয়া রাখাই আগে প্রয়োজন। সেইখানেই আমাদের সমস্ত জাতি মিলিবে। সেইখানেই আমাদের সমস্ত সেবা সমস্ত পূজা আসিয়া উপস্থিত হইবে—সেই "স্বদেশী সমাজ"কে জাগ্রত না করিলে আমরা বিদেশের আক্রমণ-স্রোতে ভাসিয়া যাইব—পৃথিবীর ইতিহাস হইতে আমাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ এদিক হইতে দেখিলে ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই। যদি ইহা সত্য হয়, যে অনুকরণ করিয়া আমরা বাঁচিবনা,—কোন জাতিই কোন দিন বাঁচে নাই—তবে আমাদের ইতিহাসের ভিতর হইতেই আমাদের প্রাণ পাইতে হইবে। এবং আমাদের ইতিহাসে যখন কোন দিনই আমরা নেশন্ গড়ি নাই অথচ সমাজের সূত্রে যখন আমাদের ঐক্যও একটা স্থির হইয়াছিল এবং আছে এখনও, তখন সেই সমাজকে কালের উপযোগী করিয়া অথচ প্রাচীনের নিত্য আদর্শের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া গড়িতেই হইবে।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'সমাজভেদ,' 'ব্রাহ্মণ,' 'হিন্দুত্ব,' 'চীনেম্যানের চিঠি' প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিলে আপনারা এই ভাবেরই পরিচয় পাইবেন।

গোরা-চরিত্রটিকেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের মধ্যে এই স্বাজাত্যের উদ্বোধকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছিল আমাদের প্রাচীন আর্য্যসমাজের ভিত্তিমূল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণই পূর্ব্বে দ্বিজ বলিয়া পরিচিত হইতেন, বৃত্তিভেদ ভিন্ন তাহাদের মধ্যে আর কোথাও কোন বৈষম্য ছিলনা। কালক্রমে দ্বিজত্বের সাধনা যেমন বিলুপ্ত হইয়াছে এবং দ্বিজত্ব কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, স্ব স্ব বৃত্তির অনুশীলনও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের দ্বারা আচরিত হইতেছেনা। ব্রাহ্মণ যিনি নির্লিপ্ত থাকিয়া তপস্যা করিবেন, সমাজের ত্যাগের নিত্য আদর্শ টিকে বিশুদ্ধভাবে নিজ জীবনে রক্ষা করিবেন, তিনি সে বৃত্তি রক্ষা না করিয়া দশের ভিড়ে মিশিয়া শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিভেদমূলক সমাজব্যবস্থাকে সেইজন্য পুনরায় তাহার পূর্ব্বতন বিশুদ্ধিতায় দৃঢ় করিতে হইবে, নহিলে আমাদের সমাজের কল্যাণ নাই, রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই ঘোষণা করিতেন।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। আধুনিক নব্য হিন্দুদলের গোঁড়া হিঁদুয়ানীর পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ কোন অবস্থাতেই ছিলেন না। যাহা আছে, তাহাই বেশ আছে এবং থাকিবে একথা তিনি কোথাও বলেন নাই। "ব্রাহ্মণ" নামক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে কায়স্থ সুবর্ণ-বণিক প্রভৃতি জাতিরা যদি দ্বিজপদবাচ্য না হন তবে ব্রাহ্মণ দাঁড়াইবার বল পাইবেন না। তাহার ভাব ছিল এই যে সমাজকে দেশ-বোধে পূর্ণ হইয়া উঠিয়া একটা শক্তি হইয়া উঠিতে হইবে, যাহার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার একটা গৌরব অনুভব করিতে পারিবে।

কিন্তু সেই জন্যই একথা বলিতে হইবে, যে, এমন করিয়া দেখা কেবলমাত্র আপনার ভাবের দ্বারাই দেখা। ভাব যতই প্রবল হয়, বাস্তবকে সে ততই অবজ্ঞার দ্বারা দবে খেদাইয়া রাখে। ভাবুকের ভাব যে তাহারই একটি বিশেষ শক্তি, অন্যের যে তাহা নাই এবং অন্য লোক যে তাহার সঙ্গে সায় দিতেও অক্ষম সে কথা এই শ্রেণীর ভাবুক চিন্তার মধ্যেই আনেন না। ক্রমাগত বাস্তবক্ষেত্রে তাই এই ভাবুকদের আঘাত খাইতে হয়, এবং ক্রমে তাহারা বুঝিতে পারেন যে বাস্তবের সঙ্গে কারবার করিতে হইলে বিকারকে মিথ্যাকে কদাচারকে মন হইতে আড়াল করিয়া রাখিলে চলে না,—তাহাদের কঠিন আঘাত দেওয়াই দরকার। প্রকাণ্ড একটি বিশ্বসত্যের মধ্যে সমস্ত কর্ম্মকে অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানকে আবৃত করিয়া না দেখিলে অসত্যে সত্যে, অনিত্যে নিত্যে এমন গোল পাকাইয়া থাকে যে কাজের পথে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না।

"গোরা"কে বাস্তবক্ষেত্রে ক্রমাগত টানিয়া গ্রামের ভিতরে ঘুরাইয়া নানা উপায়ে তাহার সুকঠিন ভাবের দুর্গটিকে কবির সজোরে ভাঙিতে হইয়াছে সে যে এমন একটি ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া আছে যাহা দেশের কাহারও মধ্যে নাই, তাহার নিজের জন্মবৃত্তান্তই চোখে আঙুল দিয়া তাহাই সর্ব্বশেষে তাহাকে দেখাইয়া দিল। তখন সে ভারতবর্ষকে যে উদার সত্য দৃষ্টিতে দেখিল তাহা

বিশেষভাবে হিন্দুর ভারতবর্ষ নহে কিন্তু সমস্ত মানবজাতির মহা সম্মিলনক্ষেত্র।

রবীন্দ্রনাথকেও এক সময়ে খুব উগ্র স্বাদেশিক উত্তেজনা হইতে সরিয়া আসিয়া আবার দেশকে তাহার যথার্থ স্বরূপে এবং আপনার সাধনাকে তাহার যথার্থ সত্যে দেখিতে হইয়াছিল।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বঙ্গদর্শন সম্পাদনের দ্বিতীয় বৎসরে ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ সালে কবির স্ত্রীবিয়োগ হয়।

এ আঘাত তাঁহার চিত্তকে খুব কঠিন ত্যাগের দিকে আত্মোৎসর্গের দিকেই অগ্রসর করিয়া দিল। তখন হইতেই সংসার হইতে তিনি একপ্রকার বিচ্ছিন্ন। আপনার শক্তি, সামর্থ্য, অর্থ, সময়, সমস্তের দ্বারা তাঁহার ত্যাগের তপস্যাকে পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

স্ত্রীবিয়োগের পর একবৎসর যাইতে না যাইতেই মধ্যমা কন্যার মৃত্যু হইল। তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য যখন তিনি আলমোড়া পাহাড়ে ছিলেন তখন একটি নূতন কাব্য সেখানে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম "শিশু"। পীড়িতা কন্যা, মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী, কবির কাছে পিতার এবং মাতার উভয়ের স্নেহ লাভ করিয়াছিল। সেই একটি গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের মধ্যে আপনার কল্পনাপ্রবণ বালকহৃদয়ের সুখ দুঃখ জাগিয়া এই কাব্যে শিশুজীবনের আনন্দলোককে উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'।"

মায়ের বাল্যের সমস্ত খেলা ধূলা পূজা অর্চ্চনা ও যৌবনের তরুণতার মধ্যে শিশু ছড়াইয়া ছিল—সে একটি বিশ্বের চির নবীনতার রহস্যে মণ্ডিত ভাব—বিশ্বের আনন্দ-উৎস হইতে মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এ সেই বৈষ্ণব মাধুর্য্যতত্ত্ব—ভগবানকে যাহারা বাৎসল্যরসের ভিতর দিয়া দেখে তাহাদের সেই মাধুর্য্যের স্রোতটি ইহার মধ্যে আগাগোড়া প্রবাহিত।

"রঙীন্ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝিরে বাছা কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে জলে রং ওঠে জেগে
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে,
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।"

কবি যে তাঁহার স্বাদেশিকতার অবস্থায় হিন্দুসমাজের গুণ কীর্ত্তন করিতেন, তাহার একটা কারণ এই যে আমাদের দেশের সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে একটা অনন্তের রহস্যবোধ আছে। অনন্ত যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমস্ত সৌন্দর্য্যকে সমস্ত মানবসম্বন্ধকে রন্ধ্র করিয়া আপনার অপরূপ প্রকাশকে ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছেন হিন্দুর চিত্ত সে কথা গভীরভাবে স্বীকার করিয়া থাকে। স্বামীকে তাই দেবতারূপে পূজা করা হিন্দু সতী স্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক, পত্নীর মধ্যেও হিন্দু-স্বামী জগতের সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর প্রতিমা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। পুত্রের মধ্যে গোপাল-রূপে ভগবান পিতার সঙ্গে লীলা করেন, কন্যার মধ্যে তাঁহার অন্নপূর্ণা মাতৃমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। কোন সম্বন্ধই প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়, সে অনাদিকালের সম্বন্ধ, সে জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ এবং তাহারই মধ্যে দেবতার প্রকাশ—হিন্দুর অবতারবাদী ভক্তিপ্রবণ হৃদয় এ কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না। বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিতরকার এইটিই আসল কথা—ভগবানকে নানা রসে নানা সম্বন্ধে উপলব্ধি করা। "নৌকাডুবি" উপন্যাসটি ইহার অনতি-কাল পরেই লিখিত—তাহার মধ্যে এই দিক্‌টাই দেখান হইয়াছে। কমলা যখন জানিল যে রমেশ তাহার স্বামী নহে, তখন এক মুহূর্ত্তেই তাহার রমেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল—সে যে ব্যক্তিকে ভাল বাসে নাই, স্বামীকে ভাল বাসিয়াছে—সেই স্বামী যখন ব্যক্তিবিশেষ নয় তখন তাহার প্রতি হৃদয়ের কোন অনুরাগ তাহার থাকিতেই পারে না। তারপর দাসীবেশে যখন সে আপন স্বামীর আলয়ে ছিল তখনও কেবলমাত্র গোপন পূজার দ্বারা সে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছে, আর কিছুই তাহার পক্ষে প্রয়োজন হয় নাই। হিন্দুভাবের খুব গভীরতার মধ্যে প্রবেশ না করিলে এ রকমের জিনিস কবির হাত হইতে বাহির হইতেই পারিত না।

১৩১২ সালে বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে দেশব্যাপী যে তুমুল

আন্দোলন উপস্থিত হইল। রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সঙ্গীতের দ্বারা, বক্তৃতার দ্বারা, তিনি দেশবাসীর চিত্তকে দেশের আদর্শ ও সত্যের দিকে জাগাইয়া তুলিলেন। তখন স্বাদেশিকতার জীবনের মধ্যাহ্নকাল। কবির বীণা তখন রুদ্রস্বরে বাঁধা তিনি ক্রমাগত ত্যাগের, কঠিন কর্ম্মভার গ্রহণের কথাই আমাদের শুনাইতেছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার যে সকল গদ্য রচনা বাহির হইয়াছে তাহাদের তুলনা নাই। দু'একটি স্থান এখানে তুলিয়া দিলে আশা করি আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিবে না:—

"যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন * * দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোন বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পর্দ্দা একবার একটু উড়িয়া যায়, তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ আমরা দেখিতে পাইব—আমরা কেহই বিচ্ছিন্ন নহি, স্বতন্ত্র নহি দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্র-বিধৌত, হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য এক সুখদুঃখ এক বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জ্জেয়, তাঁহাকে কোন দিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরাজ রাজার প্রজা নহেন, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত— ইঁহার এই সহজমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনই আনন্দের প্রাচুর্য্য-বেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব: তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পরের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু ফল লাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।"

ঐ বৎসরে বিজয়াসম্মিলনের বক্তৃতার অগ্নিময়ী বাণী আমাদের অন্তরে এখনও দু'একটা স্ফুলিঙ্গ রক্ষা করিয়াছে। সে সকল বাণী স্মরণ করিলে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইয়া উঠে:—

"ঈশ্বরের কৃপায় আজ বিজয়ার মিলনকে আমরা নূতন করিয়া বুঝিলাম—এত দিন আমরা তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করি নাই। আজ বুঝিয়াছি যে মিলন আমাদিগকে বরদান করিবে, জয়দান করিবে, অভয়দান করিবে সে মহামিলন গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে নহে, সে মিলন দেশে। সে মিলনে কেবল মাধুর্য্যরস নহে, সে মিলনে উদ্দীপ্ত অগ্নির তেজ আছে—তাহা কেবল তৃপ্তি নহে তাহা শক্তিদান করে।

* * * *

বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই। * * সেই জন্যই আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে, সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে। * * আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেছে, আমাদের গার্হস্থ্য আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম আমাদের সমাজধর্ম্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে— সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল, বাংলাদেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্য হইলাম। * * মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা রাজার কোন প্রসাদ বা অপ্রসাদের উপর নির্ভর করে না—কোন আইন পাশ হউক বা না হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না করুক আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ আমার সন্তান সন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা, শক্তিদাতা, সম্পদদাতা স্বদেশ। কোন মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিব না, কাহারো মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করিলাম। * * যে পথ কঠিন, যে পথ কণ্টকসঙ্কুল সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।"

"খেয়া"র কবিতার এই সময়েই আরম্ভ। এই ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগই—'রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সম্মুখপথে'—কবিতাটিতে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

'যেমনটা যথায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার 'পরে।
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
প'ড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কি মতে।'

"আগমন" কবিতাটিতে "বাংলাদেশের অখণ্ড স্বরূপের" এই প্রচণ্ড আবির্ভাবের কথাই লিখিত হইয়াছে। এই রাজার আগমনের অনেক আভাস ইঙ্গিত অনেক দিন হইতেই পাওয়া যাইতেছিল, তাহার দূতের পদধ্বনিকে বাতাসের শব্দ, তাহার চাকার ঝনঝনিকে মেঘের গর্জ্জন মনে করিয়া দেশ আলস্যে সুপ্ত ছিল। রাজা যখন আসিলেন তখন সমস্ত রিক্ত—কোন আয়োজন নাই। কিন্তু সেই ভাল হইল, দরিদ্র-ঘরে যাহা কিছু আছে তাহাই দিয়া তাঁহাকে বরণ করিতে হইল এই ভাল—ত্যাগ ইহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"দান" কবিতাটিও ঐ একই সময়ের লেখা। তাহাতেও ঐ ত্যাগকঠিন সাধনার রুদ্র গীতি ফুটিয়াছে।

"ভেবেছিলেম চেয়ে নেব
চাইনি সাহস ক'রে
সন্ধে বেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে প'রে
আমি চাইনি সাহস ক'রে।"

মালা লইতে আসিয়া চাহিয়া দেখেন যে

"এ ত মালা নয় গো এ যে
তোমার তরবারি!"

এই তরবারি—এই বেদনা, এই সুকঠিন ত্যাগ ইহাকেই জীবনময় গ্রহণ করিবার কথা "খেয়া"র আরম্ভের কথা।

এমন সময় হঠাৎ কবি আন্দোলন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। ন্যাশন্যাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল উদ্যোগের অগ্রণী হইয়া, পল্লীসমিতি, স্বদেশী সমাজ প্রভৃতি গঠনের প্রস্তাব ও পরামর্শ ও কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া যখন সমস্ত কর্ম্ম হইতে তিনি সরিয়া পড়িলেন তখন তাঁহার পরম ভক্তগণও একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন! এ একেবারে অপ্রত্যাশিত। বেশ মনে আছে দেশের লোকের কাছে ইহার জন্য তাঁহাকে কি নিন্দাবাদ কি বিদ্রূপই সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কেন এরূপ করিলেন?

ইহার উত্তর আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। তিনি একদিকে ক্রমাগত আপনার কল্পনা-রচিত ভাবের মধ্যে দেশকে যেরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া সে ভাব বাস্তবের আঘাতে ক্রমাগতই ভাঙিয়া যাইবার দশায় পড়িয়াছিল। অন্যদিকে যে তপোবনের বিশ্ববোধের সাধনায়, আপনাকে সকল হইতে বঞ্চিত করিয়া সকলকে আপনার মধ্যে অনুভব করিবার সাধনায় তিনি তপস্যা করিবেন সংকল্প করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই চিরজীবনের তপস্যা কর্ম্মের সাময়িক উত্তেজনায় ও উন্মত্ততায় আবিল হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম করাতেই তাঁহার ক্ষুধিত চিত্ত আপনাকে সকল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে দ্বিধা মাত্র বোধ করিল না।

এই ঘটনাই কবি-জীবনে বারম্বার ঘটিয়াছে। কেবলি বন্ধনে জড়ানো এবং কেবলি বন্ধন ছিন্ন করা। কখনো সৌন্দর্য্যে, কখনো প্রেমে, কখনো স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্রে—যখনি যাহাতে ঢুকিয়াছেন কি তীব্র আবেগে তাহাদের অনুরঞ্জিত করিয়া অপরূপ করিয়া দেখিয়াছেন—বাস ঐখানেই সমাপ্তি! বীণায় যেই তাহার পরিপূর্ণ সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে, অমনি কি তার ছিঁড়িল এবং আবার নূতন তারে নূতন গান গাহিবার জন্য সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

"খেয়া"র অবশিষ্ট কবিতায় আবার একটি নূতন অপেক্ষার বেদনা।

"আমার গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি লগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
সোনার গগন রে।"

স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্রের কাছে এবারে বিদায়:—

"বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি ত আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে
জয়মাল্য লও না তুলি গলে
আমি এখন বনচ্ছায়া-তলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।
* * * *
মেঘের পথের পথিক আমি আজি
হাওয়ার মুখে চ'লে যেতেই রাজি
অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে,
তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।"

আবার সেই সর্ব্বানুভূতির কথা! আমি আমার এই প্রবন্ধের গোড়ায় বলিয়াছিলাম যে এই সর্ব্বানুভূতিই কবির জীবনের ও কাব্যের মূল সুর। তাঁহার বীণায় সরু মোটা অন্যান্য তারে কখনো প্রেমের কখনো সৌন্দর্য্যের কখনো স্বদেশানুরাগের বিচিত্রগম্ভীর বিশ্বব্যাপী সুদূরবিস্তৃত ঝঙ্কার বাজিয়াছে, কিন্তু সকল সুর ছাপিয়া এই সর্ব্বানুভূতির মূলরাগিণীই কেবলি জাগিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। জলস্থল আকাশ, সমস্ত মনুষ্যসমাজকে আপনার চৈতন্যের আনন্দময় বিস্তারের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধির জন্যই তিনি এই তপোবন গড়িয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত এই আশ্রমেরও গভীরতর সাধনাটি কি তাহা তাঁহার ধারণার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আশ্রমের সঙ্গে যাঁহারা দীর্ঘকাল সংযুক্ত আছেন তাঁহারা জানেন যে স্বাদেশিক উত্তেজনার একটা ঢেউ ইহার উপর দিয়াও বহিয়া গিয়াছিল।

জানিনা বিধাতা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির চিত্ত-বীণাকে কেমন নিগূঢ় উপায়ে একই ছন্দে বাঁধিয়া দিয়াছেন -- যে জন্য কোন খণ্ডতার মধ্যে তাঁহার চিত্ত দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না, নানা পথ ঘুরিয়া অবশেষে আবার ইহারি মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

"আকাশ ছেয়ে মন ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশী।
লাগল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,
একটি কথা পরাণ জুড়ে বাজে
ভালবাসি হায় রে ভালবাসি
সবার বড় হৃদয়-হরা হাসি।"

কিন্তু এ ওজর তো দেশের লোকে শুনিবে না। এ যে কর্ম্মভীকতা নয়, কিন্তু কর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া জীবনকে অনন্তের মধ্যে আনন্দের মধ্যে একেবারে বিলীন করিয়া দেওয়া, এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার নয় :-

তাই

'আমার দলের সবাই আমার পানে
চেয়ে গেল হেসে"

কিন্তু আমি --

"লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই
মনের মাঝে সাড়া না পাই
মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে,
পাখীর গানে বাঁশীর তানে
কম্পিত পল্লবে।
*   *   *
ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হ'লেম পথের পরে
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ায় গন্ধে গানে।"

তখন দেখি আর একটি গভীর নিবিড় স্পর্শ সেই বিপুল বিরতির ভিতর হইতে পাওয়া গেল :--

"চেয়ে দেখি, কখন্ এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়র দেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি।"

আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে এ কথা মনে করা ভুল হইবে যে আপনার চিরাভ্যস্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবি-প্রকৃতির জন্য তিনি এমন করিয়া স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইলেন। ভোগের জীবন অনেক দিনই শেষ হইয়া গেছে—সে আমরা 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা'তেই দেখিয়া আসিয়াছি, কর্ম্মের জীবন যখন তাহার সর্ব্বোচ্চ সফলতা লাভ করিয়াছে তখন সেই কর্ম্মের ফল হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার মধ্যে একটা কঠিন আত্মপীড়ন আছে সে কথা আপনারা বিস্মৃত হইবেন না। সেই পীড়া এবং মুক্তির আনন্দ —সেই বৃহৎ উদার বিশ্বভুবনের মধ্যে আপনার অস্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিবার বৃহৎ আনন্দ এ দুইই খেয়ার কবিতার মধ্যে একসঙ্গে আছে। "কৃপণ" বলিতেছে আমি কেবল পাইতেই থাকিব এই আশায় রাজার দর্শনে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু তিনি যখন আমার কাছে চাহিলেন তখন বেশি কিছু দিতে পারিলাম না। একটি কণা মাত্র দিলাম। ঘরে আসিয়া দেখি তাহাই সোনা হইয়া গেছে। তখন কাঁদিয়া বলি

তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য ক'রে।"

তার মানে, আপনার দিকে কিছুই রাখিলে চলিবে না—আমার কাজ আমার দেশ, আমাদের সফলতা, আমাদের শক্তি—আমার আমার এই বন্ধনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বভুবনের নিবিড় আনন্দস্বরূপ, জীবনের সেই অধীশ্বর নাই—এইটিকেই খুব শক্ত আঘাতে ছিন্ন করিলে তখনই তাহার আবির্ভাব সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

'তেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটিব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে।

আপনার বন্ধনই বন্ধন, এই আপনাকে যত বড় নামই দাও—তাহাকে যত জ্ঞান যত কর্ম্ম যত মহত্ত্ব যত সৌন্দর্য্য দিয়াই আবৃত কর না কেন, সে "বন্দী"র অবস্থা—আপনার কৃতকীর্ত্তির মধ্যে আপনি বন্দী হইয়া থাকা। "বন্দী" কবিতাটিতে কবি তাহাই বলিতেছেন—

"ভেবেছিলাম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি রব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস
তাই গ'ড়েছি রজনী দিন
লোহার শিকলখান
কত আগুন কত আঘাত
নাইক তার ঠিকান।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর।"

"ভার" কবিতাটিতেও ঐ একই কথা। আপনার দিকেই সমস্ত ভার—তাঁহার দিকেই মুক্তি।

"এ বোঝা আমার নামাও
বন্ধু নামাও
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চ'লেছি
এ যাত্রা মোর থামাও।"

"খেয়া"র আর একটি মাত্র কবিতার উল্লেখ করিয়া আমার এ দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। সেটি "সব পেয়েছির দেশ।"

উপনিষদে অনন্ত সত্যস্বরূপকে আনন্দের দ্বারা উপলব্ধি করিবার কথা আছে। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে—বাক্য যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়—আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—ব্রহ্মের সেই আনন্দকে জানিয়া সাধক কিছু হইতেই ভয় পান্ না।

উপনিষদ আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধিকে কেবল অন্তরের জিনিস করিয়া রাখেন নাই। উপনিষদে নিখিল সত্যের সঙ্গে আনন্দের পরিপূর্ণযোগ সত্যের সঙ্গে রসের কোন বিচ্ছেদ নাই। এই রস পাইয়াই লোকে আনন্দী হয়।

সেই জন্য এই অনন্ত সত্য এবং অনন্ত আনন্দকে উপনিষদ এষঃ বলিয়াছেন। এষঃ অর্থে ইনি। এষহ্যে বানন্দয়াতি। ইনিই আনন্দ দিতেছেন। ইনি কে? ইনি কোথায়?

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ—ইনি এই যে অধে, ইনি এই যে উৰ্দ্ধে ইনি এই পশ্চাতে ইনি এই সম্মুখে ইনি দক্ষিণে ইনি উত্তরে—এই সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্—অনন্ত আনন্দে অনন্ত অমৃতে পরিপূর্ণ।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে জগতের এই রসময় উপলব্ধি কবির একেবারে প্রকৃতিগত জিনিস। বস্তুত সেই জন্য উপনিষদের মধ্যে কবি যত মজিয়াছেন এমন আর দ্বিতীয় কোন গ্রন্থের মধ্যে নহে।

"সব পেয়েছির দেশ" এই এষহ্যেবানন্দয়াতির উপলব্ধির কবিতা।

আমরা জানি যে সৌন্দর্য্য-বোধ যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ না হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে ভোগপ্রবৃত্তির মোহ মিশিয়া থাকে—ততক্ষণ আমরা অপরূপ কাল্পনিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য্যকে সৌন্দর্য্য বলি এবং শুচিবায়ুগ্রস্তের ন্যায় পৃথিবীর বারো আনা জিনিসেই সৌন্দর্য্যের অভাব দেখিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকি। কবির প্রথম অবস্থার কাব্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধের এই তীব্রতা ছিল, তখন সৌন্দর্য্যবোধ বিশ্বমঙ্গলের সঙ্গে বিশ্বসত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয় নাই। 'ক্ষণিকায়' আমরা প্রথম দেখিলাম ভোগবিরত সরল গ্রাম্য সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি। 'চৈতালী' হইতে সুর বদলাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু 'ক্ষণিকা'তেই শেষাশেষি সৌন্দর্য্যের "কল্যাণী" মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বর মালা।"

তারপর ক্রমেই এই কল্যাণময় সৌন্দর্য্যবোধ বিশ্বসত্যের সঙ্গে মিলিত হইতে চলিয়াছে। 'সব পেয়েছির দেশে' ক্ষণিকা হইতে আর এক ধাপ উপরে গিয়াছে। এখানে, যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই পরিপূর্ণ আনন্দরূপ—উপনিষদের এই কথাই কবির উপলব্ধির মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এই 'সব পেয়েছির দেশে' অসাধারণত্ব কিছুই নাই—সুতরাং

"এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কি আছে এই
সব পেয়েছির দেশে।"

তবে সব পেয়েছি কিসে?

এই যে—

"পথের ধারে ঘাস উঠেছে
গাছের ছায়াতলে",

এই যে—

"স্বচ্ছ তরল স্রোতের ধারা
পাশ দিয়ে তার চলে",

এই যে—

"কুটীরেতে বেড়ার পরে
দোলে ঝুমকা লতা
সকাল হ'তে মৌমাছিদের
ব্যস্ত ব্যাকুলতা।"—

ইহারি মধ্যে সব পেয়েছি, ইহারি মধ্যে পরমাতৃপ্তি, এই খানেই কবি তাঁহার শেষ জীবনের কুটীরখানি তুলিয়াছেন।

এই সাধনার মধ্যে কবি যে এখনও নিমগ্ন হইয়া আছেন—এই সকল সত্যকে রসময় করিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার সাধনায়, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতিকে মানব ইতিহাসকে একের মধ্যে অখণ্ড করিয়া বোধ করিবার সাধনায়—তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? 'রাজা' নাট্যে সৌন্দর্য্যবোধের পরিপূর্ণতার অভাবের বেদনা সুদর্শনার চরিত্রের মধ্যে কবি দেখাইয়াছেন—সে সুবর্ণের চোখ-ভোলানো রূপ দেখিয়া মজিল এবং তাহার স্বামীর 'সব রূপ-ডোবানো রূপ'কে প্রবৃত্তির মোহে পড়িয়া অবজ্ঞা করিল—সেই আপনার প্রকৃতির বিশেষ একটি আবরণের মধ্যে বাঁধা থাকিবার জন্য, সেই প্রবল আত্মাভিমানের জন্য তাহার কী জ্বালা কী ভয়ঙ্কর ছট্‌ফটানি! তাহার উল্টা দিকে ঠাকুর্দ্দার চরিত্রে কবি সকলের মধ্যে একটি অবাধ প্রবেশের আনন্দের ভাবকে কী উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ঠাকুর্দ্দা এই নিখিল উৎসবের প্রাঙ্গনে 'ফোটা ফুলের মেলার' সঙ্গে সঙ্গে 'ঝরা ফুলের খেলা' দেখিতেছেন—নানা বিচিত্র লোকের সকল বিচিত্রতার সুরই যে একতানের মধ্যে সম্মিলিত হইতেছে ইহা অনুভব করিতেছেন।

"কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ।
দিবা রাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ।"

কিন্তু সুদর্শনার যে অহঙ্কারের চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার মূল্য আছে। 'রাজা' নাট্যের ভিতরে এই অহঙ্কারের বিশেষ একটি তত্ত্ব আছে। ইহা যদিচ আমাদের নিজের ভালবাসার এক একটি বিশেষ আয়োজনের মধ্যে ক্ষণকালীন তৃপ্তি দিয়া অবশেষে দশগুণ অতৃপ্তির বেদনাকে জাগায়, তথাপি এই অহঙ্কারটিই আমাদের জীবনের সেই রাজার সেই স্বামীর কামনার ধন। তিনি চান্ যে এইটিই তাঁর পায়ে আমরা বিসর্জ্জন করি—সেইজন্য সুদর্শনা যখন তাঁহাকে আঘাত করিয়া চলিয়া গেল, তিনি তাহাকে নিবারণ করিলেন না। তিনি তাহাকে সাত রাজার সাত রিপুর টানাটানির হাত হইতে রক্ষা করিলেন, কিন্তু দেখা দিলেন না। তিনি জানেন যাহার যতখানি অহঙ্কারের আয়োজন তাহার বেদনার গভীরতা ততখানি বেশী এবং বেদনা অন্তে তাঁহার সঙ্গে মিলনও তাহার ততই সম্পূর্ণতর।

সুরঙ্গমা সরল বিশ্বাসী ভক্তের একটি চিত্র। তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্রতা নাই। সে এক সময় পাপের পথে গিয়া পড়িয়াছিল, তারপর রাজার দাসী সাজিয়া সকলের সেবায় সে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে।

সে সুদর্শনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সেই সরল ভক্তির সুরটি হিমবিন্দুর মত তাহার ক্ষুব্ধ অভিমানের শিখার উপরে ধরিতে লাগিল। অহঙ্কারের আগুন যখন বেদনার অশ্রুজলে নিভ নিভ হইয়া আসিল তখন বেদনার মধ্যে সেই স্বামীর গোপন বীণা সুদর্শনার ভিতরে ভিতরে বাজিতেছিল এবং সেই বীণার সুরে বিগলিত হৃদয় যখন ধূলামাটীর মধ্যে সকলের মধ্যে নম্র নত হইয়া আপনাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিল তখনই রাজার সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন ঘটিল।

বাংলা দেশ ধন্য যে এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন তাহার সম্মুখে স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে এমন করিয়া উদ্ঘাটিত হইল।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা, আমাদের দেশের সাধনা, আমাদের সৌন্দর্য্যের সাধনা, আমাদের ধর্ম্মের সাধনা কালে কালে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই এই জীবনটির আদর্শ জাজ্জ্বল্যমান হইয়া আমাদিগকে সকল সাধনার অন্তরতর ঐক্য কোথায়, সকল খণ্ডতার চরম পরিণাম পরম পূর্ণতা কোথায় তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে বিশ্বমানবের বিচিত্র সভ্যতার সকল আয়োজন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন যখন এই ভারতবর্ষে বিচিত্র অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবার জন্য সমাগত হইবে, তখন ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে এই অখ্যাত বাংলাদেশের মহাকবির মহান্ আদর্শের উপর পড়িবেই এবং বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রপথে নাবিকের চক্ষের সমক্ষে অন্ধকার রজনীতে ধ্রুবতারার দীপ্তির ন্যায় এই পরিপূর্ণ আদর্শের দিক্‌দিগন্তব্যাপী রশ্মিচ্ছটা সকল সংশয়ের অন্ধকারকে দূর করিবে।

(সমাপ্ত)

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

গীতাপাঠের ভূমিকা

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রথমে সাংখ্যসম্মত তত্ত্বজ্ঞানের সার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন; তাহা এই যে, শরীর কৌমার হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে, বার্দ্ধক্য হইতে মৃত্যুতে পদনিক্ষেপ করিতে থাকে—ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের সাক্ষী যিনি আত্মা তিনি প্রকৃতির কোনো পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত হ'ন না। কিন্তু আত্মা স্থির আছেন জানিয়া তুমি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের স্রোতে বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত হইতে না দিয়া তোমাকে করিতে হইবে কর্ম্মের পর্ব্বত আরোহণ; তাহার শিখরে যখন উত্থান করিবে তখন তোমার অন্তর্নিগূঢ় জ্ঞান এবং আনন্দ পরিষ্কাররূপে দীপ্তি পাইবে। তুমি চক্ষুষ্মানই হও, আর অন্ধই হও, তোমাকে গন্তব্য পথ অতিবাহন করিতেই হইবে। তুমি যদি চক্ষুষ্মান হইয়াও পথ দেখিয়া না চলিয়া ক্রমাগতই খানায় ডোবায় পা-পিছলিয়া পড়িয়া যাইতে থাক', তাহা হইলে তোমার চক্ষু থাকা না থাকা সমান। তুমি যদি ইংরাজি ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও **একটা** ইংরাজি কহিতে **দশটা** ব্যাকরণ-ভুল কর তবে সেরূপ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা মূর্খত্ব ভাল। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া কর্ম্মের পার্ব্বত্য-পথের যাত্রীদিগের পক্ষে যাহা একান্তপক্ষে অবলম্বনীয় এইরূপ একটি আশ্রয় দণ্ড তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে আশ্রয়দণ্ড হ'চ্চে অবিচলিতভাবে আত্মাতে স্থিতি যাহার আর এক নাম যোগ। পাতঞ্জল-দর্শনে যোগশব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এইরূপ ;

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানং।"

যোগ কি? না চিত্তবৃত্তির নিরোধ। তাহাতে ফল হয় কি? না, স্বরূপে অবস্থান, অর্থাৎ আত্মা ঠিক আপনি যাহা তাহাতেই ভর করিয়া দাঁড়ানো। ভাব এই যে, অসংযত মন ক্রমাগতই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, একদণ্ডও স্থির থাকে না; জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনকে স্থির করা চাই। কচ্ছপ যেমন আপনার বহির্ম্মুখী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে টানিয়া লয়, সেইরূপ বহির্ম্মুখী মনোবৃত্তি সকলকে ভিতরে টানিয়া লইয়া আত্মাতে সমাহিত করা চাই। এই জায়গাটিতে গোড়াতেই এই একটি প্রশ্ন আমাদের মনে সহজেই উত্থিত হয় যে, জ্ঞান নানাপ্রকার যেমন সঙ্গীত-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ইত্যাদি। মানিলাম যে, সঙ্গীত-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে গীতের স্বরলহরীর প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; জ্যোতিষ-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহাদির গতিবিধির প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; রসায়ন-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে দ্রব্যাদির সংযোগ-বিয়োগ-মূলক রূপান্তর সংঘটনের প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; এইরূপে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের চরিতার্থতা সাধন করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ বিষয়-ক্ষেত্রে মন স্থির করা আবশ্যক তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তুমি বিষয়-বিশেষে মন স্থির করিতে বলিতেছ না—তুমি বলিতেছ আত্মাতে মনস্থির করিতে; ইহার তাৎপর্য্য যে কি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ;—মনে কর, তুমি তানসেনের নিকটে বেহাগ রাগিণীর একটি গান শিক্ষা করিতেছ, আর মনে কর যে, সেই গানটির সমের জায়গার সুরটি নিরন্তর তোমার মনঃকর্ণে বাজিতেছে—উহার আর কোনো সুরের প্রতি তোমার তেমন মন বসিতেছে না; এরূপ হইলে, বেহাগ-রাগিণী গাহিতে শেখা যে, তোমার ভাগ্যে কোনো কালে ঘটিয়া উঠিবে তাহার কোনো সুরাহা দেখিতেছি না। তুমি যদি বেহাগ রাগিণীর গান গাহিবার সামর্থ্য উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা কর, তবে বেহাগ রাগিণীর গীতের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে বেহাগ-রাগিনীর মুখ্যভাবটি চুনিয়া লইয়া তাহারই প্রতি মনসমাধা করা তোমার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। সা গা মা পা নি এই পাঁচটি স্বর যেমন বেহাগ-রাগিণীর অন্তর্ভূত, তেমনি সমস্ত বিজ্ঞান মোট জ্ঞানের অন্তর্ভূত। একদিকে যেমন দীপালোকিত ঘরের মধ্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দ্রব্যাদি দীপনির্গত ভিন্ন-ভিন্ন রশ্মিচ্ছটার আলোকে প্রকাশিত হয়, এবং আর একদিকে যেমন দীপশিখার সঙ্গাশ্রিত মোট দীপরশ্মি আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত; সেইরূপ একদিকে জ্যোতিষাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখা-তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের অর্থাৎ ফ্যাঁকড়া-জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত হয়, আর একদিকে

আত্মার সঙ্গাশ্রিত মোট জ্ঞান আপনাতে আপনি প্রকাশিত। আত্মার সঙ্গাশ্রিত সেই যে জ্ঞান যাহা আপনাতে আপনি প্রকাশিত তাহারই নাম আত্মজ্ঞান- আত্মজ্ঞানই মোট জ্ঞান। দীপের সমস্ত ফাঁকড়া রশ্মিজাল যেমন দীপশিখার সঙ্গাশ্রিত মোট রশ্মির অন্তর্ভূত, তেমনি সমস্ত ফ্যাঁক্ড়াজ্ঞান বা বিজ্ঞান আত্মাশ্রিত মোট জ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত। উপনিষদে স্পষ্টই লেখা আছে যে, অপরা

ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

অর্থাৎ অপরাপর বিদ্যা অপরা বিদ্যা, ব্রহ্ম বিদ্যাই পরাবিদ্যা। যেমন বেহাগের গীত গাহিবার সময় সেই রাগিণীর মুখ্য ভাবটির মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হইয়া আরোহী এবং অবরোহী পদ্ধতি অনুসারে স্বর সপ্তকে বিচরণ করিতে হয়, তেমনি জ্ঞানের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে আত্মার মূখ্যতম জ্ঞান এবং আনন্দে দৃঢ়রূপে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করা বিধেয়। কেননা, তাহা হইলেই কর্ম্মধন্দার প্রতিযোগে আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান, স্বাধীন স্ফূর্ত্তি এবং সদানন্দ অনুপম সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া বাহির হইতে পথ পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাংখ্যের উপদেশ দিয়া তাহার পরে যোগের উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক বই দুই নহে কুরুনন্দন, পরন্তু অব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধি বহুশাখা এবং অনন্ত।" এই কথাটির একটি উপমা দিতেছি তাহার আলোকে উহার তাৎপর্য্য শ্রোতৃগণের চক্ষে পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইবে।

মনে কর যে, দেশের রাজা দূত-মুখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ প্রচার করিলেন যে, ঠিক্ বেলা দশটার সময় তুমি রাজপরিষদে উপস্থিত হইতে চাও। এক মুহূর্ত্তও যেন বিলম্ব না হয়; আর, মনে কর, রাজসভায় যাইবার জন্য তুমি সাজিয়া বাহির হইয়াছ। ইতিমধ্যে তোমার দুই বয়স্য রাজদর্শনের অভিলাষী হইয়া তোমার সঙ্গে যুটিলেন। মনে কর, রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণের চরমপ্রান্ত হইতে প্রাসাদের তোরণ-দ্বার পর্য্যন্ত ডাহিনদিক্ দিয়া তিনটি শান-বাঁধা বক্রপথ ঘুরিয়া গিয়াছে, আর বামদিক্ দিয়া ঐরূপ আর তিনটি বক্রপথ ঘুরিয়া গিয়াছে। তোমার সঙ্গী দুজনার মধ্যে ঘোরতর তর্কবিতর্ক চলিতে আরম্ভ হইল। রামবাবু বলিলেন বামদিকের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়; শ্যামবাবু বলিলেন দক্ষিণদিকের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়; এ তর্কের আর কিছুতেই মীমাংসা হইতেছে না; এদিকে সময় যাইতেছে; তোমাকে ঠিক দশটার সময়ে রাজপরিষদে উপস্থিত হইবে; তুমি বলিলে, "তোমরা বলিতেছ নানা কথা- ঘড়ি কি বলে দেখি", ঘড়ি বলিল, "৯টা বাজিয়া পঞ্চাশ মিনিট"। তুমি বলিলে "সর্ব্বনাশ!" বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তুমি সম্মুখের সাধা রাস্তা দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া রাজপরিষদে উপস্থিত হইলে; যেই তুমি রাজার সম্মুখে জোড়করে দণ্ডায়মান হইয়াছ, আর অমনি ঢং ঢং শব্দে দশটার ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইল। বহিঃপ্রাঙ্গণের চরমপ্রান্ত হইতে প্রাসাদের তোরণদ্বারে যাইবার বাঁকা-পথ ডাহিনে বামে তিন তিনটি, কিন্তু সোজা-পথ সম্মুখে একটি মাত্র যদিচ সে পথ কাটিয়া প্রস্তুত করা নাই। কর্ত্তব্যকার্য্যের অলঙ্ঘনীয় অনুরোধে তুমি সেই অপরিচিহ্নিত সোজা পথটি অবলম্বন করিয়া রাজাজ্ঞা-পালনে কৃতকার্য্য হইলে; আর, তোমার সঙ্গীদুজনার তর্কবিতর্কের কিছুতেই মীমাংসা না হওয়াতে, তাহাদের ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটিয়া উঠিল না। রাজবাটীতে যাইবার সোজা পথ যেমন এক বই দুই নহে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্যকরী বুদ্ধি তেমনি এক বই দুই নহে; পক্ষান্তরে, রাজবাটীতে যাইবার বাঁকা পথ যেমন অসংখ্য, অব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধি (অর্থাৎ অকেজো লোকের বুদ্ধি) তেমনি অসংখ্য এবং তাহার ডালপালা অনেক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ফলকামী স্বর্গলোভী মূঢ় পণ্ডিতেরা বেদের দোহাই দিয়া এই যেসকল কথা বলেন যে, নানাবিধ বহুমূল্য উপকরণের আয়োজন করিয়া খুব ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে পরজন্মে তোমার ভোগৈশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা থাকিবে না" এইসকল পুষ্পিত বাক্যাবলীর ছটাতে যাহাদের মন অপহৃত হয় সমাধি প্রবণ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাহাদের নিকটে সমাদর প্রাপ্ত হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, আমাদের দেশের বড় মিয়া ছোট মিয়া প্রভৃতি ওস্তাদ গায়কেরা রাগরাগিণী

ভাঁজিবার সময় মুদ্রাদোষ সহকারে প্রভূত পরিমাণে গিট্‌কিরি জারি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বাহবা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, ঐ সকল ওস্তাদি ঢঙের গিট্‌কিরি বাজিতে রাগরাগিণীর মুখ্য ভাব মাধুর্য্য সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া মারা পড়ে, তা বই, তাহা বিধিমতে ফুটিতে পথ পায় না। আমাদের দেশের তেমনি অনেকানেক মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান বাজে ক্রিয়াকলাপে এরূপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত যে, তাহার মুখ্য অঙ্গের ভাব-সৌন্দর্য্য কৃত্রিম অলঙ্কারের বোঝায় চাপা পড়িয়া তাহার প্রাণবধ হইয়া যায় —তাহা মুহূর্ত্তেকের জন্যও মাথা তুলিতে অবকাশ পায় না। রাগরাগিণীর মুখ্য ভাবটির প্রতি যাহারা মনকে সমাহিত করিয়া গান করেন, তাঁহাদের গানের মধ্য দিয়া রাগরাগিণীর সেই মুখ্য ভাবটির অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হয়; পক্ষান্তরে, যাঁহারা গিট্‌কিরি বাজি প্রভৃতি বাজে অলঙ্কারের প্রতি মনকে সমাহিত করিয়া গান করেন, তাঁহাদের গানের মধ্য দিয়া রাগরাগিণীর ভাব সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিজের নিজের ওস্তাদি মস্তক উত্তোলন করিয়া এবং বক্ষ স্ফীত করিয়া দণ্ডায়মান হয়। বাজে বিষয়েতে মনকে ঘুরাইয়া বেড়ানো একপ্রকার গিট্‌কিরি বাজি; আর, আত্মার সহজ জ্ঞান এবং সহজ আনন্দে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অনাসক্ত ভাবে বিষয়ক্ষেত্রে মনকে বিচরণ করানো একপ্রকার রাগরাগিণীর মুখ্যভাবটির প্রতি মনকে তদ্গতভাবে সমাহিত করিয়া তাহার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলা। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির পরিচালনা-কার্য্যে পরিপক্বতা লাভ করিতে হইলে বুদ্ধির মূলস্থিত সহজ জ্ঞান এবং আনন্দে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কিরূপে অনাসক্তভাবে মনকে বিষয় ক্ষেত্রে বিচরণ করাইতে হয় —অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "বেদশাস্ত্র ত্রৈগুণ্য বিষয়ক—তুমি অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও। নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হও, যোগ-ক্ষেমের ভাবনা হইতে বিরত হও—অর্থাৎ কি খা'ব কি পরিব এসকল বিষয়ে চিন্তা করিও না—আত্মবান্ হও অর্থাৎ তোমার ভিতরে যে আত্মা জাগিতেছে কার্য্যে তাহার পরিচয় দাও।" এ জায়গাটির ভাবার্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ত্রিগুণ পদার্থ টা কি, সগুণই বা কাহাকে বলে নির্গুণই বা কাহাকে বলে এসমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা চাই। এ বিষয়টি বুঝিতে হইলে শাস্ত্র-ঘটিত কতকগুলি সার সার কথার পর্য্যালোচনা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। আগামী বারে ঐ দুরূহ বিষয়টিতে হাত দেওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি-প্রিয়া

বাজায়ে কাঁকণ বাঁকায়ে আনন
কহিল কবির প্রিয়া,
"থাক্, কাজ নাই, আমি তবে যাই,
থাক কবিতারে নিয়া।
কবিতা তোমার বড় আপনার,
বড় সাধনার ধন,
নিভৃতে এবার সেবা কর তা'র
সঁপিয়া পরাণ মন।"
কবি কহে—"কেন অভিমান হেন,
কেন অকরুণ বাণী!
দিবসে নিশাথে জাগে শুধু চিতে
তোমারি মূরতিখানি।
নিখিলের শত শোভায় সতত
জড়িত তোমারি ছবি;
কবিতার ছলে প্রতিমা বিরলে
গড়ি' তব—আমি কবি।
ভাষা—সে তোমার মাধুরী অপার
চাহে বিকাশিতে, সতি,
ছন্দ—সে তব মঞ্জীর-রব,
যতি—লীলায়িত গতি।
কবিতা তোমার ছায়া সুকুমার—
মর্ম্ম কহিনু গূঢ়,
কায়া ছাড়ি' কেবা ছায়া করে সেবা,
—কে আছে এমন মূঢ়!"

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

সূচনা।

ধর্ম্মজগতের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুগে যুগে এক বা ততোধিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানবমণ্ডলী যখন পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়, তখন তাহাদিগকে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিবার জন্য, যে সকল আদর্শচরিত্র সাধুপুরুষগণের অভ্যুত্থান হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মমত বা উপদেশাবলী অভিব্যক্তির প্রথম ভাগে উপেক্ষিত হইলেও, মানবজাতি যখন উহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহারা অবনত মস্তকে নবাবির্ভূত মহাপুরুষগণের শিষ্যত্ব গ্রহণে এক একটা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গঠন করিয়া ফেলে। অনেক স্থলে ঐ সকল প্রেরিত পুরুষগণ তাঁহাদের অভীপ্সিত মাঙ্গলিক ব্রতের অনুষ্ঠানকালে কঠোর নির্য্যাতন ও তীব্র সমালোচনার ঘাত প্রতিঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন আমরা এ প্রমাণও পাইয়া থাকি।

আদি পিতা হজরত্ আদম হইতে প্রেরিত পুরুষ হজরত মহাম্মদের সময় পর্য্যন্ত অধিকাংশ পয়গম্বরগণ স্বদেশবাসী স্বজন কর্ত্তৃক কিরূপ লাঞ্ছিত এবং উপেক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসজ্ঞ বুধগণের অবিদিত নাই। আবার হজরত্ মহাম্মদের তিরোধানের পর, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম হাম্বল, তাপস-কুল গৌরব আবদুল কাদের জিলানী এবং ইমাম মহাম্মদ গজ্জালী প্রভৃতি মহাত্মাগণ তাঁহাদের সমসাময়িক এক শ্রেণীর মোসলমানগণের অযথা কটূক্তি ও উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই।

ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মত পর্য্যালোচনা করিলে, মহা প্রলয়ের পূর্ব্বে একজন ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হইবার বিষয় উল্লেখ থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সে কথা পবিত্র কোরান ও হাদিসে কোথাও প্রকাশ্য কোথাও বা রূপক ভাবে বর্ণিত আছে। হিন্দু, খৃষ্টানধর্ম্মেও এক একজন ভাবী সংস্কারকের আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু সেই সেই সংস্কারকের নাম, বংশ, প্রকাশের স্থান ও কাল (১) এবং কার্য্যাবলী সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশকগণের ব্যাখ্যায় পরস্পরের সহিত কথঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। সেই সংস্কারকের নাম, কোথাও "মোহ্‌দী" (২) কোথাও "ইব্‌নে মরিয়ম" "মসিহ্" কোথাও বা "কল্কি অবতার" নামে বর্ণিত হইয়াছে।

মোহ্‌দীর প্রকাশের পূর্ব্বলক্ষণ মধ্যে একটা লক্ষণ এই যে একই রমজান মাসের মধ্যে প্রথম ভাগে চন্দ্রগ্রহণ ও মধ্যভাগে সূর্য্যগ্রহণ হইবে (৩) এবং এরূপ দুবার হইবে। তাহা বিগত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ১৩ই রমজান চন্দ্রগ্রহণ, ২৮শে রমজান সূর্য্যগ্রহণ হয়। তাহার পর বৎসর আমেরিকায় ঐরূপ যুগল গ্রহণ দৃষ্ট হয়। এরূপ ঘটনার উল্লেখ আর কখনো শ্রুত হওয়া যায় না।

এই প্রবন্ধের উপরিভাগে যে মহাত্মার নাম লিখিত হইয়াছে, তিনি এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের অন্তঃপাতী জেলা গুরুদাসপুরের অধীন কাদিয়ান গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, এজন্য তিনি কাদিয়ানী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন; তাঁহার আসল নাম মির্জা গোলাম আহমদ। তিনি আপনাকে শাস্ত্রোক্ত 'মোহ্‌দী' বলিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রচার করতঃ আরবী, উর্দ্দু,

(১) শাহ অলিউল্লা মহাদ্দেস্ দেহলবী ও হজরত নেয়ামতুল্লা অলি প্রভৃতি সাধুগণ "মোহ্‌দীর" আবির্ভাবের সময় হিজরী ১৩শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (হোজজল্ কেরামা—৩৯৮ পৃঃ)।

(২) মোহদী – পথপ্রদর্শক। মাহদী – পথপ্রাপ্ত। (লোগাত-ই-কিশ্‌ওরী ও থেয়াস অভিধান দেখ)।

(৩) এতদ্বিষয়ক হদিস "হোজজল্ কেরামা" নামক পার্শী পুস্তকের ৩৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এতৎসম্বন্ধীয় হদিস হজরত জয়নল্ আবেদিনের পুত্র মহাম্মদ বাকেরের বর্ণিত মতে দারে কুৎনী নামক হদিস গ্রন্থে ও বয়হকী আপন হদিস গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। মোহ্‌দীর প্রকাশের ও মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ মধ্যে কয়েকটী এই—

(ক) অধিকাংশ লোকে কোরান অনুসারে কাজ করিবে না।

(খ) পৃথিবীতে খৃষ্টানসম্প্রদায়ের প্রাধান্য হইবে।

(গ) লেখাপড়ার চর্চ্চা বেশী হইবে।

(ঘ) সুরাপান; অবৈধ সংসর্গ; জারজ সন্তানের প্রাবল্য; পাত্‌-স্নেহের লাঘব; মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান; ব্যবসা বাণিজ্যের আধিক্য হইবে।

(ঙ) সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে আন্দোলন হইবে।

(চ) খনির আবিষ্কার, আরবে উষ্ট্রের পরিবর্ত্তে অন্য যান (রেলগাড়ীর) প্রচলন হইবে দেখা যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

(হোজজল্ কেরামা; আসারল্ কেয়ামা, একতারা-বাত্তেসসায়া ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।

পারসীভাষায় কয়েক খণ্ড পুস্তক লিখিয়া পবিত্র কোরান ও হদিসের দ্বারায় স্বীয় দাবীকৃত বিষয়ের প্রতিপাদন ও অন্যান্য সকলের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং ইসলামের সত্যতা প্রতিপাদক ন্যায় ও যুক্তিপূর্ণ কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় অধিকাংশ মৌলভিগণ মির্জা সাহেব বা তৎপ্রণীত গ্রন্থাদির সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। যাহারা নামমাত্র অবগত আছেন হয়তো তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে তাঁহার লিখিত ও সংগৃহীত পুস্তকাদির আদৌ আলোচনা করেন নাই। আমরা এ প্রবন্ধে মির্জা কাদিয়ানীর সংক্ষিপ্ত জীবনীর আভাস দিতেছি। যাহারা বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা উক্ত মহাত্মার রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করুন। ইঁহার পুস্তকাদির আলোচনা না করিয়া এক শ্রেণীর মৌলভিগণ স্বীয় অমূলক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মির্জা কাদিয়ানী সাহেবের প্রতি নরকের ব্যবস্থা করতঃ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন (১)।

(১) "হজরত ইমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আল্‌ফেসানী শেখ আহমদ সরহেন্দী" মহোদয় লিখিত 'মক্তুবাত' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫৫ পত্রে এই ভবিষ্যদবাণী দেখিতে পাওয়া যায় "অঙ্গীকৃত মসিহ পৃথিবীতে আগমন করিলে সেই সময়ের মৌলভিগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন; তিনি যে যে বিষয়ের সংস্কার করিবেন উহা পবিত্র কোরান ও হদিসের বিপরীত বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইবে।" মোজাদ্দদ সাহেব একজন সাধু ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, জন্ম ৯৭১ হিজরী, মৃত্যু ১০৩৪ হিঃ।

পশ্চিমপ্রদেশের দুই একজনে ইঁহার সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থাদির এবং মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে ধীরতার সহিত লেখনী পরিচালনা করেন নাই। অনেকে শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিতেও ত্রুটী করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে মির্জা কাদিয়ানীর উপদেশ ও ধর্ম্মমত উদারনীতিমূলক এবং শিক্ষাপ্রদ। তাহা মনোযোগের সহিত আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বংশপরিচয় ও পূর্ব্বাবস্থা।

মির্জা গোলাম আহমদের পিতা মির্জা গোলাম মর্ত্তুজা, পিতামহ মির্জা আতামহাম্মদ, প্রপিতামহ মির্জা গুল মহাম্মদ। মির্জা সাহেবের পূর্ব্বপুরুষগণ পারস্যদেশবাসী। সমরকন্দ হইতে ইঁহার প্রপিতামহ মির্জা গুল মহাম্মদ প্রথমে পাঞ্জাব প্রদেশে আগমন করেন। তাঁহার সহচর অনুচর ও পরিবারবর্গ লইয়া প্রায় দুইশত লোক সঙ্গে আসিয়াছিলেন। লাহোরের ন্যূনাধিক ৫০ ক্রোশ ব্যবধান ঈশানকোণে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান আবাদ করিয়া বাস করিতে থাকেন; ঐ স্থান "কাদীয়ান" (১) নামে পরিচিত হইয়াছে। শিখদের অভ্যুদয়কালে মির্জা গুল মহাম্মদ ঐ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট বড়লোক বলিয়া পরিচিত হইতেন। পচাশী খানি গ্রাম তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ক্রমে শিখগণের আক্রমণে কতিপয় গ্রাম হস্তচ্যুত হয়। এই অবস্থায়ও তিনি কয়েকজনকে কয়েকখানি গ্রাম দান করেন, উহা এখনো তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের ভোগে আছে। তাঁহার দানশীলতায় ও সৌজন্যে লোকে মুগ্ধ ছিল। অনেক মৌলভির জায়গীর নির্দ্ধারিত ছিল।

মির্জা গুল মহাম্মদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মির্জা আতা-মহম্মদ পিতার ত্যাজ্য ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

ইব্‌নে মাজা আনেছ্ হইতে হদিস বর্ণনা করিয়াছেন—"লা মোহদী ইল্লা ইসা" অর্থাৎ ইসা ব্যতীত মোহ্‌দী অন্য কেহ নয়। এই হদিস হাকিম মসতদরক্ গ্রন্থেও বর্ণনা করিয়াছেন।

হজরত পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন এই সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই মোহ্‌দীর আবিভাব হইবে। (সহি বোখারী—৪৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

(১) ৮৪০ হিজরীর লিখিত "জওয়াহেরল্ এস্‌রার" নামক গ্রন্থে যে হদিস বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে 'কাদাহ্' নামক স্থান মোহদীর প্রকাশের স্থান বলিয়া উল্লেখ আছে। আরবী ভাষায় কাদাহ্ ক্রমে পরিবর্ত্তন ও উচ্চারণের পার্থক্যে কাদিয়ান হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন কর্ডোভাকে ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

তখন হইতে শিখদের অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে গ্রামসকল অধিকারচ্যুত হইয়া পড়ে; একমাত্র কাদিয়ান গ্রাম অবশিষ্ট থাকে। তখন কাদিয়ান একটী দুর্গের ন্যায় রক্ষিত ছিল। তাহাতে কতিপয় সিপাহী ও কয়েকটী তোপ ছিল।

শিখ সৈন্যগণ চতুরতা পূর্ব্বক কাদিয়ানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা লুণ্ঠন করে। তাহাতে মির্জা আতামহাম্মদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়; তিনি সাতিশয় দুদ্দশাপন্ন ও ক্ষুব্ধ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। মনোরম অট্টালিকারাজি ভূমিসাৎ করা হয়। মূর্খতা ও গোড়ামির বশবর্ত্তী হইয়া ফলবান বৃক্ষের বাগান কর্ত্তিত এবং মসজিদ ধর্ম্মশালায় পরিণত হয়; আজও তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। সেই সময় একটী পুস্তকালয় ধ্বংস করা হয়। ঐ পুস্তকালয়ে হস্তলিপি প্রায় পাচশত খণ্ড কোরান ছিল, তাহাও ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তখন কাদিয়ানবাসী সকলকেই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে বলা হয়। স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই প্রাণের মমতায় পাঞ্জাবের অন্য একস্থানে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। সেখানে শত্রুগণের ষড়যন্ত্রে বিষ প্রয়োগে মির্জা আতামহম্মদের জীবনলীলার অবসান হয়।

তৎপর রণজিৎসিংহের রাজত্বের শেষ সময়ে মির্জা গোলাম মর্ত্তুজা কাদিয়ানে প্রত্যাগমন করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তিমধ্যে মাত্র পাচখানি গ্রাম ফেরত পাইলেন। পূর্ব্ব-পুরুষগণের সুনামের বলে ইনিও বিশেষ সম্মানিত হইতে লাগিলেন। গবর্ণর ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের দরবারে যথাযোগ্য আসন প্রাপ্ত হইতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইনি নিজ ব্যয়ে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন; এবং গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। সার লিপ্টন গ্রীফন সাহেব স্বপ্রণীত "পাঞ্জাবের ভদ্রপরিবারবর্গের ইতিহাসে" মির্জা সাহেবের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

জন্ম—বাল্যজীবন—পঠদ্দশা।

১৮৪০ খৃঃ শিখদের রাজত্বের শেষ ভাগে মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। মির্জা কাদিয়ানী ও তাঁহার একটি ভগিনী যমজ ভুমিষ্ঠ হন। ভগিনীটি সুতিকাগারে বিনষ্ট হন। কাদিয়ানী সাহেবের জন্মের পর হইতে তাঁহার পিতার সাংসারিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে। মির্জা কাদিয়ানী শৈশব অতিক্রম করিয়া যখন দশম বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহার পিতা ফজলে ইলাহী নামক জনৈক 'মৌলভিকে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাহার নিকট অল্পকাল মধ্যে বালক মির্জা কাদিয়ানী পবিত্র কোরান ও কিছু পারসী পাঠ করেন। তৎপর ফজলে আহমদ নামক অপর একজন মৌলভির নিকট মনোযোগ সহকারে আরবী, পারসী, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। মৌলভি সাহেবও সস্নেহে তাহাকে পড়াইতেন। সতর কি আঠার বৎসর বয়সের সময় গুল আলী শাহ নামধেয় আর একজন শিক্ষকের নিকট তর্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, হদিস ইত্যাদি শিক্ষা করেন। হেকিমি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদিও পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পিতা হেকিমি চিকিৎসায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন।

শিক্ষকগণের নিকট পাঠ সমাপনান্তে মির্জা কাদিয়ানী বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থাদির আলোচনায় এতদূর নিমগ্ন হইলেন, যেন, সংসারে তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য নাই। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় তদীয় পিতা অত্যধিক অধ্যয়নে নিষেধ করিতেন। পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র সাংসারিক বিষয় কর্ম্মে তাঁহার সাহায্য করেন; কার্য্যতঃ তাহাই হইল। রণজিৎ সিংহের সময়ে মির্জা আতা মহাম্মদের যে সম্পত্তি শিখগণ হস্তগত করিয়াছিল তাহার উদ্ধারার্থে বিস্তর অর্থব্যয় ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে পিতা ভারত গবর্ণমেণ্টের সমীপে বহু চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সময়ে ঐ সকল কার্য্য ব্যপদেশে পিতা পুত্রকে লিপ্ত রাখিলেন। আপন মূল্যবান সময় এই কার্য্যে ব্যয় করিতে হইয়াছিল বলিয়া মির্জা কাদিয়ানী পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন।

বৈরাগ্য ও পিতৃ-বিয়োগ।

পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র পূর্ণভাবে সংসারাসক্ত হইয়া সাংসারিক উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন; মির্জা কাদিয়ানীর স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া তাহাতে সুক্ষম হইতেন না। পিতা সতত বিষণ্নমনা থাকিতেন। প্রায় সত্তর হাজার

টাকা ব্যয় ও পিতা পুত্রের কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থ হইল। গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারিলেন না। পিতা পুত্রকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং জানিতেন পুত্রের মন সংসারাসক্ত নহে। তবে সংসারাশ্রমে বাস করিতে হইলে মান সম্ভ্রমের দরকার বিবেচনায় সাধারণে ও রাজদ্বারে আদৃত হইবার জন্য কোন কোন বিষয়ে পিতা কখনো কখনো পুত্রকে উপদেশ দিতেন। মির্জা কাদিয়ানী সতত পিতার সেবায় রত থাকিতেন। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে মির্জা কাদিয়ানী কিছুকাল চাকরী করিয়াছিলেন। পিতার নিকট প্রিয়তম পুত্রের বিচ্ছেদ অসহনীয় হওয়ায় পিতার অনুমতিক্রমে চাকরী ত্যাগ করেন। বাটীতে থাকিয়া প্রায় প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র কোরান ও হদিস পাঠ করিতেন, সময় সময় পিতাকে পড়িয়া শুনাইতেন। তখন মির্জা কাদিয়ানীর বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। পিতা ৮০ কি ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জামা মস্‌জিদের পার্শ্বে তাঁহারই অছিয়ত্‌ অনুসারে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়।

সংস্কারক বলিয়া দাবী ও প্রচার।

মির্জা সাহেব "বরাহীনে আহমদীয়া" নামক গ্রন্থ ১৮৮৪ খৃঃ যখন প্রথম প্রকাশ করেন, তখন অধিকাংশ মৌলভিগণই তাঁহাকে সংস্কারক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এবং ঐ পুস্তকের সমালোচনা করিয়া মির্জা কাদিয়ানী সাহেবকে ভূয়শী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তৎপর যখন "মসিহে মৌউদ" (অর্থাৎ শেষ যুগে যাহার আগমন বার্ত্তা হদিসে উল্লেখ হইয়াছে) বলিয়া দাবী করিলেন, তখন হইতে মৌলভিগণের মধ্যে গোলযোগ ও মতভেদ উপস্থিত হইল। মির্জা কাদিয়ানী ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন প্রকাশ করিয়া ফত্‌ওয়া (পাতি) লিখিলেন। আঠার বৎসর পূর্ব্বের বরাহীনে আহ্‌মদীয়াতে যাহা যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার প্রচারিত বাক্যে তদ্‌তিরিক্ত নূতন আর কিছুই ছিল না। তবু গোঁড়া মৌলভিগণ অযথা আপত্তি উত্থাপন করতঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে একদল মির্জা কাদিয়ানীর, অন্য এক সম্প্রদায় মৌলভিগণের মতাবলম্বন করিলেন। আর এক শ্রেণীর লোক প্রকাশ্য কোন দলে যোগ না দিয়া ধীরতার সহিত সত্যাসত্যের মীমাংসায় রত হইলেন।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত শাস্ত্র-বিচার।

১৮৮৫ খৃঃ আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত লক্ষ্মীরাম মির্জা সাহেবের সহিত তর্ক করিতে কাদিয়ানে গমন করেন। মির্জা সাহেব ১৮৯৩ খৃঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী লক্ষ্মীরামের অপঘাত মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ৬ই মার্চ্চ ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনানুযায়ী পণ্ডিত লক্ষ্মীরাম নিহত হন। পণ্ডিত লক্ষ্মীরামের শিষ্যগণ মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে হত্যাপরাধের জন্য জেলা গুরুদাসপুরের বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে অকৃতকার্য্য হন।

১৮৮৬ খৃঃ হুসিয়ারপুরে আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী লালা মুরলীধর নামক জনৈক পণ্ডিতের সহিত মির্জা সাহেবের শাস্ত্রবিচার ও তর্ক হয়। লালাজী প্রথমেই হজরত মহাম্মদের চন্দ্রমা দিখণ্ডিত করার মোজেজা (অলৌকিক ক্রিয়ার) প্রতিবাদ করেন; "সোরমায়ে চশমে আরিয়া" নামক উর্দ্দু পুস্তকে তদ্‌বিষয় বর্ণিত ও তাহার সত্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

১৮৮৮ খৃঃ লুধিয়ানাতে সাধারণকে দীক্ষিত করার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়া মির্জা সাহেব ১লা ডিসেম্বর বিজ্ঞাপন দ্বারা সকলকে আহ্বান করেন, এবং অঙ্গীকৃত মসিহ বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। সেই সময় বটালা নিবাসী মৌলভি মহাম্মদ হোসেনের সহিত তর্ক হয়। তাহার বিস্তারিত বিবরণ "আল্‌হক্‌" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মির্জা কাদিয়ানী প্রত্যাদিষ্ট হইয়া প্রকাশ করিলেন যে "ইস্রাইলী ঈসা মসিহ্ (যীশুখৃষ্ট) পরলোক গমন করিয়াছেন। যে মসিহের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী আছে সেই আমি।" সেই সময়ে একজন মৌলভি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে হিন্দুস্থানের কতিপয় মৌলভির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইয়া মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মচ্যুত হওয়ার ফতওয়া (পাতি) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মৌলভিগণের স্বাক্ষর করাইলেন। আহমদী সম্প্রদায়ের সহিত অপর মোসলমানগণের বিবাহ ক্রিয়াদি নিষিদ্ধ, মোসলমানদের গোরস্থানে উহাদের গোর

দেওয়া অনুচিত; উহাদিগকে কষ্ট দেওয়া ও উহাদিগের অনিষ্ট করা পুণ্যকার্য্য মধ্যে গণ্য; ধন সম্পত্তি স্ত্রী পরিবার চুরি করিয়া লওয়া, পরিশেষে হত্যা করা পর্য্যন্ত বেহেস্তে যাইবার সরল পথ ;—এই সকল কথা ঐ ফতওয়ায় বর্ণিত ছিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মির্জা কাদিয়ানী সাহেব লাহোর গমন করেন এবং তথা হইতে শিয়ালকোট যাইয়া নিজ ধর্ম্মমত ও দাবী প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে খৃষ্টান ও মোসলমানে ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক হয়। মোসলমানদের পক্ষে মির্জা সাহেব ও খৃষ্টানগণের পক্ষে ডিপুটী আবদুল্লা আথম, ডাঃ হেনরী মার্টন ক্লার্ক সাহেব ছিলেন। এই তর্কে খৃষ্টান সম্প্রদায় যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হন। এবিষয় "জঙ্গে মকদ্দস্" নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতমণ্ডলীর যত্নে এক বিরাট সভা আহূত হয়; তাহাতে বক্তাগণ স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থের বর্ণিত প্রমাণ উল্লেখে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের মীমাংসার জন্য আদিষ্ট হন।

১। মানবের শারীরিক, স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা কি ?
২। মৃত্যুর পর অর্থাৎ পারলৌকিক অবস্থা কি ?
৩। পৃথিবীতে মানবজাতির সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং কি উপায়ে তাহা সাধন হইতে পারে ?
৪। ইহকালে ও পরকালে কি প্রকারে কর্ম্মফল ভোগ হয় ?
৫। তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় কি ?

মির্জা সাহেব কেবল মাত্র পবিত্র কোরানের প্রবচন দ্বারায় এই পাঁচটী বিষয়ের বিশদরূপে ব্যাখ্যা করতঃ সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সিভিল এণ্ড মিলিটরী গেজেটে বিশেষ প্রশংসার সহিত উহার সমালোচনা করা হয়। এ বিষয় "জলসায়ে আজম" নামক উর্দ্দু পুস্তকে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

রচিত গ্রন্থাদি।

'বরাহীনে আহ্‌মদীয়া' নামক পুস্তকে মির্জা সাহেব ইসলামের সত্যতা প্রতিপাদক প্রায় তিন শত প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি ন্যায্য তর্কে তাঁহার সেই সকল প্রমাণের অসারতা অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে পারিবেন তিনি দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন বলিয়া ঐ পুস্তকের ১ম ভাগে ঘোষণা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কেহ এবিষয়ের প্রতিবাদ করেন নাই। বরাহীনে আহ্‌মদীয়া পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে।

"এজালাতল্ আওহাম"—ইসা মসিহের সশরীরে আকাশে উত্থান এবং আজ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান ইত্যাদির অযৌক্তিকতা পবিত্র কোরান ও হদিস দ্বারায় খণ্ডন করা হইয়াছে।

"মসিহ হিন্দুস্থান মেঁ"—হজরত ইসা মসিহের ভারতবর্ষে আগমন ও কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরের 'খান ইয়ার' পল্লীতে তাঁহার সমাধি থাকার বিষয় বিশেষ প্রমাণের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (১)

মির্জা কাদিয়ানীর স্বরচিত ও সংগৃহীত বিভিন্ন বিষয়ক আরো অনেক গ্রন্থ আছে। "রিভিউ অব রিলিজেন্জ" নামক মাসিক পত্রিকায় অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের ইস্লামের প্রতি অন্যায় দোষারোপের যে উত্তর প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আলোচনার যোগ্য বটে। তাহাতে তালাক, বহুবিবাহ, ঐস্লামিক অবরোধ প্রথা, দাসত্ব প্রথা, সুদ গ্রহণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উৎকৃষ্ট সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত লাহোর, শিয়ালকোটের বক্তৃতাও উল্লেখযোগ্য।

"সত্য বচন" নামক পুস্তকে শিখ গুরু 'বাবা নানক' একজন মোসলমান সাধু ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন ইহা বিশেষ প্রমাণের সহিত দেখাইয়াছেন। মির্জা সাহেব মোসলমানদের উন্নতিকল্পে কাদিয়ানে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ছাত্রাবাস, প্রচার-সমিতি ইত্যাদি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। মির্জা কাদিয়ানী সাহেবের শিষ্টাচার, সত্যনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা, অতিথিসৎকার ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলোকনে শত্রুপক্ষও মোহিত হইত।

আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় ও সংখ্যা।

মির্জা সাহেবের মতাবলম্বীদিগকে 'আহ্‌মদীয়া' বলে ১৮৯৪ খৃঃ এক রমজান মাসের মধ্যে দুইবার গ্রহণ হওয়ার পর সাগ্রহে কতিপয় মোসলমান তাঁহার নিকট নবধর্ম্মে

(১) লণ্ডনের "হীবর্ট জর্নেল" পত্রিকায় মাননীয় সৈয়দ আমীর আলী, এম-এ, সি, আই, ই সাহেব হজরত ইসা নবীর কাশ্মীরে আগমন ও তথায় মৃত্যু হওয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ৩১৩ জন দীক্ষিত হন।(১) ১৯০১ খৃঃ লোক গণনার রিপোর্টে ১১০৮৭ জন আহমদীর সংখ্যা দেখা যায়। ১৯০৮ খৃঃ লাহোরের বক্তৃতায় মির্জা সাহেব আহমদীর সংখ্যা অনুমান চারি লক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও মির্জা কাদিয়ানীর মতাবলম্বী এখনো বেশী হয় নাই, তবু আফগানিস্থান, পাঞ্জাব, পেশাওর, বোম্বাই, হয়দ্রাবাদ, বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা এবং আরবের কোনো কোনো স্থানে ইঁহার মতাবলম্বিগণের অবস্থান শ্রুত হওয়া যায়। কাবুলের আমীর, মৌলভি আবদুললতিফ ও আবদুররহমান নামক দুইজন ধর্ম্মভীরু চরিত্রবান ব্যক্তিকে আহমদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত জানিয়া, নৃশংস ভাবে হত্যা করেন।

মৃত্যু।

হিন্দু মোসলমান-সম্প্রদায়ের সদ্ভাব স্থাপন ও পরস্পরের বিদ্বেষভাব দূরীকরণ মানসে গত ১৯০৮ খৃঃ ৩১শে মে এক সভা আহ্বান করিতে মির্জা সাহেব কাদিয়ান হইতে লাহোরে গমন করেন। বক্তৃতা লিখিয়া প্রস্তুত করার পরই হঠাৎ ২৬শে মে মঙ্গলবার তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।(২)

মৃতদেহ সসম্মানে কাদিয়ানে নীত ও সমাহিত হয়। মির্জা কাদিয়ানী সাহেবের পরলোক গমনে ইসলাম সমাজের যে অভাব হইয়াছে তাহা আর কতদিনে মোচন হইবে কে বলিতে পারে।(৩)

শ্রীআনওয়ার আলী।

(১) "জওয়াহেরল্ এসরার" নামক গ্রন্থে এক হদিস দেখা যায় তাহাতে ৩১৩ জন লোক প্রথমতঃ 'মোহদীর' শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে উল্লেখ আছে।

(২) ১৯০৮ খৃঃ ২১শে জুন লাহোর ইউনিভার্সিটী হলে হিন্দু মোসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক সভা আহূত হয়, তাহাতে প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত হিন্দু মোসলমান উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় জষ্টিস্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মির্জা সাহেবের বক্তৃতা ঐ সভায় পাঠ করেন।

(৩) সিভিল্ এণ্ড মিলিটরী গেজেট, লাহোর; পাইওনিয়র, এলাহাবাদ; টাইমস্, লণ্ডন, প্রভৃতি পত্রিকায় মৃত্যুর পর মির্জা সাহেবের অনেক প্রশংসা ও অবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

তটের প্রতি

তোমরা দুইটী তীর স্থির অবিচল,
আমারে বাঁধিছ সদা সংযম শাসনে,
আমি মাঝখানে ধাই আবেগ চঞ্চল,
লক্ষ্যহীন দিশাহারা, আপনার মনে;
আমি চাই ছুটিবারে উদ্দাম অবাধ,
যাই আঘাতিয়া বুকে নিষ্ঠুর উল্লাসে,
ভাঙ্গিতে টুটিতে চাই তোমাদের বাঁধ,
কভু চাই ডুবাইতে অধীর উচ্ছ্বাসে;
তোমরা অসীম ধৈর্য্যে সহিতেছ বুকে,
অত্যাচার নিরবধি, আঘাত, পীড়ন,
সহিতেছ শত ক্ষতি বাক্যহীন মুখে,
চির স্নেহময়ী আহা জননী যেমন;
জীবন আমার বাঁধি গভীর সংযমে,
তোমরা নিতেছ বহি সাগর সঙ্গমে।

শ্রীবিপিনবিহারী দাস।

লিথোগ্রাফি

নানারূপ চিত্র এবং শিল্প সভ্যতার একটি অঙ্গ। কোন দেশ কি পরিমাণে সভ্যতা এবং উন্নতি লাভ করিয়াছে, চিত্র এবং শিল্প দেখিয়া তাহার অনেকটা অনুমান করা হইয়া থাকে। আজ আমরা দেশে বসিয়া যে সমস্ত মনমুগ্ধকর চিত্র এবং শিল্প দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি—তাহা আমাদিগকে তাহাদের উন্নত অবস্থারই একটা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং আমরা যে এ সমস্ত বিষয়ে আজও কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। জানি না কবে যে আমরা এ সমস্ত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারিব। আমরা যে এ সমস্ত বিষয়ে আজও এত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি তাহার কারণ কি? মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশাল ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্তও এ সমস্ত বিষয় শিক্ষার জন্য উপযুক্ত একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। সকলেই যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া বিদেশ

হইতে এ সমস্ত শিক্ষা করিয়া আসিতে পারিবেন তাহা আশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। যদি অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের এ সমস্ত বিষয় শিখিবার সুযোগ থাকিত তাহা হইলে আমরা কখনও এত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতাম বলিয়া বোধ হয় না। জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে এ সমস্ত বিষয় শিখিবার বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয় সমূহ দেখিলে প্রকৃতই বিস্ময়বিমূঢ়ের ন্যায় স্তম্ভিত হইতে হয়।

চিত্র নানারূপ, এবং তাহার প্রস্তুত-প্রণালীও অনেক রকম। বিভিন্নরূপ চিত্রসকল বিভিন্নরূপ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক এরূপ চিত্র আছে যাহার মূল্য এত অধিক যে তাহা সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না। যেমন তৈলচিত্র। ইহা কেবল ধনী লোকের গালিচামণ্ডিত কক্ষ প্রাচীরে সংলগ্ন হইয়া কক্ষের শোভা বর্দ্ধন এবং চিত্রকরের কর্ম্মপটুতারই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। বিভিন্নরূপ চিত্রসমূহ বিভিন্নরূপ নামে অভিহিত -যেমন, কলোটাইপ (Collotype), আর্টটাইপ (Art type), ফোটোগ্রেভিওর (Photogravure), হাফ্‌-টোন (Half-tone), লিথোগ্রাফ (Lithograph), উডব্লক (Wood block) ইত্যাদি।

আজকাল আমরা সাধারণ এবং ধনী লোকের গৃহ-শোভা বর্দ্ধন করিতে যে সমস্ত ছবি দেখিতে পাই তাহা প্রায়ই লিথোগ্রাফ। যেমন রবিবর্ম্মার ছবি, বামাপদর ছবি ইত্যাদি। ইহা প্রস্তর হইতে মুদ্রিত। আমরা মাসিক পত্রিকা ইত্যাদিতে যে সমস্ত ছবি দেখিতে পাই তাহা প্রায়ই হাফটোন, তবে অন্যান্য প্রণালীর ছবিও সময় সময় থাকে বটে। হাফটোন এবং ফোটোগ্রেভিওর উভয়ই তামখণ্ডে হয় বটে কিন্তু উভয়ের প্রস্তুত-প্রণালী সম্পূর্ণরূপ পৃথক। হাফটোন যেমন টাইপের সঙ্গে ছাপা যায় ফটোগ্রেভিওর ছবিগুলি সেইরূপ ছাপা যায় না। ইহার জন্য পৃথক একরূপ প্রেস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাফটোন হইতে ইহার মূল্য অধিক এবং ইহা দেখিতেও হাফটোন হইতে সুন্দর। কলোটাইপ এবং আর্টটাইপ (Sensitised gelatine) সেন্সিটাইজড্‌ জেলাটিন হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রুমালের উপর ফটোর ন্যায় ছবি করা এবং আমরা আজ কাল জাপান হইতে প্রেরিত রেশমের পাথায়

লিথোগ্রাফির আবিষ্কর্তা—এলয় সেনেফেল্ডার।

এবং রুমালে যে সমস্ত ছবি দেখিতে পাই তাহা কলোটাইপ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জাপানে সুন্দর সুন্দর ছবিওলা কার্ড (Pictorial cards)ও এই কলোটাইপ হইতে হইয়া থাকে। তবে যতরূপ ছবি বাজারে দেখা যায় তাহার মধ্যে লিথোগ্রাফের ছবিরই চলন বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের জন্য, ঘর সাজাইবার জন্য, লেবেল এবং অন্যান্যরূপ ছবি ইত্যাদির জন্য লিথোগ্রাফ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিথোগ্রাফ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া যত প্রকার কাজ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে টিন ছাপা (Tin Printing) একটি উৎকৃষ্ট কাজ। টিন ছাপার ব্যবসায় যে দিন দিন কিরূপ উন্নতি এবং প্রসার লাভ করিতেছে তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আমি এই প্রবন্ধে লিথোগ্রাফি সম্বন্ধে (অর্থাৎ প্রস্তর হইতে কিরূপ প্রণালীতে ছবি প্রস্তুত হইয়া থাকে) তাহারই বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিতে ইচ্ছা করি। অন্যান্য বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে কিরূপে এবং কাহার দ্বারা লিথোগ্রাফ

আবিষ্কৃত হয় তাহারই কিঞ্চিৎ ইতিহাস বর্ণনা করিয়া পরে অন্যান্য বিষয় লিখিব।

এলয় সেনেফেল্ডার ১৭৯৬ সালে লিথোগ্রাফ আবিষ্কার করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। সেনেফেল্ডার বোহেমিয়ার (Bohemia) রাজধানী প্রেগ্ (Prague) সহরে ১৭৭১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ম্যুনিক রয়াল থিয়েটারের একজন অভিনেতা ছিলেন। আত্মব্যবসায়ে পুত্রকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা না করিয়া, তাহাকে আইন অধ্যয়নের জন্য (University of Ingolstadt) ইঙ্গলষ্টাড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার অল্প কিছু দিন পরে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। সেনেফেল্ডার এইরূপে অর্থাভাবে পতিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হন এবং আপনার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হন। সেনেফেল্ডার গানে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এবং তাঁহার গানবাদ্যের ব্যবসায় অনুসরণ করিবার বিশেষ একটা রোখ ছিল। তাই উপস্থিত অবস্থাতে তিনি গান ইত্যাদির দ্বারাই অর্থোপার্জ্জনের পন্থা করিতে ইচ্ছা করেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি কতকগুলি গান রচনা করিয়া তাহা মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। তখন রচিত গানগুলিকে অল্পব্যয়ে মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি গানগুলিকে তামার উপর খোদাই করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে সামান্য কৃতকার্য্য হন বটে কিন্তু আশানুরূপ অর্থ লাভ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত নিরাশ হন। যখন সেনেফেল্ডার তামার উপর খোদাই ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন কালি বার্ণিস্ ইত্যাদি রাখিয়া মিশাইবার জন্য একটি কেলহীম পাথর (Kelheim stone) খরিদ করেন। এই কাজের জন্য যে পাথর ব্যবহৃত হয় তাহাকে Slab বলা হইয়া থাকে। সেনেফেল্ডার এই পাথরটিকে খুব (Compact nature) আঁটালো রকমের এবং ইহাতে খুব উত্তমরূপ পালিশ হয় দেখিয়া, তাম্রখণ্ডের পরিবর্ত্তে সেই গানগুলিকে পাথরের উপর খোদাই করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি গানগুলিকে পাথরের উপর খোদাই করিতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু আশানুরূপ কৃতকার্য্য না হইয়া অত্যন্ত অর্থাভাবে পতিত হন। সেনেফেল্ডার যখন এইরূপ খোদাই কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন তখন সহসা একদিন তাঁহার মাতা তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইয়া ধোপানীর হিসাব লিখিতে বলেন। হাতের নিকট কাগজ কলম ইত্যাদি না থাকায় তিনি হিসাবগুলিকে পাথরের উপরেই কালি* দিয়া লিখিয়া রাখেন। কিছু ক্ষণ পরে তাহা পাথর হইতে মুছিয়া ফেলিবার সময় তাঁহার মনে হয় যদি কোন উপায়ে গানগুলিকে পাথরের উপরই খোদাই করা যায় তাহা হইলে সহজেই তিনি গানগুলিকে ছাপাইয়া লইতে পারেন। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য সেনেফেল্ডার সেই পাথরের উপর একটি গান লিখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মোম দিয়া বেষ্টন করিয়া তাহার উপর মহাদ্রাবক (Nitric Acid) ঢালিয়া দেন। মহাদ্রাবক সেই লিখিত স্থানের কিছুমাত্র অনিষ্ট না করিয়া পাথরের অন্যান্য স্থান খাইয়া ফেলে। এই নূতন চেষ্টাতে সেনেফেলডার অনেকটা কৃতকার্য্য হন এবং তাহা হইতে অনেকগুলি গানও ছাপাইয়া লইতে সক্ষম হন। ইহাতে তাঁহার আশা বর্দ্ধিত হয় এবং কার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহ পান। পাথরের উপর এইরূপ খোদাই-প্রণালী তাম্রখণ্ডের কিম্বা অন্যান্যরূপ খোদাই কার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক। এইরূপে কেবল খোদাই করিয়া তাহা হইতে ছবি করা প্রকৃত লিথোগ্রাফি নয়। তবে ইহাই তাঁহাকে লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।

লিথো প্রিনটিং করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম পাথরে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া লইতে হয়। কেবল মাত্র একটি চিত্র দেখিয়া ঠিক সেই মাপ মত এবং ঠিক সেইরূপ পাথরে আঁকা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। তাই ছেলেরা যেমন ছবির উপর স্বচ্ছ কাগজ রাখিয়া ঠিক সেইরূপ ছবি নকল করে এখানেও ঠিক সেইরূপ জেলাটিন (Gelatine) কিম্বা (Tracing paper) ট্রেসিং কাগজের উপর ছবিটি নকল করিয়া পরে তাহা হইতে ছবিটিকে পাথরে উঠাইতে হইবে।

* লিথোগ্রাফের পাথরে লিখিবার এবং আঁকিবার জন্য এবং (Transferring) ট্রান্সফারিঙ্গের জন্য যে সমস্ত কালি, (Crayon) ক্রেয়ন ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে।

এই প্রণালীকে "পরিবর্ত্তন" প্রণালী (Transfer system) বলা হইয়া থাকে। এইরূপ জেলাটিন কিম্বা ট্রেসিং কাগজ হইতে ছবিটি পরিবর্ত্তন করিলেই আমরা ছবিটি ঠিকরূপ পাথরের উপরে পাইলাম। এখন আবার চিত্রটিকে যেখানে যেরূপ দরকার কালি এবং ক্রেয়ন দ্বারা উত্তমরূপ অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। যে পাথর লিথোগ্রাফির জন্য ব্যবহৃত হয় সেই পাথরের এবং তৈল পদার্থের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে যে যখনই এই দুইটি পদার্থ একত্র হয় (অর্থাৎ যখনই কোনরূপ তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা এইরূপ পাথরের উপর কিছু অঙ্কিত করা হয়) তখনই পাথরের সেই অঙ্কিত স্থানে একটি নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়—যাহাকে ইংরাজিতে Oleo-margarate of lime বলা হইয়া থাকে। ইহা একরূপ পদার্থ যাহা জলে ধৌত হয় না এবং বহু সংঘর্ষণেও বহুকাল স্থায়ী। তৈল পদার্থের উপর যেমন জল দাড়াইতে পারে না ঠিক সেইরূপ ইহার উপরেও জল দাঁড়াইতে পারে না। তাই প্রস্তরের উপর চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরে পাথরটিকে জল দিয়া উত্তমরূপ ভিজাইয়া লইয়া রোলার দিয়া কালি দিলে, যে স্থানে তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা অঙ্কিত করা হইয়াছে কেবল সেই স্থানেই কালি লাগিবে অন্যত্র একটুও কালি লাগিবে না। ইহার কারণ তেল জলের স্বাভাবিক বিরোধ, ইহারা মিশ্রিত হয় না, পরন্তু পরস্পরকে দূর করিয়া দেয়। তাই রোলার দ্বারা পাথরের চিত্রিত স্থানে কালি দিতে হইলে, সর্ব্বদাই পাথরটিকে উত্তমরূপ ভিজাইয়া লওয়া দরকার। তাহা না হইলে পাথরের সর্ব্বত্রই কালি লাগিয়া অঙ্কিত চিত্র নষ্ট হইয়া যাইবে।

যে কোনরূপ পাথরে লিথো প্রিন্‌টিং হয় না। চুনে পাথর (Lime stone, কিম্বা যে কোনরূপ Calcareous stone) লিথোগ্রাফের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। লিথোগ্রাফির এই সমস্ত পাথরের মধ্যে শতকরা ৯৪ হইতে ৯৮ ভাগ পর্য্যন্ত চৌর্ণাঙ্গারক (Carbonate of lime) থাকে, বাকি ২ হইতে ৬ ভাগ বিভিন্নরূপ পদার্থ মিশ্রিত—যেমন লোহা, ম্যাগ্নেশিয়া, এল্যুমিনিয়ম ইত্যাদি। এইরূপ প্রস্তর সকল সাধারণত মার্কিন, কানাডা, তুর্কী, ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডেও এইরূপ পাথর হয় বটে কিন্তু ইহা একরূপ অজানিত। সেনেফেল্ডার দ্বারা লিথোগ্রাফ আবিষ্কৃত হইবার পর জার্ম্মানীই প্রায় পৃথিবীর সমস্ত স্থানে এই পাথর যোগাইয়া থাকে।

সকল প্রকার পাথরেই কোনরূপ না কোনরূপ দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে। লিথোগ্রাফির জন্য যে প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাও যে এই স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত তাহা নয়। প্রস্তর ক্রয় করিবার সময় এ বিষয়ে সতর্ক না হইলে কার্য্যের সময় অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দোষগুলি খুব বেশী পরিমাণ এই পাথরে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) অনেক পাতলা রঙ্গের (light-coloured stone) পাথরে অনেক সময় একরূপ লাল লাল দাগ এবং চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ দাগ পাথরের বহুস্থানে দেখা যায় বটে তবে ইহা কার্য্যের কোনরূপ অনিষ্ট করে না।

(খ) সময় সময় এই সমস্ত পাথরে ধূসর এবং সাদা রঙ্গ (grey white) মিশ্রিত একরূপ দাগ লক্ষিত হইয়া থাকে—ইহাকে "Chalk marks" বলা হইয়া থাকে। এইরূপ দাগবিশিষ্ট স্থানগুলি পাথরের অন্যান্য স্থান হইতে নরম এবং ইহা উত্তমরূপ পালিশ হয় না। এসিড ইহাকে অতি সহজেই খারাপ করিয়া ফেলে। এইরূপ পাথর লিথোগ্রাফের জন্য মোটেই সুবিধাজনক নয়। তবে এইরূপ পাথর মোটা কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

(গ) লিথোগ্রাফের পাথরে উপরোক্ত দোষ ছাড়াও অন্য একরূপ দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে যাহাকে ইংরাজিতে "Glass marks" বলা হইয়া থাকে। (Felspar Crystal Granite) ফেল্‌স্পার ক্রিষ্টাল গ্রানাইটের মধ্যেও এই ফেল্‌স্পার ক্রিষ্টাল প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ই এক পদার্থ। ইহা চুনে পাথর (Lime stone) হইতে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন পদার্থ। ইহার কোনরূপ তৈলাক্ত পদার্থকে চুনে পাথরের ন্যায় ধরিয়া রাখিবার শক্তি নাই। কাজেই এইরূপ "Glass marks" বিশিষ্ট পাথরগুলি লিথোগ্রাফ কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণরূপ অনুপযুক্ত। উপরোক্তরূপ দোষগুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেকরূপ দোষ লিথোগ্রাফের পাথরে দেখা যায় বটে তবে সমস্ত বিষয় এই

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখা অসম্ভব বলিয়া বিশেষ বিশেষ কয়েকটি দোষ সম্বন্ধে লেখা হইল মাত্র।

পরিবর্ত্তন প্রণালী (Transferring process) লিথোগ্রাফির জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রণালী। লিথোগ্রাফের কার্য্যে প্রায় সর্ব্বদাই ট্রান্সফারিং বা পরিবর্ত্তনের দরকার হইয়া থাকে। কেবল মাত্র যে জেলাটিন কিম্বা ট্রেসিং কাগজ হইতেই ট্রান্সফার করা হইয়া থাকে তাহা নয়। ট্রান্সফার প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহুরূপ পদার্থ হইতে চিত্র কিম্বা বর্ণমালা ইত্যাদি পাথরে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ট্রান্সফার অনেক রকম, যেমন—লেখা ট্রান্সফার (Written Transfer), দানাদার কাগজে ট্রান্সফার (Grained paper Transfer), প্লেট ট্রান্সফার (Plate Transfer), জেলাটিন কী ট্রান্সফার (Gelatine key Transfer), হরপ হইতে ট্রান্সফার (Transfer from Type), ফোটো লিথো ট্রান্সফার (Photo litho Transfer), হাতের লেখা ট্রান্সফার (Autographic Transfer), উল্টা ট্রান্সফার (Reversed Transfer), অবিনাশী ট্রান্সফার (Imperishable Transfer); উপরোক্ত সমস্তরূপ ট্রান্সফারই যে এক প্রথা অবলম্বন করিয়া করিতে হয় তাহা নয়। ভিন্নরূপ ট্রান্সফারের জন্য ভিন্নরূপ প্রণালী, বিভিন্নরূপ ট্রান্সফারের জন্য বিভিন্নরূপ ট্রান্সফার কাগজ এবং বিভিন্নরূপ ট্রান্সফার কালি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"পরিবর্ত্তন" প্রণালী সকল সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠকদের বুঝান সম্ভবপর নয়। এ সম্বন্ধে লিখিতে হইলে অত্যন্ত বিস্তৃত করিয়া লিখিবার প্রয়োজন। প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে বলিয়া অন্য সময় Transfer এবং Tin Printing সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ লিথোগ্রাফির পাথরে কিরূপে Oleo margarate of lime হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন তাহা হইলে একটি পরিষ্কার প্লেট, একটি কাচ এবং একটি লিথোগ্রাফের পাথর লইয়া তাহাদের গায়ে চর্ব্বি কিম্বা ঝুল ঘষিয়া লাগাইয়া দিন। এইরূপে আধ ঘণ্টা কাল রাখিয়া পরে তার্পিন তেল দ্বারা চর্ব্বি উঠাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করুন—দেখিবেন চর্ব্বি প্লেট এবং কাচ হইতে উত্তমরূপ উঠিয়া যাইবে কিন্তু লিথোগ্রাফির সেই পাথর হইতে কিছুতে উঠিবে না। পাথরের যে সমস্ত স্থানে চর্ব্বি অথবা ঝুল লাগান হইয়াছিল সেই সমস্ত স্থানে চর্ব্বি তেলা রকমের একটা পরদার (Film) ন্যায় থাকিয়া যাইবে; ইহাই সেই Oleo-margarate of lime। ইহা হইতেই লিথোগ্রাফের ছবি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পদার্থটিকে পাথর হইতে উঠাইয়া ফেলিতে হইলে বালু এবং পাথর (Snake Stone) দ্বারা ঘষিয়া উঠাইতে হইবে। কেবলমাত্র জল দিয়া ধুইলে ইহাকে পাথর হইতে উঠান যাইবে না।

পাথরের পরিবর্ত্তে অন্য কোনরূপ পদার্থ হইতে লিথোপ্রিনটিং করা যাইতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দস্তা এবং এল্যুমিনিয়ম ব্যবহার করা হইয়াছিল। পাথরের পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থানে দস্তা এবং এল্যুমিনিয়ম ব্যবহার করা হইয়া থাকিলেও ইহা হইতে পাথরের ন্যায় উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় নাই। সাধারণ মোটা কাজ—যেমন দেয়াল সাজাইবার কাগজ (Wall-paper) লেবেল ইত্যাদির জন্য পাথরের পরিবর্ত্তে অনেক স্থানে এল্যুমিনিয়ম এবং দস্তা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কারণ ইহা পাথর হইতে অত্যন্ত পাতলা বলিয়া নাড়াচাড়া করিতে সুবিধা। কিন্তু মোটা এবং সূক্ষ্ম উভয় কার্য্যের জন্য দস্তা এবং এল্যুমিনিয়ম হইতে পাথর উৎকৃষ্ট। জাপানে প্রায় অধিকাংশ কারখানাতেই পাথর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। দস্তা অব্‌সেট প্রণালীর জন্য সুবিধাজনক, কিন্তু ডিরেক্ট প্রোসেসের জন্য সুবিধাজনক নয়। এল্যুমিনিয়ম কেবল ডিরেক্ট প্রোসেসের জন্যই ভাল। কিন্তু পাথর অব্‌সেট এবং ডিরেক্ট উভয় প্রণালীর জন্যই ভাল। আমেরিকাতে আসিয়া যে কয়টি কারখানাতে কাজকর্ম্ম দেখিলাম তাহাদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ মোটা কাজের জন্য এল্যুমিনিয়ম এবং দস্তা ব্যবহার করে এবং সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য পাথর ব্যবহার করিয়া থাকে।

শ্রীবিনয়ভূষণ বসু।

আলোচনা

[কোনো বিষয়ের আলোচনা যে মাসে মূল বিষয় প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, ঠিক তাহার পরবর্ত্তী মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত না হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। আলোচনার পর মূল বিষয়ের লেখকের উত্তর পত্রস্থ হইলে, আর সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা চলিতে পারিবে না। লেখকগণ আলোচনা যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবেন; দীর্ঘ আলোচনা ছাপা আমাদের পক্ষে দুষ্কর।
প্রবাসী সম্পাদক।]

মহাকর্ষণ

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাকর্ষণ নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"কলিকাতাতেই হউক কিম্বা আন্দামান দ্বীপেই হউক প্রশান্ত মহাসাগরের উপর জাহাজে কিম্বা উত্তর কি দক্ষিণ মেরুতেই হউক সকল স্থানেই দেখা যাইবে যে বস্তু মাত্রেরই ষোল ফুট উচ্চ হইতে পৃথ্বীপৃষ্ঠে পতিত হইতে এক সেকণ্ড সময় লাগিয়া থাকে।" (১৬৪ পৃষ্ঠা ২য় কলম)। বস্তুতঃ তাহা ঠিক কি না দেখা যাউক। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বিষুব রেখার উপর অবস্থিত কোনও একটি স্থানের দূরত্ব পৃথিবীর মেরুর দূরত্বের প্রায় ১৩ মাইল বেশী, এবং যেহেতু মহাকর্ষণ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পদার্থের দূরত্বের বর্গের অনুপাতে কমে সুতরাং পৃথিবীর মেরুতে মহাকর্ষণ পৃথিবীর বিষুব রেখার উপর অবস্থিত কোনও একটি স্থানের মহাকর্ষণের চেয়ে বেশী। সেই জন্যই বিষুব রেখার উপর অবস্থিত কোনও একটি স্থানে যদি ষোল ফুট উচ্চ হইতে পড়িতে পদার্থের এক সেকণ্ড লাগে তাহা হইলে পৃথিবীর মেরুতে আরো কম সময় লাগিবে। বিষুব রেখা হইতে মেরুর দিকে যদি অগ্রসর হওয়া যায় পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর পৃষ্ঠের স্থানগুলির দূরত্ব ক্রমশঃ কমিয়া আসে এবং তাহাতে পৃথিবীর মহাকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও সেই সেই স্থানে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ষোল ফুট উচ্চ হইতে পৃথ্বীপৃষ্ঠে পতিত হইতে পদার্থের যে সময় লাগিতেছে তাহা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে ও পৃথিবীর মেরুতে সে সময়টি সব চেয়ে কম।

আরও, পৃথিবী মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে অনবরত ঘুরিতেছে বলিয়া পৃথিবীর সকল জিনিষই দূরে ছুড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, মহাকর্ষণই তাহাদের পৃথিবীর গাত্রে টানিয়া রাখিয়াছে। এই বিকর্ষণের বেগ বিষুব রেখার নিকট সব চেয়ে বেশী হইয়া ক্রমশঃ মেরুর দিকে কমিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর মেরুতে বিকর্ষণের বেগ কিছুই নাই। সুতরাং মেরু ভিন্ন পৃথিবীর গাত্রে যে কোনও স্থানে যদি কোনও বস্তুকে উচ্চ হইতে বাধাহীন করিয়া ছাড়িয়া দি তাহা হইলে সে বস্তুটি সোজা ভাবে ঠিক নীচে পড়িবে না, বাঁকিয়া কিঞ্চিদ্দূরে পড়িবে (১৬৭ পৃষ্ঠা ক চ)। বিষুব রেখার নিকট সব চেয়ে বেশী বাঁকিয়া পড়িবে ও মেরুতে ঠিক সোজা ভাবে পড়িবে। তাহা হইলে সমান উচ্চ হইতে সকল স্থানেই যদি বস্তুকে বাধাহীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়া দেখা যায় তবে মেরুতেই সে বস্তুটি আগে আসিয়া পড়িবে।

শেষের কারণটি খুব বেশী Theoretical বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও পূর্ব্বোক্ত কারণটি পরিত্যাগ করা যায় না। জ্ঞানেন বাবু তাহার পরেই লিখিতেছেন (১৬৪ পৃষ্ঠা ২ কলম) "পর্ব্বতের উপর উঠিয়া পরীক্ষাটি করিলে দেখা যাইবে যে সেখানে কোনো বস্তু ষোল ফুট পতিত হইতে যত সময় লয় তাহা অপেক্ষা পর্ব্বতের তলদেশে অল্প সময় লয়। পার্থক্য অতি সামান্য কিন্তু ধরা যায়।" পর্ব্বতের গাত্রে ও তলদেশে পরীক্ষা করিয়া উক্ত সময়ের যে পার্থক্য হইবে তাহা যদি ধরা হয় তবে পৃথিবীর বিষুব রেখার নিকট ও মেরুতে পরীক্ষা করিয়া উক্ত সময়ের যে পার্থক্য হইবে তাহা ধরা হইবে না কেন? জগতে ২৯০০০ ফুটের চেয়ে উচ্চ আর পর্ব্বত নাই কিন্তু বিষুব রেখার নিকট পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ মেরুর নিকট ব্যাসার্দ্ধের চেয়ে প্রায় ১১৬১৬০ ফুট বেশী। বিষুব রেখার নিকট ও মেরুতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উক্ত সময়ের পার্থক্য পর্ব্বতের গাত্রে ও তলদেশে পরীক্ষা করিলে যে পার্থক্য হইবে তাহার চেয়ে ঢের বেশী, এত বেশী যে পরিত্যাগ করা যায় না।

পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে উহার উপরিভাগ ৪০০০ মাইল দূরবর্ত্তী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার অর্দ্ধেক লেখা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, এম-এ, বি-এল।

যৎকিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর "নির্ব্বাণ" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় বলিতেছেন, "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় ধর্ম্মবীর শ্রীচৈতন্য দেব, প্রাবৃটকালীন গম্ভীর শোভায় মণ্ডিত বুদ্ধগয়ার মনোহারিত্ব সন্দর্শন করিয়া, শাক্যসিংহের সেই মহাপ্রেম ও মহাভাবের কণামাত্র হৃদয়ে লাভ করিয়া, গলদশ্রুলোচনে জাহ্নবীতীরে 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন' মন্ত্র জপিতে জপিতে, অবসতনু হইয়া পড়িতেন এবং বুদ্ধের সেই অনন্তমাধুরীপূর্ণ প্রেম ও দয়ার অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, পুণ্যবতী বঙ্গভূমিকে বর্ষাকালীন স্ফীতবক্ষা, পূতসলিলা জাহ্নবীধারার ন্যায় প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন।"

নির্ব্বাণ প্রবন্ধের উপরোক্ত অংশ পাঠ করিয়া পাঠককে ইহাই বুঝিতে হইবে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন এক বর্ষাকালে বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলেন এবং সেই সময় শাক্যসিংহের সেই মহাপ্রেম ও মহাভাবের "কণামাত্র" তিনি হৃদয়ে লাভ করিয়া "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন" মন্ত্র বুদ্ধদেবের "প্রেম ও দয়ার অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত" হইয়াই প্রচার করিয়া বঙ্গদেশকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছিলেন ইত্যাদি।

এখন প্রকৃত ঘটনা এই যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোনদিন যে বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, এবং তিনি যে বর্ষাকালে গিয়াছিলেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। প্রবন্ধ-লেখক যদিও দয়া করিয়া মহাপ্রভুকে মহাপ্রেম ও মহাভাবের "কণামাত্র" লাভের অধিকারী করিয়াছেন কিন্তু একথা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন নাই যে বুদ্ধদেবের ভাবের অংশলাভ করিয়া "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন" মন্ত্র জপিতে জপিতে "অবসতনু" হইয়া পড়িবার কারণ কি? নাম জপ ও বৈষ্ণব সেবন ও ভাবাবেশে "অবসতনু" হওয়া বৌদ্ধভাবের অঙ্গ কি?

গয়াধামে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু কোন্ কোন্ স্থান দর্শন করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে। চৈতন্য ভাগবতে যেরূপ বিবরণ আছে অন্য কোনো গ্রন্থে এরূপ বিস্তৃত বিবরণ নাই।

সেই সকল বর্ণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধগয়ার সহিত মহাপ্রভুর সম্বন্ধ কল্পনা করিবার কোনই কারণ নাই এবং বৌদ্ধভাব হইতে তিনি যে ভাব পাইয়াছেন ইহাও অসংলগ্ন কল্পনা। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমত বৌদ্ধধর্ম্মমতের অনুকূল নহে, এবং বৌদ্ধের "নির্ব্বাণ" ও বৈষ্ণবের "পঞ্চম-পুরুষার্থ" এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতালের

বিভিন্নতা। প্রবন্ধ লেখক কিরূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া বুদ্ধগয়া সন্দর্শনে মহাপ্রভুর হৃদয়ে "কণামাত্র" ভাব সঞ্চারের কথা বলিয়াছেন জানিতে পারিলে উপকৃত হইব।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

এ ক' পুরুষে' জ্ঞাতি?

কিছুদিন পূর্ব্বে একজন শিক্ষিত যুবক গ্রামে যাইয়া লোকশিক্ষার জন্য সকলকে ডাকিয়া ডারবিন-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। বানরের বংশে মানুষের উৎপত্তি, অসভ্য গ্রাম্য লোকে একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল না। অধিকন্তু, এই কলেজের ছাত্রটীর গ্রামে থাকা ভার হইয়া উঠিল। তিনি ঘরের বাহির হইলেই লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কানাকানি করিত, "ঐরে, বানরের বাচ্চা যাচ্ছে"। হনুবংশীয়গণের মানব সন্তানের সঙ্গে জ্ঞাতিত্বের দাবী অশিক্ষিত লোকে একেবারেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। শিক্ষিতগণেরও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য এই দাবীর ভিত্তি কোথায়। এবং উভয়ের মধ্যে যদি কোন সম্বন্ধ থাকে তবে সে সম্বন্ধ কতকালের। কোন রকমে সম্বন্ধ থাকিলেই কি জ্ঞাতি হয়? এক দেশে ধান শুখাইয়া লই বলিয়া যেমন যাকে তাকে বলা যায় না, 'তুমি আমার মেসো,' তেমনি কোন রকম একটা সম্বন্ধের সূচনা দেখিয়াই যাকে তাকে জ্ঞাতি বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। বিশেষতঃ কয়েক পুরুষ অতীত হইলে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গেও যখন জ্ঞাতিত্ব ঘুচিয়া যায়, তখন বানরকে ডাকিয়া জ্ঞাতি সম্পর্ক পাতাইবার চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়। সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা এত দূরবর্ত্তী যে মানুষ বহুদিন হইল শ্রাদ্ধাশৌচ প্রভৃতির দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আবার যখন পণ্ডিতগণ বলিয়া দেন যে গরিলার সঙ্গে মানবের যে নিকট সম্বন্ধ, ওরাঙ্গের সঙ্গে উহার তত ঘনিষ্ঠ নহে,* তখন ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটা এত জটিল হইয়া উঠে যে জ্ঞাতিত্ব তো দূরের কথা কোনও রূপ সম্বন্ধেরই প্রকৃতি নির্ণীত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। সুতরাং এই দাবীর যাথার্থ্য একটু বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এ জ্ঞাতিত্বের দাবী অবশ্য শারীরিক দিক্ হইতে; বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির দিক্ হইতে বিচার করিলে মানবের জ্ঞাতিত্ব দেবতার সঙ্গে; পশুর সঙ্গে নহে। আবার, এই শারীরিক সম্বন্ধেও পশুর সঙ্গে মানবের ভেদ এত অধিক যে তাহা যদি কেবল পরিমাণগতও হয়, তবুও তাহা গুণগত ভেদের মধ্যেই পরিগণিত হইবে। পরন্তু, মানবের শারীরিক বিকাশ যৌন নির্ব্বাচন ফলে কেবল নীচ হইতেই উপরের দিকে উঠিতেছে, ইহা কল্পনা না করিয়া উপরের শক্তি তাহাকে গড়িয়া তুলিতেছে, এরূপ কল্পনাও তো সম্ভব? শরীর উন্নত হইতেছে এবং তদনুসারে মানসিক শক্তির বিকাশ হইতেছে, এরূপ মনে না করিয়া, একটী আধ্যাত্মিক শক্তির আবির্ভাব হইল এবং সেই শক্তি শরীরকে আপনার মত করিয়া গড়িয়া তুলিল, এরূপ মনে করিলে হানি কি? প্রাণীজগতের সঙ্গে মানবাত্মার যোগ এমন একটী গভীর রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব যে উহাকে সর্ব্বদাই পশুর দিক হইতে বিচার করিলে সুমীমাংসা পাওয়া যাইবে না। যখন দেখি সুসভ্য সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে অশিক্ষিত অসভ্য বন্য মানুষের যে বিভিন্নতা, শেষোক্তের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর শিম্পাঞ্জির বিভিন্নতার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইলেও শিম্পাঞ্জি চিরদিনই পশু, আর ঐ অসভ্য মানুষ মানুষ-কক্ষাভুক্ত।* উভয়কে আনিয়া সভ্যসমাজে শিক্ষা দাও, উহাদের অন্তর্নিহিত একটা দুরতিক্রমণীয় পার্থক্য আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আমার মনে হয়, আমরা বুঝি 'missing link' খুঁজিয়া বৃথাই হয়রান হইতেছি। সাধারণ পিতামাতার যেমন অসাধারণ গুণসম্পন্ন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সৃষ্টির অভিব্যক্তির স্তরসমূহে যে এরূপ ঘটা অসম্ভব তাহা কে বলিল? প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, এ মত সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও পণ্ডিতগণকে ভাবিতে হইতেছে, যে, এইরূপ পরিবর্ত্তনের গতি যেরূপ মন্থর তাহাকে অন্ধশক্তির হস্তে ফেলিয়া রাখিলে পৃথিবীর যে বয়স তাহাতে আজ পৃথিবীর যে উন্নতি দেখিতেছি, তাহার ব্যাখ্যা হইবে না। পশ্চাতে কোনও জ্ঞানময়ী শক্তি চাই যিনি কোনও এক উদ্দেশ্যের দ্বারা এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে নিয়মিত করিতেছেন এবং সকল পরিবর্ত্তনকে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে পরিচালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। এই মতে সৃষ্টির অভিব্যক্তির অন্ধ-শক্তিসমূহের সংগ্রামের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নহে, কিন্তু দেবতার সত্য সঙ্কল্পের অবতরণ। পৃথিবী অতি কষ্টে অনিশ্চয়তার বোঝা বহিয়া যে পথ ঠেলিয়া নীচ হইতে উপরে উঠিতেছে, সেই পথ দিয়াই তাহাকে সুনিশ্চিত গম্যস্থানে যাইবার জন্য উপর হইতে টানিয়া তোলা হইতেছে ভাবিলে ক্ষতি কি? যাহা হউক, মানুষের জ্ঞাতিবর্গকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে তাহার বয়স নির্ণয় করিতে হইবে। এ বিষয়ে ইতিহাস আমাদিগকে বড় অধিকদূর লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ভূ-স্তর অন্বেষণ করিয়া মানবের আবির্ভাব নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

ভূতত্ত্ববিদগণ ভূপৃষ্ঠের কঠিন আবরণকে পঞ্চস্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বনিম্ন স্তরের নাম আদিম যুগ (Primordial epoch)। মানুষকে খুঁজিতে যাইয়া এ যুগের সঙ্গে আমাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। এ যুগে পৃথিবী জলজ লতা জঙ্গলে আবৃত এবং মস্তকহীন জীবের আবাসভূমি। স্থানে স্থানে মৎস্যাস্থিও মিলিয়াছে। দ্বিতীয় স্তরের নাম প্রাথমিক (Primary) যুগ। এ যুগে পৃথিবী গুল্মপূর্ণ এবং অধিবাসী মৎস্য। এই গুল্মই প্রধানতঃ পাথুরিয়া কয়লার উপাদান যোগাইয়াছে। তার উপরে দ্বিতীয় যুগ (Secondary epoch) ধরণী দেবদারু অরণ্যে পরিপূর্ণ ও সরীসৃপের বিহারভূমি। পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবেরও চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। তারপর তৃতীয় যুগ (Tertiary epoch)। এই যুগে পৃথিবী বহুপত্র পরিপূর্ণ বৃক্ষাদিতে আবৃত হইয়া শ্যামলা ধরণীতে পরিণত হইয়াছে। এইখানেই মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব। এই যুগকে আদি মধ্য ও অন্ত (Eocene, miocene, pliocene,) এই তিনি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই যুগে যে কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা অনেক পণ্ডিত নরাস্থি বলিয়াই মনে করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন এই সব মানব ভাষাবিহীন। তারপর চতুর্থ যুগ (Quarternary epoch)। ইহাই বিশেষভাবে মানবযুগ।

ভূপৃষ্ঠের এই কঠিন আবরণ প্রায় ১৩০০০০ ফুট অর্থাৎ ২৫ মাইল—পৃথিবীর সমগ্র ব্যাসার্দ্ধের $\frac{১}{১৬০}$ অংশ মাত্র। স্তরগুলি যত নীচের, তাহাদের স্থূলতা তত বেশী এবং প্রস্তুত হইতেও অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগিয়াছে। অধ্যাপক হক্সলি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে, এক কয়লা স্তর গড়িতে লাগিয়াছে ৬০ লক্ষ বৎসর। এ সমস্ত স্তর গড়িতে ১০ কি

---

* 'The gorilla differs far more from some of the quadrumana than he differs from man.' (Lyell ধৃত Huxley বচন)—অথচ গরিল্লা 'missing link' নহে।

* যদিও আমি অনেক খৃষ্টীয় মিশনারীর উক্তি পাঠ করিয়াছি, যাঁহারা কোন কোন অসভ্যজাতির নিকট বিফল মনোরথ হইয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে উহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব।

২০ কোটি বৎসর লাগিয়াছে। এ সব গণনা ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম হয় না। গাগনিক গণনায় যেমন দু লাখ চার লাখ মাইল এ পাড়া আর ও পাড়া, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছে কোটি বৎসর 'সে দিনের' মধ্যে গণ্য। এই পৃথিবী জীবের আবাসভূমি হইয়াছে অন্ততঃ ১০ কোটি বৎসর হইল এবং মানুষের বয়স ১০ লক্ষ বৎসর। মানবের বয়স নিরূপণের ইতিহাস অতিশয় কৌতূহলজনক এবং শিক্ষাপ্রদ। অবশ্য যতটা অনুসন্ধান হইয়াছে, এ অনুমান তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। নূতন প্রমাণ উপস্থিত হইলে অনুমানও বদলাইয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও বেল্‌জিয়ামেই প্রধানতঃ অনুসন্ধান হইয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলে প্রথম প্রথম বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা হইল যে মানুষের বয়ক্রম ছয় হাজারের বেশী নহে। কুভিয়ার (Cuvier) এর মত পণ্ডিতও এই মতে সায় দিলেন। বাইবেলেও যখন ঐ কথাই আছে, তখন তো মণিকাঞ্চন যোগ হইল। যদিও মাঝে মাঝে দু একটা অন্যরকম প্রমাণ পাওয়া যাইতে লাগিল, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান এ দুইএর চাপে তাহা আর মাথা তুলিতে পারিল না। বিজ্ঞান অত্যন্ত রক্ষণশীল। পুরাতন মতের বিরুদ্ধে আপনার নূতন মত লওয়াইতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে কি যে বেগ পাইতে হইতেছে তাহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা এই রক্ষণশীলতার খবর জানেন। ইহা অত্যন্ত উপকারী। কথায় কথায় মত বদ্‌লাইলে তাহার কোনও মূল্য থাকে না। যখন আর গ্রহণ না করিলে একেবারেই চলে না, তখনই বৈজ্ঞানিক মত পরিবর্ত্তিত হয়। সেইজন্যই উহার উপর অসঙ্কোচে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও মানুষের বয়স ছয় হাজারেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সময় মধ্যে ভূগর্ভে যতই অনুসন্ধান হইতে লাগিল ততই পৃথিবীর লুপ্ত জানোয়ার সকলের অস্থির সঙ্গে সমান স্তরে বুদ্ধিশালী জীবের হস্তচিহ্ন সকল পাওয়া যাইতে লাগিল। এমন সকল প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেল যাহাতে মানুষ কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ঐরূপ আকার দিয়াছে, অস্থির মধ্যে এমন সকল দাগ দেখা গেল যাহা মনুষ্যহস্তের কার্য্য। প্রস্তরগুলি এমনভাবে ভাঙ্গা হইয়াছে যাহাতে কোথায়ও বা ছুরীর কার্য্য, কোথায়ও বা শরাগ্রভাগের কার্য্য, কোথায়ও বা বর্শার কার্য্য মনে হয়। অস্থির উপর প্রস্তরছুরিকা দ্বারা এমন কারুকার্য্য করা হইয়াছে যাহা অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথম প্রথম এই সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করা হইল, বলা হইল, উহা প্রকৃতির কার্য্য বা দীর্ঘদন্তশালী জীবের দন্তকণ্ডূয়নের দাগ। ক্রমে প্রমাণ এত বেশী আসিতে লাগিল এবং পণ্ডিতগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া যখন দেখিলেন আর প্রত্যক্ষকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না তখন বিজ্ঞান নিরস্ত হইল। কিন্তু ধর্ম্মের বাধা তখনও গেল না। ধর্ম্ম যদিও মানবকে মুক্তি দিবার জন্যই আবির্ভূত, কিন্তু উহা মানবজীবনে অতিপ্রাকৃতিকের প্রকাশের আসনে বসিয়া মধ্যবর্ত্তী, অভ্রান্ত গুরু ও শাস্ত্রবাদের নামে মানবমনের সর্ব্বপ্রধান বন্ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাইবেল বলে, মানুষ ছয় হাজার বৎসরের জীব, বেশীর কথা মানিতে বাধ্য নই। ধর্ম্মরক্ষকগণ কিন্তু প্রমাণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তবে প্রমাণের বিরুদ্ধে তাঁহাদের একটা যুক্তি মিলিয়া গেল। মাতা বসুন্ধরাও কম রক্ষণশীলা নহেন। যদিও সেই পুরাতন অবয়ববিহীন প্রটোপ্লাজম্ হইতেই বহুযুগব্যাপী পরিবর্ত্তনে এই বিচিত্রাবয়ব মানবদেহের বিকাশ, তবুও সেই আদিম যুগের শম্বুক মহাশয় আমাদের প্রতিবেশী। অতি প্রাচীন যে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানকালের অনেক অসভ্য জাতির অপেক্ষা উন্নত।* সুতরাং পাদ্রি মহাশয় বলিলেন, যে, এত প্রাচীনকালে এখনকার অপেক্ষাও উন্নত মানুষ আসিল কোথা হইতে? ও আর কিছুই নয়, বাইবেলোক্ত সৃষ্টি-তত্ত্বে সন্দেহ জন্মাইয়া মানবসন্তানকে ভ্রমে ফেলিয়া তাহাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য সয়তান অসভ্যের অস্থি ও অস্ত্রশস্ত্র ঐ সব স্তরে রাখিয়া দিয়াছে। এই বালকোচিত যুক্তিতে বিজ্ঞানের পথ বন্ধ থাকে না। এখন আর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতদ্বৈধ নাই যে চতুর্থ যুগের প্রথম হইতে মানব এই মেদিনীকে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এ যুগে মানব পৃথিবীতে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং মানবত্বে এতটা অগ্রসর হইয়াছে যে তাহার পূর্ব্ব যুগেও মানব ছিল তাহা অনুমান করা যায়। অন্ততঃ তৃতীয় যুগের অন্তভাগে (Pliocene) মানুষ ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলেও মানুষের বয়স ১০ লক্ষ বৎসরের কম হয় না। আর, যদি তৃতীয় যুগের মধ্যভাগের (miocene) যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা যদি স্বীকার করি তবে তো বাইবেলের ছয় হাজারের স্থলে ছয় লক্ষেও কুলাইবে না।

এতক্ষণ বয়স নির্ণয় হইল। এখন আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যাউক। এই সুদূর অতীতেই মানুষকে নানা শাখায় বিভক্ত দেখা যায়। শরীরের বর্ণ, মস্তিষ্কের গঠন, কেশের আকৃতি, দন্তের সংস্থান, কথিত ভাষা এই নানাদিক্ হইতে মানুষকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। আদিতে কি ছিল বলা যায় না, এখন কিন্তু সভ্য জাতি সকলের এক জাতি হইতে অন্য জাতিকে বর্ণ ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই পৃথক বলিয়া জানা যায় না। আবার, একই জাতির বিভিন্ন ব্যক্তিসমূহের রংও সম্পূর্ণ এক নহে—বর্ণের নানা অনুক্রম রহিয়াছে। যদি মস্তকের গঠন ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সভ্য জাতিসমূহ নিতান্তই মিশ্র জাতি। মস্তকের গঠনে মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হয়। লম্বশীর্ষ (Dolicho-cephalic) সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত মস্তকের ব্যাস দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত ব্যাস হইতে দীর্ঘতর। আফ্রিকার কাফ্রি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হ্রস্বশীর্ষ (Brachy-cephalic) সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত ব্যাস ছোট মঙ্গোলীয়গণকে এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। গোলশীর্ষ (meso-cephalic) উভয়ের মধ্যবর্ত্তী—ককেশীয়গণ ইহার অন্তর্ভূত। যদি প্রাচীন ভূমণ্ডলাক্ষ ধরা যায় তবে মোটামুটি এই তিন প্রকার মস্তকের সঙ্গে তিন প্রকার বর্ণের সামঞ্জস্য হইবে। গোলশীর্ষ শ্বেতবর্ণ, হ্রস্বশীর্ষ পীতবর্ণ এবং দীর্ঘশীর্ষ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ত্তমান জাতি সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দিশাহারা হইতে হয়। পাঞ্জাবী ও নিগ্রো মস্তকের হিসাবে এক পর্য্যায় ভুক্ত অথচ রিজলী সাহেবের মতে পাঞ্জাবী "পুরা আর্য্য"। জার্ম্মান্ ও কোরিয়ান এক পরিবারের লোক। রিজলী সাহেবের গণনায় বাঙ্গালী দ্রাবিড়-মিশ্র মঙ্গোল জাতি। আর্য্য জাতির ছিটাফোটা এখানে সেখানে আছে। অথচ মস্তকের হিসাবে বাঙ্গালী, পার্শী ইংরেজ ও চীনার সঙ্গে এক গোষ্ঠিভুক্ত। খাটি শ্বেতবর্ণ ছাড়িয়া দিলে রামধনুর সকল বর্ণই বাঙ্গালীর মধ্যে পাওয়া যাইবে। জার্ম্মাণগণ আপনাদের আর্য্যরক্তের বড়াই করেন, অথচ সকল রকম মস্তকই তাহাদের মধ্যে আছে। সাধারণতঃ মঙ্গোলীয় জাতিকে হ্রস্বশীর্ষ ধরা হয়, অথচ মস্তক গণনায় এস্কিমো লম্বশীর্ষ, বাস্কিজ ও কোরিয়ান হ্রস্বশীর্ষ এবং চীনা গোলশীর্ষ। স্থান ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তন এই গণ্ডগোল ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না। একদল ইংরাজ যদি এখন আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে তবে কাল রং ও লম্বা শির এবং কোঁকড়া চুল লাভ করিবার বহু পূর্ব্বেই ভবলীলা সাঙ্গ করিবে। আবার নিগ্রোদিগকে আনিয়া শীতপ্রধান দেশে ছাড়িয়া দাও তো কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, চামড়া শাদা করিবার অবসর মিলিবে না। তবুও দেশবাসীর সঙ্গে মিশ্রণে টিকিয়া যাইতে পারে। প্রমাণ ভারতবর্ষ। আমাদের ভারতবর্ষে যে

* "The Tertiary skull is of fair capacity, less rude and apelike than the skulls of Spy and Neanderthal, or those of modern Bushman and Australians." —*Human Origins.*

শাদা আর্য্য নাই তার কারণ এই যে, যাঁহারা দেশবাসীর সঙ্গে একেবারে মিশিতে নারাজ ছিলেন, তাঁহারা লোপ পাইয়াছেন। অন্যেরা এ দেশবাসীর সঙ্গে মিশিয়া মিশ্রবর্ণ হইয়াছেন। আবহাওয়া এত সহজে বর্ণাদি বদলাইতে পারে না। শ্বেতজাতি আবহাওয়ার কঠোরতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহ্য করিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগকেও কোথায়ও শ্বেত বা কৃষ্ণে পরিণত হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যে, সব জাতির মধ্যেই সবরকম মানুষ পাই, এই মিশ্রণই তাহার প্রধান ব্যাখ্যা। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে এরূপ মিশ্রণ সম্ভব নহে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস তাহাদের মতের অসত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। ভারতে যে এরূপ মিশ্রণ হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে, মতের খাতিরে, ইতিহাস অগ্রাহ্য হইবে না। মুরের সঙ্গে নিগ্রোর, ইউরোপীয়ের সঙ্গে আমেরিকার আদিম অধিবাসী যদি মিশ্রিত হইতে পারে, তবে দ্রাবিড় ও মঙ্গোল, আর্য্য ও দ্রাবিড় না হইবে কেন।* এখন তো অনেক পণ্ডিত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে, আর্য্যজাতি আদিতেই মিশ্রজাতি। মিশ্রণই ব্যাখ্যা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান সকল জাতির মধ্যেই নানাজাতীয় মানুষ দেখিতে পাই। যাহা হউক, এখন মিশ্রিত হইলেও আদিতে কি ছিল? পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া বলেন, এই সকল অবিমিশ্র শ্বেত পীত কৃষ্ণ জাতির মধ্যে এত প্রভেদ যে ইহাদিগকে এক বর্গের (Species) প্রকার (variety) মনে না করিয়া বিভিন্ন বর্গ মনে করাই কর্ত্তব্য। তাই যদি হয়, তবে অন্য একটী কথার মীমাংসা প্রয়োজন। সমগ্র মানবমণ্ডলী এক নরদম্পতি হইতে একস্থানে উৎপন্ন হইয়া অবস্থার বৈষম্যে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে, না, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দম্পতি হইতে শ্বেত পীত কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে? বাইবেলের ধুয়া ধরিয়া এখনও দু একজন বলিতে চান, যে, এক দম্পতি হইতেই সকলে উৎপন্ন। কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তনের গতি এত মন্থর যে এক দম্পতি হইতে উৎপন্ন সন্তানের এই বিভিন্নতা, মানুষের উৎপত্তি তৃতীয় মধ্য যুগে হইলেও সময়ে কুলাইবে না। প্রাচীন মিসর হইতে নিগ্রোর যে সংবাদ পাই তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান নিগ্রোর কোনই পার্থক্য নাই। সাত হাজার বৎসরে যেখানে কোনই বোধগম্য পার্থক্য উৎপন্ন হয় না, সেখানে ককেশীয় ও কাফির মধ্যে যে পার্থক্য তাহা গজাইতে কত হাজার সাত হাজার বৎসর লাগিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ছয় হাজার বৎসরের একটা প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া মজুরগণ তৎক্ষণাৎ তাহার নামকরণ করিল, "সেখ"। বর্ত্তমান সেখের সঙ্গে সাদৃশ্য বড়ই সুস্পষ্ট। এই যখন অবস্থা তখন এক দম্পতি বিষয়ক মত পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যদিকে, এই প্রশ্নটার কোনই মূল্য নাই। এক বর্গ হইতে যে আর এক বর্গ উৎপন্ন হয় তাহা এক দম্পতি হইতে আর এক দম্পতির উৎপত্তি নহে। কিন্তু বহু হইতে অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া বহুর উৎপত্তি। আগেকার বর্গের মধ্যেও যেমন বহু জন, নূতন বর্গের মধ্যেও বহুজন। এইরূপে বহু স্থানে বহু মানব গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালী জাতি বা ইংরাজ জাতি এক দম্পতি হইতে উৎপন্ন বলিলে কি কোনও অর্থ হয়? সর্ব্বপ্রাচীন যে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহাও লক্ষাধিক বৎসরের এবং বেশ উন্নত আকারের। মানুষ তখনই বিভিন্ন হইয়াছে। তাহারও পূর্ব্বে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ খুঁজিতে হইবে। সে কত পূর্ব্বে তাহাতো বেশ বোধগম্য হইতেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতেই চোখে আঁধার দেখিতে হইল, কূল কিনারা পাইলাম না; এখন যদি মানুষের সঙ্গে বনমানুষের (ape) সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাইয়া উভয়ের পূর্ব্বপুরুষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তবে সে 'মহাপুরুষে'র তো কোন সন্ধান পাইবই না—"The missing link has not been discovered"—বেশীর ভাগ দুর্ব্বল মাথাটা ঘুরিতে থাকিবে, তিনি যে অন্ধকারেরও ওপারে। মানুষের সঙ্গে মানুষের জ্ঞাতিত্ব লইয়াই যখন এত বিভ্রাট* তখন আর জ্ঞাতি গোষ্ঠী বাড়াইবার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। কেন না, জেদ করিলে ব্যাং আর বাদুড়ও যে জ্ঞাতিত্বের দাবী করিয়া বসিতে পারে। ব্যাং এবং বাদুড়ই বা কেন ব্যাংএর ছাতা, গোলআলু আর শালগমেরও সে অধিকার আছে। অলমতি বিস্তরেণ।†

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

* The fertility of the cross increases between the brunet white of Southern Europe and the Arab, or Moor with the Negro, and of the European with the native Indian of America.—*Human Origins.*

In fact the most opposite races breed freely together, and produce a fertile progeny,—*Modern Science and Modern Thought.*

* "If Negroes and Caucasians were snails Zoologists would universally agree that they represented two very excellent species, which could never have originated from one pair by gradual divergence."—Heackel ধৃত Quenstedt বচন।

† এই প্রবন্ধের মত ও অমত উভয়েরই জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল দ্রষ্টব্য,—Lyell's *Antiquity of Man*, Heackel's *History of Creation*, Laing's *Human Origins* এবং *Modern Science and Modern Thought*, ও Martineau's *Study of Religion*.

বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যকরূপ

আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে "বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যকরূপ" শীর্ষক প্রবন্ধের কোন কোন স্থান ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। "দেব" হইতে "দেবা", "মুড়" হইতে মুড়া", "সব" হইতে "সবা", "পা হইতে "পায়া" ইত্যাদিকে নিঃসংশয় তির্য্যকরূপ বা অপভ্রংশ (oblique form বা corrupted form) বলা যাইতে পারে। কিন্তু "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়" এস্থলে "পাগলে" বা 'ছাগলে" পাগল ও ছাগল শব্দের তির্য্যকরূপ বলা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। এগুলি প্রকৃত পক্ষে ৭মী বিভক্তিযুক্ত পদ। কারণ তির্য্যকরূপ হইলে—অর্থাৎ স্বতন্ত্র শব্দ হইলে, কর্ত্তৃকারক ভিন্ন অন্য কারকেও ঐ রূপ ব্যবহৃত হইতে পারিত। "পায়া" "দেবা" প্রভৃতি প্রকৃত তির্য্যকরূপ বিশিষ্ট স্বতন্ত্র শব্দ সমস্ত বিভক্তিতেই ব্যবহৃত হয় যথা, "পায়া" "পায়াতে", "পায়াকে", "পায়ার" ইত্যাদি। কিন্তু "ছাগলেকে" "ছাগলে থেকে" বলা যায় না। "পোকায় কেটেছে", "গরুতে ঘাস খায়", "পাগলে কি না বলে", এই সকল বাক্যে 'পোকায়', 'গরুতে', 'পাগলে' পদে কর্ত্তৃকারকে ৭মী বিভক্তি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। আমার যতদূর স্মরণ হয়, স্কুলপাঠ্য কোন ব্যাকরণেও এই ভাবের একটি সূত্র দেওয়া আছে। সংস্কৃত ভাষাতেও কখনও কখনও কর্ত্তৃকারকে ৩য়ার পরিবর্ত্তে ৬ষ্ঠী বিভক্তি হয়। অবশ্য কিরূপ স্থলে বাংলাতে কর্ত্তৃপদে ৭মী ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা আলোচ্য বিষয়, এবং উক্ত প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে অনেক নিয়মব্যতিক্রম উল্লিখিত হইয়াছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে "সকলেই" ও "সবাই" পদে যে দ্বিগুণ তির্য্যকরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণতঃ যে ভাবে "ই" প্রত্যয় হয়, এস্থলেও "ই" প্রত্যয়টির তদ্ভিন্ন অন্য কোন

অর্থ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? "আমিই যাব", "তাহারাই করিয়াছে", "ততই বাঁধন টুটবে", "সকলই ফুরায়ে যায় মা" প্রভৃতি স্থলে যে অর্থে "ই" প্রযুক্ত হয়, "সবাই" বা "সকলেই" শব্দেও সেই অর্থই করা যাইতে পারে। প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে "সকল" শব্দটি বিশেষণ, 'এ'কার যুক্ত করিলে তবেই বিশেষ্য পদ হয়। কিন্তু "সকল" শব্দও কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য কারকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—'সকলকে', 'সকলের' ইত্যাদি। কেবল কর্ত্তায় প্রথমার পরিবর্ত্তে সপ্তমীর ব্যবহার হইয়া থাকে—ইহা কেবল ভাষার বিশেষত্ব বা idiom.

প্রকৃত তির্য্যকরূপ "দেবা", "পায়া" প্রভৃতির কিরূপ স্থলে প্রয়োগ হয় প্রবন্ধকার সে সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করেন নাই। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় এইরূপ শব্দে 'তাচ্ছিল্য', 'অনাদর' বা 'হীনতর সাদৃশ্য' প্রকাশ করে। এইরূপ 'আ'কার সংযুক্ত করিয়া অনাদরসূচক পদের বা অপভ্রংশের গঠন বহুস্থলে দেখা যায়। চাকরের নাম 'রাম' হইলে তাহাকে 'রামা' বলিয়া ডাকা হয়, 'নগেন্দ্র' হইলে 'নগা', ইত্যাদি। হিন্দি ভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ চলিত কথায় খুব সাধারণ। যথা, "লোটা" হইতে "লোটোআ", "কাহার" হইতে "কাহারোআ", ইত্যাদি।

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।

মনুষ্যখাদক অসভ্যদের সহিত শ্বেতাঙ্গের বিরোধ

(সঙ্কলিত)

পশ্চিম আফ্রিকার কেমারুন জেলায় টেলর নামক জনৈক য়ুরোপীয় কিছুকাল যাবৎ বাস করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছেন—চারি বৎসর ধরিয়া আমি এ দেশের বিচিত্র দৃশ্য পর্য্যবেক্ষণে ও শিকারে অতি আনন্দে দিনযাপন করিতেছিলাম। এদেশবাসী অসভ্যদের নানা প্রকার ব্যবহার ও সংস্কারের সহিত আমার পরিচয় হইতেছিল। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই অঞ্চলের অসভ্যেরা একবার আমাকে ও আমার সঙ্গীদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

আমার আখ্যান-বর্ণিত ঘটনার ক্ষেত্র ডাম্বো জনপদ। তখন পর্য্যন্ত এই স্থানটি জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হয় নাই। একজন ধূর্ত্ত মুসলমান আপনাকে কেমারুন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ঘোষণা করিয়া সাধারণকে প্রতারিত করিতেছিল। সে ব্যক্তি ডাম্বো জনপদের পূর্ব্বাংশে কোদ্‌জা নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রাজস্ব আদায় ও গবর্ণমেণ্টের নামে কয়েকটি স্থান আক্রমণ করিয়া তত্রত্য রমণীদিগকে বন্দী করিয়া বিক্রয় করিতেছিল। এই প্রতারক মুসলমান কয়েকটি জনপদের সর্দ্দারের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল যে আমি জর্ম্মণ নহি, আমি বিনা প্রয়োজনে দুষ্ট অভিপ্রায়ে তাহাদের মাঝে বাস করিতেছি, আমাকে কেহ বর্শা-বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিলে তাহাকে কাহারো নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না। একদিক হইতে এই উত্তেজনা, অন্যদিকে এই অঞ্চলের অসভ্যদের এইরূপ সংস্কার আছে যে, কোনো শ্বেতাঙ্গকে বধ করিয়া তাহার মাংস খাইলে তাহারাও ঐ শ্বেতাঙ্গের তুল্য বলবীর্য্যশালী হইতে পারিবে। এইরূপ কারণ-পরম্পরায় অজ্ঞাতসারে আমার বিপক্ষে একদল লোক ষড়যন্ত্র করিতেছিল। বিপদ যে এমন করিয়া ঘনীভূত হইতেছিল আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না।

আমি যখন ফরাসী কঙ্গো রাজ্যের সীমান্ত হইতে ফিরিতেছিলাম তখন পথিমধ্যে স্থানে স্থানে অধিবাসীদের অনাবশ্যক শত্রুতাচরণ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম। আমার বিরুদ্ধে সকলে সহসা কেন ক্ষেপিয়া উঠিল আমি তাহার কোনো কারণ ভাবিয়া পাইলাম না। ডাম্বোতে সকলেই আমার পরিচিত বলিয়া আমি দ্রুতগতি তথায় চলিলাম।

ডাম্বোর পূর্ব্বভাগের অধিবাসীরাও এই সময়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। মুণ্ডি জনপদের একজন সর্দ্দার নিজের নাম জাহির করিবার মানসে আমার একখানি শকট আক্রমণ করিল। ডাম্বোতে আমার একটি শিকারের আড্ডা ছিল। আমার অধীন লোকজনদের লইয়া আমি সেইখানে আশ্রয় লইলাম। আত্মরক্ষার নিমিত্ত আমাকে চিন্তাকুল হইতে হইল। বামেণ্ডার জর্ম্মণ সেনানায়ক মহাশয়ের নিকটে কয়েকজন সৈন্য চাহিয়া পত্রসহ লোক পাঠাইলাম।

সপ্তাহকাল কাটিয়া গেল কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না। আমার প্রেরিত লোকেরা বামেণ্ডা হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম সেনানায়ক মহাশয় অরণ্য প্রদেশের অধিবাসীদের সহিত লড়াই করিতে বাহির হইয়াছেন দুর্গে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য আছে—তিনি না ফিরিলে সৈন্য পাইবার আশা নাই—আমার পত্র সেনানায়ক মহাশয়ের সমীপে প্রেরিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে আমি একটা বন্য ষাঁড় শিকার করিয়াছিলাম—ডাম্বো জনপদের শত শত লোক আমার নিকটে আসিয়া বন্ধুভাবে মাংস চাহিয়া লইল; তাহাদের আচরণে শত্রুতার কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল না। কয়েকদিন পরে তিন জন দূত আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া গেল যে সেনানায়ক মহাশয় কঙ্গো রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া শীঘ্রই দুর্গে ফিরিবেন। বাণিজ্য ব্যাপার লইয়া কঙ্গোর রাজার সহিত বিরোধ চলিতেছে কঙ্গোরাজ শ্বেতাঙ্গদের সহিত লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন—তিনি বিনা যুদ্ধে বিদেশীর বশ্যতা স্বীকারের অপমান গ্রহণে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন।

আমি অচিরে ডাম্বোতে ফিরিয়া সেনানায়ক মহাশয়ের নিকট হইতে সংবাদ পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। সহসা আমার লোকদের মুখে শুনিলাম যে সেনানায়ক মহাশয়ের দূতত্রয় প্রত্যাবর্ত্তন কালে অসভ্যদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছে।

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি প্রমাদ গণিলাম। ডাম্বোর অধিবাসীদের সহিত শ্বেতাঙ্গদের কখনো বিরোধ ঘটে নাই—সংপ্রতি তাহারা কি কারণে গায় পড়িয়া আমাদের সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইল—আমি জোর করিয়া তত্রত্য সর্দ্দারদের নিকট ইহার কৈফিয়ত জানিতে চাহিলাম। আমার দৃঢ়তা দেখিয়া ডাম্বোর সর্দ্দার তাহার অধীন কয়েকজন মাতব্বরকে লইয়া আমার সমীপে উপনীত হইয়া আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিল। অধিকন্তু তাহারা দূতত্রয়ের পথ-প্রদর্শকের প্রতি অযথা দোষারোপ করিল।

আমি তাহাদের কথার এক বর্ণও বিশ্বাস না করিয়া সর্দ্দারকে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—"মিথ্যা বলিয়া কিছুতেই দোষ এড়াইতে পারিবে না—প্রকৃত অপরাধীদিগকে গেরেপ্তার করিয়া আমার নিকট হাজির করিয়া দিলে তোমাদের বিপন্ন হইতে হইবে না।" আমার এই বাক্য শুনিয়া তাহারা নীরবে বিদায় গ্রহণ করিল।

ডাম্বো জনপদ একটি উচ্চ শৈলের উপরিভাগে অবস্থিত। সেই পাহাড়ের পাদমূলে রাস্তার পার্শ্বে একটি স্রোতস্বিনীর কূলে আমার গৃহ; নিকটে কয়েকখানি ছোট ছোট কুটীরে আমার অধীন লোকেরা বাস করে।

ঘণ্টাখানেক পরে পার্ব্বত্য জনপদ হইতে তুমুল চীৎকার-ধ্বনি শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে একদল লোক হাত-পা-বাঁধা দুইজন ক্রীতদাসকে লইয়া আমার কাছে উপনীত হইল। হতভাগ্য দাসদ্বয়কে তাহারা নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে টানিয়া আনিতেছিল—তাহারা এইরূপ বর্ব্বর আচরণ করিয়া যেরূপ উল্লাস প্রকাশ করিতেছিল তাহা দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। এই লোক দুইটিকে আমার হস্তে অপরাধীরূপে অর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। অসভ্য ডাম্বোবাসীদের মতে আমি এখন এই হতভাগ্য দুইজনের ভাগ্য-বিধাতা। জনপদবাসীরা মনে করিয়াছিল, আমি ইহাদিগকে অপরাধী মনে করিয়া হাতে পাইবামাত্র গুলি করিয়া মারিব, নতুবা কাটিয়া ইহাদের মাংস আহার করিব। আমি ইহাদিগকে গ্রহণ করিলাম মাত্র। পরদিন আরো দুইজনকে পূর্ব্বোক্তরূপ নির্দ্দয়ভাবে টানিয়া আমার সমীপে উপস্থিত করা হইল। ঐ দিবস রাত্রিকালে সর্ব্বসমেত দশজন ক্রীতদাসকে অপরাধী বলিয়া আমার নিকট দেওয়া হইল। জনপদবাসী কোন ব্যক্তিকে অপরাধীরূপে পাওয়া গেল না। ডাম্বোবাসীরা এইরূপে আমার চক্ষে ধূলি দিয়া আপনাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি কোনো উচ্চ বাচ্য না করিয়া তাহাদের প্রতারণা স্বীকার করিয়া লইলাম।

এদিকে আমার সদয় ব্যবহারে ক্রীতদাসেরা চমৎকৃত হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিব তাহারা মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছিল কিন্তু আমার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র উগ্রতার পরিচয় না পাইয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একজন ক্রীতদাস একদিন সাহস করিয়া আমাকে কহিল, যে, এই বিরোধে বৃদ্ধ সর্দ্দারের কোনো অপরাধ নাই। জাটো ও গাব্বা নামক দুইজন নবীন সর্দ্দার এই বিদ্রোহের অগ্রণী। বলা বাহুল্য বন্দীর প্রমুখাৎ এই সংবাদ অবগত হইয়া আমার নিকটে একটা রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। জাটোকে আমি জানিতাম—সে পরম দুর্ব্বৃত্ত—ইতিপূর্ব্বে আমার অনুগত এক সর্দ্দারকে সে অকারণে বিষপ্রয়োগে নিহত

করিয়াছিল। জাটো ও তাহার সহযোগী গাব্বার সহিত আমার কখনো সদ্ভাব ছিল না। তাহাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির শত্রুতাকে আমি এতকাল গ্রাহ্য করি নাই—সে-জন্যই প্রশ্রয় পাইয়া এখন তাহারা মাথা তুলিয়া আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছে।

পরদিন বেফাম হইতে খবর আসিল সেনানায়ক মহাশয় সসৈন্যে উক্ত নগরপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। বেফামবাসীদের সহিত ডাম্বোবাসীদের চিরবৈরিতা। ডাম্বোবাসীদের সহিত শ্বেতাঙ্গদের লড়াই বাধিয়াছে শুনিয়া তাহারা পরম আনন্দিত হইয়াছে।

সেইদিনই পার্ব্বত্য জনপদে তুমুল কোলাহল শুনিয়া আমি কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত লোক পাঠাইলাম। অচিরে চরদের মুখে শুনিলাম—ডাম্বোবাসীরা যুদ্ধার্থ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে আমাদের কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। বংশদণ্ড দ্বারা গৃহের চারিদিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত করিয়া রাখিলাম। লোকজনদিগকে সঙ্কেত করিবামাত্র গৃহের সম্মুখে সমবেত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলাম।

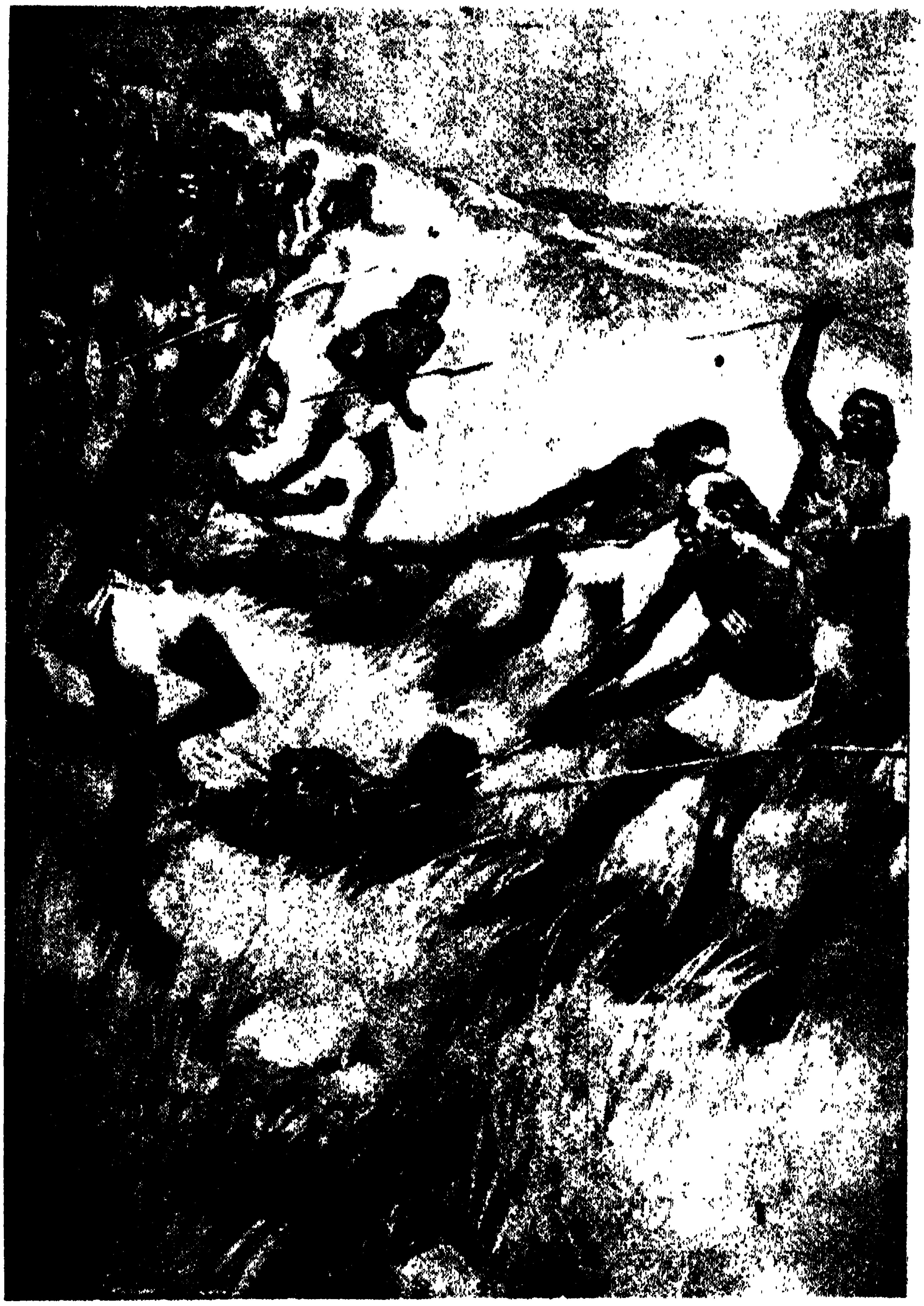

নরখাদকগণ ক্রীতদাসদিগকে বাঁধিয়া আনিতেছে।

দ্বিপ্রহরের সময়ে পার্ব্বত্য জনপদের কোলাহল সহসা থামিয়া গেল। কিছুকাল পরে তাহাদের পক্ষ হইতে একজন দোভাষী দূত আসিয়া আমাকে জানাইল যে সসৈন্যে সেনানায়ক মহাশয়ের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জনপদবাসীরা অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছে। আমি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলাম যে সেনাপতি মহাশয়ের আগমনে কোনো ভয়ের কারণ নাই, তিনি বিরোধ থামাইয়া শান্তি সংস্থাপনের জন্যই আসিতেছেন—ডাম্বোবাসীদের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সেনানায়ক মহাশয়ের দূতদিগকে অকারণ আক্রমণ করিয়া উহারা এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। দোভাষীর সহিত যখন আমার এই সকল কথা চলিতেছিল তখন আমার বন্দুক-বাহক ভৃত্য ডোগোর পত্নী নির্ঝর হইতে জল আনিতে গিয়াছিল। কলসী মাথায় লইয়া যখন সে কুটীরে ফিরিতেছিল তখন অসভ্যেরা অলক্ষ্যে থাকিয়া হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল।

নরখাদককর্ত্তৃক শ্বেতাঙ্গ আক্রমণ।

সে কাতরধ্বনি করিয়া কুটীরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। আমি চকিত হইয়া সেদিকে তাকাইয়া দেখিলাম নিকটবর্ত্তী তৃণক্ষেত্রের মধ্য হইতে একদল অসভ্য বেগে আমার গৃহের অভিমুখে আসিতেছে। আমি কুটীরের দ্বারে যাইবামাত্র আমার বালক ভৃত্য হারাম আমার হস্তে একটা বোঝাই করা দোনালা বন্দুক দিল, আমি অসভ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিলাম। আমার অব্যর্থ সন্ধানে ভীত হইয়া তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। আমার লোকেরা ডাম্বোর বৃদ্ধ নায়ক ও অপর একজন সর্দ্দারকে বন্দী করিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিল। ক্রুদ্ধ অসভ্যের দল পুনরায় চারিদিক হইতে আমাদের কুটীর আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল। উভয় পক্ষে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। আমাদের গুলির সমক্ষে বিপক্ষ দল দীর্ঘকাল দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। দিন শেষ হইয়া আসিল। রাত্রিকালে আবার কি বিপদ ঘটে সেই আশঙ্কায় আমাদের মনে দুশ্চিন্তা জাগিতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃষ্টি আরম্ভ হইল দেখিয়া আমরা কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ মনুষ্যখাদক অসভ্যেরা আমাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া আমাদিগকে হঠাৎ বিপন্ন করিতে পারিবে না। এই সময়ে শত্রুপক্ষীয়েরা দূরে চলিয়া গিয়াছিল দেখিয়া আমরা কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়া রাখিলাম যে এখনো আমাদের নিকট বিস্তর গোলাগুলি মজুত আছে।

মেঘ, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ আমাদের সেই বিপদের রাত্রিকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছিল। অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। সেই দীর্ঘ রজনীতে একবার মাত্র একদল অসভ্য আমাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত আসিয়াছিল।

আমরা গুলি ছুঁড়িয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। এইরূপ খণ্ড ক্ষুদ্র লড়াই আরো কয়েক দিন চলিল। অবশেষে অসভ্যদল হার মানিল। তাহাদের পক্ষীয় দোভাষী দূত আসিয়া আমাকে জানাইল যে বন্দী বৃদ্ধ নায়কের এই বিরোধে কোনো দোষ নাই। জাটো ও গাব্বা এই বিরোধের ষড়যন্ত্রকারী। এই দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিদ্বয় ডাম্বোবাসীদিগকে এই বলিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে যে শ্বেতাঙ্গদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস ভোজন করিলে তাহারাও শ্বেতাঙ্গদের তুল্য বিক্রমশালী হইতে পারিবে।

ভীত নরখাদকদিগকে আশ্বাস দান

পরদিন প্রভাতে এগারো জন বলবান যোদ্ধা আসিয়া আমাকে জানাইল যে রাত্রিকালে সেনানায়ক মহাশয় ডাম্বো-জনপদে পঁহুছিবেন। সৈন্যদিগকে পাইয়া আমার সাহস বাড়িয়া গেল। আমি দুরাত্মা জাটো ও গাব্বার সন্ধানে বাহির হইলাম। আমাদের ভয়ে ভীত হইয়া ডাম্বোবাসীরা নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়া গিরি গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে সেনানায়ক মহাশয় ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া ভীত বৃদ্ধ সর্দ্দারকে মুক্তিদান করিলেন। বৃদ্ধ নায়কের আশ্বাস পাইয়া ডাম্বোবাসীরা আবার স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেনাপতি মহাশয় ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান প্রধান কুড়িজনকে বন্দী করিয়া বামেণ্ডায় লইয়া গেলেন। শাস্তিস্বরূপে তাহারা একটি প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইল।

শ্রীশরৎকুমার রায়।

জাপানী নারী-পরিচ্ছদের বিবর্ত্তন

(সঙ্কলিত)

অতি প্রাচীন কালের অধিবাসীদের পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা দুরূহ। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাগজপত্রে যে সব উল্লেখ ও প্রাচীন তক্ষণ-শিল্পের নমুনায় যে সব পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান করিয়া বড় জোর সামান্য আভাস মাত্র পাওয়া যাইতে পারে।

জাপান যখন আপনার গণ্ডির বাহিরে পা দেয় নাই, যখন তাহার সহিত কোরিয়ার আদান প্রদানও আরম্ভ হয় নাই, সেই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর সমকালে জাপানীরা একটি চোস্ত আস্তিনের লম্বা জামা, 'হাদাবাকামা' বা পাজামা ও কোমরবন্ধ পরিধান করিত। পুরুষের পাজামা খাটো হাঁটু পর্য্যন্ত, স্ত্রীলোকের পাজামা পা পর্য্যন্ত থাকিত। গায়ের জামা বাঁ দিক হইতে ডাহিনে ভাঁজ করা বেনিয়ান বা চাপকানের মতো; মধ্যে মধ্যে এই ভাঁজের ব্যতিক্রমও ঘটিত। এই লম্বা জামার নাম 'হানিবা'। কাহারো

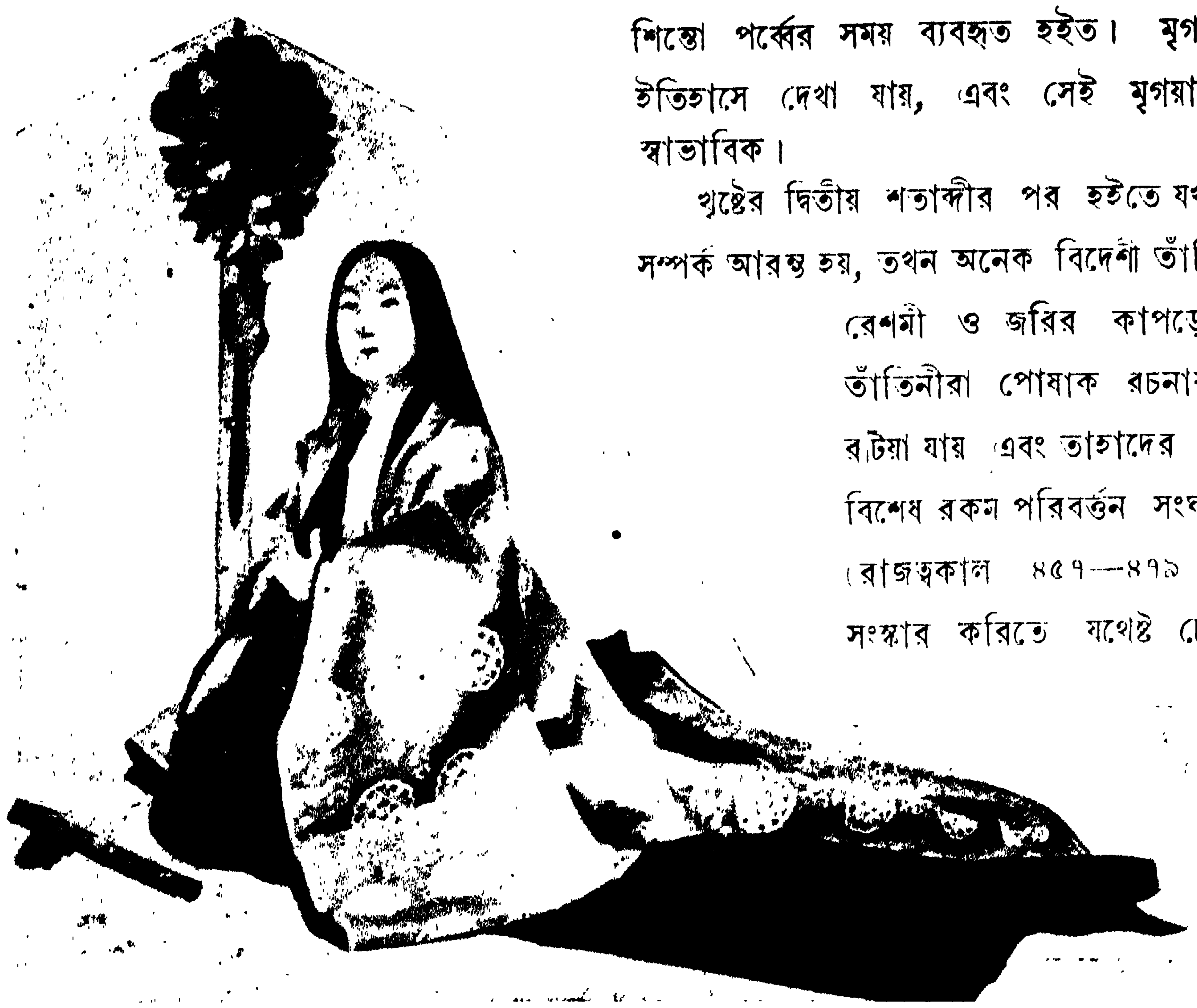

জাপানী মহিলার দরবারী পোষাক।
(ফুজিওয়ারা যুগ—৯ম—১২শ শতাব্দী)

শিন্তো পর্ব্বের সময় ব্যবহৃত হইত। মৃগচর্ম্মের পোষাকেরও উল্লেখ ইতিহাসে দেখা যায়, এবং সেই মৃগয়াপ্রধান যুগে তাহা হওয়াও স্বাভাবিক।

খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীর পর হইতে যখন কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক আরম্ভ হয়, তখন অনেক বিদেশী তাঁতি জাপানে গিয়া নক্সাকাটা রেশমী ও জরির কাপড়ের প্রচলন করে; বিদেশী তাঁতিনীরা পোষাক রচনায় পটু বলিয়া শীঘ্রই খ্যাতি রটিয়া যায় এবং তাহাদের প্রভাবে জাপানের পোষাকে বিশেষ রকম পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সম্রাট য়ুরিয়াকু (রাজত্বকাল ৪৫৭—৪৭৯ খৃষ্টাব্দ) জাতীয় পরিচ্ছদ সংস্কার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি এই কার্য্যে সৌন্দর্য্যরুচির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ফল সাধারণ লোকে গ্রহণ করে নাই। সম্রাট সুইকোর সময়ে(৫৯৩ খৃঃ)পাগড়ী টুপির গঠন-তারতম্যে পদমর্য্যাদা প্রকাশের রীতি চীনা ধরণে প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময় টুপির উপকরণ ছিল জরির কাপড়; নানান রঙের কাপড়ও ব্যবহৃত হইত। অতি পুরাকাল হইতেই লালিমা-প্রধান বেগুনে রং শ্রেষ্ঠ পদবী সূচনার জন্য ব্যবহৃত হইত।

কাহারো জামার সামনের দুই মুখ সূতার 'বন্ধ' দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। সেকালে পুরুষেরা বাহিরে যাইবার সময় তরোয়াল লইয়া যাইত এবং মেয়েরা একটা অধিক পোষাক পরিত, তাহাকে পূর্ব্বে বলিত 'ওসুহি,' এবং পরে উহার নাম হয় 'কাৎসুগী'। তাহারা পাথরের হার গাঁথিয়া গলায় এবং ঘুঙুর গাঁথিয়া কোমরে পরিত,—এই ঘণ্টিকা কাঞ্চির নাম 'কুশিরো' বা 'তামাকি'। পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে সরেশ সৌখীন ছিল; হাঁটুতে ঘুঙুর গাঁথিয়া পরিত; সেই গহনাখানির নাম 'আয়ুবি'। পদস্থ ব্যক্তির অধীনস্থ মহিলারা কাঁধ হইতে সম্মুখে ঝুলাইয়া একখানি লম্বা কাপড় পরিত; ইহার আবশ্যকতা প্রথমে ছিল, পরে শুধু শোভার জন্যই ব্যবহৃত হইতে থাকে। সেকালের লোকেদের লাল রংটাই খুব পছন্দ ছিল; সবুজ, হলদে এবং কালো রংও অল্প স্বল্প রুচিত। এই সব রং ফুল বা পাতার রস চোঁয়াইয়া তৈরি করা হইত। শাদা রং পবিত্রতার নিদর্শন মনে করা হইত বলিয়া শাদা পোষাক শুধু

নারা যুগে (৭০০ খৃষ্টাব্দের সমকাল) রাজকর্ম্মচারী ও সাধারণ লোকের পরিচ্ছদের ধরণ পৃথক করিবার দিকে বিশেষ মনোযোগ পড়ে। উচ্চকুলজাতা মহিলারা গাঢ় লালমিশ্র বেগুনে রঙের পোষাক পরিত, এবং সেই পোষাকের আস্তিন পা পর্য্যন্ত ঝুলিয়া ঝল ঝল করিত। সেই লম্বা অখণ্ড পোষাকের তলে তাহারা দু রকম কাটা পোষাক পরিত, একটি 'শীতামো' বা আঙিয়া সম্মুখ হইতে পরিয়া পিঠের দিকে বন্ধ করিতে হইত এবং আর একটি 'উয়ামো' বা ঘাগরার মতো একটা কিছু। সেকালের জুতোর নাম 'হানাতাকাকুৎসু'। চীনের প্রভাবে এই পরিচ্ছদ ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইয়া আস্তিনে ও ঝুলে খাটো হইয়া আসে।

'কাৎসুগি' বা ঢিলা উপরের আলখিল্লা।
(ফুজিওয়ারা যুগ)

'কোশিমাকি' বা গ্রীষ্মকালের পোষাকের উপরচ্ছদ।
(তোকুগাওয়া যুগ—১৭, ১৯, শতাব্দী।)

মহিলাদের পরিচারিকারা এক রকম বিশেষ কায়দা-দুরস্ত পরিচ্ছদ 'হীরে' পরিত। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা যে কি রকম পোষাক পরিত তাহার কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখা যায় না।

নারা যুগে বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জন বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি হয়। এজন্য এই সময় হইতে রমণী-পরিচ্ছদ বাহুল্য ও দুর্ম্মূল্য হইতে থাকে। এখন হইতে নক্সা-কাটা নানান-রঙা কাপড়ে পোষাক করার চলন হয়। সবুজ হলদে আর নীল রঙেরই এখন বেশি আদর। এই সময়ে 'য়িজুরী' অর্থাৎ কাপড়ে ফুল পাখী ছাপার চলন হয়। অষ্টম শতাব্দীতে কিয়োতো নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে চীনের প্রভাব প্রবল হয়। তাহাতে পদস্থা মহিলারা হাঁটিয়া চলিতেন না এবং সেই কারণে জুতা ব্যবহার অপ্রচলিত হইয়া উঠে। গাঢ় লাল রঙের লম্বা চেরা ঘাগরা 'হীনো হাকামা' দিয়া পা ঢাকা থাকিত। নারা যুগের ফ্যাশান হইতে ইহা নূতনতর বিচ্যুতি।

৪৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে 'শাতামো'র চলন উঠিয়া গেল এবং লাল চেরা ঘাগরার চলন খুব বাড়িয়া উঠিল; এই 'উয়ামো' এক এক সময় পিছনে এত লম্বা করা হইত যে মাটিতে লুটাইয়া যাইত। ৬ শতাব্দী ধরিয়া এই রাজধানীর ফ্যাশান চরম বাহুল্য ও বিলাসের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সৌখীন ধনী মহিলাগণ একাধিক জামা (কোসোদ) এবং লাল চেরা ঘাগরার উপর পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া একটা লম্বা অস্তরহীন আলখিল্লা (উবাগী) এবং তাহার উপর একটা খাটো কুর্ত্তা 'কারাগিনু' পরিত। এই সময়কার পোষাকের 'মো' বা ল্যাজ অত্যন্ত লম্বা হইত। পরিচ্ছদ পরিধায়ীর বয়স, পদমর্য্যাদা ও ঋতু অনুসারে পোষাকের ধরণ ও গুণ-তারতম্য নির্দ্ধারিত হইত।

'হীরে' বা উত্তরীয় এবং 'মো' বা ল্যাজ সংযুক্ত পোষাক।
(নারা যুগ ৭০০ ৭৫০ খৃষ্টাব্দ

হেইয়ান যুগের জাপানী পোষাক (৭৫০—৮৫০)।
(ইহাতে 'হীরে' বা উত্তরীয়, 'কারাগিনু' বা চীনে ধরণের খাটো কুর্ত্তা, 'ওমতেগিনু' বা সামনের পোষাক, 'উয়ামো' বা আঙিয়া, 'শীতামো' বা ঘাগরা, এবং 'হাকামা' বা পাড়, দেখা যাইতেছে।)

জামার সংখ্যা দিয়া পদমর্য্যাদা প্রকাশ করিবার বাতিক এক কালে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে রমণীরা ১৮টা হইতে ২৫টা জামা, প্রত্যেকটি দর্শকে দেখিতে পায় এমনতর ক্রমনিম্ন স্তরে গলা ও আস্তিন সাজাইয়া, পরিত। যে যটা জামা পরে তাহা দেখানো আজকালকারও রীতি। রমণীগণ নিজেদের জামা পরার দক্ষতায় শেষকালে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিল যে সরকার হইতে নিয়ম বাঁধিয়া দিতে হইল কেহ বারোটার বেশি জামা পরিতে পারিবে না, এবং সেও সর্ব্বোচ্চ পদবীর রমণীর বিশেষ অধিকার।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের রাজশক্তি যখন ক্ষত্রিয় অধিকারে আসিল তখন দুইটি অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল—সামরিক অভিজাত 'বুকে' ও দরবারী অভিজাত 'কুগে'। দরবারীরা কিয়োতো নগরে শক্তি সংহত করিতেছিল, এবং সামরিকেরা কামাকুরা নগরে। সামরিকেরা, সাম্রাজ্য শাসন ও শক্তি সঞ্চালন করিতেছিল, এজন্য দরবারীরা শীঘ্রই সামান্য ও দরিদ্র অবস্থায় পতিত হইল। এজন্য তাহারা পুরাতন ফ্যাশানের অনুসরণ করিতে লাগিল এবং ক্রমশ বাহুল্য দুর্ম্মূল্য পোষাক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছিল। এমন কি মেয়েদের লাল চেরা ঘাগরাও ত্যাগ করিতে হইল, এবং বিশেষ ব্যাপারেই কখনো কদাচিৎ 'উয়ামো'র সাক্ষাৎ লাভ ঘটিত। মধ্যবিত্ত অবস্থার রমণীদের বাহিরে যাইবার সময় একটি পাতলা কাপড়ের ঘোমটা ব্যবহার চলন হইয়া উঠিল এবং দুইশত বৎসর আগেও এই ঘোমটার চলন ছিল।

নারা যুগের সম্ভ্রান্ত জাপানী মহিলা

(কোরিয়া হইতে প্রচলিত বীণা যন্ত্র ও শাদা কাপড়ের পোষাক দেখাইতেছে।)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গৃহবিবাদে দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িলে পোষাকের জাঁমজমক অনেক কমিয়া গেল। শামুরাই স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত, পোষাকের ল্যাজ ছাঁটিয়া বাহুল্য বর্জ্জন করিল এবং শুধু একটি ঢিলা উপরের আলখিল্লা পরিয়াই সন্তুষ্ট হইল; শেষে এই রীতি পরবর্ত্তী কালেও রহিয়া গেল। এই সময়ে গ্রীষ্মকালের দরবারী পোষাকে সেই ঢিলা আলখিল্লা 'ওবি' বা পেটি দিয়া নিতম্বদেশে বাঁধিয়া রাখা ফ্যাশান হইল।

পরবর্ত্তী কালে পুরুষের পোষাকে বিবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলেও রমণীর পরিচ্ছদ যেমনকার তেমনি ছিল।

লম্বা আস্তিনের জাপানী পোষাক।

(তোয়োতোমি যুগ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। মহিলাটির হাতে একটি ডমরু আছে।)

এবং নারীপরিচ্ছদ ক্রমশ সরলতা ও বাহুল্যবর্জ্জনের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল।

তোকুগাবা যুগে যখন দেশের অবস্থা স্বচ্ছল হইল, তখন সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল এবং দরবারী রমণীরাও নবম শতাব্দীর ফ্যাশান পুনঃ প্রচলিত করিতে লাগিল। সে পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ উপরের পোষাকে।

এই পোষাকসমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য সরকার হইতে দরবারী পোষাকের রীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইল। নববর্ষের পোষাক 'জিশিরো' বা শাদা, 'জিগুরো' বা কালো, 'জিয়াকা' বা লাল এবং তারপর নীল, আশমানি, ও খাকি রঙেও তৈরি হইত। বয়স ও মর্য্যাদা অনুসারে রং নির্ব্বাচিত হইত। হাশিয়াদার বা নক্সাকাটা সাটিনে দরবারী পোষাক তৈরি হইত এবং সাধারণ পোষাক কাজহীন ক্রেপ কাপড়ে। গ্রীষ্মকালে খুব পাতলা কাপড়ের জামা ব্যবহৃত হইত।

আধুনিক কালের ফ্যাশান দুরস্ত সৌখীন জাপানী মহিলা।

সাধারণ স্ত্রীলোকেরা বিবাহবাসর ভিন্ন অন্য সময়ে 'উচিকাকে' বা লম্বা আলখিল্লা পরে না। তাহাদের সাধারণ পোষাক ডুরে কাপড়ের। আধুনিক কালে যে অস্তরহীন পাতলা জামা পরার রীতি চলিয়াছে তাহা নিতান্ত আধুনিক।

আস্তিনের ফ্যাশানে খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে আস্তিন বাড়িতে আরম্ভ করিয়া আজকাল তিনচার ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়াছে। এই ধরণকে 'ফুরি সোদে' বলে। 'ওবি'রও চৌড়াই প্রথমে দু তিন ইঞ্চি হইতে নয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আস্তিন ও পেটির ফ্যাশান সাধারণ লোকের মধ্যেই প্রথমে প্রাদুর্ভূত হয় এবং পরে অভিজাত সম্প্রদায় তাহা গ্রহণ করে—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা 'হেওরি' বা লম্বা উপরের আলখিল্লা পরিতে সুরু করে, এবং এখন সকল শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের মধ্যেই উহার খুব চলন হইয়াছে। এই পোষাক প্রথমে ভ্রমণ কালে ধূলা হইতে আসল পোষাক বাঁচাইবার জন্য ওভারকোটের মতো ব্যবহৃত হইত। পরে ইহা বাড়ীতেও ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে বাড়ীর মেয়েরাও পরিতে ধরে। এখন ত ইহা ভদ্র পোষাকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন কি গ্রীষ্মেও উহা ছাড়াছাড়ি নাই।

একখানি অপ্রকাশিত কাব্য

কবি রজনীকান্তের "কান্তপদাবলী"র মধুর ঝঙ্কারে আজ বঙ্গের সাহিত্যকানন মুখরিত। কিন্তু পাঠক সাধারণ বোধ হয় অবগত নহেন রজনীকান্তের কবিত্ব তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি।

রজনীকান্তের পিতা স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন সদরালা (বর্ত্তমান সময়ের সব জজ) ছিলেন। দীর্ঘকাল আইনের খুঁটিনাটির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও তিনি তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব সম্পদ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

তখন বাঙ্গালা ভাষার শৈশব। বঙ্গদেশ তখন বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর মধুর হিল্লোলে বিভোর। স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন সেই সময়ের কবি। নিজে পরম বৈষ্ণব, তৎকালোচিত পারসীক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, সুতরাং গুরুপ্রসাদের কবিতার স্থানে স্থানে বাঙ্গালা কবিতা পাওয়া গেলেও অধিকাংশই বৈষ্ণব কবিগণের অনুকরণে ব্রজবুলিতে রচিত এবং প্রায়শঃ প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের ভাবে অনুপ্রাণিত। আর গুরুপ্রসাদ সেনের লেখা সুধুই গীতি কবিতা।

এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে তাঁহার দুইখানি মাত্র কাব্য পাওয়া গিয়াছে—একখানির নাম "পদচিন্তামণিমালা।" এখানি খুব সম্ভব সেন মহাশয় বর্ত্তমানেই রাজসাহীর ধর্ম্মসভাধিকৃত তমোঘ্ন প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল।

"পদচিন্তামণিমালা" প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণেরই অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন

কবিতায় প্রকাশিত এবং কবিতাগুলিও তাল লয়-যোগে গীত হইবার উপযোগী করিয়া রচিত। ভাষার বিশুদ্ধি, রচনার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের প্রগাঢ়তায় পদচিন্তামণিমালার অনেক কবিতাই চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাসের কবিতার সহিত সমান আসন গ্রহণে অধিকারী। আমাদের স্থানাভাব বশতঃ "পদচিন্তামণিমালা" হইতে কোন কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিতে পারিলাম না, বিশেষ আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ—নাম "অভয়া বিহার"।

আগেই বলিয়াছি সেন মহাশয়ের দুইখানি গ্রন্থ, দুইখানিই গীতিকাব্য। সুতরাং আর বলিয়া দিতে হইবেনা "অভয়া বিহার" গীতিকাব্য। গ্রন্থখানির রচনাকাল গ্রন্থমধ্যে পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট নাই। কেবল একটী কবিতায় "বড় পরসাদ দাস" বলিয়া ভণিতা দেওয়া আছে। এবং কবির নিজের লিখিত পাদটীকায় "বড়" শব্দের অর্থ বৃদ্ধ দেওয়া আছে। রজনী বাবুর মুখেও শুনিয়াছি এখানি সেন মহাশয়ের শেষ বয়সের রচনা। পদচিন্তামণিমালার রচনার সহিত তুলনা করিলেও তাহাই প্রতীতি হয়।

"অভয়া বিহারে" দক্ষপ্রজাপতি-গৃহে সতীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। সমগ্র কাব্য ছয়টী কাননে বিভক্ত।

প্রথম কানন—বন্দনা ও প্রসাদদাসের দৈন্য। দ্বিতীয় কানন দক্ষপ্রজাপতি-গৃহে সতীর আবির্ভাব। তৃতীয় কানন—বাল্যলীলা। চতুর্থ কানন—সতীর তারুণ্য ও বিবাহ। পঞ্চম কানন দক্ষালয় হইতে সতীর কৈলাস-গমন। ষষ্ঠ কানন—ভৃগু-যজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ।

"অভয়া বিহারের" কবি গুরুপ্রসাদের স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ প্রবন্ধ-লেখকের নয়নগোচর হয় নাই। রজনীকান্তের হস্তলিখিত একখানি গ্রন্থ রজনীকান্তের নিকট ছিল। তাহা হইতেই প্রবন্ধ-লেখক একখানি অনুলিপি গ্রহণ করেন। রজনীকান্তের রক্ষিত পাণ্ডুলিপিখানি বিনষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক বিশ্বাস করেন তাঁহার নিকট এক্ষণে যে অনুলিপি আছে তাহাই শেষ।

কাব্যের দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা বা অধিকার বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের নাই। কাব্যখানির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। প্রবন্ধ-লেখকের অযোগ্যতা, বিশেষতঃ রজনীলিপিতে অজ্ঞতা, নিবন্ধন আলোচ্য কাব্যের যদি অণুমাত্র সৌন্দর্য্যহানি হইয়া থাকে পাঠক সাধারণ তাহা স্বীয় গুণে মার্জ্জনা করিবেন। এবং যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি কাব্যখানির প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন এবং তদ্দ্বারা রজনীকান্তের দুঃস্থ পরিবারের কথঞ্চিৎ সাহায্য হয় তাহা হইলেই প্রবন্ধ লেখক তাহার সকল শ্রম সার্থক মনে করিবেন।

প্রথম কাননে কবি—

বিঘনি-বিমোচন রাজ।
নাম গজানন, কাম-কল্পতরু॥

নগজানন্দনকে বন্দন করিয়া

চরাচর-চরক চণ্ডীগুণ-কীর্ত্তন
চরণ মধুরিম কঠিন কুশারি।
যাচে প্রসাদদাস, হিমজা-সুত
দৃঢ়তর সুকৃতি দশন অনিবারি।

প্রাণনা পূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

গণপতির পরে সরস্বতী, তৎপরে
সকল কুশলময় আময় পরলয়

মহাদেব বন্দনা গাহিয়াছেন।

ওপদ পরশে শিলা ভেল মানবী
ইঙ্গিতে সাগরে সেতু।
পরসাদদাস চণ্ডীগুণ কীর্ত্তব
তুয়া পদরজ করি হেতু॥

বলিয়া কবি তৎপরে শ্রীরামচন্দ্রের চরণ বন্দন করিয়াছেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা শেষ করিয়া কবি চণ্ডীর "লব্ধ মধুপ-কুল মিলিত পদাম্বুজ" "দরশনে নাহি নয়ন কোটি কোটি" জন্য বিধাতাকে নিতান্ত নিকরুণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। বন্দনার পর "প্রসাদদাসের দৈন্য।"

ক্ষীণমতি মনন চণ্ডিকা-গুণগান
*　*　*　*
দূর সরোবরে সলিলে বিকসিত
কমল কুসুম কত লাখ।
সোরভে আকুল মদমত মধুকর॥
উড়য়িতে নাহিক পাখা॥

তথাপি—

সাধক সহজ কৃপালব পাবক
দগধয়ে বাধক দাম।
এবল হৃদে ধরি সাহসে ভাসল
প্রসাদদাস মতি বাম॥

দ্বিতীয় কাননে দক্ষ-প্রজাপতি-গৃহে সতীদেবীর জন্ম।

মহাদেব সতীদেবীকে পত্নীরূপে পাইবার আশায় লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছেন। এমন সময় দৈববাণী হইল—

বিরম অঘোর কঠোর ঘোর তপ
দক্ষ ভবনে শরবাণী॥

অমনি

পিয়া পরকট শুনি টুটল ধেয়ান।
বিপুল পুলকে পরিপূরিত অন্তর
বাজত অধরে বিষাণ॥

সুখ হউক দুঃখ হউক অপর কেহ অংশী না হইলে বুঝি তাহার ভার দুঃসহ হইয়া উঠে, তাই

পরমানন্দ ভরে নন্দী বোলাওত
বোলত দৈব নিশান।

সে নিশান

কলপ আরাধিত কনক কলপ লতি
গাঁঠি মিলাওল আনি॥

এদিকে "শ্রীপরসূতি প্রজাপতি-বনিতা"র গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। "দিনে দিনে পূর্ণ গরভ দশমাস"। নিরূপিত সময় পূর্ণ হইল তথাপি প্রসবে বিলম্ব দেখিয়া সকলেই বিশেষ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ওঝা ডাকিয়া পাঠান হইল। ওঝা আসিয়া

"প্রসব বিলম্বে ঝাড়ে সবে পানি।"

অবশেষে প্রসব ব্যথা উপস্থিত হইল—

"শেষ রজনী জগতজননী
জনম নেলি ভুবনে।"

সতীর জন্মগ্রহণ মাত্র সমস্ত বিশ্বে এক মহা হর্ষকোলাহল উপস্থিত হইল।

নীরস শাখী সরস ভোর
ঘোঘো ঘুঘু গমকে ঘোর
শুক শারিক পিক গায়ক
নাচত শিখী অঙ্গনে।

সমস্ত প্রকৃতি আনন্দে উন্মত্ত হইল। চারিদিকে জন্মোৎসব আরম্ভ হইল।

শুভখণে বিশ্বজননী জগ আওলি
জ্যোতিঃ কোটি শরদিন্দু।
কিয়ে সুর কিন্নর কিয়ে নর ভূধর
নিমগন আনন্দ-সিন্ধু॥

এদিকে প্রজাপতি-গৃহে নারদাদি ঋষিগণ আসিয়া "শ্রুতি আওড়াইয়া" শোধিত পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত প্রদান করিলেন। বাদকদল—

অঙ্গভঙ্গ করি, ডঙ্ক বাজাওত
লম্ফে ঝম্ফে জগঝম্প।

দুয়ারে নহবত বসিয়া গেল। মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, বীণা, সপ্তস্বরা প্রভৃতি চারিদিকে বাজিয়া উঠিল। যামিনী গত দেখিয়া "অতি হরষিত গমনাকুল যোষিত"দল দক্ষ গৃহে আসিয়া কেহ—

আচরে বয়ন মুছই অনুরাগে।

কেহবা—

কেশর অবসরি চুম্ব সোহাগে।

প্রজাপতি আনন্দে গদগদ হইয়া উপস্থিত কুলযোষিত গণকে "তৈল, তাম্বূল, গুবাক" ও ভিক্ষুকগণকে বহু ধন প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণকে মাণিক রত্নাদি সহ—

কনক-খচিত খুর চারু বিষাণ
শত শত ধেনু বৎস সঙ্গে দান॥

করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ক্রমে ভূরি ভোজনের আয়োজন হইল। দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে প্রজাপতি গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। আনন্দ কোলাহলে দিবস অতিবাহিত হইল।

তৃতীয় কাননে বালা সতীর বাল্যলীলা। বালিকা—

জননীর স্তনমুখে পাইয়া পরম সুখে
দুধ খায় পদ দোলাইয়া।

আর—

জননী দেখিয়া মুখ মনে জাগে কত সুখ
আঁখি ঝরে অধর বহিয়া॥

জননী একদৃষ্টিতে কন্যার মুখ দেখিতেছেন—মুখ দেখিয়া কিছুতেই জননীর তৃপ্তি হইতেছে না। অবশেষে সমস্ত অপরাধ নিকরুণ বিধাতার স্কন্ধে অর্পিত হইল।

একে দুটি আঁখি মোর দেখিয়া না হয় ওর
আবার নিমিখ দিল বিধি।

ইহার উপরও সদাই হারাই হারাই আশঙ্কা।

আজ এটা কাল ওটা নিতুই আপদ ঘটা
অভাগী-কপালে কিবা ঘটে।

একদিন—

অলসে জননীভুজে রহি জগমাই।
উঁখি উঁখি ঘন ঘন তেজই হাই॥

অকস্মাৎ জননীর সোৎসুক দৃষ্টি কন্যার মুখবিবরে নিপতিত হইল। যাহা দেখিলেন তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

মুখ মাহা পেখি জননী অদভুত।
অখিল জগত পুন দানব ভূত॥
স্বরগ বরগ অরু শশী সুরপাল।
বিধি পঞ্চানন হরি ব্রজবাল॥

কন্যার অদৃষ্টচর ব্যাধি নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া প্রসূতি প্রজাপতির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরবরে বোলত কি দেখত আর।
পূজহ বটুক করহ প্রতীকার॥

একদিন বালিকা স্তন্যপান করিল না দেখিয়া—

জননী আকুল মনে শিরে করাঘাত হানে
বুঝি মোর ভাগ্য ভাঙ্গি যায়॥

দক্ষগৃহ মুহূর্ত্তমধ্যে বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন হইল সকলেরই "দিঠি-জলে তিতিল দুকুল।" অবশেষে ওঝা আসিয়া উপস্থিত হইল।

ওঝা ঝাড়ে শিরে বুকে মুখে মন্ত্র পড়ি ফুঁকে
কহে আর নাহি কোন বাধ॥

জননী তথাপি নিঃশঙ্ক হইতে পারিলেন না

কোলে করি মায় ধায় দেবী-গৃহদ্বারে যায়
কহে মাগো ক্ষম অপরাধ।
এত কহি শিশুমুখে স্তন রাখে মহাসুখে
দ্বার-রজ অঙ্গেতে মাখায়।

এতক্ষণে বালিকা স্তন্যপান করিলে জননীও নিশ্চিন্ত হইলেন।

এক রজনীতে কাঁদিতে কাঁদিতে
অথির মহিষী-বালা।
না মেলে নয়ন নাহি পিয়ে স্তন
যেন বেয়াধির জ্বালা॥

অমনি দক্ষগৃহে হাহাকার উঠিল। জননী ব্যাকুল হইলেন, তাঁহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা

বুঝি মোর ভাগ্য ভাঙ্গি যায়।

তখন

কেহবা তাবিজ কেহবা কবচ
রক্ষা শিক্ষা শিরে বাঁধে।

এদিকে

পড়ে দ্বিজ সব বটুক ভৈরব
অপরাজিতার স্তব।

বহুযত্নে বালিকা সুস্থ হইল। বালিকাকে নিরাপদ করিতে জননীর মুহূর্ত্তের জন্যও সতর্কতা গ্রহণে ত্রুটী নাই। জননা প্রতিদিন

নিশিতে লোহার খণ্ড শিয়রেতে রাখে।
শয্যারক্ষা মন্ত্রপাঠ করে লাখে লাখে॥
পরভাতে পরসূতি শিক্ষা বাঁধি দেয়।
মনসাধে মুখের নিছনি মুছি নেয়॥
গোময় মসীর বিন্দু কপালে ছোঁয়ায়।
থুথু সঙ্গে পদধূলি শিরেতে বুলায়॥

একদিন বালিকাকে ঘুমাইয়া রাখিয়া জননী গৃহকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে

বিজয়া ধাইয়া রাণী আগে গিয়া
চকিত নয়নে কহে।
মন্দিরের মাঝ কিবা কর কাজ
কেমনে পরাণে সহে॥
বিনোদিয়া ঝিয়া একেলা রহিয়া
বসিয়া ধরণী পরে।
কটি হেলাইয়া দু'হাতে তুলিয়া
মাটী খায় অকাতরে॥

আসিয়া দেখহ মাই।
লাল ঝোল বহি পড়িতেছে মহী
হাতে বাজাইছে তাই॥
পঙ্ক তুলিয়া উদরে মাখিয়া
হাসিছে আনন্দ ভরে।
শত অলঙ্কার রত্ন মণিহার
সে শোভা নাহিক ধরে॥

বিজয়ার কথা শুনিয়া

ত্বরা গিয়া রাণী নিজ কোলে আনি
আঁচরে মুছল অঙ্গ।

এমনি নানাভাবে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে

দুবরি চরণ দুই চলই না পার
মন্দির ধার ধরি শিখে সতী চার।
উঠি গিরি করইতে শিখলহুঁ চলনা
উঁকি উঁকি পুছইতে শিখলহুঁ বলনা॥

বালিকা দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কখনও বা

মেলিয়া নব নব সমবয় বালা
কর্দ্দমে নিরময়ে রন্ধনশালা।
মৃণময় খপর দারু কলছুল
রন্ধন-পাত্র নাচে সমতুল॥

কখনও বা

শম্ভু পূজে সবে মুদিয়া নয়ানা।
বম বম ধ্বনি করি গাল বাজনা॥

এদিকে—

শৈশব যৌবন দুহুঁ করু ভেট।
বুঝই না হোয়ত জেঠ কনেঠ।
* * * *
তারুণ রাজন নব অধিকার
আপন রাজ করত পরচার।
পহিলহি কয়ল পয়োধর গাড়ি
কচ চয় চামর হোত ঢুলাড়ি॥

ইহা দেখিয়া দুহিতাকে পাত্রস্থা করিতে প্রজাপতি দক্ষ কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। এমন সময় মহর্ষি নারদ আসিয়া প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কাহে হেরি নৃপ তুয়া মুখ ভার।

প্রজাপতি উত্তর করিলেন—

গৃহে মঝু নন্দিনী ভেলি সেয়ানী।
গৃহ কুল জাতি নৃপতি-মরিয়াদ
এসব সমঝিয়ে বিষম বিষাদ।
না মিলে সমুচিত বর সন্ধান।

তবে

ঋষিগণ গণয়িতে তুহুঁ আগুয়ান।
অবনী অমরপুরে তুহারি বাখান॥
অটল শীল কুল সুন্দর ধীর।
নিরখি পরখি তুহুঁ বর করু থীর।

প্রজাপতির বাক্যে নারদ বলিলেন—

"যদি পুছ মোয়।
সুধামুখী সতী বর শঙ্কর হোয়॥
তরুণ মদন জিনি মুরতি উজোর
অখিল সুরাসুর ভাবে বিভোর॥
নবগুণে ভূষিত সোই গোঁসাই।
ঐছে কুলীন হি দোসর নাই॥
* * * *
সো বরে দেহ দুহিতা উদবাহ॥

নারদ ঠাকুর পাকা ঘটক। প্রজাপতি নারদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন দেখিয়া

আওল মুনিবর শঙ্কর-পাশ।
শুনি শঙ্কর-মনে উয়ল উলাস
পুলক মুকুল পরিপূরল অঙ্গ।
* * * *
প্রজাপতি-মন্দির তীরথ মানি।
মুনি সঙ্গে করলহুঁ তুরিত পয়ানি॥

প্রজাপতি পাদ্যার্ঘ দ্বারা উভয়ের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ক্রমে প্রতিবেশিগণ প্রজাপতি-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। নারদ ঠাকুরের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষই বিবাহে সম্মত হইলেন। বুধগণ বিবাহের শুভদিন শুভতিথি নির্দ্ধারণে বসিয়া গেলেন।

সপ্তশলাকা দোষ
বর্জ্জিত নিশিকোষ;
দশ যোগ করি ভঙ্গ
লগন বিবাহ-অঙ্গ॥

বিবাহে লগ্নাদি নিরূপণে বরের জন্মপত্রিকা আবশ্যক হইল

হরে পুছে বুধ-গোষ্ঠী
কাঁহা জনম-কোষ্ঠি।
কহে হর রস-কোড়া
কোষ্ঠি গিয়াছে পোড়া॥
কহিতে না পারি দড়
কি সতী কি আমি বড়॥

উত্তর শুনিয়া চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। অবশেষে শুভলগ্ন নির্ণীত হইল। প্রজাপতি-গৃহে বৈবাহিক উৎসব আরম্ভ হইল। বৈবাহিক উৎসবই রমণীর—সুতরাং সে উৎসবে

সাজল সব অমরালয় নারী
শঙ্করী শঙ্কর পরিণয়-উৎসবে
ভূপ-ভবনে আগুয়ারি॥

শুভদিনে শুভলগ্নে প্রজাপতি হর-করে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। "জগত জননী মোহন বর নাগরে" মিলিত দেখিয়া

রূপে তবধ স্বরগ মরত থিরহুঁ দিকপাল।
গভীর ঘোর ভাবে মগন চরাচর বিশাল॥
সাফল করু আপ জনম রূপ অমিয় মাখিরে
নিচল তটিনী থির গহন তবধ সকল পাখীরে॥

সে রূপই কেমন—

ফাটিক অতি নিরমল জলে চাঁদ পড়ল বিম্বিত।
মুকুলিত-সহকার-শাখে হেমলতি বিলম্বিত॥
প্রাত শিশির শুভর কাতি ধরু নব রবি আভা
তুঙ্গগিরি-তুষারপুঞ্জে চমক বিজুরি-শোভা॥
নীলকণ্ঠে গীরল সতী কনকবরণ-লাবণি।
ডুবুডুবু রবি হেমকিরণ নীল গগনে চারণি॥
কিয়ে পাবন ধবল কাঁতি হেমবরণ ভাতিরে।
উদগম মুখ নব কিশলয়ে শিশিরপুঞ্জ পাতিরে॥

সে ভুবনমোহন রূপ দেখিতে দেখিতে

চকিতে ঘোর রাব উয়ল ভেদি গগনদেশা।
জয় জয় সতি জগতজননি শঙ্করি পরমেশা॥

পঞ্চম কাননে পিতৃগৃহ হইতে সতীর পতিগৃহ গমন। প্রসূতি মূর্ত্তিমান অপত্য স্নেহ। প্রসূতির সর্ব্বদাই আশঙ্কা "বুঝি মোর ভাগ্য ভাঙ্গি যায়।" বিবাহোৎসব শেষ না হইতেই নানা দুর্ণিমিত্ত দর্শনে দুহিতার বিরহ-শঙ্কায় প্রসূতি নিতান্ত উন্মনায়মানা হইলেন। এমন সময় মহাদেব স্বগৃহ গমনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া মহিষীর

মাথে পড়ল জনু ভাঙ্গি আকাশ।

মহিষীর প্রথম আপত্তি

পাণি গ্রহণ বনিতা হর আশ।
তব কাহে মাগে বিজন গিরিবাস॥
নিজ ঘরে গুরুজন দোসর নাই।
পাইল যুবতী সতী কৈছে নিবাই॥

দ্বিতীয় আপত্তি

নওল কমল কুলবালা।
পরখর পরখর রবিকর-জ্বালা।
কঠিন কাল বহুরাই।
গণয়িতে দোষ পড়সি আগুয়াই॥

সুশীল কুশীলক নাহি বিচার।
শাসন নিয়ম সমহি ব্যবহার॥
ঝিঅরু জননী কি ঘর ওড়ে ওড়ে।
এক-ঘর অনল তনুক ঘর পোড়ে॥

আরও আপত্তি

এ সতী সাঁজে ঘুমাই।
আদরে আদরে সাধি চিয়াই॥
* * *
পরশে না অশন-গরাস
সো করু কৈছন পতিঘরে বাস॥

প্রসূতির সমস্ত আপত্তিই নিরর্থক হইল। "ভজন আনন্দী" নন্দী প্রভুর আদেশ পাইয়া মহোল্লাসে কৈলাস যাত্রার আয়োজনে নিযুক্ত হইল। যাত্রাকালে জননী জামাতার হস্তে দুহিতাকে সমর্পণ করিয়া নানা প্রকারে বলিয়া দিলেন।

সহজে অবলা অতি অলপ গেয়ান।
অরু শিশুমতি সতী কিছুই না জান॥
* * *
মাপ করবি অবলা অপরাধ।
যতনে সিধাওবি সতী মনসাধ॥
দরশনে দোষ রোষ পরিহারি।
বারবি হিত উপদেশ বিথারি॥

সখীরা আসিয়া শঙ্করকে বলিলেন

গুরুজন ননদী নাহি উপলক্ষ।
ভোজন পানে করবি তুহু লক্ষ্য॥

তারপর পতিগৃহগমনোদ্যতা দুহিতাকে জনকজননী আবশ্যকীয় উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রসূতি বলিলেন—

হোম আরাধন যাগ ধেয়ান।
এক নহত পতি-চরণ সমান॥
কুলবতী রমণী-করম পতিসেবা।
পরসন রহই নিতুই সব দেবা॥
দেহ সুখাওবি পতিসুখ লাগি॥
নিজ সুখে নহে জনু মন অনুরাগী॥
স্বামী অশন অবশেষ তঁ যোই।
নারী কি দিনকৃত ভোজন সোই॥
* * *
অনুখন সব সঞে পতিগুণ সংশবি
নিজ পতি গুণ হি আলাপি।
স্বামী-অযশ-কণে কান না দেওবি
ঝটিতি তেয়াগবি ঠান।
পুন ইহ বেদবিহিত মত সঙ্গত
বধইতে আপন প্রাণ॥
* * * *
গৃহাশ্রম অতি গরীয়ান।
দৈবত দ্বিজ জনে সমুচিত মান॥

সখীরা আসিয়া তাহাদের উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিল।

সেবনে স্বামী কামী নাহি হোয়বি
সতত রহবি অনুগামী।
নিজ অপরাধ মাপ তুঁহু মাগবি।
চরণকমল পরণামি।

এ উপদেশ হিন্দু জনক জননীরই উপযুক্ত। এ ছবি হিন্দু গৃহেরই ছবি।

নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর দক্ষালয় হইতে কন্যা জামাতা বিদায় গ্রহণ করিলেন। কৈলাসে উপস্থিত হইলে "যদুপতি গৃহিণী" বধূকে বরণ করিয়া লইলেন।

ষষ্ঠ কাননে ভৃগু যজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ। ভৃগু যজ্ঞে সমবেত "বিধি হরি হর বিনু সব জন আন" সমাগত দক্ষ প্রজাপতিকে বন্দনা করিলেন। শঙ্কর প্রজাপতির জামাতা হইয়াও চরণ বন্দনা না করায় প্রজাপতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে স্বয়ং এক যজ্ঞ উপস্থিত করিলেন। সে যজ্ঞে

হরি হর বিধি পরিতেজি নিমন্ত্রণ
নারদ করু সম্বাদ।
আনল সতী বিনা আন সুতাগণ,

তাই

গরবে ঘটল পরমাদ।

পিতৃগৃহে যজ্ঞের সমাচার "জনরবে জানি শিবানী" যজ্ঞ দর্শনে যাইবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া পতির নিকট পিতৃগৃহ গমনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

শঙ্কর বলিলেন

শুন শুন শঙ্করি করু অনুমান।
যাওবি তুহুঁ যদি বড় অপমান॥
পুন কুজবারে উত্তর দিশি শূল।
নিতান্তই মোহি গমন-প্রতিকূল॥
*

অতএব

গমনে জনক-ঘরে করিয়ে নিবার॥

সতী ক্রোধে উত্তর দিলেন

বাপের ঘরেতে ঝি।
তাহে আবাহন কি॥

স্বামীর সহস্র নিষেধ উপেক্ষিত হইল। চণ্ডী যজ্ঞ দর্শনে পিতৃগৃহে ছুটিয়া চলিলেন। মহাদেব উপায়ান্তর না দেখিয়া নন্দীকে বলিলেন

বাহন ধরি চলহ সাথ।
দেখবি নহ বিঘনি পাত॥

এদিকে কুবের আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন

বিনু আভরণে জনক-বাস।
যাওবি কাহে থাকিতে দাস॥

কুবের নানা রত্নময় অলঙ্কারে শঙ্করীর দেহসজ্জা করিয়া দিলেন। কিন্তু কুবেরের এ প্রাণপাত চেষ্টা কুবের পত্নীর এক কথায় ব্যর্থ হইয়া গেল। কুবের পত্নী স্বামীকে বলিলেন

ভুবন চরাচর সৃজন বিনাশন
যাকর নয়ন-ইসারা।
তুচ্ছ রজত মণি মাণিক কাঞ্চনে
সো তনু করসি সিঙ্গারা॥
* * * *
স্বয়মপি যো তনু জগত-বিভূষণ
সো কি ভকতি বিনু সাজে?

কুবের পত্নী কুবের প্রদত্ত সমস্ত রত্নাভরণ উন্মোচন করিয়া পুষ্পাভরণে সতীর দেহসজ্জা করিয়া দিলেন। রত্নহার উন্মোচন করিয়া গলদেশ চম্পকহারে ভূষিত করিলেন। প্রকোষ্ঠে রত্নবলয়ের স্থান "কুসুমিত বলয়" অধিকার করিল। ভুজদ্বয় রঙ্গন-অঙ্গদে ও কটীদেশ মালতী-মেখলায় সজ্জিত হইল। "কুসুমিত মুকুট" মৌলিদেশে বিরাজমান হইল। "সগন্ধ বিল্বদল স্থলপঙ্কজকুল" চরণাম্বুজে অর্পণ করিয়া কুবের-পত্নী সতীর দেহসজ্জা সমাপ্ত করিলেন।

এদিকে দক্ষগৃহে প্রসূতি সতীকে না দেখিয়া গতচেতনা ছিলেন। এমন সময়ে সতী গিয়া জননীর চরণ বন্দনা করিলেন। জননী আনন্দে দুহিতাকে ক্রোড়ে সংস্থাপিত করিলেন। মুখচুম্বন ও কুশল প্রশ্নের পর মাতা পুত্রীর মধ্যে বহু অতীত বিরহ-কাহিনীর বিনিময় হইল। ক্রমে যজ্ঞের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে প্রসূতি বলিলেন

কতয়ে বোধলুঁ রাজেরে।
নারী ভাষণ করে কি মানন
মরি মা মরম-লাজেরে॥
শিব নিমন্ত্রণ কয়ল বরজন
দুখহি আকুল প্রাণরে।
স্বামী-অনুগতি নারী কুলবতী
কৈছে করি সমাধানরে॥

কিঞ্চিৎ "ক্ষীর নবনী" আহারের জন্য জননীর সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সতী যজ্ঞালয়ে উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞস্থানে শিব ভিন্ন সমস্ত দেবতার বরণ হইয়াছে, দেখিয়া সতীর হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইল। দুহিতাকে রুষ্ট দেখিয়া প্রজাপতি বলিলেন অপরাধ তাঁহার নহে অপরাধী সেই ভাঙ্গড়।

শঙ্কর উনমত কিয়ে কহ তোয়।
ভৃগুমুনি-গৃহে অবমানল মোয়॥

অভিমানিনী সতী উত্তর করিলেন—

হাম দুখিনী বিরূপাক্ষ ভিখারী।
কাহে জনক তুঁহু করব পুছারি।
দুহিতা কাঙ্গালিনী বঙ্গ জঞ্জাল।
পুছইতে মাগে রতন পরবাল॥

প্রজাপতির মুখে স্বামীর নানাবিধ নিন্দাবাদ শ্রবণে প্রসূতির উপদেশবাণী সতীর স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

স্বামী-অযশকণে কান না দেওবি
ঝটিতি তেয়াগবি ঠান।
পুন ইহ বেদবিহিত মত সঙ্গত
বধইতে আপন প্রাণ।

মুহূর্ত্ত মধ্যে কর্ত্তব্য নির্ণীত হইল—

তেজব অব নিজ দেহে
পুন না রহব ইহ গেহে।
* * * *
অঙ্গ দগ্ধ অনুবন্ধ
আজ সো ছোড়ব সো সম্বন্ধ।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া—

নিজ মুখে শঙ্করী জপে শিব নাম।
ঝর ঝর লোর ঝরয়ে অবিরাম॥

দেখিতে দেখিতে—

আপন আতম শিবে করি যোগ।
চকিতে করল সতী দেহ বিয়োগ॥

চারিদিকে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সব ফুরাইয়া গেল। শ্রীজগদীশ্বর রায়।

ক্ষণিকের গান

(নবাব আসফ উদ্দৌলা)

ঐ যে দোলে—ঐ যে কাঁপে ব্যেপে তোমার দুই নয়ন
মুক্তা কি ও? কিম্বা শিশির? টিঁক্‌বে কি ও বেশীক্ষণ?

চন্দ্রমুখের ঐ যে জুলুম—ঐ যে রূপের আকর্ষণ,—
হাকিম টলে হুকুমে যার,—টিঁক্‌বে কি ও বেশীক্ষণ?

চাঁদেরও হয় ক্ষয় উপচয়, হায় গো বিধির এই লিখন,
চন্দ্রমুখের ঐ যে বিভা টিঁক্‌বে কিও বেশীক্ষণ?

যৌবনেরি আব্‌-হাওয়াতে তাজা তোমার শরীর মন,
যে হাওয়াতে গোলাপ ফোটে থাক্‌বে কি সে বেশীক্ষণ?

দুঃখ কিসের? দৈব মোদের ঘটিয়েছিল এই মিলন,
দৈবে আজি তফাৎ করে, রয়না কিছুই বেশীক্ষণ।

দুখের বার্ত্তা তোমায় যেন জানিতে না হয় কখন,
আমার এবার দম ফুরাল (বুঝি) টিঁক্‌ব না আর অধিকক্ষণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাখী

(ইংরাজি হইতে)

যাহারা আমাদিগের বনরাজি অনুপ্রাণিত করে, আমাদের ভ্রমণপথ আমোদিত করে, এবং আমাদিগের ছায়াবহুল নিভৃত বিশ্রামস্থান সমূহের নির্জ্জনতা দূর করে সেই সুন্দর মুখর প্রাণীজাতির নিকট হইতে মানবের কোন ভয় নাই; ইহাদের আমোদ এবং বাসনা, এমন কি ইহাদের বৈরিভাব, কেবলমাত্র প্রকৃতির সহজ চিত্রকে প্রাণিত করে এবং প্রকৃতির চিন্তা প্রীতিকর করিয়া তুলে।

প্রকৃতির কোন স্থানই বসতিবিহীন বলিয়া বোধ হয় না। অরণ্য, জলাশয়, গভীর ভূগর্ভস্থ স্থান—প্রত্যেকেরই স্ব স্ব অধিবাসী আছে।

প্রত্যেক শ্রেণীর এবং পদবীর প্রাণিগণ স্ব স্ব অবস্থার উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পক্ষিগণের অপেক্ষা অন্য কোনও প্রাণী অধিক স্পষ্টরূপে স্বকীয় অবস্থার উপযোগী নহে। তাহারা বলবত্তর চতুষ্পদ জীবগণের সহিত তুল্যরূপে উদ্ভিজ্জ ও জৈব পদার্থ সকল ভোগ করে। দৌর্ব্বল্যের পূরণ স্বরূপ তাহাদিগকে দ্রুতগতি প্রদত্ত হইয়াছে। এবং তাহারা যে সকল জন্তুর প্রতিরোধ করিতে অক্ষম, সেই সকল জন্তুকে পরিহার করিবার জন্য তাহাদের বায়ুমার্গে উঠিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

পক্ষীকে দেখিলেই বোধ হয়, যেন সম্পূর্ণরূপে পলায়নশীল জীবনযাপন করিবার জন্যই উহার দেহ গঠিত এবং প্রত্যেক অবয়ব দ্রুতগতির জন্যই অভিপ্রেত। শূন্যমার্গে উঠিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট বলিয়া ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় সমপরিমিতরূপে লঘু এবং ঘন না হইয়া বহুস্থান ব্যাপক।

মনুষ্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে তাহাদের গঠন বিলক্ষণ রুক্ষ এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ তাহারা চতুষ্পদ জীবগণের ন্যায় শিক্ষাপটু নহে। বস্তুতঃ যে সকল প্রাণীর মস্তিষ্ক আকারে প্রায় তাহাদের চক্ষুর সমতুল, তাহাদের নিকট হইতে আর কত বুদ্ধিমত্তার আশা করা যাইতে পারে? যদিও প্রকৃতির নির্ব্বাচনে তাহারা পশুজাতির নিম্নস্থান অধিকার করে এবং মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণ সমূহের কম অনুকরণ করে, তথাপি তাহারা শারীরিক গঠন এবং বুদ্ধিমত্তায় বহু প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার যোগ্য, এবং ঐ দুই বিষয়ে ইহারা মৎস্য এবং কীটকে অতিক্রম করিয়াছে।

শব্দবিদ্যায় যেমন অত্যাশ্চর্য্য শব্দগুলি সাধারণতঃ বেশী জটিল, শারীরসংস্থান সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মনুষ্যদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে অবয়বের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণরূপে গঠিত পশুগণের গঠনপ্রণালী অতি সরল; পক্ষীগণের শারীর গঠনপ্রণালী আরও কম জটিল; মৎস্য সমূহের শারীরিক যন্ত্রের সংখ্যা তদপেক্ষাও কম। সর্ব্বাপেক্ষা হীনাবস্থ কীটগণকে দেখিয়া বোধ হয় যেন, তাহারা জীবজগৎ এবং উদ্ভিদ-জগতের মধ্যবর্ত্তী অন্তরকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। প্রাণিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে গঠিত মনুষ্যের চারিটা ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব আছে, পশু জাতির মধ্যে উহার অধিক রকম আছে, পক্ষিগণের তদপেক্ষাও বহুতর; কিন্তু কীট জাতির মধ্যে এত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় যে, অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন না।

আমরা বলিয়াছি যে মানুষের সহিত চতুষ্পদ জন্তুর আভ্যন্তরিক গঠনের অতি সামান্য মাত্র সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পক্ষীর আভ্যন্তরিক গঠন সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন; তাহারা প্রধানতঃ বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করিবে বলিয়া তাহাদের প্রত্যেক অবয়বই তাহাদিগের নিরূপিত আবাসের উপযোগী। অতএব পক্ষিগণের সাধারণ বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের শারীরসংস্থান এবং গঠনের একটু সংক্ষিপ্ত বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকটিত করিতে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

তাহাদের বাহ্যিক আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা অতি অদ্ভুতরূপে দ্রুতগতির উপযুক্ত। তাহাদের শরীরের সম্মুখভাগ সূচাগ্র, তদ্ধেতু তাহারা অনায়াসে বাতাস ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। তৎপরে ইহাদের শরীর ক্রমশঃ সামান্যরূপে স্থূল হইয়া অবশেষে প্রসারণক্ষম লেজে পর্য্যবসিত হয়। লেজ থাকাতে শূন্যে ভাসমান থাকিবার সুবিধা হয়, আর সম্মুখবর্ত্তী অবয়বসকল তাহাদের সূচাগ্রতার দ্বারা বায়ুরাশি ভেদ করিতে থাকে। এই প্রকার আকৃতির জন্য পক্ষীকে জলমধ্যগামী নৌকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাহাদের ধড় খোলের,

মস্তক গলইয়ের, লেজ হালের এবং পক্ষদ্বয় দাঁড়ের অনুরূপ।

ইহার পর পক্ষীর বাহ্যিক গঠনপ্রণালীর মধ্যে পালকগুলি স্থাপনার ভঙ্গী অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। সকলগুলিই এক মুখে সজ্জিত থাকে। তাহাতে তাহাদের উত্তাপ, স্বচ্ছগতি এবং নির্বিঘ্নতা যুগপৎ সাধিত হয়। অধিকাংশ পালক পশ্চাদভিমুখে, এবং ঠিক যথাক্রমে একটির পর আর একটি পর্য্যায়ক্রমে স্থাপিত; গায়ের উর্দ্ধবিভাগ নরম ও কোমল পালকে আবৃত। ঐ সকল পালক বায়ু কর্ত্তৃক অনিষ্ট নিবারণের জন্য আরও দৃঢ়রূপে সন্নিবিষ্ট এবং বাহিরে বক্র। পালকগুলি পাছে বায়ুর সহিত প্রবল সংঘর্ষণে নষ্ট হইয়া যায়, বা বায়ুমণ্ডল হইতে আর্দ্রতা শোষণ করে, তজ্জন্য পক্ষীর পশ্চাদ্ভাগে তৈলপূর্ণ একটি মাংসগ্রন্থি আছে; পক্ষী চঞ্চু দ্বারা টিপিয়া সেই তৈল বাহির করিয়া লইতে এবং যে যে পালকে তখন দরকার সেই সেই পালকে আস্তে আস্তে উহা লাগাইতে পারে। এই মাংসগ্রন্থি উহার জঙ্ঘার শেষভাগে অবস্থিত এবং মলপথের সহিত সংলগ্ন; মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে কিয়ৎ পরিমাণে চিত্রকরের তুলির মত এক পালকগুচ্ছ জন্মায়। সেই পালকগুলি যখন ছিন্ন ভিন্ন বা কুঞ্চিত হইয়া যায়, তখন পক্ষীটি পশ্চাতে মাথা ফিরাইয়া চঞ্চু দ্বারা ঐ মাংসগ্রন্থি টিপিয়া ধরে এবং সেই তৈলবৎ পদার্থ নিঃসৃত করিয়া ছিন্ন পালকাংশ সমূহে মর্দ্দন করে, এবং বিশেষ যত্ন সহকারে সেই গুলিকে টানিয়া বাহির করিয়া পুনরায় একত্র এবং যথাক্রমে স্থাপন করে; তাহাতে ঐ সকল পালক আরও ঘনসন্নিবিষ্ট হয়। যে সকল গৃহপালিত পক্ষী অধিকাংশ সময় আবৃত স্থানে থাকে, তাহাদের ঐ তরল পদার্থের সংস্থান অনাবৃতস্থানবাসী পক্ষীর মত অধিক নহে। প্রত্যেক বৃষ্টির পশলায় মুরগীর ডানা ভিজিয়া যায় এবং উহাতে জল বসে; পক্ষান্তরে হাঁস প্রভৃতি যে সমুদয় প্রাণী স্বভাবতঃই জলে বাস করে, উহাদের পালকে ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতেই তৈল মাখান থাকে। এইরূপে তাহাদের ব্যয়পরিমিত এই তরল পদার্থের সংস্থান থাকে। তাহাদের মাংস পর্য্যন্ত ইহা হইতে এক সদ্গন্ধ লাভ করে। আবার কোন কোন পক্ষীর মাংস উহাতে এরূপ পূতিগন্ধময় হয় যে, সেই মাংস সম্পূর্ণরূপে অখাদ্য হইয়া উঠে। যাহা হউক এই তরল পদার্থে মাংস নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মানুষে সেই পালক সচরাচর যে সব কার্য্যে ব্যবহার করে, সেই সব উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ঐ তৈল পালকগুলির উৎকর্ষ সাধন করে।

পক্ষিগণ যে সকল পালকে আচ্ছাদিত, সেই সকল পালকও কম বিস্ময়কর পদার্থ নহে। প্রত্যেক পালকের মূল সামঞ্জস্য মত শক্ত, কিন্তু সরু এবং লঘু হেতু নীচে ফাঁপা; এবং পালকের মধ্যের উভয় পার্শ্বে যে শুঁয়া জন্মে তাহার দৃঢ়তার জন্য উপরে মজ্জাপূর্ণ। এই পালকগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য এবং দৃঢ়তা অনুসারে স্থাপিত, তাহাতে উড়িবার সময় যে পালকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং শক্ত তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ করে। পালকের শুঁয়াও এইরূপ কৌশল এবং যত্নপূর্ব্বক নির্ম্মিত। উহা অবিচ্ছিন্ন একখানি ত্বকে নির্ম্মিত নয়। যদি একখানি ত্বকে নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে ছিঁড়িয়া গেলে সহজে পুনর্নির্ম্মিত হইতে পারিত না। প্রত্যুত উহা স্তরে স্তরে নির্ম্মিত; প্রত্যেক স্তরই কিয়ৎ পরিমাণে পালকের অনুরূপ, এবং ঘনসন্নিবেশে পরস্পরের বিপরীত ভাবে স্থাপিত। এই সকল স্তর পালকের মধ্যের দিকে প্রশস্ত, এবং অর্দ্ধ গোলাকার, তাহাতে স্তরগুলি শক্ত এবং কাছাকাছি একের সহিত অপরের সংযোগ সাধিত হয়। শুঁয়ার বহির্ভাগের স্তরগুলি ক্রমশঃ পাতলা এবং শিরাগ্রভাগের মত হইয়া উঠে; তজ্জন্য উহা লঘু হয়। নিম্নদিকে ঐ সকল স্তর পাতলা ও মসৃণ, কিন্তু তাহাদের বাহির ও উপরের প্রান্ত দুই লোমময় ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক পার্শ্ব তলার দিকে চৌড়া এবং উপর দিকে সরু এবং শুঁয়াবিশিষ্ট। এই কৌশলপ্রভাবে এক স্তরের বক্রাকার শুঁয়াগুলি অপর স্তরের সরল শুঁয়াগুলির ঠিক পরেই অবস্থিত থাকে।

যে যন্ত্রের সাহায্যে এই উৎপতনশীল প্রাণীর অগ্রগতিক্রিয়া সম্পাদিত হয় অতঃপর তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যে সকল পক্ষী উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের শরীরের এরূপ স্থানে ডানা দুটি স্থাপিত যে, তদ্দ্বারা সমস্ত শরীর সমভাবে স্থির থাকে এবং যে তরল পদার্থ প্রথমতঃ ইহার অপেক্ষা লঘুতর জ্ঞান হয়, সেই তরল পদার্থ ইহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিতে পারে। পক্ষীর পক্ষদ্বয় পশুর সম্মুখের পায়ের

অনুরূপ, এবং ইহার ধারে তাহাদের অঙ্গুলির ন্যায় শরীরের সহিত সংলগ্ন অপর এক অংশ আছে, যাহাকে bastard wing বা অকেজো ডানা বলে। উৎপতন-সাধক এই ডানা কলমের শক্ত পালক বিশিষ্ট, এবং তাহাদের সহিত সাধারণ পালকের প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্তের আকার অপেক্ষাকৃত বড়, এবং ত্বকের গভীরতর অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহাদের মূল অস্থির সন্নিকটে অবস্থিত।

এই সকল পালক একদিকে প্রশস্ত এবং অপর দিকে অধিকতর সঙ্কীর্ণ; উভয় দিকেরই খুঁয়াগুলি পক্ষীর অগ্রগতির এবং ডানার ঘনসন্নিবেশিতার সহায়তা করে। অধিকাংশ পক্ষী নিম্নলিখিত প্রকারে এই সকল পালক কার্য্যকারী করিয়া লয়,—প্রথমতঃ, ডানা দিয়া ঝাপট মারিবার স্থান পাইবার জন্য তাহারা এক লম্ফ দিয়া ভূমি পরিত্যাগ করে; উক্ত স্থান পাইলে প্রবলবেগে এবং সমগ্র বিস্তৃত ডানার নিম্নভাগ দিয়া ডানার নিম্নস্থিত বায়ুরাশিকে আঘাত করে। অথচ উর্দ্ধে উঠিবার সময় যাহাতে উপরিভাগের বায়ু সবলবেগে আঘাত না পায় তজ্জন্য ডানা তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত করিয়া লয়। ঐ আঘাতের জোরে উপরে উঠে এবং দ্বিতীয় আঘাতের জন্য ডানা বিস্তার করে। এই হেতু আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে, পক্ষী বায়ুর প্রতিকূলে উঠিতে ভালবাসে; কারণ তাহাতে তাহারা ডানার উপরি ভাগের অপেক্ষা নিম্নভাগে অধিক বায়ু পায়। এই সকল কারণেই বড় বড় পক্ষীরা প্রথমে অনায়াসে উড়িতে পারে না। ইহার কারণ প্রথমতঃ ডানার বেগ দিবার জন্য প্রচুর পরিসর পায় না, দ্বিতীয়তঃ, উঠিবার সময় বায়ুরাশি ডানার ঠিক তত সোজাসুজি নীচে থাকে না।

ডানা দুটি নাড়িবার জন্য পক্ষীকে বক্ষস্থলের উভয় পার্শ্বে দুটি মাংসপেশী প্রদত্ত হইয়াছে। সেই মাংসপেশীর তুলনায় পশুর এবং মনুষ্যের জঙ্ঘা ও শরীরের পশ্চাদ্ভাগের অবয়বগুলির সঞ্চালনের উপযোগী মাংসপেশীগুলি যার-পর নাই শক্ত, কিন্তু তাহাদিগের বাহুর মাংসপেশীগুলি ক্ষীণ; কিন্তু যে সব পক্ষী ডানা ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়; বক্ষঃস্থলে পক্ষ বা বাহু সঞ্চালক মাংসপেশীগুলি অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু জঙ্ঘার পেশীগুলি ক্ষীণ এবং সরু। এই সকল মাংসপেশীর সাহায্যে পক্ষী এত প্রবল বেগে ডানা নাড়িতে পারে যে, ইহার আয়তনের সহিত ঐ বেগ তুলনা করিলে সেই বেগ প্রায় অবিশ্বাস্য হইয়া উঠে। একটি রাজহাঁসের পাখার ঝাপটায় মানুষের পা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ঈগলপাখীর ডানার আঘাতে একজন লোক মুহূর্ত্ত মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ ঘটনাও দেখা গিয়াছে। পক্ষীর ডানার জোর এবং লঘুত্ব এত বেশী যে তাহা কৃত্রিম উপায় দ্বারা অনুকরণ করা যাইতে পারে না। মানুষের নিপুণতা এরূপ লঘু অথচ বেগবান যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে এখন পর্য্যন্ত পারে নাই।

নিশাচর ব্যতীত সকল পক্ষীরই মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট, এবং পশুর অপেক্ষা তাহাদের শরীরের সহিত মাথার তুলনামূলক কম। এই জন্য উড়িবার সময় তাহাদের মাথা অনায়াসে বায়ু বিভক্ত করিয়া দেহের জন্য পথ করিতে পারে এবং সেই পথ দিয়া অপেক্ষাকৃত সহজে সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে। তাহাদের চক্ষুও পশুর চক্ষু অপেক্ষা চেপ্টা এবং কোণবিশিষ্ট। চক্ষুর বহির্ভাগস্থ আবরণের নীচে আঁইসের মত গায়ে গায়ে স্থাপিত কতকগুলি ছোট ছোট অস্থিখণ্ড গোলাকারভাবে প্রত্যেক তারা বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাতে চক্ষুর তারা শক্ত এবং নিরাপদ হয়। প্রত্যেক পক্ষীর nictitating membrane অর্থাৎ মুদ্রণশীল ত্বক নামে এক প্রকার ত্বক আছে। চক্ষের পাতা খোলা থাকিলেও, তাহারা ইচ্ছামত এই ত্বক দ্বারা চক্ষু ঢাকিতে পারে। এই ত্বক চক্ষুর বৃহত্তর বা বক্রতর কোণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা চক্ষুর উপরিভাগ মুছিতে, পরিষ্কার করিতে এবং সম্ভবতঃ আর্দ্র করিতে পারে। পাখীর চক্ষু বাহিরে যদিও খুব ছোট দেখায়, তথাপি এক একটি প্রায় তাহাদের মস্তিষ্কের সমান; কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক অক্ষিগোলক অপেক্ষা ত্রিশগুণেরও অধিক বড়। পাখীর দর্শন শিরা এক প্রকার বিশেষ রকমে বিস্তারিত —তজ্জন্য তাহাদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং দর্শন শিরার প্রসারণীয়তার জন্য তাহাদের বাহ্য বস্তু সকলের সংস্কার আরও উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট হয়।

চক্ষুর এইরূপ গঠন দেখিয়া বুঝা যায় যে, পক্ষীর দর্শনেন্দ্রিয় অন্যান্য প্রাণীর অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঐ জীবের প্রাণধারণ এবং নিরাপদের জন্য নিতান্ত

আবশ্যক। নতুবা দ্রুতগতিপ্রসক্ত ইহা ইহার পথবর্ত্তী প্রত্যেক পদার্থকে আঘাত করিত। এই বিস্ময়াত্মক তীক্ষ্ণতার সহিত উপর হইতে খাদ্য চিনিয়া লইবার শক্তি না থাকিলেও কখনই আহার খুঁজিয়া লইতে পারিত না। শ্যেন পক্ষী এরূপ দূরে চাতককে দেখিতে পায় যে তাহাকে মানুষ কি কুকুর কিছুতেই দেখিতে পাইবে না। একটা চিল মেঘাভ্যন্তরস্থ, প্রায় অদর্শনীয় উচ্চস্থান হইতে অব্যর্থ-লক্ষ্যে তাহার শিকারের উপর ছোঁ মারিয়া থাকে। পক্ষীর দর্শনশক্তি আমাদের বিদিত অধিকাংশ পশুর দর্শনশক্তিকে অতিক্রম করে এবং বল ও অব্যর্থতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে পরাভূত করে।

পক্ষীর স্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান কর্ণ নাই, কেবলমাত্র দুটি ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্রপথে শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শৃঙ্গবিশিষ্ট পেচক এবং আরও দুই এক জাতীয় পক্ষীর বহিঃস্থ কান আছে বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু কানের মত প্রতীয়মান পদার্থ মস্তকের পার্শ্ব সংলগ্ন পালক ভিন্ন আর কিছুই নহে। শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে সেগুলির আদৌ কোন আবশ্যকতা নাই। ইহাও সম্ভবপর যে, পক্ষীর ঐ কর্ণ-বিবর বেষ্টনকারী পালকগুলি বহিঃস্থ কানের অভাব পূরণ করে, এবং শব্দ সংগ্রহ করিয়া আভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রেরণ করে। কোন কোন পক্ষী যেরূপ তৎপরতার সহিত স্বর শিক্ষা এবং বুলি আবৃত্তি করে এবং যেরূপ সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে তাহাতে তাহাদের ঐ ইন্দ্রিয়ের অতিশয় সূক্ষ্মতারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অধিকাংশ পক্ষীর ঘ্রাণশক্তি যে অপেক্ষাকৃত কম তীক্ষ্ণ তাহা বোধ হয় না। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বহু দূরে থাকিয়াও তাহাদের শিকারের গন্ধ পায় এবং অন্যান্য পক্ষীরা তেমনই এই শক্তি প্রভাবে তাহাদের ধূর্ত্ত অনুসরণকারীদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে। যেখানে ফাঁদ পাতিয়া পাতিহাঁস ধরা হয় সেখানে শিকারীরা, পাছে ঐ পক্ষী তাহাদের ঘ্রাণ পাইয়া উড়িয়া যায় সেই হেতু, নিজেদের মুখের কাছে সর্ব্বদা ঘাসের চাপড়া জ্বালাইয়া রাখে এবং তাহার উপর নিশ্বাস ফেলে।

উড্ডয়ন-সাধক অঙ্গগুলির পর গতির সহায়ভূত পদ এবং পদতলের বিষয় আলোচনা করা যাক্। বায়ুমধ্যে অনায়াসে চালিত হইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের পা এবং পায়ের চেটো হাল্কা করা হইয়াছে। সন্তরণোপযোগী হইবার জন্য কাহারো কাহারো পায়ের অঙ্গুলিগুলি যোড়া; কোন পদার্থকে অধিক দৃঢ়রূপে ধরিবার জন্য এবং নিজ প্রাণ রক্ষার্থ গাছে সংলগ্ন করিবার জন্য, অপরাপরের পায়ের অঙ্গুলি পৃথক। যাহাদের পা লম্বা তাহাদের গলাও লম্বা—নতুবা কি জলে কি স্থলে তাহারা খাদ্য সংগ্রহে অসমর্থ হইত। কিন্তু তাই বলিয়াই যে যাহাদের গলা লম্বা তাহাদের পাও লম্বা হইবে তাহা নহে। রাজহংস এবং রাজহংসীর গলা খুব লম্বা কিন্তু পা খুব ছোট। আর সেই পা প্রধানতঃ সন্তরণার্থে ব্যবহৃত হয়।

এ পর্য্যন্ত পক্ষীর যে সকল বাহ্য অবয়বের বিষয় লিখিত হইল, তাহার প্রত্যেক অবয়বই উহার জীবন ও অবস্থার উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। উহার আভ্যন্তরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে উড়িবার পক্ষে অল্প উপযোগী হইলেও উহার নিরাপদ বিষয়ে কম আবশ্যকীয় নহে। পাখীর শরীরের প্রত্যেক অংশের হাড়গুলি অত্যন্ত হাল্কা এবং পাতলা; পক্ষসঞ্চালনকারী মাংসপেশী ভিন্ন সকল মাংসপেশীই অত্যন্ত ছোট এবং ক্ষীণ। মাথা এবং গলার ভারের সহিত উহার কুইল পালক-নির্ম্মিত লেজ সামঞ্জস্য মত। উড়িবার সময় সেই লেজ পক্ষীর পক্ষে হালের কার্য্য করে এবং তাহার সাহায্যে পক্ষী উড়িতে এবং ভূমিতে নামিতে পারে।

পক্ষীর শরীরের ভিতরের ভাগ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই একই গঠনপ্রণালী তাহাদিগকে আকাশবিহারী জীবনের উপযোগী এবং শরীরের ঘনত্ব কমাইয়া ব্যাপকত্বের বৃদ্ধি করিতেছে। প্রথমতঃ তাহাদের পঞ্জর ও পৃষ্ঠের পার্শ্বদ্বয়ে ফুসফুস দৃঢ়সংলগ্ন এবং ইহা অতি অল্পমাত্র প্রসারিত এবং আকুঞ্চিত হইতে পারে। ইহাতে তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া শ্বাসনালীর শাখাগুলি ফুসফুসের ভিতর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট থাকে; আর মুখ ও উদরের ভিতর এই সকল শাখার ক্ষুদ্র দ্বার থাকে এবং নিশ্বাস দ্বারা ভিতরে আকৃষ্ট বায়ু সমস্ত দেহের লম্বালম্বি ভাবে স্থাপিত বায়ুভরা থলির মত আধারস্থান সমূহের মধ্যে সেই সকল শাখাদ্বারা আনীত হয়। এই

সকল দ্বার অস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন নহে ; কারণ, একটি মুরগীর ফুসফুসের মধ্য দিয়া শলাকা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইয়া দিলে ইহা অনায়াসে তাহার পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যায় ; এবং শ্বাসনালীর ভিতরে ফুঁ দিয়া বাতাস প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখা যায় যে, তাহাতে ঐ জীবের শরীর একটি বায়ুকোষের মত ফুলিয়া উঠে। পশুদেহাভ্যন্তরে এই পথটি উদর ও বক্ষের ব্যবধান-বদ্ধ. কিন্তু পক্ষীর এই বায়ু গমনাগমনের পথ প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় এবং সেই হেতু তাহারা অনেকক্ষণ ও অধিক পরিমাণে সহজে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে। কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, পক্ষীর শরীরের মধ্যে শ্বাসনালী অনেকবার গুটাইয়া যায়। তখন উহাকে গোলোক ধাঁধা (বক্রাকার পথ) বলে। এই গুটানোর ফল কি, অথবা কেন যে পক্ষীর দেহের মধ্যে শ্বাসনালীর এত ঘুরণপাক হয়, এই কঠিন সমস্যা কোন প্রাণীতত্ত্ববিৎ আজ পর্য্যন্ত ভঞ্জন করিতে সমর্থ হন নাই।

যে সকল পক্ষী দৃশ্যতঃ একজাতীয় তাহাদের মধ্যেও সচরাচর এই পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। গৃহপালিত রাজহংসের শ্বাসনালী একেবারে সরলভাবে ফুসফুসে প্রবিষ্ট ; কিন্তু যে বন্য রাজহংস বাহ্যিক আকার প্রকারে এক শ্রেণীর জীব বলিয়াই বোধ হয়, তাহার শ্বাসনালী বক্ষ অস্থি ভেদ করিয়া সেই স্থানে অনেকবার ঘুরিয়া পুনরায় বহির্গত এবং ফুসফুসের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল ব্যাবর্ত্তন স্বরোৎপত্তিহেতু নহে ; কারণ, যাহাদের এই সকল ব্যাবর্ত্তন নাই, সে সব পক্ষীও স্বরবিশিষ্ট, এবং যাহাদের সেই ব্যাবর্ত্তন আছে তাহারা,—বিশেষতঃ যে পক্ষীর কথা বলা হইল উহা—স্বরবিহীন। সেইজন্য কোন কোন পক্ষী কি কারণ বশতঃ উচ্চ এবং নানাবিধ স্বরে গান করিতে পারে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে, অন্ততঃ দেহ ব্যবচ্ছেদ দ্বারা তাহার নির্ণয় হয় নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত জানি যে, পক্ষীজাতির দেহের সামগ্রী পরিমাণের সহিত তুলনায় তাহাদের স্বর অন্য কোন জাতীয় জীবের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ষাঁড়ের হাম্বারব ময়ূরের কেকারব অপেক্ষা উচ্চতর নহে।

এই সকল বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পক্ষীজাতির আভ্যন্তরীণ গঠনে পরস্পরের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাও আমরা বেশ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিব। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে পক্ষীমাত্রেরই একটা করিয়া পাকস্থলী আছে ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এই পাকস্থলী অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রকমের। মাংসজীবী, হিংস্র এবং কোনো কোনো মৎস্যজীবী পক্ষী জাতির পাকস্থলী অদ্ভুতরূপে নির্ম্মিত। তাহাদের গলার নলী মাংসগ্রন্থিবৎ পদার্থে পূর্ণ ; খাদ্য পাকস্থলীতে যাইবার সময় সেই পদার্থগুলি বিস্তৃত হয় এবং খাদ্যকে আর্দ্র করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলে। পাকস্থলীটি পক্ষীর আয়তনের তুল্য মানতায় অতিশয় বৃহৎ এবং ইহার উত্তাপ ও পাকশক্তি বৃদ্ধির জন্য চতুর্দ্দিকে বসা দ্বারা বেষ্টিত।

শস্যজীবী পক্ষীর অন্ত্রাদি হিংস্র জাতীয়ের অন্ত্রাদির মত নহে। তাহাদের সাঁশা ঠিক বুকের হাড়ের উপরে প্রসারিত থাকে এবং তাহাই পক্ষীর অন্নকোষ নামে একটি থলির বা ঝুলির আকার ধারণ করে। ইহা লালানির্গমন শীল মাংসগ্রন্থিতে পরিপূর্ণ ; সেই মাংসগ্রন্থিগুলি উহার অভ্যন্তরস্থ শস্য এবং খাদ্য আর্দ্র এবং কোমল করিয়া থাকে। এই মাংসগ্রন্থি বহুসংখ্যক এবং লম্বালম্বি দ্বার-সমূহ বিশিষ্ট ; তাহার ভিতর হইতে এক প্রকার ঈষৎ শুভ্রবর্ণ এবং চট্‌চটে পদার্থ নির্গত হয়। শুষ্ক খাদ্য অনেকক্ষণ আর্দ্র হইয়া নরম হইলে পর উদর মধ্যে যায়। সেখানে, হিংস্রজাতীয় পক্ষীর মত কোমল আর্দ্র পাকস্থলীর পরিবর্ত্তে ভিতর দিকে একটি কঠিন শৃঙ্গাগ্র ও উপাস্থিবিশিষ্ট আবরণে আচ্ছাদিত, এবং প্রায় কোমলাস্থিবৎ সাধারণতঃ প্লীহা-নামক দুই যোড়া মাংসপেশীর মধ্যে সেই কোমলার্দ্র খাদ্য নিষ্পেষিত হয়। এই সকল আবরণের পরস্পর সংঘর্ষণে কঠিনতম পদার্থসমূহ চূর্ণ এবং পাতলা হইতে পারে। এই ক্রিয়াকে মানুষের এবং অপরাপর প্রাণীর কসের দাঁতের ক্রিয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পশুগণ খাদ্য চিবায় এবং তারপর সেই খাদ্য পাকস্থলীতে গিয়া আর্দ্র ও জীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে এই জাতীয় পক্ষীরা অন্ননালীতে প্রথমতঃ খাদ্য লালাসিক্ত এবং নরম করে ; তৎপরে পাকস্থলীতে বা প্লীহায় গিয়া সেই খাদ্য চূর্ণীকৃত হয়। কোন কোন পক্ষী বালি এবং অন্যান্য কঠিন পদার্থ যত্নপূর্ব্বক

খুঁটিয়া লয়। অনেকে ভুলক্রমে অনুমান করেন যে খাদ্য পেষণ করিবার জন্যই তাহারা ঐরূপ করে। কিন্তু তাহাদের পাকস্থলীর আবরণসমূহের পরস্পরের সহিত প্রবল সংঘর্ষণ নিবারণ করাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

অধিকাংশ পক্ষীর দুইটি সংলগ্নাবয়ব অর্থাৎ গমনাগমনের পথশূন্য অন্তর্নাড়ী আছে; চতুষ্পদ জন্তুর ঐ নাড়ী একটি মাত্র থাকে। এইরূপ নাড়ীদ্বয় বিশিষ্ট পক্ষিগণের মধ্যে মাংসাশী পক্ষীদের এবং চটক জাতীয় সকল পক্ষীরই সেই নাড়ী খুব ছোট এবং জলচর ও গৃহপালিত পক্ষীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা। পক্ষীর নাড়ীর মধ্যে কৃমির মত আরও এক অতিরিক্ত নাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। উহা, যখন ঐ পক্ষীশাবক অণ্ড মধ্যে থাকিয়া তা খাইত তখন যে পথ দিয়া অণ্ডের কুসুম শাবকের অন্তর্নাড়ীর মধ্যে চালিত হইয়াছিল, সেই পথের অবশিষ্টাংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পক্ষিগণের এই সরল দেহগঠনপ্রণালী হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে তাহারা প্রায়ই পীড়াগ্রস্ত হয় না। যাহা হউক তাহারা এক পীড়ার বশীভূত। তাহারা বাৎসরিক পালক পরিবর্ত্তনের পীড়ার যাতনা সহ্য করে। যে কোন জাতীয় পক্ষী হউক না কেন, বৎসরে একবার করিয়া তাহাদের নূতন পালক জন্মায় এবং পুরাতন পালক খসিয়া যায়। পালক-পরিবর্ত্তনকালে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত দেখায়। যাহারা অত্যন্ত সাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ তখন তাহাদেরও উগ্রত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়, এবং ক্ষীণকায় পক্ষীরা এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় প্রায়ই মরিয়া যায়। তখন তাহাদের আহারে অরুচি জন্মে এবং শাবক প্রসবে সামর্থ্য থাকে না। শাবক উৎপাদনে যে পুষ্টি লাগে তাহা ঐ বর্দ্ধনশীল পালকসমষ্টির যতটুকু পুষ্টির আবশ্যক তাহা পূরণ করিতেই সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়।

কৃত্রিম উপায় দ্বারা পালক-পরিবর্ত্তন শীঘ্র সাধিত হইতে পারে। গায়ক পক্ষিগণের তত্ত্বাবধায়কেরা সর্ব্বদা এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। তাহারা পক্ষীকে এক অন্ধকার পিঞ্জরে আবদ্ধ করে এবং তন্মধ্যে তাহাকে খুব গরমে রাখে এবং তাহার কৃত্রিম জ্বরোৎপাদন করে। এইরূপ করিলে পক্ষীর নূতন পালক উৎপন্ন হয়। পুরাতন পালকগুলি অকালে পড়িয়া যায় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল এবং সুন্দর নূতন পালকের গুচ্ছ পুরাতনের স্থান অধিকার করে। এই কৃত্রিম প্রক্রিয়া দ্বারা পক্ষীর স্বর মাৰ্জ্জিত এবং তাহার প্রফুল্লতা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এই প্রকরণে শতকরা তেত্রিশটি বাচে না।

যে প্রকারে এই পালক পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়া স্বভাবতঃ সম্পন্ন হয় তাহা এই;-কুইল বা পালক ডানা হইতে প্রথম ঠেলিয়া বাহির হয় এবং পূর্ণায়তন হইবার পর যতই ইহা পুরাতন হইতে থাকে ততই কঠিন হয় এবং পালকমূলের চতুর্দ্দিকে এক প্রকার অস্থিপঞ্জর-আবরক সূক্ষ্ম ত্বক জন্মে। বোধ হয় ঐ সূক্ষ্ম ত্বক দ্বারা পালক সমূহ পক্ষীর গাত্রে সংলগ্ন। যে পরিমাণে কুইল পুরাতন হইতে থাকে ইহার ধারগুলি অর্থাৎ অস্থিবৎ ডাঁটার ভাগগুলিও পুষ্ট হয়, কিন্তু ইহার সমগ্র ব্যাস কুঞ্চিত হয় এবং আয়তনে কমিয়া যায় অর্থাৎ পুরু হয় কিন্তু শুকাইয়া যায়। এইরূপে পালকের ধারসকল পুরু হওয়ায় শরীরের পুষ্টির অনেক হ্রাস হয়, এবং সঙ্কীর্ণতাহেতু ইহা খোলের মধ্যে ক্রমেই আলগা হইয়া পড়ে এবং অবশেষে খসিয়া পড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে নিম্নদেশে একটি নূতন কুইলের অঙ্কুর জন্মাইতে আরম্ভ হয়। উহার ত্বক্ এক ছোট থলিয়ার আকার ধারণ করে, এবং একটি ছোট রক্ত প্রবাহক শিরা এবং রক্ত প্রতিবাহক ধমনী দ্বারা শরীর হইতে পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। এবং দিন দিন উহার আয়তন বর্দ্ধিত ও সূচ্যগ্র হইয়া বহির্গত হয়। একদিকে পালকের এক প্রান্ত পালকের শুঁয়ার আকারে পরিণত হয়, আর ত্বকের সহিত সংলগ্নাংশ তখনও নরম থাকায় অনবরত পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। পালকের ডাঁটা কাটিয়া কলম করিবার সময় উহার ভিতরে যে হালকা পদার্থ দেখিতে পাই, তাহার দ্বারা ঐ পুষ্টি ডাঁটার অভ্যন্তরে বিকীর্ণ হয়। এই পদার্থের কোন বিশেষ নাম আছে কিনা জানিনা, কিন্তু ইহা জরায়ুমধ্যস্থ শিশুর পক্ষে নাভি সম্বন্ধীয় নাড়ীর মত, বর্দ্ধিষ্ণু পালকের ডাঁটার জন্য পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং উহার সমস্ত অঙ্গে সেই পুষ্টি বিকীর্ণ করে। তখন কুইল যথাসম্ভব পূর্ণায়তন হয়, এবং আর বেশী

পুষ্টির আয়োজন হয় না; এবং শরীরস্থ শিরা ও ধমনী ক্রমশঃই কমিয়া ক্ষীণ হইয়া আসে; অবশেষে কুইলের সহিত তাহাদের সংযোগের ছিদ্র একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় পালকের ডাঁটা কয়েক মাস তাহার খোল মধ্যে থাকে, অবশেষে কুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতির পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির অবকাশ প্রদান করে।

গ্রীষ্মকালের শেষভাগ হইতে শরৎকালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ পালক পরিবর্ত্তনের কাল। শীতকালেও পক্ষী এই পীড়ায় যাতনা পায়। প্রকৃতি সদয় হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে যখন পক্ষীর খাদ্যের খুব অনাটন ঘটে তখন তাহাদের ক্ষুধারও প্রখরতা থাকে না। বসন্তের সমাগমে যখন আবার প্রচুর খাদ্য পাওয়া যায় তখনই তাহাদের বল ও তেজ পুনরায় সমাগত হয়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

উপহার

১

আমার উষর বক্ষে বসন্ত-পবন
ফোটাতে পারেনি ফুল, বরষার ধারা
শ্যামতৃণদলে মোর হৃদয় সাহারা
ঢাকিতে পারেনি কভু। রজনী দিবস
হেথা শুধু হু হু করে উদাসী বাতাস
ধূ ধূ করে বালুরাশি। এ মরু প্রান্তরে
কোথা হতে এলে তুমি করিবারে বাস
বাঁধিলে তোমার ঘর, যত্নে নিজ করে
কুটীর-প্রাঙ্গনে তব একটি লতিকা
রোপিলে, রচিয়া দিলে স্নিগ্ধ ছায়াখানি
আপনার বক্ষবাসে। আজি মুকুলিকা
বালুকায় সে বল্লরী কেমনে না জানি।
তোমারি রোপিত লতা, লয়ে পুষ্প তার
গাঁথিনু এ মালাখানি দিতে উপহার।

২

তুমি ভালবাস তাই বাঁধি শত গান
গেয়ে এত সুখ পাই। নিত্য নব সুর
কোথা হ'তে আসে কণ্ঠে, বহে সুমধুর
বিচিত্র রাগিণী কত, কত নব তান।
তুমি এসে বস কাছে, রাখি হাতে হাত
আমারে গাহিতে বল, হৃদয় আমার
বিগলিয়া ব'য়ে যায় সহস্র-প্রপাত
সঙ্গীতের ঝরণায় হিমানী সম্ভার
ঝরে যথা কলস্বনে অরুণ উষার
কনক অঞ্জলিভরা তপ্ত পরশনে।
কত দিবা বিভাবরী কত না ঝঙ্কার
তুলেছ আমার কণ্ঠে অপূর্ব্ব নিক্কণে,
আজি তারি সুরহারা ছচারিটি বাণী
কুড়ায়ে এনেছি গাঁথি, লহ মালাখানি।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

নবীন সন্ন্যাসী

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্থানীয় হাকিম।

গোপীকান্ত বাবুর পলায়নের পরদিন, গদাই পাল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শিবিকারোহণে থানার দারোগা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিল। কেনারামও একটি টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া, নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একজন বরকন্দাজ দ্রব্য লইয়া পূর্ব্বেই পদব্রজে রওনা হইয়াছিল।

দরিয়াপুর কাছারি হইতে থানা তিন ক্রোশ ব্যবধান। বেলা ডুইটার সময় গদাই পাল সেখানে পৌঁছিল। থানার বাড়ীটি একটি দীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত। সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। একটি বটগাছের তলে গদাই পালের পাল্কী নামিল। গদাই পাল্কী হইতে বাহির হইয়া দেখিল, খড়ম পায়ে দিয়া একটি লোক থানার বারান্দায় পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে। গদাই বারান্দায় উঠিয়া নিজ পরিচয় দিয়া সে লোকটির পরিচয় গ্রহণ করিল। তিনি থানার হেড কনেষ্টবল। হেড কনেষ্টবলকে সচরাচর লোকে জমাদার বলিয়া থাকে—কিন্তু গদাই বলিয়া উঠিল—“ওঃ— আপনি এখানকার হেডকনেষ্টবল—ছোট দারোগা

বাবু? বেশ বেশ, আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় সুখী হলাম। বড় দারোগা মশায়ের নামটি কি?"

"শেখ শেফায়েৎ হোসেন।"

"তাঁর বাড়ী কোথা?"

"বগুড়া জেলা।"

"দারোগা সাহেব এখন কোথা?"

"ঘুমুচ্চেন।"

"কখন উঠবেন?"

"বেশী দেরী নেই। কেন, কোনও মারপিট খুন জখম হয়েছে না কি?"

গদাই বলিল—"না—না—সে সব কিছু নয়। আমি নূতন এসেছি—দরিয়াপুরের নায়েব হয়ে—তাই মনে করলাম একবার এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যাই। সেই মনে করে আসা।"

জমাদার বাবু কেনারামের হস্তস্থিত ঘৃতভাণ্ডের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"ওটাতে কি আছে?"

গদাই যেন বুঝিতেই পারে নাই এই ভাবে বলিল—"আজ্ঞে?"

জমাদার বাবু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ও ভাঁড়ে কি?"

"ভাঁড়ে?—ভাঁড়ে করে সামান্য একটু ঘি এনেছিলাম দারোগা সাহেবের জন্যে। জমিদারীর খাটি ঘি—আর বেশ তাজাও বটে।"

জমাদার বাবু বলিলেন—"খাটি ঘি? বটে? আহা খাঁটি ঘি এখানে আমরা একটু চক্ষেও দেখতে পাইনে। শুনতে পাই নাকি মশায়—ঘিয়ে চর্ব্বি ভেজাল দেয়। সেই শুনে অবধি আমার পিসিমা ঠাকরুণ ঘি খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন বাবা, আমি বিধবা মানুষ, শেষে কি চর্ব্বি দেওয়া ঘি খেয়ে পরকাল খোয়াব? রাত্রে খানকতক করে লুচি খেতেন, তাও গেছে—এখন শুধু দুধ—আর ফলটা পাকড়টা খান। হিঁদুরই মুস্কিল। দারোগা সাহেব মুসলমান—ওঁর ত চর্ব্বি দেওয়া ঘি খেলে জাত যাবে না।"

গদাই জমাদার বাবুর মনের ভাব বুঝিল। পাছে ইঙ্গিত ছাড়িয়া স্পষ্টই ঘৃতটুকু চাহিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় বলিল—"আহা, আপনি এখানে আছেন তা ত জানতাম না। জানলে আপনার জন্যেও একভাঁড় নিয়ে আসতাম। তাই ত!—আপনার পিসিমার ত ভারি কষ্ট হচ্ছে!"

"কষ্ট হচ্চে বৈ কি। আচ্ছা আপনি না হয় গিয়ে এক ভাঁড় পাঠিয়ে দেবেন। যাবার সময় আপনার সঙ্গে একজন চৌকিদার দিয়ে দেব এখন। এই সের পাঁচেক হলেই হবে—বেশী না। আপনার আগে যে মথুর মুখুর্য্যে ছিলেন—তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ও অঞ্চলে কোনও তদন্ত করতে গেলেই—দরিয়াপুরের কাছারিতেই আমার আড্ডা হত। মথুর মুখুর্য্যে অমনি পুকুরে জাল ফেলিয়ে বড় বড় মাছ ধরিয়ে আনাত—খাসি কাটত—কালিয়া—পোলাও—খুব খাওয়াত।"

গদাই বলিল—"তা হবেই ত—তা হবেই ত! আপনাদের মতন লোকের খাতির করবে না ত কার খাতির করবে? আমারও বলা রইল—যখন ওদিকে যাবেন-টাবেন—গরীবের কাছারিতে পার ধুলো দিতে ভুলবেন না।"

জমাদার বাবু বলিলেন—"বেশ বেশ। আপনিও দেখছি একজন সজ্জন লোক।"

ইহার পর অন্যান্য কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমে দারোগা সাহেব বাহির হইলেন। দিবানিদ্রার প্রভাবে তাঁহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন ভৃত্য—তাহার হস্তে একটি হুইল-যুক্ত ছিপ। প্রত্যহ অপরাহ্নে দারোগা সাহেব দীর্ঘিকায় মৎস্য ধরিয়া থাকেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র জমাদার বাবু বলিলেন—"এই ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

দারোগা সাহেব শ্লেষ্মাজড়িত চাপা গলায় বলিলেন—"ইনি কে?"

"ইনি দরিয়াপুরের নায়েব হয়ে এসেছেন। পূর্ব্বে যে মথুর মুখুর্য্যে ছিলেন, তাঁরই জায়গায় একটিনি করছেন।"

দারোগা সাহেব বলিলেন—"গোপীকান্ত বাবুর নায়েব?"

গদাধর বলিল—"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"বাড়ী কোথা আপনার?"

"হুগলি জেলায়।"

"ওঃ—হুগলি থেকে এত দূর এসেছেন"

গদাধর নিজ উদরদেশ বামহস্তে চাপড়াইয়া বলিল —"এরই জন্যে।"

দারোগা সাহেব হাসিয়া বলিল—"ঠিক। আমরাও সেই জন্যে নিজের মুলুক ছেড়ে এদেশে এসেছি। এখন কি মনে করে আসা হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু নয়। নূতন এসেছি—তাই মনে করলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যাই। আমার মনিবের হুকুমই হচ্ছে—'দারোগা স্থানীয় হাকিম, সদাসর্ব্বদা তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকবে, কোন রকমে তাঁদের অসন্তোষ না হয়—কারণ তাঁদের হাতেই সব।'—তাই কিঞ্চিৎ খাঁটি ঘি ভেট নিয়ে হুজুরের কাছে উপস্থিত হয়েছি।"

দারোগা সাহেবের মুখখানি হাস্যবিভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন "বেশ বেশ। আপনার মনিব গোপীকান্ত বাবু অতি উপযুক্ত লোক। তাঁর ব্যবহারে ভারি খুসী হলাম। তাঁকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম বলবেন। ওরে কে আছিস রে—যা, ঘিয়ের ভাঁড়টা বাড়ীর মধ্যে দিয়ে আয়। নায়েব বাবু আপনার মাছ ধরার বাতিক আছে?"

গদাই বলিল—"বাতিক এক সময় খুবই ছিল। এখন নানা রকম কাজকর্ম্মের ভিড়ে মাছ ধরার সময় পাইনে। বয়সও হয়ে পড়েছে। আপনাদের বয়স যখন ছিল, তখন ও বাতিক খুবই ছিল। দিনে রেতে মাছ ধরতাম।"

দারোগা সাহেব অন্ততঃ গদাধরের অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি মৃদু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন—"লোকটা আমায় ছোকরা মনে করেছে—আমি যে খেজাব মেখে শাদা গোঁফ কালো করেছি তা ধরতে পারেনি।"—প্রকাশ্যে বলিলেন—"আপনার আর কি এমন বয়স হয়েছে? আমরা বোধ হয় এক বয়সীই হব। তা চলুন—আমি মাছ ধরব আপনি বসে দেখবেন। সেইখানেই কথাবার্ত্তা হবে।"

দীর্ঘিকার পশ্চিম পাড়ে, বৃক্ষের ছায়ায়, খানিকটা স্থান সমতল করিয়া কাটা ছিল। সেইখানে কম্বল বিছাইয়া দারোগা সাহেব মাছ ধরিতে বসিলেন। ভৃত্য ছিপ প্রভৃতি রাখিয়া, গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। ছিপ ফেলিয়া দারোগা সাহেব ধূমপান করিতে লাগিলেন। গদাধরকে একটা কলার ডাঁটা আনাইয়া দিলেন—মধ্যে মধ্যে কলিকা লইয়া গদাধরও ধূমপান করিতে লাগিল।

গোপীকান্ত বাবুর জমিদারী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ দারোগা সাহেব বলিলেন "আপনার মনিবকে বলবেন, যদি কোনও অবাধ্য প্রজাকে শাসন করবার—জব্দ করবার দরকার হয়, তবে যেন আমাকে জানান।"

গদাধর বলিল—"তা জানাব বৈকি। আপনারাই ত হলেন আমাদের ভরসা। আপনাদের সাহায্য ভিন্ন আমাদের কি এক পাও চলবার যো আছে? একজন প্রজাকে জব্দ করা ভারি দরকার হয়ে পড়েছে। হুজুর নিজমুখেই যখন কথাটা পাড়লেন তখন নিবেদন পাই। আমাদের এলাকায় সাজিয়াড়া বলে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে রমণচন্দ্র ঘোষ বলে একটা প্রজা বাস করে—জেতে গয়লা। তার দেমাক যদি দেখেন। ছোটলোকের ছেলে দুকলম লেখা পড়া শিখেছে কিনা—ধরাকে সরা জ্ঞান করে।"

এই সময় দারোগা সাহেবের ছিপের ফাৎনা নড়িতে লাগিল। ইসারায় গদাধরকে চুপ করিতে বলিয়া, দারোগা ছিপের বাঁট মুঠা করিয়া ধরিলেন। ফাৎনাটি ডুবিবা মাত্র, ছিপ সজোরে টানিয়া ফেলিলেন। শূন্য বড়শী উঠিয়া আসিল। "এঃ—পালিয়েছে" বলিয়া দারোগা সাহেব বড়শীতে আবার টোপ গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিপ আবার ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি নামটা বল্লেন?"

"রমণচন্দ্র ঘোষ। সাজিয়াড়ার রমণচন্দ্র ঘোষ।"

"বেটা বড় পাজি নাকি?"

"মহা পাজি—মহা পাজি। স্ত্রীলোকঘটিত কোন ব্যাপার নিয়ে, বাবু তার উপর ভয়ানক চটেছেন। আমাকে বল্লেন—কোন গতিকে বেটাকে যদি একবার শ্রীঘর দেখাতে পার—তবে আমার মনের রাগ যায়। আমি বল্লাম সে আর বিচিত্র কি হুজুর—কিছু টাকা খরচ করলেই তা হতে পারে। বলেন ত থানায় গিয়ে দারোগা মশায়ের সঙ্গে দেখা করে সব ঠিকঠাক করে আসি। বাবু বল্লেন—বেশ ত—যাও। দারোগা মশায়কে আমার নাম করে বোলো—যদি তিনি এ কাজটি উদ্ধার করতে পারেন, তবে তাঁকে

পান খাবার জন্যে দুশো টাকা দেব। বরং এখন নগদ একশো নিয়ে যাও।"

দারোগা সাহেবের দাড়ি আবার নড়িতে লাগিল—কিন্তু সেদিকে দৃকপাত না করিয়া বলিলেন—"টাকাটা এনেছেন না কি ?"

"না, সঙ্গে করে আনিনি—কাছারিতেই রয়েছে। হুজুরের সঙ্গে ত আলাপ পরিচয় ছিল না। কি জানি আবার এ কথা পেড়ে শেষে নিজেই বিপদে পড়ে যাব! এক একজন অকালকুষ্মাণ্ড দারোগা আছেন কিনা—এ সবের মধ্যে থাকেন না—নিজেকে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বলে প্রচার করেন। তা এখন আলাপ পরিচয় হল—এখন সাহস পেলাম। টাকাটা বলেন ত কালই এনে হাজির করি ?"

"হাঁ—কাল নিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনার মনিবকে বলবেন—এ সব কাজ অত সস্তায় হয় না। একজন লোককে ফাঁসানো—দুঃসাহসের কাজ। সমস্ত সাক্ষী ঠিক থাকা চাই—ডেপুটি যদি সাজা করলে তার উপর জজ রয়েছে—তার উপর হাইকোর্ট বসে রয়েছে। কি জানেন—পুলিশের চাকরি সর্ব্বনেশে চাকরি। কখন কোন সূত্রে কি বিপদ ঘটে কিছু বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে দুশো টাকার জন্যে অতটা ঝুঁকি মাথায় নিতে পারব না বাবুকে বলবেন। যদি পাঁচশো টাকা খরচ করতে পারেন তা হলে চেষ্টা করি।"

গদাই বলিল "হুজুর যা বলেছেন—তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। দুশো টাকাটা অত্যন্ত কম বৈকি। তা, বাবুকে আমি বলেও ছিলাম। তিনি বল্লেন আচ্ছা যদি দুশোতে দারোগা সাহেব রাজি না হন—তবে আরও কিছু দেওয়া যাবে। বাবুকে আমি বলব এখন—যা বাড়াতে পারি। আপনার বাড়লেই ত আমার লাভ—আপনাদের এ দিকে কি রকম বন্দোবস্ত বলতে পারিনে—আমাদের ও দিকে, জমিদারের আমলারা শতকরা পঁচিশ টাকা করে কমিশন পায়।"

দারোগা সাহেব হাসিয়া বলিলেন "যদি আমায় পাঁচশো দেওয়াতে পারেন, তবে একশো আপনার। তার কম হলে শতকরা দশ টাকা করে পাবেন। আমাদের এ অঞ্চলে এই হারেই কমিশন দেওয়া হয়ে থাকে।"

গদাই বলিল—"আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন কি উপায়ে বেটাকে ফাঁসানো যায় বলুন দেখি ?"

দারোগা বলিলেন—"অনেক রকম উপায় আছে। তার বাড়ীটা দেখেছেন ?"

"না।"

"তার বাড়ীটা দেখা দরকার। কোনও জিনিষ সুবিধে মত তার বাড়ীতে রেখে তার পর খানাতল্লাসী করা। চোরাই মাল হোক—বন্দুক হোক—মদ চোয়ানর সরঞ্জাম হোক—মেকি টাকা তৈরি করবার যন্ত্র হোক। কিম্বা,—কারু বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে,—তাকে আসামী করা যেতে পারে—কিন্তু তাতে, যার বাড়ী তাকে হাত করতে হয়। সে গ্রামে কে তার দুষমন আছে—সেটা সন্ধান করতে পারলে, তাকে হাত করা দরকার। আমার বিবেচনায়, তার বাড়ীতে কিছু রেখে খানাতল্লাসী করাই সব চেয়ে সুবিধে হবে।"

গদাই বলিল—"আপনি যেমন উপদেশ দেবেন, তাই করতে প্রস্তুত আছি।"

দারোগা সাহেব বলিলেন "বেশ, তবে কাল ঐ একশো টাকাটা নিয়ে আসবেন, কাল নিরিবিলিতে বসে সব পরামর্শ করে ফেলা যাবে।"

"আসব। কাল এই সময় এলে দেখা পাব ত ?"

"আমাদের কি জানেন—দারোগা মানুষ—কখন কোথা খুন হয়—কোথায় ডাকাতি হয় কোথায় কি হয়—কিছুই ত ঠিক নেই। খবর পেলেই বেরিয়ে পড়তে হবে। তবে, আপাততঃ যতদূর বুঝছি কাল বৈকালে থানাতেই থাকব"

গদাধর তখন আদাব্ আরজ্ করিয়া বিদায় হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কেনারামের বিপদ।

পরদিন যথা সময়ে গিয়া গদাই পাল দারোগা সাহেবকে একশত টাকা দিল। দুইজনে নিভৃতে বসিয়া মৃদুস্বরে অনেক পরামর্শ হইল—অবশেষে রমণ ঘোষকে ফাঁসাইবার একটা পাকাপাকি মৎলব স্থির হইয়া গেল। দারোগা সাহেব বলিলেন—"এ দিকের ত সমস্তই ঠিক হল—বাকী টাকাটা ?"

গদাই বলিল—"আমার বাবু এখন বাড়ী নেই—কলকাতা গেছেন। তিনি এলেই ঠিক হয়ে যাবে। পাঁচশো পুরো নাও হোক—শো চারেক টাকা দেওয়াতে পারব—এ ভরসা খুব আছে।"

"চেষ্টা করবেন যদি বাড়াতে পারেন।"

"আজ্ঞে হেঁ হেঁ সে আর বলতে হবে না। চেষ্টার ত্রুটি হবে না - দেখি কতদূর কি হয়।"

"বেশ। তা হলে, আজ সন্ধ্যেবেলা গিয়েই সে বিষয়টা ঠিক করুন। ব্যাটা রাজি হবে ত?"

"সে রাজি হবে, তার বাবা রাজি হবে, তার চৌদ্দপুরুষ রাজি হবে। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" বলিয়া গদাই টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া দরিয়াপুর অভিমুখে রওয়ানা হইল।

সন্ধ্যার পর কাছারিতে পৌঁছিয়া, হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, গদাই হরিনামের মালা লইয়া জপে বসিল। ঝুলির ভিতর অঙ্গুলি নড়িতেছে, মালা খড় খড় করিতেছে - মুখেও মৃদুস্বরে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' যেন শুনা যাইতেছে - কিন্তু তাহার মনে নিম্নলিখিত প্রকারের ভাব তরঙ্গ খেলা করিতে লাগিল -

"মনে করেছিলাম, বাবুর ও হাজার টাকা আমারই হল—কিন্তু ও থেকে চারশো টাকা বোধ হয় বের করতে হল। একশো ত আজ দিয়েই এলাম - আর তিনশো নেবে—না নিয়ে ছাড়বে না। তবে চল্লিশটে টাকা কমিশন বলে ফিরিয়ে পাব—তিনশো ষাট টাকা গেল। কিন্তু করি কি? টাকার মায়া করলে শত্রু দমন করা হয় না - শত্রু দমন করতে হলে টাকা চাই। তবে ও টাকাটা কোন কৌশলে বাবুর কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে। বাবু কোথায় যে গেলেন—এখনও ত কিছু জানতে পারলাম না। যেখানেই যান, চিঠি একখানা নিশ্চয়ই লিখবেন - খবরাখবরের জন্যে তাঁর প্রাণটি ধুকপুক করছে। চিঠি একখানা পেলেই, টাকাটা আদায় করবার ফন্দি করতে পারি। রমণ ঘোষ! রমণ ঘোষ! যেদিন যতীন বাবু বল্‌বেন সেদিনই নাকি তুমি গিয়ে আমার নামে জালের নালিশ্ করবে? নালিশ করাচ্ছি এবার—ভাল করে। তুমি নাকি আমায় জেল দেবে? কে কাকে জেল দেয় দেখাই যাক্। এখন কেনারামকে ফরিয়াদী হতে রাজি করতে পারলে হয়। ডেকে পাঠিয়েছি, এখনও ত এল না। এলে, ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে।"

গদাধর এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কেনারাম আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"নায়েব মশায় ডেকেছিলেন?"

গদাধর ইসারায় তাহাকে বসিতে বলিয়া, হরিনামের ঝুলিটি বক্ষের কাছে ধারণ করিয়া, চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইল। প্রায় তিন মিনিট কাল এইরূপ থাকিয়া, ঝুলিটি কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে করিতে, বিড় বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল। শেষে কেনারামের দিকে চাহিয়া বলিল "আজ আবার থানায় গিয়েছিলাম।"

"থানায়? কি করতে?"

"দারোগা ডেকে পাঠিয়েছিল।"

"কেন নায়েব মশাই?"

"বলছি। তাই বলতেই ত তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। বড় বিপদ।"

কেনারাম চমকিয়া উঠিয়া বলিল "কেন? কার?"

"তোমার, আমার দুজনকারই। বুঝি দুজনকেই জেলে যেতে হয়।"

কেনারামের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। ঢোক গিলিয়া বলিল "কি সর্ব্বনাশ! কি হয়েছে বলুন—বলুন।"

"আঃ চেঁচাচ্ছ কেন? চুপি চুপি কথা কও। দেখ দেখি বাইরে কেউ আছে কি না?"

কেনারাম উঠিয়া দেখিয়া আসিল বাহিরে কেহ নাই। গদাই তখন তাহাকে নিকটে বসাইয়া বলিল "আজ বেলা তিনটের সময়ে ঘুমিয়ে উঠে, বসে তামাক খাচ্ছি—এমন সময় থানা থেকে একজন লোক এসে বল্লে দারোগা সাহেব এখনি আপনাকে ডাকছেন। ভাবলাম, দারোগা হঠাৎ ডেকে পাঠালে কেন? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে, ঘোড়া ছুটিয়ে থানায় গেলাম। গিয়ে দেখি, দারোগা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বসে আছে। একখানা ছোট জলচৌকির উপর, শাদা কালো রঙের একটা মরা বেড়াল। আমাকে দেখেই কনেষ্টবলকে হুকুম দিলে বাঁধো শালাকো। দুটো কনেষ্টবল অমনি আমার হাত দুটো দড়ি দিয়ে কড়াক্কড় করে বেঁধে ফেল্লে। তখন দারোগা আমায় যাচ্ছেতাই করে

গাল দিতে লাগল। আমি ত একেবারে অবাক—ভেবেই ঠিক করতে পারিনে ব্যাপারখানা কি। শেষে দারোগা বল্লে—তুমি আর একটু হলেই আমাদের সকলকে খুন করেছিলে। আমি বল্লাম সে কি হুজুর—এ কি কথা বলেন? দারোগা বল্লে কাল যে ঘি দিয়ে গিয়েছিলে, তাতে বিষ ছিল—গোখুরা সাপের বিষ। আমার বাবর্চ্চি তাই দিয়ে আজ হালুয়া তৈরি করেছিল—হালুয়া নামিয়ে রেখে কোথায় কোন কাজে গিয়েছিল, এমন সময় ঐ বেড়ালটা এসে হালুয়া খেতে আরম্ভ করে। বাবর্চ্চি এসে পড়ল—বেড়ালকে তাড়াতে গেল—কিন্তু বেড়াল পালাতে পারলে না। ম্যা ও করে একবার ডেকে, ঘুরপাক দিতে লাগল। খানিক ঘুরপাক দিয়ে ধপাস করে পড়ে মরে গেল।—তারপর সেই হালুয়া আমরা কাগকে খেতে দিলাম, কাগ মরে গেল—কুকুরকে খেতে দিলাম, কুকুর মরে গেল,—মুর্গিকে খেতে দিলাম মুর্গি মরে গেল। তুমি আমাদের খুন করবার জন্যে এই বিষাক্ত ঘি দিয়ে গেছ—তিনশো সাত ধারায় তোমার দশ বচ্ছর জেল হবে।—এই কথা শুনে আমি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম—বল্লাম দোহাই খোদাবন্দ আমার কিছু দোষ নেই—আমি টাকা দিয়ে ঘি কিনে এনেছি আমি কি করে জানব যে বিষাক্ত ঘি? দারোগা তখন জিজ্ঞাসা করলে—ঘি কে এনে দিয়েছিল। আমি তোমার নাম করলাম।"

কেনারাম বসিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। কোন ক্রমে বলিল—"আমার নাম করে দিলেন?"

"কি করব বাপু—'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' কথাই ত আছে জান। আর, কিছু মিথ্যে কথাও ত বলিনি। শুনে দারোগা বল্লে—তবে তুমি, কেনারাম দুজনেই আসামী হলে। দুজনকেই চালান দেব। তখন আমি অনেক করে দারোগার হাতে পায়ে ধরলাম। শেষে পাঁচশো টাকা কবুল করলাম—তখন দারোগা বল্লে আচ্ছা তোমায় খোলসা দিচ্ছি। কিন্তু কেনারামকে ছাড়ব না। তখন আমি আবার বলতে লাগলাম—আহা সে গরীব নির্দ্দোষী—পাঁচ জায়গা থেকে সংগ্রহ করে ঘি নিয়ে এসেছে—কোথায় কোন গয়লার বাড়ীতে ঘিয়ে সাপে মুখ দিয়েছিল, সেই বা কেমন করে জানবে? তাকেও খোলসা দিতে আজ্ঞে হোক। দারোগা কিছুতেই শোনে না। শেষে বল্লে কেনারাম যদি আমার একটা কায করতে পারে—তবে তাকে মাপ করতে পারি। আমি বল্লাম—হুজুর যা হুকুম করবেন তাই সে করবে—তার বাপ করবে—তার চৌদ্দ পুরুষ করবে। তখন দারোগা বল্লে—একটা গাঁয়ে আমার এক দুষমন আছে—তার নামে একটা চোরাই মাল রাখার মিথ্যে মোকদ্দমা করতে চাই, কেনারাম যদি ফরিয়াদী হয়—তবেই তাকে খোলসা দিই—নইলে চালান করে দেব। আমি বল্লাম—সে অবিশ্যি ফরিয়াদী হবে—আপনি যা বলবেন তাই করবে। দারোগা বল্লে—আচ্ছা আমি যেদিন বলব, সেই দিন রাত্রে যেন সে খানকতক পিতল কাঁসার বাসন গোপনে এনে আমায় দিয়ে যায়—আর বাড়ী গিয়ে নিজের শোবার ঘরে একটা সিঁধ কেটে রাখে, আর পরদিন সকালে এসে এজেহার লিখিয়ে যায়। সেই বাসন সেই শত্রুর বাড়ীতে রাখিয়ে আমি তাকে চোরাই মাল রাখার অপরাধে চালান করে দেব। আমি বল্লাম তা নিশ্চয়ই সে করবে এ আর বিচিত্র কথা কি। দারোগা তখন আমার বাঁধন খুলে দিলে—বল্লে, যাও, তাকে জিজ্ঞাসা করগে—সে রাজি হয় উত্তম, রাজি না হয়, তোমাকে, তাকে দুজনকেই চালান করে দেব। আর সে যদি রাজি হয়, আর তুমি পাঁচশো টাকা দাও, তবে দুজনকেই মাফ করতে পারি।—এই ত অবস্থা—এখন কি বল?"

কেনারাম কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, কর্ত্তা যা হুকুম করবেন সে কি আমি অমান্য করতে পারি?"

"তা হলে ঐ কথা কাল গিয়ে দারোগাকে বলিগে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"হাঁ আর একটা কথা দারোগা বলে দিয়েছে। তোমার বাড়ীতে কিছু ভাঙ্গা ফুটো বাসন আছে?"

"আছে বৈ কি। একখানা বকনো আছে তার কাণাটা ভাঙ্গা, একটা ঘটী আছে তার পেটটা ফুটো।"

"বেশ। সেই বকনো আর সেই ঘটী কালই কাঁসারি-বাড়ী গিয়ে রাংঝাল দিয়ে মেরামৎ করিয়ে নাও। কালই—বুঝলে? দেরী না হয়।"

"কেন নায়েব মশাই?"

"আঃ—এইটে আর বুঝতে পারলে না? এজেহার

লেখবার সময় দারোগা তোমায় জিজ্ঞাসা করবে—তোমার বাসনাদি সেনাক্ত করবার কিছু বিশেষ চিহ্ন আছে? তুমি লিখিয়ে দেবে আজ্ঞে হ্যাঁ—বকনোটার কাঁধা আর ঘটিটার পেট শ্রীঅমুক কাঁসারির দ্বারা সম্প্রতি রাংঝাল প্রদানে মেরামৎ করাইয়া ছিলাম। তারপর, সেই লোকের বাড়ী থেকে যখন ঐ সব বাসন বেরুবে—তুমি ঐ চিহ্ন দেখে সেনাক্ত করবে—আদালতে ঐ চিহ্ন দেখাবে—কাঁসারিও গিয়ে সাক্ষী দেবে হ্যাঁ, এই বকনো এই ঘটী আমি মেরামৎ করেছিলাম—এই চিহ্ন রয়েছে। দুই একটা বাসনে ও রকম চিহ্ন না থাকলে সেনাক্ত হবে কি করে? এক রকমের ঘটী এক রকমের বকনো পাঁচশো আছে। এখন বুঝলে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হলে কালই আমি কাঁসারি-বাড়ী গিয়ে ও দুটো মেরামৎ করিয়ে নিই। আপনি দারোগাকে গিয়ে বলুন, তিনি যা বলবেন, তাতেই এ গোলাম রাজি আছে।”—বলিয়া কেনারাম, গদাইপালের পদদ্বয় ধারণ করিয়া ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন

আমি শুধু জানাব আজ
তোমায় আমি ভালবাসি;
তা'তে তোমার ক্ষতি কিসের
সর্ব্বনাশি, সর্ব্বনাশি!
রাত্রিদিবা মর্ম্মতলে
যে অনন্ত বহ্নি জ্বলে,
পতঙ্গ যে সে অনলে
জীবন তাহার ঢালে হাসি,
মরণ কথা বলবে না সে?
সর্ব্বনাশি, সর্ব্বনাশি!

কেন তবে নয়ন-ভরা
পাগল-করা শোভা তোমার,
নয়ন যদি ভুলে তা'তে—
সে অপরাধ শুধু কি তার?
যদি তোমার ওষ্ঠপুটে
কহিতে কথা পদ্ম ফুটে,
ভ্রমর চক্ষু যদি জুটে—
নিন্দা করা যায় কি তাহার?
আঁখির যদি দোষই থাকে—
কিছু সে দোষ নয় কি তোমার?

চুম্বকেতে লোহা টানে,
স্বভাব তাহার ধরা দেওয়াই,
লোহা বড় নরম ত নয়,
তবু যে তার ধরম তাহাই;
এ সব সত্য মেনেও তবে
মুখটি নীচু করতে হবে?
মনের ব্যথা থাকুক তবে
আপন মনেই বলতে না চাই।

সিঁদুরে আম টুকটুকে' লাল
অস্ত-রবির আবির মাখি',
গণ্ডে তোমার লজ্জা পেয়ে
সরম রাখে পাতায় ঢাকি',
মঞ্জরিত খেজুর কাঁদে'
অলক হেরে' লুটিয়ে কাঁদে,
জোড়া-ভুরুর বেড়া-ফাঁদে
বাঁধা পড়ে আঁখি-পাখী!
তোমার মাঝে কি যে আছে
নিজে তুমি জান তা কি?

গোপন তব মরমতলে
সে কথাটি লুকিয়ে থাকে,
থাকুক না সে—জানতে কে চায়,
কে কোথায় কি ঢেকে রাখে!
তবু মনে ঠিকই জানি,
স্বচ্ছ যাহার আননখানি—
হৃদয় তাহার তেমনি মানি'
হৃদয় দেওয়া যায়গো তাকে—
দিয়েছি তাই পরাণ আমার,
সে কলঙ্ক আর কি ঢাকে?

তবু যদি ব্যথা তোমায়
দিয়ে থাকি, কর ক্ষমা
তুমি থাক কল্পলোকের
আলোকলতা মনোরমা ;
জানি কভু ফুটবেনা ফুল,
ফলবেনা ফল, তবু আকুল
এ জীবনের সে মহাভুল
মনের খাতায় রইল জমা ;
হিসেব নিকেশ চুকবে যেদিন,
এসো সেদিন প্রিয়তমা !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন বাগচী।

পতিব্রতা

দ্বিতীয় আখ্যান।

সুনীতি।

শরদাগমে প্রসন্নসলিলা যমুনা নীলাঞ্জনপটের ন্যায় প্রসারিত রহিয়াছে। তটে সুচারু উপবন ; যূথী, জাতি এবং বকুলের সৌরভে তাহা আমোদিত হইতেছে। উপবনের মধ্যে রাজা উত্তানপাদের রমণীয় প্রাসাদ। উত্তানপাদ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর, সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ও গৌরবের সীমা নাই। তাঁহার দুই পত্নী, প্রথমার নাম সুনীতি, দ্বিতীয়ার নাম সুরুচি। লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বারা বৈকুণ্ঠপুরীর ন্যায় সুনীতির ও সুরুচির দ্বারা উত্তানপাদের পুরী শোভাময়ী হইত।

প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে একদিন রাজমহিষী সুরুচি একাকিনী ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার কেশদাম আলোলিত, শরীর অলঙ্কারশূন্য এবং পরিধান জীর্ণ মলিন বস্ত্র। অনবরত রোদনে তাঁহার মুখ ও চক্ষু দুইটী আরক্ত হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল ; তাঁহার পরিচারিকাগণ কক্ষদ্বার হইতে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিল, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিতেছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল ; রাজা উত্তানপাদ রাজকার্য্যান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয়তমা মহিষীকে আপন কক্ষে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই নিভৃত গৃহে আগমন করিলেন। পত্নীকে তদবস্থ দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয়ে একি ! তুমি এখানে এভাবে রহিয়াছ কেন ?"

মহিষী কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপনার অর্দ্ধাবৃত মুখ আর একটু আবৃত করিলেন। রাজা মহিষীর মুখের বস্ত্র সরাইয়া দেখিলেন, অনবরত রোদনে তাঁহার নীলোৎপল তুল্য চক্ষু দুইটীর পল্লব ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার মুখের চম্পকনিন্দিত বর্ণ রক্তপদ্মের আভা ধারণ করিয়াছে। রাজার হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে ! বল কি হইয়াছে ? তোমার পিত্রালয় হইতে কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে কি ?"

মহিষী তথাপি উত্তর দিলেন না। তখন রাজা তাঁহার আর একটু নিকটে বসিয়া তাঁহার অঙ্গে হস্তামর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। "কি জন্য তিনি এমন করিয়া আছেন, কেহ কি তাঁহাকে কোন অপমানের কথা বলিয়াছে, যদি তাঁহার কোন অভিলাষ থাকে, বলিবামাত্রই তাহা পূর্ণ হইবে," এইরূপ নানা কথা বলিলেন, কিন্তু মহিষী কিছুতেই মৌনভঙ্গ করিলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে রাজা বলিলেন ; "প্রিয়ে ! সমস্ত দিনের কার্য্যে আমি শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছি। আমার শরীর অবসন্ন এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত। যদি তোমার অসন্তোষের কারণ থাকে, পরে অভিমান করিও, এক্ষণে আমার ক্ষুৎপিপাসা দূর কর।"

সুরুচি এইবার উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে দাসী রাজযোগ্য আহার্য্য ও পানীয় আনয়ন করিল। সুরুচি স্বহস্তে স্থান মার্জ্জনা করিয়া আসন পাতিয়া দিলেন এবং রাজা সন্ধ্যাবন্দনার পর আহার করিতে বসিলে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে রাজা মহিষীকে করে আকর্ষণ করিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইলেন এবং সপ্রেম দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে ! আমার কথা রাখ, কি হইয়াছে বল।" সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ ! আমি আপনার দাসীমাত্র ; দাসীকে এত আদর কেন ?" রাজা বলিলেন, "প্রিয়ে তোমার ভাব কি আমি

ত বুঝিতে পারিতেছি না ; তুমি যদি দাসী, তবে আমার ধর্ম্মপত্নী কে ?"

সুরুচি বলিলেন, "ধর্ম্মপত্নী সুনীতি ! মহারাজ ! যদি আমাকে পত্নীযোগ্য স্থান না দিবেন, তবে আমায় বিবাহ করিয়াছিলেন কেন ?"

রাজা। প্রিয়ে তোমার কি উদ্দেশ্য আমি ত বুঝিতে পারিতেছি না। মন খুলিয়া সকল কথা বল।

সুরুচি। বলিতেছি, কিন্তু আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া পুত্রকামনায় আমার পিতার নিকট আমাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। আপনাকে ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ জানিয়া সপত্নী সত্বেও পিতা আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে আপনি আমাকে ধর্ম্মপত্নীরূপেই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু

সুরুচির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই উত্তানপাদ বলিলেন, "প্রিয়ে ! আমি তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছি ?"

সুরুচি। মহারাজ ! এই প্রাসাদের যমুনাবায়ুসেবিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষ কাহার বাসের জন্য দিয়াছেন।

উত্তানপাদ। রাজ্ঞি ! তোমার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই সুনীতি তথায় বাস করিতেছেন, তুমি বল, আমি তোমার জন্য তাহার অপেক্ষা শতগুণ রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছি !

সুরুচি। মহারাজ ! আপনার ভাণ্ডারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন গজমুক্তার হার কাহাকে দিয়াছেন ?

উত্তানপাদ। প্রিয়ে ! অকারণ আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। এ হার অতি দুর্লভ। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল বরুণদেবের আরাধনা করিয়া ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার বিবাহের পর পিতৃদেব ইহা যৌতুক স্বরূপ সুনীতিকে দিয়াছিলেন, আমি দিই নাই। আমি তোমারও জন্য এইরূপ হার সংগ্রহের বহু চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রকূলস্থ বণিকগণ বলেন যে, ওরূপ মুক্তা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, সেইজন্য কৃতকার্য্য হই নাই।

সুরুচি ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "অহো ! আমার কি সৌভাগ্য ! কিন্তু মহারাজ ! এরূপ কপটপ্রেম প্রদর্শনে লাভ নাই। বস্ত্রালঙ্কারের কথা যাউক, অগ্নিহোত্রে সুনীতিই কেবল আপনার সহধর্ম্মচারিণী কেন ? আমি কি আপনার ভোগ্যা দাসী মাত্র !"

রাজা। প্রিয়ে তুমি ভ্রম করিতেছ। আমি যে অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়াছি, তাহা দিবসসাধ্য নয়, জীবনব্যাপী ; তুমি এখনও সুকুমারবয়স্কা, উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনে অনভ্যস্তা, সেইজন্যই সুনীতি তোমাকে ক্লেশ দিতে চাহেন না। বিশেষতঃ—

সুরুচি। বিশেষতঃ কি মহারাজ ?

রাজা। বিশেষতঃ লোকাচার এইরূপ যে, বহুপত্নীকের পক্ষে ধর্ম্মাচরণে জ্যেষ্ঠা পত্নীরই প্রথম অধিকার।

সুরুচি। মহারাজ ! আর বলিতে হইবে না। বুঝিয়াছি, আপনার সংসারে আমার স্থান নাই। রাজপুরীর শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা সুনীতির, ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠরত্ন সুনীতির, ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠ অধিকার সুনীতির ; কেবল কুক্কুরীর ন্যায় আপনার অন্নে উদর পোষণ করিতে অধিকার আমার। আপনি আপনার ধর্ম্মপত্নীকে লইয়া থাকুন। আমি বিদায় লইলাম।

সুরুচি এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে বল পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আপনার পার্শ্বে বসাইলেন এবং সস্নেহে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে সত্য বলিতেছি তুমি আমার গৃহের শোভা" রাজা আরো কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা শেষ না হইতে হইতেই সুরুচি বলিলেন, "সে কথা সত্য, মহারাজ ! আমি তাহাতে বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস করিনা। বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া আপনি আমাকে গৃহের শোভা পুত্তলিকা করিয়া রাখিয়াছেন ! ধিক্ আমাদিগের নারীজন্মকে ! ধিক্ পুরুষের রূপস্পৃহাকে !"

রাজা বলিলেন, "প্রিয়ে। তুমি অকারণে ক্ষোভ করিওনা। আমি সুনীতিকে এখনই সংবাদ দিয়া এখানে আনাইতেছি। আমি তাঁহার হৃদয় জানি। তিনি তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহবতী, তাহাতে তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে, তিনিই তোমার কষ্টের কারণ, তাহা হইলে যে কোন উপায়েই হউক, তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন।"

রাজা এই বলিয়া একজন দাসীকে বলিলেন, "যাও

বড়রাণীকে আমার নাম করিয়া একবার এখানে আসিতে বল।"

দাসী বিদায় হইল। তখন সুরুচি অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বড়রাণী! বড়রাণী! সকলেই বলে বড়রাণী! সে বড়রাণী, আমি ছোটরাণী। সে বড় কিসে? সে রাজার মেয়ে, আমি কি নই? সে রাজার স্ত্রী, আমি কি নই? তার রূপ আছে আমার কি নাই? তবে সে বড় আমি ছোট কি জন্য? যদি আমি মথুরার রাজকন্যা হই, তবে দেখব, বড়রাণী, ছোটরাণী নাম ঘোচে কিনা। লোকে দেখবে, এক রাজা, এক রাণী, বড় ছোট নাই।"

এই সময় রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া সুনীতি তথায় আগমন করিলেন। তিনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দেবালয় হইতে সন্ধ্যার আরতি দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তখনও বেশ পরিবর্ত্তন করেন নাই। সেই বেশেই আসিলেন। তাঁহার পরিধান কৌষেয় বসন, ললাটে চন্দন-রেখা, কণ্ঠে ও মস্তকে দেবপ্রসাদ পুষ্পমালা। মুখচ্ছবি অতি প্রশান্ত, দেখিলে কোন দেবীপ্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। মহিষীর বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক হইয়াছিল; যৌবনের তরল লাবণ্য অপগত হইয়া প্রৌঢ় বয়সের গম্ভীর সৌন্দর্য্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিকশিত হইয়াছিল। এবং তাহাতে পত্নীত্বের অপেক্ষা মাতৃত্বের ভাবই অধিক ব্যক্ত হইতেছিল। উত্তানপাদ একবার সুনীতির স্নেহকরুণাপূর্ণ, সরলতার আধার মুখখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। কিন্তু তিনি মুখে কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

এদিকে সুনীতি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, সুরুচির কেশ আলোলিত, শরীরে অলঙ্কার নাই, পরিধান জীর্ণ বস্ত্র। তিনি বিস্মিতা হইলেন এবং কালক্ষেপ না করিয়া একবারেই তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহার অসংযত কেশরাশি করে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,

"এ কি বোন! আজ তোমার এ বেশ কেন? দেখিতেছি চুল বাঁধ নাই, সিন্দূর পর নাই, গায়ে ধূলা মাটী লেখিয়াছ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোক্ দুটী ফুলিয়াছে; কি হইয়াছে? মথুরা হইতে কোন কুসংবাদ আসে নাই ত?"

সুরুচি আপনার কেশ আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং অতি কর্কশ স্বরে বলিলেন, "সুনীতি! তুমি আমায় স্পর্শ করিওনা।"

সুনীতি বিস্মিতা হইলেন; বলিলেন,—"একি বোন! তুমি ত কোন দিন আমার নাম ধরিয়া ডাক না। চিরদিন দিদি দিদি বল। আজ তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

সুরুচি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে রাজা উত্তানপাদ বলিলেন, "রাজ্ঞি! সুরুচি আজ তোমার, আর আমার উপর অভিমানিনী হইয়াছে। সুরুচির বিশ্বাস আমি তাহার অপেক্ষা তোমায় অধিক ভালবাসি। সে বলে ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠরত্ন গজমুক্তার হার আমিই তোমাকে দিয়াছি।"

সুনীতি। এই কথা! এই জন্য বোন! তুমি যখন আমাদের বাড়ীতে আইস নাই, তখন স্বর্গীয় কর্ত্তা মহারাজ এই হার আমায় দিয়াছিলেন। এ হারে আমারও যেমন অধিকার, তোমারও তেমনি। আজ হইতে এ হার তোমার হইল।

সুনীতি এই বলিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে তখনই হার উন্মোচন করিয়া সুরুচিকে পরাইয়া দিলেন। দীপালোকে হার অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিল, কিন্তু সুরুচি তাহা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং রুক্ষস্বরে বলিলেন, "সুনীতি! আমি মথুরার রাজকন্যা, ভিক্ষুকী নই, তোমার দান আমি গ্রহণ করিতে চাই না।"

রাজা ও সুনীতি উভয়েই সুরুচির ব্যবহার দেখিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বলিলেন, "সুরুচি! কি করিলে তোমার সন্তোষ হয় বল, আমরা উভয়েই তাহা করিব।"

সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! তবে শুনুন; এ গৃহে আমাদিগের উভয়ের স্থান হইতে পারে না। আমি যত দিন বালিকা ছিলাম, আমার ন্যায্য অধিকার কি জানিতাম না, তাই সুনীতি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছিলেন, আমি তাহাতেই তৃপ্ত ছিলাম, কিন্তু এখন আমি আমার অধিকার বুঝিয়াছি, আমার যাহা প্রাপ্য তাহা আমি লইব।"

সুনীতি বলিলেন, "এ ত ভালই কথা। এর জন্য তুমি অসুখী কেন? তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা ত তুমি পাইবেই,

তাহার উপর আমার নিজের যাহা আছে, তাহাও আমি তোমাকে দিব।"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের ভার কিছু লঘু হইল। তিনি বলিলেন, "সুরুচি! দেখ দেখি, বড় রাণী তোমায় কত ভালবাসেন, তবে তুমি তাঁহার উপর অভিমান করিয়াছ কেন?"

সুরুচি বলিলেন, "মহারাজ! আপনি নারী-হৃদয় জানেন না। নারী অপর সকলের অংশ দিতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছায় কখন স্বামীর অংশ দিতে পারে না। বস্ত্র, অলঙ্কার, ঐশ্বর্য্য সকলই সুনীতির একার থাকুক, আমি আমার স্বামীতে একাধিকার চাই।"

ক্ষণকালের জন্য সুনীতির মুখ তখন মেঘাবৃত হইল, কিন্তু চিত্তসংযম করিয়া তিনি আপনার স্বাভাবিক মধুর-স্বরে বলিলেন, "ভগিনি! তুমি আসিবার পূর্ব্বে আমি বহুদিন একাকিনী স্বামিসেবা করিয়াছি, তুমিও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং আমি যাহা পাইয়াছি, তুমিও তাহা পাইতে অধিকারিণী। এখন তুমি একাই ইঁহার সেবা কর। আমি তোমাদিগের উভয়কে সুখী দেখিয়া সুখী হইব।"

সুরুচি তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "মহারাজ শুনুন, এ পুরীতে আমাদের উভয়ের স্থান হইবে না। আপনি চমকিত হইবেন না; কেন আমি এ কথা বলিতেছি তাহা শুনুন, আপনার প্রথমা স্ত্রী অপুত্রবতী ছিলেন বলিয়াই আপনি আমার পিতার নিকট আমাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহার দৌহিত্র ভবিষ্যতে রাজ্যাধিকারী হইবে, এই আশাতেই তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন যদি আপনি আমাদিগের উভয়কে লইয়া বাস করেন, তবে আমার সন্তান হইলে তাহার রাজ্যলাভের আশা অতি অল্প। সে দিন মহর্ষি বৈশম্পায়ন আমাদিগের উভয়কেই দেখিয়া "পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। মহর্ষির বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নয়। সুতরাং আমার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, সুনীতির পুত্র হইলে, প্রজাগণের কয়দংশ শ্রেষ্ঠা মহিষীর পুত্র বলিয়া নিশ্চয়ই তাহার পক্ষ অবলম্বন করিবে, সুতরাং আমার পুত্রের নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ ঘটিবে না।"

সুনীতি। ভগিনি! এই যদি তোমার উদ্বেগের কারণ হয়, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নারায়ণ যদি আমায় কখন পুত্র দেন, তবে তুমি জানিও আমার পুত্র রাজ্যকামুক হইবে না। রাজপদ হইতেও যে পদ শ্রেষ্ঠ, আমি তাহাকে সেই পদ লাভের জন্য শিক্ষা দিব।"

সুরুচি। রাজপদ হইতেও শ্রেষ্ঠ পদ? তুমি তাহাকে কি শিখাইবে?

সুনীতি। ভগিনী তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে না, সে কথা থাক।

"বুঝিতে পারিবে না" একথা সুরুচির মর্ম্মে লাগিল। পাদস্পৃষ্টা সর্পীর ন্যায় সুরুচি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "সুনীতি! তুমি শোন, মহারাজ আপনিও শুনুন; পুত্রের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন, সুনীতির দ্বারা আপনার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই; সেই জন্যই আপনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সংসারে আমাদিগের দুইজনের থাকা নিষ্প্রয়োজন। হয় আপনি আমাকে বিদায় দিয়া সুনীতিকে লইয়া থাকুন, না হয় তাহাকে বিদায় দিয়া আমার ন্যায্য অধিকার আমাকে দিন।"

সুনীতির চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; তিনি গদগদ বচনে বলিলেন, "ভগিনি! কেন এমন কথা বলিতেছ! এস, উভয়ে মিলিয়া স্বামার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করি। আমি রাজ্য, ধন, সম্পদ কিছুই চাই না। দিনান্তে পতিপদ পূজা করিব, এই মাত্র আমার বাসনা।"

সুরুচি বলিলেন, "তাহা হইবে না; বসন্তকালে নূতন পত্র উদ্গত হইবার পূর্ব্বেই পুরাতন পত্রকে স্থানচ্যুত হইতে হয়। এ সংসারে এখন তোমার আর স্থান হইবে না।"

সুনীতি রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনারও কি এই মত?"

রাজার সর্ব্বাঙ্গ যেন সূচীবিদ্ধ হইতেছিল, তিনি সুরুচির দিকে চাহিলেন, দেখিলেন তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। তিনি কাতরকণ্ঠে সুনীতিকে বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি কি বলিব! আমায় রক্ষা কর।"

সুনীতি মহারাজার মনের ভাব বুঝিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পদে প্রণাম করিয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির

হইলেন, আপনার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া নিজের বিশ্বস্তা দাসীর নিকট দিলেন এবং এক বসনে রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্যা হইলেন। "বড় রাণী কোথায়? বড় রাণী কোথায়" অল্পক্ষণের মধ্যে রাজপুরীতে এই কোলাহল উঠিল। কেহ কোন সংবাদ দিতে পারিল না। প্রাতঃকালে একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, যে গুপ্তদ্বার দিয়া অন্তঃপুরচারিণীগণ যমুনায় স্নান করিতে যান সেই দ্বার রাত্রিতে উন্মুক্ত ছিল, এবং যমুনাপুলিনে অলক্তাঙ্কিত পদচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুনিয়া পুরজনগণ অনুমান করিলেন বড় রাণী যমুনা জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। মর্ম্মপীড়িত রাজার দীর্ঘ নিশ্বাস আকাশে বিলীন হইল, অশ্রুবিন্দু পৃথিবীতে শুষ্ক হইয়া গেল; সেই সঙ্গে বড় রাণীর নামও ক্রমে উত্তানপাদের সংসার হইতে বিলুপ্ত হইল।

যমুনার তট হইতে এক নিবিড় অরণ্যানী বহু যোজন পর্য্যন্ত উত্তরদিকে প্রসারিত আছে। তাহার এক প্রান্তে মহর্ষি অত্রির পবিত্র আশ্রম। তপোনিষ্ঠ বহু ঋষি ও ঋষিপত্নী তথায় বাস করেন। সেখানে হিংসা, দ্বেষ নাই; ঐশ্বর্য্যের বা বিলাসের চিহ্নমাত্র নাই। প্রকৃতির সদাব্রতে সকলেই সমান অধিকারী। পরস্পরের সুখ দুঃখে সুখী ও দুঃখী হইয়া সদালাপে ও সদনুষ্ঠানে তাঁহাদিগের দিন অতিবাহিত হয়। আশ্রমের এক নির্জ্জন অংশে একখানি কুটীর শোভা পাইতেছে, দেখিলে তাহা অপেক্ষাকৃত নূতন বলিয়া বোধ হয়। কুটীরখানির চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত, এবং কণ্টককঙ্করশূন্য। অসংখ্য তুলসী বৃক্ষ কুটীরখানিকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এক তপস্বিনী একাকিনী সেই কুটীরে বাস করেন। আকারে ও ব্যবহারে অন্যান্য তপোবনবাসিনীদিগের হইতে তাঁহার কিছু পার্থক্য আছে। তাঁহার শরীরের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত ও সুললিত। মুখে এমন একটী কমনীয় প্রশান্ত ভাব বর্ত্তমান যে, দেখিবামাত্র তাঁহার নিকট মস্তক নত করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার পরিধান গৈরিকরঞ্জিত বসন, কণ্ঠে তুলসীমাল্য, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনাঙ্কিত শ্রীপাদচিহ্ন। তিনি অধিকাংশ সময়ই সমাধিতে মগ্না থাকেন, কচিৎ কখনও কুটীর হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষের গলিত পত্র এবং ফল সংগ্রহ করিয়া আনেন। তাঁহার দয়ার শেষ নাই, আশ্রমে কেহ কখন পীড়িত হইলে তিনিই তাহার সেবা করেন এবং শোকার্ত্তকে তিনিই সান্ত্বনা দেন। কুলায়ভ্রষ্ট পক্ষিশাবক এবং মাতৃহীন মৃগশিশুগুলিকে প্রতিপালন জন্য ঋষিগণ তাঁহারই হস্তে অর্পণ করেন। তাঁহার কুটীর সর্ব্বদাই হরিনামে প্রতিধ্বনিত। যখন তাঁহার নিজের কণ্ঠ নীরব হয়, তখন তাঁহার শিক্ষিত শুক শারিকাগণ "হরি" "হরি" উচ্চারণ করিয়া সে স্থান পবিত্র করে। তাঁহার প্রতি আশ্রমবাসিগণের ভক্তির সীমা নাই। মহর্ষি আদর করিয়া তাঁহাকে আশ্রমলক্ষ্মী নাম দিয়াছিলেন, সেই নামেই তিনি সকলের নিকট পরিচিতা। তপোবনে সাধারণতঃ পরিচয় জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ কখন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন না। একমাত্র মহর্ষি অত্রিই তাঁহার পরিচয় জানিতেন।

একদিন অগ্নিহোত্র সম্পাদনের পর মহর্ষি অত্রি আশ্রমলক্ষ্মীর কুটীরে আগমন করিলেন। আশ্রমলক্ষ্মী দেখিবামাত্র, ব্যগ্র হইয়া, মহর্ষিকে বসিবার আসন এবং পাদ্যার্ঘ প্রদান করিলেন এবং মহর্ষি উপবেশন করিলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্টা হইলেন। পরস্পর কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করার পর মহর্ষি বলিলেন, "মা আশ্রমলক্ষ্মী! একবারও কি তোমার মুখে একটু হাসি দেখিব না? যখনই আসি, দেখি মুখখানি মলিন, চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া আছে। কেন এত কাঁদ মা!"

আশ্রমলক্ষ্মী মহর্ষিকে পিতৃ সম্বোধন করিতেন; তিনি বলিলেন, "পিতঃ আমি যদি না কাঁদিব, তবে কাঁদিবে কে? না কাঁদিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

মহর্ষি। বৎসে! আমি তোমায় কতবার বলিয়াছি, তুমি নিষ্পাপা। কেন তবে তুমি নিজেকে পাপীয়সী বলিয়া মনে কর? এক দিকে ধর্ম্মাভিমান যেমন নিন্দনীয়, অপর দিকে আত্মাবমাননাও তেমনই দোষাবহ।

আশ্রমলক্ষ্মী। নিষ্পাপা হইলে আমার এত মনস্তাপ কেন?

মহর্ষি। বৎসে! মনস্তাপ সর্ব্বত্র পাপের সূচক নয়। পাত্র বিশেষে তাহা সত্য হইলেও ভাবের ব্যতিক্রম আছে। দেখ! সূর্য্যদেব প্রখর উত্তাপে পৃথিবীকে দগ্ধ করেন, কিন্তু তাহা কি পৃথিবীর পাপের জন্য, না, পৃথিবীকে

ফলপ্রসবিনী করিবার জন্যই? ভগবান যে আমাদিগকে সময়ে সময়ে দুঃখদগ্ধ করেন, তাহা কেবল আমাদিগের পাপের জন্য নয়। আমাদিগের দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধনের জন্যও করিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস, তোমার এই সাময়িক ক্লেশ তোমার কল্যাণেরই জন্য। স্বামী হইতে বিচ্যুতা হইয়া তুমি আজ জগৎস্বামীকে যেমন ভাল বাসিতে পরিয়াছ, পূর্ব্বে কখনও তেমন পার নাই। অশ্রুপ্রবাহে তোমার মলিনতা ধৌত হওয়াতে তোমার হৃদয় এখন জগৎপতির আসন হইবার যোগ্য হইয়াছে! বৎসে! তোমার ক্লেশ জগতের কল্যাণপ্রসূ হইবে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমার গর্ভে এমন এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, যিনি পৃথিবীতে ভক্তচূড়ামণি নামে খ্যাত হইবেন এবং যাহা অধ্রুব অসত্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাহা ধ্রুব সত্য তাহা লাভ করিবেন।

আশ্রমলক্ষ্মী। পিতঃ আপনার বাক্য নিষ্ফল হইবার নয়; কিন্তু আমি কোথায় আর আমার প্রভু কোথায়? আবার কি আমি তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পাইব?

মহর্ষি। পাইবে, বৎসে! পাইবে। বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? তাঁহার কার্য্য তিনিই করিবেন। ক্রমে বেলা অধিক হইয়াছে, আমি এখন বিদায় হই।

মহর্ষি এই বলিয়া আশ্রমলক্ষ্মীকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় লইলেন। ক্রমে পূর্ব্বাকাশের সূর্য্য মধ্যগগনে আরোহণ করিলেন এবং মধ্যগগন হইতে পশ্চিমাকাশে অবতীর্ণ হইলেন। অন্ধকার ধীরে ধীরে বনভূমি আক্রমণ করিল। কিন্তু সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গেই নিবিড় ঘনঘটায় আকাশ আবৃত হইল এবং প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত হইয়া পড়িল এবং বনচর প্রাণিগণ চীৎকার করিয়া ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বনভূমি অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। পত্রসঞ্চালনে এবং শাখায় শাখায় ঘর্ষণে অতি বিকট শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রবল ধারাপাত আরম্ভ হইল। সে বৃষ্টিতে বাহিরে অবস্থান করে কাহার সাধ্য? আশ্রমবাসিগণ স্ব স্ব কুটীরে প্রবেশ করিলেন এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঝটিকা অবসানের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রহরাধিক পর্য্যন্ত ঝটিকার বিশ্রাম হইল না। আশ্রমলক্ষ্মী দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকিনী আপন কুটীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক একবার প্রবল বায়ুতে তাঁহার কুটীর আন্দোলিত হইতেছিল, আর তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় কে আসিয়া তাঁহার দ্বারে সবলে আঘাত করিয়া বলিল, "কে আছ? প্রাণ যায়, দ্বার খোল?"

আশ্রমলক্ষ্মী প্রথমে ভাবিলেন, হয়ত তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, বায়ুর গর্জ্জনই তিনি বিপন্নের আর্ত্তনাদ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার সেই স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি ব্যগ্র চিত্তে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; দীপালোক তাঁহার ও আগন্তুকের মুখের উপর পতিত হইল। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "একি বড় রাণী!"

আশ্রমলক্ষ্মী বলিলেন, "একি মহারাজ!"

দ্বিতীয় বাক্যব্যয়ের পূর্ব্বে উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া গৃহতলে পতিত হইলেন।

বলিতে হইবে কি যে এই আশ্রমলক্ষ্মী আমাদিগের পতিগতপ্রাণা সুনীতি এবং এই আগন্তুক রাজা উত্তানপাদ? গৃহত্যাগ করিয়া সুনীতি যমুনাকূল অবলম্বনে ক্রমে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহার পরিচয় পাইয়া এবং তাহার সুশীলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দুহিতৃস্নেহে আশ্রমে স্থান দিয়াছিলেন। সেখানে ঋষি ও ঋষিপত্নীদিগের সহবাসে দিবারাত্রি সদালাপে ও সদনুষ্ঠানে সুনীতির সময় অতিবাহিত হইত। জনসংঘর্ষে যে ধ্যান ও ধারণা দুঃসাধ্য, শান্তিরসাস্পদ আশ্রমে তাহা সুনীতির পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছিল। কৃষিক্ষেত্র প্রথমে সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হয়, পরে হল দ্বারা বিদীর্ণ হয়, তাহার পর বর্ষার ধারাপাতে শীতল হইলে শস্য প্রসব করে। সপত্নীর দুর্ব্যবহারে, স্বামীর ঔদাসীন্যে দগ্ধা ও বিদীর্ণহৃদয়া সুনীতি মহর্ষি অত্রির স্নেহে ও সদুপদেশে শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। ধ্রুবের ন্যায় সন্তানের মাতা হইবার তাঁহার অধিকার জন্মিল। যথাকালে তিনি পতিপদসেবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। মৃগয়ায় আগত রাজা উত্তানপাদ ঝটিকা বৃষ্টিতে পথ হারাইয়া অজ্ঞাতসারে সুনীতির কুটীরে উপস্থিত

হইলেন। মহর্ষি যথার্থ ই বলিয়াছিলেন, বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? তাঁহার কার্য্য তিনি করিলেন।

ঝটিকা বৃষ্টি অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমবাসিগণ অবগত হইলেন যে, আশ্রমলক্ষ্মীর গৃহে এক অতিথি আসিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহারা সকলে অতিথির উপযুক্ত সংকারের জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অতিথি কে, এবং আশ্রমলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ সে সংবাদ অল্প ক্ষণের মধ্যেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শুনিয়া ঋষিপত্নীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা আপন আপন গৃহ হইতে যাহার যাহা উৎকৃষ্ট বস্ত্র ছিল, সঙ্গে লইয়া আশ্রমলক্ষ্মীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। কেহ সদ্যপ্রস্তুত ঘৃত, কেহ দধি, কেহ মধু, কেহ পায়সান্ন আনিলেন। কেহ সুরভি কুসুম, কেহ চন্দন, কেহ ফলমূল প্রেরণ করিলেন। সুনীতি স্বামীকে সিক্ত ও কাতর দেখিয়া তাঁহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া অগ্নুত্তাপে তাঁহাকে সুস্থ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিপত্নীদিগের প্রদত্ত উপচারে তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। রাজার বোধ হইল, এমন অমৃতোপম বস্তু তিনি কখনও আহার করেন নাই, এবং আহারে কখনও এমন পরিতৃপ্ত হন নাই। দুঃখিনী সুনীতি রাজযোগ্য শয্যা কোথায় পাইবেন? তিনি কুটীরের একাংশে রাজার জন্য আপনার কুশাসন পাতিয়া দিলেন, রাজা তাহাতেই শয়ন করিলেন। জনপদে হউক আর তপোবনেই হউক নারীপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান। মহর্ষি অত্রির পত্নী স্বয়ং আসিয়া আশ্রমলক্ষ্মীর কেশ রচনা করিয়া দিলেন। নিজের বল্কলাঞ্চলে তাঁহার মুখ মুছাইয়া তাঁহার ললাটে চন্দনরেখা ও সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু দিলেন। মেঘাপগমে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সে সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হইল। "যাও মা লক্ষ্মি, পতিরূপী নারায়ণের সেবা করিয়া কৃতার্থ হও" এই বলিয়া অত্রিপত্নী বিদায় হইলেন।

প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত রাজার ও সুনীতির মধ্যে কি কথোপকথন হইল, রাজা কিরূপে শতবার, সহস্রবার, আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন, সুনীতি কিরূপে পতিব্রতাযোগ্য প্রেমে তাঁহার সঙ্কোচ দূর করিলেন, সে সকল কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। অনুভব করা ভিন্ন ভাষা হইতে তাহা উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রভাতে কৃতার্থ-হৃদয়া সুনীতি পতিকে প্রণাম করিলেন, রাজাও পত্নীকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া স্বনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সুনীতির কথাপ্রসঙ্গে আমরা দীর্ঘকাল সুরুচির কথা উল্লেখ করি নাই। সপত্নীকে অপসৃত করাইয়া সুরুচি একেশ্বরী হইলেন। ধন, জন, সম্পদ, স্বামী তাঁহার একার হইল। পদের কণ্টক, চক্ষুর বালি দুরীভূত হইল, তিনি ভাবিলেন, অবিচ্ছেদে সুখভোগ করিবেন কিন্তু তাহা ঘটিল না। তাঁহার মন অশান্তিতে পূর্ণ হইল। তাঁহার অশান্তির প্রথম কারণ লোকনিন্দা; তাঁহার ভয়ে কেহ কিছু মুখে না বলুক, কিন্তু তিনি জানিতেন, অন্তরে সকলেই তাঁহাকে বড়রাণীর অন্তর্দ্ধানের কারণ বলিয়া ঘৃণা করে। তাঁহার অশান্তির দ্বিতীয় কারণ এই যে যাহাকে লইয়া তাঁহার সুখ তিনি সুখী ছিলেন না। পতিসেবার তিনি ত্রুটী করিতেন না, কিন্তু পতীকে সুখী করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। তিনি দেখিতেন, রাজার আহারে তৃপ্তি নাই, নিদ্রায় গভীরতা নাই, রাজকার্য্যে আকর্ষণ নাই। তিনি কখনও চমকিয়া উঠেন, কখনও অকারণে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, কখনও কখনও নির্জ্জনে অশ্রুপাত করেন। সুনীতির অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার শয়নগৃহ, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার সমস্তই সুরুচির হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দেখিতেন শয়নগৃহে প্রবেশমাত্র রাজার মুখ ম্লান হইয়া যায়; তিনি পর্য্যঙ্কের অপেক্ষা গৃহতলে স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করিয়াই তৃপ্তি বোধ করেন। সুরুচি ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেন না, যাহা অনুমান করিতেন, তাহা তাঁহার পক্ষে হৃদয়-বিদারক হইত। বিশেষতঃ যে দিন রাজা মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার আরও ভাববৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইল। সুরুচির প্রতি রাজার সমাদরের ও অনুরাগের ত্রুটী ছিল না। কিন্তু তাহাতে সুরুচির তৃপ্তি হইত না। সর্ব্বদা কি যেন একটা অভাব রহিয়া যাইত। সুরুচি ভাবিতেন, ইহার অপেক্ষা সুনীতি যখন গৃহে ছিলেন, তখন আমি বরং অধিক সুখী ছিলাম। রাজা এখন আমায় আরও অধিক আদর করেন, কিন্তু এত লুকোচুরী করেন কেন? এই সময় সুরুচির একটী পুত্র জন্মিল। সপত্নীর উপর এইবার

প্রকৃত জয়লাভ হইল বিশ্বাসে এবং পুত্রের লালনপালনে সুরুচি মনের উদ্বেগ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত করিলেন।

এদিকে তপোবনে সুনীতিও সসত্ত্বা হইয়াছিলেন। যথাকালে তিনি এক পরম সুন্দর কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি অত্রি শাস্ত্রানুসারে বালকের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া তাহার নাম রাখিলেন ধ্রুব এবং বলিলেন, "জগতের মধ্যে যে একমাত্র বস্তু ধ্রুব এই বালক তাহা লাভ করিবে।" ধ্রুব শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া মাতার নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাকপক্ষনিন্দিত কুন্তল, ইন্দীবরের ন্যায় নয়ন, অর্দ্ধস্ফুট দন্তরাজী দেখিয়া সুনীতির সকল ক্লেশ, সকল দুঃখ দূর হইল। ধ্রুব ক্রমে উপবেশনে, দণ্ডায়মানে, কুর্দ্দনে, ধাবনে সক্ষম হইলেন। ধ্রুব যখন অপরাহ্নে ক্রীড়ান্তে ধূলিধূসরিত কলেবরে কুটীরে ফিরিয়া আসিতেন, তখন সুনীতি অঞ্চলে তাঁহার শরীরের ধূলি মুছাইয়া তাঁহাকে বক্ষে লইতেন, তাঁহার বক্ষ শীতল হইত। মহর্ষি অত্রির বড় সাধ ছিল যে, তিনি তাঁহার আশ্রমলক্ষ্মীর মুখে হাসি দেখিবেন, তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল; ধ্রুবকে দেখিলে সুনীতির মুখে হাসি ধরিতনা। মহর্ষি এক এক দিন অন্তরাল হইতে দেখিতেন, সুনীতি ধ্রুবের দিকে এবং ধ্রুব সুনীতির দিকে চাহিয়া আছেন। উভয়েরই মুখ মধুর হাস্যে সমুজ্জ্বল; সুনীতি করতালি দিয়া ধ্রুবকে নৃত্য করিতে শিখাইতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের দেহও, তালে তালে নৃত্যভঙ্গীতে সঞ্চালিত হইতেছে। মহর্ষি নিজে গৃহী ছিলেন, সুতরাং পিতা যেমন পুত্রবতী দুহিতাকে দেখিয়া সুখী হন, তিনিও তেমনই সুনীতিকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

ক্রমে ধ্রুব কৈশোরে উপনীত হইলেন। বয়সের সঙ্গে তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, সুললিত গঠন, মধুর অঙ্গভঙ্গী যে দেখিত সেই মোহিত হইত। তাহার উপর ধ্রুবের প্রকৃতি এমন মধুর ছিল যে বনের পশু পাখীরাও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতনা। ধ্রুব মাতার কোলে বসিয়া মাতার কাছে হরিনাম গান করিতে শিখিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে আশ্রমের ঋষিবালকদিগকে সঙ্গে লইয়া ধ্রুব মাতার কুটীরের অঙ্গনে হরিনাম গান করিতেন। নাচিয়া নাচিয়া বাহু তুলিয়া বালকেরা গাইত—

(তোরা) আয়রে সবে ভাই।

ধ্রুব বলিতেন

(একবার) বাহু তুলে সবে মিলে হরিগুণ গাই।

বালকেরা গাইত—

আয়রে বনের পশুপাখী,
হরি বলে সবাই ডাকি;

ধ্রুব গাইতেন—

মা বলেছেন, এমন নাম আর ত্রিজগতে নাই।

সে সঙ্গীতে তান লয়, রাগ রাগিণী কিছুরই সামঞ্জস্য থাকিতনা; তথাপি যে শুনিত, সেই মোহিত হইত। শুক্ল-কেশ ঋষিগণও আপনাদিগের নিত্য পূজা হোম ভুলিয়া সে সঙ্গীত শুনিতেন, এবং শুনিয়া গলদশ্রু হইতেন। কণ্ঠে তুলসীর মালা, সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনে অঙ্কিত পাদপদ্ম, মুখে হরিনাম, ধ্রুবকে দেখিলে বোধ হইত, মূর্ত্তিমান হরিপ্রেম ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধ্রুবের ভক্তিভাব দেখিয়া ঋষিগণ বলিতেন, এমন মাতার গর্ভে যে এমন সন্তান হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

ঋষিবালকেরা অনেক সময় প্রসঙ্গক্রমে আপন আপন পিতার কথা বলিতেন। কিন্তু ধ্রুব কখনও নিজের পিতাকে দেখেন নাই; সুতরাং কোন কথা বলিতে পারিতেন না। এক দিন বালকেরা ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! আমাদের সকলেরই ত পিতা আছেন, কিন্তু তোমার পিতা নাই? কই তাঁহাকে ত কখন দেখিতে পাইনা।" ধ্রুব বিষণ্ণ বদনে আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমার পিতা কোথায়?" শুনিয়া সুনীতি চমকিতা হইলেন, বলিলেন, "ধ্রুব! তুমি আজ একথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?"

ধ্রুব বলিলেন, "মা! ঋষিবালকেরা আজ আমাকে বলিতেছিল, আমাদের সকলেরই পিতা আছেন, কেবল তোমার পিতা নাই। মা! সত্য কি আমার পিতা নাই?"

সুনীতি বলিলেন, "অমঙ্গল দূর হউক! কেন তোমার পিতা থাকিবেন না? তিনি রাজরাজেশ্বর!"

ধ্রুব। মা! তবে তিনি আমাদের কাছে থাকেন না কেন?

সুনীতি। আমার অদৃষ্ট! তিনি নিজের রাজধানীতে থাকেন।

ধ্রুব। রাজধানী কোথায়?

সুনীতি। যমুনার কূল দিয়া যে পথ পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, সেই পথ দিয়া রাজধানীতে যাইতে হয়।

ধ্রুব বলিলেন, "মা! আমি রাজধানীতে গিয়া একবার পিতাকে দেখিয়া আসিব।"

সুনীতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, বলিলেন, "রাজধানী অনেক দূর! তুমি বালক অত পথ হাঁটিতে পারিবেনা। যদি নারায়ণ দয়া করেন তবে তোমার পিতাই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

ধ্রুব কোন উত্তর দিলেন না। তিনি সমবয়স্ক বালকগণের নিকট নিজের পিতার পরিচয় দিলে বালকগণ পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "ভাই! চল আমরা রাজধানীতে গিয়া তোমার পিতাকে দেখিয়া আসি।" ধ্রুব বলিলেন, "আমারও সেই ইচ্ছা।"

পরদিন প্রভাতে ঋষিবালকগণ ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একে অপরিচিত পথ, তাহার উপর বালকগণ দীর্ঘ ভ্রমণে অনভ্যস্ত, ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া বালকগণ মধ্যাহ্নে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজধানীর কথা শুনিয়া তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে আশ্রমেরই মত কিছু হইবে, কিন্তু এক্ষণে প্রাসাদবিপণিপূর্ণ, গজবাজীরথাকীর্ণ, বহুজনসঙ্কুল স্থান দেখিয়া সকলে ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদিগের বেশভূষা দেখিয়া নাগরিকগণ তাহাদিগকে ঋষিবালক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং কেহ আদর করিয়া তাঁহাদিগকে রাজপ্রাসাদ দেখাইয়া দিলেন। সেই বহুপ্রকোষ্ঠসমন্বিত, কারুকার্য্যখচিত, পর্ব্বতাকার অট্টালিকা দেখিয়া বালকদিগের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সশস্ত্র পুরুষগণ উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধান করিয়া প্রাসাদদ্বার রক্ষা করিতেছিল। তাহাদিগের গর্ব্বিত ভাবভঙ্গী দেখিয়া অন্যান্য বালকগণ পশ্চাৎপদ হইলেন, কিন্তু ধ্রুব অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "রাজা কোথায়? আমি তাঁহাকে দর্শন করিব।"

প্রহরী বলিল, "বালক! তুমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে চাও, তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?"

ধ্রুব বলিলেন, "আমি তাঁহার পুত্র, মহর্ষি অত্রির আশ্রম হইতে আসিতেছি।"

প্রহরী বলিল, "রাজকুমার ত গৃহে আছেন, প্রজা মাত্রই বলে আমি রাজার পুত্র, রাজার সঙ্গে দেখা করিব; আমি এমন সংবাদ লইয়া যাইতে পারিব না।"

তখন বালকদিগের মধ্যে একটী বয়োজ্যেষ্ঠ ঋষিকুমার অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমরা ঋষিকুমার, তপোবন হইতে আসিতেছি, তোমাদের মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিব, সংবাদ দাও।"

শুনিবামাত্র প্রহরী অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং রাজার নিকট যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "মহারাজ? তপোবন হইতে কয়েকটী ঋষিকুমার আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন। অনুমতি হইলে তাঁহাদিগকে সভাস্থলে আনিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "অবিলম্বে আনয়ন কর।"

তখন ধ্রুব অন্যান্য ঋষিবালকদিগের সঙ্গে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। এতদিন কাব্যে ও ইতিহাসে যাহা পাঠ করিয়াছিলেন সেই রাজসভা আজ ঋষিকুমারদিগের প্রত্যক্ষ হইল। তাঁহারা দেখিলেন বিচিত্র স্তম্ভশোভিত বিশাল গৃহ; তাহার মধ্যে একটী অনুচ্চ বেদী; বেদীর উপর স্বর্ণখচিত সিংহাসনে রাজা উত্তানপাদ উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণে, বামে সামন্তরাজগণ, সম্মুখে মন্ত্রী ও সভাসদবর্গ, দূরে অর্থীপ্রত্যর্থিগণ। সশস্ত্র প্রহরিগণ সভাগৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পাদচারণ করিতেছে এবং অঙ্গুলিসঙ্কেতে জনকোলাহল নিবারণ করিতেছে। সভাগৃহ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ; তখন ঋষিকুমার রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলে রাজা প্রণাম করিয়া সকলকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিলেন। ঋষিকুমারদিগের সুকুমার বয়স, প্রশান্ত মুখ এবং সরল ভাব দর্শনে সভাসদগণ মুগ্ধ হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে একটী বালকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বেশভূষায় ঋষিকুমারের ন্যায় হইলেও তাঁহার আকারে ক্ষত্রিয়লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছিল। তাদৃশ সুকুমার বয়সেও তাঁহার দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ, বক্ষোদেশ প্রশস্ত, পদক্ষেপ দৃঢ় এবং বাহু অস্ত্রধারণক্ষম; মুখে কোমলতার সঙ্গে তেজোবত্তা সূচিত হইতেছিল। ইনিই ধ্রুব।

অপর সকলে উপবেশন করিলে ধ্রুব রাজার সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মস্তক নত করিয়া করপুটে রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি ঋষি-কুমার, আমি ক্ষত্রিয়; আমায় প্রণাম করিতেছ কেন?"

ধ্রুব বলিলেন, "আপনি আমার পিতা, আমি আপনার পুত্র।"

রাজা। তোমার নাম কি? তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

ধ্রুব। আমার নাম ধ্রুব, আমি মহর্ষি অত্রির আশ্রম হইতে আসিতেছি।

রাজার শরীর মধ্যে যেন একটা তাড়িত প্রবাহ ছুটিল। ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইবার জন্য তিনি একবার বাহুযুগল ঈষৎ প্রসারিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার লজ্জা বোধ হইল। তিনি বলিলেন, "বৎস! আমি ত তোমায় কখনও দেখি নাই, তুমি আমাকে পিতা বলিতেছ, তোমার মাতা কে?"

ধ্রুব। তপোবনে সকলে তাঁহাকে আশ্রমলক্ষ্মী বলেন, শুনিয়াছি তাঁহার প্রকৃত নাম সুনীতি।

"সুনীতি!" এই শব্দটী মহামন্ত্রের কার্য্য করিল। রাজার লজ্জা এবং সঙ্কোচ দূর হইল, তিনি বলিলেন, "বৎস! এস, আমার ক্রোড়ে এস!" এই বলিয়া তিনি ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন দিলেন; তাঁহার শরীর যেন অমৃতসিক্ত হইল। সভাস্থ ব্যক্তিগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন! অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজপুরীতে প্রচারিত হইল যে বড়রাণী জীবিতা আছেন, তাঁহার পুত্র রাজসভায় আসিয়াছেন। এ সংবাদ অতিরঞ্জিত এবং অতিবর্দ্ধিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই একজন দাসী বলিল যে, "আমরা বড়রাণীকে সভায় দেখিয়া আসিলাম; আহা! শুকাইয়া হাড়শেষ হইয়াছেন, চেহারা যেন কালী মত হইয়াছে।" সকলেই এ সংবাদে সুখী হইলেন, কেবল দু'একজন মনে মনে বলিলেন, "ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসিবেন আসুন, কিন্তু যে বাঘিনী সতীন, তাঁহাকে কি প্রাণে রাখিবে?"

সুরুচির নিকট এ সংবাদ পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হইল না, তিনি প্রকৃত কথাই শুনিলেন। মনুষ্যের পক্ষে এক মুহূর্ত্তে যদি উন্মাদগ্রস্ত হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সুরুচি এ সংবাদে উন্মাদিনী হইলেন বলিলে অসঙ্গত হইবে না। যে দিন রাজা মৃগয়া করিতে যাইয়া অন্যত্র রাত্রিযাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে কি জানি কেন তাঁহার মনে একটা সন্দেহ উদ্ভূত হইয়াছিল। এখন তিনি বুঝিলেন যে সে সন্দেহ অনুমান নয়। তাঁহার ধৈর্য্য এবং লজ্জা এক সঙ্গেই লোপ পাইল। মস্তকের কেশ আলোলিত, বক্ষে বসন নাই, অঞ্চল ধূলিতে লুণ্ঠিত, চক্ষু ক্রোধে উদ্দীপ্ত, মুখ রক্তবর্ণ, এই অবস্থায় সুরুচি রাজসভায় উপনীত হইলেন। দেখিয়া রাজা ও রাজসভাসদগণ চমকিত হইলেন; প্রহরিগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। সুরুচি একেবারে সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি কর্কশ স্বরে ধ্রুবকে বলিলেন "তুমি কে?"

ধ্রুব বলিলেন, "আমি ধ্রুব!"

সুরুচি। ধ্রুব? কে তোমার পিতা? কে তোমার মাতা?

ধ্রুব রাজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই দেখুন আমার পিতা, আমার মাতার নাম সুনীতি।" সুরুচি বলিলেন, "ভিখারিণীর পুত্র! সিংহাসনে বসিবার স্পর্দ্ধা তোমার কেন হইল?"

"ভিখারিণীর পুত্র" এই সম্বোধনে ধ্রুব ব্যথিত হইলেন, বলিলেন, "আমার পিতা আমাকে এই সিংহাসনে বসাইয়াছেন; আপনি আমাকে ভিখারিণীর পুত্র বলিতেছেন, আপনি কে?" সুরুচি সগর্ব্বে বলিলেন "আমি রাণী; এই গৃহ, ধন, জন আমার!" ধ্রুব সুরুচির গর্ব্বদীপ্ত মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "আপনি রাণী আর আমার মা ভিখারিণী?" ধ্রুবের এই সরল প্রশ্ন সুরুচির মর্ম্মস্পর্শ করিল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এ সিংহাসন আমার পুত্রের, তুমি ইহাতে বসিয়াছ কেন?" ধ্রুব বলিলেন, "এ সিংহাসন ত আমার পিতার, তিনিই আমাকে ইহাতে বসাইয়াছেন।"

সুরুচি একবার রাজার দিকে রোষকটাক্ষপাত করিলেন, বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে ধিক! এখনও আপনি সেই মায়াবিনীর কথা ভুলিতে পারিলেন না? আমার প্রতি এবং আমার পুত্রের প্রতি আপনার

ভালবাসা সকলই মৌখিক। নচেৎ যে স্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তাহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবেন কেন?” রাজাকে এই বলিয়া, সুরুচি ধ্রুবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মূঢ় বালক! যদি অপমানে ভয় থাকে, তবে এ সিংহাসনে বসিও না। তুমি রাজার পুত্র হইলেও আমার পুত্র নও, এক দুর্ভাগা নারীর পুত্র। আমার গর্ভে যাহার জন্ম সে ভিন্ন আর কাহারও এ সিংহাসনে অধিকার নাই। ইহা তোমার যোগ্য নয়।”

সুরুচি এই বলিয়া ধ্রুবকে সিংহাসন হইতে বল পূর্ব্বক নামাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু ধ্রুব নিজেই সিংহাসন হইতে নামিলেন। সুরুচির ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইয়াছিল। কষ্টে চক্ষুর জল সম্বরণ করিয়া তিনি রাজাকে বলিলেন, “পিতঃ! আপনি রাজাধিরাজ! কিন্তু আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার পদ হইতে উচ্চতর কোন পদ আমি লাভ করিতে পারি। বিমাতার কথা যেন সত্য হয়, এ সিংহাসন যেন আমার যোগ্য না হয়।”

ধ্রুব আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করিলেন না, তৎক্ষণাৎ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। ঋষিকুমারগণও সুরুচির দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইলেন। সুরুচির ব্যবহারে রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সভাভঙ্গ করিলেন।

এ দিকে ধ্রুব অকস্মাৎ তপোবন হইতে অদৃশ্য হওয়াতে সুনীতি অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। পরে তিনি শুনিলেন, যে, অন্যান্য ঋষিবালকদিগের সঙ্গে ধ্রুব যমুনাতট দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছেন, তখন তিনি ভাবিলেন যে ধ্রুব নিশ্চয়ই রাজধানীতে গিয়াছেন। বালক এত পথ কিরূপে যাইবে, রাজা তাহাকে দেখিয়া কি বলিবেন, নৃশংস সুরুচি বা তাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে, এইরূপ চিন্তায় সুনীতির মন অস্থির হইল। পরে ধ্রুব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিলেন যে ধ্রুব মনে দারুণ বেদনা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে যথোচিত সান্ত্বনা দিলেন; কিন্তু ধ্রুবের মন কিছুতেই শান্ত হইল না। রাজসভায় লোকলজ্জায় তিনি মনের বেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতার নিকট আসিয়া ধৈর্য্য আর ধারণ করিতে পারিলেন না। ধ্রুবের রোদনে সুনীতির মন অস্থির হইল। সুনীতি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ধ্রুব! তুমি এত অধীর হইয়াছ কেন? তোমার পিতা কি তোমায় কোন মন্দ কথা বলিয়াছেন?”

ধ্রুব বলিলেন, “না মা! তিনি আমায় আদর করিয়া ক্রোড়ে লইয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় একটী স্ত্রীলোক তাঁহার বাটীর ভিতর হইতে আসিলেন। তাহার চুলগুলি আলুথালু, গায়ে কাপড় নাই, চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। তিনি আমাকে কর্কশস্বরে বলিলেন, ভিখারিণীর পুত্র তুমি সিংহাসনে বসিয়াছ কেন? আমি বলিলাম পিতা আমায় বসাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি যে কত কথা বলিলেন তাহা আর কি বলিব? তিনি পিতাকে ধিক্কার দিলেন, তোমাকে দুর্ভাগা বলিলেন, শেষে আমাকে হাত ধরিয়া সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। আমি অপমানের ভয়ে অগ্রেই নামিয়া পড়িয়াছিলাম। মা তিনি কে?” সুনীতি সমস্ত বুঝিলেন, বলিলেন, “তিনি তোমার বিমাতা।”

ধ্রুব। বিমাতা কি মা?

সুনীতি। তোমার পিতার আর এক স্ত্রী, তোমার পিতা যেমন আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহাকেও করিয়াছিলেন।

ধ্রুব। মা তবে তিনি রাণী আর তুমি ভিখারিণী কেন?

সুনীতি। সে আমার অদৃষ্টের ফল। বাবা! তুমি তোমার বিমাতাকে কি কিছু বলিয়াছিলে?

ধ্রুব। না মা! আমি তাঁহাকে কিছু বলি নাই। আমি কেবল পিতাকে এই কথা বলিয়াছিলাম, “পিতঃ আপনি রাজাধিরাজ আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার পদ হইতে উচ্চতর কোন পদ আমি যেন প্রাপ্ত হই।”

সুনীতি ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, করিয়া বলিলেন, “ধ্রুব! নারায়ণ তোমার মনস্কাম অবশ্যই সিদ্ধ করিবেন। তুমি তাঁহাকে ডাক।”

ধ্রুব। মা! আমি তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব?

সুনীতি। তুমি বলিবে, কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি! এস।

ধ্রুব। আমি ডাকিলে তিনি শুনিবেন ?

সুনীতি। তুমি যদি ভাল করিয়া ডাকিতে পার, তিনি অবশ্য শুনিবেন।

ধ্রুব। তিনি কোথায় ?

সুনীতি। তিনি এই আকাশে, তিনি এই বাতাসে, তিনি এই ফলে, তিনি এই জলে, তিনি আমার ভিতরে, তিনি তোমার অন্তরে সর্ব্বত্র আছেন; তুমি ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন।

ধ্রুব। মা! তবে আমি চলিলাম। তুমি আমার জন্য ভাবিওনা, যতদিন না তাঁহার দেখা পাইব, ততদিন আমি ফিরিব না।

সুনীতি। তুমি কোথায় যাইবে? আমার কাছে ঘরে বসিয়া সেই পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাক! তুমি শিশু, নিবিড় বনে আমি তোমায় একা যাইতে দিব না।

ধ্রুব। না মা! তাহা হইবেনা। যেখানে কেহ দেখি বেনা, কেহ শুনিবেনা আমি সেইখানে বসিয়া আমার হরিকে ডাকিব। তুমিত বলিলে তিনি আমার কাছে কাছে আছেন, তবে ভয় কি ?

সুনীতি কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ধ্রুবের মন ফিরিল না। তখন সুনীতি স্বহস্তে ধ্রুবকে সন্ন্যাসীবেশে সাজাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহার মস্তকের লম্বিত কেশ লইয়া চূড়া বাঁধিলেন; বস্ত্র খুলিয়া বল্কল পরাইলেন; কণ্ঠে তুলসীর মাল্য, কর্ণে তুলসীর মঞ্জরী দিলেন; সর্ব্বাঙ্গে বক্ষে ললাটে চন্দন দ্বারা হরিপদ অঙ্কিত করিয়া দিলেন; দিয়া ধ্রুবের মুখচুম্বন পূর্ব্বক করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি! ধ্রুব এতদিন আমার ছিল, আজ হইতে তোমার হইল। তুমি তাহাকে রক্ষা করিও।"

ধ্রুব মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

মহর্ষি অত্রির তপোবন হইতে বহু দূরে এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ধ্রুবের আশ্রম। আশ্রম বলিলে যাহা বুঝায় সেখানে তাহার কিছুই নাই। এক প্রাচীন কল্পবৃক্ষ বহু শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া তথায় দণ্ডায়মান ছিল; তলে একখণ্ড মসৃণ শিলা। এই শিলাখণ্ডের উপর ধ্রুবের শয়ন, উপবেশন, ধ্যান, এবং তপস্যা। বালক তপস্যার কিছু শিখেন নাই। আসন, প্রাণায়াম, মনন, নিদিধ্যাসন ইহার কিছুই ধ্রুব জানিতেন না। মাতা যে মহামন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, ধ্রুব দিবারাত্রি তাহাই জপ করিতেন। সেই মন্ত্রই ধ্রুবের আরাধনা, সেই মন্ত্রই ধ্রুবের তপস্যা। মা বলিয়াছিলেন হরি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাই ধ্রুব তরুলতা পশু পক্ষী যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন তুমি কি আমার পদ্মপলাশলোচন হরি! প্রেমের এমনই মহিমা চেতন অচেতন সকলেই তাহার দ্বারা বশীভূত হয়। ধ্রুবের প্রেমের গুণে ব্যাঘ্র ভল্লুক আপনাদিগের জিঘাংসা বৃত্তি ত্যাগ করিত, অচেতন বৃক্ষ লতা ফলে ফুলে সুশোভিত হইত, কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া নির্ম্মল জলের উৎস বহিত। মা বলিয়াছিলেন ভাল করিয়া ডাকিতে পারিলেই তিনি আসিবেন; ধ্রুব ভাবিতেন, আমি এত ডাকিতেছি, তবে আমার পদ্মপলাশলোচন আসেন না কেন ?

একদিন ধ্রুব দেখিলেন, এক সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ তাঁহার নিকট আসিতেছেন। তাঁহার মস্তকের কেশ শুভ্র, আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু শুভ্র, পরিধেয় বসন শুভ্র, করে পদ্মমালা শুভ্র। মুখ মধুর হাস্যে উজ্জ্বল, রসনা হইতে অনবরত হরি হরি উচ্চারিত হইতেছে। ধ্রুব ভাবিলেন ইনিই আমার পদ্মপলাশলোচন হরি। ধ্রুব ছুটিয়া গিয়া আপনার ক্ষুদ্র দুইটী বাহু দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আমার পদ্মপলাশলোচন হরি ?"

আগন্তুক ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইলেন, বলিলেন "ধ্রুব! আমি তোমার পদ্মপলাশলোচনের দাসানুদাস, আমার নাম নারদ। তিনি আমাকে তোমার সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছেন।"

ধ্রুব বলিলেন, "তিনি কি আমার ডাক শুনিতেছেন ?"

নারদ বলিলেন, "যে দিন হইতে তুমি প্রথম ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছ, সেই দিন হইতেই শুনিতেছেন।"

ধ্রুব। তবে তিনি আসিতেছেন না কেন ?

নারদ। আমি ফিরিয়া যাইলেই তিনি আসিবেন।

শুনিয়া ধ্রুবের নয়নে আনন্দে অশ্রুধারা বহিল। নারদ বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাক, একবার আমায় শুনাও দেখি !"

ধ্রুব বলিলেন "পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায় এস।"

নারদ বলিলেন, "আর কিছু বল না ?"

ধ্রুব বলিলেন, "না, মা এই শিখাইয়াছেন, এই বলি।" নারদ বলিলেন, "তবে আমি যাহা বলি তাহা বল। বল পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায় এস, আমায় দয়া কর।"

ধ্রুব বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায় এস, আমায় দয়া কর।"

নারদ বলিলেন, "বল পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায় এস, আমার মাতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায় এস, আমার মাতাকে দয়া কর।"

নারদ বলিলেন, "বল পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায় এস, আমার পিতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায় এস, আমার পিতাকে দয়া কর।"

নারদ বলিলেন, "বল পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায় এস,আমার বিমাতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব নীরব রহিলেন। নারদ বলিলেন "বল আমার বিমাতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব বলিলেন, "বিমাতা আমায় বড় ক্লেশ দিয়াছেন।" নারদ বলিলেন, "সেই জন্যই ত তোমায় তাঁহার কথা বলিতে হইবে।"

ধ্রুব তথাপি নীরব রহিলেন। তখন নারদ বলিলেন, "ধ্রুব! আমি তবে চলিলাম। তুমি কি জাননা যে ভক্তের ক্লেশে ভগবান নিজে ক্লেশ পান ? তোমার বিমাতার বাক্যে তুমি নিজে যে ক্লেশ পাইয়াছ, তোমার পদ্মপলাশলোচন তাহার অপেক্ষা অধিক ক্লেশ পাইয়াছেন। তথাপিও তিনি তোমার বিমাতাকে ভাল বাসেন, আর তুমি ভাল বাসিতে পার না ?"

ধ্রুব ক্ষণকাল নীরবে নারদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলেন? আমার পদ্মপলাশলোচন আমার বিমাতাকে ভাল বাসেন; তবে আমিও বাসিব।" এই বলিয়া ধ্রুব বলিলেন, "পদ্মপলাশলোচন হরি তুমি কোথায় এস, আমার বিমাতাকে দয়া কর।"

ধ্রুব পরক্ষণেই দেখিলেন নারদ অন্তর্হিত হইয়াছেন। অকস্মাৎ অপূর্ব্ব আলোকে সেই বনভূমি সমুজ্জ্বল হইল, অপূর্ব্ব সৌরভ চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হইতে লাগিল এবং অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর সঙ্গীত ধ্রুবের কর্ণে প্রবেশ করিল। যে মূর্ত্তি ধ্রুব এতদিন মানসপটে অঙ্কিত রাখিয়াছিলেন, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন কি মধুর কে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন? যিনি জীবনে কখনও তাহার আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি কেবল তাহা অনুভব করিতে পারেন। ধ্রুব কৃতার্থ হইলেন। অন্তরে বাহিরে সেই পদ্মপলাশলোচনকে অবিচ্ছেদ দর্শনের শক্তিলাভ করিয়া ধ্রুব পুনর্ব্বার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

সুনীতি অঞ্চলের নিধি ফিরিয়া পাইয়া কৃতার্থা হইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিলনা। মহর্ষি অত্রি তাঁহার পত্নী এবং অন্যান্য ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ সুনীতির কুটীরে আসিয়া ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহর্ষি অত্রি বলিলেন, "এতদিন পরে আমার আশ্রম প্রকৃতই পুণ্যক্ষেত্র হইল। ভক্তচূড়ামণি ধ্রুবকে বক্ষে লইয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।"

এদিকে যে মুহূর্ত্তে ধ্রুব তাঁহার বিমাতার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সুরুচির মন পরিবর্ত্তিত হইল। ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইবার এবং সুনীতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন এবং রাজা উত্তানপাদের সঙ্গে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি প্রথমেই সুনীতির কুটীরে আগমন করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন এবং তাহার পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "দিদি! আমি পাগল হইয়াছিলাম, পাগলের অপরাধ মার্জ্জনীয়, তুমি আমার দোষ মার্জ্জনা কর। নচেৎ আমি আর এ প্রাণ রাখিবনা।"

সুনীতি বলিলেন, "বোন! তোমারই জন্য আমার ধ্রুব সেই পদ্মপলাশলোচন হরির দর্শন পাইয়াছি। আমি তোমার কোন ত্রুটী মনে রাখিবনা। এস, দুজনে, যত দিন বাঁচি, পূর্ব্ববৎ একসঙ্গে পতির সেবা করি।"

সুনীতির শেষ জীবনের কথার সুদীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আশ্রমস্থ ঋষি ও ঋষিপত্নীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি পতিপুত্রসহ রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। ধ্রুব-জননীর যে সম্মান প্রাপ্য, তাহা প্রাপ্ত

হইয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

সাগর তর্পণ।

বীরসিংহের সিংহশিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!
উদ্বেলিত দয়ার সাগর, বীর্য্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার!
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার!

নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে বিদ্যা দিয়ে আর
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।

বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায়;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর!
কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর।

স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত!—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।

রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই সে এমন বীর।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজবো তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায়;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার।

সেই যে চটি দেশী চটি বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে আনব তারে এই আমাদের পণ;
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগায়।

রাখব তারে স্বদেশপ্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হ'বে ঘর।
উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্চে সবাকার।
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত অমর্য্যাদায় যার।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।

দেখুক এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ মোচন পণ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর!"

অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে লোভ ক'রে সফল হয় না মনস্কাম;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেব না? নামটি নেব?—একি বিষম লাজ!

বাংলা দেশের দেশী মানুষ! বিদ্যাসাগর! বীর!
বীরসিংহের সিংহশিশু! বীর্য্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ।

ফটোগ্রাফি

প্রবাসীতে "ফটোগ্রাফ" সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে ও ছবি প্রকাশ করার জন্য ফটোগ্রাফারদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। আমি আমাকর্ত্তৃক গৃহীত কয়েকখানা "দৃশ্য ছবি" (Landscape) পাঠাইলাম। সম্পাদক মহাশয় ইহা হইতে বাছিয়া ক্রমশঃ কতকগুলি প্রকাশ করিবেন। একখানা ছবির জন্য আমি কলিকাতার প্রথম শিল্পপ্রদর্শনী (Industrial Exhibition) হইতে ১ম স্বর্ণপদক পাই। এই ছবিখানির বিশেষত্ব মাত্র ইহার স্থান নির্ব্বাচন এবং দৃশ্যবিন্যাস। আমার বাটীর অতি নিকটে জঙ্গলময় স্থান। পূর্ব্ব রাত্রিতে বেশ বৃষ্টি হইয়া গেলে পরদিন আমি ক্যামেরা হাতে করিয়া বাহির হই (ইহাই উত্তম সুযোগ) এবং দৃশ্যটিতে Pictorial effect অর্থাৎ ছবিত্ব সম্পূর্ণ পাই। সাধারণে স্থানটি দেখিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না ইহাতে একটা ছবি লওয়া যাইতে পারে। ছবিখানি দক্ষিণ দিক হইতে লওয়ার দরুণ ছায়াসুষমার (Shade and light) সুন্দর সামঞ্জস্য হইয়াছে এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুণ ছবিতে মেঘের সুন্দর ভাব প্রকাশ পাইয়া ছবিটিকে মহিমান্বিত করিয়াছে। সেদিন রৌদ্র খরতর ছিল না। তাই সাদা স্থানগুলিতে অতিরিক্ত আলোক এবং কালো স্থলগুলিতে অতিরিক্ত ছায়া পড়ে নাই।

নিয়মিত সময় অপেক্ষা অল্পক্ষণে ছবি লইলে (Under exposure হইলে) ছবির খুটিনাটি নষ্ট হইয়া যায়। অধিকক্ষণে ছবি লইলে ছবি (Flat) বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে।

সৌখিন ফটোগ্রাফারদের একটী বিষয় মনে রাখিতে অনুরোধ করি। নিসর্গ দৃশ্য (Landscape) উঠাইতে হইলে দেখিতে হইবে দৃশ্যখানিতে সৌন্দর্য্য কি আছে? এবং ছবি উঠিলে পর (Black and white) শাদা কালো রঙে ইহা কেমন দেখাইবে। ছাপাখানার কম্পোজিটরকে যেমন অক্ষরের উল্টা দিক দিয়া অক্ষর চিনিতে হয় ফটোগ্রাফারকেও ঠিক তাহাই করিতে হয়—ক্যামেরার ঘসা কাচে যে উল্টা ছবি পড়ে তাহাতে সৌন্দর্য্য সমাবেশ করাই ছবির সৌন্দর্য্যের একমাত্র সহায়।

আমাদের সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে যেমন সুন্দর ছবি পাওয়া যাইতে পারে আমি ভারতের অনেক স্থান ঘুরিয়া তাহা পাই নাই। আমার গৃহীত বহুতর দৃশ্য-ছবির মধ্যে নানা প্রদেশেরই ছবি আছে। কিন্তু সেইসকল ছবির মধ্যে বঙ্গের গ্রাম্য ছবি যেমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে তেমন ছবি অন্যত্র কোথাও দেখি নাই। তাজমহলের ছবিতে মাত্র তাজের একটী (Black and white) শাদা কালোয় মানচিত্র দেখিয়াছি। জব্বলপুরের মর্ম্মর পাথরের পাহাড়ের মহিমাময় দৃশ্যের ফটো উঠাইতে যাইয়া দুঃখিত হইয়াছি। এহেন জগৎমুগ্ধকারী দৃশ্য-গুলিকে ক্যামেরার ঘসা আয়নায় যাহা দেখিলাম তাহার তুলনায় আমি নকলের একটা নকল ফটো উঠাইয়াছি। দিল্লির প্রাসাদ ও মসজিদ প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত হর্ম্ম্যগুলির ছবিতে আমি তাহাদের গৌরবের শতাংশের এক অংশও উঠাইতে পারি নাই। কিন্তু বঙ্গের গ্রাম্য ছবিতে যৎসামান্য দৃশ্যগুলি যাহা সাধারণ চক্ষুতে অতি নীরস অতি সামান্য—তাহার মধ্যেও এমন সুন্দর সম্পূর্ণ ছবি দেখিয়াছি যাহা Landscape বা দৃশ্যচিত্র নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে। সেদিন সাহিত্য সম্মিলনী উপলক্ষে ময়মনসিং যাইবার কালে পূর্ব্ববঙ্গের কোন গ্রামে আমি আমার এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাই। বন্ধুটিকে লইয়া গ্রাম্য দৃশ্যের ফটো উঠাইবার জন্য একদিন প্রাতে বাহির হই। আমি কয়েকটি স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ক্যামেরা বসাইবার উদযোগ করিলে বন্ধুটি হাসিয়া অস্থির; বলিলেন, "এ কি ছবি উঠাইতেছ?" কিন্তু আমি যখন ক্যামেরা খাড়া করিয়া ছবিটিকে 'ফোকাস' করিলাম তখন বন্ধুটিকে কালো ঘোমটার মধ্যে আনিয়া দৃশ্যটি দেখাইলাম; দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। ছবি উঠাইয়া আনিয়া যখন দেখাইলাম তখন তিনি বলিলেন, "শিশুকাল হইতে আমি যাহা সর্ব্বদা দেখিয়াছি তাহার মধ্য হইতে এমন ছবি হইবে ইহা আমি কখনও ভাবি নাই।"

আমাদের সৌখিন ফটোগ্রাফারদের নিকট এই নিবেদন পাইতেছি যে তাঁহারা যদি সৌন্দর্য্যের রসিক হন তাহা হইলে গ্রামে গ্রামে যে সব সৌন্দর্য্যপূর্ণ নিসর্গ দৃশ্য (Landscape) পড়িয়া আছে তাঁহারা তাহা অনায়াসে উঠাইতে সক্ষম হইবেন।

ফটোগ্রাফি বিষয়ে বারান্তরে আরও লিখিবার আশা রহিল। প্রবাসীর পাঠকগণের উৎসাহ পাইলে আমি কৃতার্থ হইব।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

কাজের লোক

(গল্প)

বিনোদ সুধীরের জন্য অনেকক্ষণ বাড়ীতে অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল তাহার আসার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সে আস্তে আস্তে সুধীরদের বাড়ীর দিকে চলিল। চারটার সময় স্কুলের ছুটি হইয়াছে, এখন ছয়টা বাজিতে যায়। সুধীরের কি অন্যায়! প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যে সুধীরের কথা ভাবে, সুধীরের সঙ্গলাভের জন্য যে সমস্ত দিন ব্যাকুল ও উৎসুক হইয়া থাকে, স্কুলের দীর্ঘ দীর্ঘ ঘণ্টাগুলি কখন তাহাকে চারটার পথে পৌঁছাইয়া দিবে এই আশাতেই যে সমস্ত দিন ঘড়ির কাটার দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার প্রতি এত তাচ্ছিল্য, এত উপেক্ষা, এত অনাদর! বিনোদ এমন কোন অতি গুরুতর কর্ত্তব্যও কল্পনা করিতে পারে না যাহা সে অনায়াসে সুধীরের জন্য পরিত্যাগ করিতে না পারে। তাহাকে লোকে অকৃতজ্ঞ বলুক, নির্ব্বোধ বলুক, মূর্খ বলুক—সে সকল অপবাদ স্বচ্ছন্দে ঘাড়ে করিয়া লইতে

পারে যদি সুধীরকে কোন প্রকারে সুখী করিতে পারে। সুতরাং সে যে আজ সুধীরের উপর রাগ করিবে তাহাতে কিছু বৈচিত্র্য নাই।

পথ চলিতে চলিতে সে উত্তেজিত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগল যেন তাহার সমস্ত জীবনটা ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতেছে। যেন শত চেষ্টাতেও সে আর সুধীরকে ধরিতে পারিতেছে না। সুধীরের নাগাল পাইবার জন্যই যেন বিনোদ দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিতে লাগিল, সুধীর নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়িয়াছে। হয় ত সে সিঁড়ি হইতে পড়িয়া হাত পা ভাঙিয়াছে। তাহা হইলে বিনোদ একটা মনের মত কাজ পায় বটে। সে এমন করিয়া তাহার বন্ধুর শুশ্রূষা করিবে যে কেহ কখনো কাহারো জন্য তেমনটি করে নাই। সে রাতদিন কাছে বসিয়া থাকিবে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিবে, বন্ধুর জন্য নিজের শরীর পাত করিবে। কিন্তু ও কি! ও কাহার গলা শোনা যাইতেছে। বিনোদ ভাবিতে ভাবিতে সুধীরের বাড়ীর কাছে আসিয়া সুধীরের গলা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সেই উচ্চ কলহাস্যে বিপদের আশঙ্কা অথবা আহতের আর্ত্তনাদ কিছুই ত অনুভূত হইল না।

সুধীরদের বাড়ীর দরজায় আসিয়া বিনোদ থমকিয়া দাড়াইল। দরজার চৌকাট পার হইয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে বিনোদের শরীরের সমস্ত রক্ত বিদ্যুৎবেগে মস্তকে গিয়া উঠিল। বিনোদ দেখিল, সুধীর ঘোড়া ঘোড়া খেলা করিতেছে, সে নিজে ঘোড়া হইয়াছে, তাহার একটি ছোট ভাই তাহার পিঠে উঠিয়াছে, সে ঘোড়সোয়ার। আশে পাশে সহিসের অভাব নাই, বড় তেজী ঘোড়া কিনা। ঘোড়সোয়ারের হাতে সজিনা গাছের একটা ছোট ডাল—ঘোড়া যখন নিতান্ত ইচ্ছা-পরায়ণ হইয়া উঠিতেছে, যেসে দিক দিয়া ছুটিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন ডালটি সপাং করিয়া তাহার পিঠে পড়িতেছে। বিনোদেরও একটি ছোট ভাই ছিল, কিন্তু বিনোদ তাহাকে বয়োজ্যেষ্ঠের উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য ও পরুষ ব্যবহার দ্বারা যথাসম্ভব দূরে রাখিত। ছোট ভাইকে খেলা দেওয়া বা তাহার খেলায় যোগদান করা কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে—তাহার মতে এরূপ করিলে ছোট ভাইকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। সুতরাং বিনোদ সুধীরের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল। নিজে যে কাজটা করিতে আমাদের ঘৃণা বোধ হয়, অপরকে সে কাজ করিতে দেখিলে তাহার উপরও ঘৃণা জন্মিয়া থাকে। সুধীর তাহার ছোট ভাইয়ের নিকট অতখানি খাটো হওয়ায় বিনোদের আত্ম-সম্মানবোধে আঘাত লাগিল। আবার এই রকম গুরুতর কার্য্যের জন্য বন্ধুর প্রতি অবহেলা, যে বন্ধু বিনোদ! দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সপ্তমে স্বর চড়াইয়া বিনোদ বলিয়া উঠিল, সুধীর একি! তোমার এ কি রকম ব্যবহার!

ঘোড়সোয়ারের হাত হইতে চাবুক পড়িয়া গেল, সহিসেরা ঘোড়ার বন্ধুকে অকস্মাৎ রণস্থলে সমাগত দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ঘোড়াটিও পরিষ্কার মনুষ্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কে ভাই, বিনোদ? কখন এলে?

বিনোদ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, তুমি আজ আমাদের বাড়ী এলেনা কেন? সুধীর বলিল, আমার মা কাজে ব্যস্ত আছেন, এরা তাঁকে ভারী বিরক্ত করচে, তাই এদের নিয়ে একটু খেলা করছি—মায়ের একটু কাজ করা হচ্চে। বিনোদ রাগিয়া বলিল, এই তোমার কাজ, তুমি ভারী কাজের লোক হয়ে উঠেচ যে দেখচি!

ঘোড়সোয়ারটি বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে ঘোড়ার পিঠ হইতে খসিয়া পড়িল, ঘোড়া হাত পা ঝাড়িয়া আবার মানুষ হইল। সুধীরের একখানি হাত নিজের হাতে ধরিয়া, বিনোদ সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া, যেন জীবন মরণের সমস্যা উপস্থিত এইরূপ কণ্ঠে বলিল, সুধীর, তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পার না? তুমি নিশ্চয়ই আমার বন্ধু নও—তুমি কখনই আমার বন্ধু নও! বিনোদ এই কথা বলিয়া স্ফীত বক্ষে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া চাহিয়া থাকিল। সে ভাবিল, সুধীর অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিবে এবং আকাশ পাতাল চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া বলিবে যে সে বিনোদেরই বন্ধু

এবং তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সুধীর তাহার কিছুই করিল না, কারণ সে কি অপরাধ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল না। সে তাহার বন্ধুকে যথেষ্ট ভাল বাসিত কিন্তু তাহার ভালবাসার মধ্যে কিছুমাত্র আবেগ ছিলনা, কিছুমাত্র আবিলতা ছিলনা, কিছু মাত্র অবিশ্বাস ছিল না। সে তাহার বন্ধুর হৃদয় জানিবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যগ্র হইত না। তাহার হৃদয়ে একটা সতেজভাব ছিল যাহা দ্বারা সে বন্ধুর হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইল। বন্ধুর হাবভাব দেখিয়া ও তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সুধীরের চোখে জল আসিল না, কিন্তু হাসি পাইল। তাহার হাসি বিনোদকে যেন দারুণ কশাঘাত করিল। সে সুধীরের হাত ছাড়িয়া দিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। তারপর "তুমি আমায় ঘৃণা কর সুধীর, আর তোমাদের বাড়ী আসব না, এই শেষ" বলিতে বলিতে সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে সুধীর নিজের ব্যবহারে বিলক্ষণ লজ্জিত হইল। তাহার মনে হইল হয়ত সে ক্ষণকালের জন্যও এরূপ ভাব দেখাইয়া থাকিবে যাহাতে তাহার বন্ধুকে সে ঘৃণা করে এরূপ কথা বন্ধু বলিতে পারিল। এই মনে করিয়া সে দুঃখিতও হইল। সুধীর কিন্তু তখনই বিনোদের নিকট ক্ষমা চাহিবার অবকাশ পাইল না। বাড়ীর ভিতর আসিতেই তাহার মা তাহাকে একটি কাজে নিযুক্ত করিলেন। সুধীর ভাবিল, কাল বিকালে বিনোদের বাড়ী যাইব। তাহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলে সে আর রাগ করিবে না।

বিনোদ কিন্তু কোন ঘটনাকে সহজভাবে লইত না। তাহার মনটা অণুবীক্ষণের মত সামান্য সামান্য কার্য্য গুলিকেও প্রকাণ্ড করিয়া দেখিত। খুঁটিনাটি ধরিয়া সে নিজেকে পীড়ন করিত। অতি তুচ্ছ ঘটনার ভিতর সে জীবন মরণের সমস্যা অনুভব করিত। তাই সে আজ ঠিক বুঝিল, তাহার বাঁচিয়া আর কোন সুখ নাই। সুধীর তাহাকে ভাল বাসে না, সুধীর তাহাকে ঘৃণা করে। সুধীরের উপর প্রবল অভিমান আসিয়া অন্য সকল ভাবনাকে ডুবাইয়া দিল। সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, সুধীরের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। এ সংসারে সুধীরের অপেক্ষা অনেক ভাল বন্ধু মেলা অসম্ভব নয় এ কথা সুধীরকে সে জানাইয়া দিবে। বিনোদ ঠিক করিল, তাহার পরদিনই সে কলিকাতা চলিয়া যাইবে। কলিকাতায় তাহার এক মামা থাকেন। কোন রকম ওজর করিয়া সে আপাততঃ সেখানে যাইবে। পরে মামাকে দিয়া চিঠি লেখাইয়া বাপ মার সম্মতি লইয়া কলিকাতাতেই পড়িবে। তাহাদের বাড়ী হইতে কলিকাতা বেশী দূর নয়। সামান্য একটা ওজর করিয়া বিনোদ কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং সেখানেই স্কুলে ভর্ত্তি হইল। পরদিন বৈকালে সুধীর তাহাদের বাড়ী আসিয়া তাহার দেখা না পাইয়া নিতান্ত হতাশ মনে ফিরিয়া গেল।

বিনোদ কলিকাতায় আসিয়া ভাবিল যে সে তাহার জীবনটাকে আগাগোড়া ঝাড়িয়া নূতন করিয়া বদলাইয়া লইবে এতদিন সে যেন প্রকৃত জীবন উপভোগ করে নাই। কলিকাতার দ্বিধাহীন সংশয়মাত্রশূন্য কার্য্যপটু বালকদের দেখিয়া সুধীরকে নির্ব্বোধ পাড়াগেয়ে বলিয়া মনে হইল। যে বন্ধুত্ব বিনোদের আজীবন সাধনার জিনিষ, যাহা হইতে সে জীবনের রস সংগ্রহ করিবে, যাহা হইতে তাহার মন প্রাণ এবং বুদ্ধি সতেজ ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে, অশিক্ষিত পাড়াগেয়ে বালক তাহার কি জানিবে? বিনোদের মনে হইল সে এতদিন যে জীবন যাপন করিয়াছে তাহাতে জীবনের অনেকটা সুখ তাহাকে বাদ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যে নির্ম্মল আনন্দে সে এতদিন বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার মনে হইল সুধীরই তাহার জন্য দায়ী। বিনোদ আত্মত্যাগী, সুধীর স্বার্থপর। বিনোদ তাহার জন্য অমূল্য জীবন ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু সুধীর সে জন্য কিছুমাত্র কৃতজ্ঞ হয় নাই। বিনোদ নিজের আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সুধীরের স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া ঘৃণা হইল। এই সময়ে সুধীর বিনোদকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিল, বিনোদ সে চিঠির কোন উত্তর দিল না এবং মনে মনে সুধীরকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া কলিকাতার নূতন বন্ধু সংগ্রহে যত্নশীল হইল। তাহার পিতা মাসে মাসে তাহাকে যথেষ্ট টাকা পাঠাইতেন, সে বন্ধুদের জন্য নূতন নূতন আমোদে সে টাকা খরচ করিতে লাগিল। পরের পয়সায় আমোদ করিতে পারিলে কৃতার্থ

হয় এমন অনেকগুলি কৃতজ্ঞ বন্ধু বিনোদের জুটিল। বিনোদ তাহাদের কথাবার্ত্তায় খুব খুসি হইল। বন্ধুপ্রেমের আকর্ষণ মাত্র অনুভব করিয়া তাহার হৃদয় চন্দ্রকিরণে স্ফীত সমুদ্রের ন্যায় দিগবিদিক ভাসাইয়া ছুটিল। বন্ধুদের রোগ হইলে প্রাণপণে সেবা করিয়া, তাহাদের বাড়ী ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে ভূতের মত খাটিয়া, তাহাদিগকে লইয়া আজ থিয়েটার দেখিতে যাইয়া কাল মিউজিয়াম বা আলিপুর যাইয়া বিনোদ বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

এইরূপে সে তাহার বন্ধুদের লইয়া একদিন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা একটি গাছের আগডালে একখানি ছোট সরু ডাল দেখিয়া সেটিতে বেশ ছড়ি হয় তাহাই বলাবলি করিতে লাগিল। তাহাতে বিনোদের একটি বন্ধু ডালটী ভাঙিয়া আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বিনোদ তাহার বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া গাছের উপর চড়িয়া পড়িল। যখন সে ডাল ভাঙিতে যাইবে সেই সময় উদ্যান রক্ষককে ভৃত্য সমভিব্যাহারে সেই দিকে আসিতে দেখা গেল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদের বন্ধুগণ যে যে দিকে পারিল পলাইয়া গেল। উদ্যানরক্ষক বিনোদকে ধরিয়া হাজতে পাঠাইয়া দিল এবং তার পর দিন তাহাকে আদালতে হাজির করাইয়া দুই টাকা জরিমানা করাইয়া ছাড়িল। বিনোদ তাহার বন্ধুদের ব্যবহারে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পরে যখন তাহার বন্ধুরা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল, তখন তাহারা বিনোদের তিরস্কারে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, ভাই, আমরা সকলে ধরা দিতে পারতুম, কিন্তু তা হলে প্রত্যেকেরই ত দু'দু' টাকা জরিমানা হত। গবর্ণমেণ্টকে বেনাহক অতগুণো টাকা দিতে যাব কেন? এতে ভাই তোমারই ত বেশী ক্ষতি হত।

কথাটা তাহারা এমন ভাবে বলিল যেন বিনোদের দোষেই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে এবং সকলের জরিমানার টাকা যখন বিনোদকেই দিতে হইত তখন তাহারা পলাইয়া গিয়া বন্ধুর মতই কাজ করিয়াছে। বিনোদও তাহাই বুঝিল এবং সেদিন বন্ধুদের আর কিছু বলিল না।

আর একদিন বিনোদ এইরূপে সার্কাস দেখিতে গিয়াছে। সে দিন সার্কাসে খুব ভিড়। বিনোদের বন্ধুগণ স্থান লইয়া কয়েকটি ফিরিঙ্গির সহিত বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। তাহাদের মধ্যে একজন ফিরিঙ্গিদের গালি দিল। ফিরিঙ্গিরা যখন মারিতে আসিল, তখন সকলেই সরিয়া পড়িল, বিনোদ মাঝে পড়িয়া একা মার খাইল।

যদিও বন্ধুদের জন্য অনেক সহ্য করা বিনোদ গৌরব বলিয়া মনে করিত, তাহা হইলেও সকলের হইয়া একা মার খাওয়ায় সে নিজেকে সম্মানিত বলিয়া মনে করিতে পারিল না। বিশেষতঃ সে কাপুরুষতাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত। তাই আজ সে বন্ধুদের ব্যবহারে নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার বন্ধুরাও তাহাদের পলায়নের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইতে পারিবে না বলিয়া দিনকতক বিনোদের কাছে ভিড়িল না। বিনোদ তাহাদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। সে ভাবিল বন্ধুমাত্রেই যখন স্বার্থপর তখন সে আর কাহাকেও বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবে না। তখন তাহার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। সে ভাবিল, এই সুযোগে সে পরীক্ষার সর্ব্বোচ্চ দাবীর নিকট হৃদয়ের সকল দাবী নোয়াইয়া রাখিবে। বিনোদ একান্তমনে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বিনোদের পরীক্ষার আর বেশি দেরী নাই। আর দিন পনের মাত্র আছে। ইতিমধ্যে বিনোদের মামা বিনোদের বাড়ী হইতে এক চিঠি পাইলেন যে বিনোদের মা অত্যন্ত পীড়িতা। তাঁহার শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া গিয়াছে। প্রাণ পাওয়া বড় শক্ত। তবে ডাক্তার বলিয়াছেন কোন বালক বা যুবকের শরীরের তাজা রক্ত তাঁহার শরীরে প্রবেশ করাইতে পারিলে তিনি বাঁচিয়া উঠিতে পারেন। মাতার পীড়ার সংবাদ এখন বিনোদকে জানাইতে পত্রে নিষেধ ছিল। বিনোদের মামা এজন্য বিনোদকে কিছুই জানাইলেন না।

কিছুদিন পরে বিনোদের মামা আর একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল বিনোদের বন্ধু সুধীর তাহার শরীরের রক্ত দিতে প্রার্থনা করায় এবং তাহাকে সবল ও সুস্থ বিবেচনা করায় ডাক্তার তাহার শিরা

কাটিয়া তাহার শরীরের অনেকখানি রক্ত বিনোদের মাতার শরীরে চালিত করিয়াছেন। বিনোদের মা ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। বিনোদের পরীক্ষার দিন বিনোদের মামা আর একখানি চিঠি পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল, সুধীর বড় কাহিল। তাহার শরীর হইতে অনেক রক্তস্রাব হওয়ায় সে খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বাঁচে কি না সন্দেহ।

বিনোদের মামা বিনোদের পরীক্ষা শেষ হইলে তিনখানি পত্রই তাহার হস্তে দিলেন। বিনোদ চিঠিগুলির মর্ম্ম অবগত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। যাহা তাহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, যাহার কল্পনায় সে পৃথিবীতে থাকিয়া অক্ষয় স্বর্গ অনুভব করিত, যাহা তাহার আজীবন তপস্যা ছিল, সেই বন্ধুত্বই সে লাভ করিয়াছিল। যে পরশমণির স্পর্শ লাভের জন্য সে ব্যগ্র হইয়া বেড়াইত, উৎসুক হইয়া সকলের বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করিত, সে পরশমণির স্পর্শ লাভ ক্ষণেকের জন্য তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। কখন তাহার হৃদয় যে সোনা হইয়া গিয়াছে তাহা সে দেখে নাই, আজ সে আপন হৃদয়ের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইল। 'চেয়ে দেখিত না নুড়ি, দূরে ফেলে দিত ছুড়ি, কখন ফেলেছে ছুড়ে পরশ পাথর!'

ভগ্নপ্রাণ লইয়া সে দেশে ফিরিল, সুধীরকে হৃদয়ে ধরিয়া তাহার সমস্ত জীবনটাকে সোনা করিয়া লইবে বলিয়া। এ মরণ ত সুধীরের একার মরণ নয়, সুধীর বিনোদের হইয়া মরিতেছে, দু'জনে নবজীবন লাভ করিবে বলিয়া। এ বিনোদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার মরণ, তাহার অবিশ্বাসের মরণ, তাহার ধৈর্য্যহীনতার মরণ। তাই সে যখন বাড়ী গিয়া সুধীরকে বুকে তুলিয়া লইল তখন তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল কিন্তু মুখে কোন কথা ফুটিল না। কেবল সুধীর ক্ষীণ হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'ভাই, কাজে যাচ্ছি, আমার ওপর রাগ করোনা।'

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

জন্মদুঃখী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মারামারির ফলাফল।

গ্রামার স্কুলের গলি যেখানে বোর্ডিং স্কুলের রাস্তায় মিশিয়াছে সে মোড়টি কোনো ছেলের পক্ষেই সুবিধার জায়গা নয়। এই জায়গাটাতে দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি বাধিয়া যাইত।

লাড্‌ভিগ ভীগাং, সীলের চামড়ার দপ্তর পিঠে ফেলিয়া এই পথ দিয়াই স্কুলে যায়। তাহার মাথা ছোট, ঘাড় লম্বা, নাক বাঁকা, চলনভঙ্গী অদ্ভুত; ছেলেরা তাহার নাম রাখিয়াছিল উটপাখী। স্কুলের পথে নিকোলার সঙ্গে তাহার প্রায়ই দেখা হইত, কিন্তু সে তাহাকে দেখিয়াও দেখিত না। নিকোলাও শিস দিতে দিতে, জুতার ঠোক্করে পথের বরফ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইত।

নিকোলার সহপাঠীরা মিলিয়া তক্তা জুড়িয়া জুড়িয়া অনেক দিনের পরিশ্রমে একখানা ঠেলাগাড়ী তৈয়ার করিয়া তুলিয়াছিল। স্কুলের ছুটির পর উহারা প্রায়ই, আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে, সকলে মিলিয়া ঐ গাড়ীটাকে রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া লইয়া বেড়াইত। একদিন এমনি হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীটা মোড় ফিরাইতেছে এমন সময়ে নিকোলার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া ভিন্ন স্কুলের ছাত্র লাড্‌ভিগের হাত হইতে পেন্সিলের ঠুঙিটা পড়িয়া গেল; কলম, উড্‌পেন্সিল, শ্লেট পেন্সিল রাস্তাময় ছড়াইয়া পড়িল। "কুড়িয়ে দে, কুকুর, কুড়িয়ে দে" বলিয়া লাড্‌ভিগ নিকোলাকে এক ধাক্কা দিল।

নিকোলা জবাব না দিয়া আল্‌গা বরফের উপর জুতার ঠোক্কর মারিল।

"এখনো বল্‌ছি কুড়িয়ে দে; নইলে আজই বাবাকে ব'লে তোকে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা করব; তুই যে এই সব বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো লক্ষীছাড়া ছোঁড়াদের সর্দ্দার হ'য়ে উঠেছিস্ সে কথাও ব'লে দেব।"

"উটপাখীর নাকটা ধরে নেড়ে দেব নাকি?"

"একবার দেখ্‌না দিয়ে! আমরা টাকা দিই, তবে খেতে

পাস, তা জানিস! আবার চোট্! মার খাইয়ে মাপ চাইয়ে তবে ছাড়ব। যার বাপের নেই খোঁজ তার আবার চোট! রাস্তার কুকুর! ফিব ছেলে!"

শেষ কয়টা কথা লাড্‌ভিগের মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে নিকোলা রাগে পাগলের মত হইয়া দুই হাতে ঘুষি বৃষ্টি করিতে লাগিল। সে বংশগত বৈষম্য ও অবস্থার তারতম্য কয়েক মিনিটের জন্য একেবারে ভুলিয়াছিল। "ডাক না এইবার বাপকে ডাক। বাপ মা যে যেখানে আছে সব্বাইকে ডাক।"

নিকোলার সহপাঠীরা এই দিনটাকে তাহাদের স্কুলের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন বলিয়া মনে করিত, কারণ ঐ দিনে লাড্‌ভিগের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন স্কুলের সকল ছেলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়াছিল। এমন কি মারামারির পরদিনেও টিফিনের সময়ে, তাহারা সকলে মিলিয়া, যে গ্যাস-পোষ্টের কাছে মারামারি হইয়াছিল সেইখানকার বরফে উটপাখীর নাক কাটিয়া রক্ত পড়িয়াছে কি না তাহারই চিহ্ন খুঁজিতে আসিয়া জটলা পাকাইয়া তুলিয়াছিল।

নিকোলা স্কুলের ছেলেদের কাছে দিগ্বিজয়ীর সম্মান পাইলেও ঘরে যে তাহার জন্য ভিন্ন রকমের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা আছে একথা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল: ভীর্গ্যাংদের বাড়ী হইতে হলম্যানদের কাছে এতক্ষণ আর খবর আসিতে বাকী নাই।

বাড়ী যতই নিকট হইতে লাগিল নিকোলার গতি ক্রমশঃ ততই মন্থর হইতে লাগিল। শেষে, তাহার সঙ্গীদের মধ্যে যে ছেলেটি সব চেয়ে তাহাদের পাড়ার কাছে থাকে, সেও যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন নিকোলা হঠাৎ রাস্তার মধ্যে একবার থামিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া, যে গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, সেটা তাহার বাড়ী যাইবার রাস্তাই নয়।

এই বার লইয়া নিকোলা তিন রাত্রি বাড়ীর বাহিরে কাটাইল। শ্রীমতী হলম্যান চৌকীদারকে ঠিক এই কথাই বলিতেছিলেন। এজন্য যদি সে পুলিসের হাতে ঠেঙানি খায় তো ভাল বই মন্দ হয় না। ভদ্রলোকের ছেলের গায়ে হাত তোলা! তাও আবার যে সে নয় কৌন্সুলী সাহেবের ছেলে!...যার অন্নে জীবন!

আচ্ছা, এই বরফ, এই ঠাণ্ডা,—ছোঁড়াটা গেল কোথায়? ব্যানহাউসের খোলা চত্বরে, হাজার তেরপল মুড়ি দিলেও তো এ শীত মানিবার নয়! নিকোলার গুপ্ত কেল্লার সন্ধান, চট্ করিয়া বলিয়া ফেলা, মোটেই সহজ কথা নয়। কারণ, সে বাড়ীর এত কাছেই লুকাইয়াছিল যে সে জায়গায় তাহার খোঁজ করিতে গেলে নিজের জামার পকেটগুলাও একবার খুঁজিয়া হাঁৎড়াইয়া দেখিতে হয়।

মরিবার ভয় থাকিলেও পতঙ্গ যেমন বাতি ছাড়িয়া দূরে যাইতে পারে না নিকোলাও তেমনি মার খাইবার ভয় সত্ত্বেও বাড়ীরই কাছে লুকাইয়া ছিল। হলম্যান গৃহিণীর গঞ্জনার ভয়ে সে বাড়ী গেল না, কিন্তু সিলার কাছ ছাড়া হইয়া বেশী দূরে যাইতেও তাহার মন সরিল না।

সেই রাত্রে শুইয়া শুইয়া নেশার ঝোঁকে হল্‌ম্যানের কেবলি মনে হইতেছিল- নিকোলার ব্যাপারটা কেমন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে বরফ গলিয়া রাস্তায় জল জমিয়াছে, মাঝে মাঝে সেই জল ভাঙিয়া লোক চলিতেছে। হলম্যানের মনে হইতেছিল সেই গতিবিক্ষুব্ধ জল কেবলি বলিতেছে নি—কো লা! নি-ই-কো-ও-লা-আ!

বেচারা ছেলেমানুষ! ব্যায়রামে পড়িবে দেখিতেছি।

সমবেদনার আকস্মিক উৎসাহে হল্‌ম্যান কম্বল ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। ছেলেটা গেল কোথায়? হুঁ! পোড়ো আস্তাবলে যে ভাঙা গাড়ীখানা কাপড়-ঢাকা পড়িয়া আছে—তাহার ভিতর নাই তো!

হল্‌ম্যান বাহির হইয়া পড়িল।

নিকোলা অঘোরে ঘুমাইতেছিল; যখন সে জাগিল তখন হলম্যান তাহার জামার কলার ধরিয়া বিড়াল ছানার মত উঁচু করিয়া তুলিয়াছে।

নিকোলা যে মুহূর্ত্তে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিল সেই মুহূর্ত্তেই অবস্থাটা বুঝিয়া লইল, এবং ব্যাপার বুঝিয়া একেবারে সটান হইয়া শুইয়া পড়িল। সে পা ছুড়িতে লাগিল এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিছুতেই সে বাড়ী যাইবে না। মারিয়া ফেলিলেও না।

নিকোলা এমনি ক্ষেপিয়াছিল এবং এমনি পা ছুড়িতেছিল যে তাহার কথায় সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্রও অবসর ছিল না।

হলম্যান উহাকে একবার বাড়ীর ভিতর পুরিতে পারিলে হয়, চাবুকের চোটে সিধা করিবার লোক দরজায় দাড়াইয়া আছে।

হলম্যান গৃহিণী লণ্ঠন হাতে দাড়াইয়া ছিল। তাহারি আলোকে সে দেখিল নিকোলার ক্রুদ্ধ চোখ আগুনের মত জ্বলিতেছে, তাহার কচি মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে।

“যার ঘর নেই তার ঘরে দরকারও নেই, ছেড়ে দাও বলছি ছেড়ে দাও” বলিতে বলিতে রোরুদ্যমান নিকোলা হঠাৎ এক ঝটকায় হলম্যানের হাত ছাড়াইয়া, তীরের মত ছুটিতে ছুটিতে ফটক পার হইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিকোলার ঘুষি যে কেবল লাড্‌ভিগের নাকে বাজিয়াছিল তাহা নয় উহা বার্ব্বারার বুকে বাজিয়াছিল। কিন্তু যখন সে শুনিল নিকোলা হলম্যানদের ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাকে “সংশোধনাগার” নামে ছেলেদের জেলে পাঠাইবার কথা উঠিয়াছে তখন সে পুরা দমে কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। সে ছেলের জন্য অনেক দুঃখ সহিয়াছে কিন্তু এ ধাক্কা সে সামলাইতে পারিবে না, ছেলে জেলে গেলে সে বাঁচিবে না। মনিব ঠাকুরাণীকে দয়া করিতেই হইবে, নিকোলার এ দুর্গতি কিছুতেই সে বরদাস্ত করিতে পারিবে না। বার্ব্বারা রোজসহি করিয়া কাজ করে নাই, প্রাণ দিয়া খাটিয়াছে। লাড্‌ভিগ, লিজিকে নিজের ছেলের মত করিয়া মানুষ করিয়াছে। তাহার এ অনুরোধ রাখিতেই হইবে। নইলে, কি যে ঘটিবে, বার্ব্বারা কি যে করিবে তাহা সে নিজেই জানে না; হয় তো তাহাকে বাধ্য হইয়া এ চাকরী ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বার্ব্বারা কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ীসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া তুলিল। ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার কাছে ঘেঁসিতে সাহস পায় না।

এই রকম কান্নার পালা প্রায় একদিনের অধিক স্থায়ী হইত না, কিন্তু এবার তিন চার দিনেও থামিল না। বাড়ীসুদ্ধ লোক বিরক্ত। ভীর্গ্যাং-গৃহিণীর মাথার অসুখ চাগিয়া উঠিল। অসুখের সময়ে তিনি গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায় সাধারণতঃ ঘুমাইলেই তাঁহার মাথা পরিষ্কার হইয়া যাইত।

এই রকম অসুখের সময় বার্ব্বারাই গোলমাল থামাইয়া বেড়াইত, গৃহিণীর মহলে চৌকিদারী করিত, কিন্তু আজ সে নড়িল না; নিজের ঘরে একলাটি বসিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

আজ, এই অসুখের সময়ে মনিবঠাকুরাণী যে একবারও বার্ব্বারাকে ডাকিলেন না ইহাতে সে মনে মনে [illegible] নিশ্চয় [illegible] [illegible] সে একটু খুসীও হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, ভীর্গ্যাং গৃহিণী উঠিলেন না। কৌসুলী সাহেব বাড়ী আসিলে মাথায় শাল জড়াইয়া নিজেই প্রদীপ জ্বালিলেন, বার্ব্বারাকে ডাকিলেন না। মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার গলার আওয়াজ কাঁপিতেছিল।

ভবিষ্যতে মানাইয়া চলিতে না পারিলে বার্ব্বারার যে এ বাড়ীতে চাকরী করা পোষাইবে না এ কথা ভীর্গ্যাং-গৃহিণী স্পষ্টাক্ষরে বার্ব্বারাকে পূর্ব্বাহ্ণেই জানাইয়া রাখিতে চান।

দাসীর মান অভিমানের জ্বালায় বাড়ীসুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত। ছেলেদের মুখ চাহিয়া এতদিন গৃহিণী সমস্ত সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, কোনো কথায় কথা কহেন নাই,—কর্ত্তাও সে কথা জানেন, কিন্তু আর বরদাস্ত করা যায় না। তা' ছাড়া ছেলেরাও বড় হইয়া উঠিয়াছে, এখন বার্ব্বারাকে ছাড়াইয়া দিলেও ক্ষতি নাই। গৃহিণীর মতে, এই সুযোগে বার্ব্বারাকে বরখাস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত, ছোটলোক ভারি বাড়িয়াছে।

সুতরাং এ বাড়ী হইতে শীঘ্রই যে বার্ব্বারার অন্নজলের বরাৎ উঠিবে সে কথা তাহাকে সংযত অথচ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইল। কৌসুলি-গৃহিণীর বন্ধু ও বান্ধবী-মহলের সকলেই এক বাক্যে এই পাকা চালের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ পেটমোটা আহরে জীবটিকে যে আর বেশী দিন আদর দেওয়া চলিবে না, এ কথা তাহারা আগে হইতেই জানিতেন।

বিস্মিত হইল কেবল বার্ব্বারা, বজ্র-গর্জ্জন-বিমূঢ়ের মত ব্যাপারটার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাহার বেশ একটু দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইল। সে—ভীর্গ্যাং বাড়ীর বার্ব্বারা—

লিজি লাউভিগের মাতৃস্থানীয়া যে নহিলে একদণ্ড চলে না—সে লিজি লাউভিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে? তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে? বাব্বারার ইহা বিশ্বাস করিতে দেরী লাগিল।

বাব্বারা একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল, বিনা অপরাধে যে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার নোটিস দেওয়া হইয়াছে ইহা সবাই বুঝুক,—উহার গম্ভীর হইবার কারণ অনেকটা এই রকম। ইহাতে কিন্তু ফল হইল না, মনিব-ঠাকুরাণী গলিলেন না। বাব্বারা মনে মনে ধূলার অধম হইয়া গেল। ইহার পর সে কত মিনতি করিল, কত কাঁদিল, কিন্তু মিষ্টভাষিণী ভীর্গ্যাং-গৃহিণীর ঐ এক কথা, ছেলেরা বড় হইয়াছে, এখন আর তাহাকে প্রয়োজন নাই। বাব্বারা ছেলেদের অনেক করিয়াছে, সেজন্য গৃহিণী কর্ত্তাকে বলিয়া না হয় বিদায়ের পূর্ব্বে তাহাকে কিছু পারিতোষিক দেওয়াইয়া দিবেন।

বাব্বারা চটিল, সে সহরে যাইবার নাম করিয়া এক বেলার ছুটি চাহিয়া লইল। বাব্বারা একবার ঘুরিয়া আসুক,—তখন মনিব ঠাকুরাণী বুঝিবেন। শরীরের রক্ত দিয়াও যাহাদের মন পাওয়া যায় না বাব্বারা তাহাদের চাকরী ছাড়িয়াই দিবে, সে অন্যত্র কর্ম্মের চেষ্টা দেখিবে।

বাব্বারা প্রথমেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে গিয়া উঠিল। উঁহারা একজন ছেলের ঝি খুঁজিতেছিলেন। তাহার উপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কৌন্সলি সাহেবের বন্ধু মানুষ, সুতরাং বাব্বারাকে আর পরিচয় দিয়া ভর্ত্তি হইতে হইবে না, উঁহারাই বাব্বারাকে লুফিয়া লইবেন। এই গত রবিবারেও কৌন্সলি সাহেবের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-গৃহিণী বাব্বারার কত সুখ্যাতি করিয়া আসিয়াছেন, তিনি যে অমন একজন লোক পাইতেছেন না সেজন্য কত দুঃখ করিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু—কি দুরদৃষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট-গৃহিণী আজই আরেকজন ছেলের ঝি নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন!

হাকিম সাহেব কাছারী হইতে ফিরিবা মাত্র গৃহিণী আসিয়া বলিলেন "আর শুনেছ? ভীর্গ্যাং-বাড়ীতে একেবারে প্রলয় হয়ে গেছে; মহামহিমান্বিত প্রবলপ্রতাপান্বিত বাব্বারা ঠাকরুণের জবাব হয়েছে। তিনি এখানে এসেছিলেন চাকরীর জন্যে। আদুরে ঝি চাকর আমার দু' চক্ষের বিষ, অমন লোক আবার আমি রাখ্‌বো?—মাইনে দিয়ে? ঘরের কড়ি দিয়েও বিদায় ক'রে দিতে হয় অমন লোককে।"

বাব্বারা সে দিন অনেক ঘুরিল, অনেক বড় লোকের ফটক ডিঙাইল। সে তিন-ভাঁজ-করা লম্বা কাগজ খুলিয়া কৌন্সলি সাহেবের প্রশংসা-পত্র দেখাইল; সবাই তাহাকে চেনে, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না। চাকরী খালি নাই।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, নিরাশ হৃদয়ে অবসন্ন দেহে মর্ম্মাহত বাব্বারা নিঃশব্দে মনিব-বাড়ীর দরজায় আবার মাথা গলাইল।

তাহার এতদিনের প্রতিপত্তি, এতদিনের বিশ্বস্ততা, এতদিনের কর্ম্মনৈপুণ্য, সে কি একটা ফুৎকারেই হাওয়ার সঙ্গে মিশাইয়া গেল!

চাকরীর চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া বাব্বারা যখন ফিরিয়া আসিল তখন কেহ তাহাকে সে বিষয়ের কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। বাব্বারা তাহা লক্ষ্য করিল। বাব্বারার রোষতুষ্টির উপর যাহাদের চাকরী থাকা না থাকা নির্ভর করিত, ভীর্গ্যাং গৃহিণীর প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা পর্য্যন্ত নির্ভর করিত, সেই সব চাকর দাসীরা আজ নিজেদের মধ্যে গা টেপাটিপি করিতেছে, দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে।

এই ঘটনার পর বাব্বারা এ সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিলেই ভীর্গ্যাং গৃহিণী অন্য পাঁচ কথা তুলিয়া চাপা দিতেন। এ সম্বন্ধে যে তাঁহার নিজের কোনো হাত নাই এমন কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

বাব্বারার চলিয়া যাইবার দিন যতই ঘনাইতে লাগিল গৃহিণীর বক্‌শিস দিবার প্রবৃত্তিও ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বাব্বারার মনে হইতে লাগিল, এই বক্‌শিসের রাশি তাহাকে ইস্ক্রুপের মত, জোরে ঘা না দিয়া, কায়দায় পেঁচ কষিয়া ক্রমশঃ দূরে সরাইয়া ফেলিতেছে।

ইতিমধ্যে কৌন্সলি সাহেব নিকোলাকে একটা লোহার কারখানায় কাজ শিখিবার জন্য ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন।

গৃহিণীর কাছে বখ্‌শিস্‌ পাওয়াটা যখন প্রায় গা-সহা

হইয়া আসিয়াছে ঠিক এমনি সময়ে একদিন স্বয়ং কৌন্সলী সাহেব তাঁহার একটা প্রকাণ্ড পুরাণো পোর্টম্যাণ্টো বার্ব্বারাকে ডাকিয়া দান করিয়া দিলেন। বার্ব্বারা একেবারে বসিয়া পড়িল; তবে তাহাকে সত্যই ছাড়াইয়া দেওয়া হইল! লিজি লাড্‌ভিগ্‌কে ছাড়িয়া তাহাকে যে সত্যই চলিয়া যাইতে হইবে, একথা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না,—উহাদের দেখিতে না পাইলে বার্ব্বারা আর বাঁচিবে না।

স্বয়ং কৌন্সলি সাহেবের কাছে নিজের বক্তব্য জানাইয়া বার্ব্বারা কতকটা হাল্কা বোধ করিল।

কৌন্সলি সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "এ বাড়ীতে যে তুমি ভালই ছিলে, আর সে কথা যে তুমি নিজেই বেশ বুঝ্‌তে পেরেছ, এতে আমি খুসী হয়েছি।" বার্ব্বারা কিন্তু এরূপ উত্তরের আশা করে নাই।

খাতাপত্র দেখিয়া কৌন্সলি সাহেব বার্ব্বারাকে একশত সতের ডলার দিয়া হিসাব মিটাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন "এই যে জমেছে এ তোমার সৌভাগ্য। নিকোলার জন্যে এ পর্য্যন্ত খরচটা তো কম হয় নি।"

বার্ব্বারা মনে মনে ঠিক করিল এবার অন্যত্র চাকরী লইবার পূর্ব্বে কিছু দিন বিশ্রাম করিয়া লইবে। সে কিছু দিন গাঁয়ে গিয়া থাকিবে। চৌদ্দ বৎসর সে কেবল পরের জন্য খাটিয়া মরিয়াছে।

বিদায়ের দিনটা এতদিন তাহার কাছে ভারি ভয়ানক হইয়াই ছিল; কিন্তু কাটিল সহজেই। ঠিক সেই দিনেই ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী কৌন্সলি সাহেবের নিমন্ত্রণ। গৃহিণী এবং ছেলে মেয়েদের সকলকেই যাইতে হইল; সুতরাং গাড়ীতে উঠিবার সময়ে, বার্ব্বারার বিদায়গ্রহণ ব্যাপারটা সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইয়া গেল।

গাড়ী চলিয়া গেল; লিজির লোমশ পোষাকের কোমল স্পর্শ হাতে জড়াইয়া বার্ব্বারা দরজার কাছে অনেকক্ষণ একা দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঝুলন

সূর্য্য, গ্রহ, চন্দ্র, তারা রশ্মিধারা বর্ষিছে,
গাহিছে গৃহী প্রেমের স্বর, বাজায় তাল বৈরাগী;
শূন্যতলে ধ্বনিছে সদা ঐকতান নৌবতে,
কবীর কহে বন্ধু মম গগনে সদা রয় জাগি'।

দণ্ড পলে খণ্ড করি' আরতি করা কেমন সে?
বিশ্বলোক আরতি যার করিছে গান দিবস রাত;
ঘূর্ণ্যমান চাঁদোয়া ঘিরি' ঝালর দোলে অদৃশ্যে,
অদৃশ্যের দেউল 'পরে বিরামহীন ঘণ্টানাদ!
কবীর কহে আরতি তার অহর্নিশি সেথায় রে
জগত রাজ-সিংহাসনে বিরাজে যেথা জগন্নাথ।

কর্ম্ম, ক্রিয়া, প্রান্তি আর প্রাপ্তি শুধু সংসারে,
পরাণ-প্রিয়তমের কথা যে হয় প্রেমী সেই জানে,
পিরীতি আর নিরতি ধারা ধরেছে যে বা অন্তরে
গঙ্গা আর যমুনা বারি মিলিছে আসি, যার প্রাণে;
সলিল অতি সুনিরমল ঝরিছে সেথা নির্ঝরে
জন্ম আর মরণ তত্ত্ব অন্ত পায় সেইখানে।

দেখরে যাবি' সেথানে, মরি, বিরাম কিবা চমৎকার!
যোগ্য সেবা পেয়েছে হ'তে আরাম শুধু সেই তো পায়
প্রেমের ডোরে দুলিছে কায়া সিন্ধু সম হিন্দোলার
মধুর রবে উচ্ছ্বসিয়া উঠিছে ধ্বনি গগন গায়;
সলিল বিনা কমল সেথা সকল দল মেলিছে তার
কবীর কহে হৃদয় মম ভ্রমর সম সে ফুল চায়।

পদ্মফুল ফুটিয়া আছে চক্রটির কেন্দ্রেতে,
স্পন্দ তার অর্থ, আহা জানে সে কোন সজ্জনে!
সঙ্গীতের উঠিছে নাদ রটিছে রাগ চৌদিকে,
মর্ম্ম তার গুপ্ত আছে সিন্ধুনীর-মজ্জনে!
কবীর কহে ডুবাও মন অসীম রস-সিন্ধুতে,-
ইচ্ছা যদি জনম আর মরণ ভ্রম-বর্জ্জনে।

পাঁচের সেথা পিপাসা মিটে—মিটিয়া যায় নিঃশেষে,
তিনের তাপ লাগে না আর পশে না হৃদি-কন্দরে;
কবীর কহে অগম-লীলা চলেছে সদা সেই দেশে,
লোচন-অগোচরের জ্যোতি চাহিয়া দেখ অন্তরে।

গগন সেথা মগন সদা নবীন চির আনন্দে,
জন্ম আর মরণ, তার বাজিছে তালি দুই হাতে;
রাগিণী উঠে ঝঙ্কারিয়া কি মূর্চ্ছনা কি ছন্দে!
ত্রিলোক হ'তে রসের ধারা মিশিছে আসি' দিন রাতে।

সূর্য্য শশী লক্ষ কোটি প্রদীপ সেথা সমুজ্জ্বল,
বাজিছে তূরী ভুবন ভরি' প্রেমিক দোলে হিন্দোলে;
পিরীতি সেথা মঞ্জরিছে ঝরিছে আলো অনর্গল,
আপনা ভুলি' ভকত হিয়া অমৃত পিয়ে বিহ্বলে।

জন্ম আর মরণে কোনো তফাৎ নাই—নাই তফাৎ
নাই তফাৎ যেমনতর দক্ষিণে ও বামে গো;
কবীর কহে সেয়ানা যেবা হয় সে বোবা অকস্মাৎ,
কোরাণ-বেদ অতীত বাণী অতল যেথা নামে গো।

অসীমে মম আসন পাতি' অগম সুরা পিয়েছি,
যোগের মূল মুকতি আমি জেনেছি অতি গোপনে,
না চিনি' পথ অশোকপুরে এসেছি, কৃপা পেয়েছি,
পেয়েছি জগদেবের দয়া সহজে মর-ভুবনে।

ধেয়ানে ধরি' এঁকেছি তারে নয়ন বিনা দেখেছি
অগম বলি' অসীম বলি' যাহারে করে বর্ণনা;
এই তো বটে অশোকপুর, যেথায় এসে লেগেছি,
যাহার পথ খুঁজিতে লোক সহিছে শত যন্ত্রণা;
পাতক হেথা না পায় পথ মুকতি হেথা নিরন্তর,
সেয়ানা সেই হেথা যে আসে,—ফুরায় তার লাঞ্ছনা।

কেমনে তার সোয়াদ কহি? —মুখ্য অতি সেই বাণী,
স্বপ্ন তার সোয়াদটুকু জেনেছে যেবা সেই জানে,
কবীর কহে মুখে যদি বুঝে একথা,—সেই জ্ঞানী,
সেয়ানা জনে বনিয়া বোবা ফিরিছে এরি সন্ধানে।

রজনী দিন মাতিয়া হেথা রয়েছে যোগী সন্ন্যাসী
নিরতি-ধারা শোধন করি' লয়েছে তারা জ্ঞান দিয়া,
নিশ্বাসে ও প্রশ্বাসেতে অমৃত পিয়ে নিঃশেষি,
গগন গুহা কাঁপায়ে যেথা ধ্বনিছে তূরী নন্দিয়া।

হস্ত বিনা তন্ত্রী কিবা বাজিছে মধু নিঃস্বনে!
যতন আর জ্বলন লয়ে কি খেলা চলে দিবস রাত!
কবীর কহে প্রাণ-সাগরে মিলাও প্রাণ নির্জ্জনে,
অলোক-ধামে পুলকে যদি মিলিতে চাও তাঁহারি সাথ।

মাতাল সেথা মাতিয়া আছে—মাতিয়া আছে আট পহর,
নিঙাড়ি' আট পহর তারা রসের ধারা ভুঞ্জিছে,
মাতিয়া আছে মজিয়া আছে মত্ততার ধায় লহর,
ব্রহ্মদেহে নিলীন হ'য়ে ভকত হিয়া গুঞ্জিছে।

সাচ্চা সদা কহি গো আমি মাথায় বহি সাঁচ্চারে,
ত্যজিয়া কাচে নিয়েছি সাঁচা সাগর-সেঁচা রত্ন;
জন্ম আর মরণ-ভয় নাহি সে এক কাচ্চা রে
কবীর কয় ভাগিল ভয় সফল হ'ল যত্ন।

গগন সদা গরজে কিবা গাহে গো গান গম্ভীরে,
তূর্য্যরবে যামিনীদিন অমৃত হয় বৃষ্টি;
অরূপ বিভা বিরাজে কিবা অমল নীল অম্বরে,
উদয় নাই, অস্ত নাই, নাহিক লয় সৃষ্টি!
প্রেমের ধারা প্রকাশ করা সাগরে ঢেউ সঞ্চরে,
প্রভেদ আলো অন্ধকারে হয় না কিছু দৃষ্টি!

দুঃখ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, বিরাজে শুধু আনন্দ,
বিরাজে বাধা-বন্ধ-হারা আনন্দের পূর্ণতা,
কবীর কহে নিভৃতে বহে রসের ধারা সুমন্দ,
শান্তি যত নিঃশেষিত, চোখেরো ভ্রম চূর্ণ তা'।

দেখেছি দেহ পিণ্ড মাঝে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেরে,
ভাগিয়া গেছে ভরম আর করম কোন্ মন্তরে!
ধরার মাঝে ধরেছি আমি অ-ধর সে অখণ্ডেরে,
বাহির আর ভিতর এক অমৃত-নীরে সন্তরে!

দেখিয়া চোখে শুনিয়া কানে পাগল বনি' যাই আমি,
সকল ভরি' রয়েছে, মরি, তোমারি জ্যোতি দীপ্যমান!
জ্ঞানের থালে প্রেমের দীপ জ্বলিছে প্রভু দিনযামি,
অসীমে আজি আরাম করি গগনে পাতি আসনখান্।
মায়ার খেলা ভ্রমের মেলা আজিকে থামি' যায় স্বামী!
কবীর কহে জন্ম আজ মরণ সাথে সুনির্ব্বাণ!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান*

যেসকল আধ্যাত্মিকভাব আমাদের সমাজ ও জীবনের মূলগত সেগুলি যখন ক্ষণকালের জন্য আচ্ছন্ন হইয়া আবার

* হিবার্ট জর্নাল হইতে সঙ্কলিত।

পূর্ণ তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে তখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দের কারণ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের সেইরূপ সময় আসিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যেরূপ ছিল আজ তদপেক্ষা ধর্ম্মের জ্ঞানগত ভিত্তি অনেক বেশী দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সে সময়ে আমরা একটা মানসিক অশান্তিতে ছিলাম— ভয় হইতেছিল ধর্ম্মের মূল যদি বা ভূমিসাৎ না হয় বুঝি বা টলে। বিজ্ঞানের নূতন মাদকতা আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া অনেক পীড়া এবং প্রলাপের কারণ ঘটাইয়াছিল। তাহা ছাড়া প্রতিদিন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হওয়াতে তাহাদের নব নব তাৎপর্য্য লাভের জন্য মানুষ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। জীববিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যেসকল বড় বড় বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে আমাদের চিন্তাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যক ঘটিল। আমাদের মনোরাজ্যে একটা বিপর্য্যয় দশা উৎপন্ন হইয়া আমাদের কাছে সমস্তই যেন অনিশ্চিত করিয়া তুলিল।

এইরূপ সময়ে যে ধর্ম্মবিশ্বাস সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে ইহা অনিবার্য্য। চিন্তাশক্তিহীন ব্যক্তিরাই যে কোনো অপরিচিত সত্যের অভ্যুদয়ে বিপদের আশঙ্কা করেন। নূতন কোন ভাবকে গ্রহণ করিতে হইলে চিন্তাপ্রণালীতেও কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ত্রই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হয়। সেইজন্য তাহা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে ও আমাদের বিরাগের কারণ হইয়া উঠে।

পৃথিবীতে সহসা যদি স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে নানা লোকের নানা স্বার্থে ও ব্যবসায়ে আঘাত লাগিত সুতরাং তাহারা প্রতিকূল হইয়া উঠিত। তেমনি যদি হঠাৎ চরম সত্যও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে তবে নানাবিধ চিরাভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যে যাহাদের মন নানাপ্রকার আরাম ফাঁদিয়া বসিয়া আছে তাহারা পীড়া অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না।

শুধু যে পরিবর্ত্তনের বিভীষিকাই অশান্তির কারণ তাহা নহে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও মানুষ এখনকার চেয়ে অনেক কাঁচা ছিল। তখন সমস্ত নূতন তথ্যকেই মানুষ ইন্দ্রিয়বোধ-প্রধান স্থূল জড়বাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করিত, সুতরাং সহজেই সেই ব্যাখ্যা নাস্তিকতার অভিমুখে অগ্রসর হইত। কিন্তু এখন আমাদের দর্শনশাস্ত্র অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে; এইজন্যই এককালে যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আমরা প্রলয়ঙ্কর বলিয়া ভয় করিতাম এখন সেই সমস্ত সত্যকেই জ্ঞানোন্নতির সহায় বলিয়া স্বীকার করিয়া শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি। ইহার ফলে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধের কথা আর আমরা শুনিতে পাই না এবং অভিব্যক্তিবাদই সকল রহস্যের মীমাংসাস্থল ও সকল জ্ঞানের মূল আশ্রয় এই ভুল ধারণা ঘুচিয়াছে।

এই জন্যই আজকালকার দিনে ধর্ম্মকে মানবসমাজের একটি মহৎ পদার্থ বলিয়া সকলে সমাদরের সহিত স্বীকার করে;—ইহা যে আমাদের পশুপ্রকৃতিরই একটা উচ্চতর পরিণাম মাত্র এ কথা এখন আর শ্রদ্ধা লাভ করে না। অভিজ্ঞতাবাদী (empirical) পণ্ডিতগণ বলিতেন কোন জিনিসকে বুঝিতে হইলে কি হইতে তাহার আদিম উৎপত্তি তাহা আলোচনা করা আবশ্যক,—তাহার প্রথম উন্মেষের অবস্থায় তাহাকে বিচার করিয়া দেখিলে তবেই তাহার প্রকৃত পরিচয় সম্ভবপর। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি সম্বন্ধে এই যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে যেহেতু মানুষের জীবনে শারীরিক অনুভূতিই সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশ পায় অতএব আমাদের উচ্চতম বৃত্তিগুলিও এই মূল উপাদানে গঠিত। ইহা হইতে তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে মূলত ধর্ম্ম উন্নত পাশবিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং তাহার নীচ উৎপত্তির সংবাদ যে জানে সে তাহাকে লইয়া আর বড়াই করিতে পারে না। কিন্তু এই সকল মহদাশয়েরা সমস্ত চিন্তাকে স্থূল রেখায় আঁকিয়া ও প্রাকৃতিক জগতের সহিত সকল বিষয়ের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া বিষম ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। যে কোনো পদার্থের মধ্যে বৃদ্ধি-ধর্ম্ম আছে অর্থাৎ যাহা ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রকৃতি বুঝিতে হইলে তাহার গোড়ার দিকে তাকাইলে চলে না; তাহার পরিণত অবস্থার মধ্যেই তাহার যথার্থ তাৎপর্য্যটি পাওয়া যায়। বীজে নহে কিন্তু পরিণত বৃক্ষটিতেই আমরা বৃক্ষের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি। এইরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে পাশব স্বার্থপরতা হইতেই ধর্ম্মবোধের উৎপত্তি এই সিদ্ধান্ত সত্য নহে। বস্তুতঃ

কালের মধ্য দিয়া বিশ্ব ক্রমশঃ পরিণতির দিকে চলিয়াছে, এই ক্রমবিকাশের কোনো একটি বিশেষ পর্ব্বকেই মূল বলিয়া গণ্য করা কোনো মতেই চলিতে পারে না। মূলে নহে ফলেই, আরম্ভে নহে চরমেই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়, ফলেন পরিচীয়তে। অতএব মানুষের মন পদার্থটা কি তাহা জানিতে হইলে মিলের উপদেশ অনুসারে আমরা ধাত্রী-ক্রোড়ের শিশুর অপরিস্ফুট মনের মধ্যে উঁকি মারিতে চেষ্টা করিব না; কিন্তু সাহিত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যেই আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেইরূপ ধর্ম্মবোধের প্রকৃতি কি তাহারই খোজ করিতে গিয়া আদিম কালের মানুষের স্বপ্ন এবং কুসংস্কারের অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাতে কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে আর অধিক কিছু নয়। বস্তুত জগতে যে সকল বড় বড় ধর্ম্মতন্ত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহাদেরই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে তবেই ধর্ম্ম জিনিষটা যথার্থ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

এইরূপে সম্প্রতি আমাদের অনুসন্ধানের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সেইজন্য এখন আমরা ধর্ম্মকে মানুষের জীবনের একটা বাহির-হইতে জোড়া-দেওয়া জিনিষ বলিয়া মনে করিনা—আমরা এই ধর্ম্মকেই সমস্ত জীবনের চূড়া এবং মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ বলিয়া গণ্য করি।

আজকাল বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট অধিকার-ভেদ ঘটিয়াছে। আমরা যত কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করি এক্ষণে তাহাকে দুই পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখা হইয়া থাকে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করে, বর্ণনা করে, ঘটনাগুলিকে তাহাদের দেশকালগত নিয়মের সহিত মিলাইয়া দেখে। দর্শন শাস্ত্র তাহার কারণ-তত্ত্ব ও তাৎপর্য্য নির্ণয় করে। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা আমরা এই অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যগুলির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাই। এই তথ্যগুলি আমাদের প্রিয় হউক আর নাই হউক, তাহাদিগকে আমরা কোন কাজে লাগাইতে পারি আর না পারি—তাহাদের অস্তিত্বকে ঘুচাইবার নহে, তাহারা থাকিবেই। কোনো শাস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকা না থাকা, ভাল লাগা না লাগার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই, ইহারা পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও প্রমাণের অধিকারভূত। ধর্ম্মসভার মন্ত্রণা বা কোন সাধারণ-সভার বিধানে ইহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। যদি কোন শাস্ত্র ইহাদিগকে অস্বীকার করে তবে সেই শাস্ত্রকেই অপমানিত হইয়া হার মানিতে হইবে, কিন্তু যেমনই হউক বিজ্ঞান কেবল বর্ণনাই করে, ব্যাখ্যা করে না। চরম তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগকে দর্শনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়। জ্ঞানের পূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দুইদিকের প্রশ্নেরই উত্তর আবশ্যক হয়। অবশ্য পূর্ণরূপে এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই নাই—কিন্তু এই দুই জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রকে পৃথক রাখাতে এবং উভয়েরই গৌরব স্বীকার করাতে উভয়েই বিনা বিরোধে পাশাপাশি বাস করিতে পারে। এই কারণেই আজকাল ধর্ম্মকে লইয়া বিজ্ঞান দর্শনের বিরোধ-সম্ভাবনা নাই।

আমরা যখন কোন পরিবর্ত্তন দেখি তখন কোনো না কোনো দ্রব্যকেই সেই পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া জানি। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েই এখন দৃশ্যমান স্পর্শগোচর পদার্থকেই চরম বলিয়া গণ্য করে না। এই সকল দ্রব্যকে আমরা যতই কেন ব্যবহারে লাগাই ও মাপিয়া জুখিয়া দেখি, ইহাদের যথার্থ প্রকৃতিটি জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়বোধমূলক অভিজ্ঞতার ভাষায় ব্যাখ্যা করা সহজ এবং সেইরূপে ব্যাখ্যা করিলে তাহার রহস্যটুকু আর থাকেনা। কিন্তু যখনি আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে বস্তু পদার্থটা আসলে কি, অমনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে থাকি। প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ ও রাসায়নিকগণ বলেন যে অণুর সমষ্টিই বস্তু ও সেই অণুগুলি আবার পরমাণুতে বিভক্ত, এবং সম্প্রতি পরমাণুগুলিকেও আবার আরো সূক্ষ্ম পদার্থের সমবায় বলা হয়। আমাদের অনুসন্ধান আরো অগ্রসর হইতে থাকিলে আরো গভীরতর রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করি এবং তখন শুনা যায় বস্তু নাকি আকাশ পদার্থের আবর্ত্ত মাত্র। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমাদের চারিদিকে যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাইতেছি তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহারা তাহাদের অতীত কোন একটি শক্তির ক্রিয়া মাত্র। অবশেষে স্পেন্সরের সহিত একবাক্যে বলিতে হয় যে, মানুষ সর্ব্বদাই একটি অসীম নিত্য শক্তির সম্মুখে রহিয়াছে এবং সেই শক্তি

হইতেই সমস্ত পদার্থ নিঃসৃত হইতেছে। এই সিদ্ধান্তটি যেমনই সত্য হউক না কেন ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কারণ-তত্ত্বের সমস্যাটিকে আপাতদৃষ্টিতে যতই সহজ মনে হউক বস্তুত উহা রহস্যে পূর্ণ। যে কারণ-তত্ত্ব প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের মূল তাহাকে এক্ষণে আমরা কোন দৃশ্যমান পদার্থেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখি না,—আমরা তাহাকে কোন একটি আদি শক্তির মধ্যেই অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করি।

তারহীন টেলিগ্রাফের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে আমাদের চারিদিকে একটি অদৃশ্য শক্তির মহা রাজ্য আছে এবং বিজ্ঞান ও দর্শন এই দৃশ্যমান জগতের ঘটনাবলীকে কেন যে সেই অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ বলিয়া থাকে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাইব। অতএব দেখা যাইতেছে দৃশ্যমান দ্রব্যগুলিকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া না মানিয়া তাহাদিগকে অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া বলিয়াই আজ কাল গণ্য করা হয়।

এইরূপে মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান একটি মস্ত ফললাভ করিয়াছে। প্রচলিত নাস্তিকবাদ ও জড়বাদ একেবারে লোপ পাইয়াছে। আমাদের চিন্তাবৃত্তি যে অবস্থায় প্রকৃতির মধ্য দিয়াই সকল ব্যাপারকে দেখিয়া থাকে সে অবস্থায় প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। তখন মনে হয় যে প্রকৃতিই অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করে এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাই কেবল ঈশ্বর করিয়া থাকেন। প্রচলিত ধর্ম্ম-সমাজ এতদিন এই প্রকারে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই প্রকৃতি মাঝে মাঝে ঈশ্বরকে ঠেলিয়া নিজেই সমস্ত স্থান জুড়িবার উপক্রম করিয়াছে। সেই জন্যই বিজ্ঞানের কোন নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হইলেই এপর্য্যন্ত ধর্ম্মসমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যত বিস্তার হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কর্তৃত্বরাজ্য আমাদের পক্ষে ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে ভগবানই সেই অনন্ত নিত্যশক্তি যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা সেণ্টপলের ভাষায় বলিতে হইলে,—যাঁহার মধ্যে আমরা বাস করি, চলি ফিরি, ও যাঁহার মধ্যে আমরা অস্তিত্বলাভ করি—তখন আমাদের বিষাদের আর কোন কারণ থাকে না। তখন আর প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে কিন্তু তাঁহারই প্রকাশমাত্র। প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁহার কার্য্যপ্রণালী মাত্র। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী তাঁহারই জ্ঞানের রূপ।

এই কথাটিই ধর্ম্মের মর্ম্মকথা। ঈশ্বরই যে সকলের মূলে রহিয়াছেন ধর্ম্ম ইহাই বলিতে চাহিয়াছে। তবে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য কি প্রণালীতে চলে সে সম্বন্ধে ধর্ম্ম কিছু বলিতে চাহে না ; সে যে প্রণালীই হউক না কেন তিনি মূলে আছেন এইটুকু হইলেই হইল। তিনি যদি তাঁহার এক আদেশেই জ্যোতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন ত ভাল, আর যদি যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাঁহার সৃষ্টির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ত আরো ভাল। যতক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া স্বীকার করা যায় ততক্ষণ প্রণালী লইয়া ধর্ম্মের কোন আপত্তি থাকে না।

জাগতিক কারণ-তত্ত্বের কেবল আকার এবং প্রণালীই বিজ্ঞানের আলোচ্য। তাহার প্রকৃতি ও অভিপ্রায়ের আলোচনা দর্শন ও ধর্ম্মের অধিকারভুক্ত। এইরূপে অধিকারের শ্রেণীভেদ হওয়াতেই, অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্ত্তনাকালে ধর্ম্মসমাজে যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল এখন তাহা সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়াছে। এক সময়ে লোকে কল্পনা করিয়াছিল যে যাহা বিশেষ একটা কিছুই নহে বলিলেও হয় তাহাও কেবলমাত্র কালপ্রভাবেই সমস্ত উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু এখন সে মোহ কাটিয়া গিয়া এ কথা বুঝিয়াছি যে অভিব্যক্তিবাদ একটি মূল কারণশক্তির বাহ্য কার্য্যপ্রণালী মাত্র, তাহার মধ্যে কর্তৃত্ব কিছুই নাই। অভিব্যক্তিবাদ হইতে আমরা কেবল এই কথাই বুঝিয়াছি যে কোন জিনিষই হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই বা প্রথম হইতেই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই। ধর্ম্মতত্ত্বের একমাত্র জিজ্ঞাস্য এই যে কোন্ শক্তি মূলে থাকিয়া সমস্ত ঘটাইতেছে এবং এই অভিব্যক্তির মধ্যে ক্রম-উন্নতির পরিচয় আছে কি না? যদি সেই পরিচয় থাকে তবেই ধর্ম্মের পক্ষ হইতে চিন্তার কারণ দূর হয়। অভিব্যক্তিবাদকে যদি কেবল অন্ধ পরিবর্ত্তন পরম্পরা না বলি তা হইলেই স্বীকার করিতে হয় যে উহা একটি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জগতের অভিব্যক্তির মধ্যে এই যে সম্মুখের দিকে লক্ষ্য স্থাপনের ভাবটি আছে ইহাই জগৎবিকাশের মূলে জ্ঞানের অস্তিত্বের পক্ষে

প্রধান যুক্তি। যে কারণ-তত্ত্ব যন্ত্রমূলক, তাহা কেবলমাত্র অতীত ঘটনার পরিণাম, যাহা জ্ঞানমূলক তাহাই ভবিষ্যতের অভিমুখে আপন অভিপ্রায়কে অগ্রসর করে।

ধর্ম্মরাজ্যেও অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করে, এই ধারণায় ধর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বললাভ করিয়াছে। এক্ষণে আমরা কোন ইঙ্গিত বা অলৌকিক কোন ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু তাঁহারই এই জগতের মধ্যে আমাদের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও জীবনের মধ্যেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি। তিনি সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন এবং তাঁহার ক্রিয়া নির্ভরযোগ্য নিয়মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এমন কি খৃষ্টানদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ছিল যে যাহা কিছু নিয়মবহির্ভূত ও সৃষ্টিছাড়া তাহারই মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ আবির্ভাব। কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলেই বুঝিতে পারি যে আভ্যন্তর জগত ও বহির্জগত যে অমোঘ নিয়মের দ্বারা চালিত হইতেছে তাহার মধ্যেই ঈশ্বরের চিরন্তন পরিচয়। যাহা কিছু প্রাকৃতিক তাহাকে এখন আমরা আর অনৈশ্বরিক মনে করি না, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যেই দিব্যকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি।

শ্রীঅতসী দেবী।

উড়ো চিঠি

(গল্প)

জাপানে অবিবাহিত যুবক যুবতীর মধ্যে ভালোবাসা যখন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, তখন তাহারা বিবাহের প্রতিজ্ঞাস্বরূপ গোপনে একটা উপহার বিনিময় করে;—কেহ আংটি, কেহ আয়না, কেহ বা একটি ছোট্ট জাপানী বাক্স দেয়।

অনেক দিনের কথা। টোকিও সহরে সামুরাই বংশীয় জনৈক ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র। ছেলেটি রূপে গুণে সব বিষয়ে ভালো। পড়াশুনায় এমন মন বড় কাহারো দেখা যায় না। দিনরাত হাতে বই—একেবারে পুঁথির কীট!

হঠাৎ পিতা একখানা উড়ো চিঠি পাইলেন। তাহাতে লেখা আছে—"তোমার ছেলে তোমার কোনো প্রতিবাসীর কন্যার প্রণয়মুগ্ধ। ব্যাপার বড় সঙিন! প্রণয়ীযুগল গোপনে গৃহত্যাগ করিবার মতলব করিয়াছে। সাবধান, যেন তোমার বংশে কলঙ্ক স্পর্শ না করে!"

চিঠি পড়িয়া পিতা অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র প্রণয়মুগ্ধ! যে কেতাব হইতে মুখ তুলিয়া কোনো রমণীর পানে কখনো চাহিয়াছে কি না সন্দেহ সে প্রণয়মুগ্ধ! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

যাহা হৌক কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন এই মনে করিয়া তিনি গৃহিণীর পরামর্শ লইতে গেলেন।

গৃহিণী বলিলেন "আশ্চর্য্য কি? প্রেম তো অন্তঃসলিলের মতো গোপনেই বয়। আমি বলি, সন্দেহের মধ্যে থাকবার দরকার নেই; ছেলের বিয়ে তো দিতেই হবে—কাজটা এখনই চুকিয়ে ফেল!"

কর্ত্তা তখন কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কন্যার পিতা সকল কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! তাঁহার কন্যার মতো লাজুক জাপানের মধ্যে আর একটি মেয়ে আছে কি, না, সন্দেহ! সে না কি প্রেম করিতে পারে! যাহা হৌক, সুপাত্র উপস্থিত, হাতছাড়া করা নয় এই মনে করিয়া তিনি বিবাহে সম্মতি দিলেন।

বিবাহের যখন সব ঠিক তখন ছেলেটি হঠাৎ একদিন পুস্তক হইতে দৃষ্টি তুলিয়া প্রথম শুনিল যে পাড়ার একটি মেয়ের সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় লইয়া লোকে কানাঘুষা করিতেছে।

সে বিস্মিত হইয়া বলিল—"এ কী! মেয়েকে যে আমি চক্ষে দেখিনি!" তারপর বিস্ময়ের মাত্রা যখন অতিরিক্ত হইয়া উঠিল, তখন সে একদিন গোপনে তাহাকে দেখিয়া আসিল। দেখিয়া মনে হইল কেতাবের অক্ষরগুলার চেয়ে একটা বেশি আকর্ষণ যেন মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ হইতে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

মেয়েটি এদিকে সকল কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল।

পাড়ার লোকে ছেলেটির কথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল—"লজ্জায় পড়লে মানুষ অনেক কথাই অস্বীকার করে!"

ছেলে বলিল—"এ তো ভারি বিপদ! আচ্ছা বাপু, আমি না হয় বলচি ও মেয়েকে বিয়ে করব না—তা হ'লেই তো হল!"

লোকে বলিল "ও একটা জেদের কথা মাত্র! দুদিন গেলেই তখন বিয়ে হবে।"

যখন এইরূপ একটা গোলমাল চলিতেছে তখন খবর পাওয়া গেল—উড়ো চিঠিখানা একটা পরিহাস মাত্র—তাহাতে সত্য কিছুই নাই।

পাড়ার লোকে সে কথাও হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল—"তাও কি কখন হয়?"

ছেলে বলিল—"আচ্ছা! তবে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম বিয়ে করব না!"

এই বলিয়া সে হাতের আংটি খুলিয়া গোপনে মেয়েটিকে পাঠাইয়া দিল—মেয়েটিও নিজের আংটি খুলিয়া দিল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

সাহিত্য (আষাঢ়)—

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর 'ভারতে শক-শোণিত' প্রবন্ধে বলিতেছেন—

মধ্য-এসিয়াবাসী শকজাতি পঞ্জাবের মধ্য দিয়া আসিয়া রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশে বাস করে। কর্ণেল টডের মতে রাজপুত জাতি সেই শকজাতি হইতে উৎপন্ন। রিজলী সাহেব উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে রাজপুত জাতি বিশুদ্ধ আর্য্যবংশসম্ভূত; পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্র জাতিই শকবংশীয়। বাঙালী জাতি দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মস্তক ও নাসিকার দৈর্ঘ্য ও স্থূলতা মাপিয়া জাতি-নির্ণয় করা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া আজকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে। দীর্ঘশীর্ষ ও উন্নত-নাসিক আর্য্য; গোলশীর্ষ ও নত-নাসিক মোঙ্গোলীয়; স্থূলমস্তক ও স্থূল-নাসিক নিগ্রো; প্রভৃতি বিভাগে মানবসমাজকে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে পাঞ্জাব প্রদেশে আর্য্য লক্ষণ পূরা মাত্রায় বিদ্যমান, এবং পাঞ্জাব হইতে যত দূরে যাওয়া যাইবে, ততই আর্য্যলক্ষণ অল্প হইয়া আসে। এই হিসাবে বাঙালীরা মঙ্গোলীয়-ঘেঁসা, এবং মহারাষ্ট্র জাতি শক ও দ্রাবিড় সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া প্রমাণিত হয়। বাঙালীর মাতৃশোণিত অনার্য্য, মহারাষ্ট্রীয়ের পিতৃশোণিত অনার্য্য। ফল কথা কোনো দেশে অমিশ্র জাতি নাই।

দেউস্কর মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে দৈহিক বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া কোনো জাতির মূল-বংশ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা দুঃসাহসের কার্য্য। দুঃসাহসের কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু জগতে অমিশ্র বিশুদ্ধ জাতি যে নাই, এ কথা অস্বীকার করাও দুঃসাহস। অনার্য্য বলিয়া নিজেদের স্বীকার করিতে মনের মধ্যে চিরকালের পুষ্ট অহঙ্কার আঘাত পাইতে পারে, কিন্তু সত্য ত কাহারো খাতির রাখে না। ভারতের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষবিবরণ জানিতে কৌতূহলী পাঠক মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় অধ্যাপক হোমারশ্যাম কক্সের লিখিত প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিয়া দেখিবেন।

শ্রীযুক্ত শশধর রায় 'জীব-বন্ধন' নামক সুলিখিত প্রবন্ধে বলিতেছেন—

এই ধরাতলে অসংখ্য জীবের বাস। ইহাদিগকে বাহ্যত সম্বন্ধশূন্য বোধ হইলেও সকল জীবই, এমন কি জড় ও উদ্ভিদ পর্য্যন্ত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, একের অভাবে অপরের তিষ্ঠানো দায়। যে সকল জীবকে আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতিকারক বলিয়া মনে হয় তাহারাও এই মহা জীবমণ্ডলীর অত্যাবশ্যক পরিজন। জগতে সকলেরই আবশ্যকতা আছে। ধূলিকণা হইতে জ্যোতিষ্ক ও তৃণ হইতে মানব পর্য্যন্ত যে যেখানে যে ভাবে অবস্থিত তাহা যুগযুগান্তরের সামঞ্জস্যের ফল। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া হিন্দু আততায়ী প্রাণীকেও বধ করিতে সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। অথচ জীবনসংগ্রামে বধ ভিন্ন বাঁচিবার উপায় নাই। অতএব মধ্যপথ আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ পন্থা ইহা বৈজ্ঞানিকের মত; ধর্ম্ম ও নীতি কিন্তু এ মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্রকার বলেন 'তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।'

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যাকরণ বিভীষিকার' দ্বিতীয় কিস্তিতেও অনেক প্রচলিত ভুল শব্দ, সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় প্রভৃতির আলোচনা হইয়াছে। যে সব শব্দ শুধু কথাবার্ত্তায় বা গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় তাহাও লিখিত ভুল শব্দের তালিকায় সন্নিবেশিত করিয়া লেখক একটু গোলমাল করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও এই প্রবন্ধটি প্রত্যেক লেখকের পাঠ করা উচিত। উহার সার সঙ্কলন অসম্ভব বলিয়া আমরা বিরত রহিলাম।

ভারতী (আষাঢ়)—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "লঙ্কায় নটরাজ শিব" মূর্ত্তি আবিষ্কারের সংবাদ দিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

এইরূপ মূর্ত্তি আর্য্যাবর্ত্তে কোথাও নাই। দাক্ষিণাত্যে চিদম্বরম সহরে একটি আছে। দ্বিতীয় মূর্ত্তি সিংহলের প্রাচীন রাজধানী পুলস্ত্যপুরে পাওয়া গিয়াছে। ইহা বোধ হয় শৈব তামিলগণের লঙ্কাপ্রবেশের চিহ্ন। প্রবাদ যে রাবণ তামিল বংশীয়। রাবণের পিতামহের নামও ছিল পুলস্ত্য। পুলস্ত্যপুরী শিলামেঘবর্ণ রাজা কর্ত্তৃক ৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হওয়ার উল্লেখ মহাবংশে আছে। ৮০০ বৎসর ঐ নগর ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং প্রাপ্ত মূর্ত্তি অতি প্রাচীন।

নটরাজ শিবের একটি চিত্র প্রবাসীতেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লশঙ্কর গুহের 'সমাধিসাধ' কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত স্বর্গীয়া কুমারী প্রতিভা দত্তের ঐ নামেরই একটি কবিতার স্পষ্ট নকল।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চীন দেশীয় একখানি ক্ষুদ্র নাটক "সবুজ-সমাধি" নামে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে অনুবাদকুশল কবি গদ্যে পদ্যে চীন সাহিত্যের রস অনুবাদের অনুবাদেও আমাদিগকে দিতে পারিয়াছেন। আমাদের সহিত চীনের পরিচয় জুতার দোকানে; তাহারা যে সাহিত্যরসেরও মহাজন তাহা এই ক্ষুদ্র অথচ করুণ সুন্দর নাটকখানি পাঠ করিলে জানা যায়।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সুন্দর 'সুন্দর' প্রবন্ধে বলিতেছেন—

আমাদের আর্য্য পিতামহেরা সৌন্দর্য্যের মহিমাকে উপেক্ষা ত করেনই নি, তাকে হৃদয়ের মধ্যে পূজার মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন, সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে আনন্দ তাকে তাঁরা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন। যেখানে তাঁরা প্রকৃতির সুন্দর প্রকাশকে দেখেছেন সেইখানে তাঁরা আপনার ভোগের উদ্যান রচনা করেন নি, তীর্থ স্থাপন করে সেই

সুন্দরের মধ্যে ভূমার সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে মহান বলে জেনে ভক্তি করা বড় সহজ অনুভূতি নয়, মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই, এই জন্যে তার মধ্যে সুন্দর ও ভূমাকে দেখা সহজ। মানুষ আমাদের অত্যন্ত কাছে বলে আমরা তার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে বড় করে দেখি। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতিকে আমরা অখণ্ড বৃহৎভাবে দেখি বলে তার মধ্যে যে সব ঘাত প্রতিঘাত চলছে তা আমাদের নজরে পড়ে না। সমস্তই যে সুন্দর তা আমরা প্রতিদিন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দিয়েই উপলব্ধি করতে পারি। এর কারণ সর্ব্বত্র একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করচে; তাকে ভাগ করে দেখলে সে অতি ভীষণ, কিন্তু অখণ্ডরূপে সে শান্ত সুন্দর। মানবসমাজেও এই শক্তি কাজ করচে, কিন্তু আমরা সেই শক্তির মাঝখানে আছি বলে তার স্থির সুন্দর মূর্ত্তি দেখতে পাইনে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি এক সঙ্গেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার কঠোর চেষ্টা করচে। একটি সুমহৎ সামঞ্জস্যের নিত্য আদর্শ তাদের ছোট ছোট সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এই দুঃখের আদিতে ও অন্তে আনন্দ। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখা। সত্যকে পূর্ণভাবে দেখতে পারলেই সুন্দরের সাক্ষাৎ মিলে। এই রকম পূর্ণ সত্যকে দেখিয়ে গেছেন শাক্যরাজবংশের তপস্বী বুদ্ধদেব, ভগবান যিশু। আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই, নতুবা জীবনের সার্থকতা ভোগেও নয়, বৈরাগ্যেও নয়। সুন্দরকে জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে ত মরীচিকা। যিনি পরম সুন্দর তিনিই যে আবার মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম এ কথা অনুভব করতে হলে দুঃখ-কঠোরতা এড়িয়ে চলা চলবে না।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (আষাঢ়)—

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন 'আয়ুর্বেদের ক্রমবিকাশ' দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। ইহা আয়ুর্বেদের প্রথম যুগ। কালে উহা বিলুপ্ত হইলে অত্রিপুত্র পুনর্বসু মুনি অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি নামক ছয় জন শিষ্যকে শিক্ষা দেন এবং তাহারা স্ব স্ব নামে প্রচলিত ছয় খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। চরক মুনি অগ্নিবেশ সংহিতার কিয়দংশ প্রতিসংস্কার করেন; সুতরাং চরক আয়ুর্বেদ-প্রণেতা নহেন, সংস্কর্ত্তা। চরক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। চরকের দ্বারা অসংস্কৃত অংশ পঞ্চনদনিবাসী দৃঢ়বল সংস্কার করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রপুত্র সুশ্রুত ধন্বন্তরি-শিষ্য। ধন্বন্তরি নাম নহে উপাধি, অর্থ—শস্ত্রচিকিৎসার পারদর্শী। তাহার প্রকৃত নাম দিবোদাস, তিনি কাশীর রাজা ছিলেন। সুশ্রুত ২৪ শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। আদিম সুশ্রুত বিলুপ্ত হইলে নাগার্জ্জুন তাহার প্রতিসংস্কার করেন, সেই প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থই এখন চলিতেছে। সুশ্রুতের সময় হইতে শস্ত্রচিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপরে বাগভট। তাহার পুত্র দেবেশ্বর গুপ্ত মালবরাজার কবি অমাত্য ছিলেন। ইঁহাদের কবিত্বশক্তি হইতেই চিকিৎসকগণ কবিরাজ নামে খ্যাত হইয়া থাকিবেন। তৎপরে মাধবকরনিদান ও চক্রদত্ত। চক্রদত্ত সংগ্রহ পুস্তক; সংগ্রহপুস্তক-প্রণেতৃগণ প্রায়ই বৈদ্য। চক্রপাণির নিবাস রাঢ়ের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ক্রমদীশ্বর [ব্যাকরণ-প্রণেতা?]। চক্রপাণির পিতা পালবংশীয় রাজা নয়পাল দেবের খাদ্য পরীক্ষক ছিলেন, সুতরাং মনে হয় তিনি রসায়ন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তৎপরে শিবদাস ও ভাবমিশ্র। গোপাল কবিভূষণ রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ধাতুর জারণ মারণাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অনেক খ্যাতনামা টীকাকারও প্রাদুর্ভূত হইয়া আয়ুর্বেদ প্রচার ও সংস্কারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার 'মহাভারতের জ্যোতিষ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—

মহাভারতের সময়ে এক সংবৎসরে ৬ ঋতু, ১২ মাস, ২৪ পর্ব্ব (অমাবস্যা পূর্ণিমা), ৩৬০ অহোরাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। দিবসকে কলা কাষ্ঠা ও মুহূর্ত্তে বিভক্ত করা হইত। প্রতি ৫ সৌর বৎসরে ২ মাস বা প্রতি সৌরবৎসরে ১২ দিন অধিমাসাধিক্য ধরা হইত অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে চান্দ্র বর্ষ এবং ৩৬৬ দিনে সৌর বর্ষ। বর্ষ গণনা সাধারণত সৌর হিসাবেই হইত। চন্দ্র সূর্য্যের গতি অনুসারে ঋতু পরিবর্ত্তন হয় জানা ছিল। রাশিচক্রস্থ নক্ষত্র সকল জানা ছিল এবং নক্ষত্র দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় হইত। ২৭ নক্ষত্র প্রথমে ২৭ দিনের, পরে তৎপরিমিত স্থানের, পরিমাপক ছিল। নবগ্রহের উল্লেখ মহাভারতে আছে। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য ব্যতীত অপর কাহারো ভগণ বা পরিভ্রমণকালের পরিমাণ লিখিত নাই। গ্রহনামানুসারে বারের নামকরণ তখনো হয় নাই। গ্রহের চক্রগতি জানা ছিল। অমাবস্যা শেষে সূর্য্যগ্রহণ পরিজ্ঞাত ছিল। পূর্ণিমা তিথিতে মাস অন্ত করা হইত, সেই জন্য তিথির নাম পৌর্ণমাসী। মহাভারতীয় কালে উত্তরায়ণ প্রবর্ত্তে শীত ঋতু ও বর্ষ আরম্ভ হইত। পুরাণের অনেক নক্ষত্র সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা জ্যোতিষের রূপক মাত্র।

'আসামের মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়' ও 'আদালতীয় বাংলার নালিশ' উল্লেখযোগ্য।

ভারত-মহিলা (আষাঢ়)—

এ সংখ্যায় অনুবাদ ছাড়া মৌলিক কোনো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই। শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের 'নৈতিক শিক্ষা ও পরিবার গঠন' মনস্বী হার্বার্ট স্পেন্সরের 'এডুকেশন' নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নন্দন বন' শ্রীমতী অলিভ শ্রীনারের একটি স্বপ্নের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' মডার্ণ রিভিউ হইতে সংকলিত। শ্রীযুক্ত কালিদাস বসুর 'ধনী ও নির্ধন' কবিতাটি বেশ হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (আষাঢ়)—

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিত 'বেদান্তবাদ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুন্দর' প্রবন্ধের সার সঙ্কলন অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুফী কবি' বহু তথ্যপূর্ণ সুলিখিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠ' চলিতেছে; লেখক কবি দার্শনিক বলিয়া অনেক পুরাতন জিনিষকে নূতনভাবে প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছেন। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অন্ধের দৃষ্টিলাভ' সম্বন্ধে ডাক্তার আয়াসের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন

ফারমার জন নামে এক ব্যক্তির চোখে জন্মাবধি ছানি পড়িয়া অন্ধ ছিল। চল্লিশ বৎসর বয়সে ছানি কাটিয়া তাহার দৃষ্টি লাভ হয়, তখন সে প্রথম প্রথম স্পর্শ না করিয়া কোনো জিনিষের পরিমাণ বা আকারের পার্থক্য স্থির করিতে পারিত না কিন্তু রং দেখিয়াই বলিতে পারিত এবং না দেখিয়া স্পর্শ করিয়াই কোন জিনিষের কি রং বলিতে পারিত; ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার। অনেক প্রাণীর এক ইন্দ্রিয়ের কাজ অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা করিবার শক্তি আছে, কিন্তু মানুষেরও সে শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কোন বিশেষ অবস্থায় পরিস্ফুট হয় কিনা বলা শক্ত।

বেগুনি রঙের উত্তাপ লাল রঙের অপেক্ষা দ্বিগুণ ; মানুষ কি স্পর্শ দ্বারা ইহা বুঝিতে পারে ? দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার পর তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণ বোধশক্তি ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৈদিক সাহিত্য হইতে 'শরীর বিজ্ঞান পরিভাষা' সংকলন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ 'বুদ্ধ গয়ার তিনখানি শিলালিপি'র পাঠোদ্ধার করিয়া পূর্ব্বপাঠকগণের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 'হিমনদপুষ্ট উপল খণ্ড' সম্বন্ধে পরিচয় লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা সাধারণের সুবোধ্য হয় নাই। শ্রীশিবচন্দ্র শীল 'শ্রীচৈতন্যপারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ' বা ভুবন-মঙ্গল গীত নামক দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় 'নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন' প্রতিলিপি ও পাঠোদ্ধার সহ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহার প্রথম সংবাদ প্রবাসীতে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত 'গৌড়ীয় মঙ্গল-চণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব' আছে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশধর রায় 'জীববিজ্ঞানের পরিভাষা' সংকলন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন যে 'আর্য্যবিজ্ঞানে বর্ত্তমান জীবাণু' পরিজ্ঞাত ছিল এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে।

বীরভূমি (জ্যৈষ্ঠ) :—

শ্রীযুক্ত সতোশচন্দ্র গুপ্ত 'বীরভূমের ঢেকারু জাতি' সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ স্বাধীন অনুসন্ধান প্রশংসনীয়।

দেবালয় (আষাঢ়)—

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় টেনিসনের ইংরাজি কবিতা 'হোলি গ্রেল' সমালোচনা প্রসঙ্গে এবারে কবিতাটির সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাণের দান' নামে শ্রীমতী অলিভ শ্রীনারের একটি স্বপ্ন অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত 'খলিফা দ্বিতীয় ওমার'-চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্গদর্শন (বৈশাখ)

'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে অপ্রকটনামা লেখক বলিয়াছেন যে লোকশিক্ষা ব্যতীত কোনো রাজ্যের কখনো মঙ্গল হয় না। ইহা যে ধ্রুব সত্য তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 'সাহিত্যে অপচয়' প্রবন্ধেও লেখকের নাম অপ্রকট। তাহার বক্তব্য এই যে—

যখন সাহিত্য বিস্তৃত হয়, তখন আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য সমালোচনার নিতান্ত আবশ্যক। বাংলা সাহিত্যের এখন এই অবস্থা সমুপস্থিত অথচ বাংলায় প্রকৃত সমালোচকের নিতান্ত অভাব। সমালোচকের প্রধান গুণ সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ; দ্বিতীয় গুণ আত্মসংযম ; নিজের রুচি দিয়া পরের রচনা বিচার করিলে নিরপেক্ষ সমালোচনা হয় না, বিচারককে নিরপেক্ষ বিচারের জন্য নিজের জ্ঞান ও ধারণাকে দূরে রাখিতে হয়। অপ্রীতিকর কঠোর ভাষা প্রয়োগও নিন্দনীয়। সত্যকেও অপ্রীতিকর ভাষায় প্রকাশ করিলে তাহা লোকের গ্রাহ্য হয় না। তৃতীয় গুণ লেখকের প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি। লেখকের উন্নতি ও কল্যাণই সমালোচকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। লেখকের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাও সমালোচকের কাজ। চতুর্থ গুণ সর্ব্বতোগামিনী বুদ্ধি এবং সর্ব্বপ্রকার ভাবের অনুভবক্ষম হৃদয়। পঞ্চম গুণ উদারতা। ষষ্ঠ গুণ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। এই সকল গুণ এক ব্যক্তিতে দুর্লভ হইলে একটি সমিতির দ্বারা প্রকৃত সমালোচনা হইতে পারে।

এই সমস্ত কথা যুক্তিসঙ্গত। ফরাসী সমালোচক সেন্ত বিউব এইরূপ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'বুদ্ধ সংবাদ' পালি হইতে সংকলিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ 'কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত কবিতা'র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'নূতন নীহারিকাবাদ' উল্লেখযোগ্য

অধ্যাপক সি বলেন সূর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া গ্রহাদির উৎপত্তি হয় নাই, সকলেই একটি বিশাল নীহারিকা স্তূপের অংশ মাত্র ; সূর্য্য এখনো জমাট বাঁধে নাই, অন্যান্য গ্রহ জমাট বাঁধিয়াছে এই মাত্র তফাত। উপগ্রহগুলিও কখনো মূল গ্রহের অঙ্গীভূত ছিল না। যে যাহার আকর্ষণের সীমার মধ্যে জমিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। ধূমকেতুও এই বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত নক্ষত্র হইতে উল্কাপিণ্ড পর্য্যন্ত সকল জ্যোতিষ্কই নিজ নিজ দেহ হইতে নিয়তই অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ত্যাগ করিতেছে। এই ধূলিকণাই নীহারিকার উৎপত্তি করে। সমগ্র আকাশ যে জ্যোতিষ্কধূলিতে আচ্ছন্ন তাহা আকাশের ফটোগ্রাফে স্পষ্ট দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে জ্যোতিষ্কের দেহ ক্ষয় হইয়া নীহারিকার উৎপত্তি করে এবং পুনরায় জমাট বাঁধিয়া নূতন জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করে। নীহারিকাগুলি ছায়াপথ হইতে দূরে অবস্থিত; ইহার কারণ বিকর্ষণশক্তির প্রভাবে তাড়িত হইয়া নক্ষত্রধূলি নীহারিকা রচনা করে, এবং ছায়াপথ নক্ষত্রবহুল আকাশ পথ ভিন্ন আর কিছুই নয়; সুতরাং নীহারিকা নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে দূরে থাকাই স্বাভাবিক। এই নীহারিকাগুলি যখন বহু গ্রহবেষ্টিত নক্ষত্রের মূর্ত্তি গ্রহণ করে তখন আবার ছায়াপথের নক্ষত্রদিগের টানে ছায়াপথের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। জ্যোতিষ্কদিগের দেহ হইতে ধূলিস্খলনই পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য-তারতম্যের কারণ। অনুজ্জ্বল বা অল্পোজ্জ্বল নক্ষত্র এই ধূলি সংঘর্ষে জ্বলিয়া উঠিয়া আমাদের নিকট নক্ষত্ররূপে পরিচিত হয়। অধ্যাপক সির মতে চন্দ্রের কলঙ্ক পাহাড়ের চিহ্ন নয়, কাদায় ঢিল পড়ার মতো চন্দ্রের কোমল শরীরে উল্কাপাতের চিহ্ন। ইনি গণিত দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে নেপচুনই সৌর-জগতের শেষ গ্রহ নয়, উহার পরেও একাধিক গ্রহ নিশ্চয় আছে। এইরূপ বহু বিবদমান তথ্য অধ্যাপক সির প্রচারিত নূতন মতবাদ দ্বারা অবিসংবাদীরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে যুগান্তর সংঘটিত করিয়াছেন।

বাণী (জ্যৈষ্ঠ)—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা 'আমরা', জাতীয় গর্ব্ব সাহস ও আশায় পরিপূর্ণ সুন্দর কবিতা। কবিতাটি দীর্ঘ ; তথাপি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম-

মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে,-
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক মালা,
ভালে কাঞ্চনশৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল ভরা যার কনক ধান্য বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।
বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।

আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।
জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি;
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে।
স্থপতি মোদের স্থাপনা ক'রেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যামরাজ্যেতে 'ওঙ্কার-ধাম, মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদেরি ভাস্কর
দিকপাল আর ধীমান, যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।
মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি', আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদের এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া;
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।
তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনের বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।
বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি সর্ব্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া অঙ্গে লাগায়ে দিবস রজনী কাটে;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।
মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভার তপে সে ঘটনা হ'বে লাগিবে না তার বেশী
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা সুদৃঢ় মাংসপেশী;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্ত বেণীর তীরে।

পুস্তক পরিচয়

ঝরাফুল—

শ্রীকরুণানিধান বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ৪৭ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩১৮ ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশ ৭৯+৮০ পৃষ্ঠা এণ্টীক্ কাগজে পরিষ্কার ছাপা; কাপড়ে বাঁধা মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপট। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতা পুস্তক, খাঁটি কবিতার বই। ইহা বাণীর চরণনির্ম্মাল্যের ঝরা ফুল। কবির কথা দিয়া ছবি আঁকিবার ক্ষমতা অসাধারণ। প্রকৃতিলক্ষ্মী তাঁহার ঘোমটা খসাইয়া কবিকে দেখা দিয়াছেন, আর কবিরও নিপুণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহার অনবদ্য রূপের "কানের পাশের ছোট্ট তিলটি" পর্য্যন্ত এড়াইয়া যায় নাই। প্রত্যেকটি কবিতা যেন আলো ঝলমল ময়ূরকণ্ঠী চেলীর মতো, ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া পাঠকের মনকে জড়াইয়া ধরে। কবিতাগুলির মধ্যে পল্লীদৃশ্যের এমন একটি সরস সুন্দর ছাপ আছে যে তাহাতে পাঠকের প্রাণমন মুগ্ধ হইয়া যায়। এই ছবিগুলি ছবি হিসাবে অনিন্দ্য, কিন্তু সেগুলি মানব-মনের বিচিত্র ভাবের সহিত জড়িত হইয়া একটি বিশেষ সার্থকতা লাভ করিবার সুযোগ কবির কাছ হইতে লাভ করে নাই। কবি শুধু ছবি আঁকিয়াই নিরস্ত না হইয়া তাহার এই অসাধারণ চিত্রণকুশলতার মধ্যে মানব-মনের সমাবেশ করিতে পারিলে তাহার কবিতা অতি উপাদেয় হইবে। কবি এখনো তরুণ, তাহার সাধনা জয়যুক্ত হইবে তাহার উজ্জ্বল আভাস ঝরা ফুলে আছে। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ছন্দের গতিস্খলন হইয়াছে, সেদিকেও একটু অবহিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সুন্দর ভূমিকায় কবির কবিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

পঞ্চপ্রদীপ

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক মজুমদার লাইব্রেরী। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশ ৮৪ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা। মূল্য দশ আনা। ১৯১০। এখানি ছোট গল্পের বই; ঋষি টলষ্টয়ের ছোট গল্পের ভাব লইয়া দেশী ধরণে লেখা। গল্পগুলি মানবমনের বিচিত্র ভাবে ভরা; রচনাও বেশ সাদাসিধে ধরণের। লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে এগুলি প্রধানত বালক বালিকাদের জন্য লিখিত। কিন্তু গল্পগুলির ভাষা ও ভাব কিছুই শিশুর উপযোগী নহে, শিশু অপেক্ষা শিশুর পিতামাতা ইহাদের রসসম্ভোগ করিবেন ভালো।

নির্ব্বাসন-কাহিনী—

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনিত্যরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, গিরিডি। মূল্য আট আনা। ১৩১৭। ইংরেজ সরকার শ্যেনপক্ষীর মতো ছোঁ মারিয়া যে নয়জন ভারতবাসীকে রাজদ্রোহিতার সন্দেহের বশে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, মনোরঞ্জন বাবু তাহাদের অন্যতম। তদুপরি তিনি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রেও সুপরিচিত। সুতরাং তাহার নির্ব্বাসন-কাহিনী আমরা এক নিশ্বাসে পড়িয়াছি। পড়িবার সময় খুব কৌতূহল বরাবর জাগ্রত ছিল, কিন্তু পড়িয়া বই বন্ধ করিয়া মনে হইল কিছুই পাইলাম না। একটা শুধু প্রাত্যহিক কাজের ফর্দ্দ আর রান্না খাওয়ার কথা ছাড়া

বড় বেশি কিছু নাই। তবু সেই সব কথাগুলিই কখনো করুণ কখনো হাস্য রসে অভিষিক্ত, লেখকের ভগবানে ভক্তি ও নির্ভরের ভাবে পূর্ণ। ইহার মধ্যে কিন্তু বিশেষ করিয়া কোনো বিশেষ কথা তিনি বলেন নাই, সব চুটকি, শুধু ছুঁইয়া যাওয়া। ইহাতে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু মিটে না। ইহা মোটের উপর এমন হইয়াছে যাহাকে প্রশংসাও করা যায় না, নিন্দাও করা যায় না। পুস্তকের মধ্যে একটি কথা আমাদের কেমন কেমন লাগিয়াছে;—লেখক বিশ্বে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন, অথচ সেই যে নিজের ঠাকুরটিকে প্রণাম করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার বেদনা তিনি কিছুতেই ভুলিতে ছিলেন না; যিনি গাছে, পাহাড়ে, নদীতে, বিড়ালের খেলায় ভগবানের প্রকাশ দেখিতে পান তাহার ঐরূপ ভাব কেন হইয়াছিল তাহা ঠিক্ বোঝা যায় না।

ভক্তের জয় (দ্বিতীয় উল্লাস)

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশ ২০৬ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য এক টাকা। ১৩১৭। ইহার প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে আমরা যে কথা বলিয়াছিলাম, এখানি সম্বন্ধে তদতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই। ভক্ত ভগবানকে বিচিত্র ভাবে উপলব্ধি করিয়া যে বিমলানন্দ লাভ করেন তাহার পরিচয় এই ভক্ত-চরিত্রগুলিতে পাওয়া যায়। ইহাতে উৎকল দাক্ষিণাত্যের এগারটি ভক্ত চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস কিন্তু উচ্ছ্বাস ফেনিল। কিন্তু লেখক প্রাণ দিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া সেই ত্রুটিও পাঠকের মনকে পীড়িত করিবার অবসর পায় না।

নিবেদন—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম, এ, প্রণীত। প্রকাশক মিলন কার্য্যালয় ২৫।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ষোড়শাংশ ১৭৬ পৃষ্ঠা। ১৩১৮। মূল্য একটাকা। এখানি কবিতাপুস্তক। ভূমিকায় প্রকাশক বলিয়া দিয়াছেন যে 'এই কবিতাগুলির ভাব সাধারণের নিকট একটু কঠিন মনে হইবে। কারণ সত্যকে অনুভব করিয়া সমগ্র ভাবে অথচ অল্পমাত্র বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এ শ্রেণীর চেষ্টা আমাদের ভাষায় এই প্রথম।' বাস্তবিক এইসকল কবিতার উদ্দেশ্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; প্রচলিত ষ্টাণ্ডার্ড অনুসারে এগুলিকে কবিতা বলিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়, অথচ একেবারে নূতন জিনিসকে পুরাতন নিরিখে মাপ করাও ত ঠিক নয়। তবে যদি ছন্দ, সরসতা, বৈচিত্র্য, কবিতার প্রাণ হয় তবে সেগুলি এ পুস্তকে নাই। তবে ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রকাশ করিবার খুব জাগ্রত চেষ্টা আছে; কোন কবিতাটি ভবানীপুরে যাইবার ট্রামপথে বা ২টা ৫৯ মিনিটের সময় রচিত ইত্যাদি কথা খুব সতর্কতার সহিত লেখা হইয়াছে। তদতিরিক্ত কোনো গুণ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।

আসাম গোয়ালপাড়া এবং আসামী ভাষা—

৬১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। লেখকের বক্তব্য যে গোয়ালপাড়া আসামের অন্তর্গত নহে, অতএব সেখানে আসামী ভাষা না চালাইয়া বাংলা ভাষা চালানো উচিত এবং আসামী ভাষাও কোনো স্বতন্ত্র ভাষা নহে, বাংলারই উপভাষা, সুতরাং আসামেও সাহিত্যের ভাষা বাংলা হওয়া উচিত।

মুদ্রারাক্ষস।

বিবিধ প্রসঙ্গ

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান" বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইটি প্রবন্ধের জন্য কোনও ব্রহ্মবাদিনী মহিলা কর্ত্তৃক দুটি স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইবে। একটির জন্য লেখক ও লেখিকাগণ উভয়েই প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিবেন। অপরটির জন্য কেবল লেখিকাদিগের প্রবন্ধ গৃহীত হইবে। প্রবন্ধসকল আগামী চৈত্র সংক্রান্তির মধ্যে প্রবাসী সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য। অন্যান্য নিয়ম ও জ্ঞাতব্য কথা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

আমাদের দেশের কোন শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই যথেষ্ট শিক্ষা-বিস্তার হয় নাই। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ত শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এইজন্য তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। ইহার জন্য বোম্বাই অঞ্চলে শ্রীযুক্ত বিঠলরাম শিন্দে কর্ত্তৃক রীতিমত চেষ্টা হইতেছে। তাহার বৃত্তান্ত প্রবাসীতে দেওয়া হইবে। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও এরূপ চেষ্টা নানা স্থানে হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার জন্য একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকা তাহার কেন্দ্র। নমঃশূদ্র, চামার, জোলা প্রভৃতিদের মধ্যে কার্য্য হইতেছে। বেরাস্ নামক একটি নমঃশূদ্রপ্রধান গ্রামে সমিতির একজন পরিচারক কাজ করিতেছেন। তথায় একটি উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়, দুইটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি নৈশ বিদ্যালয়, স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকাতে চর্ম্মকার ও সূত্রধরদিগের জন্য একটি ও মেথরদিগের জন্য একটি পাঠশালা, এবং শ্রমজীবীদিগের জন্য তিনটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে এবং নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিবার জন্য আরও পরিচারকের অভাবে সমিতির কার্য্য আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। বাবু রমেশচন্দ্র সেন চট্টগ্রামে মোক্তারী কাজ ছাড়িয়া উৎসাহের সহিত বঙ্গের নানাস্থানে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

যশোহর জেলার শেখহাটী হাতিয়াড়া গ্রামে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মব্রত পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষাবিস্তার কার্য্য করিতেছেন। বাঁকড়াতেও এইরূপ একটি নৈশ বিদ্যালয় আছে। তাহার ছাত্রসংখ্যা ৯৪ জন।

শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী লোক মাত্রেই জানেন, আজকাল অনেক ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কিরূপ কষ্ট পায়, এবং কখনও কখনও কলেজের অধ্যক্ষ বা কেরাণী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়। কেন এরূপ হইল তাহার আলোচনা অপেক্ষা প্রতীকারের চেষ্টা করাই ভাল। নূতন কয়েকটি কলেজ স্থাপিত হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা দুঃসাধ্য। তদপেক্ষা বর্ত্তমান কলেজগুলির আয়তন বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানশ্রেণীর যন্ত্রাদি সরঞ্জাম বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য; ইহাতে বর্ত্তমান কলেজগুলিতেই অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি হইতে পারে। অতএব এইজন্য অর্থদান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আলিগড় কলেজের বর্ত্তমান ও পুরাতন ছাত্রেরা যেমন সভা করিয়া দল বাঁধিয়া নানা স্থানে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেড়ান, বঙ্গের কলেজগুলির বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদেরও তাহা করা কর্ত্তব্য।

এখন কলেজগুলির বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। এখন যে যে সহরে কলেজ আছে, তথায়, বিশেষতঃ কলিকাতায়, অনেক দরিদ্র ছাত্র সাহায্যের চেষ্টায় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার

জন্য একটি সমিতি থাকা উচিত। সমিতি হইতে দরিদ্র ছাত্রদিগকে কেবল যে নগদ টাকাই দেওয়া হইবে তাহা নয়। তাহদিগকে গৃহ-শিক্ষকতা, কাগজ পেন্সিল সাবান পুস্তকাদি ফেরীর কাজ, টাইপরাইটিঙের কাজ, প্রভৃতি জুটাইয়া দিয়া স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টাও করা যাইতে পারে।

১২ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে দেখিলাম, গত ৩১শে মার্চ্চ যে তিন মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে পশ্চিম বাঙ্গলায় একভাষায় মোট ৬৯৩খানি, দ্বিভাষায় ১৩৭ খানি, ত্রিভাষায় ২খানি, সর্ব্বসমেত ৮৪৮ খানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে একভাষায় বাঙ্গলা ৩০০, ইংরাজী ১৯০, উড়িয়া ৯১, হিন্দী ৩৫, সংস্কৃত ৩২, ও উর্দ্দু ১৯ খানি। সাময়িক পত্র এক ভাষায় ৩০১, দ্বিভাষায় ২৩ এবং বহুভাষায় ১ খানি বাহির হইয়াছে। এক ভাষায় বাঙ্গলা সাময়িক পত্রের সংখ্যা ১৬৫, ইংরাজীর ১১৩। ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে প্রকাশিত বিবিধ বিষয়ক প্রধান প্রধান বাঙ্গলা সাময়িক পত্রগুলি কত ছাপা হইয়াছিল তাহা, ইংরাজী বর্ণানুক্রমে, কলিকাতা গেজেটে এইরূপ লেখা আছে:—অর্চ্চনা ৫০০, অর্ঘ্য ৫০০, আর্য্যাবর্ত্ত ৬০০, ভারতী ১৬০০, দেবালয় ১০০০, মানসী ৭৫০, মুকুল ১০০০, মৃণ্ময়ী ২০০, নব্যভারত ১৫০০ (মাঘ ফাল্গুন ১৬০০), প্রকৃতি ১০০০, প্রবাসী ৪০০০, সাহিত্য ১০০০, সাহিত্য সংহিতা ৫০০, শিল্প ও সাহিত্য ৫০০, সুপ্রভাত ৯০০, বামাবোধিনী পত্রিকা ৭৫০, বঙ্গদর্শন ৮০০, বাণী ১১০০, বীরভূমি ১০০০, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৩০০।

বর্ত্তমান বৎসরে প্রবাসী ৫০০০ করিয়া ছাপা হইতেছে।

মালদহনিবাসী শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের পরলোক যাত্রায় বঙ্গদেশ একজন ভক্তসেবক হারাইলেন। তিনি কোন কোন বিষয়ে মূল্যবান ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়াছিলেন। আরও ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার তাঁহার দ্বারা হইবে, এইরূপ আশা ছিল। নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধারেও তাঁহার উৎসাহ ছিল।

চিত্র পরিচয়

বলরামের দেহত্যাগ।

যদুবংশের ধ্বংশের পর বলরাম যোগ দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। বলরাম অনন্ত সর্পের অবতার; সহস্রফণ অনন্ত নাগ বলরামের দেহ ত্যাগ করিয়া দূরে প্রভাস ক্ষেত্রের শান্ত সমুদ্রে প্রস্থান করিতেছেন। এই ভাবটিই লইয়া শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এই চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ।

এই প্রাচীন চিত্রখানিতে লোকালয় হইতে দূরে প্রান্তরে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেছেন এবং গোপনারীগণ ও গোপাল মুগ্ধনেত্রে পরিপূর্ণ আনন্দে সেই অপরূপ প্রেমাস্পদ পুরুষকে দেখিতেছে ও বাঁশি শুনিতেছে, এই ভাবটি চিত্রিত হইয়াছে। গোপনারীদের মধ্যে কয়েকটির চিত্রে নীলাম্বরীর বেষ্টনে কমনীয় কান্তি বৈপরীত্যে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই চিত্রখানি পারিপ্রেক্ষিত ও ছায়া সুষমায় সুচিত্রিত। বিশ্বকেন্দ্রের মধ্যে হৃদয়পদ্মে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি নিত্য নিরন্তর বাজিতেছে; যে সে বাঁশি শুনিতে পায় সে গৃহসংসার ভুলিয়া সেই রসে তন্ময় হইয়া উঠে; সে বাঁশির স্বরে পশুপক্ষী বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত মুগ্ধ। সমস্ত বিশ্বযন্ত্রকে শৃঙ্খলায় মণ্ডল-কেন্দ্রে বিধৃত করিয়া যিনি চালিত করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজে একদিকে সকলের সহিত যোগযুক্ত, অপর দিকে তিনি নির্লিপ্ত। এই সঙ্কেতটিও চিত্র মধ্যে পরিস্ফুট দেখা যায়।

ভ্রমসংশোধন

গত সংখ্যার প্রবাসীতে লেখা হইয়াছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় এ বৎসর ৮ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু আমি গেজেটে দেখিলাম ৮ জনের পরিবর্ত্তে ১২ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন; ২জন Honourএ, ৩ জন Distinctionএ এবং ৭ জন Passএ। আরও আহ্লাদের বিষয়, একজন ছাত্রী Honoursএ ইংরাজী সাহিত্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক সংখ্যক ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর "নির্ব্বাণ" প্রবন্ধে ১৩৬ পৃষ্ঠায়, ২য় স্তম্ভে ১০ম ছত্রের প্রথমে "শাক্যসিংহ" এবং ১৬শ ছত্রের প্রথমে "তথাগত" না হইয়া "নাগসেন" হইবে। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নাবিক ও শ্রীরামচন্দ্র।

অহল্যা ও শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি অনুসারে।

Kuntaline Press, Calcutta.

Three Colour Blocks by U. Ray & Sons.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

১১শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩১৮

৫ম সংখ্যা

জীবন-স্মৃতি

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয় কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দুইটি ঠিক এক নহে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(একপঞ্চাশৎ জন্মদিনে গৃহীত ফটোগ্রাফ।)

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে আমাদের অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম জীবন-বৃত্তান্তের দুই চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রং পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রং তাহার নিজের ভাণ্ডারের—সে রং তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—সুতরাং পটের উপর যে ছাপ

পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে পথটাতে চলিতেছে বা যে পান্থশালায় বাস করিতেছে তখন সে পথ বা সে পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে,—তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তখনি তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে সকল সহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্ব্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সে দিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মনের মধ্যে যে ঔৎসুক্য জন্মিল তাহা কি কেবলমাত্র নিজের অতীত জীবনের প্রতি স্বাভাবিক মমত্বজনিত? অবশ্য, মমতা কিছু না থাকিয়া যায় না কিন্তু ছবি বলিয়াই ছবিরও একটা আকর্ষণ আছে। উত্তর-রাম-চরিতের প্রথম অঙ্কে সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ যে ছবিগুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সীতার জীবনের যোগ ছিল বলিয়াই যে তাহারা মনোহর তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

এমনি করিয়া, ছবি দেখিয়া প্রতিচ্ছবি আঁকার মত কিছুদিন জীবনের স্মৃতি লিখিয়া চলিয়াছিলাম। কিছু দূর পর্য্যন্ত লিখিতেই কাজের ভিড় আসিয়া পড়িল—লেখা বন্ধ হইয়া গেল।

এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্য্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভাল করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

এই স্মৃতি-চিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।

শিক্ষারম্ভ। আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গী দুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে সুরু হইল। কিন্তু সে কথা আমার মনেও নাই।

কেবল মনে পড়ে, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" তখন "কর, খল" প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি;—সেদিন পড়িতেছি, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না। তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

তাহার পরে যে কথাটা মনে পড়িতেছে, তাহা ইস্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য, ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর কোনো উপায় আমার হাতে ছিলনা। ইহার পূর্ব্বে কোনো দিন গাড়িও চড়ি নাই, বাড়ির বাহিরও হই নাই; তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণ-বৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিঁকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন:—"এখন

ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" সেই শিক্ষকের নাম ধাম আকৃতি প্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই—কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এত বড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।

কান্নার জোরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে অকালে ভর্ত্তি হইলাম। সেখানে কি শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি স্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণা-শক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।

এমনি করিয়া নিতান্ত শিশুবয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চ্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে; বাহির বাড়িতে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটাতে খেলিতেছি। মনে নাই সত্য কি কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য হঠাৎ "পুলিসম্যান" "পুলিসম্যান" করিয়া ডাকিতে লাগিল। পুলিসম্যানের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে অত্যন্ত মোটামুটি রকমের একটা ধারণা আমার ছিল। আমি জানিতাম একটা লোককে অপরাধী বলিয়া তাহাদের হাতে দিবামাত্রই, কুমীর যেমন খাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায় তেমনি করিয়া হতভাগাকে চাপিয়া ধরিয়া অতলস্পর্শ থানার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়াই পুলিশ কর্ম্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এরূপ নির্ম্মম শাসনবিধি হইতে নিরপরাধ বালকের পরিত্রাণ কোথায় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে অন্তঃপুরে দৌড় দিলাম; পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। মাকে গিয়া আমার আসন্ন বিপদের সংবাদ জানাইলাম; তাহাতে তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইলনা। কিন্তু আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না। দিদিমা আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্ব্বেল কাগজের কোণ-ছেঁড়া মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্লের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

ঘর ও বাহির। আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিলনা বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই ত তখনকার কালের বিশেষত্ব; তাহার পরে আবার বিশেষ ভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিলনা। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্ত্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্ অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো পরানো সাজানো গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের সৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্ব্বে কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে

একটা শাদা জামার উপরে আর একটা শাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনো দিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম, কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই পকেটে রাখিবার মত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছু মাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্দ্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটি জুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম। তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাহারা বড় তাহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহার বিহার, আরাম আমোদ, আলাপ আলোচনা সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল;— বড় হইলে কোনো এক সময়ে পাওয়া যাইবে এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্যও যাহা কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্য্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি তাহারা সহজেই সব জিনিষ পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জ্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।

বাহির বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড় একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম এই জন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট — দক্ষিণধারে নারিকেল-শ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মত দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহবা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহবা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহবা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ এক সময় ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহবা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহবা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহবা ব্যস্ত, কোনো মতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই; ধীরে সুস্থে স্নান করিয়া, জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছুবা ফুল তুলিয়া মৃদুমন্দ দোদুল গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া

যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায়, এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জ্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারি ধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কি রকম আচ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম

নিশিদিসি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট ?

কিন্তু হায় সে বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন দুর্দ্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্ব্বত্র যেমন খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন আমার গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ; মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড় হইয়া যে কবিতাটা লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে—"খাঁচার পাখী আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখী বলে, "বনের পাখী আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখী বলে—"না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখী বলে—"হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!"

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটু বড় হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূ সমাগম হইয়াছে, এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্ম্মে ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাতের কার্ণিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জ্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখীর সঙ্গে ঐ বনের পাখীর চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত! দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেল-শ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত সিঙ্গিরবাগান-পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে, যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়াল ঘর; আরো দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা সহরের নানা আকারের ও নানা

আয়তনের উচ্চ নীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্ব্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সকল অতি দূর বাড়ির ছাদে এক একটা চিলে কোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত তা'রা যেন নিশ্চল তর্জ্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সঙ্কেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজ-ভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমাণিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া "চাই, চুড়ী চাই, খেলোনা চাই" হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতালার ঘর বন্ধ থাকিত। খড়খড়ি খুলিয়া হাত গলাইয়া ছিটকিনি টানিয়া দরজা খুলিতাম এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল—সেইটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যাহ্ন কাটিত। একে ত অনেক দিনের বন্ধ করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তখন সবেমাত্র সহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদার্য্যে বাঙালি পাড়াতেও তাহার কার্পণ্য সুরু হয় নাই। সহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। একদিকে মুক্তি, আর একদিকে বন্ধনের আশঙ্কা এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলক-শর বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক বহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয় ত সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলি বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায় আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগা শিশু খেলার জিনিষ অপর্য্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশী বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সম্পত্তি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানা প্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই, মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তর কোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত। কলিকাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া এই ঢেঁকিশালাটি কোন্ এক-দিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম মানব আদমের স্বর্গোদ্যানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। কারণ, প্রথম মানবের স্বর্গলোক আবরণহীন—আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতে যে পর্য্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে সে পর্য্যন্ত মানুষের সাজ সজ্জার প্রয়োজন কেবলি বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল—সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে শরৎ কালের ভোর বেলায় ঘুম

ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশির-মাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পূবদিগের প্রাচীরের উপর নারিকেল পাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর অংশে আর একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্য্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয় কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত—তখন সহর এবং পল্লী অল্প বয়সের ভাই ভগিনীর মত অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত এখন দিদির সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কি বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটি নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কি একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্যও নহে, বিশ্রামের জন্যও নহে; সেটা বাড়ি-ঘরের বাহির, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই; তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই; এই জন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামত কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটু মাত্র রন্ধ্র দিয়া যে দিন কোনো মতে এইখানে আসিতে পারিতাম সে দিন ছুটির দিনকে বিশেষ ভাবে ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই. আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, "আজ সেখানে গিয়াছিলাম।" কিন্তু এক দিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত সেটা অত্যন্ত কাছে; এক তলায় বা দোতলায় কোনো একটা জায়গায়; কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠেনা। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে? সে বলিয়াছে, না,. এই বাড়ির মধ্যেই। আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই ত আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোথায়? রাজা যে কে সে কথা কোন দিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকু মাত্র আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুদ্ধের ধর্ম্মে ব্রহ্মের স্থান

বুদ্ধদেব যে একটা নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তাহা আমরা কয়েকটী প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি। এই নিত্য বস্তুটা কি প্রকার তাহা 'উদান' নামক গ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে ('বুদ্ধের ধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৬)। 'ইতি বুত্তক' নামক গ্রন্থও অতি প্রাচান এবং প্রামাণিক। ইহাতে এবিষয়ে এই প্রকার বলা হইয়াছে :-

"ভগবান (বুদ্ধ) এই প্রকারই বলিয়াছেন, অহত এই প্রকারই বলিয়াছেন—আমি এই প্রকারই শুনিয়াছি :—'হে ভিক্ষুগণ। এমন কিছু আছে যাহা অজাত, অভূত, অকৃত, এবং অ-যৌগিক (অত্থি ভিক্খবে অজাতম, অভূতম, অকতম, অসঙ্খতম)। হে ভিক্ষুগণ। যদি সেই অজাত, অভূত, অকৃত এবং অ-যৌগিক বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে এখানে জাত, ভূত, কৃত এবং যৌগিক বস্তুর মুক্তি জ্ঞানগোচর হইত না (নো চে তম্ ভিক্খবে অভবিসস অজাতম অভূতম্ অকতম্ অসঙ্খতম, ন য়িধ জাতসস ভূতসস কতসস সঙ্খতস্‌স নিস্‌সরণম্ পঞ্‌ঞায়েথ)। হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু অজাত, অভূত, অকৃত এবং অ-যৌগিক একটা বস্তু নিশ্চয়ই আছে তখন জাত, ভূত, কৃত, এবং যৌগিক বস্তুর মুক্তি জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। (যস্মা চ খো ভিক্খবে অত্থি অজাতম্, অভূতম্, অকতম, অসঙ্খতম, তস্মা জাতস্‌স, ভূতস্‌স, কতস্‌স, সঙ্খতসস, নিসসরণম পঞ্‌ঞায়েথা-তি)।'

"এতদর্থে ভগবান বলিয়াছেন, তিনি এবিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন—

'যাহা জাত, ভূত, সমুৎপন্ন, কৃত, যৌগিক, অধ্রুব, জরামরণসংযুক্ত, রোগনিলয়, ভঙ্গপ্রবণ এবং আহার-নেতৃপ্রভব*, তাহা অভিনন্দনের বিষয় নহে।

---

* বৌদ্ধশাস্ত্রে 'আহার' = খাদ্যদ্রব্য + স্পর্শ + চিন্তা + বিজ্ঞান। 'নেতা'

'জাতম্ ভূতম্ সমুপ্পন্নম্,
কতম্ সঙ্খতম্ অদ্ধুবম্,
জরামরণ-সংখতম্,
রোগনীলম্ পভঙ্গুণম্,
আহার-নেত্তি প্পভবম্,
নালম্ তদ্ অভিনন্দিতুম্।

'তাহার মুক্তিই 'শান্ত', তর্কাতীত, ধ্রুব, অজাত, অসমুৎপন্ন, অশোক এবং বিরজ পদ; ইহাই দুঃখ-ধর্ম্মের নিরোধ, সংস্কারের উপশম এবং সুখ।

• 'তসস নিসসরণম্ সন্তম্,
অতক্কাবচরম্ ধুবম্,
অজাতম্ অসমুপ্পন্নম্,
অশোকম্ বিরজম্ পদম্,
নিরোধো দুক্খধম্মানম্,
সঙ্খারূপসমে সুখো তি।

ভগবান এই প্রকারই বলিয়াছেন, আমি ইহাই শুনিয়াছি।"

'ইতিবুত্তকম্'—৪৩।

আমরা যাহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকি, বুদ্ধদেবের অজাত, অভূত, অকৃত, 'অসংখত' বস্তু এবং শান্ত, ধ্রুব, অশোক এবং বিরজ পদ কি ঠিক তাহাই নহে? যাঁহারা বুদ্ধদেবকে শূন্যবাদী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা কি সত্যের অবমাননা করিতেছেন না?

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

বাঙ্গলা ভাষার সংস্কার

সময়টা যখন আমাদের ইংরেজিনবিসদের হাতের উপর ভারি হইয়া ঝোলে (১), অর্থাৎ ভাষা কথায় যখন কোন কাজকর্ম্ম না থাকে, তখনই ইঁহারা কেহ কেহ বাঙ্গলা ভাষার একটু সখের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। অবসর বড় বালাই। অবসরের ছিদ্র পথেই যত শয়তান মানুষের ঘাড়ে চাপে। কাজ না থাকিলে উপযুক্ত ভাইপো খুড়ার গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করেন; এবং কাজ নাই বলিয়াই অনেক সখের সাহিত্যিক ভাষার সংস্কারক সাজিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কেহ বা বলিতেছেন বাঙ্গলা অক্ষরগুলির চেহারা বড় খারাপ; হয় উহাদিগকে রোমান্ ছাঁচে ঢাল, না হয় নাগরাই পেটা কর। কেহ বা বলিতেছেন যে অক্ষরের ঘাড়ে অক্ষর চড়িলে ছেলেখেলার মত দেখায়; উহারা গম্ভীর ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়া থাকুক্। কেহ বা বানান সংস্কার করিতে গিয়া অ-গুলির গাল টিপিয়া ও করিয়া দিতেছেন এবং বর্গীয় অনুনাসিককে আস্ত একটি বর্ণরূপে খাড়া করিতেছেন। ইহাতে ভাষা শিখিবার বা লিখিবার কোন প্রকার সাহায্য হইতেছে কি না, সে কথা ভাবিবার ইহাদের অবকাশ নাই। যে ধাতুর গুণে সংস্কারকেরা আপনার কথা ছাড়া পরের কথা বিচার করিতে পারেন না এবং যে পথে দেবতারাও যাইতে সাহস করেন না, সেই পথে অগ্রসর হয়েন, সে ধাতুর ইংরেজি নাম brass।

১। রাসিয়া বাদ দিলে বাদ বাকি ইউরোপটা যত খানি, আমাদের ভারতবর্ষটা প্রায় তত বড়। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কোন কোন সংস্কারক মনে করেন যে যদি আমরা সকলে মিলিয়া এক রকম অক্ষর লিখি, তবে হয় ভাষাগুলি এক হইয়া যাইবে, না হয় ত নিদান পক্ষে আমরা পরস্পরে পরস্পরের ভাষা শিখিয়া ফেলিব। বাঙ্গলা এবং আসাম দেশের অক্ষর একই রূপ, অথচ বাঙ্গালিরা আসামের ভাষা শিখিয়া ফেলে না কেন? ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, ইটালিতে এবং আরও অন্য অন্য দেশে একই রকমের অক্ষর প্রচলিত আছে বলিয়া কি ইংরেজেরা ফরাসি বা ইটালিয়ান শিখিয়া থাকে? দায়ে পড়িয়া না শিখিলে কিম্বা প্রাণের টানে না শিখিলে কেহই পরের ভাষা শিখিতে পারে না; তাই ইংলণ্ডে অল্পসংখ্যক কয়েকজন শিক্ষিত লোক ভিন্ন ফরাসিভাষাবিৎ লোক পাওয়া যায় না। ফরাসিদেশে অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া ইংরেজিজানা লোক বাহির করিতে হয়। অক্ষরের সাদৃশ্য ছাড়াও স্পেন পর্ত্তুগালের ভাষা ইটালিয়ানের বড় কাছাকাছি; তবুও ত উহারা পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করে না। যাহারা প্রত্নতত্ত্বের জন্য বা অধিক বিদ্যালাভের জন্য অন্য দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে যান,

---

শব্দ 'নেতৃ' শব্দের প্রথমার একবচন। ইহার মৌলিক অর্থ 'চালক'। নদী, স্রোত, বেগ ইত্যাদি গৌণ অর্থেও এই শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং যাহা 'আহার' রূপ স্রোত হইতে উৎপন্ন, তাহাকেই 'আহার-নেত্ত-প্রভব' বলা হয়। 'নেত্ত' শব্দকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করিলেও অর্থের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

(১) এইরূপ অপূর্ব্ব বাঙ্গলা লিখিয়া আমিও ভাষা-সংস্কারক হইতে ইচ্ছা করি।

অক্ষরের বাধা তাঁহাদের কাছে অতি তুচ্ছ। ভারতে যত শ্রেণীর অক্ষর প্রচলিত আছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সেগুলি চিনিয়া ফেলিতে পারেন। স্থইজারল্যাণ্ডে জার্ম্মান ভাষা চলে, ফরাসি ভাষা চলে, তবুও কিন্তু একতার বাধা নাই। মিলনের যাহা যথার্থ বাধা, আমরা তাহা দূর করিতে শিখি নাই; কেবল অবান্তর কথা লইয়া সময় নষ্ট করিতে শিখিয়াছি।

যাহারা অক্ষরের একতা সাধন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের ঐতিহাসিক বিদ্যা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। নাগরি নাকি আমাদের পূর্ব্বকালের অক্ষর ছিল এবং সংস্কৃত ভাষার নাকি ঐগুলি লিখিবার অক্ষর ছিল। এই সকল কথা কহিতে যাহারা লজ্জাবোধ করেন না, তাঁহাদের ধৃষ্টতা অসীম। একদিকে দীনেশচন্দ্র সেনের মত পণ্ডিতেরা বুদ্ধদেবকে বাঙ্গলা অক্ষর শিখাইয়া দিতেছেন, অন্যদিকে আবার অপূর্ব্ব ঐতিহাসিকেরা বাঙ্গলা অক্ষরকে নাগরির বাচ্চা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এই গেল এক শ্রেণীর সংস্কারকের কথা।

২। বর্ণপরিচয় করিয়া ফেলিতে পারিলেই যে একটি ভাষায় সকল শব্দ উচ্চারণ করা যাইতে পারিবে, একথা কোন তাজা ভাষার সম্বন্ধে কদাচ খাটিতে পারে না। যেমন অক্ষর, তেমনি বানান আর তেমনি উচ্চারণ, এ ত্র্যহস্পর্শগুণ ঘটাইয়া তোলা দুঃসাধ্য। সংস্কৃত নামে পরিচিত ভাষায় বর্ণগুলির বাঁধা উচ্চারণ দেখিতে পাই। এ-কার, উ-কারের হ্রস্ব উচ্চারণ নাই, কুত্রাপি accent নাই, এ অসাড়তা কোন কথা কহিবার ভাষায় থাকিতে পারে না। ছান্দস বা বেদের ভাষায় ঐগুলি ছিল না; accent যোগে এ-কার, উ-কারও অনেক স্থানে হ্রস্ব উচ্চারিত হইত। এবং ভাব অনুসারে কথায় accent পড়িত। আন্ধ্র এবং তামিল ভাষায় প্রাচীনকালের স্বর-বর্ণগুলি হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য অধিক হইয়া পড়িয়াছে। হ্রস্ব এ, হ্রস্ব ও উচ্চারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে ছান্দস ভাষাজাত প্রাকৃত ভাষাকে ঘসিয়া মাজিয়া সংস্কৃত নাম দেওয়া হইয়াছিল, সে প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃত উচ্চারণই ছিল। লোকের সাধারণ ব্যবহারের ভাষা ছিল না বলিয়া অর্ব্বাচীন যুগের সংস্কৃতে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কোন জীবন্ত ভাষায় চলিতে পারে না।

ঠিক্ উচ্চারণের মত করিয়া বানান করিব, একাজ কেবল দুরূহ তাই নয়। উহার ক্ষণস্থায়ী সুবিধা অল্প দিনেই ফুরাইয়া যায়। শব্দ যত ছোট হউক, যত সোজা হউক, সাধারণ উচ্চারণে সর্ব্বদাই উহার বিকৃতি হইতেই থাকিবে। এরূপ স্থলে যদি উচ্চারণের কোন একটা প্রাকৃতিক নিয়ম ধরিতে পারা যায়, তবে সেই নিয়মটি বলিয়া দিয়া শব্দ উচ্চারণের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শব্দতত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তখন আশা করিয়াছিলাম যে বিস্তৃতভাবে বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণের নিয়মগুলি কেহ লিখিয়া ফেলিবেন। প্রবাসী পত্রে যখন ঐ গ্রন্থখানির সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন ঐ বিষয়ে দুচারটি কথা লিখিয়াছিলাম। কত্র ও-কার দিয়া না লিখিলেও যখন প্রায় ও-কারান্ত করিয়া কল্ পড়ি, বিশেষ্য হইলে মত কথাটি হসন্ত করিয়া উচ্চারণ করি এবং সদৃশ অর্থে ব্যবহার করিলে অক্ষর দুইটিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রথম অক্ষরে অর্দ্ধ ও-কার এবং শেষ অক্ষরে পূর্ণ ও-কার যোগ করি, ভিক্ষা লিখিলেও ভিক্‌খে পড়ি, চলা লিখিলেও চ্লো পড়ি, তখন উচ্চারণের নিয়ম নির্দ্দেশ করাই প্রয়োজন। উচ্চারণের মত করিয়া বানান করিলে কিছু ফল হইবে না। আমাদের একালের যে উচ্চারণ ইংরেজি at শব্দে আছে, ঐ উচ্চারণটি বাঙ্গলা দেশের বিশেষ উচ্চারণ। উচ্চারণের নিয়ম নির্দ্দেশ না করিলে এক এবং একুশ শব্দের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর চাই। "কাল একটি কাল ছেলে বলিল--পাত পাত, ভাত খাইবে" এস্থলে একটি অক্ষরকে হসন্ত দিয়া এবং অন্য অক্ষরটিতে ও কার যোগ করিয়া না লিখিলেও এক বানান দেখিয়া শব্দ উচ্চারণ করিতে গোলে পড়িতে হয় না; এবং যে নিয়মে উচ্চারণ স্বতন্ত্র হইয়া যায়, তাহাও ধরিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে বাঙ্গলা বর্ণমালার উচ্চারণ সম্বন্ধে দুচারিটি কথা বলিতেছি---

অ --বাঙ্গলায় এই অক্ষরটির উচ্চারণ কতকটা ও ঘেঁসা। প্রাচীন পালিতে এবং মগধ দেশের প্রাকৃতে অনেকস্থলে ঠিক্ এইরূপ উচ্চারণ ছিল। আমরাই কেবল এখন সেই

উচ্চারণের উত্তরাধিকারী আছি। সংস্কৃত ভাষা পড়িবার সময়ে উহাকে যে ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়, সে উচ্চারণ আ স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ মাত্র। মহারাষ্ট্রে এবং দ্রাবিড় ভাষায় যে ভাবে উচ্চারিত হয়, তাহাতে উহাকে আমাদের আ বলিলেই চলে। কেননা আমাদের আ দীর্ঘ না হইয়া বরং হ্রস্ব উচ্চারিত হইয়া থাকে। বৈদিক বা ছান্দস ভাষায় অনেকস্থলে অ-কারটির কিঞ্চিৎ ও-ঘেঁসা উচ্চারণ হইত; এবং সেই ঐতিহ্যেই পালিতে উহার উচ্চারণ সংক্রমিত হইয়াছে। বৈদিক প্রাতিশাখ্যে (অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য, ১৩৬; বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্য ১.৭২) এবং পাণিনির শেষ সূত্রে অ-কারের ঐরূপ উচ্চারণের কথা আছে। উহার নাম "সংবৃত" বা চাপা উচ্চারণ।

আমরা দেখিতে পাই যে যেগুলি খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ অথবা যেগুলি বহুকাল থেকে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত, সে সকল শব্দে অ কারের সর্ব্বত্রই সংবৃত উচ্চারণ। সংস্কৃত কথা হইলেও লক্ষ্য, কল্য, অতি, গণ্য, হন্ত প্রভৃতি শব্দে সংবৃত বা বাঙ্গলা অ উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু যেখানে কথাগুলি খাঁটি সংস্কৃত, কেবল কদাচিৎ মানুষের নামকরণে বা অন্যরকম পোষাকি ব্যবহারে কথাগুলি ব্যবহার করি, সেখানে পূর্ণ অ কার উচ্চারণ করি, যথা--কমল, অক্ষয়, অপূর্ব্ব প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন যে র-ফলা বিশিষ্ট বর্ণের সহিত "অ" লিপ্ত থাকিলে তাহা "ও" হইয়া যায়। যথা-বজ, নম, প্রতাপ ইত্যাদি। কিন্তু "য" পরে থাকিলে হয় না। যথা—ক্রয়, ত্রয় ইত্যাদি। পাঠকেরা দেখিতে পাইতেছেন যে এখানেও আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মই খাটিতেছে; নূতন সূত্রের প্রয়োজন হইতেছে না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যতিক্রম সূত্রটিও গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তগুলি আমার সাধারণ সূত্রের মধ্যেই পড়িতেছে। কোন ব্যতিক্রম সূত্র না করিয়াই বুঝিতে পারি যে অকিঞ্চন, অকুতোভয়, অখ্যাতি, অনৃত প্রভৃতির অ-কার বাঙ্গলার মত উচ্চারিত হইবে না।

অনেকগুলি শব্দ আছে যেগুলি বিশেষ্য হইলে হসন্ত উচ্চারিত হয়, কিন্তু ক্রিয়াপদ বা বিশেষণ হইলে স্বরান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং কাজেই বাঙ্গলা অকারের উচ্চারণ প্রবল হইয়া উঠে। প্রায়শঃই এইগুলি দুই অক্ষরের শব্দ। যেমন বল (শক্তি) এবং বল (কথা কও), মত (অভিপ্রায়) এবং মত (সদৃশ)। দুই অক্ষরের নিম্নলিখিত বিশেষণ শব্দগুলিতে অক্ষর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয়। যথা---ভাল, কাল ইত্যাদি। আলো শব্দটি লএ ও-কার দিয়া লিখিত হয় বলিয়া কেহ কেহ ভাল, কালতেও ও-কার দিতে চান। আলো কথাটি আলোক শব্দ হইতে। কাজেই উহাতে ও কার আছে। কিন্তু অন্যগুলিতে ও-কার না দিলেও বাঙ্গলা নিয়মে ও-কার যোগ করিবার মত উচ্চারণ করিতে হইবে।

আ -অ-কার উচ্চারণ যে যে স্থলে এ-কার এবং যে যে স্থলে ও-কার হইয়া আসে, রবীন্দ্র বাবু শব্দতত্ত্বে তাহার সুন্দর দুইটি নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা লিখি পিঠা, চিঁড়া, কন্যা, ভিক্ষা; কিন্তু উচ্চারণ করি পিঠে, চিঁড়ে, কন্যে এবং ভিক্ষে। এবং লিখি কুলা, চুলা, চুমা, মুঠা; কিন্তু উচ্চারণ করি কুলো, চুলো, চুমো ও মুঠো। এরূপ স্থলে নিয়মটি ধরাই উচিত। উচ্চারণের মতন করিয়া বানান পরিবর্ত্তন করা উচিত নয়।

বাঙ্গলার যুক্ত অক্ষরগুলি যদি কৈবল্যলাভ করিয়া মুক্ত হয়, হউক। কিন্তু কি প্রয়োজনে উহাদিগকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, একবার জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এখনও যুক্ত অক্ষরগুলি তাহাদের প্রাচীনরূপে একটা ইতিহাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লিখিতে পড়িতে কেহ কোন ক্লেশ অনুভব করিতেছে না। তবে কি জন্য উহারা সঙ্গহীনতা সুখ অনুভব করিবে? কেহ বলিতে পারেন যে, ছাপাখানায় কোন অসুবিধা ঘটে নাই বটে, কিন্তু যখন বাঙ্গলার জন্য টাইপ লেখা কলের সৃষ্টি হইবে, তখন এই জটিল বানান রাখিলে কলগড়ার সুবিধা হইবে না। কল-গড়ার যখন দরকার জন্মিবে, তখন যে কলটি গড়িবে, সে ব্যবসায়ীদিগের জন্য নূতন চেহারার অক্ষর সৃষ্টি করিতে পারে। প্রয়োজনের তাড়ায় অনেক পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন হয়। তখন যদি দ্রুত লিখিবার নিয়মের অনুরূপ বানান গ্রহণ করিবার পক্ষে দশজনের প্রয়োজন হয়, তবে ধীরে ধীরে অক্ষরের চেহারা বদলাইয়া যাইবেই। ইচ্ছা

করি যে এমন দিন আসুক, যখন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বহুপরিমাণে বাঙ্গলা ভাষায় অনেক কথা লিখিতে হইবে। সে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কাহাকেও কোন প্রস্তাব করিতে হইবে না। আপনা আপনি সুবিধার খাতিরে অক্ষরগুলির চেহারা বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। ব্যবসা বাণিজ্যে যাহা চলিবে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বাড়িলে তাহা আপনিই আদৃত হইবে। তখন কল গড়িবার সময় দেখিয়া লইবে যে, উ কার ঋ-কার প্রভৃতিও অক্ষরের নীচে না দিয়া পাশে দিলে অধিক সুবিধা হইবে কি না? আমরা যখন কল গড়িতেছিনা, তখন একটা বৃথা নূতনত্ব খাড়া করিয়া ফল কি? যাহারা নূতনত্বের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহারা কোন কথা না বলিয়া যদি টাইপ লিখিবার কল সৃষ্টি করিয়া ফেলেন এবং সেই কলে যে অক্ষরের যে চেহারা দিলে লিখিবার সুবিধা হয় এবং খরচ সস্তা পড়ে, অক্ষরগুলির সেই চেহারা দিয়া দেন, তাহা হইলে যাহাদের কল কিনিয়া লিখিবার প্রয়োজন, তাহারা নিশ্চয়ই সে কল কিনিবে এবং নূতন চেহারার অক্ষরে কথা লিখিবে। পরিবর্ত্তনের যে সময়ে প্রয়োজন নাই, তখন অযথা কথা লইয়া সময়ক্ষেপ করিবার কিছু সুবিধা দেখিতে পাইতেছি না। মিছাই একটা নূতন কিছু কর বলিয়া সংস্কারক সাজিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দধি

খেজুর-রস মধু দুগ্ধ প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসকে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলে, এগুলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিকৃত হইয়া পড়ে। একটু পরীক্ষা করিলেই দেখা যায়, এক প্রকার বাষ্প উঠিয়া জিনিসগুলিকে ফেনাসক্ত করিয়া ফেলিতেছে। খেজুর-রস এইপ্রকারে বিকৃত হইলে এত ফেনিল হইয়া পড়ে যে, তখন ভাণ্ডে তাহার স্থান সংকুলান হয় না। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্ত্তনে জিনিসের স্বাদ বর্ণ গন্ধ সকলই পৃথক হইয়া দাঁড়ায়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে এই প্রকারে উহাদের একটা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। চলিত কথায় আমরা এই পরিবর্ত্তনকে "গাঁজিয়ে যাওয়া" বলি। ইংরাজিতে উহাকে Fermentation বলে। খাটি সংস্কৃতে, ব্যাপারটাকে কিরূপ বলা যাইতে পারে। যে বাষ্প উঠিয়া জিনিসগুলাকে ফেনাইয়া তোলে, তাহার পরিচয় গ্রহণ করা হইয়াছে। বাষ্পটা অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic acid gas) ব্যতীত আর কিছুই নয়।

টাটকা খেজুরের রস, খাটি দুধ প্রভৃতি কিছুক্ষণ অনাবৃত রাখিবার পরই তাহাদের এই প্রকার বিকার দেখিলে বাহিরের কোন জিনিসের যোগেই এই পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত ব্যাপারটাও তাই বটে। বায়ুশূন্য পরিষ্কার পাত্রে রাখিলে উহাদের কোন বিকারই দেখা যাইবে না। জর্ম্মানির গো-শালাগুলির ঘন দুধ, ইংলণ্ডের মাছ, এবং আমেরিকার বড় বড় বাগানগুলির ফলমূল এই পদ্ধতিতেই টিনে আবদ্ধ হইয়া আমাদের বাজারে উপস্থিত হইতেছে। এবং এইরূপ বায়ুশূন্য কৌটায় ফলরক্ষণ আমাদের দেশেও আরম্ভ হইয়াছে।

যাহা হউক যে জিনিস বাতাসের সহিত ভাসিয়া আসিয়া খেজুর-রস ইত্যাদি বিকৃত করে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহা লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ইহাতে জানা গিয়াছে বাতাসে সর্ব্বদাই নানা জাতীয় জীবাণু ভাসিয়া বেড়াইতেছে। জীবাণুর নাম শুনিলেই ব্যাধির জীবাণুর কথা মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু এপর্য্যন্ত যতগুলি এই শ্রেণীর জীবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাধি-উৎপাদক জীবাণুর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহকে পচাইয়া ফেলা, চিনি হইতে মদ উৎপন্ন করা, উদ্ভিদের মূলে বায়ুর নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া রাখা, এমন কি চুরুটের তামাকে সুগন্ধ উৎপন্ন করা এবং রঞ্জন কার্য্যে রঙকে ফলাইয়া তোলা প্রভৃতি অনেক ব্যাপার কেবল জীবাণু দ্বারাই সম্পন্ন হয় বলিয়া স্থির হইয়াছে। কেবল স্থির করিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ ক্ষান্ত হন নাই। হাজার হাজার পৃথক জাতীয় জীবাণুর মধ্যে আবশ্যক মত এক এক জাতিকে চিনিয়া এবং বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যবসায়ের জন্য আমরা রেশমের কীট ও লাক্ষার কীট পালন করিয়া

থাকি। আজকাল ব্যবসায়ের জন্য ঐ সকল জীবাণুকেও পালন করা হইতেছে। যে জীবাণু মদ্য উৎপন্ন করে বা উদ্ভিদের খাদ্য যোগায়, পালন করিয়া তাহাদিগকে মদ্য প্রস্তুতের কারখানায় বা শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে আজকাল অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইতেছে।

দধি জিনিসটাও জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন। এক শ্রেণীর বিশেষ জীবাণু দুগ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন প্রকার রস নির্গত করিতে থাকিলে তাহা দ্বারা রাসায়নিক কার্য্য সুরু হয়। ইহাই দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে। দধির সুগন্ধ, অম্লস্বাদ সকলই সেই দধি-জীবাণুর কাজ। মাখনের সুগন্ধ এবং বিলাতি চিজের সেই গন্ধটারও মূলে জীবাণুর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ জীবাণু দুগ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহারাই মাখন ও চিজ উৎপন্ন করে। আজকাল বিলাতি গোয়ালারা দধি, মাখন বা চিজ উৎপাদক জীবাণুগুলিকে চিনিয়া লইয়া পৃথক স্থানে তাহাদের পালন করিতেছে, এবং আবশ্যকমত তাহাদিগকেই দুগ্ধে ফেলিয়া দিয়া উৎকৃষ্ট দধি মাখন ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। আমাদের গো-শালাগুলিতে সেই "সাঁজা" দিয়া দধি প্রস্তুতের প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। "সাঁজা" দেওয়া এবং দুগ্ধে জীবাণু সংযোগ করা একই কাজ বটে, কিন্তু আমরা যাহাকে "সাঁজা" বলি তাহাতে দধির উৎপাদক খাটি জীবাণু ছাড়া আরো অনেক জীবাণু থাকিয়া যায়। কাজেই সকল সময় সাঁজায় খুব ভাল দধি হয় না। দধি-উৎপাদক জীবাণু যেমন কাজ করিতে থাকে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অপর অনাবশ্যক জীবাণু সাঁজার সহিত দুগ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিকৃত করিতে আরম্ভ করে। ফলে দধিটা একটা অদ্ভুত জিনিস হইয়া পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় দধি বসিল না বা সেটা লালার ন্যায় একটা আটালো জিনিস এবং দুর্গন্ধময় হইয়া পড়িল। এই সকল সেই অনাবশ্যক জীবাণুরই কীর্ত্তি।

জীবাণু কেবল ব্যাধি উৎপাদন, এবং বাহিরের জিনিসকে ভাল মন্দে পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষান্ত হয় না। সুস্থ এবং সবল প্রাণীর দেহের ভিতরেও ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কার্য্য দেখায়। মানবদেহের নবদ্বারের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি দ্বার ইহাদের প্রবেশের জন্য অবারিত রহিয়াছে। আমরা খাদ্যের সহিত অনেক জীবাণু উদরস্থ করিয়া ফেলি। কিন্তু এগুলি যদি ব্যাধি-জীবাণু না হয় তবে, তাহারা আমাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। আমাদের জঠর হইতে যে পাক-রস (Gastric Juice) নির্গত হয়, তাহার জীবাণু নাশের শক্তি আছে। কাজেই উদরস্থ হইলে পর সেই রসের সংযোগে তাহারা মরিয়া যায়। কিন্তু অন্য পথে আমাদের অন্ত্রে (Intestine) যে সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে অন্ত্র রস (Pancreatic Juice) তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারে না। বরং ঐ রসের সহিত একটু ক্ষার যুক্ত থাকায় তাহা অন্ত্রস্থ পদার্থগুলিকে জীবাণুর বংশ বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র করিয়া তোলে। ইহার ফলে অন্ত্রস্থ অর্দ্ধপক্ব ভুক্ত জিনিসগুলাকে ঐ জীবাণুগুলি খুব পচাইয়া তুলিতে থাকে। পচানই যে সকল জীবাণুর কাজ তাহারা সংসারের অশেষ উপকার করে সত্য, কিন্তু এই পচানোর কাজটা আমাদের দেহের মধ্যে চলিতে থাকিলে ফল শুভ হয় না। জীবাণু সকল নিজের দেহ হইতে যে রস নির্গত করে, তাহা রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলেই নানা পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

মানবদেহে এই সকল জীবাণুর কাজ লইয়া আধুনিক শরীরবিদ্‌গণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে জানা গিয়াছে বয়স যতই অধিক হয় মানুষের অন্ত্রে অনিষ্টকর জীবাণুর সংখ্যা ততই বাড়িয়া চলে। সুস্থ শিশুদের অন্ত্রে সেই পচানো জীবাণু একপ্রকার দেখাই যায় না। পরীক্ষায় কেবল কতকগুলি দধি-জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। তা'রপর শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে ঐ দধি-জীবাণুগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া পচানো-জীবাণু ক্রমে অন্ত্র অধিকার করিয়া বসে।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক মেচ্‌নিকফ (Metchnikoff) আজকাল জীবাণু সম্বন্ধে নানা গবেষণা দ্বারা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি মানবদেহের প্রধান শত্রু জরার মূলকারণ খুঁজিতে গিয়া তাহাতে জীবাণুর কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি বলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দেহের পাকনালীতে যে-সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদেরই দেহনির্গত

বিষ রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলে জরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্যাধির মূল কারণ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলে তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন প্রায়ই সুসাধ্য হইয়া পড়ে। মেচ্‌নিকফ সাহেব জরা উৎপত্তির ঐ একটি কারণ জানিতে পারিয়া তাহার নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি দেখিয়াছিলেন অম্লযুক্ত পদার্থে ঐ অনিষ্টকর জীবাণুগুলি মোটেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। শিশুর অন্ত্রে দধি-উৎপাদক (Lactic acid) জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে বলিয়াই শিশুগণ ঐ অনিষ্টকর জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। যে উপায়ে স্বয়ং প্রকৃতি শিশুদেহ হইতে অনিষ্টকর জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করেন, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীরের ভিতরকার জীবাণুগুলি ঠিক সেই প্রকার অম্ল সংযোগে ধ্বংস করিবার জন্য মেচ্‌নিকফ কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। খাদ্যের সহিত কিঞ্চিৎ ল্যাকটিক এসিড অর্থাৎ দধির অম্ল উদরস্থ করিবার কথা সর্ব্ব প্রথমে ইঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষায় শুভ ফল পাওয়া যায় নাই। পাকযন্ত্রে উপস্থিত হইবামাত্র এসিড্‌কে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছিল। কাজেই যখন অন্ত্রে গিয়া পৌঁছিয়াছিল তখন তাহা দ্বারা জীবাণুর বিনাশ হয় নাই। এই কারণে যাহাতে অন্ত্রেই কোন প্রকারে দধির অম্ল উৎপন্ন হইতে পারে তাহার কোন এক ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মেচ্‌নিকফ মনে করিয়াছিলেন, যদি কোনক্রমে দেহের পাকাশয়ে দধির অম্ল উৎপাদক জীবাণুর (Lactic acid bacteria) স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করা যাইতে পারে তবে সকল গোলযোগেরই অবসান হয়; তখন ঐ জীবাণুগুলিই দধির অম্ল প্রস্তুত করিয়া অনিষ্টকর জীবাণুগুলিকে নিশ্চয়ই নষ্ট করিতে থাকিবে।

ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ উৎপাদক সাধারণ জীবাণুগুলি ৮৫ ডিগ্রির অধিক উত্তাপে ভাল জন্মায় না। আমাদের পাক-নালীর উষ্ণতা প্রায় ৯৯ ডিগ্রি। কাজেই পাকনালীতে ল্যাক্‌টিক এসিড জীবাণুর উপনিবেশ স্থাপন করার কল্পনা মেচ্‌নিকফ্‌কে একপ্রকার ত্যাগই করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি একেবারে হতাশ হন নাই। দুগ্ধ দ্বারা যত প্রকার অম্লস্বাদযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে তিনি নানা দেশ হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহু পরীক্ষার পর রুসিয়ার বুলগেরিয়া অঞ্চলের একপ্রকার দধিতে (Yoghurt) বাঞ্ছিত জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এই জীবাণুগুলিও দধির অম্ল অর্থাৎ ল্যাকটিক এসিডের উৎপাদক, কিন্তু এই শ্রেণীর সাধারণ জীবাণু হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক। আমাদের পাকযন্ত্রের উত্তাপকে সহ্য করিয়া এগুলি বেশ বৃদ্ধি পাইতে পারে। মেচ্‌নিকফ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বুলগেরিয়ার এক শ্রেণীর লোক এই দধি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ।

ইহার পর আমাদের দেশের দধি এবং ইজিপ্টের লেবেন (Leben) লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। উভয়েই তিনি তাপসহিষ্ণু জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। আমাদের দধির জীবাণু ৯৯ ডিগ্রির অধিক উষ্ণতা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু বুলগেরিয়ার দধির জীবাণুগুলিকে প্রায় ১২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উষ্ণতায় জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। শিশুর অন্ত্রে যে সকল স্বাস্থ্যকর জীবাণু দেখা যায় সেগুলি এই জাতিরই অন্তর্গত।

যাহা হউক এই আবিষ্কারের পর হইতে দধি ভক্ষণ ব্যাপারটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। য়ুরোপের বড় বড় সহরে দধির কারখানা খোলা হইয়াছে; শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেই ইহার হিতকারিতার কথা শুনিয়া আজকাল দধিকে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যের মধ্যে ধরিতেছেন। দধি যে মানুষকে দীর্ঘায়ু এবং বলিষ্ঠ করে, একথা সকলে আজও নিঃসন্দেহে স্বীকার না করিলেও, ইহা যে পাকযন্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক পীড়ার একটি মহৌষধ তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। বয়স অধিক হইলে অনেক সময় অকারণে মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই ব্যাধির প্রতিকারে দধির অত্যাশ্চর্য্য শক্তি দেখা গিয়াছে। তা'ছাড়া রক্তহীনতা, পেটফাঁপা, অবসন্নভাব, মাথাধরা ইত্যাদি ছোট বড় নানা প্রকার পীড়ায় ইহা খুবই উপকার করে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত প্রায় সকল ব্যাধিই পাকনালীর সেই অনিষ্টকর জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন। সুতরাং দধির স্বাস্থ্যকর জীবাণুই যে দেহ-শত্রুগণকে ধ্বংস করিয়া মানুষকে

নিরুপদ্রব করে তাহাতে বোধ হয় আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। দধির অপর কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক ইহার যে এক অদ্ভুত পাচকশক্তি আছে কেবল তাহার জন্যই জিনিসটা সর্ব্বজাতির প্রধান খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্যবৰ্দ্ধক বলিয়াই হাটে বাজারে দধি নামক যে এক অতি তরল্ পদার্থ বহু ব্যয়ে ক্রয় করা যায় তাহা ব্যবহার করিবার জন্য পাঠককে কেহই পরামর্শ দিবে না। খাঁটি দধি-জীবাণু দ্বারা প্রস্তুত দধিই স্বাস্থ্যপ্রদ। স্বাদে গন্ধে বর্ণে যে দধি নিকৃষ্ট তাহা স্বাস্থ্যহানিকর জীবাণুরই আবাসভূমি একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কাজেই ইহার ব্যবহারে স্বাস্থ্যের হানি হইবারই কথা। বাড়িতে যাহারা ভাল দধি পাতিতে পারেন এ প্রকার গৃহিণী আমাদের পাড়াগাঁয়ে ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দধিব্যবসায়িগণ নিরক্ষর বটে কিন্তু ইহাদেরই মধ্যে অনেকে দীর্ঘকালের পুরুষপরম্পরাগত অভিজ্ঞতার ফলে অনিষ্টকর জীবাণু তাড়াইয়া তাহাদের "সাঁজা"গুলিকে এমন সুন্দর করিয়া প্রস্তুত করে যে, ইহাদের হাতের দধি কখনই খারাপ হইতে দেখা যায় না। খাঁটি দধি-জীবাণু দিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দই পাতা আমাদের দেশেও আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা বারান্তরে দেশবিদেশের প্রচলিত দধি-প্রস্তুত-পদ্ধতির আলোচনা করিব। শ্রীজগদানন্দ রায়।

প্রাচীন ভারত

পুরাকালে ভারতভূমি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎকালে "সাগর মধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য" ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজন্যমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বক্ষণ ঈর্ষা দ্বেষ প্রজ্বলিত থাকিত। এক রাজা অন্য রাজ্যের ধ্বংসসাধন জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিল।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ কেবল দুইবার একতাবদ্ধ হইয়াছিল; প্রথম, মহারাজ অশোকের সময়; দ্বিতীয়, মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সময়। মহারাজ অশোকের পরাক্রম অপরিসীম ছিল। তিনি সুবিশাল আর্য্যাবর্ত্তের চক্রবর্ত্তী রাজারূপে সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন। তক্ষশিলা হইতে কামরূপ এবং কাশ্মীর ও হিমাচল হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতীয় রাজন্যকুলে মহারাজ অশোকের পরেই মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত দ্রাবিড়জাতি অধ্যুষিত দেশ হইতে অনুগাঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে স্বীয় বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন।

হিউএনথসঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, আমরা তাহা বর্ণনা করিতেছি। সে সময় হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নর্ম্মদাবিধৌত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত ছিল। এই সকলের কোন কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন দেখিতে পাওয়া যাইত। তৎসমুদয়ে এক এক বংশের লোকসমূহ মিলিত হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বৈশালী রাজ্যে লিচ্ছবি বংশীয়গণ সম্মিলিতভাবে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঈদৃশ শাসনপ্রণালী বিশিষ্ট আর কতিপয় রাজ্যের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কুশীনগর রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে মল্লগণ দেশ শাসন করিতেন। তৎকালে যে-সকল রাজতন্ত্র-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে তিনটি সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই তিনটি রাজ্যের নাম মগধ, কোশল এবং কৌশাম্বী। রাজগৃহে মগধ রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই স্থানে রাজা বিম্বিসার রাজত্ব করিতেন। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র অজাতশত্রু রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। কোশলরাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল শ্রাবস্তী। সেখানে প্রসেনজিৎ নামক গুণবান রাজা রাজত্ব করিতেন। বুদ্ধদেবের জীবনের শেষভাগে প্রসেনজিতের পুত্র বিরুঢক শ্রাবস্তীর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কৌশাম্বীরাজ্যের অধিপতির নাম ছিল উদয়ন।

এই সময় পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের কিয়দংশ পরাধীন ছিল। আমরা হিরোডোটাসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী অংশে পারস্যাধিপতির প্রতিনিধি শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৫৫৭ অব্দে আবির্ভূত হইয়া ৪৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এইকালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা লিখিত হইল। পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিতে হইলে গ্রীকবীর আলেকজণ্ডারের অভিযানবৃত্তান্ত অবলম্বন করা আবশ্যক। আলেকজণ্ডার শতদ্রুর তীরে উপস্থিত হইলেই তাঁহার অগ্রগতি শেষ হইয়াছিল, তিনি সিন্ধুনদের পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই কারণ তদীয় অভিযানবৃত্তান্ত হইতে কেবল পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশের রাজনৈতিক অবস্থাই অবগত হওয়া যায়। আমরা তৎসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাবীর আলেকজণ্ডার ৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দের বসন্তকাল হইতে ৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সার্দ্ধ দুই বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিদৃষ্ট প্রদেশ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) সিন্ধুনদের পশ্চিমকূলবর্ত্তী রাজ্যসমূহ; (২) সিন্ধু এবং শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী রাজ্যসমূহ; (৩) আলেকজণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তন-পথের দুই পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ।

আলেকজণ্ডার সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষভুক্ত যে সকল ক্ষুদ্র জনপদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের নাম যথাক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে। অস্তি (হস্তীশ) রাজার রাজ্য, পুষ্কলাবতী (পেশওয়ারের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান চারসদা নামক স্থান), আস-পাস সয়ান এবং গৌরিয়ান জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত রাজ্যদ্বয় (বর্ত্তমান চিত্রল, গিলগিট প্রভৃতি স্থান), অশ্বকানী জাতির রাজধানী মাসগানগর (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সোয়াত নদীর তীরবর্ত্তী মনগ্লৌর নামক স্থান), অনদকনগর, অরিগেইয়ন নগর, বাজিরা (বাজোর), অভিসার রাজ্য (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান হাজরা জেলা) এবং নিশা রাজ্য (বর্ত্তমান জালালাবাদ জেলার নিকটবর্ত্তী স্থান)।

আলেকজণ্ডার নিশারাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশিলা রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার পরেই বিতস্তার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মহারাজ পুরুর রাজ্য (বর্ত্তমান ঝিলাম, গুজরাট এবং সাপুর জেলা) উল্লিখিত হইয়াছে। এই রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের বিষয় আমরা জানিতে পারি। এই রাজ্যে গ্লউসাই নামক জাতির বাস ছিল। আলেকজণ্ডার গ্লউসাই জাতিকে পরাভূত করিয়া চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর মধ্যস্থলে মহারাজ পুরুর ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আলেকজণ্ডার ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া অদর ইসতাই জাতির রাজধানী পিমপ্রমা নগরী অধিকার করিয়াছিলেন। পিমপ্রমার নিকটবর্ত্তী স্থানে (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান গুরুদাসপুর জেলায়) কাথাই নামক পরাক্রান্ত জাতির রাজ্য স্থাপিত ছিল। আলেকজণ্ডার কাথাই জাতিকে বিধ্বস্ত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া শতদ্রুর তীরে উপনীত হন।

আলেকজণ্ডার শতদ্রুর তীর হইতে সিন্ধুনদের পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকালে কতিপয় রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তৎসমুদয়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। লবণপর্ব্বত রাজ্য (তৎকালে সৌভূত এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন), শিবি জনপদ, মালই রাজ্য (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মুলতান জেলা), আগলাইস জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত রাজ্য, ক্ষুদ্রক জাতির রাজ্য, মৌসিকানাস নামক রাজার রাজ্য (পরবর্ত্তী কালে এই রাজ্যের রাজধানী আলোর নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে শিকারপুর জেলায় উহার ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে)। অক্সিকেনাস রাজার রাজ্য এবং সম্বোস রাজার রাজ্য (সিন্ধুমান নামক স্থানে এই রাজার রাজধানী বিদ্যমান ছিল; সিন্ধুমান বর্ত্তমান সময়ে সেওয়ান নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে)।

ফলতঃ আলেকজণ্ডার সার্দ্ধ দুই বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া বহুসংখ্যক রাজ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। এই সমুদয় রাজ্য পরস্পর স্বতন্ত্র ছিল; সময় সময় এক রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যের শত্রুতা উপস্থিত হইত। আলেকজণ্ডারের পরিদৃষ্ট রাজ্যসমূহ মধ্যে কোন কোন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাদৃশ রাজ্যসকলকে স্বাধীন বিশেষণে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের রাজনৈতিক অবস্থা কীদৃশ ছিল,

তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। শতদ্রু হইতে যমুনা নদী ১৬৮ মাইল দূরে অবস্থিত, যমুনা হইতে গঙ্গানদী ১১২ মাইল দূরে অবস্থিত, গঙ্গা নদীর এই স্থান হইতে কালিনিপাক্ষ (লাসন সাহেবের মতে কালিনিপাক্ষের বর্ত্তমান নাম কনৌজ) ২৮৬ মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে। শতদ্রুর প্রাগুক্ত স্থান হইতে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল অর্থাৎ সমগ্র দোয়াবপ্রদেশ দৈর্ঘ্যে ৬২৫ মাইল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে পাটলীপুত্র ৪২৫ মাইলরূপে লিপিবদ্ধ আছে। এই অঙ্ক ভুল; কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহার দূরত্ব ২৪৮ মাইল মাত্র। পাটলীপুত্র হইতে গঙ্গার মুখ ৭৩৮ মাইল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তৎকালে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রাচ্যদেশ অর্থাৎ মগধ সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই দেশ শাসন করিতেন। তাঁহার ছয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং নয় হাজার রণহস্তী ছিল। এই সৈন্যবল দ্বারাই তাঁহার প্রতাপ ও আধিপত্য কিরূপ সুবিস্তৃত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, মথুরা ও আগ্রার পার্শ্ববর্ত্তিনী যমুনা নদী চন্দ্রগুপ্তের দেশ দিয়া প্রবাহিত ছিল। এই কারণ উপলব্ধি হয় যে, ঐ সকল স্থানের অধিপতিগণ চন্দ্রগুপ্তকে চক্রবর্ত্তী নরপতিরূপে সম্মান করিতেন।

গঙ্গা নদীর সাগর সঙ্গমস্থলে গঙ্গারাঢ়ি নামক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। গঙ্গার উপকূলে সমুদ্রের নিকট কলিঙ্গ নামে আর একটি রাজ্য দেখা যাইত। গঙ্গার তীরে মালাই নামে একটি জাতির বাস ছিল। মেগাস্থিনিসের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া উপলব্ধি হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ বঙ্গের কিয়দংশ কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। পরথলিস নামক নগরে কলিঙ্গ দেশের রাজা বাস করিতেন। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান পরথলিস নামে পরিচিত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

কলিঙ্গ দেশের পশ্চাতে কতিপয় শৌর্য্যবীর্য্যশালী জাতি একজন অধিপতির অধীনে বাস করিত। এই অধিপতির ৫০ হাজার পদাতিক সৈন্য, ৪ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৪ শত রণহস্তী ছিল। এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলে অন্দরো জাতির আবাসস্থানে উপস্থিত হইতে হইত। মেগাস্থিনিস-বর্ণিত অন্দরো জাতিকে প্রাচীন অন্ধ্র জাতিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অন্ধ্রগণ প্রথমতঃ গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর মধ্যস্থলে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তারপর নর্ম্মদার তীরদেশ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

তৎকালে বর্ত্তমান রাজপুতনা বহুসংখ্যক পার্ব্বত্য জাতির বাসভূমি ছিল। গ্রীকদূত এইসকল পার্ব্বত্য জাতির বর্ণনার অন্তে হোরেসো নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের রাজধানী সমৃদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বাণিজ্যের জন্য খ্যাত ছিল। হোরেসো জাতি সৌরাষ্ট্রীয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান মাদুরা এবং তিনেভেলি জেলায় পাণ্ড্য নামে এক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। রমণীই কেবল পাণ্ড্য রাজ্য শাসন করিবার অধিকারিণী ছিলেন। এই রাজ্যে তিনশত নগর পরিদৃষ্ট হইত এবং দেশ রক্ষার জন্য দেড় লক্ষ পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত থাকিত।*

হিউএনথসঙ্গের গ্রন্থ পাঠে আমরা দুইজন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতির নাম জানিতে পারি। অশোক ও কনিষ্ক। মহারাজ অশোক দারকাল (২৬৩—৩৩ খৃঃ পূঃ) মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। হিউএনথসঙ্গ পুনঃ পুনঃ তাঁহার সুগভীর ধর্ম্ম নিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অশোক রাজা স্বধর্ম্মের মহিমাপ্রচারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত বলা হইবে না। আমাদের চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে অশোকনির্ম্মিত স্তূপাদি বিদ্যমান দেখিয়াছিলেন। তাদৃশ নিদর্শন একদিকে তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মকর্ম্ম-তৎপরতা এবং অন্যদিকে

* এই বৃত্তান্তের কোন কোন অংশ প্লিনি ও এরিয়ানের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তৎসমুদয় মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। এজন্য সর্ব্বত্রই মেগাস্থিনিসের নাম প্রদত্ত হইল।

তাঁহার ভারতব্যাপী প্রাধান্যের পরিচায়ক ছিল। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অশোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ ভারতবর্ষের সুবিশাল অংশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

মহারাজ অশোকের ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারও বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগ অতি প্রবল ছিল। তাঁহার প্রতাপও যথেষ্ট ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিউএনথসঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার আধিপত্য সুদূরপ্রসারী ছিল। চীন প্রভৃতি দেশ হইতে রাজন্যগণ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিতেন। ইতিহাসবেত্তৃগণের মত এই যে, কাবুল ও কাশগড় হইতে আগ্রা এবং গুজ্জর পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন বৈদেশিক বণিক (ইনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন) ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে আমরা সিন্ধুদেশের কিয়দংশ এবং দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারি।

সিন্ধুনদের তীর হইতে সমগ্র সৌরাষ্ট্র ভূমিতে শকগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বাণিজ্য বন্দর বরবরিকন শকগণের আধিপত্যাধীন সিন্ধু সাগর-সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। তৎকালে চিরবিখ্যাত উজ্জয়িনী নগরীর অস্তিত্ব ছিল এবং তথা হইতে সর্ব্বপ্রকার পণ্য রপ্তানী হইত।

নর্ম্মদা নদীর তীর হইতে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণদেশ বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণদেশের সর্ব্বপ্রধান রাজ্য আরিয়াকি বা আর্য্যাকি নামে কথিত হইত। আর্য্যাকির বর্ত্তমান নাম মহারাষ্ট্র বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কল্যাণনগর এই দেশের প্রধান নগর ছিল।

দক্ষিণদেশের বিবরণের শেষে আমরা কেপরোবোট্রস নামধেয় একজন অধিপতির রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে কেপরোবোট্রসের সংস্কৃত নাম কেরলপুত্র।

পূর্ব্বোক্ত রাজ্যের পার্শ্বেই গোলকুণ্ডা নামক এক নগর বিদ্যমান ছিল। এই নগরের অধিপতির নাম বা উপাধি পাণ্ডিয়ান ছিল। এই রাজা ও মেগাস্থিনিস বর্ণিত পাণ্ড্য রাজা অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

টলেমির ভূগোল বৃত্তান্ত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থ হইতে প্রাগুক্ত রাজ্য সকলের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কেরলপুত্রের রাজ্যের রাজধানীর নাম করৌরা ছিল। বর্ত্তমান কোইম্বাটুর জেলার অন্তর্গত করুর নামক স্থান প্রাচীন করৌরারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। করুর শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ নগর। টলেমির গ্রন্থানুসারে পাণ্ডিয়ান বা পাণ্ড্যগণ কোলখাই নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। টলেমি সোর নামক একটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। চোল তাঁহার হস্তে পতিত হইয়া সোর হইয়াছে। টলেমি দক্ষিণ ভারতের একাংশকে দমিরিকি নামে আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।[১]

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহুসংখ্যক অসভ্য জাতির আধিপত্য বদ্ধমূল ছিল। টলেমির গ্রন্থে এইসকল অসভ্য জাতি পুলিন্দেই, প্রাপিওটাই, কিলটাই প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজপুতনায় প্রমর বংশীয়গণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। পালিমবোথার (পাটলিপুত্র), কার্টিসিনা (কর্ণসুবর্ণ), গঙ্গারাঢ়ি, তামালাইস (তাম্রলিপ্ত) প্রভৃতি নামে এই সকল রাজ্য কথিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

[১] মৈসরিক ও গ্রীক লেখকদ্বয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি (আমরা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে উত্তর সরকার, গঞ্জাম জেলা ও ভিজিগাপটম জেলা ছাড়িয়া দিতেছি), এবং মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অর্থাৎ টলেমি-বর্ণিত দমিরিকি দেশে তিনটি খ্যাতনামা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই তিনটির নাম পাণ্ড্য, চোল ও চের বা কেরল।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিচার্য

ঢাকা হইতে প্রচারিত সম্মিলন নামক মাসিক পত্রের বৈশাখের খণ্ডে 'উকার বনাম ওকার' প্রবন্ধে বাঙ্গালা ব্যাকরণের এক বিচার্য বিষয় আছে। ধাতুর উকার বিভক্তি যোগে ওকার হয় কিনা, ইহাই বিচার্য। (সে) শুনে উঠে তুলে, না (সে) শোনে ওঠে তোলে?

বাঙ্গালা ব্যাকরণে উকার ওকার দ্বন্দ্ব এক নাই, ইকার একার দ্বন্দ্ব আছে, আরও দ্বন্দ্ব আছে। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সময় এইরূপ দ্বন্দ্বে পড়িতে হয়। আমার সঙ্কলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ অধ্যায়ে এই সব দ্বন্দ্বের উল্লেখ ও যথাসাধ্য ভঞ্জন করা গিয়াছে। সে গ্রন্থ এখন বাঙ্গালা মুদ্রাকরের কার্যতৎপরতা পরীক্ষায় নিযুক্ত আছে। এখানে পুনরুক্তি না করিয়া দিকদর্শন করা যাইতেছে। ক্রিয়াপদের ও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদের ইকার একার, উকার ওকার লক্ষ্য হইবে।

ভাষা কোন দিকে চলিয়াছে, প্রথমে তাহা দেখা যাউক। দেখা যায়, সে লেখে, ছেঁড়ে, ধোয়, শোনে; সে লেখায় ছেঁড়ায় ধোয়ায়, শোনায় প্রভৃতি পদ চলিত হইতেছে। লেখা কাগজ, ছেঁড়া কাপড়, ধোয়া হাত, শোনা কথা; লেখান, ছেঁড়ান, ধোয়ান, শোয়ান; লেখা লেখি, ছেঁড়া ছেঁড়ি, ধোয়া ধোয়ি, শোনা শোনি। এখানে বাঙ্গালা শব্দশিক্ষার সূত্র আসিয়া লেখা-লিখি, ছেঁড়া-ছিঁড়ি, ধোয়া-ধুয়ি, শোনা শুনি করিতে পারে। যেমন সং কোশী হইয়াছে কুশী (কোশা কুশী), তেমন কোলা-কোলি কোলা কুলি, মোটা মোটি—মোটা-মুটি ইত্যাদি হইতে দেখা যায়।

ব্যাকরণের ভাষায়, বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে ধাতুর ইকার উকারের গুণ হয়। প্রয়োজক অর্থে আন্ত (সং ণিজন্ত) ধাতুর ইকার উকারের গুণ হয়। কৃৎ আ অন প্রত্যয় হইলেও হয়। বলা বাহুল্য, সামান্য ধাতুর উত্তর যেমন আ, আন্ত ধাতুর উত্তর তেমন অন হয়।

আর এক স্থল আছে। মধ্যম পুরুষে বর্তমান অনুজ্ঞায় ইকার উকারের গুণ হয়। যথা, তুই লেখ্ ছেঁড়্ ধো শোন্; তুমি লেখ ছেঁড় ধোও শোন। এইটার বিকল্প বিধি আছে। কারণ তুমি শুন তুল টিপ পিট ইত্যাদিও শুনিতে পাওয়া যায়। তুই শুন্ তুল্ টিপ্ পিট্ ইত্যাদিও শুনি। বঙ্গের কোন অঞ্চলে শুনি, কোন অঞ্চলে শুনি না, তাহা কষ্টিপাথর করিয়া ফল নাই। কারণ শব্দ শিক্ষার সূত্রে যেমন ও পরে ই থাকিলে ও স্থানে উ সহজে চলিয়া আসে, অ পরে ই থাকিলে অ স্থানে ঈষৎ ও আসে, তেমন এ আ পরে থাকিলে ধাতুর ই স্থানে এ, উ স্থানে ও আসিয়া পড়ে। মোটের উপর বলিতে পারা যায়, বঙ্গের পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে ই উ কারের গুণ প্রায় হয় না।

কৃৎ আ প্রত্যয়ান্ত শব্দের এ-ওকার সম্বন্ধে তর্কের সুবিধা নাই। কারণ, চেনা শোনা, বেচা-কেনা, ওলা-উঠা, যোজা মিলন, নাম যোষা, সিদ্ধি-যোটা, ছোয়াছিয়া রোগ, জোড়া কাপড়, ঠেকা দায়, জ্বালা পোড়া ইত্যাদি একার-ওকারাদি শব্দ অনেক কাল হইতে আছে। ওলা-উঠা শব্দে একদিকে ওলা যেমন আছে, অন্য দিকে উঠা আছে। নী ধাতু হইতে নেওয়া (নেআ), দি ধাতু হইতে দেওয়া (দেআ), শু ধাতু হইতে শোয়া (শোআ), ধু ধাতু হইতে ধোয়া (ধোআ) ইত্যাদি বহু প্রচলিত।

আন্ত (সং ণিজন্ত) ক্রিয়াপদে ই উকারের গুণ সব অঞ্চলে কথাভাষায় হয় না। কোন কোন অঞ্চলে ধাতুবিশেষে হয়, ধাতুবিশেষে হয় না। পি ধাতু হইতে পিয়া ধাতু হয়, পেয়া পাই নাই। এইরূপ আরও ধাতু আছে।

ই-উ কে এ ও করিবার চেষ্টা অনেককাল চলিতেছে। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন, বিহঁসি পালটি নেহারি—নিহারি হইবার ছিল। এইরূপ, পবনে ঠেলল—ঠিলল হইতে পারিত। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, ঠেকিল রাজার ঝি, রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন, ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, পোড়ায় আনলে অতি, ইত্যাদি। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন, লোকে ঘোষে অপযশ, শোয় তরুতল, লোটায়্যা কুন্তলভার, আনলে পোড়ায়্যা নষ্ট না করহ তনু, লাজে হেঁঠ মাথা করে না তোলে বদন, কৃত্তিকা ধরিয়া তোলে, কান্ধেতে লম্বিত ঝুলি দোলে, প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে, গোময়ে লেপিয়া মাটী, পুষ্প তোলা বিনা অন্য করহ আরতি, ইত্যাদি। অনুমান হয় প্রাচীন যে-কোন গ্রন্থে ধাতুর ইকার উকারের গুণের দুই পাচটাও উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

আধুনিক কালের মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ দেখি। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে, রোষে তার গতি, (রুষিলা দানববালা, কিন্তু) রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ, দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা, ফেরে দূরে মত্ত সবে, ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে, কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ, বৈতালিক গাতে খোলে আঁখি, ইত্যাদি। নোয়া ধাতু (নম ধাতুর আদেশ) বহুকাল চলিতেছে। বৈষ্ণব কবি হইতে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় নোয়া ধাতু স্বীকার করিয়াছেন। প্রভেদ এই পূর্বকালে লেখা হইত নোঙা, এখন হয় নোয়া।

বাঙ্গালাভাষায় সহস্রাধিক ধাতু প্রচলিত আছে। সব ধাতুতে এক নিয়ম চলিতে পারে কি না, তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। শেষে বুঝিয়াছি, যদি এক নিয়ম মানিতে হয়, তাহা হইলে ইকার উকারের গুণ স্বীকার করাই ভাল। যখন নেয় দেয়, তখন মেলে মেশে; যখন শোয় ধোয়, তখন রোষে ভোগে। কেহ একটা ধরেন, অপরটা ছাড়েন; কেহ বা বিকল্পবিধি আশ্রয় করেন। বিকল্প বিধি আর কিছু নয়, গ্রাম্যজনের ভাষায় বলিতে হয়, 'এও হয় সেও হয়'। জীবিতভাষার ব্যাকরণে বিকল্পবিধি অবশ্য থাকিবে। ভাষার বিবর্তনের মূল মন্ত্র না মানিয়া গতি নাই। যে বিবর্তনের কারণ সুখোচ্চারণ, তাহার বোধ সহজ নহে। পরে এ আ স্বর আনিতে হয় বলিয়া পূর্বের ই উ-কে এ ও করিয়া ফেলিতে স্বভাবতঃ চেষ্টা হয়। ভাষায় শুদ্ধাশুদ্ধির একমাত্র পরীক্ষা, যোগ্যের জয়।*

এখন আর এক প্রসঙ্গে আসি। আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ' দেখাইয়াছেন। বিভক্তি-প্রত্যয়যুক্ত পদকে তিনি শব্দের তির্যক রূপ বলিতেছেন। বাঙ্গালা আ প্রত্যয় ও কর্তৃকারকে এ বিভক্তি, এই দুই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। এখানে দুই একটা কথা সংক্ষেপে তুলি।

বাঙ্গালায় অনাদরে, স্বার্থে, সাদৃশ্যে, বিশেষণে আ তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। রাম—রামা, পাগল—পাগলা, দেব—দেবা, হাত—হাতা, আধ—আধা, বঙ্গ—বাঙ্গা প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্ত আছে।[১] মরা (মাছ), জানা (পথ), শোনা (কথা) প্রভৃতি কৃৎ আ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ অসংখ্য আছে।

ইদানী কেহ কেহ অন কৃৎ প্রত্যয়কে অনো লিখিতেছেন। তাঁহারা লাফান, কাদান, ধরান প্রভৃতি না লিখিয়া, লাফানো, কাদানো, ধরানো লিখিতেছেন। বোধ হয় যুক্তি এই; (১) কেহ কেহ নো বলেন, (২) ন লিখিলে ন্ উচ্চারিত হইবার শঙ্কা থাকে। আমার সামান্য বিবেচনায়, যুক্তিদ্বয় কাজের নহে। কারণ, (১) বাঙ্গালার একটা উচ্চারণ আছে, সে উচ্চারণ যে প্রত্যেকের উচ্চারণের সহিত মিলিবে এমন নয়; বাঙ্গালার আদর্শ উচ্চারণে অন (অকারান্ত), অনো (ওকারান্ত) প্রত্যয় নহে। (২) বাঙ্গালা শব্দের বানান ও উচ্চারণের অমেল এই একস্থলে নহে, অসংখ্য স্থলে আছে। কেহ কেহ কালো, ভালো, মতো বানান করিতেছেন। এরূপ বানান স্বীকার করিতে হইলে বাঙ্গালাভাষার নূতন ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করিতে হইবে। অকারান্ত শব্দ অল্প নাই। যদি এমন নিয়ম করা যায় যে, সংস্কৃত শব্দের বানানে হাত না দিয়া কেবল সংস্কৃত হইতে অপভ্রষ্ট শব্দের বাঙ্গালা শব্দের শেষের অ

---

* 'উকার বনাম ওকার' প্রবন্ধে আর দুই এক কথা আছে। বাঙ্গালা শব্দ শিক্ষাধ্যায়ে কয়েকটা আলোচনা করা গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শব্দশিক্ষাধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে

[১] এখানে একটা জিজ্ঞাস্য আছে। ঠাকুর মহোদয় লিখিয়াছেন, 'বহুতর দৃষ্টান্ত'। বৎসর কয়েক হইতে 'বহুতর' হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে, এবং বোধ হয় দেখা দেখি অনেকে বহু অর্থে 'বহুতর' প্রয়োগ করিতেছেন। ঠাকুর মহোদয়কেও প্রয়োগ করিতে দেখিয়া সন্দেহ বাড়িয়া গেল। 'বহুতর' অর্থে বহুবিধ বুঝি। স্মরণ হইতেছে গ্রামে এই অর্থে দুই একবার শুনিয়াছি। বহু, কিংবা অতিবহু অর্থে বহুত (সং প্রভূত, সং বহুত্তিথ) শুনি। বহুত শব্দটির সংস্কৃতরূপ দিবার বাসনায় গ্রাম্যজন 'বহুতর' না বলিতে পারে, এমন নহে। বাঙ্গালা পুস্তক অতি অল্পই পড়িয়াছি। তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রে কবিকঙ্কণেও বহুতর শব্দ পাইয়াছি। যথা, কবিকঙ্কণে, ঝড় বৃষ্টি হৈল বহুতর, কিনিয়া বহুতর। ভারতচন্দ্রে, প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র বহুতর। মঙ্গল দেখেন বহুতর। গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুতর। সুন্দর সুন্দর, নৌকা বহুতর। এই সকল স্থলে বহুবিধ অর্থও হইতে পারে। বহুবিধ অর্থ হইতে বহু অর্থও আসিতেছে। বোধ হয় আরবী তরহ শব্দ বহু শব্দের সহিত যুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত তর প্রত্যয় যেমন গুরুতর, ঘোরতর—বহু শব্দে বসিলে অর্থ ভাল হয় না। বাঙ্গালায় বেতর তর-বেতর, এবং গ্রাম্য বাঙ্গালায় কেমনতর যেমনতর তেমনতর শব্দ, চলিত আছে। বলা বাহুল্য, কেমনতর ইত্যাদি অশুদ্ধ এবং এই তর আরবী তরহ (প্রকার)।

উচ্চারিত হইলে বানানে ও লেখা যাইবে, তাহা হইলেও প্রশ্ন সহজ হইবে না।

বস্তুতঃ জীব-বিদ্যায় যেমন আদর্শ (type) ধরিয়া জীবের জাতি (species) নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, তেমন প্রত্যেক ভাষার একটা আদর্শ আছে। যে লেখক বা বক্তার ভাষা সে আদর্শের যত নিকটবর্ত্তী, তাঁহার ভাষা তত শুদ্ধ। ব্যাকরণে সে আদর্শের ব্যাখ্যান থাকে। শব্দ কোষে জীবজাতির নামমালার তুল্য শব্দরূপ জাতির নাম থাকে।

জাতির অল্পাধিক গৌণ পরিবর্ত্তনে জাতিত্ব লুপ্ত হয় না। পরিবর্ত্তন বা বিকারই নিয়ম, স্থায়িত্বই ব্যভিচার বলা যাইতে পারে। শব্দেরও এইরূপ বিকার নিত্য ঘটিতেছে। কিন্তু সে বিকার মুখ্য অঙ্গে হইলে এক জাতি অন্য জাতি হইয়া পড়ে। কোন বিকারে বা পরিবর্ত্তনে জাতিত্বে আঘাত লাগে না, তাহার নির্ণয় একপ্রকার অসাধ্য। তথাপি সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কিছু দূর যাইতে পারা যায়।

অন প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ—দুইই হয়। আ প্রত্যয়ান্ত শব্দও হয়। দুধ ছাড়ান দিয়াছে, দুধ ছাড়ান হইয়াছে; এমন দেখান দেখাব, দেখান হবে, ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। ছাড়ান বাকি আছে, দেখানর কথা পরে হবে, ইত্যাদিও আছে।

লিখনে উচ্চারণ প্রভেদ যত দেখাইতে পারা যায়, ভাষার ততই পূর্ণতা। পূর্ণতা অসম্ভব। একটা সীমা চাই। এই কারণে বলিতে পারা যায় অকারান্ত জানাইতে অক্ষরের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন চলিবে না। না জানাইলে যেখানে চলে না, সেখানে অক্ষরের নীচে মাত্রা লাগাইতেছি। বোধ হয় সাধারণে ইহাও চলিত হইবে না। এই সমস্যার এক উত্তর, অন প্রত্যয়কে অনা প্রত্যয় করা। অনা করিবার পক্ষে যুক্তি এই, (১) জানানা, দেখানা প্রভৃতি আকারান্ত উচ্চারণ অনেক স্থানে আছে; (২) জানা, দেখা প্রভৃতি পদ যেমন, জানানা দেখানা ঠিক তেমন, দ্বিতীয়টি প্রথমের অন্তর্গত। প্রভেদ, জান দেখ ধাতুর আন্ত রূপ জানা দেখা বলিয়া আবার আ যুক্ত হইতে পারে না। (৩) বাঙ্গালা বিশেষণ পদ যে প্রায়ই আকারান্ত হইয়া থাকে, তাহা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধে জানা যাইবে। (আমার ব্যাকরণেও এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার গত খণ্ডে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ও দেখাইয়াছেন।)

এখন বাঙ্গালায় কর্ত্তৃকারকে একার প্রয়োগের প্রসঙ্গ আনিতেছি। ঠাকুর মহোদয় লিখিয়াছেন, 'মোটের উপর বলা যাইতে পারে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্য বিশেষ্যপদ কর্ত্তৃকারকে তির্য্যকরূপ ধারণ করে।' যেমন বলি ছাগলে ঘাস খায়, পোকায় কেটেছে, ভূতে পেয়েছে। কিন্তু এই সূত্র অসম্পূর্ণ দেখিয়া ঠাকুরমহোদয় সকর্ম্মক অকর্ম্মক ক্রিয়া ছাড়িয়া সচেষ্টক অচেষ্টক ক্রিয়াভেদ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, সূত্রটি এই, যেখানে কর্ত্তৃপদে জাতির বা সামান্যের ধর্ম্ম-প্রকাশ উদ্দেশ্য হয়, সেখানে কর্ত্তৃপদে একার আসে। বলা বাহুল্য, সামান্য দ্বারা বহুত্ব প্রকাশিত হয়, এবং বিশেষ্য জাতিবাচক না হইলে সামান্য ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। আমরা বলি বানরে লাফায় অর্থাৎ বানরের ধর্ম্ম লাফান, তেমনই, মানুষে ঘুমায়, লোকে না খেতে পেয়ে মরে, মাছে কামড়ায়, পোকায় কাটে, গাছে ফুল ধরে, গাছে আওতা করে, বাতাসে নড়ায়, ধার্ম্মিকে পুণ্য করে, চোরে চুরি করে, মর্ম্মে মানে না, ইত্যাদি। যখন বলি, বেদে বলে ইতিহাসে লেখে, তখন বেদ ও ইতিহাসে কি আশা করি তাহা মনে মনে স্বীকার করিয়া লই। এ, য়, ই, একেরই রূপান্তর। হলন্ত শব্দে এ যুক্ত হয়, স্বরান্ত শব্দের পরে য় বসে। বাঙ্গালা ভাষায় বহুবচন বাচক ই বিভক্তি হয় না, আসামী ভাষায় হয় বা হইত। উচ্চারণ সুখের নিমিত্ত স্বরান্ত বিশেষ্য শব্দের পরে এ স্থানে তে হয়। গোরু-এ—গোরুতে ঘাস খায়, ঘোড়ায় ঘোড়াতে চাটি মারে, দেবতায় মারিলে রাখে কে, ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে বলে —এখানে 'অনেক' শব্দ যে বিশেষ্য তাহা জানাইতে 'অনেকে'।

ওড়িয়া, হিন্দী, মরাঠীতেও এ বহুবচনের সামান্য বিভক্তি। ওড়িয়াতে, লোকে কহন্তি। এ যে বহুবচনের বিভক্তি, তাহা বাঙ্গালায় যেন কালক্রমে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ওড়িয়াতেও হইতেছে। একারণ ওড়িয়াতে ইদানী

একটা 'মান্' শব্দ বহুবচনের বিভক্তি সরূপ প্রযুক্ত হইতেছে। নব্য লেখক ও বক্তার নিকট 'মান্' অত্যাবশ্যক হইতেছে, গ্রাম্য লোকে 'মান্' তত লাগায় না। বাঙ্গালাতেও নব্য লেখক 'গণ' শব্দ যত লাগান, প্রাচীন লেখক তত লাগাইতেন না, লাগাইবার প্রয়োজন পাইতেন না। ওড়িয়াতে 'বালকমান্', বাঙ্গালায় যেমন 'বালকগণ'। কিন্তু 'বালকমান্' যে বহুবচন হইল, তাহা ভুলিয়া বহুবচনের এ্ আনিয়া নব্য ওড়িয়া লেখক লেখেন 'বালকমানে'। ইহা আর কিছু নয়, এ্ যে বহুবচনের বিভক্তি তাহা অজ্ঞাতসারে স্বীকার। মান্য ব্যক্তিকে বহু জ্ঞান করাই রীতি। বাঙ্গালাতে গৌরবে বহুবচন আছে, যদিও প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, ওড়িয়াতে স্পষ্ট আছে। ওড়িয়াতে বলা হয়, 'কবি কালিদাসে লিখিঅছন্তি'—কবি কালিদাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাতে ক্রিয়াপদ বহুবচন করিয়া কর্তার সম্মান করা হয়। এই কারণে, লিখিয়াছে ন। এ্ যে বহুবচনের বিভক্তি, আসামীতে তাহা বিস্মৃত হইয়া একবচনে এ্ বসাইতে বসাইতে এখন এ্ একবচনের বিভক্তি হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ভুল সকল ভাষাতে ঘটে।

হিন্দীতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে এ্, এ্ঁ বসে। যেমন, কুত্তা কুত্তে, আঁখ—আঁখেঁ। ইঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে আঁ এবং পুংলিঙ্গ শব্দের বহুবচনে ওঁ লাগে। যেমন, স্ত্রী স্ত্রিআ—স্ত্রিয়া, ভাই—ভাইয়োঁ। মরাঠীতে পুংলিঙ্গ শব্দে এ্ (যেমন ঘোঁড়া ঘোড়ে) ক্লীবলিঙ্গ শব্দে এ্ঁ কিংবা ঈ (যেমন বস্ত্র—বস্ত্রেঁ), স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে আ কিংবা ঈ (যেমন কাথ (সং কথা)—কাথা, জাত (সং জাতি)—জাতী)। এসব অতি স্থূল নিয়ম। তা হউক, দেখা যাইতেছে বহুবচনের বিভক্তি এ্ ই আছে, এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দে এ্ অনুনাসিক হয়।

যখন সংস্কৃতের বিবর্তনে বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি, এবং যখন সংস্কৃতমূলক সকল ভাষাতে এ্ আছে, এবং এ্ ই একেরই রূপান্তর, তখন স্বচ্ছন্দে মনে করা যাইতে পারে যে সংস্কৃত হইতে এ্কার আসিয়াছে। এখানে এবিষয় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমার অনুমানে সংস্কৃত নি (যেমন ফলানি) হইতে ইঁ ই-য়্-এ্কার আসিয়াছে। যখন বলি, এঘরে সবাই আছে, তখন সবাই এর ই নিশ্চয়ে ই এবং বহুবচনের ই মনে করা যাইতে পারে। আসামীতে পুংলিঙ্গ সি (সে) শব্দের বহুবচনে সি-হঁতে (তাহারা)। এখানে য়ঁ এ্ মূল রূপ হইতে হঁতে আসিয়া থাকিবে। প্রাচীন বাঙ্গালা তেঁহ, যাহা হইতে বর্তমান তি-নি মূলতঃ বহুবচনের রূপ, গৌরবে একবচন হইয়া গিয়াছে।

কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

(De La Mazelière'র নব প্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(প্রথম পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তি)

এই সময়ে বর্ণভেদ প্রথা এবং সেই সঙ্গে উচ্চ নীচ পদমর্য্যাদার ক্রমিক সোপানাবলী স্পষ্টাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রধান পদবী অধিকার করিল। বৈদিক দেবতাদিগের উদ্দেশে ও পিতৃগণের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করা, জীবনের একার্দ্ধ ভাগ পারিবারিক কর্ত্তব্যসাধনে ও অপরার্দ্ধভাগ সন্ন্যাসধর্ম্মপালনে নিয়োগ করা—স্মৃতিগ্রন্থাদির এই যে উপদেশ ইহা অতি অল্প লোকেই অনুসরণ করিত। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা হয় সরকারী কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইল, নয় স্বকীয় ভূসম্পত্তির উপসত্বে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা, শিব ও কৃষ্ণ এই দুই নব দেবতার মন্দিরে বাস করিত, উৎসবাদিতে কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া পৌরোহিত্য করিত, ভিক্ষা করিত, সকল প্রকার ব্যবসায়ে এমনকি অতীব জঘন্য ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হইত। অর্থগৃধ্নুতাপ্রযুক্ত উহারা লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের স্থান ব্রাহ্মণের নীচে। কিন্তু রাজারা সর্ব্বময় প্রভু হইয়া পড়িয়াছিল; রাজবংশীয়েরা রাজাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিত না। বারাঙ্গনা ও সৈনিক সকলবর্ণের মধ্যেই ছিল।

দাক্ষিণাত্যবিজয়, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, ধনের উপচয়—এই সমস্ত, প্রাচীন বর্ণগুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। ব্যবসায়ের বনিয়াদে নূতন বর্ণসকল গঠিত হইল। জাতকের যুগে, বড় বড় বণিক ও প্রধান প্রধান ভূস্বামিগণ সম্মিলিত

হইয়া এক প্রকার সমবায়মণ্ডলী গঠন করিয়াছিল;—উহারা "গহপতি।" উহাদের প্রতিনিধি সভা- বণিক-প্রধান "শ্রেষ্ঠী" ও রাজস্বসচিব লইয়া সংগঠিত। বড় সওদাগরদিগের যদিও একরূপ কোন সমবায়মণ্ডলী ছিল না, কিন্তু কারিকরদিগের, বিশেষত কর্ম্মকার, কুম্ভকার ও স্বর্ণকারদিগের, কতকগুলি "শ্রেণী" ছিল।

আরও কয়েক শতাব্দী পরে, ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থে, আদিম নাটকগুলিতে, আমরা একটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত সমাজের পরিচয় পাই। কারিকর, বণিক ও কৃষক, ইহারা কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণী নগরের একটি পৃথক অঞ্চলে কিংবা পৃথক গ্রামে বাস করিত। আবার অনেকগুলি শ্রেণী বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। এমন কি যেসকল ব্যবসায় জাতক গ্রন্থে প্রধান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহাও বর্ণবিশেষের অন্তর্ভুক্ত; যথা রাজভৃত্য, গায়ক বাদক, নর্ত্তক ও পর্য্যটনকারী বাজিকর, রাজপথের বার্ত্তাবাহক, তস্কর ইত্যাদি। যাহারা প্রাচীন শাখা জাতিসমূহ হইতে নিঃসৃত এবং যাহারা গোড়ায় হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া যাইতে অস্বীকৃত হয়, সেই সব নীচ বর্ণদিগেরও এক একটা নিজস্ব ব্যবসায় ছিল; যথা ব্যাধ, ধীবর, খাগড়াবয়নকারী, রথকার, ঝুড়ি নির্ম্মাতা, বংশীনির্ম্মাতা, নাপিত, চণ্ডাল- যাহারা চর্ম্ম রঞ্জিত করিত, শ্মশানের কর্ম্ম করিত।(১)

মেগাস্থিনিস ভুল বলিয়াছেন যে ভারতবাসীরা দাসত্ব প্রথা অবগত ছিল না। বস্তুত সকল যুগেই বহুসংখ্যক দাস বিদ্যমান ছিল: যথা,—যুদ্ধের বন্দী, বধ্যজন, অধমর্ণ, দাসের বংশধরগণ। যে কেহ আপনাকে বিক্রয় করিতে পারিত, আপনার স্ত্রীপুত্রদিগকে বিক্রয় করিতে পারিত। প্রচলিত বিধি অনুসারে, দাসের উপর প্রভুর প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। তবে কি না, ভারতবাসী মৃদুস্বভাব এবং আইনেরও বাঁধুনী তেমন সুদৃঢ় ছিল না। তাই, ভৃত্য ও দাসের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন। সে যাহাই হউক, অস্পৃশ্য বর্ণের লোকদিগের অপেক্ষা দাসের অবস্থা ভাল ছিল, এবং দাসত্ব প্রথা তৎকালীন ভারতসমাজের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া মনে হয় না।(২)

*

আর্য্য-পরিবারের গঠন বদলায় নাই: আদিমবাসীরা অংশতঃ উহা গ্রহণ করিয়াছিল। পিতৃপ্রভুত্ব অবিসম্বাদী ছিল। ভূসম্পত্তি সমবায়াত্মক (গ্রামসমূহের ভূসম্পত্তি, বর্ণবিশেষের ভূসম্পত্তি, বংশবিশেষের ভূসম্পত্তি)। গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই সংস্কারলক্ষণাক্রান্ত; ব্যয়বহুল আড়ম্বরের সহিত জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কারসকল অনুষ্ঠিত হইত।(৩)

আর্য্যদিগের মতে, রমণী পুরুষের সমকক্ষ। আদিমবাসীদিগের প্রভাব বশে নারীজাতির অবস্থা একটু হীন হইয়া পড়ে। তখন অল্প বয়সেই বালিকার বিবাহ দেওয়া হইত। মনু বলেন:

"স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে না।

"স্ত্রীলোকেরা সদাই প্রহৃষ্টমনে কালযাপন করিবে, গৃহকর্ম্মে দক্ষ হইবে; গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইবে।

"শীলরহিত, পরদাররত বিদ্যাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার

(১) জাতক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ব্যবসায়ের শ্রেণী সম্বন্ধে, শ্রেণীসমূহের প্রধানের সম্বন্ধে, অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। এই বিষয়টি M. Fickএর গ্রন্থে উত্তমরূপ আলোচিত হইয়াছে।

(২) বশিষ্ঠ (XVI) ও গৌতম (XII) হইতে দত্তমহাশয় কর্ত্তৃক বচন উদ্ধৃত। এইসকল বচনে কেবল দাসীর উল্লেখ আছে, দাসের উল্লেখ নাই। এই মনুর বচনটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য:- "যুদ্ধের বন্দী, যে স্বকীয় অন্নের বিনিময়ে প্রভুর সেবায় প্রবৃত্ত, যে গৃহজাত শিশুকে ক্রয় করা হয়, যে শিশুকে তাহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথোপযুক্ত পারিশমিক পাইবার আশায় যে ব্যক্তি প্রভুর সেবা করে এই সাত শ্রেণীর দাস।" দ্বিতীয় ও সপ্তম শ্রেণীর দাস যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতবাসীরা ভৃত্য ও দাসের সবিশেষ প্রভেদ অবগত ছিল না, সুতরাং রোমকেরা যে অর্থে দাসত্ব বুঝিত, ভারতবাসীরা সে অর্থে বুঝিত না।

(৩) হিন্দুদের পরম্পরাগত অনুষ্ঠানপদ্ধতির মধ্যে ৪০টি সংস্কারের বিধান আছে; ইহাদের মধ্যে প্রধান এইগুলি:—বিবাহ, গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন- অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়নের আরম্ভ, এবং সমাবর্ত্তন-- অর্থাৎ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। দত্তের "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা" নামক গ্রন্থে এই সকল সংস্কার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। এই সকল সংস্কার এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ন্যায় তাঁহার সেবা করিবেন। স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই। কেবল পতিসেবার দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন।"

ব্রাহ্মণেরা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যবহার আরও কঠোর। বৌদ্ধধর্ম্মে স্ত্রীলোক এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—"রমণী অপবিত্রতার আধার; জঘন্য মাংসাবৃত অস্থিপুঞ্জের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাক্ষাৎ পাপ; মিথ্যাবাদিতা, অহঙ্কার, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি।"

জাতক গ্রন্থ এই নীতিধর্ম্ম লোকের মধ্যে প্রচার করে। রমণীর অপদার্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতা বহু আখ্যায়িকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন রাণীর দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পরিচারিকাগণ রাণীকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে। একজন অল্পবয়স্ক তাপস তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজ কুটীরে লইয়া আসে।

তাপসকুমার রাণীর নিকট প্রেমের প্রস্তাব করিল। রাণী সম্মত হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই রাণীর এই প্রেমে অরুচি জন্মিল। রাণী কতিপয় দস্যুর সহিত পলায়ন করিলেন। পরে কোন এক সময় তাপসকুমারের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটা সংকেতস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তাপসকুমার সংকেতস্থানে উপস্থিত হইয়া দস্যুপতির হাতে পড়িলেন। সুন্দরীর নিকট দস্যুপতি পূর্ব্বেই তাহার সংবাদ পাইয়াছিল। তাপসী (পূর্ব্বকার রাণী) ক্রন্দন করিতে করিতে, সমস্ত ঘটনা—তাহার প্রেমের সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলেন। দস্যুপতি বিশ্বাসঘাতিনীর শিরশ্ছেদ করিল।

কোন এক রমণী, রাজ-উদ্যান হইতে কিছু কুঙ্কুম চুরী করিয়া আনিবার জন্য তাহার স্বামীকে অনুরোধ করে; কেননা কোন এক উৎসব উপলক্ষে তাহার পীতবর্ণ পরিচ্ছদ আবশ্যক হইয়াছিল। বাগানের মালীরা চোরকে ধরিয়া ফেলিল ও শূলে চড়াইয়া দিল। তাহার মুণ্ড ভূলুণ্ঠিত; কাকেরা চঞ্চুর আঘাতে তাহার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে, তবু বেচারী গুন্‌গুনস্বরে এইরূপ বলিতেছে:—"হায় আমার প্রিয়তমা তাহার সাধের পরিচ্ছদটি পাইবে না।" ইহা হইতে বুদ্ধ সিদ্ধান্ত করিলেন:—"এইরূপ চিন্তাপ্রসূত ঐ লোকটির নরকে পুনর্জ্জন্ম হইবে।" (৪)

তথাপি, গৌতম স্ত্রীলোকদিগকে তাহার ভিক্ষুশ্রেণীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধমণ্ডলীর মধ্যে উহাদের অপেক্ষা উৎসাহী ধর্ম্মপ্রচারক আর কেহ ছিল না। আবার, সমস্ত ভারতীয় কাব্যে, পত্নীর প্রতি পতির প্রেম, ও গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

রামের পত্নী ও বনবাসের সহচরী সীতা, রামকে এইরূপ বলিতেছেন: "অধর্ম্মজনক পরদারগমন তোমার নাই। পূর্ব্বেও তাহা হয় নাই এবং পরেও হইবে না। রাজপুত্র! তুমি নিয়তই নিজপত্নীর প্রতি আসক্ত। তোমার মনেও পর কলত্র বিষয়ক অভিলাষ নাই।"

একদিন সায়াহ্নে রাম তাহার কুটীরগৃহ শূন্য দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন:

"সীতে, হৃদয়রত্ন, তুমি কোথায় পলায়ন করিলে? কেহ কি তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? কোন রাক্ষসে কি ভক্ষণ করিয়াছে কিংবা আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য তুমি বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া আছ? এখন এই নিষ্ঠুর পরিহাস রাখিয়া দেও। হায় হায়! আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু দেখ প্রিয়তমে, তোমার ক্রীড়ার সঙ্গী মৃগগণ সাশ্রুনয়নে ও অধীরভাবে বনভূমিতে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সীতে! সীতে! তুমি প্রস্থান করিয়াছ, আমি এখানে হতাশ ও নিরুপায় হইয়া অবস্থিতি করিতেছি—আমার এমন বল নাই যে এই শোক আমি সহ্য করি। ইহজন্মে আর কি তোমার দর্শন পাইব না? ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু শ্রেয়।"

এক্ষণে, প্রথম যুগের বিবরণ হইতে একটা সারসংগ্রহ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:

যে দেশ মহাদেশের ন্যায় বৃহৎ, কিন্তু সাগর ও গিরিমালার দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগ হইতে পৃথক্—সেই ভারতের অধিবাসীগণও বিভিন্ন জাতিভুক্ত; নেগ্রিটো, তুরানীয়, মোগোল, আর্য্য। শেষোক্ত জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। উহারাই প্রাচীন যুগের বিংশতি শতাব্দীর

(৪) এই সকল কাহিনীর জন্য "জাতক", "তন্ত্র" (৬৩) ও "পুপ্পরত্ন" দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক Cowell ও M. Chalmers-এর ইংরাজি অনুবাদ।

কাছাকাছি কোন এক সময়ে পঞ্জাব জয় করে। ৫০০ বৎসর পরে, উহারা যমুনার অববাহ প্রদেশ আক্রমণ করে; আরও কিছুকাল পরে এমনকি গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে। উহারা অবঙ্গের আদিম বাসীদিগকে বশীভূত করে, কিন্তু দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। ইহার ফলে, সমাজের দ্বিগুণাত্মক গঠনপ্রণালী। এক, চতুঃশ্রেণী; যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আর এক:—সাদা, কালো, শ্যামল—এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের শত শত লোক, স্বকীয় উৎপত্তি অনুসারে, বাসস্থান অনুসারে, ব্যবসায় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ। আর্য্যদিগের রীতিনীতি কালক্রমে রূপান্তরিত হয়। বহুপরিমাণে সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছিল। আর্য্য জাতি ও আর্য্য সভ্যতা, আদিমবাসীদিগের জাতি ও সভ্যতার সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছিল। পরে ইহা হইতে একটা প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। কিন্তু কোন নিষেধই বর্ণসাঙ্কর্য্যের কিংবা সভ্যতার গতিরোধ করিতে পারে নাই। ধনশালী লোকদিগের নিকট, লোকবহুল ও সমৃদ্ধ রাজ্যসমূহের অধিপতিদিগের নিকট ব্রাহ্মণের দাসত্ব ঘৃণিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পুরোহিততন্ত্রাধীন জনসমাজ রাষ্ট্রতন্ত্রাধীন হইয়া দাঁড়াইল।

প্রাচীন যুগের তৃতীয় শতাব্দীর অভিমুখে, দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থানের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় ভারতের একীকরণ সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হয়, ভারতীয় সভ্যতা সংগঠিত হয়। অশোকের রাজত্ব হইতে রাষ্ট্রীক একতা, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নৈতিক একতা, এবং বর্ণভেদ প্রথা হইতে একপ্রকার সামাজিক একতা সংস্থাপিত হয়। কিন্তু অশোকের রাজত্ব এক শতাব্দীকালও টিকে নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত ভারতে প্রচারিত হইবামাত্র, বৌদ্ধধর্ম্মের অধোগতি আরম্ভ হয়। অকালপক্ক ফলের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধন ও নৈতিক ঐক্যবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, কেবল বর্ণভেদ-প্রথা টিকিয়া রহিল। যদিও বর্ণভেদ প্রথার বন্ধনটি অসম্পূর্ণ ও স্থূল ধরণের, তথাপি এই একমাত্র বন্ধনে সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একত্রীভূত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেকালের আহার

সেকালের বাঙ্গালীর আহার কেমন ছিল, জানিবার জন্য অনেকের, বিশেষতঃ আমাদের ব্রাহ্মণবর্গের, কৌতূহল উদ্দীপিত হওয়া স্বাভাবিক। এখনও—এই অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিকারের দিনেও—ভোজের উপর দশ গোণ্ডা সন্দেশ অক্লেশে উঠিয়া যাওয়ার ব্যাপার পল্লী অঞ্চলে বিরল নহে। নবাবী আমলে বড়িশা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদার রাজস্ব বাকীর দায়ে বন্দীভূত হইয়া গোটা একটি খাসী রাঁধিয়া একাকী নিঃশেষ করায় খাজনা বাকী রেহাই পাইয়াছিলেন। এক বখস্ আলি মিয়া পাকী ৮ সের পোলাও কালিয়া স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করায় তাঁহার তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা এখনও নিজামৎ প্রাসাদে সযত্নে রক্ষিত। মনকে রঘু প্রভৃতির নাম এখনও অনেকের স্মৃতিপটে বিরাজমান। অপিচ, আহারের বর্ণনা উদরাময়গ্রস্ত ব্যক্তিরও অতৃপ্তিকর হইবেনা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'জনক ভূপতি' কন্যার বিবাহে যে সকল আহার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কিছু নিম্নে দেওয়া গেল:

ঘৃত দুগ্ধে জনক করিলা সরোবর,
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিলা মনোহর;
রাশি রাশি তণ্ডুল মিষ্টান্ন কাঁড়ি কাঁড়ি
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি;
অন্যত্র ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে কলা
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজলা।
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ
অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ। — রামা—আদি।

এস্থলে বিবাহের পরে বরের ভোজনের কথা আছে, বিশেষ বর্ণনা নাই। 'দধি দুগ্ধ দিলা রাজা ভোজনাবশেষে' এই নির্দ্দেশে সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রধান লোভনীয় দ্রব্যের উল্লেখ মাত্র আছে। কিন্তু

রাজরাণী গিয়া পরে করিলা রন্ধন।
কন্যা বর দুইজনে করিল ভোজন॥

এই উল্লেখে রাণীর স্বয়ং রন্ধনের কথায় সেকালের প্রথা সূচিত হইতেছে। আহারের অন্য উল্লেখ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বড় পাওয়া যায়না; লক্ষ্মণ-ভোজন ইহার বিষয় নহে। কুম্ভকর্ণের কলসী কলসী মদ্যপান ও পর্ব্বত-প্রমাণ রাশি রাশি মাংসভক্ষণে আমাদের কোন লাভ নাই।

কাব্য ও কুসুম।

পারসিক চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিঅনুসারে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

অতঃপর বৈষ্ণব সমাজের নিরামিষ আহারের কথা বলা হইবে। চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস গরীবের ছেলে এবং সরল প্রকৃতির ভক্ত লোক। তিনি 'শ্রী শাক ব্যঞ্জনে' গৌরচন্দ্রের তৃপ্তির কথায় শাকের ভাগ্য বর্ণন করিয়াছেন; পটল, বাস্তুক, সালঞ্চা, হেলেঞ্চায় কৃষ্ণভক্তি মিলিবার কথা বলেন। এখনও অধিক শাক ভক্ষণে শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বটে! বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শচীমাতার (আই) অদ্বৈতভবনে রন্ধন বর্ণনায় বলিতেছেন ঃ

> কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
> নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন ॥
> বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিয়া এতেকে।
>
> (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য

শ্রীশাকের প্রতি গৌরাঙ্গ প্রভুর অনুরাগ যতই থাকুক, দাস ঠাকুরের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অন্যত্র টোটার শাক তুলিবার এবং তেঁতুল পাতা বাটিয়া অম্বল করার কথাও আছে।

চৈতন্যভাগবতে 'দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স' সকলই আছে। শ্রীক্ষেত্রে অদ্বৈত প্রভুরা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া দশ প্রকার শাক রন্ধন করিয়া এবং

> 'ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক
> নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক'

দিয়া মহাপ্রভুর তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন—ইহাও দেখা যায়। অদ্বৈতভবনে মহোৎসবের কথায় বৃন্দাবন দাস 'ঘর দুই চারি তণ্ডুল', 'পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠ', 'ঘর পাচেক ঘট ও রন্ধনের স্থালী', 'ঘর দুই চারি মুদ্গের বিয়লী' সংগ্রহের কথা বলিয়া লিখিতেছেন ঃ--

> 'ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক,
> সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক।
> না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান,
> * * *
> 'পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান,
> কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ।
> সহস্র সহস্র ঘট দেখে দধি দুগ্ধ,
> ক্ষীর ইক্ষু অঙ্কুরের সনে কত মুদ্গ।'
>
> ইত্যাদি (চৈ, ভাঃ অন্ত্য)।

কিন্তু দাস ঠাকুর কোথাও তাঁহার সময়ের রন্ধনের বিশেষ বর্ণনা দেন নাই। এই অভাব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় পূরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান ঝামটপুর, কাটোয়ার দুইক্রোশ উত্তরে; বৃন্দাবন দাসের লীলাভূমি দেনুড় কাটোয়ার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। উভয়েই একস্থানের লোক, সুতরাং তাহাদের বর্ণনায় কাটোয়া অঞ্চলের সেকালের আহার্য্যের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীচৈতন্য তিন দিন প্রেমবিহ্বলভাবে অনাহারে ঘুরিলেন। শেষে গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আহার করিতেছেন ঃ

> 'মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
> চারিদিকে ব্যঞ্জন দোনা আর মুদ্গ সূপ।
> বাস্তুক শাক পাক করি বিবিধ প্রকার
> পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মান কচু আর।
> চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া আর মূল ফলে
> অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।
> কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী
> পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
> নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর,
> মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।
> মধুরাম্ল, বড় অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়
> সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত কয়।
> মুদ্গ বড়া, মাষ বড়া, কলা বড়া মিষ্ট
> ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলি যত পিঠা ইষ্ট।
> সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া
> তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া।
> দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকি [illegible] ভরি,
> চাপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।
>
> (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য [illegible])।

শ্রীক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে অনেক সাধ্য সাধির পরে গৌরচন্দ্র একদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী যাঠীর মাতা সযত্নে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন পাক করিলেন। আহার্য্য ও পরিবেষণের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ--

> "বত্রিশা কলার এক আঙ্গেটিয়া পাত।
> উত্তারিল তিন মান তণ্ডুলের ভাত।
> পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল
> চারি দিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল।
> কেয়াপাতের খোলা ডোঙ্গা সারি সারি
> চারি দিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি।
> দশবিধ শাক নিম্ব তিক্ত সুক্তার ঝোল
> মরিচের ঝালে ছেনাবড়ি বড়া ঘোল।
> দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেশারী নাফরা
> মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা, বিবিধ শাকরা।
> ফুলবড়ি ফল মূলে বিবিধ প্রকার
> বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড-বড়ির ব্যঞ্জন অপার।
> নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী
> ফুলবড়ি পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।

এই মাষ মুদ্গাসূপ অমৃত নিন্দয়
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলি আর পিষ্ট।
কাঞ্জী বড়া দুগ্ধ চিড়া দুগ্ধ লকলকী
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তার পরি।
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।

অন্যত্র সেকালে জলপানের আয়োজন বর্ণনায় প্রবীণ কবিরাজ মহাশয় শ্রীক্ষেত্রের 'বনগণ্ডী ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত' তাহা দেখাইয়াছেন :

ছানা পানা পেড়াম নারিকেল কাঁঠাল,
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল।
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জুর।
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার
অমৃত গোটিকা আদি খিরিসা অপার।
অমৃত মোণ্ডা সেবতি কর্পূর কুলী
রসামৃত শরভাজা আর শরপুলি।
হরিবল্লভা সেবতি কর্পূর মালতী
ডালিমা মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতি।
পদ্ম চিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ড সার
বিয়ড়ি কদম্বা তিলা খাজার প্রকার।
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম বৃক্ষের আকার
ফল ফুল পত্র যুত খণ্ডের বিকার।
দধি দুগ্ধ দধিতক্র রশালে শিখরিণী
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।
লেম্বু কোলা আদা নানা প্রকার আচার
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার।

চৈঃ চঃ মধ্য - ১৪।

বাঙ্গলা হইতে গৌর-ভক্তগণ বর্ষান্তরে শ্রীক্ষেত্রে আসিতেছেন ; সঙ্গে প্রভুর ভোগের জন্য কি আনিয়াছিলেন, জানিয়া লইতে আমাদের মত প্রসাদভক্ত লোকের স্বতঃই অনুরাগ হইবে : —

নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ,
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপভোগ।
আম কাসন্দি আদা কাসন্দি ঝাল কাসন্দি নাম
নেম্বু আদা আম্র কোলি বিবিধ বন্ধান।
আমসি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা,
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ শুকতা।
শুকতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে
শুকতায়ে যে সুখ প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে।

* * *

ধনিয়া মৌরির তণ্ডুল চূর্ণ করিঞা,
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিঞা।
শুণ্ঠি খণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর,
পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কোথলি ভিতর।
কোলি শুণ্ঠী কোলি চূর্ণ কোলি খণ্ড আর
কত নাম লৈব শত প্রকার আচার।
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল
চিরস্থায়ি খণ্ড বিকার করিল সকল।
চিরস্থায়ি খিরসার মণ্ডাদি বিকার
অমৃত কর্পূরী আদি অনেক প্রকার।
সান্দিকাচুটি ধান্যের অন্ন চিড়া করি
নূতন বস্ত্রের বড় বড় কথলি ভরি।
কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
সান্দি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিঞা
ঘৃত সহিত সিক্ত কৈল চিনি পাক দিয়া।
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।
সান্দি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া
চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া তার নাড়ু কৈল।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।

বঙ্গাগত ক্ষেত্র-যাত্রীদল শ্রীচৈতন্যের নিমিত্ত এই সমুদয় ভোগের দ্রব্য লইয়া যান না যান, বাঙ্গালী বৃন্দাবন-যাত্রীরা যে সময়ে সময়ে ঐরূপ লইয়া যাইতেন, চরিতামৃতই তাহার প্রমাণ। এস্থলে গৌরচন্দ্রের সেবার বর্ণনায় দেখা যায়, —

যদ্যপি মাসেকের বাসি রসকরা নারিকেল
অমৃত গোটিকা আদি পানাদি সকল।
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্য স্বাদ
বাসি বিস্বাদ নহে কভু প্রভুর প্রসাদ।
শত জনের ভক্ষ্য প্রভু এক দণ্ডে খাইল
আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল।

তখন সবার সেরা যতনে সাজান 'রাঘবের ঝালি' মাত্র অবশিষ্ট আছে শুনিয়া প্রভু 'আজি রহুক পাছে দেখিব' আজ্ঞা দিলেন। পরে একদিন, 'প্রভু নিভৃতে ভোজন কৈল, স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল'। এইরূপে 'চতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে', পরে 'মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ'—এবং পুনরায় দুই চারি বার অন্ন ব্যঞ্জনের তালিকা। এ হেন চরিতামৃতে যার অরুচি সে নিতান্তই অব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেব কেবল প্রেম ভক্তিই শিক্ষা দেন নাই। ব্রাহ্মণকুমার গৌরচন্দ্রের আহারে অনুরাগ ত

স্বাভাবিক; চরিতামৃত গ্রন্থের নানাস্থানে ভোজনের পরিপাটী বর্ণনায় মনে হয়, বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়েরও প্রসাদে বেশ ভক্তি ছিল। যাহা হউক, তাঁহার প্রসাদে সে যুগের অনেক খাদ্যের নাম শুনিয়াও আমরা পরিতৃপ্ত হইতেছি। আমাদের এক সমালোচক বন্ধু শেষ বৈষ্ণব লেখকগণের বর্ণিত আহার্য্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য বা সংযমে সন্দিহান হইয়াছেন। লেখক ব্রাহ্মণ; তাঁহার কথায় সায় দিতে নিতান্ত নারাজ। ঠাকুরপ্রসাদ বা নিমন্ত্রণের রন্ধনে সাধারণ বৈষ্ণবের আহার্য্যের পরিচয় দেয় না, এটিও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া গোস্বামীরা শাক সবজী ও সন্দেশের তালিকা ক্রমশঃ বাড়াইয়াছেন, এই উক্তিও সমীচীন নহে। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় সেকালের প্রথা ও আহার উভয়ই দেখা যায়। তিনি গৌরাঙ্গের প্রায় সমসাময়িক। চরিতামৃত ও ভাগবত উভয় গ্রন্থেই বাল্যাবধি চৈতন্যের তথা নিত্যানন্দের ভোজনপটুতার পরিচয় পাইতেছি। কবিরাজ গোস্বামী একস্থলে "যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ; সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ" লিখিয়া 'নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি নচাত্যন্তমনশ্নতঃ'—গীতার শ্লোক ভুলিয়াছেন বটে কিন্তু সমসাময়িক বৈষ্ণবদলের ভোজনচতুরতার কথায় চরিতামৃত সমধিক পরিপুষ্ট। দধি এবং ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধের সহিত রম্ভা চিনি সংযোগে চিপীটকের ফলাহারের ঘটা সেকালের বৈষ্ণবসমাজে বিলক্ষণই ছিল। নিত্যানন্দ পাণিহাটীতে রঘুনাথের দ্বারা যে চিড়া-মহোৎসব দেওয়াইয়াছিলেন তাহাতে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়। একালে, এমন কি কবিকঙ্কণের সময়েও লুচি জন্মগ্রহণ করে নাই দেখা যাইতেছে। 'পীত ঘৃতসিক্ত অন্নস্তূপ' কেবল 'ঘি দেওয়া ভাত'; পলান্নের উদ্দেশ পাই নাই।

পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবসমাজের আহার বিহারেও আমরা এই মিষ্টান্নবহুল বর্ণনা দেখিতে পাই। ভক্তি-রত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে বহু মহোৎসবের উল্লেখ আছে; আহার্য্য বস্তুর রীতিমত নির্দ্দেশ না থাকিলেও সেই সমস্ত বিবরণ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে। মালসা ভোগের চিড়া-মহোৎসবই গোস্বামী প্রভুদিগের বিশেষ তৃপ্তিকর ছিল। যে যুগে ঘৃত বিষ, দুগ্ধ গোপ ভায়াদের হস্তে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত, চিনি ব্যবসায়ীর বুদ্ধিকৌশলে বালির সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া অপরূপ আকারে দর্শন দিয়াছেন এবং যে যুগের বাঙ্গালী আমরা নানা কারণে অম্লরোগগ্রস্ত, সেকালে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধুর সহিত লোকের সম্বন্ধবিচ্ছেদ বিচিত্র নহে। এখন যে মাংসাহারী নহে সে ভদ্রলোক কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকে। অনেক বৈষ্ণব মহাত্মাও মৎস্যের কথা দূরে থাকুক, গোপনে নিষিদ্ধ আহার্য্যের প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু নিরামিষাশী যে দুই এক জন নবরবপু বৈষ্ণব এখনও নয়নগোচর হয় তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনকাল প্রত্যক্ষ করিয়াও আহার সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা লোপ পায় নাই। তবে সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক দলের মুখে নিরামিষের প্রশংসা শুনিয়া কেহ কেহ সঙ্কুচিতভাবে মস্তক অবনত করিতেছেন বটে।

এক্ষণে সেকালের শাক্ত-সমাজের ও সাধারণ লোকের আহারের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাঢ় দেশের কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নানাস্থানে সেকালের বাঙ্গালীর ভোজ্য বস্তুর কথা বর্ণন করিয়াছেন। খুল্লনা চণ্ডীদেবীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া স্বামীর তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কি রন্ধন করিলেন, দেখুন :-

"বেগুন কুমড়া কড়া, কাচকলা দিয়া শাড়া
বেশর পিঠালী ঘন কাঠি।
ঘৃতে সম্ভোলিল তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথী
শুক্তা রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজা পলা কড়ি, নৈটা শাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ী কাটাল বীচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক, তৈলে বাস্থ করি পাক
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥
দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড
সম্ভোলিল মহুরির বাসে।
মুগ-সূপে ইক্ষুরস, কে ভাজে পণ দশ
মরিচ গুঁড়িয়া আদা রসে॥
মহুরি মিশ্রিত মাস, সূপ রাঁধে রস বাস
হিঙ্গু জীরে বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিথলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল
মান বড়ি মরিচে ভূষিত॥

*

বোদালি হেলেঞ্চা শাক, কাঠি দিয়া কৈল পাক
ঘন বেসার সম্ভোলন তৈলে।

কিছু ভাজে রাই খড়া চিঙ্গড়ীর তোলে বড়া
খরসোলা পুটি দশ তোলে ॥
করিয়া কণ্টকহীন, আমে শউল মীন,
খর লুণ দিয়া ঘন কাটি ।
রান্ধিল পাকাল ঝস দিয়া তেতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জাল করি ভাঁটি ॥
কলাবড়া মুগসাউলি, ক্ষীরমোনা ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে ।"

ক. ক. চণ্ডী ।

অন্যত্র,

* * *

নিমে শিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত ।
বেশম মাখিয়া রান্ধ সরিষার শাক
কটু তেলে বেথুয়া করিবা দড় পাক ।
খণ্ডে মুগের সূপ উত্তার ডাবরে
আচ্ছাদন থালাখানি তাহার উপরে
কড়াইতে কড়িয়া আনিবে নারিকেল
পিঠালী মিশায়া তথি দিবে কিছু জল ।
আমড়া সংযোগে তবে রাঁধিবে পালঙ্গ
ঘন কাটি খর জ্বালে বাথ ভাল খণ্ড ।

ইত্যাদি । ক. ক. চ.

এই হইল সেকালের রাঢ় অঞ্চলের ভদ্র গৃহস্থের বাটীর রন্ধন। ব্যাধপত্নী নিদয়ার সাধ-বর্ণনে নিম্ন শ্রেণীর সসত্ত্বা স্ত্রীলোকের পক্ষে সুভোজ্য বস্তুরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এখনও বঙ্গীয় পল্লীর অনেক গর্ভবতী ললনা সেই সমস্ত রসনার তৃপ্তিকর ভোজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। তিন শতাব্দী ধরিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর নিরামিষ আহার্য্যের তালিকার অধিক কিছু প্রভেদ দেখা যায় না। বৈষ্ণব-সমাজে মিষ্টান্ন ও পিষ্টক পায়সের কিছু বাড়াবাড়ি হইলেও সাধারণ ব্যঞ্জন পাকের ব্যবস্থা শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সমাজেই এক ভাবের ছিল দেখা যায়।

কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁহার সময়ের ভদ্র সমাজের পাকের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। ভবানন্দ মজুমদারের পত্নী পদ্মমুখী অন্নদার পূজায় ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমিত্ত যে সমস্ত রন্ধন করিলেন তাহার রস গ্রহণ করুন :

"হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক
শড়শড়ী ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক ।
ডাল রান্ধে ঘনতর ছোলা অড়হরে
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে ।
বড়া বড়ি কলা মূলা নারিকেল ভাজা
তধ থোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা ।
কাঁঠালের বীজ রান্ধে চিনি রসে গুড়
তিল পিঠালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া

* * *

কাতলা ভেকুট কই কাল ভাজা কোল
শিক-পোড়া ঝুরী কাঁঠালের বীজে ঝোল ।
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই
কই মাগুরের ঝোল, ভিন্ন ভাজে কই ।
ময়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার
চিঙ্গড়ীর ঝোল ভাজা অমৃতের তার ।
কণ্টা দিয়া রান্ধে কই কাতলার মুড়া,
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুড়া ।
আম দিয়া শোল মাছে ঝোল চড়চড়ী
আড়ি রান্ধে আদা রসে দিয়া ফুলবড়ী ।
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল শাক
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক ।
বাচার করিল ঝোল খয়রার ভাজা
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা ।

* * *

অতঃপর

বড়া কিছু, সিদ্ধ কিছু, কাছিমের ডিম
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ।
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝোল ঝোল রসা
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচি সমসা ।
অন্য মাংস শিক ভাজা কাবাব করিয়া
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিয়া ।

* * *

শেষে

বড়া হলো আশিকা পিযুষী পুরী পুলি
চুটী রুটি রামরোট মুগের শামলী ।
কলাবড়া ঘিওর পাপর ভাজা পুলি
সুধা রুচি মুচি মুচি লুচি কত গুলি ।
পিঠা তৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা ।" ইত্যাদি ।

অন্নদামঙ্গল ভাঃ চঃ ।

অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৰ্দ্ধমানের নিরামিষ পাকের স্বাদ গ্রহণ করিবেন ? রাঁধুনীতে কিছু গোলযোগ আছে ।

"মন্দ মন্দ জ্বালে ঝালে বসে ভাজে ভাজা,
কদলী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা ।
কটে রাখে নায়িকা লবণ মাখি থালে
নির্জ্জলা করিয়া রামা তপ্ত ঘৃতে ঢালে ।
মান কচু কুন্দরকী হবিষ্যান্ন সব,
ফল মূল ভাজে কত ঘৃতে জবজব ।
ভাজিল বেগুন সীম নিম দিয়া ফোড়,
মূলা আদা বটিকা করলা গর্ভ-থোড় ।
সম্বাল বকাল কত মিছরি মিশাইয়া
দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া ।
চিঁড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা
ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা ।
ঘৃতপক্ক লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রাঁধে অবশেষে ।"

ঘনরাম- ধঃ মঙ্গল, ৩৮৯ ।

অন্নদামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গলে আসিয়া লুচির উদ্দেশ পাওয়া গেল এ একটা মঙ্গলের সংবাদ। ধর্ম্মমঙ্গলে জলখাবারের উদ্যোগে অন্যত্র :—

"লাড়ু কলা চিনি ফেনী ক্ষীরখণ্ড খই।
মজা মত্তমান মিছরি খাসা ক্ষীর খণ্ড,
মনোহরা মতিচুর খাসামৃত মণ্ড।"

পাওয়া যায়। একালে ঘৃতপক্কের ব্যবস্থাটা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়া আসিতেছে দেখা গেল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'মঙ্গলের' কবিদ্বয় রাজবাটীর আহারে পরিপুষ্ট।

দেখা গেল, ভারতচন্দ্রের সময়ে নবাব দরবারে অভ্যস্ত কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে 'কালিয়া, কাবাব, দোলমা' দেখা দিয়াছে। আমাদের একজন বন্ধু সভয়ে বলিয়াছেন—"কোম্মা কোপ্তা, কারি কটলেট্ প্রভৃতি ককারাদি ব্যঞ্জনের প্রকোপে বুঝি বা ঝাল ঝোল, দালনা চড়চড়ি, আর বাঙ্গালী বাবুর মুখে রুচিবেনা"। প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট রন্ধন দেশে দুর্লভ হইয়া পড়িতে চলিল। কারণ বাবুদের মত বাবুর গৃহিণীদেরও এখন আর কষ্টসাধ্য কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি হয় না। সেকালে রন্ধনকার্য্যে গৃহকর্ত্রীরই পূর্ণাধিকার ছিল। একালের মত অজ্ঞাতকুলশীল রসুয়ে বামন ঠাকুর বা বাবুর্চ্চী বাবাজীর অধিকার তখনও আরম্ভ হয় নাই। সেকালের প্রবাসীরা অন্য অনাচারে আপত্তি না করিলেও আহার বিষয়ে শুচি ছিলেন, অনেকেই এই অবস্থায় স্বপাক খাইতেন; দাসী যোগাড় করিয়া দিত মাত্র। সেকালে ছোট বড় এমন কি রাজাদের গৃহিণীরাও স্বয়ং রন্ধন করিতেন; কুত্রাপি নিজের আত্মীয় অন্য রমণীকে নিযুক্ত করা হইত। রন্ধন-কলায় নিপুণা হইবার নিমিত্ত ইতর ভদ্র সকল মহিলাই প্রাণপণে যত্ন করিতেন। রাণী ভবানী স্বপাক খাইতেন এবং পশ্চাতে স্বয়ং রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এবং রাজবল্লভের পত্নীরা স্বয়ং পাক করিয়া পতি পুত্রকে খাওয়াইতেন। রাজা পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি কুটুম্ব লইয়া এক সঙ্গে আহার করিতেন।

শিবায়নে—

* * *

চটপট চামুণ্ডা চড়ায়ে দিলা পাক॥
শঙ্করীর হুঙ্কারে কিঙ্করী করে ত্রস্ত।
পায়স পর্য্যন্ত পর প্রস্তুত সমস্ত॥
রাজরাজেশ্বরী রামা রান্ধেন যাবন্ত।
পায়স করিয়া আদি সূপ করি অন্ত॥
চর্ব্বচূষ্য লেহ্যপেয় তিক্ত কষায়ণ।
অম্ল মধু চতুর্ব্বিধ ব্যঞ্জনের গণ॥

এখানেও রাজরাজেশ্বরীর রন্ধনবার্ত্তায় বড় ঘরের রাজেশ্বরীর স্বয়ং রন্ধন সূচিত হইতেছে। একালে আমার মহাকালী পাঠশালার মতে স্থানে স্থানে বালিকাদের রন্ধন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পাক প্রণালী বলিয়া পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। ঘরের কাজ পরের দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে কি?

আহার ব্যবহারে বিলাসিতা সেকালের সমাজ মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। রন্ধনকার্য্যে প্রশংসা পাইলে মহিলাগণ উল্লসিত হইতেন; কেহ ভাল রাঁধিতে জানেন না বলিলে তাহা গালাগালি অপেক্ষাও অধিক লজ্জার বিষয় হইত। যাহারা ভোজকাজে রন্ধনশালার ভার পাইতেন, তাহাদের শ্লাঘার সীমা থাকিত না। এখনও পল্লী-সমাজে এই ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু একালে সহরে যে হাওয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রবাহিত থাকিলে বড় অধিক আশা নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য *

আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বাংলায় নামসংজ্ঞা ছাড়া বিশেষ্যপদবাচক শব্দ মাত্রই সহজ অবস্থায় সামান্য

* বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যকরূপ নামক প্রবন্ধে, বাংলায় বিশেষ বিশেষ স্থলে কর্ত্তৃকারকে একার যোগে যে রূপ হয় তাহাকে তির্য্যকরূপ নাম দিয়াছিলাম। তাহাতে কোনো পাঠক আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহাকে বলা উচিত কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। নাম লইয়া তর্ক নিষ্ফল। না হয় নাই বলিলাম "তির্য্যকরূপ" না হয় আর কোনো নাম দেওয়া গেল। আমার বক্তব্য এই ছিল, যে, কোনো কোনো স্থলে বাংলা বিশেষ্যপদ তাহার সহজরূপ পরিত্যাগ করে। তাহার এই রূপের বিকারকেই অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত তুলনা করিয়া "তির্য্যকরূপ" নাম দিয়াছিলাম। ঘোড়ে, কুত্তে প্রভৃতি হিন্দি শব্দই হিন্দি তির্য্যকরূপের দৃষ্টান্ত; ঘোড়ওয়া, কাহারওয়া প্রভৃতি শব্দ নহে অন্তত তুলনামূলক ব্যাকরণবিদগণ শেষোক্তগুলিকে তির্য্যকরূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীয় কথা এই, বাংলা কর্ত্তৃকারকের একারসংযুক্ত রূপকে যদি সংস্কৃত কোনো বিভক্তির নাম দিতেই হয় তবে আমার মতে তাহা সপ্তমী নহে তৃতীয়া। বাংলা "বাঘে খাইল" বাক্যটি সংস্কৃত "ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ" বাক্য হইতে উৎপন্ন এমন অনুমান করা যাইতেও পারে। যাহাই হোক এসকল অনুমানের কথা। আমার সে প্রবন্ধে আসল কথাটা ব্যাকরণের নাম নহে, ব্যাকরণের নিয়ম।

বিশেষ্য। অর্থাৎ তাহা জাতিবাচক। যেমন, শুধু "কাগজ" বলিলে বিশেষভাবে একটি বা অনেকগুলি কাগজ বোঝায় না, তাহার দ্বারা সমস্ত কাগজকেই বোঝায়।

এমন স্থলে যদি কোনো বিশেষ কাগজকে আমরা নির্দ্দেশ করিতে চাই তবে সে জন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা আবশ্যক হয়।

ইংরেজি ব্যাকরণে এইরূপ নির্দ্দেশক চিহ্নকে Article বলে। বাংলাতেও এই শ্রেণীর সঙ্কেত আছে। সেই সঙ্কেতের দ্বারা সামান্য বিশেষ্যপদ একবচন ও বহুবচন রূপ ধারণ করিয়া বিশেষ বিশেষ্যে পরিণত হয়। একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য, বিশেষ্যপদ, একবচন বা বহুবচনরূপ গ্রহণ করিলেই, সামান্যতা পরিহার করে। একটি ঘোড়া বা তিনটি ঘোড়া বলিলেই ঘোড়া শব্দের জাতিবাচক অর্থ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে তখন বিশেষ এক বা একাধিক ঘোড়া বোঝায়—সুতরাং তখন তাহাকে সামান্য বিশেষ্য না বলিয়া বিশেষ বিশেষ্য বলাই উচিত। এই কথা চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন আমাদের সামান্য বিশেষ্য এবং ইংরেজি Common name এক নহে।

বিশেষ বিশেষ্য একবচন।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে বাংলার নির্দ্দেশক চিহ্নগুলি শব্দের পূর্ব্বে না বসিয়া শব্দের পরেই যোজিত হয়। ইংরেজিতে "the room" বাংলায় "ঘরটি"। এখানে "টি" নির্দ্দেশক চিহ্ন।

টি ও টা।

ইংরেজিতে the আর্টিক্‌ল একবচন এবং বহুবচন উভয়ত্রই বসে কিন্তু বাংলায় টি ও টা সঙ্কেতের দ্বারা একটিমাত্র পদার্থকে বিশিষ্ট করা হয়। যখন বলা হয়, "রাস্তা কোন্ দিকে" তখন সাধারণভাবে পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়—যখন বলি, "রাস্তাটা কোন্ দিকে"—তখন বিশেষ একটা রাস্তা কোন্ দিকে সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়।

ইংরেজিতে "the" শব্দের প্রয়োগ যত ব্যাপক বাংলায় "টি" তেমন নহে। আমাদের ভাষায় এই প্রয়োগ সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা আছে। সেই জন্যে যখন সাধারণ ভাবে আমরা খবর দিতে চাই, মধু বাহিরে নাই, তখন আমরা শুধু বলি, মধু ঘরে আছে—ঘর শব্দের সঙ্গে কোনো নির্দ্দেশক চিহ্ন যোজনা করি না। কারণ ঘরটাকেই বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ইংরেজিতে এস্থলেও "the room" বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোনো একটি বিশেষ ঘরে মধু আছে এই সংবাদটি দিবার প্রয়োজন ঘটে তখন আমরা বলি, ঘরটাতে মধু আছে। এইরূপ, যে বাক্যে একাধিক বিশেষ্যপদ আছে তাহাদের মধ্যে বক্তা যেটিকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিতে চান সেইটির সঙ্গেই নির্দ্দেশক যোজনা করেন। যেমন, গোরুটা মাঠে চরচে, বা মাঠটাতে গোরু চরচে। জাজিমটা ঘরে পাতা, বা ঘরটাতে জাজিম পাতা। "আমার মন খারাপ হয়ে গেছে" বা "আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে"—দুইই আমরা বলি। প্রথম বাক্যে, মন খারাপ হওয়া ব্যাপারটাই বলা হইতেছে—দ্বিতীয় বাক্যে, আমার মনই যে খারাপ হইয়া গেছে তাহার উপরেই ঝোঁক।

"টি" সঙ্কেতটি ছোট আয়তনের জিনিষ ও আদরের জিনিষ সম্বন্ধে এবং "টা" বড় জিনিষ সম্বন্ধে বা অবজ্ঞা কিম্বা অপ্রিয়তা বুঝাইবার স্থলে বসে। যে পদার্থ সম্বন্ধে আদর বা অনাদর কিছুই বোঝায় না তৎসম্বন্ধেও "টা" প্রয়োগ হয়। "ছাতাটি কোথায়" এই বাক্যে ছাতার প্রতি বক্তার একটু যত্ন প্রকাশ হয়, কিন্তু "ছাতাটা কোথায়" বলিলে যত্ন বা অযত্ন কিছুই বোঝায় না।

সাধারণত নামসংজ্ঞার সহিত "টা" "টি" বসে না। কিন্তু বিশেষ কারণে ঝোঁক দিতে হইলে নামসংজ্ঞার সঙ্গেও নির্দ্দেশক বসে। যেমন, হরিটা বাড়ি গেছে। হরির বাড়ি যাওয়া বক্তার পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই, টা তাহাই বুঝাইল। "রামটি মারা গেছে" এখানে বিশেষ ভাবে করুণা প্রকাশের জন্য টি বসিল। এইরূপ, শ্যামটা ভারি দুষ্ট, শৈলটি ভারি ভাল মেয়ে। এইরূপে টি ও টা অনেক স্থলে বিশেষ শব্দের সঙ্গে বক্তার হৃদয়ের সুর মিশাইয়া দেয়। বলা আবশ্যক মান্য ব্যক্তির নাম সম্বন্ধে টি বা টা ব্যবহার হয় না।

সামান্যতাবাচক বা সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদকেও বিশেষ-ভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইলে নির্দ্দেশক প্রয়োগ করা যায়-

যেমন "গিরিডির কয়লাটা ভাল", "বেহারের মাটিটা উর্ব্বরা", "এখানে মশাটা বড় বেশি", "ভীম নাগ সন্দেশটা করে ভাল।" কিন্তু শুদ্ধ অস্তিত্ব জ্ঞাপনের সময় এরূপ প্রয়োগ খাটে না; বলা যায় না, "ভীমের দোকানে সন্দেশটা আছে।"

এখানে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যখন বলা যায় "বেহারের মাটিটা উর্ব্বরা" বা "ভীমের দোকানের সন্দেশটা ভাল" তখন প্রশংসা সূচনা সত্ত্বেও "টা" নির্দ্দেশক ব্যবহার হয় তাহার কারণ এই যে, এই বিশেষ্য পদগুলিতে যে সকল বস্তু বুঝাইতেছে তাহা পরিমাণে অল্প নহে।

যখন আমরা কর্ত্তৃবাচক বিশেষ্যকে সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়া পরিচয়বাচক বিশেষ্যকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করি, তখন শেষোক্ত বিশেষ্যের সহিত নির্দ্দেশক যোগ হয়। যেমন, "হরি মানুষটা ভাল", "বাঘ জন্তুটা ভীষণ।"

সাধারণতঃ গুণবাচক বিশেষ্যে নির্দ্দেশক যোগ হয় না বিশেষত শুদ্ধমাত্র অস্তিত্ব জ্ঞাপনকালে ত হয়ই না। যেমন, আমরা বলি, "রামের সাহস আছে।"---কিন্তু "রামের সাহসটা কম নয়", "উমার লজ্জাটা বেশি" বলিয়া উমার বিশেষ লজ্জা ও রামের বিশেষ সাহসের উল্লেখকালে টা প্রয়োগ করি।

ইংরাজিতে "this" "my" প্রভৃতি সর্ব্বনাম বিশেষণ পদ থাকিলে বিশেষ্যের পূর্ব্বে আর্টিকল বসে না কিন্তু বাংলায় তাহার বিপরীত। এরূপ স্থলে বিশেষ করিয়াই নির্দ্দেশক বসে। যেমন, "এই বইটা," আমার কলমটি।"

বিশেষণ পদের সঙ্গে "টা" "টি" যুক্ত হয় না। যদি যুক্ত হয় তবে তাহা বিশেষ্য হইয়া যায়। যেমন, "অনেকটা নষ্ট হয়েছে", "অর্দ্ধেকটা রাখ", "একটা দাও", "আমারটা লও", "তোমরা কেবল মন্দটাই দেখ" ইত্যাদি।

নির্দ্দেশক চিহ্ন যুক্ত বিশেষ্যপদে কারকের চিহ্নগুলি নির্দ্দেশকের সহিত যুক্ত হয়। যেমন "মেয়েটির", "লোক টাকে", "বাড়িটাতে" ইত্যাদি।

অচেতন পদার্থবাচক বিশেষ্যপদে কর্ম্মকারকে "কে" বিভক্তিচিহ্ন প্রায় বসে না। কিন্তু "টি" "টা"র সহযোগে বসিতে পারে। যেমন, "লোহাটাকে", "টেবিলটিকে" ইত্যাদি।

ক্রোশটাক সেরটাক প্রভৃতি দূরত্ব ও পরিমাণ বাচক শব্দের "টাক" প্রত্যয়টি টা ও এক শব্দের সন্ধিজাত। কিন্তু এই "টাক" প্রত্যয়যোগে উক্ত শব্দগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ক্রোশটাক পথ, সেরটাক দুধ ইত্যাদি। কেহ কেহ মনে করেন এগুলি বিশেষণ নহে। কারণ, বিশেষ্য ভাবেও উহাদের প্রয়োগ হয়। যেমন "ক্রোশটাক গিয়েই বসে পড়ল", "পোয়াটাক হলেই চলবে।"

যদিচ সাধারণত টি টা প্রভৃতি নির্দ্দেশক সঙ্কেত বিশেষণের সহিত বসে না, তা একস্থলে তাহার ব্যতিক্রম আছে। সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত নির্দ্দেশক যুক্ত হইয়া বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, একটা গাছ, দুইটি মেয়ে ইত্যাদি।

বাংলায় ইংরেজি Indefinite article-এর অনুরূপ শব্দ, একটি, একটা। একটা মানুষ বলিলে অনির্দ্দিষ্ট কোনো একজন মানুষ বুঝায়। "একটা মানুষ ঘরে এল" এবং "মানুষটা ঘরে এল" এই দুই বাক্যের মধ্যে অর্থভেদ এই প্রথম বাক্যে যে হউক একজন মানুষ ঘরে আসিল এই তথ্য বলা হইতেছে, দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ কোনো একজন মানুষের কথা বলা হইতেছে।

কিন্তু "একটা" বা "একটি" যখন বিশেষভাবে এক সংখ্যাকে জ্ঞাপন করে তখন তাহাকে indefinite বলা চলে না। ইংরাজিতে তাহার প্রতিশব্দ one। সেখানে একটা লোক মানে এক সংখ্যক লোক, কোনো একজন অনির্দ্দিষ্ট লোক নহে।

যেখানে "এক" শব্দটি অপর একটি বিশেষণের পরে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় সেখানে সাধারণত "টি" "টা" প্রয়োগ চলে না—যেমন, লম্বা-এক ফর্দ্দ, মস্ত-এক বাবু, সাত হাত এক লাঠি।

বলা বাহুল্য, এক ভিন্ন অন্য সংখ্যা সহযোগে যেখানে টি টা বসে সেখানে তাহাকে Indefinite article-এর সহিত তুলনীয় করা চলে না, সেখানে তাহা সংখ্যাবাচক বিশেষণ।

খানি খানা প্রভৃতি আরো কয়েকটি নির্দ্দেশক চিহ্ন আছে, তাহাদের কথা পরে হইবে।

বলা আবশ্যক সংস্কৃতের অনুকরণ করিতে গিয়া বাংলা লিখিত ভাষায় নির্দ্দেশক সঙ্কেতের ব্যবহার বিরল হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী তাঁহাদের রচনায় ইহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু বাংলায় বক্তা ইচ্ছা করিলে কোনো একটি বিশেষ্যপদকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিতেও পারেন নাও করিতে পারেন সেইজন্য ইহাকে বর্জ্জন করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক রীতিকে ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে দুর্ব্বল করা হয়। আধুনিক কালের লেখকগণ মাতৃভাষার সমস্ত স্বকীয় সম্পদগুলিকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমশই ভাষাকে প্রাণপূর্ণ ও বেগবান করিয়া তুলিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনজিমা জাতি বা কাচানাগা

অনজিমা বা ইনজিমা জাতি নাগা সম্প্রদায়ের একটী শাখা বিশেষ। ইহারা বুরাইল পর্ব্বতে (Burrial Hills) ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বাস করে। সাধারণতঃ ইহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা

১। জেমি (Zemi) জিমি বা সেন্ গিমা।

২। ইমবো (Embo) বা আরঙ্গ (Arung)।

৩। কোইরেঙ্ (Kowi-reng) বা লিঙ্রঙ্।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী কাছাড় পর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণ উপত্যকায় এবং শেষোক্ত শ্রেণী মণিপুর সীমান্তে বসবাস করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা অন্যূন চল্লিশ সহস্র।†

উৎসববেশে সজ্জিত নাগা পুরুষ।

ইহাদের গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী অতীব সুন্দর। গৃহের ছাদটী গুরুভারপ্রপীড়িত হইয়া প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করে। প্রবেশ করিতে হইলে হামাগুড়ি দেওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই।

গ্রামগুলি অতি ক্ষুদ্র ও পরস্পর সংলগ্ন; কিন্তু প্রত্যেক গ্রামই একজন প্রধান বা মণ্ডলের অধীনে স্বাধীন। এই 'প্রধান' পদ বংশানুযায়ী। অধীনস্থ লোকদিগকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষাপ্রদান এবং বিপদাপদে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণই তাহার প্রধান কার্য্য।

বেশভূষা সম্বন্ধে তাহারা তেমন উদাসীন নহে। একখানি অপ্রশস্ত নাতিদীর্ঘ নীল রঙ্গের গামোছা বা ধুতি দ্বারা তাহারা কোমরটী ঘিরিয়া রাখে, কিন্তু বস্ত্রখানি কখনও উরুদেশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্তও পৌঁছায় না। স্ত্রীলোকের হাঁটু হইতে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত কালো রঙ্গের বেতের খাড়ু তাহাদের শোভাবর্দ্ধন করে। এই খাড়ুগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে তাহা একটী বলিয়া ভ্রম হয়। আমাদের দেশের পশ্চিমে স্ত্রীলোকগণ ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ বলিয়া মনে হয় না। শরীরের উপরার্দ্ধ অনাবৃত থাকে। কর্ণের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য মাকড়ি পরিয়া অথবা কর্ণটীকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে, এবং নানাপ্রকার কড়ি, শঙ্খ, শামুক ও বিচিত্র বর্ণের পালকাদি দ্বারা এক অপূর্ব্ব মালা রচনা করিয়া অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার মানসে

---

* এই প্রবন্ধে নির্দ্দেশক নামক একটি নূতন পারিভাষিক ব্যবহার করিয়াছি। পাঠকদের প্রতি আমার নিবেদন এইরূপ নামকরণ অভাবে ঠেকিয়া দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধে আমার কোনো মমতা বা অভিমান নাই। এই সকল নামকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাষার মর্ম্মগত সমস্ত নিয়মের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার মধ্যে ভুল ও অসম্পূর্ণতা থাকাই সম্ভব। কারণ বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার নিয়ম আলোচনার চেষ্টা তেমন করিয়া হয় নাই। পাঠকগণ আমার এই ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধের ভুল সংশোধন ও অভাব পূরণ করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

† Outline Grammar, by Mr. C. A. Soppitt, published at Shillong.

নাগাদিগের দারুময় দেবতা, ও নাগা স্ত্রীলোক ও পুরুষের সাধারণ বেশ।

নানা ভঙ্গীতে গলদেশে ধারণ করে। মস্তকের কেশকলাপ কর্ত্তনকৌশলেই হউক কিম্বা অন্য কোন প্রকার কৃত্রিম উপায়েই হউক সজারু-কণ্টক-বিনিন্দিত করিয়া তুলে, এবং মস্তকটা বৃষস্কন্ধোপরি প্রস্ফুটিত কদম্ব পুষ্পের ন্যায় শোভা পায়।

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র 'বর্ষা' এবং 'দা'ই তাহাদের প্রধান সম্বল। তবে আজকাল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বন্দুকও পাইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগের পোষাকপরিচ্ছদ অবশ্য বিভিন্ন প্রকারের। তাহারা নীল ও শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে এবং তাহা নাতিদীর্ঘ হইলেও কোন প্রকারে জানু পর্য্যন্ত পৌছায়। ইহা ব্যতীত আরও একখানি ত্রিকোণাকৃতি বিচিত্র বস্ত্র তাহারা নৃত্যগীতাদি উৎসবসময়ে পরিধান করিয়া থাকে। এই বস্ত্রখানি দৃঢ়রূপে স্তনের উপরিভাগে আবদ্ধ থাকে এবং একটা অগ্রভাগ নাভিমূল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে।

অবিবাহিতা বালিকাগণ ছোট ছোট করিয়া চুল ছাঁটিয়া ফেলে, কিন্তু বিবাহের পর হইতেই কেশের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত অনুরাগ দেখা যায়। তখন আর তাহারা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে না। সংবদ্ধ কেশকলাপ পৃষ্ঠদেশে দুলিতে থাকে। কুমারীগণ গলায় শামুক, শঙ্খ এবং মোটা কাচের মালা এবং হস্তে পিতল, দস্তা বা কখন কখন রূপার বালা পরে। এই অপূর্ব্ব বেশবিন্যাস প্রণয়াস্পদের মন আকর্ষণের নিমিত্ত কুমারীগণের একটা ফাঁদ বিশেষ।* বিবাহের পরে তাহারা স্বীয় অবিবাহিত আত্মীয় স্বজনকে এই সকল অলঙ্কার প্রদান করিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হয় এবং বস্ত্র বয়ন, কাষ্ঠ সংগ্রহ ও অষ্টপ্রহর পতিসেবায় নিযুক্ত থাকে।

ইহাদের কৌতুকাবহ বিবাহপদ্ধতির অনুসরণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সমাজের তমসাচ্ছন্ন

* Mr. Soppitt's remarks on Wilder Tribes.

মাতৃগর্ভ হইতে ইহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ আলোকের পথে অগ্রসর হইতেছে। পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই মনোনীত যুবক মনোনীতা যুবতীর পিতৃগৃহে রজনী অতিবাহিত করিতে পারে। বিবাহের পরে বর কন্যার পিতামাতাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করে এবং এই প্রকারে বিবাহের পূর্ব্বে শ্বশুরগৃহে রাত্রিবাসজনিত ঋণ হইতে মুক্ত হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা মাতার নামানুসারে পুত্রের নামকরণ হয় না। গ্রামে অতি বৃদ্ধ পুরুষ বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নামানুসারে কিম্বা তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে নামকরণ হয় এবং সন্তানের পিতামাতাকে—অমুকের 'বাপ্', অমুকের 'মা' ইত্যাদি বলিয়া ডাকা হয়। কোন স্ত্রীপুরুষের বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্তও সন্তান না হইলে তাহারা 'অপুত্রকের পিতা' ও 'অপুত্রকের মাতা' নামে অভিহিত হয়। কেহ আর তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকে না এবং এই প্রকারে তাহাদের পূর্ব্বনাম লোপ পায়।

পিতামাতার মৃত্যুর পর পুত্রই উত্তরাধিকারসূত্রে সকল ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়, কন্যা কেবল মাত্র মাতার অলঙ্কার প্রাপ্ত হয়। কোন পুরুষ কেবল মাত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তাহার নিকট আত্মীয় কোন পুরুষ সেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারী হয় কিন্তু কন্যা কিছুই পায় না।*

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে না। কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে পারে না।

ইহাদিগের মধ্যে নৃত্য দুই প্রকার:—তাণ্ডব নৃত্য ও সাধারণ নৃত্য। তাণ্ডব নৃত্যে কেবল মাত্র পুরুষগণেরই অধিকার। সাধারণ নৃত্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই যোগদান করিয়া থাকে।

ইহারা শৃঙ্গ-চঞ্চু পক্ষীর (Hornbill) অত্যন্ত আদর ও সম্মান করে এবং তাহার পুচ্ছের বিচিত্র বর্ণের পালক সমর সজ্জায় পরমাদরে ব্যবহার করে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করে না। বিশেষতঃ তাহাদের মাংস অতি কোমল ও উপাদেয় বলিয়া আগ্রহ সহকারে ভোজন করে। যে পাখীটার বাসার প্রবেশ দ্বার পশ্চিম দিকে, সেই বাসাটা নষ্ট করা ইহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

অনজিমাজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম—হানারা। এই সময় তাহারা তাহাদের গ্রামের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং অষ্টপ্রহর পাহারা দিয়া থাকে। তখন কোন বাহিরের লোকের ভিতরে প্রবেশ এবং ভিতরের লোকের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। এই সময় তাহারা পূর্ণমাত্রায় পানাহারাদিতে মত্ত থাকে এবং তাহাদের ধারণানুসারে প্রাণে নববলের সঞ্চার হয়।

মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই; একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুঁড়িতে গর্ত্ত করিয়া তাহাই তাহারা শবাধার (coffin) রূপে ব্যবহার করে এবং তাহা মাটীতে পুঁতিয়া ফেলে। মৃত ব্যক্তির যদি কোন পশু পক্ষী থাকে তবে তাহাদিগকেও এই সময় হত্যা করা হয়; তাহাদের বিশ্বাস যে এইসকল পশু পক্ষীর আত্মা মৃত ব্যক্তির আত্মার অনুগমন করিবে। উৎসবান্তে ছেদিত পশু পক্ষীর মস্তকসকল দীর্ঘ বংশদণ্ডের অগ্রভাগে ঝুলাইয়া তাহা সমাধিস্থলে পুঁতিয়া রাখা হয় এবং এইসকল গলিত-চর্ম্ম শিরকঙ্কাল সময়ে ভীষণাকার ধারণ করে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

আমার চীনপ্রবাস

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

অধিকাংশ চীনবাসী কৃষি কিম্বা মৎস্যজীবী। কৃষিকার্য্যকে চীন জাতি অতি গৌরবের ব্যবসা বলিয়া মনে করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রত্যেক চীন সম্রাট পিকিন রাজধানীতে কৃষি-মন্দিরে প্রতি বৎসর দিবারাত্রি-সমান-মাসে সোনার হল চালনা করিয়া কৃষিঋতু আরম্ভ করেন। বিভিন্ন প্রদেশে

* Tribes of the Brahmaputra Valley, by L. A. Waddell, M.B., F.L.S.

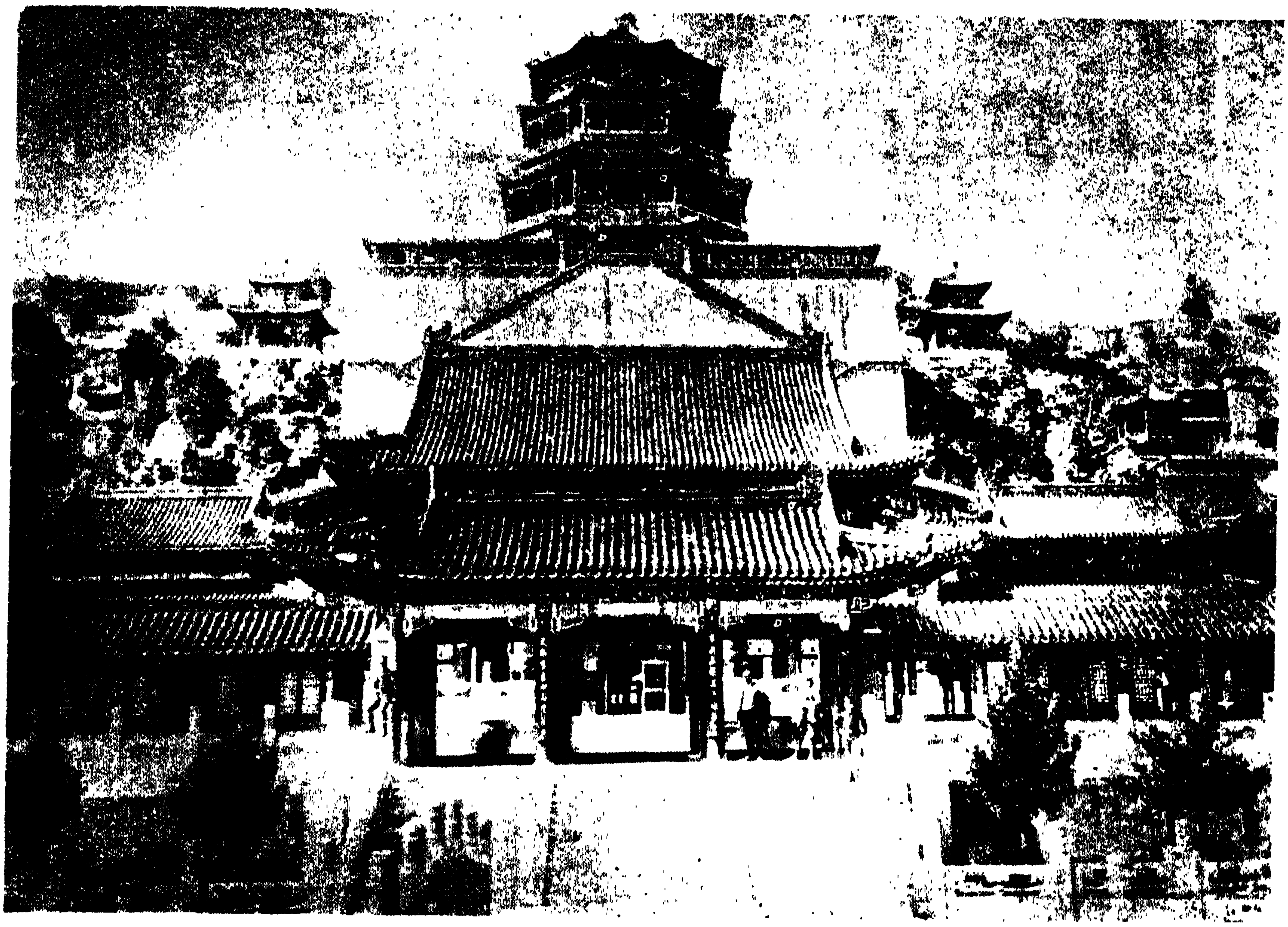

পিকিনের কৃষি-মন্দির।

রাজপ্রতিনিধি বা শাসকেরাও বৎসর বৎসর এই উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। চীন সাম্রাজ্ঞী তুঁতের চাষের উৎসাহ দিয়া গুটিপোকা পালন এবং রেশম প্রস্তুতের বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া থাকেন। দেশে খাওয়া পরার সংস্থান থাকিলে লোকের আর কোন কষ্ট থাকিবেনা, চীন সম্রাট প্রজাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। চীন সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে ভাল মৎস্য পাওয়া যায়। পরিশ্রমী কৃষকের জমির উৎপন্নও বড় কম নহে। ব্যবহার্য্য শিল্পে চীনজাতি অন্য সমুদয় জাতিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। কাগজ প্রস্তুত, বারুদ, কাচ, চীনা বাসন এবং ছাপিবার-সরঞ্জাম প্রস্তুতপ্রণালী তাহারা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করে। গাছের ছাল, তুলা, রেশমের টুকরা, ঘাস এবং বাঁশ হইতে তাহাদের কাগজ তৈয়ারী হইয়া থাকে। চীনদেশে যে কোন আঁশযুক্ত পদার্থে কাগজ প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। ইণ্ডিয়া পেপার নামক এক প্রকার অতি সুন্দর পাতলা অথচ টেঁকসই কাগজ চীন দেশে প্রস্তুত হয়। তাহাতে মুদ্রণ এবং চিত্রণ কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে সম্পাদিত হয়। চীন দেশে বিভিন্ন প্রকারের কাগজ প্রস্তুত হয়। কোন কাগজ ঔষধের পুরিয়ার জন্য, কোন কাগজ চিত্রকার্য্য এবং মুদ্রণ জন্য, কোন কাগজ প্লিষ্টের ন্যায় ক্ষত স্থানে লাগাইবার জন্য, কতকগুলির এক পৃষ্ঠা অত্যন্ত মসৃণ তাহা লিখিবার জন্য, কতকগুলি সুরঞ্জিত করিয়া গৃহের দেয়ালে লাগাইবার জন্য, কতকগুলি তৈলাক্ত করিয়া দ্বার জানালার সার্সিতে লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক চীন জাতি প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে আগমন করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এখনও ইয়ুনান, জসুয়েন (Sze-Chuen) নামক কতকগুলি প্রদেশে আদিম অধিবাসীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। একজন বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলেন ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি লোক আসিয়া এখানে সর্ব্বপ্রথম বসবাস করে। এই দেশ ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইয়া থাকে;

যথা—ক্যাথে বা কিতা, খিতান, খিতাই বা খাতা। রুষেরা এই দেশকে খিতাই বলে। মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় এই স্থান খ্রিষ্ট জন্মিবার বার শতাব্দী পূর্ব্বে চায়না বা চীন নামে অভিহিত ছিল।

চীনের অষ্টাদশ প্রদেশকে 'প্রকৃত চীন' বলা হইয়া থাকে। ইহার লোকসংখ্যা ৩৬১,২২১,৯০০; এবং সমগ্র চীন সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪৫ কোটি। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট ৫,৩০০,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে রাজত্ব করেন। কোন সম্রাট এতাধিক বিস্তৃত সাম্রাজ্যে রাজত্ব করেন নাই। আকারে চীন সাম্রাজ্য একটা সমকোণ চতুর্ভুজ বলা যাইতে পারে। ইহার পরিধি ১৪০০০ মাইল কিম্বা পৃথিবীর পরিধির অর্দ্ধেকের বেশি। ১২০০০ বর্গ মাইল ঔপনিবেশিক রাজ্য। ইহার মধ্যে রুসিয়ার ৬০০০ মাইল, ইংলণ্ডের ৪৮০০ মাইল, ফরাসীর সবে ৪০০ মাইল এবং ৮০০ মাইল অনিশ্চিত। ফর্ম্মোজা জাপানের আয়ত্তাধীন। যে আঠারটা প্রদেশকে প্রকৃত চীন বলা হয় তাহার বিস্তৃতি ২,০০০,০০০ বর্গ মাইল। সাতটা ফরাসী দেশ বা পনরটা গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়র্লণ্ড উক্ত পরিমিত স্থানে স্থাপিত হইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বৃহদায়তন সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য একই প্রকার বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং রাজকীয় সভায় কোন আইন পাশ হইলে তাহা ধনী নির্ধনী সহজেই সমভাবে পড়িতে পারে।

চীনেদের প্রায় সকলেই নিজের কাজকর্ম্ম চালাইবার মত লেখা পড়া জানে। একেবারে নিরক্ষর লোক খুব কম দেখিয়াছি। চীনজাতি প্রত্যেক বিষয়ের উন্নতির জন্য স্বকীয় শিক্ষাপদ্ধতির নিকট ঋণী। সু কিংয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সুন রাজার সময়ে (২২৫৫—২২০৫ পূঃ খৃঃ) হস্তলিপির অভ্যাস ছিল। পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভাষা অপেক্ষা চীন ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া অনেকের ধারণা। চীন অক্ষরের নাম শিক্ষা করিতেই চীন বালকের ৪।৫ বৎসর লাগে। অধিকাংশস্থলে পাঠ্য আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করান হয়। অর্থবোধ বালকদিগের আদৌ হয় না। চীনজাতির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। আমাদের বাঙ্গালিজাতির ন্যায় ইহারা পুস্তকের আগাগোড়া মুখস্থ করিয়া নির্ভুল বলিতে পারে। পাঠার্থীদিগকে ব্যায়ামাদি ক্রীড়া করিতে দেওয়া হয় না। এরূপ খেলাকে তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করা মনে করিয়া থাকে। চীন বিদ্যালয়ে বালকসমষ্টি লইয়া শ্রেণীবিভাগ নাই। প্রত্যেক বালক লইয়া এক একটী শ্রেণী হয়। অল্পবুদ্ধি বালক এরূপ প্রথায় তেমন উন্নতি করিতে পারে না। স্কুলের নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঠ শিক্ষা করান হয়। পাঠ শিক্ষা হইলেই শিক্ষকের নিকট গিয়া পাঠ বলিতে পারে। ত্রিশ চল্লিশটী বালক লইয়া এক একটী স্কুল গঠিত হয়। প্রত্যেক বালকই উচ্চৈঃস্বরে পাঠ অভ্যাস করে বলিয়া দূর হইতেই স্কুলের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের গুরুমহাশয়ের পাঠশালার ন্যায় কোথায় স্কুল আছে তাহা সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। অনুবাদ, প্রবন্ধ-রচনা, লিপি-লিখন ইত্যাদি ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। রচনা-চাতুর্য্য সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম চীন দেশে প্রচলিত হয়। সকল বিভাগেই প্রতিযোগী পরীক্ষার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। গণিত বিজ্ঞান এবং ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না, এক্ষণে হইয়াছে।

পুস্তকের পৃষ্ঠার ধারে পুস্তকের নাম বা টাইটেল লেখা থাকে। শেষাংশ হইতে পুস্তক পাঠ করিতে হয়। মাথার উপর হইতে নীচের দিকে ঠিক সোজা করিয়া লেখার এবং পুস্তক মুদ্রণ করিবার রীতি। পুস্তকের পাশ কাটা হয় না, কারণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা থাকে। পুস্তকের টীকা টিপ্পনী পুস্তকের উপরিভাগে লেখা থাকে, সুতরাং তাহাকে ফুটনোট না বলিয়া হেডনোট বলা সঙ্গত। কখন কখন এক সঙ্গে দুইখানি পুস্তক বাঁধান দেখা যায়। এক একখানা পুস্তকের মাঝখানে মোটা দাগ দেওয়া থাকে, তাহাতে দুইখানি পৃথক বই একত্র আছে, বুঝিয়া লইতে হয়। চীনেদের একখানি বিরাট অভিধান আছে, তাহা ৫০২০ (কেহ কেহ বলেন বাইশ সহস্র) খণ্ডে বিভক্ত। একখানি প্রশস্ত গৃহ উক্ত কোষ দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে ইহার সমকক্ষ গ্রন্থ আর নাই।

হস্তলিখনপ্রণালী ১৭০০ পূঃ খৃঃ সাংকিয়ে রাজার সময়ে কচ্ছপপৃষ্ঠে দাগ দেখিয়া আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রণকার্য্য ৫৮১—৬১৮ পূঃ খৃঃ প্রচলিত ছিল। প্রস্তরের উপর খোদাই কার্য্য ১৭৭ পূঃ খৃঃ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীস্থ যাবতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে পিকিন গেজেট অতি পুরাতন। এই পত্র দৈনিক। ইহাকে সাধারণ পত্রিকা না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট গেজেট বলা যাইতে পারে।

চীন জাতির সমাজকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। মানসিক উৎকর্ষ বা বিদ্যাশিক্ষা সর্ব্ব প্রথম এবং অতিশয় সম্মানিত। কৃষিকার্য্য দ্বিতীয়, শিল্প কার্য্য তৃতীয়, এবং ব্যবসায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

আবেকাস (abacus) বা গণনাফলক হিসাবের জন্য চীন জাতির ব্যবসায়ী জীবনে অতি আবশ্যকীয় দ্রব্য। গণনাফলক না হইলে তাহারা হিসাব করিতে নিতান্ত অপারগ। ইহা একখানা শূন্যগর্ভ কাষ্ঠফলক, ইহার সহিত তিনটা লৌহশলাকা ঋজুভাবে সংলগ্ন, তন্মধ্যে কতকগুলি কাষ্ঠের ছোট ছোট বল বা বর্ত্তুল মালার ন্যায় গ্রথিত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুল দ্বারা চীনেরা এত শীঘ্র সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া থাকে যে দেখিলে অবাক হইতে হয়। শুভঙ্করের সূক্ষ্ম হিসাবের নিয়ম যাহারা অবগত আছেন তাঁহাদের নিকট ইহা তেমন বিস্ময় উৎপাদক নহে। সওদাগরী আফিসেও হিসাব বহির সহিত একখানি গণনাফলক চাই।

ক্রেতা দাম কমাইবে বিবেচনায় চীন ব্যবসায়ী সাধারণতঃ জিনিষের দাম বেশী বলিয়া থাকে। দ্বিগুণ কিম্বা তিনগুণ বেশী বুঝিয়া লইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন দোকানে যাচাই করিলেই দামের তারতম্য বুঝিতে পারা যায়। জিনিষ খরিদ করিতে গিয়া সেই জিনিষের প্রশংসা করিলে চীন ব্যবসায়ী খরিদ্দারের গলা কাটিতে চেষ্টা করে, সুতরাং জিনিষ ভাল নয় বলাই বিধেয়।

শরীরের কোন স্থানে বেদনা, গ্রন্থিস্ফীতি বা বাত হইলে চীন বৈদ্যেরা শরীরাভ্যন্তরে সূচ প্রবেশ করাইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার ইংরাজী নাম আকুপাংচার (Acupuncture)। বৈদ্যের শলাকা বা সূচ সীবনযন্ত্রের সূচের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা লম্বা এবং অপরিষ্কার। সূচের বহির্ভাগে কখন কখন তাপপ্রদত্ত হয়। সম্রাট হোয়াংটি এই প্রথার প্রবর্ত্তক এইরূপ কথিত আছে। চীনজাতির বৈদ্যক গ্রন্থের নয় প্রকার অস্ত্র চিকিৎসার মধ্যে ইহাও একটী অতি প্রাচীন প্রথা। প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সুং রাজবংশের সময়ে এই প্রক্রিয়া বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কখন কখন এই শলাকা কতিপয় দিবস ধরিয়া শরীরাভ্যন্তরে রাখা হয়। এই চিকিৎসাপ্রণালী চীন হইতে জাপানে নীত হয়। একজন ডচ অস্ত্রচিকিৎসক এই চিকিৎসা ইউরোপে প্রবর্ত্তন করেন।*

চীনের সিনকোনা বা জিনসেন অত্যধিক মূল্যের জন্য চা'র ন্যায় প্রখ্যাত। ইহার রোগাপনয়নকারী আশ্চর্য্য গুণ আছে বলিয়া চীন জাতি বিশ্বাস করে। সকল রকম দুর্ব্বলতা এবং জ্বর রোগে ইহা আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। নেপাল এবং মাঞ্চুরিয়ার পার্ব্বত্য বনে ইহা জন্মিয়া থাকে। এই ঔষধ প্রতি পাউণ্ড চারি কিম্বা পাঁচ শত টাকায় বিক্রয় হয়।

চীন জাতি অত্যন্ত পরিশ্রমী হইলেও আমোদপ্রমোদ-প্রিয়তায় কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। চীন জাতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। চীন জাতির দৈহিক গঠন অনেকাংশে মঙ্গোলিয় জাতির ন্যায়। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়াও চীনদিগের মধ্যে অনেকে দীর্ঘায়ু লাভ করে। স্থান স্বাস্থ্যকর হইলেও বাসের দোষে কদর্য্য এবং অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। গড়পড়তা চীন জাতির উচ্চতা পাঁচ ফুট চারি ইঞ্চি। ইহাদের রং কাঞ্চন-বর্ণ, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ ক্ষুদ্র এবং ভাসা, নাক কতকাংশে চ্যাপটা, কপোলের অস্থি উচ্চ। যাহারা মজুরের কাজ করে তাহাদের রং অনেকটা তাম্রবর্ণ। চীন জাতিকে পীত জাতি বলা হইয়া থাকে। দেহের বর্ণানুসারেই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইংরাজকে যেমন শ্বেতাঙ্গ, আবিসিনিয়াকে হাব্সি, চীন জাতিকে পীত জাতি বলিলে তত্তৎ প্রদেশের সমগ্র জাতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে, আমাদের দেশে কিন্তু ঐরূপ 'একরঙা' জাতি নাই। অনেকে ভারতের জাতিসমূহকে 'কৃষ্ণাঙ্গ' নামে অভিহিত করেন। যাহারা গৌরবর্ণ তাহাদিগকে এই বিশেষণ হইতে নাম কাটিয়া না দিলে ইহাদিগকে বর্ণান্ধতা দোষে পীড়িত বই আর কি বলা যাইতে পারে? এরূপ বর্ণবৈচিত্র্য আর কোন দেশে প্রায়

দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ভারতের জনসঙ্ঘের এক কথায় বর্ণ নিরূপণ হইতে পারে না।

চীন দেশে প্রায় চারি লক্ষ বর্গ মাইল কয়লার খনি আছে, সুতরাং এই দেশকে কয়লার দেশ বলিলে অসঙ্গত হয় না।

চীন জাতির ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা এবং শ্রমশীলতা প্রশংসার যোগ্য। কোন কার্য্যই তুচ্ছ কিম্বা কোন পরিশ্রমই অসম্ভব বলিয়া ইহাদের নিকট বিবেচিত হয় না। ইহাদিগের নম্রতা, শান্তিপ্রিয়তা এবং দোষভীতি অতিরিক্ত মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পরিমিতব্যয়ী এবং শ্রদ্ধাবান্। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে সরলতা এবং পরদুঃখকাতরতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ফরাসী জাতির ন্যায় ইহাদিগের মধ্যে চতুরতা, শঠতা এবং বড়যন্ত্র বিদ্যমান আছে, কিন্তু উক্ত জাতির সদগুণ কিছু মাত্র নাই। ইহাদিগের স্বদেশী রীতি নীতির উপর এতদূর আস্থা যে যাহা স্বদেশ সংক্রান্ত নয় তাহার উপর আদৌ লক্ষ্যই করেনা। চীনেরা পরিমিতপায়ী। মাতাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের মধ্যে এক জাতি আছে, তাহারা স্কচ্ দলের ন্যায়। বিবাদ বিসম্বাদ ইহাদের মধ্যে লাগিয়াই আছে।

সকল রকম খনিজ পদার্থ এবং বহুমূল্য প্রস্তর চীন দেশে পাওয়া যায়। চীনে মাটির জিনিস পত্র ১৭০০ খৃঃ পূঃ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন হোয়াংটি রাজার সময়ে ইহার প্রবর্ত্তন হয়।

চীন দেশের ইয়ুনান প্রদেশে প্রথম প্লেগ দেখা দিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ রায়।

পতিত-পাবন

সকল দেশেই একশ্রেণীর লোক আছে তাহারা যেন সমাজের ত্যাজ্যপুত্র—এবং অবহেলা, ঘৃণা, অনাদর সহিয়া সহিয়া তাহাদেরও অন্তরের ব্রহ্ম সঙ্কুচিত ও মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহারাও সমাজের নিকট নিজেদের ন্যায্য দাবী আদায় করিতে কুণ্ঠা বোধ করে।

অপর দেশের তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থা একটু বিশেষ রকমে অসাধারণ। অন্য দেশের সমাজের অন্ত্যজ জাতিদিগের মধ্য হইতে যদি কোনো ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম্মিষ্ঠতা বা চারিত্রে নিজেকে নিজের পরিবেষ্টনের ঊর্দ্ধে উন্নত করিতে পারে, তবে ভদ্রসমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দুর্লভ হয় না, ক্রমশ সে ভদ্রসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু সেরূপ হইবার উপায় নাই; আমাদের জাতিভেদ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ না হইয়া জন্ম ও বংশগত হওয়াতে হীনবংশের কেহ উন্নত হইয়া উঠিলেও সে হীন ও ঘৃণ্য, এবং উন্নত বংশের কেহ হীন হইয়া পড়িলেও সে সমাজে মান্যার্হ। এই জন্য ব্রাহ্মণের সন্তান মূর্খ দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইলেও সে ইতর জাতির প্রণম্য, এবং অন্ত্যজাতির সন্তান বিদ্যা চারিত্রে ভূষিত হইলেও সে অপাংক্তেয় এবং এমন কি অস্পৃশ্য। এইরূপ মুক্তিমার্গের বহির্ভূত অবস্থা সমাজকে ক্রমশঃ হীনবল করিয়া ফেলে। উচ্চ শ্রেণীর লোক বংশপরম্পরাক্রমে চিরকালই যে উন্নত অবস্থায় থাকিবে এমন কোনো উপায় যখন নাই, তখন নিম্নশ্রেণীর লোকের উন্নতির পথ প্রতিরুদ্ধ রাখিয়া সমাজের একাংশকে পঙ্গু করিয়া রাখা কখনই কল্যাণকর ব্যবস্থা নহে।

সমাজের এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সমাজসংস্কারক মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হয়; মহাত্মা বুদ্ধদেব ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আমাদের দেশের পতিত-পাবন অবতার।

তাঁহাদের প্রদর্শিত বিরাট বিশ্বপ্রেম জগতের ইতিহাসেও দুর্লভ কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় ভগবৎপ্রেরিত মহাত্মার হৃদয়শৈল হইতে যে পাবন প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহার স্পর্শে যুগে যুগে দেশে দেশে কতশত নরনারীর মনে আত্মসম্মান, আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে; কতশত নরনারী পরের হীনাবস্থায় লজ্জিত হইয়া পতিতপাবনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন।

উপলবিষম গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া ক্ষীণা নদী প্রবাহিত হইয়া যতই অগ্রসর হয় ততই তাহার বিস্তার বাড়িতে থাকে। তেমনি প্রাচীন মহাপুরুষদিগের সাম্যবাদ ক্রমশঃ

বিস্তার লাভ করিতে করিতে এখন এমন কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যখন সমতার আকাঙ্ক্ষা আপামরসাধারণ সকল নরনারীর অন্তরই অধিকার করিয়াছে। ইহার পরিচয় আমাদের মত অদৃষ্টবাদী, কর্ম্মফলে অশেষ আস্থাবান, জড়ধর্ম্মী দেশেও বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে ইংরাজ-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্যবাদের কল্যাণময় খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ কর্ত্তৃক নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পর্ব্বতকান্তারে যখন প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন আলোকমুগ্ধ পতঙ্গের মত শিক্ষিত অশিক্ষিত নরনারী সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আপনাদের দেশ ও সমাজ, ধর্ম্ম ও আচার সবই বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন। ঠিক সেই বিপ্লবের মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত হিন্দুসমাজ ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়া সাম্যমন্ত্রে ক্ষুব্ধ নরনারীকে আশ্বস্ত করিলেন। যে শুভক্ষণে রাজা রামমোহন ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সে ক্ষণ হিন্দুসমাজের মাহেন্দ্রক্ষণ। সেইদিন হইতে হিন্দু নিজের দেশ ও সমাজের ক্রোড়ে যোগযুক্ত থাকিয়া, নিজের ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া নিজেদের ঐহিক পারত্রিক উন্নতির পথ মুক্ত দেখিয়াছে। আজ কত মহাত্মা সমাজের নিম্নস্তরের চিরাগত অবসাদ ও জড়তা দূর করিবার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তির নিয়োগ করিতেছেন। এইরূপ একজন মহাত্মা বোম্বাইপ্রদেশবাসী মহারাষ্ট্র শ্রীযুক্ত বিঠলরাম সিন্ধে।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সিন্ধে বিলাতে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান। তিনি ব্রহ্মবাদী হিন্দু; এজন্য বিদেশেরও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মনের প্রসার বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি গ্রাজুয়েট এবং খুব অধ্যবসায়শীল ছাত্র; পাঠে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ; কিন্তু পুঁথি ও পণ্ডিতের শিক্ষা তাঁহার মনঃপূত হইতেছিল না; মানব-জীবন যে মহাশিক্ষার ক্ষেত্র উদ্ঘাটিত করিয়া বিচক্ষণকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছে সেই দিকে তাঁহার চিত্ত প্রধাবিত হইল। তাঁহার কলেজের কাছেই একটি দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকের পল্লী ছিল; সেখানকার বাহিরের নোংরাভাব নরনারীর আন্তরিক কলুষের সহিত মিলিত হইয়া বীভৎস; সেস্থানের পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনার মধ্যে পশু-প্রকৃতি নরনারী মাদক, কদাচার, কলহ বিবাদ, প্রভৃতি

শ্রীযুক্ত বিঠলরাম সিন্ধে।

পাপে জড়ীভূত হইয়া জীবনযাত্রায় একেবারে পঙ্গু। কিন্তু তাহারা জীবনসংগ্রামে পর্য্যুদস্ত হইলেও তাহারা একেবারে ধর্ম্মহীন নহে; মনুষ্যত্বের বিকার দর্শনে কাতরহৃদয় নরনারী তাহাদিগকে নানা উপায়ে মনুষ্যত্বের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। ইহাদেরই পুণ্যব্রতের দিকে শ্রীযুক্ত সিন্ধের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তাঁহার মনে পড়িল তাঁহার স্বদেশেও ত এমনি কত নরনারী অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া নিশ্চেষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতেছে; প্রাচীন দেশাচারশাসন উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি তাহাদের নাই; তাহাদের হাত ধরিয়া জড়তা ঝাড়িয়া তুলিবে এমন শক্তিমান ও হৃদয়বান লোকেরও নিতান্ত অভাব। দেশের সমগ্র অধিবাসীর ষষ্ঠাংশ এবং হিন্দুজনসংখ্যার চতুর্থাংশ লোক—প্রায় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ নরনারী—পারিয়া, পঞ্চম, হাড়ি, ডোম, মেথর, নমঃশূদ্র প্রভৃতি নামে একেবারে অস্পৃশ্য হইয়া আছে। তাহারা কুকুর বিড়ালেরও অধম; কুষ্ঠরোগী

অপেক্ষাও পরিবর্জ্জনীয়। সিন্ধে প্রতিজ্ঞা করিলেন এই পতিত-পাবন তাঁহার জীবনের ব্রত হইবে। এই শুভ সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু আমাদের দেশটি বড় কঠিন ঠাঁই। অতিবিজ্ঞতার বাধা, শাস্ত্রের দোহাই, গোঁড়ামির আক্রোশ এবং প্রাচীন পন্থা হইতে রেখামাত্র ব্যতিক্রমের নির্য্যাতন সকল উৎসাহ একেবারে দমাইয়া দেয়। সেই দুর্ভাগ্য সিন্ধেরও পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। তিনি পারিয়া জাতির উন্নতির জন্য একটি কর্ম্মীমণ্ডলী স্থাপনের চেষ্টা করিলে তাঁহার বন্ধুরা অতিবিজ্ঞ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের বাপপিতামহেরা 'রেখামাত্রং ন ব্যতীয়ুঃ আমনোঃ বর্ত্মনঃ পরম'—তাঁহারা কি আমাদের অপেক্ষা বোকা ছিলেন?" সিন্ধে খৃষ্টান মিশনরীদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও কাহাকেও এই কার্য্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করাইতে পারিলেন না।

কিন্তু সিন্ধের চরিত্র কঠিন ধাতুতে গড়া; তিনি লোকের উদাসীনতা দেখিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি 'পঞ্চম' বা মেথরদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; কারণ, অভাব না জানিলে সাহায্য করা যায় না। তিনি মেথরদের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সকল অস্পৃশ্য জাতিরা হিন্দুসমাজে হেয় হইয়াও নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব অনুভব করে; তাহারা সিন্ধেকে তাহাদের পল্লীতে গতায়াত করিতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল,—তাহারা মনে করিল সিন্ধে খৃষ্টান মিশনরী। কারণ, তাহারা কোনো উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে কস্মিন কালেও তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে দেখে নাই, এমন অসম্ভব কাহিনী শুনেও নাই। সিন্ধের অকুণ্ঠিত আগমন এই কারণেই তাহাদিগকে ধর্ম্মনাশ ভয়ে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সিন্ধে নিজের সহানুভূতি ও সদয় ব্যবহারে তাহাদের প্রিয় হইয়া উঠিলেন; তাহারাও ক্রমে ক্রমে তাহাদের সুখদুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল; সিন্ধে তাহাদের সহচর হইয়া শুঁড়ির দোকানে পর্য্যন্ত গিয়াও তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সিন্ধে বোম্বাই প্রার্থনা-সমাজের প্রচারক। বোম্বাই

শ্রীযুক্ত সার নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর।

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর সেই সমাজভুক্ত। তিনি সিন্ধের সহায়রূপে অগ্রসর হইলেন; পতিত-পাবনমণ্ডলীর তিনি নেতৃত্ব স্বীকার করিলেন। ১৯০৬ সালের ১৮ই অক্টোবর এই মণ্ডলী সংগঠিত হইল। বোম্বাইয়ের ধনী ও জনহিতৈষী শ্রেষ্ঠী শ্রীযুক্ত শেঠ দামোদর দাস সুখদওয়ালা সহস্র মুদ্রা এককালীন ও ৫০০৲ টাকার হুণ্ডী দান করিলেন। পরবৎসর মে মাস হইতে ১৯১০ সালের জুলাই পর্য্যন্ত তিনি মাসে একশত টাকা দান করিয়া মণ্ডলীর বহু স্বার্থত্যাগী কর্ম্মীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি মণ্ডলীর বহু শাখা কর্ম্মকেন্দ্র বহু স্থানে সংগঠিত হইয়াছে। ১৯০৯ সালে শ্রীযুক্ত শেঠ সুখদওয়ালা ৫০০০৲ এবং ১৯১০ সালে কুমারী ভায়োলেট ক্লার্কের স্মৃতিভাণ্ডার ৫০০০৲ টাকা ও বরোদার গায়কোয়াড় ২০০০৲ টাকা, দান করিয়া মণ্ডলীর একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডারের ভিত্তিপত্তন করেন।

এই পতিত-পাবনমণ্ডলীর মূলকর্ম্মস্থান বোম্বাই সহরে

অস্পৃশ্য বালকেরা পতিতপাবন-মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে আসিবার পূর্ব্বে যেমন থাকে।

কয়েকটি স্কুল ও ছাত্রাবাস, একটি দপ্তরীখানা, একটি জুতার কারখানা ও একটি প্রচারক-সঙ্ঘ আছে।

অস্পৃশ্য বিদ্যালয়ের প্রধানটিতে অস্পৃশ্য বালকবালিকাদিগকে দেশভাষা ও ইংরেজি, অঙ্কন, বইবাঁধা, সেলাই প্রভৃতি রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদিগকে কোনো না কোনো রকম ব্যায়াম করিতে হয়; ছেলেরা 'আট্যা-পাট্যা' খেলিতে বড় ভাল বাসে। এই বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ১৯১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ১৪১; তন্মধ্যে ৯২ জন অস্পৃশ্য ও ৪৯ অন্যান্য জাতির; ১৪১ জনের মধ্যে ১৭ জন ছাত্রী। দ্বিতীয় বিদ্যালয়ে সহরের ঝাড়ুদারদিগের ৩০টি বালক ও ৭টি বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। এই স্কুলের শিক্ষকও মাহারজাতীয়, অস্পৃশ্য। তৃতীয় বিদ্যালয়ে ৯৬ ছাত্র ও ১৯ ছাত্রী শিক্ষা লাভ করে। ভাঙ্গী বা মেথর বিদ্যালয়ে ২৩ জন বালক ও ৬ জন বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।

১৯০৯ সালে প্রধান বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি ছাত্রাবাস খোলা হয়। এখানে ১৮টি বালক ও ৩টি বালিকা তাহাদের পল্লী-পরিবারের অসৎপ্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রচারকদিগের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিতেছে। এইসকল হোষ্টেলবাসী ছাত্রদের মধ্যে দুজন পূরা খরচ দেয়, চারজন অৰ্দ্ধেক দেয়, এবং অন্যান্য বাকি যাহারা তাহারা মণ্ডলীর ব্যয়ে পালিত হইতেছে। ইহাদিগকে ঠিক পাঁচটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া ভজন ও উপাসনায় যোগ দিতে হয়; ৬টার সময় একবাটি কাঞ্জি পান করিয়া সকলে বইবাঁধা শিখিতে যায়; তারপর নিজেদের পাঠ অভ্যাস করে; ৯টায় স্নানান্তে আহার করিয়া পুনরায় বইবাঁধার কাজ শিখে। স্কুলের সময় ১১—৫টা; মাঝে আধ ঘণ্টা টিফিনের ছুটি। স্কুলের পর তাহারা কাপড় চোপড় কাচিয়া ব্যায়াম করে এবং ৬টার সময় আহার করে। তারপর হয় তাহারা নিজেরাই পাঠাভ্যাস করে বা নৈশ বিদ্যালয়ে যায়; এবং ১০টার সময় শয়ন করে। রবিবারে প্রাতঃকালে নীতিবিদ্যালয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় নিজেরা ভজসভা করে। ছেলেরা নিজেরাই নিজেদের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করে; কেবল রন্ধন করিয়া দেন কমলা বাঈ, একজন চামারণী। এখানে জাতিভেদ নাই, সকলে একত্র আহার ও অবস্থান করে। বিদ্যালয়ের খাদ্যব্যবস্থা নিরামিষ। ছাত্রদের পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও আচারব্যবহারের প্রতি খুব কড়া নজর রাখা হয়। ছাত্র ছাত্রী কেহ পীড়িত হইলে ডাক্তার কামাত বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করেন। স্কুলের পর্য্যবেক্ষক শ্রীযুক্ত সৈয়দ। তিনি মুসলমানের সন্তান; এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার পত্নী ব্রাহ্মণকন্যা তিনি স্বামীকে ছাত্রাবাসের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে সাহায্য করেন এবং বালিকাদিগকে সেলাই ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেন।

১৯০৭ সালে নিরাশ্রিত-সদন এই পতিত পাবনমণ্ডলীর সহিত একযোগে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহাদের ছয়জন কর্ম্মী বোম্বাইয়ের দরিদ্র-কুটীরে গিয়া গিয়া বালক বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার জন্য পিতামাতাদিগকে

অস্পৃশ্য বালকেরা পতিতপাবন মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে আসিয়া যেমন হয়।

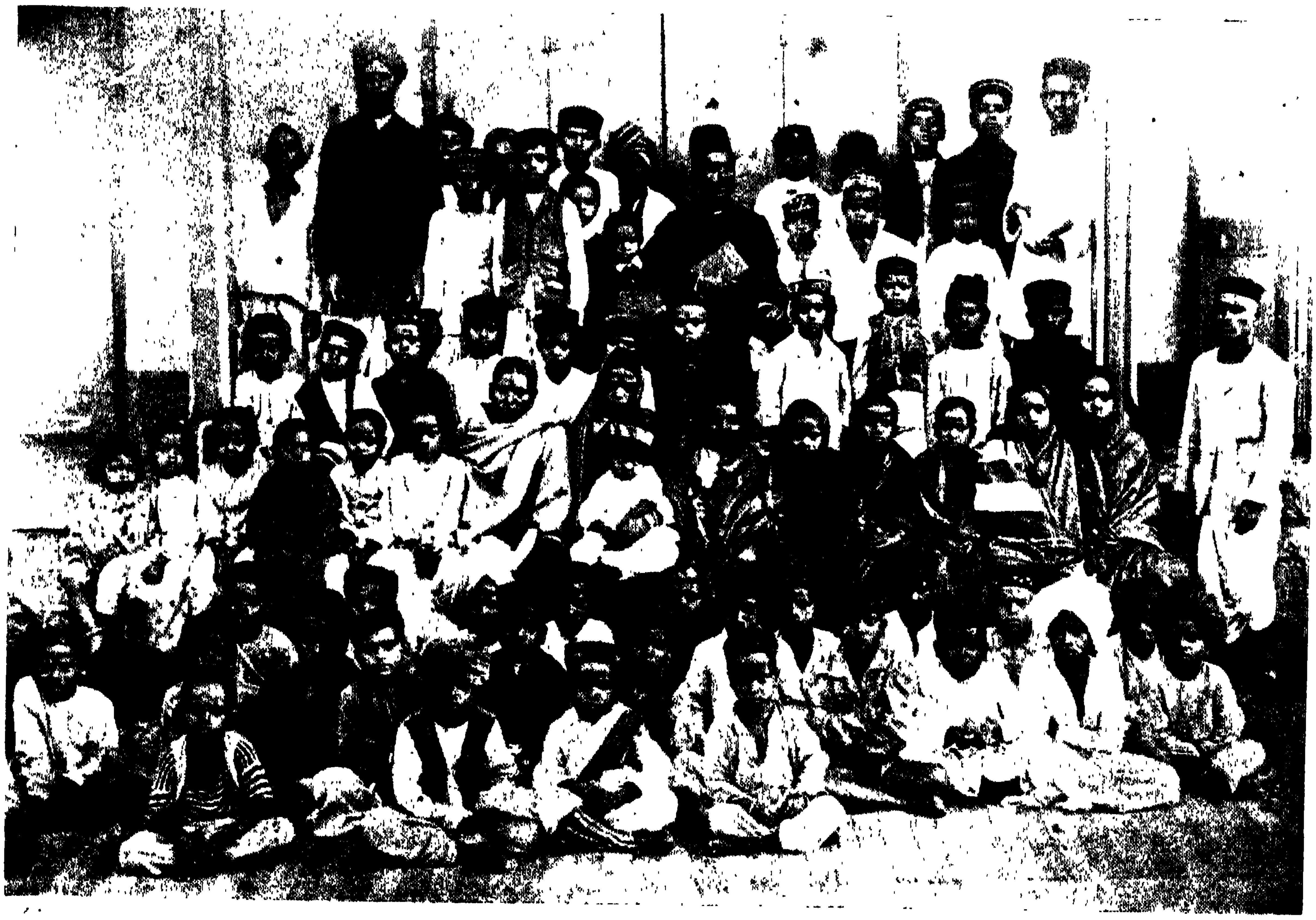

অস্পৃশ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি।

বুঝাইতেছেন; তাহাদিগকে দেহ ও গৃহস্থালী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে উপদেশ দিতেছেন ও সাহায্য করিতেছেন; পীড়িতদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন; এবং আবশ্যক হইলে হাঁসপাতালে স্থান করিয়া দিতেছেন। সেবা-সদনের একজন সেবিকা ভগিনী পারিয়া পরিবারে ১৩ জন স্ত্রীলোকের প্রসবকার্য্যে ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছেন।

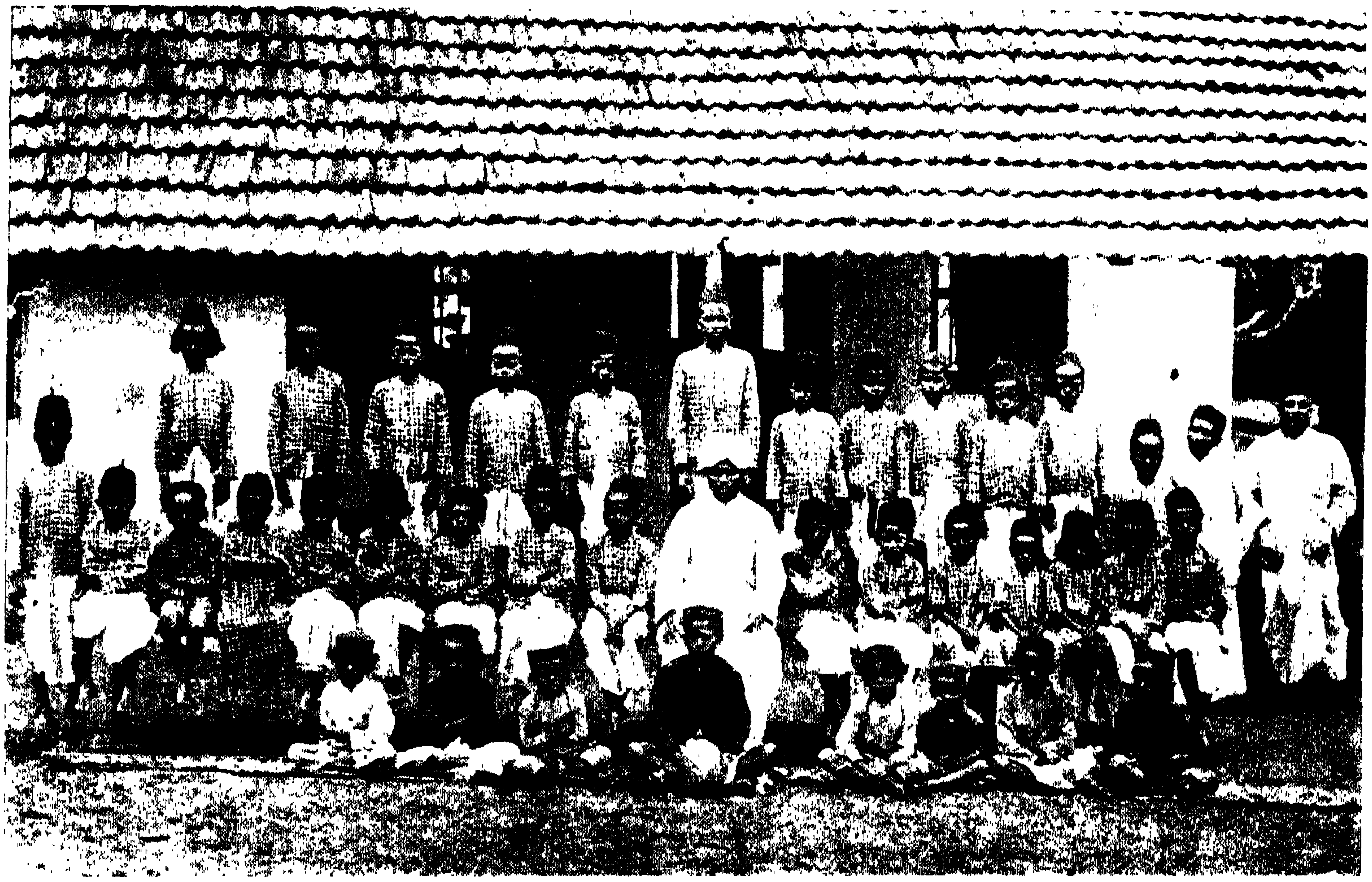

অস্পৃশ্য বালকবালিকা, যাহারা পুনা পতিতপাবন মণ্ডলী কর্তৃক শিক্ষিত হইতেছে।

বয়স্কা রমণীদিগকে শিক্ষাদানের জন্য বাড়ী বাড়ী গিয়া লেখাপড়া এবং সেলাই শিখান হয়। প্রচারকেরা অস্পৃশ্য রমণীদিগকে একটি সুগঠিত সঙ্ঘে সম্মিলিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই রমণীসঙ্ঘ প্রতি শনিবার একত্র হইয়া রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ শুনিয়া বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে।

পতিত-পাবনমণ্ডলীর মহিলা-পরিষদে দেশীয় বিদেশীয় বহু মহিলা উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ রানাড়ে, শ্রীমতী কাপ্তান, লেডি মিউর ম্যাকাঞ্জি, শ্রীমতী ষ্টানলি রীড প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা গৃহস্থ ও ধনী অন্তঃপুরিকা ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে এই শুভানুষ্ঠানে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সম্মত ও প্রবৃত্ত করাইতেছেন।

১৯০৭ সালে পতিত-পাবনমণ্ডলী সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কার এবং অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে শিক্ষা ও নীতি-বিস্তারের উদ্দেশ্যে সোমবংশীয় মিত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কার্য্যও সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে।

ঠানা, মনমাড, মহাবালেশ্বর, দাপোলি, পুনা, সাতারা, কোলহাপুর, আকোলা, অমরাবতী, ইন্দোর, মান্দ্রাজ ও মাঙ্গালোরে শ্রীযুক্ত সিন্ধের চেষ্টায় মণ্ডলীর ১২টি শাখা-মণ্ডলী সংগঠিত হইয়াছে। এইসকল শাখামণ্ডলীও শিক্ষা ও সংস্কারকার্য্যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত সরবরাহ করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করা হইতেছে। একটি শিল্প-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সেখানে আমেরিকার খৃষ্টান-প্রচারকমণ্ডলীর সহযোগিতায় ফিতা-বোনা ও দড়ি-পাকান শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যে সব নরনারী এই কাজ শিখে তাহাদিগকে দৈনিক ৮ আনা, ও বালক বালিকাদিগকে দেড় আনা হিসাবে মজুরীও দেওয়া হইয়া থাকে। কার্য্যকাল প্রাতে ৮—১১টা এবং বৈকালে ২ ৫টা। অন্যত্র আর একটি স্কুলে ছুতারের কাজও শেখান হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষায় প্রোৎসাহিত করিবার জন্য ছাত্রবৃত্তিরও ব্যবস্থা আছে। অতি দরিদ্রদিগকে স্কুল হইতেই বই, কাপড় ও আহার ইত্যাদি সমস্তই দেওয়া হয়। দুটি ছাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে

পাঠ করিতে গিয়াছে এবং মণ্ডলীই তাহাদের ব্যয় বহন করিতেছে। বোম্বাইয়ের বাহিরে যেখানে সেখানে পতিত-পাবনমণ্ডলী আছে, সেখানেই শিক্ষাকার্য্য নৈশ ও দিবসীয় বিদ্যালয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গেই চলিতেছে এবং সকলেই দৃষ্টি রাখা হইয়াছে যাহাতে বালিকারাও শিক্ষা লাভে বঞ্চিত না হয়। পুনা সহরের বিদ্যালয়ে ১৭০টি বালক ও ১১টি বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। সকল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই সব নোংরাস্বভাব বালকবালিকাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেওয়া বিশেষভাবেই হয় এবং যাহাতে তাহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় তাহারও চেষ্টার ত্রুটি হয় না। কোনো বালক স্নান না করিলে সে দণ্ডিত হয় এবং বাড়ীতে স্নান করিয়া না আসিলে স্কুলে তাহাকে খুব করিয়া স্নান করাইয়া তবে ছাড়া হয়।

অস্পৃশ্যা বালিকা পতিতপাবন-মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা পাইতেছে।

পুনার বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হোলির কদর্য্য উৎসবের প্রতিরোধ। প্রথমে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ উৎসবের সময় স্কুল খোলা রাখিয়া বালকবালিকাদিগকে উৎসব হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে কোনো ফলই হইল না, উৎসবের সময় ছাত্রগণের প্রায় কেহই স্কুলে উপস্থিত হইল না। তৎপরে কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইলেন। স্কুলের বয়স্ক ছাত্রদিগকে উপদেশ দিয়া হোলির কদর্য্য আমোদের অপকারিতা বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করা হইল এবং ছোট ছেলেদের জন্য বিবিধ

মাহার বালক, পঙ্গু হইয়াও পতিতপাবন-মণ্ডলীর কৃপায় দপ্তরীর কাজ শিখিয়া ভদ্রভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে।

খেলা, সঙ্গীত ও জলখাবারের ব্যবস্থা হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার গীত রচনা করিয়া একদল ছাত্রকে শিখাইয়া হোলির উৎসব-মেলায় পল্লীতে পল্লীতে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; ইহাতে হোলির অশ্লীল গান অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া গেল এবং লোকে বালকদিগের মধুকণ্ঠের তানলয়শুদ্ধ সঙ্গীত খুব আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে লাগিল। ইহাতে যেমন একদিকে হোলির আমোদের সংস্কার সাধিত হইল অপর দিকে তেমনি স্কুলটি জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিল। পুনা পতিত-পাবনমণ্ডলীর

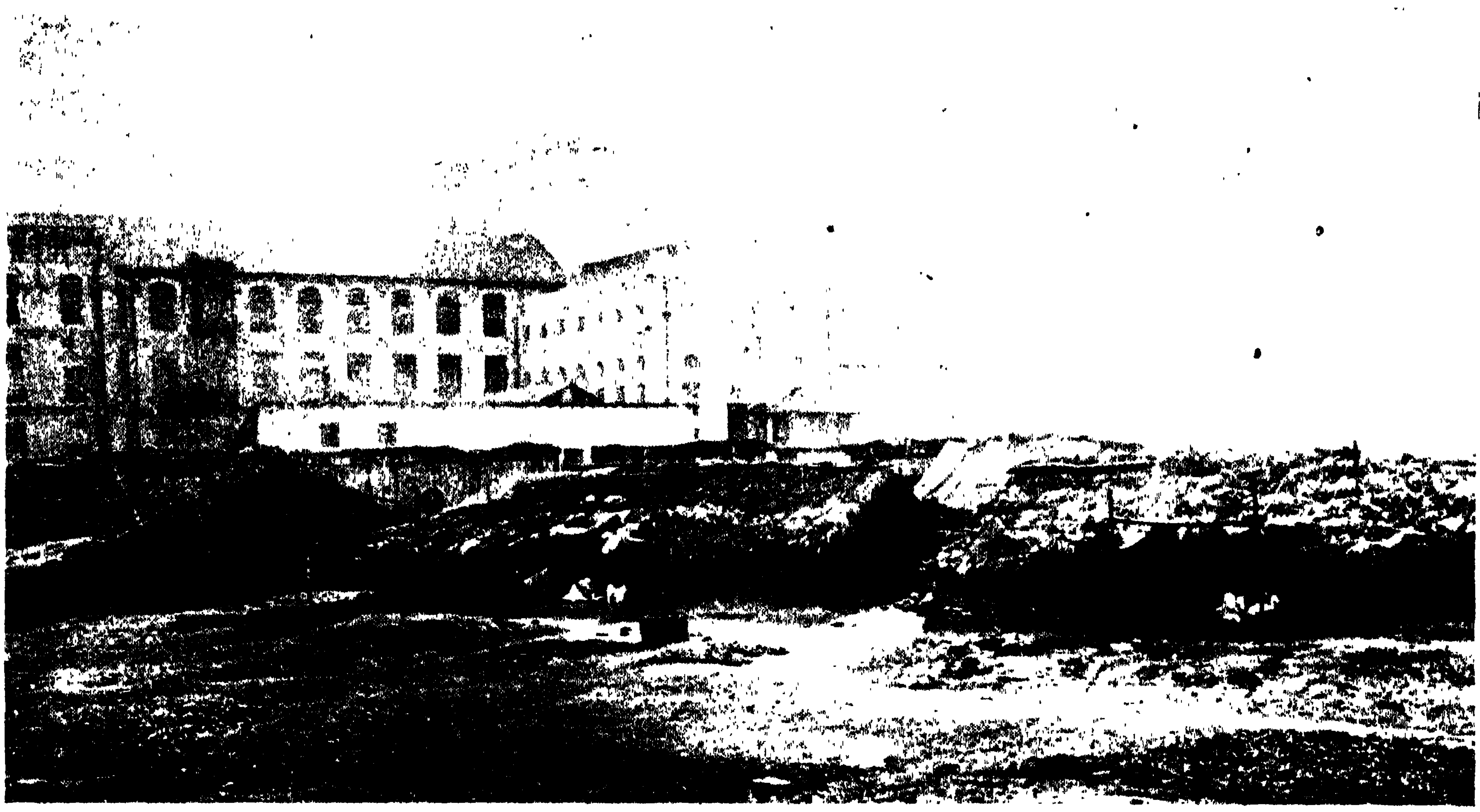

অস্পৃশ্যদিগের কর্ম্ম ও বাসস্থান—পাশাপাশি শোচনীয় বৈষম্য।

তত্ত্বাবধানে একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার আছে, সেখানে অস্পৃশ্য পতিত জাতির নরনারী জ্ঞানচর্চ্চার সুযোগ লাভ করিতেছে।

সাতারা সহরেও একটি স্কুলে পতিত পাবন-কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতেছে। এই স্কুল দিনে বালকদিগকে, রাত্রে শ্রমজীবীদিগকে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা বিতরণ করিয়া নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এমন একটি সজীবতা সঞ্চার করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে যে মহামতি রাণাড়ের মৃত্যু হইলে অস্পৃশ্য পতিত লোকেরা নিজেদের চেষ্টায় একটি সভা আহ্বান করিয়া ২৫৲ টাকা চাঁদা আদায় ও ৬।৶০ আনার অঙ্গীকার করিয়াছিল। সাতারার মেথরেরা নিজেরাই একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্য পরিচালন করিতেছে। ইহার দ্বারা তাহাদের সর্ব্বগ্রাসী ঋণ শোধ হইয়া তহবিলে ২০০৲ টাকা আমানত জমা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের পরিচালক ভাঙ্গীরা অঙ্গীকার করিয়াছে জীবনে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

বেরারের অন্তর্গত আকোলার মণ্ডলী স্কুল প্রতিষ্ঠা ভিন্ন প্রতি সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পতিতপল্লীতে বক্তৃতা ও উপাসনা করিয়া যথেষ্ট ফল লাভ করিয়াছে।

অমরাবতীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাপুনা যোর মহাশয়ের বাড়াতেই অস্পৃশ্য জাতির স্কুলের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে।

ইন্দোরের স্কুলটি ছাত্রের অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুটি মাত্র ছাত্র পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করাতে একজন সদাশয় ভদ্রলোক তাহাদিগকে স্বয়ং শিক্ষা দান করিতেছেন।

মান্দ্রাজে মণ্ডলীর কার্য্য খুব উৎসাহের সহিত চলিতেছে। সেখানে ৪টি স্কুল, এবং শিক্ষকেরা মাহিনা করা। প্রথমে তেঁতুল গাছের তলায় স্কুল করিয়া এখন এতদূর উন্নতি হইয়াছে। এ ছাড়া দুটি নৈশ বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতিও আছে।

মাঙ্গালোরে স্কুল প্রভৃতি ছাড়া স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে একটি পঞ্চম পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পঞ্চম-পল্লী প্রায় ৮০ বিঘা জমি ব্যাপিয়া; প্রত্যেক পরিবারকে আবশ্যক মত জমি মৌরসী স্বত্বে বিলি করা। ইহার কার্য্য শ্রীযুক্ত রঙ্গরাও কর্ত্তৃক বহু দিন পূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি নামলোলুপ নহেন বলিয়া শ্রীযুক্ত সিন্ধের বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের কৃতকর্ম্ম যোগ করিয়া দিয়া প্রতিষ্ঠানের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন

এবং নিজেও ধন্য হইয়াছেন। এখানকার স্কুলের একজন শিক্ষক পঞ্চম জাতীয়। স্কুলে ছাত্রদিগের বেতন ত লাগেই না, অধিকন্তু বই, পরিচ্ছদ, ছাতা ও আহার ইত্যাদিও স্কুল হইতেই সরবরাহ করা হয়। ছাত্রগণকে লেখাপড়া ছাড়া তাঁতের কাজ, মালীর কাজ, সঙ্গীত, ব্যায়াম প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শাখার একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য বালকবালিকাদিগের নামসংস্কার। নিম্নশ্রেণীর বালকবালিকাদিগের নাম কেঁচো, বিড়াল, বিছা, শূকর, ইঁদুর, চাঁদা মাছ, শিঙ্গি মাছ, ডাকন্ত কুকুর ইত্যাদি; এমন নামের লোকেরা কখনো আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন বা পশুপ্রকৃতি ছাড়াইয়া উন্নত হইতে পারে না মণ্ডলীর এইরূপ বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল। বোধ হয় স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম ঈশ্বরচন্দ্র না হইয়া গোবর্দ্ধন হইলে তিনি গোবর্দ্ধনই থাকিতেন বিদ্যাসাগর হইতে পারিতেন না; অপর পক্ষে আবার সেক্সপীয়র বলেন-

"নামে কিবা করে ?
গোলাপ যে নামে ডাক' সৌরভ বিতরে !"

যাহাই হোক স্কুলে নাম পরিবর্ত্তন আরম্ভ হওয়াতে ছাত্রদিগের আত্মীয়গণেরও চৈতন্য হইয়াছে; তাহারাও এখন নবজাতদিগের নাম বাছিয়া বাছিয়াই রাখিতেছে। মাঙ্গালোর শাখার স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী হইতে প্রাত্যহিক মুষ্টিভিক্ষা সপ্তাহান্তে সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রভরণ করেন। এক্ষণে এঁড়িজাত রেশমকীট পালনের চেষ্টা হইতেছে এবং সে চেষ্টা যে সফল হইবে সেরূপ আশাও হইয়াছে।

শুভসঙ্কল্প ও অধ্যবসায় মাত্র সম্বল করিয়া একজন দরিদ্র মহারাষ্ট্র যুবক যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা আজ কত পতিত নরনারীর আশীর্ব্বাদভাজন ও অপর প্রদেশের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। আজ তাঁহার চেষ্টা ও একাগ্রতার ফলে শ্রেষ্ঠী ও জমিদার, উচ্চশ্রেণীর নরনারী সকলেই এই প্রতিষ্ঠানকে মঙ্গলের আকর মনে করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। গাছ বীজ হইতে একটি মাত্র সরল কাণ্ডরূপেই উদ্গত হয় কিন্তু ক্রমশ তাহার মূল ও শাখাপত্র বিস্তৃত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলে। মঙ্গলকর্ম্মও ঠিক এইরূপে আরম্ভ হয় একজনের দ্বারা, পরিপুষ্ট হয় বহুর সাহায্যে। আমাদের বাংলা দেশেও এইরূপ পতিত-পাবন কর্ম্মের চেষ্টা খৃষ্টান প্রচারকদিগের দ্বারা বহুদিন হইতে চলিতেছে। এত দিনে হিন্দুরাও নিজেদের কর্ত্তব্যে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন; হিন্দুসমাজেরই শাখা ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া নমঃশূদ্র, বাউরী প্রভৃতি জাতির মধ্যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই শুভ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক !

জনৈক হিন্দু।

মৎস্যরক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি

গত বৎসর ফাল্গুনের প্রবাসীতে মৎস্যপালন শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে মৎস্যপালন এদেশের পক্ষে একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ সামান্য একটু উদ্যোগী হইলেই নিজ নিজ পুকুরে যথেষ্ট পোনা ফেলিতে পারেন এবং ২।৩ বৎসর পরে সাংসারিক প্রয়োজনীয় মৎস্য ব্যতীত উদ্বৃত্ত মাছ বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতে পারেন। তবে যে-সকল গৃহস্থের নিজের পুষ্করিণী নাই, তাঁহাদের পক্ষে মৎস্যরক্ষা করিতে শেখা মন্দ নহে।

বর্ষাকালে নিম্নবঙ্গের অনেক স্থান নদীর বানে ভাসিয়া যায়। সে সময় মাছ পাওয়া নিতান্তই দুর্লভ হইয়া উঠে। মৎস্যাশী বাঙ্গালীজাতির পক্ষে সে সময়টা বাস্তবিকই বড়ই কষ্টকর হইয়া থাকে। বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানের কতকগুলি ছাত্র কিছুদিন নিরামিষ ভোজন করায় রুগ্ন ও ওজনে কমিয়া গিয়াছিল এরূপও দেখিয়াছি। শরীর রক্ষার জন্য অবশ্য পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক, কিন্তু আহারকালে তৃপ্তিবোধ না করিলে সে খাদ্যে বিশেষ উপকার করে বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্যই মৎস্যের অভাবে অনেকের শরীর খারাপ হইয়া পড়ে। সকল ঋতুতে সব রকম খাদ্য পাওয়া সম্ভব নহে। সেই জন্য খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করিতে শিক্ষা করা গৃহস্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কলিকাতায় বড়বাজারে মাড়োয়াড়ী মহলে অনেক রকম আচারের

দোকান দেখা যায়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যখন লেবু (পাতি ও কাগজী) দুষ্প্রাপ্য হইয়া থাকে, তখন রক্ষিত (preserved) লেবু বা নিম্‌কী—(লেবুর আচার)—লেবুর অভাব অনেক পরিমাণে মোচন করে না কি? কাশী এবং বীরভূম ও মালদহ জেলায় হরিতকী, আমলকী, শতমূল প্রভৃতি ফলমূলের উৎকৃষ্ট মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন উৎসাহী যুবক এই কার্য্যে অগ্রসর হইলে স্বাধীনভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। সুখের বিষয় মুজাফ্‌ফরপুরে আমরক্ষার জন্য একটা কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মৎস্যরক্ষা করিতে পারিলে অবশ্য অধিক লাভ হইবারই কথা।

অনেকেই হয়ত জানেন যে কার্ব্বলিক এসিড (Acid), ক্রিয়োজোট (Creosote), স্যালিসিলিক এসিড (Salicylic Acid), সালফিউরিক (Sulphric) এসিড, বোরিক এসিড, সোহাগা (Borax), চিনি, লবণ, সুরাসার (Alcohol এবং গ্লিসিরিন (Glycerine) প্রভৃতি দ্রব্যের পচন নিবারণের ক্ষমতা আছে। অনেক পাচন ও পেটেণ্ট ঔষধ কার্ব্বলিক এসিডের সাহায্যে দীর্ঘকাল রক্ষা করা হয়। কিন্তু কার্ব্বলিক বিষাক্ত জিনিষ এবং উহার গন্ধও বড় কদর্য্য। ধূমের মধ্যে ক্রিয়োজোট নামক একরূপ পদার্থ থাকে; উহার দ্বারা খাদ্য দ্রব্য অনেকদিন রক্ষা করা যায় বটে কিন্তু উহারও একটা দুর্গন্ধ আছে। স্যালিসিলিক এসিড দ্বারা খাদ্য বেশ রক্ষা হইতে পারে বটে কিন্তু ঐরূপ দ্রব্য অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেক দেশে বিধিনিষিদ্ধ হইয়াছে। সালফিউরিক এসিড এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, কারণ একে ত গন্ধকের গন্ধ বড় উগ্র, তাহাতে আবার উহার রক্ষা করার ক্ষমতাও স্থায়ী নহে। বোরিক এসিড অনেক সময়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সোহাগারও পচন নিবারণ ক্ষমতা আছে। সকল রকম সুমিষ্ট ফল ও ফলের রস রক্ষার জন্য চিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অম্ল আস্বাদযুক্ত কুল ও শশা জাতীয় কতকগুলি ফলকে রক্ষা করিবার জন্য লবণ জলের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। তবে মাংস রক্ষার্থেই লবণের ব্যবহার অধিক দেখা যায়। সুরাসারে অনেক দ্রব্য রক্ষা করা যায় বটে। অনেকে ভিনিগারে আম, আদা ইত্যাদি রক্ষা করিয়া আচার রূপে ব্যবহার করেন। জলের সহিত অল্প পরিমাণ গ্লিসিরিন মিশ্রিত করিয়া ঐ জলের সাহায্যে ফল ও মাংস রক্ষা করা যায়। তৈলেরও পচন নিবারণ ক্ষমতা আছে। সর্ষপ তৈলের সাহায্যে টক আচার ও নিমকী (লেবুর আচার) রক্ষা করা এ দেশেও প্রচলিত আছে। নন্দীগ্রাম হইতে ভরতের আগমনের পূর্ব্বে কয়েকদিন পর্য্যন্ত রাজা দশরথের মৃতদেহকে তৈলের মধ্যে রক্ষা করা হইয়াছিল। তৈলময় একরূপ পদার্থের সাহায্যে প্রাচীন মিসরের রাজাদিগের মৃতদেহ অনুলেপিত হইয়া দীর্ঘকাল রক্ষিত হইত। এতদ্ভিন্ন বরফ ও কাঠকয়লার (charcoal) গুঁড়ার পচননিবারণ ক্ষমতাও প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গলা দেশের কোন কোন স্থানে জেলে ও মুসলমান মহাজনগণ মৎস্য রক্ষার ব্যবসায় চালাইয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক কি কি উপায়ে উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পদ্মা নদীতে যথেষ্ট মৎস্য ধরা পড়ে। দামুকদিয়া, গোয়ালন্দ, কুষ্টিয়া প্রভৃতি রেলওয়ে ষ্টেশনে ঐ সকল মাছ একত্র করিয়া কলিকাতা, দার্জিলিঙ্গ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রধান প্রধান নগরে চালান দেওয়া হয়। ইলিশ মাছ শীঘ্রই পচিয়া যায়। এই জন্য মহাজনেরা বড় বড় বাক্সে মাছ সাজাইয়া বরফের টুকরা দিয়া ডালা বন্ধ করিয়া দেয়। রাত্রির ট্রেনেই মৎস্য চালান দেওয়া হয়। সেই জন্য ঐ সকল মাছ কলিকাতায় টাট্‌কা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে।

এই উপায়ে আমেরিকা হইতে অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশে মাংস প্রেরিত হইয়া থাকে শোনা যায়। সাইবিরিয়ায় একটা অতিকায় হস্তীর (mammoth) বরফের মধ্যে প্রোথিত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলেও উহার গাত্রমাংস যে পচিতে পায় নাই সে কেবল বরফেরই গুণে বুঝিতে হইবে। বায়ুস্থিত অসংখ্য জীবাণু উপযুক্ত উত্তাপ ও রস (moisture) পাইলে মৃত দেহের উপর কার্য্য করিয়া শীঘ্র শীঘ্র পচাইয়া ফেলে কিন্তু বরফের মধ্যে সেই উত্তাপের অভাব হওয়ায় জীবাণুগুলি ধ্বংসকার্য্যে আদৌ ব্যাপৃত হইবার অবসর পায় না। এইজন্যেই উত্তর মেরুপ্রদেশবাসী ল্যাপ, এস্কিমো, চুকচিন্ প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ সীল, সিন্ধুঘোটক, তিমি ইত্যাদির মাংস দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারে।

গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র বরফ সংগ্রহ করা সম্ভব নহে এবং গ্রীষ্ম কালে বরফের সাহায্যে খাদ্য রক্ষা করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠে। এই জন্য লবণের সাহায্যে মৎস্য রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সময় মৎস্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া থাকে সেই সময় প্রধান প্রধান নগরের মাছের বাজারে গমন করিলে লোণা ইলিশ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরে সময়ে সময়ে এত ইলিশ মাছ ধরা পড়ে যে স্থানীয় বাজারে উহা একরূপ জলের দরেই বিক্রীত হইয়া থাকে; এক আনায় এক হালি (৪টা) পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। অনেক মহাজন এই সুযোগে প্রচুর মাছ কিনিয়া লয়। পরে উহার পেট চিরিয়া নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলে ও মাছটিকে ৭।৮ খণ্ডে বিভক্ত করে কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন করে না, পিঠের দাঁড়াটায় সংলগ্ন থাকে, তাহাতে মাছের আকার অবিকলই থাকে। তলদেশে ছিদ্রযুক্ত বৃহৎ বৃহৎ জালায় (মৃত্তিকা পাত্র বিশেষ) ঐ সকল কর্ত্তিত মৎস্য এক স্তর সাজাইয়া তাহার উপায় লবণ দেয়। সেই লবণের উপরে আর এক স্তর মৎস্য রাখে। এইরূপে মৎস্য ও লবণ স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া জালাটি পূর্ণ করে। লবণের জল নিষ্কাষণের (extract) ক্ষমতা আছে। সেই জন্য মাছের রস বাহির হইয়া জালার তলদেশে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে, অথবা ছিদ্র পথে বহির্গত হইয়া যায়। কয়েক দিন পরে মাছগুলিকে জালা হইতে তুলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশে চালান দেয়। এ দেশের ইতর শ্রেণীর লোকেরাও যে উহা না খায় তাহা নহে। লোণা ইলিশের স্বাদ থাকে না। লবণে উহার সমুদয় "শস্য" নষ্ট করিয়া ফেলে। রান্নার সময় উহাতে লবণ দেওয়া হয় না। কিন্তু তথাপি উহাতে লবণের আধিক্য লক্ষিত হয়। লোণা মাছ অতিশয় দুষ্পাচ্য।

এই উপায়েই অনেক মাছ আমেরিকা হইতে ইউরোপের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। সেখানে মাছের মাথাটা বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য নাড়ী ভুঁড়িও যে বাদ না পড়ে তাহা নহে। বড় বড় পিপায় ঐ সকল মাছ সাজাইয়া লবণ সংযোগ করে ও পিপাটিকে মধ্যে মধ্যে ওলটপালট করিয়া সমুদয় মাছে লবণজল মিশ্রিত করা হয়। ৫।৭ দিন পরে গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষক পিপাটির গাত্রে ছাপ দিলে উহা বিদেশে চালান দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টের ছাপ দেওয়া পিপার মাছ উৎকৃষ্ট রূপে রক্ষিত বোধে লোকে শীঘ্রই কিনিয়া লয়। সামুদ্রিক মৎস্য ধরিয়া দেশের আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এরূপ চেষ্টা আদৌ নাই। জাপান হইতে আনীত লোণা মাছ দেখিয়াছি। গ্রীষ্মের সময় উহা হইতে বড় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। এরূপ মাছ অতিশয় দুষ্পাচ্য।

আশ্বিন মাস হইতেই নদীর জল কমিতে আরম্ভ করে; কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষরূপ কমিয়া যায়। সেই সময় চিংড়ি, পুঁঠি, খয়রা প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র মৎস্য ঘুণি, চিত্তি প্রভৃতিতে ধরা পড়ে। মহাজনেরা ঐ সকল মাছ কিনিয়া নদীর বালুকাময় চরের উপরে উহাদিগকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লয়। ভালরূপ শুষ্ক হইলে বস্তায় বস্তায় ব্রহ্মদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে চালান দেয়। ইহাতে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে। ইহাকে শুট্‌কী মাছ বলে। গরীব লোকেরাই অসময়ে এই সকল মাছ খাইয়া থাকে। অনেক সম্পন্ন লোকেও সখ করিয়া শুট্‌কী মাছ ও লোণা ইলিশ খান।

পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক গৃহস্থ সস্তার সময় ইলিশ মৎস্যের ডিম কিনিয়া ঝুড়িতে সাজাইয়া রান্নাঘরের উনানের উপরে ঝুলাইয়া রাখে। নিম্নস্থ অগ্নির উত্তাপে ডিমগুলি শুষ্ক হয় এবং ধূমের অন্তর্গত ক্রিয়োজোটের সাহায্যে রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল ডিম গরম জলে সিদ্ধ করিয়া রান্না করা হয়। অসময়ে গৃহস্থের ইহাতে অনেক উপকার হয়। ইউরোপে smoked meat বা ধূমে রক্ষিত মাংসের যথেষ্ট প্রচলন আছে।

পাশ্চাত্য দেশে আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা হয়। তাহার মধ্যে কাঠের কয়লার গুঁড়া একটি। কর্ত্তিত মৎস্য মাংস কয়লার গুঁড়ায় উত্তমরূপ আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। কাজেই (Oxygen) অক্সিজেন বায়ু কয়লার আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য পচন

ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। এই উপায়ে রক্ষিত মৎস্য দূরস্থ আত্মীয় স্বজনের নিকট পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ মৎস্য রান্নার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ধৌত করা উচিত; নতুবা অতি শীঘ্র পচিয়া যায়। এই উপায়ে ডিম দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায়; তবে মাঝে মাঝে কয়লার গুঁড়া বদলাইয়া দিতে হয়। চূনের জলে মধ্যে মধ্যে ডুবাইয়া লইলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত ডিম রক্ষিত হইতে পারে। চূনের জন্য ডিমের খোলার ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায়। সেইজন্য ডিমের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে না।

ফরাসীদেশে জলপাইয়ের ফুটন্ততেলে (Olive oil) দুই তিন মিনিট কাল ভেট্‌কী প্রভৃতি মাছ রাখিয়া ঐ অৰ্দ্ধ ভর্জ্জিত মৎস্য টিনের পাত্রে এরূপে সজ্জিত করে যে পাত্রটির মধ্যে অতি অল্প স্থানই খালি থাকে। এই শূন্য স্থানের বায়ু দূর করিবার জন্য ঠাণ্ডা তেল ঢালিয়া দেয় এবং পূর্ণ হইলে পাত্রটির মুখ ঝালিয়া দেওয়া হয়। এই উপায়ে অনেক সুখাদ্য মৎস্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এ দেশেও এরূপ মাছের আমদানি হয়। জীবাণু নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই উত্তপ্ত করার প্রয়োজন, কিন্তু এই উপায়ে রক্ষিত মৎস্য সাধারণ হিন্দুগণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং একেবারে সরিষার ঠাণ্ডা তেলের সাহায্যে ইলিশ-মাছ রক্ষা করিলে কাজ চলিতে পারে।

কেবলমাত্র বায়ু নিষ্কাষণ করিয়াও এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। একটা টিনের কেনেস্তারায় মস্তক ও নাড়ীভুঁড়িবিহীন মৎস্যদেহ এরূপ ঘন সন্নিবেশিত করিতে হয়, যেন পাত্রটির মধ্যে অতি অল্প বায়ু থাকিতে পায়। সাজান শেষ হওয়া মাত্র পাত্রটির ঢাক্‌না বন্ধ করিয়া কিনারাটা উত্তমরূপে ঝালিয়া দিতে হয়। ঢাক্‌নার উপরে একটি ছোট ছিদ্র করিয়া পাত্রটিকে বাষ্প-সাহায্যে উত্তপ্ত করিলে মৎস্যের দেহস্থিত জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে ছিদ্র পথটি দিয়া বাহির হইতে থাকে। ঐ সঙ্গে পাত্রটির ভিতরকার বাতাসটুকুও বাহির হইয়া আসে। ঐ সময় ছিদ্রটি ঝালিয়া দিতে হয়। ঠাণ্ডা হইলে পর পাত্রের ডালা একটু তোবড়ান (concave) দেখাইলে বুঝিতে হইবে যে পাত্রের বায়ু অনেকটা বাহির হইয়া গিয়াছে। উষ্ণ বাষ্পের সাহায্যে উত্তপ্ত করা অসুবিধাজনক বোধ হইলে অগভীর বৃহৎ একটা জলপাত্রে টিনগুলিকে রাখিয়া অল্পে অল্পে তাপ বৃদ্ধি করিলেও চলে। হঠাৎ উত্তাপ বৃদ্ধি করিলে বা ফুটন্তজলে হঠাৎ নিক্ষেপ করিলে টিনগুলি ফাটিয়া যাওয়া সম্ভব। এই উপায়ে কেবলমাত্র মৎস্য মাংস নহে, অনেক সুমিষ্ট ফল ও সিরাপ পর্য্যন্ত রক্ষা করা হয়।

চিনির সাহায্যে মৎস্য মাংস রক্ষা করার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। ইউরোপের অনেক স্থানে এক পাউণ্ড (প্রায় আধ সের) লবণের সহিত ৪ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট চিনি মিশ্রিত করিয়া উহার দ্বারা মৎস্য মাংস উত্তমরূপে মাখান হয়। দুই দিন ঐরূপ অবস্থায় রাখিয়া পরে চাপিয়া পিপার মধ্যে সাজান হয়। পিপার খালি অংশ তরল চর্ব্বি দ্বারা পূর্ণ করা হয়। এইরূপে রক্ষা করার নাম ওলির (Wohly's) প্রক্রিয়া। আমাদের দেশে লোকে চর্ব্বি পছন্দ করিবে না, সুতরাং সর্ষপ তৈল উহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রতি বৎসর ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে অনেক টাকার রক্ষিত মাংস এ দেশে আসিয়া থাকে; অথচ আমরা ইলিশের ন্যায় উৎকৃষ্ট মৎস্য বিদেশে চালান দিয়া নিজের ও দেশের অর্থবৃদ্ধি করিতে অক্ষম। উৎসাহী যুবকগণই এখন দেশের একমাত্র ভরসা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

সর্ব্বপ্রথম বিলাত-যাত্রী বঙ্গনারী

পাশ্চাত্য শিক্ষার অভ্যুদয়ে হিন্দুসমাজ সংস্কারের কল্যাণ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ধীরে ধীরে মেঘ-মুক্ত রবি-কিরণের ন্যায় ভারতের সামাজিক জীবনে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী এবং আধ্যাত্মিক জীবনে ঋষিধর্ম্ম—ব্রহ্মজ্ঞান—সঞ্চার হইতেছে। এই নবীনস্রোত, নবসংস্কার, নবআন্দোলনের পথে বাধা দিবার আর উপায় নাই। কালের এমনি গতি, যাঁহারা সংস্কার চাহেন না, পদে পদে সংস্কারমূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত, তাঁহারাও সংস্কারভাব-স্রোতে ক্রমশঃ পরিচালিত হইতেছেন।

সে ত সুদূর অতীত কালের কথা নহে, যখন অবরোধ-বাসিনী ভারতমহিলাগণ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেন

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৭১ সালের চেহারা।)

না, যে, অবলা কুলবধূ হইয়া তাঁহারা বাড়ীর বাহির হইতেই সমর্থ। এক সময়ে যাহা কল্পনার অতীত ছিল, তাহাই এখন সম্ভব হইয়াছে। ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার প্রমুক্ত হইয়াছে। মহিলাজগতে মঙ্গল-শঙ্খ বাদিত হইতেছে। ভারতের রাজন্যবৃন্দও রাণী এবং কুমারীগণ সহ পৃথিবীর নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছেন। জয়পুর, গোয়ালিয়র, বড়োদা প্রভৃতি রাজ্যের হিন্দু মহারাজাগণ সপরিবারে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন। পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে মুসলমান মহারাণী ভূপালের বেগম পর্য্যন্তও ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষা এবং জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য প্রতি বৎসর অনেক ভারতমহিলা বিদেশে গমন করিতেছেন। সমুদ্র যাত্রার "নিষেধ বাঁধ" ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; অবরোধ-প্রথা দূরীভূত হইতেছে; জাতিভেদ শিথিল হইতেছে। কিন্তু প্রথমে যাঁহারা এই চিরাগত সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমাজে সাম্য ও স্বাধীনতার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কত বড় বীর তাহা আমরা তাঁহাদের উপ্ত বীজের ফল ভোগ করিয়া বুঝিতে পারি না। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সাহস করিয়া বিলাত গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট আজ বঙ্গদেশ অনেক পরিমানেই ঋণী। বঙ্গদেশে পুরুষদিগের মধ্যে যেমন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম বিলাত গমন করেন, তেমনি নারীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিলাত গমন করিয়াছিলেন,—

স্বর্গীয়া রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগরের বিখ্যাত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী এবং কোচিন ষ্টেটের দেওয়ান, ভারতীয় সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, মহাশয়ের মাতৃ দেবী।

যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে—ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে—শশিপদ বাবুর প্রাণে এই ভাব জাগ্রত হইয়াছিল যে, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং শ্রমজীবিগণের শিক্ষা ও উন্নতি-সাধন ভিন্ন নব্যভারত সুগঠিত হইবে না। তিনি এই মহৎ ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া দৃঢ় পদ বিক্ষেপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। বালিকা পত্নীকে কর্ম্মের সহকারিণী করিয়া লইলেন। রাজকুমারীর বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, তখন হইতে তিনি স্বামীর নিকটে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। একদিকে যেমন শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন, অপর দিকে পরিবারস্থ ছোট ছোট মেয়েদিগকে শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকা শিক্ষার আয়োজন হইল। নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শশিপদ বাবু স্বীয় লক্ষ্য রত্নহারের ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছেন বলিয়া সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, গৃহ হইতে বিতাড়িত এবং নানা ভাবে লাঞ্ছিত। এ সময়ে তাঁহার আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় ছিল। কিন্তু পতি ও পত্নী দুই জনে একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়া তপপরায়ণ সাধকের ন্যায় নারীশিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। বন্দ্যোপাধ্যায়-দম্পতি এই বীজমন্ত্র গ্রহণ করিলেন :—

স্বর্গীয়া রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৭১ সালের চেহারা।)

“প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাজে তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।”

এই সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী মেরি কার্পেণ্টার ইংলণ্ড হইতে ভারতে শুভাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় উপনীত হইয়া শশিপদ বাবুর কার্য্য-প্রণালী দর্শন করিবার জন্য বরাহনগরে গমন করেন। তখন বন্দ্যোপাধ্যায়-দম্পতি সামান্য কুটীরে বাস করিতেন; অতি সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিতেন। বিদুষী সম্ভ্রান্তা ইংরাজ মহিলাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিবার তাঁহাদের সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু মেরি কার্পেণ্টার বন্দ্যোপাধ্যায়-দম্পতির শিষ্টাচার, আদর, যত্ন ও আগ্রহ দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বশকট সদর রাস্তায় উপস্থিত হইবামাত্র একজন হিন্দু বধূ মুক্তভাবে বাহির হইয়া সাদর সম্ভাষণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন, এদৃশ্যে ইংরাজ মহিলা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দু গৃহে তিনি এরূপ দৃশ্য আর দর্শন করেন নাই। তিনি ইহা দেখিয়া এমনি মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাসস্থান গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে গমন করিয়া এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, “আজ আমি বরাহনগরে গিয়া যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, ভারতে আসিয়া তাহা দেখি নাই।”

বরাহনগরের দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে ফোটগ্রাফের ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছিল। তাই তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, শশিপদ বাবু বিলাত গমনের সংকল্প করিয়াছেন, অমনি তিনি তাঁহাকে এই মর্ম্মে অনুরোধ পত্র লিখিলেন, “আপনি পত্নীসহ এখানে আসিবেন; ব্যয় আমি বহন করিব।”

বৈষ্ণবভক্তগণের মুখে একটা অমৃতবাণী শুনিতে পাওয়া যায়,

“আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।”

বন্দ্যোপাধ্যায়-দম্পতি স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেমন নারী শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন, অপর দিকে উভয়ে মুক্তভাবে নানা স্থানে কার্য্যোপলক্ষে গমনাগমন করিয়া নারীর স্বাধীনতার পথ প্রমুক্ত করিতে লাগিলেন। এবং এই লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াই মেরি কার্পেণ্টারের অনুরোধে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে অলগা নামক ষ্টীমারে বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতি কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। প্রায় দেড় মাস পরে তাঁহারা ইংলণ্ডে উপনীত হন।

সেই দিন হইতে ভারতনারীর বিদেশ যাত্রার দ্বার প্রমুক্ত হইল।

নারীসমাজে রাজকুমারী পতি-সাহায্যে সর্ব্বপ্রথমে যে যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ভারত সেই আদর্শের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে।

বন্দ্যোপাধ্যায়-দম্পতি ইংলণ্ডে ৮ মাস কাল অবস্থিতি করিয়া সম্ভ্রান্ত নরনারীগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তৎপর তাঁহারা ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় শ্রমজীবি

শিক্ষা, বিধবাগণের আশ্রয় ও শিক্ষাদান, বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনাদি কার্য্যে নিয়োজিত হন। কিন্তু রাজকুমারী দীর্ঘ-কাল ইহলোকে সেবাকার্য্যে রত থাকিতে পারিলেন না। তিনি অসময়ে—মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে, পরলোক গমন করিলেন। তিনি কর্ম্ম করিতে করিতে অকস্মাৎ চলিয়া গেলেও নব ভারতের ঐতিহাসিকগণ তাহার সম্বন্ধে অকৃতজ্ঞ হইবেন না। সামাজিক ইতিহাসে হিন্দুনারীর স্বাধীনতা লাভের অধ্যায়ে রাজকুমারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

গীতাপাঠ

(আবহমান)

এই যে একটি কথা যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অথচ আত্মা যিনি প্রকৃতির দ্রষ্টা এবং অধিষ্ঠাতা তিনি নিগুর্ণ, এ কথাটি আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই—বিশেষত সাংখ্য এবং বেদান্ত শাস্ত্রে—আবহমান কাল হইতে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ও-কথাটির অর্থ কি? ত্রিগুণ পদার্থ টা কি? এই প্রশ্নের যথাবৎ মীমাংসা করিতে হইলে সত্ত্বগুণের গোড়ার কাহিনীটি অন্ধকার হইতে আলোকে টানিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। এ কার্য্যটির নিষ্পাদন অতি সহজে হইতে পারে—হয় না কেবল আমাদের নিজের দোষে। আমরা গোড়ার পইটা হইতে যাত্রারম্ভ না করিয়া আগে ভাগেই চরম পইটাতে পদনিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, আর সেই জন্য অভীষ্ট ফল-লাভে বঞ্চিত হই। অতএব আমাদের এই চাপল্য-দোষটিকে প্রশ্রয় না দিয়া সর্ব্বাগ্রে সত্ত্বগুণের গোড়ার কাহিনীটির তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

কবি শব্দ হইতে কবিতা এবং কবিত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। ইহা সকলেরই জানা কথা। এটাও তেমনি জানা উচিত যে, সৎ শব্দ হইতে সত্তা এবং সত্ত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে;—দেখা উচিত যে, কবিতা এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সত্তা এবং সত্ত্বের মধ্যে অবিকল সেইরূপ। কবির কবিতা যখন প্রকাশে বাহির হয়, তখন তাহা দৃষ্টে আমরা যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি, যে-কোনো বস্তুর সত্তা যখনই আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, সে বস্তুর ভিতরে সত্ত্ব রহিয়াছে—সে বস্তু সৎপদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, কবিতার প্রকাশ যেমন কবিত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ, সত্তার প্রকাশ তেমনি সত্ত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ। সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়-লক্ষণ আছে—সেটি হচ্চে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। কবিতার রসাস্বাদনে যখন ভাবুক ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্রটি যেমন কবির অন্তর্নিহিত কবিত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি সত্তার রসাস্বাদনে চেতনাবান্ ব্যক্তির যখন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দ মাত্রটি সদ্‌বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে।

আমরা প্রতিজনে আমাদের আপনার আপনার ভিতরে মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকাশ এবং আনন্দ সত্তা'র সঙ্গের সঙ্গী। "আমি এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি আমি যেমন আমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি, তুমিও তেমনি তোমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছ। ইহারই নাম আত্মসত্তার প্রকাশ। আবার, "আমি যেমন এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি তেমনি সর্ব্বকালেই যেন বর্ত্তিয়া থাকি" আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার এই যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ, এ আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতিজনের আত্মসত্তার উপরে নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে। আত্মসত্তাতে যদি আমাদের আনন্দ না হইত তবে ঐ শুভ ইচ্ছাটি অর্থাৎ বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা কোনো কালেই আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে স্থান পাইতে পারিত না। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার মধ্যেই সত্তা'র সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, আর, সেই গতিকে আমরা এটা বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ভিতরে সত্ত্ব আছে—আমরা সৎ-পদার্থ। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই তাই এ কথাটি বেদবাক্যের ন্যায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রকাশ এবং আনন্দই সত্ত্বগুণের পরিচায়ক-

লক্ষণ; এমন কি—সত্ত্বগুণের সহিত প্রকাশ এবং আনন্দের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য ইঙ্গিতচ্ছলে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করা হয় নাই যে, প্রকাশ এবং আনন্দের নামই সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখিলাম, এখন রজোগুণ এবং তমোগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখা যা'ক্।

নানা কবির কবিতা আছে, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই কবিতা দেশ-কাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন এই অর্থে ব্যষ্টিকবিতা। পক্ষান্তরে কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ, তাঁহার কবিতা সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের কবিতা এই অর্থে সমষ্টি-কবিতা। কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ তিনি কে? তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন—তিনি প্রকৃতিদেবী স্বয়ং। কাব্যানুরাগী বিদ্বজ্জন-সমাজে এ কথা কাহারো নিকটে অবিদিত নাই যে, কালিদাসের কবিতায় যেমন শেক্স্পিয়রীয় কবিত্ব-গুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না, শেক্স্পিয়রের কবিতাতেও তেমনি কালিদাসীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না; তেমনি আবার মিল্টনের কবিতাতেও ও-দুই শ্রেণীর কবিত্বগুণের কোনোটিরই নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবেই হইতেছে যে প্রকৃতিদেবীর হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত সমষ্টিকবিতা যেমন পূর্ণমাত্রা কবিত্বের অভিব্যঞ্জক, ব্যষ্টিকবিতা সেরূপ নহে; ব্যষ্টিকবিতা মাত্রই কবিত্বগুণের দেশ-কাল-পাত্রোচিত খণ্ডাংশেরই অভিব্যঞ্জক। কবিতা সম্বন্ধে এ যেমন আমরা দেখিলাম, সত্তাসম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, এক শাখার পুষ্প যেমন আরেক শাখার পুষ্প নহে, তেমনি তোমার সত্তাও আমার সত্তা নহে, আমার সত্তাও তোমার সত্তা নহে, এবং তৃতীয় আর যে-কোনো ব্যক্তির নাম করিবে তাহার সত্তাও তোমার বা আমার সত্তা নহে। ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই এইরূপ দেশ-কাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন; আর সেই জন্য কোনো ব্যষ্টিসত্তাই পূর্ণমাত্রা সত্ত্বগুণের বা শুদ্ধসত্ত্বের পরিচায়ক নহে; ব্যষ্টিসত্তা-মাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, যেমন সকল শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, সুতরাং বৃক্ষের পুষ্পই সমষ্টি-পুষ্প, আর সকল শাখার পুষ্পই সেই সমষ্টি-পুষ্পের অন্তর্ভূত; তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি পরমাত্মা তাঁহার সত্তাই সমষ্টিসত্তা এবং আর আর সকল সত্তাই সেই সমষ্টিসত্তার অন্তর্ভূত; আর, সেই জন্য সমষ্টিসত্তা যেমন অবাধিত সত্ত্বগুণের বা শুদ্ধসত্ত্বের নিধান, ব্যষ্টিসত্তা সেরূপ নহে। ব্যষ্টিসত্তামাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের, অথবা যাহা একই কথা—বাধাক্রান্ত প্রকাশ এবং আনন্দের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। বলিয়াছি যে, সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটি, একটি হ'চ্চে প্রকাশ এবং আর একটি হ'চ্চে আনন্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকাশকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য অচৈতন্য বা জড়তা এবং অবসাদ বা স্ফূর্ত্তিহীনতা। আনন্দকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য দুঃখ বা পীড়ানুভব এবং অশান্তি বা প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য। সত্ত্বগুণের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে শাস্ত্রীয় ভাষায় যথাক্রমে বলা হইয়া থাকে তমোগুণ এবং রজোগুণ। বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের আর এক নাম যেমন সত্ত্বগুণ, অচৈতন্য এবং অবসাদের আর এক নাম তেমনি তমোগুণ; আবার, দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের আর এক নাম তেমনি রজোগুণ। তমোগুণ যে কি অর্থে তমোগুণ তাহা তমঃ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে—তমোগুণ প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী এই অর্থেই তমোগুণ। রজোগুণ কি অর্থে রজোগুণ তাহাও রজঃ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ধোপাদের বংশানুযায়ী কার্য্য কাপড় কাচা তো ছিলই, তা ছাড়া তাহাদের আর একটি কার্য্য ছিল বস্ত্র রঙানো; এই জন্য সংস্কৃত ভাষায় ধোপা রজক নামে প্রসিদ্ধ—বস্ত্র রঞ্জন করে অর্থাৎ রঙায় এই অর্থে রজক। রঙ সম্বন্ধে জর্ম্মাণ দেশীয় মহাকবি গেটের একটি সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণক্ষেত্র মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত; সে তিন ভাগ হ'চ্চে—একদিকে সাদা, আর একদিকে কালো এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রক্ত নীল পীত প্রভৃতি রঞ্জন বা রঙ। তাহার মধ্যে দেখিতে হইবে এই যে, কালো রঙ রঙই নহে—তাহা অন্ধকারেরই আর এক নাম। সাদা রঙ কালো রঙের ঠিক্ উল্টা পিঠ সুতরাং তাহাও প্রকৃত পক্ষে রঙ নহে। সাদা রঙ বিচিত্র বর্ণরাজির লয় স্থান—তাহা শুভ্র আলোক। বর্ণক্ষেত্রও যেমন তিন ভাগে বিভক্ত—গুণক্ষেত্রও অবিকল সেইরূপ। গুণক্ষেত্রের এ মুড়ায় রহিয়াছে সত্ত্বগুণের নিরঞ্জন আলোক; ও মুড়ায় রহিয়াছে তমোগুণের অঞ্জন; এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে

রজোগুণের রঞ্জন। অর্থাৎ একদিকে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের চেতনজ্যোতি, আর একদিকে রহিয়াছে তমোগুণের জড়তা অন্ধকার, এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রাগ-দ্বেষ-রূপী রজোগুণের রঞ্জন; তাহার মধ্যে দ্বেষ তমোগুণ ঘ্যাঁসা রজোগুণ এইজন্য তাহা অন্ধকার ঘ্যাঁসা নীল রঙের সহিত উপমেয়; দ্বেষকে গিলিয়া খাইয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। অনুরাগ সত্ত্বগুণ ঘ্যাঁসা রজোগুণ, এই জন্য তাহা আলোক ঘ্যাঁসা পীত রঙের সহিত উপমেয়—গোপী-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাই পীতাম্বর হইয়াছেন; পরন্তু রজোগুণের নিজমূর্ত্তি হ'চ্চে রাগ; তার সাক্ষী রজোগুণের যে দুইটি প্রধান অন্তরঙ্গ কাম এবং ক্রোধ দুইই রাগধর্ম্মী। কাম তো রাগ বটেই; তা ছাড়া বঙ্গ ভাষায় ক্রোধের আর এক নাম রাগ। রাগই প্রবৃত্তি চাঞ্চল্যের গোড়ার সূত্র। রজোগুণের নিজমূর্ত্তি এই যে, রাগ, ইহা লাল রঙের সহিত উপমেয়। রক্ত শব্দ, রঞ্জন শব্দ, রজঃ শব্দ, রাগ শব্দ, সবাই এরা একই মূলধাতুর সন্তান সন্ততি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। লাল রঙ দেখিলেই বৃষজাতি ক্ষেপিয়া ওঠে রক্ত গরম হইলেই প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য হয় দুঃখজ্বরে রক্তের তাপ বৃদ্ধি হয় এ সমস্তই রজোগুণের লক্ষণ। এই জন্য যদি উপমাচ্ছলে বলা যায় যে, সত্ত্বগুণ সাদা, তমোগুণ কালো, রজোগুণ লাল, তবে প্রকৃত কথাটা যে কি বলা হইল তাহা সাধারণ শ্রোতৃবর্গের সহসা বোধগম্য না হইতে পারুক্, পরন্তু ভাবুক লোকের তাহা বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। এ সকল ফ্যাঁকড়া কথা ছাড়িয়া এখন প্রকৃত প্রস্তাবের বাঁধা রাস্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক্।

একটু পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। সত্ত্বগুণের বাধা জন্মায় যে কে তাহাও আমরা দেখিয়াছি; আমরা দেখিয়াছি যে, যে দুইটি মূল উপাদান সত্ত্বগুণের সহিত মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে কিনা প্রকাশ এবং আনন্দ—তাহাদের প্রথমটির (অর্থাৎ প্রকাশের) প্রতিদ্বন্দ্বী হ'চ্চে তমোগুণ বা জড়তা এবং অবসাদ; দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ আনন্দের) প্রতিদ্বন্দ্বী হ'চ্চে রজোগুণ বা দুঃখ এবং অশান্তি। তা'ছাড়া, রজোগুণ এবং তমোগুণের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়াছে খুবই স্পষ্ট। বাধার অনুভব হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেরই জানা কথা; এমন কি—বাধানুভবেরই নাম দুঃখ। বাধানুভব যদিচ বিশুদ্ধ জ্ঞানের ন্যায় সুস্পষ্ট চেতন নহে, কিন্তু তথাপি তাহা যে চেতনের পূর্ব্বাভাস তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; পরন্তু তমোগুণের জড়তার মধ্যে চেতনের নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না; তেমনি আবার, প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের মধ্যে যদিচ কেবল আনন্দ হাত বাড়াইয়া পাইবার জন্য এক প্রকার মোহাচ্ছন্ন আঁকুবাকুর ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়, তা ভিন্ন কর্ত্তৃত্বমূলক কর্ম্ম-চেষ্টার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তাহা যে স্বাধীন কর্ম্মোদ্যমের পূর্ব্বাভাস তাহাতে আর ভুল নাই; পক্ষান্তরে, তমোগুণের জড়তা এবং অবসাদের মধ্যে কর্ম্মোদ্যমের নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তার অধিকারায়ত্ত প্রদেশে শুধুই যে কেবল সত্ত্বগুণের সহিত অপর দুই গুণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তাহা নহে; পরন্তু সে প্রদেশে তিন গুণই পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, তিন গুণের কোন না-কোনো-টির সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, কোনো না-কোনোটির প্রসুপ্ত ভাব, কোনো না-কোনটির অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাদমস্তক জুড়িয়া সর্ব্বত্রই পরিকীর্ণ রহিয়াছে; সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটিও এমন কোনো বস্তু খুঁজিয়া পাইতে পারিবার জো নাই, যাহাতে তিন গুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে একত্র যোটবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি না করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ত্রিগুণের একটি-না-একটির সাময়িক প্রাদুর্ভাব এবং সেই সঙ্গে অপর দুইটি গুণের কোনোটির বা অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাব এবং কোনোটির বা প্রসুপ্ত ভাব যাহা আমরা প্রতি জনে আপনার আপনার মধ্যে কালসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে দেখিতে পাই, তাহাই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত আকাশক্ষেত্রে পরিবেশিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। প্রাতঃকালে সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় একদিকে যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, ইতিপূর্ব্বে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বশত আমাদের ভিতরে সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে রজোগুণের দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য স্ফূর্ত্তি পাইতে

পথ নাই, আর এক দিকে তেমনি দেখিতে পাই যে, ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুর মধ্যে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং আনন্দ, আর সেই সঙ্গে রজোগুণের দুঃখ এবং প্রবৃত্তি চাঞ্চল্য স্ফূর্ত্তি পাইতে পথ পায় না। ইহা দৃষ্টে কেহ যদি মনে করেন যে, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের ভিতরে প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য মূলেই বিদ্যমান ছিল না—প্রসুপ্ত ভাবেও বিদ্যমান ছিল না, অথবা যদি মনে করেন যে, ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুতে প্রকাশ এবং আনন্দ তথৈব দুঃখ এবং প্রবৃত্তি চাঞ্চল্য মূলেই বিদ্যমান নাই-বীজভাবেও বিদ্যমান নাই, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। এ তো সোজা কথা যে, আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় যদি আমাদের ভিতরে প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দুঃখ এবং প্রবৃত্তি চাঞ্চল্য প্রচ্ছন্ন ভাবে অর্থাৎ ধামাচাপা ভাবে বিদ্যমান না থাকিবে, তবে আমাদের জাগরণ মুহূর্ত্তে ঐ সত্ত্বরজোগুণের ব্যাপারগুলি আমাদের মধ্যে আসিয়া জুটিবে কোথা হইতে? তেমনি আবার জড় পরমাণু-নিচয়ের মধ্যে যদি ঐ সত্ত্বরজোগুণের ব্যাপারগুলি ধামাচাপা না থাকিবে, তবে এককালে তো আমরা মাতৃগর্ভের জরায়ুশয্যায় প্রকৃত পক্ষেই জড়পিণ্ড ছিলাম—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র ঐ চেতন-ব্যাপারগুলির অস্ফুট আভাস আমাদের এই জড়শরীরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল কোথা হইতে? তা ছাড়া, আর একটি কথা আছে সেটাও বিবেচ্য। সে কথা এই যে, গোড়ায় সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত আনন্দ না থাকিলে, সেই আনন্দের বাধানুভূতি যাহার আরেক নাম দুঃখ তাহা থাকিতে পারে না; আনন্দের বাধানুভূতি না থাকিলে আনন্দের জন্য একটা আঁকুবাঁকু অর্থাৎ প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না; আনন্দের জন্য একটা আঁকুবাঁকু না থাকিলে আনন্দের বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা থাকিতে পারে না; বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিলে, ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না। জড়পরমাণুচয়ের সঙ্গে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি-ক্রিয়া নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে এটা সকলেরই জানা কথা; কাজেই, এই মাত্র যে একটি সম্ভাবনীয়তার সোপান পদ্ধতি দেখাইলাম তাহা হইতে আসিতেছে এই যে, সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ক্রিয়ার মূলে প্রাণ যাহা চায় তাহার বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা রহিয়াছে; সেই বাধা অতিক্রমণের চেষ্টার মূলে প্রাণ যাহা চায় তাহার জন্য একটা আঁকুবাঁকু রহিয়াছে; আনন্দের জন্য এই যে একটা আঁকুবাঁকু তাহার মূলে আনন্দের বাধানুভূতি রহিয়াছে; আনন্দের বাধানুভূতির মূলে সত্তার রসাস্বাদন জনিত আনন্দ রহিয়াছে এবং সেই আনন্দের মূলে সত্তার প্রকাশ রহিয়াছে। ইহাতে এইরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জীবের মধ্যেও যেমন, জড় পরমাণুর মধ্যেও তেমনি, উভয়েরই তিন গুণই এক সঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রকাশ এবং আনন্দও বিদ্যমান রহিয়াছে, দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যও বিদ্যমান রহিয়াছে, জড়তা এবং অবসাদও বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, জড়জগতে তমোগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী; নীচের ধাপের জীবজগতে রজোগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী; উপরের ধাপের জীবজগতে অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজে সত্ত্বগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, জড়বস্তুর মধ্যেও কি সত্ত্বগুণ আছে—প্রকাশ এবং আনন্দ আছে? ইহার উত্তর এই যে, আছে কিন্তু প্রসুপ্ত ভাবে। ফলে জড়বস্তুর ভিতরে সত্ত্বগুণের বর্ত্তমানতা যতই তর্কের বিষয় হউক না কেন সে সম্বন্ধে অন্ততঃ এটা স্থির যে, জড়বস্তুর সত্তা শুধু কেবল তোমার বা আমার বা অপর কাহারো মনোগত সত্তা নহে—পরন্তু তোমার সত্তা যেমন বাস্তবিক সত্তা, জড়বস্তুর সত্তাও সেইরূপ বাস্তবিক সত্তা। আমি যদি বলি যে তোমার সত্তা তোমার নিজের মধ্যে মূলেই প্রকাশ পায় না, তথৈব জড়বস্তুর সত্তা জড়বস্তুর নিজের মধ্যে মূলেই প্রকাশ পায় না, দুইই কেবল আমার মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বলা হয় এই যে, প্রভূত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শুদ্ধ কেবল আমার সত্তাই বাস্তবিক সত্তা, তা বই তোমার সত্তা বা আর কোনো কিছুর সত্তা আমার একটা মনগড়া সামগ্রী বই আর কিছুই নহে। এই জন্য আমি তাহা না বলিয়া বলি শুধু এই যে, তোমার নিদ্রাবস্থাতে যেমন তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ তোমার সত্তার

প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রশান্ত আনন্দ তোমার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তেমনি তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ জড়পরমাণুর সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রশান্ত আনন্দ তাহার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে - এই যা কেবল; তা বই, জড়বস্তুর মধ্যে ঐ দুইটি সত্ত্বগুণের ব্যাপার মূলেই যে বিদ্যমান নাই তাহা নহে।

মানবসমাজের প্রতিভাশালী আদি গুরুগণের চক্ষুই স্বতন্ত্র। তাহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি একপ্রকার অন্তর্দীপনী আলোকচ্ছটা একপ্রকার X-ray। পুঁথিগত বিদ্যার ব্যবসায়ীরা যাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও দেখিতে পান না সেই সকল বিশ্বব্যাপী মহাতত্ত্ব অতীব স্বল্প উপলক্ষে প্রতিভাশালী মহাত্মগণের দিব্যচক্ষুতে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। তা'র সাক্ষী ঃ নিউটন একটা বৃন্তচ্যুত আপেল ফলকে ভূতলে পড়িতে দেখিয়া তাহার আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ভারাকর্ষণের কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। গালিলিও তাঁহার দেশের ভজন-মন্দিরের মূর্দ্ধালম্বিত দীপঝাড়ের দোলনের ভাবগতি দেখিয়া তাহার আলোকে এই একটি বিশ্বব্যাপী তত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দোলা মাত্রেরই পর্য্যাবর্ত্তন সামকালিক। আমাদের দেশের আদিম আচার্য্যেরা তেমনি জীবপ্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকতা দেখিয়া তাহার আলোকে সর্ব্বময়ী মহাপ্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকতা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই শেষের বার্ত্তাটির আমি সন্ধান পাইলাম কিরূপে তাহা বলিতেছি -প্রণিধান কর। সত্ত্ব শব্দের প্রচলিত অর্থ জীব। তার সাক্ষী ঃ- দেশীয় সাধুভাষায় গর্ভিণী নারীকে বলা হইয়া থাকে অন্তঃসত্ত্বা—অন্তরে সত্ত্ব কি না জীব জাগিতেছে এই অর্থে অন্তঃসত্ত্বা। তা' ছাড়া কাব্য পুরাণাদিতে সমুদ্র-বর্ণনার প্রসঙ্গচ্ছলে ভূয়োভূয় এইরূপ স্বভাবোক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমুদ্র তিমি মকর প্রভৃতি মহাসত্ত্বগণের বাসস্থান। অতএব প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় সত্ত্ব শব্দের অর্থ যে জীব তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এখন কথা হচ্চে এই যে, মনুষ্যই জীবের মধ্যে সেরা জীব বা আদর্শ-জীব, আর, মনুষ্যের একটি প্রধান জাতি-পরিচায়ক-লক্ষণ হ'চ্চে বুদ্ধিমত্তা। এইজন্য দার্শনিক ভাষায় জীবের পরিবর্ত্তে মনুষ্যজাতি-সুলভ স্থির বুদ্ধিই বিশেষার্থে সত্ত্ব নামে সংজ্ঞিত হয়। পাতঞ্জল-দর্শনের তৃতীয় পাদের সর্ব্বশেষের সূত্রটির প্রতি যদি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর তবে দেখিবে যে, সে সূত্রটি এই ঃ—"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যং।" ঐ দর্শনের ভানুমতী টীকায় "সত্ত্বশুদ্ধি" এই বচনটির অর্থ ভাঙিয়া বলা হইয়াছে এইরূপ ঃ -"সত্ত্বস্য বুদ্ধিদ্রব্যস্য শুদ্ধিঃ" সত্ত্বের শুদ্ধি কি না বুদ্ধি-পদার্থের শুদ্ধি। এখন দেখিতে হইবে এই যে জীবের নিশ্চয়াত্মিকা স্থির বুদ্ধিই বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের নিলয়; জীবের অস্থির মনই দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের নিলয়; জীবের স্থূল শরীরই জড়তা এবং অবসাদের নিলয়। এই জন্য বলিতেছি যে, খুব সম্ভব আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা জীবের মধ্যে ঐ তিনটি আদর্শভূত সত্ত্বরজস্তমোগুণের ব্যাপার পরম্পরাশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিয়া তাহারই আলোকে এই মহাতত্ত্বটি প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুই সত্ত্বরজস্তমোগুণের লীলাক্ষেত্র, এমন কি সত্ত্বরজস্তমোগুণই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব। তাঁহারা আরো বলেন এই যে, জগতের মধ্যস্থিত প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ একত্র যোটবদ্ধ রহিয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, তিনগুণের যে গুণটি এক বস্তুতে প্রকট ভাবে ফুটিয়া বাহির হয়, সেই গুণটি আর এক বস্তুতে অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, এবং তৃতীয় আর এক বস্তুতে তাহা প্রসুপ্ত ভাবে বা বীজ ভাবে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ বিশেষ মাত্রায় অভিব্যক্ত হয়। এ কথার প্রমাণ আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই সহজে পাইতে পারি। আমাদের নিদ্রাবস্থায় যখন আমাদের মনোমধ্যে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আমরা জড়পদার্থের --বিশেষতঃ উদ্ভিদ্ পদার্থের – দলভুক্ত হই। তমোগুণের এইরূপ প্রাদুর্ভাব কালেও আমাদের মধ্যে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণের কার্য্য ন্যূনাধিক পরিমাণে তলে তলে চলিতে থাকে, তা বই ও-দুয়ের কোনোটির কার্য্য একেবারেই বন্ধ থাকে না। তাহার সাক্ষী ঃ—নিদ্রান্ধকারের মেঘের আড়ালে ঘড়ি ঘড়ি স্বপ্নের ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা রকমের বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে থাকে ইহা

সকলেরই জানা কথা ; এরূপ প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য যে রজোগুণের ব্যাপার তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তা ছাড়া, নিদ্রান্ধকারের আরো গভীর অন্তস্তরে সত্তার প্রকাশ এবং সেই প্রকাশের সঙ্গাশ্রিত সুনির্ম্মল আনন্দ এই দুই সত্ত্বগুণের ব্যাপারও যে তলে তলে জাগিতে থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে কেহ যদি কাহারো সুনিদ্রা বলপূর্ব্বক ভাঙ্গাইয়া দ্যায়, তাহা হইলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্তো নাবিল এই ভাবে চমকিয়া উঠিয়া পূর্ব্বানুভূত সুখের বড্ড একটা অভাব অনুভব করে। আমাদের এই স্থূল শরীরাবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিদ্রা স্বপ্ন এবং জাগরণ দৈনন্দিন ব্যাপার, পরন্তু বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঐ তিনটি অবস্থা পরিণাম যুগযুগান্তরের ব্যাপার। তাহা হইবারই কথা—কেন না ব্রহ্মার এক দিন আমাদের এক যুগ। তমোগুণের প্রাদুর্ভাব-কালে অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমরা যেমন কার্য্যত অচেতন হই অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে practically unconscious সেই ভাবে অচেতন হই ; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের জড়পরমাণু সকল সেই ভাবেই অচেতন ; তা বই, এ ভাবে অচেতন নহে যে, তাহাদের মধ্যে চেতন মূলেই বর্ত্তমান নাই—বীজ ভাবেও বর্ত্তমান নাই। আবার রজোগুণের প্রাদুর্ভাবকালে যখন আমাদের মনোমধ্যে স্বপ্নের আধিপত্য হয়—তা' সে নিদ্রাবস্থার খাটি স্বপ্নই হো'ক্ আর জাগরিতাবস্থার জাগ্রৎস্বপ্নই হো'ক্ তাহাতে বিশেষ কিছু আইসে যায় না, আর সেই স্বপ্নের ঝাপ্সা আলোকে আমরা যেমন প্রবৃত্তির ঝোঁকে ইতস্তত নীয়মান হইয়া কার্য্যত মূঢ়জীব বনিয়া যাই, পশ্বাদি জন্তুরা সেই ভাবে মূঢ়জীব। অধুনাতন কালের নব্যতম প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পিপীলিকা মধুমক্ষিকা প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিহীন জীবদিগের স্বভাব চরিত্র এবং কার্য্যানুষ্ঠান-পদ্ধতি বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নিশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা (অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Somnambulist সেই শ্রেণীর ব্যক্তিরা) যেমন ঘুমের ঘোরে কেহ বা কলেরিজের কুব্‌লাখানের ন্যায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখে, কেহ বা গণিতের দুরূহ সমস্যা অবলীলাক্রমে পূরণ করে, কেহ বা সংকটময় দুর্গম পথ অবলীলাক্রমে অতিবাহন করে, মৌমাছি পিপীলিকা প্রভৃতি অমেরুক (invertibrated) শ্রেণীর জীবেরা সেই গোচের এক প্রকার অস্ফুট চেতনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আলোকে প্রবৃত্তির ঝোঁকে নীয়মান হইয়া আপনাদের গার্হস্থ্য সামাজিক এবং আর আর শ্রেণীর নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল যথাবৎ অশ্রান্ত অপ্রমত্ত এবং অবিচলিত ভাবে নিষ্পাদন করে। ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি পদার্থ সকল যেন অচেতন বস্তু পশ্বাদি জন্তুরা যেন মূঢ় জীব আমরা কি ? "আমরা কি ?" এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমরা নহি কি ? অর্থাৎ আমরা সবই। আমাদের নিদ্রাবস্থায় আমরা উদ্ভিদ্‌পদার্থ, স্বপ্নাবস্থায় প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান মূঢ়জীব, জাগরিতাবস্থায় জ্ঞানবান্ মনুষ্য। তবেই হইতেছে যে, আমরা প্রতিজনে এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আবার বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ছাঁচে গঠিত। বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সবই ব্রহ্মতালের বা সুদীর্ঘচ্ছন্দের গাথা ; ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সবই লঘুত্রিপদীচ্ছন্দের পদ্য। আমাদের নিদ্রার কাল এক রাত্রির অধিক নহে, পরন্তু পৃথিবীতে যতকাল পর্য্যন্ত জীবের উন্মেষ হয় নাই ততকাল পর্য্যন্ত পৃথিবী প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল ; তাহার পরে পৃথিবীর নিশাগ্রস্ত অবস্থায় কীট পতঙ্গাদির নড়ন চড়ন এবং চলাফেরা আরম্ভ হইল, তাহার পরে পৃথিবীর স্বপ্নাবস্থায় মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবের উন্মেষ হইতে আরম্ভ হইল, তাহার পরে পৃথিবীর জাগরিতাবস্থায় জ্ঞানবান মনুষ্যের আবির্ভাব হইল। আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় যেমন তাহার অন্তঃকরণের উপরস্তরে স্থির বুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দ বিরাজ করে, তেমনি সেই সঙ্গে তাহার নীচের স্তরে মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত দুঃখ ও প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্যে ব্যাপৃত হয় ; আর, সময়ে সময়ে যখন সেই রজোগুণের ব্যাপারটা প্রবল হইয়া ওঠে তখন তাহা দর্শকের চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইহার যদি একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন বা নমুনা দেখিতে চাও তবে এল্‌বা দ্বীপে অবস্থিতি-কালে প্রথম নেপোলিয়নের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাঁহার কোনো প্রকার শারীরিক কষ্ট বা আর্থিক কষ্ট ছিল না অথচ রজোগুণের প্রাদুর্ভাব বশত তাঁহার মন নানা প্রকার জাগ্রৎস্বপ্নে,

প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে এবং দুঃখ যন্ত্রণায় পিঞ্জরাবরুদ্ধ সিংহের ন্যায় অষ্টপ্রহর ছট্‌ফট্ করিত, অথচ তাঁহার অন্তঃকরণের উপর স্তরে স্থির বুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দের ন্যূনতা ছিল না। তেমনি আবার মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের নীচের স্তরে স্থূল শরীরাশ্রিত প্রসুপ্ত চেতনের বা প্রাণের ব্যাপার—অর্থাৎ যেমন অন্ন হইতে রক্তের উৎপাদন রক্ত হইতে অস্থি মজ্জা মাংসপেশী প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চালান—এই সকল প্রাণের ব্যাপার তমোগুণের অন্ধকারাচ্ছন্ন নাড়ীপথের মধ্য দিয়া চলাফেরা করিতে থাকে এরূপ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে যে, তাহার ভিতরে জ্ঞানালোকের প্রবেশের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ। এতগুলা কথা যাহা আমি সবিস্তরে ভাঙিয়া বলিলাম তাহা যদি সংক্ষেপে এইরূপে সাঁটেসোঁটে বলা যায় যে, মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় তাহার অন্তঃকরণের উপরি স্তরে ভিতরের মনুষ্য বিরাজমান হয়, তাহার এক ধাপ নীচের স্তরে ভিতরের সিংহ ব্যাঘ্র ছাগমেষাদি বিচরণ করে, এবং তাহার আরো নীচের স্তরে ভিতরের ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তু সকল জমাটবদ্ধ হয়, তবে খুব সম্ভব যে, তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে শ্রোতৃবর্গের এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় এ যেমন দেখা গেল, পৃথিবীর জাগরিতাবস্থাতেও তেমনি উপরের ধাপে সত্ত্বগুণপ্রধান মনুষ্য-মণ্ডলীর ব্যাপার সকল চলিতেছে, বুদ্ধির অঙ্গীভূত জাগ্রত চেতনের নীচের ধাপে রজোগুণপ্রধান অপরাপর জন্তুদিগের স্বপ্নবৎ অর্দ্ধস্ফুট চেতনের ব্যাপার সকল চলিতেছে, এবং তাহারও নীচের ধাপে তমোগুণপ্রধান উদ্ভিদ্ এবং ধাতু প্রস্তরাদি জড়বস্তু সকলের বীজভাবাপন্ন অস্ফুট চেতনের ব্যাপার সকল চলিতেছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ত্রিগুণের লীলাক্ষেত্র,—ত্রিগুণই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব।

ত্রিগুণতত্ত্বের সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা আমি বলিলাম এ সকল কথা ব্যষ্টিসত্তার সম্বন্ধেই খাটে—সমষ্টি-সত্তার সম্বন্ধে খাটে না। সমষ্টি-সৎ এবং ব্যষ্টি-সৎকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে প্রথমেই দুয়ের মধ্যেকার একটি মর্ম্মান্তিক প্রভেদ আমাদের চক্ষে পড়ে এই যে, তুমি এবং আমি দুই, এই জন্য তোমাতে আমার সত্তার অভাব আছে, আমাতে তোমার সত্তার অভাব আছে, আর যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নাম কর তবে তাহাতে তোমার এবং আমার উভয়েরই সত্তার অভাব আছে। তবেই হইতেছে যে, ব্যষ্টিসৎ মাত্রেতেই সত্তার সঙ্গে সত্তার বাধা ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত রহিয়াছে; আর সেই সূত্রে সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজোগুণ এবং তমোগুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে;—সাত্ত্বিক আনন্দ রাজসিক দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিহত হইতেছে; সাত্ত্বিক প্রকাশ তামসিক জড়তা এবং অবসাদে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। কাজেই ব্যষ্টিসত্তা ত্রিগুণাত্মক। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, তোমার বাহিরে যেমন আমি রহিয়াছি, এবং আমার বাহিরে তুমি রহিয়াছ, সমষ্টিসত্তের বাহিরে সেরূপ দ্বিতীয় কোনো কিছুই নাই; কাজেই দাঁড়াইতেছে যে সমষ্টিসত্তের সত্তার সহিত লেশমাত্রও বাধার সংস্পর্শ থাকিতে পারে না; আর তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সমষ্টিসত্তে সাত্ত্বিক-প্রকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চেতন জ্যোতি এবং সাত্ত্বিক আনন্দ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এই জন্য আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেরই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে সমষ্টিসৎ চিদানন্দ স্বরূপ। আজ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের একটি নিগূঢ় রহস্য আজ যাহা আমি সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিলাম তাহার সহিত ডারুইনের মতের কিরূপ ঐক্যানৈক্য আগামীবারে তাহা পর্য্যালোচনা করা যাইবে; এবং তাহার পরে গীতাশাস্ত্রোক্ত নিস্ত্রৈগুণ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য্য কি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মানবজগতে কুকুরের স্থান

মানুষ যেসকল জন্তুর সেবায় উপকৃত, যাহাদের নয়ন-মনোহর আকৃতি ও শ্রবণসুখকর ধ্বনিতে মুগ্ধ, অথবা, আকৃতি ও শক্তিবৈচিত্র্যে বিস্মিত হইয়াছে, প্রায় তাহাদের সকলের সহিতই তাহারা পরিচয় এবং অধিকাংশের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছে। মানবের দেবতাগণও সেই

সকল জীবজন্তুর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছেন। প্রাচীন আর্য্য অনার্য্য সকল জাতির মধ্যেই তাহার পুরাণ প্রসিদ্ধি আছে। ঐরাবত হইতে আরম্ভ করিয়া মূষিক পর্য্যন্ত, গরুড় হইতে আরম্ভ করিয়া পেচক, কাক পর্য্যন্ত, বাসুকি হইতে আরম্ভ করিয়া পরীক্ষিতের পূজাপুষ্প গর্ভবাসোপযোগী তক্ষক পর্য্যন্ত, বৃহত্তম হইতে অতিক্ষুদ্র এবং জীব ও কল্পনাজগতের কত জন্তুই না হিন্দু, গ্রীক, মিশরীয় প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে ও ভক্তের পূজা পাইয়া আসিয়াছে। হিন্দুমতে ভগবান পতিতোদ্ধার-মানসে জীবজন্তুর দেহেই প্রথম প্রথম অবতার হইয়াছিলেন। এবং প্রধান প্রধান দেবতাগণ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে বাহন পাইয়াছিলেন। এক মহেশ্বর পরিবারেই দেখা যায়, শান্ত ও রুদ্রপ্রকৃতি শিব বৃষভবাহন। মহাশক্তিস্বরূপিনী দুর্গা সিংহবাহিনী। লোকলোচনের অগোচরে যাহার গমনাগমন সেই রাত্রিচর পেচক লক্ষ্মীর বাহন। বিদ্যা শুভ্রা, নির্ম্মলা, জ্যোতির্ম্ময়ী এবং অবিদ্যান্ধকারবিনাশিনী; তাই বিদ্যারূপিনী সরস্বতী নীরত্যাগী ক্ষীরগ্রাহী শ্বেত হংসবাহিনী। কার্ত্তিক উভয় শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আধার; তাই সর্পভুক্ কলাপী তাঁহার বাহন। গণপতি পণ্ডিত এবং "পণ্ডিতে নির্ধনত্বং"—তাই বুঝি সিংহাদির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর মূষিক তাঁহার বাহন? প্রাচীন ভারতে মহামরু-তরণীর প্রয়োজন না থাকায় বোধ হয় ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবার পার্শ্বে উষ্ট্রের আবির্ভাব হয় নাই। বায়ুর বাহন মৃগ, অগ্নির বাহন ছাগ, শীতলার বাহন গর্দ্দভ, যমের বাহন মহিষ এবং ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল। এইরূপে প্রাচীন ও আধুনিক দেবতাগণের সহিত জীবজন্তুর প্রভুভৃত্যের বা সেব্যসেবকের সম্বন্ধ বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

এইসকল নিকৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে কুক্কুরের স্থান বড় সামান্য নহে। উভয় দেব ও মানবসমাজে কুক্কুরের প্রতিপত্তি আছে। অত্রি মুনির ঔরসে অসূয়াদেবীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশাবতার দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনেরই অংশাবতার। তাই তিনি ত্রিমুণ্ড। নারদ তাঁহাকে "আদৌ ব্রহ্মা মধ্যে বিষ্ণুরন্তে দেবং সদাশিবঃ। মূর্ত্তিত্রয় স্বরূপায় দত্তাত্রেয় নমোস্তুতে" বলিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইনি কুক্কুরকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পঞ্জাব কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে দত্তাত্রেয় বঙ্গদেশাপেক্ষা অধিক পরিচিত। এতদঞ্চলে এবং যুক্তপ্রদেশে দত্তাত্রেয় অবতারের যে কয়খানি চিত্র দেখিয়াছি তাহাতেই তাঁহার তিনটী মস্তক ও সঙ্গে কুক্কুর আছে। মথুরার "ব্রজবাসী ফ্রেণ্ড" কোম্পানীর প্রকাশিত একখানি চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দত্তাত্রেয়।

পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানকালে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ কুক্কুরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। কাশীর কালভৈরব কুক্কুরবাহন। ব্রহ্মার মহাপাতকের দণ্ডবিধান করিবার জন্য যখন কালভৈরবের জন্ম হইল তখন তিনি ভূস্বর্গ কাশীর কোতয়াল নিযুক্ত হইয়া দিবারাত্রি পাহারা দিতে লাগি-লেন। যে দেবতা নির্নিমেষ নয়নে পাহারা দিতে পারেন তাহার বাহন হওয়া নিদ্রালু জীবের কর্ম্ম নয়, তাই, সদাসতর্ক সারমেয় তাঁহার বাহনপদে বৃত হইল। কুক্কুরের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রহরী জীবজগতে আর কে আছে? কিন্তু

হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! স্বয়ং কালভৈরবের পদস্পর্শেও কুক্কুরের নীচত্ব ঘুচিল না! "শুনিচৈব স্বপাকেচ" সমদর্শী পণ্ডিতগণ যখন জীবজন্তুকে দেবতার চরণতলে রাখিয়া মানবের পূজা করিয়া দেন তখন ত আর ভক্তের চক্ষে দেবতা ও বাহনে বড় প্রভেদ থাকে না? এই কারণেই ত নন্দী বৃষত্বে এবং বৃষ স্থলবিশেষে শিবত্বে পরিণত হইয়াছে এবং গাভী স্বয়ং ভগবতী জ্ঞানে পূজিতা হইতেছে। ভগবতীর চরণে যখন পূজার পুষ্প নিবেদিত হয় তখন তাহা দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া সিংহ এবং চোরাসুরের মস্তকেও পতিত হইয়া থাকে। দেবতার সহিত এবং দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে হইতে বহু নিকৃষ্ট জীব মানবের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আদরযত্নে হরিদ্বারের মীন ও অযোধ্যার মর্কটের ন্যায় নির্ব্বিবাদে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু কুক্কুরের ইতিহাস অতি বিচিত্র। কখন ইহা দেবতার বাহন, কখন অবতারের গুরুস্থানীয়, মানবের পূজার পাত্র, এবং কখনও বা অস্পৃশ্য এবং ঘৃণ্য!

কুক্কুরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মানবচরিত্রের রহস্য কতকটা উদ্ঘাটিত হয়। মিশরের সর্ব্বত্রই কুক্কুর অতি ভক্তিভরে পূজিত হইত। সারমেয়ের শত্রু দেশের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইত এবং রীতিমত দণ্ডিত হইত। কেহ কুক্কুরকে তাড়না করিলে তাহার আর নিস্তার ছিল না। কুক্কুর যে গৃহে মরিত তথায় গৃহস্বামীর আত্মীয় কুটুম্বের মৃত্যু মনে করিয়া পরিবারবর্গ শোক করিত। শবের সংকার সেই ভাবেই সম্পন্ন হইত এবং পরমাত্মীয়ের ন্যায় শব সমাধিস্থ হইত। ভীষণদর্শন সারমেয় কার্ব্বিরস্ গ্রীক নরকের দ্বাররক্ষক ছিল। পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তার কয়েক পৃষ্ঠা কুক্কুর-চরিত কীর্ত্তনেই পূর্ণ হইয়াছে। কল্পনার গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব যাহাই থাকুক, আবেস্তা কুক্কুরের "অষ্টধা কুললক্ষণম্" নির্ণয় করিয়াছেন। জন্দগ্রন্থমতে—

"কুক্কুর অথর্ব অর্থাৎ সাধুসন্ন্যাসী স্বরূপ: কারণ সে স্বল্পাহারে তুষ্ট, সদাসুখী, হিতৈষী এবং সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট; সন্ন্যাসীদেরই মত সহজে কাহাকেও নিকটে আসিতে দেয় না। কুক্কুর সৈনিক স্বরূপ; কারণ কুক্কুর সেনার ন্যায় অগ্রগামী হয়; গৃহপালিত পশুপালকে সেনার ন্যায় অগ্রপশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তাহারই মত আততায়ীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কুক্কুর ধনের উৎস শ্রমিক ও ভৃত্যের ন্যায়; সেইরূপই কার্য্যতৎপর, নিদ্রাবস্থাতেও সতর্ক এবং শ্রমিকের ন্যায় ধনদ। কুক্কুর পক্ষী স্বরূপ; কারণ পক্ষীর ন্যায় মুক্তপ্রাণ ও প্রফুল্ল। কুক্কুর তস্কর স্বরূপ; কারণ সে চোরের ন্যায় অন্ধকারেও কার্য্য করে; সে চোরের মতই প্রহার পাইতে ও ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে। কুক্কুর বন্য পশুর স্বরূপ; কারণ তাহার মত অন্ধকারে কাজ করিতে পারে; বন্য পশুর ন্যায় কখন কখন অনাহারে থাকে এবং কখনও বা কুখাদ্য খায়। কুক্কুর দুশ্চরিত্রা নারীর ন্যায়; কারণ সেইরূপ ভাবে সে জীবন যাপন করে; তাহারই মত পথে পথে ঘুরিয়া উচ্ছিষ্ট খাইয়া দেহ ধারণ করে। কুক্কুর শিশু স্বরূপ; কারণ সে শিশুর ন্যায় অধিক নিদ্রা যায়; তাহারই মত হৃষ্টচিত্ত ও চঞ্চল; তাহারই মত লোলজিহ্ব; দ্রুত ও অগ্রগমনে কুক্কুর শিশুরই মত। পরম পুরুষের সৃষ্টির মধ্যে ও কে যে রাত্রির প্রথম যামে হাঃ, হাঃ শব্দে দিগন্ত নিনাদিত করে? হোরমজ্দ্ বলিলেন, ও সেই সূক্ষ্মাগ্রমুখ ক্ষুদ্র-মস্তক কুক্কুর ভাগাপার (Vaughapar) যাহার কুলোকে দুর্ণাম করে। ও সেই [কুক্কুর] যে সৃষ্টির মধ্যে পরম পুরুষের সৃষ্ট জীব; যে রজনীর প্রথম প্রহরে উচ্চৈঃস্বরে সহস্র প্রকারে দুরাত্মা আহ্রমানকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যে এই কুক্কুরকে প্রহার করে তাহার আত্মা নয় জন্ম নরকের যন্ত্রণা ভোগ করে। সে কখনই চিনাবাদ বৈতরণী পার হইতে পারে না। তাহার দণ্ড এক সহস্র বেত্রাঘাত।"

আবেস্তায় পিরোশচরণ, ভেশ্চেরুণ প্রভৃতি কতিপয় জাতীয় কুক্কুরের নামোল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে তাহারা নিম্নশ্রেণীর পাপাত্মাদিগকে আক্রমণ করে। তাহাদিগকে প্রহার করিলে কি কি দণ্ডভোগ করিতে হয় তাহারও উল্লেখ আছে। বসুশুরণ (Wasushuran) নামক সারমেয়কে আঘাত করিলে মহাপাতক হয়। কুক্কুরকে কুখাদ্য দিলে তাহা গৃহের কর্ত্তাকেই দেওয়ার সমতুল্য হয়। যে কুক্কুরকে কুভোজন দেয় তাহার দণ্ড ৫০ হইতে ২০০ বেত্রাঘাত। কুক্কুরকে টাট্‌কা মাংস বা চর্ব্বী এবং দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষিপ্ত কুক্কুরকে বাঁধিয়া রাখিতে হয় এবং তাহার প্রাণ সংহারে মহাপাতক হয়।

পারসীকদিগের ন্যায় হিন্দু শাস্ত্রকার কুক্কুরের সত্বাদি গুণত্রয় ভেদে এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ভেদে তাহার জাতি এবং কুললক্ষণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। কুক্কুরের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ তাহাদের লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"শুভ্রা দীর্ঘাঃ স্তব্ধকর্ণা লঘুপুচ্ছাস্তনূদরাঃ।
শুক্লনখরদন্তাশ্চ শ্বানস্তে ব্রহ্মজাতয়ঃ॥"

যাহারা কুক্কুরদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয় তাহাদের সম্বন্ধে আছে—

"রক্তাঙ্গাস্তনুলোমানো ললৎকর্ণাস্তনূদরাঃ।
দীর্ঘা দীর্ঘা নখরদাঃ শ্বানস্তে ক্ষত্রজাতয়ঃ॥"

যাহারা তাহাদিগের মধ্যে বৈশ্য তাহাদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"যে পীতবর্ণা মৃদবঃ তনুলোমান এব চ।
ক্রুদ্ধা ক্রুদ্ধা ললজ্জিহ্বাস্তে শ্বানো বৈশ্যজাতয়ঃ॥"

এবং কুক্কুরদিগের মধ্যে শূদ্রেরা—

"কৃষ্ণবর্ণাস্তনুমুখা দীর্ঘরোমাণ এব চ।
অক্রুদ্ধাঃ শ্রমযুক্তাশ্চ তে শ্বানঃ শূদ্রজাতয়ঃ॥"

সত্ত্বগুণান্বিত নরনারীই যখন অতি বিরল তখন—

"অশ্রান্তা অপরিক্ষীণাঃ পবিত্রাঃ স্বল্পভোজিনঃ।
শ্বানস্তে সাত্ত্বিকাঃ প্রোক্তা দৃশ্যন্তে চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥"

রজোগুণান্বিত কুক্কুর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"ক্রুদ্ধা বহুভুজো দীর্ঘা গুরুবক্ষাস্তনূদরাঃ।
জঙ্গলস্থা জাঙ্গিকাশ্চ শ্বানস্তে রাজসামতাঃ॥"

এবং

"অল্পশ্রমেণ যে শ্রান্তা ললজ্জিহ্বা গুরূদরাঃ।
শ্বানস্তে তামসাঃ প্রোক্তাঃ সন্ধ্যাবনসমাশ্রয়াঃ॥"

পারসীকগণ কুক্কুরকে অষ্টগুণান্বিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকার কুক্কুরকুলের পরিচয়ে বলিয়াছেন—

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টো সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ ষড়েতে চ শুনোগুণাঃ॥"

এইরূপে প্রাচ্যসাহিত্য শ্বচরিত্র কীর্ত্তনে একখানি সারমেয়-সংহিতার সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। শাস্ত্রসুরভি দোহন করিলে কি না পাওয়া যায়। সুতরাং যে কুক্কুর যথায় অবতারগুরুর পদে অধিষ্ঠিত সেই আবার মহাঘৃণ্য অস্পৃশ্য! কুক্কুর পূর্ব্বে চণ্ডালগৃহেই পালিত হইত এবং রাজা ও রাজকুমারদিগের শিকারসঙ্গী হইত। কুক্কুর মুসলমানের পক্ষে শূকরের মতই অস্পৃশ্য ও অপবিত্র। বাহনেজাৎ, মোয়াল্লা বূদ, হজার-এ-মশ্লা প্রভৃতি ইসলামীয় স্মৃতিশাস্ত্রের মতে, প্রাতে কুক্কুরদর্শন ও ভদ্রাসনে তাহার লোমপতন অশুভজনক। কেবল শিকারীর পক্ষে এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে অর্থব্যয়কারী ধনীর ধনরক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুক্কুরপালন দোষাবহ নহে; কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করা সম্বন্ধে নিষেধ আছে। যদি দৈবাৎ কেহ স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহাকে অজুর মন্ত্র পড়িয়া সেই অঙ্গ ধৌত করত পুনরায় পবিত্র হইতে হয়। অধুনা শিক্ষিত মুসলমানের গৃহে প্রায় কুক্কুর দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুর গৃহেও তাহার অসদ্ভাব নাই। কোন কোন দত্তাত্রেয়-পন্থী ব্রহ্মচারীকে কুক্কুরকে ভূরিভোজনে পালন করিতে দেখিয়াছি। কোন কোন মুসলমান ফকীরকে কয়েকটী কুক্কুর লইয়া ঘুরিতে এবং কুক্কুরকে আহার করাইয়া তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে দেখিয়াছি। যতই দিন যাইতেছে কুক্কুরের কদর বৃদ্ধিই পাইতেছে। ধীরে ধীরে কুকুরের অন্তর্নিহিত শতমুখী প্রতিভা যতই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে মানব ততই তাহার প্রাণঘাতী বিষদন্তের ভীষণ আতঙ্ক সত্ত্বেও আপনার পরম সুহৃদ বলিয়া তাহাকে কোল দিতেছে। অধ্যাপক ফিট্‌জিঙ্গার ১৮৯ প্রকার গৃহপালিত সারমেয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। আধুনা কুক্কুরের নিকট হইতে এমন সকল কাজ লওয়া হইতেছে, তাহার দ্বারা জটিল মকর্দ্দমার এরূপ রহস্যভেদ হইতেছে, তাহার সহায়তায় শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন এমন সহজসাধ্য হইয়া আসিতেছে, যে, অদূর ভবিষ্যতে ইন্দ্রত্বনাশের ভয়ে ইন্দ্রের ন্যায় পশুরাজকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারে। এবং শুদ্ধ তাই কি? কুক্কুর জীবন-সংগ্রামক্ষেত্রে মানবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতেছে। য়ুরোপে এই সংগ্রামের সূত্রপাত হইয়াছে। তথায় কুক্কুর বিচার, পুলিশ, প্রভৃতি কোন কোন বিভাগে মানুষের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। আল্‌স্ পর্ব্বতের তুষারাচ্ছন্ন দুরবগাহ শিখরে বহু যাত্রী তুষারপাতে অভিভূত বা পদস্খলনে পতিত হইয়া চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়ে; তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সেণ্ট বার্নার্ড হোম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সেই আশ্রমের পালিত অতিকায় কুক্কুরসকল সদা সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত থাকে এবং কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে তাহাকে মুখে করিয়া তুলিয়া আশ্রমে লইয়া আসে। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত-দিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঔষধ ব্যাণ্ডেজ পটি, খাদ্য পানীয় প্রভৃতি সরবরাহ করা কুক্কুরের পুণ্যব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কুক্কুর প্রভুর লণ্ঠন ছাতা বহিয়া ভৃত্যের অভাব পূরণ করিতেছে।

মানবজাতির মধ্যে যেমন দেখা যায় বিশেষ বিশেষ কার্য্যে জাতিবিশেষ স্ব স্ব উপযোগিতা প্রদর্শন করে এবং দেহ মনের গঠনানুসারে তাহাদের শক্তির পরিচয় দেয়, কুক্কুরেরও আকৃতি প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে তাহারা মানবের বিবিধ কার্য্যে সহায়তা করে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও লাব্রাডরে কুক্কুর ভারবাহী পশুর কাজ করে। কুক্কুরের গাড়িটানা অধুনা সখের ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। কুক্কুর ধন প্রাণের রক্ষাকার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

সেদিন পারীনগরে শ্রীমতী লেডি (Madame Leduc)

নাম্নী জনৈক ধনবতী বিধবা যুবতী আপনার গৃহমধ্যে বসিয়া হিসাবপত্র দেখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পশ্চাতে দুই জন দস্যু যমদূতের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়। দস্যুদ্বয় অবিলম্বে একখানা গামছা দিয়া ম্যাডাম লেডির মুখ বন্ধ করে এবং তাঁহার গলায় চামড়ার ফাঁস দিয়া খুন করিতে চেষ্টা করে। শ্রীমতী সাহায্যের জন্য চীৎকার করিবারও অবকাশ পান নাই। কিন্তু তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন হইল না। ব্রী ম্যাষ্টিফ (Brie Mastiff) জাতীয় দুটী বিশ্বস্ত কুক্কুর 'বুল' ও 'থিও' তাঁহার নিকটে ছিল। তাহারা দস্যুদ্বয়ের উপস্থিতি ও কার্য্য দেখিয়াই হতভাগ্যদের উপর বজ্রের ন্যায় পতিত হইল এবং নিমেষের মধ্যে দস্যুদ্বয়ের দেহ নখদন্তাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া মূর্চ্ছিতা পালয়িত্রীর হস্তলেহন দ্বারা তাঁহাকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিল।

ভ্যালেন্সিয়ায় একব্যক্তি ক্রোধপরবশ হইয়া সেদিন একজনকে হত্যা করত গোপনে তাহার দেহ প্রোথিত করিয়া রাখে। হত ব্যক্তির কুক্কুর উভয় কার্য্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সে খুনীর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া প্রভুর গৃহে গমন করে এবং হত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্রকে চীৎকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাহার সঙ্গে গমন করিতে বাধ্য করে। তৎপরে উভয়ে সেই সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলে কুক্কুর তথাকার মৃত্তিকা খনন করিতে থাকে। অতঃপর পুলিশের সমক্ষে প্রোথিত দেহ বাহির করা হয়। প্রভুভক্ত কুক্কুর কিন্তু তখনও ক্ষান্ত হয় নাই। সে পুলিশকে সঙ্গে করিয়া মৃত্তিকা আঘ্রাণ করিতে করিতে সহরের একস্থানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায় সেই হত্যাকারীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। পুলিশ তাহাকে ধৃত করিলে সে খুন স্বীকার করে।

ঘেণ্ট নামক স্থানের এক কারখানায় একটী বালিকা খুন হয়। বালিকার কুক্কুর তাহা দেখিয়াছিল। যে ঘরে বালিকাকে হত্যা করা হয় পুলিশ সেই ঘরে কুক্কুরটীকে লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে কারখানার সকলকে সারবন্দী করিয়া দাঁড় করায়। কক্কুরটী তাহাদের মধ্যে একজনকে ভীষণ চীৎকার করিয়া আক্রমণ করে! পুলিশ তাহাকে ধৃত করিয়া তাহার বস্ত্র পরীক্ষা করে। তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ পাওয়া যায় এবং সে সেই বালিকাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া অপরাধ স্বীকার করে।

জর্ম্মনির পুলিশে কুক্কুরই উৎকৃষ্ট ডিটেক্‌টিভের কাজ করে। এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ কুক্কুরের কার্য্য দেখিয়া তাহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। পারীর গুণ্ডারা পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের যমের স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কৃত হত্যার তালিকা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু পুলিশ-বিভাগ যে দিন হইতে শিক্ষিত কুক্কুর ভর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই দিন হইতেই গুণ্ডাদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়াছে। ব্রাসেল্‌স্ পুলিশের কুক্কুরগণ বেশ কাজ করিতেছে। সিঁদকাটা, রাত্রে চৌকিদারদিগকে আক্রমণ করা, ঘরে আগুন দেওয়া, হাল্ সহরে এত বাড়িয়াছিল যে অবশেষে পুলিশবিভাগে কুক্কুর ভর্ত্তি করা ভিন্ন আর উপায় রহিল না। তথাকার কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন পুলিশ-বিভাগে সারমেয় পলিশ বৃদ্ধি করিতেছেন। য়ুরোপ ও এমেরিকার সর্ব্বত্রই পুলিশে কুক্কুর রাখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা সুফল ফলিতেছে। যেসকল স্থানে দিনের বেলায় পথ চলা বিপজ্জনক ছিল এখন তথায় কুক্কুরের কৃপায় নৈশভ্রমণও নিরাপদ হইয়াছে। ঘেণ্ট নামক স্থানে গুণ্ডাদের প্রধান আড্ডা। এই ঘেণ্টের পুলিশদারোগা এখন গর্ব্বভরে বলিয়া থাকেন "Give me instead of 60 Policemen at 5 shillings a day, 20 dogs at 3 pence a day" অর্থাৎ "রোজ পৌনে চার টাকা মাহিনার ৬০ জন পুলিশের লোক না দিয়া প্রত্যেকের জন্য রোজ তিন আনা খরচ পড়ে এমন ২০টী কুকুর আমায় দাও।" ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে দারোগা সাহেব মানুষের অপেক্ষা কুক্কুরকে কত উচ্চস্থান দান করেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি ৬০ জন উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী অপেক্ষা ২০টী কুক্কুরের সাহায্যে স্বীয় কর্ত্তব্য-পালন সন্তোষজনকরূপে করিতে পারিবেন। সম্প্রতি আবর-অভিযানে ভারত গভর্মেণ্ট কুক্কুর নিযুক্ত করিতেছেন। মানুষ মানুষ অপেক্ষা কুক্কুরের উপর কতদূর বিশ্বাসপরায়ণ ও নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে, কুকুর কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সৎসাহস ও কার্য্যদক্ষতায় মানুষকে কেমন পরাস্ত করিতেছে, মানব-

সমাজ এই জন্তুটীর উপর ধীরে ধীরে কি পরিমাণ আস্থাবান হইতেছে এসকল তাহারই দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এইসকল দৃষ্টান্ত সত্বে, এবং প্রাচ্য সাহিত্যে, পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ব ও জীবজন্তুর আখ্যান গ্রন্থে, এবং বহু জনহিতকরী সভাসমিতি, আতুরালয় ও সেবাশ্রম প্রভৃতির কার্য্য-বিবরণীতে যাহার কীর্ত্তি বিঘোষিত, যাহার সম্বন্ধে ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—

"আততায়ীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে যে সর্ব্বপ্রথম ছিল, সাদরাহ্বান করিতে যে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ছিল, যাহার সৌন্দর্য্য থাকিলেও বৃথা গর্ব্ব ছিল না, যাহার বীর্য্য থাকিলেও ঔদ্ধত্য ছিল না, যাহাতে মানুষের সকল গুণই ছিল কেবল তাহার দোষগুলি ছিল না।"

যে মানবের সুখদুঃখের সহচর, খেলার সাথী, পথের সঙ্গী, রাত্রির প্রহরী, বিপন্নের সহায়, জলমগ্নের উদ্ধারক, ডিটেক্‌টিভের পথপ্রদর্শক ও অগ্রণী, রাখালের ভরসা, ক্রীড়াজীবীর অবলম্বন, শিকারীর সহায় ও শস্ত্র, ধনপ্রাণের রক্ষক, প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ, এবং শতগুণে গুণান্বিত, তাহার কুক্কুর এই নাম এত ঘৃণ্য হইল কেন? কুক্কুর শব্দ গালির তালিকাভুক্ত হয় কেন? কুক্কুরস্পর্শে দেহ ও দ্রব্যজাত অপবিত্র হয় কেন? মানবেতর প্রাণীর মধ্যে সারমেয় নীচতম জাতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত হয় কেন? মানব যাহাদের নিকট অধিক উপকার প্রাপ্ত হয়, যাহাদের দ্বারা অধিক সেবিত হয়, তাহাদিগের প্রতিই যেন তাহার সম্বন্ধ অধিক দূরে গিয়া পড়ে! মানুষ তাহাদিগকেই অধিক ঘৃণা করিতে শিখে! মহর্ষি ইব্রাহিম গৃহাগত অতিথিকে নাস্তিক জানিয়া "কুক্কুর" বলিয়া বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। আবার কুকুরের আদর যে দেশে অত্যধিক, সে দেশের লোকেরা যদি কেহ কুপথে যায়, তাহাকে বলে "He has gone to the dogs." কোন জিনিষ তুচ্ছবোধে ফেলিয়া দিতে হইলে, বলে "Give to the dogs" নরকের কুক্কুর (hell hound) একটা মস্ত গালাগাল। যা কোনই কাজে আসে না তাকে বলে "A dead dog." দুষ্ট প্রবঞ্চককে বলে "A sly dog." "Dog cheap" অর্থে মাটির দর। "Doggishness." অর্থাৎ কুক্কুরপণা মানে নীচতা। অতি জঘন্য বাসাকে বলে "Dog hole", অশ্লীল নীচ কবিতা বা ছড়াকে বলে "Doggerel." এইরূপ নানা কথায় নানা অভিব্যক্তিতে কুক্কুর যে বড়ই ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র তাহাই বুঝায়। মানবচরিত্র কি বিচিত্র! প্রভুভক্ত কুক্কুরের নামেই প্রভুর ঘৃণা উদ্রিক্ত হয় কিন্তু প্রভু যখন সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হন তখন তাঁহার ভক্ত চতুরশ্ব শকটের মখমল 'কুশনে' বসিয়া যায় এবং কুশনের কাঠিন্য তাহার অরুচিকর হইলে অথবা সে প্রভুর অধিক আদরপ্রয়াসী হইলে তাঁহারই উৎসঙ্গে বিরাজ করিয়া বাহু বেষ্টনে বদ্ধ হইয়া থাকে। ঠিক সে সময়ে যদি কথাপ্রসঙ্গে কাহাকেও "লোকটা অধঃপাতে গিয়াছে" বলিতে হয়, তবে তিনি কুক্কুর কোলে করিয়াই বলিয়া উঠেন "He has gone to the dogs!" মানবপ্রকৃতির এই রহস্য ভেদ করা কঠিন। কোন্ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানবমস্তিষ্ক এই অবস্থায় পরিণত হয়, মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের তাহা আবিষ্কার করিবার দিন আসিয়াছে। কারণ শুদ্ধ কুক্কুর সম্বন্ধে নহে, পরন্তু জাগতিক প্রায় সকল বিষয় ব্যাপারেই মানুষের আর কথার মত কাজ হইতেছে না। মানুষ যা ভাবে তা বলে না, যা বলে তা করে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

আমেরিকায় ভারতবাসী

(সংকলিত)

আমেরিকা ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ওয়াশিংটন ও এমার্সনের জন্মভূমি, স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মক্ষেত্র ও ভারতীয় ছাত্রের শিক্ষাস্থান এবং উদগ্র স্বাধীনতার দেশ বলিয়া সবিশেষ পরিচিত। কিন্তু ইহার বেশি আর কিছু খবর তাহারাও বড় একটা রাখেন না, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই। কিন্তু সেই দেশ শিক্ষিত অশিক্ষিত, শিক্ষার্থী ও ধনার্থী সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর বন্ধুস্বরূপ।

পাশ্চাত্য সকল জাতি অপেক্ষা আমেরিকাই ভারতের নিঃস্বার্থ বন্ধু। এই নবজাত সভ্যজাতি প্রাচীন সভ্যতার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে বৃদ্ধের প্রতি বালকোচিত শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের চক্ষেই দেখিয়া থাকে। পাশ্চাত্য অপর জাতিরা ভারতবর্ষকে শুধু রত্নগর্ভা ও ইংরাজের কামধেনু বলিয়াই জানে; এবং ভারতবাসী পরাধীন বলিয়া সকলের নিকট ঘৃণাভাজন। এবং এই জন্যই সকল জাতি নিজেদের

স্বামী পরমানন্দ।

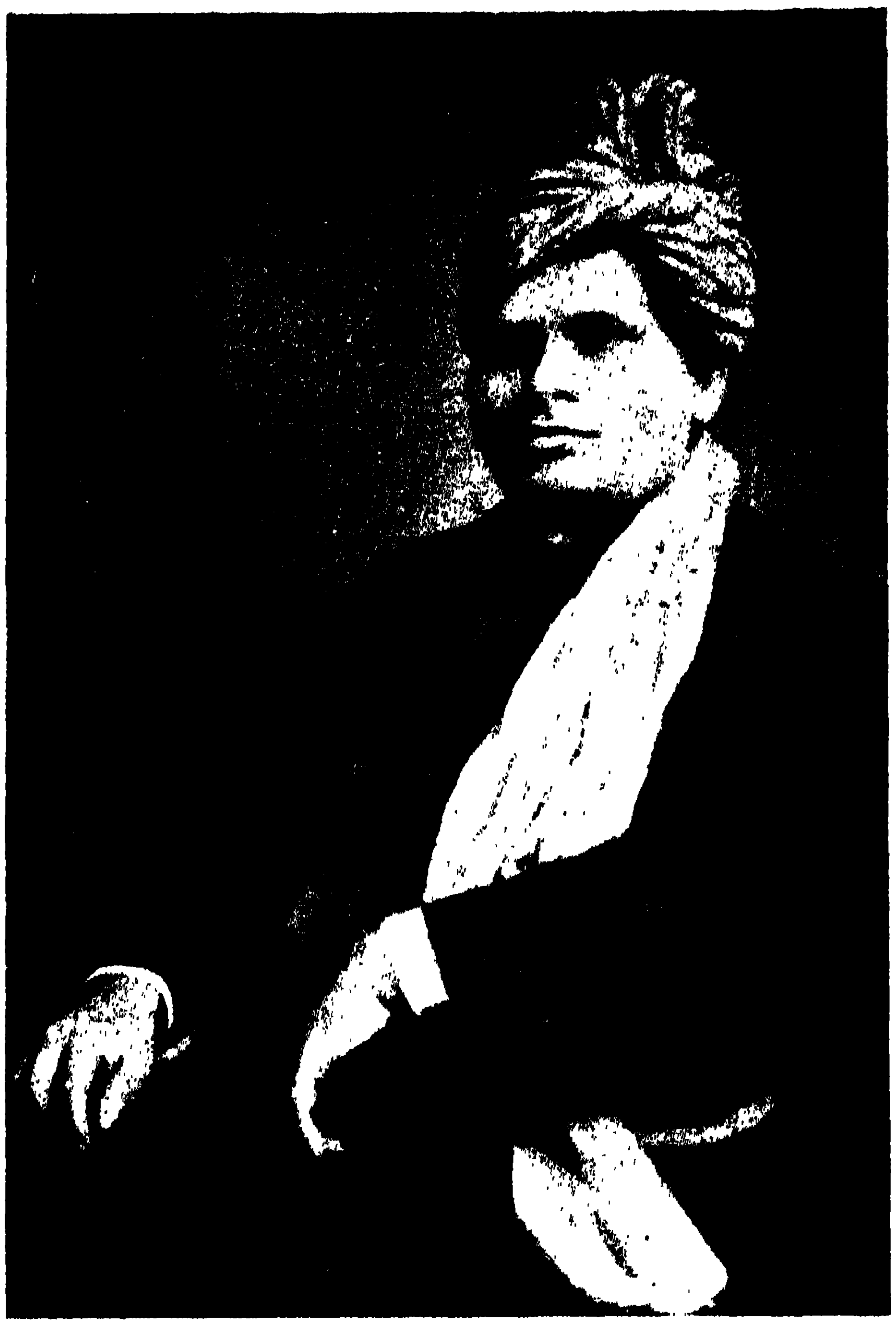

স্বামী ত্রিগুণাতীত।

চাক্‌চিক্যময় বাণিজ্যসম্ভার দেখাইয়া ভারতের ধন আহরণে ব্যগ্র। কিন্তু আমেরিকার সহিত আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক নাই; বাণিজ্য-সম্পর্কও বেশি নয়। অধিকন্তু অন্যান্য দেশ আমাদের দেশের সংবাদ সাক্ষাৎ সম্পর্কে কিছুই পায় না, যাহা পায় তাহা ইংরেজি গ্রন্থের ঘৃণা-বিজৃম্ভিত অপপাঠ; কদাচিৎ দু একজন নিরপেক্ষ পর্য্যটকের পুস্তকে ভারতের যথার্থ বিবরণ দেখা যায়। ইংলণ্ড আমাদের রাজার দেশ বলিয়া তাহার সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; কিন্তু সেখানে বড়লোকের আদুরে নষ্ট-চরিত্র বংশদুলাল, বা কোন না কোন প্রকারে রাজপ্রসাদ-লিপ্সু ছাত্র অনেক গিয়া থাকে; স্বাধীনচিত্ত ও চরিত্রবান্ ভারতবর্ষীয় লোক দেখার সুবিধা আমেরিকার যত এত আর কোনো দেশের নয়।

আমেরিকায় চারি শ্রেণীর ভারতবাসী আছে। (১) ধর্ম্মপ্রচারক (২) শিক্ষার্থী (৩) শ্রমজীবী এবং (৪) গোয়েন্দা। এই সুদূর বিদেশেও ভারতবাসীর ভাল মন্দ সকল কাজে নজর্ দিবার সরকারী অভিভাবকের অভাব নাই। কিন্তু সেখানে যেসকল ভারতবাসী প্রবাসী তাঁহারা নিজের ধান্দাতেই ব্যস্ত, এবং স্বাধীন দেশে তাঁহাদের গুপ্ত মত কিছুই নাই; এজন্য গোয়েন্দার দল সেখানে একেবারে নিষ্কর্ম্মা।

বহু সহস্র ভারতীয় শ্রমজীবী সুদূর আমেরিকায় কায়িক শ্রমে মজুরী উপার্জ্জন করিতেছে। এই সকলের মধ্যে শতকরা ৯০ জন শিখ, বাকির অধিকাংশ মুসলমান। কিন্তু আমেরিকায় ভারতবাসী মাত্রেই হিন্দু নামে পরিচিত। ইহারা আমেরিকার মজুর অপেক্ষা অল্প মজুরীতে কাজ করে এবং প্রায়ই কোনো প্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে না ও শান্তশিষ্ট বলিয়া অধিক কাজ করিতে পারে; এজন্য একদিকে যেমন ইহারা কর্ম্মদাতাদিগের প্রিয়, অন্য দিকে তেমনি ইহারা সেই দেশের মজুরদের চক্ষুশূল। এই সব মজুরেরা ভারতের নিম্ন শ্রেণীর লোক; শুধু অধিক উপার্জ্জনের প্রলোভনে অতদূরে গিয়াছে; সুতরাং ইহারা নিজেদের সংস্কার ত্যাগ করিয়া অবস্থার সহিত নিজেদের

সুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ।

মানাইয়া লইতে পারে না। ইহারা আমেরিকায় গিয়াও পাগ্‌ড়ী বাঁধে, দাড়ি পাকায়, চুলে ঝুঁটি করে; এই বিসদৃশ বেশ সে দেশের অনভ্যস্ত চোখে কদর্য্য ও কিম্ভূতকিমাকার ঠেকে; ইহার ফলে ভারতবাসীদিগকে উপহাস, বিদ্রূপ ও নির্য্যাতন সহিতে হয়। হাজার অসুবিধা ভোগ করিলেও ইহারা নিজেদের বেশ বদলাইতে চাহে না বা ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিবে না। গোঁড়ামিতে অন্ধ হইয়া শুধু জেদের বশে বা গায়ের জোরে কাজ করিতে গেলে বিপদ ও লাঞ্ছনা ভোগ অনিবার্য্য। আমেরিকার কোনো কোনো প্রদেশে নিয়ম আছে যে ইংরাজি বা য়ুরোপীয় অন্য কোনো ভাষা না জানিলে কোনো লোককে সেখানে ঢুকিতে দেওয়া হয় না; কিন্তু এইসব অজ্ঞ ভারতবাসী সে কথা কিছুতেই বুঝে না বলিয়া অকারণ লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু ইহাদের আমেরিকায় গমন একেবারে ব্যর্থ হয় না; ইহারা একদিকে যেমন অর্থ সঞ্চয় করে অপর দিকে ইহাদের মনও যথেষ্ট প্রসার ও সাহস প্রাপ্ত হয়। বাঙালী হিন্দু মজুরগণ শিখ বা মুসলমানগণ অপেক্ষাও শান্তশিষ্ট ও মাদকবিরাগী এবং তাহাদের চুল দাড়ি রাখাও ধর্ম্মের অঙ্গ নহে; তাহারা যদি আমেরিকায় যায় তবে যথেষ্ট সুবিধা লাভ করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকার লোকেরা ইহা পছন্দ করে না যে 'হিন্দু'রা সে দেশে গিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবে। তাহারা চায় প্রবাসীরা পত্নী পুত্র লইয়া সেই দেশেরই অধিবাসী হইয়া যায়।

আমেরিকায় সকলের চেয়ে সুবিধা ছাত্রদের। আমেরিকা-প্রবাসী ছাত্রগণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তান; তাহাদের অধ্যবসায় ও বুদ্ধির পুঁজি অপেক্ষা অর্থের পুঁজি অল্প; ইহারা ঐ দেশে গিয়া নিজেদের চেষ্টায় মজুরী দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের মনে একাগ্রতা, আত্মনির্ভরতা পরিস্ফুট হয় এবং চরিত্র সবল ও নির্ম্মল থাকিতে পারে। প্রলোভন তাহাদিগকে টলাইতে পারে না, কোনো দিকে মন দিবার তাহাদের সময় নাই, অর্থ নাই। প্রবাসী ছাত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্দ ও সখ্য স্থাপিত হয়; তুচ্ছ অভিমান ও মিথ্যা মর্য্যাদাগর্ব্ব তিরোহিত হইয়া তাহাদের জীবন কর্ম্মের উপযুক্ত হইয়া উঠে। অবশ্য অভাবে পড়িয়া কোনো কোনো ছাত্র অভদ্র ও অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করে; কেহ বা সন্ন্যাসী গণৎকার সাজিয়া লোক ঠকায়; কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। অনেক ছাত্রই গৃহস্থ বাড়ীতে বা হোটেলে ঝাড়ুদার বা খানসামার কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা অপমানজনক মনে করে না; তাহারা বেশ বুঝে যে ন্যায়সঙ্গত কর্ম্মে কোনো লজ্জা নাই, সে কর্ম্ম যেমনই হোক না কেন; কেহ কেহ রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালিয়া, ফেরি করিয়া, খবরের কাগজ বিলি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। যে শ্রমবিমুখ নয়, তাহার অন্ন সেদেশে দুর্লভ নয়। এখানকার লোকে চাকরের জন্য লালায়িত; সম্পন্ন লোকদিগের স্ত্রীকন্যাকেও নিজে হাতে সব কাজ করিতে হয়, এখানকার চাকর এমনই দুর্ম্মূল্য। অতএব যে কোনো উৎসাহশীল সুস্থ ছাত্র শুধু যাওয়া আসার পথখরচ ও অসুখ বিসুখের জন্য কিছু পুঁজি সম্বল করিয়া ঐ দেশে গেলে স্বচ্ছন্দে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া

আসিতে পারে। কিন্তু একেবারে নিঃসম্বল হইয়া কাহারো অত দূরদেশে যাওয়া উচিত নয়। বন্দরে জাহাজ হইতে নামিয়া আমেরিকার ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই আগন্তুককে ৫০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫০, টাকা দেখাইতে হয়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে হয় যে আগন্তুক অন্ততঃ কিছু দিন কাজ না জুটিলেও নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, সাধারণের গলগ্রহ হইবে না।

যাহারা নিজে উপার্জ্জন না করিয়া আমেরিকায় শিক্ষা করিতে চায় তাহাদের বৎসরে অন্ততঃ ৮০০, টাকার সংস্থান না করিয়া কিছুতেই সে দেশে যাওয়া উচিত নয়। ভাল করিয়া পাশ করিতে পারিলে এ টাকা প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার লাভে উঠিয়া আসে। অনেক সম্পন্ন ছাত্রও সখ করিয়া নিজে উপার্জ্জন করিয়া পড়ার খরচ চালায়; তাহারা ইহাকেও একটা শিক্ষার অঙ্গ মনে করে। আত্মচেষ্টায় কৃতী হওয়ার যে আনন্দ তাহা পিতৃপুরুষের সঞ্চিত ধন খরচ করিয়া পাওয়া যায় না।

যাহাদিগকে আত্মচেষ্টায় ব্যয় নির্বাহ করিতে হয় তাহাদিগকে কষ্ট যে পাইতে হয় না এমন নহে। এমন সময়ও আসে যখন তাহাদের ভাগ্যে একখানা রুটি, একটু চিনি, এক গেলাস দুধ এবং খুব সৌভাগ্য হইলে কিছু ফল ছাড়া আর কিছুই খাবার জোটে না। কিন্তু তাহাতে কেহ মরিয়া ত যায়ই নাই, কেহ অপ্রসন্ন বা নিরুৎসাহও হয় না। ক্ষুধার তাড়না ইহারা স্বদেশী সঙ্গীত গাহিয়া অগ্রাহ্য করে, এবং "হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে করে এরা পরিহাস!" নিজেদের জন্মভূমির কল্যাণকামনা ও সেবার বাসনা ইহাদিগকে সকল সময়ে বলদান করে।

জাপানে অপেক্ষাকৃত কম খরচে শিক্ষালাভ হইতে পারে বটে কিন্তু সেখানে ভারতবাসীর অসুবিধা অনেক। প্রথমত সেখানে স্বোপার্জ্জনের কোনো ক্ষেত্র উন্মুক্ত নাই, আমেরিকায় বহু পথ মুক্ত। দ্বিতীয়ত জাপানী ভাষা ভারতবাসীর দুর্বোধ্য; কিন্তু ইংরাজী অল্পবিস্তর সকল ভারতীয় ছাত্রই জানে। তৃতীয়ত জাপানের অপেক্ষা অর্দ্ধেক সময়ে আমেরিকায় বেশি শিক্ষালাভ করা যায়। কিন্তু হাতেহাতিয়ারে কারখানার কাজ শিখিবার পক্ষে জাপানই প্রশস্ত ক্ষেত্র। যাহারা স্বদেশে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা

প্রেমানন্দ দাস।

লাভ করিয়াছে তাহারা জাপানে গেলে সুবিধা বোধ করিতে পারে।

১৯০৪ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত মোটামুটি ৬০ জন ছাত্র আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে শিক্ষার্থী হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১৮ জন সেখানকার গ্রাজুয়েট হইয়াছেন এবং অপর সকলে পাশের পরীক্ষা শীঘ্রই দিবেন। সকলেই বিদ্যাশিক্ষা ছাড়া ব্যবসায় ও কারখানার কাজও শিক্ষা করিতেছেন। ৬ জন অকৃতকার্য্য হইয়া কতক দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং কয়েকজন এখনো সেই দেশেই অন্যবিধ চেষ্টা চর্চ্চা করিতেছেন। এই কয়েকজন ছাত্রের অকৃতকার্য্য হওয়ার কারণ তাঁহাদের নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যের দৃঢ়তার অভাব, সুবিধার অভাব নহে।

যাঁহারা আমেরিকায় গিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের

অকৃতকার্য্য ছাত্র। আমেরিকার শিক্ষাদানের গুণে তাঁহারা এক একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন। আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রের একটি আংশিক তালিকা এস্থানে প্রদত্ত হইল :—

১। নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৯০৩ সালে আমেরিকায় গিয়া এক বৎসরে কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খনি বিদ্যালয় হইতে বি. এস. উপাধি লাভ করিয়া মেক্সিকোর একটি প্রকাণ্ড তামার খনিতে কাজ পান। এখন তিনি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রদেশের একটি তামার খনির পর্য্যবেক্ষক।

২। গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১৯০৫ সালে যাইয়া কালিফর্ণিয়া কৃষিবিদ্যালয় হইতে এম্. এস. উপাধি লাভ করিয়া সে দেশের এক চিনির কারখানায় পর্য্যবেক্ষক রাসায়নিক নিযুক্ত হন; এবং তিনি উপনিবেশিক বিভাগে হিন্দুস্থানী দ্বিভাষী ছিলেন। এক্ষণে তিনি বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

৩। যোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ১৯০৬ সালে গিয়া কৃষিবিদ্যালয়ের বি. এস. উপাধি ১৯১০ সালে লাভ করেন। এক্ষণে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক।

৪। কনাপুরেড্ডি রামশাস্ত্রলু জাপান হইতে আমেরিকা যান বলিয়া ইঁহার মুরুব্বি ইঁহার খরচ বন্ধ করিয়া দেন। ইঁনি ৬ মাস জাহাজের কারখানায় কাজ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তখন তাঁহার মুরুব্বি আবার খরচ দিতে আরম্ভ করেন। ইঁনিও কৃষিবিদ্যালয়ের বি. এস. এবং এক্ষণে মান্দ্রাজের এক রাজার সরকারে নিযুক্ত আছেন।

৫। শান্তিলাল গোরোওয়ালা। ইঁনিও বি. এস।

৬। জ্যোতিষচন্দ্র দাস বাণিজ্য বিদ্যালয় হইতে অর্থশাস্ত্রে সম্মানের সহিত বি. এস. উপাধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কলিকাতায় আমদানি রপ্তানির কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

৭। খগেন্দ্রচন্দ্র দাস—ইঁনি রসায়ন বিদ্যালয়ের বি. এ. এবং চিকাগোতে জগতের একটি বৃহত্তম কারখানায় রাসায়নিক নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। সুরেন্দ্রমোহন বসু—রসায়ন বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জার্ম্মানিতে যাইতেছেন।

৯। মহেশচরণ সিংহ—বিনা সম্বলে গিয়া ওরেগন সরকারী কৃষি-কলেজ হইতে এম. এস. উপাধি লাভ করেন। এক্ষণে ইঁনি গুরুকুলে অধ্যাপক।

১০। পাল সিংহ—উপরিউক্ত কলেজ হইতে খনিবিদ্যায় বি. এস. উপাধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে গোয়ালিয়ার রাজসরকারে নিযুক্ত।

১১। সোহনলাল রবি—যন্ত্রবিদ্যায় বি. এস. এবং এক্ষণে বড়োদা রাজসরকারে নিযুক্ত।

১২। মুলুকরাজ সোহি—তাড়িৎ বিদ্যায় বি. এস।

১৩। ভোলাদত্ত পাঁড়ে—কৃষিবিদ্যায় গ্রাজুয়েট।

১৪। সৈয়দ রশীদ—কৃষিবিদ্যায় বি. এস।

১৫। হরিসিংহ চিমনা—কৃষিবিদ্যায় গ্রাজুয়েট। এক্ষণে অমৃতসর খালসা কলেজের অধ্যাপক।

১৬। সতীশচন্দ্র বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রে এ. এম.। এবং এক্ষণে কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক।

১৭। তারকনাথ দাস—১৯০৬ সালে মাত্র ১৫৲ টাকা সম্বল লইয়া আমেরিকার মাটিতে পা দেন। সমস্ত পঠদ্দশায় কর্ম্ম করিয়া উপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১২৫০৲ টাকার বৃত্তি লাভ করেন। গত জুন মাসে তাঁহার এম. এ. ডিগ্রি পাওয়ার কথা।

১৮। সত্যদেব—ললিতকলা বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট।

১৯। সুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ—কৃষি বিষয়ে বি. এস। তিনি আগাগোড়াই স্বোপার্জ্জনে খরচ চালাইয়াছেন।

২০। রাইমোহন দত্ত—সমাজবিজ্ঞানের বি. এস।

২১। ভূপেন্দ্রনাথ রায় কলিকাতার এম. এস. সি. ছাত্র। গত ডিসেম্বরে আমেরিকা গিয়াছেন। ১৯১২ সালে এম. এস. উপাধি পাওয়ার কথা।

২২। দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের এফ. এ. পাশ করিয়া আমেরিকায় গিয়াছেন। খনিবিদ্যায় বি. এস. উপাধির পরীক্ষা দিবেন।

২৩। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়—বাণিজ্যবিদ্যার বি. এস. উপাধি পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতেছেন। স্বাবলম্বী।

২৪। দক্ষিণারঞ্জন গুহ—যন্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন।

২৫। স্বর্ণকুমার মিত্র—কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন।

২৬। শার্ঙ্গধর দাস রসায়ন কলেজে একবৎসর পাঠ করিয়া এখন সানফ্রান্সিস্কো চিনির কারখানায় কাজ করিতেছেন। ইঁনিও স্বোপার্জ্জন সম্বল করিয়া লেখাপড়া শিখিতেছেন। ইঁনি ধনীর সন্তান; বাসন মাজিতে বা ঝাড়ু ধরিতেও জানিতেন না। ইঁহার মুনিবগিন্নি ইঁহাকে শিখাইয়া দেওয়াতে বেশ সক্ষম হইয়াছেন। সময়ে সময়ে ইঁনি সামান্য মুটে মজুরের কাজও করিয়াছেন এবং সেই গুরু শ্রমে শুধু মনের জোরেই ভাঙিয়া পড়েন নাই। গোসলখানা পরিষ্কার করিতেও ইঁনি দ্বিধাবোধ করেন নাই।

২৭। দেবীদয়াল বীরমণি—রসায়ন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন।

২৮। পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব খানকোজী—১৯০৭ সালে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় আমেরিকায় পৌঁছেন। আমেরিকায় পৌঁছিলে, সরকারকে দেখাইতে হয় যে সঙ্গে অন্তত ১৫০৲ টাকা পুঁজি আছে। ইঁহার পুঁজির টাকা ইঁহার আমেরিকাস্থ বন্ধুবান্ধবেরা যোগাড় করিয়া দেখান। এক্ষণে ইঁনি কৃষি শিক্ষা করিতেছেন।

২৯। যোগেশচন্দ্র মিশ্র—সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর। হাসপাতালে কাজ করিয়া ললিতকলা শিক্ষা করিতেছেন।

৩০। বিজয়কুমার রায়—বনবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। গত পরীক্ষায় উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে ও আরো অন্য দুই বিষয়ে শতকরা ৯৪ নম্বর পাইয়াছেন। ইঁনি চকর কাঠের কারখানায় কাজ করেন।

৩১। তারকচরণ মজুমদার—ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়র হইবেন।

৩২। প. গ. উপলাপ—রসায়ন কলেজে সদ্য ভর্ত্তি হইয়াছেন।

৩৩। নলিনীনাথ পাল—বয়স মাত্র ১৮ বৎসর অথচ আত্মচেষ্টায় সেখানকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া খনিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন।

৩৪। লালা তিহারা মজুরের কাজ করিতে প্রথমে আমেরিকায় যান। তখন ইঁনি ইংরাজি বলিতে বা পড়িতে পারিতেন না। দু বৎসর মজুরী করার পর ইঁহার খেয়াল হইল যে বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত। এক্ষণে ইঁনি স্কুলে পড়িতেছেন। স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ইঁহার খনিবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার বাসনা।

৩৫। মথুরাদাস জেনী—যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

৩৬। হরনাম সিংহ—কৃষি অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

৩৭ ও ৩৮। ভাল সন্ত ও ইলাহি বখশ—উচ্চ বিদ্যালয় হইতে খুব ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতেছেন।

৩৯ ও ৪০। শম্ভু ও রাজমল—দুজনেই নিরক্ষর বালক, মজুরী করিতে আমেরিকায় যায়। এক্ষণে সকল রকম অসুবিধার সহিত

সংগ্রাম করিয়া ইঁহারা স্কুলে পড়িতেছে। শিক্ষা সমাপ্ত করিতে বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু ইঁহাদের প্রাণভরা আশা ও উদ্যম।

৪১। মতিলাল দত্ত—যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

৪২। অনন্ত ম জুর্জ্জর—স্বোপার্জ্জনে নির্ভর করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

৪৩। হরি সিংহ এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি। কৃষিবিষয়ক রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।

৪৪। নিরুপমচন্দ্র গুহ রসায়ন অধ্যয়ন করিতেছেন। ইনি প্রবাসীতে ও ভারতীতে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

৪৫। বিষণ দাস—স্বোপার্জ্জননির্ভর। যন্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন। গত পরীক্ষায় চারটি বিষয়ে শতকরা ৯৪ ও পঞ্চম বিষয়ে শতকরা ৮৫ নম্বর লাভ করিয়াছেন।

৪৬। অনাথবন্ধু সরকার—এক্ষণে প্রবাসীর পাঠক ও বাঙ্গলার জনসাধারণের নিকট ফলরক্ষণে কৃতবিদ্যতার জন্য সুপরিচিত। ইনি মজফ্ফরপুর ফলরক্ষণ কারখানার অধ্যক্ষ।

৪৭, ৪৮ ও ৪৯। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার—কৃষিবিদ্যা ও গোপালন প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আসিয়া স্বাধীন ভাবে কৃষি ও গোপালন আরম্ভ করিয়াছেন।

৫০। প্রেমানন্দ দাস—পি এইচ, ডি, উপাধি পরীক্ষায় অনেক বিষয়ে শতকরা ১০০ নম্বর পাইয়া ও অনেক বিষয়ে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শীঘ্রই বি, এস, উপাধি পরীক্ষাও দিবেন। ভেষজ প্রস্তুত-পদ্ধতি ও গন্ধ তৈল প্রস্তুত বিধি বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হইতেছেন। ইনি সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্ম বিষয়েও ভারতীয় ছাত্র ও স্বদেশবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া নিজের চিন্তাশীলতা ও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিতেছেন।

আমাদের দেশের সাধারণ মেধার ছাত্রগণও যদি সেদেশে গিয়া এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারে তবে বিশেষ মেধাবী ছাত্রগণ যে অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারেন তাহা নিঃসন্দেহ। স্বোপার্জ্জননির্ভর ছাত্রগণ সামান্য চাকর খানসামার কাজ করিয়া নিজেদের লেখাপড়া চালান বলিয়া কোথাও তাঁহাদিগকে হীন মনে করা হয় না এবং তাঁহারাও নিজেদের আচরণে লজ্জা অনুভব করেন না; বরং সর্ব্বত্র ইঁহারা সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়া আত্মনির্ভরতাজনিত আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন।

দুই রকম ভাবে উপার্জ্জন করিয়া লেখাপড়া চালান যাইতে পারে। ১ম ছুটির ৩মাস চাকরি করিয়া সঞ্চয় বা ২য় পাঠ ও কর্ম্ম এক সঙ্গেই করা। অনেকেই প্রথম উপায়ই অবলম্বন করেন। কোনো পরিবারে বা হোটেলে দিনে তিন ঘণ্টা করিয়া বাসন মাজা, বাড়ী ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা, খাদ্য পরিবেষণ করা প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে দিনে তিনবার খাইতে পাওয়া যায়। চার ঘণ্টার কাজে থাকিবার ঘর ও খাওয়া, কিংবা খাওয়া

তারকনাথ দাস।

ও ২০।২৫৲ টাকা মাসে মাহিনা পাওয়া যাইতে পারে। এ সব কাজ করা বেশি শ্রমসাধ্য নয়, সপ্তাহের অভ্যাসেই তালিম হওয়া যায়। ঘণ্টায় বারো আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত ঠিকা বেতন উপার্জ্জন করা কঠিন ব্যাপার নহে। প্রতি শনিবার আমেরিকার ঘর পরিষ্কার করার দিন; স্বোপার্জ্জনসম্বল ছাত্রগণ সেদিন স্কুলে ছুটি পান এবং অনায়াসেই এক শনিবারে ঘণ্টা আষ্টেক খাটিয়া ৬।৭৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। আপিসের বাবুয়ানি ধরণের কাজ সহজে জুটে না। খাইখরচ ছাড়া, শুধু ঘর ভাড়া, ধোপার খরচ ও অল্প স্বল্প আমোদ প্রমোদ বাবদ ভারতবাসী ছাত্রের মাসে ২৫।৩০৲ টাকাতেই চলে। এই সব কাজ করিয়াও লেখাপড়ার সময়ের অভাব বা অসুবিধা হয় না। ছুটির সময় এক একজন ছাত্র ২৫০৲ হইতে ৩৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া কলেজের

বাম হইতে দক্ষিণে দাঁড়াইয়া—অধরচন্দ্র লস্কর, শার্ঙ্গধর দাস, খগেন্দ্রচন্দ্র দাস সুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ, জ্যোতিষচন্দ্র দাস, রাইমোহন দত্ত।

বাম হইতে দক্ষিণে বসিয়া—বিজয়কুমার রায়, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শাস্তলাল গোরোওয়ালা, যোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, কুনাপুরেদ্দি রামশাস্ত্রলু, সুরেন্দ্রমোহন বসু, নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

খরচ চালাইয়াও বই পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্রয় করিবার মত উদ্বৃত্ত রাখিতে পারেন। যেসকল ছাত্র খাটিয়া উপার্জ্জন করেন তাঁহারা অধিকতর সুস্থ ও অধ্যয়নক্ষম।

আমেরিকার লোকেরা কৃষ্ণকায় কাফ্রিদিগকে বড় ঘৃণা করে এবং তাহাদিগকে কোনো কাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চায় না। ভারতবাসীর প্রতি তাহাদের সেরূপ কোনো অসম্মানের ভাব নাই; বরং শিখ মজুরদিগকে রাস্তা হইতে ডাকিয়া ইহারা কাজ দেয়। কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরাও ভারতীয় ছাত্রদের সহিত খুব সদ্ব্যবহার করেন। তেমন সমাদর ও সম্মান আমরা আমাদের নিজের দেশে য়ুরোপীয়ের নিকট প্রায়ই পাই না। সেখানে একগাড়ীতে গেলে শাদা চামড়ার অপমান হয় না; দেশনায়ককেও সেলাম না করিলে তিনিও চাবুক হাতে অগ্নিমূর্ত্তি হন না। আমরা এই বিদেশীদের কাছে যে সাহায্য ও সৌহার্দ্দ লাভ করি তাহা আমরা আমাদের স্বদেশবাসীদের প্রতি সাধারণতঃ প্রদর্শন করি না। আমরা অস্পৃশ্য পতিত বলিয়া কত জাতিকে ঘৃণা করি, অথচ তাহাদের ঘরের পাশে লইয়া আমাদের সংসারকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়। যদি কোথাও আমরা অপমানিত হই তবে সে আমাদের কৃতকর্ম্মেরই প্রায়শ্চিত্ত; যে স্বদেশ ও স্বদেশীকে সম্মান সমাদর করিতে পারে না সে পরের নিকট সম্মান সমাদর আশা করে কোন আক্কেলে? সেদেশী কোনো কোনো অজ্ঞ লোক ভারতবাসীকে অসভ্য ও অধার্ম্মিক মনে করে, কিন্তু ভারতবাসীর সংসর্গে আসিলে

তাহাদের আর সে ভাব থাকে না। এবং এই সব অজ্ঞ ধারণা দূর করিবার জন্য বহুসংখ্যক সচ্চরিত্র ভারতবাসীর সেদেশে যাওয়া দরকার।

যেসকল লোক আমেরিকার লোকের ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তদ্ব্যতীত স্বামী রামতীর্থ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অনাগারিক ধর্ম্মপাল, বীরচাঁদ গান্ধি, রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের অনেক সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। ইঁহাদের আগমনে আমেরিকার নরনারীর ভারতবাসী সন্ন্যাসী ও প্রচারকের প্রতি এমন শ্রদ্ধা হইয়াছে যে এখন যে সে নিজেকে মহাত্মা বলিয়া প্রচার করিয়া এক এক দল গঠন করিতেছে ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। অনেক ছদ্ম মহাত্মা নিজেদের অজ্ঞতাবশত আমেরিকার চেলাদের পরিবারে অন্তঃপুর ও অবরোধ প্রচলন করিতেছে, চেলা-দিগকে অদৃষ্টবাদী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। ইহাদের পসার দেখিয়া অনেক কাফ্রি নরনারী ভারতীয় যোগী যোগিনী সাজিয়া লোক ঠকাইয়া দুপয়সা বেশ উপার্জ্জন করে। এইরূপ দেশী বিদেশী ছদ্ম স্বামীদের দ্বারা ভারতের অপকার ও দুর্নামই হইতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের দলভুক্ত স্বামীদের প্রায় সকলেই সাধু এবং আমেরিকা ও ভারতের প্রকৃত কল্যাণকর্ম্মী। ইঁহাদের মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী পরমানন্দের প্রশংসা শুনা যায়। ইঁহাদের চেষ্টায় আমেরিকায় হিন্দু মন্দির ও সন্ন্যাসাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে অনেক সাত্ত্বিক প্রকৃতির নরনারী নির্জ্জনে তপস্যা ও ধ্যানরত হইয়া বাস করিতেছেন। অনেক আমেরিকা-বাসী নরনারী এইসকল হিন্দু-সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দেব মাতা নামধারিণী একটি মহিলা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জ্ঞানকর্ম্মের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই-সকল শিষ্য গীতা পাঠ ও যোগাভ্যাস করেন এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। আমেরিকার এই হিন্দুমন্দিরে হিন্দুপ্রথায় একটি বিবাহ হইয়া গেছে, বর কন্যা উভয়েই আমেরিকা-বাসী।

সভ্যতার পুরাতনভূমি ভারতবর্ষ এখন মহা ভিক্ষুক—সমগ্র জগতের সম্মুখে তাহার ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করিয়া শুধুই দেও দেও করিতেছে। সবাই আজ আমাদের শিক্ষা-গুরু। কিন্তু আমাদেরও যে শিখাইবার কিছু আছে, তাহা যাঁহারা প্রমাণ করিতেছেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন। এইসকল মহাত্মার ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকারের হইলেও মূল মত একই। কেশবচন্দ্র ও দয়ানন্দ, মহেন্দ্রলাল সরকার ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিম ও রবীন্দ্র, অরবিন্দ ও তিলক, জগদীশ ও প্রফুল্ল, বিবেকানন্দ ও রামতীর্থ, লাজপত রায় ও বিপিন পাল সকলেই একই কথা জগৎকে শুনাইয়াছেন ও শুনাইতেছেন, ভারত শুধু ভিক্ষুক নয়, তাহারও দিবার মত সম্বল আছে। আমরা যদি জগৎকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া শিল্প ও বিদ্যা শিখিয়া লই তবে তাহা মন্দ বিনিময় হইবে না।

অতএব তরুণ উৎসাহশীল যুবকদের উচিত স্বদেশের উন্নতির জন্য দলে দলে বিদেশে যাত্রা করা এবং বিদেশে নিজেদের ব্যবহার দ্বারা স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি ও মুখ উজ্জ্বল করা। বিদেশের লোকেরা বিদ্রূপ করিয়া বলে যে, ভারতে শুধু বুঝি ছেলেই আছে, মেয়ে নাই?—যেখানে ভারতবাসীরা যায় সেখানেই পুরুষের জটল্লা, নারীর সম্পর্ক সেখানে থাকে না। বাস্তবিক আমরা স্ত্রীলোকের প্রতি নিতান্ত উদাসীন, এবং স্ত্রীলোকেরাও নিজেদের ন্যায্য দাবী আদায় করিতে কুণ্ঠিত। শিক্ষা ও উন্নতিতে নরনারীর সমান অধিকার। মেধাবী ও উৎসাহ-সম্পন্ন যুবক যুবতী বহুসংখ্যক প্রতি বৎসর বিদেশে গেলে আমাদের জগৎসভায় পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বলসঞ্চয়ের সুবিধা হইবে। এবং তখন আমাদের দেশের উন্নতি অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

প্রেমের জয়জয়ন্তী*

(গল্প)

একটি পুরাতন ইতালীয় ভাষায় লিখিত পুঁথিতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি পড়িলাম :—

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকালে ফেরারা সহরে ফাবিয়ো

* Turgenieff-এর "The Song of Triumphant Love" গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

এবং মুজিয়ো নামক দুইজন যুবক বাস করিত। ঐ সহরটি কলাবিদ্যা-চর্চ্চায় এবং কাব্যপ্রিয় সমৃদ্ধিশালী আর্ক-ডিউকের রাজছত্রের ছায়াস্পর্শে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ দুইটি যুবক সমবয়সী এবং নিকট আত্মীয় ছিল, পরস্পর কেহ কাহারও চোখের অন্তরালে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিত না। বাল্যকাল হইতে তাহারা আন্তরিক প্রীতিসূত্রে বদ্ধ ছিল এবং সামাজিক তৌলে উভয়ের একই ওজন ছিল বলিয়া বন্ধনটাও নিবিড়তর হইয়াছিল। উভয়েই বনিয়াদি ঘরের সন্তান, ঐশ্বর্য্যবান, স্বাধীন এবং অবিবাহিত। উভয়ের মনের ভাব এবং রুচি একই প্রকারের; মুজিয়ো একান্ত সঙ্গীতপ্রিয় এবং ফাবিয়ো চিত্রবিদ্যানিপুণ। সমগ্র ফেরারা সহরের লোক তাহাদের গৌরবে গৌরব অনুভব করিত; তাহারা উভয়ে রাজসভার, সমাজের এবং সহরের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। আকৃতির সাদৃশ্য না থাকিলেও উভয়েরই মুখে একটি যৌবনসুলভ কমনীয়তা ছিল। ফাবিয়ো ঈষৎ অধিক লম্বা, তাহার বর্ণ সুগৌর, চুল সোনালী রঙের এবং চোখ নীলাভ। মুজিয়ো অপেক্ষাকৃত শ্যামবর্ণ, তাহার চুল কাল, এবং তাহার কটা চোখে একটু সহাস্য তরলতার অভাব ছিল। মুজিয়োর অনতিপ্রশস্ত চোখের পাতার উপর খুব ঘন মোটা ভুরু। ফাবিয়োর সরল নিটোল কপালের নীচে তাহার সোনালী রঙের ভুরু ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মত শোভা পাইত। কথাবার্ত্তা বলিতেও মুজিয়ো পটু ছিল না। এইসকল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শৌর্য্য, বিনয় এবং ঔদার্য্যের আদর্শরূপে উভয়েই স্থানীয় মহিলাদের প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইত।

এই সময় ভ্যালেরিয়া নামে একটি রমণী ফেরারা সহরে বাস করিত। যদিও গির্জ্জায় যাত্রাকালে এবং বড় পর্ব্ব উপলক্ষ্যে বেড়াইতে যাইবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাহাকে কেহ দেখিতে পাইত না অদৃশ্য থাকিয়া নির্জ্জন বাসেই তাহার অধিকাংশ দিন কাটিয়া যাইত—তথাপি সে সহরবাসীদের মনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরূপে অটল আসন দখল করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মা একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবা, কিন্তু তাঁহার ধনসম্পদ তদুপযোগী ছিল না। তাঁহার এই একমাত্র কন্যা ভ্যালেরিয়া। যে কেহ একবার ভ্যালেরিয়াকে দেখিত সেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইত। তাহার সুন্দর মুখের মধ্যে এমন একটি সংযত ভাব ছিল যাহা দেখিয়া মনে হইত যে তাহার নিজের মোহিনী শক্তি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কেহ কেহ বলিত তাহার মুখশ্রী বড় ম্লান, তাহার চোখের নতদৃষ্টির মধ্যে যেন একটি সভয় সলজ্জ ভাব, ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা কদাচিৎ লক্ষিত হয়—তাহাও অতি ক্ষীণ। তাহার কণ্ঠস্বর কখনো শোনা যায় না। কিন্তু তবুও অনেকেই বলিত তাহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর; অতি প্রত্যূষে যখন নিস্তব্ধ নগরী সুপ্তিনিমগ্ন তখন সে নিভৃত কক্ষে একাকী বীণা বাজাইয়া পুরাতন কালের বিস্মৃত গানগুলি গাহিত। তাহার পাণ্ডুর মুখচ্ছবি হইতেও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের লাবণ্য উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িত। অতি বৃদ্ধ লোকও তাহাকে দেখিয়া বলিত, 'আহা, এই পেলব পুষ্প-কলিকাটি কালে যে যুবকের জন্য পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবে সে কত সৌভাগ্যবান!'

ফ্রান্সের রাজা দ্বাদশ লুইর কন্যা এই ফেরারা সহরের প্রধান ডাচেস ছিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে একসময় অনেক-গুলি বিশিষ্ট ধনী সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য আর্কডিউক একটি সাধারণ উৎসবের আয়োজন করিলেন। ফাবিয়ো এবং মুজিয়ো ঐ দিন ভ্যালেরিয়াকে প্রথম দেখিল। ফেরারা সহরের বড় রাস্তার ধারে বিশিষ্ট মহিলাদের বসিবার জন্য নির্ম্মিত একটি সুরম্য মঞ্চের উপর ভ্যালেরিয়া তাহার মাতার পাশে বসিয়াছিল। ফাবিয়ো এবং মুজিয়ো তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং পরস্পরের সখ্য নিবন্ধন উভয়েই জানিতে পারিল যে উভয়েই ভ্যালেরিয়ার পরিণয়প্রার্থী। তাহারা ভ্যালেরিয়ার পরিচয় লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল; তাহারা স্থির করিল যে ভ্যালেরিয়া যাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিবে সেই তাহাকে লাভ করিবে এবং ব্যর্থমনোরথ অন্যটি তাহাতে কোনো আপত্তি প্রকাশ করিবে না। কয়েক সপ্তাহ পরে এই প্রখ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত যুবক দুটি সেই বিধবার গৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিল; কিছু বাধা পাইতে হইয়াছিল কিন্তু বিঘ্ন কাটিয়া গেল।

সেই দিন হইতে তাহারা প্রত্যহ ভ্যালেরিয়ার সহিত দেখা করিত এবং কথাবার্ত্তা বলিত। উভয়ের হৃদয়ের অনুরাগ-বহ্নি প্রতিদিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া

উঠিতে লাগিল। ভ্যালেরিয়া তাহাদের উভয়েরই সঙ্গ ভালবাসিত, ইহার মধ্যে কম বেশি কিছু ছিল না। মুজিয়োর সহিত তাহার সঙ্গীতচর্চ্চা হইত, ফাবিয়োর সহিত তাহার আলাপ আলোচনা বেশি চলিত। তাহার সম্বন্ধে ভ্যালেরিয়ার ভয় ভাঙিয়া গিয়াছিল।

অবশেষে একদিন ফাবিয়ো এবং মুজিয়ো তাহাদের ভাগ্যফল জানিবার জন্য ভ্যালেরিয়াকে এক পত্র লিখিল; তাহাতে সে কাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছুক তাহা খুলিয়া লিখিবার জন্য অনুরোধ করিল। ভ্যালেরিয়া মাকে ঐ পত্র দেখাইল এবং বলিল সে এখন বিবাহ করিতে চাহে না; তিনি যদি তাহাকে বিবাহযোগ্যা বিবেচনা করেন তবে তিনি যাহাকে পছন্দ করিবেন তাহাকেই সে বিবাহ করিবে। প্রাণাধিকা কন্যার সহিত ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তায় বিধবা কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরিণয়প্রার্থী দুজনকেও ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাহাদের উভয়কেই তিনি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন।—কিন্তু ফাবিয়ো খুব বাকপটু বলিয়া তিনি ফাবিয়োকেই বেশি পছন্দ করিতেন এবং তাঁহার কন্যারও মত তাহাই এই বিবেচনা করিয়া ফাবিয়োরই নাম উল্লেখ করিলেন।

পরদিন ফাবিয়ো এই সুখবর পাইল এবং মুজিয়ো তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিল না। কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুর বিজয়োল্লাস চোখের সাম্নে সর্ব্বদা দেখিবে ইহা সে সহ্য করিতে পারিল না। তাহার কিছু বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। ফাবিয়োর নিকট বিদায় লইবার সময় সে বলিল যে ভ্যালেরিয়ার প্রতি অনুরাগের চিহ্ন চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া তাহার পর সে দেশে ফিরিয়া আসিবে।

বাল্যবন্ধু চিরসাথীকে বিদায় দিবার সময় ফাবিয়ো অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল; কিন্তু আসন্ন সৌভাগ্যসুখের সর্ব্বগ্রাসী কবলের মধ্যে মনের অন্য সমস্ত বিক্ষেপ নিমেষে বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই আনন্দের স্রোতে সে সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দিল। কয়েক দিন পরে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল এবং ফাবিয়ো যে ভাগ্যগুণে অমূল্য রত্ন লাভ করিল তাহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ফেরারা সহর হইতে কিছু দূরে শ্যামচ্ছায় সুশীতল বনানী-বেষ্টিত পল্লীভবনে ফাবিয়ো তাহার স্ত্রী এবং শাশুড়ীকে লইয়া বাস করিতে লাগিল। দুটি হৃদয়বীণার আনন্দ-সঙ্গীতের প্রথম ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল। মিলনের অরুণালোকস্পর্শে ভ্যালেরিয়ার অন্তরের মাধুর্য্য পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। কালে ফাবিয়ো একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হইয়া উঠিল, সে এখন আর নিজের সখের জন্য ছবি আঁকে না, এখন সে একজন ওস্তাদ। ভ্যালেরিয়ার মাতা ইহাদের সৌভাগ্যের চরম উৎকর্ষ দেখিতেন, আর তাহার জন্য ভগবানকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেন।

দেখিতে দেখিতে চার বৎসর স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। একটি অভাব এই দম্পতীকে সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ করিত—সমস্ত সুখভোগের মধ্যে একটি বেদনার সুর বাজিত—তাহাদের সন্তান হয় নাই। কিন্তু তাহারা আশা ত্যাগ করে নাই। চার বৎসর কাটিয়া যাইবার পর ভ্যালেরিয়ার মার মৃত্যু হইল।

ভ্যালেরিয়া অনেক কান্না কাঁদিল। শোকের দাহ মিটিতে অনেকদিন লাগিল। এইরূপে আর এক বৎসর কাটিল, তাহার পর জীবনের স্রোত পুনরায় আপনার পথ কাটিয়া অবাধে প্রবাহিত হইল। এমন সময় একদিন এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায় সহসা মুজিয়ো ফেরারা সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ভ্রমণে বাহির হইবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচ বৎসর সুদূর প্রবাসযাপনের মধ্যে কেহ তাহার কোনো খবর পায় নাই। তাহার কথা কেহ বলিত না, সে যেন এই পৃথিবীতেই ছিল না। যখন ফাবিয়ো ফেরারার কোনো রাস্তায় তাহার বন্ধুকে দেখিতে পাইল তখন সে প্রথমে ভয়ে পরে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ মুজিয়োকে তাহার পল্লীভবনে লইয়া গেল। তাহার বাড়ির অনতিদূরে বাগানের মধ্যে আর একটি ছোট বাড়ি ছিল, তাহাতেই মুজিয়োর বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। মুজিয়ো রাজি হইল এবং সেই দিনই জিনিষ পত্র লইয়া সেখানে উঠিয়া গেল। তাহার সঙ্গে তাহার মলয়দ্বীপবাসী ভৃত্যটিকে লইয়া গেল—

এ লোকটা বোবা কিন্তু বধির নহে এবং চোখমুখের ভাব দেখিয়া খুব বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়। তাহার জিভ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মুজিয়ো সুদীর্ঘ ভ্রমণকালীন নানা স্থানে ক্রীত নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ অনেকগুলি বাক্স আনিয়াছিল। প্রবাসপ্রত্যাগত মুজিয়োকে দেখিয়া ভ্যালেরিয়া খুব খুসি হইল এবং সাদরে অথচ অকুণ্ঠিত ধীরতার সহিত তাহাকে অভিবাদন করিল। মুজিয়ো ফাবিয়োর নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিল তাহার ব্যবহারে তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না। দিনের বেলা সে তাহার বাড়িটি নিজের মনের মত করিয়া গুছাইয়া লইল; তাহার মলয়বাসী ভৃত্যের সাহায্যে বাক্সগুলি খুলিয়া তাহা হইতে নানাপ্রকারের কৌতূহলজনক জিনিষপত্র—কম্বল, রেশমের কাপড়, মখমল, জরিদার পোষাক, অস্ত্রাদি, বাটি, মিনার কাজ করা থালা এবং পাত্র, মুক্তা এবং নীলাখচিত সোনারূপার জিনিষ, অশব এবং হাতির দাঁতের কারুকার্য্যখচিত বাক্স, সুগন্ধি মসলা, বন্যজন্তুর চামড়া, অজানা পাখীর পালক ইত্যাদি বাহির করিল।

এই সকল জিনিষের মধ্যে একটি মুক্তার কণ্ঠহারও ছিল। পারস্যের শাহ তাঁহার বিশেষ কোন গোপনীয় কার্য্যে মুজিয়োর সহায়তা লাভ করিয়া তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ ইহা দিয়াছিলেন। এই কণ্ঠহারটি মুজিয়ো বিশেষ আগ্রহ করিয়া একদিন স্বহস্তে ভ্যালেরিয়ার কণ্ঠে পরাইয়া দিল। এই মালাটির ভার এবং এক প্রকার অদ্ভুত উত্তাপের পরিচয় পাইয়া ভ্যালেরিয়া বিস্মিত হইল—সেই উত্তাপে তাহার গাত্রচর্ম্ম যেন জ্বলিতে লাগিল। রাত্রে আহারান্তে ছাদের উপর বসিয়া মুজিয়ো তাহাকে তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনাইল। কত দূর দেশ—মেঘচুম্বিত পর্ব্বতমালা, মরুভূমি, নদী, হ্রদ, সমুদ্রের কথা বলিল—পারস্য এবং আরব দেশের কথা বলিল যেখানে সকল জন্তুর মধ্যে ঘোড়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং মহৎ জীব। ভারতবর্ষের কথা বলিল যেখানে মানুষ দীর্ঘোন্নত গাছের মত বাড়িয়া উঠে। তিব্বত এবং চীন দেশের কথা বলিল যেখানে জীবন্ত দেবতা প্রধান লামা তাঁহার মৌনব্রত এবং অনতিপ্রশস্ত চক্ষু লইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন।

কত অদ্ভুত গল্প বলিল ফাবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া তাহার গল্প শুনিল। মুজিয়োর আকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই; তাহার ঈষৎ শ্যামবর্ণ প্রাচ্য-গগনের দীপ্ত ভাস্করের তাপে গাঢ়তর হইয়াছিল এবং চক্ষু দুটি কোটরের অভ্যন্তরাভিমুখে ঈষৎ অধিক অগ্রসর হইয়াছিল, এইমাত্র। কিন্তু তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছিল; মুখে তাহার এমন সংযত গাম্ভীর্য্য যে ব্যাঘ্র-সঙ্কুল পথে নৈশভ্রমণ, কিম্বা করালী দেবীর তুষ্টির জন্য নরবলির অন্বেষণতৎপর ভীষণ কাপালিকদিগের শিকারভূমি, জলশূন্য পথে দিবসভ্রমণ ইত্যাদি বর্ণনা করিবার সময়ও তাহার মুখের সেই ভাব অবিচলিত থাকিতেছিল। তাহার কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর হইয়াছিল, তাহার হাত পা নাড়া, এবং চলন ধরণের মধ্যে ইতালি দেশগত বিশেষত্বের সহজ সরলতাটুকু সে হারাইয়াছিল। তাহার আদেশ-পালন-তৎপর মলয়বাসী ভৃত্যের সাহায্যে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট হইতে যেসকল অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ শিখিয়াছিল তাহা সে ফাবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়াকে দেখাইল। যথা, কিছুক্ষণ পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া যখন আবার পর্দ্দা খুলিয়া দেওয়া হইল তখন সকলে দেখিল যে লম্বাভাবে দণ্ডায়মান দুইটা ছোট বংশখণ্ডের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ভর দিয়া মুজিয়ো শূন্যের উপর বসিয়া আছে। ফাবিয়ো অবাক্ হইয়া গেল এবং ভ্যালেরিয়া দেখিয়া শুনিয়া ভয় পাইল, সে ভাবিল লোকটা কি পিশাচসিদ্ধ নাকি। যখন একটি ছোট বাঁশী বাজাইয়া চুপড়ির ঢাকা খুলিয়া বিচিত্র বর্ণের বিস্তৃতফণা দোদুল্যশীর্ষ লেলিহরসনা সাপগুলিকে বাহির করিল তখন ভ্যালেরিয়ার গা শিহরিয়া উঠিল এবং সেই জঘন্য ভীষণ জীবগুলিকে পুনরায় ঢাকা বন্ধ করিয়া রাখিতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। রাত্রির ভোজে মুজিয়ো একপ্রকার সূচিমুখ পাত্র হইতে ঈষৎ হরিতাভ সোনালি রঙের সিরাজী মদ্য ছোট অশবনির্ম্মিত পাত্রে ঢালিয়া বন্ধুকে পান করিতে দিল। ইহার স্বাদ ইউরোপীয় মদ্য হইতে স্বতন্ত্র, অত্যন্ত মিষ্ট এবং তীব্র, এবং পান করিবামাত্র সমস্ত অঙ্গে একটা সুখাবেশজনিত নিদ্রালস কাতরতা সঞ্চারিত হয়। মুজিয়ো তাহা ফাবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া উভয়কেই পান করিতে দিল এবং নিজেও

করিল। ভ্যালেরিয়ার পাত্রের কাছে মুখ আনিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি মন্ত্র পড়িল। ভ্যালেরিয়া তা দেখিল; কিন্তু মুজিয়োর সমস্ত আচরণেই একটু অদ্ভুতত্ব ছিল বলিয়া ভ্যালেরিয়া মনে করিল ইনি কি ভারতবর্ষে গিয়া অন্য কোন ধর্ম্মবিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছেন না সেখানকার রীতি এইরূপ। কিছুক্ষণ পরে ভ্যালেরিয়া মুজিয়োকে জিজ্ঞাসা করিল সে তাহার প্রবাসযাপনের সময় সঙ্গীতচর্চ্চা করার অভ্যাস অব্যাহত রাখিয়াছে কি না। ইহার উত্তরে মুজিয়ো তাহার মলয়বাসী ভৃত্যকে বেহালাখানা আনিতে বলিল। এই যন্ত্রটি এখানকার বেহালারই মত, কেবল চারিটা তাঁতের বদলে তাহাতে তিনটা তাঁত ছিল। তাহার উপরিভাগে নীলাভ সাপের খোলস জড়ানো, তলদেশটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, এবং তাহারই প্রান্তভাগে একটি বড় হীরকখণ্ড ঝক্ঝক্ করিতেছিল। মুজিয়ো অনেকগুলি অতি করুণ রাগিণী বাজাইল; তাহা ইতালী দেশবাসীর কানে অত্যন্ত অদ্ভুত এবং এমন কি অত্যন্ত বর্ব্বর রকমের বোধ হইল। কিন্তু মুজিয়ো যখন শেষ গানটি বাজাইল তখন যেন যন্ত্রে এক প্রকার জোর আসিয়া পড়িল; ছড়ি চালাইবামাত্র ঝনন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—যন্ত্রের শীর্ষস্থিত সাপের মত রাগিণী মিড়ে মূর্চ্ছনায় পাকাইয়া পাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন একটি দীপ্তি একটি উচ্ছ্বসিত জয়োল্লাসের উন্মত্তশিখা এই রাগিণীর মধ্য হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতে লাগিল যে ফাবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়ার হৃদয় তাহাতে বেদনায় স্পন্দিত হইয়া উঠিল, তাহারা চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না, এবং পাণ্ডুরকপোল মুজিয়োর মূর্ত্তি গম্ভীরতর এবং সংযততর দেখাইতে লাগিল। যন্ত্র-প্রান্তস্থিত হীরকখণ্ডটি যেন সেই দেবদুর্লভ-রাগিণীর দীপ্ত উচ্ছ্বাসের স্পর্শ লাভ করিয়া উজ্জ্বলতর হইয়া ঝলিতে লাগিল। যখন মুজিয়ো থামিল এবং ছড়িটি নামাইল তখন ফাবিয়ো বলিল "একি! এ কী রাগিণী শুনালে তুমি?" ভ্যালেরিয়া নীরব হইয়া রহিল কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর স্বামীর এই প্রশ্নটিকে প্রতিধ্বনিত করিল। মুজিয়ো বেহালাটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া হাত দিয়া কপাল হইতে চুল সরাইয়া দিয়া অতি বিনীতভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল "এই রাগিণী আমি লঙ্কা দ্বীপে শুনিয়াছি। ইহাকে সেখানকার লোকেরা বলে প্রেমের জয়জয়ন্তী।" ফাবিয়ো মৃদুস্বরে বলিল "আবার বাজাও।" মুজিয়ো বলিল "না, আবার বাজাইবার জো নাই। তাহা ছাড়া এখন অনেক রাত হইয়াছে, শ্রীমতী ভ্যালেরিয়ার বিশ্রামের সময় হইয়াছে এবং আমিও বড় পরিশ্রান্ত।" সমস্ত দিন মুজিয়ো ভ্যালেরিয়ার প্রতি পুরাতন বন্ধুজনোচিত সসম্মান সহজ সরল ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল কিন্তু এখন যাইবার সময় সে তাহার হাত সবলে মর্দ্দন করিয়া তাহার করতলের উপর আঙুলগুলি রাখিয়া চাপিয়া ধরিল এবং এমন একটি ঐকান্তিক একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল যে যদিও ভ্যালেরিয়ার আনত চক্ষে তাহা পড়িল না তথাপি তাহার আরক্তিম কপোলের উপর সেই প্রখর দৃষ্টির প্রভাব সে অনুভব করিল। সে মুজিয়োকে কিছুই বলিল না কেবল তাহার হাত জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল এবং যখন মুজিয়ো চলিয়া গেল তখন দরজার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল সে গেল কি না। ভ্যালেরিয়ার মনে পড়িল সে পূর্ব্বেও মুজিয়োকে ভয় করিত এবং এখন তাহার ব্যবহারে সে সংশয়ব্যাকুলতায় অভিভূত হইয়া পড়িল। মুজিয়ো বাড়ি চলিয়া গেল এবং স্বামী স্ত্রী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

ভ্যালেরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিল। সে তাহার শিরায় শিরায় শোণিতপ্রবাহে একটা অবসাদ এবং ক্লান্তির সঞ্চারণ অনুভব করিল এবং একটা অশ্রদ্ধা উপেক্ষার সুর তাহার কানের কাছে রহিয়া রহিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইল হয়ত সেই সিরাজী মদ্য পান করিয়া কিম্বা মুজিয়োর গল্প এবং বেহালা বাজনা শুনিয়া তাহার এইরূপ হইয়াছে। সেই রাত্রে সে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। দেখিল সে যেন একটা নাচু ছাদ-ওয়ালা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল; এমন ঘর সে জন্মে কখনো দেখে নাই। সমস্ত দেয়ালে সোনালি রঙের রেখাঙ্কিত নীল রঙের টালি বসান। অনতিস্থূল স্ফটিকস্তম্ভ, প্রস্তরনির্ম্মিত ছাদটিকে ধারণ করিয়া আছে; ছাদ এবং স্তম্ভগুলিকে যেন প্রায় স্বচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছিল;—একটি ঈষৎ ম্লান গোলাপী আভা চতুর্দ্দিক হইতে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার সমস্ত আসবাবগুলির উপর সেই ক্ষীণ আলোকের রহস্য

বিস্তার করিয়া সেগুলিকে একাকার করিয়া দিয়াছে। মধ্যখানে আয়নার মত চক্চকে মেজের উপর পাতা একটা সূক্ষ্ম জাজিমের উপর কতকগুলি কিংখাপের বালিস। সে ঘরের অদৃশ্যপ্রায় কোণগুলিতে ধূনা জ্বলিতেছিল; কোনো দিকে জানালা একেবারেই নাই। দেয়ালের এক অন্ধকার নিস্তব্ধ কোণে একটি মাত্র দ্বার, তাহার উপর মখমলের পর্দ্দা বিলম্বিত। এই পর্দ্দাটা হঠাৎ ধীরে ধীরে সরিয়া গেল এবং মুজিয়ো প্রবেশ করিল। সে নমস্কার করিয়া তাহার হাত দুটি বাড়াইয়া দিয়া হাসিল। তাহার সাপের মত ভীষণ হাত ভ্যালেরিয়ার কটিদেশ বেষ্টন করিল, তাহার শুষ্ক ওষ্ঠ যেন ভ্যালেরিয়ার সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরাইয়া দিল। সে চিৎ হইয়া গদীর উপর পড়িয়া গেল।

ভ্যালেরিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং অনেক কষ্টে উঠিয়া বসিল। সে তখনও বুঝিতে পারিল না সে কোথায় আছে এবং তাহার কি হইয়াছে। সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা বেপথু তাড়িৎপ্রবাহে খেলিয়া গেল। ফাবিয়ো পাশে শুইয়াছিল। সে ঘুমাইয়া ছিল; মুক্ত জানালা হইতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোক আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। সে মুখ যেন শবের মুখের মত পাণ্ডু এবং তাহা অপেক্ষাও বিষণ্ণ জ্যোতিহীন। ভ্যালেরিয়া তাহার স্বামীকে ঠেলিল এবং সেও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল "কেন, কি হইয়াছে?" ভ্যালেরিয়া ভীতি-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল "শোন, আমি—আমি—একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি।" তখনো তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছিল।

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে মুজিয়োর বাড়ি হইতে একটা প্রবল ধ্বনি বাতাস বহিয়া সেই ঘরে আসিল; ফাবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া শুনিয়াই বুঝিতে পারিল মুজিয়ো যাহাকে প্রেমের জয়জয়ন্তী বলিয়াছিল উহা সেই রাগিণীর সুর। ফাবিয়ো অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে ভ্যালেরিয়ার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। ভ্যালেরিয়া চোখ বুজিয়া ফেলিল এবং ফিরিয়া বসিয়া গানটি শেষ পর্য্যন্ত শুনিল। সেই গানের শেষ সুরটি যখন মিলাইয়া গেল তখন আকাশের পূর্ণচন্দ্র মেঘের অন্তরালে লুকাইয়াছে এবং ঘরটা অন্ধকার হইয়া গেছে। একটি কথাও না বলিয়া তাহারা দুজনে পুনরায় বালিশের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেহ জানিতেও পারিল না কে কখন ঘুমাইল।

পরদিন মুজিয়ো প্রাতরাশের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল—অক্ষুণ্ণ হর্ষোৎফুল্ল মূর্ত্তি, আসিয়াই ভ্যালেরিয়াকে হাস্যমুখে অভিবাদন করিল। ভ্যালেরিয়া কেমন একরকম হতবুদ্ধি হইয়া গেল; একবার মুখ তুলিয়া মুজিয়োর দিকে চাহিল, পরক্ষণেই সেই শান্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং প্রখর কুতূহলী দৃষ্টি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। মুজিয়ো গল্প বলিতে সুরু করিতেছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফাবিয়ো তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল "তুমি নূতন জায়গায় আসিয়া ঘুমাইতে পার নাই দেখিতেছি। তুমি কাল রাত্রে সেই গানটি পুনরায় বাজাইতেছিলে, আমি এবং আমার স্ত্রী তাহা শুনিয়াছি।" মুজিয়ো বলিল "হ্যাঁ, তোমরা কি শুনিয়াছিলে না কি? হ্যাঁ, আমি সেটা বাজাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমি ঘুমাইয়াছিলাম এবং এক অদ্ভুত স্বপ্নও দেখিয়াছিলাম।" ভ্যালেরিয়ার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। ফাবিয়ো বলিল "কি রকম স্বপ্ন দেখিয়াছিলে?"

মুজিয়ো ভ্যালেরিয়ার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিল "আমি দেখিলাম যেন একটা প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহার ভিতরদিককার ছাদ পূর্ব্বদেশীয় ধরণে চিত্রিত। কারুকার্য্যখচিত কতকগুলি স্তম্ভ তাহাকে ধারণ করিয়া আছে, দেয়ালে টালি বসান, এবং যদিও দরজা জানালা ছিল না তবুও এক প্রকারের গোলাপী আলোকের আভায় সমস্ত ঘরটা আলোকিত। দেয়ালের পাথরগুলোও যেন স্বচ্ছ বলিয়া বোধ হইল। কোণে চীন দেশীয় ধূপ জ্বলিতেছিল, এবং মেজেয় একটা জাজিমের উপর কিংখাপের বালিস সাজানো। আমি পর্দ্দা তুলিয়া একটা দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম এবং অন্য দ্বার দিয়া একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহাকে আমি পূর্ব্বে ভালবাসিতাম। তাহাকে এত সুন্দর বোধ হইল যে আমার অতীত প্রণয়স্মৃতি আমাকে একেবারে মাতাইয়া তুলিল—"

হঠাৎ কি মনে করিয়া মুজিয়ো থামিয়া গেল। ভ্যালেরিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মুখের রং সাদা হইয়া যাইতে লাগিল এবং শ্বাস অতি ধীরে

বহিতে লাগিল। মুজিয়ো বলিল "তাহার পর উঠিয়া আমি ঐ গানটি বাজাইলাম।" ফাবিয়ো জিজ্ঞাসা করিল "সে স্ত্রীলোকটি কে?" মুজিয়ো বলিল "কে, জিজ্ঞাসা করিতেছ? সে একজন ভারতবাসীর পত্নী। আমি তাহাকে দিল্লিতে দেখিয়াছিলাম। সে এখন জীবিত নাই, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" "এবং তাহার স্বামী?" ফাবিয়ো যে কেন এই প্রশ্ন করিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। মুজিয়ো বলিল "তাহার স্বামীরও বোধ হয় মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের দুজনকেই আর দেখিতে পাই নাই।" ফাবিয়ো বলিল "আশ্চর্য্য, আমার স্ত্রীও কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; কি দেখিয়াছিলেন তাহা উনি আমাকে বলেন নাই।" মুজিয়ো একদৃষ্টে ভ্যালেরিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সময়ে ভ্যালেরিয়া উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। প্রাতরাশের পর মুজিয়োও চলিয়া গেল এবং বলিয়া গেল কার্য্যবশতঃ তাহাকে সহরে যাইতে হইবে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে ফিরিতে পারিবেনা।

* * *

মুজিয়োর দেশে ফিরিবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে ফাবিয়ো সাধ্বী সিসিলিয়ারূপে তাহার স্ত্রীর একখানি ছবি আঁকিতেছিল। ছবিটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কেবল মুখের দুই এক জায়গায় একটু রং দিলেই হইয়া যায়। মুজিয়ো যখন সহরে চলিয়া গেল তখন ফাবিয়ো তাহার চিত্রাঙ্কণ-কক্ষে প্রবেশ করিল। ভ্যালেরিয়ার সেখানে অপেক্ষা করিয়া থাকিবার কথা, কিন্তু সে ছিলনা: ফাবিয়ো তাহাকে ডাকিল কিন্তু কোনো সাড়া পাইল না। ফাবিয়ো একটু চিন্তিত হইল এবং তাহার সন্ধানে বাহির হইল। বাড়িতে কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইলনা, অবশেষে বাগানের একটি ছায়া-গোপন রাস্তায় ভ্যালেরিয়াকে দেখিতে পাইল। দেখিল সে বেঞ্চির উপর বসিয়া আছে, তাহার মাথা বুকের উপর নুইয়া পড়িয়াছে এবং হাত দুইখানি জানুর উপর ন্যস্ত; তাহার পশ্চাতে লতার ঘনান্তরাল হইতে বিকটমূর্ত্তি পূর্ব্বার্দ্ধ মানুষ এবং উত্তরার্দ্ধ ছাগরূপী বনদেবতার প্রস্তর মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে। স্বামীকে দেখিয়া ভ্যালেরিয়া আশ্বস্ত হইল এবং বলিল যে তাহার একটু মাথা ধরিয়াছিল, এখন সারিয়াছে এবং এখন সে তাহার চিত্রাঙ্কণ-কক্ষে যাইতে প্রস্তুত। ফাবিয়ো তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল এবং তুলি ধরিল। কিন্তু সে যেমন ইচ্ছা করিয়াছিল তেমন করিয়া মুখটি আঁকা হইল না, ইহাতে সে বিরক্ত হইল। ইহার কারণ এ নয় যে সেদিন ভ্যালেরিয়ার মুখশ্রী পাণ্ডুর এবং তাহাকে ক্লান্ত দেখাইতেছিল; ভ্যালেরিয়ার যে মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া সেণ্ট্ সিসিলিয়ার ভাবে তাহার ছবি আঁকিবার কথা ফাবিয়োর মনে উদয় হইয়াছিল সে ভাব ভ্যালেরিয়ার মুখে সেদিন ছিলনা। সে তুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং তাহার ছবি আঁকিবার মত মনের অবস্থা নয় এই কথা বলিয়া ভ্যালেরিয়াকে বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিতে বলিল এবং ছবিটি দেয়ালের দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া দিল। ভ্যালেরিয়া ফাবিয়োর প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ফাবিয়ো সেই ঘরেই রহিল। সে যে মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিল, তাহার অর্থ সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। মুজিয়োকে সে স্বেচ্ছায় নিজের বাড়িতে স্থান দিয়াছে কিন্তু এখন তাহার বোধ হইল কাজটা বড় গর্হিত হইয়াছে। ঈর্ষ্যাবশতঃ এভাব তাহার মনে উদয় হয় নাই, কেননা ভ্যালেরিয়ার চরিত্র সন্দেহেরও অতীত। কিন্তু মুজিয়োকে সে মনে মনে ঠিক্ বহুকালের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। যেসকল বিজাতীয় চালচলন, অভ্যাস, মুজিয়োর রক্তমাংসের মধ্যে তাহার সর্ব্ব শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার মলয়বাসী ভৃত্য, তাহার যাদুবিদ্যা, গীত বাদ্য, বিদেশীয় মদ্য, তাহার অঙ্গের বিজাতীয় গন্ধ ইত্যাদি সমস্ত লইয়া সে ফাবিয়োর মনে তাহার প্রতি অবিশ্বাসের,—এমন কি ঘৃণার ভাব উদ্রেক করিয়াছিল। তাহার মলয়বাসী ভৃত্য টেবিলে পরিবেষণ করিবার সময় তাহার দিকে এমন বিরক্তিজনক একাগ্র দৃষ্টিতে কেন তাকাইয়া থাকে? তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় সে ইতালীয় ভাষা জানে। মুজিয়ো একবার বলিয়াছিল যে ঐ ভৃত্যটি বাক্‌শক্তি বিসর্জ্জনের বিনিময়ে অন্য প্রকার

নানারূপ শক্তিপ্রয়োগ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। সে শক্তি কি এবং জিহ্বার বিনিময়েই বা কেমন করিয়া সে তাহা লাভ করিল, এ বড় আশ্চর্য্য, বড় বিস্ময়কর! ফাবিয়ো তাহার স্ত্রীর ঘরে গেল; ভ্যালেরিয়া শুইয়া ছিল, ঘুমায় নাই। ফাবিয়োর পায়ের শব্দে সে সচকিত হইয়া উঠিল এবং তন্মুহূর্ত্তেই তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ফাবিয়ো তাহার পাশে বসিয়া পূর্ব্বরাত্রে সে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা বলিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল তাহার স্বপ্নের সহিত মুজিয়োর স্বপ্নের কোনো সাদৃশ্য আছে কি না। ভ্যালেরিয়ার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল "ওঃ না, না, আমার মনে হইল যেন একটা ভীষণ জন্তু আমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে।" ফাবিয়ো জিজ্ঞাসা করিল "সে জন্তুটা কি মানুষের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল?" ভ্যালেরিয়া বলিল "না না, সে জন্তু, সে জন্তু।" এই বলিয়া বালিশের উপর মুখ লুকাইয়া ফেলিল। ফাবিয়ো অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্ত্রীর হাত ধরিয়া বসিয়া রহিল, অবশেষে সেই হাতটি চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত দিনটা এইরূপ রুদ্ধ বেদনায় কাটিল। তাহাদের মাথার উপর কি যেন ঝুলিতেছিল। কি যে তাহা তাহারা নিজেরাই ভাল করিয়া জানিতে পারিতেছিল না। আসন্ন কোন বিপৎপাতের আশঙ্কায় তাহারা কেহ পরস্পরের কাছছাড়া হইল না, কিন্তু বলিবার কিছু কথা কেহ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ফাবিয়ো ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিল, সমসাময়িক বিখ্যাত কবির কাব্য পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। রাত্রে আহারের সময় মুজিয়ো আসিয়া উপস্থিত হইল। বেশ প্রফুল্ল মূর্ত্তি, কিন্তু বেশি কথা বলিল না; কিছু কিছু রাজনৈতিক আলোচনা হইল। মুজিয়ো যখন ভ্যালেরিয়াকে সিরাজী মদ্য পান করিতে অনুরোধ করিল তখন সে তাহার অসম্মতি জানাইলে মুজিয়ো বলিল "প্রয়োজন নাই, বোধ হয়। আচ্ছা থাক্।"

স্ত্রীর সহিত ঘরে গিয়া ফাবিয়ো শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল; এক ঘণ্টা পর যখন ঘুম ভাঙিল, তখন তাহার মনে হইল যেন শয্যার অন্য অংশ শূন্য পড়িয়া আছে, ভ্যালেরিয়া সেখানে নাই। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং তখনি দেখিল তাহার স্ত্রী বাগান হইতে ঘরের দিকে আসিতেছে। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, এখন জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। চোখ বন্ধ করিয়া নিস্পন্দ মুখের ভয়কাতর ম্লানিমা লইয়া সে ধীরে ধীরে শয্যার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া হাত দিয়া অনুভব করিয়া নিঃশব্দে শয়ন করিল। ফাবিয়ো প্রশ্ন করিল কিন্তু কোন উত্তর পাইল না, ভ্যালেরিয়া তখন ঘুমাইতেছিল। ফাবিয়ো তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেখিল তাহার কাপড় ভিজা, মাথার উপর বৃষ্টির জলবিন্দু, এবং তাহার পায়ের তলায় স্থানে স্থানে বালি লাগিয়া আছে। ফাবিয়ো এক লম্ফে শয্যা ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধমুক্ত দ্বারা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। তখন সমস্ত বাগানটি চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত, ফাবিয়ো চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া দুইজোড়া পায়ের চিহ্ন মাটিতে অঙ্কিত দেখিতে পাইল, তাহার মধ্যে এক জোড়া নগ্নপদের চিহ্ন; সেই চিহ্ন ধরিয়া সে একটা বনমল্লিকা লতার ঝোপের কাছে গেল। হঠাৎ সেই রাত্রির গানের সুর তাহার কানে আসিয়া লাগিল। ফাবিয়ো শিহরিয়া উঠিল। দ্রুতবেগে মুজিয়োর বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে তাহার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইতেছে। ফাবিয়ো অন্ধবেগে তাহার কাছে গিয়া বলিল "তুমি বাগানে গিয়াছিলে, তোমার কাপড় ভিজা।" মুজিয়ো ফাবিয়োর আকস্মিক প্রবেশ এবং বিচলিত ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিল "না, আমি ত কোথাও বাহির হই নাই; তা হতেও পারে, বলিতে পারি না।" ফাবিয়ো তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "কেন তুমি আবার সেই গান বাজাইতেছ? তুমি কি আবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলে?" মুজিয়ো অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কোনো উত্তর করিল না। ফাবিয়ো বলিল "উত্তর দাও বলিতেছি।" মুজিয়ো প্রলাপের মত বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিল "গোলাকার ঢালের মত চাঁদ আকাশে ছিল, নদী সাপের গায়ের মত ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে, বন্ধুরা জাগ্রত, শত্রুরা নিদ্রিত; কপোতের উপর বাজ পাখী ছোঁ মারিল—

বাঁচাও।" ফাবিয়ো পিছু হটিয়া মুজিয়োর দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বাড়ি গিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

ভ্যালেরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ফাবিয়ো তাহাকে অনেক কষ্টে জাগাইয়া তুলিল এবং তাহাকে দেখিবামাত্র ভ্যালেরিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ফাবিয়ো তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বার বার আদর করিয়া বলিল "কি হইয়াছে তোমার, কি, হইয়াছে কি?" ভ্যালেরিয়া নিস্পন্দ হইয়া তাহার বুকের উপর পড়িয়া রহিল। ক্ষণপরে তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল "ওঃ কী ভয়ানক স্বপ্ন আমি দেখিয়াছি।" ফাবিয়ো প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, ভ্যালেরিয়া শিহরিয়া উঠিল। ঊষার অরুণচ্ছটা ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল, ভ্যালেরিয়া ফাবিয়োর হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রত্যূষে মুজিয়ো সহরে চলিয়া গেল; ভ্যালেরিয়া স্বামীর নিকট অনতিদূরস্থ মঠে তাহার বৃদ্ধ ঋষিতুল্য ধর্ম্মপিতার সহিত দেখা করিতে যাইবার ইচ্ছা জানাইল। ইঁহার উপর ভ্যালেরিয়ার অটল বিশ্বাস ছিল। ফাবিয়ো কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে এই কয়েকদিনের অভাবনীয় ঘটনায় মুহ্যমান হৃদয়ের ভার লঘু করিবার জন্যই সে তাঁহার কাছে যাইতে চায়। ভ্যালেরিয়ার নষ্টশ্রী মুখের দিকে তাকাইয়া এবং তাহার কাতর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফাবিয়ো ঐ প্রস্তাবে রাজি হইল; তাহার মনে হইল হয়ত বাবা লোরেঞ্জোর অমূল্য উপদেশবাক্য শুনিয়া ভ্যালেরিয়ার মনের সমস্ত সন্দেহ ও ভয় দূর হইয়া যাইবে।

চারজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া ভ্যালেরিয়া মঠে চলিয়া গেল। ফাবিয়ো বাড়িতে থাকিল এবং দিবারাত্রি বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মনে মনে ভ্যালেরিয়ার এই অকারণ ভীতির এবং গত কয়েক দিনের ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মুজিয়োর অনুপস্থিতি কালে সে কতবার তাহার বাড়িতে গিয়াছিল; মলয়বাসী চাকরটি তাহাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হাসিভরা মুখ লইয়া হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়াছে; ফাবিয়োর মনে হইয়াছে তাহার সেই হাসি নিতান্তই কপট হাসি।

ভ্যালেরিয়া তাহার গুরুর নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিল; বলিবার সময় লজ্জায় তত নয় যতটা ভয়ে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। গুরু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সমস্ত ব্যাপারটা শুনিলেন এবং ভ্যালেরিয়াকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন "ইন্দ্রজাল—সয়তানের পৈশাচিক খেলা এব্যাপারটা এই রকম ভাবে চলিতে দেওয়া কোনো মতেই উচিত নহে।" তিনি এই অশান্তি সমূলে দূর করিবার জন্য ভ্যালেরিয়ার সহিত তাহাদের বাড়িতে আসিলেন। গুরুকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ফাবিয়ো অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; তিনি অনেক করিয়া বুঝাইয়া ফাবিয়োকে ঠাণ্ডা করিলেন। বাবা লোরেঞ্জো ফাবিয়োকে একসময়ে একলা পাইয়া ভ্যালেরিয়া যাহা তাঁহার কাছে গোপনে বলিয়াছিল তাহার উল্লেখ না করিয়া তিনি তাহাকে তাহার অতিথিটিকে স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন যে তাঁহার বিশ্বাস যে ঐ লোকটাই তাহার গল্প, গান, এবং সমস্ত আচরণের দ্বারা ভ্যালেরিয়ার কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া এই বিপত্তি ঘটাইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে মুজিয়োর পূর্ব্বেও ধর্ম্মবিশ্বাস তত দৃঢ় ছিল না এবং ম্লেচ্ছদেশে অধিক দিন বাস করিয়া হয়ত সে সেখানকার অদ্ভুত তন্ত্রমন্ত্রের সংক্রামক স্পর্শ এড়াইতে পারে নাই; এমন কি হয়ত বা গোপনে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাও শিখিয়া আসিয়াছে; এই জন্য বন্ধুত্বের দাবি থাকা সত্ত্বেও সংসারের মঙ্গল এবং শান্তি রক্ষার জন্য এই বন্ধুবিচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ফাবিয়ো এই সাধু সন্ন্যাসীর সহিত সম্পূর্ণ একমত হইল; গুরুর সৎপরামর্শের কথা স্বামীর নিকট শুনিয়া ভ্যালেরিয়া অত্যন্ত খুসি হইল। বাবা লোরেঞ্জো মঠের জন্য দম্পতিপ্রদত্ত নানাবিধ বহুমূল্য উপহারাদি লইয়া প্রস্থান করিলেন। ফাবিয়ো ভাবিল রাত্রের আহারের সময় মুজিয়োর সহিত তাহার একটা বোঝাপড়া হইবে। কিন্তু মুজিয়ো সে সময় উপস্থিত হইল না। পরদিন কথাবার্ত্তা হইবে এই স্থির করিয়া উভয়ে শয়ন করিতে গেল।

ভ্যালেরিয়া ঘুমাইল কিন্তু ফাবিয়ো ঘুমাইতে পারিল না। রাত্রের নিস্তব্ধ অন্ধকারে পূর্ব্বে যাহা কিছু দেখিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিল সেইগুলি সমস্ত যেন সুস্পষ্টরূপে চোখের সামনে আসিয়া ধরা দিল। যে প্রশ্নের উত্তর সে নিজের মনের মধ্যে ভাবিয়াও কোনদিন খুঁজিয়া পায় নাই তাহারই সম্বন্ধে সে এখন ভাবিতে লাগিল। মুজিয়ো কি যথার্থ পিশাচসিদ্ধ এবং সে কি ভ্যালেরিয়াকে সত্য সত্যই বিষ খাওয়াইয়াছে? এক হাতে মাথা রাখিয়া অন্য হাতে ক্ষুব্ধ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া সে যখন শুইয়া এ কথা ভাবিতেছিল তখন মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে চাঁদ উঠিল। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া পড়িল এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে একটি অতি মৃদুপ্রবাহিত সুরভি নিশ্বাস!—একি ফাবিয়োর কল্পনা? না, একটি ব্যাকুল করুণ মৃদু আহ্বান শোনা গেল,—তৎক্ষণাৎ ভ্যালেরিয়া নড়িয়া উঠিল। ফাবিয়ো সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, দেখিল ভ্যালেরিয়া ধীরে ধীরে এক পা'র পর আর এক পা খাট হইতে নামাইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত জ্যোতিঃহীন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া বাগানের দিকে চলিল। ফাবিয়ো তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া দৌড়িয়া গিয়া বাগানে বাহির হইবার দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। দরজার হাতলটা ধরিবামাত্র তাহার মনে হইল যেন কে ভিতর হইতে ক্রমাগত ঠেলা দিয়া দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সে একটি অত্যন্ত মিনতিপূর্ণ সকরুণ বিলাপের ধ্বনি শুনিতে পাইল। হঠাৎ ফাবিয়োর মনে হইল মুজিয়ো তো এখনো সহর হইতে ফেরে নাই। কিন্তু তবুও সে তাহার বাড়ির ভিতর দ্রুত প্রবেশ করিল।

কি দেখিল?

শান্তোজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত পথ দিয়া মুজিয়ো চন্দ্রাহতের ন্যায় হাত বাড়াইয়া দৃষ্টিশক্তিহীন দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ফাবিয়ো তাহার কাছে গেল, মুজিয়ো থামিল না, চলিতে লাগিল, এক পা এক পা করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল; মলয়বাসী ভৃত্যের মুখে যে হাসি ফাবিয়ো দেখিয়াছিল মুজিয়োর মুখেও সেইরূপ হাসি দেখিল। ফাবিয়ো তখনি তাহাকে ডাকিত কিন্তু একটা জানালা খোলার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

দেখিল তাহার শয়ন ঘরের জানালাটা সম্পূর্ণ খোলা, চৌকাঠের উপর একটি পা রাখিয়া ভ্যালেরিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহার দুই হাত সে মুজিয়োর দিকে বাড়াইয়া দিয়াছে; তাহার সমস্ত শরীর মুজিয়োর স্পর্শ-লালসায় একান্ত ব্যাকুল।

হঠাৎ ক্রোধে ফাবিয়োর বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, "পাষণ্ড পিশাচসিদ্ধ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং এক হাতে মুজিয়োর গলা টিপিয়া ধরিয়া অপর হাত দিয়া কটিবন্ধ হইতে ছোরা বাহির করিয়া মুজিয়োর বক্ষে তাহা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। মুজিয়ো আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং ক্ষতস্থান হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে ভ্যালেরিয়াও সেইরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় মাটির উপর পড়িয়া গেল।

ফাবিয়ো দ্রুতবেগে ভ্যালেরিয়ার কাছে গিয়া তাহাকে শয়ন কক্ষে লইয়া গেল এবং তাহাকে কথা বলাইতে চেষ্টা করিল। ভ্যালেরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া রহিল, অবশেষে একটু চোখ মেলিল; আসন্ন মৃত্যুভয়মুক্ত মুমূর্ষুর স্বচ্ছন্দ নিশ্বাসপ্রবাহের মত ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে তাহার বক্ষ দুলিয়া উঠিল এবং দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের কাছে গিয়া পড়িল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল "তুমি বুঝি, তুমি?" তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার হাত নামাইয়া লইয়া ম্লানস্মিত হাসি হাসিয়া বলিল "যাক, এখন সব বিপদ কাটিয়া গেল; কিন্তু ওঃ আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি!" এই বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ফাবিয়ো তাহার পাশে শুইয়া তাহার পাণ্ডু মুখের অপেক্ষাকৃত শান্তচ্ছবি দেখিয়া আশ্বস্ত হইল, এবং অতীতের ঘটনা ও ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। এখন কি করা কর্ত্তব্য? মুজিয়োর বক্ষে যে রকম সজোরে ছোরাটা বিদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে তাহার যে মৃত্যু হইয়াছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই এবং ইহাও নিশ্চয় এ কথা কখনই চাপা থাকিবে না। আর্কডিউক এবং

বিচারকদিগকে জানাইতে হইবে, কিন্তু এই বুদ্ধির অগম্য ঘটনাটি সে কেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিবে? সে তাহার নিজের বাড়িতে তাহার প্রিয়তম বন্ধুকে হত্যা করিয়াছে! তাঁহারা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন, কি জন্য?—কিন্তু মুজিয়ো যদি না মরিয়া থাকে?—সন্দেহ দূর করিবার জন্য অতি সন্তর্পণে উঠিয়া সুপ্তসুপ্ত ভ্যালেরিয়াকে ছাড়িয়া সে মুজিয়োর বাড়িতে গেল। সেখানে অক্ষুণ্ণ নিস্তব্ধতায় সমস্ত বাড়িটা ছমছম্ করিতেছিল; একটা জানালা দিয়া আলোক আসিতেছিল। ফাবিয়ো শঙ্কিত হৃদয়ে বাহিরের দরজাটা খুলিয়া দিল তাহাতে তখনও রক্তের চিহ্ন লাগিয়া এবং মাটিতে গাঢ় রক্তের ছাপ পড়িয়া আছে। প্রথম অন্ধকার ঘরটি পার হইয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিবার দরজার কাছে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

ঘরের মাঝখানে একখানা পারস্যদেশের গালিচার উপর কিংখাপের বালিশে মাথা রাখিয়া এক লাল আঁচলাদার শাল গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া চিৎ হইয়া মুজিয়ো শুইয়া আছে। তাহার মুখের রং মোমের মত হলদে, চোখ দুটি বিবর্ণ নীল, শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনো লক্ষণই নাই, একেবারে মৃত শবের মত পড়িয়া আছে। তাহার জানুর কাছে মলয়বাসী ভৃত্যটি শালমুড়ি দিয়া বসিয়া, বাম হাতে ফার্ণ জাতীয় একপ্রকার গাছের ডাল মুজিয়োর দেহের দিকে নত করিয়া ধরিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের উপর তাকাইয়া আছে। সেই ঘরে একটি মাত্র ছোট মশাল জ্বলিতেছিল, এবং তাহার নিষ্কম্প স্থির ফিকে সবুজ রঙের শিখা একেবারে নির্ধূম। ফাবিয়ো প্রবেশ করিল কিন্তু সেই মলয়বাসী ভৃত্য নড়িল না, একবার তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া পুনরায় মুজিয়োর দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিল। সে ডালটি ধরিয়া দোলাইতে লাগিল, শূন্যে ঘুরাইতে লাগিল এবং মুখ ওষ্ঠ নাড়িয়া শব্দহীন মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল। তাহার এবং মুজিয়োর মাঝখানে সেই ছোরাটি পড়িয়াছিল। রক্তাক্ত ছোরার উপর সে ডালটা দিয়া দুইবার ঘা দিল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই রকম করিল। ফাবিয়ো তাহার কাছে গিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "মারা গিয়াছে কি?" মলয়বাসী মাথা নাড়িয়া জানাইল "হাঁ" এবং শালের ভিতর হইতে তাহার হাত বাহির করিয়া সগর্ব্বে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ফাবিয়োকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল। ফাবিয়ো আবার জিজ্ঞাসা করিত কিন্তু দৃপ্ত অঙ্গুলির নীরব আদেশ তাহাকে নিরস্ত করিল। সে রাগ করিল বটে কিন্তু হতবুদ্ধি হইয়া আদেশও পালন করিল। ভ্যালেরিয়া তখন শান্তমুখে ঘুমাইতেছিল। ফাবিয়ো কাপড় না ছাড়িয়া জানালার কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। সূর্য্য উঠিল—তখনো সে চিন্তায় নিমগ্ন। ভ্যালেরিয়ার ঘুম তখনো ভাঙে নাই, ফাবিয়ো স্থির করিল ভ্যালেরিয়া জাগিলে সে ফেরারা সহরে যাইবে, এমন সময় কে দরজায় আস্তে ঘা দিল। ফাবিয়ো বাহিরে গিয়া দেখিল তাহার পুরাতন ভৃত্য আন্তোনিয়ো তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বৃদ্ধ বলিল "মহাশয়, সেই মলয়বাসী বলিতেছে যে মুজিয়ো অত্যন্ত পীড়িত সেই কারণ সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া তাহাকে সহরে যাইতে হইবে। জিনিষপত্র গুছাইতে আমাদের বাড়ির ভৃত্যদের সাহায্য চায় এবং আহারের পর আসবাববাহক এবং জীনশওয়ারী ঘোড়া পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছে। আপনি কি আদেশ করেন?" ফাবিয়ো বলিল "সেই মলয়বাসী বলিল? কেমন করিয়া সে বলিল? সে ত বোবা।" আন্তোনিয়ো বলিল "এই কাগজে সে বিশুদ্ধ ইতালীয় ভাষায় লিখিয়া দিয়াছে, এই দেখুন।" ফাবিয়ো জিজ্ঞাসা করিল "মুজিয়ো পীড়িত বুঝি?" আন্তোনিয়ো বলিল "হাঁ, তিনি অত্যন্ত পীড়িত, কাহারো সহিত দেখা করিতে পারিবেন না।" ফাবিয়ো পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তাহার ভৃত্য ডাক্তার আনিতে পাঠাইল না?" আন্তোনিয়ো বলিল "না, সে ডাক্তার আনিতে নিষেধ করিয়াছে।" ফাবিয়ো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে আন্তোনিয়োকে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে আদেশ করিল এবং আন্তোনিয়ো প্রস্থান করিল। ফাবিয়ো ভাবিল "তবে কি সে মরে?" ইহাতে সে দুঃখিত হইবে কি আনন্দিত হইবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। পীড়িত? কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই ত সে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছে!

ইহার পর যখন ফাবিয়ো ভ্যালেরিয়ার কাছে গেল তখন

সে জাগিয়া উঠিয়া মাথা তুলিল। উভয়ের চোখে চোখে বোঝাপড়া হইয়া গেল। ভ্যালেরিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল "সে কি চলিয়া গেছে?" ফাবিয়ো শিহরিয়া উঠিয়া বলিল "কেমন করিয়া যাইবে? তুমি কি বলিতে চাও—" সে না থামিতেই ভ্যালেরিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "সে কি চলিয়া গেছে?" ফাবিয়োর হৃদয় হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। "সে বলিল এখনো যায় নাই কিন্তু আজই যাইবে।" ভ্যালেরিয়া বলিল "আর কখখনো কস্মিন্ কালেও তাহার সহিত দেখা হইবে না?" ফাবিয়ো বলিল "না।" ভ্যালেরিয়া বলিল "আঃ বাঁচিলাম", তাহার ওষ্ঠে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল "আর কখনো আমরা তাহার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিব না, কখনো না, শুনিতেছ? যতক্ষণ না সে চলিয়া যাইবে ততক্ষণ আমি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইব না। এখন তুমি যাও, আমার দাসীকে আমার কাছে পাঠাইয়া দাও।" একটু থামিয়াই আবার বলিল "না, একটু দাঁড়াও। ঐ জিনিষটা এখান থেকে লইয়া যাও।" এই বলিয়া মুজিয়ো প্রদত্ত মুক্তার কণ্ঠহারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। বলিল "একটা সুগভীর কূপের মধ্যে উহা ফেলিয়া দাও। এস, একবার আমার কাছে এস, আমি এখন তোমারই ভ্যালেরিয়া। এখন যাও, সে চলিয়া যাইবার পর আমার কাছে আবার আসিও।" ফাবিয়ো কণ্ঠহারটি লইয়া যথা-দিষ্ট করিল। তাহার পর সে বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং মুজিয়োর বাড়িতে আসন্ন বিদায়ের ব্যবস্থা কালীন চঞ্চলতা দূর হইতে দেখিতে লাগিল। সে দেখিল তাহারই ভৃত্যেরা জিনিষপত্র নামাইতে ব্যস্ত, কিন্তু মলয়বাসী ভৃত্য একবারও দেখা দিল না। বাড়ির মধ্যে এখন কি হইতেছে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা ফাবিয়ো কোনো মতে দমন করিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল যে মুজিয়োকে যে ঘরে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে সেই ঘরে প্রবেশ করিবার একটা গোপন দরজা আছে। তৎক্ষণাৎ সেই দরজার কাছে গিয়া দেখিল তাহা খোলা, এবং ভারি পর্দ্দার ভাঁজগুলি ধীরে ধীরে সরাইয়া ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিল।

এখন মুজিয়ো গালিচার উপর শুইয়া নাই। ভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদ পরিয়া সে এখন একটা হাতওয়ালা চৌকির উপর বসিয়া; কিন্তু আকৃতির কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই, দেখিয়া মনে হইল ঠিক্ সেই মৃত দেহ। তাহার অসাড় মাথা চৌকির পিঠের উপর নুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার আড়ষ্ট, কঠিন, বিস্তৃত, হলদে হাত দুইটি হাঁটুর উপর পড়িয়া রহিয়াছে। বক্ষস্থল স্থির নিস্পন্দ। চৌকির কাছে মেজের উপর কতকগুলা শুষ্ক গাছ গাছড়া এবং কতকগুলি কাচের পাত্রে এক প্রকার সবুজ রঙের কস্তরীর মত অত্যন্ত তীব্র শ্বাসরোধী গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ সারি সারি সাজানো। এক একটি কাল রঙের সাপ প্রত্যেক পাত্রটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সোনালি চোখগুলো ঝক্ ঝক্ করিতেছে। ঠিক্ মুজিয়োর সামনে দুই হাত তুলিয়া সেই মলয়বাসী ভৃত্যটি দণ্ডায়মান, তাহার অঙ্গে বিচিত্র রঙের জরির সাজ, কটিদেশ একটি ব্যাঘ্রের লাঙ্গুলে বেষ্টিত এবং মাথায় এক প্রকার মুকুটের আকারের টুপি। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; একবার মাথা নীচু করিল দেখিয়া মনে হইল যেন উপাসনা করিতেছে; তাহার পর সোজা হইয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। হাত দুইটি মুজিয়োর মুখের সামনে তালে তালে নাড়াইতে লাগিল, এবং তাহাকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সজোরে মেজের উপর পদাঘাত করিতে দেখিয়া মনে হইল যেন সে মুজিয়োকে ভয় দেখাইবার জন্যই এরূপ করিতেছে। বেশ দেখা গেল এই সকল ব্যাপার করিতে তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট করিতে হইতেছে, তাহার যন্ত্রণাবোধ হইতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল এবং কপাল দিয়া ঘাম গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া কুঞ্চিত ললাটে অতি কষ্টে মুজিয়োর সামনে এমন ভাবে তাহার বদ্ধ মুষ্টি তুলিল যে মনে হইল সে যেন ঘোড়ার রাশ বাগাইয়া ধরিয়াছে। এই সময় হতবুদ্ধি ফাবিয়ো চোখের সামনে দেখিল মুজিয়োর মাথা চৌকির পিঠ ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিল এবং মলয়বাসীর হাতের আন্দোলনের তালে তালে দুলিতে লাগিল। মলয়বাসী হাত নামাইল তাহার মাথাটিও যথাস্থানে নামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ চলিল। পাত্রের সেই গাঢ় রঙের তরল পদার্থগুলি ফুটিতে আরম্ভ করিল, কাচের পাত্রে ঘণ্টার শব্দের মত ঠুং ঠুং শব্দ হইতে লাগিল এবং কাল

সাপগুলি নড়িয়া চড়িয়া যেমন ইচ্ছা সেগুলিকে বেষ্টন করিয়া ধরিতে লাগিল। মলয়বাসী এক পা অগ্রসর হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মুজিয়োকে নমস্কার করিল মৃতের চোখের পল্লব কাঁপিয়া উঠিল, ঈষৎ মেলিল, সীসকের মত নিস্তেজ চোখ অল্প দেখা গেল। মলয়বাসীর মুখ এক প্রকার পিশুন আনন্দের দৃপ্ত উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে মুখ খুলিয়া বক্ষের গভীরতম কুহর হইতে একটা গম্ভীর হর্ষোন্মত্ত ধ্বনি ধ্বনিত করিয়া তুলিল; মুজিয়োর কম্পিত ওষ্ঠে এই অমানুষিক শব্দের অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কাঁপিয়া উঠিল।

ফাবিয়ো আর সহ্য করিতে পারিল না; তাহার মনে হইল যেন তাহার চতুর্দ্দিকে পৈশাচিক যাদুমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। আর বিলম্ব না করিয়া মনে মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে আর কোনো দিকে না তাকাইয়া সোজা বাড়ির দিকে ছুটিয়া চলিল। তিন ঘণ্টা পরে আন্তোনিয়ো আসিয়া খবর দিল সমস্ত প্রস্তুত, এবং মুজিয়ো যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। কোনো উত্তর না দিয়া ফাবিয়ো বাড়ির ছাদের উপর উঠিল। সেখান হইতে মুজিয়োর বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ধীরে ধীরে সদর-দরজা খুলিয়া গেল এবং মুজিয়ো সাধারণ বেশ পরিয়া বাহির হইল। তাহার মুখ, হাত, সমস্তই মৃতব্যক্তির মত নিস্তেজ, অসাড়, কিন্তু তবু সে চলিতে লাগিল; ঘোড়ার উপর উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া রাশ হাতড়াইয়া বাহির করিয়া বাগাইয়া ধরিল। মলয়বাসী এক লম্ফে সেই ঘোড়ার পিঠের উপর উঠিয়া পিছন হইতে মুজিয়োর কোমর জড়াইয়া ধরিল, তাহার পর তাহারা যাত্রা সুরু করিল। ঘোড়াগুলি ধীর পদবিক্ষেপে চলিল; মোড় ঘুরিবার সময় ফাবিয়ো মুজিয়োর গালে দুইটি সাদা চিহ্ন দেখিতে পাইল এবং তাহার মনে হইল যেন মুজিয়ো তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। মলয়বাসী পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া তাহার উদ্দেশে একটি বিদ্রূপাত্মক নমস্কার নিবেদন করিল। ফাবিয়ো ভাবিল, ভ্যালেরিয়া কি এই সব দেখিতে পাইয়াছে? জানালা ত বন্ধ ছিল কিন্তু হয় ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ভ্যালেরিয় খাবার ঘরে আসিল বেশ প্রফুল্লচিত্ত এবং সেবাতৎপর কিন্তু অত্যন্ত শ্রান্ত বলিয়া মনে হইল। তাহার মুখে আর সে ভয়ের লক্ষণ নাই। মুজিয়ো চলিবার পর ফাবিয়ো যখন আবার তাহার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিল তখন ভ্যালেরিয়ার মুখে তাহার পূর্ব্বের ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। ফাবিয়ো নিশ্চিন্ত চিত্তে ছবি শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইল—স্বামী স্ত্রী মিলিয়া আবার সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। মুজিয়ো সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গেল। ফাবিয়ো এবং ভ্যালেরিয়া আর কেহ তাহার কথা উত্থাপন করিল না এবং তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খোঁজ লইল না। তাহার স্মৃতি লইয়া মুজিয়ো যেন সহসা পৃথিবীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া অসীম রহস্যের মধ্যে অদৃশ্য হইল। ফাবিয়ো একবার ভাবিল সেই হত্যাকাণ্ডের রাত্রির ঘটনা ভ্যালেরিয়াকে বলিবে কিন্তু ভ্যালেরিয়া ইহা ভাবে জানিতে পারিবামাত্র নিরস্ত করিল এবং এমন ভাবে চোখ বুজিয়া শ্বাসরোধ করিয়া বসিল যে মনে হইল যেন তাহাকে কেহ দারুণ আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

শরৎকাল, ফাবিয়ো ছবির উপর শেষ তুলি চালাইতেছে এবং ভ্যালেরিয়া অর্গানের কাছে বসিয়া আপন মনে যেমন ইচ্ছা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে তাহা বাজাইতেছে। হঠাৎ তাহার আঙ্গুলগুলি সেই মুজিয়োর "প্রেমের জয়জয়ন্তী"র প্রথম পদের সুরের পর্দ্দাগুলির উপর পড়িয়া তাহা বাজাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ বিবাহের পর এই প্রথম বক্ষের মধ্যে নবীন প্রাণের স্পন্দন স্পন্দিত করিয়া তুলিল। ভ্যালেরিয়া চমকিয়া উঠিল—বাজনা থামাইল।

ইহার অর্থ কি? ইহা কি তবে—

কিন্তু এইখানেই পুঁথি শেষ হইয়া গেল।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তদবধি

সেই বহুবর্ষ আগে প্রথম যৌবনে
তোমার প্রণয়লিপি, আলেখ্য তোমার
ঐ মধুমুখচ্ছবি, প্রীতি উপহার
কে আমারে দিয়া গেল। নিস্পন্দ নয়নে

নাহি জানি কতক্ষণ হেরিনু বিস্ময়ে
সে অপূর্ব্ব চিত্রলেখা, আঁখি তারকায়
কি নিবিড় স্নিগ্ধদৃষ্টি। চিত্র পরিচয়ে
হৃদয় হরিলে মোর। কোথা দুজনায়
হ'বে দেখা পত্রে তার ছিলনা নির্দ্দেশ,
শুধু আবাহন মাত্র, সংক্ষিপ্ত সরল
প্রণয়ের নিমন্ত্রণ। পরি বরবেশ
বাহিরিনু রাজপথে, খুঁজিনু বিফলে
সে অজানা বধূ মোর। আজি শুভ্রকেশ
তারি লাগি ফিরি পথে বৃদ্ধ দরবেশ।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

আবির্ভাব

(গল্প)

আজ মন্দিরে মহোৎসব। দেশদেশান্তর হইতে কত যাত্রী—কত কাঙাল ফকির আজ দেবতার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকাল। মন্দির বন্ধ। তাই বাহিরের প্রাঙ্গণে সকলে মিলিয়া জটলা করিতেছে—কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ শুইয়া। কেহ গান ধরিয়াছে। আগুন করিয়া কেহ হোমে বসিয়াছে—কেহ ধূপ ধুনা জ্বালিয়া আরতি করিতেছে। কেহ ধ্যানে মগ্ন, কেহ বা রন্ধনে ব্যস্ত। চারিদিকের এই কল্প কোলাহল মন্দিরের শান্তি ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুরু ও শিষ্য—দুই সন্ন্যাসী মন্দিরের পুষ্পোদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। কাহারো মুখে কথা নাই,—যেন কাহার বিরাট আবির্ভাব নিস্পন্দ হইয়া দেখিতেছেন। পূর্ণিমার রাত্রি—জ্যোৎস্নার প্লাবনে সমস্ত বিশ্ব মগ্ন। উদ্যানের মধ্যে বাতাসে গন্ধে একটা মাতামাতি চলিয়াছে;—আকাশের আলো, বাতাসের মর্ম্মর, পুষ্প পল্লবের সুগন্ধ দেবতার চরণে যেন পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াছে। বাতাস আসিয়া ফুলগুলি ঝরাইয়া দেবতার চরণে স্তূপীকৃত করিতেছে—গন্ধ সেখানে আশ্রয় খুঁজিতেছে। আরতির প্রদীপের মুখে জ্যোৎস্না জ্বলিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শিষ্য কহিল—"আজ এ চোখের সামনে কি দেখচি ঠাকুর! এ কার আবির্ভাব?"

গুরু কহিলেন—"দেখতে পাচ্চনা বৎস! সামনে যে তোমার দেবতা! ঐ দেখ আলোকে বাতাসে গন্ধে দেবতার অপরূপ প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে ফুটে উঠেচে। আজ যে তিনি জ্যোৎস্নার স্মিতহাস্যে আমাদের প্রাণ ভরে তুলচেন—বাতাসের স্পর্শে হাত বুলিয়ে সকল পাপ, সকল গ্লানি মুছে দিচ্ছেন। আজ আমাদের জীবন পবিত্র হয়ে উঠল! আজ দেবতার দর্শন পেলুম। কত দিন ঠাকুর আমায় ডেকেচেন আমি সংসারের মায়ায় বদ্ধ হয়ে তাঁর চরণে আসতে পারিনি। দয়াল ঠাকুর তবু আমায় ত্যাগ করেন নি;—পথের কাঁটা একটি একটি করে সরিয়ে আমায় কাছে টেনে নিয়েছেন। ঠাকুরের সে দয়ার কথা আজ তোমায় বলব;—আজ তাঁকে দেখেছি—আজই তো বলবার দিন! আমি সংসারের মায়ায় একেবারে ডুবে ছিলুম! অপর্য্যাপ্ত ধনরত্ন সুখসম্পদ—স্ত্রীপুত্র কন্যা—এদেরই নিয়ে মেতেছিলুম,—ভগবানকে কখনো ডাকিনি। প্রভু দেখলেন আমি নষ্ট হয়ে যাচ্চি—একে একে ঐশ্বর্য্য সম্পদ কেড়ে নিতে লাগলেন; তবুও আমার চোখ ফুটলনা। তখন ঠাকুর একে একে মায়ার বন্ধনগুলি কাটতে লাগলেন—স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, কন্যা গেল। তবুও আমি অন্ধ হয়ে রইলুম—জীবনের একমাত্র সম্বল ছোট ছেলেটিকে আঁকড়ে পড়ে রইলুম। দিন রাত তাকে চোখে চোখে রাখতুম—ভাবতুম, দেখি যম কেমন করে নেয়! একদিন যেই একটু চোখের আড় করেচি অমনি ঠাকুর তাকে সরিয়েছেন। এতদিনে চোখ ফুটল! ভালো মানুষটির মতো নয়—কঠিন রুদ্র মূর্ত্তিতে এসে চোখে আঙুল দিয়ে ঠাকুর চোখ ফুটিয়ে দিলেন;—রক্তমাখা বুকের দুলালকে ছিন্ন জবার মতো ধূলায় লুটাতে দেখলুম! সে রক্ত দেখে আমার মনে হল—এ তো আমার বাছার গায়ের রক্ত নয়—এ আমার ঠাকুরের রক্ত আঁখি!"

শিষ্য বাধা দিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল—"কেমন করে এমন হল ঠাকুর?"

—"প্রভু আমার ডাকাত হয়ে এসে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেলেন!"

—"ডাকাত? ঠাকুর, আপনার দেশ কোথায়?"

—"পলাশপুর।"

—"পলাশপুর?"

শিষ্য চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"তবে শোনো ঠাকুর, শোনো, আমার কাহিনী শোনো। আমি ছিলুম ডাকাতের সর্দ্দার! কত লোকের সর্ব্বনাশ, কত নরহত্যা এ জীবনে যে করেচি তা বলতে পারিনা। একদিন এক গাঁয়ে ডাকাতি করতে গিয়েছিলুম। সন্ধ্যা থেকেই আমার দলবল বনে লুকিয়ে রেখে আমি গাটা একটু ঘুরে আসতে বেরুলুম। পথে দেখলুম, একটি ছেলে। গা গহনায় ভরা। লোভ সামলাতে পারলুম না ঠাকুর! লোভ সামলাতে পারলুম না! ছোট ছেলে মারবার ইচ্ছে ছিলনা; কিন্তু কি করব? তার গায়ে হাত দিতেই সে চীৎকার করে উঠল। আমি ধরা পড়বার ভয়ে কোমর থেকে ছোরা বার করে তখনই তার বুকে বসিয়ে দিলুম! ঠাকুর! এত খুন করেচি কিন্তু এমন কখনো দেখিনি রক্তেতে যেন পৃথিবী ভেসে গেল ছেলেটা আমার পানে সে যে কী করে চাইলে আমি পাগল হয়ে গেলুম ঠাকুর! পাগল হয়ে গেলুম। আমাকে একজন সাধু দয়া করে বলে দিলেন তোমার কাছে আসতে। তিনি বল্লেন, যদি কেউ তোমার মঙ্গল করতে পারে ত সে তিনি। প্রভু, দাও আমাকে সান্ত্বনা, দাও আমাকে শান্তি, কর আমাকে ক্ষমা।"

সন্ন্যাসী স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পরে কহিলেন—"ক্ষমা আমি করেচি কিন্তু সান্ত্বনা আমি দেব না।"

শিষ্য কহিল, "প্রভু এ যে অসহ্য কষ্ট!"

গুরু কহিলেন "এই অসহ্য কষ্টই যে তোমার সত্য—এ শান্তি মিথ্যা তা আমার কাছে চেয়োনা।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বারিনিধি

আমি বারিনিধি, অবধিবিহীন,
চির নব, চির বৃদ্ধ,
বিধাতার বরে অজর অমর,
মাণিক রতনে ঋদ্ধ।
অনন্তগামী, চলিয়াছি আমি
আশার অসীম পথে,
ঘুরিছে লক্ষ— লহরীচক্র
আমার বাসনা-রথে।
কবে হব পার দেখা পাব তাঁর
জানি নাকো কিছু মাত্র,
তাই তাঁরি পানে দিয়াছি ঢালিয়া
আমার তরল গাত্র।
তরল গাত্র, অসরল মোর
চপল চিন্তা ঢেউ।
তাই ডেকে মরি গুরু গম্ভীরে
শুনে না কি কিছু কেউ।

শ্রীরঘুনাথ সুকুল।

জন্মদুঃখী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত সাক্ষ্য।

বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে, যেন কতকটা সাহস সঞ্চয় করিবার জন্যই হল্‌ম্যান ছুতার প্রত্যহ যথাসময়ে সেল্‌ভিগের দোকানে গিয়া হাজির হইত। বোতল খুলিয়া নিয়মিত মাত্রা চড়াইলেই তাহার মুখখানা ভাবহীন নির্জীব মখোসের মত হইয়া উঠিত; মনের অশান্তি এবং চোখের অস্থিরতা বিন্দুমাত্রও আর প্রকাশ পাইত না। গৃহিণীকে ঘরে আনিয়া অবধি বেচারা দিন দিন যেন জড়ভরত হইয়া পড়িতেছিল, কোনো বিষয়েই সে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিত না। ক্রমশঃ গৃহিণীর কথায় সে উঠিতে বসিতে লাগিল। এইরূপ হীনতার মধ্যে তাহার সকল গ্লানি ভুলিবার ঔষধ হইয়াছিল মদ।

তাড়াতাড়ি কয়েক পাত্র নিঃশেষিত করিয়াই হল্‌ম্যান্ দার্শনিকের মত গম্ভীর হইয়া পড়িত। তাহার দৃষ্টি নিশ্চল, মন চিন্তামগ্ন। সে কি যে ভাবিত তাহা কেউ জানে না। হল্‌ম্যানের অন্তরঙ্গেরা বলে, দাম্পত্য জীবনের সুখ দুঃখ বিচারই উহার চিন্তার একমাত্র বিষয়। কার্য্যকারণের এত বাধাবাধি সত্ত্বেও, কোন্

কর্ম্মফলে দস্তুর মত সংসারী হইয়াও সে সারাটা সন্ধ্যা সেল্‌ভিগের দোকানে কাটাইয়া যায়, ইহাও একটা ভাবনার কথা বটে।

প্রতি সপ্তাহের শেষে শনিবার বৈকালে একটি লম্বা ছিপ্‌ছিপে মেয়ে, একখানা ফর্দ্দ এবং একটা চুপ্‌ড়ি লইয়া হলম্যানের দোকানে আসিত এবং বাড়ী না পৌঁছানো পর্য্যন্ত উহার সঙ্গ ছাড়িত না। মেয়েটি সিলা।

হল্‌ম্যান্ হপ্তার রোজগার পকেটস্থ করিয়া, দোকানের ঝাঁপ ফেলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িত। মেয়ের সঙ্গে কিছু দূর চলিয়াই তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিত, শেষে সেল্‌ভিগের দোকানের কাছে আসিয়াই "একটা জিনিস ফেলে এসেছি, এখুনি আসছি" বলিয়া সিলাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া হলম্যান্ মাতালের দলে ভিড়িয়া যাইত।

"এখুনি" যে কতক্ষণ তাহার আন্দাজ সিলা প্রতি শনিবারেই পাইয়া থাকে; সুতরাং সেও বিলম্ব না করিয়া লোহার কারখানার দিকে চলিয়া যায় এবং এখুনির মেয়াদ ফুরাইবার আগেই যথা স্থানে আসিয়া হাজির হয়।

শরৎকালের অপরাহ্ণ। পুলের উপর দিয়া কলের মজুর এবং কারিগরেরা দলে দলে বাসায় ফিরিতেছে—কাহারো সঙ্গে স্ত্রী, কাহারো সঙ্গে ছেলে, কাহারো সঙ্গে মেয়ে। আজ বেতন পাইবার দিন; এক সপ্তাহের রোজগার পাছে এক ঘণ্টায় উড়াইয়া দেয় এই ভয়ে আপনার লোকেরা আজ তাহাদের চোখে চোখে রাখিয়াছে।

যে সব ফটকের ভিতর হইতে পিপড়ার সারির মত লোক বাহির হইতেছে সিলা তাহারি একটার মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানকার রাস্তার কাদা তেলচিটার মত কালো, দুই পাশে লোহা লক্কড়।

সিলা যেখানটাতে গিয়া দাড়াইল সেটা আনাগোনার পথ, পথের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড রাবিশের স্তূপ। লোকের ভিড় আর কমে না, সিলাও পিছাইতে পিছাইতে ক্রমশঃ ঢিবির উপরে গিয়া দাড়াইল। ভিতরে এখনো অনেকে মাহিনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সিলা উঁচুতে দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে।

হঠাৎ নীচে হইতে কে বলিয়া উঠিল "কি গো ভালমানষের মেয়ে, বঁধুর খোজে নাকি?"

ঠিক এই সময়ে নিকোলার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় সিলা আগ্রহে হাতের ফর্দ্দ নাড়িয়া উহাকে ডাকিতে লাগিল, অসভ্য লোকটার কথায় কর্ণপাত করিল না।

নিকোলা বাহির হইয়া আসিল, সে এখনো হাত মুখ ধোয় নাই, কারখানার কালিতে তাহার সর্ব্বশরীর অপরিষ্কার।

"লোকটা সরে গেছে!"

"কে?"

"নাম তো জানিনে, চুলগুলো তামাটে, জামাটা নীল; বোধ হচ্চে গ্রনলানে থাকে; আমায় বলে, বঁধুর খোজে এসেছ।"

"বঁধূ দেখিয়ে দিই একবার হাতে পেলে, পিটিয়ে লম্বা করে দিই বাছাধনকে। ছিঁড়ে-পিজে ফেলি—পুরোণো কাছির মতন—ওর ওই তামাটে চুলগুলো; আল্‌কাৎরায় ডুবিয়ে নিলে দিব্যি মশাল হ'বে।"

নিকোলা কট্‌মট্ করিয়া চারিদিকে চাহিল, কিন্তু লোকটার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না।

হঠাৎ নিকোলার রাগ পড়িয়া গেল, সে সিলাকে বলিল "এখন? রুটির দোকানে?"

আজ তাহার হাতে সপ্তাহের রোজগার, সুতরাং রুটির দোকানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

নিকোলা খুব খাইল, খুব খাওয়াইল। বিশেষ, 'জ্যাম' দেওয়া একরকম দামী 'কেক' কিনিতে উহার অনেক পয়সা খরচ হইয়া গেল। সে যে পয়সায় এ সপ্তাহে দুইটা গেঞ্জি কিনিবে মনে করিয়াছিল তাহা আজ দুইজনে খাইতেই ফুরাইয়া গেল।

নিকোলা নিজে যে কেমন লায়েক ছোকরা হইয়া উঠিয়াছে তাহাও সিলার কাছে গল্প করিল। সে এ সপ্তাহে ছয়টা জাহাজী গজাল্ তৈয়ার করিয়াছে। শুধু পিটাইলেই হয় না; পিটাইতে হয়, তাতাইতে হয়, ঠিক মত সময়ে বাকাইতে হয়, তবে হয়। অন্য ছোকরারা কাস্তে, কোদাল আর গাড়ীর সাজ গড়িতে শিখিতেছে, নিকোলা তালা চাবির কাজ, না হয়, ঢালাইয়ের কাজ শিখিবে।

সিলা কিন্তু এসব কথায় তেমন কান দেয় নাই; গত রবিবারে বড় কারিগরের সঙ্গে নিকোলা যে বনভোজনে

গিয়াছিল তাহারই বর্ণনা শুনিতে সে উদ্গ্রীব। "খুব মজা হয়েছিল! না?" "হাঁ, হ'য়েছিল বৈ কি! খুব আমোদ, খুব খাওয়া দাওয়া। আণ্ডার্সবার্গ লোকটি খাসা; মাস খানেকের মধ্যেই দোকান ক'রে ফেলবে, বিয়েও করবে।"

"আচ্ছা তোমাদের সঙ্গে সে দিন আর যে মেয়েরা ছিল? তারা কেমন? সবারি কি বিয়ের ঠিকঠাক হয়েছে?"

"হুঁঃ!"

"অ্যাঁ?"

"আরে ছ্যাঃ!"

"কেন? কি হয়েছে? আমাকে বলবে না?"

"তাদের আবার বিয়ে! আজ এর সঙ্গে মিশছে কাল ওর সঙ্গে বেড়াচ্ছে। কোনো ভদ্র কারিগরের সঙ্গে এক ঘরে ঘর করবার মত তারা মোটেই নয়। আমি যখন কারিগর হব, সিলা, তোমার ফেরবার সময় হ'য়েছে না? চল ফেরা যাক্।"

"কই? কোথায় সময় হয়েছে? তুমি জ্যামের পুর দেওয়া আরেকখানা কেক কিনে নিয়ে এস, লক্ষ্মীটি,— এস নিয়ে!"

নিকোলা চট্ করিয়া আর একখানা 'কেক্' কিনিয়া আনিল। "যেতে যেতে খাওয়া যাবে, কি বল, সিলা? নইলে তোমারি দেরী হ'য়ে যাবে। আর তোমার মা যদি টের পান যে তুমি আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিলে তা' হ'লে আর রক্ষে থাক্‌বে না।"

"তাড়াতাড়ির কোনো দরকার নেই, সেল্‌ভিগের দোকান থেকে বাবার এখনো বেরুতে দেরী আছে" বলিয়া সিলা অপ্রস্তুত ভাবে ঢোক গিলিল। "মা যদি কিছু বলে তো বলব বাবার জন্যেই দেরি হ'য়েছে। তা' ছাড়া আজ শনিবার,—বল্‌ব দোকানে যে ভিড় ফর্দ্দ মিলিয়ে জিনিস কেনা দূরে থাক,—দোকানের কাছে ঘেঁসে কার সাধ্যি? এদিকে এখন যে রকম খাওয়া হ'ল এতে রাত্তিরে আর খেতে পারা যাবে না; মাকে বল্‌ব দোকানে ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ধরে ভারি অসুখ ক'চ্ছে, কিছু খেতে পারব না। যদি টের পায় তোমার কাছে এসেছিলুম তা হ'লে যা চট্‌বে! তুমি অমন গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?"

"দেখ দেখি, হক্‌-না-হক্ তোমাকে এই মিথ্যা কথা-গুলো কইতে হয়, প্রত্যহ কইতে হয়,—এর নাম শাসন! ওঁর সম্মুখে ভয়ে কারু সত্যি কথা কইবার জো নেই! ওঁর কাছে সত্যি কথা বলে' সেটা বজায় রাখ্‌তে হ'লে ঘুষির উপর ঘুষি চালাবার দরকার, নইলে আমার মতন মার খেয়ে মরতে হয় আর কি। আমার জন্যে ভয় করিনে, সে তো চুকে বুকে গেছে। কিন্তু তুমিও যে ভয়ে ভয়ে সত্যি কথা বল্‌তে সাহস পাও না, এ একেবারে অসহ্য। একটা বদ্ অভ্যাস জন্মে যাচ্ছে।"

সিলা হাসিয়া কথাটা হাল্কা করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু পারিল না। সে এ বিষয়ের আলোচনা ভালই বাসিত না, কারণ সে জানিত, নিকোলা যতই রাগ করুক, মিথ্যা না বলিলে সিলার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। মার সঙ্গে একটি দিনও বনিবে না।

"দেরি হ'য়ে যাচ্চে, নিকোলা। চল, ওকথা পরে হ'বে এখন।"

পকেটে হাত রাখিয়া হাত গরম করিতে গিয়া হঠাৎ সিলার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। সে দুই হাতে দুইটা পকেট হাৎড়াইল, এদিক ওদিক দেখিল, তাড়াতাড়ি বডিসের বোতাম খুলিয়া খুঁজিতে লাগিল।

"নিকোলা! আমার টাকা।" কাপড় ঝাড়া দিয়া পাগলের মত এদিক ওদিক চাহিয়া সিলা আবার বলিয়া উঠিল "আমার টাকা! দুখানা পাচ টাকার নোট আরো কী খুচরো জড়িয়ে বাবা আমার হাতে দিলেন, আমিও তখুনি পকেটে রেখেছি। কি হ'বে, নিকোলা? আমি কি করব?" সিলা কাঁদিয়া ফেলিল।

দু'জনে মিলিয়া কত খুঁজিল।

তাই ত! এতক্ষণ কাহারো খেয়াল হয় নাই! সিলা যখন রাবিশের স্তূপে দাঁড়াইয়া কাগজের ফর্দ্দ নাড়িয়া নিকোলাকে ডাকিতেছিল, নিশ্চয় তখনই টাকাটা পড়িয়াছে। ঐখানেই আছে, কোনো সন্দেহ নাই। কোনো ভয় নাই। তখন সবে চাঁদ উঠিয়াছে। ফিকা আলোয় আস্তিন্ গুটাইয়া নিকোলা অনেকক্ষণ খুঁজিল, তন্ন তন্ন করিয়া রাবিশ ঘাঁটিল। পুলের ধার পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আসিল, তবুও টাকা পাওয়া গেল না।

এদিকে রাত বাড়িতেছে। বাড়ীতে হয় তো সিলার খোঁজ পড়িয়াছে। সিলা আবার কাঁদিতে লাগিল।

নিকোলা ইহার পূর্ব্বে তাহাকে দুই একবার চুপ করিতে বলিয়াছিল, এবার কিন্তু সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "সিলা, চল, জন্মের শোধ আর একবার একসঙ্গে জ্যামের পুর দেওয়া কেক্ খেয়ে দুজনে মিলে জলে ঝাঁপ দিই। আর তা হ'লে কোনো ভয় থাকবে না।" প্রস্তাবটা তামাসাই হোক্ আর নাই হোক্ সিলা ও কথায় কান দিল না। সে একখানা প্রকাণ্ড কাঠের কুঁদোর উপর বসিয়া কাদিতে লাগিল।

সতেরো বছরের ছেলে নিকোলা সমস্ত সপ্তাহের কালিঝুল মাখিয়া বিমর্ষভাবে আকাশ পাতাল ভাবিতেছে। তাহার দৃষ্টি ছিল কাঠের কুঁদার একটা ছিদ্রে। চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল ছিদ্রটা অতবড় কাঠখানাকে অসার করিয়া ফোঁপরা করিয়া ফেলিয়াছে। সতেরো বছরের শিক্ষানবিশ ভাবনার কোনো কূলকিনারা পাইল না। সিলারও কোনো উপায় হইল না।

সিলা উঠিল। চুপড়িটি লইয়া নতমুখে গৃহাভিমুখে চলিল। যতদূর যাইতে সাহসে কুলাইল ততদূর পর্য্যন্ত নিকোলাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। সে সিলাকে অভয় দিতে চেষ্টা করিল, বলিল "ভয় কি? সত্যি তো আর মেরে ফেল্‌বে না।" সিলা চুপটি করিয়া চলিয়া গেল।

সিলা চলিয়া গেলে নিকোলা পুলের উপর দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ উহার দিকে চাহিয়া রহিল। সিলা চলিয়াছে, অবনত মুখে মন্থর গতিতে। একবারও থামিল না, একবারও ফিরিয়া দেখিল না।

অন্ধকারে নিকোলা হল্‌ম্যানের জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সিলা ফোঁপাইতেছে।

হল্‌ম্যান-গৃহিণীর প্রশ্নের ধমকে সিলা স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে, যে, সে নিকোলার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। আর যায় কোথা? তবে তো টাকা হারাইবেই; আধ-পেটা খাইয়া যাহার দিন কাটে সেই হতভাগার সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা করিতে গেলে টাকা হারাইবে না তো কি? পেটের মেয়ে যখন এত নিষেধ সত্ত্বেও কথা শোনে না, তখন তো এ সব ঘটিবেই। নইলে এত কষ্টের পয়সা কি কাৎলীর গরম জলের মত ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যায়? ছোঁড়া ঐ তকেই ছিল, সুবিধা বুঝিয়া হাতাইয়াছে আর কি।

সিলা বারম্বার বলিতে লাগিল যে নিকোলা উহার টাকা দেখেই নাই, তা লইবে কি? আর দেখিলেই বা কি? নিকোলা সিলার একটি পয়সাও ছুঁইবে না,—এ কথা সে জোর করিয়া বলিতে পারে। সিলার শেষ কথায় নিকোলার কপাল ভাঙ্গিল—হল্‌মান্ গৃহিণী পুলিশে খবর দেওয়াই শ্রেয় মনে করিলেন।

পরদিন সকালে কামারশালায় পুলিশ গিয়া হাজির। একটি অল্প বয়স্ক বালিকার নিকট হইতে টাকা ভুলাইয়া লওয়ার অপরাধে নিকোলাকে উহারা থানায় চালান করিয়া দিল।

উহারা চলিয়া গেলে বড় কারিগরদের মধ্যে তর্ক বাধিয়া গেল। অ্যাণ্ডার্সবার্গ নেহাইয়ের উপরে সজোরে হাতুড়ি হানিয়া বলিল "নিকোলা চুরি করেছে এ আমি বিশ্বাসই করিনে। ও নিশ্চয় খালাস পাবে।" অন্য মিস্ত্রিরা জোর করিয়া কিছুই বলিল না; তবে একটা নামজাদা কারখানায় পুলিশ বসানো—এ একেবারে অসহ্য। নিকোলা দোস্‌রা জায়গায় গিয়া কাজ শিখুক। এ ব্যাপারের পর উহাকে এখানে আর ঢুকিতে দেওয়া নয়।

পুলিশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে মানুষের যাহা হইয়া থাকে নিকোলারও হইল তাহাই; সে ভয়ে কেমন যেন জড়ভরত হইয়া গেল। সে নিজের নির্দ্দোষিতার কথা মনে করিয়া বলসঞ্চয়ের চেষ্টা পাইল, কিন্তু সে বল টিঁকিল না। নিকোলার অন্তরে আত্মমর্য্যাদার ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি ইতিপূর্ব্বে হলম্যান গৃহিণী এতবার এবং এমনি করিয়াই পদদলিত করিয়াছেন যে সেটি আর তেমন বাড়িতে পায় নাই; সুতরাং আজ যে উহা নিকোলাকে ছায়াদান করিবে তাহা দুরাশা মাত্র।

এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে নিকোলা হঠাৎ পুলিশের হাত হইতে পলাইয়া বাঁচিবার আশায় একবার একটা ঝট্‌কা দিল। পলাইতে তো পারিলই না, লাভের মধ্যে আরো দুইজন পাহারাওয়ালা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া লইয়া চলিল।

থানায় গিয়া সে কোনো প্রশ্নেরই ভাল করিয়া জবাব

দিল না। সিলা? শনিবারে সে সিলা টিলা কাহারও সঙ্গে বেড়াইতে যায় নাই। নিকোলা এ ব্যাপারের সঙ্গে সিলার নাম জড়াইতে চাহে নাই, কিন্তু শেষে যখন স্বয়ং সিলাকে তাহার সম্মুখে হাজির করা হইল এবং সিলা যে তাহাদের গুপ্ত সাক্ষাতের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে তাহাও নিকোলা শুনিল, তখন সে অগত্যা সিলার সঙ্গে কেকের দোকানে যাওয়ার কথা পুলিশের কাছে একরার করিল।

সিলার সেই এক কথা, নিকোলা টাকা লয় নাই। এদিকে, নিকোলা যাহাদের সঙ্গে একত্র বাসা করিয়া থাকিত তাহারা সকলেই এক বাক্যে বলিল যে শনিবারে সে রাত্রি করিয়াই ফিরিয়াছিল এবং রবিবারে ভোরে উঠিয়াই আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।

নিকোলা বলিল "ওই হারানো টাকারই খোঁজে আমি বাহির হইয়াছিলাম।" কিন্তু আসামীর কথা পুলিশের লোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করিল না।

"এই বয়সেই ছোঁড়া একেবারে এ কাজে পেকে উঠেছে" নিকোলার 'দুধ-মা' হলম্যান-গৃহিণী এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

নিকোলা নিশ্চল, মুখ অবনত, মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছে। দারোগাসাহেব পাকা জহরীর মত উহাকে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গেই লক্ষ্য করিতেছিলেন; নিকোলার কপালের ডাহিন দিকে চুলের 'মোড়', উহার তীক্ষ্ণ চোখ, চকিত দৃষ্টি, চওড়া চোয়াল কিছুই এড়াইয়া যায় নাই। দারোগাসাহেব মনে মনে বলিলেন "ছোকরা পুলিশকে অনেক বার ভোগাবে দেখছি।" রেকর্ডে লেখাইলেন "অন্যান্য দুষ্ট লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিবার সম্ভাবনা থাকা বিধায় এবং পুলিশের হাত ছিনাইয়া পলাইবার চেষ্টা করা বিধায় আসামীকে হাজত বাসের হুকুম দেওয়া হইল।"

নিকোলার ঘর্ম্মাক্ত ললাটে আবার কুঞ্চন প্রসারণ চলিতে লাগিল। হায়, গরীবের আর নিস্তার নাই, একবার পদস্খলন হইয়াছে কি না হইয়াছে অমনি বেচারা ধরা পড়িয়াছে; কাহার কোথায় একটা টাকা হারাইল, অমনি গরীব গেল হাজতে।

তার পরদিন হাকিমের এজলাসে প্রমাণাভাবে নিকোলা অগত্যা খালাস পাইল।

হাজতের বাহিরে আসিয়া তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল যেন রাস্তার সকল লোকের দৃষ্টি আজ তাহারই দিকে। নিকোলার পা টলিতে লাগিল।

বাসায় ফিরিয়া দেখিল তাহার সমস্ত জিনিস পত্র দেউড়িতে পড়িয়া আছে। বাসার ঝি আসিয়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার হাতে একখানি কাগজ দিল; নিকোলা পড়িল "তোমার ঘরে অন্য ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। জিনিষপত্র উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাও।"

কেন যে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে সে বিষয়ে নিকোলা কোনো প্রশ্নই করিল না। তাহার সঙ্গে যে কেহ কথা কহিল না ইহাতেই সে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিল।

এদিকে আবার কারখানায় যাইতে হইবে; সর্দ্দারের কাছে, মিস্ত্রিদের কাছে আবার মুখ দেখাইতে হইবে,... নিকোলা লজ্জায়, সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছিল। না জানি অ্যাণ্ডার্সবার্গ কি মনে করিতেছে।

নিকোলা ফিরিয়াছিল আর কি; কিন্তু ফিরিলে চলে কই। নিকোলা আবার বুক বাঁধিল, সোজা হইয়া শিস্ দিতে দিতে কারখানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হঠাৎ মোড় ফিরিয়া কারখানার ভুসো মাখা রেলিঙে নজর পড়িতেই নিকোলার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইয়া পড়িল।

কামারশালায় ঢুকিয়াই সে কোনো দিকে না চাহিয়া ঝোড়ায় করিয়া কয়লা তুলিতে লাগিল। এখানেও কেহ তাহার সঙ্গে কথা কহিল না।

অ্যাণ্ডার্স্‌বার্গ ঠিক সেই সময়ে আর একজন মিস্ত্রির সঙ্গে মিলিয়া একখানা প্রকাণ্ড তপ্ত লোহা পিটাইতেছিল। সে হাতের কাজ সারিয়া খানিক পরে নিকোলার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পিঠ চাপড়াইয়া বলিল "আমি জানতুম ঠিক খালাস পেয়ে যাবে; এই নাও, এই চাবী তিনটেতে উখো লাগাও দেখি।"

নিকোলা কাজ পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; অ্যাণ্ডার্স্‌বার্গের হৃদ্যতায় সে আবার আগেকার মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; ঠিক তেমনি আদর, তেমনি খাতির।

নিকোলা কাজে লাগিয়া গেল ; কামারের কাজে যে এত গৌরব এত আনন্দ তাহা নিকোলা পূর্ব্বে জানিত না। সে মোটা উখা রাখিয়া দিয়া একেবারে সরু উখা লইয়াই কাজ সুরু করিয়া দিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কেঠো ফটকের নিরেট চাবিটা দেরাজের দামী চাবির মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। নিকোলার উখার শব্দ হাতুড়ির শব্দকে আজ ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

নিকোলার ঠিক পাশেই একজন মিস্ত্রি মাথাওয়ালা পেরেক তৈয়ার করিতেছিল, উহার হাপরে ছিল একজন ছোকরা। উহারা দুইজনে মিলিয়া আজ খুব হাসি গল্প চালাইয়াছে। প্রথমে নিকোলা সে দিকে কান দেয় নাই, কাজেই ব্যস্ত ছিল; হঠাৎ মাথা তুলিয়া নিকোলা দেখিল ছোকরাটা নিকোলাকে লক্ষ্য করিয়া মুখভঙ্গী করিতেছে; নিকোলার চোখ কান অমনি সজাগ হইয়া উঠিল। সে বুঝিল যে সে নিজেই উহাদের আলোচনার বিষয়।

জান্ পিটার এক একবার হাপরের কাছে আসিয়া এ কি বলিতেছে এবং ও কি ঠাওরাইতেছে তাহার খবর দিয়া যাইতেছে। এখন নিকোলা মোটামুটি সবই শুনিতেছে।

চিড়িয়াখানার পশু যেমন সকলের কৌতুকের বিষয় নিকোলা আজ তেমনি—না, তাহারও অধম সে গাঁটকাটা, —অন্ততঃ তাহার সঙ্গীরা ইহাই ঠাওরাইয়াছে। এখন হইতে উহারা কেহই যে আর নিকোলাকে এক বাসায় জায়গা দিবে না, এ কথা নিকোলা স্পষ্ট বুঝিল। নিকোলার মনে হইতে লাগিল যেন উহারা সকলে মিলিয়া নিকোলাকে হাতুড়ি দিয়া পিটাইতেছে, উখা দিয়া ঘসিতেছে। উহাদের হাসিতে বিদ্রূপ, চাহনিতে অবজ্ঞা। নিকোলা সব বুঝিয়াছে।

যে লোকটা পেরেক গড়িতেছিল সে হঠাৎ হাপরের ছোক্‌রাটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল "জানিস্ রে, ম্যাথিয়াস্! কামারের কাজ কষ্টের কাজ; এর চেয়ে একটা খুব সোজা কাজ আছে, রোজগারও খুব—তারে বলে পাঁচ আঙ্গুলের প্যাঁচ ; সেইটে শিখে নে, বুঝিচিস্?"

"হিঃ—হিঃ হিঃ" ছোকারাটা হাসিয়া উঠিল।

"আর তা যদি না পারিস্ তো ঘাগ্‌রার পকেট মারার মত চিম্‌টে গড়াতে শেখ্; সহরের যত মেয়ের পকেট মারবি, কেমন?"

লোকটার সঙ্গে নিকোলার চোখোচোখি হইল; লোকটা বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে; দেখিয়া নিকোলা রাগে আগুন হইয়া উঠিল। তাহার মাথা গোলমাল হইয়া গেল, নিকোলা ঝাপসা দেখিতে লাগিল।

লোকটা পেরেক লইয়া নিকোলার পাশ দিয়াই আনাগোনা করিতেছিল। এবার সে যেমনি যাইবে অমনি নিকোলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রকাণ্ড একটা উখার ঘায়ে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। পেরেকগুলা ছড়াইয়া পড়িল।

বিস্মিত কারিগরেরা মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে নিকোলা একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলিয়া লইয়াছে। সে একধার হইতে সকলকে শোয়াইয়া দিবে, তাহার নামে যাহারা মিথ্যা বদ্‌নাম দিতে সাহস করে তাহাদের সকলকেই সে একবার দেখিয়া লইবে।

কিন্তু কামারের দল তাহাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার মোটেই অবসর দিল না। একজন পিছন হইতে উহার হাতুড়িটা কাড়িয়া লইল, তারপর প্রহার। প্রহারের চোটে নিকোলা সর্ষে ফুল দেখিতে লাগিল। মার, মার, মার, দল বাঁধিয়া মার, হাত বাড়াইয়া মার, হুমড়ি খাইয়া মার। এত বড় আস্পর্দ্ধা হাতিয়ার তোলে, এখনই উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হোক।

কোটের কাপড়ের সঙ্গে গায়ের মাংস সুদ্ধ মোচড়াইয়া ধরিয়া নিকোলাকে কারখানার বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। ফেলিয়া দিল অ্যাণ্ডারস্‌বার্গ, নহিলে বেচারা মারের ধমকে সেইখানেই মরিয়া যাইত।

কারখানার সঙ্গে নিকোলার সম্বন্ধ ফুরাইল।

সেদিন আর নিকোলা বাসা খুঁজিল না। তাহার চেহারা এবং পোষাকের দুর্দ্দশা দেখিলে তাহাকে এ অবস্থায় জায়গাও কেহ দিত কি না সন্দেহ। তাহার উপর, কারখানায় সে যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে ইহার পর কাহারো কাছে মুখ দেখাইতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিকোলা নিঃশব্দে বান্ হাউসের চত্বরে ঢুকিয়া

পূর্ব্বের মত তেরপল মুড়ি দিয়া জীবনের আরেকটা রাত্রি-যাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইল।

সে রাত্রে কিন্তু, পূর্ব্বের মত সহজে ঘুম আসিল না। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে, আর প্রশান্ত, অবমানিত, নিরাশ্রয়, নির্দ্দোষ নিকোলা, তেরপলে শুইয়া মনে মনে আওড়াইতেছে—

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বামুন ঠাকুর

[১]

শালগ্রাম শিলা তাকে তুলে', দিছি
তোমারে 'ঠাকুর' আখ্যা,
রান্নার নুনে মুখ পুড়ে' যায়,
তবু করি তব ব্যাখ্যা।
ব্রহ্মময় তুমি বুঝেছ জগৎ—
নাহি বোধ শুচি অশুচি!—
তবু ত কখনো তোমার রান্না
খাইতে করিনে অরুচি!

(কোরস)

শুধু, খুসী আছি দেখে জাতীয় পতাকা
গলে ঐ কালো সূত্র;
(আর) শুনে পরিচয়—"ফুলের মুখটী
ছোট ঠাকুরের পুত্র!"

[২]

চাল ডাল আলু আনিতেই নাই;
তবু তুমি মোর ভাণ্ডারী!
জীবন-ধারণ ভোজন-সাগরে
তুমিই পারের কাণ্ডারী!
দুধ খেতে' বসে' শুধু খাই জল,
—শুনি গোয়ালার কুচ্ছ!
মাছের মুড়াটা বিড়ালেই খায়,
আমি খাই তার পুচ্ছ!

(কোরস্)

(তবু) খুসী আছি দেখে জাতীয় পতাকা
গলে ঐ কালো সূত্র;
(আর) শুনে পরিচয়—"ফুলের মুখটী
ছোট ঠাকুরের পুত্র!"

[৩]

মাজোনা দন্ত কাচোনা বস্ত্র
বমি আসে গা'র গন্ধে!
ডালে ভাতে পড়ে দেহের ঘর্ম্ম,
তবু গিলি স্বচ্ছন্দে!
ছ মাসের এঁটো হাঁড়ীর ভিতরে
নেচে মৌরসী পাট্টা!
খাই বা না খাই গণে দিই পায়ে
মাসে মাসে টাকা আট্টা।

(কোরস্)

(শুধু) খুসী আছি দেখে জাতীয় পতাকা
গলে ঐ কালো সূত্র;
(আর) শুনে পরিচয়—"ফুলের মুখটী
ছোট ঠাকুরের পুত্র!"

[৪]

সোডা ও এসিড্ শিশি শিশি ঢালি,
তবু হয় ভারি অম্বল,
তথাপি তোমার মধুর রান্না
জীবনে মরণে সম্বল!
কইনে কথাটী তুলিনে মাথাটা
যদি দাও কান মলিয়া,
তোমার বাজার এমনি গরম
তব যেতে চাও চলিয়া!

(কোরস্)

(তাই) খুসী আছি দেখে জাতীয় পতাকা
গলে ঐ কালো সূত্র;
(আর) শুনে পরিচয়—"ফুলের মুখটী
ছোট ঠাকুরের পুত্র!"

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

আলোচনা

[কোনো বিষয়ের আলোচনা যে মাসে মূল বিষয় প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, ঠিক তাহার পরবর্ত্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত না হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। আলোচনার পর মূল বিষয়ের লেখকের উত্তর প্রস্তুত হইলে, আর সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা চলিতে পারিবে না। লেখকগণ আলোচনা যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবেন; দীর্ঘ আলোচনা ছাপা আমাদের পক্ষে দুষ্কর। —প্রবাসী সম্পাদক।]

"ষ্টুডেণ্ট্‌স্ ফণ্ড্"

শ্রাবণের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্যের নিমিত্ত সমিতি স্থাপনের প্রস্তাবনা প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি যে উক্ত উদ্দেশ্যে স্থাপিত সমিতি কলিকাতায় বর্ত্তমান আছে, এবং দরিদ্র ছাত্রবৃন্দ তাহা হইতে যথাসাধ্য সাহায্যও পাইয়া থাকে। উহা কলিকাতা য়ুনিভর্সিটি ইন্‌স্‌টিটিউট-এর তত্ত্বাবধানে "Student's Fund" নামে পরিচালিত। উক্ত ইন্‌স্‌টিটিউটের সুযোগ্য সম্পাদক, স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ি, বি-এ, ইহার সম্পাদক। একটি ছাত্রসভা ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির (Executive Committee) কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই সমিতির সভ্যগণ প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে ইন্‌সটিটিউট-এর পরিচালকগণ এবং সাধারণ ছাত্র সভ্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। মাসিক চাঁদা, এককালীন দান, পুরাতন পুস্তক প্রদান, প্রভৃতির দ্বারা বহুসংখ্যক ছাত্র ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর ইহার সাহায্যের নিমিত্ত অভিনয় হয় (Charitable Performance) —তাহাতেও টিকিট বিক্রয় করিয়া ৩০০।৪০০ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে ছাত্রগণ ব্যতীত জনসাধারণের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। সমিতিও সেজন্য ছাত্রগণকে আশানুরূপ সাহায্য করিতেও পারেন না।

আগামী অগাষ্ট মাসে রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার কথা, আশা করা যায় যে আগামী আশ্বিনের প্রবাসীতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত করিতে পারিব।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

সিন্ধুর প্রেম।

কোন যুগে দেবাসুরে করিয়া মন্থন,
অন্তর-অমৃত-লক্ষ্মী নিয়েছে কাড়িয়া;
কম্পনে ঝম্পনে তাই বুকের ক্রন্দন
আছাড়ি' বিছাড়ি' পড়ে রণিয়া ধ্বনিয়া।
শান্তি নাই—শুধু শ্রান্তি,—আবেগ স্পন্দন
মুহূর্ত্তে টানিয়া আনে সৈকতের পানে,
অবশেষে রিক্ত বক্ষ, দৃপ্ত আলিঙ্গন,
গর্জ্জিয়া ফিরিয়া ছুটে নীলাম্বু-শয়ানে।
ক্ষুধাতুর ক্ষিপ্ত হিয়া যেখানে যা পায়
আগ্রহে আঁকড়ি ধরে আপনার বুকে;
শেষে দেখে এ নহে ত সে যাহারে চায়,
ধিক্কারে ফেলিয়া যায় সৈকত সমুখে।
হৃদলক্ষ্মী হীন সিন্ধু বক্ষে অবিরল,
বহিছে প্রিয়ার শোক বাড়ব অনল।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

নবীন-সন্ন্যাসী

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস-দগ্ধ।

ষ্টীমার যখন হুগলিতে পৌঁছিল, তখন বেলা এগারোটা। গোপীকান্ত বাবু ও সন্ন্যাসী ঠাকুর ঘাটে অবতরণ করিলেন।

গোপীকান্ত বাবু বলিলেন "ঠাকুর কি এখন শিষ্যবাড়ী যাবেন?—তা যদি না হয় তবে সোজাসুজি ষ্টেশনে গেলে একটার প্যাসেঞ্জার ধরা যেত।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"তারা তারা—তারা। একটার প্যাসেঞ্জার? একটার প্যাসেঞ্জারে কেমন করে যাওয়া হতে পারে? এখনও ঠাকুর সেবা হল না। রন্ধনাদি করা আবশ্যক। তার উপযুক্ত স্থানও ত এখানে দেখ্‌ছিনে।"

গোপী বাবু বলিলেন—"তবে ঠাকুর শিষ্যবাড়ী গমন করুন। ঠাকুর সেবা প্রভৃতি সেরে আসবেন, না হয় সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাওয়া যাবে।"

"আর তুমি?"

"আমি এইখানে স্নানটা করে নিয়ে, ময়রার দোকানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করব। বৈকালে আপনি ষ্টেশনে যাবেন, সেইখানেই আমি থাকব।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ যুক্তিসঙ্গত নহে,—বিশেষ যখন ভক্তটি অর্থশালী। তাঁহার স্থানীয় শিষ্যটিও অর্থশালী বটে—কিন্তু বড় কৃপণ। সেখানে টাকাটা সিকিটার লোভে গিয়া শেষে কি এমন শিকারটা হাতছাড়া হইয়া যাইবে?

তাই ঠাকুর বলিলেন—"না না, সে কি হয়? তুমিও আমার সঙ্গে চল। আমার শিষ্যটি অতি সজ্জন ব্যক্তি। আমার সঙ্গে গেলে তোমার যথেষ্ট আদর করবে।"

গোপীকান্ত বাবুর ইচ্ছা নয় যে তিনি কোনও ভদ্র লোকের বাড়ীতে গিয়া উঠেন। সেখানে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, কে চিনিয়া ফেলিবে, তাহার স্থিরতা কি? আর কোন ওজর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন—"আমাকে সে আজ্ঞা করবেন না। আমি পরান্ন গ্রহণ করিনে।"

"তাতে দোষ কি? শাস্ত্রে আছে, প্রবাসে নিয়মং নাস্তি।"

"আজ্ঞে না—এইখানেই লুচি সন্দেশ খেয়ে নেব এখন।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন—"বাসি লুচি সন্দেশ খেয়ে কেন কষ্ট করবে? দিন সময়ও ভাল নয়! বাসি লুচিং চ সন্দেশং অয়োদশারঞ্চ কারয়েৎ।"

কিন্তু গোপীকান্ত বাবু তথাপি সম্মত হন না। অবশেষে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন—"তবে থাক্—আমারও যাওয়া হল না। এইখানেই কোথাও পাকাদির বন্দোবস্ত করা যাক্। নিজেরা না হয় একবেলা আহার নাই করতাম, কিন্তু সঙ্গে বিগ্রহ রয়েছেন, তাঁকে ত উপবাসী রাখতে পারিনে! এখন একটু স্থান কোথায় পাওয়া যায়?"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একজন বৃদ্ধ, গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া, সিক্তবস্ত্রে সেই খানে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের শেষ কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"ঠাকুর, প্রণাম হই। যদি দয়া করেন, এ অধমের কুটীরে আসুন, আমি আপনাদের পাকাদির জন্য উত্তম স্থান দিতে পারি।"

সন্ন্যাসী প্রসন্ন দৃষ্টিতে বলিলেন—"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীমাধবচন্দ্র দাস ঘোষ।"

"কোথায় থাকেন?"

"অতি নিকটেই। ঐ গঙ্গাতীরে আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

"কি করেন?"

"আজ্ঞে—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এখানে ওকালতীর ব্যবসায় করে।"

"আপনার ছেলে উকীল?—বেশ বেশ। কি বল হে?"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গোপী বাবুর পানে চাহিলেন।

গোপী বাবু বলিলেন "তা, উনি যখন স্থান দিতে চাচ্চেন—ভালই হল।"

বৃদ্ধটি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়ের নাম কি?"

"শ্রীরাধামোহন গোস্বামী।"

"ব্রাহ্মণ? প্রণাম হই। আজ আমার বড় সৌভাগ্য। আসতে আজ্ঞে হোক্।"

গোপী বাবু বলিলেন—"স্নানটা এইখান থেকেই সেরে যাই। আপনি ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? আপনি অগ্রসর হোন। বাড়ী ত দেখা যাচ্ছে—স্নান করে আমরা আসছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন "উত্তম কথা। আমি ততক্ষণ ওদিককার সব যোগাড় যন্ত্র করে রাখিগে।"—বলিয়া হাতযোড় করিয়া বলিলেন "আসবেন তা হলে। আশা দিয়ে নৈরাশ করবেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "আমরা স্নান করেই আসছি।"

বৃদ্ধ তখন ক্ষিপ্রপদে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

গোপী বাবু বলিলেন "ঠাকুর, আপনি প্রথমে স্নান করে নিন আমি জিনিষ আগলাই।"

"বেশ" বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর স্নানে নামিলেন।

গোপী বাবু তখন গঙ্গার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, চামড়ার ব্যাগটি খুলিয়া, রুমালে বাঁধা একতাড়া নোট বাহির করিয়া লইলেন। তাড়াটি নিজের পেট কাপড়ে বাঁধিয়া, জামার পকেট হইতে খুচরা টাকা কড়ি প্রভৃতি ব্যাগের মধ্যে ফেলিয়া একখানি ধৌত বস্ত্র বাহির করিয়া লইলেন। স্নান করিতে করিতে সন্ন্যাসী ঠাকুর এসমস্ত ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছিলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর স্নান করিয়া উঠিলে, গোপী বাবু জলে নামিলেন। স্নানান্তে উঠিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, সিক্ত বস্ত্র হইতে বাণ্ডিলটি কৌশলে খুলিয়া আবার ব্যাগে নিক্ষেপ করিলেন! এটুকুও সন্ন্যাসী ঠাকুরের দৃষ্টি এড়াইল না।

তখন দুইজনে মাধব বাবুর গৃহ লক্ষ্য করিয়া পদচালনা করিলেন। মাধব বাবু বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া-

ছিলেন—বারান্দার প্রান্তে দুইখানি জলচৌকি রাখা ছিল। আদর অভ্যর্থনা করিয়া তিনি অভ্যাগতদ্বয়কে সেই জলচৌকিতে বসাইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদ স্বয়ং ধৌত করাইয়া দিলেন। একজন ভৃত্য গোপীকান্ত বাবুর পদ ধৌত করিয়া দিল।

বৈঠকখানার পশ্চাতের বারান্দায় একখানি কম্বল বিছান ছিল। এক কোণে নূতন ইষ্টক সাজাইয়া চুল্লী প্রস্তুত করা রহিয়াছে। কাষ্ঠ, নূতন হাঁড়ি, মালসা, একটা পিতলের ঘড়ায় গঙ্গাজল প্রভৃতিও সজ্জিত ছিল। বাটীর ব্রাহ্মণ ঠাকুর দুইটা বৃহৎ থালা করিয়া সিধা আনিয়া উপস্থিত করিল।

গোপী বাবু বলিলেন "আবার এ সব কেন? বাজার ত নিকটেই—আমি সব কিনে কেটে আনছি।"

মাধব বাবু বলিলেন—"তাও কি হয়? যখন দয়া করে এ অধমের কুটীরে আতিথ্য স্বীকার করেছেন নিজের খরচ করে খাবেন তা কি হতে পারে?"

গোপী বাবু বলিলেন—"আপনি আমাদের স্থান দিয়েই যথেষ্ট উপকার করেছেন আপনাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিনে। সঙ্গে টাকা কড়ি রয়েছে যাই বাজারে গিয়ে আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র কিনে একটা ঝাঁকা মুটে করে নিয়ে আসি।" বলিয়া গোপীকান্ত ব্যাগটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন—"না না এমন আজ্ঞা করবেন না। আমার অনেক পুণ্য ছিল, তাই ঠাকুরের মত সাধুপুরুষ আর আপনার মত একজন সদ্‌ব্রাহ্মণের পদধূলি আমার বাড়ীতে পড়েছে। যদি এ গরীবের সেবা গ্রহণ না করেন তা হলে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হব।" বলিয়া বৃদ্ধ হাত দুইটি যোড় করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন "ওহে রাধামোহন আর আপত্তি কোরো না। শাস্ত্রে আছে মনঃক্ষুণ্ণং ন কর্ত্তব্যো ভক্তেষু সেবকেষু চ। ভক্ত আর সেবকের মনঃক্ষুণ্ণ করতে নেই। আর, উনি ত আমাদের দিচ্ছেন না—উনি দিচ্ছেন আমার ইষ্টদেবতাকে। তাঁর ভোগ হবে—তারপর সেই প্রসাদ আমরা পাব।"

গোপীকান্ত বাবু আর আপত্তি করিলেন না। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বহস্তে ভোগ রাঁধিলেন। ঠাকুর সেবা হইলে, উভয়ে প্রসাদ পাইলেন। মাধব বাবু তখন উভয়ের জন্য বৈঠকখানায় চৌকির উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, ইঁহাদের অনুমতি লইয়া আহার ও বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সন্ন্যাসী শয্যায় বসিয়া বলিলেন "তারা মার কি অনুগ্রহ! যেখানে যাই কোন কষ্ট হয় না। ভাবছিলাম, পথে আজ আহার যোটে কি না যোটে, তা মা ভাল রকমই জুটিয়ে দিলেন। একছিলিম সাজ।"

গোপী বাবু গাঁজা সাজিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে দিলেন। পরে নিজেও প্রসাদ পাইয়া, শয়ন করিলেন। পথশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন। ঘুমে তাঁহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—"তারা তারা—তারা। আজ একটার প্যাসেঞ্জারে গেলে বড়ই কষ্ট পেতে হত। দেওঘর অতি সুন্দর স্থান পবিত্র স্থান। দেবগৃহ—দেবতাদের আবাস। বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে প্রবেশ করলে সেখান থেকে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। তারা—তারা—তারা। আচ্ছা রাধামোহন, সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জারে উঠলে কটার সময় আমরা সেখানে পৌঁছব?"

কোনও উত্তর নাই।

"রাধামোহন—ও রাধামোহন!"

"রাধামোহন" তখন নাসিকাধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। ক্রমে গোপীকান্ত বাবুর নাসিকাধ্বনি গভীরতর হইল। তানলয়ের সহিত যেন বাদ্য বাজিতেছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তখন উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কেহ কোথাও নাই। ভৃত্যেরাও নিদ্রিত। ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার ঝুলির ভিতর হইতে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া, গোপীকান্ত বাবুর ব্যাগটি প্রান্ত হইতে প্রান্ত অবধি নিমেষের মধ্যে চিরিয়া ফেলিলেন। ভিজা রুমালে বাঁধা তাড়াটি এবং খুচরা টাকা পয়সা যাহা কিছু ছিল—সমস্তই বাহির করিয়া নিজের ঝুলির মধ্যে

ভরিলেন। ব্যাগের কাটা দিকটা দেয়ালের দিকে গোপন করিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাহির হইয়া গেলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অতিথি দেবতা।

বেলা চারিটার পর উকীল বাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক নিদ্রা যাইতেছেন। উকীল বাবুর পিতাও সেই সময় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। উকীল বাবুর নাম দেবেন্দ্রনাথ—পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কে?"

"একটি ব্রাহ্মণ—অতিথি।"

"কোথা থেকে এলেন?"

"যশোর জেলায় বাড়ী। ইনি আর একজন সন্ন্যাসী—দুজনে ষ্টীমার থেকে নেমেছিলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথা গেলেন, কৈ দেখতে পাচ্ছিনে ত?"

ইঁহাদের কথোপকথনের শব্দে গোপীকান্ত বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া, উকীল বাবুটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

"কি রাধামোহন বাবু, নিদ্রাভঙ্গ হল?"—বলিয়া বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

"আজ্ঞা হ্যাঁ"—বলিয়া গোপীকান্ত বাবু উঠিয়া বসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, যুগ্মকর ললাটে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসী ঠাকুর কৈ?"

গোপীকান্ত বাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথা গেলেন? এইখানেই ত শুয়ে ছিলেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন "তাইত! ঠাকুর কোথায় গেলেন? কোথাও বেরিয়েছেন বোধ হয়।"

"আমাদের যে সন্ধ্যার গাড়ীতে যেতে হবে। কটা বাজল?"—বলিয়া ঘড়ি দেখিবার জন্য ব্যাগটি সরাইয়া লইলেন।

ব্যাগ কাটা দেখিয়া গোপীকান্ত বাবু চমকিয়া বলিলেন—"এ কি!—আমার ব্যাগ কাটলে কে?"

বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্র ঝুঁকিয়া ব্যাগটি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারাও বলিয়া উঠিলেন—"তাই ত!—এ কি হল?"

গোপী বাবু তৎক্ষণাৎ ব্যাগ হইতে সমস্ত দ্রব্য টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। কাপড়, জামা, গেঞ্জি, তোয়ালে দুই হস্তে পাগলের মত ঝাড়া দিয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

"কি গেছে?"

"যা কিছু ছিল—যথাসর্ব্বস্ব।"

উকীল বাবু বলিলেন—"কি ছিল?"

"নোট ছিল। খুচরা কিছু ছিল।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"কত টাকার নোট?"

"ছিল যৎসামান্য। তীর্থ করতে বেরিয়েছিলাম—খুব তীর্থ হল। একটা এমন পয়সা নেই যে একখানা পোষ্টকার্ড কিনে বাড়ীতে চিঠি লিখে টাকা আনাই।"

সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন "সে সন্ন্যাসীটি কে?"

"তা ত জানিনে মশাই। ষ্টীমারেই তার সঙ্গে দেখা। সেও বল্লে আমি নানা তীর্থে ভ্রমণ করব। মনে করলাম আমি নতুন মানুষ কখনও বেরুইনি—লোকটাও সাধু পুরুষ তাই সঙ্গ নিয়েছিলাম। সেই কি শেষে আমায় এ বিপদে ফেল্লে?"

উকীল বাবু বলিলেন—"নিশ্চয় তারই কায।"

বৃদ্ধের তাহা বিশ্বাস হইল না। বলিলেন—"না না তিনি কখনও নেন নি। তিনি বোধ হয় কাছেই কোথাও বেড়াতে টেড়াতে গিয়েছেন এখনি আসবেন। ঘর খোলা দেখে কোনও চোর এসে এ কাজ করেছে।"—বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের অন্বেষণে বাহিরে গেলেন।

উকীল বাবু বলিলেন—"বাবা যাই বলুন—সেই সন্ন্যাসীরই এ কায। বাবা যেমন ভালমানুষ—মাথায় জটা পরণে গেরুয়া কাপড় দেখলেই তাকে একজন সিদ্ধ পুরুষ বলে ঠাউরে নেন। সন্ন্যাসীর কোনও জিনিষ ত এখানে দেখছিনে।"

"তার একটা মস্ত ঝুলি ছিল, একখানা বাঘছাল ছিল, একটা চিমটে ছিল, কমণ্ডলু ছিল। যদি কাছে কোথাও বেড়াতে যেত ত সেগুলোও সঙ্গে নিয়ে যেতনা। সট্‌কেছে।"—বলিয়া গোপী বাবু মাথায় হাত বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উকীল বাবু বলিলেন—"তা

আপনি অত ভাবছেন কেন? বাড়ীতে চিঠি লিখে টাকা আনিয়ে নিন—যত দিন টাকা না আসে ততদিন এইখানে স্বচ্ছন্দে থাকুন। আমি আপনাকে খাম পোষ্টকার্ড সব দিচ্ছি।”

গোপী বাবু কোন কথাই কহিলেন না। উকীল বাবু বলিলেন—“পুলিসেও একটা খবর দেওয়া উচিত। নম্বরী নোট ছিল কি?”

“আজ্ঞা না। দশ দশ টাকার নোট ছিল মাত্র। যা হবার তা ত হল। এখন থানা পুলিসে খবর দিলে মহা ফেসাদে পড়ে যাব।”

ইতিমধ্যে বৃদ্ধও ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—“কৈ—সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ত কোথাও দেখতে পেলাম না।”

পুত্র বলিলেন—“তিনি এতক্ষণ অনেক দূরে।”

বৃদ্ধ বলিলেন—“আসবেন বোধ হয়। কোনও মন্দিরে দর্শন করতে গিয়ে থাকবেন।”

“না বাবা—দর্শন করতে যান নি। দর্শন করতে গেলে তাঁর ঝুলি চিমটে বাঘছাল সব নিয়ে যাবেন কেন?”

বৃদ্ধ তখন আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

সে রাত্রি গোপীকান্ত বাবু সেইখানেই যাপন করিলেন। পরদিন উকীল বাবুকে বলিলেন—“আমার এই ঘড়িটের দাম ৫০৲ এটা বন্ধক রেখে আমায় গোটা দশেক টাকা ধার দিন। আপনারা আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন। কতদিনে আমার বাড়ী থেকে টাকা আসবে—ততদিন পর্য্যন্ত এখানে থেকে, আপনাদের ওপর জুলুম করা আমার উচিত হবে না।”

উকীল বাবু ও তাঁহার পিতা এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। বলিলেন—“একজন বিপন্ন ব্রাহ্মণকে যদি আমরা দুদিন দু মুঠো খেতে দিতেই না পারলাম, তবে আমাদের সংসার ধর্ম্ম করে ফল কি?—আপনার হাত খরচের জন্যে যা দরকার দিচ্ছি—এইখানেই থাকুন। আপনার টাকা এলে তখন পরিশোধ করে দেবেন।”

ইহাঁদের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে গোপীকান্ত বাবু অগত্যা সম্মত হইলেন। সেই দিনই গদাই পালকে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন।—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুক্ত গদাধরচন্দ্র পাল পত্রদ্বারায় আমার বহু বহু আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি এখানে অবস্থান করিতেছি। আমার ব্যাগ হইতে টাকা কড়ি সমস্তই চুরি হইয়া যাওয়ায় বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছি। সত্বর তহবিল হইতে একশত টাকা মনিঅর্ডার যোগে আমার নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে। ওখানকার সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্যও ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি। সুতরাং ফেরৎ ডাকে উত্তর দিতে ভুলিবে না। অত্র কুশল। তোমাদের মঙ্গল নিয়ত ৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক,

শ্রীরাধামোহন গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ উকীল বাবুর বাটী, হুগলি।

তিন দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল। গদাই পত্র মধ্যে দুই খানি মাত্র দশটাকার নোট পাঠাইয়াছে। লিখিয়াছে গোপীকান্ত বাবুর কল্যাণপুর ত্যাগের পর দিন প্রত্যুষেই গদাই থানায় গিয়াছিল। গিয়া দেখে, রমণ ঘোষ সেই স্ত্রীলোকটাকে সঙ্গে লইয়া, নালিশ করিবার জন্য বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে। গদাই তখন তাড়াতাড়ি দারোগার সঙ্গে দেখা করিয়া, তাঁহাকে নগদ ৫০০৲, হেডকনেষ্টবলকে ১০০৲, রাইটার কনেষ্টবলকে ৫০৲ এবং অপরাপর কনেষ্টবলগণকে ৫০৲ একুনে ৭০০৲ দিয়া, সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। দারোগা এজেহার না লিখিয়া, তাহাদিগকে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করার অপরাধে চালান দেওয়ার ভয় দেখাইয়া, থানা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু অদ্য এই মাত্র গদাই সংবাদ পাইল, রমণ ঘোষ স্ত্রীলোকটাকে লইয়া সদরে ম্যাজেষ্টার সাহেবের নিকট নালিস করিতে গিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে উপযুক্ত তদ্বির করিবার জন্য এখনি গদাইকে খুলনা যাত্রা করিতে হইবে—পাল্কী প্রস্তুত। “হুজুরের” হাজার টাকার মধ্যে ৩০০৲ মাত্র আছে। তহবিল হইতে আর ২০০৲ একুনে ৫০০৲ লইয়া গদাই খুলনা যাইতেছে। তহবিলে আর টাকা না থাকা বিধায় অত্র পত্র মধ্যে ২০৲ মাত্র গদাই পাঠাইল। খুলনায় যেরূপ হয় সেইখান হইতেই সংবাদ

লিখিবে। "হুজুরের" আপাততঃ দেশে আসার আবশ্যক নাই, কারণ খুলনা হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির হইতে পারে।

এই পত্র পাঠ করিয়া গোপী বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল।

মাধব বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ীর খবর ভাল ত?"

বিকৃত স্বরে গোপীকান্ত বাবু উত্তর করিলেন—"খবর ভাল—কিন্তু ছেলে লিখেছে টাকা কড়ি এখন কিছুই হাতে নেই, শীগ্‌গির টাকা সংগ্রহ করে পাঠাবে।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"তা বেশ ত দিন কতক এখানে থাকুনই না। টাকা এলে তখন বাড়ী যাবেন।"

গোপী বাবু বলিলেন "কাযেই তাই হল। কিন্তু আপনাদের উপর আর অত্যাচার করতে মন সরছেনা।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"রাধামোহন বাবু ও কথাটি বলবেন না। আপনি অতিথি—দেবতা। তার উপর আবার ব্রাহ্মণ। দিনকতক আপনার সেবা করতে পাব—এ ত আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—দেবতা ব্রাহ্মণে যেন আমার ভক্তি অচল থাকে। আমি আর কিছু চাইনে।"

গোপী বাবু গদাই পালের দ্বিতীয় পত্রের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়

রথঘর্ঘরে হ্রেষা বৃংহিতে অসি তীর ঝনঝনে।
চলে মহারাজ মৃগয়ায় আজ কম্পিত করি বনে।
ভাঙে তরুশির ছিঁড়ে লতাজাল পদাতি অশ্ব করী,
বনের হরিণ আশ্রয় লয় আশ্রমবেদী পরি।
সহসা উঠিল একটি শুষ্ক তর্জ্জনী পুরোভাগে,
তপঃব্রতকৃশ যজ্ঞমলিন একটি মূর্ত্তি জাগে।
সংযত যত হস্তী অশ্ব অবনত অসি তীর,
কম্পিত ভীত সেনাদল সহ নমে নৃপতির শির।

শ্রীকালিদাস রায়।

কষ্টিপাথর

ভারতী (শ্রাবণ)—

প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা'। প্রবন্ধের বক্তব্য এই- বৈশাখী ঝড় যেমন দেখতে দেখতে সমস্ত দিক ছেয়ে ধরণীর তাপ ও শুষ্কতা বর্ষণে মোচন করে, তেমনি নিজের পরিপূর্ণতাও পুরুষকারের অপেক্ষা না করে এক মুহূর্ত্তে মন ছেয়ে সমস্ত কল্মক্ষোভ ও অপবিত্রতা দূর করে দেয়। সে মৌচাকের মধু ভরা নয়, সে বসন্তের এক নিশ্বাসে বনে বনে লক্ষ কোটি ফুলের নিগূঢ় মর্ম্মকোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া।

শ্রীমতী সরলা বালা মিত্র ইংলণ্ডের 'ট্রেনিং কলেজ' সম্বন্ধে একটি বহুতথ্যপূর্ণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রচনাও সুলিখিত, ভাষাও অনাড়ম্বর স্বচ্ছ।

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ আমাদের 'বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগ' তুলনায় সমালোচনা করিয়া আমরা কি ছিলাম কি হইতেছি তাহার হিসাব নিকাশ করিয়াছেন। একস্থানে তিনি জাতিভেদ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে জাতিভেদের চাপে প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না, এবং তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় রাজা জনক ও বিশ্বামিত্র এবং নিষাদ একলব্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত ন্যায়ের ফাঁকি; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা মিথ্যা বাকবিন্যাস বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাচীন আদর্শ বজায় রাখিলে নমঃশূদ্র বা সাঁওতাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কাফ্রি কবি ডানবার প্রভৃতির আবির্ভাব অসম্ভব হইত। সুতরাং চাতুর্ব্বর্ণ্য, চতুরাশ্রম প্রভৃতি প্রাচীন মনভুলানো নামের দোহাই দিয়া জাতিভেদ কোন রকমে সমর্থন করা চলে না।

'কাসিমের মুরগী' শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সুন্দর করুণ গল্প।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের 'জাপানে স্নানাগার' ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেনের 'গুজরাত কৃষক পল্লীচিত্র' সুখপাঠ্য বর্ণনা। কিন্তু জাপানের স্নানাগারের অতদূর বিস্তৃত বর্ণনা না করিলেই ভালো হইত।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন যশোহরের অন্তর্গত সিঙ্গিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে একজন রাজা থাকার কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজা একটি গুপ্ত পাতালগৃহ ভূগর্ভে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'পাতালভেদী রাজা' নামেই আজ পর্য্যন্ত পরিচিত, তাহার অন্য সকল বৃত্তান্ত অধুনা বিলুপ্ত। প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের গবেষণার ক্ষেত্র জুটিল।

'দগ্ধ মৎস্য' শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের রহস্যরসালো গল্প।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অক্লান্ত লেখনী ফরাশী হইতে ভারতে নাট্যের উৎপত্তির কৌতূহলপ্রদ ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছে।

অর্ঘ্য (জ্যৈষ্ঠ)—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডুর 'দানে দীন' কবিতা; সম্পাদকের 'মেটিয়া-বুরুজের নবাব' এবং জর্ম্মন লেখক হেনরিক কোকের গল্পানুবাদ 'আক্কেল সেলামী' শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র কর্ত্তৃক লিখিত চলনসই রচনা। শেষোক্ত গল্পের আর একটি অনুবাদ 'সাহিত্য' প্রকাশ করিয়াছেন।

কোহিনূর (আষাঢ়)—

শ্রীযুক্ত মহম্মদ এয়াকব আলীর 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান লেখক', 'আরব জাতির ইতিহাস', শ্রীযুক্ত শেখ আবদুল জব্বারের মুসলমান শাস্ত্রানুসারে 'মানব-সমাজে অগ্ন্যুপাসনার সৃষ্টি' বিষয়ক মত, শ্রীযুক্ত মহম্মদ কে চাঁদের 'প্রাথমিক মুসলমানগণের বিদ্যানুরাগ' উল্লেখযোগ্য

প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত মহম্মদ মোজাম্মল হকের কবিতা 'হিন্দু মুসলমান' কবিত্বের হিসাবে হীন হইলেও উদ্দেশ্যের হিসাবে ভালো ; তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই কবিতা লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'মিলনভূমি' প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে মুসলমান জাতি যখনই হজরত মহম্মদের আদর্শ ও উপদেশ ত্যাগ করিয়া স্বার্থের পূজা করিয়াছে তখনই তাহাদের অবনতি হইয়াছে। সমাজ তত্ত্বও প্রমাণ করিয়াছে যে কোনো জাতি অপর প্রতিবেশী জাতির সহিত সদ্ভাব ও ভাবের আদান প্রদান না করিলে তাহার কল্যাণ নাই। মুসলমান হিন্দু একদেশবাসী একভাষাভাষী ; ইহাদের মধ্যে অমিলন উভয়েরই অকল্যাণের কারণ। ভারতের দুর্ভাগ্য বশত বর্ণভেদে ও ব্যবসায় ভেদে জাতিভেদ হইয়াছিল, তাহার উপর ধর্ম্মভেদে যদি বিরোধী জাতির সৃষ্টি হয় তাহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী (শ্রাবণ)—

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী 'আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন' লইয়া শিলাজতু পরীক্ষা করিয়াছেন এবং বৈদিক যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সীস, তাম্র, প্রভৃতির সহিত এবং মনুর সময় কাংস্য, ত্রপু প্রভৃতিরও সহিত পরিচয় ছিল দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী 'বিদ্যাপতির লিখনাবলী' হইতে প্রাচীন কালের সংস্কৃত পত্রলিখনপ্রণালী ও অনেক আচার ব্যবহারের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা কৌতুকাবহ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী 'শেরপুরের ইতিহাস' সঙ্কলন করিতেছেন ; উদ্যম প্রশংসার্হ। ইতিপূর্ব্বে রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু শেরপুরের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তদতিরিক্ত কিছু বলিবার থাকিলে বলা উচিত ; নতুবা একক্ষেত্রে দুই জনের শক্তিব্যয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্থাপত্য, ভাস্কর্য, তক্ষণ প্রভৃতির নমুনা হইতে দেখাইয়াছেন যে 'বিক্রমপুরে বৌদ্ধপ্রভাব' পালরাজগণের সময়ে বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী গোখলের প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রসার আইনের সমর্থন করিয়া স্বেচ্ছাকর প্রদানের প্রস্তাবও সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে করভার আপামর সাধারণের উপর না চাপাইয়া মাসিক অন্যূন ৬০ টাকা আয়ের উপর মাসিক ।৷০ আনা কর ধার্য্য করিলে আপত্তির কারণ হইবে না। এবং জমিদারেরা এখন টাকায় ৵১০ পয়সা পথকর দেন ; তাঁহারা সেই পথকরের সিকি বা পঞ্চমাংশ এবং মহাজন ব্যবসায়ীরা আয়করের দশমাংশ দিলে এই শুভানুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে। লেখক নিরক্ষর পল্লীকৃষকের সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহারাও জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য লালায়িত। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার যদি খরচ করিতে ইতস্তত করেন তবে আমাদিগকেই সেই ব্যয়ভার বহন করিয়া কার্য্যত দেশহিতৈষণার পরিচয় দিতে হইবে। জ্ঞান বিস্তার ব্যতীত কখনো কোনো দেশের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না। লেখকের এই উক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার 'লক্ষ্মী নারায়ণের কৃপা' প্রবন্ধে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের প্রামাণিক পরিবারের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ১১৬৫ বাঙ্গালা সনের একখানি নিয়োগপত্রে প্রামাণিক বংশের সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাসের হস্তাক্ষর ও তাঁহার অন্যান্য বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক।

নব্যভারত (শ্রাবণ)—

শ্রীযুক্ত সেবানন্দ ভারতী 'রাজা নবরঙ্গ রায়' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—ময়মনসিংহ চারিপাড়া গ্রামের জমিদারগণ রাজা নবরঙ্গ রায়ের বংশধর। রাজা নবরঙ্গ রাঢ় দেশ হইতে গিয়া ঐ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ; তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ সাগরদীঘি, রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, গোপীনাথ বিগ্রহ এখনো বিদ্যমান আছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে নবরঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি সম্ভবত ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত কালে বিদ্যমান ছিলেন। ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক এই রাজ্য জিত ও ধ্বস্ত হয়।

এই প্রবন্ধটি শিক্ষা-সমাচার ও মাহিষ্য সমাজ পত্রিকায়ও মুদ্রিত হইয়াছে।

বীরভূমি (আষাঢ়)—

শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন

"বীরভূমের খনিজ সম্পদ" লোহ, কয়লা, ঘুটিং এবং ৩৪ প্রকারের প্রস্তর। কয়লার খনি একটি মাত্র। ঘুটিং পুড়াইয়া চূন হয় ; প্রস্তর রেলের কাজে লাগে ; মেটে পাথরের মধ্যে যে অসংখ্য ছিদ্র থাকে তাহাই পূর্ণ করিয়া লোহ মাটিতে স্তরবিন্যস্ত অবস্থায় আছে ; এইসব লোহমিশ্র প্রস্তরস্তর ৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। অতি প্রাচীন কাল হইতেই অসম্বদ্ধ ভাবে বীরভূমে লৌহনিষ্কাসন কার্য্য হইত, অনেক সাহেব সওদাগর ইহা ব্যবসায় সঙ্ঘত-রূপে নিষ্কাসন করিবার চেষ্টা করেন ; ধাতুমিশ্র মৃত্তিকা হইতে ২৪ মণ লৌহ বাহির করিতে ৪ অহোরাত্র সময় এবং ৭৫ টাকা ব্যয় লাগিত ; ১০ মণ কাঁচা লোহা হইতে ৭ মণ ১০ সের পাকা লোহা হইত। কিন্তু সেই সময়কার আমদানি লৌহের মূল্য ইহা অপেক্ষা কম থাকাতে লৌহের দেশী ব্যবসায়ে লাভ হইত না। তথাপি বীরভূমে বৎসরে ৬৬৬৮০ মণ কাঁচা লোহা উৎপন্ন হইত। ইন্ধন ও ধাতব প্রস্তরের অভাবই লৌহ ব্যবসায়ে ক্ষতির কারণ। ধাতব প্রস্তর হইতে লৌহ বাহির করার কার্য্য মুসলমানেরা করিত এবং লৌহ পরিষ্কার করিয়া পাকা করিত হিন্দুরা। প্রতি চুল্লী হইতে গড়ে ২৫২ মণ লৌহ উৎপন্ন হইত।

মন্দাকিনী (জ্যৈষ্ঠ)—

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "ভারতের উদ্ভিদ" হইতে আঁশ, পত্ররস, পুষ্প, ফল, আঠা, ক্ষার, বীজ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া শিল্পকর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এবারে আঁশ-পর্য্যায়ে উলটকম্বল, পেটারি, বড় কান্দি, শোলা ও ঘৃতকুমারীর উল্লেখ করিয়াছেন।

মানসী (জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ও শ্রাবণ)—

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ 'চিত্র ও চিত্রকর' প্রবন্ধে বলিতে চাহিয়াছেন যে

নিখিল সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে মাধুর্য্য ও শিক্ষা নিহিত আছে তাহারই ব্যাখ্যা করা কবি ও চিত্রকরের কার্য্য। ব্যাখ্যার ভাষা দুষ্ট হইলেও ক্ষতি নাই, নিগূঢ় মর্ম্মকথা যিনি যতখানি উদ্ঘাটন করিতে পারেন তিনি ততখানি নিপুণ ; কিন্তু যদি কেহ নিগূঢ় মর্ম্মকথার সন্ধান না পাইয়া শুধু ভাষার আড়ম্বর করেন তিনি ব্যর্থ ; আর যিনি ভাষা ও বিশ্লেষণ একত্র মিলাইতে পারেন তিনি অতুলন। চিত্রকরের কার্য্য বিশ্বগ্রন্থের ভাষার অনুকরণ নহে। প্রতিলিপি ও ব্যাখ্যা যেমন এক সঙ্গে করা চলে না তেমনি প্রকৃতির চেহারার ছাঁচ ও অন্তরের ভাব একসঙ্গে প্রকাশ করা ঘটে না ; একদিকে ঝোঁক দিলে অন্য দিক হাল্কা হইবেই ; যদি তাই হয় তবে ভাবের ক্ষতি করিয়া আকারের সম্পূর্ণতা চাই না ; ভাব পুরামাত্রায় বজায় রাখিয়া আকার যতটা আদায় করিতে পারি সেই ভালো।

এই কথাই আমরাও সমর্থন করি এবং ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির মূল সূত্রই এইটি।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সান্যাল "কবি ও চিত্রকর" তুলনায় সমালোচনা করিতে গিয়া পরস্পরবিরোধী অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

কবিকে চিত্রকরের সঙ্গে তুলনা করিলে কবির অমর্য্যাদা হয়। কবি প্রকৃতির মন্দিরে পরার্থপর পূজারী আর চিত্রকর প্রকৃতির সম্ভোগপিয়াসী স্বার্থপর।

অথচ পরক্ষণেই বলিতেছেন—

কবির আত্মীয়তা প্রেমিকের উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসা; চিত্রকরের আত্মীয়তা গুরুশিষ্যের নিয়মাধীন কর্ত্তব্যসংযত ভক্তি; প্রেমজ ভালবাসা অনন্ত; কর্ত্তব্যজ ভক্তি সান্ত। কবি দান করে, চিত্রকর কুসীদজীবীর মতো শুধু নিজেই সঞ্চয় করে—কবি কাব্য রচনা করেন পরের জন্য এবং চিত্রকর চিত্র রচনা করেন আত্মচিত্ত বিনোদনের জন্য। কবি সর্ব্বদেশদর্শী, চিত্রকর একদেশদর্শী। চিত্রশিল্পী শুধু আকার আঁকিতে পারেন, তাঁহাতে ভাবসঞ্চার করিতে পারেন না; চিত্রশিল্পীর সহানুভূতি নাই, আত্মত্যাগ নাই। কবি স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, চিত্রকর নির্ম্মাতা ও দর্শক।

এইসব কথার তাৎপর্য্য কি, ও পার্থক্য কোথায়? লেখকের মতে কবি তুমি ব্রহ্ম, তোমায় লেখক উপাসনা করেন; চিত্রকর তুমি মনুষ্য, লেখক তোমায় অনুগ্রহ করিয়া যে ভালো বাসেন ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য। লেখক মোটেই চিত্রের অর্থ ও উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; কেবল কতকগুলা কথা গাঁথিয়াছেন মাত্র। যে চিত্রকর আকারে ভাবসঞ্চার করিতে পারে না সে ত চিত্রকরই নহে, এবং নির্ব্বাক আকৃতির মধ্যে ভাবব্যঞ্জনাই যে চিত্রকরের বিশেষত্ব এবং এইখানে কবি অপেক্ষা চিত্রকর শ্রেষ্ঠ এই সহজ কথাটুক লেখকের হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি নাই, অথচ তিনি কলা-সমালোচক।

বঙ্গদর্শন (জ্যৈষ্ঠ)—

প্রথমে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "সামাজিক সমস্যা" প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

সমাজ ও ধর্ম্ম পরস্পর সাপেক্ষ। হিন্দুধর্ম্মকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা যেমনটি আছি তেমনটিই থাকিব; স্থিতি জড়ের স্বভাব, গতি জীবের ধর্ম্ম। পরিবর্ত্তন হইবে, পরিবর্ত্তন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের সনাতন ভূমানিষ্ঠা বা পরমার্থ নিষ্ঠাটুক না হারায় ইহাই আজিকার ভারতের প্রধান ও বিষম প্রশ্ন।

চিত্রপরিচয়

এই সংখ্যায় মুখপত্ররূপে ৩খানি বিবিধ বর্ণে মুদ্রিত প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অজন্তা গুহার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত চিত্র দেওয়া হইয়াছে। চিত্র দুইখানির বিষয় সর্ব্বজনবিদিত শ্রীরামচন্দ্রের অহল্যা-উদ্ধার ও মিথিলা যাত্রাকালে নাবিক কর্ত্তৃক গঙ্গা পার। দুইখানি চিত্রই শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তবৎসলতা ও পতিতের প্রতি করুণার নিদর্শন।

কাব্য ও কুসুম নামক চিত্রখানি প্রাচীন, পারস্য দেশের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে অঙ্কিত। চিত্রের বিষয়বিন্যাসের পারিপাট্য ও নিপুণতা এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য বিকাশই ইহার বিশেষত্ব।

বিবিধ প্রসঙ্গ

যাহাদের মাতৃভাষা সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী তাহাদের পরম সৌভাগ্য। এই সাহিত্যের রস তাহাদিগকে আনন্দ দেয় ও বলবান করে। সুতরাং যাহারা এই রস হইতে বঞ্চিত, তাহারা বড় হতভাগ্য ও দরিদ্র। আমাদের বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্যসম্পৎ ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির সমতুল্য নহে, কিন্তু তথাপি ইহাতে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা যে কোন ভাষা ও জাতির গৌরবের বিষয় হইতে পারে। বাঙ্গালী হইয়া যে বাঙ্গলা সাহিত্য অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পায় না, সে কেমন করিয়া নিজ জাতির সহিত একহৃদয় হইয়া বলীয়ান হইবে এবং তাহাতে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিবে? মধ্যে এমন সময় ছিল যখন বঙ্গের বাহিরে শিক্ষিত প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সুখের বিষয় এখন আর সে কাল নাই। সর্ব্বত্রই বাঙ্গলার চর্চ্চা হইতেছে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের মানুষ গণনায় ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা ২০৫,০০০ হইয়াছিল। এবারকার গণনায় হয় ত দ্বিগুণ হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুনেও বাঙ্গালীর ছেলেদের নিম্নতম শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই। এক্ষণে কতকদূর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। তাহাতে বাঙ্গলাও শিখান হইবে। বাঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্টের হাতে ১২০০০৲ টাকা আমানত রাখিলে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর রেঙ্গুন কলীজিয়েট স্কুলের উপরের শ্রেণীগুলিতে ৪০টির অনধিক বাঙ্গালীর ছেলেদের জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে রাজী হইয়াছেন। বাঙ্গালীর ছেলেদের জন্য ইস্কুল স্থাপনের ব্যয় ও এই ১২,০০০৲ টাকা, সর্ব্বসমেত ৩০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। ইহার মধ্যে ব্রহ্মদেশের বাঙ্গালীরা নিজেরাই কয়েক হাজার টাকা তুলিয়াছেন। বাকী তাঁহারা বঙ্গদেশের ভ্রাতৃগণের নিকট প্রার্থনা করেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বিদ্যোৎসাহী মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় স্কুল কমিটীকে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন। স্কুলের জমীর দাম ৮০০০৲ টাকা। কমিটি জমীর দাম একা মহারাজার নিকট পাইবার আশা করেন। মহারাজা যেরূপ দানশীল ও ধনী তাহাতে কমিটির আশা অসঙ্গত নহে। শুনিলাম ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার স্কুল কমিটীর সেক্রেটারী। তাঁহার ঠিকানা,

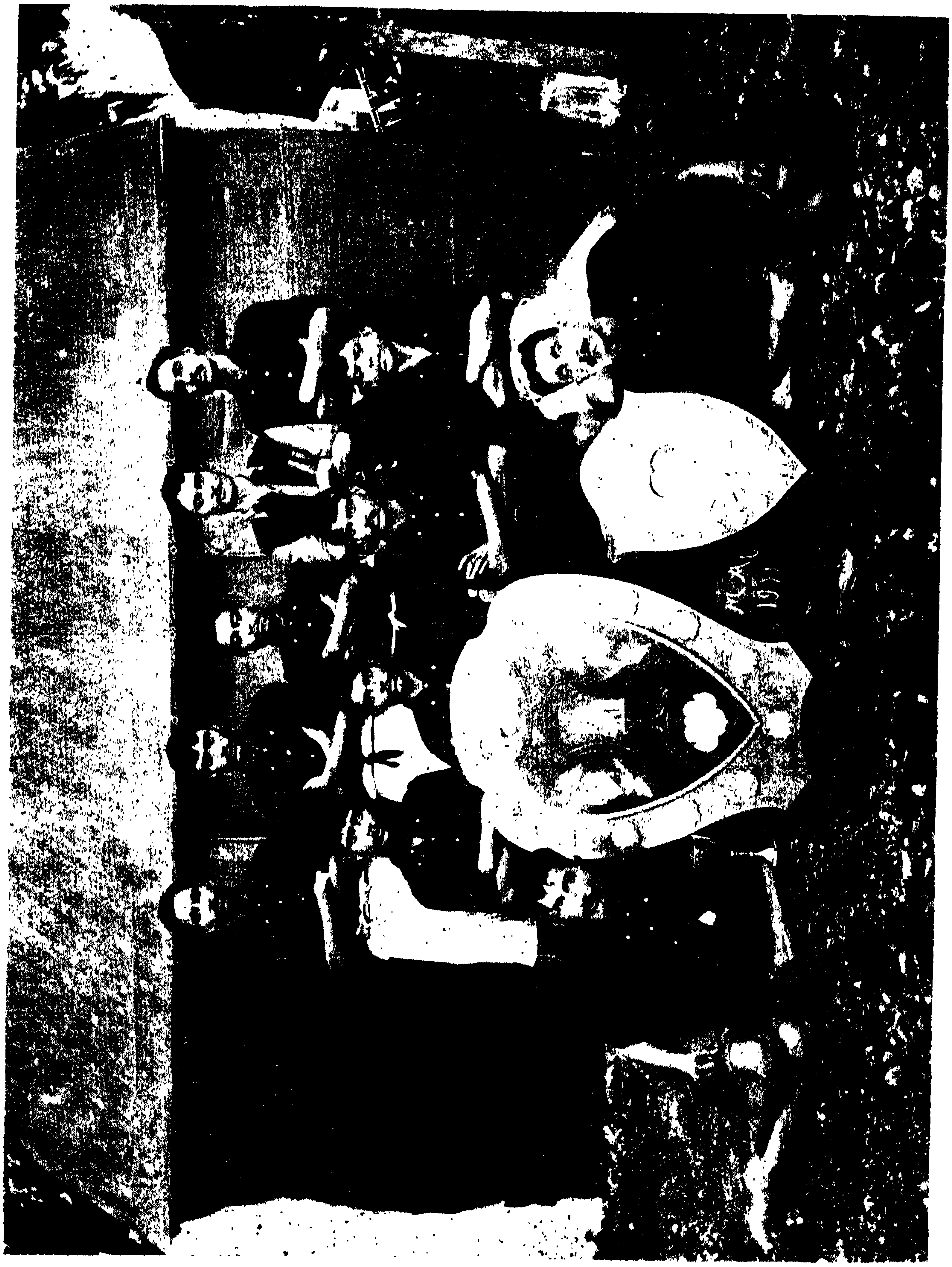

বিজয়ী মোহনবাগান টীমের পেলোয়াড়ের দল।
ইপসিং কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

The English Medical Hall, 10, Upper Pozundoung, Rangoon.

যুদ্ধ দেহমনের বলবিক্রম দেখাইবার প্রধান ক্ষেত্র। ভারতবাসীদের এই প্রকারে পৌরুষ দেখাইবার সুযোগ এখন খুব কম। ভারতীয় শিখ, গুর্খা আদি কোন কোন জাতি এখনও সাধারণ সৈনিক এবং খুব নিম্নপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীরূপে পৌরুষ দেখাইতে পারে। কিন্তু

ভারতীয় অধিকাংশ জাতির মত বাঙ্গালীর এ সুযোগও নাই। কিন্তু পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালীর এ সুযোগ ছিল, তখন অনেক বাঙ্গালী সেনানায়ক ও সাধারণ সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ক্লাইব যে লাল পল্টনের সাহায্যে অনেক যুদ্ধ জয় করেন, তাহা প্রধানতঃ বঙ্গীয় সৈনিকগণেরই সমষ্টি ছিল। হিংস্র পশুর শিকারেও পৌরুষ দেখান যায়। তাহাতেও অনেক বাঙ্গালীর খ্যাতি আছে। পুরুষোচিত অনেক ব্যায়াম ও ক্রীড়াতেও দেহের বল ও ক্ষিপ্রকারিতা ও মনের সাহস দেখান যায়। বাঙ্গালী সার্কাসে সিংহ ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, বেলুনে উঠিয়াছে, এরোপ্লেনে চড়িয়া বাঙ্গালী পুরুষ ও নারী আকাশে বিচরণ করিয়াছে। সুতরাং ফুটবল প্রভৃতি খেলায় যে বাঙ্গালী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইজন্য মোহন-বাগানের ফুটবলের দল প্রতিযোগিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ ইংরাজ খেলোয়াড়ের দলকে পরাজিত করিয়া সম্মানসূচক রৌপ্য "শীল্ড" বা ঢাল লাভ করায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি বটে, কিন্তু বিস্মিত হই নাই। কারণ বাঙ্গালী ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক পৌরুষের কাজ করিতে সমর্থ। শুধু বাঙ্গালী কেন, যে কোন জাতি সময় সুযোগ ও শিক্ষা পাইলে যে কোন কাজ করিতে পারে।

অনেকে এই সব খেলাকে বড় তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আমাদের মত সেরূপ নয়। আমরা যেমন অকালপক্ক অকালবিজ্ঞ ছেলে ভালবাসি না, যাহারা কুড়িতে পা দিবার আগেই দৌড়াদৌড়ি করা পর্য্যন্ত "ছেলেমানুষী" ও অসভ্যতা মনে করে, তেমনি অতিবিজ্ঞ জাতিও ভালবাসি না। যে জাতির যৌবন আছে ও কর্ম্মিষ্ঠতা আছে, তাহাদের মধ্যে এই অস্বাভাবিক অকালবিজ্ঞতা ও অতিবিজ্ঞতা লক্ষিত হয় না। তাহাদের পক্ককেশ লোকেরাও নানা রকমের লাফালাফি ও দৌড়াদৌড়ির খেলা করে। এ সব খেলা জাতীয় সুস্থতা ও যৌবনের লক্ষণ। কিন্তু অপর পক্ষে যাহারা মোহনবাগানের জিতের প্রসঙ্গে রুষ জাপান-যুদ্ধের কথা বা তদ্বিধ কোন কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের মাত্রাজ্ঞান ও রসবোধ বড় কম। ফুটবলে জিৎ যুদ্ধজয়ের সমতুল্য নয়, মেরু আবিষ্কারের সমানও নয়; যদিও ইহা আনন্দের ও গৌরবের বিষয় বটে।

গত জুলাই মাসে লণ্ডন সহরে য়ুনিভার্সেল্ রেসেজ কংগ্রেস বা সার্ব্বজাতিক মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য* বিজ্ঞানের ও আধুনিক ধর্ম্মবুদ্ধির আলোকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিদের, তথাকথিত শ্বেত ও তথাকথিত অশ্বেত জাতিদের, বর্ত্তমান পরস্পর সম্বন্ধের বিচার করা, যদ্দারা তাহারা আরও ভাল করিয়া পরস্পরকে বুঝিতে পারে, তাহাদের মধ্যে মিত্রতা জন্মিতে

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

পারে, এবং আন্তরিক সহযোগিতা উৎপন্ন হইতে পারে। এই মহাসভার আটটি বৈঠক হইয়াছিল। নানাজাতির পণ্ডিত ও গণ্যমান্য লোকে এই কংগ্রেসের জন্য প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। প্রথম বৈঠকের বিচার্য্য বিষয় উত্থাপন করিবার ভার ছিল, বঙ্গের সুপণ্ডিত সন্তান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের উপর। ভারতবর্ষের, বঙ্গের, এই সম্মানে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ফ্লেচার সাহেব মেদিনীপুর ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় সুবিচার করিয়াছেন। তিনি অভিযুক্ত মিঃ ওয়েষ্টন, মৌলবী মজহরল হক ও বাবু লালমোহন গুহকে অপরাধী স্থির করিয়া তাহাদিগকে অভিযোক্তা প্যারীমোহন দাসকে ১০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং মামলার খরচ দিবার হুকুম দিয়াছেন। জজ মহোদয়ের হাতে সুবিচার করিবার ক্ষমতা যাহা ছিল,

* "To discuss, in the light of science and the modern conscience, the general relations subsisting between the peoples of the West and those of the East, between so-called white and so-called coloured peoples, with a view to encouraging between them a fuller understanding, the most friendly feelings, and a heartier co-operation."

তিনি তাহা ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু আইনের ও সুবিচারের উদ্দেশ্য যে শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের শাস্তি ও দমন তাহা হইয়াছে কি না, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা ভাল। মানুষ রাজদ্বারে অপরাধী হইলে তাহার দণ্ড নানা প্রকারে হইয়া থাকে; যেমন, কারাগারে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, জরিমানায় বা ক্ষতিপূরণ দিতে হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি, পদচ্যুতি বা পদোন্নতি বন্ধ, ইত্যাদি। মেদিনীপুরের অভিযুক্ত ও দণ্ডিত ব্যক্তিদের এরূপ কোন ক্লেশ বা অনিষ্ট হয় নাই। তাহাদিগকে জেলে যাইতে হয় নাই, বেত খাইতে হয় নাই, তাহাদের মোকদ্দমার আত্মপক্ষসমর্থনের বহু লক্ষ টাকা পরিমিত সমস্ত ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ এবং অভিযোক্তার ব্যয়ও গবর্ণমেণ্ট দিবেন, তাহাদের পদচ্যুতি বা পদের অবনতি বা পদোন্নতি বন্ধ থাকার পরিবর্ত্তে বরং পদোন্নতিই হইয়াছে। সুতরাং হাইকোর্টে সুবিচার হওয়া সত্ত্বেও অপরাধীর দণ্ড কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের দেখা কর্ত্তব্য যে বাস্তবিকই যাহারা দোষ করিয়াছে, কোন না কোন প্রকারে তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল জজের রায়ে নহে দণ্ডিত হয়। এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ত দেখিতেছি, দণ্ড বঙ্গের প্রজাদেরই হইতেছে। কারণ, তাহাদেরই প্রদত্ত কর হইতে মোকদ্দমার ব্যয় এবং ক্ষতিপূরণাদি দেওয়া হইতেছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়া উচিত।

অল্প কয়েকদিনের চেষ্টায় কলিকাতার স্বদেশী মেলা বেশ দর্শনীয় ও ফলদায়ক হইয়াছে। ইহা একটি বার্ষিক ঘটনাতে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বদেশী বাজার স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। শুনিলাম এইরূপ একটি প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিবেচনাধীন আছে। এখন স্বদেশী আন্দোলন নানা কারণে অত্যন্ত মৃদুভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু স্বদেশীর প্রতি অনুরাগ বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। আন্দোলনের পথ পাকে প্রকারে বন্ধ হইলেও অন্য নানা উপায়ে এই অনুরাগ সকলের প্রাণে জাগাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। নেতারা যতই স্বদেশী মেলার মত এইরূপ নানা উপায় বাহির করিতে পারিবেন, ততই তাঁহাদের নেতৃত্ব সার্থক ও সফল হইবে। স্বদেশীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা একটুও নিরাশ নহি।

ঢাকায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন ও ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অভিযোগে কয়েকমাস ধরিয়া ৪৩ জন ভদ্রলোকের বিচার হইতেছিল। আসেসর ছিলেন দুই জন শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি। তাঁহারা যুক্তির সহিত এই মত দিয়াছিলেন যে আসামীদিগের একজনেরও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। জজ কয়েক সপ্তাহ পরে যে রায় দিয়াছেন, তদনুসারে ৮ জন খালাস পাইয়াছেন। বাকী ৩৫ জনের কঠিন দণ্ড হইয়াছে। তিনজনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন, ১৭ জনের ১০ বৎসর করিয়া সশ্রম কয়েদ, ইত্যাদি। ইহার পর আপীল হইবে। তাহার ফল কয়েকমাস পরে জানা যাইবে।

এইরূপ মোকদ্দমা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়। তাহার মধ্যে একটা এই যে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধটাকে গবর্ণমেণ্ট এমন তুচ্ছ ব্যাপার করিয়া তুলিতেছেন কেন? কোথায় প্রবলপ্রতাপান্বিত লক্ষ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধজাহাজ কামানাদির অধীশ্বর সম্রাট, আর কোথায় কয়েকজন লোক, কয়েকটি লাঠি ও গোটাকতক রিভলভার!

বাবু পুলিনবিহারী দাসের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয় এই যে, তিনি একবার নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, ১৯ মাস নির্ব্বাসনের পর গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ছাড়িয়া দেন। তখন বড়লাট বলিয়াছিলেন যে তিনি ও তাহার মত নির্ব্বাসিত অন্যান্য ভদ্রলোকেরা যে আন্দোলন করেন, তাহার ফলে এনার্কিজম (অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারীদিগকে খুন করা ইত্যাদি উপদ্রব) উপস্থিত হয়, কিন্তু আন্দোলনের এই পরিণতির জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। বড়লাটের এই উক্তিতে ইহাই প্রমাণ হয় যে পুলিন বাবু গবর্ণমেণ্টের মতে যে দোষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আর বন্দী করিয়া রাখিবার প্রয়োজন ছিল না, বড়লাটের মতে তখন তাঁহার যথেষ্ট শাস্তি হইয়া গিয়াছিল। তিনি বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইবার পর কোন নূতন অপরাধ করেন নাই, ইহা জানা কথা। তবে কি একই অপরাধে দুইবার শাস্তি হইল? তবে বড়লাট বাহাদুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি ভ্রমাত্মক?

বিলাতে "টুথ" বা "সত্য" নামক একখানি খবরের কাগজ আছে। কাগজখানির নাম সার্থক, কারণ ইহার সম্পাদক কখনও সত্য কথা বলিতে পশ্চাৎপদ হন না। সম্প্রতি টুথ লিখিয়াছেন যে রাজার দিল্লীতে মুকুটধারণ দরবার উপলক্ষে ভারতবাসীকে তাক লাগাইবার জন্য যে জাঁকাল তামাসার আয়োজন হইতেছে, তাহাতে ভারতবাসী আনন্দিতই হইবে। কারণ প্রাচ্য প্রতীচ্য সব দেশের লোকই জাঁকজমক দেখিতে ভালবাসে। এইরূপ সময়ে কয়েদী খালাস করাও একটা মামুলী প্রথা আছে বটে। কিন্তু শুধু তামাসা দেখিয়া বা চোর ডাকাতের অসাময়িক পুনরাবির্ভাবে ভারতবাসী বিশেষ বরলাভ করিল বলিয়া মনে করিবে না। আরও কিছু চাই। টুথের মতে সর্ব্বাগ্রেই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করা

উচিত। এখন কেহ আর ইহার সমর্থন করে না। এমন কি ইহার জনক লর্ড কর্জনও ইহার দায়িত্ব লইতে চান না। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা আর পূর্ব্বের মত শুনা যায় না বটে, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মনের ভাব ঠিক্ পূর্ব্ববৎ আছে। এ বিষয়ে টুথের সহিত আমরা একমত। টুথের দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে কেবল রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীগণকে অর্থাৎ যাহারা কোন খুনো-খুনি মারামারি ডাকাইতি করে নাই কেবল আইনবিরুদ্ধ রাজনৈতিক লেখা বা বক্তৃতাদির জন্য দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এই প্রস্তাবও খুব যুক্তিসঙ্গত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ইংলণ্ডে ভারতের কল্যাণার্থ বহু চেষ্টা করিয়া গত রবিবারে সুস্থদেহে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস খুব উদ্যোগী খবরের কাগজ। ঐ দিন অপরাহ্ণে উহার একজন প্রতিনিধি ভূপেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অধিকাংশ প্রশ্নই বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে। ভূপেন বাবু যাহা বলেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে ঐ ছাত্রদের সম্বন্ধে তথাকার লোকদের মনের ভাব ভাল নয়; তাহাদের সঙ্গে সুবিবেচনার সহিত ব্যবহার করা হয় না; তাহাদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত জন্মান হয় না বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সামাজিক জীবনে যোগ দিবার তাহাদের সুযোগের অভাব আছে। তাহারা যেরূপ ব্যবহার পায়, তাহা তাহারা পছন্দ করেনা, তাহাদের কলেজে ভর্ত্তি হওয়া সহজ নয়, নির্দ্দিষ্ট অল্পসংখ্যক মাত্র ভারতীয় ছাত্র লওয়া হয়। যে সরকারী পরামর্শদাতা কমিটী (advisory committee) আছে, তৎসম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা এই যে ইহার কাজে পরামর্শদান অপেক্ষা গোয়েন্দাগিরির ভাগই বেশী। ভূপেন বাবু বলেন যে কমিটি এরূপ ভাবে গঠিত এবং ইহার কার্য্য এরূপ ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে এরূপ ধারণা জন্মিবার কোন কারণ না থাকে।

কোন দেশ জাগিয়া আছে না ঘুমাইতেছে তাহা জানিবার একটা সঙ্কেত এই যে যাহাতে দেশের কল্যাণ হইবে তাহা পাইবার জন্য এবং যাহাতে দেশের অকল্যাণ হইবে, দূরে রাখিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে কিনা দেখা। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিবাহ সম্বন্ধে একটি বিশেষ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাইতে চান। মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় দেশের সর্ব্বত্র বালকবালিকাগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাইতে চান। এই দুইটি আইনের পাণ্ডুলিপির সপক্ষে ও বিপক্ষে ভারতের অনেক স্থানে সভা হইতেছে, খবরের কাগজে লেখালেখি হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী অন্য প্রদেশবাসীর তুলনায় নিতান্ত উদাসীন রহিয়াছেন বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর যদি কোনটির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বা আংশিক আপত্তিই থাকে, তাহাও ত জানান চাই। আর যদি বাঙ্গালী এই দুই বা কোন একটি ব্যবস্থার অনুমোদন করেন, তবে তাহাও সভা সমিতি দ্বারা, এবং সংবাদপত্রে লিখিয়া জানান দরকার। এরূপ ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্ট ভাব কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পুস্তক পরিচয়

ভাগ্যচক্র—

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এণ্টিক কাগজে ছাপা। সুন্দর সুদৃশ্য বাঁধাই। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ২১৩ পৃষ্ঠা। মূল্য মাত্র এক টাকা। এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট ডচ উপন্যাসের অনুবাদ, ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা সুতরাং পাঠকদিগের পরিচিত; ইহার মূলের সৌন্দর্য্য ও অনুবাদের কৃতিত্ব কেমন চমৎকার তাহা প্রবাসীর পাঠক পাঠিকার অগোচর নাই; সুতরাং আমাদের অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

মানুষের উপর ঈশ্বরের বিশ্বাস—

রেভাঃ জে, এম, বি, ডনক্যান বিরচিত ও প্রকাশিত। ২ কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে প্রাপ্তব্য। মূল্য /০ আনা। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান; ঈশ্বরের পুণ্যপথে চলাই তাহার কর্ত্তব্য; ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন মানুষেরই গৌরব বৃদ্ধির জন্য; এবং মানুষ যে অপথে যাইবে না এই বিশ্বাস তিনি মানুষকে করেন; সুতরাং মানুষেরও উচিত সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সৎ ও সাধু হওয়া।

পুস্তকের ভাষা বিশুদ্ধ ও সরস; তথাপি ইহা যে বিদেশীর লেখা তাহার আভাস পাওয়া যায়; ঠিক বাঙালী ঢঙে লেখা হয় নাই। উদ্দেশ্য সাধু ও বক্তব্য সুন্দর হইলেও যুক্তি সর্ব্বত্র টেঁকসই হয় নাই। তবু মোটের উপর বইখানিকে ভালোই বলিতে হয়।

রাজকাহিনী—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ। এবারে মূল্য কমিয়া হইয়াছে ॥০ মাত্র। অবনীন্দ্রনাথ শুধু বর্ণচিত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন নাই চিত্রবাক্যেও তিনি অদ্বিতীয়। এমন সুললিত শব্দচিত্রণ ও সরস বাক্যবিন্যাস করিবার শক্তির সহিত রাজস্থানের পুণ্যকাহিনীর সংমিশ্রণ; তাহার সমাদর অবশ্যম্ভব।

প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, প্রণীত। প্রকাশক সিটীবুক সোসাইটী। ছাপা পরিষ্কার, কাগজ ভালো, বহু চিত্রসংযুক্ত, মূল্য ।৵০ আনা। এখানি স্কুলপাঠ্য ইতিহাস; কিন্তু ইহা ঘটনার নীরস তালিকা নহে; প্রত্যেক যুগের মূল ও স্থূল বিষয়টি সহজ সরল ভাষায় সরস করিয়া গল্পের ভাবে বিবৃত অথচ গল্পের শৃঙ্খলে ধারাবাহিক ইতিহাস। ইহা ছাত্রদের গৃহপাঠ্য অবসরবিনোদন রূপে ও বিদ্যালয়

পাঠ্যরূপে তুল্যভাবেই অধীত হইতে পারে। চিত্রগুলি ও ম্যাপগুলিও ভালো হইয়াছে।

তোতলাম ও তাহার প্রতিকার

শ্রীযামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ক্রাঃ ১৬ অংশিত ৮৮ পৃষ্ঠা। সুন্দর সুদৃশ্য বাঁধা। মূল্য এক টাকা। যিনি বোবাকে কথা বলান তিনি তোতলার কথা বাধার প্রতিকারের পরামর্শ দিতেছেন ইহা সকল তোতলার অবহিত হইয়া শ্রবণ ও উপদেশ পালন করা উচিত। বিশেষজ্ঞের মতে তোতলাম ব্যাধি নহে কু-অভ্যাস; একবার সেই অভ্যাস হইলে আর রক্ষা নাই, ক্রমে কথা বাধিবার ভয় ও লজ্জাতেই আরো বেশি করিয়া কথা বাধিয়া যায়; বাগযন্ত্রের দোষেও তোতলা হয় কিন্তু ইহারও চিকিৎসায় প্রতিকার করা যায়। বাক্যবাগীশ লোকেরা বেশি তোতলা হয়; তোতলা শিশু প্রায় দেখা যায় না, তোতলাম আট বৎসর বয়সের পর মানুষকে আক্রমণ করে। আহারবিহারে তোতলা সংযত ও সাবধান হইলে, এবং স্বরসাধন ও যে বর্ণ আটকায় সেই বর্ণবহুল বাক্য বলিতে অভ্যাস করিলে তোতলামির প্রতিকার হয়; বাক্যোচ্চারণে বাগযন্ত্র কোমল করিয়া ধীরে চালনা করা উচিত; মনঃসংযম ও উত্তেজনা-পরিহার কর্তব্য; ইত্যাদি।

স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক—

পরলোকগত ডাক্তার দুর্গাদাস কর বিরচিত ও শ্রীরাধামাধব কর দ্বারা প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ অংশিত ৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥০ আনা। ইহা ১২৬৮ সালে রচিত হয়; সুতরাং ইহা তথাকথিত আদি বাংলা নাটক কুলীনকুলসর্ব্বস্বের এক বৎসরের কনিষ্ঠ এবং দীনবন্ধু বাবুর নীলদর্পণ নাটকের ১২ বৎসর জ্যেষ্ঠ। ইহার মধ্যে প্রাচীন রীতির রচনা-পারিপাট্য ও ভাববিকাশ আছে এবং সেকালের ধনীদিগের আদবকায়দার একটা আবছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কৌরব কর্তৃক পাণ্ডব লাঞ্ছনার বিষয় লইয়া রচিত; দ্রৌপদী প্রেমের স্বর্ণশৃঙ্খলে পঞ্চপাণ্ডবকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, এই ভাবটি হইতে গ্রন্থকার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন। প্রাচীনত্বের হিসাবে এই গ্রন্থের সমাদর হইবে।

ব্যবসায়ী—

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩১৮। মূল্য চার আনা। লেখক কৃতকর্ম্মা ব্যবসায়ী। তিনি নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বহু কাজের উপদেশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কি করিলে ব্যবসায়ে সুবিধা ও উন্নতি হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বহু Practical উপদেশ শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী সকলেই ইহা হইতে অনেক শিক্ষা ও সাহায্য পাইবেন এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা এবার যথেষ্ট কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। অথচ মূল্য সে অনুপাতে বেশি হয় নাই।

সম্রাট জর্জ—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন। মূল্য চার আনা। ১৯১১। দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহা সম্রাটের জীবনচরিত, সুন্দর সুদৃশ্য ছাপা ও বহু চিত্রসমন্বিত। নিজ দেশের জীবিত রাজার জীবনচরিত কেহ কখনো নিরপেক্ষ ভাবে লিখিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহস্থল, বিশেষত আমাদের এই নিতান্ত পরাধীন দেশে। সুতরাং জীবনচরিত হিসাবে ইহার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। তবে ইহা দ্বারা সম্রাটের জীবনের অনেক ঘটনা, রঞ্জিত হইলেও, জানা যাইতে পারে।

খাদ্য—

শ্রীচুনিলাল বসু প্রণীত দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহার প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে আমরা প্রশংসা করিয়াছিলাম; এবারেও তদতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই। আমাদের খাদ্যের প্রকৃতি ও গুণাগুণ ও রোগের সহিত খাদ্যের সম্পর্ক, রন্ধন, বয়স ও কার্য্য ভেদে আহারের তারতম্য, আহারের সময় ও রীতি প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সহজ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ছাত্র ও গৃহস্থের উপকারী গ্রন্থ।

সাবিত্রী

শ্রীযশোদালাল বণিক প্রণীত। প্রকাশক অতুল লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য কাগজে বাঁধাই ।০ আনা, কাপড়ে বাঁধাই ॥৵০ আনা। সচিত্র। "সাবিত্রীর উপাখ্যান যতগুলি বাহির হইয়াছে তাহার অধিকাংশই হয় দুরূহ নতুবা প্রাদেশিক ভাষা বৈচিত্র্যে দূষিত হওয়ায় তদ্দ্বারা বালিকাদের চরিত্রগঠন কিংবা ভাষা শিক্ষা কোন উদ্দেশ্যই সুসম্পন্ন হয় না" এজন্য গ্রন্থকার সহজ অথচ কেতাবী ভাষায় এই উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ইহা পূর্ব্বপ্রকাশিত কোনো পুস্তকের নকল, শুধু রকমফের।

সরল ও সংক্ষিপ্ত রামায়ণ—

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। পরলোকগত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সম্বলিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ২৫৪ পৃষ্ঠা। ছবিগুলি উপেন্দ্রকিশোর বাবুর ছেলেদের রামায়ণ হইতে গৃহীত। রচনা পয়ার ছন্দে। মূল্য বারো আনা।

প্রবন্ধাষ্টক—

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম, এ, প্রণীত ও ২০ পটুয়াটোলা লেন হইতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥৵০ আনা। ইহাতে ৮টি প্রবন্ধ আছে—(১) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি, (২) আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষা-সমালোচনা, (৩) ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার, (৪) কালিদাসের কাহিনী (কিম্বদন্তীমূলক), (৫) কাদম্বরীর উপাখ্যান, (৬) পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ, (৭) ফকির শাহজলাল, (৮) সুখ ও দুঃখ।—রচনার ভাষা কাঁচা ও তথাও প্রায় সকল প্রবন্ধেরই নূতন নহে।

শিবরাত্রি ব্রতকথা

শ্রীমহেন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল ও পদ্যানুবাদ। মূল্য তিন আনা।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব—

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য যথাক্রমে ।৵০ ও ।৵০ আনা। ডাক্তার শ্রীহরিনাথ ঘোষ, এম, ডি, প্রণীত। বাস, আহার, ব্যায়াম, মাদক, ব্যাধি, রোগী পরিচর্য্যা, অপঘাত প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা আছে। ছাত্রদের ও গৃহস্থের উপকারী গ্রন্থ।

কৃষি-রসায়ন—

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত ১৯৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ সিকা। কৃষিবিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, কৃষির মৃত্তিকা, মনুষ্য ও গবাদির খাদ্য বিচার, সার ও বিবিধ দ্রব্যের চাষের প্রক্রিয়া প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চালাইবার ইচ্ছা যাঁহাদের তাঁহারা এই পুস্তক হইতে সাহায্য পাইতে পারিবেন।

স্বপ্ন—

শ্রীসরস্বতী দেবী কর্তৃক রচিত। প্রথমভাগ চার আনা, দ্বিতীয়ভাগ পাঁচ আনা। প্রকাশক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, হবিবপুর, নদীয়া। দুখানিই পদ্য পুস্তক। লেখিকার পদ্য রচনার শক্তি নাই, কবিত্ব ত নাইই। এবং বক্তব্য তত্ত্বকথা আর উপদেশ; কিন্তু উদ্দেশ্য দুর্ভেদ্য।

প্রবাসীর নিজের কথা

প্রবাসীর প্রথম বৎসর হইতে এ পর্য্যন্ত কিরূপ মূল্যবৃদ্ধি ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

বৎসর	মূল্য	ছবির সংখ্যা	পৃষ্ঠার সংখ্যা।
১৩০৮	২॥০	১৬০	৪৬৬
১৩০৯	২॥০	১৬০	৪২৮
১৩১০	৩	৮৮	৫৬০
১৩১১	৩	১০৬	৬৮০
১৩১২	৩	১১২	৭৭৪
১৩১৩	৩৷৵০	১২২	৭০৮
১৩১৪	৩৷৵০	১২৪	৭৬২
১৩১৫	৩৷৵০	১২৩	৭১২
১৩১৬	৩৷৵০	১৫১	১০৬৮
১৩১৭	৩৷৵০	২১৩	১২৬২
১৩১৮	৩৷৵০ (ভাদ্র পর্য্যন্ত)	১০২	৫৪৪

তদ্ভিন্ন ১৩১৫ সালের মাঘ মাস হইতে প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে তিন রঙে ছাপা ছবি দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে দেওয়া হইত।

অনেকে বিনামূল্যে বা ন্যূন মূল্যে প্রবাসী চান, তাহা আমরা দিতে অসমর্থ। কারণ ইহা লাভের জিনিষ নহে।

"রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে সাধারণতঃ কোন চিঠির জবাব দেওয়া হয় না", সকলে অনুগ্রহ করিয়া প্রবাসীর এই নিয়মটি মনে রাখিবেন।

প্রবাসীর ১ পৃষ্ঠা সাধারণ পুস্তকের ২॥০ পৃষ্ঠার সমান। একখানি প্রবাসী ২৫০ পৃষ্ঠা পরিমিত সাধারণ একখানি বহির সমান। এরূপ বহির বাজার দর সাধারণতঃ ১৲ টাকা। গ্রাহকগণ সুতরাং প্রতি মাসে এই এক টাকার জিনিষ চারি আনায় পান। তা ছাড়া সুন্দর সুন্দর ছবি পান।

কেহ কেহ কোন মাসে বা মধ্যে মধ্যে প্রবাসী যথাসময়ে না পাইয়া অভিযোগ করিবার সময় বার্ষিক মূল্যের উপর আবার চিঠি লিখিবার অতিরিক্ত ব্যয় হয় বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আমরা নাচার। আমরা সকল গ্রাহককেই যথাসাধ্য সাবধানতার সহিত প্রবাসী পাঠাইয়া থাকি। আমাদের কেবল সান্ত্বনা এই যে আমরা এক টাকার জিনিষ চারি আনায় দিতেছি।

কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, প্রতারক প্রভৃতি উপাধি দিয়া থাকেন।

গ্রাহকগণকে জানান দরকার যে তাঁহারা টাকা দিয়া ভি, পি, প্যাকেট লইলেই আমরা নিশ্চয় টাকা পাইয়াছি, এরূপ মনে করিবেন না। ডাকবিভাগের গোলমালে আমরা অনেকের টাকা বড় বিলম্বে অনেক লেখালেখির পর পাই। কাহারও কাহারও টাকা মোটেই পাই না। কাহারও কাহারও টাকা পাই, কিন্তু ডাকবিভাগ নাম ঠিকানা ভাল করিয়া লিখিয়া না দেওয়ায় কাগজ পাঠান হয় না। কেহ কেহ যেখানে ভি, পি, লয়েন, সেখান হইতে পরে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় কাগজ পান না ও আমাদিগকে দোষী করেন। আমরা যে ঠিকানা হইতে টাকা পাই তাহাই গ্রাহকের খাতায় লিখিয়া রাখি।

প্রতিমাসে অনেক গ্রাহক কাগজ পান না বলিয়া অভিযোগ করেন। কেন পান না, তাহা আমরা কেবল অনুমান করিতে পারি মাত্র, নিশ্চিত বলিতে পারি না। কোন কোন গ্রাহক এইরূপ লেখেন যে তাহাকে ঠকাইয়া পাঁচ আনা লাভ করিবার জন্য আমরা নিশ্চয়ই তাহাকে কাগজ পাঠাই নাই।

এই জন্য সমস্ত অসুবিধা প্রতিকারের গ্রাহকগণের উচিত ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বা সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগকে ও স্থানীয় পোষ্ট আপিসে খবর দেওয়া। এই পূজার সময় অনেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিবেন। সে সময় প্রবাসীর ঠিকানা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় নিয়মটি গ্রাহকেরা স্মরণ করিবেন। আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসী কলেবরে বিপুল হইবে; এজন্য ঐ সংখ্যা খুচরা কিনিতে মূল্য ১৲ টাকা লাগিবে; কিন্তু গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু লাগিবে না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ-সুবর্ণ-পদক

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান" বিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য ২টি সুবর্ণ পদক দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামে শ্রীমতী হেমলতা দেবী এই দুটি পদক দিবেন। একটির জন্য কেবল লেখিকারা প্রবন্ধ পাঠাইবেন। অপরটির জন্য লেখক ও লেখিকা উভয়েই প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ আমার নামে ১৩১৮ চৈত্র সংক্রান্তির মধ্যে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধগুলি উপযুক্ত পরীক্ষকগণের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে। উহা লেখক বা লেখিকার নিজের রচনা হওয়া চাই। অপরের রচিত পুস্তক বা প্রবন্ধের নকল বা সংক্ষিপ্তসার হইলে চলিবে না। ইতি—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

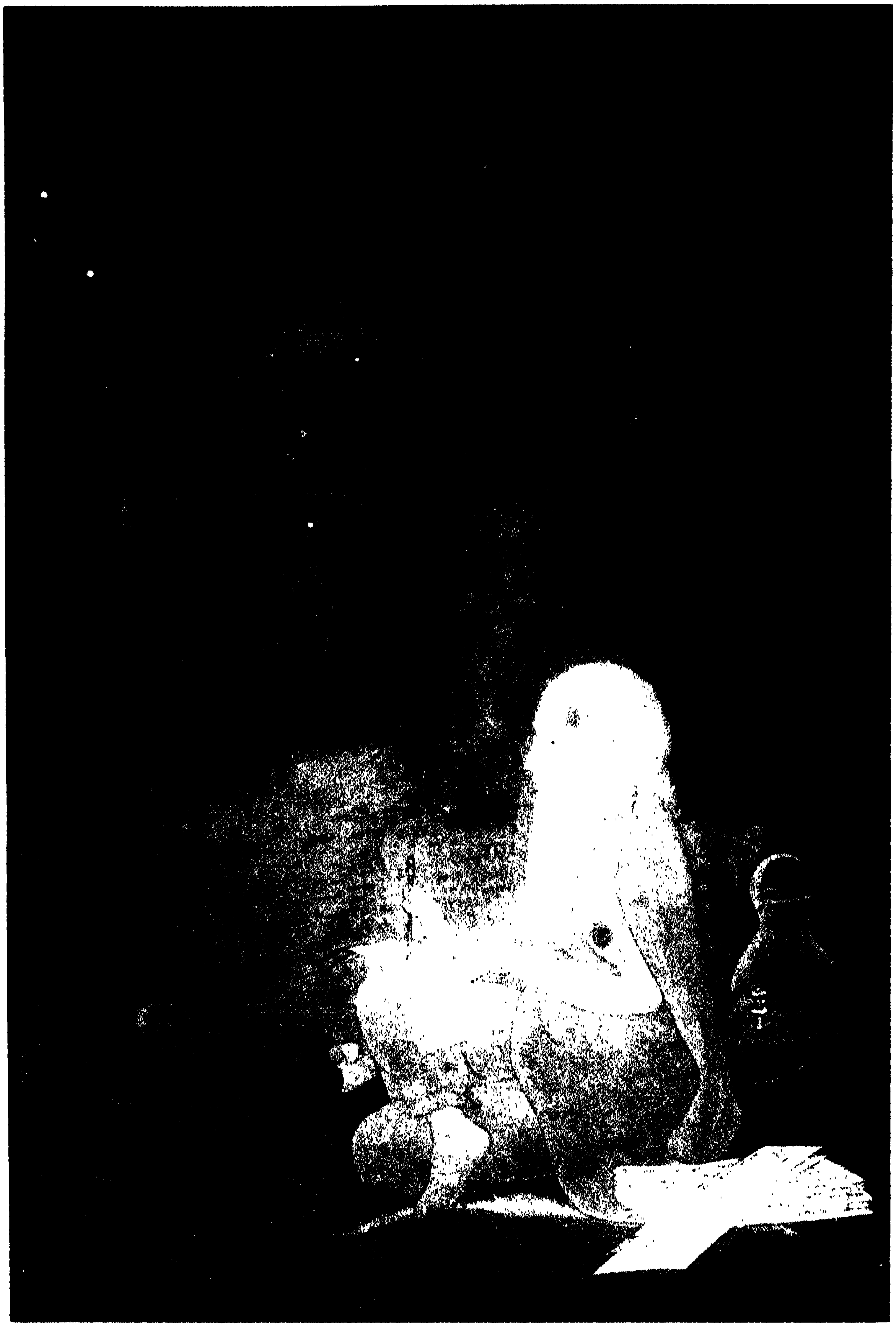

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১১শ ভাগ | আশ্বিন, ১৩১৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১ম খণ্ড

অচলায়তন*

১

অচলায়তনের গৃহ।

পঞ্চক

(গান)

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানেনা,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানেনা।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ ত টানেনা।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক

গান! আবার গান!

পঞ্চক

দাদা, তুমি ত দেখ্‌লে—তোমাদের এখানকার মন্ত্রতন্ত্র আচার আচমন সূত্র বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক

সে ত দেখ্‌তে বাকি নেই—কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?

পঞ্চক

একমাত্র ঐটেই যে পারি।

মহাপঞ্চক

পারি! ভারি অহঙ্কার! গান ত পাখীও গাইতে পারে। সেই যে বজ্রবিদারণ মন্ত্রটা আজ সাত দিন ধরে তোমার মুখস্থ হল না আজ তার কি করলে?

পঞ্চক

সাত দিন যেমন হয়েছে অষ্টম দিনেও অনেকটা সেই রকম। বরঞ্চ একটু খারাপ।

মহাপঞ্চক

খারাপ! তার মানে কি হল!

পঞ্চক

জিনিষটা যতই পুরোনো হচ্চে মন ততই লাগ্‌চেনা, ভুল ততই করচি—ভুল যতই বেশিবার করচি ততই সেইটেই পাকা হয়ে যাচ্চে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্চি দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাৎ হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।

মহাপঞ্চক

সেই তফাৎটা ঘোচাতে হবে, নির্ব্বোধ

---

* আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপে এই অচলায়তন নাটকখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম।
১৫ই আষাঢ়, ১৩১৮। শিলাইদহ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চক

সহজেই ঘোচে, যদি তোমাদেরটাকেই আমার মত করে নাও! নইলে, আমিত পারব না।

মহাপঞ্চক

পারবে না কি। পারতেই হবে।

পঞ্চক

তা হলে আর একবার সেই গোড়া থেকে চেষ্টা করে দেখি—একবার মন্ত্রটা আউড়ে দিয়ে যাও।

মহাপঞ্চক

আচ্ছা, বেশ, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে যাও! ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর বসন্যানি। চুপ করে রইলে যে।

পঞ্চক

ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—আচ্ছা দাদা।

মহাপঞ্চক

আবার দাদা! মন্ত্রটা শেষ কর বলচি।

পঞ্চক

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এ মন্ত্রটার ফল কি!

মহাপঞ্চক

এ মন্ত্র প্রত্যহ সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তে উনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়।

পঞ্চক

রক্ষা কর দাদা। এটা জপ করতে গিয়ে আমার এক বেলাকেই নব্বই বছর মনে হয়—দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেছি।

মহাপঞ্চক

আমার ভাই হয়েও তোমার এই দশা! তোমার জন্যে আমাদের এই অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজ্জা!

পঞ্চক

লজ্জার ত কোনো কারণ নেই দাদা!

মহাপঞ্চক

কারণ নেই?

পঞ্চক

না। তোমার পাণ্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য্য হয় তুমি আমারই দাদা বলে!

মহাপঞ্চক

এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত। দেখ পঞ্চক, তুমিত আর বালক নও—তোমার এখন বিচার করে দেখবার বয়স হয়েছে!

পঞ্চক

তাইত বিপদে পড়েছি। আমি যা বিচার করি তোমাদের বিচার একেবারে তার উল্টো দিকে চলে, অথচ তার জন্যে যা দণ্ড সে আমাকে একলাই ভোগ করতে হয়।

মহাপঞ্চক

পিতার মৃত্যুর পর কি দরিদ্র হয়ে, সকলের কি অবজ্ঞা নিয়েই এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিলুম, আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে কত উপরে উঠেছি, আমার এই দৃষ্টান্তও কি তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না!

পঞ্চক

সচেষ্ট করবার ত কথা নয়। তুমি যে নিজগুণেই দৃষ্টান্ত হয়ে বসে আছ, ওর মধ্যে আমার চেষ্টার ত কিছুমাত্র দরকার হয় না। তাই নিশ্চিন্ত আছি।

মহাপঞ্চক

ঐ শঙ্খ বাজ্‌ল। এখন আমার সপ্তকুমারিকাগাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্চি সময় নষ্ট কোরোনা!

[প্রস্থান।

পঞ্চক

(গান)

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ ত হানেনা!
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ ত আনেনা।
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানেনা!

(ছাত্রদলের প্রবেশ)

প্রথম

ওহে পঞ্চক।

পঞ্চক

না ভাই, আমাকে বিরক্ত কোরো না।

দ্বিতীয়

কেন? হল কি তোমার?

পঞ্চক

ওঁ তট তট তোতয় তোতয় —

তৃতীয়

এখনো তট তট তোতয় তোতয় ঘুচল না? ওযে আমাদের কোনকালে শেষ হয়ে গেছে তা মনেও আনতে পারিনে।

প্রথম

না ভাই, পঞ্চককে একটু পড়তে দাও; নইলে ওর কি গতি হবে। এখনো ও বেচারা তট তট করে মরচে—আমাদের যে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী পর্য্যন্ত শেষ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়

আচ্ছা পঞ্চক, এখনো তুমি চক্রেশমন্ত্র শেখনি?

পঞ্চক

না।

তৃতীয়

মরীচী?

পঞ্চক

না।

প্রথম

মহামরীচী?

পঞ্চক

না।

দ্বিতীয়

পর্ণশবরী?

পঞ্চক

না।

তৃতীয়

আচ্ছা বল দেখি হরেত পক্ষীর নখাগ্রে যে পরিমাণ ধূলিকণা লাগে সেই পরিমাণ যদি —

পঞ্চক

আরে ভাই, হরেত পক্ষীই কোনো জন্মে দেখিনি ত তার নখাগ্রের ধূলিকণা!

প্রথম

হরেত পক্ষীত আমরাও কেউ দেখিনি — শুনেছি সে দধি-সমুদ্রের পারে মহাজম্বুদ্বীপে বাস করে — কিন্তু এ সমস্ত ত জানা চাই, নিতান্ত মূর্খ হয়ে জীবনটাকে মাটি করলে ত চলবে না!

দ্বিতীয়

পঞ্চক, তুমি আর বৃথা সময় নষ্ট কোরো না। তোমার কাছে ত কেউ বেশি আশা করে না। অন্তত শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চু পরীক্ষা, ছাগলোম-শোধন, দ্বাবিংশ-পিশাচভয়ভঞ্জন—এগুলো ত জানা চাইই — নইলে তুমি অচলায়তনের ছাত্র বলে লোক-সমাজে পরিচয় দেবে কোন লজ্জায়?

তৃতীয়

চল বিশ্বম্ভর! আমরা যাই, ও একটু পড়ুক।

[গমনোদ্যত]

পঞ্চক

ওহে বিশ্বম্ভর! তট তট তোতয় তোতয়—

বিশ্বম্ভর

কেন? আবার ডাক কেন?

পঞ্চক

সঞ্জীব, জয়োত্তম! তট তট তোতয় তোতয়—

সঞ্জীব

কি হয়েছে! পড়না।

পঞ্চক

দোহাই তোমাদের, একেবারে চলে যেয়োনা। ঐ শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান জীবের মুখ দেখলে তবু আশ্বাস হয় যে জগৎটা বিধাতা পুরুষের প্রলাপ নয়।

জয়োত্তম

না হে, মহাপঞ্চক বড় রাগ করেন। তিনি মনে করেন, তোমার যে কিছু হচ্ছে না তার কারণ আমরা।

পঞ্চক

আমি যে কারো কোনো সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজগুণেই অকৃতার্থ হতে পারি দাদা আমার এটুকু ক্ষমতাও স্বীকার করেন না এতেই আমি বড় দুঃখিত হই। আচ্ছা ভাই তোমরা ঐখানে একটু তফাতে বসে কথাবার্ত্তা কও। যদি দেখ একটু অন্যমনস্ক হয়েছি আমাকে সতর্ক করে দিয়ো। ফট্ ফট্ স্ফোটয় স্ফোটয়—

জয়োত্তম

আচ্ছা বেশ, এইখানে আমরা বসচি।

সঞ্জীব

বিশ্বম্ভর, তুমি যে বল্লে এবার আমাদের আয়তনে গুরু আসবেন সেটা শুনলে কার কাছ থেকে ?

বিশ্বম্ভর

কি জানি, কারা সব বলাকওয়া করছিল। কেমন করে চারদিকেই রটে গিয়েছে যে চতুর্ম্মাস্যের সময় গুরু আসবেন।

পঞ্চক

ওহে বিশ্বম্ভর, বল কি ? আমাদের গুরু আসবেন না কি ?

সঞ্জীব

আবার পঞ্চক! তোমার কাজ তুমি কর না।

পঞ্চক

ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম

কিন্তু অধ্যাপকদের কারো কাছে শুনেছ কি ? মহাপঞ্চক কি বলেন ?

বিশ্বম্ভর

তাঁকে জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। মহাপঞ্চক কারো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। আজকাল তিনি আর্য্যঅষ্টোত্তরশত নিয়ে পড়েছেন—তাঁর কাছে ঘেঁষে কে।

পঞ্চক

চলনা ভাই, আচার্য্যদেবের কাছে যাই—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই—

জয়োত্তম

আবার, ফের !

পঞ্চক

ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম

আমার ত উনিশ বছর বয়স হল এর মধ্যে একবারো আমাদের গুরু এ আয়তনে আসেননি। আজ তিনি হঠাৎ আসতে যাবেন এটা বিশ্বাস করতে পারিনে।

সঞ্জীব

তোমার তর্কটা কেমনতর হল হে, জয়োত্তম ? উনিশ বছর আসেননি বলে বিশ বছরে আসাটা অসম্ভব হল কোন যুক্তিতে ?

বিশ্বম্ভর

তা হলে ত অঙ্কশাস্ত্রটাই অপ্রমাণ হয়ে যায়। তবে ত উনিশ পর্য্যন্ত বিশ নেই বলে উনিশের পরেও বিশ থাকতে পাবে না।

সঞ্জীব

শুধু অঙ্ক কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও টেঁকে না। কারণ, যা এ মুহূর্ত্তে ঘটেনি, তা ও মুহূর্ত্তেই বা ঘটে কি করে ?

জয়োত্তম

আরে! ঐটেই ত আমার তর্ক। কে বল্লে ঘটে! যা পূর্ব্বে ঘটেনি তা কিছুতেই পবে ঘটতে পারে না। আচ্ছা, এস, কিছু যে ঘটে সেইটে প্রমাণ করে দাও।

পঞ্চক

জয়োত্তমের কাঁধে চড়িয়া

প্রমাণ ? এই দেখ প্রমাণ ! ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম

আঃ পঞ্চক। কর কি। নাব বলচি। আঃ নাব।

পঞ্চক

আমি যে তোমার কাঁধে চড়েছি সেটা প্রমাণ না করে দিলে আমি কিছুতেই নাব্‌চিনে। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক

পঞ্চক ! তুমি বড় উৎপাত করচ !

পঞ্চক

দাদা, এরাই গোল করছিল। আমি আরো থামিয়ে দেবার জন্যেই এসেছি। তট তট তোতয় তোতয় ফট ফট—

মহাপঞ্চক

তোমার নিজের কাজ অবহেলা করবার একটা উপলক্ষ্য জুটলেই তোমাকে সম্বরণ করা অসম্ভব।

বিশ্বম্ভর

দেখুন, একটা জনশ্রুতি শুনতে পাচ্ছি, বর্ষার আরম্ভে আমাদের গুরু নাকি এখানে আসবেন।

মহাপঞ্চক

আসবেন কিনা তা নিয়ে আন্দোলন না করে' যদিই আসেন তার জন্যে প্রস্তুত হও।

পঞ্চক

তিনি যদি আসেন তিনিই প্রস্তুত হবেন। এদিক থেকে আবার আমরাও প্রস্তুত হতে গেলে হয় ত মিথ্যে একটা গোলমাল হবে।

মহাপঞ্চক

ভারি বুদ্ধিমানের মতই কথা বল্লে!

পঞ্চক

অন্নের গ্রাস যখন মুখের কাছে এগয় তখন মুখ স্থির হয়ে সেটা গ্রহণ করে—এ ত সোজা কথা! আমার ভয় হয় গুরু এসে হয় ত দেখ্‌বেন আমরা যেদিক দিয়ে প্রস্তুত হতে গিয়েছি সে দিকটা একেবারে উল্টো। সেইজন্যে আমি কিছু করিনে।

মহাপঞ্চক

পঞ্চক, আবার তর্ক?

পঞ্চক

তর্ক করতে পারিনে বলে রাগ কর, আবার দেখি পারলেও রাগো!

মহাপঞ্চক

যাও তুমি।

পঞ্চক

যাচ্চি, কিন্তু বলনা গুরু কি সত্যই আসবেন?

মহাপঞ্চক

তাঁর সময় হলেই তিনি আসবেন।

[প্রস্থান]

সঞ্জীব

মহাপঞ্চক কোনো কথার শেষ উত্তর দিয়েছেন এমন কখনই শুনিনি।

জয়োত্তম

কোনো কথার শেষ উত্তর নেই বলেই দেন না। মূর্খ যারা তারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যারা অল্প জানে তারাই জবাব দেয়, আর যারা বেশি জানে তারা জানে যে জবাব দেওয়া যায় না।

পঞ্চক

সেই জন্যেই উপাধ্যায় মহাশয় যখন শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করেন তোমরা জবাব দাও কিন্তু আমি একেবারে মূক হয়ে থাকি।

জয়োত্তম

কিন্তু প্রশ্ন না করতেই যে কথাগুলো বল, তাতেই—

পঞ্চক

হাঁ, তাতেই আমার খ্যাতি রটে গেছে, নইলে কেউ আমাকে চিনতেই পারত না।

বিশ্বম্ভর

দেখ পঞ্চক, যদি গুরু আসেন তাহলে তোমার জন্যে আমাদের সকলকেই লজ্জা পেতে হবে।

সঞ্জীব

আটাত্ন প্রকার আচমন-বিধির মধ্যে পঞ্চক বড় জোর পাঁচটা প্রকরণ এতদিনে শিখেছে।

পঞ্চক

সঞ্জীব, আমার মনে আঘাত দিয়ো না। তুমি অত্যুক্তি করচ!

সঞ্জীব

অত্যুক্তি।

পঞ্চক

অত্যুক্তি নয় ত কি! তুমি বলচ পাঁচটা শিখেছি! আমি দুটোর বেশি একটাও শিখিনি! তৃতীয় প্রকরণে মধ্যমাঙ্গুলির কোন পর্ব্বটা কতবার কতখানি জলে ডুবতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে অন্য আঙুলের অস্তিত্বই ভুলে যাই। কেবল একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা আমার খুব অভ্যাস হয়ে গেছে। হাসচ কেন? বিশ্বাস করচনা বুঝি?

জয়োত্তম

বিশ্বাস করা শক্ত।

পঞ্চক

সেদিন উপাধ্যায় মশায় যখন পরীক্ষা করতে এলেন তখন তাকে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখিয়ে বিস্মিত করবার চেষ্টায় ছিলুম কিন্তু তিনি চোখ পাকিয়ে তর্জ্জনী তুল্লেন, আমার আর এগল না।

বিশ্বম্ভর

না, পঞ্চক, এবার গুরু আসার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।

পঞ্চক

পঞ্চক পৃথিবীতে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে জন্মেছে তেমনি অপ্রস্তুত হয়েই মরবে। ওর ঐ একটি মহদ্‌গুণ আছে, ওর কখনো বদল হয় না।

সঞ্জীব

তোমার সেই গুণে উপাধ্যায় মশায়কে যে মুগ্ধ করতে পেরেছ তা ত বোধ হয় না।

পঞ্চক

আমি তাঁকে কত বোঝাবার চেষ্টা করি যে বিদ্যা সম্বন্ধে আমার একটুও নড়চড় নেই—ঐ যাকে বলে ধ্রুব নক্ষত্র—তাতে সুবিধা এই যে এখানকার ছাত্ররা কে কতদূর এগল তা আমার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

জয়োত্তম

তোমার আশ্চর্য্য এই সুযুক্তিতে উপাধ্যায় মশায়ের বোধ হয়—

পঞ্চক

না, কিছু না—তাঁর মনে কিছুমাত্র বিকার ঘটল না। আমার সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁর যে ধারণা ছিল সেইটেই দেখলুম আরো পাকা হল।

সঞ্জীব

আমরা যদি উপাধ্যায় মশায়কে তোমার মতন অমন যা-তা বলতুম তাহলে রক্ষা থাকত না। কিন্তু পঞ্চকের বেলায়—

পঞ্চক

তার মানে আছে। কুতর্কটা আমার পক্ষে এমনি সুন্দর স্বাভাবিক যে সেটা আমার মুখে ভারি মিষ্ট শোনায়। সকলেই খুসি হয়ে বলে, ঠিক হয়েছে, পঞ্চকের মতই কথা হয়েছে। কিন্তু ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয় না দিতে পারলে তোমাদের আদর নেই। এমনি তোমরা হতভাগ্য।

জয়োত্তম

যাও ভাই পঞ্চক, আর বোকোনা। আমরা চল্লুম। তুমি একটু মন দিয়ে পড়।

[তিনজনের প্রস্থান]

পঞ্চক

হবে না, আমার কিছুই হবে না। এখানকার একটা মন্ত্রও আমার খাটল না।

(গান

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।
যেপথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে,
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরাণ
যেতে চায় কোন অচিন্ পুরে।

ওকি ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই আয়তনে ওর চোখের জল আর শুকল না। ওর কান্না আমি সইতে পারিনে।

[প্রস্থান]

(বালক সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের পুনঃ প্রবেশ)

পঞ্চক

তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল—কি হয়েছে বল্।

সুভদ্র

আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক

পাপ করেছিস্? কি পাপ?

সুভদ্র

সে আমি বলতে পারব না! ভয়ানক পাপ! আমার কি হবে!

পঞ্চক

তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল্।

সুভদ্র

আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের---

পঞ্চক

উত্তর দিকের?

সুভদ্র

হাঁ, উত্তরদিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক

জানলা খুলে কি করলি?

সুভদ্র

বাইরেটা দেখে ফেলেছি!

পঞ্চক

দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্চে যে।

সুভদ্র

হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না---একবার দেখেই তখনি বন্ধ করে ফেলেছি। কোন প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক

ভুলে গেছি ভাই। প্রয়েশ্চিত্ত বিশ পঁচিশ হাজার রকম আছে;—আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তাহলে তার বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত-আমি আসার পর প্রায় তার সব কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখ্‌তে পারিনি।

(বালকদলের প্রবেশ)

প্রথম

আঁ্যা, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়

জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কি ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক

চুপ্‌ চুপ্‌! ভয় নেই সুভদ্র, কাঁদ্‌চিস্‌ কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ত করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাক্‌লে ত মানুষ টিক্‌তেই পারত না।

প্রথম

(চুপি চুপি)

জান পঞ্চক দাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক

আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মত তোদের অমন সাহস আছে?

দ্বিতীয়

আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

তৃতীয়

সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহলে যে সে

পঞ্চক

তাহলে কি?

তৃতীয়

সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক

কি ভয়ানক শুনিই না।

তৃতীয়

জানিনে, কিন্তু সে ভয়ানক!

সুভদ্র

পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা! আমার কি হবে?

পঞ্চক

শোন্‌ বলি সুভদ্র, কিসে কি হয় আমি ভাই কিছুই জানিনে—কিন্তু যাই হোক না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র

ভয় কর না?

সকল ছেলে

ভয় কর না?

পঞ্চক

না। আমি ত বলি, দেখিই না কি হয়।

সকলে

(কাছে ঘেঁসিয়া)

আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক

দেখেছি বই কি। ওমাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল সেদিন আমি কাঁসার থালায়

ইঁদুরের গর্ত্তের মাটি রেখে তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাসকলাই সাজিয়ে নিজে আঠার বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে

আঁ্যা! কি ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র

পঞ্চকদাদা, তোমার কি হল?

পঞ্চক

তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল সে আজ পর্য্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম

কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি!

দ্বিতীয়

মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক

তাঁর রাগটা কি রকম সেইটে দেখবার জন্যেই ত একাজ করেছি।

সুভদ্র

কিন্তু পঞ্চকদাদা যদি তোমাকে সাপে কামড়াত।

পঞ্চক

তাহলে এ সম্বন্ধে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।

প্রথম

কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের উত্তর দিকের জানলাটা—

পঞ্চক

সেটাও আমাকে একবার খুলে দেখতে হবে স্থির করেছি।

সুভদ্র

তুমিও খুলে দেখ্‌বে?

পঞ্চক

হাঁ ভাই সুভদ্র, তাহলে তুই তোর দলের একজন পাবি।

প্রথম

না পঞ্চকদাদা, পায়ে পড়ি পঞ্চকদাদা, তুমি—

পঞ্চক

কেনরে, তোদের তাতে ভয় কি?

দ্বিতীয়

সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক

ভয়ানক না হলে মজা কিসের?

তৃতীয়

সে যে ভয়ানক পাপ।

প্রথম

মহাপঞ্চকদাদা আমাদের বলে দিয়েছেন, ওতে মাতৃহত্যার পাপ হয়। কেন না, উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

পঞ্চক

মাতৃহত্যা করলুম না অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করলুম সেই মজাটা কি রকম, দেখতে আমার ভয়ানক কৌতূহল।

প্রথম

তোমার ভয় করবে না?

পঞ্চক

কিছু না। ভাই সুভদ্র তুই কি দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়

না, না, বলিস্‌নে।

তৃতীয়

না, সে আমরা শুন্‌তে পারবনা কি ভয়ানক!

প্রথম

আচ্ছা, একটু, খুব একটু খানি বল্ ভাই!

সুভদ্র

আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরচে—

বালকগণ

(কানে আঙুল দিয়া)

ও বাবা, না, না, আর শুন্‌বনা! আর বোলোনা সুভদ্র! ঐ যে উপাধ্যায়মশায় আস্‌চেন। চল্ চল—আর না!

পঞ্চক

কেন? এখন তোমাদের কি?

প্রথম

বেশ, তাও জাননা বুঝি? আজ যে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক

তাতে কি?

দ্বিতীয় বালক

আজ কাকিনী সরোবরের নৈঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবেনা ?

পঞ্চক

কেনরে ?

প্রথম বালক

তুমি কিছু জাননা পঞ্চকদাদা ! সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার ল্যাজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে !

দ্বিতীয় বালক

আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন !

পঞ্চক

তাতে তাদের কষ্ট হবে না ?

প্রথম বালক

পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য !

[বালকগণের প্রস্থান]

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

উপাধ্যায়

পঞ্চককে শিশুদের দলেই প্রায় দেখতে পাই।

পঞ্চক

এই আয়তনে ওদের সঙ্গেই আমার বুদ্ধির একটু মিল হয়। ওরা একটু বড় হলেই আর তখন-

উপাধ্যায়

কিন্তু তোমার সংসর্গে যে ওরা অসংযত হয়ে উঠ্‌চে। সেদিন পট্টবস্ম আমার কাছে এসে নালিশ করেছে শুক্রবারের প্রথম প্রহরেই উপতিষ্য তার গায়ের উপর হাই তুলে দিয়েছে।

পঞ্চক

তা দিয়েছে বটে, আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

উপাধ্যায়

সে আমি অনুমানেই বুঝেছি নইলে এত বড় আয়ুক্ষয়কর অনিয়মটা ঘটবে কেন ? শুনেছি তুমি না কি সকলের সাহস বাড়িয়ে দেবার জন্য পট্টবস্মকে ডেকে তোমার গায়ের উপর একশোবার হাই তুলতে বলেছিলে ?

পঞ্চক

আপনি ভুল শুনেছেন।

উপাধ্যায়

ভুল শুনেছি ?

পঞ্চক

একলা পট্টবস্মকে নয় সেখানে যত ছেলে ছিল প্রত্যেককেই আমার গায়ের উপর অন্তত দশটা করে হাই তুলে যাবার জন্যে ডেকেছিলুম—পক্ষপাত করিনি।

উপাধ্যায়

প্রত্যেককেই ডেকেছিলে ?

পঞ্চক

প্রত্যেককেই। আপনি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে জানবেন। কেউ সাহস করে এগল না। তারা হিসেব করে দেখলে পনেরোজন ছেলেতে মিলে দেড় শো হাই তুল্লে তাতে আমার সমস্ত আয়ুক্ষয় হয়ে গিয়েও আরো অনেকটা বাকি থাকে, সেই উদ্বৃত্তটাকে নিয়ে যে কি হবে তাই স্থির করতে না পেরে তারা মহাপঞ্চকদাদাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গেল, তাতেই ত আমি ধরা পড়ে গেছি।

উপাধ্যায়

দেখ, তুমি মহাপঞ্চকের ভাই বলে এত দিন অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর চলবেনা। আমাদের গুরু আসবেন শুনেছ ?

পঞ্চক

গুরু আসচেন ? নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছেন ?

উপাধ্যায়

হাঁ। কিন্তু এতে তোমার উৎসাহের ত কোনো কারণ নেই।

পঞ্চক

আমারই ত গুরুর দরকার বেশি, আমার যে কিছুই শেখা হয়নি।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র

উপাধ্যায় মশায় !

পঞ্চক

আরে পালা পালা ! উপাধ্যায় মশায়ের কাছ থেকে

একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনচি এখন বিরক্ত করিসনে, একেবারে দৌড়ে পালা!

উপাধ্যায়

কি সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কি শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র

আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক

ভারি পণ্ডিত কিনা! পাপ করেছি! পালা বলচি!

উপাধ্যায়

(উৎসাহিত হইয়া)

ওকে তাড়া দিচ্চ কেন? সুভদ্র শুনে যাও।

পঞ্চক

আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মত ছোটে।

উপাধ্যায়

কি বলছিলে?

সুভদ্র

আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়

পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তাহলে বস। শোনা যাক্।

সুভদ্র

আমি আয়তনের উত্তর দিকের

উপাধ্যায়

বল, বল, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র

না, আমি উত্তর দিকের জানলায়

উপাধ্যায়

বুঝেছি কুনুই ঠেকিয়েছ? তাহলে ত সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক

এটা আপনি ভুল বলচেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার--

উপাধ্যায়

তোমার ত স্পর্দ্ধা কম দেখিনে! কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনো দিন খুলে দেখা হয়েছে?

পঞ্চক

(জনান্তিকে)

সুভদ্র যাও তুমি!--কিন্তু কুলদত্তকে ত আমি—

উপাধ্যায়

কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি ত মানতেই হবে, তাতে—

সুভদ্র

উপাধ্যায় মশায় আমি ভয়ানক পাপ করেছি!

পঞ্চক

আবার! সেই কথাই ত হচ্চে। তুই চুপ কর!

উপাধ্যায়

সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র

আঁক কাটিনি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়

(বসিয়া পড়িয়া)

আঃ সর্ব্বনাশ! করেছিস্ কি? আজ তিন শো পয়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলেনি তা জানিস?

সুভদ্র

আমার কি হবে?

পঞ্চক

(সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া)

তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র! তিন শো পয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ! তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায় মশায়ের মুখে আর কথা নেই!

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

উপাধ্যায়

জানিনে কি সর্ব্বনাশ হবে! উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী! বালকের দুই চক্ষু মুহূর্ত্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাব্‌চি! যাই আচার্য্যদেবকে জানাইগে!

[প্রস্থান]

আচার্য্য ও উপাচার্য্যের প্রবেশ

আচার্য্য

এতকাল পরে আমাদের গুরু আসচেন।

উপাচার্য্য

তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য্য

প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে! হয়ত প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য্য

নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য্য

এক এক সময়ে মনে ভয় হয় যে হয়ত অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসচেন।

উপাচার্য্য

না, আচার্য্য দেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করিছি কোনো ত্রুটি ঘটেনি।

আচার্য্য

কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য্য

বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তরবার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়?

আচার্য্য

না আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য্য

কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্চে কেন?

আচার্য্য

দ্বিধা? তা দ্বিধা হচ্চে সে কথা স্বীকার করি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) দেখ সুতসোম, অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠচে, কাউকে বলতে পারচিনে। আমি এই আয়তনের আচার্য্য; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তখন একলা চুপ করে বহন কর্ত্তে হয়। এতদিন তাই বহন করে এসেছি। কিন্তু যে দিন পত্র পেয়েছি গুরু আসচেন সেই দিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারচিনে। সে কেবলি আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠচে—বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা।

উপাচার্য্য

আচার্য্যদেব, বলেন কি! বৃথা, সমস্তই বৃথা!

আচার্য্য

সুতসোম, আমরা এখানে কতদিন হল এসেছি মনে পড়ে কি? কত বছর হবে?

উপাচার্য্য

সময় ঠিক করে বলা বড় কঠিন। এখানে মনের পক্ষে প্রাচীন হয়ে উঠতে বয়সের দরকার হয় না। আমার ত মনে হয় আমি জন্মের বহু পূর্ব্ব হতেই এখানে স্থির হয়ে বসে আছি।

আচার্য্য

দেখ সুতসোম, প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা কিছু পাওয়া যাবে। সেই জন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তারপরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি বলে কিছু একটা আছে। আজ গুরু আসবেন শুনে হঠাৎ মনটা থমকে দাঁড়াল—আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই ত পড়া হল, সব ব্রতই ত পালন করলি, এখন বল মূর্খ কি পেয়েছিস? কিছু না, কিছু না, সুতসোম! আজ দেখ্‌ছি—এই অতি দীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেচে!

উপাচার্য্য

বোলোনা, বোলোনা, এমন কথা বোলোনা! আচার্য্যদেব, আজ কেন হঠাৎ তোমার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হল?

আচার্য্য

সুতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য্য

আমার ত একমুহূর্ত্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য্য

অশান্তি নেই ?

উপাচার্য্য

কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মত বজ্রের মত শক্ত হয়ে জমে গেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কিছুই ভাবতে হয় না! এর চেয়ে আর শান্তি কি হতে পারে ?

আচার্য্য

না, না, তবে আমি ভুল করছিলুম সুতসোম, ভুল করছিলুম। যা আছে, এই ঠিক এই-ই ঠিক। যে করেই হোক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে।

উপাচার্য্য

সেই জন্যেই ত অচলায়তন ছেড়ে আমাদের কোথাও বেরনো নিষেধ। তাতে যে মনের বিক্ষেপ ঘটে—শান্তি চলে যায়।

আচার্য্য

ঠিক্, ঠিক্,—ঠিক বলেছ সুতসোম! অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব! এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এইত নিশ্চল শান্তি! গুরু, তুমি যখন আসবে, কিছু সরিয়োনা, কিছু আঘাত কোরোনা—চারিদিকেই আমাদের শান্তি, সেই বুঝে পা ফেলো। দয়া কোরো, দয়া কোরো আমাদের! আমাদের পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের আর চলবার শক্তি নেই। অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এম্নি করেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ বোলোনা যে নূতনকে চাই—আমাদের আর সময় নেই!

উপাচার্য্য

আচার্য্যদেব, তোমাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখিনি।

আচার্য্য

কি জানি, আমার কেমন মনে হচ্চে কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হচ্চে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্য্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারচনা সুতসোম ?

উপাচার্য্য

কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্চিনে। আমাদের ত বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্য্যাপ্ত।

আচার্য্য

আজ আমার একটু একটু মনে পড়চে বহু পূর্ব্বে সব প্রথমে সেই ভোরের বেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে যার কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম তিনি গুরুই— তিনি পুঁথি নন, শাস্ত্র নন, বৃত্তি নন, তিনি গুরু। তিনি যা ধরিয়ে দিলেন তাই নিয়ে আরম্ভ করলুম—এতদিন মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেইটেই বুঝি আছে, ঠিক চলচে কিন্তু—

উপাচার্য্য

ঠিক আছে, ঠিকই চলচে, আচার্য্যদেব, ভয় নেই! প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিইনি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি। তুমি কি বলতে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে! সর্ব্বনাশ! সেই ছায়া!

আচার্য্য

সর্ব্বনাশই ত!

উপাচার্য্য

তা হলে হবে কি! এতদিন যারা স্তব্ধ হয়ে আছে তাদের কি আবার উঠতে হবে ?

আচার্য্য

আমি ত তাই সাম্‌নে দেখ্‌চি। সে কি আমার স্বপ্ন? অথচ আমার ত মনে হচ্চে এই সমস্তই স্বপ্ন, এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই সব নানা রেখার গণ্ডি, এই

স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি—সমস্তই স্বপ্ন!

উপাচার্য্য

ঐযে পঞ্চক আসচে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরয়? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কি করে সম্ভব হল? শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তাকে কিছুতেই দমন করা গেলনা। ঐ বালককে আমার ভয় হয়। ওই আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল তোমাকেই মানে। তুমি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দিয়ো।

আচার্য্য

আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্য্যের প্রস্থান]

(পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য্য

(পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া)

বৎস, পঞ্চক!

পঞ্চক

করলেন কি? আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য্য

কেন, বাধা কি আছে?

পঞ্চক

আমি যে আচার রক্ষা করতে পারিনি।

আচার্য্য

কেন, পারনি বৎস?

পঞ্চক

প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারিনে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য্য

সৌম্য, তুমি ত জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুসি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পঞ্চক

আচার্য্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।

আচার্য্য

নিয়মের জন্য ভয় নয়, কিন্তু যে লোক ভাঙতে যাবে তারই বা দুর্গতি ঘটতে দেব কেন?

পঞ্চক

আমি কোনো তর্ক করবনা। আপনি নিজমুখে যদি আদেশ করেন যে, আমাকে সমস্ত নিয়ম পালন করতেই হবে তাহলে পালন করব। আমি আচার অনুষ্ঠান কিছুই জানিনে, আমি আপনাকেই জানি।

আচার্য্য

আদেশ করব—তোমাকে? সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবেনা।

পঞ্চক

কেন আদেশ করবেন না প্রভু?

আচার্য্য

কেন? বলব বৎস? তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরোনা।

পঞ্চক

আচার্য্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য্য

কেমন করে বৎস?

পঞ্চক

তা জানিনে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য্য

তুমি কি কর না কর আমি কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে শোণপাংশু জাতির সঙ্গে মেশ?

পঞ্চক

আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান ?

আচার্য্য

না, না, থাক, বোলোনা। কিন্তু শোণপাংশুরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক

তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে ?

আচার্য্য

না, না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করগে—তুমি ভুল করগে—আমাদের কথা শুনোনা। আমাদের গুরু আসচেন পঞ্চক—তাঁর কাছে তোমার মত বালক হয়ে যদি বসতে পারি—তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খুলে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন, তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন আজ থেকে ভুল করে করে সত্য জানবার অধিকার তোমাকে দিলুম, আমার মনের উপর থেকে হাজার হাজার বছরের পুরাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন!

পঞ্চক

ঐ উপাচার্য্য আসচেন,—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই।

[প্রস্থান]

উপাধ্যায় ও উপাচার্য্যের প্রবেশ

উপাচার্য্য

উপাধ্যায়ের প্রতি

আচার্য্যদেবকে ত বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য্য

উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি ?

উপাধ্যায়

অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য্য

অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাচার্য্য

উপাধ্যায় কথাটা বলে ফেল। এদিকে প্রতিকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে। আমাদের গ্রহাচার্য্য বল্‌চেন আজ তিন প্রহর সাড়ে তিন দণ্ডের মধ্যে দ্ব্যাত্মকচরাংশলগ্নে যা কিছু করবার সময়—সেটা অতিক্রম করলেই গো-পরিক্রমণ আরম্ভ হবে, তখন প্রায়শ্চিত্তের কেবল এক পাদ হবে বিপ্র, অর্দ্ধ পাদ বৈশ্য, বাকি সমস্তটাই শূদ্র।

উপাধ্যায়

আচার্য্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানালা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য্য

উত্তরদিকটা ত একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়

সেইত ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রঃপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা ত যায় না।

উপাচার্য্য

এখন কথা হচ্চে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

আচার্য্য

আমার ত স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি

উপাধ্যায়

না, আমিও ত মনে আনতে পারিনে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয়নি—সবাই ভুলেই গেছে। ঐ যে মহাপঞ্চক আসচে—যদি কারো জানা থাকে ত সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়

মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক

সেই জন্যেই ত এলুম, আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য্য

এর প্রায়শ্চিত্ত কি, আমাদের কারো স্মরণ নেই—তুমিই বলতে পার।

মহাপঞ্চক

ক্রিয়া-কল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান্ জলনানন্তকৃত আধিকর্ম্মিক বর্ষায়ণে লিখ্‌চে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য্য

মহাতামস ?

মহাপঞ্চক

হাঁ, আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখ্‌তে পাবে না। কেন না আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য্য

তাহলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপরই রইল।

উপাধ্যায়

চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে তিঙ্গুমর্দ্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনিগে।

[সকলের গমনোদ্যম]

আচার্য্য

শোন, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়

কিসের প্রয়োজন নেই ?

আচার্য্য

প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক

প্রয়োজন নেই বল্‌চেন! আধিকর্ম্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্চি—

আচার্য্য

দরকার নেই—সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্ব্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক

এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য্য

না, হতে দেবনা, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়

এ রকম দুর্ব্বলতা ত আপনার কোনো দিন দেখিনি। এই ত সে বার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন একবিন্দু জল দেওয়া গেল না তখন ত আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মবিধি ত চিরকালের।

(সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ)

পঞ্চক

ভয় নেই, সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু!

আচার্য্য

বৎস, তুমি কোনো পাপ করনি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্চে পাপ তাদেরই। এস পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান]

উপাধ্যায়

এ কি হল উপাচার্য্য মশায় ?

মহাপঞ্চক

আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাস সমস্তই পণ্ড হতে থাক্‌ল, এ ত সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়

এ সহ্য করা চল্‌বেই না। আচার্য্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছর সঙ্গে সমান করে দিতে চান্ ?

মহাপঞ্চক

উনি আজ সুভদ্রকে বাচাতে গিয়ে সনাতন ধর্ম্মকে বিনাশ করবেন! এ কি রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল? এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য্য বলে গণ্য করাই চল্‌বে না।

উপাচার্য্য

সে কি হয়? যিনি একবার আচার্য্য হয়েছেন তাঁকে কি আমাদের ইচ্ছামত—

মহাপঞ্চক

উপাচার্য্য মশায়, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

উপাচার্য্য

নূতন কিছুতে যোগ দেবার বয়স আমার নয়।

উপাধ্যায়

আজ বিপদের সময় বয়স-বিচার!

উপাচার্য্য

ধর্ম্মকে বাঁচাবার জন্যে যা করবার কর। আমাকে

দাঁড়াতে হবে আচার্য্যদেবের পাশে। আমরা একসঙ্গে এসেছিলুম, যদি বিদায় হবার দিন এসে থাকে তবে একসঙ্গেই বাহির হয়ে যাব।

মহাপঞ্চক

কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে দেখবেন। আচার্য্যদেবের অভাবে আপনারই আচার্য্য হবার অধিকার।

উপাচার্য্য

মহাপঞ্চক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্য্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এ কথা বলবার জন্যে তুমি যে মুখ খুলেছ সে কি এখানকার উত্তরদিকের জানালা খোলার চেয়ে কম পাপ!

[প্রস্থান]

মহাপঞ্চক

চল উপাধ্যায়, আর বিলম্ব নয়। আচার্য্য অদীনপুণ্য যতক্ষণ এ আয়তনে থাকবেন ততক্ষণ ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত বন্ধ, ততক্ষণ আমাদের অশৌচ।

২

পাহাড় মাঠ।

পঞ্চক

(গান)

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক্ পানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে!
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে!

(পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশুদলের নৃত্য)

পঞ্চক

ও কিরে! তোরা কখন্ পিছনে এসে নাচ্‌তে লেগেছিস।

প্রথম শোণপাংশু

আমরা নাচ্‌বার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখ্‌তে পারিনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আয় ভাই ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক

আরে না না, আমাকে ছুঁস্‌নেরে ছুঁস্‌নে!

তৃতীয় শোণপাংশু

ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে! শোণপাংশুকে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক

জানিস্, আমাদের গুরু আস্‌বেন?

প্রথম শোণপাংশু

সত্যি নাকি! তিনি মানুষটি কি রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক

নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আচ্ছা এলে খবর দিয়ো—একবার দেখ্‌ব তাঁকে।

পঞ্চক

তোরা দেখ্‌বি কিরে! সর্ব্বনাশ! তিনি ত শোণপাংশুদের গুরু নন্। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সে জন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সাব রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও ত গুরু আছে—তাকে নিয়েই—

তৃতীয় শোণপাংশু

গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়! আমরা ত হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্য্যন্ত আমরা ত কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম শোণপাংশু

সেই জন্যেই ত ও জিনিষটা কি রকম দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক—তার কি জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য্য কি একটা ফল পাবে—তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু

কিন্তু শোণপাংশু বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয় সে লেগেই রয়েছে।

তোমরা মন্ত্র দাওনা বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম শোণপাংশু

কিন্তু পঞ্চক দাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক

বলতে পারি নে—কি জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস্—সেইটে যে বড় দোষ! তোরা চাষ করিস ত?

প্রথম শোণপাংশু

চাষ করি বই কি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

(গান)

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয়রে দেখা,
মাতেরে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।

পঞ্চক

আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস্ সেও কোনো মতে সহ্য হয়—কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস্?

প্রথম শোণপাংশু

করি বই কি।

পঞ্চক

কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস্ বুঝি?

তৃতীয় শোণপাংশু

কেন করব না! এখান থেকেইত কাঁকুড় খেসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক

তা ত যায়, কিন্তু জানিস্ নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিইনে।

প্রথম শোণপাংশু

কেন?

পঞ্চক

কেন কি রে? ওটা যে নিষেধ!

প্রথম শোণপাংশু

কেন নিষেধ?

পঞ্চক

শোন একবার! নিষেধ, তার আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ! এই সহজ কথাটা বুঝিসনে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ!

দ্বিতীয় শোণপাংশু

কেন? ওটা কি তোমরা খাওনা?

পঞ্চক

খাই বইকি, খুব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াইনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

কেন?

পঞ্চক

ফের কেন! তোরা যে এত বড় নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে খবর রাখিস্‌নে বুঝি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক

আবার কেন? তোরা যে ঐ এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুল্লি!

তৃতীয় শোণপাংশু

আর, খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক

একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্ এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনি সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের ক্ষেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড় তেজ! তোরা হলে কি করতিস্ বল দেখি!

প্রথম শোণপাংশু

আমাদের কথা বল কেন। উপবাসের দিনে গেঁসারি ডাল যদি গোঁফের উপর পর্য্যন্ত এগিয়ে আসে তাহলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস্ তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস্?

প্রথম শোণপাংশু

লোহার কাজ করি বইকি, খুব করি!

পঞ্চক

রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা পিতলের কাজ করে আস্‌চি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটনো সে ত হতেই পারেনা!

তৃতীয় শোণপাংশু

আমরা লোহার কাজ করি তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।

(গান)

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনুরে!
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন
ওগো তায় জাগাইনুরে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনুরে।
অচল ছিল, সচল হয়ে
ছুটেছে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনুরে।

পঞ্চক

সেদিন উপাধ্যায় মশায় একঘর ছাত্রের সাম্‌নে বল্লেন শোণপাংশু জাতটা এমনি বিশ্রী যে তারা নিজের হাতে লোহার কাজ করে। আমি তাঁকে বল্লুম, ও বেচারারা পড়াশুনো কিছুই করেনি সে আমি জানি—এমন কি, এই পৃথিবীটা যে ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথা-মুড়োনো চুলের জটা দিয়ে তৈরি তাও ঐ মূর্খেরা জানে না, আবার সে কথা বল্‌তে গেলে মারতে আসে,—তাই বলে ভাল মন্দর জ্ঞান কি ওদের এতটুকুও নেই যে লোহার কাজ নিজের হাতে করবে! আজ ত স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি যার যে বংশে জন্ম তার সেই রকম বুদ্ধিই হয়।

প্রথম শোণপাংশু

কেন, লোহা কি অপরাধটা করেছে?

পঞ্চক

আরে ওটা যে লোহা সে ত তোকে মানতেই হবে।

প্রথম শোণপাংশু

তা ত হবে।

পঞ্চক

তবে আর কি—এই বুঝে নে না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

তবু একটা ত কারণ আছে।

পঞ্চক

কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। সুতরাং মহাপঞ্চক দাদা ছাড়া আর অতি অল্প লোকেরই জানবার সম্ভাবনা আছে। সাধে মহাপঞ্চক দাদাকে ওখানকার ছাত্রেরা একেবারে পূজো করে। যা হোক ভাই তোরা যে আমাকে ক্রমেই আশ্চর্য্য করে দিলিরে! তোরা ত গেঁসারিডাল চাষ করচিস্ আবার লোহাও পিটচ্চিস্, এখনো তোরা কোনো দিক্ থেকে কোনো পাঁচ চোখ কিম্বা সাত মাথাওয়ালার কোপে পড়িস্ নি?

প্রথম শোণপাংশু

যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে তারও কোপ বড় কম নয়!

পঞ্চক

আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

মন্ত্র! কিসের মন্ত্র?

পঞ্চক

এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র—তট তট তোতয় তোতয়

তৃতীয় শোণপাংশু

ওর মানে কি ?

পঞ্চক

আবার ! মানে ! তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয় ! সব কথাতেই মানে ! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস ?

প্রথম শোণপাংশু

না।

পঞ্চক

মরীচী ?

প্রথম শোণপাংশু

না।

পঞ্চক

মহাশীতবতী ?

প্রথম শোণপাংশু

না।

পঞ্চক

উষ্ণীষবিজয় ?

প্রথম শোণপাংশু

না।

পঞ্চক

নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কি ?

তৃতীয় শোণপাংশু

সেদিন নাপিতের দুইগালে চড় কসিয়ে দিই।

পঞ্চক

নারে না, আমি বল্‌চি সেদিন নদীপার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকয় উঠ্‌তে পারিস্ ?

তৃতীয় শোণপাংশু

খুব পারি।

পঞ্চক

ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলিরে ! আমি আর থাক্‌তে পারচিনে ! তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্চেনা। এমন জবাব যদি আর একটা শুনতে পাই তাহলে তোদের বুকে করে নিয়ে পাগলের মত নাচব, আমার জাতমান কিছু থাক্‌বেনা। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস্ ? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করেনা ?

(শোণপাংশুগণের গান)

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক

সর্ব্বনাশ করলেরে আমার সর্ব্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখ্‌লে না ! এদের তালে তালে আমারো পা দুটো নেচে উঠচে ! আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখ্‌চি। কোন দিন আমিও লোহা পিটবরে লোহা পিটব—কিন্তু খেসারির ডাল——না, না, পালা ভাই, পালা তোরা ! দেখ্‌চিসনে পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

ও কি পুঁথি দাদা ? ওতে কি আছে ?

পঞ্চক

এ আমাদের দিক্‌চক্রচান্দ্রিকা—এতে বিস্তর কাজের কথা আছে রে !

প্রথম শোণপাংশু

কি রকম ?

পঞ্চক

দশটা দিকের দশ রকম রং গন্ধ আর স্বাদ আছে কিনা এতে তার সমস্ত খোলসা করে লিখেছে। দক্ষিণদিকের রংটা হচ্চে রুইমাছের পেটের মত, ওর গন্ধটা দধির গন্ধ, স্বাদটা ঈষৎ মিষ্টি ; পূর্ব্বদিকের রংটা হচ্চে সবুজ, গন্ধটা মদমত্ত হাতির মত, স্বাদটা বকুলের ফলের মত কষা,—নৈঋৎ কোণের—

দাদাঠাকুর

না ভাই, বড় হয়নি, সত্য হয়ে উঠেছে— সত্য যে বড়ই, ছোটই ত মিথ্যা।

পঞ্চক

তোমার বাধা কেটে গেছে দাদাঠাকুর, সব বাধা কেটে গেছে। এমন হাসতে খেলতে মিলতে মিশতে কাজ করতে কাজ ছাড়তে কে পারে। তোমার ঐ ভাব দেখে আমার মনটা ছটফট করতে থাকে। ঐযে কি একটা আছে চরম, না পরম, না কি তা কে বলবে তার জন্যে দিনরাত যেন আমার মন কেমন করে। থেকে থেকে এক একবার চমকে উঠি, আর ভাবি এইবার বুঝি হল, বুঝি পাওয়া গেল। দাদাঠাকুর, শুনচি আমাদের গুরু আস্‌বেন।

দাদাঠাকুর

গুরু! কি বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হ'লে ত!

পঞ্চক

একটু উৎপাত হলে যে বাচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌চে।

দাদাঠাকুর

তোমার যে শিক্ষা কাচা রয়েছে, মনে ভয় হচ্চে না?

পঞ্চক

আমার ভয় সব চেয়ে কম আমার একটি ভুলও হবে না।

দাদাঠাকুর

হবে না?

পঞ্চক

একেবারে কিছুই জানিনে, ভুল করবার জায়গাই নেই। নির্ভয়ে চুপ করে থাকব।

দাদাঠাকুর

আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাঁকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলত?

পঞ্চক

ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর! মনে মনে প্রার্থনা করচি গুরু এসে যেদিকে হোক্ একদিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন্। নয়ত খুব কসে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্‌টা হয়ে যাই।

দাদাঠাকুর

তা, তোমার গুরু তোমার উপর যত পুঁথির চাপই চাপান না কেন তার নীচের থেকে তোমাকে আস্ত টেনে বের করে আনতে পারব।

পঞ্চক

তা তুমি পারবে সে আমি জানি। কিন্তু দেখ ঠাকুর একটা কথা তোমাকে বলি অচলায়তনের মধ্যে ঐ যে আমরা দরজা বন্ধ করে আছি, দিব্বি আছি। ওখানে আমাদের সমস্ত বোঝাপড়া একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার মানুষ সেই জন্যে বড় নিশ্চিন্ত। কিছুতে কারো একটু সন্দেহ হবার জো নেই। যদি দৈবাৎ কারো মনে এমন প্রশ্ন ওঠে যে, আচ্ছা ঐ যে চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের দেওয়ালে তিন বার শাদা ছাগলের দাড়ি বুলিয়ে দিয়ে আওড়াতে হয় "হুন হুন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অমৃতে হুঁ ফট্ স্বাহা" এর কারণটা কি— তাহলে কেবলমাত্র চারটে সুপুরি আর একমাষা সোনা হাতে করে যাও তখনি মহাপঞ্চকদাদার কাছে, এমনি উত্তরটি পাবে যে আর কথা সরবে না। হয় সেটা মান, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে চলে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই। তাই সমস্তই চমৎকার সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাকুর, সেখান থেকে বের করে তুমি আমাকে এই যে জায়গাটাতে এনেছ এখানে কোনো মহাপঞ্চকদাদার টিকি দেখবার জো নেই—বাধা জবাব পাই কার কাছে! সব কথারই বারো আনা বাকি থেকে যায়। তুমি এমন করে মনটাকে উতলা করে দিলে তারপর?

দাদাঠাকুর

তার পরে?

(গান)

যা হবার তা হবে!
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অম্‌নি ছেড়ে রবে!
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই ত ঘরে লবে।

পঞ্চক

এত বড় ভরসা তুমি কেমন করে দিচ্ছ ঠাকুর? তুমি কোনো ভয় কোনো ভাবনাই রাখতে দেবে না। অথচ জন্মাবধি আমাদের ভয়ের অন্ত নেই। মৃত্যু-ভয়ের জন্যে অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্র পড়চি, শত্রু-ভয়ের জন্যে মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিণী, ঘরের ভয়ের জন্যে গৃহমাতৃকা, বাইরের ভয়ের জন্যে অভয়ঙ্করী, সাপের ভয়ের জন্যে মহাময়ূরী, বজ্রভয়ের জন্যে বজ্রগান্ধারি, ভূতের ভয়ের জন্যে চণ্ডভট্টারিকা, চোরের ভয়ের জন্যে হরাহরহৃদয়া। এমন আর কত নাম করব।

দাদাঠাকুর

আমার বন্ধু এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েছেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষদাঁত ভেঙে যায়।

পঞ্চক

তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই বন্ধুকে পেলে কোথা ঠাকুর?

দাদাঠাকুর

পাবই বলে সাহস করে বুক বাড়িয়ে দিলুম, তাই পেলুম। কোথাও যেতে হয়নি।

পঞ্চক

সে কি রকম?

দাদাঠাকুর

যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনি বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, আলো চাই, ছেলে বলে তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।

পঞ্চক

দাদাঠাকুর, আমার অচলায়তন ছেড়ে অনেক সাহস করে তোমার কাছ অবধি এসেছি কিন্তু তোমার ঐ বন্ধু পর্য্যন্ত যেতে সাহস কর্ত্তে পারচিনে।

দাদাঠাকুর

কেন, তোমার ভয় কিসের!

পঞ্চক

খাঁচায় যে পাখীটার জন্ম, সে আকাশকেই সবচেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুরদুর করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কি করে। আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখিনি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

দাদাঠাকুর

তোমরা অনেকগুলো তালা লাগিয়ে সিন্ধুক বন্ধ করে রাখাকেই মস্ত লাভ মনে কর কিন্তু সিন্ধুকে যে আছে কি তার খোঁজ রাখনা।

পঞ্চক

আমার দাদা বলে, জগতে যা কিছু আছে সমস্তকে দূর করে ফেলতে পারলে তবেই আসল জিনিষটিকে পাওয়া যায়। সেইজন্যেই দিনরাত্রি আমরা কেবল দূরই করচি— আমাদের কতটা গেল সেই হিসাবটাই আমাদের হিসাব— সে হিসাবের অন্তও পাওয়া যাচ্চে না।

দাদাঠাকুর

তোমার দাদা ত ঐ বলে, কিন্তু আমার দাদা বলে, যখন সমস্ত পাই তখনি আসল জিনিষকে পাই। সেইজন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারিনে দিনরাত্রি সব খুলে রেখে দিই। আচ্ছা পঞ্চক, তুমি যে তোমাদের আয়তন থেকে বেরিয়ে আস কেউ তা জানে না?

পঞ্চক

আমি জানি যে আমাদের আচার্য্য জানেন। কোনো দিন তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি তিনিও জিজ্ঞাসা করেন না আমিও বলিনে। কিন্তু আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি আমাকে দেখলেই বুঝতে পারেন। আমাকে তখন কাছে নিয়ে বসেন, তাঁর চোখের যেন একটা কি ক্ষুধা তিনি আমাকে দেখে মেটান। যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন। ঠাকুর, যেদিন তোমার সঙ্গে আচার্য্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারব সেদিন আমার অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে।

দাদাঠাকুর

সেদিন আমারও শুভ দিন হবে।

পঞ্চক

ঠাকুর, আমাকে কিন্তু তুমি বড় অস্থির করে তুলেচ;

এক এক সময় ভয় হয় বুঝি কোনো দিন আর মন শান্ত হবে না।

দাদাঠাকুর

আমিই কি স্থির আছি ভাই? আমার মধ্যে ঢেউ উঠেছে বলেই তোমারও মধ্যে ঢেউ তুলচি।

পঞ্চক

কিন্তু তবে যে তোমার ঐ শোণপাংশুরা বলে তোমার কাছে তারা খুব শান্তি পায়, কই শান্তি কোথায়! আমি ত দেখিনে!

দাদাঠাকুর

ওদের যে শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

পঞ্চক

তোমাকে দেখে ওরা শান্তি পায়?

দাদাঠাকুর

এই পাগল যে পাগলও হয়েছে শান্তিও পেয়েছে। তাই সে কাউকে ক্ষ্যাপায় কাউকে বাঁধে। পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে মন্ত্রে, সেই মন্ত্রেই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

পঞ্চক

ঢেউ তোলো ঠাকুর ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলচি আমার মন ক্ষেপেছে, কেবল জোর পাচ্চিনে—তাই দাদাঠাকুর মন কেবল তোমার কাছে আস্‌তে চায়—তুমি জোর দাও—জোর দাও—তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না!

(গান)

আমি কারে ডাকি গো
আমার বাঁধন দাও গো টুটে!
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে!
তুমি ডাক এমনি ডাকে
যেন লজ্জা ভয় না থাকে,
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে!
আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা,
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে;
ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হল লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায়
পরাণ কেঁদে উঠে!

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাদতে হয় না? তুমি যার কথা বল তিনি তোমার চোখের জল মুছিয়েছেন?

দাদাঠাকুর

তিনি চোখের জল মোছান কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

পঞ্চক

কিন্তু দাদা, আমি তোমার ঐ শোণপাংশুদের দেখি আর মনে ভাবি ওরা চোখের জল ফেল্‌তে শেখেনি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাওনা?

দাদাঠাকুর

যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়েনা সেখানে খাল কেটে জল আন্‌তে হয়। ওদেরও রসের দরকার হবে তখন দূর থেকে বয়ে আন্‌বে। কিন্তু দেখেছি ওরা বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, ঐ রকমই ওদের স্বভাব!

পঞ্চক

ঠাকুর, আমি ত সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার ত সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুন্‌তে পাচ্চি। বুঝি এবার ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে ভরে যাবে।

দাদাঠাকুর

(গান)

বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ!
এবার ধর দেখি তোর গান!
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ঐ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

পঞ্চক

ঠাকুর, আমার বুকের মধ্যে কি আনন্দ যে লাগচে সে আমি বলে উঠতে পারিনে। এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ডাক ডাক, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেল!

(গান)

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমনি করে গাও গো!
যেমন করে চাইছে আকাশ
তেমনি করে চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্ম্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাদাও গো!

শুনচ দাদা, ঐ কাঁসর বাজচে।

দাদাঠাকুর

হাঁ বাজচে।

পঞ্চক

আমার আর থাকবার জো নেই।

দাদাঠাকুর

কেন?

পঞ্চক

আজ আমাদের দীপকেতন পূজা!

দাদাঠাকুর

কি করতে হবে?

পঞ্চক

আজ ডুমুরতলা থেকে মাটি এনে সেইটে পঞ্চগব্য দিয়ে মেখে বিরোচন মন্ত্র পড়তে হবে। তারপরে সেই মাটিতে ছোট ছোট মন্দির গড়ে তার উপরে ধ্বজা বসিয়ে দিতে হবে। এমন হাজারটা গড়ে তবে সূর্য্যাস্তের পরে জলগ্রহণ।

দাদাঠাকুর

ফল কি হবে?

পঞ্চক

প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হয়ে যাবে

দাদাঠাকুর

যারা ইহলোকে আছে তাদের জন্যে—

পঞ্চক

তাদের জন্যে ঘর এত সহজে তৈরি হয় না। চল্লুম ঠাকুর, আবার কবে দেখা হবে জানিনে। তোমার এই হাতের স্পর্শ নিয়ে চল্লুম—এ-ই আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে—এ-ই আমার নাগপাশ-বাঁধন আলগা করে দেবে! ঐ আসচে শোণপাংশুর দল—আমরা এখানে বসে আছি দেখে ওদের ভাল লাগচে না, ওরা ছট্‌ফট্‌ করচে। তোমাকে নিয়ে ওরা হুটোপাটি করতে চায়—করুক, ওরাই ধন্য—ওরা দিন রাত তোমাকে কাছে পায়।

দাদাঠাকুর

হুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়? কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

(শোণপাংশুদলের প্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু

ও কি ভাই পঞ্চক, যাও কোথায়?

পঞ্চক

আমার সময় হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই হবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

বাঃ সে কি হয়! আজ আমাদের বনভোজন, আজ তোমাকে ছাড়্‌চিনে।

পঞ্চক

না, ভাই, সে হবে না—ঐ কাঁসর বাজচে।

তৃতীয় শোণপাংশু

কিসের কাঁসর বাজ্‌চে?

পঞ্চক

তোরা বুঝবিনে। আজ দীপকেতন পূজা—আজ ছেলেমানুষি না। আমি চল্লুম।

(কিছু দূরে গিয়া হঠাৎ ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া)

(গান)

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে!
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে!

ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কেরে!
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্ট হাস্যে সকল বিঘ্ন বাধার বক্ষ চেরে।

প্রথম শোণপাংশু

বেশ বেশ পঞ্চকদাদা, তাহলে চল আমাদের বনভোজনে।

পঞ্চক

বেশ, চল।

(একটু থামিয়া দ্বিধা করিয়া)

কিন্তু ভাই ঐ বন পর্য্যন্তই যাব ভোজন পর্য্যন্ত নয়।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

সে কি হয়! সকলে মিলে ভোজন না করলে আনন্দ কিসের!

পঞ্চক

না রে, তোদের সঙ্গে ঐ জায়গাটাতে আনন্দ চলবেনা।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

কেন চলবেনা? চালালেই চলবে।

পঞ্চক

চালালেই চলে এমন কোনো জিনিষ আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে পারেনা তা জানিস্। মারলে চলেনা, ঠেল্‌লে চলেনা, দশটা হাতী জুড়ে দিলে চলেনা, আর তুই বলিস্ কিনা চালালেই চলবে!

তৃতীয় শোণপাংশু

আচ্ছা ভাই, কাজ কি! তুমি বনেই চল, আমাদের সঙ্গে খেতে বস্‌তে হবেনা।

পঞ্চক

খুব হবেরে খুব হবে। আজ খেতে বসবই, খাবই,—আজ সকলের সঙ্গে বসেই খাব—আনন্দে আজ ক্রিয়া-কল্পতরুর ডালে ডালে আগুন লাগিয়ে দেব—পুড়িয়ে সব ছাই করে ফেলব! দাদাঠাকুর, তুমি ওদের সঙ্গে খাবেনা?

দাদাঠাকুর

আমি রোজই খাই।

পঞ্চক

তবে তুমি আমাকে খেতে বলচনা কেন?

দাদাঠাকুর

আমি কাউকে বলিনে ভাই, নিজে বসে যাই।

পঞ্চক

না দাদা, আমার সঙ্গে অমন করলে চলবেনা। আমাকে তুমি হুকুম কর তাহলে আমি বেঁচে যাই। আমি নিজের সঙ্গে কেবলি তর্ক করে মরতে পারিনে।

দাদাঠাকুর

অত সহজে তোমাকে বেঁচে যেতে দেবনা পঞ্চক। যে দিন তোমার আপনার মধ্যে হুকুম উঠবে সেই দিন আমি হুকুম করব।

(একদল শোণপাংশুর প্রবেশ)

দাদাঠাকুর

কি রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম শোণপাংশু

চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর

কে মেরেছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক

আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় শোণপাংশু

স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু

আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শোণপাংশু

আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গেছে, হয়ত ওদের কালঝন্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর

চল তবে।

প্রথম শোণপাংশু

কোথায়?

দাদাঠাকুর

স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

এখনি?

দাদাঠাকুর

হাঁ এখনি।

সকলে

ওরে চল্‌রে চল।

দাদাঠাকুর

আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম শোণপাংশু

দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে

দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর

ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে

হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর

আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে

হাঁ, চলবে, চলবে।

পঞ্চক

দাদাঠাকুর, এ কি ব্যাপার?

দাদাঠাকুর

এই আমাদের বনভোজন।

প্রথম শোণপাংশু

চল, পঞ্চক, তুমি চল।

দাদাঠাকুর

না, না, পঞ্চক না। যাও ভাই তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক

কি জানি ঠাকুর যদিও আমি কোনো কর্ম্মেরি না, তবু ইচ্ছে করচে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর

না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করগে।

পঞ্চক

তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয়, ওটাকে বড় করে দাও, নয় আমাকে আর পাড়তে দিয়ো না।

দাদাঠাকুর

আয়রে, তবে যাত্রা করি।

৩

অচলায়তন।

(মহাপঞ্চক, উপাধ্যায়, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম)

বিশ্বম্ভর

আচার্য্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম

তিনি বলেন তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন সেই জন্যে তিনি অপেক্ষা করচেন।

(একটি ছাত্রের প্রবেশ

মহাপঞ্চক

কি হে তৃণাঞ্জন!

তৃণাঞ্জন

আজ দ্বাদশী, আজ আমার লোকেশ্বর ব্রতের পারণের দিন। কিন্তু কি করব, আমাদের আচার্য্য যে কে তার ত

কোনো ঠিক হল না—আমাদের যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হতে বসল এর কি করা যায়।

মহাপঞ্চক

সে ত আমি তোমাদের বলে রেখেছি—এখন আশ্রমে যা-কিছু কাজ হচ্চে সমস্তই নিষ্ফল হচ্চে।

উপাধ্যায়

শুধু নিষ্ফল হচ্চে তা নয়, আমাদের অপরাধ ক্রমেই জমে উঠচে!

সঞ্জীব

এ যে বড় সর্ব্বনেশে কথা।

জয়োত্তম

কিন্তু আমাদের গুরু আসবার ত দেবি নেই, এর মধ্যে আর কত অনিষ্টই বা হবে।

সঞ্জীব

আরে রাখ তোমার তর্ক! অনিষ্ট হতে সময় লাগেনা। মরার পক্ষে এক মুহূর্ত্তই যথেষ্ট!

(অধ্যেতার প্রবেশ)

উপাধ্যায়

কিগো অধ্যেতা, ব্যাপার কি?

অধ্যেতা

তোমরা ত আমাকে বলে এলে সুভদ্রকে মহাতামসে বসাতে—কিন্তু বসায় কার সাধ্য?

মহাপঞ্চক

কেন কি বিঘ্ন ঘটেছে?

অধ্যেতা

মূর্ত্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই!

মহাপঞ্চক

পঞ্চক?

অধ্যেতা

হাঁ। আমি সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দ্দন কুণ্ডে স্নান করিয়ে সবে উঠেছি এমন সময় পঞ্চক এসে তাকে কেড়ে নিয়ে গেল!

মহাপঞ্চক

না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চল্‌ল না! অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্ব্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা

আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি? স্বয়ং আচার্য্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন তাইত সে সাহস পেলে।

তৃণাঞ্জন

আচার্য্য অদীনপুণ্য!

সঞ্জীব

স্বয়ং আমাদের আচার্য্য!

বিশ্বম্ভর

ক্রমে এ সব হচ্চে কি! এতদিন এই আয়তনে আছি কখনো ত এমন অনাচারের কথা শুনিনি। যে ব্রাত তাকে তার ব্রত থেকে ছিন্ন করে আনা! আর স্বয়ং আমাদের আচার্য্যের এই কীর্ত্তি!

জয়োত্তম

তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক না!

বিশ্বম্ভর

না, না, আচার্য্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক

কি করবে আচার্য্যকে, বলেই ফেল!

বিশ্বম্ভর

তাইত ভাবচি কি করা যায়! তাঁকে না হয়—আপনি বলে দিন না কি করতে হবে!

মহাপঞ্চক

আমি বলচি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব

কেমন করে?

মহাপঞ্চক

কেমন করে আবার কি? মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম

আমাদের আচার্য্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক

হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

তৃণাঞ্জন

কেন পারব না? আপনি যদি আদেশ করেন তাহলেই—

জয়োত্তম

কিন্তু শাস্ত্রে কি এর—

মহাপঞ্চক

শাস্ত্রে বিধি আছে।

তৃণাঞ্জন

তবে আর ভাবনা কি?

উপাধ্যায়

মহাপঞ্চক, তোমার কিছুই বাধে না, আমার কিন্তু ভয় হচ্চে।

(আচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য

বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য্য বলে মেনেছ আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করচি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

তৃণাঞ্জন

তবে আর দেরি করেন কেন? এদিকে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়!

জয়োত্তম

দেখ তৃণাঞ্জন, আঁস্তাকুড়ের ছাই দিয়ে তোমার এই মুখের গর্ত্তটা ভরিয়ে দিতে হবে! একটু থাম না।

আচার্য্য

গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; তার শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটেনা ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কি চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই! এবার নিয়ে এস সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এস হৃদয়ের বাণী! প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও!

পঞ্চক

(ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া)

তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক্ সব শুকনো পাতা—আয়রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো! ভাই জয়োত্তম, শুনচনা, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য কররে নৃত্য কর!

(গান)

ওরে ওরে, ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কেরে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে
তারে আজ নামায় কেরে!

(প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ)

মহাপঞ্চক

পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম্ বলচি থাম্!

পঞ্চক

(গান)

ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কেরে!

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলিনি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখচ, কি করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলচেন—ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবেনা!

পঞ্চক

না, থাকবেনা, থাকবেনা, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ্‌রে ও ভাই নাচ্‌রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌রে,—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দেরে!
তোরে আজ থামায় কেরে!

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখচ কি। সর্ব্বনাশ সুরু হয়েছে, বুঝতে পারচ না! ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্ব্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক

সর্ব্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ সুরু হয় দাদা!

মহাপঞ্চক

চুপ্ কর লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়োনা! ঘোর বিপদ আসন্ন সে কথা স্মরণ রেখো!

বিশ্বম্ভর

আচার্য্যদেব পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না!

আচার্য্য

না, বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব

ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কত বড় ভাগ্য! মহাতামস ক জন লোকে পারে! ওযে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে!

আচার্য্য

গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না! সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

তৃণাঞ্জন

দেখুন আপনি আমাদের আচার্য্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় আজ করচেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য্য

কর, বলপ্রয়োগ কর, আমাকে মেনোনা, আমাকে মার, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল তাতেই বুঝতে পারচি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেই জন্যেই বলচি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেবনা। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

তৃণাঞ্জন

পারবে না?

আচার্য্য

না।

মহাপঞ্চক

তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। তৃণাঞ্জন, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বদ্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করচ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম

খবরদার আচার্য্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না!

বিশ্বম্ভর

না, না, মহাপঞ্চক, ওকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব

আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

তৃণাঞ্জন

এই অচলায়তনে এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে—তাতে ক্ষতি কি হয়েছে!

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র

আমাকে মহাতামস ব্রত করাও!

পঞ্চক

সর্ব্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে!

আচার্য্য

বৎস সুভদ্র, এস আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করচ সে পাপ আমার—আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

তৃণাঞ্জন

না, না, আয়রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব

তুই ধন্য!

বিশ্বম্ভর

তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিল।

উপাধ্যায়

আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে!

মহাপঞ্চক

আচার্য্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্চ?

আচার্য্য

হায়, হায়, এই দেখেইত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে

যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তাহলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখ্‌চি হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছেরে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক

সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য্য

বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র

না, না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে—লোক থাকলে যে পাপ হবে।

মহাপঞ্চক

ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্য্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এস তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য্য

না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করচি! সুভদ্র, আচার্য্যের কথা অমান্য কোরোনা—এস পঞ্চক ওকে কোলে করে নিয়ে এস।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্য্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান]

মহাপঞ্চক

ধিক্! তোমাদের মত ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারো নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্য সকলকেও মারবে। তোমাদের উপাধ্যায়টিও তেমনি হয়েছেন—তাঁরও আর দেখা নেই।

(পদাতিকের প্রবেশ)

পদাতিক

রাজা আস্‌চেন।

মহাপঞ্চক

ব্যাপারখানা কি! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

(রাজার প্রবেশ)

রাজা

নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে

জয়োস্তু রাজন।

মহাপঞ্চক

কুশল ত?

রাজা

অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্ত দেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

মহাপঞ্চক

দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা

ঐ যে শোণপাংশুরা।

মহাপঞ্চক

শোণপাংশুরা যদি আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

রাজা

সেই জন্যেই ত ছুটে এলুম। তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে আমাদের প্রাচীর ভাঙল কেন?

মহাপঞ্চক

শিখাসচ্ছন্দ মহাভৈরব ত আমাদের প্রাচীর রক্ষা করচেন।

রাজা

তিনি অনাচারী শোণপাংশুদের কাছে আপন শিখা নত করলেন। নিশ্চয়ই তোমাদের মন্ত্র উচ্চারণ অশুদ্ধ হচ্চে, তোমাদের ক্রিয়া পদ্ধতিতে স্খলন হচ্চে নইলে এ যে স্বপ্নের অতীত।

মহাপঞ্চক

আপনি সত্যই অনুমান করেছেন মহারাজ।

সঞ্জীব

একজটা দেবীর শাপ ত আর ব্যর্থ হতে পারেনা।

রাজা

একজটা দেবীর শাপ! সর্ব্বনাশ! কেন তাঁর শাপ!

মহাপঞ্চক

যে উত্তরদিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানলা খোলা হয়েছে।

রাজা

(বসিয়া পড়িয়া)

তবে ত আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক

আচার্য্য অদীনপুণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্চেন না।

তৃণাঞ্জন

তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা

তবে ত মিথ্যা আমি সৈন্য জড় করতে বলে এলুম দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনি নির্ব্বাসিত করে দাও।

মহাপঞ্চক

আগামী অমাবস্যায়—

রাজা

না, না, এখন তিথি নক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সঙ্কটের সময় আমি আমার রাজ অধিকার খাটাতে পারি—শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক

হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য্য কে হবে?

রাজা

তুমি, তুমি! এখনি আমি তোমাকে আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম! দিকপালগণ সাক্ষী রইলেন, এই ব্রহ্মচারীরা সাক্ষী রইলেন।

মহাপঞ্চক

অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্ব্বাসিত করতে চান?

রাজা

আয়তনের বাইরে নয়—কি জানি যদি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন! আমার পরামর্শ এই যে আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকদের পাড়া আছে এ কয়দিন সেইখানে তাঁকে বদ্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম

আচার্য্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়? তারা যে অন্ত্যজ পতিত জাতি!

মহাপঞ্চক

যিনি স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক আচার লঙ্ঘন করেন অনাচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোক ফুটবে। মনে কোরোনা আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব—তারও সেইখানে গতি!

রাজা

দেখো মহাপঞ্চক, তোমার উপরই নির্ভর, যুদ্ধে জেতা চাই। আমার হার যদি হয় তবে সে তোমাদের অচলায়তনেরই অক্ষয় কলঙ্ক।

মহাপঞ্চক

কোনো ভয় করবেন না।

৪

দর্ভকপল্লী।

পঞ্চক

নির্ব্বাসন, আমার নির্ব্বাসনরে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি! কিন্তু এখনো মনটাকে তার খোলসের ভিতর থেকে টেনে বের করতে পারচিনে কেন?

(গান)

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে!
  তোরা আমায় বলে দে ভাই বলে দে রে।
  ফুলের গোপন পরাণ মাঝে
  নীরব স্বরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই বাঁশিতে কেমনে মন হরেছে রে!
  যে মধুটি লুকিয়ে আছে
  দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে!

(দর্ভকদলের প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক

দাদাঠাকুর!

পঞ্চক

ওকিও! দাদাঠাকুর বলছিস্ কাকে? আমার গায়ে দাদাঠাকুর নাম লেখা হয়ে গেছে নাকি?

প্রথম দর্ভক

তোমাদের কি খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক

তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক

আমাদের খাবার? সেকি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক

সে জন্যে ভাবিস্‌নে ভাই। পেটের ক্ষিদে যে আগুন, সে কারো ছোঁওয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে তোরা সকাল বেলায় করিস্ কি বল্ ত! ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবিনে?

তৃতীয় দর্ভক

ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত—আমরা ওসব কিছুই জানিনে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসচি কোনো দিন ত তোমাদের পায়ের ধূলা পড়েনি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক

সর্ব্বনাশ! বলিস কি! এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তাহলে নির্ব্বাসনের দরকার কি ছিল! তা, সকাল বেলা তোরা কি করিস্ বল্ ত।

প্রথম দর্ভক

আমরা শাস্ত্র জানিনে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক

সে কি রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক

ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাস্‌বে।

পঞ্চক

আমিই ত ভাই এত দিন লোক হাসিয়ে আস্‌চি—তোরা আমাকেও হাসাবি—শুনেও মন খুসি হয়। আমি যে কি মূল্যের মানুষ সে তোরা খবর পাসনি বলে এখনো আমার হাসিকে ভয় করিস্। কিছু ভাবিস্‌নে—নির্ভয়ে শুনিয়ে দে!

প্রথম দর্ভক

আচ্ছা ভাই আয় তবে—গান ধর!

(গান)

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু!
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা!
ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক

দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক

আমাদের গান?

পঞ্চক

হাঁরে, হাঁ ঐ অধমের গান, অক্ষমদের কান্না! তোদের এই মূর্খের বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খুঁজেই ত আমার পড়াশুনা কিছু হল না, আমার ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত নিষ্ফল হয়ে গেল! ও ভাই, আর একটা শোনা—অনেক দিনকার তৃষ্ণা অল্পে মেটে না।

দর্ভকদলের গান

আমরা　তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথী!
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।
তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যা কালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি।

(আচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য

সার্থক হল আমার নির্ব্বাসন।

প্রথম দর্ভক

বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধূলো ত এখানে পড়েনি।

আচার্য্য

সে আমার অভাগ্য, সে আমারি অভাগ্য !

দ্বিতীয় দর্ভক

বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে ত —

আচার্য্য

বাবা, তোরাই তুলে আন্‌বি।

প্রথম দর্ভক

আমরা তুলে আনব—সে কি হয় !

আচার্য্য

হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক

ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনিগে।

[প্রস্থান]

আচার্য্য

দেখ পঞ্চক, কাল এখানে এসে আমার ভারি গ্লানি বোধ হচ্ছিল।

পঞ্চক

আমি ত কাল রাত্রে ঘরের বাইরে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

আচার্য্য

যখন এই রকম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে আদ্যোপান্ত পাপলিপ্ত মনে করে বসে আছি এমন সময় ওরা সন্ধ্যা বেলায় ওদের কাজ থেকে ফিরে এসে সকলে মিলে গান ধর্‌লে—

পারের কাণ্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়?

নাম্‌বে কি সব বোঝা এবার ঘুচবে কি সব দায়?

শুনতে শুনতে মনে হল আমার যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল। দিনের পর দিন কি ভার বয়েই বেড়িয়েছি। কিন্তু কতই সহজ—সরল প্রাণ নিয়ে সেই পারের কাণ্ডারীর খেয়ায় চড়ে বসা !

পঞ্চক

আমি দেখছি দর্ভক জাতের একটা গুণ—ওরা একেবারে স্পষ্ট করে নাম নিতে জানে। আর তট তট তোতয় তোতয় করতে করতে আমার জিবের এমনি দশা হয়েছে যে, সহজ কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরতে চায়না। আচার্য্যদেব, কেবল ভাল করে না ডাকতে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শুকিয়ে এসেছে, একবার খুব করে গলা ছেড়ে ডাক্‌তে ইচ্ছা করচে। কিন্তু গলা খোলেনা যে—রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে প্রভু ! এমন হয়েছে আজ কান্না এলেও বেধে যায় !

আচার্য্য

সেই জন্যেই ত ভাবচি আমাদের গুরু আসবেন কবে ! জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে দিন্—তাতে করে ধবে সকলের সঙ্গে মিল করিয়ে দিন।

পঞ্চক

মনে হচ্চে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্চি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে !

আচার্য্য

ওই পঞ্চক শুনতে পাচ্চ কি?

পঞ্চক

কি বলুন দেখি?

আচার্য্য

আমার মনে হচ্চে যেন সুভদ্র কাঁদচে।

পঞ্চক

এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ !

আচার্য্য

তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কান্না রাখ্‌তে পারে না তবু কিছুতে মান্‌তে চায় না সে কাঁদচে।

পঞ্চক

এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে—আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহাবা দিয়ে বল্‌চে সুভদ্র দেবশিশু আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে। কানে ধরে দেবতা করে দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য্য

ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্চে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেচে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

পঞ্চক

প্রভু, আমরা তাঁকে সকলে মিলে কত কাঁদালুম তবু তাড়াতে পারলুম না। তাঁকে যে ঘরে বসালুম সে ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলুম—তাঁকে আর দেখ্‌তে পাইনে—তবু তিনি সেখানে বসে আছেন!

(গান)

সকল জনম ভোরে
ও মোর দরদিয়া—
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া।
আছ হৃদয় মাঝে,
সেথা কতই ব্যথা বাজে
ওগো এ কি তোমায় সাজে
ও মোর দরদিয়া।
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে
তবু আছ তারি পরে
ও মোর দরদিয়া।
সেথা আসন হয়নি পাতা
সেথা মালা হয়নি গাঁথা
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া।

(উপাচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য

একি সুতসোম! আমার কি সৌভাগ্য! কিন্তু তুমি এখানে এলে যে!

উপাচার্য্য

আর কোথা যাব বল? তুমি চলে আসামাত্র অচলায়তন যে কি কঠিন হয়ে উঠ্‌ল, কি শুকিয়ে গেল সে আমি বলতে পারিনে। এখন এস একবার কোলাকুলি করি।

আচার্য্য

আমাকে ছুঁয়োনা—কাল থেকে ঘটশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি কিছুই করিনি।

উপাচার্য্য

তা হোক তা হোক্। তোমারও আলিঙ্গন যদি অশুচি হয় তবে সেই অশুচিতার পুণ্যদীক্ষাই আমাকে দাও!

(কোলাকুলি)

পঞ্চক

উপাচার্য্যদেব, অচলায়তনে তোমার কাছে যত অপরাধ করেছি আজ এই দর্ভকপাড়ায় সে সমস্ত ক্ষমা করে নাও!

উপাচার্য্য

এস বৎস, এস।

(আলিঙ্গন)

আচার্য্য

সুতসোম, গুরু ত শীঘ্রই আসচেন, এখন তুমি সেখান থেকে চলে এলে কি করে?

উপাচার্য্য

সেই জন্যেই চলে এলুম। গুরু আসচেন, তুমি নেই! আর মহাপঞ্চক এসে গুরুকে বরণ করে নেবে—এও দাঁড়িয়ে থেকে দেখ্‌তে হবে। ঐ শাস্ত্রের কীটটা গুরুকে আহ্বান করে আনবার যোগ্য এমন কথা যদি স্বয়ং মহামহর্ষি জলধরগর্জ্জিতঘোষসুস্বরনক্ষত্রশঙ্কুসুমিত এসেও বলেন তবু আমি মানতে পারব না।

পঞ্চক

আঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি মেঘ করে এল! শুনচ আচার্য্যদেব, বজ্রের পর বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে!

আচার্য্য

ঐ যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপনদেখা বৃষ্টি!

পঞ্চক

মিট্‌ল এবার মাটির তৃষ্ণা—এই যে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নীচেকার মাটি!

(ডালিতে কেয়াফুল কদম্বফুল লইয়া বাদ্যসহ দর্ভকদলের প্রবেশ)

আচার্য্য

বাবা, তোমাদের এ কি সমারোহ! আজ এ কি কাণ্ড!

প্রথম দর্ভক

বাবাঠাকুর, আজ তোমাদের নিয়েই সমারোহ। কখনো পাইনে আজ পেয়েছি।

দ্বিতীয় দর্ভক

আমরা ত শাস্ত্র কিছুই জানিনে—তোমাদের দেবতা আমাদের ঘরে আসেনা।

তৃতীয় দর্ভক

কিন্তু আজ দেবতা কি মনে করে অতিথি হয়ে এই অধমদের ঘরে এসেছেন।

প্রথম দর্ভক

তাই আমাদের যা আছে তাই দিয়ে তোমাদের সেবা করে নেব।

দ্বিতীয় দর্ভক

আমাদের মন্ত্র নেই বলে আমরা শুধু কেবল গান গাই।

(মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত)

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমালবনে আঁধার করে।
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরাণখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার পরে।

আচার্য্য

পঞ্চক, আমাদেরও এমনি করে ডাকতে হবে—বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও—আর দেরি কোরোনা।

ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে বরণ,
করিব জয় সরম ত্রাসে
দাঁড়াব আজ তোমার পাশে।
বাঁধন বাধা যাবে জ্বলে,
সুখ দুঃখ দেব দলে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভরে।

(সকলে)

উতল ধারা বাদল ঝরে
দুয়ার খুলে এল ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

পঞ্চক

ঐ আবার বজ্র।

আচার্য্য

দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি এল।

উপাচার্য্য

আজ সমস্ত রাত এমনি করেই কাটবে।

৫

অচলায়তন।

(মহাপঞ্চক, তৃণাঞ্জন, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম)

মহাপঞ্চক

তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন? কোনো ভয় নেই।

তৃণাঞ্জন

তুমি ত বলচ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক

একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়! শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব

কে যে বল্লে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক

সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম

আজই ত আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক

তার জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে ; কেবল যে ছেলের মা বাপ ভাই বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আন্‌তে পারলেনা—দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়্‌বে ঠিক করতে পারচিনে।

সঞ্জীব

গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে ? আচার্য্য অদীনপুণ্য তাঁকে জান্‌তেন। আমরাত কেউ তাঁকে দেখিনি।

মহাপঞ্চক

আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর

ঐ যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসচেন।

মহাপঞ্চক

নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা-পাঠের কি করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে ত পাওয়া গেল না।

(উপাধ্যায়ের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক

কত দূর ?

উপাধ্যায়

কত দূর কি ? এসে পড়েছে যে !

মহাপঞ্চক

কই দ্বারে ত এখনো শাঁখ বাজালে না ?

উপাধ্যায়

বিশেষ দরকার দেখিনে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখ্‌তে পাচ্চিনে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক

বল কি ? দ্বার ভেঙেছে ?

উপাধ্যায়

শুধু দ্বার নয়, প্রাচীর গুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই !

মহাপঞ্চক

কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়

তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্চে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো !

ছাত্রগণ

কি সর্ব্বনাশ !

সঞ্জীব

কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক ?

ভূণাঞ্জন

আমি ত তখনি বলেছিলুম এ সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথি-পড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয় !

বিশ্বম্ভর

কিন্তু এখন করা যায় কি ?

ভূণাঞ্জন

আমাদের আচার্য্যদেবকে এখনি ফিরিয়ে আনিগে। তিনি থাক্‌লে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব

কিন্তু দেখ মহাপঞ্চক আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তাহলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল্‌ব।

উপাধ্যায়

সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আস্‌চে।

মহাপঞ্চক

তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্র সূর্য্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্চি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক দেবতার আশ্চর্য্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়

তার চেয়ে দেখি কোন্‌ দিক দিয়ে বেরবার রাস্তা।

তৃণাঞ্জন

আমাদেরও ত সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরবার পথ যে জানিই নে। কোনো দিন বেরতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করিনি।

সঞ্জীব

শুনচ—ঐ শুনচ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ

কি হবে আমাদের! নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে!

তৃণাঞ্জন

ধর মহাপঞ্চককে! বাঁধ ওকে! একজটাদেবীর কাছে ওকে বলি দেবে চল।

মহাপঞ্চক

সেই কথাই ভাল। দেবীর কাছে আমাকে বলি দেবে চল। তাঁর রোষ শান্তি হবে। এমন নিষ্পাপ বলি তিনি আর পাবেন কোথায়?

(বালকদলের প্রবেশ)

উপাধ্যায়

কিরে তোরা সব নৃত্য করচিস্ কেন?

প্রথম বালক

আজ এ কি মজা হল।

উপাধ্যায়

মজাটা কি রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক

আজ চারদিক থেকেই আলো আস্‌চে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক

এত আলো ত আমরা কোনো দিন দেখিনি!

প্রথম বালক

কোথাকার পাখীর ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্চে।

দ্বিতীয় বালক

এ সব পাখীর ডাক আমরা ত কোনদিন শুনিনি! এ ত আমাদের খাঁচার ময়নার মত একেবারেই নয়।

প্রথম বালক

আজ আমাদের খুব ছুট্‌তে ইচ্ছে করচে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা!

মহাপঞ্চক

আজকের কথা ঠিক বল্‌তে পারচিনে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চল্‌বে বলে বোধ হচ্চে না।

প্রথম বালক

আজ তাহলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক

হাঁ বন্ধ।

সকলে

ওরে কি মজারে মজা!

দ্বিতীয় বালক

আজ পংক্তিধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক

না।

সকলে

ওরে কি মজা! আঃ আজ চারিদিকে কি আলো!

জয়োত্তম

আমারও মনটা নেচে উঠচে বিশ্বম্ভর! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারচিনে!

বিশ্বম্ভর

আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্চে বিশ্বম্ভর!

সঞ্জীব

কিন্তু ব্যাপারটা যে কি ভেবে উঠ্‌তে পারচিনে! ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুসি হয়ে উঠলি কেন বল্ দেখি!

প্রথম বালক

দেখচনা সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক

মনে হচ্চে ছুটি—আমাদের ছুটি!

তৃতীয় বালক

সকাল থেকে পঞ্চকদাদার সেই গানটা কেবলি আমরা গেয়ে বেড়াচ্চি।

জয়োত্তম

কোন্ গান?

প্রথম বালক

সেই যে—

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা !
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা !
নাচে আলো নাচে—ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে—ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে ;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা !
আলো, আমার আলো ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌ল নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা— ও ভাই
যায় না মাণিক গোণা,
পাতায় পাতায় হাসি—ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুরনদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

[বালকদের প্রস্থান]

জয়োত্তম

দেখ মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্চে ভয় কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুসি হয়ে উঠ্‌ল কেন ?

মহাপঞ্চক

ভয় নেই সে ত আমি বরাবর বলে আসচি।

(শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ)

উভয়ে

গুরু আসচেন।

সকলে

গুরু !

মহাপঞ্চক

শুনলে ত ! আমি নিশ্চয় জানতুম তোমার আশঙ্কা বৃথা !

সকলে

ভয় নেই আর ভয় নেই !

তৃণাঞ্জন

মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে !

সকলে

জয় আচার্য্য মহাপঞ্চকের।

(যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

শঙ্খবাদক ও মালী

(প্রণাম করিয়া)

জয় গুরুজীর জয় !

(সকলে স্তম্ভিত)

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, এই কি গুরু ?

উপাধ্যায়

তাইত শুনচি।

মহাপঞ্চক

তুমি কি আমাদের গুরু ?

দাদাঠাকুর

হাঁ ! তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু !

মহাপঞ্চক

তুমি গুরু ? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে ? তোমাকে কে মানবে ?

দাদাঠাকুর

আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু !

মহাপঞ্চক

তুমি গুরু ? তবে এই শত্রুবেশে কেন ?

দাদাঠাকুর

এই ত আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক

কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে ?

দাদাঠাকুর

তুমি যে কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখনি !

মহাপঞ্চক

তুমি কি মনে করচ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব ?

দাদাঠাকুর

না, এখনি না ! কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক

আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবচ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারিনে ?

দাদাঠাকুর

আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না—আমি যে তোমার গুরু !

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে না কি ?

উপাধ্যায়

দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহলে প্রণাম করব বই কি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক

না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর

আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব !

মহাপঞ্চক

তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি ?

দাদাঠাকুর

আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক

তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা ?

দাদাঠাকুর

এরা আমার অনুবর্ত্তী—এরা শোণপাংশু।

সকলে

শোণপাংশু !

মহাপঞ্চক

এরাই তোমার অনুবর্ত্তী !

দাদাঠাকুর

হাঁ।

মহাপঞ্চক

এই মন্ত্রহীন কর্ম্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল !

দাদাঠাকুর

এস ত, তোমাদের মন্ত্র এদের শুনিয়ে দাও ! এদের কর্ম্মকাণ্ড কি রকম তাও ক্রমে দেখ্‌তে পাবে।

শোণপাংশুদের গান

যিনি সকল কাজের কাজী, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী !
যার নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী।
তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চলে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান ভেরী, মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গী।
এই জন্ম মরণ খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়,
এই দুঃখ সুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে, ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে,
ছুটি পথের কাটা পায়ে দলে
সাগর গিরি লঙ্ঘি।

মহাপঞ্চক

আমি এই আয়তনের আচার্য্য—আমি তোমাকে আদেশ করচি তুমি এখন ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর

আমি যাকে আচার্য্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য্য ; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক

উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এস আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়

এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্চে।

প্রথম শোণপাংশু

অচলায়তনের দরজার কথা বলচ—সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়

বেশ করেছ ভাই! আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাবতে হত!

মহাপঞ্চক

পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বস্‌লুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু

এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক

কিসের ভয় দেখাও আমায়! তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই!

প্রথম শোণপাংশু

ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগ্‌বে।

দাদাঠাকুর

ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু

ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর

শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

(বালকদলের প্রবেশ)

সকলে

তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর

হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে

আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর

বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ কর।

প্রথম বালক

ঠাকুর, তুমি আমাদের কি করবে?

দাদাঠাকুর

আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে

খেলবে?

দাদাঠাকুর

নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের?

সকলে

কোথায় খেলবে?

দাদাঠাকুর

আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক

মস্ত! এই ঘরের মত মস্ত?

দাদাঠাকুর

এর চেয়ে অনেক বড়।

দ্বিতীয় বালক

এর চেয়েও বড়? ঐ অঙিনাটার মত?

দাদাঠাকুর

তার চেয়ে বড়।

দ্বিতীয় বালক

তার চেয়ে বড়! উঃ কি ভয়ানক!

প্রথম বালক

সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর

কিসের পাপ ?

দ্বিতীয় বালক

খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না ?

দাদাঠাকুর

না বাছা, খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে

কখন্ নিয়ে যাবে ?

দাদাঠাকুর

এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম

(প্রণাম করিয়া)

প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর

সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকদের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও!

সঞ্জীব

মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এস না!

মহাপঞ্চক

না, আমি না।

৬

দর্ভকপল্লী।

পঞ্চক

(গান)

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাইরে!
আমি আপনাকে ভাই মেল্‌ব যে বাইরে!
পালে আমার লাগ্‌ল হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাইরে।
সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাইরে।
পাগ্‌লামি আজ লাগ্‌ল পাথায়
পাখী কি আর থাক্‌বে শাখায় ?
দিকে দিকে সাড়া যে পাইরে!

(আচার্য্যের প্রবেশ)

পঞ্চক

দূরে থেকে নানা প্রকার শব্দ শুনতে পাচ্চি আচার্য্যদেব! অচলায়তনে বোধ হয় খুব সমারোহ চলচে।

আচার্য্য

সময় ত হয়েছে। কালই ত তাঁর আস্‌বার কথা ছিল। আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেচে। একবার সুভদ্রসোমকে ওখানে পাঠিয়ে দিই।

পঞ্চক

তিনি আজ একাদশীর তর্পণ করবেন বলে কোথায় ইন্দ্রতৃণ পাওয়া যায় সেই খোঁজে বেরিয়েছেন।

(দর্ভকদলের প্রবেশ)

পঞ্চক

কি ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের ?

প্রথম দর্ভক

শুনচি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেচে।

আচার্য্য

লড়াই কিসের ? আজ ত গুরু আস্‌বার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক

না, না, লড়াই হচ্চে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক

বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য্য

ওখানে ত লোক ঢের আছে তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক

লোক ত আছে কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন ?

দ্বিতীয় দর্ভক

শুনেছি কত রকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক

আচার্য্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল

সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙে চুরে পড়চে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য্য

তবে কি গুরু আসেন নি?

পঞ্চক

হয়ত বা আমার দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয় ত যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক

আমরা শুনেছি কে বল্‌ছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য্য

গুরুও এসেছেন? সে কি রকম হল?

পঞ্চক

তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বল্ ত?

প্রথম দর্ভক

লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদা ঠাকুরের দল।

পঞ্চক

দাদাঠাকুরের দল! বল্ বল্ শুনি ঠিক বল্‌ছিস্ ত রে?

দ্বিতীয় দর্ভক

হাঁ, সকলেই ত বলচে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক

ওরে কি আনন্দরে কি আনন্দ!

আচার্য্য

এ কি পঞ্চক, হঠাৎ তুমি এ রকম উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লে কেন?

পঞ্চক

প্রভু, আমার মনের একটা বাসনা ছিল কোনো সুযোগে যদি আমাদের দাদাঠাকুরের সঙ্গে গুরুর মিলন করিয়ে দিতে পারি, তাহলে দেখে নিই কে হারে কে জেতে!

আচার্য্য

পঞ্চক, তোমার কথা আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌চিনে। তুমি দাদাঠাকুর বল্‌চ কাকে?

পঞ্চক

আচার্য্যদেব, ঐটে আমার গোপন কথা, অনেকদিন থেকেই মনে রেখে দিয়েছি। এখন তোমাকে বল্‌বনা প্রভু, যদি তিনি এসে থাকেন, তাহলে একেবারে চোখে চোখে মিলিয়ে দেব।

প্রথম দর্ভক

বাবাঠাকুর, হুকুম কর, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি—দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক

আয়না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চল্‌বরে!

দ্বিতীয় দর্ভক

তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক

হাঁ, লড়্‌ব।

আচার্য্য

কি বলচ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাক্‌চে?

পঞ্চক

আমার প্রাণ ডাক্‌চে। একটা কিসের মায়াতে মন জড়িয়ে রয়েছে প্রভু! যেন কেবলি স্বপ্ন দেখ্‌চি—আর যতই জোর করচি কিছুতেই জাগ্‌তে পারচিনে। কেবল এমন বসে বসে হবেনা দেব। একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়তে না পারলে কিছুতেই এ ঘোর কাট্‌বেনা।

(গান)

আর নহে আর নয়।
আমি　করিনে আর ভয়।
আমার　ঘুচল বাধন ফল্‌ল সাধন
　হল বাধন ক্ষয়।
ঐ　আকাশে ঐ ডাকে
আমায়　আর কে ধরে রাখে!
আমি　সকল দুয়ার খুলেছি আজ
　যাব সকলময়।
ওরা　বসে বসে মিছে
শুধু　মায়াজাল গাঁথিছে,
ওরা　কি যে গোণে ঘরের কোণে
　আমায় ডাকে পিছে!

আমার অস্ত্র হল গড়া,
আমার বর্ম্ম হল পরা,
এবার ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে
করবে ভুবন জয়।

মালীর প্রবেশ

মালী

আচার্য্যদেব, আমাদের গুরু আসচেন।

আচার্য্য

বলিস কি? গুরু? তিনি এখানে আসচেন? আমাকে আহ্বান করলেই ত আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক

এখানে তোমাদের গুরু এলে তাকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক

বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বস্‌বার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও—আমরা তফাতে সরে যাই।

(আর একদল দর্ভকের প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক

বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়—সে এ পাড়ায় আস্‌বে কেন? এ যে আমাদের গোসাঁই।

দ্বিতীয় দর্ভক

আমাদের গোসাঁই?

প্রথম দর্ভক

হাঁরে হাঁ, আমাদের গোসাঁই। এমন সাজ তার আর কখনো দেখিনি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক

ঘরে কি আছেরে ভাই সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক

বনের জাম আছেরে।

চতুর্থ দর্ভক

আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক

কালো গোরুর দুধ শীগ্‌গির দুয়ে আন্ দাদা।

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

আচার্য্য

(প্রণাম করিয়া)

জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক

একি! এযে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল

গোসাঁইঠাকুর! প্রণাম হই! খবর দিয়ে এলেনা কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয়নি।

দাদাঠাকুর

কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়েনি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোষ করতে আরম্ভ করেছিস্ নাকিরে?

প্রথম দর্ভক

আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর

আমারো তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক

দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারো যে চিনতে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক

ঐ ত আমাদের গোসাঁই পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তারপর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান]

দাদাঠাকুর

আচার্য্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য্য

কি যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি—আমি সব নষ্ট করেছি!

দাদাঠাকুর

যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ!

আচার্য্য

কিন্তু বাঁধতে ত পারিনি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধচি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারদিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি!

দাদাঠাকুর

যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য্য

তিনি যে আছেন এই খবরটা মনের মধ্যে পৌঁছায়নি বলেই মনে করে বসেছিলুম তাঁকে বুঝি কৌশল করে গড়ে তুল্‌তে হয়। তাই দিন রাত বসে বসে এত ব্যর্থ চেষ্টার জাল পাকিয়েছি!

দাদাঠাকুর

তোমার যে কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আচার্য্য

আদেশ কর প্রভু! ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারিনি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলচি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়চি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর

যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য্য

ধন্য করেছ!—কিন্তু এতদিন আসনি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করচ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের কেন দেখা দিলে না?

দাদাঠাকুর

এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা ত সহজ ক'রে রাখনি।

পঞ্চক

ভালই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন. আমি ভাবচি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর

যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্চি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চল্‌তে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক

প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্চি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্চ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি শোণপাংশু না তোমাকে মেনে চলতে আমার ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারি বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর!

দাদাঠাকুর

আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক

কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর

ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক

আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয়নি?

দাদাঠাকুর

কারাগার যা ছিল সে ত আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক

ঠাকুর, আমি তোমাকে জোড়হাত করে বল্‌চি আর আমাকে বসিয়ে রাখার কাজে লাগিয়োনা। তোমার ঐ বীরবেশে আমার মন ভুলেছে—তোমাকে এমন মনোহর আর কখনো দেখিনি।

দাদাঠাকুর

ভয় নেই পঞ্চক! অচলায়তনে আর সেই শান্তি

দেখ্‌তে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঘোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মত ঘুচিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চক

কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবেনা প্রভু!

দাদাঠাকুর

আমি বল্‌চি তুমি অচলায়তনের লোকের সকলের চেয়ে আপন।

পঞ্চক

কিন্তু দাদাঠাকুর, আমি কেবল একলা, এক্‌লা, ওরা আমাকে সবাই ঠেলে রেখে দেবে।

দাদাঠাকুর

ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্চে না, সেই জন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্চে বলেই তুমি ওদের ঠেল্‌তে পারবে না।

পঞ্চক

আমাকে কি করতে হবে?

দাদাঠাকুর

যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আন্‌তে হবে।

পঞ্চক

সবাইকে কি কুলবে?

দাদাঠাকুর

না যদি কুলয় তাহলে এমনি করে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেথো—আমার আর কাজ বাড়িয়োনা।

পঞ্চক

শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর

হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বস্‌তে শিখুক্‌।

পঞ্চক

ওদের বসিয়ে রাখা! সর্ব্বনাশ! তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে! ওরা কেবল ছট্‌ফট্‌ করাকেই মুক্তি মনে করে!

দাদাঠাকুর

ছোট ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুসি হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেই রকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিষ বলে জানে—কিন্তু জানেনা স্থির হ'য়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থ টা বের করে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্যে তোমার মহাপঞ্চক-দাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

পঞ্চক

তাহ'লে আমার মহাপঞ্চকদাদাকে কি ঐখানেই

দাদাঠাকুর

হাঁ ঐখানেই বই কি। তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘুরছিল তা সে দেখ্‌তেও পায়নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে মানুষ নেই। কি করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।

আচার্য্য

আর এই চির অপরাধীর কি বিধান করলে প্রভু?

দাদাঠাকুর

তোমাকে আর কাজ করতে হবেনা আচার্য্য! তুমি আমার সঙ্গে এস!

আচার্য্য

বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে! আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হ'য়ে গেছে—আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আন। আমি কোন সম্পদ চাইনা—আমাকে একটু রস দাও!

দাদাঠাকুর

ভাবনা নেই আচার্য্য ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা

নেমে এসেছে—তার ঝর্ ঝর্ শব্দে মন নৃত্য করচে আমার! বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখ্‌তে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্চে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপচে কারা! এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জ্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় ত উড়ে যাক্, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক্—আজ দুর্যোগ একে বলে কে! আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক্ না—আজ একেবারে বড় রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন!

(সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র

গুরু!

দাদাঠাকুর

কি বাবা!

সুভদ্র

আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর

তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র

বাকি নেই?

দাদাঠাকুর

না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র

একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর

একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙ্‌বা মাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হ'য়ে গেল যে সে আর কোনদিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখ্‌লে মনে হবে সে আকাশের আলো—তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র

এখন আমি কি করব?

পঞ্চক

এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলি উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিমের সমস্ত দরজা জানলাগুলো খুলে খুলে বেড়াব!

উপাচার্য্য

(প্রবেশ করিয়া)

তৃণ পাওয়া গেল না—কোথায়ও তৃণ পাওয়া গেল না!

আচার্য্য

সুতসোম, তুমি বুঝি তৃণ খুঁজেই বেড়াচ্ছিলে?

উপাচার্য্য

হাঁ, ইন্দ্র তৃণ, সে ত কোথাও পাওয়া গেল না। হায়, হায়! এখন আমি করি কি! এমন জায়গাতেও মানুষ বাস করে।

আচার্য্য

থাক তোমার তৃণ! এদিকে একবার চেয়ে দেখ!

উপাচার্য্য

এ কি! এ যে আমাদের গুরু! এখানে! এই দর্ভকদের পাড়ায়! এখন উপায় কি? ওঁকে কোথায়—

(দর্ভকগণের অর্ঘ্য লইয়া প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক

গোসাই এই সব তোমার জন্যে এনেছি। কেতনের মাসি পণ্ড্ পিঠে তৈরি করেছিল তারি কিছু বাকি আছে—

উপাচার্য্য

আরে, আরে সর্ব্বনাশ করলে রে! করিস্ কি! উনি যে আমাদের গুরু!

দ্বিতীয় দর্ভক

তোমাদের গুরু আবার কোথায়? এ ত আমাদের গোসাই!

দাদাঠাকুর

দে ভাই, আর কিছু এনেছিস্?

দ্বিতীয় দর্ভক

হাঁ জাম এনেছি।

তৃতীয় দর্ভক

কিছু দই এনেছি।

দাদাঠাকুর

সব এখানে রাখ্। এস ভাই পঞ্চক, এস আচার্য্য অদীনপুণ্য—নূতন আচার্য্য আর পুরাতন আচার্য্য এসো,

এদের ভক্তির উপহার ভাগ করে নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি!

(বালকগণের প্রবেশ)

সকলে

গুরু!

দাদাঠাকুর

এস বাছা, তোমরা এস!

প্রথম বালক

কখন আমরা বের হব?

দাদাঠাকুর

আর দেরি নেই—এখনি বের হতে হবে।

দ্বিতীয় বালক

এখন কি করব?

দাদাঠাকুর

এই যে তোমাদের ভোগ তৈরি হয়েছে।

প্রথম বালক

ও ভাই এই যে জাম—কি মজা!

দ্বিতীয় বালক

ওরে ভাই খেজুর—কি মজা!

তৃতীয় বালক

গুরু, এতে কোন পাপ নেই?

দাদাঠাকুর

কিছু না—পুণ্য আছে।

প্রথম বালক

সকলের সঙ্গে এইখানে বসে খাব?

দাদাঠাকুর

হাঁ এইখানেই।

(শোণপাংশুদলের প্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু

দাদাঠাকুর!

দ্বিতীয় শোণপাংশু

আর তো পারিনে! দেয়াল ত একটাও বাকি রাখিনি। এখন কি করব? বসে বসে পা ধরে গেল যে!

দাদাঠাকুর

ভয় নেই রে! শুধু শুধু বসিয়ে রাখব না! তোদের কাজ দেব।

সকলে

কি কাজ দেবে?

দাদাঠাকুর

আমাদের পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাথতে লেগে যেতে হবে।

সকলে

বেশ, বেশ, রাজি আছি!

দাদাঠাকুর

ঐ ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।

সকলে

হাঁ মিলেছে।

দাদাঠাকুর

সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র! নূতন সৌধের শাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেল তোমরা দুইদলে, লাগ তোমাদের কাজে!

সকলে

তাই লাগব! পঞ্চকদাদা, তাহলে তোমাকে উঠতে হচ্চে, অমন করে ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে থাকলে চলবেনা। ত্বরা কর। আর দেরি না!

পঞ্চক

প্রস্তুত আছি! গুরু তবে প্রণাম করি। আচার্য্যদেব, আশীর্ব্বাদ কর।

(সমাপ্ত)

জীবন-স্মৃতি

ভৃত্যরাজক তন্ত্র।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাস রাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই সকল রাজাদের পরিবর্ত্তন বারম্বার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল তা'তেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই—পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম সংসারের ধর্ম্মই এই—বড় যে সে মারে, ছোট যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ, ছোট যে সেই মারে, বড় যে সেই মার খায়—শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

কোন্‌টা দুষ্ট এবং কোন্‌টা শিষ্ট, ব্যাধ তাহা পাখীর দিক হইতে দেখে না, নিজের দিক হইতেই দেখে। সেই জন্য যে সতর্ক পাখী গুলি খাইবার পূর্ব্বেই চীৎকার করিয়া দল ভাগায় শিকারী তাহাকে গালি দেয়। মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্ত্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুত সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন্। আমার বেশ মনে আছে সেই সিডিশন্ সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার বড় বড় জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইত! রোদন জিনিষটা প্রহারকারীর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অসুবিধাজনক একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন এক একবার ভাবি ভৃত্যদের হাত হইতে কেন এমন নির্ম্মম ব্যবহার আমরা পাইতাম। মোটের উপরে আকার প্রকারে আমরা যে স্নেহদয়ামায়ার অযোগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আসল কারণটা এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিষটা বড় অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্ব্বহ। ছোট ছেলেকে যদি ছোট ছেলে হইতে দেওয়া যায়—সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতূহল মিটাইতে পারে তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে ভার নিজে অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্ত্তার উপরে পড়ে। তখন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ান হয়। যে বেচারা কাঁধে করে তাহার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরির লোভে কাঁধে করে বটে কিন্তু ঘোড়া বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে।

এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিল-চড় আকারেই মনে আছে—তাহার বেশি আর মনে পড়ে না। কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।

তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্ব্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া গম্ভীর গলায় চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিত। তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে একটা প্রবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে সে "বরানগর"কে "বরাহনগর" বলে। এটা জনশ্রুতি হইতে পারে কিন্তু আমি জানি, "অমুক লোক বসে আছেন"—না বলিয়া সে বলিয়াছিল "অপেক্ষা করচেন।" তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্য্যন্ত সঞ্চিত ছিল। নিশ্চয়ই এখনকার দিনে ভদ্রঘরের কোনো ভৃত্যের মুখে "অপেক্ষা করচেন" কথাটা হাস্যকর নহে। ইহা হইতে দেখা যায় বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে;—একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ভেদ ছিল এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।

এই ভূতপূর্ব্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ মহাভারত শোনাইত। চাকরদের

মধ্যে আরো দুই চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্য্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিক্‌টিকি দেয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চাম্‌চিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মত ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সঙ্কটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুয্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল;—কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝঙ্কারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

কোনো কোনোদিন পুরাণ পাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। যদিও ছোটো ছেলেদের চাকর বলিয়া ভৃত্যসমাজে পদমর্য্যাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু, কুরুসভায় ভীষ্ম পিতামহের মত, সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আপন গুরুগৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল।

এই আমাদের পরম প্রাজ্ঞ রক্ষকটির যে একটি দুর্ব্বলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল। সে আফিম খাইত। এই কারণে তাহার পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই জন্য আমাদের বরাদ্দ দুধ যখন সে আমাদের সাম্‌নে আনিয়া উপস্থিত করিত তখন সেই দুধ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশি প্রবল হইয়া উঠিত। আমরা দুধ খাইতে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দায়িত্ব পালন উপলক্ষ্যেও সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করিত না।

আমাদের জলখাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সঙ্কোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোসে লুচিগুলা রাশ করা থাকিত। প্রথমে দুই একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মত, লুচি কয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে পরিবেষণকর্ত্তার কুণ্ঠিত দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কি না। আমি জানিতাম কোন্ উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না। বাজার হইতে আমাদের জন্য বরাদ্দমত জলখাবার কিনিবার পয়সা ঈশ্বর পাইত। আমরা কি খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম সস্তা জিনিষ ফরমাস করিলে সে খুসি হইবে। কখনো মুড়ি প্রভৃতি লঘু পথ্য, কখনো বা ছোলাসিদ্ধ চিনাবাদামভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম। দেখিতাম শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।

নর্ম্মাল স্কুল।

ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনরিতে বোধ করি বেশি দিন ছিলাম না। যখন নর্ম্মাল্ স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম তখনকার স্মৃতিটা তেমন ঝাপ্‌সা নয়, এবং কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনোমতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তারদিকের এক জানলার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর—আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে।

শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে আমি পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কি করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ঐ ক্লাশের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ঐ কথাটা মনে মনে আলোচনা করিতাম তাহা আজও আমার মনে আছে। ভাবিতাম কুকুর বাঘ প্রভৃতি হিংস্রজন্তুদের খুব ভাল করিয়া শায়েস্তা করিয়া প্রথমে তাহাদের দুই চারি সার যুদ্ধক্ষেত্রে যদি সাজাইয়া দেওয়া যায় তবে লড়াইয়ের আসরের মুখবন্ধটা বেশ সহজেই জমিয়া ওঠে; তাহার পরে নিজেদের বাহুবল কাজে খাটাইলে জয়লাভটা নিতান্ত অসাধ্য হয় না। মনে মনে এই অত্যন্ত সহজ প্রণালীর রণসজ্জার ছবিটা যখন কল্পনা করিতাম তখন যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপক্ষের জয় একেবারে সুনিশ্চিত দেখিতে পাইতাম। যখন হাতে কাজ ছিল না তখন কাজের অনেক আশ্চর্য্য সহজ উপায় বাহির করিয়াছিলাম। কাজ করিবার বেলায় দেখিতেছি যাহা কঠিন তাহা কঠিনই যাহা দুঃসাধ্য তাহা দুঃসাধ্যই; ইহাতে কিছু অসুবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা আরো সাতগুণ বাড়িয়া উঠে।

এমনি করিয়া সেই ক্লাসে একবছর যখন কাটিয়া গেল তখন মধুসূদন বাচস্পতির নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। সকল ছেলের চেয়ে আমি বেশি নম্বর পাইলাম। আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কর্ত্তৃপুরুষদের কাছে জানাইলেন যে পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আমার পরীক্ষা হইল। এবার স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। এবারেও ভাগ্যক্রমে আমি উচ্চস্থান পাইলাম।

কবিতা রচনারম্ভ।

আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়। তিনি তখন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যাম্‌লেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মত শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

পদ্য জিনিষটিকে এ পর্য্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবা চিন্তা নাই, কোনো খানে মর্ত্ত্যজনোচিত দুর্ব্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না। একদিন আমাদের বাড়িতে চোর ধরা পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অথচ নিরতিশয় কৌতূহলের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম নিতান্তই সে সাধারণ মানুষের মত। এমন অবস্থায় দরোয়ান যখন তাহাকে মারিতে সুরু করিল আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। পদ্য সম্বন্ধেও আমার সেই দশা হইল। গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল তখন পদ্যরচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না। এখন দেখিতেছি পদ্য বেচারার উপরেও মার সয় না। অনেক সময় দয়াও হয়, কিন্তু মারও ঠেকানো যায় না, হাত নিস্‌পিস্‌ করে। চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই।

ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে? কোনো একটি কর্ম্মচারীর কৃপায় একখানি নীলকাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড় বড় কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম।

হরিণ শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষতঃ আমার দাদা আমার এইসকল রচনায় গর্ব্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ

করিয়া তুলিলেন। মনে আছে একদিন একতালায় আমাদের জমিদারী কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি এমন সময় তখনকার "ন্যাশানাল পেপার" পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া কহিলেন "নবগোপাল বাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন্ না।" শুনাইতে বিলম্ব হইল না। কাব্যগ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারি হয় নাই। কবিকীর্ত্তি কবির জামার পকেটে পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক এই তিনে-এক একে তিন হইয়া ছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন। পদ্মের উপরে একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটা দেউড়ির সামনে দাঁড়াইয়াই উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে, কিন্তু ঐ "দ্বিরেফ" শব্দটার মানে কি ?

"দ্বিরেফ" এবং "ভ্রমর" দুটোই তিন অক্ষরের কথা। ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোন অনিষ্ট হইত না। ঐ দুরূহ কথাটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মনে নাই। সমস্ত কবিতাটার মধ্যে ঐ শব্দটার উপরেই আমার আশা ভরসা সব চেয়ে বেশি ছিল। দফ্‌তরখানার আমলা-মহলে নিশ্চয়ই ঐ কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। কিন্তু নবগোপালবাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্ব্বল করিতে পারিল না। এমন কি, তিনি হাসিয়া উঠিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল নবগোপালবাবু সমজদার লোক নহেন। তাঁহাকে আর কখনো কবিতা শুনাই নাই। তাহার পরে আমার বয়স অনেক হইয়াছে কিন্তু কে সমজদার, কে নয়, তাহা পরখ্ করিবার প্রণালীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাই হোক্ নবগোপালবাবু হাসিলেন বটে কিন্তু "দ্বিরেফ" শব্দটা মধুপান-মত্ত ভ্রমরেরই মত স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।

নানা বিদ্যার আয়োজন।

তখন নর্ম্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক, ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষ-জন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মত বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্য্যন্ত সমস্তই ইঁহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্রবিষয়ে শিক্ষাদিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লঙ্গটি পরিয়া প্রথমেই এক কাণা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাষ্টিকের মাষ্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরাজি পড়াইবার জন্য অঘোর বাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাৎলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারি জল নীচে নামিতে থাকে, এবং এই জন্যই জল টগ্‌বগ্ করে, ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয় এ কথাটাও যে দিন স্পষ্ট বুঝিলাম সে দিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।

ইহা ছাড়া ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ

করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুল ঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।

ইহারি মাঝে একসময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং" হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে সুরু করাইয়া দিলেন। অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং বোপদেবের সূত্র, দুইয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।

বাংলা শিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মাষ্টার অঘোর বাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন। কাঠ হইতে অগ্নি উদ্ভাবনটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় উদ্ভাবন এই কথাটা শাস্ত্রে পড়িতে পাই। আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পাখীরা আলো জ্বালিতে পারে না এটা যে পাখীর বাচ্চাদের পরম সৌভাগ্য একথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে ভাষা শেখে সেটা প্রাতঃকালেই শেখে এবং মনের আনন্দেই শেখে সেটা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশ্য, সেটা ইংরেজি ভাষা নয় একথাও স্মরণ করা উচিত।

এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র মহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভাল ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনা সত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল সেই সময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাষ্টার মহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্ব ফুলের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের আসিবার সময় দু চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনও বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং" যা'কে বলে! এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া "হা হতোঽস্মি" করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্য্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ! না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্ম্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সে দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরি গলিতে মাষ্টার মহাশয়ের সমানধর্ম্মা দ্বিতীয় আর কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনো মতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্‌স্ কোর্স অফ্ রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না, কেননা শিশুদের প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই। এখনকার মত ছেলেদের বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না। প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাঁধা সিলেব্‌ল্-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্‌সেণ্ট্ চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙীন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত! ইংরেজি ভাষার এই পাষাণ দুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না। মাষ্টার মহাশয় তাঁহার অপর একটি কোন্ সুবোধ ছাত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমাদের প্রত্যহ ধিক্কার দিতেন; এরূপ তুলনামূলক সমালোচনায় সেই ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতিসঞ্চার হইত না, লজ্জাও পাইতাম অথচ সেই কালো বইটার অন্ধকার অটল থাকিত। প্রকৃতিদেবী জীবের প্রতি দয়া করিয়া দুর্ব্বোধ পদার্থমাত্রের মধ্যে নিদ্রাকর্ষণের মোহমন্ত্রটি পড়িয়া রাখিয়াছেন। আমরা যেমনি

পড়া সুরু করিতাম অমনি মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া বারান্দায় দৌড় করাইয়া কোনো স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে তখনি ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হইত না। (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তারা

জানি আমি কারা ওরা আলোকে বিলীন,
ছেয়ে আছে ঊর্দ্ধ ওই অসীমের দেশ;
চেয়ে আছে চিরদিন স্তব্ধ বাক্যহীন,
এ ধরার পানে মেলি' আঁখি নির্ণিমেষ।
অনন্তের মহাকাব্যে ওরা অগণিত
জ্যোতির অক্ষরে লিখা পুণ্যময় শ্লোক;
সনাতন সৌন্দর্য্যের ছন্দ বিরচিত,
আনন্দকল্যাণময়, অমৃত, অশোক।
কি মহা রহস্য হোথা, অর্থ সুগভীর,
চিন্তিছে জগৎ বসি স্তিমিত নয়ানে;
যুগ যুগান্তর ব্যাপী কঠোর নিবিড়,
স্পন্দহীন, মহামৌন, নিশীথ ধেয়ানে।
অনন্তের মহাকাব্যে শ্লোক সংখ্যাহারা,
পুণ্য জ্যোতিশ্ছন্দময় ওই কোটী তারা।

শ্রীবিপিনবিহারী দাস।

ডাউলিং*

এডওয়ার্ড ডাউলিং একজন শান্তপ্রকৃতি মৌনস্বভাব ষাট বৎসরের বৃদ্ধ আইরিশম্যান। তিনি একদা হ্যাভলক ও কলিন ক্যাম্পবেলের অধীনে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সৈন্যদলে কাজ করিয়াছিলেন। সৈনিকের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশে তিনি একটি পশুচারণ-ভূমি ক্রয় করেন, কিন্তু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট হইয়া যাওয়াতে অপরটি রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। সেই অবস্থায় তিনি নিউইয়র্কে আসিলেন। তখন তাঁহার হাতে একটি পয়সা নাই বা একটি বন্ধু নাই। একদিন রাস্তার ধারে এক-ব্যক্তিকে পুরান ছাতা মেরামত করিতে দেখিয়া তিনি তাহার পাশে বসিয়া তাহার কাজ দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি এই বিদ্যাটি কিছু পরিমাণে শিখিয়া লইলেন।

একদিন রবিবারে সন্ধ্যার সময় আমি যখন দরিদ্র-নিবাসে উপাসনা-সভা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলাম তখন দেখিলাম তিনি তাঁহার বিছানায় বসিয়া বাফেলো বিলের জীবনী পড়িতেছেন। আমি তাঁহাকে আমাদের সভায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলাম কিন্তু তিনি ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত এই কথা জানাইয়া আমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহার পরবর্ত্তী রবিবারেই তিনি আমাদের সভায় আসিলেন এবং সেই একদিনেই তাঁহার যেমন আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল এমন আর কখন দেখি নাই।

যেদিন তাঁহার চিত্তে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল তাহার পর সপ্তাহের রবিবারে আমাদের সভাভঙ্গ হইয়া গেলে তিনি তাঁহার এই মানসিক পরিবর্ত্তনের বিবরণ সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন—শুনিয়া তাঁহার বাসার লোকেরা বিস্মিত হইয়া গেল।

তখন শীতকাল। বৃদ্ধটি তাঁহার নূতন ব্যবসায়ে অল্পই উপার্জ্জন করিতেন—কিন্তু তাঁহার যাহাই জুটিত তাহাই সকলের সহিত একত্রে ভোগ করিতেন। তাঁহার বাসার একটি লোকের কাছে শুনিয়াছি যে তিনি কয়েক পয়সা দিয়া একটা বাসি রুটি কিনিয়া, একটি টিনের পাত্রে বিনা চিনিতে কফি তৈরী করিয়া গুটিকতক ক্ষুধার্ত্তকে জুটাইতেন এবং তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া আহার করিতেন, আহার্য্য আর কিছুই নহে,—কফির জলে ভিজান রুটি। কখন কখন তাহাদিগকে বাইবেল হইতে কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইতেন, কখন বা তাঁহার সেই সুস্পষ্ট আইরিশ-কণ্ঠে বলিতেন "ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

---

* From the bottom up নামক গ্রন্থে একজন আইরিশ পাদ্রি নিজের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত আছেন। নিউইয়র্কের যে সকল বাসাবাড়িতে সেখানকার দীনতম ব্যক্তিরা আশ্রয় লইয়া থাকে সেখানে দীর্ঘকাল ইনি কাজ করিয়াছেন। সেইখানকার যে দুই একজন ব্যক্তির বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ডাউলিং একজন।

এই সময় তিনি সপ্তাহে এক ডলার মাত্র উপার্জ্জন করিতে পারিতেন—তথাপি তাঁহার সেই চুলার ধারে ছোট চা-পান নিমন্ত্রণ-সভার অন্যথা হইত না। আহারান্তে বিদায়ের সময় তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া দিনের কাজে বাহির হইত।

কিছুদিন পরে দেখিলাম তাঁহার বড় বড় অক্ষরে ছাপা একটি নূতন বাইবেল জুটিয়াছে। প্রতিদিন চায়ের টেবিলে তিনি সেই বাইবেলটি হইতে দুই একটি অংশ পড়িয়া শুনাইতেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেই বাসার তিন শত লোক তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত দেখিতে লাগিল। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহারই জন্য যে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে; কারণ তিনি চিরকালই শান্ত, ভদ্র ও নম্রস্বভাব ছিলেন। কিন্তু এতদিন তিনি যেন নিজের বাণীটি পান নাই, এখন তাঁহার সেই বাণী ভরসা ও সমবেদনা বহন করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল—এই বাণী এই ধ্বনি তাঁহার সঙ্গীরা অন্যত্র খুঁজিয়া পাইত না।

তিনি দরিদ্র বস্তিতে গিয়া হাঁড়ি কাংলি প্রভৃতি পাত্র ও ছাতা মেরামত করিতেন। সব সময় যে অর্থ উপার্জ্জনের অভিপ্রায়ে করিতেন তাহা নহে কিন্তু তাঁহার বাইবেল হইতে সেই দুঃখী দরিদ্রদিগকে আশ্বাসবাণী শুনাইবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া তিনি এই উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দুরন্ত শীতের সময় একদিন মালবারি ষ্ট্রীট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম একটি গলির মধ্যে এক ভাঙ্গা জানালার ধারে আমার বন্ধুটি দাঁড়াইয়া। তাঁহার হাতে সেই বাইবেল ও পায়ের কাছে মেরামতের আসবাবের ঝুলিটি পড়িয়া রহিয়াছে। যে বাড়ীর জানালায় দাঁড়াইয়া তিনি বাইবেল শুনাইতেছেন তাহার কপাট বন্ধ। কয়েক মিনিট পরে তিনি বইটি বন্ধ করিয়া ঝুলির ভিতর রাখিলেন ও দেখিলাম তিনি চলিয়া আসিলে পর ভিতর হইতে সেই ভাঙ্গা জানালার ফাঁকটি ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলী গুঁজিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ওখানে কি করিতেছিলে?" তিনি হাসিয়া বলিলেন "ভগবান এই স্ত্রীলোকটির মঙ্গল করুন। আমি উহার একটি ছাতা মেরামত করিয়া দিয়াছি কিন্তু বাইবেল শুনাইবার প্রস্তাব করাতে তাহার ঘর অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়া সে আমাকে বাড়ির মধ্যে বাইবেল পড়িতে দিল না; তাই আমি ঐ ভাঙ্গা জানালার বাহির হইতে উহাকে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম।"

সে বৎসর সমস্ত শীতকাল তিনি পুরাতন জিনিষ মেরামত করিয়াছেন আর ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। সমস্ত শীত ধরিয়া প্রতিদিন সকালবেলায় জীর্ণবসনধারী শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। সন্ধ্যার সময় তিনি যখন বিশ্রাম ও নির্জ্জনতার জন্য কোন নিভৃত কোণে বসিতেন তখনও অনেক সময় তিনি একটি জিজ্ঞাসু মণ্ডলীর কেন্দ্র হইয়া পড়িতেন।

তাঁহার সেই সময়কার ডায়ারী আমার নিকট আছে এবং তাহার মধ্যে এই সরলপ্রকৃতি বৃদ্ধের যে নম্রতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। এডওয়ার্ড ডাউলিংকে তাঁহার পাদ্রী একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু যতদিন না প্রয়োজনের তাড়নায় বাধ্য হইয়াছিলেন ততদিন তিনি বিনয় বশত সেখানে যান নাই। অবশেষে তিন দিন যখন উপবাসে কাটিল তখন সেই ধনী পাদ্রীর নিকট গিয়া নিজের অবস্থা নিবেদন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার পরিধানে দরিদ্রবেশ ছিল। সেদিন বড় শীত। বরফ ও বরফগলা জলে রাস্তা দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় পথে যাইতে যাইতে এডওয়ার্ড একটি বৃদ্ধাকে দেখিলেন তাহার ছিন্ন বেশ, ভিজা পা। বৃদ্ধাটিকে সম্বোধন করিয়া ডাউলিং বলিলেন, "বাছা তোমার নিশ্চয়ই বড় শীত করিতেছে।" বৃদ্ধাটি উত্তরে বলিল, "হাঁ মহাশয় আমার শীত করিতেছে কিন্তু শুধু তাই নয়, আমি উপবাসে মরিতেছি। আমাকে রুটি কিনিবার জন্য একটি পয়সা দিতে পারেন?"

"বাছা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমি নিজেই তিন দিন ধরিয়া উপবাসী রহিয়াছি। কিন্তু আমি এখন আমাদের প্রভুর একটি বিশ্বস্ত সেবকের নিকট যাইতেছি। যদি তাঁহার নিকট হইতে কোন সাহায্য পাই তবে তাহা তোমার সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিব। আমি গরীব মানুষ, পুরান জিনিষ মেরামত করিয়া দিন চলে, কিন্তু এ

সপ্তাহে কাজ বড় ঢিলা পড়িয়াছে, বাসা ভাড়া কুলাইয়া উঠিতে পারি নাই।”

ডায়ারীতে সমস্ত বিবরণ দেওয়া আছে; বৃদ্ধার সহিত যেখানে সাক্ষাৎ হইয়াছিল রাস্তার সেই বিশেষ কোণটি, সময়টি পর্য্যন্ত।

একটি ভৃত্য তাঁহাকে সেই ‘প্রভুর সেবকের’ বৈঠকখানায় লইয়া গেল। এমন সময় সেই শ্রদ্ধাস্পদ পাদ্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে যেন কিছু বিরক্ত দেখাইতেছিল। তিনি করমর্দন না করিয়াই বলিলেন, “ডাউলিং, আমি তোমাকে কয়েকবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম জানি, কিন্তু আমি কাজের লোক; আসিবার পূর্ব্বে আমাকে একবার সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল। আজ এখন তোমার সহিত আলাপ করা একেবারে অসম্ভব! আমার একটা বক্তৃতা লিখিতে হইবে, আমার আর সময় নাই।”

বৃদ্ধের ডায়ারীতে আছে—“না করচালন না কোন খৃষ্টান-সম্ভাষণ।” “অন্যের প্রতি প্রতিকূল ভাবনার পাপ আমার হৃদয়ে যেন কোন দিন প্রবেশ না করে।” এই কথা কয়টি লিখিয়া তিনি এই ঘটনাটির বিবরণ সমাপ্ত করিয়াছেন।

একটি ট্র্যাক্ট সোসাইটির নিকট হইতে তিনি পুস্তক ফেরি করিবার ভার লইলেন। হাড্‌সান নদীর পূর্ব্ব তটভাগ তাঁহার এই ফেরির জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এখনকার কালে ধর্ম্মপুস্তক ফেরি করার ন্যায় এমন লাভহীন অপ্রিয় কাজ আর বোধ হয় নাই। বেচারা বৃদ্ধের স্কন্ধে ছাপাখানার যত কুলিখিত জঞ্জাল চাপান হইল। স্থির হইল যে তিনি বিক্রয়ের এক চতুর্থাংশ লাভ পাইবেন। হৃদয়ে উৎসাহ ও স্কন্ধে ঝুলি লইয়া তিনি ত পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে তাঁহার ডায়ারী ছিল। যদিও বিবরণগুলি সংক্ষিপ্ত কিন্তু একেবারে খাঁটি।

“২৯শে আগষ্ট। রুটি কিনিবার বা ঘর ভাড়া দিবার একটি পয়সা নাই। ঈশ্বর মঙ্গলময়। রাত্রি হইয়া আসিল, বড় শ্রান্তি ও ক্ষুধা বোধ করিতে লাগিলাম। একটি বাগানের মধ্যে আশ্রয় লইলাম এবং একটি প্রার্থনা করিয়া ঘুমাইলাম। নিকটেই একটি ঘড়িতে ২টা বাজিল, তারপর অত্যন্ত বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বাতাসও প্রবল হইয়া উঠিল। ঝড় বৃষ্টিতে আমাকে বাগানে টিঁকিতে দিল না। একটি পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল ‘কে তুমি?’ আমি বলিলাম ‘বন্ধু, আমি ঈশ্বরের দাস।’ ‘তবে তিনি তোমাকে রাত্রের বিশ্রামের জন্য স্থান দেন্ নাই কেন?’ আমি ভাবিলাম ‘ভগবান ক্ষমা করুন, কিন্তু এই অযোগ্য সংশয় আমারও মনে উদয় হইয়াছিল।’ অদূরে একটি বাড়ি তৈরি হইতেছিল তাহারি কতকগুলি কাঠের স্তূপের মধ্যে শুইয়া রহিলাম। কিন্তু অত্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া ঘুম আসিল না।”

পর দিন ক্ষুধার তাড়নায় তিনি প্রত্যূষেই কাজে বাহির হইলেন। দ্বার হইতে দ্বারে তিনি ফিরিলেন কিন্তু সাধু অসাধু সকলের নিকট হইতেই তাড়িত হইলেন। অবশেষে ক্ষুধায় এত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার প্রায় দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। ইহার পরে তিনি এক প্রকার ‘মরিয়া’ হইয়া পুনরায় আর একটি পাদ্রীর সহিত দেখা করিতে গেলেন।

এই সুবিখ্যাত ধর্ম্মব্যবসায়ীটির ধর্ম্মগ্রন্থে কোন প্রয়োজন ছিল না বা ভিক্ষুকের জ্বালাতন সহ্য করিবার মত অবকাশও তাঁহার অল্প ছিল। ডায়ারীতে লেখা আছে যে ডাউলিং পাদ্রীকে বলিয়াছিলেন যে তিনি ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতেছেন না ও এক টুকরা রুটি এবং এক গ্লাস জল পাইলে তিনি বড়ই বাধিত হইবেন। কোন খৃষ্টান-সমাজে যে ঘটনা কল্পনা করা যায় না তাহাই ঘটিল, তিনি দ্বার হইতে তাড়িত হইলেন। এই ঘটনাটি কেবল তাঁহার ডায়ারিতেই লিখিত আছে, কিন্তু কোমলহৃদয় ডাউলিং যত কাল বাঁচিয়াছিলেন একদিনের জন্যও একথা কাহাকেও বলেন নাই।

এই ধনশালী ট্র্যাক্ট-সমিতির নিকট হইতে তিনি অনেকগুলি পরিচয় পত্র পাইয়াছিলেন তাহারই একটি লইয়া তিনি পুনর্ব্বার একজন পাদ্রীর নিকট গেলেন।

“একটি সুন্দরী মহিলা আসিলেন, আমি তাহাকে আমার পরিচয় লিপিগুলি দেখাইলাম এবং আমার অবস্থা নিবেদন করিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলাম। তিনি বলিলেন, ‘আমরা এখন ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়াছি, তোমাকে সাহায্য করিতে পারিব না। ধর্ম্মপুস্তকে আমাদের আর প্রয়োজন নাই।’ অবশেষে ট্যারিটাউনের একটি পাদ্রী অপর পাদ্রীগুলির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কতকগুলি পুস্তক ক্রয় করিলেন।”

আর এক সময় অনাহারে যখন ডাউলিং প্রায় মৃতবৎ হইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া ছিলেন, একটি মজুর তাঁহাকে সংবাদ দিল যে নিকটেই একটি নিগ্রোর মদের দোকান আছে। তাহার কোন ধর্ম্ম নাই কিন্তু সে ধর্ম্মের কথা শুনিতে উৎসুক, ডাউলিং যদি তাহার

কাছে যান ত ভাল হয়। তিনি তাহাই করিলেন। সেই নিগ্রোটি তাঁহাকে বলিল যে তাহারা মদের দোকান রাখে বলিয়া গির্জ্জায় যাইতে পারে না। সে বলিল, "রোস, আমার চাকর জিমকে দোকানে রেখে আমি তোমার সঙ্গে বাড়ি যাব, তুমি আমাদের কাছে ঈশ্বরের বিষয় বলবে।" এইরূপে তাহারা দরিদ্র প্রচারকটির অতিথি সৎকার করিল। ঈশ্বর তাঁহাকে এই বন্ধু জুটাইয়া দিলেন বলিয়া সেদিনকার ডায়ারী তাঁহার গুণগানে পূর্ণ। নিগ্রোটি এক ডলার (তিন টাকা মূল্যের পুস্তক ক্রয় করিল ও ডাউলিংকে সে রাত্রি তাহাদের বাড়িতে রাখিল।

এই ডলারটি লইয়া তিনি নিউইয়র্কে ফিরিয়া গেলেন এবং আবার তাঁহার মেরামতের ঝুলি ঘাড়ে করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের কাজে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন যে আত্মার সংস্কারের প্রয়োজন বোধ না করিলেও মেরামতের যোগ্য ঘটি বাটি মানুষের নিশ্চয়ই অনেক আছে। অতএব তিনি রন্ধনশালার পাত্র মেরামতের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সংস্কার সাধনেও প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উপবাসকঠোর জীবনের অবসান হইল। তিনি তাঁহার অন্তরে যে আবির্ভাব নূতন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, জীবিকা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাই প্রচার করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইল। তাঁহার ডায়ারী হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই বিবরণ শেষ করি :—

১২ই সেপ্টেম্বর পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে যে ছোট নদীটি আছে আমি তাহারই তীরে গিয়া পড়িলাম। আমার সঙ্গে একটি রুটি ও কতকটা পনির ছিল। তাহাই খাইলাম ও একটি টিনের পাত্রে করিয়া নদী হইতে জল তুলিয়া পান করিলাম। যাহা অবশিষ্ট রহিল সেইগুলি একটি পুঁটুলি করিয়া আমি রাস্তার ধারে একটি বৃক্ষের ডালে বাঁধিয়া রাখিলাম। তাহার উপর লিখিলাম "বন্ধু! তুমি যদি এই খাদ্যের সন্ধান পাও ও ক্ষুধার্ত্ত থাক তবে ইহা আহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিও না। কিন্তু ইহাতে যদি তোমার প্রয়োজন না থাকে তবে ইহা এইখানেই রাখিয়া দিও কারণ আমি দিনশেষে এইখানে আবার ফিরিয়া আসিব। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

সন্ধ্যাবেলায় তিনি ফিরিয়া আসিয়া পুঁটুলিটির আকারের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন দুইটি মাংসের কচুরী ও বড় বড় দুইটি আপেলের সহিত একটি লিপি রহিয়াছে, "বন্ধু! আহার্য্যের কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সাধনের জন্য এইগুলি গ্রহণ কর। তুমি শান্তিতে থাক।" ভগবানের এই দয়ায় তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল ও তিনি ভগবানের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅতসী দেবী।

বাদশাহী গল্প

(ফার্সী হইতে)

"প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা।"

(কালিদাস।)

(১) শাহ্‌জাহানের প্রজাবাৎসল্য।

এই বাদশাহের হৃদয় সর্ব্বদা রাজ্যের খবর লইতে ব্যস্ত থাকিত। একদিন দুপুর রাত্রে রাজস্বের কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে একখানা কাগজ হইতে জানিতে পারিলেন যে কোন একটি মহালের খাজনা গতবৎসর অপেক্ষা কয়েক হাজার টাকা বেশী করা হইয়াছে। অমনি ইহার কারণ জানিবার জন্য রাজস্বসচিব (দেওয়ান) প্রধান মন্ত্রী সাহুল্লাঃ খাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘটনাক্রমে তখন সাহুল্লাঃ রাজস্ব-বিভাগের তোষাখানার মধ্যে হিসাবের কাগজ হাতে লইয়া বসিয়াছিলেন; রাত জাগিয়া হিসাব ঠিক এবং কাগজ পত্র তৈয়ারি করিতে হওয়ায় তাঁহার চক্ষু দুটি ঘুমে বুজিয়া আসিতেছিল। বাদশাহের দূত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং মন্ত্রী ঠিক কি অবস্থায় ছিলেন তাহা বর্ণনা করিল। শাহ্‌জাহান একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি সজাগ থাকিয়া রাজ্যের সব নিয়মগুলি চালাইতেছ এবং তত্ত্বাবধান করিতেছ, এই বিশ্বাস করিয়া আমি একটু বিশ্রাম ভোগ করিতাম। কিন্তু যখন আমার বিশ্রাম তুমি নিজেই লইয়াছ, তখন আমাকেই রাত জাগিতে হইবে।" সাহুল্লাঃ খাঁ নিজের দোষের জন্য কিছু কারণ দেখাইয়া মিনতি করিলেন; তাহার পর বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মহালের জমা-বৃদ্ধির কারণ কি? এই পরিবর্ত্তন কেন হইল? আমার রাজত্বকালে ত চাষের উপযুক্ত কোন জমি পতিত ছিল না, যে, তাহা চাষ করাইয়া তাহা হইতে

খাজনার পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে। এই মহালের কর্ম্মচারীর নিকট সন্ধান কর।"

পরে সেখানকার কর্ম্মচারী লিখিয়া পাঠাইল যে সে বৎসর নদী সরিয়া যাওয়ায় কতকটা জমি দেখা দিয়াছে, এবং এই নূতন জমির জন্য খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহ আবার জানিতে চাহিলেন যে এই জমি সরকারী খাস মহাল, অথবা লাখরাজ দানের ভূমির সঙ্গে লাগা। খুঁজিয়া জানা গেল যে উহা দানের ভূমির মধ্যে। তখন বাদশাহ বলিলেন, "এই সব লাখরাজ-ভোগী অসহায় পিতামাতাহীন অথবা বিধবা প্রজাদের ক্রন্দনে নদী শুকাইয়া গিয়াছে। ও জমিতে তাহাদের সত্ব। ও জমি সরকারী জমির মধ্যে আনা শুধু ঐ বেচারাদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা।" এবং সাহল্লাঃর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ঐ মহালের হতভাগ্য ফৌজদার একটি দ্বিতীয় শয়তান, তাহাকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া মারিলে ঠিক হইত; কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের প্রাণনাশ করা উচিত নয়। এখন তাহাকে শুধু কাজ হইতে ছাড়াইলেই শাস্তি দেওয়া হইবে, এবং ইহা দেখিয়া ভবিষ্যতে অন্য কেহ এরূপ ন্যায্য-সত্ব-নাশকারী কর্ম্ম করিবে না। অতিরিক্ত যে খাজনা আদায় হইয়াছে তাহা সরকারী কোষাগার হইতে সেই সেই প্রজাদের ফেরৎ দেওয়া হউক।"

(২) বিজাপুর রাজ্যে প্রজার সুখ।

মুহম্মদ আদিলশাহ ১৬২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৬ পর্য্যন্ত বিজাপুরের রাজা ছিলেন। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে আদালত মহল নামক উচ্চ রাজবাড়ীর ছাদে সাদা ফরাশ বিছাইয়া সাদা পোষাক পরিয়া মহা সমারোহে মন্ত্রী ও সামন্তদের সহিত বসিয়া আমোদ করিতেছিলেন। মধ্য রাত্রে যখন সকলেরই হৃদয় আহ্লাদে মগ্ন ছিল, রাজা বিজাপুর শহরের প্রজাদের অবস্থা জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া কান খাড়া করিয়া রহিলেন এবং শহর হইতে যে শব্দ আসিতেছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে আমোদের ধ্বনি গান ও বাদ্য ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইতেছে না। তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে তাঁহার রাজত্ব কালে প্রজারা এত নিরাপদ ও সুখে আছে, এবং কোথায়ও ক্রন্দন বা আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে না। বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্র আফজল খাঁ সিংহাসনের পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আফজল খাঁজি! শহর কি বলিতেছে?" আফজল খাঁ উচিত সম্ভাষণ করিয়া উত্তর করিলেন, "শহর হুজুরের গুণ গান করিতেছে এবং এই প্রার্থনা করিতেছে যে আপনার ঐশ্বর্য্য, আয় এবং ক্ষমতা বাড়িতে থাকুক, কারণ এ সব সুখ ও আনন্দ শুধু আপনার ন্যায়বিচার, সৎকার্য্য, প্রজা-বাৎসল্য এবং দানশীলতার ফল।" রাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, যদি দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হয় তবে তাহার ফল কি হইবে?" আফজল খাঁ উত্তর করিলেন, "এই আমোদ আহ্লাদের শব্দের পরিবর্ত্তে কাদাকাটি, আর্ত্তনাদ ও বিলাপের ধ্বনি উঠিবে।"

(৩) বিজাপুরের রাজার দয়া।

বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিলশাহ এক দিন উচ্চ প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। দূরে গ্রামের বাড়ীগুলির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে আর সব পাড়া হইতে ধূঁয়া উঠিতেছে, শুধু একটি পাড়ার বাড়ীগুলির উপর ধূঁয়ার চিহ্ন নাই। আশ্চর্য্য হইয়া পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর সব পাড়া হইতে রান্নার ধূঁয়া দেখা দিতেছে, কিন্তু ঐ পাড়ায় নহে। ইহার কারণ কি?" তাহারা উত্তর করিল, "ওটা ব্রাহ্মণপাড়া; ব্রাহ্মণেরা দিনে শুধু একবার মাত্র রাঁধে ও খায়।" কিন্তু দয়ালু সরল রাজার মনে এই সন্দেহ উঠিল যে হয়ত উহারা দারিদ্র্যের জন্য শুধু একবার আহার করে। দুঃখে তাঁহার চোখে জল আসিল, এবং তিনি হুকুম দিলেন যে ঐ ব্রাহ্মণদের আহারের খরচ রাজসরকার হইতে দেওয়া হউক, যেন উহারা প্রাণ ভরিয়া দুবার করিয়া খাইতে পারে। তিনি জানিতেন না যে

ব্রাহ্মণ জাতি, কি ধনী কি দরিদ্র, দিনে একবারের বেশী রাঁধা জিনিষ আহার করা আচার-বিরুদ্ধ মনে করে।

***

(৪) নূরজাহানের জন্ম ও বিবাহ।

"জাহাঙ্গীরনামা" নামক ইতিহাসের লেখক সময় উপযুক্ত নয় দেখিয়া এবং উভয় পক্ষের মান রাখিয়া চলা আবশ্যক বলিয়া এই কাহিনীর আদি ও অন্ত বর্ণনা করিতে অনেকগুলি ঘটনা চাপা দিয়াছেন এবং বিষয়টি অন্যরূপ করিয়া সাজাইয়াছেন। কিন্তু আমি (অর্থাৎ খাফি খাঁ) অনুসন্ধান করিয়া যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, এবং সুজার চাকর মহম্মদ সাদিক তব্‌রেজী লিখিত "মনহজ-উল-সাদিকাইন" নামক গ্রন্থে পড়িয়াছি, তাহা এইরূপ ঃ

নূরজাহানের পিতা ঘিয়াস বেগ পারস্য দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন এবং শাহ্ তহমাস্প নামক রাজার অধীনে খুরাসানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার নিকট অনেক রাজস্ব বাকী হওয়ায় এবং অন্যান্য বিপদ ঘটায়, তিনি অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, এবং দেশত্যাগ করিয়া নিজের স্ত্রী, দুই কন্যা এবং এক পুত্র সহিত হিন্দুস্থানে আসিবার পথিকদলের সঙ্গে জুটিলেন। পথে তাঁহার উপর আরও বিপদ আসিয়া পড়িল এবং সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার অবস্থা এমন শোচনীয় হইল যে এই পাঁচ ছয় জন লোকের চড়িবার ও জিনিষ বহিবার জন্য শুধু দুইটি উট অবশিষ্ট ছিল, এবং তাঁহারা পালাক্রমে তাহাতেই চড়িতেন। তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী থাকায় তাঁহাকে উটে চড়ানই বেশী আবশ্যক হইয়াছিল। কান্দাহারের নিকট পৌছিলে নূরজাহানের জন্ম হইল। শুশ্রূষা করিবার লোক নাই; এবং ক্ষুধার্ত্ত, পথশ্রমে ক্লান্ত ও পীড়িত মাতার স্তনে কন্যার পানের জন্য যথেষ্ট দুগ্ধ দেখা দিল না। তখন তাঁহারা মেয়েটিকে একখান কাপড়ে জড়াইয়া ভগবানে সমর্পণ করিয়া রাত্রিকালে পথিকদলের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। প্রাতে যখন সকলে যাত্রা আরম্ভ করিবে, শিশুর ক্রন্দন মালিক মাসুদ নামক ঐ দলপতির কোন চাকরের কানে পৌছিল। সে উহাকে তুলিয়া প্রভুর কাছে আনিল। মেয়ের মুখ দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, এবং নিজের সন্তান না থাকায় সন্তানের মতন পালন করিতে লাগিলেন। মেয়েটিকে স্তনপান করাইবার জন্য খুঁজিয়া তাহার মা ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক পাওয়া গেল না। পথিকদের নেতা তখন ঘিয়াস বেগ ও তাঁহার স্ত্রীকে আদর করিয়া কাছে আনিলেন এবং তাঁহাদের চড়িবার উট এবং জিনিষ পত্র দান করিলেন। মেয়ের মাই তাহার ধাত্রী নিযুক্ত হইলেন, এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

মালিক মাসুদ প্রতি বৎসরই পারস্য হইতে পথিকদল লইয়া ভারতে আসিতেন এবং বাদশাহ আকবরকে নিজের বাণিজ্য দ্রব্য হইতে বাছিয়া ভাল ভাল উপহার দিতেন। আকবর বলিলেন, "তোমার এবারকার কোন উপহারই যে আমার উপযুক্ত বোধ হইতেছে না।" যাত্রী-দলপতি উত্তর করিলেন, "আমরা কাপড়-বিক্রেতা; আমাদের কোন উপহার এই সম্রাটের যোগ্য হইতে পারে? কিন্তু এ বৎসর আমি কয়েকটি সজীব অমূল্যরত্ন সঙ্গে আনিয়াছি। যদি আপনি তাহাদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি করেন, তবে বলিতে পারি যে এমন উপহার ইরান ও তুরান হইতে ভারতবর্ষের সম্রাটদের জন্য এ পর্য্যন্ত কখনও আসে নাই।" তাহার পর বাদশাহ তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে বলিলেন এবং ঘিয়াস্ বেগ ও তাঁহার পুত্র আবুল্‌হসনকে নিজের কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এবং কার্য্যদক্ষতায় দিন দিন তাঁহাদের পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মালিক মাসুদের স্ত্রীর বাদশাহের অন্তঃপুরে যাইবার অনুমতি ছিল। তিনি নূরজাহান ও নূরজাহানের আপন মাতার সহিত তথায় যাতায়াত করিতেন এবং উৎসবের দিনে বেগমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গৌরব ও নগদ টাকা, গহনা, কাপড় প্রভৃতি উপহার পাইতেন। যখন নূরজাহান যৌবনকালে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি সৌন্দর্য্যের সঙ্গে দিন দিন বাড়িতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত যুবরাজ সেলিমের প্রেমকটাক্ষ বিনিময় হইত। যুবরাজ তাঁহার প্রেমের বশ হইয়া পড়িলেন। একদিন অন্দরমহলের এক কোণে নূরজাহানকে একা পাইয়া সেলিম আদর করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া নিজের দিকে টানিলেন। নূরজাহান পলাইয়া গিয়া

বেগমদিগের কাছে নালিশ করিলেন। অন্তঃপুরের গুপ্ত চরেরা বাদশাহকে এ খবর দিল। আকবর ন্যায়পরায়ণতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। অধীনস্থ লোকদের মানসম্ভ্রমের দিকে চাহিয়া তিনি সেলিমের উপর রাগ করিলেন এবং নুরজাহানের গুরুজনকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, যে, এই অমূল্য কুমারী-রত্নকে কাঁহারও সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হউক। গিয়াস বেগ উত্তর করিলেন "আমরা আপনার দাস মাত্র; এ বিষয়ে আমাদের কি ক্ষমতা আছে?"

তুর্কী জাতির আস্তাথলু শ্রেণীর আলীকুলী নামক এক যুবক প্রথমে পারস্যরাজ শাহ তহমাস্পের পরিবেষণকারী ভৃত্য ছিল, পরে ভারতে আসিয়া মুলতানের শাসনকর্ত্তার অধীনে কাজ কর্ম্ম ভাল করায় খ্যাতিলাভ করে এবং বাদশাহের নিকটস্থ কর্ম্মচারীদের দলভুক্ত হয়। আকবরও তাহাকে ভালবাসিতেন; তাহাকে শেরাফ্‌কন অর্থাৎ "ব্যাঘ্রহন্তা" উপাধি দিয়া তাহার সহিত তাড়াতাড়ি নুরজাহানের বিবাহ দিয়া ফেলিলেন, এবং বাঙ্গালায় এক জাগীর দান করিলেন। শেরাফ্‌কন কিছুদিন মহারাণার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া পরে জাগীরে গিয়া বাস করিতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া তাহার দুধ-ভাই কুতবুদ্দীন খাঁ কোকলতাশকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন এবং বিদায় দিবার সময় গোপনে শেরাফ্‌কন সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দিলেন। শেরাফ্‌কন দরবারে তাহার প্রতিনিধির চিঠি হইতে এই গোপনে কথাবার্ত্তার সংবাদ পাইল, এবং "প্রেম ও কস্তুরীর গন্ধ লুকান যায় না" এই প্রচলিত বচন অনুসারে বাদশাহের অভিপ্রায় বুঝিয়া লইল। সেইদিনই জেলার সংবাদলেখক কর্ম্মচারীকে কহিল "আজ হইতে আমি আর বাদশাহের চাকর নই।" অস্ত্রসজ্জা করা ছাড়িয়া দিল। কুতবুদ্দীন খাঁ বাঙ্গলায় পৌঁছিয়া শেরাফ্‌কনকে দেখা করিবার জন্য কত চিঠি লিখিলেন, কিন্তু সে আসিল না। তখন কুতবুদ্দীন সরকারী কাজের ভাণ করিয়া তাহার জাগীরের নিকট পৌঁছিলেন এবং শেরাফ্‌কনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শেরাফ্‌কন অর্দ্ধ আস্তীন জামার নীচে বর্ম্ম ও তরবারী পরিয়া দু চার জন অনুচরসহ কুতবুদ্দীনের কাছে আসিয়া দেখা করিল। কুতবুদ্দীন সম্ভাষণ ও কুশল জিজ্ঞাসার পর বাদশাহের প্রস্তাবটি মিষ্টভাবে শেরাফ্‌কনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন এবং সম্রাটের হুকুম মানিবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু সেই সিংহহৃদয় বীর বুঝিল যে কথায় রাগ প্রকাশ করা বৃথা, এবং কুতবকে মারিয়া নিজে মরা ভিন্ন মানের সহিত প্রাণ লইয়া সে স্থান হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। তখন শেরাফ্‌কন আস্তীনের নীচে হইতে ছোরা বাহির করিয়া কুতবুদ্দীনের পেটে এমন জোরে ঘা মারিল যে তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। শের ছুটিয়া পলাইবে এমন সময় সুবাদারের একজন কাশ্মীরী চাকর পথরোধ করিয়া তরবারের আঘাত করিল; শের তাহাকে মারিয়া ফেলিল; কিন্তু ইতিমধ্যে কুতবের আর সব অনুচর পৌঁছিয়া অনেক অস্ত্রাঘাতে শেরের প্রাণ লইল।

এ সম্বন্ধে অন্য একরকম গল্পও প্রচলিত আছে। শেরাফ্‌কন সাঙ্ঘাতিক আহত হইয়াও শত্রুর দল ভেদ করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত আসিল; ইচ্ছা যে নিজের স্ত্রী ও শাশুড়ীকে কাটিয়া ফেলিয়া বংশে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে দিবে না। নুরজাহানের মা অত্যন্ত চালাক স্ত্রীলোক ছিলেন। শেরাফ্‌কন স্ত্রীবধের পাপে মগ্ন না হইতে পারে এজন্য তিনি জামাই ঢুকিবার আগেই বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া নুরজাহান কূয়ায় ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তোমার অন্দরে আসার আবশ্যক নাই। বাহিরে থাকিয়া আঘাতের চিকিৎসা কর।" এই কথা শুনিয়া শেরাফ্‌কনও প্রাণত্যাগ করিল। পরে বাদশাহ নুরজাহানকে বিবাহ করিলেন।

***

(৫) নুরজাহানের ব্যাঘ্র শিকার।

একদিন বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার দুই স্ত্রী, অর্থাৎ প্রথম বিবাহিতা রাণী (মানসিংহের ভগিনী, খসরুর মাতা,) এবং নুরজাহানকে সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে গিয়াছেন। একটা প্রকাণ্ড বাঘকে দূর হইতে (জালের) বেড়া দিয়া ঘেরাও করা হইয়াছিল। বাদশাহ তাহাকে মারিতে যাইবার আগেই অভ্যস্ত সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। জাহাঙ্গীর

শাজাহাঁর দরবার।

(মোগল চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিঅনুসারে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে)

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

প্রায় সব রকম নেশাই করিতেন, কাজেই দুপুরে না ঘুমাইলে তাঁহার চলিত না। তাঁহার বন্দুক ও বারুদ জ্বালাইবার জ্বলন্ত পলতে বিছানার পাশে রহিল। দুই রাজমহিষী এবং দু তিনজন দাসী কাছে পাহারা দিতে লাগিল। এমন সময়ে বাঘটা গর্জ্জন করিয়া বেড়া হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে সময়ে ভারতের বাদশাহদিগের স্ত্রী ও প্রিয় দাসীদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া ঘোড়ায় চড়া এবং তীর ও বন্দুক ছোড়া শেখান হইত; কেবল নূরজাহান এ সব বিদ্যা জানিতেন না। সেই বাঘ দূরে দেখা দিল, রাণী বন্দুক তুলিয়া বুকে লাগাইয়া চামকা দিয়া বারুদে আগুন দিলেন। এমন লক্ষ্য ঠিক, যে, বাঘের কপালে গুলি লাগিয়া সেই ভীষণ জন্তুটা একবার মাত্র হুঙ্কার ছাড়িয়া অজ্ঞান হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বন্দুকের আওয়াজ এবং বাঘের গর্জ্জন শুনিয়া বাদশাহ জাগিয়া দেখিলেন যে বাঘ সেই অবস্থায় পড়িয়া আছে, রাণী বন্দুক-হস্তে আহ্লাদে দাঁড়াইয়া আছেন, আর নূরজাহান দূরে ভয়ে কাঁপিতেছেন ও কাঁদিতেছেন। তখন তিনি রাণীকে প্রশংসা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং সে দিন হইতে তাঁহাকেই বেশী অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন; নূরজাহান যেন ছয়োরাণী হইলেন। নূরজাহানের মা বুদ্ধিতে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনি বাদশাহের মন ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, বলিলেন "মহাত্মা আলীর উক্তি আছে যে অনেকগুলি গুণ পুরুষের পক্ষে প্রশংসার কারণ কিন্তু তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে দোষ বলিয়া গণ্য হয়, যেমন বীরত্ব এবং দানশীলতা (অপব্যয়)।"

সেই দিন হইতে নূরজাহান বন্দুক চালান শিখিতে লাগিলেন, এবং অল্প দিনে তাহাতে দক্ষ হইলেন। পূর্ব্বে বর্ণিত ঘটনার দু এক বৎসর পরে বাদশাহ আবার শিকারে গেলেন। চাকরেরা চারিটা বাঘ বেড়ায় ঘিরিল, নূরজাহান তাহাদের মারিতে অনুমতি লইলেন, এবং অব্যর্থ গুলিতে পরে পরে চারিটিকেই শিকার করিলেন। বাদশাহ খুসী হইয়া তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দামের হীরার পুঁছী (অলঙ্কার) উপহার দিলেন।

***

(৬) তাজমহল নির্ম্মাণ।

বাদশাহ শাহজাহান তাঁহার পত্নী মমতাজমহলকে বড়ই ভাল বাসিতেন, কি যুদ্ধযাত্রায়, কি ভ্রমণে, কি স্থির হইয়া বাস কালে, কখনও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেন না। বেগমের শেষ সন্তান হইবার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার জঠরের ভিতর হইতে ছেলের কান্নার মত শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। এই কুলক্ষণ হইলে প্রসূতি বাঁচে না। জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারাকে দিয়া বাদশাহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শাহজাহান ছুটিয়া বেগমের পাশে আসিলেন। সাম্রাজ্ঞী বলিলেন, "নাথ! এতদিন আমি আপনার চিরসহচরী ছিলাম, আপনার যৌবরাজ্য কালে, কি সুখে কি দুঃখে, কি গৌরবে কি পিতৃ-কারাগারে বন্দী থাকার সময়ে, আমি আপনা হইতে ভিন্ন হই নাই। এখন আপনি সিংহাসনে চড়িলেন, আর আমার এমন দুর্ভাগ্য যে এই সময় আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! আমার কাছে দুইটি প্রতিজ্ঞা করুন যে আমি মনের সুখে মরিতে পারি।" বাদশাহ প্রাণের দিব্য দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বেগমের প্রার্থনা রাখিবেন। তখন বেগম বলিলেন, "আমার প্রথম প্রার্থনা এই যে আপনি আর বিবাহ করিবেন না। ভগবান আমাদের চারি পুত্র দিয়াছেন, তাহারাই যথেষ্ট। আবার নূতন বিবাহ করিলে সে স্ত্রীর সন্তানের সঙ্গে আমার ছেলেদের সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ হইবে। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে আমার জন্য এমন সমাধি-মন্দির রচনা করিবেন যে তাহা যেন পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হয়।" বাদশাহ কাঁদিতে কাঁদিতে সম্মত হইলেন। কিছু পরে এক কন্যা প্রসব করিয়া বেগম মারা গেলেন।

তখন বাদশাহ চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে বেগমের সমাধি নির্ম্মাণের জন্য কারিগরেরা নক্সা প্রস্তুত করিয়া দেখাক্। যে নক্সা পছন্দ হইল তাহার অনুসারে একটি ছোট নমুনা (model) তৈয়ারি করা হইল। সেইটা মঞ্জুর করিয়া ঠিক সেই ধরনে তাজমহল নির্ম্মাণ করা হইল। [মমতাজমহলের দম্পতি-জীবন ১৮ বৎসর ছিল। তাহার ১৪টি সন্তান হয়। শাহজাহানের সিংহাসন আরোহণের পর চতুর্থ বৎসরে, শেষ সন্তানটি প্রসব করার

পর সাম্রাজ্ঞী তাপ্তী নদীর তীরে বুর্হানপুর নগরে প্রাণত্যাগ করেন। শাহজাহান প্রথম বয়সে পিতা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন নাই, কিন্তু পিতার সেনাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অনেকদিন ধরিয়া তাঁহাকে পলাইয়া বেড়াইতে হইয়াছিল।]

***

(৭) আওরাংজীবের প্রজাপালন

বাদশাহ আওরাংজীব তখন পাঞ্জাবের হসন আব্দাল নামক শহরে বাস করিতেছিলেন। রাজবাড়ীর দেওয়ালের বাহিরে একজন গরীব বুড়োর দোকান ছিল। রাজ-বাগানের মধ্য দিয়া যে জল বাহির হইয়া নালায় পড়িত তাহাতে তাহার যাঁতা ঘুরিত এবং এইরূপে ময়দা পিষিয়া বেচিয়া সে কোনক্রমে খাওয়া পরা চলাইত। বাদশাহ আসায় নাজীরের চাকরেরা ঐ জল বাহির হওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিল; বুড়ো ময়দাওয়ালা অনাহারে মারা যায়-যায়। "মাসির-ই আলমগীরি" গ্রন্থের লেখক সাকী মুস্তাদ খাঁ খবর পাইয়া একজন উচ্চকর্ম্মচারী বখ্তাওর খাঁর দ্বারা বাদশাহকে জানাইলেন। আওরাংজীব হুকুম দিলেন যে বখ্তাওর খাঁ স্বয়ং গিয়া দেখুন যেন জলের মরী খুলিয়া দেওয়া হয় এবং চাকরদের কড়া করিয়া বলিয়া দেন যে বুড়োর ব্যবসায়ে বাধা না ঘটে। দেড় প্রহর রাত্রে দুই থালা খাদ্য ও পাঁচটা মোহর একজন কর্ম্মচারীর হাতে দিয়া বলিলেন "এগুলি বখ্তাওর খাঁর কাছে লইয়া যাও, সে তোমাকে ঐ বুড়োর বাড়ীর পথ দেখাইয়া দিবে। বুড়োকে আমার সেলাম দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার পক্ষ হইতে বলিও—'তুমি আমার প্রতিবাসী, অথচ আমার আগমনে তোমার কষ্ট হইয়াছে। আমাকে মাফ কর।'" কর্ম্মচারী বখ্তাওর খাঁর বাসায় পৌঁছিয়া অনেক খোঁজ লইবার পর একজন পেয়াদার নিকট জানিলেন যে আর একটি ছোট পাহাড়ের উপর বুড়োর কুঁড়ে ঘর আছে। দুপুর রাত্রে সেখানে পৌঁছিয়া, বুড়োকে জাগাইয়া, তাহার ক্ষমা লাভ করিয়া, তবে সকলে ফিরিল।

পরদিন বাদশাহ নাজীরকে হুকুম করিলেন যে বাদশাহী পালকী পাঠাইয়া বুড়োকে অন্দরমহলে আন। বুড়ো জীবনে কখন পালকীর নামও শুনে নাই, রূপার ডাঁটযুক্ত পাল্কী দেখা ত দূরে থাকুক। তাহাকে ঐ পালকীর ভিতর বসাইয়া আনা হইল। বাদশাহ তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, জানিলেন যে তাহার স্ত্রী, দুই কুমারী কন্যা ও নেংটা দুই পুত্র আছে। সরকার হইতে তাহাকে ত শ টাকা দেওয়া হইল, তা ছাড়া আর সকলে অনেক টাকা, গহনা ও কাপড় দিলেন। দুদিন রাজবাড়ীতে কাটাইয়া সে ঘরে ফিরিল। তখন তাহার গায়ে শাল, কিংখাবের পাজামা, সুন্দর কেনারাযুক্ত পেশওয়াজ জামা, এবং বাদলা কাজ করা টুপী পরা, কোঁচায় মোহর টাকা ও গহনা! অথচ মুখখানি শত শত লোলচর্ম্মে ঢাকা এবং চোক দুটি অন্ধপ্রায়! মুস্তাদ খাঁর তাম্বুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ত চিনিতেই পারেন না, পুছিলেন "কে হে তুমি?" বুড়ো বলিল, "আজ্ঞা, আমি সেই বুড়ো। আপনার এবং বখ্তাওর খাঁর অনুগ্রহে আমার এই সৌভাগ্য হইয়াছে!" খাঁ উত্তর করিলেন "ঈশ্বর তোমার ভাল করুন।"

৩ তিন দিন পরে বাদশাহ পালকী করিয়া বুড়ো ও তাহার কন্যাদের আনাইলেন এবং যৌতুক স্বরূপ হাজার টাকা দিলেন। বেগমেরাও অনেক গহনা পোষাক ও টাকা দিলেন। বুড়োর আর একটি যাঁতা বসাইয়া তাহার জন্য সরকারী বাগান হইতে জল দিবার হুকুম হইল, এবং তাহাকে সব টেক্‌শ হইতে মাফ করিয়া সনদ দেওয়া হইল। রাজবৈদ্যকে পাঠাইয়া বুড়োর চক্ষুর চিকিৎসা করা হইল। তাহার মেয়েদের বিবাহ হইয়া গেল, এবং উলঙ্গ ছেলেদের জরীর পোষাক পরান হইল। তাহার স্ত্রী এতদিন গ্রামের বুড়ী ডাকিনী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু বাদশাহের অনুগ্রহে যেন তাহারও চেহারা ফিরিল, লোলচর্ম্ম চলিয়া গেল, চক্ষে জ্যোতি আসিল, সে আবার সুন্দরী হইল!

***

(৮) আওরাংজীব ও বাঙ্গালী মুসলমান।

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর তীরে বহিগ্রামে বাদশাহ আওরাংজীব বসিয়া কাচারি করিতেছেন, এমন সময়

সালাবৎ খাঁ মীর তুজুক একজন লোককে উপস্থিত করিল। লোকটি বলিল, "আপনার শিষ্য হইবার জন্য আমি সুদূর বাঙ্গালা দেশ হইতে এখানে আসিয়াছি। আশা করি আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" বাদশাহ মুচকি হাসিয়া পকেটে হাত দিয়া প্রায় একশত টাকা ও সোনা রূপার টুকরা বাহির করিয়া ঐ লোকের নিকট পাঠাইয়া বলিলেন, "উহাকে বল যে আমার নিকট হইতে যে অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতেছে তাহা এই।" লোকটা টাকা লইয়া ফেলিয়া দিল এবং নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। হুকুম পাইয়া চাকরেরা তাহাকে জল হইতে টানিয়া তুলিল। তখন বাদশাহ একজন মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাঙ্গলা হইতে একজন লোক আমার শিষ্য হইবে এই পাগলা খেয়াল লইয়া এখানে আসিয়াছে। (হিন্দী কবিতা)

টুপী লেণ্ডী, বাউরী ডেণ্ডী, গহরে নিলজ।
চুহা খাদন মাউলী, তু কাল বান্ধে ছজ॥

উহাকে সরহিন্দ শহরের পণ্ডিত মিয়াঁ মহম্মদ নাফির নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার শিষ্য করিয়া দেও।"*

যদুনাথ সরকার।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

(De La Mazeliere-র নব প্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এসিয়িক সভ্যতা ও এসিয়িক-য়ুরোপীয় সভ্যতার সংগঠন। দরায়ুস ও সেকেন্দর শার অভিযান।—মধ্য-এসিয়ানিবাসী লোকদিগের আক্রমণ।—বৌদ্ধপ্রচারক।—হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ, অবনতি ও অন্তর্ধান।—শক ও হূনদিগের সহিত হিন্দুদিগের সংগ্রাম—হিন্দুসভ্যতার চূড়ান্ত উন্নতি।

পঞ্চাশ শতাব্দীকালের মধ্যে, আর্য্য ও আদিমনিবাসীদিগের মধ্যে মেশামিশি হইয়া যে একটি জাতি সংগঠিত হয়, তাহাকে হিন্দুজাতি বলা যাইতে পারে। এই জাতি কিরূপ সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করে, তাহার অনুসন্ধান করা এবং আরম্ভ হইতে আধুনিক যুগের অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির ক্রম অনুসরণ করা আবশ্যক।

প্রাচীন যুগের শেষ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এসিয়া রূপান্তরিত হয়। প্রথমে, পারস্যরাজ্যের পত্তন ও পতন, দরায়ুস কর্ত্তৃক পঞ্জাববিজয়, সেকন্দরশার অভিযান, সিরীয়া ও বাকত্রিয়া প্রদেশে গ্রিশীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। তাহার পর, অশোক-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সহিত ভারতীয় রাজাসমূহের সংযোগ, এবং Ts'in রাজবংশের পরে Han রাজবংশের শাসনাধীনে চীন-রাজ্যসমূহের সম্মিলন। ক্রমে চীনরাজ্য পামীর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে; পার্থীয়দিগের প্রভাব সত্ত্বেও, চীনরাজ্য রোমকদিগের সহিত বিবিধপ্রকারে সম্বন্ধ স্থাপন করে। আধুনিক যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে, পারস্য ও বৈজন্তীন রাজ্য হইতে সার্থবাহগণ পঞ্জাবে আগমন করে; দাক্ষিণাত্যের বন্দরসমূহে, রোমক, বৈজন্তীন, পারস্যিক ও চীনীয়দিগের জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হয়। এসিয়িক সাম্রাজ্যসমূহের সহিত মধ্য অধিত্যকাবাসী লোকদিগের গতিবিধি আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত, বিদেশযাত্রী হিন্দুরা ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ ও মালাই দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা যে সকল শিল্প সেখানে লইয়া যায়, আঙ্কোর ও বোরোবোদর আজিও তাহার সাক্ষী।

সেই সময় একটা এসিয়িক সভ্যতা, এমন কি, একটা এসিয়িক-য়ুরোপীয় সভ্যতা সংঘটিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। (১)

---

* আদি গ্রন্থ—প্রথম গল্পের, ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীর ৩৭০নং ফার্সী হস্তলিপি; দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পের, "বসাতীন-ই-সালাতীন" নামক হস্তলিপি; চতুর্থ ও পঞ্চম গল্পের, কাফি খাঁর "মুনতখাব-উল্-লবাব," ১ম বালুম, ২৬৩—২৬৮ এবং ২৮৭—২৯০ পৃঃ; ষষ্ঠ গল্পের, "দিউয়ান্-ই-আফ্রিদি" নামক হস্তলিপি; শেষ দুই গল্পের, "মাসির-ই-আলমগীরী" নামক ইতিহাসের ১৩৩—১৩৬ এবং ৩৩৩—৩৩৪ পৃষ্ঠা।

(১) খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত এসিয়ার ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

পারস্য।—অ্যাকেমেনিডিস্দিগের সাম্রাজ্য সংস্থাপন (৫৬০—৩৩০); সাইরস (৫৬০—২৯); জারেক্সিস্ (৪৮৫—৬৫); সেকেন্দার শার অভিযান (৩৩৪—৩৩৩)। সেলিউসিডিসদিগের সাম্রাজ্য-অন্তর্গত পারস্য (৩১২—২৫৬); পার্থীয়গণকর্ত্তৃক পারস্যবিজয়—আর্সাসাইডিস্দিগের সাম্রাজ্যাধীনে এই পার্থীয়গণ এক প্রকার সমবেত সামন্তরাজ্য সংস্থাপন করে (২৫৬ খৃ-পূ, ২২৬ খৃ-উ)। সাসানিডিসগণ (২২৬—৬৩৬) একটা কেন্দ্রীভূত জাতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে: দ্বিতীয় শাপুর (৩১০—৩৭৯); প্রথম খসরু (৫৩১—৭৯); প্রসিদ্ধ শিরীনের প্রণয়ী খসরু পার্ভিজ (৫৯০—৬২৮)। আরবদিগের কর্ত্তৃক পারস্য বিজয় (৬৩৬)।

চীন।—চাও বংশের শাসনাধীনে সামন্ত তন্ত্রের যুগ (১১২২—২৫৫)।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ,—সিংহল, যবদ্বীপ, হিন্দচীন, আফগানিস্থান, তিব্বত, মোগোলিয়া, চীন ও জাপান—এই সকল দেশকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করে; উহারা পারস্যদেশেও আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে।(১) পণ্ডিতদিগের শিল্পীদিগের, ও বণিকদিগের প্রযত্নে এবং বর্ব্বরজাতিদিগের আক্রমণের ফলে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রান্ত-এসিয়ার লোকদিগের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ গুণ সংক্রামিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতবাসীদিগের গুণসমূহ যথা:—সাহিত্যের প্রতি, শিল্পকলার প্রতি, দর্শনের প্রতি অনুরাগ, যোগতন্ত্র, দুঃখবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ, মৈত্রীবাদ। চীনবাসীদিগের গুণসমূহ যথা:—বাহ্যশিষ্টতা, শৃঙ্খলার ভাব, প্রতিষ্ঠিত রাজসরকারের প্রতি সম্মান। পারস্যবাসীদিগের গুণসমূহ, যথা:—যোদ্ধৃজন-সুলভ বীরধর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র স্থাপনের প্রতি অনুরাগ।

আর কতকগুলি গুণও এসিয়াবাসীমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। যথা:—অদৃষ্টবাদ,—এই অদৃষ্টবাদের সহিত অত্যাচারসহিষ্ণুতাও জড়িত; পিতৃশাসনতন্ত্র,—ইহা হইতে ঐতিহ্যের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন; এবং ইহা হইতেই য়ুরোপীয়-সুলভ উন্নতির বিপরীতে অবনতির ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। এই ঐতিহ্য হইতে, ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, সৌজন্য, ধৈর্য্য, এবং যথেচ্ছাচার-শাসনতন্ত্রে যে চাতুর্য্য আবশ্যক সেই চাতুর্য্য সম্ভূত হইয়াছে। প্রাচ্যদেশবাসীরা যে (deductive) অবরোহীপ্রণালীসিদ্ধ বিজ্ঞানের তেমন অনুশীলন করে না এবং (inductive) আরোহীপ্রণালীসিদ্ধ বিজ্ঞানকেও যার-পর নাই অবজ্ঞা করে, অদৃষ্টবাদ ও ঐতিহ্যের প্রতি অসীম ভক্তিই তাহার কারণ। উন্নতির ঐকান্তিক অভাব হইতে, পিতৃশাসনতন্ত্র হইতে, আয়াসের আতঙ্ক ও শান্তির জীবন সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকার জীবনে দুঃখই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়; তবে দুঃখ-দুরবস্থায় আত্মীয়স্বজনের সাহায্য প্রাচ্য দেশে অবশ্যপ্রাপ্তব্য বলিয়া, দুঃখ কখনই চরমসীমায় উপনীত হয় না। চরমসীমায় উপনীত হইলেও অদৃষ্টবাদ সেই দুঃখকে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য বলিয়া সহজভাবে গ্রহণ করে। অলস জীবন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রযুক্ত, কল্পনাবৃত্তি উদ্দাম ও অপ্রতিহতগতি হইয়া উঠে। এইরূপ কল্পনা অসম্ভব ও অদ্ভুত কার্য্যের বর্ণনা করিতে ভালবাসে। সমস্ত প্রাচ্য সভ্যতা একই প্রবণতার বশবর্ত্তী:—সে কি?—না ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি বিরাগ; এমন কি, বৌদ্ধধর্ম্মও পরিবার-শৃঙ্খল ও বর্ণভেদ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া আবার একটি ভিক্ষুশ্রেণী গড়িয়া তুলিল।

(Ts'in) সিনদিগের শাসনাধীনে (২৫৫—২০৬) এবং হানদিগের শাসনাধীনে (২০৬ খৃ পূ, ২২০ খৃ-অ) সাম্রাজ্য স্থাপন। সাম্রাজ্যের খণ্ডাংশিক বিভাগ, ঘরোয়া যুদ্ধ (২২০—৫৮১)। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বড় বড় রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা; সুই (৫৮১—৬১৮); তাং (৬১৮—৯০৭); সুং ৯৬০—১২৮০)। ১২০৬ হইতে ১৩৬৮ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে মোগলেরা চীন জয় করে।

বাকত্রিয়ানা।—পাঞ্জাব যাহাদের শাসনাধীনে ছিল, বাকত্রিয়া প্রদেশের সেই গ্রীক রাজবংশ কিয়ৎকালের জন্য গঙ্গানদী পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তার করে (খ পূ ১২৭)। রাজা মেনান্দরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত; তাঁহার নামেই "মিলিন্দপনহ" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হয়, এবং তিনি পাটনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। (১৫০ খৃ-পূ)।

সিথীয়গণ।—য়ুচিগণ (সংস্কৃত শক) খৃ পূ ১২৭ অব্দে বাকত্রিয়া ও গ্রীক-ভারত জয় করে। উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাজা কনিষ্ক উচ্চ পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে রাজত্ব করেন (৫৮ খৃ পূ ও ৪০ খৃ পূ—এই সময়ের মধ্যে। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করে; পক্ষান্তরে, আর এক শক জাতীয় রাজবংশ, যাহারা প্রথমে কনিষ্কের অধীন সামন্ত মাত্র ছিল (শা-গণ) তাহারা প্রায় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত গুজরাটে রাজত্ব করে। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, উজ্জয়িনীর হিন্দু রাজা বিক্রমাদিত্য, ষষ্ঠ শতাব্দীতে শকদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, কিন্তু এই কাহিনী তেমন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তখন শকেরা উত্তর ভারত ও রাজস্থানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথাপি একাদশ শতাব্দীর মুসলমান ঐতিহাসিক আল্‌বিরুণী বলেন,—মুলতান ও লোণি-কোটের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোরুর প্রদেশে বিক্রমাদিত্য একটা যুদ্ধে শকদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন। শকদিগের আক্রমণের পরে, ষষ্ঠ হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত, শ্বেত-হূনদিগের ও তুর্কদিগের আক্রমণ।

(২) উত্তর-খৃষ্ট ৬৪ অব্দে চীন, ৩৭২ অব্দে কোরিয়া, ৬২৩ অব্দে জাপান বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। বুদ্ধের চিহ্নাবশেষের মধ্যে, বুদ্ধব্যবহৃত পাত্রের ন্যায় বহুমূল্য দ্রব্য আর কিছুই ছিল না। ৪০৩ অব্দে, ফা-হিয়ান বলেন, ঐ পাত্র পেশোয়ারে ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সিয়াং বলেন, ঐ পাত্রটি পারস্যদেশে আছে। তাই মনে হয়, Graalএর কাহিনীর উৎপত্তিস্থান পারস্যদেশ। সেই জোহানাইট্ খৃষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কাহিনীটির উদ্ভব হয়। Aptesteএর মস্তক পারস্যদেশের মালভূমে ন্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত সম্প্রদায় পারস্যদেশকে ভক্তি করিত। কেবল Wolfram von Eschenbachএর কবিতায় Graal কাহিনীটি উক্ত খৃষ্ট সম্প্রদায়ের সংশ্রব হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। তথাপি Kundry Hero-diade এই বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উহাতে রক্ষিত হইয়াছে। অতএব এই "গ্রালের" কাহিনী ও পাত্রের কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতে পারে। মধ্য যুগের লেখক মাত্রই বলেন, অ-খৃষ্টান (Pagan) দেশেই এই "গ্রাল"-কাহিনীর উৎপত্তি।

এই সকল গুণই এসিয়িক সভ্যতার বিশেষত্ব। এখন এই সকল গুণকে পৃথক করিয়া দেখা আবশ্যক। একদিকে এমন কতকগুলি গুণ দৃষ্ট হয় যাহা মানব-পরিণতির কোন কোন বিশেষ-সময়ের লক্ষণ: ঐ সকল গুণ এখন এসিয়িক বলিয়া মনে হইতেছে; কেন না, এখন এসিয়িক সভ্যতার যে অবস্থা, সে অবস্থা হইতে য়ুরোপীয় সভ্যতা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এমন কতকগুলি গুণও দৃষ্ট হয় যাহা প্রাচ্যদেশীয় লোকের মানস-প্রকৃতির ঠিক উপযোগী। কিন্তু কোন প্রকার চিন্তা, কোন প্রকার ভাব,—কোন এক বিশেষ দেশনিবাসী লোকের, কোন এক বিশেষ জাতির নিজস্ব জিনিস হইতে পারে কি? কখনই না। কেন না, সকল মানব-সমাজেরই একই পরিণতি ক্রম। সেই পরিণতি-ক্রম সকল জাতিই অনুসরণ করে; তবে, কোন কোন জাতি অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে ও সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে, এইমাত্র প্রভেদ।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভেই এসিয়িক-য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সভ্যতা হইতে ভারতের অনেক লাভ হইয়াছিল। দরায়ুস ও সেকেন্দরশার অভিযান হইতে, সমস্ত ভারতবর্ষকে এক সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার কল্পনা ভারতবাসীদিগের মনে প্রথম উদিত হয়, এবং সেই সঙ্গে, রাষ্ট্রিক ও সামরিক কোন-কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলে এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে তাহাও তাহারা অবগত হয়। পারস্যবাসীদিগের নিকট উহারা, লিপিপদ্ধতি,—চালডীয়দিগের নিকট জ্যোতিষের, পাটীগণিতের, বীজগণিতের, জ্যামিতির ও চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলি প্রাপ্ত হয়।*

এই সকল বিদ্যায় ভারতবাসীরা গুরুকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তাছাড়া, মহাকাব্যের সংকলনে, গীতিকাব্য ও নাট্যকলার বিকাশেও গ্রীকদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শিল্পকলাসম্বন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা আরও বেশী ফলগর্ভ। ভারত, বাস্তুশিল্পরীতির জন্য আসিরীয়া ও পারস্যের নিকট, এবং মূর্ত্তি-কলার জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী। বণিকগণ ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ এই নূতন সভ্যতা হিন্দ চীনে, চীনে, জাপানে লইয়া যায়। ভারতের মধ্যবর্ত্তিতাসূত্রে, প্রাচ্য-এসিয়ার সমস্ত শিল্পকলা গ্রীকভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

এবং গ্রীক প্রভাব হইতেই, ভারতে মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে ভারতে, চীনে, জাপানে কোন মূর্ত্তি ছিল না। কেবল সেকন্দরশার অভিযানের পর হইতেই, উহারা স্বকীয় দেবতাদিগকে মানব আকৃতি প্রদান করে। সমস্ত প্রাচ্য এসিয়ার কৃতবিদ্য লোকেরা ক্রমাগত মূর্ত্তিপূজার প্রতিবাদ করিত; পক্ষান্তরে সাধারণ লোকেরা চিত্র ও মূর্ত্তির উপর অলৌকিক শক্তি আরোপ করিত। দেবভাবাপন্ন মানুষের আদর্শ যাহা গ্রীক আদর্শ, সে আদর্শ প্রাচ্যবাসীরা বুঝিতে পারে নাই।

তাহার পর, খৃষ্টধর্ম্ম এসিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যে সকল সার্থবাহ পারস্য ও মধ্য মালভূমি দিয়া যাত্রা করিত, এপিসিয়া হইতে এবং আরও পরে, বৈজন্তীন হইতে সমাগত খৃষ্টানেরা তাহাদের অনুসরণ করিত; এবং অন্যান্য খৃষ্টানেরাও সমুদ্রপথ দিয়া দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হইত। পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ শতাব্দীর অভিমুখে, নেষ্টোরীয় সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা মাদ্রাজে ও মালাবার উপকূলে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশে উহারা অনেকগুলি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করে। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধেরা দেব প্রসাদ-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মমতটি খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। বোধ হয় কতকগুলি নীতি-উপদেশের জন্যও উহারা খৃষ্টধর্ম্মের নিকট ঋণী। কিন্তু প্রাচ্য এসিয়ার অল্প লোকই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব কখনই সেখানে প্রভূত পরিমাণে প্রকটিত হয় নাই।

সভ্যতার মুখ্য সাধন ও সহায় মধ্য-এসিয়ার বর্ব্বরেরা। আধুনিক যুগের আরম্ভে উহারা এসিয়া ও য়ুরোপের সমস্ত রাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম শতাব্দীতে, য-চি বা শকজাতি, বাহ্লীক ও পঞ্জাব হইতে গ্রীকদিগকে বিদূরিত করিয়া, পেশোয়ারের কনিষ্কের অধীনে, একটা বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করে, (খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দ ও খৃষ্টোত্তর ৪০ অব্দ—ইহার মধ্যে)। তখন হইতেই, আফগানিস্থান,

* গ্রন্থকার এই বিষয়ে ভারত-প্রতিভা-বিদ্বেষী, Weberকেই অনুসরণ করিয়াছেন।—অনুবাদক।

কাশ্মীর ও ভারতের পশ্চিম-প্রদেশ শকগণকর্তৃক পরিশাসিত হইতেছিল। তুর্কিস্থানের বিপুল জনসংঘের সহিত এবং হূনদিগের স্থাপিত চীন রাজ্যসমূহের সহিত, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত শকদিগের সংস্রব ঘটায়, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইয়াছিল। আরও কিছুকাল পরে, তুর্ক বা শ্বেতকায় হূনেরা, পারস্য ও চীনের সহিত ভারতকে সম্মিলিত করে।

যে ধর্ম্মে, মতের তেমন বাঁধাবাঁধি ছিল না, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম, বিবিধ প্রভাব বশে, বিশেষত Mazdeism-এর প্রভাব বশে রূপান্তরিত হয়। এই আশ্চর্য্য বিকাশ লাভ করিয়া নব বৌদ্ধধর্ম্ম স্বকীয় প্রাচীন মতসমূহ হইতে এমন সকল মত বাহির করিল, যাহা বৌদ্ধধর্ম্মের বিপরীত বলিয়া মনে হয়। নাস্তিকতার পরিবর্ত্তে একটি বৌদ্ধ দেবমণ্ডলী, ভাবী বুদ্ধগণ, রূপকাত্মক দেবদেবী, স্বর্গ ও নরক এই সমস্ত স্থাপিত হইল। বিজন ধ্যান সমাধির পরিবর্ত্তে, বিবিধ ক্রিয়াকলাপ ও মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হইল। আত্মশক্তির দ্বারা মোক্ষসাধন—ইহার পরিবর্ত্তে, দেবপ্রসাদের মতবাদ গৃহীত হইল।

বুদ্ধ বলিলেন, "একটি বীণা গ্রহণ কর, এই বীণা হইতে মধুর স্বর-লহরী বিনির্গত হইবে; কিন্তু একজন অনিপুণ বাদকের হস্তে উহা হইতে অপ্রীতিকর ধ্বনিই বাহির হইবে। এই প্রকার মানুষেরাও। তোমাদের সকলেরই উত্তম অন্তঃকরণ, তোমাদের সকলেরই সম্যক্ দিব্যজ্ঞান আছে। কিন্তু আমার সাহায্য ব্যতীত তোমাদের অন্তঃকরণের অনুসন্ধান ব্যর্থ হইবে ... ।"

এই কথা শুনিয়া, শিষ্যদিগের সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইল, সত্যের সহিত উহারা সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হইল। উহাদের কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল; উহারা বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইল। উহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"হে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র মহিমান্বিত প্রভু—অসীম তোমার দয়া। আমি এখন বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি উপলব্ধি করিতেছি; বুদ্ধের রহস্যময় অন্তরাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া যে সত্তা বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করিয়া আছে আমি সেই মহাসত্তাকে উপলব্ধি করিতেছি।(৩)... "

যে সময়ে সমস্ত এসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, সেই একই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত হয়। বাস্তব-পক্ষে বৌদ্ধদিগের উপর রীতিমত কোন প্রকার উৎপীড়ন হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের রীতিনীতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ায় উহারা আপনারাই বিহার পরিত্যাগ করে; কারণ, ভক্তেরা সেখানে আসিয়া উহাদিগকে আর ভিক্ষা দিত না। চতুর্থ শতাব্দীতে, চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী

---

(৩) সুরঙ্গমসূত্র (চীনভাষায়—শাও লেং য়ন কিং) Rev. Beal-এর অনুবাদ:—(বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের তালিকা)।

রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্ম, যাহা এসিয়ায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা মহাযান নামে খ্যাত। একটি মধ্যম যানও ছিল, কিন্তু তাহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা কম। হীনযানের অনুবলে যে সকল বৌদ্ধপরিষদের অধিবেশন হয় তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান।—রাজগৃহের পরিষৎ; বুদ্ধদেবের মৃত্যুর বৎসরেই এই পরিষদের অধিবেশন হয় ([illegible])। বেশালীর পরিষৎ ([illegible]); এবং অশোকের অধীনে পাটলীপুত্রের পরিষৎ ([illegible])। যে পরিষদে মহাযান সংস্থাপিত হয়, তাহা কনিষ্কের অধীনে পেশোয়ারের পরিষৎ (খ্রীষ্টোত্তর ৮০)। যে পরিষদে এই মতবাদটি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে তাহার অধিবেশন, দ্বিতীয় শিলাদিত্যের অধীনে, কনৌজে হইয়াছিল ([illegible])।

যে সময়ে বৌদ্ধেরা হিন্দু দেবতাদিগের পূজা করিত; প্রজ্ঞা-পারমিতার ন্যায় রূপকাত্মক দেবতাদিগের পূজা করিত; বোধিসত্ত্ব বা ভাবী বুদ্ধদিগের পূজা করিত; মনুষ্যদিগকে মোক্ষতত্ত্বের শিক্ষা না দিয়া যাহারা নির্ব্বাণ লাভ করে সেই প্রত্যেক বুদ্ধদিগের পূজা করিত, মানব বুদ্ধদিগের পূজা করিত; ধ্যানী বুদ্ধদিগের পূজা করিত। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এই ত্রিমূর্ত্তি লোকপ্রিয়—পশ্চিম-স্বর্গের স্রষ্টা অমিতাভ; ঐতিহাসিক বুদ্ধ শাক্য-মুনি; করুণার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর। আর-এক ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে দেখা যায়; ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়, যিনি পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিবেন। অবলোকিতেশ্বরের কার্য্যপরিসর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত (চীনভাষায়—কোয়ান্ ইন্; জাপানীভাষায়—কোয়ানন্); উহাদের প্রার্থনা-মন্ত্র এইরূপ—

"করুণাময় প্রভু তুমিই ধন্য।

"আমি যদি ছুরিকাময় পর্ব্বতের উপর নিক্ষিপ্ত হই, ঐ সকল ছুরিকা আমাকে আঘাত করিতে পারিবে না।"

"আমি যদি নরকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হই, নরকের প্রাচীর আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না।"

"আমি যদি বুভুক্ষু ভূতপ্রেতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হই, উহাদের মাংসহীন হস্ত আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

"যদি আমি দৈত্য দানবের হস্তে পতিত হই, উহাদের তীক্ষ্ণ নখর আমাকে আঘাত করিতে পারিবে না।"

"যদি কোন পশুর আকারে জন্মগ্রহণ করি, তথাপি আমি স্বর্গে গমন করিব।"

এই সকল প্রার্থনা-বাক্য অজন্তার গুহা-মন্দিরে ক্ষোদিত রহিয়াছে। অন্যান্য চীন-গ্রন্থকার বলেন, উত্তরের বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সমাজপতি ছিল। তন্মধ্যে একাদশ সমাজপতি "বুদ্ধচরিতের" গ্রন্থকার অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন ও দেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই তিন জন এবং যোগাচার্য্য বসুবন্ধু (চতুর্থ শতাব্দী) ইঁহারা কনিষ্কের সমসাময়িক।

মহাযান-শাস্ত্রের সংস্কৃতগ্রন্থ আছে।

ফাহিয়ান সমস্ত বৃহৎ নগরে তখনও বিহার দেখিয়াছিলেন; অনেক রাজা ঐ সকল বিহারের আনুকূল্য করিতেন, কিন্তু তখন জনসাধারণের উপর ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। হিউয়েন-সিয়াং-এর বিবরণ সপ্তম শতাব্দীর; তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ অবনতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীর অভিমুখে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয়।(৪)

*

বস্তুত, অবনতিগ্রস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিযোগিতায়, একটা হিন্দু সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা আধুনিক যুগের চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর অভিমুখে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়। বৈদেশিক প্রভাব যেমন একদিকে এই সভ্যতাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি আবার, বৈদেশিকের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া উহার মধ্যে একটা আত্মচেতনার আবির্ভাব হয়। প্রথম ভারত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইবার পর, যে অরাজকতা উপস্থিত হয়, সেই সুযোগে শকেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে,—এমন কি, গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যেও আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীতে, একটি স্বদেশীয় রাজবংশ,—কনৌজের গুপ্তেরা, শকদিগের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে, শ্বেত-হুনেরা গুপ্তদের সাম্রাজ্য বিনষ্ট করে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই বিক্রমাদিত্য আবার উহাদের গতিরোধ করেন। উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য ভারত-ইতিহাসের একজন সর্ব্বজনপ্রিয় অধিনায়ক; অনেক বিজয়-কাহিনী ইঁহার উপর আরোপিত হইয়া থাকে; ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিরা ইঁহারই আশ্রয়ে বাস করিত। সপ্তম শতাব্দীতে কনৌজের অধিপতি দ্বিতীয় শিলাদিত্য সমস্ত উত্তর-ভারত বশীভূত করেন, এবং সমস্ত স্বাধীন নৃপতিকে তাঁহার চক্রবর্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। এই দুই রাজার রাজত্বকালে ভারত সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করে। তৎকালীন সভ্যতার এই দুই প্রধান লক্ষণ বলা যাইতে পারে: এক, নিরঙ্কুশ কল্পনা; আর এক, শ্রেণীবন্ধনের প্রবণতা। এই সভ্যতা-প্রসূত প্রধান প্রধান কার্য্যের মধ্যে, ঐ দুই লক্ষণের অনুশীলন করিলে সুবিধা হইবে। ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৪) যে একমাত্র উৎপীড়নের কথা হিউএন-সাং প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা উল্লেখ করেন সে কাশ্মীরের হুনরাজ মিহিরকুল কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের প্রতি উৎপীড়ন। তিনি উত্তরের বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বয়োবিশেষ্ঠি সমাজপতি সিংহকে নিহত করেন।

বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন

আমাদের শাস্ত্রে "ক্ষিত্যপতেজোমরুৎব্যোম" বলিয়া যে পঞ্চভূতের উল্লেখ আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাদের চারিটি—মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুকে ভূত অর্থাৎ মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইঁহাদের বিশ্বাস ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের এই প্রাণীউদ্ভিদ, নদীসমুদ্র, শিলা-কঙ্কর সকলই সেই চারিটি মূল পদার্থে গঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণ যখন বহু যুগের অসম্বদ্ধ ভাব, চিন্তা ও অদ্ভুত কাহিনীর আবর্জ্জনা হইতে রাসায়নিক তত্ত্বের সারোদ্ধার করিয়া, তাহাকে মূর্ত্তিমান করিতে চেষ্টা করিতে-ছিলেন, তখনো ইঁহারা সেই চাতুর্ভৌতিক সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নতির যুগ বলা যাইতে পারে। বসন্তের দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শ যেমন সমস্ত প্রকৃতিকে সজীব করিয়া তোলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ঊষালোকের স্পর্শ তেমনি সমগ্র সভ্যদেশকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ প্রভৃতি সকলেই দীর্ঘকালের জড়তা ত্যাগ করিয়া সত্যকে বুঝিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রসায়নবিদগণও প্রাচীন পুঁথির পাতা উলটাইয়া মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি কি কারণে মূল পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেক্ষণাগারেও দেশবিদেশের মহাপণ্ডিতগণ পরীক্ষা সুরু করিয়া দিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে স্থির হইয়া গেল, জলবায়ু বা অগ্নিমৃত্তিকার মধ্যে কোনটিই মূল পদার্থ নয়; অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি কয়েকটি বায়ব পদার্থ এবং গন্ধক, তাম, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পারদ প্রভৃতি কয়েকটি তরল ও কঠিন পদার্থ সৃষ্টির মূল উপাদান। ইহার পর অণু-পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া কি প্রকারে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।

প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। অধিক দিন নয়, দশ বারো বৎসর পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকগণ সেই অণুপরমাণুরই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন এবং উহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির মূল রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি এক বৃহৎ সমস্যা উপস্থিত হইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের সেই সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া দিয়াছে।

পদার্থকে সচরাচর কঠিন, তরল এবং বায়ব, এই তিন অবস্থাতেই আমরা দেখিয়া থাকি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ক্রুকস্ (Crooks) সাহেব পদার্থের এক চতুর্থ অবস্থার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। প্রায় বায়ুশূন্য কাচের নলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার জুড়িয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে থাকিলে, শূন্য নলের ভিতর বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করে। এই প্রকার পরীক্ষায় ক্রুকস্ সাহেব একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম জড়কণাকে বিদ্যুৎ বহন করিতে দেখিয়াছিলেন। কণিকাগুলিতে কঠিন, তরল বা বায়ব, কোন পদার্থেরই লক্ষণ দেখা যায় নাই। কাজেই আবিষ্কর্ত্তা উহাদিগকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের অন্যতম নেতা সার উইলিয়ম্ লজ্ (Lodge) এই অদ্ভুত কণাগুলি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে জানা গিয়াছিল, তাহারা আকারে ও গুরুত্বে লঘুতম পরমাণু অপেক্ষাও সহস্রগুণে ক্ষুদ্র। লজ্ সাহেব বুঝিয়াছিলেন, হয় ত এই জিনিসটাই সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের মূল উপাদান, কিন্তু তখন বিষয়টির বিশেষ আলোচনা হয় নাই। কাজেই ক্রুকস সাহেবের সেই চতুর্থ অবস্থার কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

প্রায় কুড়ি বৎসর হইল সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ষ্টোনি সাহেব (Johnstone Stoney) দেখিয়াছিলেন, অনেক যৌগিক পদার্থে ব্যাটারির দুই প্রান্ত ডুবাইয়া রাখিলে পদার্থটি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং বিশ্লিষ্ট অংশগুলি Ions তারের প্রান্তে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ বহন করিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। ইনি মাপিয়া ঐ বিদ্যুতের পরিমাণকে ইলেক্ট্রন (Electron) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহার পর ক্রুক্স্ সাহেবের সেই পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বিদ্যুৎপূর্ণ কণিকার উপর বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। হিসাবে দেখা গেল এগুলিরও বিদ্যুতের পরিমাণ ষ্টোনি সাহেবের ইলেক্ট্রনের সহিত অবিকল এক। সকলে ক্রুকসের সেই সূক্ষ্ম কণিকাগুলিকেও ইলেক্ট্রন নামে আখ্যাত করিতে লাগিলেন, এবং চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগণ জড়কণিকা ও ইলেক্ট্রনের একতা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ পর্য্যন্ত স্বর্ণরৌপ্য হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন প্রভৃতিকে যে, মূল পদার্থ বলা হইতেছে, তাহা ভুল। ইলেক্ট্রনের আবিষ্কার প্রচলিত রাসায়নিক সিদ্ধান্তকে খুবই বিচলিত করিয়া দিয়াছিল।

এই প্রকার একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারকে সম্মুখে রাখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন নাই। নূতন গবেষণার শতদ্বার মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী প্রভৃতি সকল দেশেরই বড় বড় বৈজ্ঞানিক মনে করিতে লাগিলেন, সত্তর বা আশীটি মূল পদার্থ নাই; বোধ হয় এক মূল পদার্থে সমগ্র বিশ্বের রচনা হইয়াছে এবং তাহা সেই ইলেক্ট্রন।

ক্রুকস্ সাহেবও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন না, সকল মূল পদার্থের গোড়ায় একটামাত্র মূল পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকা সম্ভব বলিয়া ইঁহার মনে হইয়াছিল। এই কাল্পনিক জিনিসটাকে "Protyle" নামে আখ্যাত করিয়া, ইনি তাঁহার নির্জ্জন বেক্ষণাগারে বসিয়া বিশ্ব রচনার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ইঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহারি আবিষ্কৃত সেই অতি সূক্ষ্ম কণাগুলি যেন কোন এক অজ্ঞাত শক্তিতে একত্র হইয়া হাইড্রোজেনের পরমাণুর রচনা করিতেছে। তাহাদেরই সহিত আবার কতকগুলি নূতন কণিকা অল্পাধিক পরিমাণে মিলিয়া গন্ধক, আর্সেনিক ও লৌহ তাম্রাদির সৃষ্টি করিতেছে, এবং সমবেত কণিকার সমষ্টি অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইলে ইউরেনিয়ম প্রভৃতি গুরু ধাতুর সৃষ্টি চলিতেছে। স্বপ্নের শেষে দেখিতে পাইলেন, সেই বিদ্যুদ্বাহক কণিকা লঘুগুরু পদার্থের জন্ম দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না, গুরু ধাতু হইতে তাহারা গোলা-গুলির মত ছুটিয়া বাহির হইয়া লঘুতর পৃথক পদার্থে পরিণত হইতেছে।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক ক্রুকসের পূর্ব্বোক্ত চিন্তা সত্যই স্বপ্নের ন্যায় ছিল। বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবে কিন্তু তাহাই সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইলেক্ট্রন জিনিসটা যে কি, তাহা আজও নিঃসংশয়ে স্থির হয় নাই। কেহ সেগুলিকে বিদ্যুৎপূর্ণ জড়কণা বলিয়া প্রচার করিতেছেন, কেহ উহাদিগকে খাঁটি বিদ্যুৎ বা মূর্ত্তিমান শক্তি বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু জিনিসটা যে সৃষ্টির মূল উপাদান সে বিষয়ে প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়া আসিয়াছেন।

সংগঠনতত্ত্ব জানা না থাকিলেও, ইলেক্ট্রনের আকার প্রকার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলি আয়তনে এত ক্ষুদ্র যে, প্রায় হাজারটিতে মিলিয়া জোট না বাঁধিলে, তাহাদের সমবেত আয়তন বা গুরুত্ব হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান হয় না এবং যখন ছুটিয়া চলে তখন উহাদের বেগের পরিমাণ আলোকের বেগের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হইয়া দাঁড়ায়।

রসায়নবিদ্‌গণ যখন এই অদ্ভুত জিনিসের সন্ধান পাইয়া তাহার রহস্য আবিষ্কারের জন্য অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন রেডিয়ম নামক এক অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কার গবেষণার এক নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। নূতন ধাতুর আণবিক গুরুত্ব স্থির হইয়া গেল, বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) উহা কোন কোন বর্ণ-রেখার পাত করে তাহা দেখা গেল, এবং কোন্ কোন পদার্থের মিলনে তাহার কতগুলি যৌগিক উৎপন্ন হয় তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু রতিপ্রমাণ রেডিয়ম হইতে অবিরাম যে তাপরশ্মি ও ইলেকট্রন নির্গত হয় তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। মূল পদার্থের পরিবর্ত্তন নাই ও বিয়োগও নাই বলিয়া যে বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকগণ শত বৎসর ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা পাইয়া গেল। তা ছাড়া আলোক ও বিদ্যুতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে, তাহারো ভিত্তি যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর সেই বিদ্যুন্ময় ইলেকট্রন প্রবাহ ও রেডিয়ম লইয়া এ পর্য্যন্ত নানা দেশে নানা গবেষণা হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে প্রচলিত রাসায়নিক সিদ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকদিগের অবিশ্বাসের মাত্রা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। রেডিয়ম একটা ধাতুর মূল পদার্থ, সুতরাং প্রচলিত সিদ্ধান্তানুসারে ইহার রূপান্তর না হইবারই কথা। কিন্তু ইহারই দেহ হইতে যেসকল ইলেকট্রন অবিরাম নির্গত হয়, তাহা যখন জোট বাঁধিয়া হেলিয়ম (Helium) নামক আর একটি ধাতুর উৎপত্তি করে তখন রেডিয়মকে পরিবর্ত্তনশীল মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। কেবল রেডিয়মেই এই সৃষ্টিছাড়া ধর্ম্ম দেখিলে নিশ্চিন্ত থাকা যাইত, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমেই অনেক মূল পদার্থে এইপ্রকার ভাঙা গড়ার সন্ধান পাইতেছেন, কাজেই ব্যাপারটিকে হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া যাইতেছে না।

ক্রুকস্ সাহেব তাঁহার স্বপ্নের এই আংশিক সফলতা দেখিয়াই নিরস্ত হন নাই। ইনি পূর্ব্বোক্ত ইউরেনিয়ম্ নামক গুরু ধাতুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, ইহা খনির যেস্থানে থাকে, তাহার চারিদিকে রেডিয়ম্‌ও পাওয়া যায়। প্রথমে ইহাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যেখানে ইউরেনিয়ম্ আছে, তাহারি চারিদিকে রেডিয়ম্ জমিয়া রহিয়াছে। সুতরাং ইউরেনিয়ম্ ইলেক্ট্রন্ ত্যাগ করিয়া

ক্ষয় পাইলেই যে, লঘুতর ধাতু রেডিয়মের উৎপত্তি হয়, ইহাতে আর অবিশ্বাস করা চলিতেছে না। বংশের পরিচয় দিতে গেলে, বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম তালিকাশীর্ষে স্থান পায়। তার পরে পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্রের নাম যথাক্রমে বংশতালিকায় লেখা হইয়া থাকে। ক্রুকস্ সাহেব ও অপর বৈজ্ঞানিকগণ ইউরেনিয়মের এক বংশতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। জিনিসটা পরিজ্ঞাত ধাতু ও অধাতু পদার্থের মধ্যে গুরুত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই ইহাকে প্রতিষ্ঠাতার আসন দিতে হইয়াছে। তারপরে ইহারি দেহচ্যুত ইলেকট্রন দ্বারা কোন কোন পদার্থের উৎপত্তি হইল দেখিয়া, তাহাদিগকে তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। এইপ্রকারে এক ইউরেনিয়মেরই পুত্রপৌত্রাদির নাম সহ এক প্রকাণ্ড বংশতালিকা পাওয়া গিয়াছে। সন্তানদিগের মধ্যে কে কোন খনিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি আকারে আছে, আজও তাহার সন্ধান হয় নাই, তথাপি উহার বংশধরের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের সকলেই ডাল্টনের সিদ্ধান্তে মূল পদার্থ অর্থাৎ খাঁটি কুলীন, কিন্তু এখন ইহারা সকলেই ভাঙিয়া চুরিয়া নিজেদের কুলগৌরব হারাইতেছে।

বিদ্যালয়ে অধ্যাপক মহাশয় সত্তর আশীটি মূল-পদার্থের নাম মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা দিতেন, তাহাদের পরিবর্ত্তন নাই এবং ক্ষয়ও নাই। এখন দেখিতেছি সেই দু'টিই ঊনবিংশ শতাব্দীর মূল পদার্থের প্রধান ধর্ম্ম। জীবরাজ্যে সকল জীবের আয়ুষ্কাল সমান নয়। যাহারা দুই চারি ঘণ্টায় জীবনের লীলা শেষ করে এপ্রকার অনেক প্রাণী উদ্ভিদের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। আবার যাহারা দুই চারিশত বৎসর বা হাজার বৎসর বাঁচিয়া আছে, এপ্রকার জীবের সহিতও আমাদের পরিচয় রহিয়াছে। এপর্য্যন্ত যেসকল বস্তুকে মূল পদার্থ বলা হইতেছিল, তাহাদেরও জীবনের ঐপ্রকার এক একটা সীমা আবিষ্কার হইয়া পড়িতেছে। ইউরেনিয়ম্ প্রায় ত্রিশ কোটি বৎসর জীবিত থাকে এবং রেডিয়ম্ কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যেই বিকার প্রাপ্ত হইয়া পদার্থান্তরে পরিণত হয়। অর্থাৎ কয়েক রতি ইউরেনিয়ম ধাতুকে কোন পাত্রে রাখিয়া যদি ত্রিশ কোটি বৎসর প্রতীক্ষা করা হয় তবে ঐ দীর্ঘকালের শেষে পাত্রে আর ইউরেনিয়মের সন্ধান পাওয়া যাইবে না; উহার দেহনির্গত তেজ অর্থাৎ ইলেকট্রন্ হইতে যেসকল অপর পদার্থের উৎপত্তি হইবে, তাহারাই পাত্রটিকে পূর্ণ করিয়া রাখিবে। সীসকের (Lead) গুরুত্ব স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতুর তুলনায় অনেক কম, সুতরাং কালক্রমে ক্ষয় দ্বারা সীসকের স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত হওয়া বিচিত্র নয়। কোন ভবিষ্যদ্দর্শী ব্যক্তি তাঁহার লোহার বাক্সে সীসা বোঝাই করিয়া যদি স্বর্ণ প্রাপ্তির আশায় প্রতীক্ষা করেন, তবে অবৈজ্ঞানিকদিগের নিকট লাঞ্ছিত হইলেও, বৈজ্ঞানিক সমাজে এখন তাঁহার সমাদর লাভের সম্ভাবনা আছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পদার্থতত্ত্ববিদগণ বলিতেছেন, এই যে নদীসমুদ্র প্রাণীউদ্ভিদময় জগৎ দেখিতেছ, ইহা মূলে কিছুই নয়। জড় বলিয়া কোন জিনিসই বিশ্বে নাই। জড়ের সূক্ষ্মতম কণা অর্থাৎ পরমাণুকে ভাঙিয়া হাজারটি বা ততোধিক সূক্ষ্মতর অংশে ভাগ কর, দেখিবে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলি সেই ইলেকট্রনের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। আবার ইলেকট্রনগুলি খাঁটি বিদ্যুতের কণিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই বলিতে হইতেছে, এই ব্রহ্মাণ্ড এক বিদ্যুতেরই রূপান্তর। অর্থাৎ জগতে জড় নাই, এক শক্তিকে লইয়াই বিশ্ব।

ক্রুকস্ সাহেব গত শতাব্দীর শেষে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছে। পদার্থতত্ত্ববিদগণ এখন স্বপ্নে জড়ের যে শক্তিময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন, তাহা সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষে এইসকল স্বপ্নের স্থানে কোন্ স্বপ্ন আসিয়া বিশ্বের কোন্ মূর্ত্তি সম্মুখে ধরিবে, তাহা কেবল বিশ্বনাথই জানেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ম্যাডাম্ কুরী।

প্রাচীন ভারতের অনেক প্রতিভাশালিনী মহিলার কথা আমরা জানি, তাঁহাদের অনেকেই শাস্ত্রকার ছিলেন এরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বিদুষী নারীর গৌরব আমাদের খুব আছে। পাশ্চাত্য জগতের অনেক প্রতিভাসম্পন্না মহিলার কথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

নারীর প্রতিভার দৃষ্টান্ত বড় অধিক পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে পোল্যাণ্ড্ দেশীয়া একটি বিদুষী মহিলার কথা শিক্ষিত সমাজের সকলেরই মুখে শুনা যাইতেছে, তাঁহার নাম, ম্যাডাম্ কুরী। ইঁহার ন্যায় নিরভিমানিনী প্রখর বুদ্ধিমতী, অসামান্য প্রতিভাশালিনী রমণী-বৈজ্ঞানিকের কথা ইতিহাসেও পাওয়া যায় না; বর্ত্তমানকালে ইঁহার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারেন এমন কেহ নাই। রসায়ন শাস্ত্রের বহু আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিকজগৎ ইঁহার নিকট ঋণী; রেডিয়াম্ নামক অত্যাশ্চর্য্য পদার্থটির আবিষ্কার ইঁহারই দ্বারা হইয়াছে। ইঁহার কতকগুলি আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু তবু, তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া, প্যারিসের বৈজ্ঞানিক-দিগের সমিতি তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করে নাই। সেই সমিতির বর্ত্তমান কোনো সভ্যই আবিষ্কার-কার্য্যে ম্যাডাম কুরীর সমকক্ষ নহেন। অথচ তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইল না। এ ঘটনাটি কয়েকমাস পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলিতে এখনো কেহই সমিতির এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন নাই।

চিকাগোর পপুলার ইলেক্‌ট্রিসিটি নামক পত্রিকায় লরা ক্রোজিয়ার্জ, ম্যাডাম কুরী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংগ্রহ করা গেল।

ম্যাডাম্ কুরীর পিতা ওয়ার্সো য়ুনিবার্সিটির একজন রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। যোগ্যতার হিসাবে তিনি মাহিনা পাইতেন অতি অল্পই। তাহার কারণ এই যে তিনি রুশিয়ার অধিকৃত পোলণ্ডের অধিবাসী ছিলেন; পরাধীন জাতি বলিয়া পোলাণ্ডবাসীদিগকে তখন নানা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। কুরী শৈশবেই মাতৃহারা হন। যখন অন্যান্য বালিকারা পুতুল লইয়া খেলা করিয়া থাকে তিনি সেই বয়সে, সহকারীর বেতনের টাকা বাচাইবার জন্য পিতার পরীক্ষাগারে কাজ করিতেন।

ইহার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার কুমারী অবস্থার নাম মারি স্ক্লাডোস্কা (Marie Skladoska)। কুমারী স্ক্লাডোস্কা দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করেন এবং যাহাতে

ম্যাডাম কুরী।

সে কার্য্যের যোগ্য হইতে পারেন সেজন্য দেশ পর্য্যটনে ইচ্ছুক হন। একটি রুশীয় পরিবার তখন দক্ষিণ য়ুরোপ পর্য্যটন করিতেছিলেন; তিনি তাহাদের পরিবারে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এবং যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহার অধিকাংশ তিনি ভাল করিয়া রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষার খরচ বহন করিবার জন্য বাচাইয়া রাখিতেন। পিতার পরীক্ষাগারে যতটুকু শিখিবার বন্দোবস্ত ছিল তাহা তিনি সমস্ত আয়ত্ত করিয়াছিলেন এখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল।

দুই বৎসর পরে তিনি প্যারিসের লাটিন্ কোয়ার্টারে একটি বাড়িতে থাকিয়া মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। আহারে পর্য্যন্ত মহা কষ্ট স্বীকার করিয়াও য়ুনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করিবার খরচ জোগাইবার শক্তি তাঁহার ছিলনা। আহার হৌক আর নাই হৌক পুস্তক ক্রয় করিতেই হইবে, সেই জন্য তিনি আহারে পর্য্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শিক্ষার প্রতি এই

প্রবল আন্তরিক অনুরাগ বেশিদিন চাপা থাকিবার নহে। তাঁহার শিক্ষক ইহা লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলির মৌলিকতা দেখিয়া ও রসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ দখলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন পরীক্ষাগারে সহকারীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহারা কিছুকাল একত্র কাজ করিয়া পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ-সম্পন্ন হন। অবশেষে নবীন অধ্যাপক কুরী এই প্রতিভাশালিনী মহিলাকে তাঁহার পত্নী হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

তিনি এই প্রস্তাবে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহারো বিশেষত্ব আছে। একথা শুনিয়াই তিনি ওয়ার্সোতে প্রস্থান করেন। স্ত্রীসুলভ লজ্জাশীলতার নিকট তাঁহার বৈজ্ঞানিকের তেজ হার মানিয়াছিল। দেশকে একবারে ত্যাগ করিতে হইবে এই চিন্তায় মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার অনুরাগ নূতন ভাবে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাতে পোল্যাণ্ড দেশীয়া বালিকার রূপ কিংবা আকর্ষণী শক্তি, কিছুই ছিল না, পরীক্ষাগারের বাষ্পের মধ্যে কালযাপন করিয়া তাঁহার গাত্রবর্ণ পাণ্ডুর এবং মস্তকের কেশ শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সেই শাদাসিধা পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে যে হৃদয়টি স্পন্দিত হইত তাহা জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেমে পরিপূর্ণ।

কাজেই তিনি অধ্যাপক কুরীকে লিখিলেন, বহুদিন হইতে তিনি মনস্থ করিয়াছেন যে স্বদেশ ও বিজ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন; তাঁহার এই ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় এই পত্রের উত্তরে তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা উল্লেখ ও মিলিত জীবনে তাঁহারা যে কাজ করিতে পারিবেন তাহার এরূপ একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কন করিয়া জানাইয়া ছিলেন যে শেষে কুমারী স্ক্লাডোস্কার বিবাহে মত হইল এবং তাহার দুই সপ্তাহ পরেই তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

অনেক প্রকৃত শক্তিসম্পন্ন দম্পতি এইরূপ ভাবে মিলিত-ভাবে কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন কিন্তু অতি অল্পকেই কুরী-দম্পতির ন্যায় ত্যাগশীল হইতে দেখা গিয়াছে। ইহারা প্রথমে প্যারিস হইতে নয় মাইল দূরে সিয়োঁ নামক স্থানে একটি কুটীর গ্রহণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু যাতায়াতে অত্যন্ত সময় নষ্ট হইত বলিয়া পরে প্যারিসের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান বিদ্যালয় ও পরীক্ষাগারের নিকটে কু-দ্য-লা গ্লাসিয়ার নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহাদের কার্য্যের খুব সুবিধা হইয়াছিল। তখন ম্যাডাম কুরীর শক্তিমত্তার পরিচয় বহুজনবিদিত হওয়ায় তিনি পরীক্ষাগারে কাজ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনো নারী এ অধিকার পান নাই।

দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তাঁহারা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাজ করার পর একদিন ম্যাডাম কুরী তাঁহার স্বামীকে একটি নূতন পদার্থ দেখাইলেন। এই পদার্থটি তিনি বোহেমিয়ার কোনো একটি খনি হইতে প্রাপ্ত পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক পদার্থ হইতে পাইয়াছিলেন। ইহা বহুমূল্য। ইহা সংগ্রহ করিতে যাহা ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে ম্যাডাম কুরীর সামান্য পুঁজি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা এতই বিস্ময়োৎপাদক যে অধ্যাপক কুরী পত্নীকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার আপন পরীক্ষাসকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাই রেডিয়াম। তাঁহারা কোনো প্রকারে এক গ্রাম পরিমাণ রেডিয়াম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়, শীতল না হইয়া এবং আয়তনে না কমিয়াও উত্তাপ প্রদান করে। এপ্রিল মাসে তাঁহারা এই আবিষ্কারের কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের নিজের দেশ ভিন্ন অন্যান্য নানা দেশ হইতে সম্মান লাভ করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ইংলণ্ডের রয়াল ইনষ্টিটিউট তাঁহাদিগকে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে তাঁহারা স্বর্গীয় লর্ড কেল্‌ভিনের উৎসাহে নানা সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। রয়াল সোসাইটি ম্যাডাম্ কুরীকে ডেবি স্বর্ণপদক উপহার দেন এবং সুইডেন হইতে তাঁহারা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ফ্রান্স অধ্যাপক কুরীকে সম্মানিত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় এ সম্মান তাঁহার কার্য্যের জন্য নহে বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহা অনুমান করা

অসঙ্গত নহে যে অধ্যাপক কুরীর আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহার পত্নীর কৃতিত্বও স্বীকৃত হয় নাই বলিয়াই তিনি ফ্রান্সের সম্মান গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। ম্যাডাম্ কুরী তাঁহার স্বামীর অনুমতি লইয়া ওসিরিস্ পুরস্কারের ১২,০০০ ডলার (প্রায় ৩৬,০০০ টাকা) গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হইয়াছিল।

ইহার পর প্যারিস্ য়ুনিবার্সিটির সোরবনে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহারা আহূত হইয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দেশ হইতে শিক্ষিত ছাত্রেরা শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য আসিয়া থাকে।

সময়ের অভাব জ্ঞাপন করিয়া কুরী দম্পতি রাজ-সন্নিধানে বক্তৃতা করিতে আপত্তি করিতেন, কিন্তু যখন পারস্যের শাহ্ প্যারিসে আসেন তখন তাঁহার সমক্ষে রেডিয়াম্ প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

রেডিয়ম্ খণ্ডটি একটি কাচ পাত্রের ভিতরে ছিল। ঘর খানি অন্ধকার করা হইলে ইহা আলোক প্রদান করিতে আরম্ভ করে; তাহা দেখিয়া শাহ্ এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে তিনি অতিব্যস্ততায় টেবিল্‌টি উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। রেডিয়ম্ খণ্ডটি নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া কুরী দম্পতি বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বহু পরিশ্রমের পর ঐটুকু লাভ করিয়াছিলেন, আর, ঐ এক গ্রাম্ রেডিয়ামের মূল্যও ৩০,০০০ ডলারের (প্রায় ৯০,০০০ টাকা) অধিক। এই কার্য্যে শাহ্ দুঃখিত হইয়া আপন হস্ত হইতে অঙ্গুরীগুলি খুলিয়া উহার মূল্য স্বরূপ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

কিন্তু রেডিয়াম্ খণ্ডটি শেষে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। তার পর বক্তৃতা আবার চলিয়াছিল। এই অত্যাশ্চর্য্য পদার্থটি দেখিয়া শাহ্ এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি ম্যাডাম্ কুরীর পরিচ্ছদে আপন বহুমূল্য আভরণ সকল সংলগ্ন করিয়া দিবার জন্য জেদ করিয়াছিলেন। ইহাতে ম্যাডাম কুরী বড়ই বিব্রত হইয়াছিলেন, কারণ আভরণে তাঁহার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। যাহাতে শান্তিতে আপন কার্য্য করিতে পারেন সে জন্য তিনি তাঁহাদের গৃহের গোপন ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, কিন্তু সাময়িক পত্রের সংবাদদাতারা তাঁহার পরীক্ষাগার পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের দ্বিতীয়া কন্যা ইভ্ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কন্যা লাভের আনন্দ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ তাঁহার জন্মের কয়েক সপ্তাহ পরেই অধ্যাপক কুরী রাজপথ অতিক্রম করিবার সময় গাড়ী চাপা পড়েন এবং অবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুকালে অধ্যাপক কুরীর বয়স পঞ্চাশ বৎসরও হয় নাই। তিনি হয়তো আরো অনেক আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে ফ্রান্স একজন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক হারাইয়াছে; তিনি ফ্রান্সকে কত গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন! ম্যাডাম্ কুরীর ক্ষতি অবশ্য সকলের চেয়ে অধিক। কিন্তু তাঁহার সাহস আছে, তাই তিনি স্বামীর মৃত্যুর পরেও পরীক্ষাগারের কার্য্য ত্যাগ করেন নাই। এর পর তিনি পলোনিয়ম্ নামক মৌলিক পদার্থটি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ইহার গুণ রেডিয়ামের গুণ অপেক্ষা আরো বিস্ময়জনক। ইহা সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। ম্যাডাম্ কুরীর নিকট যেটুকু আছে তাহা ৫ টন (১৪০ মণ) পিচ্ ব্লেণ্ড হইতে পাওয়া গিয়াছে।

দৃঢ়তার সহিত সঙ্কোচ দমন করিয়া তিনি সোরবনে তাঁহার স্বামীর পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন। অল্প লোকেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিবে এরূপ মনে করিয়া তিনি কলেজের বৃহৎ হল্ ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র ঘরে আশ্রয় লয়েন, তাহাতে ত্রিশজনের অধিক শ্রোতার স্থান সঙ্কুলন হয় না। কিন্তু তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে প্যারিসের বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রলোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। পর্টুগালের রাজা ও রাণীও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালে রেডিয়ামের অসদ্ভাবে ম্যাডাম্ কুরীর পরীক্ষায় অত্যন্ত বাধা হইতেছে। চিকিৎসাতেও ইহার ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় ইহার মূল্য বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এখনই রেডিয়াম নানা কার্য্যে যেরূপ ব্যবহার হইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয়, এর পর রেডিয়াম্ পাওয়া ভার হইবে।

ম্যাডাম্ কুরীর মন পরীক্ষাগারেই থাকে বটে কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণটি পড়িয়া থাকে, সেই তাঁর দ্রাক্ষালতা-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীর খানিতে যেখানে তিনি তাঁহার পিতা ও কন্যা দুইটিকে লইয়া বাস করেন।

তাঁহার যে হস্ত পরীক্ষাগারে অসীম সাহসে সূর্য্যের উপাদান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, গৃহে সেই হস্ত জোড় করিয়া তিনি বালিকা দুটির নিকট সুদূর পোল্যাণ্ডের বীরকাহিনী বলিয়া থাকেন। কন্যা দুটির বাহুবেষ্টনের মধ্যে তিনি তাঁহার আর একটি দিনের কর্ম্মের জন্য সাহস ও শক্তি লাভ করেন।

ম্যাডাম্ কুরীর কথা শেষ হইল। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক-দিগের সমিতি তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা যায় না। ম্যাডাম্ কুরীর প্রতি এই লজ্জাকর ব্যবহার করিয়া সমিতি কেবল তাঁহার প্রতি নহে, সমগ্র নারীসমাজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। যে সমিতিতে বর্ত্তমান কালে তাঁহার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ, সেই সমিতিরই কিনা এতদূর স্পর্দ্ধা হইল যে কেবল মাত্র তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া ম্যাডাম্ কুরীকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিল না! ম্যাডাম্ কুরী ফ্রান্সের গৌরবস্থল, কিন্তু এত বড় একটা সমিতি একথা বুঝিল না! ইংলণ্ড এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান দান করিয়াছে, কেবল তাঁহার ঘরের লোকেরা তাঁহার গুণের মর্য্যাদা রাখিল না! ইহাতে তাঁহার কিছুই আসিয়া যায় না,—কর্ম্মে যে সাফল্য লাভ করিতেছেন তাহাই তাঁহার পুরস্কার। কিন্তু সমিতির এই কুকীর্ত্তির জন্য লোকচক্ষে সমগ্র ফ্রান্স লজ্জা পাইতেছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব-গৌরব

১

আমরা—অমুক রাজার নাতি!
শোন নি তোমরা আমাদেরি দ্বারে
বাঁধা ছিল জোড়া হাতী?
আমরা—অমুক রাজার নাতি!

২

আমাদেরি পুরে সোনার আধারে
জ্বলিত লক্ষ বাতি;
হ'ত—মণির আভায়, রূপের প্রভায়,
দিনের সমান রাতি!—
আমরা—অমুক রাজার নাতি!

৩

আমাদের ঘাটে রূপের বাজার
শোভিত বিমল ভাতি;
কমলের বনে খেলিত মরাল,
ডাহুক তাহার সাথী!
আমরা—অমুক রাজার নাতি!

৪

বহিত মলয়, কানন-কুসুমে
ভ্রমর বেড়াত মাতি!
মন্দিরে নিজ শান্তি-ছায়ায়
সুখে ছিল সব জাতি!
আমরা—অমুক রাজার নাতি!

৫

এখন যদিও উদরের দায়ে
ধরি পরশিরে ছাতি;
হাসিয়া রুষিয়া যা দেয় ফেলিয়া
তাই লই মাথা পাতি!
(তবু) আমরা—অমুক রাজার নাতি!

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

পালিভাষা*

পালিভাষার নাম পা লি হইল কেন? এই প্রশ্ন সাধারণতই পাঠকের চিত্তে উদিত হইতে পারে। এই জন্য তৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পালিভাষার নাম পালি হইল কেন?

* পালিপ্রকাশ-নামক পালিব্যাকরণের ভূমিকার একদেশ।

সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও পা লি শব্দের মূল অর্থ পঙ্‌ক্তি,

পালি-শব্দের মূল অর্থ পঙ্‌ক্তি

বীথি, বা শ্রেণী প্রভৃতি।[১] বৌদ্ধ সাহিত্যে পূর্ব্বাচার্য্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন অক্ষর-পঙ্‌ক্তি বা বচনপঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতে, বা বুঝাইতে হইলে সাধারণত পঙ্‌ক্তিবাচী অপর শব্দ প্রয়োগ না করিয়া পা লি শব্দই প্রয়োগ করিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এখনো দেখা যায় যে, লেখক ও পাঠকগণ কোন মূল গ্রন্থ উদ্ধৃত করিতে হইলে "তথাচ সূত্রপঙ্‌ক্তিঃ" ইত্যাদিরূপে পঙ্‌ক্তি-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।[২]

কখনো কখনো আবার মূলগ্রন্থ বুঝাইতে কেবল পঙ্‌ক্তি

মূলগ্রন্থ বুঝাইতে পঙ্‌ক্তিশব্দের প্রয়োগ

শব্দও প্রযুক্ত হয়; ইহা সংস্কৃতের অধ্যাপক ও ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রসি । বৌদ্ধ সাহিত্যেও এইরূপ পা লি শব্দটি শাস্ত্রের অক্ষরপঙ্‌ক্তি, অথবা মূলমাত্রকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

"থেরিয়াচরিয়া সব্বে পা লিং বিয় তমগ্গহুং"—স্থবির

শাস্ত্রপঙ্‌ক্তি বা মূলশাস্ত্র বুঝাইতে পালি-শব্দের প্রয়োগ

আচার্য্যগণ সকলেই তাহা (বুদ্ধঘোষ-কৃত অর্থকথাকে) পা লি র (অর্থাৎ শাস্ত্রের পঙ্‌ক্তি বা মূলের) ন্যায় গ্রহণ করিলেন।[৩] "পিটকত্তয় পা লি ঞ্চ তস্‌স অট্‌ঠকথঞ্চ তং"—পিটকত্রয়ের পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) ও তাহার সেই অর্থকথাকে।[৪] "পা লি-মত্তং ইধানীতং নত্থি অট্‌ঠকথা ইধ" - কেবল পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) এখানে আনীত হইয়াছে, অর্থকথা (ভাষ্য) আনীত হয় নাই।[৫] "পা লি-মাহাভিধম্মস্‌স"—তিনি অভিধর্ম্মের পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) বলিলেন।[৬] "নেব পা লি য়ং ন অট্‌ঠকথায়ং দিস্‌সতি"— পা লি তে ও (পঙ্‌ক্তি বা মূলেও) দেখা যায় না, অর্থকথাতেও দেখা যায় না।[৭] "যো পন অত্থমেব সম্পাদেতি ন পা লিং"—, আর যে ব্যক্তি কেবল অর্থই অধিকার করেন, পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) আয়ত্ত করেন না।[৮] "এবং পা লি য়ং বুত্তনয়েন"- এইরূপ পা লি তে (পঙ্‌ক্তি বা মূলে) উক্ত প্রকারে।[৯] "ইমিস্‌সা পন পা লি য়া এবমত্থো বেদিতব্বো"—আর এই পা লি র (পঙ্‌ক্তি বা মূলের) অর্থ এইরূপ জানিতে হইবে।[১০] "ইতি-আদিসু অয়ং পা লি"—ইত্যাদি বিষয়ে পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) এই।[১১] "সেসং যথা পা লিং এব নিয্যাতি"—অবশিষ্ট (তাৎপর্য্যার্থ) পা লি তে ই (পঙ্‌ক্তি বা মূলেই) প্রকাশিত আছে।[১২] "জম্বুদীপে পন আবুসো পা লি মত্তং যেব অত্থি, অট্‌ঠকথা পন নত্থি"—জম্বুদ্বীপে কেবল পা লি (পঙ্‌ক্তি বা মূল) আছে, অর্থকথা (ভাষ্য বা ব্যাখ্যা) নাই।[১৩]

উল্লিখিত উদাহরণসমূহ হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে

ত্রিপিটক ও তৎ-সম্বদ্ধ অন্যান্য গ্রন্থ বুঝাইতে পা লি শব্দের প্রয়োগ

প্রদর্শিত ভাবে পা লি শব্দ প্রথমত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শাস্ত্রের পঙ্‌ক্তি বা মূলশাস্ত্র ত্রিপিটককে বুঝাইত। তাহার পর কালক্রমে ধীরে ধীরে ত্রিপিটকের সহিত সম্বদ্ধ অর্থ-কথা, এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাদের সহিত সম্বদ্ধ যে-কোন গ্রন্থই পা লি শব্দে অভিহিত হইবার সুযোগ

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত

প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন মূল সংহিতা ও তৎসম্বদ্ধ ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ বলিয়া গৃহীত, অথবা যেমন প্রাচীন মনু-প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তৎসম্বদ্ধ আধুনিক গ্রন্থকারের গ্রন্থ, উভয়ই স্মৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধ সাহিত্যে সেইরূপ প্রথমে ত্রিপিটক, তাহার পর অর্থকথা, এবং তদনন্তর তৎসম্বদ্ধ

ত্রিপিটকাদির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলে কোন গ্রন্থ পূর্ব্বে পা লি বলিয়া গণ্য হইত না

অপর গ্রন্থসমূহও পা লি নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু যে সকল গ্রন্থের সহিত পা লি র (ত্রিপিটকাদির) কোনো বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না তৎসমুদয় পূর্ব্বে

১। "পন্তি বীথ্যাবলিস্‌সেনি পা লি রেখা তু রাজি চ"—অভিধান-প্রদীপিকা, ৫৩৯।

২। "ওমন্ত ইতি আস্তার প ঙ্‌ক্তিঃ প্রণবোপসনে বিনিযুজ্যতে—তৈ, আ, ভট্টভাস্কর, ৬, ৩১, ১; "কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্র প ঙ্‌ক্তি রূপাঙ্কতা দৃশ্যতে"—কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্র, উপোদ্ঘাত, p. ix.

৩। ম, ব, ২৫৭ পৃ,। ৪। ঐ ২০৭ পৃ,।

৫। ঐ ২৫১ পৃ,। ৬। ঐ ২৫১ পৃ,।

৭। সুমঙ্গলবিলাসিনী। ৮। ধ, প, ৪১৯।

৯। ক, ব, ১১৯ পৃ,। ১০। বি, ম, ১৫ পৃ,।

১১। বি, ম, ১৫ পৃ,। ১২। ক, ব, অ, ১৫৮, ১৫৯ ইত্যাদি।

১৩। সা. ব. ৩১ পৃ.।

পা লি নামে গৃহীত হয় নাই, কেবল গ্রন্থ বলিয়াই তাহারা পরিচিত হইত।[১৪]

মূল শাস্ত্রের নাম পালি বলিয়া তাহার ভাষার নাম পা লি ভা ষা, অথবা পা লি

মূল শাস্ত্র পা লি বলিয়া যে ভাষায় ঐ মূল বা পা লি লিখিত ছিল, তাহা পা লি র ভা ষা; এবং সেই জন্যই ঐ ভাষা পা লি ভা ষা বলিয়া পরবর্ত্তী কালে অভিহিত হইয়াছে।[১৫] আবার কালক্রমে এই পা লি ভা ষা সংক্ষেপে কেবল মাত্র পা লি শব্দেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পালিতে রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই নাম পালি হইবার কারণ

যখন এইরূপে পা লি ভা ষা, অথবা কেবল পা লি বলিয়া একটি ভাষা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন ত্রিপিটক ও অর্থকথাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও ঐ ভাষায় রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই পা লি নাম গ্রহণে কোনো আপত্তি থাকিল না।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বলিতে হইবে যে, পা লি ভা ষা র আদিম অর্থ পা লি র অর্থাৎ বৌদ্ধ-ধর্ম্মীয় মূলশাস্ত্রের ভা ষা।

পালি শব্দের ব্যুৎপত্তি বা মূল

কোন একখানি পালিব্যাকরণে পা লি শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে:—"সদ্দথং পা লে তী তি পা লি" —যাহা শব্দার্থকে পা ল ন (রক্ষা) করে, তাহার নাম পা লি।[১৬] ইহা যে কোন বৈয়াকরণিকের শব্দবিদ্যার প্রভাবে কল্পিত অর্থ, তাহা না বলিলেও চলে।

পালি শব্দের মূল সম্বন্ধে দুইটি মতের উল্লেখ

আমার মনে হইতেছে, কোন স্থানে পড়িয়াছিলাম, এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন যে, প ল্লী র ভাষা পা লি ভা ষা, প ল্লী হইতে পা লি হইয়াছে। তাহাদের এ সম্বন্ধে যুক্তি এই যে, পা লি যখন প্রাকৃতের মধ্যে গণনীয়, এবং প্রাকৃত যখন সাধারণ গ্রাম্য লোকের, পল্লী বা পাড়াগাঁয়ে লোকের ভাষা, তখন ঐ ভাষার নাম পল্লীগ্রাম বা পাড়াগাঁর নামে প্রসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়।

আবার কেহ বলেন মগধে বিপুলভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল; অতএব পাটলিপুত্রের ভাষাতেই যে ঐ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। সেই পাটলিপুত্রের তদানীন্তন ভাষার নামই পা লি ভা ষা, এবং পা ট লি শব্দের অপভ্রংশই পা লি।

মতদ্বয়ের আলোচনা

এই উভয় মতই আমার নিকটে যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। দ্বিতীয় মতে, যিনি বলিতে চান যে, পাটলিপুত্রের ভাষা পা লি, এবং পা ট লি শব্দ হইতে অপভ্রংশ পা লি হইয়াছে, তাঁহার একটা কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, পাটলিপুত্রের ভাষা সেই সময় পালি ছিল। কিন্তু পাটলিপুত্রের পা ট লি হইতে পা লি হইয়াছে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না।

পাটলিপুত্রের পা-ট লি হইতে পালির নাম পা লি হয় নাই

প্রাকৃতের বিচিত্র পরিবর্ত্তনচক্রে পা ট লি শব্দ কোন প্রকারে পা লি আকার ধারণ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র শব্দ সাধন করিলেই এ মতটি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে।

জনপদের নামে ভাষার নাম হয়, নগর বা ব্যক্তিবিশেষের নামে নহে

মগধের পাটলিপুত্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে মগধের ভাষা পাটলিপুত্রের নামে প্রসিদ্ধ হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। জনপদের নামেই কথ্য ভাষাসমূহ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে; কোনো নগরবিশেষের নামে বা ব্যক্তিবিশেষের নামে নহে। পাটলিপুত্র চিরদিনই একটি নগর ছিল, জনপদ নহে।

পালিভাষার পা লি পাড়া-বাচী প ল্লী হইতে হয় নাই

যিনি বলেন প ল্লী অর্থাৎ পাড়া বা পাড়াগাঁর ভাষা পা লি ভাষা এবং প ল্লী হইতে পা লি হইয়াছে, তাঁহার কথারও একদেশ মাত্র আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি, ও স্বীকার করি। প ল্লী হইতেই পা লি হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পল্লীর অর্থ পাড়া নহে।

পল্লী-শব্দের পাড়া-অর্থ আধুনিক

পল্লী-শব্দের পাড়া-অর্থ নিতান্ত আধুনিক, পরে ইহা বিবৃত হইবে। বিশেষত পাড়া-শব্দে

১৪। "এতে (মহাবংশ প্রভৃতি) পা লি মু ত্ত ক ব সে ন বুত্ততা গ ন্ধা ত্ত রা তি বুচ্চতি"—সা. ব ৩৮ পৃ.।

১৫। "ইচ্চেবং পা লি ভা সা য় পরিয়ত্তিং পরিবত্তিত্তা"—সা. ব. ৩১ পৃ.।

১৬। From a MS. in India Office quoted by Childers in his Dictionary of the Pali Language, p. 322, B.

কোনো ভাষার নাম হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। গ্রামের ও নগরের ভাষাপ্রভৃতি বহু বিষয়ে ভেদ আছে সত্য, এবং ঐ ভেদ বুঝাইবার জন্য গ্রা ম্য এবং না গ রি ক শব্দ আছে। যদি আমাদের প্রথমমতবাদী মনে করেন যে, প্রাকৃত ভাষা নাগরিকগণের ছিল না, গ্রাম্যগণেরই ছিল, তাহা হইলে প্রাকৃতবিশেষ পা লি কে গ্রা মে র নামেই উল্লেখ করিয়া গ্রা ম্য ভা ষা বলাই সঙ্গততর ছিল। আবার পল্লী ও গ্রাম-শব্দ একার্থক নহে। গ্রামেরই বিশেষ বিশেষ অংশকে আমরা পল্লী বলিয়া থাকি। তবে কি মনে করিতে হইবে পালিভাষা কেবল পল্লীতে অর্থাৎ পাড়ায় কথিত হইত, সম্পূর্ণ গ্রামখানিতেও কথিত হইত না। এই সমস্ত অর্থকল্পনা নিতান্তই উৎকট বলিয়া মনে হয়। পালি যে পাড়াগাঁর ন্যায় নগরেরও ভাষা ছিল তাহাও দ্রষ্টব্য।

পাড়া-বাচা শব্দে কোন ভাষার নাম অস্বাভাবিক

কেহ কেহ আবার বলিতে চাহেন যে, মগধের প্রাচীন নাম প লা স হইতে পা লি হইয়াছে; কেহ বলেন প লি (tower) হইতে হইয়াছে; কেহ বলেন Palestine বা Palatine hills হইতে, আবার কেহ বলেন যে, Pehlve হইতে হইয়াছে (Vidyabhusona's Pali Grammar, p. xxxii)। ইঁহারা সকলেই কেবল শব্দসাদৃশ্য মাত্র ধরিয়া কোনরূপ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, উপযুক্ত প্রমাণপ্রয়োগ কেহই দিতে পারেন নাই; এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের ঐ সকল কথায় কোনরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না।

পালি-শব্দের অন্যান্য নির্বচন

আমরা সংস্কৃতে (অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে, প্রাচীন সংস্কৃতে নহে) প ল্লী ও পা লি শব্দ দেখিতে পাই, যথা (দশকুমারচরিত-প্রভৃতিতে) শবরপল্লী, ভিল্লপল্লী, ইত্যাদি। কিন্তু মূলত এই উভয় শব্দই খাঁটি সংস্কৃত নহে, ইহারা আদত প্রাকৃত; সংস্কৃত ইহাদিগকে নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে।[১৭] বৈয়াকরণসিংহের শব্দনির্ব্বচনশক্তির প্রভাবে অনেক ইংরাজী প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহা ভিন্ন কথা।

সংস্কৃতে দৃশ্যমান পল্লী ও পালি শব্দ সংস্কৃত নহে, তাহা প্রাকৃত

সংস্কৃত মূল প ঙ্‌ ক্তি শব্দ হইতেই প ল্লী বা প ল্লি,[১৮] এবং তাহা হইতেই পা লি হইয়াছে। কিরূপে প ঙ্‌ ক্তি শব্দ পা লি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সপ্রমাণ ক্রমপরিবর্ত্তন দেখাইবার পূর্ব্বে আমরা প ঙ্‌ ক্তি হইতে প্রাকৃতে উৎপন্ন শব্দসমূহের কিঞ্চিৎ অর্থ আলোচনা করিব। বাঙ্‌লায় শ্রেণী অর্থে পা তি শব্দ প্রসিদ্ধ আছে, যথা মুক্তাপাতি, দশনপাতি ইত্যাদি। সংস্কৃত প ঙ্‌ ক্তি হইতে প্রাকৃত প ন্তি অথবা পং তি হয়, এবং তাহা হইতে বাঙ্‌লায় পা তি হইয়াছে। অতএব মুক্তাপাতি-অর্থ মুক্তাপঙ্‌ক্তি, এইরূপ দশনপাতি-অর্থে দশনপঙ্‌ক্তি। আবার কোন হিন্দু কোন পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট পা তি গ্রহণ করে। এই পা তি প্রাকৃত বা পালির প ন্তি এবং সংস্কৃতের পঙ্‌ক্তি। ইহার অর্থ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মূল শাস্ত্রের ব্যবস্থাবিষয়ক বচনপঙ্‌ক্তি। পালিসাহিত্যে পা লি শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয় পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, এখানে পা তি শব্দও সেইরূপ ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃত পঙ্‌ক্তি শব্দজাত প্রাকৃত শব্দাবলীর অর্থ-আলোচনা

আমরা বাঙ্‌লায় বলি দ ন্ত পা টি, ইহার অর্থ দন্তশ্রেণী। এই পা টি শব্দ সংস্কৃত প ঙ্‌ ক্তি হইতেই আসিয়াছে। প্রাকৃত বা পালিতে পঙ্‌ক্তি হইতে উৎপন্ন প ন্তি শব্দের যেরূপ প্রয়োগ আছে, প্রাকৃতে সেইরূপ তজ্জাত প ত্তি শব্দেরও প্রয়োগের অভাব নাই।[১৯] প ত্তি হইতে প ট্টি হইয়াছে, এবং বাঙ্‌লাতে ইহার প্রয়োগও অল্প নহে; যথা, আমরা কোন নগরাদির অংশবিশেষকে বলি কাঁ সা রি প ট্টি (অথবা প ট্টা), শাঁ খা রি প ট্টি, ইত্যাদি। কাঁ সা রি প ট্টি, ইহার অর্থ যে স্থানে কাঁসারিদের প ঙ্‌ ক্তি অর্থাৎ শ্রেণী আছে; এইরূপ শাঁ খা রি প ঙ্‌ ক্তি, যে স্থানে শাঁখারিশ্রেণী আছে। প ট্টি হইতেই বাঙ্‌লায় পা টি হইয়াছে। আবার এই প ট্টি ই কোমলভাবে প টি উচ্চারিত হয়।[২০]

১৭। রাশি-রাশি প্রাকৃত শব্দ যে সংস্কৃতের মধ্যে অলক্ষিতভাবে ঢুকিয়া গিয়াছে, তাহা "সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব" প্রবন্ধে এই পত্রিকাতেই সবিস্তর দেখান হইয়াছে।

১৮। প্রাকৃতে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে ইকার ও উকার স্থানে যথাক্রমে ঈকার ও ঊকার হয়।

১৯। "ধেনুপত্তী," বিদগ্ধমাধব, ১৮ পৃঃ, ১৩ পং; ১ অ, ২৬ শ্লোক।

২০। আমরা স্থানে প ট্টি (মালদহে বলে), বা প ট্টি বাধি, এই দুই শব্দ প ট্ট বা প ট শব্দ হইতে জাত।

প্রাকৃত ও পালিতে ত=ট, এবং ট=ল স্থবহুস্থানে হইয়া থাকে। সেই নিয়মানুসারে প ট্টি হইতে প ল্লি ও তাহা হইতে পা লি শব্দ হইয়াছে। ইহা মনে করিবার বিরুদ্ধে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

কর্পূরমঞ্জরীতে (১০ পৃ.) এক স্থানে পা লি শব্দ আছে, এবং তাহার টীকায় ঐ শব্দের সংস্কৃত প ঙ্ক্তি লিখিত হইয়াছে। যদিও এই অনুবাদ ঐ স্থলে সঙ্গততর বোধ হয় না, তথাপি অনুবাদকের মতে প ঙ্ক্তি হইতেই যে পা লি হইতে পারে, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি।

প্রাকৃতের কোন সংস্কৃতটীকাকার পা লি শব্দের অনুবাদ প ঙ্ক্তি করিয়াছেন

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মূলশাস্ত্র বুঝাইতে সংস্কৃতে পূর্ব্বকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত পঙ্ক্তি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ও পালি অভিধানসমূহে পা লি শব্দের মূল অর্থ পঙ্ক্তি হয় জানা যায়। পালিসাহিত্যে পা লি শব্দ সংস্কৃতের প ঙ্ক্তি শব্দের ন্যায় মূল শাস্ত্রকেই বুঝাইতে প্রথমে প্রযুক্ত হইত। প ঙ্ক্তি হইতে জাত পাঁ তি শব্দ এখনো বঙ্গদেশে মূলশাস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভাষার পরিবর্ত্তন নিয়মানুসারে প ঙ্ক্তি হইতে পা লি পদ হইবার কোন বাধা দেখা যায় না, কোনো কষ্টকল্পনা করিতে হয় না। কোনো টীকাকার বলিতেছেন যে, পঙ্ক্তি হইতে পা লি হইয়াছে। অতএব এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া পা লি র মূল অনুসন্ধানের জন্য প ঙ্ক্তি শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন শব্দের নিকট আমরা যাইতে পারি না।

পঙ্ক্তি শব্দ হইতেই যে পা লি হইয়াছে, তাহার স্থাপন

প ঙ্ক্তি শব্দ কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পা লি হইয়াছে, তাহাই আমরা অতঃপর সপ্রমাণ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমরা পালি বা প্রকৃতের মধ্যে প ঙ্ক্তি শব্দ জাত প ন্তি ও প ত্তি উভয় শব্দই পাই। এই উভয় শব্দ হইতেই পালি পদ হইতে পারে; এবং তাহাদের পরিবর্ত্তনক্রম এইরূপ অসঙ্গত মনে হয় না:—

পঙ্ক্তি শব্দের ক্রমপরিবর্ত্তন ও পালিশব্দের উৎপত্তি

প ঙ্ক্তি অথবা পং ক্তি=প ন্তি অথবা পং তি (১০§ ৫১; ৩০§৩৮, টীকা)*=প ন্টি অথবা পং টি (ত=ট, ১০§৮৫০ ক)=পংলি (ট=ল, ১০§৮৩, ক)=প ল্লি (২০§১৩) =পা লি (১১ পৃ, টীকা)। অথবা প ঙ্ক্তি=(ঙকারলোপে) প ত্তি (১০§৫১)=প ট্টি (১০§৮৫, ক) =প ল্লি (১০§৮৩, ক)=পা লি (১১ পৃ, টীকা)।

* সংখ্যাগুলি পালিপ্রকাশের তত্তৎস্থানসূচক।

পা লি শব্দের উচ্চারণ-ভেদ

উচ্চারণভেদে পা লি শব্দ সিংহলে পা লি. (পা ল়ি) উচ্চারিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পালি-শব্দ বৌদ্ধসাহিত্যে শাস্ত্রের পঙ্ক্তি বা মূল বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত; কিন্তু ইহা কতদিন হইতে ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহা এখন আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। পূর্ব্বে যেসকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই বুদ্ধঘোষ (৫ম শতাব্দী) ও তৎপরবর্ত্তী লেখকের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। Childers মনে করেন সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর পর হইতে ঐ ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

পা লি শব্দ মূল শাস্ত্র অর্থে কতদিন হইতে ব্যবহৃত হইতেছে

ঐ অর্থে পালি শব্দ প্রযুক্ত হইল কেন

পা লি শব্দ কি জন্য ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা অল্পক্ষণ পরেই ত ন্তি শব্দের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিব।

ত্রি পি ট ক নাম ধারণের পূর্ব্বে[২১] বুদ্ধবচনসমূহের সাধারণ নাম ছিল ধ ম্ম ও বি ন য়।[২২] পরবর্ত্তী কালে যাহা বিনয়পিটক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই তখন বি ন য় বলিয়া প্রচলিত ছিল; ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ ধ ম্ম নামে অভিহিত হইত।[২৩]

বুদ্ধবচন পূর্ব্বে ধ ম্ম ও বি ন য় নামে অভিহিত হইত

পালিভাষার অপর একটি নাম ত ন্তি, বা ত ন্তি-ভা ষা। ত ন্তি (সংস্কৃত ত ন্ত্রি অথবা ত ন্ত্রী) শব্দ প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বোক্তরূপে ঠিক পা লি শব্দের ন্যায় মূলশাস্ত্র বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত। সংস্কৃত ত ন্ত্র ও ত ন্ত্রী উভয় শব্দই

পালি ভাষার একটি নাম ত ন্তি, বা ত ন্তি ভাষা।

২১। এতৎসম্বন্ধে পরে সবিশেষ উক্ত হইবে।

২২। "যো বো আনন্দ, ময়া ধ ম্মো চ বি ন য়ো চ দেসিতো"—ম, নি, সু, ৬, ১, (D. XVI. 6. 1); "কথ নু খো ময়ং ধ ম্ম ঞ্চ বি ন য় ঞ্চ সঙ্গায়েয্যাম"—সু. বি. ৫. ৮. ১৩ পৃ. ইত্যাদি।

২৩। "সব্বমেব চেদং ধ ম্মো চেব বি ন য়ো চেতি সংখং গচ্ছতি। তত্থ বি ন য় পি ট কং বি ন য়ো, অ ব সে সং বু দ্ধ ব চ নং ধ ম্মো"—সু, বি, ১৬পৃ.; দ্রঃ—চু. ব. ১১, ১. ১, ৭; ৮।

তন্ত্র, তন্ত্রী ও সূত্র

রজ্জু বা সূত্র বুঝায়। ব্যাসাদিপ্রণীত ব্রহ্মপ্রভৃতিবিষয়ক বাক্যাবলী সূত্র নামে সংস্কৃতসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ; যথা, ব্রহ্মসূত্র, ন্যায়সূত্র, ইত্যাদি। আবার ঐ পৃথক্-পৃথক্ সূত্রসমূহ যে গ্রন্থে একত্র গ্রথিত হয়, তাহাও সূত্র নামেই পরিগণিত; যে গ্রন্থে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্রসমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মসূত্র নামে খ্যাত। এইরূপই বুদ্ধদেবের স্বল্পাক্ষর অসন্দিগ্ধ সারবৎ বিশ্বতোমুখ গ্রন্থিহীন অনবদ্য বাক্যসমূহ[২৪] প্রথমে তন্তি ও সূত্র এই উভয় নামেই কথিত হইত। আমার মনে হয় প্রথমে তন্তি শব্দই প্রচলিত হয়, এবং তাহার পর ব্রাহ্মণগণের তত্তদ্ গ্রন্থের ন্যায় সূত্র শব্দেরই

সূত্র ও সুত্রান্ত

বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই জন্যই ত্রিপিটকের অনেক অংশ এখনো সূত্র (সুত্ত) বা সূত্রান্ত (সুত্তন্ত) নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, নতুবা ইহার অপর কোন কারণ দেখা যায় না।

তন্তি শব্দের অর্থ-পরিবর্ত্তন

প্রাচীন মূল উপজীব্য বাক্যসমূহ যে অতিপ্রামাণিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইত, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ প্রাচীন বাক্যসমূহ যখন পূর্ব্বোক্তরূপে তন্ত বা তন্তি আখ্যা ধারণ করিল, তখন তাহাদের মুখ্য সিদ্ধান্ত এই নূতন অর্থের সৃষ্টি হইল; এবং সেই জন্যই অভিধানসমূহে তন্ত ও তন্তি অর্থ সিদ্ধান্ত অথবা মুখ্য সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে।[২৫]

তন্ত ও তন্তি শব্দের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের সাহিত্যে প্রয়োগ

ঐ উভয় শব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রথমটি (অর্থাৎ তন্ত=তন্ত্র),[২৬] এবং বৌদ্ধগণ দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ তন্তি) বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়।

তন্তি ও পালি একার্থক, উভয়ই পঙ্ক্তি-বাচি; এবং উভয়ই মূল শাস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে

পালিসাহিত্যে দেখা যায় তন্তি পালি-শব্দের অন্যতম প্রতিশব্দ;[২৭] এবং পালি বুঝাইতে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[২৮] পালি শব্দে পঙ্ক্তি বুঝায়, ও সেই জন্যই বুদ্ধবচনের অক্ষরপঙ্ক্তি বা বচনপঙ্ক্তিকে অর্থাৎ মূলশাস্ত্র বুঝাইতে পালি শব্দ প্রযুক্ত হইত, ইহা বলা হইয়াছে। তন্তি শব্দেও এইরূপ পঙ্ক্তি বুঝায়;[২৯] এবং তজ্জন্যই পালি শব্দের ন্যায় ইহাও বুদ্ধবচনের অক্ষরপঙ্ক্তি বা বচনপঙ্ক্তি অর্থাৎ মূল শাস্ত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত।

মূল শাস্ত্রকে তন্তি ও পালি বলিবার প্রধান কারণ

ব্রাহ্মণেরা বেদের শ্রুতিসমূহকে যেমন ঠিক একই ভাবে রাখিতেন, তাহার পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমকে কিছুতেই নষ্ট হইতে দিতেন না, বৌদ্ধগণও সেইরূপ বুদ্ধবচনকে রক্ষা করিতেন, তাহার ক্রমভঙ্গ হইতে দিতেন না। এবং এই স্থির-সমান রচনাক্রম থাকাতেই সমক্রমে অবস্থিত বৃক্ষাদির ন্যায় বুদ্ধবচনকেও তাঁহারা পঙ্ক্তি, বা পালি, বা তন্তি বলিতেন, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়।[৩০]

পালির অপর নাম মাগধী ভাষা, কেননা ইহা মগধের ভাষা ছিল।

পালিভাষার আর একটি নাম মাগধী ভাষা;[৩১] ইহা তাহার ভৌগোলিক নাম। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে পালি মগধ দেশের ভাষা ছিল।

কেহ বলেন গৌতম বুদ্ধ মগধে উৎপন্ন হন বলিয়া তাঁহার নাম মাগধ; এবং তাঁহার ভাষা বলিয়া পালির

২৪। ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্রের লক্ষণ এইরূপ:—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখং। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।"

২৫। "তন্ত্রং প্রধানে সিদ্ধান্তে সূত্রবাপে পরিচ্ছদে"—অমর, নানার্থ,১৮৩; "তন্তি বীণাগুণে তন্তং মুখ্য সিদ্ধন্ত তন্তসু"—অ, প, ৮৮২।

২৬। লক্ষণীয়—তন্ত্রবার্ত্তিক, তন্ত্রশাস্ত্র, পঞ্চতন্ত্র, ইত্যাদি।

২৭। "সেতুস্মিং তন্তি পন্তীসু নারিয়ং পালি কথ্যতে"—অ, প, ৯৯৬।

২৮। "সুপুমঞ্ঞাণগোচরং তন্তিং সঙ্গায়িত্বা"—সু, বি, ১৫ পৃ,; থেরথেরীগাথাতি ইমং তন্তিং সঙ্গায়িত্বা"—ঐ; "তন্তি নয়ানুচ্ছবিকং আরোপেন্তো"—ঐ ১ পৃ,; "তথ ধম্মোতি তন্তি"—অ, সা, ২২; "তন্তি য়া মাতিকং ঠপেসি," "তন্তি বসেন মাতিয়া ঠপিতা," "তন্তি বসেনেব বিভত্তা" ক, ব, অ, ২, ৭, পৃ,।

২৯। তন্ত্র, ও তন্ত্রি অথবা তন্ত্রী শব্দ মূলত একই; Prof. V. Apte তন্ত্র শব্দের অন্যতম অর্থ দিয়াছেন—"An uninterrupted series;—Sanskrit-English Dictionary, p. 529.

৩০। "So called from the regularity of its structure"—W. Subhuti, অ, প, ৯৯৬।

৩১। যথা, "মাগধভাসা কথয়েন লিখাহি"—সা ব, ৩১,পৃ। কখন কখন মাগধা বলা হইয়া থাকে—ধম্মকিত্তি সিরিধম্মারাম, ক, ব—(সিংহল), বিঞ্ঞাপন, p. 1.

নাম মা গ ধী।[৩২] এই ব্যাখ্যা যে কেবল বৈয়াকরণিকের শক্তিকল্পিত, তাহা না বলিলেও চলে; কেননা, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে ভাষার নাম হয় না, ইহা নিতান্তই অপ্রসিদ্ধ ও অস্বাভাবিক; দেশের নামেই ভাষার নাম হয়। প্রচলিত যে কোন ভাষার নামই এস্থলে উদাহরণ রূপে উল্লিখিত করিতে পারা যায়।

মাগধীনিরুক্তি

কথন কথন এই ভাষা মা গ ধী নি রু ক্তি[৩৩] নামেও কথিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে মা গ ধী নামে প্রসিদ্ধ একরূপ প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু আলোচ্য পালি হইতে ঐ ভাষা যে অত্যন্ত বিভিন্ন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। নবীন পাঠকগণের ঐ উভয় মাগধীর ভেদাবধারণ আবশ্যক, এই জন্য তৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পালি বা বৌদ্ধ-মাগধী ও প্রাকৃত-মাগধী পরস্পর ভিন্ন

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এস্থলে পালিকে বৌ দ্ধ মা গ ধী, এবং মাগধী প্রাকৃতকে প্রা কৃ ত মা গ ধী নামে নির্দ্দেশ করিব।

আলোচনার জন্য মাগধীদ্বয়ের সংজ্ঞা

প্রাকৃতলক্ষণকার চণ্ড প্রাকৃতমাগধীর এই মাত্র বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন যে, ইহাতে র স্থানে ল, এবং স (ও ষ) স্থানে শ হয়।[৩৪] যথা সংস্কৃত নি র্ঝ র প্রাকৃতমাগধীতে নি জ্ঝ ল হইবে; এইরূপ মা ষ=মা শ, বি লা স=বি লা শ। কিন্তু বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে নি জ্ঝ র (১০.§১২), মা স, বি লা স (১০.§৬)।

উভয় মাগধীর পরস্পর ভেদপ্রদর্শন

প্রাকৃতমাগধীতে অকারান্ত প্রাতিপদিকের পুংলিঙ্গে প্রথমা বিভক্তির একবচনে একার হইয়া থাকে।[৩৫] যথা,—মা ষঃ=মা শে, বি লা সঃ=বি লা শে, নি র্ঝ রঃ=নি জ্ঝ লে। বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে মা সো, বি লা সো, নি জ্ঝ রো (১০.৯১)।

প্রাকৃতমাগধীতে অস্মদ্ শব্দের প্রথমার এক ও বহু বচনে হ কে ও হ গে পদ হইয়া থাকে।[৩৬] যথা "চে ড়ে হ গে"[৩৭]=চেটঃ অ হ ম্। বৌদ্ধমাগধীতে ইহার রূপ চে টো অ হং।

প্রাকৃতমাগধীতে অবর্ণান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে বিকল্পে আ হ হয়।[৩৮] যথা, পু লি শা হ অথবা পু লি শ শ্ শ=পু রু ষ স্য। বৌদ্ধমাগধীতে ইহার রূপ পু রি স স্ স। যথা বা "হগে ন এ লি শা হ ক ম্মা হ কালী"=অহং ন এ তা দৃ শ স্য ক র্ম ণঃ কারী (শকুন্তলা, ৫ম অঙ্ক); "ভগদত্ত শো ণি দা হ কুম্ভে"=ভগদত্ত শো ণি ত স্য কুম্ভঃ (বেণী-সংহার, ৩য় অঙ্ক)।

এ স্থানে আর একটি বিশুদ্ধপ্রাকৃতমাগধীরচিত গাথা উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারাও পাঠকগণ উভয়ের ভেদ অনেকটা জানিতে পারিবেন:—

"লহশবশনমিলশুলশিল
বিঅলিদমন্দাললাযিদংহিয়ুগে।
বীলযিণে পক্খালদু[৩৯]
মম শয়লমবয্যযম্বালং॥" হে. চ. ৮. ৪ ২৮৮।

বৌদ্ধমাগধীতে ইহা এইরূপ হইবে:

"রভসবসনম্মসুরসির-
বিগলিতমন্দাররাজিতঙ্ঘিযুগো।
বীরজিনো পক্খালেতু
মম সকলমবজ্জজম্বালং॥"

৩২। "সো চ ভগবা মা গ ধো ম গ ধে ভবত্তা, সা চ ভাসা মা গ ধা, মাগধস্স তথাগতস্সায়ং ভাসাতি চ কত্বা সম্পচ্চোক্তি পকতিপচ্চয়ঞ্ঞ্চনো বিঞ্ঞ্চনো।" ঐ।

৩৩। "নিরুত্তিয়া মা গ ধি কা য় বুদ্ধিয়া। করোমি দীপন্তর-বাসিনাং অপি।" দা, ব, ১,১০।

৩৪। "মা গ ধি কা যাং র স য়ো র্ল শৌ"—প্রা. ল, ৩, ৩৯; হে, চ, ৮, ৪, ২৮৮; প্রা, প্র, ১১, ৩; স, সা, ৫,৮৬—৮৭।

৩৫। হে, চ, ৮, ৪, ২৮৭; হেমচন্দ্রের মতে অর্দ্ধমাগধী ও আর্ষ প্রাকৃতে এই নিয়ম বৈকল্পিক। প্রাকৃতমাগধীতে বিকল্পে ইকারও হইয়া থাকে, "অ,ত ই দে তৌ লু ক্ চ"—প্রা. প্র, ১১,১০।

৩৬। হে, চ, ৮, ৪, ৩০১; স, সা, ৫, ৯৭; প্রা, প্র, ১১, ৯. এখানে কোনো কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে অ হ কে পদও দেখা যায়। আবার হ গে স্থানে হ গ্ গে পদও দৃষ্ট হয়; যথা—"লাজশিয়ালে হ গ গে"=রাজশ্যালঃ অহম্, মৃ, ক, ৮ম, ৯ম অঙ্ক।

৩৭। মৃ, ক, ১ম অঙ্ক।

৩৮। হে, চ, ৮, ৪, ২৯৯; প্রা, প্র, ১১, ১২; ক্রমদীশ্বর হ-স্থানে হং করিয়াছেন, যথা—ব ম্ হ ণা হং=ব্রা হ্ম ণ স্য, স, সা, ৫, ৯৪।

৩৯। হেমচন্দ্রের মতে এখানে প[illegible]কালদু (দ্রঃ—হে, চ, ৮, ৪, ২৯৬), এবং বররুচির মতে প্র স্খা ল দু (প্রা, প্র, ১১, ৮; তুলঃ—হে, চ, ৮, ৪, ২৯৭) হওয়া উচিত ছিল। প্র স্খা ল য় তু সংস্কৃত ধরিলে ঠিকই হইতে পারে।

সংস্কৃতে তাহার অনুবাদ এই প্রকার : —

"রভসবশনম্রসুরশিরো-
বিগলিতমন্দাররাজিতাঙ্‌ঘ্রিযুগঃ।
বীরজিনঃ প্রক্ষালয়তু
মম সকলমবদ্যজম্বালম্॥"

মৃচ্ছকটিকে (১ম অঙ্কে) শকারের "শূরে বিক্কন্তে পণ্ডবে শেদকেদু" ইত্যাদি শ্লোক বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধীতে রচিত।

বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর পরস্পর আরো অনেক ভেদ আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রদর্শিত হইল না ; কিন্তু যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যাইবে যে, উভয় ভাষা পরস্পর দূরবিভিন্ন।

অ র্দ্ধ মা গ ধী

অ র্দ্ধ মা গ ধী নামে আর এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রসিদ্ধ আছে। অ র্দ্ধ মা গ ধী শব্দটি দ্বারাই জানিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ ভাষার শব্দপ্রভৃতির অর্দ্ধ অংশ ঠিক মা গ ধী অর্থাৎ প্রা কৃ ত মা গ ধী। তবে তাহার অপর অর্দ্ধ অংশ কি? ক্রমদীশ্বর বলিয়াছেন তাহা ম হা রা ষ্ট্রী ; প্রা কৃ ত মা গ ধী ম হা রা ষ্ট্রী র সহিত মিশ্রিত হইয়া অ র্দ্ধ মা গ ধী নাম ধারণ করে। [৪০]

তাহার উদাহরণ

পূর্ব্বোক্ত গাথাটি অ র্দ্ধ মা গ ধী তে এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে : —

"লভশবশনামলশুলশিল-
বিঅলিদমন্দাললাজিদংহিজুগে।
বীলজিণে পক্‌খালদূ
মম শয়লমবজ্জজম্বালং॥" [৪১]

৪০ "ম হা রা ষ্ট্রী মি শ্রা র্দ্ধ মা গ ধী"—স. স. ৫. ৯৮। মার্কণ্ডেয় বলেন—"শৌ র সে ন্যা অবিদূরত্বাদ্ ইয়ম্ (মাগধী) এব অ র্দ্ধ মা গ ধী-তি ভরতঃ।"

৪১। প্রাকৃতলক্ষণের (৫০ পৃ,) কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে মা গ ধী প্রকরণে উদাহরণপ্রসঙ্গে এইরূপ পাঠেই এই গাথাটি লিখিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রও প্রাকৃতমাগধীর উদাহরণস্বরূপ এই গাথাটিই বলিয়াছেন, কিন্তু এখানকার পাঠ হইতে তাঁহার পাঠ ভিন্ন এবং প্রাকৃত-মাগধীর নিয়মানুগত। এখানে যে পাঠ ধৃত হইয়াছে তাহা বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধীর বলিতে পারা যায় না। কারণ, প্রাকৃতমাগধীতে জ, দ্য, ও য স্থানে য হইয়া থাকে (হে, চ, ৮, ৪, ২৯২); তদনুসারে এখানে লা জি দ=লা য়ি·দ, জু গে=যুগে, জি ণে=যি ণে, অ ব জ্জ= অ ব য্য, এবং জ ম্বা লং=যম্বালং হওয়া উচিত ছিল, এবং হেমচন্দ্রের পাঠে তাহাই আছে। অপর পক্ষে ম হা রা ষ্ট্রী তে আদিস্থিত যকার স্থানে জকার হয় (হে, চ, ৮, ১, ২৩৫); তদনুসারেই সংস্কৃত যুগ=জুগ হইয়াছে; আবার দ্য=জ্জ (হে, চ, ৮, ১, ২৪৮,), তদনুসারে এখানে অ ব দ্য= অ ব জ্জ হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীতে ক্ষ ক্‌খ হয়, ইহাতে প ক্‌ খা ল দূ পদের সমাধান করিতে পারা যায়। অতএব এখানে যে ম হা রা ষ্ট্রী প্রাকৃত রহিয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই আবার ল ভ শ প্রভৃতি পদে স্পষ্টই প্রাকৃতমাগধী দেখা যাইতেছে। অতএব ঐ উভয় প্রাকৃত এখানে মিশ্রিত হওয়ায় এই গাথাটিকে অ র্দ্ধ মা গ ধী বলিতে পারা যায়।

মৃচ্ছকটিকে শকারের অনেক কথা বিশুদ্ধপ্রাকৃতমাগধী-রচিত। প্রাকৃতমাগধীর মূল শৌরসেনী, এজন্য তাহাতে শৌরসেনীও দেখা যায়ই, আবার স্থানে স্থানে ম হা রা ষ্ট্রী শব্দও দৃষ্ট হয়। এই জন্য কোনো কোনো শকারের ভাষাকে অ র্দ্ধ মা গ ধী নাম দিতে পারা যায়। অভিজ্ঞানশকুন্তলে রক্ষিপুরুষ ও ধীবরের ভাষা প্রাকৃতমাগধী। বেণীসংহার ও উদাত্তরাঘবের রাক্ষসের ভাষাও প্রাকৃতমাগধী। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতিতেও ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু প্রায়ই ইহার সহিত ভিন্নজাতীয় প্রাকৃতের সম্মিলন দেখা যায়। [৪২]

সংস্কৃত দৃশ্য কাব্য সমূহে প্রাকৃতমাগধী ও অর্দ্ধমাগধীর ব্যবহার

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনা

শক্র যদি দিতে হয়　　দাও তবে ভীষ্ম সম,
ওহে জগদীশ !
যার শরজাল দেয়　　বক্ষঃ চিরি পরাজ্ঞান,
শিরে শুভাশিস।

৪২। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যসমূহে স্থানে স্থানে প্রাকৃত অংশ বিভিন্ন-বিভিন্ন পাঠে এত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে। দৃষ্টান্তরূপে আমরা বেণীসংহার ধরিতে পারি। ইহার তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে রাক্ষস ও রাক্ষসীর ভাষা বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধী, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কেননা বহুপ্রাকৃতবিদ্ হেমচন্দ্র মাগধীপ্রসঙ্গে অনেক স্থলে তাহা ধরিয়াছেন (যথা—"কহিং নু গদে লুহিলপ্পিয়ে ভবিসসিদি" হে. চ. ৮. ৪. ৩০২, ইত্যাদি)। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের কোন কোন সংস্করণে বিভিন্নজাতীয় প্রাকৃত দেখা যায়। একখানি সংস্করণে মা গ ধী রচনাই আছে দেখিয়াছি। আবার জীবানন্দের সংস্করণে সেই স্থানে অন্যবিধ প্রাকৃত যোজিত হইয়াছে। আবার ইহারও মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাকৃতের পদাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত পাঠকগণের প্রাকৃতের দিকে অনাদরই এই পাঠবিপর্য্যয়ের অন্যতম প্রধান হেতু। ইহার সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

চাহিনাক মিত্র আমি সে যদি শকুনি সম
চাটু সুধা মাখি'
সেবন করায়ে নিত্য কুপথ্য গরলরাশি
মৃত্যু আনে ডাকি'।
করগো ভিখারী মোরে সে যদি বিদুর সম
চিরতৃপ্তপ্রাণ,
মধুর ক্ষুদের লাগি' যার দ্বারে ফিরে ফিরে
আসে ভগবান।
করোনাক নৃপ মোরে সে যদি যযাতি সম
ভোগে অন্ধ, হায়,
নিজ জরা বিনিময়ে পুত্রের যৌবন তরে
মরে পিপাসায়।
দাও প্রভু পরাজয় সে যদি বলির মত
ত্রিভুবনহারা,
বিকাইতে পারি শির বালক বামন-পদে
লভি চির-কারা।
চাহিনাক জয় তবু সমগ্র ভারত রাজ্য
জিনিয়া সমরে,
স্বজন-সন্ততি-হারা, কুরুক্ষেত্র শ্মশানের
সিংহাসন পরে।
চিরবর্ষা দাও মোরে, জীবনে আনুক বন্যা
প্রচণ্ড উন্মাদ,
বর্ষণে বিদারি বক্ষ আনে যেন সুধাস্নিগ্ধ
শ্যামল সম্পদ।
চাহি না ফাল্গুন আমি ফলদল কিসলয়ে
অলস সুন্দর,
সে যদি স্বপন ভাঙি নিয়ে আসে বৈশাখের
ব্যথিত মর্ম্মর।

শ্রীকালিদাস রায়।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা

(সমালোচনা)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যাকরণের বিভীষিকা করিয়াছেন। বিভীষিকা একটা প্রশ্ন। সেটা এই,—"যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ, অপভ্রংশ-রূপে নহে, অবিকৃতভাবে বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে, সেগুলি কোন্ ব্যাকরণের শাসনে আসিবে?"

প্রশ্নকর্তা দুই দলের দুই উত্তরও পাইয়াছেন। এক দলের উত্তর,—'যাহা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, তাহা বাঙ্গালা সাধু ভাষাতেও অপ-প্রয়োগ।' অন্য দলের উত্তর,—'বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।'

বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় নিজে একটা উত্তর দিয়াছেন। তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে 'তিনি শিক্ষা ও সংস্কারবশে অনেক স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন।' তিনি জিজ্ঞাসিতেছেন, 'বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ দেখিলেই কি সিদ্ধ প্রয়োগ বলিয়া মানিব, এবং সেটাকে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্ব বলিয়া ধার্য্য করিব?' তাঁহার শেষ মীমাংসা এই, 'যাহা ভাষায় খুব চলিত, তাহা শুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে ক্ষতি নাই; না মানিলে উপায়ান্তরও নাই; কেননা, তাহার রোধ করা অসম্ভব।'

তবে লেখকের মত দাঁড়াইল এই,—যে পদ বাঙ্গালা ভাষায় খুব চলিত, তাহা শুদ্ধ; সংস্কৃত শব্দ লইয়া নূতন পদ গড়িতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের কষ্টিতে ঘষিয়া পরখ করিয়া লইতে হইবে। 'মনান্তর' খুব চলিত, ইহা শুদ্ধ; 'মন-সংযোগ' খুব চলিত নয়, ইহা অশুদ্ধ; কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণে 'মনঃ-সংযোগ' লেখে, মন-সংযোগ লেখে না। আর এক দৃষ্টান্তে, 'নীলবরণী' হইতে দোষ নাই, কারণ 'বরণ' শব্দ সংস্কৃত নহে; কিন্তু 'নীলবর্ণী' হইলে পদ দুষ্ট বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণে 'নীলবর্ণা' পদ শুদ্ধ বলে।

বোধ হয়, বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় নিজের মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এই হেতু, তিনি 'এবিষয়ে আলোচনা করিতে পণ্ডিত-ব্যক্তিদিগকে সনির্বন্ধ আহ্বান করিয়াছেন।'

আমি পণ্ডিত নই, আমাকে আহ্বান নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা আমারও ভাষা, কেবল পণ্ডিতের ভাষা নহে, এবং আমাকেও কতকগুলি তর্কের ফাঁদে পড়িতে হইয়াছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া উদ্ধারের পথও খুঁজিতে হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমান স্তোকবাক্য মানে না, ভবিষ্যৎ বিচারের আশায় বসিয়া থাকিতে দেয় না। কাজ চালাইবার মতন একটা কিছু ধরা চাই।

প্রথমে উপরের দুই উত্তর বুঝিয়া দেখা যাউক। যাহা সংস্কৃত ভাষার নিকট অপপ্রয়োগ, তাহা বাঙ্গালা ভাষার নিকটও কি অপ-প্রয়োগ? একথা সত্য হইলে বাঙ্গালা একটা ভাষার নাম হইতে পারিত কি? সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এক কি? সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কি এক? যখন বলি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি, তখন কি স্বীকার করি না, এক নহে? উৎপত্তি শব্দটা সংশয়াত্মক, সুস্পষ্ট নহে। বীজ হইতে বৃক্ষের, তিল হইতে তৈলের, কিংবা মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি যেমন, সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তেমন। শুধু বাঙ্গালা কেন; হিন্দী, ওড়িয়া, মরাঠী ভাষারও তেমন। উৎপত্তি না বলিয়া বি-বর্ত্তন বলিলে সংস্কৃত-বাঙ্গালার সম্বন্ধ আরও স্পষ্ট হয়। বি-বর্ত্তনে উন্নতি হয়, অবনতিও হয়। সংস্কৃত-ভাষা সংস্কৃত, মার্জ্জিত, শোধিত; বিবর্ত্তনে সে ভাষা অ-মার্জ্জিত, অশুদ্ধ হইয়া পালি, এবং 'প্রাকৃত' ভাষা হইয়াছিল, বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষা হইয়াছে। সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ ভাষার প্রাণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ ভাষার অঙ্গ বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় চলিত বিশেষ্য বিশেষণ কতকটা সংস্কৃত আছে কতকটা নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় একটা ক্রিয়াপদ পাই না, যাহা সংস্কৃত হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দও কি সংস্কৃত আছে? সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ কি বাঙ্গালা শব্দে আছে? এক এক শব্দ ত আর কিছু নয়, এক এক ধ্বনি। সে ধ্বনি যদি পরিবর্ত্তিত কিংবা অপভ্রষ্ট হইল, তবে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার ঐক্য রহিল কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, বাঙ্গালাতে সংস্কৃতের কাঠাম আছে, মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কারণে, বাঙ্গালা ভাষা

'সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র' বলিতে পারা যায় না, সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীনও বলিতে পারা যায় না। পারা যায় না বলিয়া দুই প্রকার উত্তর হইতে পারিয়াছে। বিবর্ত্তন হইলে যে যাবতীয় অঙ্গের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে, এমন কথা নাই। সংস্কৃতের বিবর্ত্তনের এক অবস্থা প্রাচীন বাঙ্গালা, আর এক অবস্থা নবীন বাঙ্গালা। উভয় অবস্থাতেই অবিকৃত সংস্কৃত পদ পাওয়া যায়।

তবে কি লেখকের 'খেয়াল-মত' যে-সে পদ বাঙ্গালাতে প্রবেশ করিতে পারে? কখনও না। খেয়ালে সমাজের ক্ষতি, কষ্ট-বৃদ্ধি, অসুবিধা হইলে সে খেয়াল অবশ্য দণ্ডণীয়। গ্রামে বাস করিয়া গ্রামের লোকের অসুবিধা জন্মাইলে যেমন দুষ্ট ব্যক্তির শাসন কর্ত্তব্য হয়, তেমন যে বাঙ্গালা ভাষা বহু লোকের ভাষা তাহাতে বিশৃঙ্খলা আনিলে সে কাজ অত্যাচার বলিয়া গণ্য।

শৃঙ্খল, রীতি, নিয়মের অভাব হইলে বিশৃঙ্খলা বলি। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র ধরিয়া পদ সিদ্ধ করিলে বাঙ্গালাভাষায় বিশৃঙ্খলা ঘটিবার কথা। একটা দৃষ্টান্ত ধরুন। বাঙ্গালায় দুই পদের সন্ধি না করা নিয়ম। শ্রী-অঙ্গ, মাতৃআজ্ঞা প্রভৃতি অসংখ্য পদ এই কারণে চলিতেছে। হলন্ত ব্যঞ্জনের পর স্বরবর্ণ থাকিলে সমাসে সন্ধি হইতে পারে। যেমন, জন্+এক=জনেক, মন্+আগুন=মনাগুন। চলিত শব্দ না হইলে এ সব স্থলেও সন্ধি না করাই নিয়ম। যেমন, উদ্ধার-আশায়, উপনয়ন উপলক্ষে। সন্ধি না করিলে শ্রুতি-মধুর হয়, করিলে হয় না; অতএব বাঙ্গালায় সন্ধি হয় না; এ নিয়ম নহে। আমরা সংস্কৃত শব্দ লইয়াছি, সংস্কৃত ব্যাকরণ লই নাই। পদে শব্দগুলি রাখিতে চেষ্টা করি। যেখানে সন্ধি করিলে অর্থগ্রহে বিঘ্ন হয়, সেখানে সন্ধি বাঙ্গালাভাষার রীতিবিরুদ্ধ। আমরা আরবী ফারসী ইংরেজী শব্দও লইয়াছি, কিন্তু ভাষা বাঙ্গালা রাখিয়াছি। এই কারণে এ সব শব্দের বেলাও সন্ধি করি না। যিনি 'গ্যাসালোক', 'আয়েষোপভোগ' লেখেন, তিনি বাঙ্গালাভাষার ধার ধারেন না। তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালা আরবী ফারসী ইংরেজী শব্দের সমাস করিয়া বাঙ্গালাভাষার মুণ্ডপাত করেন। আরবী ফারসী ইংরেজী শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের সমাস বরং সহ্য হয় সংস্কৃত শব্দের সমাস 'অসহনীয়' হইয়া উঠে। 'স্কুল ভবন,' 'আপিশ গৃহ,' 'মোক্তারগণ' প্রভৃতি পদ রচনা 'সডাক মাশুল প্রেরিতব্য' মাসিক পত্রেই শোভা পায়। গ্রাম্যজন এমন পণ্ডিত্য জানে না।

দেখা যায়, সংস্কৃত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ বাঙ্গালা শব্দ হইয়াছে।* এইকারণে 'শ্রোতাগণ', 'হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা', 'আত্মা পুরুষ,'† 'গুণী মহাশয়,' 'প্রিয়সখা' প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ বলিতে পারি না। ললিত বাবুও এইরূপ প্রয়োগের যুক্তি দিয়াছেন, বিপক্ষের খণ্ডনও দিয়াছেন। খণ্ডন এই, 'সংস্কৃত শব্দ যোজনাকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম বাঙ্গালা রাখাই কর্ত্তব্য। লেখকদিগের শিক্ষা ও সংস্কারের তারতম্য অনুসারে উভয়প্রকার প্রয়োগই চলিত দেখা যায়।' খণ্ডনটা যদিও আপোষ-নিষ্পত্তি হইয়াছে, ভিতরে বাঙ্গালাভাষার নিয়ম পাওয়া যাইতেছে। যে ভাষারই শব্দ হউক, যোজনাকালে শব্দের মূল রূপ রাখাই নিয়ম। বাঙ্গালায় সে শব্দ অপ্রচলিত হইলে মূল রূপ দেখাইতেই হইবে, প্রচলিত হইলে অর্থগ্রহে বিঘ্ন না জন্মিলে আদি ভাষার নিয়মও চলিতে পারে। প্রকৃত পরীক্ষা অর্থবোধ; বাঙ্গালীর কাছে অর্থবোধ, সংস্কৃতে পণ্ডিতের কাছে কিংবা আরবী ফারসীতে মোলভীর কাছে নহে।

বাস্তবিক, যাঁহারা সংস্কৃত-ব্যাকরণের সূত্র দেখাইয়া বাঙ্গালায় বিভীষিকা আনিতে চাহেন, তাঁহারা কি মনে করেন, সাড়ে চারি কোটি মানুষ সংস্কৃত-ব্যাকরণ শিখিয়া বাঙ্গালা কথা কহিবে? হাজার বিভীষিকা দেখাই, এত লোকের মুখ ও কলম সংযত করা সোজা কাজ হইবে না। আশ্চর্য্য এই, এত লোক প্রায় এক রকম ভাষায় কথা কহে, এবং ভুল করিলে এক এক রকমের ভুল করে। ইহাতে অনুমান হয়, ভুল করারও সূত্র আছে এবং সে সূত্র সবাই জানে। সবাই বলে 'নীলাম্বরী শাড়ী'; 'প্রেতিণী' না বলুক 'পেত্নী' বলে। বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় যাহা 'অলীক সাদৃশ্য' (false analogy) বলিয়াছেন, দেখিতেছি, তাহাই সূত্র হইয়াছে। তিনি এ বিষয়ের বহু উদাহরণ একত্র করিয়াছেন।

আমার বোধ হয়, ভাষার পদ রচনায় 'অলীক সাদৃশ্য' অলীক নহে। যখন দেখি, 'সহধর্ম্মিণী' 'পদ্মিনী' হয়, তখন 'হেমাঙ্গিনী' 'অধীনী' না হইবে কেন? 'প্রথমা' 'দ্বিতীয়া' 'তৃতীয়া' কন্যা বলা চলে, এমন কি পহেলা দোসরা তেসরা চৌঠা শব্দও বাঙ্গালায় আছে, তখন 'চতুর্থা' 'পঞ্চমা' 'ষষ্ঠা' কন্যা বলা না চলিবে কেন? যখন 'গোয়ালিনী' বা 'গয়লানী' হয়, যখন চণ্ডীদাস লিখিতে পারিলেন 'ননদিনী' 'রজকিনী' তখন 'গয়লানী'কে শুদ্ধ করিয়া সভ্য সমাজে 'গোপিনী' নামে চালাইতে দোষ কি? যখন 'শ্রীচরণেষু', 'চরণকমলেষু' হয়, তখন 'নিরাপদেষু', এমন কি ফারসী 'বরাবর' লইয়া 'বরাবরেষু' না হইবে কেন?

ইহার উত্তর দেওয়া সোজা নহে। জ্ঞাত বস্তুর সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অজ্ঞাত বস্তুর প্রয়োগ করি। জীবন-যাত্রায় ইহাই কল্প। সাদৃশ্য অনুভব করিয়া ভাষার শব্দে বিভক্তি প্রত্যয় বসাই। শব্দ অসংখ্য; প্রত্যেক শব্দের উত্তর এক এক বিভক্তি প্রত্যয় শিখিতে হইলে ভাষা কেহ শিখিতে পারিত না। সংস্কৃত ভাষা বহু-পুরাতন, বহু-দেশব্যাপী ছিল, নতুবা এত জটিল হইত না। তথাপি এক এক রকম শব্দের নিমিত্ত এক এক সূত্র আছে। জটিল বলিয়া প্রাকৃত জন সে ভাষা সোজা করিয়া লইয়াছিল; এইরূপে পালির জন্ম, সংস্কৃত-প্রাকৃতের জন্ম। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত-প্রাকৃত অপেক্ষাও সোজা হইয়াছে। বিশেষ বিধি ঘুচিয়া গিয়াছে, সামান্য বিধিতে কাজ চলিতেছে। যদি কেহ বাঙ্গালাতে প্রযোজ্য শব্দসমুদ্র ভাগ ভাগ করিয়া আলি দিয়া বলিতে পারিতেন, এই সীমালির ভিতরের শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন, এই সীমালির নহে, তাহা হইলেও একটা কাজের মত কাজ হইত।

অপপ্রয়োগের কারণ বুঝিতেছি, নিবারণের উপায় পাইতেছি না। উপায় পাইতেছি না বলিয়া বাঙ্গালা ভাষা বানে ভাসাইয়া দরিয়ায় ফেলা কর্ত্তব্য নহে। বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন, "লেখক-সম্প্রদায়ের খেয়ালমত যে সব কৃত্রিমপদ নির্ম্মিত হইবে, তাহাই যে মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে, আমার ইহা সঙ্গত বিবেচনা হয় না। উৎকট মৌলিকতা, অজ্ঞতা, বা অনবধানের ফলে যে সব শব্দ উদ্ভাবিত হইতেছে, সে গুলিতে যে ভাষার শব্দসম্পদ্ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।"

ব্যাকরণ-বিভীষিকাকর্ত্তা অপপ্রয়োগের তিন প্রকার উদাহরণ তুলিয়াছেন। যথা, (১) সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, (২) গ্রাম্য বা নিরক্ষর লোকের কথাবার্ত্তার শব্দ, (৩) সংস্কৃত ব্যাকরণের বিরোধী শব্দ। প্রথম দুই শ্রেণীর উদাহরণ এত আছে যে, ব্যাকরণ-বিভীষিকা না করিয়া এক বৃহৎ শব্দকোষ-বিভীষিকা করা চলিত। ভ্রাতৃবধূ স্থানে ভাদ্রবধূ কিংবা ভাদর-বউ, পূর্ণিমা স্থানে পুন্নমী যাবতীয় স্থানে যাবদীয়, ঘনিষ্ঠ, মলম্মা প্রভৃতি যে শ্রেণীর

* কতকগুলি শব্দে সংস্কৃত-ব্যাকরণের বহু বচনের রূপ আছে। নানা কারণে এরূপ ঘটিয়াছে।

† বাঙ্গালায় আত্মা—ব্রহ্মজীব, আত্ম—স্বয়ং, দুই অর্থে দুই শব্দ হইয়াছে। আত্মা পুরুষ, আত্মপর ইত্যাদি পদে দুই রূপ পাওয়া যায়। আত্মন্ শব্দের অপভ্রংশে আমন-আপন হইয়াছে।

অনেক, বারেক, স্বজন, একত্রিত, জীবন্ত, দয়াল, সাবকাশ, সক্ষম; বিধর্ম্মী প্রভৃতি সে শ্রেণীর নহে। পরিত্যজ্য, উৎকণ্ঠতা, সৌজন্যতা, প্রফুল্লিত, দুরাবস্থা, আবশ্যকীয় প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর শব্দ। অপর কতকগুলি উদাহরণ সম্বন্ধে হয়ত সংস্কৃত-শব্দকোষ দায়ী। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র-বিদ্যারত্ন-প্রণীত শব্দসার অভিধান* প্রামাণিক কি না জানি না। কিন্তু তাহাতে দেখিতেছি, অপরূপ (আশ্চর্য্য), কৃষক, সৌদামিনী, মাত্র, পুত্তলিকা, বিদায়, সৌরভ, সমারোহ (জাঁকজমক) প্রভৃতি শব্দ আছে। আপ্তের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে বালিকা (বালুকা) শব্দ আছে। আপ্তে মহাশয় অবশ্য বাঙ্গালার ঢেউ পান নাই। ললিত বাবুরও অনবধানে কয়েকটা যাবনিক (আরবী ফারসী, এক কথায়) শব্দ সংস্কৃত শব্দের তালিকায় ঢুকিয়াছে। যেমন শীকার (মৃগয়া), আরাম (বিশ্রাম)।† শব্দ-সারে আরাম অর্থে বিশ্রামও আছে। মোহ অর্থে ব্যামোহ সংস্কৃতে আছে, রোগ অর্থে নাই। মোহ শব্দের অর্থ-সম্প্রসারণে ব্যামোহ অর্থে রোগ না আসিতে পারে এমন নয়। ব্যারাম শব্দও এইরূপে আসিতে পারে। নিরাকরণ অর্থে নিবারণ, প্রত্যাখ্যান; ইহা হইতে সন্দেহ-নিবারণ ও পরে নিরূপণ আসিয়া থাকিবে। সংস্কৃতে আমাশয় আছে, কিন্তু আমাসা রোগ অর্থে নাই, এই অর্থ টানিয়া আনিতেও পারা যায় না। সংস্কৃত আমাতিসার শব্দের অপভ্রংশে আমাসা। এইরূপ, সং মৌক্তিক হইতে মোতি, বানান দোষে মতি লেখা হয় (যেমন দোড়ী—দড়ী, গোর—গর; বিপরীত, সং খস—খোস)। বৈমুখ, নৈরাশ, নৈরাকার, অনপাম, সম্মুখ, সন্মান প্রভৃতি শব্দ বহুকাল হইতে চলিতেছে। আশ্চর্য এই, সম্মুখ, সন্মান কেবল বাঙ্গালায় নহে, হিন্দী ওড়িয়া আসামী মরাঠী ভাষাতেও চলিত আছে। সংস্কৃত শব্দের শেষ স্বর লুপ্ত হইয়া বাঙ্গালায় অসংখ্য শব্দ প্রচলিত আছে। ভূম (ভূমি), রীত, ধাত (ধাতু), আজ (আজি), প্রভৃতি এত শব্দ আছে যে শব্দ-কোষ ব্যতীত এখানে উল্লেখের স্থান হইবে না।

বন্ত, মন্ত, অন্ত প্রভৃতি বাঙ্গালা প্রত্যয় অস্বীকারের কারণ নাই। জ্ঞানবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, শ্রীমন্ত, জীয়ন্ত, চলন্ত প্রভৃতি শব্দ অশুদ্ধ বলিলে বাঙ্গালাভাষা লা-চার। ভর শব্দে সাদৃশ্যার্থে সা প্রত্যয় করিয়া বাং ভরসা। একত্রীকৃত বা একত্রীভূত শব্দ বাঙ্গালা নিয়মে একত্রিত। (যদিও ললিত বাবু বলেন, একত্রীকৃত, একত্রীভূত দুইটাই অশুদ্ধ)। সং সু অব্যয় স্থানে স হইয়া সশঙ্কিত, স+অবকাশ, সক্ষম ইত্যাদির উৎপত্তি অনুমান করি। অনেকে নিশি শব্দটা ভুল ভুল করিয়া 'নিশির শিশির' প্রলাপ ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু সং নিশীথ হইতে বাং নিশী বা নিশি (থ সহজে হ হইয়া লুপ্ত হয়)। তেমনই সং দিবস হইতে দিসি হইয়াছে, নিশি-দিসি (নিশিতে শ দেখিয়া প্রায়ই দিশি বানান ঘটে) প্রাচীন বৈষ্ণব-পদাবলীতে আছে।‡ বোধ হইতেছে, স্বজন সিজন কৃত্তিবাসে পাইয়াছি। (ওড়িয়াতে সজন, সজনা খুব চলিত)। নাপিতিনী, বণিকিনী চণ্ডীদাসে আছে। বাং ইত প্রত্যয়ের এক চমৎকার উদাহরণ কবিকঙ্কণে আছে,—'অঙ্গুকেশ আঁচড়িত লঘুগতি ধায়।' তথাপি 'এলায়িত' পদ বাঙ্গালায় নূতন 'ফোটনোন্মুখী ফুল'ও নূতন।

এখন কথা শেষ করি। বস্তুতঃ (তঃ, কারণ এইরূপ উচ্চারণ করি) আমার লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক গ্রন্থে ললিত বাবুর উদাহৃত শব্দ ও ব্যাকরণের বিচার্য বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করা গিয়াছে। তথাপি ললিত বাবু যে সব আধুনিক উৎকট পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে অনেকের চক্ষু (বাঙ্গালায় শব্দটা চক্ষু, সংক্ষেপে চোখ) ফুটিবে। শব্দ-রচনার ভুলের সঙ্গে বাক্য-রচনার ভুল মিলিত হইয়া অনেক মাসিক পত্রের, বিশেষতঃ বিজ্ঞাপনের, কলেবর বেশ পুষ্ট হইতেছে। অনেকের বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষা যখন মাতৃভাষা তখন ত মায়ের কোলে শুইয়া থাকিবার সময় ভাষাটা দখল হইয়া গিয়াছে।* ললিত বাবুর ব্যাকরণ-বিভীষিকা হইতে কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলিতেছি। আশা করি, ইহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ বোধ করিবেন না। কারণ, এমন ভুল বাঙ্গালার ধারা হইতেছে। দেখিতেছি, ব্যাকরণ-বিভীষিকা "কলিকাতা ১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" এখানে, কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট কি রকম অন্বয় হইয়াছে? ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত? না, ষ্ট্রীটের ১১৭।১ নম্বরের বাড়ী হইতে প্রকাশিত? দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত? কর্ত্তৃক কি পদ? একটা বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি, 'ইহাতে দশটি গল্প সরল সরস মজাদারী রূপকথার ভাষায় বর্ণিত। দুই রঙ্গের কালিতে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই। মলাট তক্তকে ঝক্‌ঝকে। ১২ খানি হাফ্‌টোন ছবি ও ২ খানি তিন রঙ্গের ছবিসহ।' এই ভাষা বাঙ্গালা কি? বাঙ্গালা হইলে বাস্তবিক বিভীষিকার ভাষা। ইহার কোন্ অংশের উল্লেখ করিব, জানি না। কারণ আগাগোড়া 'মজাদারী'। আরও দেখিবেন? 'উভয় পুস্তকই কলিকাতা ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।' এই রকম ভাষা পড়িলে বলিতে ইচ্ছা হয়, 'হা বঙ্গভাষা!'

কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

* এই অভিধানে অল্লা (পরমদেবতা), জনাব (লোকপালক) শব্দ আছে; অথর্ব উপনিষদে নাকি আল্লা শব্দ আছে।

† এইরূপ, ফারসী বন্দ শব্দের সংস্কৃত রূপ হইয়া বন্ধ, যেমন কাছারি বন্ধ। বিদায় হই—বিদায় আরবী।

‡ যথা, চণ্ডীদাসে,—নিশিদিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন, বিরহ অনলে জ্বলে তনু। নিশিদিশি কাঁদি, কিন্তু হাসি লোকলাজে॥ জ্ঞানদাসে,—জ্ঞানদাসে কহে আর কি বিছু রয়ে, নিশিদিশি ধরণ ধেয়ান॥ নিশিদিশি অবিরত, জাগিতে ঘুমিতে কত, প্রাণ নাথ সোঙরি সদাই।

* আমিও বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া কলম ধরিয়াছিলাম। এখন যে শিখিয়াছি, তাহা নহে। তবে কি না, ভুল ধরা সোজা।

নিমেষিকা

১

শুধু মোর আঁখি পরে মুগ্ধ আঁখি তার
রাখি ক্ষণেকের তরে, অশ্রুভরা আঁখি
মন্থর পল্লবচ্ছায়ে কোন মতে ঢাকি,
চলি গেল ধীর পদে। কিছু নয় আর।
সেই মৌন পরিচয়, অনুরাগ নব,
প্রণয়কম্পিত মোর সে নব মিলন,
সেথা তার অবসান—সেই মোর সব
—কয়টি মুহূর্ত্তব্যাপী সমগ্র জীবন

পুঞ্জীভূত সেইখানে ক্ষণিক আভায়
মেঘভরা আকাশের আলোকনির্য্যাস
আঁধারে উচ্ছ্বসি' যথা বিজুলি রেখায়
মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হয়। প্রেম-ইতিহাস
তেমনি সংক্ষিপ্ত মোর তেমনি উজ্জ্বল,
নয়ন-জলদজালে বিজুলি নির্ম্মল।

২

শুধু নিমেষের তরে চক্ষে মোহ লাগে।
চিত্ত হয় আত্মহারা বক্ষ স্পন্দহীন
দগ্ধ অরণ্যের মাঝে বনশ্রী নবীন
হাসিয়া ফুটিয়া উঠে নব অনুরাগে
তোমার চকিতদৃষ্টি বসন্ত পরশে।
জানি আমি তুমি শুধু মায়া নিমেষিকা
পলকে ভুলায়ে মোরে ক্ষণিক হরষে
আকুল করিয়া যাও হে সুরবালিকা।
তোমার সুদূর লোকে নিভৃত নন্দনে
সুরেন্দ্র-বাঞ্ছিত হার মন্দার-মালিকা
কোন্ ভাগ্যবান্ লাগি গাথ সযতনে।
সুদূর অলক মেঘে রাকার চন্দ্রিকা
শুভ্র হাসি সম ফুটি অমনি মিলায়
সে মায়া কি ধরা পড়ে ধরার মায়ায়?

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

গীতাপাঠ

(আবহমান)

এখন ডারুইনের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের কথার কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

ডারুইনের মোট কথাটা'র ঘাটিস্থান তিনটি;—তাহার প্রয়াণ-স্থান হ'চ্ছে Natural selection অর্থাৎ প্রাকৃতিক পাত্র-নির্ব্বাচন; গম্যস্থান Survival of the fittest যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন; এবং মাঝ-পথ, Struggle for existence, সত্তা-রক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি। প্রকৃতির পাত্রনির্ব্বাচন-প্রণালী একপ্রকার জলশোধন-প্রণালী। বর্ষাকালের পঙ্কিল গঙ্গাজল ভাল করিয়া ছাঁকিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট প্রণালী কিরূপ তাহা বোধ করি শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই জানেন—তাহা এইরূপ:- একটি নিশ্ছিদ্র খালি কলসের উপরে দুইটি তলায়-ঝাঁঝরি-কাটা কলস উপর্য্যুপরি স্থাপন করা হো'ক্; উপরের কলসটার ছআনা অংশ কয়লার কুচিতে ভরাট্ করা হো'ক্, এবং মাঝের কলসটার ঐ পরিমাণ অংশ বালির গাদায় ভরাট্ করা হো'ক্; তাহার পরে উপরের কলসটা শোধিতব্য জলে গলাগলি পূর্ণ করা হো'ক্। তাহা হইলে জলের বারো-আনা দূষিত অংশ কয়লার কুচিতে খাইয়া গিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা মাঝের কলসে স্থিতি-লাভ করিবে; তাহার পরে জলের অবশিষ্ট দূষিতাংশ বালির গাদায় খাইয়া গিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, সেই ঝর্ঝরে পরিষ্কার জল নীচের খালি কলসে স্থিতি লাভ করিবে। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জীবের মধ্যে এইরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই শ্রেণীর জীবের মধ্যে যাহারা অযোগ্য তাহারা চারিদিগের পাঞ্চভৌতিক শত্রু এবং বিজাতীয় জীবশত্রুর সহিত সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি-গতিকে মারা পড়িয়া যায়, এইরূপে অযোগ্য জীবেরা মারা পড়িয়া গিয়া যাহারা উদ্বৃত্ত হয়, তাহারাই প্রথম দফার যোগ্যতম জীব। এই যে প্রথম দফার যোগ্যতম জীব ইহাদের নির্ব্বাচন-প্রণালীর নাম দেওয়া যাইতে পারে "বিজাতীয় জীবন-সংগ্রাম": কেননা প্রথম দফার যোগ্যতম জীবেরা বিজাতীয় শত্রুর অথবা পাঞ্চভৌতিক শত্রুর হস্ত হইতে অথবা দুয়েরই হস্ত হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে। এইরূপে বিজাতীয় জীবন-সংগ্রামের পথ দিয়া প্রথম দফার যোগ্যতম জীবের নির্ব্বাচন-কার্য্য হইয়া চুকিলে দ্বিতীয় দফার যোগ্যতম-জীবের নির্ব্বাচন-কার্য্য আরম্ভ হয়। এই দ্বিতীয় দফার যোগ্যতম জীবের নির্ব্বাচন প্রণালীর নাম দেওয়া যাইতে পারে সজাতীয় (অর্থাৎ সমজাতীয়) জীবন-সংগ্রাম। যূথস্থ বানরী-বৃন্দের স্বামিত্বের অধিকার-প্রাপ্তির জন্য বীর-বানরদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে যে কিরূপ সাংঘাতিক যুদ্ধ বাধে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। এইরূপ স্ত্রীপরিগ্রহের উপলক্ষে সজাতীয় (অর্থাৎ সমজাতীয়) জীবগণের মধ্যে যেরূপ সংগ্রাম বাধে তাহারই

আমি নাম দিতেছি "সজাতীয় জীবন-সংগ্রাম।" পূর্ব্বোক্ত বিজাতীয় জীবন সংগ্রামের উদ্দেশ্য হ'চ্চে জীবের ব্যক্তিগত সত্তা-রক্ষা; সজাতীয় জীবন-সংগ্রামের উদ্দেশ্য হ'চ্চে জীবের জাতিগত সত্তা-রক্ষা। জাতিগত সত্তারক্ষা আর কিছু না— পুরুষানুক্রমে যাহাতে যোগ্যতম সন্তানসন্ততির প্রবাহ চলিতে পারে তাহারই গোড়াপত্তন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রথম দফার ঐ যে বিজাতীয় জীবন-সংগ্রাম উহার প্রধান নেতা বা প্রবর্ত্তক কে? আর দ্বিতীয় দফার এই যে সজাতীয় জীবন সংগ্রাম ইহারই বা প্রধান নেতা কে? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, বিজাতীয় সংগ্রামের প্রধান নেতা যে ক্রোধ এবং সজাতীয় সংগ্রামের প্রধান নেতা যে কন্দর্পদেব, ইহা বলা বাহুল্য; কেননা সকলেরই তাহা জানা কথা। এখন বক্তব্য এই যে মনুষ্যের নীচের ধাপের জীবরাজ্যে জীবন-সংগ্রাম চালাইবার ঐ যে দুই প্রধান অধিনায়ক—কাম এবং ক্রোধ—ও দুই ধনুর্দ্ধর রজোগুণের ডা'ন হাত বাঁ হাত। এই জন্য ডারুইনের ঐ মোট মন্তব্য কথাটি আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিলে ফলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, রজোগুণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। তা'র সাক্ষী—পুরাণাদির অনেকানেক স্থানে এইরূপ একটি কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সংহারকর্ত্তা মহাদেব তমোগুণ মূর্ত্তিমান্, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু সত্ত্বগুণ মূর্ত্তিমান্, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রজোগুণ মূর্ত্তিমান্। ডারুইনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের কথার কোন্খানটিতে ঐক্য তাহা সংক্ষেপে দেখাইলাম; কোন্খানটিতে অনৈক্য তাহাও সংক্ষেপে দেখাইতেছি প্রণিধান কর।

ডারুইনের এই যে একটি কথা Struggle for existence সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি, এ কথার ভিতরে আর একটি কথা প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সে কথাটি কিন্তু প্রকৃতির পর্দার আড়ালের কথা, আর, সেই জন্য ডারুইন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে পথের পন্থী, সে পথে অন্তঃপুরবাসিনী মর্ম্ম-কথাটি মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া জনতা'র মধ্যে দণ্ডায়মান হইতে নিতান্তই পরাঙ্মুখ। এ বিষয়ে বেশী বাক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। যেহেতু হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞানের যে কিরূপ দশা হয়, আমাদের দেশের সাধারণ-শ্রেণীর লোকেরা—বিশেষত, প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা খুবই বোঝেন।

ডারুইনের কোনো শিষ্যানুশিষ্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "তুমি বলিতেছ যে, জীবজগতে সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি হয় অনবরত,—কেন এরূপ হয়?—উহার ভিতরের কথা কি?" তবে সে প্রশ্নের একটা সদুত্তর প্রদান করা তাঁহার কর্ম্ম নহে—যেহেতু ডারুইন সে বিষয়ে মূলেই কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। আমরা কিন্তু ত্রিগুণ-তত্ত্বের চাবি দিয়া প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ঐ নিগূঢ় রহস্যটির কতকটা সন্ধান পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, সমুদ্রের তরঙ্গচাপল্যের নীচের স্তরে যেমন গভীর জলের অটল শান্তি চাপা দেওয়া রহিয়াছে, তেমনি সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তির মূলে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে; আমরা দেখিয়াছি যে, "আমি ভূতকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি" এ বৃত্তান্তটি আমার নিকটে অপ্রকাশ নাই; আর, আমার সত্তার এই যে প্রকাশ ইহা আমার আনন্দের বিষয়; তেমনি আবার, ভূতকাল হইতে বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি বর্ত্তমান কালে আমার আনন্দের বিষয় বলিয়াই আমি ভবিষ্যৎ কালে বর্ত্তিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ আমার শুধু একলার নহে পরন্তু জীবমাত্রেরই পৈত্রিক সম্পত্তি। এটাও আমরা দেখিয়াছি যে, জীবের মধ্যে যেমন সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাধীন আনন্দ রহিয়াছে, তেমনি সেই প্রকাশ এবং আনন্দের বাধাও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে এই যে, আনন্দের বাধানুভূতি যদিচ আনন্দানুভবের বিপরীত পক্ষ তথাপি আনন্দের বাধানুভূতি অনুভবকর্ত্তার অন্তর্নিগূঢ় বীজভাবাপন্ন আনন্দের পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করে না। একজন ক্ষুধার্ত্ত পথিক যতক্ষণ পর্য্যন্ত পান্থশালায় প্রবেশ করিয়া আপনার ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে প্রকৃতিস্থ হয় না অথবা যাহা একই কথা—ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শরীরে স্বাস্থ্য থাকে না। তবেই হইতেছে যে, ক্ষুধার জ্বালা শারীরিক স্বাস্থ্যের বিপরীত পক্ষ, এমন কি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি ক্ষুধার

জ্বালাতেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়। ক্ষুধার জ্বালা যদিচ এইরূপ স্বাস্থ্যের বিপরীত পক্ষ, তথাপি এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ক্ষুধার তীব্রতা শারীরিক স্বাস্থ্যের একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ, পক্ষান্তরে ক্ষুধামান্দ্য মস্ত একটি রোগের লক্ষণ। এই সঙ্গে এটাও দ্রষ্টব্য যে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হয়, আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের প্রতি সে ব্যক্তির মূলেই লক্ষ্য থাকে না—পরন্তু কতক্ষণে অন্নব্যঞ্জনাদি তাহার তৃষিত নয়নের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে এই ভাবনাটিই তাহার মনোরাজ্যে একাধিপত্য করে। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি জীবেরা যখন আপনাদের অন্তর্নিগূঢ় আনন্দের বাধাপনয়ন-চেষ্টায় প্রাণপণে ব্যাপৃত হয়, তখন সেই বাধার অনুভূতিই তাহাদের সংগ্রামকার্য্যের একমাত্র নেতা হয়, তা বই, সেই বাধানুভূতির মূলে যে সত্তাঘটিত আনন্দের আস্বাদ অবিচ্ছেদে লাগিয়া রহিয়াছে তাহার প্রতি তাহাদের মূলেই লক্ষ্য থাকে না। অতঃপর আমি বলিতে চাই এই যে, এক ব্যক্তি সহস্ররোগী হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নাড়ীতে প্রাণ ধুক্ ধুক্ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার রোগের অন্তস্তলে স্বাস্থ্য কোনো-না-কোনো পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা স্বাস্থ্যের ঐকান্তিক অভাবের নামই মৃত্যু। কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না যে, রোগ-যন্ত্রণার অন্তর্নিগূঢ় স্বাস্থ্যকে তাহার নিভৃত গুহার মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া কাজে খাটানো রোগীর তো অধিকারায়ত্ত নহেই, তা'ছাড়া, তাহা চিকিৎসকেরও অধিকারায়ত্ত নহে। এই জন্য সুচিকিৎসকেরা আপনাদের ব্যবসায়ের লাঘব স্বীকার করিয়া এ কথা বলিতে একটুও সংকুচিত হ'ন না যে, ধরিতে গেলে প্রকৃতিই রোগের প্রতিবিধানকর্ত্রী, তাঁহারা কেবল উপলক্ষ মাত্র। তা বলিয়া চিকিৎসকের সাধু-প্রকৃতির পরিচায়ক ঐ সত্য-বচনটিতে মুগ্ধ হইয়া রোগী ব্যক্তি যেন এরূপ মনে না করেন যে, ঔষধ-পথ্যের সেবনে তবে আর প্রয়োজন নাই—রোগ আপনা-আপনিই ভাল হইয়া যাইবে। চিকিৎসকের ঐ সার-কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সুচিকিৎসার অনুষ্ঠান দ্বারা স্বাস্থ্যের অভিব্যক্তিপথের বাধা অপনয়ন করা খুবই আবশ্যক—বাধা অপনীত হইলে স্বাস্থ্য প্রকৃতির প্রেরণায় আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে—তা বই তাহাকে সাধ্যসাধনা করিয়া লইয়া আসিতে হইবে না। এই উপমাটির প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া একটু মনোযোগের সহিত প্রণিধান করিয়া দেখিলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সত্তা-রক্ষার জন্য মহা একটা ধস্তাধস্তি ব্যাপার' যাহা ডারুইন্ জীবজগতের পুরাতন কাহিনীর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে আলোকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা কথাটা আর কিছু না—কেবল সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা অপসারণের চেষ্টা মাত্র। যে জীব আপনার সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা-অপসারণে যে পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়, সেই জীবের অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে প্রকাশ এবং আনন্দ আপনা হইতে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে—তাহার জন্য দ্বিতীয় কোনো-প্রকার ধস্তাধস্তির প্রয়োজন হয় না। এ যাহা বলিলাম এ তো খুব সোজা কথা; কিন্তু তাহা সোজা কথা হইলেও তাহার আশুফলদর্শিতা পাকচক্রময় বাঁকা কথা অপেক্ষা বেশী বই কম নহে। পৃথিবীপথের যাত্রীদিগকে নদ নদী পর্ব্বত প্রভৃতি নানাপ্রকার পথের বাধার পাশ কাটাইয়া অনেক বার অনেক দিকে ঘোরফের করিয়া প্যাঁচাও পথ দিয়া গম্যস্থানে উপনীত হইতে হয়—এ যেমন একদিকে, আর একদিকে তেমনি আকাশপথের যাত্রীরা নবাবিষ্কৃত বিমানে ভর করিয়া সোজা পথ দিয়া অবলীলাক্রমে গম্যস্থানে উপনীত হ'ন, ইহা সংবাদপত্রের পাঠকদিগের কাহারো অবিদিত নাই। আমরা তেমনি আমাদের ঐ সোজা কথাটিতে ভর করিয়া সোজা পথ দিয়া অতীব একটি গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। সে সিদ্ধান্ত এই যে, রজোগুণপ্রধান নীচের শ্রেণীর জীবেরা যখন সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা অতিক্রমণ করিতে করিতে মনুষ্যত্বের উচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়, তখন সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দ যাহা সর্ব্বপ্রথমে জড়রাজ্যে বীজভাবে অন্তর্নিগূঢ় ছিল এবং তাহার পরে যাহা অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত-ভাবে জীবরাজ্যের তলে তলে জানান্ দিতেছিল, তাহা প্রকৃতির প্রেরণায় আপনা হইতেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তা বই, তাহাকে সাধ্যসাধনা করিয়া লইয়া আসিতে

হয় না। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে—সেটাও বিবেচ্য। সে কথা এই যে, ডারুইন্ কেবল জীবদিগের বহিঃক্ষেত্রের জীবন-সংগ্রামের প্রতিই ষোলো আনা মাত্রা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন;—ভালই করিয়াছিলেন—কেননা তাঁহার লক্ষ্যসাধনে তিনি ঐরূপ একাগ্রতার সহিত উঠিয়া-পড়িয়া না লাগিলে তাঁহার হাতের কাজ তিনি অমনতর পাকাপোক্তরূপে সুনিষ্পন্ন করিতে পারিতেন না। কিন্তু ডারুইনের লক্ষ্যবিষয় হইতে আমাদের লক্ষ্যবিষয় যে অংশে ভিন্ন সে অংশে আমরা আরেক পথের পন্থী—এ পথ হ'চ্চে মনুষ্যের অন্তর্জগতের পর্য্যালোচনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডারুইন বহির্জগতের ক্রমবিকাশের মূলে যেরূপ রাজসিক কুরুক্ষেত্রকাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন—মনুষ্যের অন্তর্জগতে আমরা অবিকল তাহারই আর এক পৃষ্ঠা দেখিতে পাইতেছি; প্রভেদ কেবল এই যে, ডারুইনের হস্তের সাধনীযন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ অনুমান এবং বাহ্য পরীক্ষা; আমাদের হস্তের সাধনীযন্ত্র স্বানুভূতি, মহচ্চরিতের আলোচনা এবং আত্মপরীক্ষা। জীবেরা যেমন তাহাদের বহিঃক্ষেত্রের বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে মনুষ্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; মনুষ্যের অন্তর্জগতে তেমনি রিপুগণের সহিত কঠোর সংগ্রামের পথের মধ্য দিয়াই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি হয়; আর, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যাওয়ার নামই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি। মনুষ্য কিন্তু পশ্বাদি জন্তুদিগের ন্যায় শুধুই কেবল সত্ত্বগুণের বাধামাত্র অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, পরন্তু সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণের যে দুইটি প্রধান অন্তরঙ্গ, প্রকাশ এবং আনন্দ, তাহাও অন্তঃকরণে উপলব্ধি করে। মনুষ্য তাহার পশ্চাৎপদের ভর আপনার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের উপরে স্থাপন করে, এবং অগ্রপদের ভর সেই প্রকাশ এবং আনন্দের বাধানুভূতির উপরে স্থাপন করে—এইরূপে অগ্র-পশ্চাতের মধ্যে যোগ রক্ষা করিয়া রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। নিপুণ সেনাপতি যেমন পিছনের যে পথ দিয়া নূতন বলের সমাগম হইবে সে পথের আদ্যোপান্তে বিধিমতে পাহারা স্থাপন করিয়া তাহার আটঘাট আগ্‌লিয়া রাখেন—সাধক তেমনি যখন আত্মপ্রভাবের প্রকটন দ্বারা রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন পিছনের যে পথ দিয়া দেবপ্রসাদের সমাগম হইবে সে পথ বিধিমতে আগ্‌লিয়া রাখেন—অর্থাৎ রিপুগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া যাহাতে রিপুগণের কুস্বভাবের ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত না হ'ন, সে বিষয়ে বিধিমতে সাবধান হ'ন। চৈতন্য মহাপ্রভু যদি জগাই-মাধাইএর উদ্দীপ্ত ক্রোধানলকে ক্রোধ দ্বারা জয় করিতে যাইতেন, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় জগাই-মাধাই হইতেন—তাহা না করিয়া তিনি প্রেম দ্বারা ক্রোধকে জয় করিলেন। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, অগ্নি দ্বারা অগ্নিকে নির্ব্বাণ করা যায় না—অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে হইলে জলের প্রয়োজন। এই জন্য রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সময় রাজসিক উৎসাহ এবং উদ্যমের সঙ্গে সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দের যোগ রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক—আত্মপ্রভাবের সহিত দেবপ্রসাদের যোগ রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক—তা নহিলে সাধকের জয়লাভের চেষ্টা চরম সাফল্যে পৌঁছিতে পরাভব মানিয়া মাঝপথে গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া ভূতলে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অন্তর্জগতের রিপুগণের উপরে বিহিত বিধানে জয়লাভ করিলে সাধকের অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের ফোয়ারা কিরূপে আপনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া যায় তাহার যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে তাহার দুইটি সেরা দৃষ্টান্ত জগতে সুপ্রসিদ্ধ—তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই দেখিতে পারো। বোধিবৃক্ষের তলে বুদ্ধদেব প্রশান্তভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন মারের শতসহস্র দলবলের উপরে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের ফোয়ারা কেমন স্বর্গীয় ভাবে উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহার আর কতিপয় শতাব্দী পরে ঈসা মহাপ্রভু যখন বিজনপ্রান্তরে সয়তানের উপরে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বরের প্রসাদ তাঁহার মস্তকের উপরে অবতীর্ণ হইয়া কেমন আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার সমস্ত দুঃখ ক্লেশ মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্তিসাগরে

ডুবাইয়া দিয়াছিল—ইহা পৃথিবীসুদ্ধ লোকেরই জানা কথা।

ডারুইনের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মন্তব্য কথার ঐক্য কোন্‌স্থানটিতে তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি; জীবজগতে রজোগুণের প্রবর্ত্তিত জীবনসংগ্রাম জীবের ক্রমোন্নতিপথ উন্মুক্ত করিয়া দ্যায়—এ কথাটি ডারুইন্‌ও বলেন, আমরাও বলি; তা ছাড়া আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একেবাক্যে বলে যে, রজোগুণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। কিন্তু আমাদের ন্যায় ডারুইন এ কথা বলেন না যে, সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তির মূলে যে বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দ অন্তর্নিগূঢ় রহিয়াছে তাহার বাধা অপনীত হইলেই তাহা আপনা হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; তা ছাড়া, ইহার পরে তাহা যখন আর কতিপয় শতাব্দী ধরিয়া মনুষ্যের অন্তর্নিহিত পাশব প্রকৃতির সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া তাহাদের উপরে রীতিমত জয়লাভ করিবে, তখন তাহা আরো জাজ্বল্যতররূপে ফুটিয়া বাহির হইবে—তখন মনুষ্যসমাজে সকলেই সকলের দুঃখমোচনের জন্য আগ্রহান্বিত হইবে; সুবিবাহিত নর-নারীরা যথোপযুক্ত বয়সে মনুষ্যের মতো মনুষ্যের বংশ পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত করিবে; ডারুইনের মতানুযায়ী ধস্তাধস্তির পরিবর্ত্তে পৃথিবীর মনুষ্যজাতির আপাদমস্তক জুড়িয়া প্রেম এবং সদ্ভাব বিরাজ করিতে থাকিবে; এক কথায়—মনুষ্য প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য হইবে। এইখানটিতে আমাদের মতের সহিত ডারুইনের মতের মিল হয় কি না সন্দেহ—মিল না হইবারই বেশী সম্ভাবনা। আজ আমি যাহা বলিলাম তাহার মূলমন্ত্র হচ্চে উপনিষদের এই বচনটি—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" সাধক অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন। ইহার ভাবার্থ এই যে জীব অবিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ যেমন ডারুইনের অভিপ্রেত সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি সেইরূপ ধস্তাধস্তি দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি-পথের বাধা অপসারণ করেন; তাহার পরে এক প্রকার দিব্যজ্ঞান-গর্ত্তা বিদ্যা অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তিপথের বাধা আত্মপ্রভাবের বলে অপনীত হইলে ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধ অশেখা বিদ্যা, যাহার আরেক নাম বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং *বিমল আনন্দ তাহা,* অন্তর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া জীবকে অমৃতে অভিষিক্ত করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘুম-হারা

তুমি আমায় বক্‌ছ কেন মা,
আজ্‌কে আমার ঘুম যে আস্‌ছে না —
ঘুমাই কেমন করে'?
কি সব কথা মনে যে মা আসে,
—এই খানেতে বাবা শু'তেন পাশে
গলাটি মোর ধরে'।
আচ্ছা, মা — ঐ কালো ঘোড়ায় চড়ে'
কোথায় গেলেন? যদি মা যান পড়ে'—
ঘোড়া যে বজ্জাত!
বল্‌না মাগো — কস্‌নে কেন কথা?
খেলেন কোথায়, শুলেন তিনি কোথা,—
এখন যে মা রাত!

মা, মনে-মনে—
(বাহির দোরে কে ঠেলে ঐ আগল?
এরি মধ্যে ফিরে' আস্‌বে?—পাগল!)
—বক্‌তে আমি পারি না রাত-ভোর,
পোড়া চোখে ঘুম কেন নাই তোর?

আচ্ছা, মা—ঘুম কোথায় থেকে আসে?
দিনে বুঝি লুকিয়ে থাকে মা সে—
কোথায় ঘুমের বাড়ী?
সবাই রাতে ঘুমায়—ঘুম ত মেলা!
কাদের সঙ্গে তাদের মা আজ খেলা—
আমার বুঝি 'আড়ি'!
ঝিঁঝিদেরও 'আড়ি'—তাইতে ডাকে,
সারারাত মা জেগে তারা থাকে
শুধু বাজ্‌না বাজায়!

জোনাকপোকাও ঘুমায় না মা রাতে,
রোজ-ই বিয়ে হয় মা কাদের সাথে—

রোজ-ই আলো সাজায় ?

তোর সাথে আর বক্‌তে পারিনি—
পোড়া চোখে ঘুমের হ'লো কি ?

—তোবও মা আজ কি হয়েছে যেন !
রোজ কথা ক'স্—আজ্‌কে এমন কেন ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

আমার চীনপ্রবাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

টিয়েনসিন সহর চীন রাজধানী পিকিনের নিয়েই ধরা যাইতে পারে। সহরটী পিহো নদীর তীরে অবস্থিত। সহরের অপর পারে পর্ব্বতাকার লবণের স্তূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রাখা হইয়াছে। এই স্থান একটা বিখ্যাত লবণের আড়ত। এখানে টিয়েনসিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সামরিক বিদ্যালয় বর্ত্তমান। পেতসাই বা চীন কপি এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং চীনের অন্যান্য প্রদেশে সরবরাহ হইয়া থাকে। এই শাক চীনেরা চাউলের পরই প্রয়োজনীয় মনে করে, এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই সহরের চতুর্দ্দিক সুউচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহা চীনদেশের অদ্ভুত প্রাচীরের সমান উঁচু। এটা একটী বিখ্যাত বাণিজ্যস্থান। প্রত্যেক বিদেশীয়ের এখানে কনসেসন বা গণ্ডি আছে। শীতকালে যখন পিহো নদী জমিয়া যায় তখন স্লেজে (Sledge) বা বরফের উপর চলিবার গাড়ীতে চড়িয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ বেশ একটী আনন্দজনক খেলা, এবং অনেকেই ইহাতে যোগ দিয়া থাকে। ইহা এত দ্রুতবেগে চালিত হয় যে দ্রুতগামী ট্রাম গাড়ীকেও পরাজিত করে। চীনেরা একখানা লৌহশলাকাযুক্ত আঁকষী দ্বারা এই নৌকা অতি দ্রুতবেগে চালাইয়া থাকে। ইউরোপের কোন কোন স্থানে যেমন বল্গা-হরিণ দ্বারা স্লেজগাড়ী চালিত হয়, এখানে সেরূপ নয়। এই স্লেজ একখানি ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায়, আকারে দেখিতে রেলষ্টেসনে ছোট পার্শেল ইত্যাদি বহনোপযোগী কুলিদের হাতগাড়ীর মত। নিম্নদেশে দুইখানি লম্বা কাষ্ঠখণ্ডের সহিত দুইখানি লোহার পাত সমসূত্রপাতে লম্বভাবে আঁটা, তদ্দ্বারা বরফের উপর রেখা টানিয়া চলিয়া থাকে। পেছন দিকে একজন চীনাম্যান 'লগী' (আঁকষী) হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া বরফের উপর চলিবার উপযোগী এই নৌকা বাহিয়া লইয়া যায়। নৌকার সম্মুখভাগে পাশাপাশি দুই জন বা চারিজন লোক বসিতে পারে।

চীনেদের বরফের ভিতর হইতে মাছ ধরিবার কৌশল দেখিলে অবাক হইতে হয়। এক স্থানে বরফ কাটিয়া একটী ক্ষুদ্র নালা প্রস্তুত করে। ১০।১৫ হাত দূরে বরফের মধ্যে একটা গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে একখানা আঁকষী প্রবেশ করাইয়া নিম্নস্থ জল সবেগে আলোড়িত করিতে থাকে। মৎস্যগুলি একে ত বরফ ঢাকা, শীতে অত্যন্ত নিস্তেজ, তাড়িত হইয়া কথিত কর্ত্তিত নালার দিকে বায়ু এবং আলো দেখিয়া ধাবিত হয়, এবং চীন-ধীবরেরা সেই সময়ে একখানা ছাঁকনি জাল দ্বারা মাছগুলি উঠাইয়া লয়। শীতের প্রারম্ভে যখনও জল জমিয়া বরফ হয় নাই, চীন-জেলেরা এক প্রকার চর্ম্মনির্ম্মিত তৈলাক্ত পোষাকে দেহ সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া জলে অবতরণ করিয়া মৎস্য ধরে। সেই সময় আমাদের যদি দশ মিনিট জল মধ্যে অবস্থান করিতে হয় তাহা হইলে শীতে আড়ষ্ট হইয়া এই পাঞ্চভৌতিক দেহের মায়া কাটাইতে হয়। টিয়েনসিনের জল বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ।

চীন জাতির সন্তান জন্মগ্রহণের সঙ্গেও ভারতবর্ষের ন্যায় কুসংস্কার গ্রথিত। সুপ্রসবের জন্য গর্ভবতী রমণীকে অগ্রে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ধারণ করিতে হয়। ধাত্রী প্রায়ই উপস্থিত থাকে। গৃহস্থ দরিদ্র না হইলে একমাস পূর্ব্বে ধাত্রী নিযুক্ত হয়। তাহারা প্রায়ই অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোক। প্রসববেদনা আরম্ভ হইলে সত্বর এবং সুপ্রসবের জন্য গৃহকর্ত্রী এবং ধাত্রী মিলিয়া গৃহ-দেবতার পূজা করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন সন্তান জন্মিবামাত্র গরম জলে ধোয়াইয়া দেওয়া হয়। প্রথম মাসে প্রসূতি প্রত্যেক খাদ্যের সঙ্গেই আদা এবং সির্কা খাইয়া থাকে।

পেচিলি উপসাগরের উপকূলে শান-হাই-ক্বান সহরে মহাপ্রাচীরের উপর বাঙ্গালীর প্রথম পদার্পণ। বামে শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়। মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। দক্ষিণে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়। পশ্চাতে মহাপ্রাচীরের উপর নির্ম্মিত প্রাচীর-রক্ষীর গম্বুজ দেখা যাইতেছে।

একমাসের মধ্যে কিম্বা মাসের মধ্যে শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া সন্তানের মস্তকমুণ্ডনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। পৈতৃক দেবতাকে পূজা করিয়া বলি প্রদত্ত হয়। ডিম লাল রংয়ে রঞ্জিত করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রেরিত হয়। পুত্রসন্তান কন্যাপেক্ষা সমধিক আদরণীয়। কন্যা-হত্যা অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। এই মহাপাপের শাস্তিবিষয়ে চীনের ফৌজদারী আইনে কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সময়ে সময়ে ধাত্রীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া অপর প্রসূতির নিকট হইতে কন্যা-সন্তানের পরিবর্ত্তে পুত্র-সন্তান অপহৃত করিয়া লওয়া হয়। পুত্রবিহীন ব্যক্তি আপনাকে নিতান্ত ভাগ্যহীন মনে করে। কারণ পিতৃ-পুরুষগণের কবরের নিকট পূজার জন্য পুত্রের একান্ত প্রয়োজন। তজ্জন্যই ভারতবাসীর ন্যায় চীনজাতি পুত্রবিহনে জগৎ অন্ধকার দেখে। চীনারা ১৬ বৎসরে সাবালগ হয়। পোষ্যপুত্র-গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। চীনারা পিতামাতাকে আজীবন ভক্তিশ্রদ্ধা করে, এবং মৃত্যুর পর পূজা করে। বহুসংখ্যক লোকে পূর্ব্বপুরুষের পূজাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। প্রত্যেক পরিবারে পিতার নিকট সন্তান প্রভৃতি সম্পূর্ণ বশ্যতাস্বীকার একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। বড় ছেলে পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু পরিবারস্থ

সকলে একত্রে বাস করে। একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা তথায় প্রচলিত।

কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে গৃহ-দেবতার উদ্দেশে কতকগুলি অনুষ্ঠান করা হয়। বিবাহে, যাত্রাকালে, কোন জিনিষ ক্রয় কালে এবং স্থান পরিবর্ত্তনেও ঐ দেবতার উদ্দেশে মাঙ্গল্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্জিকা দেখিয়া শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইসব কাজে ভারতবাসীর সহিত চীনাদের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পুরাকাল হইতে চীন জাতি ষষ্টি বৎসরের বর্ষচক্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। এইরূপ ষষ্টি সাম্বৎসরিক বর্ষবিভাগ পুরাকালে ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল।

স্বভাব-চিত্রাঙ্কনে চীনের চিত্রশিল্পীর অদ্ভুত ক্ষমতা। চিত্রাঙ্কনের কালি চীনকালি বলিয়া জগতে বিখ্যাত। ধর্ম্ম, প্রকৃতি, ইতিহাস এবং সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় ন্যূনাধিক পরিমাণে চীন চিত্রকরকে সাফল্য প্রদান করিয়াছে। তৃতীয় শতাব্দীতে বাঁশ এবং রেশমনির্ম্মিত জিনিষের উপর চিত্র অঙ্কিত হইত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাগজ আবিষ্কৃত হয়। ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত চিত্র বিদ্যাও যে চীনদেশে প্রবেশ করিয়া চীন চিত্রাঙ্কনের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। পিত্তলের উপর কারুকার্য্য পুরাকাল হইতে চীনদেশে চলিয়া আসিতেছে। এই শিল্প এমন কি শাং রাজবংশের সময়েও (পূঃ খৃঃ ১৭৮৩—১১৩৪) যে বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কুবলাইখাঁর সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক পিত্তল নির্ম্মিত যন্ত্র মানমন্দিরের জন্য (Observatory) সুচারু কারুকার্য্য সম্পন্ন করিয়া পিকিনে রাখা হয়। পিত্তলের উপর খাজ কাটিয়া তন্মধ্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য তার বসাইয়া অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পন্ন বস্তু তৈয়ারী হইয়া থাকে। পিত্তলের উপর গিল্টি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষ হইতে চীনে আনীত হয়। চীনেরা চিকণ সূচীকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এই কার্য্যে দক্ষ।

চীন জাতি শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। ইহারা জানু নত ও হাত জোড় করিয়া নমস্কার করে, অতিথি অভ্যাগতকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করে, অতিথিকে না বসাইয়া কখনই নিজে বসেনা। ইহাদিগের মধ্যে বামভাগে স্থানদান সম্মানের চিহ্ন। লম্বা নখ রাখা সম্ভ্রান্ত বংশের লক্ষণ, কারণ ইহা শারীরিক শ্রমসাধ্য কোন কাজ না করার পরিচায়ক। অতিথি কিম্বা পূজনীয় ব্যক্তির সম্মুখে চশ্‌মা ধারণ অশিষ্টতার লক্ষণ, বাস্তবিক যাহার চোখের দোষ আছে তাহার পক্ষেও ঐ সময়ে চশ্‌মা ব্যবহার নিষিদ্ধ। কোন বস্তু কাহাকেও দিতে কিম্বা গ্রহণ করিতে হইলে উভয় হস্ত ব্যবহার করা হয়। এটী বেশ সুন্দর নিয়ম। কাহারও সহিত দেখা করিতে গেলে চা দ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়, যেমন আমাদের মধ্যে পান তামাক দ্বারা অভ্যর্থনার নিয়ম আছে।

কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তরের উপর খোদাই কার্য্যে চীন জাতির ধৈর্য্য অসাধারণ, অধিকাংশ গৃহের কোন না কোন অংশ খোদাই কার্য্যে শোভিত। হস্তিদন্ত এবং চন্দন কাষ্ঠে খোদাই পশ্চিম বিভাগে হইয়া থাকে। এই চারুশিল্পে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিকে তাহারা পরাস্ত করিয়াছে। কোন চীন খোদাই কার্য্যের নীচে তারিখ কিম্বা নাম সহি না থাকাতে সময় নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নয়।

চীনজাতির পরিচ্ছদ ঢিলে পাজামা এবং ঢিলে অঙ্গরাখা বা কোর্ত্তা। স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদে বড় একটা প্রভেদ নাই। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূত্র নির্ম্মিত বা পশম-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হয়। প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীলোকেই ইয়াররিং বা মাকড়ি পরিয়া থাকে। স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কৃত্রিম নখ অঙ্গাভরণের মধ্যে গণ্য, এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাগণ ব্যবহার করেন। সাদা কাপড় পরিবার নিয়ম নাই। স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত থাকে। বাঙ্গালী জাতির স্ত্রীলোকের ন্যায় ইহাদের বে-আবরু কাপড় পরা নয়। আমার বোধ হয় পৃথিবীতে যত সুসভ্য জাতি আছে, বাঙ্গালীর স্ত্রী পুরুষের কাপড় পরার ন্যায় ক্ষণমাত্রে বে-আবরু হইবার ভয় আর কাহারও নাই।

পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় আর কোন জাতি দ্বারা এত অধিক পরিমাণে পাখা ব্যবহৃত হয় না। রাস্তায় চলিবার

চীনের মহাপ্রাচীর শান-হাই-কান প্রদেশের সুউচ্চ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া নির্ম্মিত।

সময়েও পাখা ব্যবহার সভ্যতার চিহ্ন। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ইহা সমভাবে সমাদৃত। চীনকে পুষ্পোদ্যান বলা হয়, অতএব ইহার অধিবাসীরা যে কুসুম-বিলাসী হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! কোন স্ত্রীলোকেই সুন্দর সৌরভময় ফুল দ্বারা কেশদাম সুশোভিত করিতে অবহেলা করে না, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত। চীনে মালি নানাবিধ সুদৃশ্য আকারে পুষ্পবৃক্ষকে পরিণত করে। মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ সকল আকারেই পুষ্পবৃক্ষকে সজ্জিত হইতে দেখা যায়। সুন্দর ফুল এবং স্বাস্থ্যপ্রদ গুণের জন্য সুং রাজবংশের সময়ে পোস্ত চাষ আরম্ভ হয়। প্রথমে ঔষধার্থে ইহার ব্যবহার ছিল। ভারতবর্ষ হইতেই ইহার প্রথম আমদানী হয়, এখন সেখানেই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

চীনের গাভী অধিকাংশই ধূসর বর্ণ এবং মহিষাকৃতি বা আমেরিকার বাইসনের ন্যায়। দুগ্ধ দোহনের নিয়ম নাই, বিদেশীয়েরা দুধ ব্যবহার করে বলিয়া কেহ কেহ এই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। এক এক কোয়ার্ট বোতল দুধ আমরা বিশ সেণ্ট (প্রায় দশ আনা) দিয়া ক্রয় করিতাম। মহিষ আছে, আকারে কিছু বড়। মহিষ, খচ্চর এবং গাধা দ্বারা হল চালিত হইয়া থাকে। দুই জাতীয় অতি সুন্দর কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। চা-কুকুর এবং আস্তিন-কুকুর, উভয়েরই আকৃতি ছোট, এবং জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমোক্ত কুকুর এক ফুট উচ্চ, এবং দুই ফুট লম্বা। শেষোক্তকে কোটের আস্তিনের মধ্যে করিয়া লইয়া যাওয়া যায় বলিয়া তাহার এবম্বিধ নাম হইয়াছে।

নানাবিধ সুদৃশ্য ও সুস্বর বিহঙ্গ চীন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। চাতক পক্ষী চীন জাতির অতি প্রিয়। এই পাখীর স্বর অতি সুমিষ্ট। এক একটা চারি পাঁচ ডলারে (১৪৷১৫ টাকা) বিক্রয় হয়। মঙ্গোলিয়ান চাতক এক একটী পঁচিশ ডলার (প্রায় ৮০৲ টাকা) পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে।

চীনেরা পেছনের দিকে লম্বা চুল রাখিয়া বেণী বন্ধন

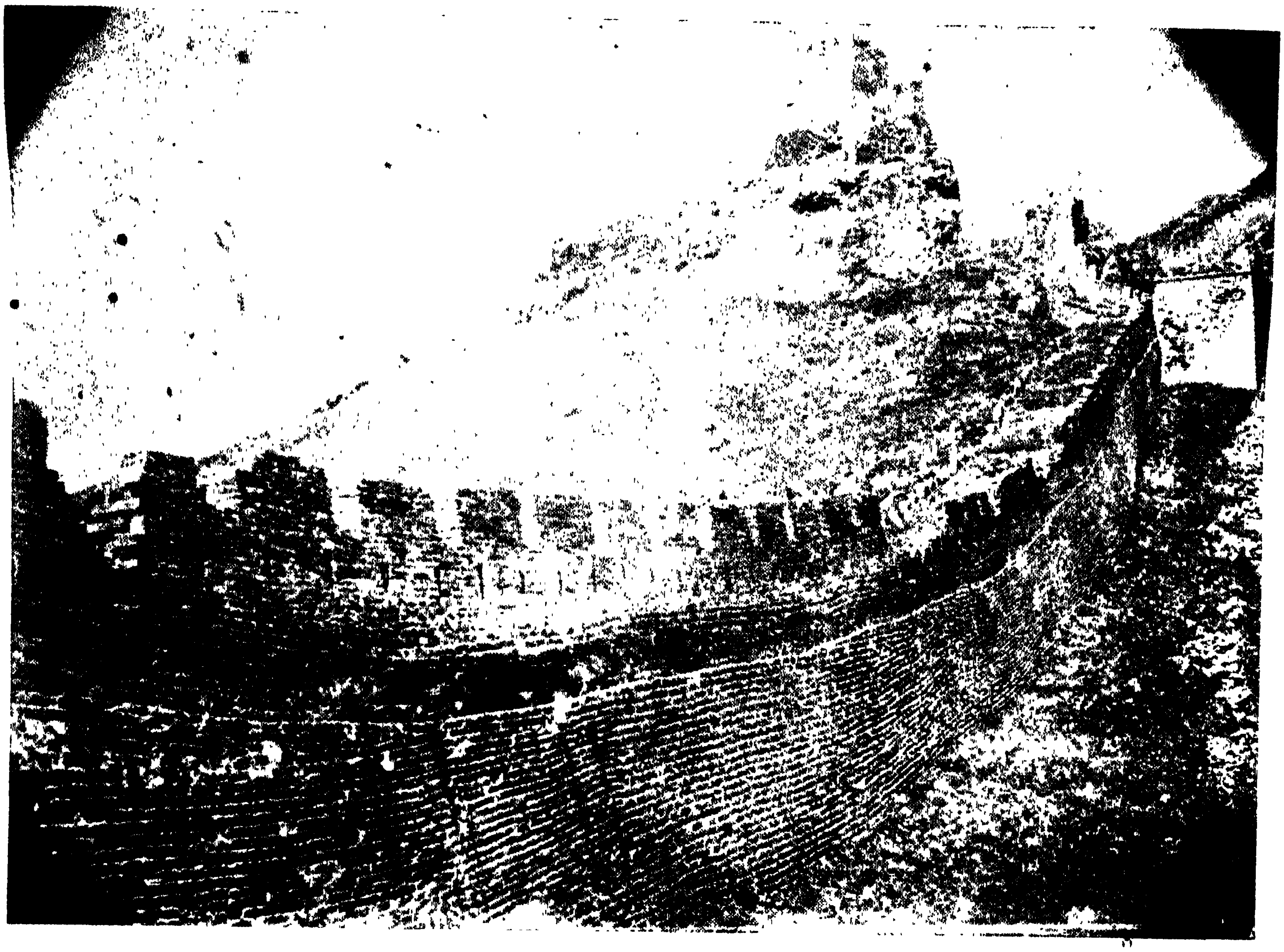

চীনের মহাপ্রাচীর—ক্ষেত্রে, খাদে ও পর্ব্বতে।

করে, কিন্তু সম্মুখভাগ উত্তমরূপে মুণ্ডিত করিয়া ফেলে। ৪০।৪৫ বৎসর না হইলে গোঁপ দাড়ী রাখিবার নিয়ম নাই। চীনজাতি লম্বা বেণী না রাখিলে আইনতঃ দণ্ডিত হইয়া থাকে। লাল বস্ত্র আহ্লাদের চিহ্ন বলিয়া বিবাহ এবং অন্যান্য আমোদজনক উৎসবে পরিহিত হয়। দস্তানা পরিবার নিয়ম নাই, কিন্তু হাতের আস্তিন এত লম্বা রাখা হয় যে শীতের সময়ে তাহাই দস্তানার কাজ করে। শিশুদিগকে পৃষ্ঠদেশে ঝোলার মধ্যে রাখিয়া বহন করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা প্রায়ই স্ত্রীলোক দ্বারা চালিত। ধুমপান-প্রথা স্ত্রীলোকের মধ্যেও প্রচলিত আছে। তামাকের ব্যবহার ১৫৩০ খৃঃ খ্রী পূজন হইতে চীনদেশে প্রচলিত হয়। মিং রাজবংশের সময়ে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলেও প্রায় সকলেই ইহা সেবন করে। শুক্না তামাক নলদ্বারা এবং হুকায় জল পূরিয়া ব্যবহারের নিয়ম আছে।

চীনদেশের অদ্ভুত বিশাল প্রাচীরের কথা ন্যূনাধিক সকলেই অবগত আছেন। ইহা পৃথিবীর সপ্তম অত্যাশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে একটা বিপুল কীর্ত্তি। দুর্দ্দান্ত তাতার জাতির আক্রমণ নিবারণ জন্য এই বৃহত্তম ব্যাপার প্রথম চীন-সম্রাট চিহোয়াংটি দ্বারা খ্রীষ্টাব্দের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত হয়। এই বিরাটদেহ প্রাচীর প্রস্তুত করিতে দশ সহস্র লোকের দশ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার খাড়াই পঁচিশ ফুট বা সাড়ে ষোল হাত, দৈর্ঘ্যে পনর শত মাইল, উহার উপরিভাগ এমন প্রশস্ত যে তদুপরি ছয় জন অশ্বারোহী পাশাপাশি হইয়া অনায়াসে যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে প্রাচীরগাত্র স্তম্ভদ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত। উক্ত স্তম্ভগুলি দ্বিতল ত্রিতল সমান উচ্চ, এবং সংখ্যায় প্রায় এক সহস্র। এক লক্ষ সৈন্য দ্বারা এই বিশালবপু প্রাচীর রক্ষিত হইত। ঐ প্রাচীরের কোন কোন অংশ উপত্যকা, দুর্গম কানন, গিরিশৃঙ্গ, নদী এবং সৈকতময় ভূমি ভেদ করিয়াও নির্ম্মিত হইয়াছে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। উহার বহির্ভাগ নীল বর্ণ ইষ্টকে

নির্ম্মিত এবং মধ্যভাগ মৃত্তিকাস্তূপে গঠিত। দুই সহস্র বৎসর গত হইল এই প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। কত বজ্রবৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহার বিলোপ সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন ইহার অবস্থা শোচনীয়। মিং রাজবংশের সময়ে এই দেয়ালের একবার সংস্কার হয়। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশ এবং মালাক্কাদ্বীপ হইতে উপঢৌকন লইয়া রাজদূতেরা চীনে আগমন করেন। এই বৃহত্তম প্রাচীর প্রস্তুত করিতে যে মালমসলা লাগিয়াছিল তাহাতে পৃথিবীর বিশাল পরিধিকেও বেষ্টন করিতে পারা যায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যে ইষ্টক দ্বারা এই প্রাচীর গ্রথিত তাহার দৈর্ঘ্য পনর ইঞ্চি, চারি ইঞ্চি স্থূল, এবং সাড়ে সাত ইঞ্চি প্রস্থ। শানহাই-কোয়ানের সন্নিকট পিচিলি উপসাগরের তীর হইতে এই প্রাচীর আরম্ভ হইয়াছে। আমরা প্রত্যহই এই প্রাচীরের উপর বেড়াইতে যাইতাম এবং কীর্ত্তি চিরস্থায়ী ভাবিয়া অবাক হইয়া ইহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ রায়।

স্থললিতা

(একটি বিধবা বালিকার প্রতি।)

১

অপরাজিতার সম ছিলি মনোহরা,
ফুলে ফুলে ভরা।
শারদী শেফালী সম একরাশি ফুলে
মুকুলে মুকুলে,
ছিলি তুই ভরপুর অপূর্ব্ব সৌরভে,
অপূর্ব্ব গৌরবে।
বসোরা গোলাপ সম ফুল্ল বিকশিতা
ভ্রমর-ঝঙ্কৃতা,
ছিলি তুই অনিন্দিতা, প্রকৃতি-দুহিতা!
অয়ি স্থললিতা!

২

রজনীগন্ধার মত উল্লাস আকুলা,
ছিলি রে অতুলা।
কদম্বকেশর সম পূর্ণ-পুলকিতা
সদা-উচ্ছ্বসিতা!
হাস্নুহানার মত সৌরভ-ঝরণা
ছিলি অতুলনা;
কুঞ্জ-কুরঙ্গীর মত লাবণ্যে অজিতা,
সদা উল্লসিতা;
ছিলি তুই অনিন্দিতা কুন্দবিনিন্দিতা,
অয়ি স্থললিতা।

৩

সহসা উঠিল ঝড়,—বিক্লবা, বিবশা,
একি তোর দশা।
স্বর্ণ-প্রজাপতি কেন বসে না অলকে,—
যূথিকা-কোরকে?
বারাণসী চেলী কেন ঝলকে ঝলকে
আর না চমকে?
যেন কোন হঠযোগী কপট কৌশলে,
ক্রূর মায়া বলে,
উচ্চারিল মায়ামন্ত্র,—নলিনী মধুরা
হইল ধূস্তরা!

৪

ঊষাকালে রাহু যেন রুষি মহারোষে,
আনিল প্রদোষে!
বৃষ্টিপাতে কড়্ কড়্ করকা-আঘাতে,
বৈশাখী ঝঞ্ঝাতে!
খসিল আমের বোল—একি গণ্ডগোল!
একি হাহা রোল?
কোথা হতে একরাশি পঙ্গপাল আসি,
সব দিল নাশি!
অকালবৈধব্য এল! হইলি, মোহিনি,
যৌবনে যোগিনী!

৫

ধূ ধূ ধূ ধূ বালি শুধু—নাহি জলধারা,
কি ঘোর সাহারা?
নিরাশার পারাবার তরঙ্গ-আকুল,
নাহি বুঝি কূল?

বার মাস, বার মাস বহে অবিরল
তপ্ত আঁখিজল!
কি মেঘান্ধ অমানিশা! একটি তারকা
নাহি যায় দেখা।
আশার জোনাকিপাতি তাও নাহি জ্বলে
এ গগন-তলে!

৬

তবে কি এমনি তোর চিরদিন যাবে?
রাতি না পোহাবে?
এ কুসুমে করিবারে সফলা সরসা
নাহি কি বরষা?
আধা-আঁকা এই ছবি পূর্ণ করিবারে
কে কৌশলী পারে?
আর কি রে আসিবে না বাসন্ত জোয়ার?
কুসুমসম্ভার?
শ্মশান হয়েছে হিয়া! এ শ্মশানে বাস
তোর বার মাস!

৭

শোন্ লো আশার কথা, এ ক্ষত অক্ষয়
নয় নয় নয়।
ইহারও ঔষধি আছে, অপূর্ব্ব লেপনী
বিশল্যকরণী।
প্রাণ জুড়াইয়া যায় করিলে লেপন
এ শ্বেত চন্দন।
ধূ ধূ ধূ ধূ মরুতেও, বুদ্‌বুদিয়া উঠে,
এ ফোয়ারা ছোটে!
কবির আশ্বাসবাণী, কল্পনা কাহিনী
নয় লো নন্দিনি!

৮

নীরব লো তোর কানে সুখ-সাধ-আশা—
প্রণয়ের ভাষা।
তাই যদি হইয়াছে; বাসনা-বালাই
পুড়ে হোক্ ছাই—
জগতের সুখ-সাধ অপূর্ণ অলীক,
সকলি বেঠিক্!
শ্মশানেরে সত্য বলি বুঝেছে যে ঠিক্
সেই সে রসিক!
কর্, তবে, কর্ ধনি, ত্যজিয়া বাসনা,
শ্মশান-রচনা!

৯

সেই সে শ্মশানে বসি, কর্ মহাধ্যান,
মুদিয়া নয়ান।
হইলে ইন্দ্রিয় জয়, হবি বিজয়িনী,
শ্মশান-বাসিনি!
বম্ বম্ হর হর—হর হর রবে,
উৎকট উৎসবে,
দিবে দেখা নৃত্যকালী! তাধিয়া তাধিয়া,
নাচিয়া নাচিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া, তোরে নিবে নিজ কোলে,
আনন্দের দোলে!

১০

সে শুভ মুহূর্ত্তে দেবী, সে মাহেন্দ্রক্ষণে,
নব জাগরণে,
জাগিয়া হেরিবি তুই—মাতিয়াছে সবে
বাসন্ত উৎসবে!
সারাবিশ্ব দুলিতেছে আনন্দের দোলে,
মহাকালী-কোলে।
তখন আবার তুই সীমন্তে মধুর,
ধরিস্ সিন্দুর,
অনিন্দিতা, আনিন্দিতা, ভুবনে বন্দিতা,
অয়ি সুললিতা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মেঘমালার দেশ

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া পাঠক পাঠিকাগণ আপনারা ভাবিবেন না যে আমি দ্বিতীয় কলম্বসের ন্যায় কোনও এক অজানা দেশের অপূর্ব্ব কাহিনী বর্ণনা করিতে বসিয়াছি। আপনাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল যে আমাদেরই এই বাংলাদেশের অতি সন্নিকটেই এই

সিকিমের সওদাগর।

একটি নেপালী রমণী কুলি।

লামা ভিক্ষুক।

দেশ অবস্থিত। আজ আমি পর্ব্বতের রাজা হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ শৈলনিবাস দার্জিলিং সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। দার্জিলিং-এর কথা নূতন করিয়া বলিতে পারিব এরূপ ভরসা আমার নাই, তবে প্রথম দর্শকের চক্ষে হিমাচলের মহান্ সৌন্দর্য্য কিরূপ ঠেকিয়াছিল এবং তৎ-সংলগ্ন অন্যান্য কথা কাহারও না কাহারও চিত্তবিনোদন করিতে পারে, এই মাত্র ভরসা।

পথের কথা বিশেষ করিয়া কাহাকেও বলিতে হইবে

তিব্বতী বণিক ও তাহার স্ত্রী।

শিশু ক্রোড়ে ভুটিয়ানী।

দুজন লেপচা।

একজন ভুটিয়া কুলি।

ঘুমের বামন।

ঘুমের ডাইনী।

না। শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে দ্রুতগামী মেল ট্রেনে আজ কাল যাত্রিগণ ঝড়ের বেগে পক্ষাধিক কালের পথ কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির এই লীলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছেন। আর সে পথের কষ্ট নাই, এবং পূর্ব্বে যেরূপ লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ ব্যতীত আর সকলের পক্ষে

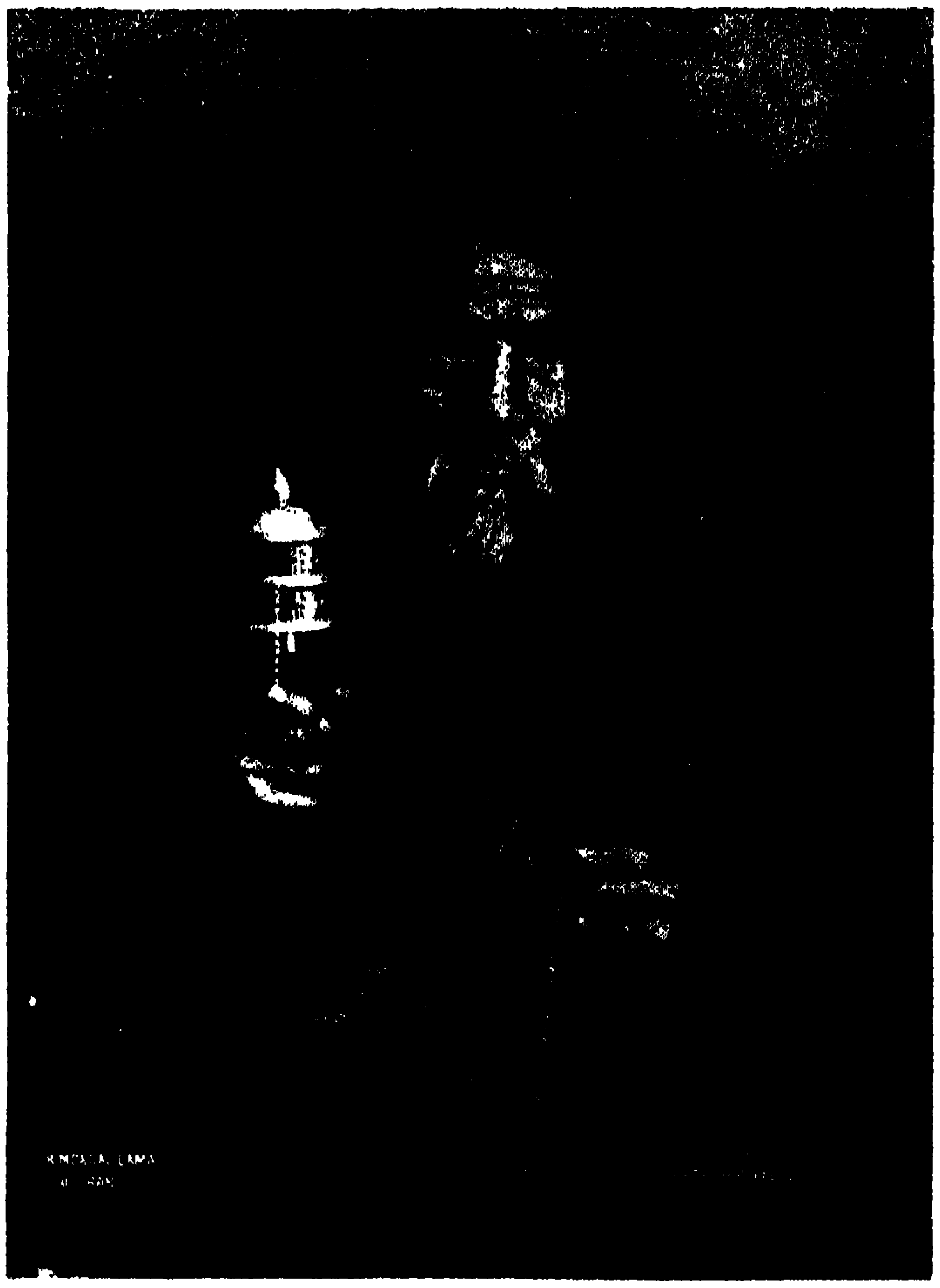

মোঙ্গোলজাতীয় লামা।

স্ত্রীকুলি।

নেপালী স্ত্রীলোক ও পুরুষ।　　একটি ভুটিয়া নারী এবং তিনজন গর্ভিনবতী।　　দুইজন নেপালী কুলি।

এদেশ দুর্গম ছিল সে ভাবও আর নাই; এখন যে-কেহ স্বল্প ব্যয়েই এখানে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়া যাইতে পারেন।

একটি ভুটিয়া স্ত্রীলোক।

সে আজ কিছুদিনের কথা; প্রখরতপন-তাপে-তাপিত, ধূলিধূসরিত কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিয়া আমরা শরতের এক মধুর অপরাহ্নে গিরিসন্দর্শনে বাহির হইয়া পড়িলাম। বৃহৎ এক অজগর সর্পের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুতগামী দারজিলিং মেল ট্রেনখানি হুস্ হুস্ শব্দে দুইপাশের গ্রামগুলিকে মুখর করিয়া বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে আপন শ্যামল অঞ্চলখানি বিছাইয়া আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে গ্রাম্য শোভাগুলি যেন মুছিয়া দিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় কল্লোলময়ী পদ্মা পার হইয়া পরপারে সারাঘাটে উপস্থিত হইলাম। সারাঘাট হইতে ঘুমাইবার জন্য sleeping car দেওয়া হয়। সকলে যে যাহার স্থান ঠিক করিয়া লইয়া আহারাদি শেষ করিয়া লইলাম। রাত্রি অর্দ্ধতন্দ্রা অর্দ্ধঘুমে কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইতেছে। প্রভাত-গগনের কি সুন্দর শোভা! দূরে তিস্তা উপত্যকা ও তাহার পর শৈলশ্রেণী ঠিক একখানি ছবির মত দেখাইতেছিল। ঠিক যেন নয়ন সমক্ষে কে একখানি মানচিত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছে!

শিলিগুড়ি হইতেই দারজিলিং শৈল আরোহণ আরম্ভ। ছোট ছোট গাড়ী ও ইঞ্জিনগুলি দেখিয়া বড়ই হাসি পাইল। এই গাড়ীগুলিই নাকি আবার আমাদের সাত হাজার ফুট

কাঞ্চনজঙ্ঘা।

উচ্চ পর্ব্বতশিখরে পৌঁছাইয়া দিবে! কিছুক্ষণ পরেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ক্ষুদ্র ট্রেনখানি আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিল। বাস্তবিকই এই পার্ব্বত্য রেল লাইনটি স্থাপত্য বিদ্যার গৌরবের নিদর্শন।

গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটের ন্যায় আমাদের নয়ন সমক্ষে একের পর আর একটি জীবন্ত ছবি প্রকৃতিরাণী যেন খুলিয়া ধরিতে লাগিলেন। আমরা যেন এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে একটি ভ্রাম্যমান্ চিত্র অমরাবতীর সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়া চলিল।

মহানদীর সেতু পার হইয়া গাড়ী শুক্‌না ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। এইখানে অরণ্যানীর কি শোভা! যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল বৃক্ষের পর বৃক্ষ, পুষ্পলতায় মণ্ডিত ও শৈবালে আবৃত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; ঝিল্লীরব, বিবিধ পক্ষীর কূজন ও কলনাদী মহানদীর কুলু কুলু ধ্বনিতে নিবিড় অরণ্য ক্ষণে ক্ষণে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, —ইহা ব্যতীত আর কোনও শব্দ নাই।

আমরা ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিলাম। পাঁচকিল অতিক্রম করিবার কিছু পরে আমরা প্রথম loopএ (চক্রে) উপস্থিত হইলাম। 'লুপ্' একটি ফাঁসের মত, পর্ব্বতগাত্র বিদীর্ণ করিয়া প্রসারিত; যেখানে পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া লাইন লইয়া যাইতে হইলে অনেক ঘুর হয় সেইখানেই 'লুপ' তৈয়ারী করিয়া অল্প আয়াসেই গাড়ীখানির উর্দ্ধে উঠিবার পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম লুপ পার হইবার পর পথে রংটং ষ্টেসন পড়ে; এইখানে গাড়ী জল লইবার জন্য কিছুক্ষণ থামে। লুপ ব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যে পর্ব্বত আরোহণের জন্য আর একটি কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাকে 'জিগ্‌জ্যাগ্' (zig-zag) বলে; এইরূপ স্থলে গাড়ীগুলি প্রথমতঃ অগ্রসর হইয়া পুনরায় পশ্চাদ্‌পদ হয় ও ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর রাস্তা অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে থাকে।

ক্রমে আরও দুইটি লুপ্ বেষ্টন করিয়া আমরা তিন-ধারিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিলাম; পথে ভুটান রাজ্যের গিরিশ্রেণী, শস্যশ্যামলা তিস্তা উপত্যকা ও রজতরেখা তিস্তা দেখিতে দেখিতে আসিলাম। ট্রেন হইতে তিস্তার দৃশ্য কি সুন্দর! যেন একটি বৃহৎ অজগর সর্প অরণ্যানীর মধ্য দিয়া আঁকিয়া

কাঞ্চনজঙ্ঘা।

থাকিয়া চলিয়াছে। তিনধারিয়া ছাড়িলে আমরা চতুর্থ লুপে উপস্থিত হইলাম, এই লুপটি বৃহত্তম ও এইখান হইতে শিটং পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরই গয়াবাড়ী ষ্টেসন্, এবং তাহার কিঞ্চিৎ দূরে লোকবিশ্রুত পাগ্‌লা ঝোরা। বর্ষা সমাগমে ইহার উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল গতি বাড়িয়া উঠে; গম্ভীরনাদী জলস্রোত শিলাখণ্ড হইতে শিলাখণ্ডে লাফাইয়া পড়িয়া সূর্য্যকিরণে ইন্দ্রধনুর শোভা বিস্তার করিতেছিল; চারিপার্শ্বে অসংখ্য পার্ব্বত্য লতা পুষ্পভারাবনত হইয়া ও মহান্ বৃক্ষগুলি শৈবালাবৃত হইয়া স্থানটিকে বাস্তবিকই রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। গাড়ী এইখানে কিছুক্ষণের জন্য থামিলে আমরা নামিয়া এই ঝরণা ও চতুঃপার্শ্বস্থ দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিলাম।

গয়াবাড়ীর পর মহানদী ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া আমরা কার্‌সিয়ং ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। কার্‌সিয়ং দারজিলিংএর ন্যায় বৃহৎ না হইলেও এই প্রদেশের একটি বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদ। কার্‌সিয়ংএ গাড়ী অনেকক্ষণ থামে। এইখানে আহারাদির বন্দোবস্ত আছে। আমরা সকলেই এইখানে মুখ হাত ধুইয়া আহারাদি সারিয়া লইলাম। কার্‌সিয়ং হইতে গিরিশ্রেণীর ও শুভ্রতুষার-কিরীটী কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য বড়ই সুন্দর! সম্মুখে দূরে ভীমপ্রাকার সদৃশ নেপালের পর্ব্বতশ্রেণী, গুর্খাসেনারক্ষিত ইলামের সামান্য দুর্গ, ও পশ্চাতে সমতল ভূমির দৃশ্য আলো ও ছায়ায় মণ্ডিত হইয়া সত্যই এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিতেছিল! গিরিনিতম্বে মেঘগুলি যেন খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। মেঘের লীলায়িত গতিতে যে এত সৌন্দর্য্য আছে ইতিপূর্ব্বে তাহা জানিতাম না, দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। ঐ দূরে নীল আকাশপটে তরঙ্গিত হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী, রজতমুকুট মাথায় দিয়া; নিকটে ঘনশ্যাম নীল গিরিশ্রেণী, আশে পাশে কলনাদী ঝরণা ও বিবিধ পক্ষী কাকলি কূজিত অরণ্যানীর ভীমকান্ত শোভা, মধ্যে মধ্যে লীলায়িত মেঘে লুক্কায়িত ও পুনঃ প্রকাশিত হইয়া কি সৌন্দর্য্যই না সৃষ্টি করিতেছিল! অমর কালিদাস যে মহান্ দৃশ্যের চিত্র লেখনীমুখে অঙ্কিত করিয়া সম্যক্ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই মনে করেন, আমার ক্ষীণ লেখনী সে দৃশ্যের কি বর্ণনা করিবে? এ দৃশ্য যিনি দেখেন নাই তাঁহাকে বুঝান অসম্ভব। প্রথম দর্শনে বিরাট তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার নিকট

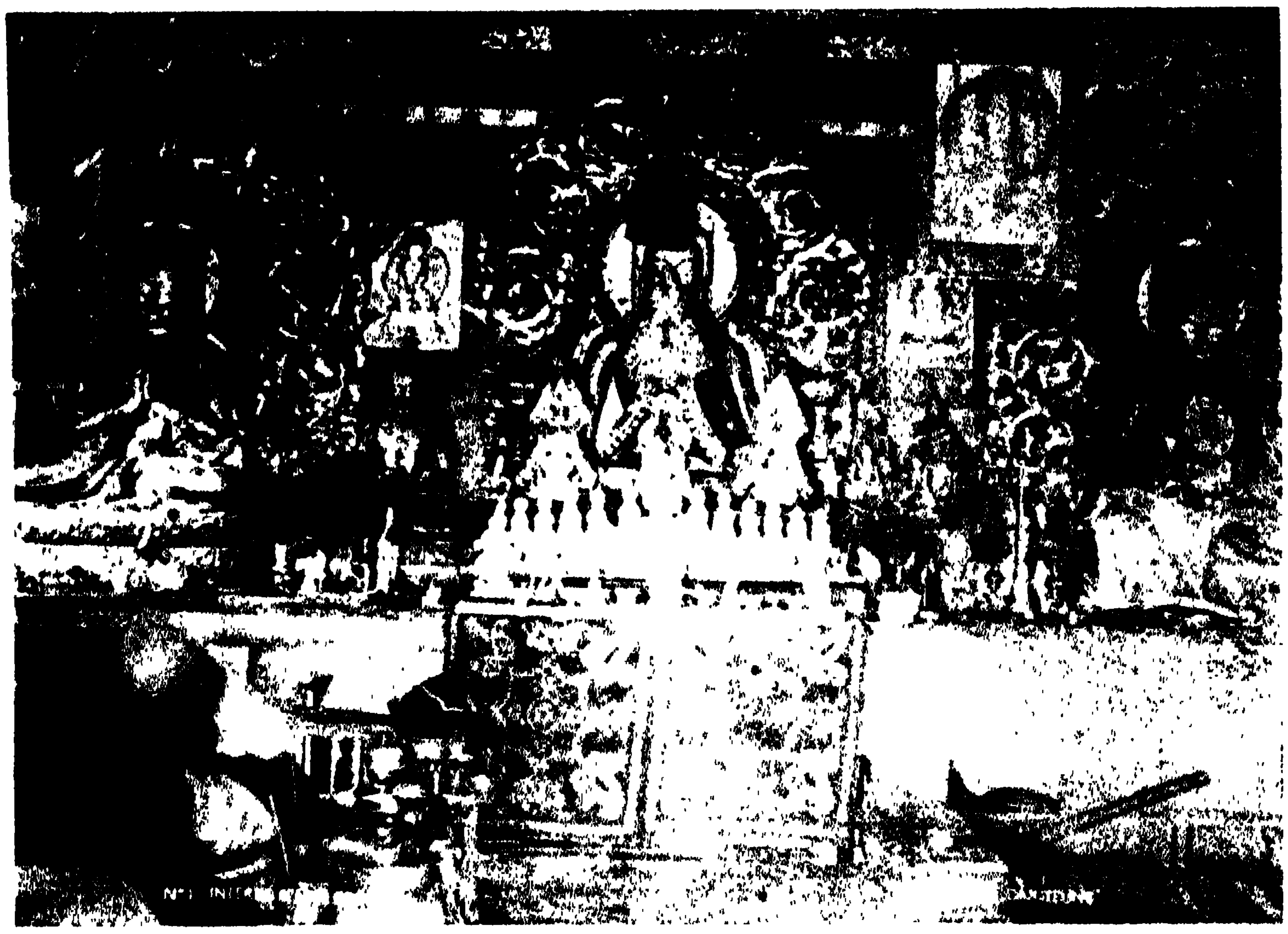

গিং বৌদ্ধমন্দিরের অভ্যন্তর।

ফুল পূজার উপকরণ এবং কলনাদী পার্ব্বত্য ঝোরা আরতির শঙ্খঘণ্টানাদ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া স্বতঃই কবি প্রমথনাথের কথা মনে পড়িয়া গেল

"* * * বেদমন্ত্র তোমারি ঘোষণা।
কোটি কবি শিখিয়াছে তব কাছে
রচনার মায়া,
শত শিল্পী তব দ্বারে দেখিয়াছে আদর্শের
ছায়া,
অহর্নিশি কত ঋষি তপ-ফল সঁপি তব
পায়
তোমার মাঝার দিয়া পাইয়াছে
ইষ্টদেবতায়।
কে আমি অধম ক্ষুদ্র? ভীত ত্রস্ত
শিশুর মতন
অসীম বিস্ময়ে শুধু হইতেছি রহস্যে
মগন।"

পথে সোনাদার ভীষণ অরণ্যানী পার হইয়া আমরা ঘুম্ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঘুম্ এই লাইনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে অবস্থিত; আমাদের ট্রেনখানি যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতি কষ্টে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে কুয়াসা আসিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারে ঢাকিয়া দিতে লাগিল, কিছু পূর্ব্বেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, পর্ব্বতগাত্র ও উচ্চশীর্ষ ভীমকায় বৃক্ষরাজি হইতে বারিবিন্দু ঝরিয়া

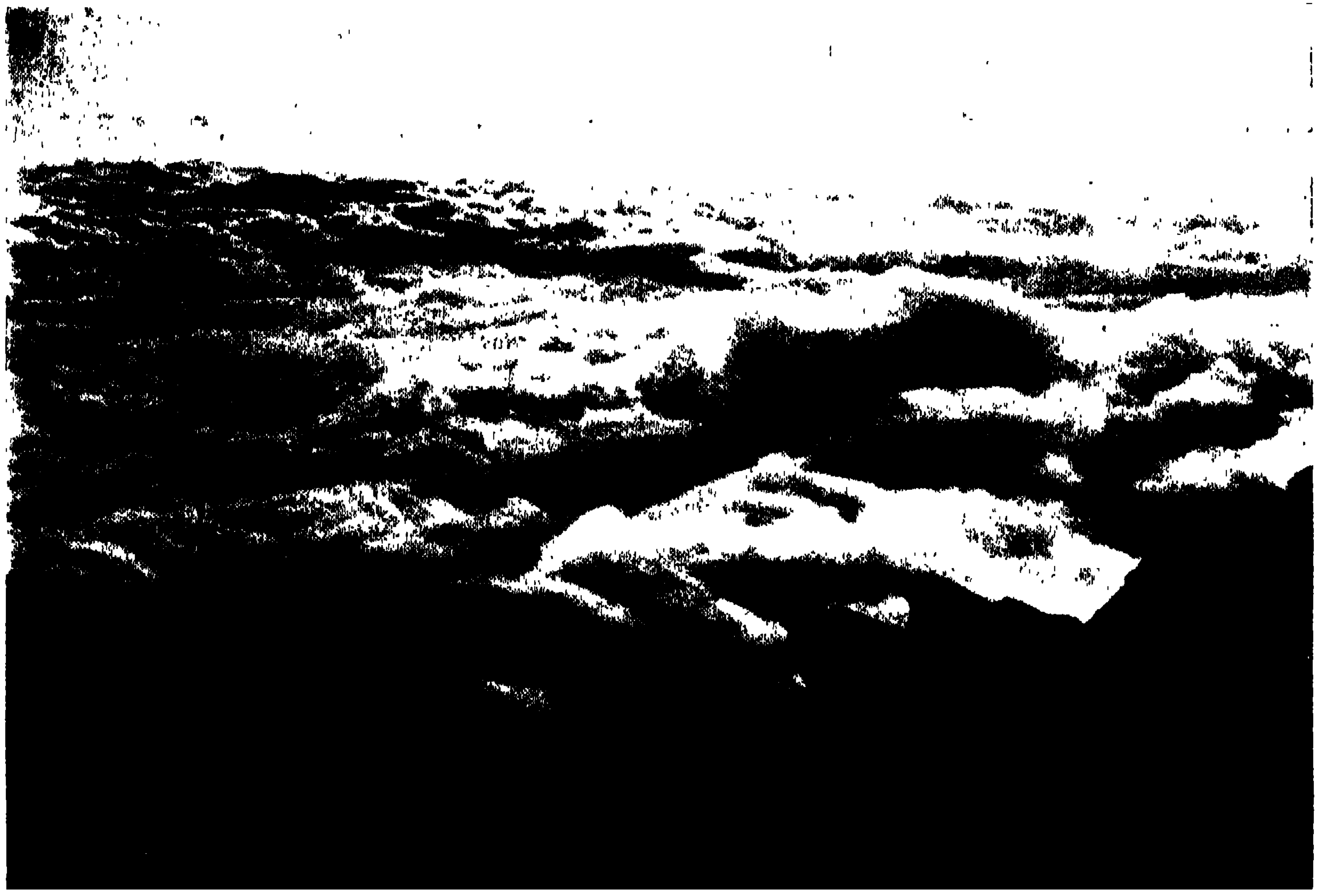

মেঘের নিদ্রা—(ফালুট হইতে মেঘের দৃশ্য।)

"যঃ দেব ওষধিষু বনস্পতিষু" সেই মহাপুরুষের সত্তা সতা সত্যই যেন প্রতীয়মান করিয়া দিল। এই জন্যই বুঝি আমাদের আর্য্য ঋষিগণ বিশ্বেশ্বরের আরাধনার জন্য হিমাচলের ক্রোড়ে আপনাদের আশ্রমক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরব্রহ্মের আরাধনার প্রকৃষ্ট স্থান আর কোথায়? এই বিরাট মন্দিরে নীল নভোমণ্ডলই চন্দ্রাতপ, চন্দ্রতপনতারকা আরতির দীপ, বনের ফল

ঝরিয়া পড়িতেছিল, কোথাও কলনাদী ঝোরা বহিয়া চলিয়াছে; ট্রেন হুস্ হুস্ শব্দে অরণ্যানীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রকৃতিরাণীর যেন নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতেছিল। ঘুম্ হইতেই বেশ শীত অনুভব হয়, এই স্থানের উচ্চতা ৭৪০৭ ফুট; ঘুম্ হইতে গাড়ী পর্ব্বতগাত্র দিয়া ক্রমেই নীচে নামিতে লাগিল, এইরূপে প্রায় ৬০০ ফুট নামিয়া আসিলে দারজিলিং। দারজিলিং সহরটি দূর হইতে ঠিক

একখানি ছবির মতই প্রতীয়মান হয়; পর্ব্বতগাত্রে পর পর বাড়ীগুলি কে যেন সযত্নে সাজাইয়া রাখিয়াছে; রাত্রে আরও সুন্দর দেখায়। দূর হইতে দেখিলে আলোকমালায় ভূষিত বাড়ীগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোনাকি পোকা বলিয়া ভ্রম হয়।

দারজিলিংএ পৌঁছিয়া দেখি যে আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুরেশকৃষ্ণ বসু ও আমাদের গৃহস্বামী রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই, ই, মহাশয়ের পুত্র রিক্‌সা (rickshaw) ও কুলী প্রভৃতি লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সুরেশ বাবুর সহিত আমাদের পূর্ব্ব হইতেই আলাপ ছিল, এবং তাঁহারই পরিবারবর্গ আমাদেরই সহিত এক গাড়ীতে আসিতেছিলেন।

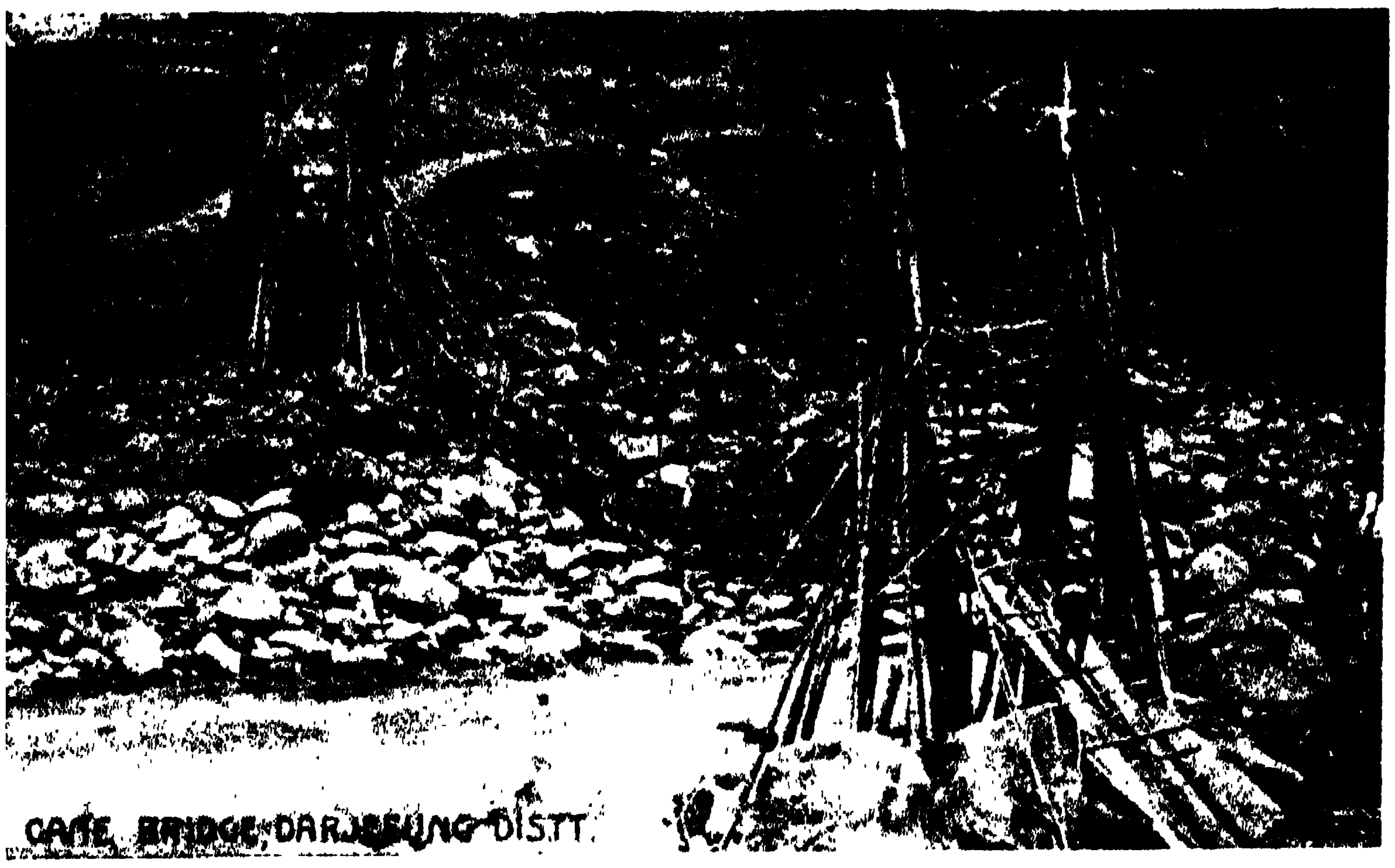

বেতের সাঁকো, দার্জিলিং।

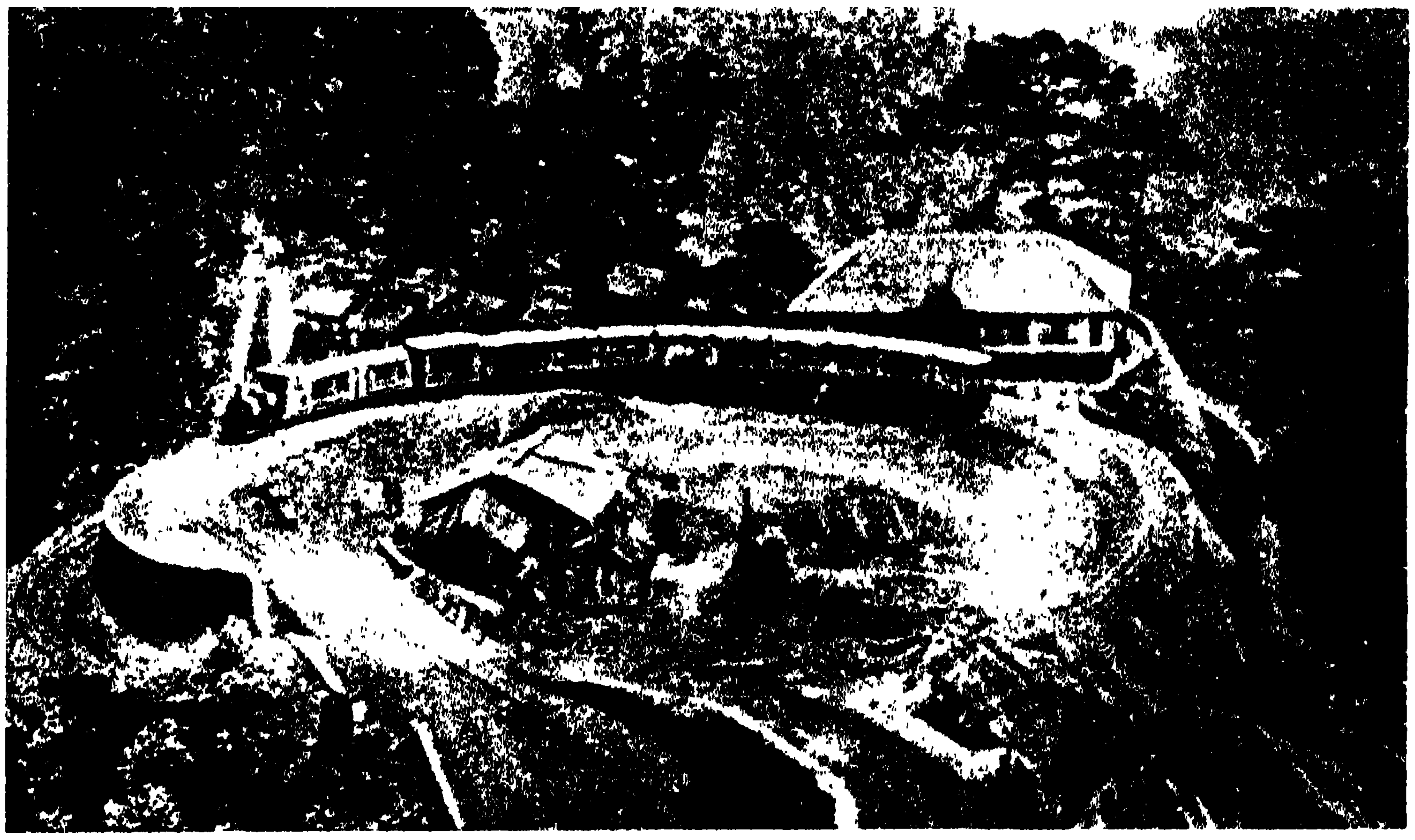

লুপ বা রেলচক্র ও পাহাড়ে উঠিবার ছোট গাড়ী।

বাড়ী পৌঁছিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। চারিদিকে কি সুন্দর দৃশ্য! সেদিন অল্প অল্প মেঘ করিয়াছিল বলিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্রতুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না বটে কিন্তু ঐ মেঘাচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যই কি নয়নাভিরাম; মেঘের কতই শোভা! লঘু মেঘগুলি সূক্ষ্ম তুলার ন্যায় পর্ব্বতগাত্রে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে তাহারই মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ উঁকি মারিতেছে; ক্ষণে আলো ক্ষণে অন্ধকার, এমন আলো ও ছায়ার মেশামেশি কখনও দেখি নাই। আমার ত বোধ হয় মেঘের লীলাই এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তহারী সৌন্দর্য্য; এই জন্যই বুঝি লোকে ইহাকে মেঘের দেশ বলে। সেদিন পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম বলিয়া আর বেড়াইতে বাহির হই নাই; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাহিরের ঘরের কৌচে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রকৃতির লীলাময়ী সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে লাগিলাম। আমাদের বাড়ীটি এরূপ স্থানে অবস্থিত ছিল যে সর্ব্বদাই তুষারকিরীটী কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়নপথে পড়িত; সহরের অল্প বাড়ী হইতেই এই নয়নমনোরম দৃশ্য এত ভাল দেখা যাইত। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; মেঘ কাটিয়া গিয়া সান্ধ্য সূর্য্যকিরণ থাকিয়া থাকিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া তুলিল, স্থানে স্থানে কুজ্ঝটিকাবৃত

গৌরীশঙ্কর পর্ব্বতের দৃশ্য (সন্দকফু হইতে)।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে ফার্ণ বৃক্ষ।

গিরিশৃঙ্গ উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল, কখনও ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ বিচ্ছুরিত করিয়া অনন্ত ধবল তুষাররাশি নয়নমন বিমোহিত করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল, চন্দ্রোদয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আর এক ভাব আমার নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইল; গিরিশ্রেণীর তুষাররাশি রজতবর্ণে মণ্ডিত হইয়া হাসিতে লাগিল, চারিদিকের বৃক্ষলতাও কৌমুদীস্নাত হইয়া সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে যেন ডুব দিল। এইরূপে হিমাচলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হইল। প্রথম পরিচয়েই যেন কত নিকট বন্ধুত্ব! দেখিয়া দেখিয়া আশা মেটে না!

পর দিবস প্রাতে উঠিয়া আবার সেই নয়নরঞ্জন দৃশ্য দেখিলাম। প্রভাত-সূর্য্যকিরণে ঝলসিত কাঞ্চনজঙ্ঘার আর এক মূর্ত্তি আজ দেখিলাম; প্রত্যেক মূর্ত্তিটিই কি সুন্দর! কোনটি ছাড়িয়া কোনটির প্রশংসা করিব? পাঠক পাঠিকাগণ একবার দারজিলিং গিয়া এই সমস্ত দৃশ্য দেখিবেন। ইহা বর্ণনার অতীত, ধ্যান ধারণার বিষয়!

সেইদিন আমাদের গৃহস্বামী শরৎবাবুর সহিত আলাপ পরিচয় হইল। ইনি বহুদিন হইতে দারজিলিংএ বাস করিতেছেন। তাঁহার সহিত তাঁহার তিব্বত ভ্রমণ প্রভৃতির গল্প লইয়া কত সকাল সন্ধ্যা কাটাইয়াছি। শরৎ বাবু তখন একখানি তীব্বতীয় গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন। আমি পালি ভাষা জানি শুনিয়া আমার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল; তাঁহার অনূদিত গ্রন্থ হইতে অনেক স্থান আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই বৃদ্ধ পর্য্যটকের সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছিল। দারজিলিং অবস্থান কালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিতও আলাপ-পরিচয় হয়। বিনয় বাবু সদালাপী, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী; তাঁহার সহিত কতদিন নানা আলোচনায় সুখে সময় কাটাইয়াছি।

দারজিলিং সহরটি গিরিশ্রেণীর একটি শৈলশিখরের উদ্ধদেশে অর্দ্ধবৃত্তাকারে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। সহরের

বাড়ীগুলি অধিকাংশই কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং কাচের সার্শি দরজায় আঁটা; ধনবানদিগের গৃহগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত ও ঢালু ছাদগুলি কাঠ বা লোহার পাতে মণ্ডিত; গৃহগুলি-পর্ব্বতগাত্রে স্তরে স্তরে নির্ম্মিত। সহরের মধ্যে ছোট লাট বাহাদুরের প্রাসাদ (যাহা পূর্ব্বে Shrubbery নামে অভিহিত হইত এবং যাহা এক্ষণে Government House বলিয়া পরিচিত), আদালতগৃহ, Secretariat Office বা বাংলা গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানা, ইডেন স্যানিটেরিয়ম্ (Eden Sanitarium), সেণ্ট এণ্ড্রুজ্ গির্জ্জা (St. Andrew's Church), দিঘাপতিয়ার মহারাজার শৈলনিবাস "গিরিবিলাস", কুচবিহারের মহারাজার প্রাসাদ কলিনটন (Colintoun), সেণ্ট পলস্ বিদ্যালয় (St. Paul's School), Alliance Bank of Simlaর দারজিলিংস্থ ব্রাঞ্চ আফিস্, Masonic Lodge (মেসনিক লজ্), লোরেটো স্কুল (Loretto School) বিশেষ দর্শনযোগ্য সৌধাবলী।

মখসপরা লামার দল।

ডাণ্ডিওয়ালা।

দারজিলিংএর অবজারভেটরী হিল্ (Observatory Hill) নামক শৈলশৃঙ্গ সহরের প্রায় মধ্যস্থলেই অবস্থিত, ইহার উচ্চতা ৭১৬৮ ফুট; পূর্ব্বে এখানে একটি মানমন্দির বা Observatory ছিল, তাহা হইতেই বোধ হয় ইহার নামকরণ হইয়াছিল। এই শৃঙ্গের উপর উঠিলে সমস্ত সহরটি বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায় এবং দূরের গিরিশ্রেণীর ও ধবলাগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘার সুন্দর দৃশ্য নয়নসম্মুখে প্রসারিত হয়। প্রবাদ আছে যে এই শৈলশিখরে দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামক এক মহাদেবের মন্দির ছিল, এক্ষণে তিনি নাকি গিরিগহ্বরে বিরাজ করিতেছেন। এই পর্ব্বতে একটি গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা একরূপ অসম্ভব। অবজারভেটরী হিলের উপর ভুটিয়াদের একটি মন্দির আছে, অবশ্য এ মন্দির আমাদের দেশের মন্দিরের মত নহে,—কতকগুলি বৃহদাকার বংশদণ্ড চারিদিকে প্রোথিত দেখিলাম এবং তাহাতে শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কাপড়ের রঙ্গীন নিশান ঝুলান রহিয়াছে। মন্দিরধারী পুরোহিত বা লামাদের ভাষা একেবারেই দুর্ব্বোধ্য; আমি বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই। আমরা প্রথম যে দিন অবজারভেটরী

চারিজন ভুটিয়া।

একদল লামা।

সন্ধ্যায় এইখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়; ইংরাজ বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ একত্রে অবাধে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন ও বিশ্রম্ভালাপে হাস্য কৌতুকে স্থানটি মুখর করিয়া তুলিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

চৌরাস্তার ঠিক নিম্নস্তরেই অর্দ্ধবৃত্তাকারের বার্চ্চহিল্ রোড্টি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই পথ ধরিয়া চলিলে বার্চ্চহিল্ (Birch Hill) উদ্যানে উপস্থিত হওয়া যায়; উদ্যানে কোনও প্রকার সংযত সৌন্দর্য্য নাই বলিয়াই যথেচ্ছবর্দ্ধিত বৃক্ষরাজি, লতাগুল্ম পত্রপুষ্প শোভিত হইয়া স্থানটিকে বাস্তবিকই মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। পূজার বন্ধের সময় বাঙ্গালী পুরুষ মহিলাবৃন্দ মধ্যে মধ্যে এখানে চড়িভাতি প্রভৃতি আমোদের জন্য সমবেত হন।

বার্চ্চহিলের কিঞ্চিৎ উপরেই ছোটলাট সাহেবের বাড়ী; তাহার নিকটেই স্থানীয় ক্রিকেট

হিল্ আরোহণ করি সে দিন গিরিশিখর হইতে কতকগুলি ইংরাজ সৈনিক চুম্বি উপত্যকাস্থ ইংরাজ সেনানিবাসে বার্ত্তা প্রেরণের জন্য হেলিয়োগ্রাফ (Heliograph) যন্ত্র সাহায্যে ক্রমাগত signal বা সঙ্কেত করিতেছিল।

অবজারভেটরী হিলের প্রায় নীচেই Mall বা চৌরাস্তা; ইহাই দারজিলিংএর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর রাস্তা। এখানে ইংরাজ বণিকগণের বিপণীশ্রেণী নানা দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত; চৌরাস্তার মধ্যস্থলে Band-stand, বা নহবতখানা। তথায় সপ্তাহে দুই তিন দিন ব্যাণ্ড বাজিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে বিশ্রামের জন্য অনেকগুলি বেঞ্চ পাতা আছে; সকালে

খেলার মাঠ, টাউন্ হল্ (Town Hall), অ্যামিউজ্‌মেণ্ট ক্লব (Amusement Club, ও রিঙ্ক (Rink) অবস্থিত। টাউন হলের নীচে ক্ষুদ্র এক গিরির শীর্ষদেশে সাহেবদিগের স্বাস্থ্যনিবাস ইডেন্ স্যানিটেরিয়াম্ (Eden Sanitarium) অবস্থিত। এই প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ীটি প্রায় দুইলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় এবং তৎকালীন ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেন্ সাহেবের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইডেন্ স্যানিটেরিয়ামের প্রায় সম্মুখেই গম্বুজ ও স্বর্ণরঞ্জিত চূড়া-বিশিষ্ট বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত হিন্দুমন্দির এবং ইহারই সন্নিকটে দারজিলিংএর ব্রাহ্মসমাজগৃহ। মন্দিরের

কিছু উপরেই স্থানীয় বাজার নানা বিপণী-শ্রেণীতে শোভিত। এখানকার বাজার বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কতকটা কলিকাতার হগ্‌সাহেবের বাজারের ন্যায়। বাজারে সর্ব্বদাই শাক, সব্‌জি ও মাংস বিক্রয় হয়; মৎস্য বাংলা দেশ হইতে ট্রেনে আনীত হইয়া রোজ বৈকালে বিক্রয় হয়। ইহা ভিন্ন প্রতি রবিবারে হাট বসে, সেই দিন বহু দূর প্রদেশ হইতে পাহাড়িয়া, তিব্বতীয়, ভুটিয়া ও লেপ্‌চাগণ নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া এইখানে মিলিত হয়। হাটে স্ত্রীলোক বিক্রেতারই অধিকার দেখা যায়; এদেশের পুরুষেরা গৃহকর্ম্ম লইয়াই থাকে, বাহিরের কাজকর্ম্ম বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকের দ্বারাই সম্পন্ন হয়—কতকটা ব্রহ্মদেশেরই মত।

বাজারের কিঞ্চিৎ উপরে এক পর্ব্বতগাত্রে স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয় ও পুলিস্ ষ্টেশন্। চিকিৎসালয়টি ক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ। এই পাহাড়ের ঢালু গায়েই ডাক ও তারঘর, ইউনিয়ন্ চ্যাপেল (Union Chapel) গির্জ্জা ও স্থানীয় ক্লবঘর অবস্থিত। বাজার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রেল ষ্টেসনের নিকটেই কার্টরোডের উপর লাউইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়াম্ (Jubilee Sanitarium); ইডেন্ স্যানিটেরিয়াম্ যেরূপ কেবল ইউরোপীয়দিগের জন্য, এইটি সেইরূপ কেবল ভারতবাসীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। প্রতি বৎসর 'বিজয়ার দিন এখানে সহরের সমস্ত বাঙ্গালী সমবেত হন; সেদিন ক্রীড়া, কৌতুক ও অভিনয়ে সময় অতিবাহিত হয়। সহরের বাঙ্গালীমাত্রেই নিমন্ত্রিত হন এবং সকলকেই কিছু না কিছু মিষ্টমুখ করিতে হয়।

রেল ষ্টেসন হইতে দক্ষিণে বর্দ্ধমানের মহারাজার সুপ্রশস্ত ভবন রোজ্ ব্যাঙ্কে (Rose Bank) যাইবার পথে ভিক্টোরিয়া ফল্ নামক জলপ্রপাত দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্বে এই জলপ্রপাত বিস্তৃত ও ভীষণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহাকে পাথরের বাঁধে বাঁধিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট করিয়া ফেলা হইয়াছে; তথাপি ইহার বেগ ও প্রপাত নিতান্ত অল্প নহে। পূর্ব্বে এই জলপ্রপাতের উপর দিয়া একটি সেতু ছিল এবং তাহার উপর দিয়া উভয় পার্শ্বস্থ গিরিপথে গমনাগমন করা যাইত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দারজিলিংএ পাহাড় ধসিয়া গিয়া যে ভীষণ কাণ্ড হইয়াছিল সেই সময় জলস্রোতে ও পাহাড়ের ভাঙ্গনে রাস্তা সেতু সমস্তই লোপ পায়; পুনরায় উহার উপর লোহার সেতু নির্ম্মাণের কথা হইতেছে। উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে জলধারা নীচে পাষাণখণ্ডের উপর পতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে; যেন একটি গলিত রজতস্রোত পাহাড় হইতে পাহাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তরঙ্গভঙ্গে ফেনমণ্ডিত হইয়া নীচে উপত্যকায় বহিয়া চলিয়াছে; সে কি সুন্দর দৃশ্য! চারিদিকে বনজ বৃক্ষলতা নানাবিধ কুসুমদামে সজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডবহুল সেই পার্ব্বত্য স্থানকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে,—অবিরাম জলপ্রপাতের ঝর্ ঝর্ শব্দ তীব্র করুণ বিষাদসঙ্গীতের ন্যায় কানে বাজিতে থাকে। আমার এই স্থানটি বড়ই ভাল লাগিত, সেই জন্য প্রায়ই এইখানে বেড়াইতে যাইতাম। একদিন আমরা সদলবলে এইখানে সম্মিলিত হই; সুরেশ বাবুর দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র গাহিতে লাগিল,—

কর তাঁর নাম গান;
যত দিন রহে দেহে প্রাণ;
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে,
জলগর্ভে কি আকাশে;
অন্ত কোথা তাঁর অন্ত কোথা তাঁর,
এই সবে জিজ্ঞাসে হে।

আমার মনে হইতে লাগিল যথাস্থানেই আমরা বিশ্বপাতার নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছি। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর ও সুন্দর দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিকই সর্ব্বাগ্রে জগতের সেই আদি কারণের উদ্দেশে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

বর্দ্ধমানের মহারাজার বাড়ী Rose Bank দেখিতে মন্দ নয় ইহা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার মধ্যে দেবালয়, পুষ্করিণী (বোধ হয় ইহাই দারজিলিংএর একমাত্র পুষ্করিণী), টেনিস্ খেলার জায়গা প্রভৃতি আছে; একটি পর্ব্বতের মাথা কাটিয়া সমতল করিয়া এই সমস্ত নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

দারজিলিং সহরের আর একটি দর্শনযোগ্য স্থান লয়েড্ বোটানিকেল্ গার্ডেন (Lloyd Botanical Garden)। প্রায় ৪০।৪২ বিঘা জমী জুড়িয়া এই উদ্যান বিস্তৃত। এখানে সর্ব্বপ্রকারের বৃক্ষলতাই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন একটি বৃহৎ কাচনির্ম্মিত গ্রিন্‌হাউসে (Green Houseএ) বিচিত্র পত্র-পুষ্প-শোভিত বিভিন্ন অর্কিড্ (Orchid) অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া দর্শকের নয়ন মন

দার্জিলিঙের গোয়ালা।

তৃপ্ত করে। বোটানিকেল্ গার্ডেনের একাংশে একটি গৃহে দারজিলিংএর গৌরব ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রজাপতি রক্ষিত হইয়াছে। এরূপ বর্ণের সমাবেশ আর কোথাও দেখি নাই। এক একটি প্রজাপতির মখমল সদৃশ কোমল রঙ্গীন পক্ষের কি বাহার! প্রজাপতি ব্যতীত এখানে কতকগুলি পার্ব্বত্য সর্পের দেহও রক্ষিত হইয়াছে। ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের বন্যজন্তু এই প্রদেশে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহারাও নীচের তেরাই প্রদেশে বাস করিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের উর্দ্ধ প্রদেশে আহার অন্বেষণে আসিয়া পড়ে; মধ্যে মধ্যে বাঘ আসিতেও শুনা গিয়াছে। চা বাগানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বন্য জন্তু প্রায় নিম্মূল হইয়া আসিতেছে। এখানে বহুবিধ সুকণ্ঠ পক্ষী, টিকটিকি ও মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। অরণ্যানী সর্ব্বদাই মধুকর ও ভ্রমর গুঞ্জনে ঝঙ্কৃত। মক্ষিকা ও মশকের উপদ্রব নাই বলিলেই চলে।

দারজিলিং সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব গায়ে সহর হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে জলাপাহাড় কেণ্টনমেণ্ট বা গোরা বারিক; এখানে অক্ষম ও দুর্ব্বল ইংরাজ সৈনিকদিগের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস আছে, পূর্ব্বে উহা সিঞ্চলে ছিল কিন্তু তথায় বিষম শীতের প্রকোপে বহুসংখ্যক সৈনিকের মৃত্যু হওয়ায় কর্তৃপক্ষ উহা ত্যাগ করেন; এক্ষণে তথায় সেই সমস্ত গৃহের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। সিঞ্চল হইয়া টাইগার হিল্ (Tiger Hill) নামক গিরিশৃঙ্গে যাইতে হয়। ঐ গিরিশৃঙ্গ হইতে হিমাচলের বৃহত্তম ও সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর (Mount Everest), কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলাগিরি শৃঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে এখান হইতে সূর্য্যোদয় দেখিতে আসেন, সে দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন না। প্রসন্ন নির্ম্মল মেঘমুক্ত সুনীল আকাশপটে হিমালয় গিরিশ্রেণী স্তরে স্তরে মহাসাগরের ঊর্ম্মিমালার ন্যায় বিস্তৃত, তাহারই পরে দূরে—বহু দূরে—অনন্ত তুষার-মণ্ডিত গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলাগিরি শৃঙ্গ উচ্চ করিয়া দণ্ডায়মান, চারিদিক নিস্তব্ধ; প্রভাতঅরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া শ্বেতশুভ্র তুষাররাশি যখন ঝলসিত হইতে থাকে এবং ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ একে একে প্রতিফলিত হইয়া চক্রবালব্যাপী চিরশুভ্র তুহিনরেখাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, তখন দর্শক নির্ণিমেষনয়নে সেই রূপসুধা পান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যায়; মনে হয় সহস্র চক্ষু থাকিলেও বুঝি এই অপরূপ রূপ-মাধুরী ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারিতাম না।

সিঞ্চল হইতে নামিবার পথে ঘুম্ পাহাড় পড়ে; এখানে ঘুম্ রক্ (Ghoom rock) নামে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড পাহাড়ের শীর্ষদেশে প্রায় ৮০ ফুট মস্তক উত্তোলন করিয়া দাড়াইয়া আছে। ইহার সহিত একটি করুণ কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে; প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে সুতরাং উহার বর্ণনা হইতে বিরত হইলাম। ঘুমবুড়ী বা ঘুম্ ডাইনীর সহিত দারজিলিং যাত্রী মাত্রেই পরিচিত। সে যে কতকালের তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিতনা। আজ কয়েক বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভিক্ষালব্ধ অর্থে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা আজও তাহার স্মৃতি জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে; তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে একটি

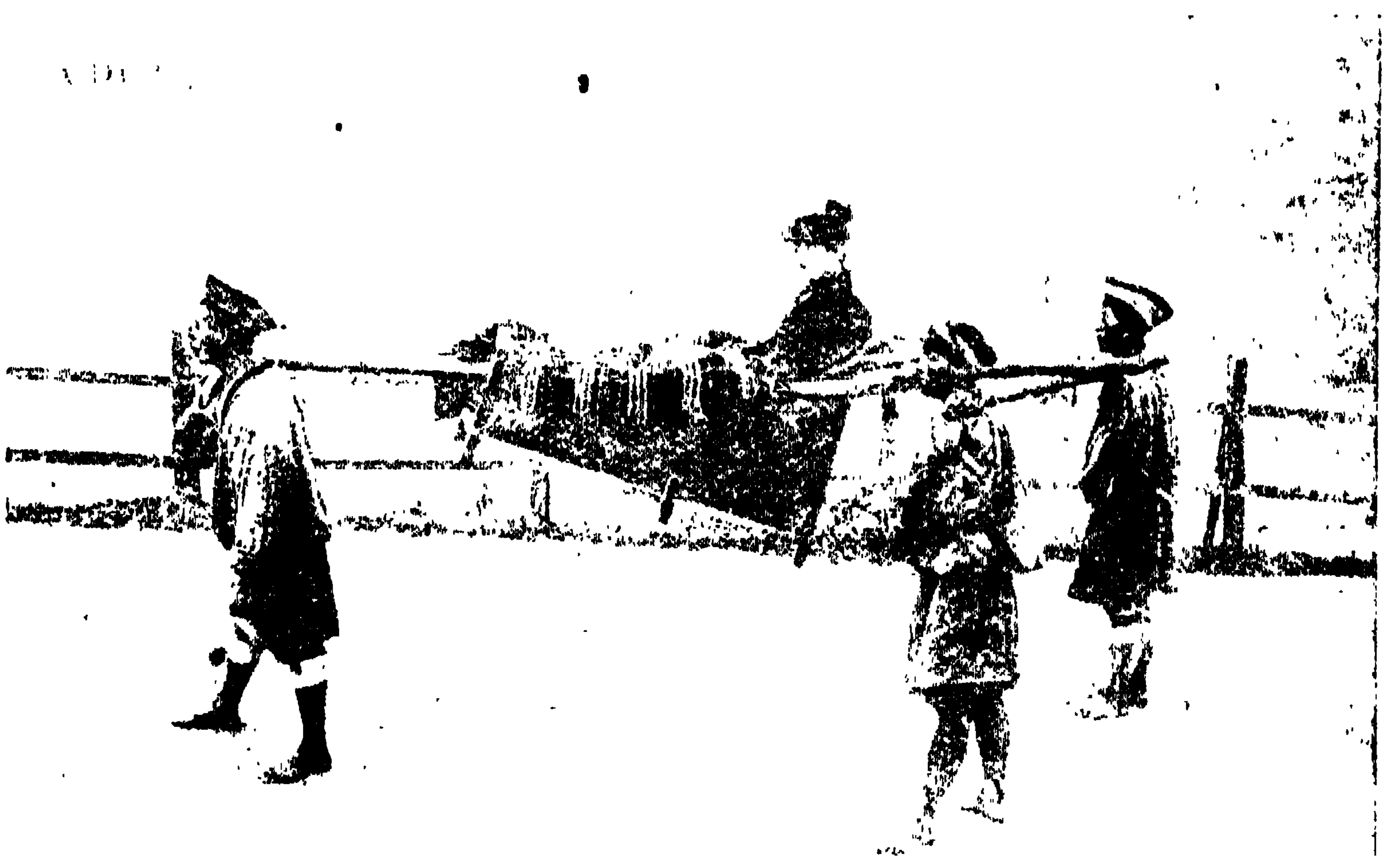

ডাণ্ডী।

লামাদের নৃত্য।

প্রতিষ্ঠিত মহারাণী স্কুল দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার সংলগ্ন বোর্ডিংএ প্রবাসী বালিকাদের থাকিবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। কুচবিহার, ময়ূরভঞ্জ ও বর্দ্ধমানের মহারাণীত্রয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম মহারাণী স্কুল। ইংরাজ বালিকাদের জন্য এরূপ বোর্ডিং স্কুল দারজিলিংএ অনেকগুলি আছে, কিন্তু আমাদের নিজের বলিয়া গৌরব করিবার ইহাই একমাত্র। বিদ্যালয়ের কাজ বেশ চলিতেছে এবং শিক্ষয়িত্রীগণের উদ্যম ও স্বার্থত্যাগ প্রশংসার্হ।

দারজিলিংপ্রবাসীর আর একটি দর্শনযোগ্য স্থান তিস্তা ও রঙ্গিৎ নদীর সঙ্গমস্থল। এইস্থানে যাইবার পথ বড়ই দুর্গম এবং দুরূহ, কিন্তু পথিপার্শ্বস্থ অরণ্যানীর শোভা এবং সর্ব্বোপরি সঙ্গমস্থলের অপূর্ব্ব শোভা পথশ্রমের সমস্ত কষ্ট লাঘব করিয়া মনপ্রাণে অপূর্ব্ব পুলক

বামন এবং লোকসমাজে Ghoom dwarf সে নামে পরিচিত।

দারজিলিং সহরের কিঞ্চিৎ নিম্নে ভুটিয়াবস্তী ও ইংরাজ গোরাবারিক লিবং; এখানে একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে। পর্ব্বতশিখর কাটিয়া সমতল করিয়া কিরূপে Race Course প্রস্তুত করা হইয়াছে দেখিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। জালাপাহাড়ের উপর এইরূপে একটি ফুটবল খেলিবার মাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে। জালাপাহাড় হইতে নামিবার পথে বাঙ্গালী বালিকাদের জন্য

সঞ্চার করে। রঙ্গিৎ যাইবার পথে রঙ্গিতের দোদুল্যমান লৌহসেতু (iron suspension bridge) পড়ে, উহা বড় সুন্দর; এই পথে সিকিম যাওয়া যায়। নদীগর্ভে নানাবর্ণের অসংখ্য উপল খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির বর্ণ বাস্তবিকই চিত্তহারী; তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছ স্ফটিক জলধারা কুলুকুলু বহিয়া চলিয়াছে "কূলে কূলে তুলি কত গান!" সঙ্গমস্থলের দৃশ্য আরও সুন্দর আরও মহান্।

ইহা ব্যতীত সাণ্ডুকফু (Sandakphu) ও ফালুট,

(Phalut) গিরিশিখরও দর্শনযোগ্য। ফালুট হইতে গৌরীশঙ্করের শৃঙ্গ খুবই বৃহৎ ও পরিষ্কার দেখা যায়।

দারজিলিংএ সাধারণতঃ তিন প্রকারের পার্ব্বত্যজাতি দেখিতে পাওয়া যায়—পাহাড়িয়া বা নেপালী, ভুটিয়া ও লেপচা। ইহার মধ্যে পাহাড়িয়াগণই দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর; পাহাড়িয়া রমণীগণের মধ্যে অনেক যথার্থ সুন্দরী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের রক্তিম গণ্ড ও সুস্থ সবল দেহ স্বাস্থ্য ও স্ফুর্ত্তিব্যঞ্জক। ইহারা অলঙ্কার ও কুসুমদামে সজ্জিতা হইয়া থাকিতে ভালবাসে। লেপচারমণীদের মধ্যেও অনেক সুন্দরী দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ইহাদের অমুন্নত নাসা ও ক্ষুদ্র কপোলদেশ সকল সৌন্দর্য্যই নষ্ট করিয়া দেয়।

এই সকল পার্ব্বত্যজাতি ভূত প্রেত প্রভৃতি অপদেবতার ভয়ে সর্ব্বদাই অস্থির। ভূত প্রেত তাড়াইবার জন্য ইহারা গৃহের চারিদিকে দীর্ঘ বংশ প্রোথিত করিয়া তাহাতে মন্ত্রপূত নানাবর্ণের কাপড়ের নিশান ঝুলাইয়া দেয়, সেগুলি বায়ুভরে পত্ পত্ শব্দে উড়িয়া তাহাদিগকে সকল অমঙ্গল হইতে রক্ষা করে এই উহাদের বিশ্বাস। অনেক সময় দেখা যায় যে পথের ধারে লামানামধারী মূর্খ ভুটিয়া নরকের চিত্র প্রদর্শন করিয়া এবং "ওঁ মনি পদ্মে হুঁ" ইত্যাদি মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে প্রার্থনা-চক্র ঘুরাইয়া সরলচিত্ত স্ত্রী পুরুষের নিকট হইতে বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছে। হায়, কি ধর্ম্মের কি অধঃপতনই হইয়াছে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মিত্র।

দার্জ্জিলিঙের চিঠি

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত·····················

সমীপে—

আমি এখন ব'সে আছি সাত-শো-তলার ঘরে!
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।
ফিরোজা রং আকাশ হেথা, মেঘের কুচি তায়,—
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখনা ঝেড়ে যায়!
অস্ত রবির আভাস লাগে পূর্ণিমা চাঁদে,
শীর্ণ 'ঝোরা' যক্ষনারীর দুঃখেতে কাঁদে!
তবু, এখন নাই অলকা, নাই সে যক্ষ আর,
মেঘের দৌত্য সমাপ্ত, হায়, কবির কল্পনার।

*　　*　　*

হঠাৎ এল কুজ্ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া,
ঘুম-পাহাড়ের বুড়ী দিল মন্ত্র পড়িয়া!
কুহেলিকার কুহকে, হায়, সৃষ্টি ডুবিল,
ঝাপ্সা হ'ল কাছের মানুষ দৃষ্টি নিবিল।
ভস্মভূষণ ভোলানাথের অঙ্গ-বিভূতি
বিশ্ব 'পরে ঝরে যেন বিশ্ব-বিস্মৃতি!
সকল গ্লানি যায় মুছে সেই দৈব-ধূমপানে,
অরুণ আভা অঙ্গে জাগে আরাম পরাণে!

*　　*　　*

ক্ষণেক 'পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়,
গুল্ম-ঘেরা পাহাড়গুলি আবার দেখা যায়;
নীল আলোকের আব্‌ছায়াতে নিলীন তরুচয়,
'কাঞ্চি' মণির দুল দুলিয়ে হাল্কা হাওয়া বয়।
মেঘ টুটে ফের ফুটে ওঠে আকাশ-ভরা নীল,
নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় খোঁজে মিল,
শান্তি-হ্রদে সাঁতারি' তার মিটে না আশা,
নীল নীড়ে, হায়, আঁখি পাখীর আছে কি বাসা?

*　　*　　*

সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে,
অস্ত রবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে!
মেঘের বুকে কিরণ-নারী পিচ্‌কারী হানে,
ইন্দ্র-ধনুর চূর্ণ শোভা ছড়ায় বিমানে;
মেঘে মেঘে পান্না চুনির লাবণ্য লাগে,
আচম্বিতে তুষারগিরি উদ্ভত জাগে!
দিব্য-লোকের যবনিকা গেল কি টুটি?
অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি?

*　　*　　*

গিরিরাজের গায়েব-টোপর ওই গো দেখা যায়,—
স্বর্ণ-সারে সিঞ্চিত কি স্বর্ণ-সুষমায়!
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে লাখ,
আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া করেছে নির্ব্বাক!
নর-চরণ-চিহ্ন কভু পড়েনি হোথায়,
নাইক শব্দ, বিরাট, স্তব্ধ,—আপন মহিমায়!

সন্ধ্যা প্রভাত অঙ্গে তাহার আবীর ঢেলে যায়,
রুদ্ধগতি বিদ্যুতেরি দীপ্তি জাগে তায়!
শিখায় শিখায় আরম্ভ হয় বর্ণ মহোৎসব,
বিদূর-ভূমে রত্ন-ফসল হয় বুঝি সম্ভব!
মর্ত্ত্যে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার,
ওই পাদপীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার।

* * *

ওই বরফের ক্ষেত্রে হলের আঁচড় পড়ে নাই,
ওই মুকুরে সূর্য্য তারা মুখ দেখে সবাই!
হোথায় মেঘের নাট্যশালা, রঙ্গ কুয়াসার,
হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা-যমুনার।
ওই খানেতে তুষার-নদীর তরঙ্গ নিশ্চল,
রশ্মি-রেখার ঘাত প্রতিঘাত চল্‌ছে অবিরল।
উচ্চ হ'তে উচ্চ ও যে—মহামহত্তর,—
নির্ম্মলতার ওই নিকেতন অক্ষয় ভাস্বর!

* * *

হয় তো হোথাই যক্ষপতির অলকা নগর,
হয় তো হ'কে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর;
রজতগিরি শঙ্করেরি অঙ্কোপরি, হায়,
কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মূরছায়!
হয় তো আদিবুদ্ধ হোথায় সুখাবতীর মাঝে
অবলোকন করেন ভূলোক সাজি কিরণ সাজে।
কিম্বা হোথা আছে প্রাচীন মানস-সরোবর
স্বচ্ছ শীতল আনন্দ যার তরঙ্গনিকর!
কবিজনের বাঞ্ছা বুঝি হোথাই পরকাশ,—
সরস্বতীর শুভ্র মুখের মধুর মৃদু হাস!

* * *

লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াসায়?—
বাংলা দেশের মানুষ যেথা আজো পূজা পায়?
এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি' উৎসাহ-শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায়।
এই পথেতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই সব,
এইখানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ-কলরব!
এম্‌নি ক'রে স্বর্ণশৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,—
আমার মত তাঁদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিস্ময়!

দেশের লোকের সাড়া পেয়ে আজ কি তাঁহারা
চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনা-হারা?
চোখে পলক নাইক তাঁদের পড়ে না ছায়া,
মমতা কি যায় নি তবু? ঘোচেনি মায়া?
তাই বুঝি, হায়, ফিরে যেতে ফিরে ফিরে চাই,
কে যেন হায় রইল পিছে, কাহারে হারাই!

* * *

সন্ধ্যা এসে ডুবিয়ে দিল রঙীন চরাচর,
অনিচ্ছাতে রুদ্ধ হ'ল দৃষ্টি অতঃপর।
সাঁঝের আলোয় উঠ্‌ল সেজে দার্জ্জিলিং-পাহাড়,
উঠ্‌ল ফুটে ভুবন-জোড়া গাঁদা ফুলের ঝাড়!
কুজ্ঝটিকায় সাঁঝের আঁধার হ'ল দ্বিগুণ কালো,
অরুণ-ছটার ছাতা মাথায় হাসে পথের আলো।
তখন দুয়ার বন্ধ ক'রে, বন্ধ ক'রে সাসি,
অন্ধ-করা অন্ধকারে স্বপন-সুখে ভাসি।
ঘুমের বুড়ীর মন্ত্র-মোহ আপনি তখন খসে,
চেনা মুখের ছবিগুলি ঘিরে ঘিরে বসে।
ঘোর নিশীথে দারুণ শীতে কষ্ট যখন পাই,
ইচ্ছা করে কৃচ্ছ্র-সাধন পাহাড় ছেড়ে যাই;
শিক্ষা-শাসন হেথা, সেথায় হরষ হিন্দোল,
এ যে কঠোর গুরু-গৃহ, সে যে মায়ের কোল।
তাই নিশীথে ঘরের কথা জাগে সে সদাই,
মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।
সংগোপনে শব্দ-যোজন করি দুচারিটি,
সশরীরে যেতে না পাই তাই তো পাঠাই চিঠি।
ভগ্ন স্বাস্থ্য কর্ত্তে আস্ত পড়্‌ছে ভেঙে মন
ডাক পিয়নের মূর্ত্তি ধেয়ান ক'রে সকল ক্ষণ;
তাই অনুরোধ মাঝে মাঝে পত্র যেন পাই,
চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথার পার ক'রে নাও, ভাই!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন ভারত

খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা অন্ধকারাচ্ছন্ন; (১) তারপর পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে, চৈনিক পরিব্রাজকের আলোক-সম্পাতে উহা আংশিকভাবে আমাদের নিকট পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তদীয় ভ্রমণ-কাহিনীতে সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ বহু হিন্দু রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জনপদের মধ্যে টৌলি, উত্থান, গান্ধার, পুরুষপুর এবং নগরহার সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

ফাহিয়ান সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলা ব্যতীত পঞ্জাবের আর কোন রাজ্যের নাম তদীয় ভ্রমণ-কাহিনীতে উল্লিখিত হয় নাই। পঞ্জাবের পর মথুরা দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা দেশের পশ্চিমদিকে মরুভূমির পশ্চাতে পশ্চিম-ভারত অর্থাৎ রাজপুতানার রাজ্য সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। তত্রত্য অধিপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মথুরার দক্ষিণদিকে মধ্যদেশ বিস্তৃত ছিল। ফাহিয়ান মধ্যদেশে সাতিশয় গ্রীষ্ম অনুভব করিয়াছিলেন। মধ্যদেশে একাধিক নরপতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফাহিয়ান কনৌজ, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, এবং কৌশাম্বী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ফাহিয়ান এই সকল চিরখ্যাত নগরের কোন রাজনৈতিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তিনি এই সকল নগর পরিদর্শন করিয়া চম্পানগরীতে আগমন করেন; তৎকালে চম্পা একটি বিস্তৃত রাজ্যে অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই রাজ্য তৎকালে অঙ্গ নামে খ্যাত ছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে উহা দক্ষিণবিহার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ফাহিয়ান চম্পা হইতে তাম্রলিপ্তি রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। এই রাজ্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "তাম্রলিপ্তি রাজ্যের রাজধানী তাম্রলিপ্তি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এই রাজ্যে চতুর্ব্বিংশতি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এই দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল।"

আমরা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর এই সাতিশয় অসম্পূর্ণ ও আংশিক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়া পরবর্ত্তী কালের বিবরণ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

হিউএনথ্ সঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, পঞ্জাবে মিহিরকুল নামক হূনজাতীয় নরপতি রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ৫১০ অব্দ তাঁহার আবির্ভাব-কালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত অংশে তাঁহার আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। কাশ্মীরে এক স্বতন্ত্র রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মহারাজ মিহিরকুলের বিশ্বাসঘাতকতায় এই রাজবংশ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তৎকালে গান্ধারে ও সিন্ধুদেশে বৌদ্ধরাজত্ব দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সকল রাজ্যের নরপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের পোষণ করিতেন। মগধের বালাদিত্য রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তিনি মিহিরকুলকে কর প্রদান করিতেন।

হিউএনথ সঙ্গ স্বয়ং ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া প্রায় সমগ্র দেশ পর্য্যটন করেন।

হিউএনথ্ সঙ্গের সময়ে কাশ্মীরে পরাক্রান্ত রাজবংশের

(১) বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে রাজনৈতিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই বলিয়া আমরা তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। কিন্তু খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিবার উপায় আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর-ভারতে গুপ্তবংশ নামে এক নূতন রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজার নাম সমুদ্রগুপ্ত। তিনি ৩২৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্ত বিপুল ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন। সমগ্র উত্তর-ভারত তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী নদী হইতে পশ্চিমদিকে যমুনা ও চম্বল নদী পর্য্যন্ত এবং উত্তরদিকে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণদিকে নর্ম্মদার তীরভূমি পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সমতট, কামরূপ, দবাক (বর্ত্তমান বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলা), কর্ত্রিপুর রাজ্য (বর্ত্তমান কুমায়ুন, আলমোরা, গাড়োয়াল এবং কাঙ্গরা) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিত। তৎকালে পঞ্জাব, পূর্ব্ব রাজপুতানা এবং মালবদেশের অধিকাংশ স্থলে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী বিদ্যমান ছিল। এই সকল রাজ্যের শাসনভার এক এক বংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। যৌধেয় বংশীয়গণ শতদ্রুর উভয় তীরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাদ্রকগণ মধ্য-পঞ্জাবের অধিকারী ছিলেন। গ্রীকবীর আলেকজণ্ডারের ভারত আক্রমণ-কালে পঞ্জাবে মালই, কাথাই প্রভৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাহাদের স্থানে ঐ সকল নূতন বংশের উদ্ভব হইয়াছিল। আর্জ্জুনায়ন ও আভীরগণ যথাক্রমে পূর্ব্ব-রাজপুতানা এবং মালবদেশের অধিবাসী ছিলেন এবং প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়া শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

আধিপত্য ছিল। পঞ্জাবে কতিপয় স্বতন্ত্র রাজ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। সিন্ধুদেশে শূদ্রবংশোদ্ভব বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেন।

কনৌজের অধিপতি শিলাদিত্য ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নর্ম্মদা নদীর কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক রাজা তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। সুদূরবর্ত্তী কামরূপের অধিপতি কুমারও তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন।

হিউএনৎ সঙ্গ মগধের গৌরব ও বৈভব অতীতের কুক্ষিগত দেখিয়াছিলেন। তৎকালে পাটলীপুত্র নগরের ভগ্নদশা উপস্থিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যে দেশ বঙ্গদেশ নামে পরিচিত হইতেছে, তাহা পাঁচ স্বতন্ত্র রাজ্যে (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ) বিভক্ত ছিল। এই পঞ্চ রাজ্যের অন্যতম রাজ্য কর্ণসুবর্ণ পরাক্রান্ত ছিল। এই রাজ্যের অধিপতি শশাঙ্ক কনৌজের অধিপতি শিলাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে রণক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এই রাজ্যের যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পতনদশার বিবরণ। কলিঙ্গ দেশ বনজঙ্গলে পূর্ণ এবং বন্যহস্তীর আবাস রূপে পরিণত হইয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রবল প্রতাপ ছিল। তৎকালে রাজা পুলকেশী মহারাষ্ট্রের রাজসিংহাসনের শোভাবর্দ্ধন করিতেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার সাতিশয় বাধ্য ও অনুগত ছিল। কনৌজের অধিপতি পুলকেশীকে পরাজিত করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু পুলকেশীই রণক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিয়া স্বরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

চিরপ্রসিদ্ধ মালব, সৌরাষ্ট্র, গুর্জ্জর প্রভৃতি রাজ্য বিদ্যমান ছিল। হিউএনৎ সঙ্গের মালব গমনের ষাট বৎসর পূর্ব্বে শিলাদিত্য নামক একজন অসামান্য ধীমান ও বিদ্বান্ নরপতি মালব দেশে রাজত্ব করিতেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরব দেশীয় মোসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইহাই মোসলমান কর্ত্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ। এই আক্রমণের পাঁচশত সাতান্ন বৎসর পরে পাঠানজাতীয় মোসলমানগণ উত্তর ভারতে অধিকার স্থাপন করেন। প্রাগুক্ত সময়ের মধ্যে কতিপয় আরবী লেখক পর্য্যটন বা বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত ভারতবিবরণী হইতে আমরা কতিপয় রাজ্যের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাকি। আমরা এখানে সেই সকল রাজ্যের নাম উল্লেখ করিতেছি। বল্লার (বল্লভীপুর), জুরজ (গুজরাট), তাফন (ঝিলাম ও সিন্ধুনদের মধ্যস্থিত রাজ্য), রুমি (পূর্ব্ববঙ্গস্থিত একটি রাজ্য), কাসবিন, দ্বান, কামরুন (কামরূপ), যাব এবং কুমার (কুমারিকা অন্তরীপ এবং ত্রিবাঙ্কুরের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য)।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অলবেরুণী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কনৌজ ভারতবর্ষের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত। কনৌজ যে কেবল ভৌগলিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থানুসারেই ভারতবর্ষের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত, তাহা নহে, রাজনৈতিক হিসাবেও ভারতবর্ষের কেন্দ্র-স্বরূপ সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।"

অলবেরুণী উজ্জয়িনীর নাম উল্লেখ করিয়া তারপর লিখিয়াছেন, উজ্জয়িনীর পশ্চিম দিকে ধার নামধেয় নগর অবস্থিত। এই নগর মালব রাজ্যের রাজধানী। ধার নগর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলে মহারাষ্ট্র দেশে উপনীত হইতে হয়, তারপর কঙ্কণদেশ, কঙ্কণদেশের রাজধানীর নাম টান। গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রের উপকূলে প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির অবস্থিত ছিল।

এই স্থান হইতে অনতিদূরে (গুজরাটের রাজধানী) অনহিলবার (পত্তন) অবস্থিত। অনহিলবার হইতে দক্ষিণ দিকে লার নগরে উপনীত হইতে হয়। তার পর বিরোজ এবং হিরঞ্জর নামক রাজদ্বয়ের রাজধানী পাওয়া যায়। এই উভয় নগরের পাদমূলই সাগরজলরাশি দ্বারা বিধৌত

অলবেরুণী কাশ্মীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ হিন্দুজাতির শাসনাধীন। পশ্চিমাংশে কতিপয় ক্ষুদ্র রাজা প্রতিষ্ঠিত। উত্তরভাগ এবং পূর্ব্বভাগের কিয়দংশে খোতান ও তিব্বতের তুর্কিগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার তিনশত বৎসর পরে ধর্ম্মপ্রাণ অশোকের অপূর্ব্ব সাধনায় সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হইয়াছিল এবং অন্যূন সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম রূপে পরিগণিত ছিল।

এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে অসংখ্য ভারতীয় নরপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, অশোক, কনিষ্ক, শিলাদিত্য প্রভৃতি চিরখ্যাত রাজন্যবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা জ্ঞানানুরাগী ও বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন। এক একটি বিহারে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। বৌদ্ধ রাজন্যবৃন্দ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপন জন্য তাঁহারা জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেন; এই সকল কার্য্যে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধশাস্ত্রানুমত চিকিৎসালয়, অন্নসত্র, পশু-চিকিৎসালয় প্রভৃতি শুভকর অনুষ্ঠানে তাঁহাদের অগাধ ব্যয় ছিল।

তাদৃশ রাজবল লাভ করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিদ্বন্দ্বী আর্য্যধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। মেগাস্থিনিসপ্রমুখ গ্রীক-লেখকগণের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ শ্রমণগণের বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ ব্রাহ্মণগণের বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ আছে। তৎকালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ সমান সম্মানভাজন ছিলেন। বৌদ্ধগণ বর্ণভেদ মানিতেন না। গ্রীক-লিখিত বৃত্তান্তে নানা বর্ণের লোকের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁহাদের বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, গ্রীক-লেখকগণ বৌদ্ধ ও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মীদের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন নাই।

মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক-লেখকগণের আবির্ভাবের ন্যূনাধিক আট শত বৎসর পরে বহুসংখ্যক চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে মহারাজ অশোক-নির্ম্মিত বৌদ্ধ স্তূপাদি সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তৎসমুদয়ের অনেকগুলিই ভগ্নস্তূপে পরিণত হইতেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণ নানাপ্রকার মূর্ত্তি উপাসনা প্রচলিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ উৎসবসমূহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইত; এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার কুসংস্কার বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালের রাজন্যগণ বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগীই হউন বা আর্য্যধর্ম্মানুরাগীই হউন, সমভাবে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন। সর্ব্বত্রই আর্য্য দেবালয় ও বৌদ্ধ মঠ পাশাপাশি দৃষ্ট হইত। আর্য্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট হইতে মূর্ত্তি উপাসনা গ্রহণ করিয়া অভিনব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নূতন উদ্যমে মস্তক উত্তোলন করিবার উপক্রম করিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

নবীন সন্ন্যাসী

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গদাই পালের পত্র।

একদিন যায়—দুদিন যায়—তিন দিন যায়, তবু খুলনা হইতে প্রত্যাশিত পত্র আসে না। গোপীকান্ত বাবু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছেন। কি হইল? গদাই কি করিল? ওয়ারেণ্ট বাহির হইল কি? এইসকল চিন্তা গোপীবাবুকে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ করিতেছে না। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ডাকপিয়ন আসিবার সময় তিনি রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে, চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন।

সঙ্গে টাকা যাহা আছে তাহা এত অল্প যে সাহস করিয়া অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছেন না। তাহাও প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে দুইবেলা অন্নধ্বংস করিতে তাঁহার

বড়ই লজ্জা করিতে লাগিল। তাই টাকা আসিবার পরদিন প্রভাতে, বেড়াইতে যাইবার ছল করিয়া তিনি বাজারে গেলেন এবং একটা পাঁচ ছয়সের পরিমাণ রুইমাছ কিনিয়া, মুটিয়ার মাথায় দিয়া লইয়া আসিলেন।

গৃহস্বামী বৃদ্ধ মাছ দেখিয়া বলিলেন—"আপনি কেন মাছ কিনে আনলেন?"

"মাছটা বেশ সস্তায় পাওয়া গেল—আর, একেবারে টাটকা, দেখুন না, এখনও ধড়ফড় করছে। তাই লোভ সামলাতে পারলাম না, কিনে ফেল্লাম।"

"তা বেশ করেছেন, কিন্তু দামটা আপনাকে নিতে হচ্ছে। কত দাম লেগেছে বলুন।"

গোপীবাবু বলিলেন "দাম অতি সংসামান্য। সে আর আপনাকে দিতে হবে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন- "সে কি কথা। আপনি অতিথি—অভ্যাগত। নিজের পয়সা খরচ করে আপনি আনবেন কেন?"

গোপীবাবুও দাম বলিবেন না, বৃদ্ধও ছাড়িবেন না। শেষে বৃদ্ধ রাগ করিতে লাগিলেন।

গোপীবাবু তখন হাসিয়া বলিলেন—"এই ত ঘোষজা মশাই!—আপনার ত ভেদবুদ্ধি গেল না। এই মাছটি যদি আপনার ছেলে দেবেনবাবু কিনে আনতেন তা হলে মাছ দেখে আপনি কত আহ্লাদ করতেন। আমি কিনে এনেছি বলে রাগ করছেন কেন?"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"অন্যায় করেছেন কিন্তু। আচ্ছা, এর সাজা আপনাকে দেওয়াচ্ছি। মুড়োটা আপনাকে খেতে হবে।"

পরদিন আবার গোপীকান্তবাবু বাজারে গিয়া এক টুকরী নূতন পাটনাই কপি কিনিয়া আনিলেন। তৎপর দিন দেবেন্দ্রবাবুর পুত্রটিকে বেড়াইতে লইয়া গেলেন, ফিরিবার সময় বালক একটা টানা বাজনা হাতে করিয়া বাড়ী আসিল, এবং বাজনা বাজাইয়া বাজাইয়া বাড়ীর লোকের কান ঝালাপালা করিয়া তুলিল।

চতুর্থ দিন অপরাহ্ণকালে বৈঠকখানায় বসিয়া গোপীকান্তবাবু ধূমপান করিতেছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি রেজিষ্টারি চিঠি দিল। সেই মাত্র চারিটা বাজিয়াছে উকীলবাবু তখনও কাছারি হইতে ফেরেন নাই। বৈঠকখানায় আর কেহ ছিল না। দুরু দুরু হৃদয়ে গোপীকান্তবাবু পত্র খুলিলেন। একখানি একশত টাকার নোট তাহা হইতে বাহির হইল। গদাই পাল একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছে। সেই পত্রখানি আধুনিক ভাষা ও বানানে পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নে তাহার একটি নকল দিলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

মহামতিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধামোহন গোস্বামী মহাশয় আশ্রিতজন-প্রতিপালকেষু। পত্র দ্বারায় ভৃত্যের বহু বহু প্রণাম জানিবেন। পরে মহাশয়কে শেষ পত্র লিখনান্তে আমি মোকাম খুলনা যাত্রা করি। তথায় গিয়া জনৈক মোক্তারের মুহুরির প্রমুখাৎ জানিতে পারিলাম, সেই দিবসই রমণ ঘোষ গঙ্গামণিকে লইয়া নালিস করিবার জন্য কাছারিতে গিয়া ক্ষুদিরাম মজুমদারকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিল। নালিসী দরখাস্ত মোক্তার-লাইব্রেরির বারান্দায় বসিয়া লেখা হইতেছিল কিন্তু নালিস দায়ের হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা সে ব্যক্তি কিছুই বলিতে পারিল না। ইহা শুনিয়া আমি গভীর রাত্রে উক্ত মোক্তারের বাসায় গিয়া তাঁহাকে অর্থলোভ দেখাইলাম। ক্ষুদিরাম বলিলেন "আমায় কি করিতে বলেন?" আমি বলিলাম—"বেশী কিছুই নয়, মোকদ্দমাটা যাহাতে ফাঁসিয়া যায় ইহাই আপনাকে করিতে হইবে।" তিনি বলিলেন—"কথাটা বড় বিপজ্জনক শেষে নিজে কি ফেসাদে পড়িয়া যাইব?" বহুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর তিনি বলিলেন "আমায় যদি হাজার টাকা দিতে পারেন তবে আমি মোকদ্দমাটা ডিসমিস্ করাইয়া দিব।" অনেক কসামাজা দরদস্তরের পর পাঁচ শত টাকায় ঠিক হইল—তাহার ২৫০৲ তখনি দাখিল করিলাম এবং বক্রী টাকা কার্য্য উদ্ধার হইলে দিব বলিলাম। ক্ষুদিরাম মোক্তার তখন বলিলেন "অদ্য কাছারিতে উহারা আসিয়া যখন আমায় নিযুক্ত করিল, বেলা তখন পৌনে বারোটা, ফৌজদারী দরখাস্তের ডাক হইয়া গিয়াছে। দরখাস্ত লইয়া যখন আমি এজলাসে গেলাম তখন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এ কারণে হাকিম দরখাস্ত লইলেন না। কল্য ইহা দাখিল হইবার

কথা।"—ইহা শুনিয়া আমি মূল দরখাস্ত খানা চাহিয়া লইয়া পড়িলাম। তাহাতে সমস্ত ঘটনাই সংক্ষেপে লেখা আছে। রমণ ঘোষ সে স্ত্রীলোকটাকে গভীর রাত্রে বাগানবাড়ীর তালা ভাঙ্গিয়া উদ্ধার করিয়াছে লেখা আছে, কিন্তু ছোটবাবু মহাশয়ের কোনও উল্লেখ নাই। সাক্ষীর তালিকাতেও তাঁহার নাম নাই। সম্ভবতঃ তিনি লোক-লজ্জা ভয়ে ভ্রাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় রমণ ঘোষ তাঁহার কথা চাপিয়া গিয়াছে। দরখাস্ত পড়িয়া আমি নিজহস্তে সেখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। মোক্তারকে বলিলাম "অন্য একখানি দরখাস্ত এরূপ লিখুন যে পড়িবামাত্র হাকিম ডিসমিস্ করিয়া দেয়। কল্য কৌশলে সেই দরখাস্তে বাদিনীর বুড় অঙ্গুলের টিপসহি লইয়া দাখিল করিয়া দিবেন।" মোক্তার বলিল "সেজন্য চিন্তা নাই। অদ্য কাছারিতে দুইখানা কার্ত্তিজ কাগজে বাদিনীর টিপসহি লইয়াছিলাম। এক খানাতেই দরখাস্ত সংকুলান হইয়া গেল বলিয়া দ্বিতীয় খানা আবশ্যক হয় নাই। সেই খানায় দরখাস্ত লিখিতে পারি। কিন্তু কি লেখা যায়?" তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই প্রকার দরখাস্ত লেখা হইল—

"আমার নাম শ্রীমত্যা গঙ্গামণি বেওয়া। আমার নালিস এই যে আমি কল্যাণপুরের জমিদার বাবু গোপীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কয়েকমাস যাবৎ চাকরি করি। বাবু মহাশয় অতি উগ্রপ্রকৃতির লোক এবং আমার সহিত সর্ব্বদা অসদ্ ব্যবহার করিতেন। বাবুর কামিজের সোনার বোতাম চুরি যাওয়াতে আমাকে অন্যায়রূপে সন্দেহ করেন এবং থানায় দিবার ভয় দেখান। এ কারণ আমি চাকরিতে জবাব দিয়া প্রাপ্য বেতন চাহি। কিন্তু বাবু মহাশয় আমায় বেতন না দিয়া গালাগালি করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। চারিমাসের বেতন নগদ ৩৲ হিসাবে মবলগে ১২৲ আমার পাওনা আছে। আমি থানায় নালিস করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু দারোগা আমার নালিস্ লয় নাই। অতএব প্রার্থনা অন্যায়ভাবে ভয়প্রদর্শন ও গালি দেওন অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ৫০৬ এবং ৫০৪ ধারা অনুসারে সমন বা ওয়ারেণ্ট যোগে আসামী তলব করিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।"

অতঃপর মোক্তার বাবু বলিলেন "এমন দুই তিন জন সাক্ষীর নাম লেখাইয়া দিন যে যদিও বা প্রমাণ তলব হয় তবে সেই সাক্ষিগণ আপনার প্রভুর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে।" আমি মহাশয়ের দুইজন ভৃত্য ও একজন দাসীর নাম লেখাইয়া দিলাম। মোক্তার বাবু বলিলেন—"কল্য এই দরখাস্ত দাখিল করিয়া স্ত্রীলোকটার হলফান্ জবানবন্দী করাইতে হইবে কিন্তু আমি এরূপভাবে প্রশ্ন করিব যে আসল কথা কিছুই প্রকাশ হইবে না এবং মোকদ্দমা সদ্য ডিসমিস হইয়া যাইবে।

পরদিন আমি ছদ্মবেশে আদালতে উপস্থিত হইলাম। দরখাস্ত পেশ হইলে গঙ্গামণি সাক্ষীমঞ্চে উঠিলে মোক্তার বাবু এইরূপ সওয়াল করিতে লাগিলেন—

প্রশ্ন। কার নামে নালিস করিস?

উত্তর। গোপী বাবুর নামে।

প্র। গোপী বাবু কি? কোথাকার গোপী বাবু?

উ। কল্যাণপুরের জমিদার গোপীকান্ত বাড়ুয্যে।

প্র। কতদিন তাঁর বাড়ীতে ছিলি?

উ। তিন চার মাস।

প্র। তোর সঙ্গে বাবু কি রকম ব্যাভার করতেন?

উ। খারাপ।

প্র। টাকা দিয়াছিলেন?

উ। না।

প্র। কবে সে বাড়ী থেকে চলে এলি?

উ। কালীপূজোর রাত্রে।

প্র। কার সঙ্গে এলি?

উ। রমণ ঘোষ। সম্পর্কে আমার দেওর হয়।

প্র। থানায় গিয়েছিলি?

উ। হ্যাঁ।

প্র। দারোগা কি বল্লে?

উ। বল্লে তুই মিথ্যে নালিস করতে এসেছিস তোকেই জেলে দেব।

প্র। তোর নালিস্ সত্যি না মিথ্যে?

উ। সত্যি।

প্র। এই দেখ দরখাস্ত। বুড়ো আঙ্গুলের এ টিপসহি তোর?

উ। হ্যাঁ।

জবানবন্দি শেষ হইলে হাকিম দরখাস্ত পড়িয়া মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন, বলিলেন ফৌজদারীতে এ মোকর্দ্দমা চলিবে না—ইচ্ছা হয়ত দেওয়ানী করতে পার।

আমি ভাবিলাম আপদ চুকিয়া গেল। কিন্তু রমণ ঘোষ বাহিরে আসিয়া মোক্তার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিল। বলিল "আসল কথা আপনি কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।" মোক্তার বলিলেন "আসল কথা সকলই দরখাস্তে লেখা রহিয়াছে।" তাঁহার ব্যবহারে রমণ ঘোষ সন্দিগ্ধ হইয়া অন্য মোক্তার নিযুক্ত করিয়া নকলাদি লইল। নকল পড়িয়া ক্ষুদিরাম মোক্তারের চাতুরী সমস্তই জানিতে পারিয়াছে। পরদিন মোক্তারের বিরুদ্ধে এফিডেবিট করিয়া নূতন মোকর্দ্দমা দায়ের করিবার জন্য সকল মোক্তারের নিকট গিয়াছিল কিন্তু সকলেই বলিয়াছে জানত হে বাপু কাকের মাংস কাকে খায় না। আমরা একজন মোক্তারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিতে পারিব না।—পরে রমণ ঘোষ ছোট বড় অনেক উকীলের কাছেই যায় কিন্তু প্রত্যেক উকীলেই বলিয়াছে—দেখ বাপু, মোক্তারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিলে সকল মোক্তার আমার উপর চটিয়া যাইবে, তাহাতে আমার ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি।—অবশেষে একজন নূতন উকীল এই সর্ত্তে ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছে যে দরখাস্তে কেবল মাত্র লেখা হইবে যে প্রথম দিন ভুলক্রমে ওরূপ দরখাস্ত পড়িয়াছিল, প্রকৃত ঘটনা এই এই; মোক্তারের বিরুদ্ধে কোন কথা লেখা বা বলা হইবে না। পরদিন সেই দরখাস্ত পড়িলে হাকিম প্রমাণ তলব করিয়াছেন। সাক্ষিগণের জবানবন্দি লইয়া যদি মোকর্দ্দমা সত্য বলিয়া হাকিমের বিশ্বাস হয় তবেই আসামীর উপর সমন হইবে নচেৎ মোকর্দ্দমা পুনরায় ডিসমিস হইবে। আগামী ২৯শে কার্ত্তিক শুনানির দিন ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং এখনও দশ দিন বাকী। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিয়াছি, এ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, রমণ ঘোষকে প্রথমে সরান আবশ্যক। সে-ই মোকর্দ্দমার একমাত্র তদ্বিরকারক, সে না থাকিলে মোকর্দ্দমা চালাইবার মত আর কেহ রহিল না। আপনার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মোহিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মোকর্দ্দমায় কোন রূপ সাহায্য করিবেন এমন বোধ হয় না। তাঁহার সে উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি স্বয়ং একজন সাক্ষী হইতেন সন্দেহ নাই। এখন রমণ ঘোষকে সরাইবার একমাত্র উপায়, তাহাকে কোনও মোকর্দ্দমায় ফাঁসাইয়া ফেলা। দারোগাকে টাকা দিয়া আমি সমস্ত ঠিক করিতে পারি। তদ্ভিন্ন, সেই স্ত্রীলোকটাকেও কোনও উপায়ে সরাইতে হইবে। হুজুর আমাকে যে হাজার টাকা দিয়াছিলেন, পুলিসকে দেওয়ার পর তাহার ৩০০৲ বাকী ছিল। সেই ৩০০৲ এবং সরকারী তহবিল হইতে ২০০৲ একুনে ৫০০৲ লইয়া আমি খুলনায় আসি। সে টাকার ২৫০৲ মোক্তারকে দিয়াছি, হুজুরকে ১০০৲ এই পত্র মধ্যে পাঠাইলাম এবং আমার রাহা খরচ বাসা খরচ ডাকমাসুল ইত্যাদি বাবদে ১০৷৵১০ খরচ হইয়াছে। আমার হস্তে এখন ১৩৯৷৵১০ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি অদ্যই দরিয়াপুর যাত্রা করিতেছি এবং দারোগাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া রমণ ঘোষকে ফাঁসাইবার বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু দারোগা যেরূপ অর্থলোলুপ ব্যক্তি এবং হুজুরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা যেরূপ সঙ্গীন—সে যে পাঁচ সাত শত টাকার কমে সম্মত হয় এমন আশা অল্প। গঙ্গামণিকে সরাইবার জন্যও টাকা ব্যয় হইবে। আগামী ২৯শে কার্ত্তিক গঙ্গামণি কিম্বা রমণ ঘোষ আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মোকর্দ্দমা তৎক্ষণাৎ খারিজ হইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে আর কোনও রূপ আশঙ্কা থাকিবে না, হুজুরও নিরাপদে গৃহে ফিরিতে পারিবেন। অতএব শ্রীচরণে নিবেদন, আমাকে আট শত টাকা দিবার জন্য সদর কাছারির খাজাঞ্চির নামে ফেরৎ ডাকে এক হুকুমনামা প্রেরণ করা হউক। আমি প্রত্যেক পয়সাটির হিসাব রাখিতেছি। হুজুর নিরাপদে গৃহে ফিরিলে সে জমা খরচ হুজুরে দাখিল করিব। যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে কার্য্য উদ্ধার করিতে সর্ব্বদাই এ ভৃত্য চেষ্টিত আছে। অত্র কুশল। আগামীতে শ্রীচরণের কুশল লিখিয়া সন্তোষ করিবেন। ইতি তারিখ ১৯শে কার্ত্তিক, মোং খুলনা।

আজ্ঞাকারী

শ্রীগদাধরচন্দ্র পাল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া গোপী বাবুর দুশ্চিন্তা কতকটা দূর হইল। যদিও বা মোকদ্দমাও হয়, ক্ষুদিরাম মে'ক্তার তাঁহার পক্ষের এক প্রধান সাক্ষী। প্রথমে স্ত্রীলোকটা ক্ষুদিরামের নিকট সম্পূর্ণ অনুরূপ উক্তি করিয়াছিল। পত্রখানি সযত্নে তাঁহার নবক্রীত টিনের বাক্সে রাখিয়া দিলেন।

বিশ্বস্ত ভৃত্যের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার বহু প্রশংসা করিয়া গোপীকান্ত বাবু তাহাকে পত্রোত্তর লিখিলেন। বলিলেন "সদর খাজাঞ্চির নিকট হুকুমনামা পাঠাইলাম, সে তোমায় এক হাজার টাকা দিবে। মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য তুমি আট শত রাখিয়া, বাকী দুই শত রেজিষ্টারি পত্রযোগে আমায় পাঠাইয়া দিও। আগামী কল্য আমি ৺বৈদ্যনাথ যাত্রা করিব। পৌঁছিয়া তথাকার ঠিকানা তোমায় জানাইব। সেই ঠিকানায় তুমি টাকা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠাইবে, এবং অন্যান্য সংবাদও লিখিবে।"—পত্র শেষে তিনি নিজের নূতন নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওঘর যাত্রা।

বেলা পাঁচটা বাজিলে দেবেন্দ্র বাবু কাছারি হইতে ফিরিলেন। দেখিলেন বহির্ব্বাটীর বারান্দায় একজন জমিদারী পাইক বসিয়া আছে। দেবেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিল। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা থেকে আসচ ?"

"এজ্ঞে বারুইপুর হতে।"

"বারুইপুর থেকে ? বেশ বেশ। কখন এলে ?"

"এজ্ঞে এই আসছি।"

"বাড়ীর খবর ভাল ? বাবু ভাল আছেন ?"

"এজ্ঞে। সবাই ভাল, কেবল পুঁটু দিদির ব্যামো। তাই তেনার শরীল সারাতে বাবু পশ্চিম যাচ্ছেন। আজ রাতে এখানে এসে পৌঁছবেন, কাল রেলে রওয়ানা হবেন।"

"খুকীর অসুখ ? কি অসুখ ?"

"এজ্ঞে জ্বর হয়, পেট নামে। শরীল শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে।"

"বটে !—তা, বাবু কখন এসে পৌঁছবেন ?"

"তিন পহর বেলায় লৌকো ছাড়বার কথা। এখানে এই রাত নটা দশটার সময় এসে পৌঁছবেন।"

"কে কে আসছেন ?"

"বাবু, মা ঠাকরুণ, পুঁটু দিদি আর ছোট খোকা; ঝি, চাকর, বামুন, তারা আর একখানা লৌকো করে আসছে।"

"বাড়ীতে বলেছিস ?"

"এজ্ঞে না।"

"আচ্ছা বস।"—বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার পিতা বাহির হইয়া আসিলেন। তিনিও পাইককে উপরোক্ত মত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। শেষে বলিলেন—"পশ্চিমে কোথা যাবেন ?"

করযোড়ে পাইক বলিল—"এজ্ঞে সেটা বলতে লারনাম। শুনেছিলাম কিন্তু বিস্মরণ হয়ে গেছি।"

মাধবচন্দ্র বাবু বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া গোপী বাবুকে দেখিয়া বলিলেন—"রাধামোহন- আজ আমার ভাগনে আসছে।"

"কোথা থেকে আসছেন ?"

"বারুইপুর থেকে। সে সেখানকার জমিদার। তার মেয়েটির অসুখ তাই হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাচ্ছে। কাল আহারাদি করে পশ্চিমের গাড়ীতে রওনা হবে বলেছে। যদিও আমি তাকে অত শীগ্‌গির ছাড়ছিনে।"

গোপী বাবু বলিলেন—"আমাকেও কাল রওয়ানা হতে হবে। আজ আমার টাকা এসেছে।"

"বাড়ীর সব খবর ভাল ?"

"আজ্ঞে হাঁ। সবাই ভাল আছে।"

"তা তোমাকেই কাল ছাড়ব মনে করেছ বুঝি ? দুদিন আরও থাকতে হবে। আমি একবার বাজারে যাই। কুটুম্বর ছেলে আসছে, একটু ভাল করে খাওয়াতে দাওয়াতে হবে ত।" বলিয়া তিনি একজন ভৃত্য সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাজার হইতে নানাবিধ ফল, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন।

সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্র বাবু আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। গোপী বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যিনি আসছেন, তিনি আপনার পিসতুতো ভাই হন বুঝি ?"

"হ্যাঁ। আমার পিসতুতো ভাই। বারুইপুরের জমিদার।"

"নাম কি?"

"যতীন্দ্রনাথ বসু। জমিদারের ছেলে হলেও, বেশ লেখাপড়া শিখেছে, বি-এ, পাস। সে আবার একজন মস্ত লেখক। মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লেখে। সেদিন ধূমকেতু কাগজে তার একটা লেখা দেখছিলাম—প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল কি না। রামায়ণ টামায়ণ থেকে অনেক শ্লোক তুলে প্রমাণ করে দিয়েছে, রাজা দশরথের সময় অযোধ্যায় বন্দুক কামান এ সমস্তই ছিল।"

প্রাচীন ভারতে বন্দুকের ভাবনায় গোপীকান্ত বাবুর কিছুমাত্র শিরঃপীড়া না থাকাতে, তিনি ও প্রসঙ্গে কান দিলেন না। কলেজের উচ্চশিক্ষিত নব্যযুবকগণকে তিনি বড় ডরাইতেন। গোপীকান্ত বাবু দেওঘরে যাইবেন স্থির করিয়াছেন—সে লোকটিও বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যদি দেওঘরেই যাইব বলে তাহা হইলে বড়ই অপ্রীতিকর হইবে। আবার গৃহস্বামী শাসাইয়াছেন কল্য তিনি গোপীকান্ত বাবুকে ছাড়িবেন না। সে হইবে না, কল্য গোপীকান্ত বাবুকে যাত্রা করিতেই হইবে।

গোপী বাবুকে নীরব দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজা দশরথের কামান বন্দুক ছিল এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?"

গোপী বাবু বলিলেন—"অ্যাঁ? কি জিজ্ঞাসা করলেন?"

এমন সময় মাধব বাবু অন্তঃপুরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—"দেবেন, ও দেবেন—একবার ভিতরে এস ত। কোন ঘরটায় যতীনের বিছানা হবে ঠিক করা যাক্।"

"আসছি।"—বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং বন্দুকের কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় যতীন বাবু সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সে রাত্রে গোপী বাবুর সহিত তাঁহার সামান্য আলাপ হইল মাত্র। তাহাতেই গোপী বাবু বুঝিলেন, লোকটা শিক্ষিত হইলেও, ভয়ঙ্কর নহে।

পরদিন প্রভাতে সাতটার পর যতীন্দ্র বাবু উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। যতীন্দ্র বাবুর চা আসিল। তিনি গোপী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি চা খান না?"

গোপী বাবু চা জিনিষটার খুবই পক্ষপাতী। গৃহে তিনি প্রত্যহই প্রভাতে চা পান করিতেন। কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি "সদব্রাহ্মণ" বলিয়া তাঁহার খ্যাতি জন্মিয়া যাওয়াতে, প্রাভাতিক চা পানের সুযোগ ঘটে নাই। বেলা নয়টার সময় বৃদ্ধের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। স্নানান্তে বৃদ্ধকে দেখাইবার জন্য ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক একটু ঘটা করিয়াই করিতে হইত। যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন সাড়ে দশটা—সুতরাং চা পানের কথাও কেহ বলিত না।

অদ্য এই ধূমায়মান পেয়ালাটি দেখিয়া তাঁহার বড়ই লোভ হইল। বিশেষতঃ বৃদ্ধও সেখানে উপস্থিত নাই। তাই গোপীকান্ত বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ-খাই বৈ কি মাঝে মাঝে।"

যতীন বাবু পেয়ালাটি গোপী বাবুর দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন—"এই পেয়ালাটি আপনি নিন। আমি অন্য পেয়ালা আনাচ্ছি। ওরে—যা, বাড়ীর ভিতর থেকে আর এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।"

গোপী বাবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলেন। আবার ইহাও ভাবিলেন, বুড়া আসিবার পূর্ব্বেই পেয়ালাটা শেষ করিয়া ফেলাই ভাল। যতীন বাবু বলিলেন—"খাননা মশায়—আর এক পেয়ালা ত আসছে এখনি।" গোপী বাবু চা পান করিতে করিতে শঙ্কিত নেত্রে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরের দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ভৃত্য দ্বিতীয় পেয়ালা চা আনিয়া দিল। চা পান করিতে করিতে যতীন বাবু বলিলেন—"কাল রাত্রে বাড়ীর মধ্যে আপনার সমস্ত ইতিহাস শুনলাম রাধামোহন বাবু। কি বদমায়েসের পাল্লাতেই পড়েছিলেন! কত বদমায়েস্ যে সন্ন্যাসী সেজে বেড়ায় তার ঠিকানা নেই। কেউ বা জেল থেকে পালিয়ে এসেছে, কেউ বা খুন কি ডাকাতি করেছে, পুলিসের ভয়ে সন্ন্যাসী সেজে বেড়াচ্ছে। কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই। আপনাকে খুব বিপদে ফেলেছিল ত!"

"বিপদে ফেলেছিল বৈ কি। যাচ্ছিলাম পশ্চিম—টাকার অভাবে এইখানেই সপ্তাহ কেটে গেল। কাল বাড়ী থেকে আমার টাকা এসেছে। আজই আমি রওয়ানা

হবে। কিন্তু মাধব বাবু শাসিয়েছেন, আজ আমায় যেতে দেবেন না। আপনাকেও আজ যেতে দেবেন না বলেছিলেন।"

যতীন বাবু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন—"রাধামোহন বাবু সে ঠিক হয়ে যাবে। আমি পাঁজি দেখেছি। কাল অশ্লেষা, পরশু মঘা, তার পরদিন বৃহস্পতিবার, তার পরদিন অমাবস্যা, তার পরদিন প্রতিপদ্। আজকে না গেলে পাঁচদিন এখন যাত্রা নাস্তি। এই বলে মামার কাছ থেকে অনুমতি নেব—আপনারও ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দেব। আপনি কোথা যাবেন?"

"আমি দেওঘর যাব মনে করছি।"

"দেওঘর? আমিও ত দেওঘর যাচ্ছি। চমৎকার জায়গা মশাই শীতকালে। আমার মেয়েটির শরীর বড় কাহিল, তাই তাকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাচ্ছি। বেশ, তা হলে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। কোন গাড়ীতে যাওয়া যায় বলুন দেখি?"

এমন সময় মাধব বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। শেষ কথাগুলি শুনিয়া তিনি বলিলেন—"এখনি গাড়ীর খোঁজ নেবার তাড়াতাড়ি কি? দুদিন থাক—তারপর যেও। রাধামোহনকেও আজ যেতে দিচ্ছিনে।"

যতীন বাবু ঘাড়টি হেঁট করিয়া, গোপী বাবুর প্রতি বক্রনয়নে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞা, তাহলে বেশই হত। কিন্তু কাল আবার অশ্লেষা, পরশু মঘা, তার পরদিন বৃহস্পতিবার, তার পরদিন অমাবস্যা, তার পরদিন প্রতিপদ। আজ না বেরিয়ে পড়লে পাঁচ ছ দিন দেরী হয়ে যায়। খুকীর শরীর বড় খারাপ—অতদিন দেরী করাটা ঠিক হবে কি?"

"তুমি পাঁজি দেখেছ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

শুনিয়া মাধব বাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেবেন্দ্র বাবু আসিলে বলিলেন—"ওহে দেবেন, যতীন ত আজই যেতে চায়। বলছে পাঁচদিন আবার যাত্রা নেই।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন—"তা হলে অবিশ্যি নাচার।"

গোপী বাবু বলিলেন—"অত দিন দেরী করা আমারও ত চলবে না। তীর্থ সেরে শীঘ্র আমায় বাড়ী ফিরতে হবে।"

মাধব বাবু বলিলেন—"কি বলব। বলুন! তা, যতীন তুমি কোন গাড়ীতে যেতে চাও?"

গোপী বাবু বলিলেন—"বেলা একটায় একখানা পশ্চিমের প্যাসেঞ্জার আছে। একখানা সন্ধ্যাবেলায়। আমি একটার গাড়ীতেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি।"

যতীন্দ্র বাবু বলিলেন—"আমিও একটার গাড়ীতে যেতাম। কিন্তু সে গাড়ীতে গেলে অনেক রাত্রে দেওঘরে পৌঁছতে হবে। খুকীর হিম লাগবে। সে পাহাড়ে দেশ, হিমটে কিছু বেশী। সন্ধ্যার গাড়ীতে যাওয়াই আমার ভাল। তা রাধামোহন বাবু, আপনিও কেন সন্ধ্যার গাড়ীতে চলুন না।"

"সন্ধ্যার গাড়ীতে?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন—"সেই ত বেশ হবে। এক সঙ্গে যাওয়াই ভাল।"

মাধব বাবু বলিলেন—"সেই ভাল হবে। যতীন একলাটি, ছেলেপিলে নিয়ে যাচ্ছে। রাত্রিকাল—আজকাল আবার ট্রেনে বিপদ আপদ আছে। রাধামোহন তুমি যতীনের সঙ্গেই যাও। তা হলে আমিও, কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

গোপী বাবু সম্মত হইলেন। যতীন বাবু তখন বলিলেন—"রাধামোহন বাবু—দেওঘরে আপনি কতদিন থাকবেন?"

"মাসখানেক বড় জোর।"

"বাড়ী টাড়ী ঠিক করেছেন?"

"না, বাড়ী ঠিক করিনি। এখন গিয়ে পাণ্ডাদের বাড়ীতেই উঠব। তারপর একটা বাড়ী দেখে নেওয়া যাবে।"

"আমি একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। এক কায করুন না। পাণ্ডাদের বাড়ীতে উঠে কেন মিছে কষ্ট পাবেন? এখন আপাততঃ আমার বাড়ীতে গিয়েই উঠবেন। তারপর একটা সুবিধা মত বাড়ী আপনাকে ঠিক করে দেওয়া যাবে। আপনি ত সেখানে এক মাস মাত্র থাকবেন? অবিশ্যি আপনাকে আমি অনুরোধ করতে সাহস করিনে। এক মাসের জন্যে একটা বাড়ী নেবারই বা প্রয়োজন কি? আপনি ত একলা মানুষ। এক মাস যদি, আমার ওখানে

থাকেন তা হলে আমি বড়ই খুসী হব। কি বলেন মামা ?”

বৃদ্ধ বলিলেন—“সে যদি হয় ত অতি উত্তমই হয়। তাই কর রাধামোহন। যতীন ছেলেমানুষ, বউমাও ছেলেমানুষ। দুটি ছেলেমানুষ যাচ্ছে, দুটি শিশুকে নিয়ে—তার মধ্যে একটি আবার রুগ্ন। বিদেশ বিভুঁই, কোনও অভিভাবক নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই। এরকম অবস্থায় ওদের যেতে দিতে আমার ত মনই সরছিল না। তুমি ওদের সঙ্গে থাকলে তোমার কাছে ওরা অনেক সাহায্য পাবে।”

গোপী বাবু একটু চিন্তা করিলেন। এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, যতীন্দ্র বাবু লোকটি বেশ অমায়িক, নিরহঙ্কার, উচ্চ শিক্ষিত হইলেও ঝাঁঝালো নহে। উঁহার সঙ্গ অপ্রীতিকর হইবে না। সুতরাং বলিলেন—“তা বেশ,—আমি ওঁর ওখানে গিয়েই কাল উঠব। আমায় যদি কাছাকাছি একটা বাড়ী খুঁজে দেন,—তা হলে আমি সর্ব্বদা ওঁদের দেখতে শুনতেও পারব। যতীন বাবু ওঁর ওখানেই থাকবার জন্যে যে আমায় অনুরোধ করেছেন, তাতে ওঁর ভদ্রতা খুবই প্রকাশ পাচ্ছে। ওঁর সৌজন্যে আমি আপ্যায়িত হলাম। কিন্তু এক মাস ধরে ওঁর উপর দৌরাত্ম্য করাটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। বিদেশ বিভুঁই বলে শুধু আমিই যে ওঁদের কাজে লাগতে পারি তা নয়। ওঁর দ্বারাও আমার অনেক উপকার হতে পারবে।”

সকলের মনের মত সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। গোপী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“যতীন বাবু, দেওঘরে আপনার সে বাড়ীর ঠিকানাটা কি হবে? বাড়ীতে সে ঠিকানাটা আমার লেখা দরকার।”

যতীন বাবু বলিলেন—“আমার সে বাড়ীর নাম লালকুঠী। লালকুঠী—দেওঘর, এই ঠিকানা দিলেই চিঠি আসবে।”

গোপী বাবু গদাই পালকে চিঠি লিখিয়া দিলেন—“লালকুঠী—দেওঘর, এই ঠিকানায় আমায় টাকা পাঠাইবে এবং পত্রাদি লিখিবে।”—সন্ধ্যাকালে, দাস দাসীকে পুরস্কৃত করিয়া, যতীন্দ্র বাবুর সঙ্গে গোপী বাবু দেওঘর যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত

বিদেশে ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে অধুনা বঙ্গদেশে কিঞ্চিৎ চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। আরবজাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতীয় বাণিজ্যপোতগুলি যে মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, মিশর প্রভৃতি মহাদেশে গমন করিত তাহা এখন সর্ব্ববাদীসম্মত। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশীয় ভিক্ষু ফা-হিয়ান যবদ্বীপ হইতে ভারতীয় বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশ হইতে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গ্রীক পর্য্যটক ও গ্রন্থকারগণও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে ভারতীয় বাণিজ্যতরীগুলি এসিয়াখণ্ডের দক্ষিণকূল অবলম্বন করিয়া মিশরে উপনীত হইত, কিন্তু এপর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন অংশে ভারতীয় বাণিজ্যপোতের মহাসমুদ্র অতিক্রমণের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

সপ্তসপ্ততিবর্ষ পূর্ব্বে কাপ্তেন জেমস্ লো (Captain James Low, M. A., S. C.) মলয় উপদ্বীপে বর্ত্তমান প্রভিন্স ওয়েলেসলি (Province Wellesley) নামক প্রদেশে একখানি খোদিতলিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরের অক্টোবর মাসে তিনি মেজর সাদারল্যাণ্ড্ নামক একজন ইংরাজের হাতে উহার একখানি প্রতিলিপি এসিয়াটীক্ সোসাইটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।* ইহার একবৎসর পরে খোদিতলিপিযুক্ত প্রস্তরফলকখানিও আবিষ্কর্ত্তা কর্ত্তৃক এসিয়াটীক্ সোসাইটীতে প্রেরিত হয় ও উক্ত বৎসরে এসিয়াটীক্ সোসাইটীর পত্রিকায় উক্ত প্রস্তরখণ্ডের একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।† এসিয়াটীক্ সোসাইটীর চিত্রশালার দ্রব্যাদি লইয়া যখন কলিকাতা মিউজিয়ম গঠিত হয় তখন এই প্রস্তরখণ্ডও এসিয়াটীক্ সোসাইটীর গৃহ হইতে নবনির্ম্মিত কলিকাতা মিউজিয়মে আনীত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ মৃত ডাক্তার এণ্ডারসন্ প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তালিকায় এই প্রস্তরখণ্ডের নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন:—

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1834, Vol. III, p. 591.

† *Ibid* Vol. IV, p. 56, pt. III.

তিনখানি শিলালিপি।

"শিলাখণ্ড ২-২'' উচ্চ, নিম্নে ১-১॥ ও ঊর্দ্ধে ১১॥ প্রশস্ত। ইহার চারিদিকে খোদিতলিপি ও সম্মুখে একটি ব্রহ্মদেশীয় স্তূপের প্রতিকৃতি আছে। স্তূপের ভিত্তি চতুষ্কোণ এবং উচ্চ এবং স্তূপটী বৃত্তাকার ও তদূর্দ্ধে একটী দণ্ডে সাতটি ছত্র ও সর্ব্বোপরি দুইটি অর্দ্ধবৃত্ত।"

ডাক্তার এণ্ডারসনের বিবরণও যথাযথ নহে, সুতরাং মূল ইংরাজী বিবরণ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম :—

M. P. I.—A slab, 2'-2" high, by 1'-1'50" in breadth at the lower end, and 11'50" at the other extremity: the curved and inscribed face being narrower than the back, which is plain, the sides being beveled off to the back, each side as well as the face on each of its margins being inscribed. The figure of a Burmese pagoda is delineated in outline between the two last-mentioned inscriptions. The base of the pagoda is apparently nearly square, and of some height; whilst the dome-like portion is almost round and capped by a long stalk-like pinnacle, with seven umbrellas at wide intervals on the round stem, which ends above in two half circles, inverted towards each other. The figure given of this sculpture in the Journal of the Asiatic Society is inaccurate. Nothing has been placed on record regarding the discovery of the slab beyond what follows.—Catalogue and Handbook on Archæological Collections in the Indian Musium, Part II, p. 119.

গত ছিয়াত্তর বৎসরের মধ্যে এই খোদিতলিপিটির প্রতি বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাক্তার কার্ণ (Heinrich Kern) ওলন্দাজভাষায় প্রকাশিত "Jaarteling" নামক একখানি পত্রিকায় উক্ত খোদিতলিপির পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত পুস্তক ভারতবর্ষীয় কোনও পুস্তকাগারে না থাকায় তাহার উদ্ধৃত পাঠ বা তৎসম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করিবার সুযোগ হয় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে তৎকালে সুইটজরলণ্ডের Darosplatz-প্রবাসী জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোকের নিকট অবগত হইয়াছিলাম যে ডাক্তার কার্ণ এই খোদিতলিপি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রস্তরখণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে দাক্ষিণাত্যে খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে প্রচলিত অক্ষরে দুই পংক্তি খোদিতলিপি আছে :—

১। সর্ব্বেণ প্রকারেণ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বথা সর্ব্ব
২। স্মিন্ধজাতাসন্ন।

প্রস্তরখণ্ডের সম্মুখভাগে একটি স্তূপ আছে ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইহার দুই পার্শে দুইটি খোদিতলিপি ছিল, তন্মধ্যে বামপার্শ্বের খোদিতলিপিটি লুপ্তপ্রায়, তবে তাহার যতটুকু বর্ত্তমান আছে তাহা হইতে স্পষ্ট বোধ হয় যে উভয় পার্শ্বের খোদিতলিপিতে একই কথা লিখিত ছিল।

দক্ষিণ পার্শ্বের খোদিতলিপিতে নিম্নলিখিত কয়টি কথা পাঠ করা যায় :—

রাজ্ঞী নাচ্ছিয়াতি কর্ম্ম জন্মনঃ কর্ম্মকারেণ।

ফলকের উর্দ্ধদেশ ভগ্ন হওয়ায় প্রথম অক্ষরের উর্দ্ধদেশ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে। অনুমান হয় নাচ্ছিয়াতি-নাম্নী কোন অনার্য্যবংশসম্ভূতা রাজ্ঞীর আদেশে এই শিলাপট্ট জন্মনামধেয় কোন কর্ম্মকারকর্ত্তৃক খোদিত হইয়াছিল। বামপার্শ্বের খোদিতলিপিতে দুইটি অক্ষরমাত্র পাঠ করা যায় :—

(রা) জ্ঞী না (চ্ছিয়াতি)…

শিলাপট্টের বামপার্শ্বের খোদিতলিপি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়-জনক। ইহাতেও দুইটী পংক্তি আছে, কিন্তু প্রথম পংক্তির দুইটী অক্ষর ব্যতীত আর কিছুই পাঠ করা যায় না :—

১। …সর্ব্ব…

২। মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তস্য রক্তমৃত্তিকবাস

(কস্য)…

খোদিতলিপিটির অসম্পূর্ণতার জন্য ইহার অর্থবোধ করা কঠিন।

প্রথম কথা, রাজ্ঞী নাচ্ছিয়াতির আদেশে জন্মনামক কর্ম্মকারকর্ত্তৃক শিলাখণ্ড তক্ষণ।

দ্বিতীয় কথা, মহানাবিক শব্দ। মহানাবিক বলিলে সম্ভবতঃ নাবিকগণের অধ্যক্ষ বা পোতাধ্যক্ষ বুঝায়। প্রাচীন খোদিতলিপিসমূহে এইরূপ শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। মহাদণ্ডনায়ক শব্দে প্রধান বিচারপতি, মহা প্রতীহার শব্দে পুলিস বিভাগের অধ্যক্ষ ও মহাপুরোহিত শব্দে যখন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পুরোহিতকে বুঝায়, তখন পোতাধ্যক্ষের যে মহানাবিক উপাধি হইবে ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নহে। ইহা হইতে অনুমান হইতেছে যে খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে Master Mariner পদ ছিল।

তৃতীয় কথা "রক্তমৃত্তিক"। ইহা বোধ হয় ভ্রমবশতঃ রক্তমৃত্তিকের পরিবর্ত্তে লিখিত হইয়াছে। মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত রক্তমৃত্তিকনামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রক্তমৃত্তিকনামক কোন স্থান পাওয়া যায় না। কিন্তু উত্তরাপথে তিনস্থানে প্রাচীন রক্তমৃত্তিক নগরের অবস্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে :—

(১) রাঙ্গামাটী—আসাম।

(২) রাঙ্গামাটী—চট্টগ্রাম।

(৩) রাঙ্গামাটী—মুর্শিদাবাদ।

ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও আসামের রাঙ্গামাটী সম্ভবতঃ বুদ্ধগুপ্তের আবাসস্থান ছিল না, কারণ এতদুভয় সমুদ্র হইতে বহুদূরবর্ত্তী; সুতরাং চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটী বুদ্ধগুপ্তের আবাসস্থান ছিল।

চতুর্থ কথা, খোদিতলিপিতে দক্ষিণদেশীয় অক্ষর ব্যবহার। ইহার উত্তর অতি সহজ। মলয় উপদ্বীপে দাক্ষিণাত্যবাসী আর্য্যগণই সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন ও তাঁহাদিগের চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত বর্ণমালাই প্রচলিত হয়; প্রাচীনকালে মলয় উপদ্বীপ হইতে শ্যামদেশ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাপথে প্রচলিত বর্ণমালাই ব্যবহৃত হইত; উত্তরাপথের বর্ণমালা মলয় উপদ্বীপে প্রচারিত হয় নাই। শেষ কথা, মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের সহিত রাজ্ঞী নাচ্ছিয়াতির সম্পর্ক। ইহার তিনটি সদুত্তর আছে :—

(১) রাজ্ঞী নাচ্ছিয়াতির রাজত্বকালে বুদ্ধগুপ্তের ব্যয়ে এই শিলাপট্ট খোদিত হইয়াছিল।

(২) রাজ্ঞী নাচ্ছিয়াতির আদেশে ও ব্যয়ে এই শিলা-পট্ট খোদিত হইয়াছিল, মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত দূরদেশ হইতে প্রস্তর আনয়ন বা তদ্রূপ কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

(৩) শিলাপট্ট তক্ষণের ব্যয় উভয়েই বহন করিয়া-ছিলেন।

খোদিতলিপিগুলি জীর্ণ হওয়ায় স্পষ্টভাবে কোন কথা বলিবার উপায় নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে উত্তরাপথের রক্তমৃত্তিক গ্রাম বা নগরবাসী বুদ্ধগুপ্ত নামক মহানাবিক মহাসমুদ্রের অপর পারে এই শিলাখণ্ডের তক্ষণকার্য্যে বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিবিধ নির্ব্বাণ

বৌদ্ধশাস্ত্রে দ্বিবিধ নির্ব্বাণের উল্লেখ আছেঃ—(১) 'উপাদিশেষ' নির্ব্বাণ এবং (২) 'অনুপাদিশেষ' নির্ব্বাণ। 'উপাদিশেষ' নির্ব্বাণের সহিত 'সবিকল্পক' সমাধি কিম্বা 'সম্প্রজ্ঞাত' সমাধির তুলনা দেওয়া যাইতে পারে এবং 'অনুপাদিশেষ' নির্ব্বাণ 'নির্ব্বিকল্পক' সমাধি কিম্বা 'অসম্প্রজ্ঞাত' সমাধির অনুরূপ। এই দ্বিবিধ নির্ব্বাণের বিষয় 'ইতিবুত্তক' নামক পালিগ্রন্থে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে :—

"ভগবান (বুদ্ধ) এই প্রকারই বলিয়াছেন, অর্হৎ এই প্রকারই বলিয়াছেন—ইহা আমি শুনিয়াছি :—হে ভিক্ষুগণ। নির্ব্বাণ-ধাতু দ্বিবিধ। সে দুই কি? 'উপাদিশেষ' নির্ব্বাণ-ধাতু এবং 'অনুপাদিশেষ' নির্ব্বাণ-ধাতু। হে ভিক্ষুগণ! উপাদিশেষ নির্ব্বাণ-ধাতু কি? হে ভিক্ষুগণ। এই পৃথিবীতেই ভিক্ষু অর্হ (=অর্হৎ) হইতে পারেন যদি জীবিতাবস্থায় তিনি ক্ষীণাসব হয়েন, কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করেন, সমুদয় ভার দূরীভূত করেন, সদর্থ অবগত হয়েন, যদি তাঁহার ভবসংযোগ পরিক্ষীণ হয় এবং তিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া বিমুক্ত হয়েন। তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় সুপ্রতিষ্ঠিত,—তাঁহার আত্মা অপ্রতিহত, তিনি প্রিয় ও অপ্রিয় অনুভব করেন এবং সুখদুঃখ অবগত হয়েন। তাঁহার রাগ-ক্ষয় (=আসক্তিক্ষয়), দ্বেষক্ষয় এবং মোহক্ষয়কেই 'উপাদিশেষ' নির্ব্বাণ-ধাতু বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ! 'অনুপাদিশেষ' নির্ব্বাণ-ধাতু কাহাকে বলে? হে ভিক্ষুগণ! পৃথিবীতেই ভিক্ষু অর্হৎ হইতে পারেন, যদি জীবিতাবস্থায় তিনি ক্ষীণাসব হয়েন, কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করেন, সমুদয় ভার দূরীভূত করেন, সদর্থ অবগত হয়েন, যদি তাঁহার ভবসংযোগ পরিক্ষীণ হয় এবং তিনি সম্যকজ্ঞান লাভ করিয়া বিমুক্ত হয়েন। হে ভিক্ষুগণ! তিনি যদি সমুদয় বেদনাকে (=অনুভূতিকে) অভিনন্দন না করেন তাহা হইলে সেই সমুদয় বেদনার উপশম হইবে। ইহাকেই অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ ধাতু বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ। নির্ব্বাণ-ধাতু এই দুইপ্রকার।'

এতদর্থেই ভগবান বলিয়াছেন,—তিনি এ বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন :—

'যিনি চক্ষুষ্মান্ এবং অনস্যাশ্রিত, তাদৃশ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে নির্ব্বাণ ধাতু দুইপ্রকার। এক ধাতুর কর্ম্ম এই পৃথিবীতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাতে ভবস্রোত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ইহাই উপাদিশেষ নির্ব্বাণ ধাতু। 'অনুপাদিশেষ' নির্ব্বাণ ভবিষ্যৎসম্বন্ধীয়। ইহাতে উৎপত্তি ('ভব') সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হইয়া থাকে। যাঁহারা এই অযৌগিক ('অসঙ্খতম্') পদ অবগত হইয়া ভবস্রোত-ক্ষয়নিবন্ধন বিমুক্তচিত্ত হয়েন, তাঁহারা কর্ম্মের সার অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ক্ষয়ে (অর্থাৎ 'রাগ', দ্বেষ ও মোহ-ক্ষয়ে) রত; তাদৃশ ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার উৎপত্তি ('ভব') পরিহার করেন।'

'ভগবান এই প্রকারই বলিয়াছেন—আমি ইহাই শুনিয়াছি।" ইতিবুত্তকম্। ৪৪।

যে নির্ব্বাণে 'উপাদি' অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ [=(১) রূপ, (২) বেদনা বা অনুভূতি, (৩) সংজ্ঞা, (৪) সংস্কার এবং (৫) বিজ্ঞান] বর্ত্তমান থাকে তাহাকে 'উপাদিশেষ' নির্ব্বাণ, 'স-উপাদিশেষ' নির্ব্বাণ কিম্বা 'সবুপাদিশেষ' নির্ব্বাণ বলা হয়। আর যে নির্ব্বাণে 'উপাদি' বর্ত্তমান নাই তাহারই নাম 'অনুপাদিশেষ' নির্ব্বাণ। উপাদি এবং উপাধি একজাতীয় কথা—কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যও করা হইয়াছে। পঞ্চস্কন্ধ, কাম, ক্লেশ (=দুঃখ, কলুষাদি), এবং কর্ম্ম এই চারিটীকে উপাধি বলা হয়। যাঁহারা কাম, ক্লেশ এবং কর্ম্মের অতীত হইয়াছেন কিন্তু পঞ্চস্কন্ধের অতীত হইতে পারেন নাই তাঁহারা উপাদিশেষ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। আর যাঁহারা চারি প্রকার উপাধিই অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাদিগের নির্ব্বাণকে 'অনুপাদিশেষ' নির্ব্বাণ বলা হয়। এই ব্যাখ্যা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে জীবিতাবস্থায় কেবল 'উপাদিশেষ' নির্ব্বাণ লাভ করাই সম্ভব—এবং এ দেহ পরিত্যাগ না করিলে অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ লাভ করা সম্ভব নহে। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। পরে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

খেজুরের চাষ

বঙ্গদেশের খেজুর গাছ বাঙ্গালীর অপরিচিত নহে। খেজুর গাছের রস হইতে যে অতি উপাদেয় গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাও সকলে অবগত আছেন। ইক্ষু-চাষের ন্যায় খেজুরের চাষও যে একটি লাভজনক ব্যবসায় তাহা যশোহর, পাবনা প্রভৃতি জেলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অবগত হওয়া যায়। ঐ দুই জেলার নানা স্থান হইতে খেজুর গুড় প্রস্তুত হইয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিক্রয় জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এমন অনেক স্থান আছে যে তথায় শত শত খেজুর গাছ আপনা আপনি জন্মিয়া এক একটা বাগানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত খেজুর গাছ হইতে যে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে দেখা যায় না। সামান্য অবস্থার লোক মাত্রেই খেজুর গুড়ের কারবার করিয়া

লাভবান হইতে পারেন। অবশ্য চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে অধিক মূলধনের আবশ্যক। কেননা বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা, পরের কথা। সামান্য অর্থ লইয়া শুধু গুড়ের কারবার করিলে কত দূর লাভবান হওয়া যাইতে পারে, তাহা দেখানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত খেজুর গাছ হইতে রস পাইবার সময়। এই ছয় মাসে একশতটী খেজুর গাছের রস হইতে কি পরিমাণ গুড় পাওয়া যাইতে পারে ও উহা বিক্রয় করিয়া খরচ বাদে কিরূপ লাভ হইতে পারে আমরা নিম্নে তাহার একটী হিসাব দিতেছি। আমরা প্রত্যেক মাস ১৫ পনের দিনে ধরিয়া লইব। কারণ গাছ "মাতিলে" অর্থাৎ ফেনা ধরিলে মধ্যে মধ্যে দুই চারিদিন গাছ "দাগান" বন্ধ রাখিতে হয়। ইহাকে গাছ "শুকনা" দেওয়া বলে; পশ্চিমে বঙ্গে বলে "জিরেন" দেওয়া।

এক একটী গাছ হইতে দিবারাত্রিতে /৪—/৫ চারি পাঁচ সের হইতে ॥০ আধমণ পর্য্যন্ত রস পাওয়া যায়। কিন্তু গাছ অনুসারে ইহার তারতম্যও হইয়া থাকে। এই হেতু এবং চৈত্র মাসে রসের পরিমাণ কম হয় বলিয়া প্রতি গাছে দৈনিক গড়ে /৫ পাচ সের হিসাবে ধরিয়া লওয়া গেল।

তাহা হইলে ১০০ একশতটী গাছ হইতে গড়ে দৈনিক ১২॥০ মণ রস এবং ঐ রস হইতে মণকরা /৫ সের 'পাটালি' (জমাট) গুড় হিসাবে একমণ সাড়ে বাইশ সের গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। এই হিসাবে প্রত্যেক মাসে (১৫ দিনে) সাতাশ মণ সাড়ে সতের সের গুড় এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ ছয়মাসে মোট একশত চল্লিশ মণ পঁচিশ সের গুড় পাওয়া যাইতে পারে। ইক্ষুগুড়-প্রস্তুতপ্রণালী অনুসারে রস জ্বাল দিয়া খেজুর গুড় প্রস্তুত করিতে হয়। ঝোলা ও 'পাটালি' গুড় দুই-ই হইতে পারে।

বাজারে খেজুর গুড় খুচরা দুই আনা হইতে তিন আনা প্রতি সের বিক্রয় হয়। আমরা পাইকারী ৪৲ চারি টাকা মণ দরে ধরিয়া হিসাব দিলাম।

আয়।

মোট গুড় ১৪০॥৫ সের ৪৲ টাকা মণ দরে মূল্য।

	৫৬২॥০
বাদ খরচা	২১৯৲
লাভ	৩৪৩॥০

ব্যয়।

৬ মাসের জন্য ৩ জন মজুরের বেতন মাসিক প্রতি জনে ৮৲ করিয়া ২৪৲ টাকা হিসাবে — ১৪৪৲

জ্বালানি কাষ্ঠ বাবত মাসিক ১০৲ হিঃ — ৬০

রস রাখিবার ও জ্বাল দিবার জন্য মৃৎপাত্র এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য খরচ বাবত — ১৫৲

মোট — ২১৯৲

মাত্র একশতটী খেজুর গাছ হইতে ছয় মাসে খরচ বাদে ৩৪৩॥০ আনা লাভ, ইহা অপেক্ষা লাভজনক ব্যবসায় আর কি হইতে পারে। অনেক স্থানে হয়ত মজুর ইত্যাদির খরচ বেশী লাগিতে পারে, সুতরাং খরচ মধ্যে আরও ১০০৲ শত টাকা ধরিয়া বাদ দিলেও ২৪৩॥০ আনা লাভ হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে প্রতি গাছে ২৲ দুই টাকার উপর লাভ হইবার আশা করা যায়। রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি যে সমস্ত জেলায় খেজুরগুড় দুষ্প্রাপ্য, সেই সমস্ত জেলায় পাঠাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে দ্বিগুণমূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় হইতে পারে। কাঁচা রস বিক্রয় করিতে পারিলে আরও অধিক লাভ হইতে পারে।

বঙ্গদেশের সকল রকম মাটীতেই খেজুর গাছ জন্মিতে পারে। সামান্য অবস্থাপন্ন লোক মাত্রেই খেজুরগাছের বাগান করিয়া ইহার কারবার করিতে পারেন। অবশ্য গাছগুলি রীতিমত বর্দ্ধিত না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর ধৈর্য্য অবলম্বন করা আবশ্যক। যে সমস্ত জমিতে বর্ষাকালে বন্যার জল আটকাইয়া না থাকে তদ্রূপ জমিই বাগান করিবার উপযোগী। জমির চতুর্দ্দিকে পগার দিয়া ৭।৮ হাত অন্তর শ্রেণীবদ্ধভাবে গাছগুলি রোপণ করা উচিত। এই প্রকারে গাছ রোপণ করিলে জমিও আবদ্ধ থাকে না অথচ গাছগুলিও নির্ব্বিঘ্নে রহিয়া যায়। নারিকেল ও সুপারী-বাগানের ন্যায় রীতিমত বাগান করিতে হইলে জমির মধ্যে ৭।৮ হাত অন্তর ২।৩ হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত কাটিয়া ঐ গর্ত্ত গোবরসার

কিম্বা পুষ্করিণীর পচা পাঁক দিয়া পূরণ করিয়া তদুপরি এক একটী চারা রোপণ করিবে। চারা রোপণের অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্ব হইতে এই প্রকারে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। খেজুরের চারা কিম্বা বীচি দুই-ই রোপণ করা যাইতে পারে। বর্ষাকালে খেজুরগাছের তলায় বীচি পড়িয়া অসংখ্য চারা উৎপন্ন হয়; তখন চারাগুলি উঠাইয়া উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে রোপণ করিবে। বীচি রোপণ করিতে হইলে প্রত্যেকটী বীচি ৪।৫ চারি পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত গভীর মাটীর নীচে পুঁতিয়া দিবে এবং যাহাতে চারাগুলির কচি পাতা গো-ছাগাদিতে খাইতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। গাছে কাঠ ছাড়িতে আরম্ভ করিলে, অর্থাৎ গাছ বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উহার গোড়ার ডালগুলি কাটিয়া দেওয়া উচিত। নূতন তোলা মাটীতে অর্থাৎ পগারের ধারে পুষ্করিণীর পাড়ে গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিত হইয়া থাকে।

গাছ চারি পাঁচ হাত উচ্চ হইয়া কাঠ না ছাড়িলে 'লাগান' অর্থাৎ রসের জন্য কাটা উচিত নহে। ছোট অবস্থায় 'লাগাইলে' গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলে মরিয়াও যায়। বলা বাহুল্য যে শীতকালই খেজুর গাছ "লাগাইবার" সময়।

খেজুর গাছের পত্র হইতেও অর্থ উপার্জ্জন হইয়া থাকে। বাগ্দী, সাঁওতাল, পাহাড়িয়া প্রভৃতি এক শ্রেণীর লোক 'খেজুর পাটি' প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া থাকে। কৃষকপরিবারে এই 'খেজুর পাটির' প্রচলন অধিক, সুতরাং উহার কাট্তিও সামান্য নহে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সান্যাল।

ঘুমের রাণী

দেখা হ'ল ঘুম নগরীর রাজকুমারীর সঙ্গে,
সন্ধ্যা বেলায় ঝাপসা ঝোপের ধারে;
পরণে তার হাওয়ার কাপড় ওড়্না ওড়ে অঙ্গে,
দেখ্লে সে রূপ ভুল্তে কি কেউ পারে?

চোখ্ দুটি তার ঢুলু ঢুলু মুখখানি তার মিঠে,
আফিম ফুলের রক্তিম হার চুলে;
নিশ্বাসে তার হাস্নু-হানা, হাস্যে মধুর ছিটে,
আল্গোছে সে আলগা পায়েই বুলে।

এক যে আছে কুজ্ঝটিকার দেওয়াল-ঘেরা কেল্লা,
মৌনমুখী সেথায় নাকি থাকে!
মন্ত্র প'ড়ে বাড়ায় কমায় জোনাক পোকার জেল্লা,
মন্ত্র প'ড়ে চাঁদকে সে রোজ ডাকে!

তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার জান্লাতে দেয় পর্দ্দা,
হুতোম প্যাঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে;
ঝর্ণাগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হ'য়ে জর্দ্দা
জলতরঙ্গ বাজনা শোনায় তারে।

কালো কাচের আর্শীতে সে মুখ দেখে সুস্পষ্ট,
আলো দেখে কালো নদীর জলে!
রাজোতে তার নেইক মোটেই স্থায়ী রকম কষ্ট,
স্বপন সেথা বেড়ায় দলে দলে!

সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে হঠাৎ হ'ল দেখা
ঘুম নগরীর রাজকুমারীর সনে,
মধুর হেসে সুন্দরী সে বেড়ায় একা একা
মূর্চ্ছা হেনে বেড়ায় গো নির্জ্জনে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বরলাভ

(গল্প)

রোগশয্যায় রক্তস্বল্পতায় রাজপুত্র সংজ্ঞাহীন। বলিষ্ঠ দেহের রুধির চাই।

রুধির দিবে কে?

বিলাস-ভবনে সংবাদ রটিল। রাজপুত্রের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী শতেক রমণী পরস্পরের মুখ চাহিল।

সুগোল সুঠাম কমনীয় হস্ত প্রসারণ করিল কে ঐ? পরিচয় লইবার অবসর ত নাই—রোগী মুমূর্ষু!

ক্ষিপ্রহস্তে শস্ত্রবৈদ্য অস্ত্রচালনা করিলেন সতেজ লোহিত শোণিত লইয়া রাজপুত্রের ধমনীতে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন।

সুস্থ, সবল হইয়া রাজপুত্র শুনিয়া চমকিত হইলেন নিজ হৃদয়-রক্ত অর্পণ করিয়া রাজনন্দিনী দেবতার কাছে সহোদরের জীবনভিক্ষা লইয়াছেন।

ত্রস্ত শঙ্কিত রাজপুত্র কক্ষান্তরে ভগিনীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। লোলচর্ম্ম, বিবর্ণ, বিকটদর্শন বিভীষিকা! এই কি জরা?

পদ্মপরাগের মত যৌবনের লাবণ্য যে ছড়াইয়া বেড়াইত, ঊষার কনক কিরণের সৌন্দর্য্যে যে ভুবন আলো করিত, হাসিতে যার মাণিক ঝরিত, অশ্রুতে যার মুক্তা গড়াইত — এই সেই!—সেই সৌন্দর্য্যের এই পরিণতি! কি বিকট!

রাজপুত্র বিষম মর্ম্মাহত হইলেন। ভাবিলেন, সৃষ্টির একি রহস্যজাল! সুন্দর যাহা তাহা চিরসুন্দর রহে না কেন? লয় পাইবে যদি জরাগ্রস্ত হইয়া কুৎসিৎ কদর্য্য আকারে লয় পায় কেন? সৌন্দর্য্যের ডালি সাজাইয়া অনন্তে মিলে না কেন?

সৌন্দর্য্যপ্রিয় রাজপুত্র প্রাণে ব্যথা পাইয়া বনগমন করিলেন।

[২]

দুর্গম বিজন বন। রাজপুত্র ভাবিলেন,—হইলই বা বন, বনেই ত ফুল ফুটে।

চলিতে চলিতে একদিন প্রাতে দেখিলেন, লজ্জাবতী লতা বায়ুভরে কম্পিতা; মধ্যাহ্নে দেখিলেন, প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক, মলিন; সন্ধ্যায় ফিরিয়া দেখেন, বারিপাতে আর্দ্র স্নাত। কয় দিন পরে দেখিলেন, পাতায় পাতায় মুকুল—স্ফুটনোন্মুখ। দ্বিপ্রহরে দেখিয়া মোহিত হইলেন, ফুলে ফুলে ক্ষুদ্র লতিকা মধুরহাসিনী। মুগ্ধ রাজপুত্র সৌন্দর্য্যের বিকাশে আত্মহারা হইয়া গেলেন।

পরদিন যখন দেখিলেন, ফুলের যত পাপড়ি ঝরিয়া খসিয়া গলিয়া পড়িতেছে, মনুষ্যজীবনের সঙ্গে ক্ষুদ্র লতিকার সাদৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ে মৃদু কম্পন অনুভব করিলেন। আবার সেই জরা—যে জরায় স্বর্ণপ্রতিমা রাজনন্দিনী বিভীষিকা!

[৩]

বনে রাজপুত্র কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন—যুগ ব্যাপী।

দেবতার সিংহাসন টলিল। দেবতা আসিয়া কহিলেন "তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। কি চাও?"

রাজপুত্র নিরুত্তর।

"বর লও।"

রাজপুত্র নির্ব্বাক।

"সাম্রাজ্য চাও?"

এইবার মুখ ফুটিল। রাজপুত্র উত্তর দিলেন—"পিতৃ-রাজ্য ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি। লক্ষ প্রজার সুখদুঃখের অসহ ভাবনা ভাবিতে পারি না।"

"যশ চাও?"

"যশ! শিরে তুলিয়া কখন নাচে, কখন পায় দলে। যশে আকাঙ্ক্ষা নাই।"

"ঐশ্বর্য্যে আসক্তি নাই, যশে শ্রদ্ধা নাই। তবে কি ভুবনমোহিনী সুন্দরীর প্রেম চাও?"

"প্রাণ সে লইতে শিখে, দিতে জানে কি? মার্জ্জনা করুন, ভগবন্, এজন্মে আর না।"

"তবে কি কিছু চাহ না?"

"নিজের জন্য না!"

"কাহার জন্য, কি চাও?"

"চাহি মানবজাতির জন্য। প্রার্থনা শুধুই সৌন্দর্য্য।"

"পৃথিবীতে সকলই ত সুন্দর। প্রাণ সুন্দর করিয়া লও, সৌন্দর্য্যের অঞ্জন চোখে লাগিলে সকলই সুন্দর দেখিবে।"

"কিন্তু অসুন্দর ঐ যে জরা।"

"তবে কি জরা বার্দ্ধক্য রহিত করিতে চাও?"

"রেশম-কীট গুটির মধ্যে লালিত হইয়া দুঃখবেদনা সহিয়া অবশেষে প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া পড়ে। আমার নিবেদন,—শৈশবে বাল্যে সুখদুঃখের ভিতরে নরনারী শক্তি সঞ্চয় করিয়া লউক, মধুর যৌবনের রূপচ্ছটায় ভালবাসিয়া ভালবাসা দিয়া চুম্বনপুলকে সার্থকতা লাভ করুক।"

"কবি, কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতেছ। বৎস, বর

দিতেছি—ললিতমধুর ভাষায় আশা আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ ব্যক্ত কর, কবিতার জন্ম হউক।"

আদিকবি রাজপুত্র পুলকভরে মহাসঙ্গীত গাহিলেন। বিশ্বের ত্রিতন্ত্রী বাজিয়া উঠিল।

শ্রীকালীচরণ মিত্র।

দেবতার দূত

(গেয়ানদাস বঘেলি)

সকাল বেলায় এলে তুমি দূত
সোনালি জরির পোষাক পরি',
ব্যথা-ভরা তব সুরভি নিশ্বাসে
সুপ্ত হৃদয় জাগালে, মরি!

আলোকে আমায় করিলে উদাসী,
ধ্যান-সমাহিত রহিনু চেয়ে,
মরণের মত রাত্রি আসিল
পছিমে গেরুয়া রাগিণী গেয়ে!

কালো কাগজেতে আলোর আখর
মরি কিবা চিঠি আনিলি, ওরে!
এত সমারোহ কেন আজি তোর?
তুই কি নিজেই ভুলাবি মোরে।

"এত ঘটা আর এত আয়োজন,—
অতিথি আহূত তুমিই একা!"
দূত কহে "মোর এই গৌরব—
লোকে লোকে খুলে ধরেছি লেখা।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাংলা নির্দ্দেশক

আমরা বাংলা ভাষার নির্দ্দেশক চিহ্ন "টি" ও "টা" সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই শ্রেণীর সঙ্কেত আরো কয়েকটি আছে।

খানি ও খানা।

বাংলা ভাষায় "গোটা" শব্দের দ্বারা অখণ্ডতা বুঝায়। এই কারণে, এই "গোটা" শব্দেরই অপভ্রংশ "টা" চিহ্ন পদার্থের সমগ্রতা সূচনা করে। হরিণটা, টেবিলটা, মাঠটা, শব্দে একটা সমগ্র পদার্থ বুঝাইতেছে।

বাংলা ভাষার অপর একটি একত্ব নির্দ্দেশক চিহ্ন খানা, খানি। "খণ্ড" শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। এখনো বাংলায় "খান্-খান্" শব্দের দ্বারা খণ্ড খণ্ড বুঝায়।

ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, এক একটি সমগ্র বস্তুকে বুঝাইতে "টা" চিহ্নের প্রয়োগ এবং এক একটি খণ্ডকে বুঝাইতে "খানা" চিহ্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গোড়ায় কি ছিল বলিতে পারি না এখন কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। আমরা বলি কাগজখানা, স্লেটখানা। এই কাগজ ও স্লেট সমগ্র পদার্থ হইলেও আসে যায় না।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যেসকল সামগ্রী দীর্ঘ প্রস্থ বেধে সম্পূর্ণ, সাধারণত তাহাদের সম্বন্ধে "খানা" ব্যবহার হয় না। যে জিনিষকে প্রস্থের প্রসারের দিক হইতেই দেখি, লম্বের বা বেধের দিক হইতে নয় প্রধানত তাহারই সম্বন্ধে "খানা" "খানি"র যোগ। মাঠখানা, ক্ষেতখানা; কিন্তু পাহাড়খানা নদীখানা নয়। থালাখানা, খাতাখানা; কিন্তু ঘটিখানা বাটিখানা নয়। লুচিখানা কচুরিখানা; কিন্তু সন্দেশখানা মেঠাইখানা নয়। শালপাতাখানা, কলাপাতাখানা; কিন্তু আমখানা কাঁটালখানা নয়।

এই যে নিয়মের উল্লেখ করা গেল ইহা সর্ব্বত্র খাটে না। যে জিনিস পাতলা নহে তাহার সম্বন্ধেও "খানা" ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন খাটখানা, চৌকিখানা, ঘরখানা, নৌকাখানা। ইহাও দেখা গিয়াছে, এই "খানা" চিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে সকলের অভ্যাস সমান নহে।

তবে "খানা"র প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ নিয়ম বলা যায়। জীব সম্বন্ধে কোথাও ইহার ব্যবহার নাই; গোরুখানা ভেড়াখানা হয় না। দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহারে বাধা নাই। দেহখানা, হাতখানা, পাখানা। বুকখানা সাত হাত হয়ে উঠ্‌ল; মায়ের কোলখানি ভরে আছে; মাংসখানা ঝুলে পড়েছে; ঠোঁটখানি রাঙা; ভুরুখানি বাঁকা।

অরূপ পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। বাতাসখানা বলা চলে না; আলোখানাও সেইরূপ; কারণ, তাহার অবয়ব নাই। যত্নখানা, আদরখানা, ভয়খানা, রাগখানা হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে; যথা, ভাবখানা, স্বভাবখানা, ধরণখানা, চলনখানি।

যে সকল বস্তু অবয়ব গ্রহণ না করিয়া তরল বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকে তাহাদের সম্বন্ধে "খানা" বসে না। যেমন, বালিখানা, ধূলোখানা, মাটিখানা, দুধখানা, জলখানা, তেলখানা হয় না।

ধূলা কাদা তেল জল প্রভৃতি শব্দের সহিত "এক" শব্দটিকে বিশেষণরূপে যোগ করা যায় না। যেমন, একটা ধূলা বা একটা জল বলি না। কিন্তু "অনেক" শব্দটির সহিত এরূপ কোনো বাধা নাই। যেমন, অনেকটা জল বা অনেকখানি জল বলা চলে। বলা বাহুল্য এখানে "অনেক" শব্দ দ্বারা সংখ্যা বুঝাইতেছে না—পরিমাণ বুঝাইতেছে।

এখানে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এরূপ স্থলে আমরা খানি ব্যবহার করি; খানা ব্যবহার করি না। "অনেকখানি দুধ" বলি, "অনেকখানা দুধ" বলি না। এস্থলে দেখা যাইতেছে, পরিমাণ ও সংখ্যা সম্বন্ধে "খানি" ব্যবহার হয়, কিন্তু "খানা" কেবলমাত্র সংখ্যা সম্বন্ধেই খাটে।

বাংলায় হাসিখানি শব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা আদরের ভাষা। আদর করিয়া হাসিকে যেন স্বতন্ত্র একটি বস্তুর মত করিয়া দেখা হইতেছে। মনে পড়িতেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন ভাবের কথা কোথায় দেখিয়াছি যে, "তাহার মুখের কথাখানির যদি লাগ পাইতাম" এখানে আদর করিয়া মুখের কথাটিকে যেন মূর্ত্তি দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবেই "স্পর্শখানি" বলিয়া থাকি।

খানি ও খানা যেখানে বসে সেখানে ইচ্ছামত সর্ব্বত্রই টি ও টা বসিতে পারে—কিন্তু টি ও টার স্থলে সর্ব্বত্র খানি ও খানার অধিকার নাই।

গাছা ও গাছি।

"খানি খানা" যেমন মোটের উপরে চওড়া জিনিষের পক্ষে, "গাছা" তেমনি সরু জিনিষের পক্ষে। যেমন, ছড়িগাছা, লাঠিগাছা, দড়িগাছা, সুতোগাছা, হারগাছা, মালাগাছা, চুড়িগাছা, মলগাছা, শিকলগাছা।

এই সঙ্কেতের সঙ্গে যখন পুনশ্চ "টি" ও "টা" চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে তখন "গাছি" "গাছা" শব্দের অন্তস্থিত ইকার আকার লুপ্ত হইয়া যায়। যথা লাঠিগাছটা মালাগাছটা ইত্যাদি।

জীববাচক পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। কেঁচোগাছি, বলা চলে না।

সরু জিনিষ লম্বায় ছোট হইলে তাহার সম্বন্ধে ব্যবহার হয় না। দড়িগাছা, কিন্তু গোঁফগাছা নয়। শলাগাছটা কিন্তু ছুঁচগাছটা নয়। চুলগাছি যখন বলা হয় তখন লম্বা চুলই বুঝায়।

যেখানে গাছি ও গাছা বসে সেখানে সর্ব্বত্রই বিকল্পে টি ও টা বসিতে পারে—এবং কোনো কোনো স্থলে খানি ও খানা বসিতে পারে।

টুকু।

টুকু শব্দ সংস্কৃত তনুক শব্দ হইতে উৎপন্ন। মৈথিলী সাহিত্যে তনুক শব্দ দেখিয়াছি। "তনিক" এখনও হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়। ইহার সগোত্র "টুকরা" শব্দ বাংলায় চলিত আছে।

টুকু স্বল্পতাবাচক।

সজীবপদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। ভেড়াটুকু গাধাটুকু হয় না। পরিহাসচ্ছলে মানুষটুকু বলা চলে।

ক্ষুদ্রায়তন হইলেও এমন পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় না যাহার বিশেষ গঠন আছে। যেমন এয়ারিংটুকু বলা যায় না, সোনাটুকু বলা যায়। পদ্মটুকু বলা যায় না, চুনটুকু বলা যায়। পাগড়িটুকু বলা যায় না, রেশমটুকু বলা যায়। অর্থাৎ যাহাকে টুকরা করিলে তাহার বিশেষত্ব যায় না তাহার সম্বন্ধেই "টুকু" ব্যবহার করা চলে। কাগজকে টুকরা করিলেও তাহা কাগজ, কাপড়কে টুকরা করিলেও তাহা কাপড়, এক পুকুর জলও জল, এক ফোঁটা জলও জল এইজন্য কাগজটুকু কাপড়টুকু জলটুকু বলা যায় কিন্তু চৌকিটুকু খাটটুকু বলা যায় না।

কিন্তু, এই ঐ সেই কত এত তত যত সর্ব্বনাম পদের সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্রার্থক সকল বিশেষ্যপদের

বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা যায়। যেমন এইটুকু মানুষ, ঐটুকু বাড়ি, ঐটুকু পাহাড়।

অরূপ পদার্থবাচক বিশেষ্যপদে ইহার ব্যবহার চলে। যেমন হাওয়াটুকু, কৌশলটুকু, ভারটুকু, সন্ন্যাসী ঠাকুরের রাগটুকু।

অন্যান্য নির্দেশক চিহ্নের ন্যায় "এক" বিশেষণ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা ব্যবহৃত হয় কিন্তু দুই তিন প্রভৃতি অন্য সংখ্যার সহিত ইহার যোগ নাই। দুইটা, দুই খানি, দুই গাছি হয় কিন্তু দুইটুকু তিনটুকু হয় না। "এক" শব্দের সহিত যোগ হইলে টুকু বিকল্পে টু হয় যথা একটু। অন্যত্র কোথাও এরূপ হয় না। এই "একটু" শব্দের সহিত "খানি" যোজনা করা যায়—যথা, একটুখানি বা একটুকখানি। এখানে "খানা" চলে না। অন্যত্র, যেখানে টুকু বসিতে পারে সেখানে কোথাও বিকল্পে খানি খানা বসিতে পারে না, কিন্তু টি টা সর্ব্বত্রই বসে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নোট

"বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্‌রূপ" নামক প্রবন্ধে কর্ত্তৃকারকে একার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। নিয়মের সূত্রটাকে বাঁধিয়া তুলিতে আমার গোল ঠেকিতেছিল সে আমি নিজেই অনুভব করিয়াছি। বস্তুত বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার পদে পদেই আমার মনে দ্বিধা আছে। অতএব এ বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় আমাকে আনুকূল্য-প্রার্থী জানিয়া আমার সন্দেহভঞ্জন করিবেন।

তাঁহার মতে সূত্রটি এই:—যেখানে কর্ত্তৃপদে জাতির বা সামান্যের ধর্ম্মপ্রকাশ উদ্দেশ্য হয় সেখানে কর্ত্তৃপদে একার আসে।

তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে "ঠেলা দিলে টেবিল উল্টে পড়ে" না বলিয়া আমরা কি বলিতে পারি "টেবিলে উল্টে পড়ে?" "জল পাইলে ধান বাড়ে" না বলিয়া "ধানে বাড়ে" বলা যায় কি?

"গাছে ফুল ধরে" এই যে দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন—এখানে "গাছে"র এ-বিভক্তি কি সপ্তমী বিভক্তি নহে? অর্থাৎ ফুলধরা ব্যাপারটা গাছে ঘটে ইহাই কি বক্তব্য নহে? এ বাক্যে "গাছে" শব্দ কি কর্ত্তৃপদ?

'বেদে লেখে" "ইতিহাসে বলে" প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বেদ ও ইতিহাস নিঃসন্দেহ অচেতন পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে বেদ ও ইতিহাসকে মানুষরূপে দেখা হইতেছে।

"ইংরেজ সৈন্যদলে ভারতবর্ষে আছে" বা "কয়েদীতে জেলে আছে" এরূপ বাক্য কি বাংলাভাষায় সম্ভব?

"বালকে ঘুমায়" অচেষ্টক ক্রিয়াবিশিষ্ট এই দৃষ্টান্তটি আমার মনে আসিয়াছিল কিন্তু এরূপ প্রয়োগ চলে কিনা সে সম্বন্ধে আমার দ্বিধা দূর হয় নাই। "ঘোড়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়" বা "কুমীরে চোখ চাহিয়া ঘুমায়" বা "হাঁসপাতালের এই ঘরে রোগীতে ঘুমায়" এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত কিনা সন্দেহ হইতে লাগিল।

মুস্কিল এই যে, যে সব কথা আমরা সহজেই বলিয়া থাকি তাহাদের সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন উদয় হইলে আর দিশা পাওয়া যায় না। একবার মনে হয় বুঝি এরূপ চলে, একবার মনে হয় চলে না।

"ঘুমায়" ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহাই স্থির হউক না কেন, আমি যে লিখিয়াছিলাম সচেষ্টক ক্রিয়ার যোগেই কর্ত্তৃপদে একার বসে—এ নিয়মটিকে গ্রাহ্য করা যায় না। "প্লেগে স্ত্রীলোকেই অধিক মরে" এস্থলে মরা ক্রিয়া অচেষ্টক সন্দেহ নাই। "বেশি আদর পেলে ভালমানুষেও বিগড়ে যায়", "অধ্যবসায়ের দ্বারা মূর্খেও পণ্ডিত হতে পারে", "অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কায় বীরপুরুষেও ভীত হয়" এ সকল অচেষ্টক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তে আমার নিয়ম খাটে না।

কিন্তু "আছে" ক্রিয়ার স্থলে কর্ত্তৃপদে একার বসে না, এ নিয়মের ব্যতিক্রম এখনও ভাবিয়া পাই নাই।

প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় নূতন বিধি

শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় ভারতবর্ষীয় সমুদয় বালকগণই যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য হয় তৎসম্বন্ধে এক নূতন বিধি প্রবর্ত্তন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। দেশের লোকের সুশিক্ষাবিধান দ্বারা দেশের যে উন্নতি হইয়া থাকে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে সেই শিক্ষার প্রণালী কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা লইয়াই মতভেদ। কিছুকাল হইল প্রবাসীতে* একটী প্রবন্ধে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান কালে যে প্রণালীতে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই প্রণালীতে শিক্ষা দিলে কৃষক বা মজুরদের বালকদিগের কিছুই লাভ ত হইবেই না বরং অনেক অনিষ্টও হইতে পারে। যতটা শিক্ষা পাইলে দুষ্ট মহাজন বা জমিদারের ফেরেববাজী বুদ্ধিকে পরাস্ত করা যায় প্রাথমিক শিক্ষায় ততটা বুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষক ও রাখাল বালকেরা জঙ্গলে ঘুরিবার সময় ও খেলা করিবার সময় প্রকৃতির কাছ হইতে কিরূপ শিক্ষা পায় তাহা ত্রিবেদী মহোদয় সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন। কৃষকের ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া এপর্য্যন্ত যে তাহার কোনও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় উপকার হয় নাই তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। কাজেই এ প্রবন্ধে আমি সে সকল কথার পুনরুত্থাপন করিব না।

ইউরোপীয় কোনও ব্যবস্থা এদেশে আমদানী করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখা আবশ্যক যে উক্ত ব্যবস্থা এদেশ

* প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৭ সাল; লোকশিক্ষা নামক প্রবন্ধ।

সম্বন্ধে দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী ব্যবস্থা কি না ? এবং ঐ ব্যবস্থার উপকারিতা ইউরোপেও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে কি না, তাহাও দেখা প্রয়োজন। 'দেশের সকল বালককে বাধ্য করিয়া শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা' ইংলণ্ডের উন্নতির কারণ নহে, ফল মাত্র। এই ফলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে তাহার ফল যে কিরূপ হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা (Compulsory Primary Education)র ফলে ইংলণ্ডের কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হইবে তাহা আরও একশত বৎসরের পূর্ব্বে জানা যাইবে বলিয়া বোধ হয় না।

তবে ঐ ফল যে ভাল হইবে না এখনই যেন তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রাণিবিজ্ঞাবিৎ পণ্ডিতগণ (Biologists) কয়েকবর্ষ হইতে ঐ প্রথার বিপক্ষে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। এবং তাহাদের আন্দোলন দিন দিনই পুষ্টতর হইতেছে। কৌতুকের বিষয় এই যে যে সময়ে ইংলণ্ডে উক্তরূপ শিক্ষাপ্রণালীর বিপক্ষে প্রথম আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে ঠিক সেই সময়েই আমরা এদেশে উহার প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি।

প্রাণবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত কারণে সর্ব্বসাধারণ বালককে বাধ্য করিয়া শিক্ষা দিবার প্রণালীর বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন :—

(১) আবদ্ধবায়ুযুক্ত মলিন বা অন্ধকারময় বিদ্যালয় গৃহে বহুসংখ্যক বালককে বদ্ধ রাখায় তাহাদের স্বাস্থ্যহানি সহজেই ঘটিতে থাকে এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ সংক্রামক পীড়া বিদ্যালয়ে এক বালক হইতে আর এক বালকের দেহে সহজেই সংক্রামিত হইতে পারে।

(২) উপযুক্তরূপ ক্রীড়ার অভাবে বালকদের শারীরিক গঠন উপযুক্তরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। শারীরিক অবনতির সহিত অনেকের মানসিক বিকৃতিও এরূপ হয় যে তাহাদের উন্মাদ, দুষ্ক্রিয়াকারী বা আত্মহত্যাকারী হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়।

(৩) ঐরূপ শিক্ষার ফলে বালকদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ একই ছাঁচে ঢালা হইয়া তাহাদের মৌলিক গবেষণাশক্তির পথ রোধ করে।

ইংলণ্ডে ঐরূপ শিক্ষার কুফল এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ঐরূপ শিক্ষার পক্ষাবলম্বিগণও ভীত হইয়া নানারূপ ড্রিল্ প্রভৃতি কৃত্রিম ব্যায়ামের দ্বারা উহার দোষ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহারা বুঝিতেছেন না যে কৃত্রিম ড্রিল প্রভৃতি কখনই স্বাভাবিক ব্যায়ামের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না।

ইংলণ্ডের মত সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দেশে যদি বাধ্যকরী নিম্নশিক্ষার ফলে ঐরূপ কুফল ঘটিয়া থাকে তবে ভারতবর্ষের মত অর্থহীন ও বিবিধ পীড়াপূর্ণ দেশে উক্ত প্রথা সম্যকরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের যে কি ভীষণ অনিষ্ট হইবে তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

ইংলণ্ডের স্কুলগুলি এদেশের স্কুলগুলির মত কদর্য্য প্রণালীতে গঠিত নহে, কাজেই তত অস্বাস্থ্যকর নহে। এদেশের গরিব লোকের ছেলেরা যে সকলেই ভাল করিয়া খাইতে পায় তাহা বোধ হয় না। তাহার উপর অনেকেই বৎসরের মধ্যে তিন চারি মাস জ্বরে ভুগে। ইংলণ্ডের পড়ানর প্রণালীও ভাল, সেখানকার শিক্ষকগণ কৃতবিদ্য—সরস করিয়া পড়াইতে পারেন। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী সেখানে যথাযথরূপে প্রযুক্ত হয়। আর এদেশের অধিকাংশ শিক্ষকের কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নাই; বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি পর্য্যন্ত এখানে খাঁটী মুখস্থ লওয়া হয়। অতএব এখানকার পড়ানর প্রণালীও অস্বাস্থ্যকর। এদেশের লোকের যে দিন দিন স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তদুপরি যে শিক্ষাপ্রণালীতে ইংলণ্ডের মত দেশেরও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাইতেছে সেই শিক্ষাপ্রণালী আরও খারাপভাবে এদেশের উপর প্রযুক্ত হইয়া যে কোনওরূপ সুফল প্রসব করিবে তাহার কোনওরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভদ্রলোকের ছেলেরা বহুপুরুষ ধরিয়া পড়া মুখস্থ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু কৃষকাদির ছেলেদের কোনও পুরুষে পড়া মুখস্থ করে নাই। কাজেই ঐ শিক্ষা তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে আরও অনিষ্টকর হইবে। অথচ কৃষক আদির ছেলের আরও ভাল স্বাস্থ্যের প্রয়োজন; তাহাদিগকে রৌদ্রের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে, জলের মধ্যে ও জঙ্গলের মধ্যে কার্য্য করিতে হইবে।

ছেলেবেলা হইতে জঙ্গল, রৌদ্র ও বৃষ্টির মধ্যে বেড়াইতে ও

[illegible] তাহাদের শরীর বিবিধ রোগ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি সঞ্চয় করে। তাহাকে দিন পাঁচ ঘণ্টা স্কুলে আটক রাখিলে ও আর চারি ঘণ্টা বাড়িতে পড়া মুখস্থ করিবার জন্য আটক রাখিলে তাহার ঐরূপ শক্তি সঞ্চয়ের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিবে এবং তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যকারী জীবনের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর হইবে।

"*The belief that progress lies chiefly in mental training is less rampant than formerly. The compulsory education* of young children has increased the infectious diseases to which they are liable, has stunted the growth of their originality as well as their bodies, and has in many cases produced that mental instability which has revealed itself at a later stage of life in crime, insanity, or suicide. The suppression of the instinct to play has gone so far that it has become necessary to found societies for the purpose of teaching children how to play. Even the believers in compulsory education of young children have taken alarm, and think they can undo the harm by compulsory systems of monotonous drill, unnatural postures, and breathing exercises. The irony of it is that this kind of physical training is said to be based upon the teachings of physiology. It is a false physiology which does not recognise that natural exercise is the best, that instincts in healthy children ought not to be unduly suppressed, and that heredity is more potent than systems of education.—*Further Advances in Physiology: The Physiology of Muscular Work*, pp. 223. M. S. Pecmbrey, Lecturer on Physiology, Guy's Hospital, London.

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদকের মন্তব্য।

আমাদের নিজের সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস এই যে ভারতবর্ষের সমুদয় লোককে লেখাপড়া না শিখাইলে কোন দিকেই মঙ্গল নাই, এবং এইরূপ সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিস্তার মোটের উপর শুভফলপ্রদ হইবে। তথাপি আমাদের সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসের বিরোধী মত ও আপত্তি শুনা ও জানা ভাল বলিয়া, এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে লিখিত আপত্তিগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

দুষ্ট মহাজন বা দুষ্ট জমিদারের ফেরেববাজী বুদ্ধিকে পরাস্ত করা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান বা একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ লোকের শয়তানীকে পরাস্ত করিতে সুপণ্ডিত অধ্যাপকেরাও পারেন না। অন্য দিকে, সামান্য লেখাপড়া জানিলেও লোকে যে অনেক প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, ইহা কে না জানে? তদ্ভিন্ন কৃষকের ছেলে প্রাথমিক শিক্ষার সীমা উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শিক্ষা পাইবে না, এরূপ কোন নিয়ম ত হইতেছে না। সে বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী হইলে গবর্ণমেণ্ট বা সদাশয় ধনী ব্যক্তির প্রদত্ত বৃত্তির সাহায্যে বা অন্য উপায়ে উচ্চতম শিক্ষাও পাইতে পারে। শ্রীযুক্ত গোখলে কেবল সকলেরই শিক্ষার ভিত্তি পত্তন করিতে চাহিতেছেন। এই বুনিয়াদের উপর যে যত বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে, করুক।

বর্ত্তমান শতদোষপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীতেও কৃষক ও মজুরদের ছেলের উপকার হয়, তাহা আমরা শিক্ষা দিয়া দেখিয়াছি। সুতরাং হয় না, বলিলে, তাহা আমরা মানিব না।

জঙ্গলে ঘুরিয়া ও খেলা করিয়া প্রকৃতির কাছ হইতে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সত্য। কিন্তু এইরূপ শিক্ষার জন্য ভদ্রলোকদের ছেলেদিগকে নিরক্ষর রাখিয়া কেন জঙ্গলে পাঠান হয় না, ও কেবল খেলায় নিযুক্ত রাখা হয় না, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অপর দিকে বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাইয়াও তাহাকে খেলিবার এবং প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ দেওয়া মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য নহে।

কলিকাতার মত বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র সহরের নিরক্ষর দরিদ্রসন্তানেরা কোন জঙ্গলে বেড়ায়? তাহাদের নির্দোষ ক্রীড়ার ক্ষেত্রই বা কতটুকু?

প্রাথমিক শিক্ষাকেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি ধরিলে, ইহা সত্য বটে যে তাহাতে চাষার ছেলের চাষের কোন জ্ঞান হয় না। কিন্তু সে হিসাবে কেবল প্রাথমিক শিক্ষায় উকীলের ছেলেরও ওকালতী শিক্ষা, শিক্ষকের ছেলেরও শিক্ষকতা শিক্ষা, বণিকের ছেলেরও বাণিজ্য শিক্ষা, কেরাণীর ছেলেরও কেরাণীগিরি শিক্ষা হয় না। কৃষি শিক্ষা দিবার ইচ্ছা থাকিলে ও প্রয়োজন হইলে তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিলেই হয়। অন্য দিকে চাষার ছেলে নিরক্ষর থাকিলেই চাষের কাজে সুদক্ষ হইবে, ইহা কি সত্য? যাঁহারা দুনিয়ার খবর একটু জানেন তাঁহারা জানেন যে জাপান, আমেরিকা, জাভা প্রভৃতির শিক্ষিত কৃষকেরা আমাদের নিরক্ষর চাষাদের চেয়ে ভাল ও অধিক ফসল উৎপন্ন করে।

ইংলণ্ডে বা অন্য সভ্যদেশে বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষার ফল ভাল হয় নাই বা ফল কিরূপ হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। লেখকের এই মতটির পোষক প্রমাণ চাই। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান শিক্ষাতত্ত্ববিদ্গণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিলে তবেই ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে।

প্রাণবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ যে এরূপ শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে, তাঁহাদের আন্দোলনের যে সব কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি নহে, যে অবস্থায় বা প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহারই বিরুদ্ধে আপত্তি।

(১) অস্বাস্থ্যকর গৃহে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; ইংলণ্ডের মত আমাদের ধন নাই যে আমরা সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যকর বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিতে পারিব। ইহা সত্য। কিন্তু আমাদের গরমের দেশে ইংলণ্ডের মত আঁটা সাঁটা ঘরের প্রয়োজনও নাই। বৎসরের অধিকাংশ সময় আমরা আকাশের নীচে খোলা জায়গায় বা খোলা বারাণ্ডায় শিক্ষা দিতে পারি। যেমন সাবেক ধরণের পাঠশালায় হইত ও এখনও হয়, এবং যেরূপ এখন বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে হইতেছে।

অস্বাস্থ্যকর গৃহের আপত্তিটা কেবল প্রাথমিক শিক্ষার বেলায় কেন উঠে? আমাদের কলেজ ও এণ্ট্রেন্সস্কুলগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই গৃহ ত অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

(২) ক্রীড়ার বন্দোবস্ত করিলেই, দ্বিতীয় আপত্তি থাকিবে না। এই আপত্তিও এণ্ট্রেন্সস্কুলের এবং কলেজের শিক্ষার প্রতি প্রয়োগ করা উচিত।

(৩) তৃতীয় আপত্তিটি সম্পূর্ণ অমূলক নহে, কিন্তু উহার বেশী গুরুত্ব নাই। প্রমাণস্বরূপ লেখক ও তাঁহার মতাবলম্বী লোকদিগকে নিম্নলিখিত তথ্যটি সম্বন্ধে ও তাহার কারণটি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি:—খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার পূর্ব্ব যে কোন একটা শতাব্দী অপেক্ষা বেশী হইয়াছে, এবং ঐ শতাব্দীতেই মৌলিকগবেষণা ও আবিষ্কারও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার যদি মৌলিকতা বিনাশ করে, তাহা হইলে এমন কেন হইল? পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য শিক্ষিত জাতি অপেক্ষা নিরক্ষর কাফ্রি, হটেণ্টট, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াক্ষেত্রে অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না কেন?

লেখক বলিতেছেন যে বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষার দোষে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে। ইহার প্রমাণ কি? দিল্লী সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজের অধ্যাপক পাদ্রী এণ্ড্রুজ সাহেবের নাম শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই জানেন। তিনি স্বদেশের এবং পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশসমূহে শিক্ষাবিস্তারের ফলাফল আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানেন। তিনি বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় "ভারতের মৃত্যুসংখ্যার অনুপাত" (The Death-rate of India) নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে যেদেশে শিক্ষার বিস্তার হয়, তথায় মৃত্যুসংখ্যা কমিতে থাকে। যথা

"I would ask any one, who has any lingering doubt on the subject, to study the returns of the 'Statesman's Year Book.' He will find that in almost every case the death-rate varies inversely with the spread of education, and the exceptions, such as they are, only go to prove the rule. The countries where modern education has been in longest operation and most effectively established, have to-day the lowest death-rate, and *vice versa*."

এই প্রবন্ধটি লেখক মহাশয়কে পড়িতে অনুরোধ করি।

তাহার পর শিক্ষাপ্রণালীর কথা। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী আমাদের গুরুমহাশয়েরা যেমন জানেন না, ইংরাজী ইস্কুলের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকেরাও তেমনি জানেন না অথচ এই কারণে ইংরাজি স্কুলগুলি ত কেহ উঠাইয়া দিতে বলিতেছেন না। সহজবুদ্ধি অনুসারে শিক্ষা দিলেও সুশিক্ষা কতকটা দেওয়া যায়; অবশ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী জানা থাকিলে ফল আরও ভাল হয়। আমরা ছেলে বেলা বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে শিক্ষা পাইলে হয়ত খুব পণ্ডিত ও কাজের লোক হইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা পাই নাই বলিয়া আমাদের শিক্ষা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা বিনয়ের অনুরোধেও স্বীকার করিতে পারি না।

মোটকথা এই যে লেখক মহাশয় যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা শিক্ষা জিনিষটার নয়, শিক্ষাপ্রণালীর। সে হিসাবে তাঁহার সমালোচনার মূল্য আছে। কিন্তু তিনি এমন কোন কারণ দেখাইতে পারেন নাই, যাহার জন্য দেশে শিক্ষার সর্ব্বত্র প্রচলন অবাঞ্ছনীয় মনে করা যাইতে পারে।

জন্মদুঃখী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেকার।

নিকোলা এখন একেবারে বেকার।

সে কাজের জন্য কোনো লোহার কারখানাতেই উমেদারী করিতে গেল না; কারণ, নিকোলা জানিত, একটা কারখানা হইতে যাহার অন্ন উঠিয়াছে অন্য কোনো কারখানাতেই তার আর আশা ভরসা নাই। কারিগরের কারিগরে আলাপ, সুতরাং খবর রটিতে বিলম্ব হয় না। এ দিকে, সে, যে-ছুতারের ঘরে রাত্রে মাথা গুঁজিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, সেও আজ কয়দিন হইতে নিকোলার কারখানা ত্যাগের বিবরণ শুনিবার জন্য হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেন উহা না শুনিলে আর লোকটার ঘুম হইবে না। পরের কথায় অত মাথাব্যথা কেন বাপু?

নিকোলা জবাবদিহির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সরিয়া পড়িল।

ডকে—এত জাহাজ, এত বোঝাই খালাসের কাজ, এ জায়গায় দশ জনের উপর আর একজন বাড়িলে বেশ চলিয়া যাইবে, অথচ কাহারো বিশেষ ক্ষতি করাও হইবে না। আধপেটা খাইয়া উপবাস করিয়া আর চলে না; নিকোলা শেষে সাহসে বুক বাঁধিয়া কাজের আশায় ঐ ডকেই গিয়া হাজির হইল।

সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার আগমনে মুটিয়া-মহলে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। খুব চালাক ছোকরা! চালাকির জোরে পুলিশের হাতে পড়িয়াও কেমন উদ্ধার পাইয়া আসিয়াছে! মুটিয়ারা সব জানে! এই শ্রেণীর লোকের চক্ষে পুলিশের হাত ফস্কাইয়া পলাইয়া আসাটাই সকলের চেয়ে বাহাদুরীর কাজ। সুতরাং ইহাদের সমাজে নিকোলা একজন বাহাদুর বলিয়া সহজেই পরিচিত হইয়া উঠিল।

নিকোলাকে নিষ্কর্ম্মা ফুর্ত্তিবাজ ভাবিয়া প্রথম প্রথম মুটিয়ারা বেশ একটু খাতির করিত। শেষে যখন দেখিল যে জাহাজ আসিতেই ছোঁড়াটা উহাদেরি মত যাত্রীদের ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহারা ভারি চটিয়া গেল। নিকোলার কি জেটিতে ঢুকিবার চাপরাশ আছে? না, ছোকরা ভাবিয়াছে পরের রুটিতে ভাগ বসান ভারি সহজ? ও যে কি রকমের লোক তাহা আর উহাদের জানিতে বাকী নাই।

নিকোলা মনে মনে জানিত যে, যখন কারখানা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দিয়াছে, তখন জেটিতে ঢুকিবার চাপরাশ চাহিতে যাওয়া তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা;

সুতরাং পেটের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য, তাহাকে চোখ্ রাঙাইয়া এবং দরকার হইলে অন্য মুটিয়াদের সঙ্গে ঘুষোঘুষি করিয়াও মোট মাথায় তুলিতে হইবে; পয়সা রোজগার করিতে তো হইবেই। অন্য মুটিয়ারা গালিই দিক আর যাহাই বলুক, নিকোলা যে মোট প্রথম ছুঁইয়াছে সে মোট সে আর কাহাকেও ছুঁইতে দিবে না; সে কোনো কথায়, কোনো টিট্‌কারীতে কান দিবে না; এ অবস্থায় নিকোলা বন্ধকালা।

এদিকে, যেখানে একটা মোট, সেখানে দশটা মুটিয়া, সুতরাং এততেও নিকোলার পেট ভরিত না। কাজেই, সে লোকের বাড়ীতে, ভাঙা কুলুপ সারিয়া, দরজা জানলার কব্জা বদলাইয়া মাঝে মাঝে দুই চারি আনা উপরি রোজগার করিতে বাধ্য হইত। ইহাতেও কিন্তু কুলাইত না। বিশেষতঃ শীতকালে, আগুন পোহাইবার কাঠ কিনিতে গেলে পেট ভরিত না, আবার পুরা পেট খাইতে গেলে শীতে কষ্ট পাইতে হইত। নিকোলা এক বেলা খাইতে আরম্ভ করিল; রাত্রে সে খালিপেটে শুধু মদ খাইয়া থাকিত। কি সুবিধা! মদ খাইয়া শরীরটা বেশ গরম হইয়া ওঠে, সুতরাং আগুন পোহাইবার কাঠের খরচটা আর লাগে না; আবার পেটেও কিছু পড়ে, সুতরাং ক্ষুধাটাও তত প্রখর থাকে না।

ভাবনার অন্ত নাই, সকালে উঠিয়াই আবার কাজের খোঁজে বাহির হইতে হইবে। হয় জেটিতে মোট বহা, না হয়, এই শীতে বরফ কাটিয়া কাটিয়া লোকের দরজা খোলসা করিয়া দেওয়া। না আছে একটা ওভার-কোট, না আছে একটা আস্ত জামা। সম্বলের মধ্যে শুধু সেই কারখানার দরুণ পোষাকটা।

আজকাল পথে ঘাটে পুরাণো কারখানার কোনো মিস্ত্রির সঙ্গে দেখা হইলে নিকোলা অবজ্ঞার ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠে, সে যে এখন উহাদের মত কারো তাঁবেদার নয়, সে যে এখন স্বাধীন, এইটাই যেন সে জোর করিয়া সকলকে জানাইতে চায়।

নিকোলা একদিকে যেমন কারখানার পথ মাড়ানো বন্ধ করিয়াছিল অন্য দিকে তেমনি হল্‌ম্যান্দের বাড়ীর রাস্তা দিয়াও হাঁটিত না। কারণ যাহাই হোক্, সিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাহার আর মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

কারখানা হইতে মারপিট করিয়া যে দিন সে চলিয়া আসে সেই দিন সিলার সঙ্গে তাহার শেষ আলাপ। সে দিনকার কথা নিকোলা ভুলে নাই। সিলা যতক্ষণ এক সঙ্গে ছিল ততক্ষণ যেন কেমন সন্ত্রস্ত, কেমন যেন আড়ষ্ট, নিকোলা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। নিকোলা কাছে ঘেঁষিয়া আসিলেই সে তফাতে সরিয়া যায়, এদিক ওদিক চায়। বাড়ীর লোকের ভয়? না, তাহা তো নয়। হঠাৎ নিকোলার মাথা খুলিয়া গেল, সে বুঝিল, আজ সিলা তাহার সঙ্গে একত্র দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেছে বিশেষতঃ পথে, লোকের সম্মুখে। বুঝিতে পারিয়াই নিকোলা তাড়া তাড়ি 'গুড্‌ বাই' বলিয়া সিলার কাছ হইতে যেন ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

তারপর সে সিলাকে যতবার দেখিয়াছে ততবারই মনে হইয়াছে যেন সে বিষণ্ণ। নিকোলা বুঝিত তাহার সঙ্গে মিশিতে সিলা উৎসুক;—ইহাতে নিকোলা মনে মনে খুব খুসী হইত; কিন্তু সিলাকে কাছে ঘেঁষিতে দিত না; কেক্ খাওয়াইবার পয়সা যাহার নাই তাহার সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা কেন?

যাহাদের কোর্ত্তা তেমন পুরু নয় এবং সংখ্যাতেও খুব বেশী নয়, তাহাদের একজন চমৎকার বন্ধু আছে, তার নাম সূর্য্য। সে রোজ এমন হাজার হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ করে,—তাকে বলে রৌদ্রের ওভার-কোট। সে বন্ধুর দেখা পাইলে অসাড় হাত পায়েও সাড় ফিরিয়া আসে, খোরাকী রোজগারের আর ভাবনা থাকে না। পুরা সকালটা জেটিতে খাটিয়া নিকোলা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া হাই তুলিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় রুমাল বাঁধিয়া একটি ছিপছিপে মেয়ে দ্রুতগতিতে তাহারই দিকে আসিতেছে—এ আর কেউ নয়—এ সিলা।

সিলা তুঁতপোকার মত বক্রগতিতে জাহাজঘাটায় সদ্য আনীত মাছের ঝোড়াগুলার ভিতর দিয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতেছে। সোৎসুক দৃষ্টিতে সে একবার

এদিকে চায়, একবার ওদিকে চায়। এইবার সে নিকোলাকে দেখিতে পাইয়াছে।

"নিকোলা! নিকোলা!" তাড়াতাড়িতে তাহার কথাগুলা মুখের মধ্যে জড়াইয়া যাইতেছে। "ভারি সুখবর! ভারি সুখবর! আমার সেই নাল জামাটাকে মেরামত করতে গিয়ে, তার অস্তরের ভিতর থেকে মা সেই হারাণো টাকাগুলো পেয়ে গেছে, নোট টাকা সব ছিল—ওই অস্তরের পাশে পড়ে! আমি বাবাকে দোকানে খাবার দিতে এসেছিলুম অমনি তোমাকেও তাড়াতাড়ি খবরটা দিয়ে যাচ্ছি। যাচ্ছি কারখানায়—তাদেরো সব বলতে হ'বে, মিছেমিছি তোমার অপমান করেছিল। একি কেউ স্বপ্নেও জানত? ঠিক অস্তরের আর জামার কাপড়ের মাঝখানটিতে! আমি যে—আমি যে—কী খুসী হয়েছি তা বলে জানাতে পারি নে। মাকে যদি দেখ্‌তে—একেবারে মুখ গম্ভীর!"

নিকোলার মন গলিল না, সে অন্য দিকে চাহিয়াই বলিল, "আমার এতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তুমি তোমার মা বাপকে এই কথা বলগে।" কথাটা সিলার কানে পৌঁছিবার আগেই সে কারখানার দিকে ছুটিয়াছে।

অবশ্য নিকোলারও তাহাতে আপত্তি ছিল না। দিক খবর করখানায়, সে যে নির্দ্দোষ সে কথা সকলে জানুক। তবে, অ্যাণ্ডার্সবার্গ এখন সহরের বাহিরে গিয়া দোকান করিয়াছে, সে আর কারখানায় নাই; নিকোলা অন্য মিস্ত্রিদের মতামতের বড় একটা তোয়াক্কা রাখে না। সে এখন স্বাধীন।

নিকোলা প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরিয়া সাগরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কয়জন কুলিদের ছেলে সাঁতার দিয়া একখানা পাউরুটি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। পাউরুটিখানা নোনাজল খাইয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় ডুবু ডুবু।

হায়! সিলা যতই চেষ্টা করুক নিকোলার সুনাম আর ফিরিবে না। একবার যাহাকে চোর বলা হইয়াছে ঐ পাউরুটিখানার মত নোনাজল ঢুকিয়া তাহাকে অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। যাক্‌,—সে তো আর কারখানায় কাজের উমেদারীতে যাইতেছে না, সে এখন স্বাধীন, কারো তোয়াক্কা রাখে না। "এই ছোঁড়ারা ধরতে পারলিনে পাউরুটি? তবে আখ কি ক'রে ধরতে হয়; খেতে হ'বে কিন্তু তোদের,—বলে রাখছি।" নিকোলা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হলম্যান ছুতার সেলভিগের দোকানের পুরাণো খরিদ্দার। সকলেই তাহাকে চিনিত, এবং সে যে টাকার মানুষ এমন ধারণাও অনেকের ছিল। সুতরাং সে ধারেও মদ পাইত; হিসাব চলিয়াই আসিতেছিল। হলম্যান গৃহিণী এ খবর মোটেই জানিত না; তাহার বিশ্বাস ছিল, যে, হলম্যান যখন পকেট খরচ বলিয়া প্রতি সপ্তাহেই কিছু পয়সা নিজের কাছে রাখিয়া থাকে তখন মদ ভাং যাহা খায় ঐ পয়সাতেই খায়।

এক শনিবারে, অভ্যাসমত হলম্যান দোকানে ঢুকিয়াছে, সিলা বাজারের চুপড়ি লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। আজ সিলা বেশ একটু ফিট্‌ফাট। হঠাৎ তাহার মনে হইল, রাস্তার মোড়ে নিকোলার মত কাহাকে যেন সে দেখিল, গত শনিবারেও তাহার ঐ রকম মনে হইয়াছিল।

কয় মাসের মধ্যে নিকোলার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিবারও সুযোগ সে পায় নাই।

সিলা দ্রুতপদে মোড়ের দিকে চলিল—নিশ্চয়ই নিকোলা। কিন্তু, মোড়ের কাছে গিয়া আর সিলা তাহাকে দেখিতে পাইল না। কাজেই, সেলভিগের দোকানের সবুজ দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বিষণ্ণ মনে সিলা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল।

সিলা জানিত সাতটা বাজিলে আর হলম্যান্ সেখানে একদণ্ডও দাঁড়াইবে না। দরজার কাছে গিয়া আবার হঠিয়া আসিল। নিশ্চয় সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে অনেক দোকানই বন্ধ হইয়া গেল। সিলা ছটফট করিতে লাগিল। আজ আর কিছুই কেনা হইবে না, দেখিতেছি। সব দোকান প্রায় বন্ধ হইল।

তাহার বাপ চলিয়া যায় নাই তো? সিলা যখন মোড়ের দিকে গিয়াছিল সেই সময়ে হলম্যান্ বাহির হয় নাই তো? সে তো কোনো দিন এমন দেরী করে না।

হঠাৎ দোকানের সবুজ দরজা খুলিয়া একজন

পরিচারিকা খালিমাথায় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। এক মিনিটের মধ্যে আরো একজন লোক ঐ রকম তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল; লোকটা ছুটিয়া গেল বলিলেই হয়। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক দোকান ঘরের ভিতর হইতে একেবারে বাহিরের সিঁড়ি কয়টার উপর আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

কি একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে।

পর মুহূর্ত্তে ঝনঝন্ করিয়া দোকানের একটা সাসি কে ভাঙিয়া ফেলিল। ব্যাপার কি?...কোনো মাতাল হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে আর কি...আজ শনিবার কিনা...মাত্রা ঠিক রাখিতে পারে নাই...এখন বোধ হয় উহাকে পুলিশের হাতে দিতে হইবে।

সিলা এমন কাণ্ড অনেকবার দেখিয়াছে, সুতরাং ভয় পাইল না। হল্‌ম্যান সম্বন্ধে তাহার কোনো আশঙ্কা ছিল না, কারণ সে বেচারা কখনো কোনো হাঙ্গামায় ভিড়িত না।

কিন্তু...সবাই দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল... হল্‌ম্যান কই?

সিলা ভাঙা-সাসির ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিল... কয়টা মরকুটে জেরেনিয়মের গাছ;...মদের দোকানের উৎকট গন্ধে সিলাকে অবিলম্বে মুখ ফিরাইতে হইল।

সিলার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং সে দুর্গন্ধ অগ্রাহ্য করিয়া পুনর্ব্বার উঁকি মারিল।

ও কে?...ওই যে বুকের বোতাম খোলা...টেবিলের উপর সটান...একখানা হাত ঝুলিয়া পড়িয়াছে...ওকি সিলার বাপ?...হলম্যান্?

"লোকটা যেন নড়ছে বলে বোধ হ'ল...নিকটে কারো কাছে একটা ল্যানসেট পাওয়া যায় না...একটা ল্যানসেট কোথাও নেই?"

ইহার পর যে কি হইল তাহা সিলা জানে না; শুধু এইটুকু মনে আছে, যে, কে যেন তাহাকে ঘরের ভিতর ঢুকিতে বারণ করিতেছিল এবং কে যেন বলিল "যেতে দাও,—ও হল্‌ম্যানের মেয়ে।"

জ্ঞান হইয়া সিলা দেখিল তাহার বাপের মাথা তাহার কোলের কাছে। তাহার মনে হইতেছে যেন সে খুব উঁচু হইতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল।

আগে হল্‌ম্যানের গলা হইতে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাইতেছিল, এখন তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার বিস্ফারিত চক্ষের দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে।

দরজার কাছে একখানা বেঞ্চির উপর একটা গুণ্ডা রকমের লোক বসিয়া আছে। সিলা উহাকে চেনে। মাতালদের মধ্যে কেহ হাঙ্গামা করিলে ওই লোকটাই দমন করে...ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেয়।

ঘর নিস্তব্ধ; কেবল একটা মদের পিপার ছিপি-দেওয়া নলের মুখ হইতে একটা টিনের মগে টুপ্ টাপ্ করিয়া মদ টোপাইতেছে।

এই সময়ে একজন চশ্‌মা-পরা ছোকরা ঘরে ঢুকিল; বোধ হয় ডাক্তার। সে যন্ত্রের ব্যাগ খুলিতে খুলিতে বাঁধি গতের মত উপর্য্যুপরি অনেকগুলা প্রশ্ন করিয়া, হল্‌ম্যানের বুকে একটা ষ্টেথোস্কোপ্ লাগাইল। পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া ল্যান্‌সেট বাহির করিয়া সিলার দিকে চাহিয়া বলিল "কামিজের কফ্‌টা গুটিয়ে ধর; দেখো, যেন নেমে না পড়ে।"

ডাক্তার যতক্ষণ অস্ত্র ফুটাইতেছিল সিলা ততক্ষণই এমনি করুণভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, যে, দেখিলে মনে হয়, যেন ঐ ডাক্তারেরই কাছে সে নিজের বাপের জীবন ভিক্ষা করিতেছে।

ল্যান্‌সেটে যাহা উঠিল তাহা রক্ত বলিয়া চেনা এক রকম অসাধ্য...ঘন, কাল্‌চে, চিটা গুড়ের মত।

ডাক্তার আবার নাড়ী দেখিল, বুক পরীক্ষা করিল, আবার ল্যান্‌সেট লাগাইল। শেষে নীচের ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটা ঠেলিয়া তুলিয়া মেডিকেল কলেজের বড় ডাক্তারদের মত গম্ভীর চালে বলিয়া উঠিল "হ'য়ে গেছে; অতিরিক্ত মদ খেয়ে মারা গেছে।"

সিলা চীৎকার করিয়া হল্‌ম্যানের বুকে লুটাইয়া পড়িল। ছোক্‌রা ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল "এ কে? ওর মেয়ে নাকি?"

ডাক্তার যাইবার পূর্ব্বে মালোর কাছে গিয়া সযত্নে অস্ত্রশস্ত্র মুছিয়া গুছাইয়া লইতে লাগিল এবং চশ্‌মার পাশ দিয়া বারম্বার সিলার দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল।

সিলা বুকভাঙা কান্না কাঁদিতেছিল, তাহার অন্য দিকে তখন দৃষ্টি ছিল না।

ডাক্তার যথাসম্ভব বিলম্ব করিয়া বিদায় হইল।

একজন বছর কুড়ি বয়সের ছোকরা এক হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে আর এক হাতে আস্তে আস্তে সিলাকে হল্‌ম্যানের মৃত শরীর হইতে তফাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

"সিলা! সিলা! শুনছ? আমি এসেছি; আমি—নিকোলা।" নিকোলা দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াও সিলাকে নড়াইতে পারিল না।

ইতিমধ্যে একজন পুলিসের লোক আসিয়া দোকানের লোকেদের জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছিল।

দোকানের কর্ত্রী জেরায় যাহা বলিল তাহা মোটামুটি এই :—

হল্‌ম্যান্ বরাদ্দ মত এক বোতল এবং তিন গ্লাস শেষ করিয়া আবার হাত বাড়াইল; যে লোকটা মদ দিতেছিল সে ভাবিল বুঝি আবার চাহিতেছে। সেই মুহূর্ত্তেই কিন্তু হল্‌ম্যান কেমন অবসন্ন ভাবে বেঞ্চিতে শুইয়া পড়িল, সকলেই ভাবিল লোকটার নেশা হইয়াছে। হল্‌ম্যানের এত নেশা হইতে কিন্তু কেহ কখনো দেখে নাই, যতই মদ্ খাক্ না কেন সে টলিত না; খুব মাতাল হইলে, বড় জোর বাড়ী যাইবার সময় সঙ্গে একজন লোক লইয়া যাইত, এই পর্য্যন্ত।

সেল্‌ভিগের দোকানে যাহাদের নিত্য যাতায়াত ছিল শেষ কথাটায় তাহারা সকলেই একবাক্যে সায় দিল।

দারোগা লিখিল "দোকানের বিশিষ্ট বাঁধা খরিদ্দারের সকলেই সাক্ষ্যদানকালে একমত হওয়া বিধায় তাহাদের কথা প্রমাণ ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল।"

এই সকল নির্ব্বাক বাঁধা খরিদ্দারের মধ্যে অনেকেই কিন্তু গোলমাল দেখিয়া গোড়াতেই টলিতে টলিতে সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অব্যবহৃত খোলা বোতল এবং ভরা গেলাস এখনো কেহ গুছাইয়া তুলিয়া রাখে নাই।

গোঁফে মোচড় দিয়া দারোগা যাইবার সময় আবার জিজ্ঞাসা করিল "আর কোন হেতু নাই তো?"

দোকানের কর্ত্রী প্রথমে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর ভাবিয়া পাইল না; শেষে ইতস্ততঃ করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম কতকটা এইরূপ,—

পুরাণো খরিদ্দারকে সে বেশি পীড়ন করিতে চায় না, কিন্তু কি করিবে? সে বিধবা, তাহার উপর তাহার দুইটি অবিবাহিত মেয়েকে প্রতিপালন করিতে হয়; কাজেই, সে আজ হল্‌ম্যান্‌কে বলিয়াছিল যে, এখন হইতে সে আর ধারে মদ দিতে পারিবে না; যদি খাইতে হয় তো নগদ পয়সা ফেলিয়া খাও। সে অনেক কাল অপেক্ষা করিয়া দেখিয়াছে; হল্‌ম্যানের অনুরোধে সে কখনো বাড়ীতে তাগাদা করিতে লোক পর্য্যন্ত পাঠায় নাই। এ দিকে টাকা তো আর চিরদিন ফেলিয়া রাখা যায় না; কাজেই, জিনিষপত্র নীলাম করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবে—এ কথা সে আজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হল্‌ম্যান্‌কে বলিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সময়ে সেই গুণ্ডা-রকমের লোকটা আর দুইজন লোকের সাহায্যে মদের পিপা বহিবার ঠেলা গাড়ীতে ধরাধরি করিয়া হলম্যানের মৃতদেহ শোয়াইয়া দিল, এবং টেবিল-ঢাকা কাপড় দিয়া শব ঢাকিয়া ফেলিল।

খরিদ্দারের শবদেহ এমন করিয়া রাস্তা দিয়া লইয়া গেলে দোকানের দুর্নাম হইবে ভাবিয়া সেল্‌ভিগ্-গৃহিণী একখানা কালো রঙের কাপড় খুঁজিতে গেল। না পাইয়া অভাবে একখানা সবুজ রঙের পুরাণো পর্দ্দা চাপা দিয়াই মড়া বিদায় করিবার ব্যবস্থা করিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সিলার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। এখন নিকোলা ভিন্ন তাহার কাছে আর কেহই নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল একটা মশা কানের কাছে আসিয়া ক্রমাগত ভোঁ ভোঁ করিতেছে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নিকোলা বলিল "তোমার বাপ, তোমার উপর খুসী ছিলেন, আমার উপরও ছিলেন। আমায় যে ভালবাস্‌তেন সে কথা তিনি কখনো মুখ ফুটে বল্‌তে পারেন নি।"

সিলা চুপ করিয়া রহিল।

"বাড়ী ফির্‌তে তাঁর ভারি ভয় ছিল,—আর বাড়ী যেতে হ'বে না। ভয় ভাঙ্‌তে মদের দোকানেও আর ঢুক্‌তে হ'বে না।"

সিলা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিকোলা কহিল "শোনো, সিলা, কেঁদো না, চুপ কর। বাপ মা কারু চিরদিন থাকে না। বাপ গেছে, ভাবনা কি? তোমার ভাবনা ভাববার লোক তোমার কাছেই আছে। এই দেখ না, আমি কখনো বাপের যত্ন পাইনি, বাপ যে কেমন তা' চক্ষেও দেখি নি। আমি নিজে নিজের ভার নিয়েছি, আর তোমার ভার নিতে তো আমি চিরদিনই প্রস্তুত। তোমাকে আমার মনের কথা জানিয়ে রাখ্‌লুম। আমি অল্পদিনের মধ্যেই কিছু একটা হ'য়ে উঠ্‌ছি। তোমাকে বেশী দিন খেটে খেতে হ'বে না সিলা।"

নিকোলার সকল কথা সিলার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ।

"তোমাকে গলির মোড় পর্য্যন্ত আজ এগিয়ে দেব এখন; রাত্রেও কাছাকাছিই থাক্‌ব;—যদি কোনো দরকার হয়—বুঝেছ?"

সিলা ভাঙা গলায় মৃদুস্বরে বলিল "হাঁ, নিকোলা, তুমি আজ কাছে কাছেই থেক।"

রাস্তায় লোক চলাচল কমিয়া গেলে, গুণ্ডাটা হল্‌ম্যানের শবদেহ ঠেলা গাড়ী করিয়া দোকানের বাহির করিল। ময়লা কালো পোষাক পরা দুইটা কুলি মড়া কাঁধে করিল; আগে আগে চলিল গুণ্ডাটা, পিছনে সিলা ও নিকোলা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা

[কোনো বিষয়ের আলোচনা যে মাসে মূল বিষয় প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, ঠিক তাহার পরবর্ত্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত না হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না। আলোচনার পর মূল বিষয়ের লেখকের উত্তর পত্রস্থ হইলে, আর সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা চলিতে পারিবে না। লেখকগণ আলোচনা যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবেন; দীর্ঘ আলোচনা ছাপা আমাদের পক্ষে দুষ্কর।—প্রবাসী সম্পাদক।]

বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

গত ভাদ্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য" পাঠ করিয়া যে কয়টী কথা আমার মনে উদিত হইয়াছে তাহাই আজ প্রবাসীর পাঠকগণ ও সন্দর্ভকারের নিকট সমুত্থিত করিতেছি।

(১) "টি" সঙ্কেতে আদরের বস্তু বুঝায় বটে কিন্তু ছোট আয়তনের বস্তু সর্ব্বত্র বুঝায় না, যেমন, রাজপ্রাসাদটি, বৃদ্ধলোকটি, ছোট ছেলেটি, হাতীটি ইত্যাদি বাক্যে আদর বা টান বুঝাইতেছে বটে কিন্তু ছোট আয়তন বুঝাইতেছে কি?

(২) "ছাতাটা কোথায়?" বলিলে যদি 'যত্ন অযত্ন কিছুই না বোঝায়' তবে "ছাতাটি"তে বুঝানই বা সম্ভব কিরূপে? যে জিজ্ঞাসা করিতেছে তার ঐ ছাতার উপর একটু মমতা বা প্রয়োজন না থাকিলে সে এরূপ প্রশ্ন করিবে কেন? তবেই এখানে "টি" বা "টা"র অর্থ একই, ভিন্ন অর্থ বুঝাইতে পারে না; বরং যত্নই বেশী বলিতে পারা যায়।

(৩) সকল স্থানে নাম সংজ্ঞায় "টি" বা "টা" যোগ হইলে বক্তার "অপ্রীতিকরতা" বুঝায় না। যেমন, আমি একজন লোককে কোনও একটি কথা (যাহা তাহার দোষের) বলিতে সাহস করিতেছি না কিন্তু অত্যন্ত ইচ্ছা যে বলি, তখন আমার বন্ধু হরি যদি সেই কথাটি তাহাকে বলিয়া ফেলে তখন আমরা সেখানে বলি না কি যে "দেখলে হরিটা কেমন উচিত বক্তা?" এখানে হরির কাযটা বক্তার বিন্দুমাত্রও অপ্রীতিকর হয় নাই, বরং তাহার বাহাদুরী বা সাহসের প্রশংসাই করা যাইতেছে। তবেই এখানে "বক্তার হৃদয়ের সুর মিশান" হইল বটে কিন্তু "টা, টি"তে লেখকের প্রদত্ত সুর খাটিল না।

(৪) অচেতন পদার্থবাচক বিশেষ্য পদে কর্ম্মকারকে "কে" বিভক্তিচিহ্ন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন 'জলকে যাব, ঘরকে যাও, বনকে যাব'। এতদ্ভিন্ন সাহিত্য-ভাষাতেও অপর্য্যাপ্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেমন 'জগৎকে, বিশ্বকে, পদার্থকে, বস্তুকে, বৃক্ষকে, শাখাকে।' এই অচেতন পদার্থে "টি, টা" প্রত্যয় করিলে কি সেই বস্তুটিকে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করে?

(৫) "টাক্" প্রত্যয় "টা" ও "এক" এ দুয়ের সন্ধিজাত হইতে পারে, কিন্তু 'টাক্' হইতে "টেক" শব্দটি অধিক ব্যবহৃত এবং প্রযুজ্য; তাহা হইলে সন্ধিও সহজ বোধ হয়; যেমন টা+এক=টেক; যথা জন+এক জনেক=জনেক; বার+এক=বারৈক=বারেক। "ঐ"-কার স্থানে "এ"কারের ব্যবহার অসংখ্য। এ "টেক" বা "টাক্" অর্থ= "প্রায়।"

(৬) রবি বাবু বলিতেছেন যে যেখানে "এক শব্দ অপর একটি বিশেষণের পরে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় সেখানে সাধারণতঃ 'টি' বা 'টা' প্রয়োগ চলে না, যেমন 'লম্বা এক ফর্দ্দ' ইত্যাদি" কিন্তু "টি" বা "টা" প্রয়োগ করিলেও কোনই অর্থবৈষম্য ঘটে না। লম্বা একটা ফর্দ্দ বা লম্বা এক ফর্দ্দ, অর্থ একই। উভয়ের ব্যবহারও প্রায় সমানই।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা

উপনিষদ্ : ব্রহ্মতত্ত্ব—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল, প্রণীত। পৃষ্ঠা—৵+২৮২; মূল্য ১৷৹; ৫০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে লোটাস্ লাইব্রেরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়গুলি এই:—বৈদিক সাহিত্য, বেদ কি? বেদ সঙ্কলন, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক, উপনিষদ্—বেদান্ত, বেদের সংকলনকাল, উপনিষদের প্রাচীনতা,

উপনিষদের সংখ্যা ও বিভাগ, অথর্ব্ব উপনিষদ, উপনিষদ্ শব্দের নিরুক্ত। উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব, ব্রহ্মবিদ্যা; দ্বি-বিধ ব্রহ্ম, নিগুর্ণ ব্রহ্ম, নিরুপাধি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম অজ্ঞেয়; সত্যস্যসত্যম্, সগুণ ব্রহ্ম, মহেশ্বর, অন্তর্যামী, বিধাতা, বিশ্বাতিগ, বিরাট পুরুষ; সচ্চিদানন্দ, ঈশ্বর ও মহেশ্বর, ত্রিপুরুষ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি—সূত্রাত্মা, প্রধান ক্ষেত্রপতি, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য (দুইটী পরিশিষ্ট সহ)।

যে অধ্যায়ে যে প্রকার মন্ত্র উদ্ধৃত করিলে বিষয়টী বিশদ হয়, গ্রন্থকার সেই অধ্যায়ে সেই প্রকার মন্ত্র বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থকার একজন খ্যাতনামা লেখক। ইঁহার ভাষা পরিমার্জ্জিত; স্থলে স্থলে ভাষা এতই মিষ্ট হইয়াছে যে একবার পড়িয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না—ইচ্ছা হয় বহুবার সেই সমুদয় স্থল অধ্যয়ন করি। বিষয়গৌরবে এবং ভাষার মাধুর্য্যে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

দুইটী দোষে এই সুন্দর গ্রন্থের গৌরবের অনেক লাঘব হইয়াছে। প্রথমতঃ থিয়সফির আবরণে বেদান্ত আচ্ছন্ন হইয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জড়বাদের 'অনুমান' সমূহকে ঋষিগণের মস্তকে চাপাইয়া গ্রন্থকার ভারতীয় বিজ্ঞানবাদকে জড়বাদে পরিণত করিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবুর ধারণা—জড়বাদের সিদ্ধান্তের সহিত না মিলিলে বিজ্ঞানবাদের (Idealism) সিদ্ধান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে।

এই দুইটী কারণে উপনিষদের ব্যাখ্যাও দুই একটী স্থলে অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। 'মাতরিশ্বা' শব্দের এই অর্থ দেওয়া হইয়াছে, মাতরি (matterএ) শ্বসতি = মাতরিশ্বা। মাতৃর প্রকৃতির একটী সংজ্ঞা। খ্রীষ্টানদিগের Virgin Mary। তাঁহারাও বলেন Holy Ghost moving on the surface of the waters.

উপনিষদের অনুবাদও সব স্থলে ঠিক হয় নাই। একস্থলে আছে—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ঐতরেয় ১৷১। গ্রন্থকারের অর্থ—আদিতে এক পরমাত্মা (মহেশ্বরই) ছিলেন। কিন্তু পদপাঠ ও অর্থ এই:—আত্মা বা (=বৈ) ইদম্ (=ইহা, এই জগৎ) এক এব অগ্রে আসীৎ (=ছিল)=অর্থাৎ এই জগৎ অগ্রে এক আত্মাই ছিল অর্থাৎ আত্মারূপে বর্ত্তমান ছিল।

"স পর্য্যগাৎ শুক্রমকায়মব্রণম্" ঈশ, ৮। গ্রন্থকার অর্থ করেন 'সেই অকায় অব্রণ শুদ্ধ (ব্রহ্ম) সমস্তে প্রবেশ করিলেন'। এ অংশ ব্রহ্মের অতীতকালের ইতিহাস নহে। তিনি কি ভাবে বর্ত্তমান তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। প্রকৃত অর্থ এই—'তিনি সমুদয় ব্যাপিয়া আছেন।'

'অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে'—ইহার অর্থ করা হইয়াছে—'অস্তি' এই মাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না। কিন্তু ইহার অর্থ "যাঁহারা বলেন 'তিনি আছেন,' তাঁহারা ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে?"

'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো' ইত্যাদির অর্থ এই প্রকার করা হইয়াছে—"যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর……যিনি পৃথিবীকে অন্তরে যমন করেন" ইত্যাদি। 'অন্তর' শব্দের অর্থ কি? দুইটী 'অন্তর' কি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? না, প্রথম 'অন্তর' শব্দের অর্থ 'পৃথক্'?

গ্রন্থকার উপনিষদের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে এ চেষ্টা ফলবর্তী হয় নাই। একস্থলে লিখিয়াছেন "এই নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি নিগুণ পরব্রহ্ম যখন মায়া উপাধি অঙ্গীকার করেন, যখন তিনি মায়া উপাধির দ্বারা নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন, তখন তিনি সবিশেষ সবিকল্প সোপাধি সগুণ হয়েন।" হীরেন্দ্র বাবুর মতে সগুণ ভাব ও নিগুর্ণ ভাব উভয়ই সত্য। অথচ 'যেন' কথাটী ব্যবহার করিয়া সগুণ ভাবের সত্যতা অস্বীকার করিতেছেন। একস্থলে লিখিয়াছেন এই পরব্রহ্মে "স্বগত ভেদেরও অবকাশ নাই"। অপর একস্থলে আছে "পরব্রহ্মে এই হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি চিরকালই অবস্থিত আছে, কিন্তু তিনি যতক্ষণ না মায়া উপাধিতে উপস্থিত হন, ততক্ষণ ঐ তিন শক্তির প্রকাশ হয় না"। যে ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নাই সেই ব্রহ্মে এই তিন শক্তি কি প্রকারে অবস্থিত থাকিতে পারে? যদি বল বীজাকারে রহিয়াছে—তাহা হইলেও স্বগতভেদ স্বীকার করা হইল। হীরেন্দ্র বাবু বলেন 'ব্রহ্মের যে মায়া আবরণ, তাহা স্বেচ্ছাকৃত।' কিন্তু নিগুণ স্বগতভেদরহিত ব্রহ্মে কি প্রকারে 'ইচ্ছা' থাকা সম্ভব? ইচ্ছা স্বীকার করিলেই স্বগতভেদ স্বীকার করা হইল। আর যদি স্বীকারই করা যায় যে 'ইচ্ছা বীজাকারে ছিল' তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য বীজরূপে অবস্থিত যে এই ইচ্ছা, ইহা প্রকাশমান হইল কি প্রকারে?

ব্রহ্ম কেন অজ্ঞেয়—এবিষয়ে হীরেন্দ্র বাবু দুইটী যুক্তি দিয়াছেন। ১। ব্রহ্ম বিষয়ও নহেন, বিষয়ীও নহেন, তাঁহাতে বিষয় ও বিষয়ী একাকার, সুতরাং তাঁহাকে জানা যায় না। ২। তিনি বিষয়ী, সুতরাং তিনি বিষয় হইতে পারেন না। প্রথম যুক্তিতে স্বীকার করা হইল যে ব্রহ্ম বিষয়ও নহেন, বিষয়ীও নহেন, কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তিতে বলা হইল তিনি বিষয়ী; যুক্তি দুইটী কি পরস্পর বিরোধী নহে?

গ্রন্থকারের মতে সগুণ ব্রহ্মও সত্য অথচ তিনি বলিতেছেন "এই যে বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ, ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্তমাত্র, ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা।" ব্রহ্মের সগুণ ভাব যদি সত্য হয় তবে এজগৎকে 'রজ্জু-সর্প'বৎ ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলিব কি প্রকারে?

আজকাল অনেকেই পাশ্চাত্য দর্শনের দোহাই দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন বলিতে কি বুঝেন তাহা তাঁহারাই জানেন। হীরেন্দ্র বাবুও একস্থলে লিখিয়াছেন—"পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে জড়ে আমরা যে শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাই, তাহা জীবশক্তিরই রূপান্তর।" এখন কোন্ দার্শনিক একথা বলিতেছেন তাহা আমরা জানি না। Berkeley এক সময়ে Subjective Idealism প্রচার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে ত ২০০ বৎসরের কথা, আর সে মত যে ঠিক এই মত তাহাও নহে। হীরেন্দ্র বাবু Spencerকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় এই কথা বলিয়াছেন কারণ টীকাতে তাঁহার গ্রন্থ হইতেই অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে এজগৎ জীবশক্তির রূপান্তর। আর Spencer এ মতই পোষণ করেন না—তিনি যাহা বলেন তাহা এই—"যে শক্তি জড়রূপে প্রকাশিত, সে শক্তিই চৈতন্যরূপে প্রতিভাত।"

গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই অতি পরিপাটী।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

সনাতনী—

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। বকুলও প্রেসে মুদ্রিত ও ২৮।৪ অখিল মিস্ত্রির লেন হইতে প্রকাশিত। কাগজ ও বাঁধাই উত্তম। বড় বড় অক্ষরে ছাপা, সুতরাং সুপাঠ্য; এবং পুস্তক দেখিতে বড় হইলেই অল্প আয়াসেই শেষ হয়। ভাষাও প্রাঞ্জল, "পূর্ব্ব পীঠিকা" রূপ দন্তভাঙ্গা শব্দ না থাকিলে আরও প্রাঞ্জল হইত। পুস্তকের বাহ্যতত্ত্ব এই পর্য্যন্ত, এখন একবার ভিতরে প্রবেশ করা যাক্। কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই বুঝিতে পারিলাম গ্রন্থকার আমাদের কি অপূর্ব্ব সামগ্রী দিয়াছেন। প্রথমেই লেখা আছে "আজকাল অনেক 'শিক্ষিত' লোকেই পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী—মনে করেন, ধর্ম্মে, সমাজে, শিক্ষায়, দীক্ষায়—সকল বিষয়েই নিয়ত পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। সংসারের গতিই যেন কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; পরিবর্ত্তন দ্বারা সংসারের সকল পদার্থেরই যেন

পরিস্ফুটন হইতেছে। এটী তাঁহাদের বিশ্বাস, কিন্তু এটী একটী বিষম ভ্রমাত্মিকা ধারণা।” কথাটা পাঠ করিয়াই একেবারে থতমত খাইয়া গেলাম। উনবিংশ শতাব্দীর মহামহত্বপূর্ণ যুগের* যাহা সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার, মানবের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানবিজ্ঞান সর্ব্ববিভাগে একবাক্যে যাহার সমর্থন করিতেছে, যাহার জন্য প্রতিদিনই নূতন নূতন প্রমাণ উপস্থিত হইতেছে, সরকার মহাশয় বলেন, তাহা মিথ্যা। সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী মনীষীগণ যে বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, অপূর্ব্ব প্রাণীতত্ত্ববিদ ডারবিন্ এবং তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন আত্মতত্ত্বজ্ঞ গ্রীন্, দার্শনিক স্পেন্সার ও কবি ব্রাউনিং যে তত্ত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জীবনপাত করিলেন, সরকার মহাশয় বলেন, তাহা মিথ্যা। জগৎ যে অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই চলিয়াছে এবং অনন্তকাল চলিবে এই বিবর্ত্তনতত্ত্ব আজকালকার স্কুলের বালকও জানে। এই তত্ত্বের যে আবার আজ পক্ষসমর্থন করিতে হইবে ইহা আমরা স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই। ভূতত্ত্ববিদ্ ভূস্তরাভ্যন্তরে, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ আপনার বৃক্ষবাটিকায়, জীবনতত্ত্ববিদ্ আপনার পরীক্ষাগারে, জ্যোতির্ব্বেত্তা স্বীয় পর্য্যবেক্ষণ-মন্দিরে, মনস্তত্ত্বজ্ঞ বিদ্যালয়ে, ঐতিহাসিক স্বীয় পাঠাগারে ও প্রত্নতত্ত্ববিদ যাদুঘরে অনুসন্ধান করিতে করিতে সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে যে তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন সরকার মহাশয় বলেন, তাহা মিথ্যা। অধ্যাপক হাক্সলী জীববিবর্ত্তনের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই "A general name for the history of the steps by which any living being has acquired the morphological and the physiological character which distinguish it."† হারবার্ট স্পেন্সার বলেন—"Evolution is a change from an indefinite incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity through continuous differentiations and integrations."‡ জগৎ যে কেবলই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইতেছে—আজকালিকার দিনে যিনি সে কথা অস্বীকার করেন তাঁহাকে নিতান্ত অন্ধ ও বধির ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। সরকার মহাশয় বলিবেন মূল বজায় রাখিয়া খোসার পরিবর্ত্তন হয়। প্রথম কথা এই, কোনটা মূল কোন্‌টা খোসা, তাহা নির্ণীত হইবে কিরূপে? জগতের ইতিহাসে স্পষ্টই দেখা যায় যে এক যুগে যাহাকে মূল বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল পর যুগে তাহাকে খোসা বলিয়া বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাঁহার সনাতনের দৃষ্টান্ত হিন্দু ও ইহুদাও শত পরিবর্ত্তনের আধার। ঋগ্বেদ হইতে রামমোহন এবং মুসা হইতে মেইমনাইডিস্ পর্য্যন্ত তাহাদেরও ধর্ম্ম ও সমাজে যে কত মূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ঐতিহাসিক দর্শনের অভাবে তিনি তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই। পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু তাহার নাম পরিবর্ত্তন নহে। আর, বিবর্ত্তনের§ দিক হইতে এ সিদ্ধান্তটাই নিতান্ত ভ্রা ।। বিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে এমন সব নূতন মূলতত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে যাহা পূর্ব্ব স্তরের জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আসল কথাটা এই, মানুষ এই পৃথিবীতে সনাতন না হৌক নিতান্ত পুরাতন হইলেও তার বুদ্ধিবিবেক অত্যন্ত পুরাতন নহে। তাহার বুদ্ধিবিবেক যখন ক্রমবর্দ্ধনশীল, তখন তাহার নিকটে এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের দ্বার দিয়া নিত্য নূতন মূলতত্ত্বের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং এই নূতন তত্ত্বের আলোকে তাহার প্রাচীন আচারপদ্ধতি ও মানসিক ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন নিতান্ত অপরিহার্য্য। মানুষের জগৎসৃষ্টিবিষয়ক ধারণার কথাটা ভাবিয়া দেখা যাক্। মানবের জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিবিষয়ে তাহার হৃদয়ে প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল এবং সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে এ বিষয়ের একটা মীমাংসাও করিয়া রাখিয়াছিল। সেই মীমাংসা সে এতকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে তাহার সে ধারণাকে চূরমার করিয়া দিতেছে, তাহার সৃষ্টির ধারণাকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইতেছে। বিবর্ত্তনের এই স্তরে আমরা এমন কিছু পাইলাম যাহা আমাদিগের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। সরকার মহাশয় হয়তো বলিবেন, - মূলতত্ত্বের কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, ঈশ্বর তো সৃষ্টিকর্ত্তাই রহিলেন। উত্তর এই,—সকল বিবর্ত্তনবাদী ঈশ্বরবাদী নহেন। যদি মানিয়াই লওয়া যায়, যে তাঁহারা ভ্রান্ত, তবুও আসল কথাটার উত্তর হইতেছে না। সৃষ্টির মূল প্রশ্নটা,—কে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু কোথা হইতে এই দৃশ্যমান জগৎ আসিল; সেই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর আসিয়াছেন, ঈশ্বর সৃষ্টিপ্রশ্নের মূল কথা নহেন। বাস্তবিকই বর্ত্তমান বিবর্ত্তনবাদ সৃষ্টিবিষয়ক প্রাচীন ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার স্থানে নূতন মূল রোপন করিয়া দিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য নাই। মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন একদিন প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে নবীনের মৌলিক সামঞ্জস্য দেখাইতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক হাক্সলী যখন বর্ত্তমান ভূবিজ্ঞানের বিরাট লগুড় লইয়া তাড়া করিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, বিবাহ আট প্রকারের হইলেও তাহার মূল কথাটা অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছে। আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি তিনি কি করিয়া ভাবিতে পারিলেন, যে, মানবের জ্ঞানধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরে তাহার বিবাহ সম্বন্ধীয় ধারণার মূল একই। ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে যে নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর ও জ্ঞানধর্ম্মে অত্যুন্নত সুসভ্য মানবের বিবাহবিষয়ক মূল ধারণা এক হইবে। দেবী অঘোরকামিনীর স্বামীর সঙ্গে তাঁহার যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা সুসভ্য সমাজেই কয়জন লোকের মধ্যে প্রকটিত? যদি বলা যায় ইহার সঙ্গে অসভ্য মানবের বিবাহ-আদর্শের মূলগত কোন পার্থক্য নাই, তাহা হইলে সভ্য মানুষের যাহা মনুষ্যত্ব তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইবে। তিনি বিবাহ সম্বন্ধে যাহাকে মূল ধরিয়াছেন তাহা নিতান্ত অশাস্ত্রীয়। প্রাজাপত্য বিবাহ যে ব্রাহ্ম, দৈব ও আর্ষবিবাহ হইতে নিকৃষ্ট* শাস্ত্রকারগণ তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে, উক্ত বিবাহে স্বামী স্ত্রীকে সংসারধর্ম্ম পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়, এটা বিশেষভাবে গৃহস্থাশ্রমীর বিবাহ, সেইজন্য ইহা নিকৃষ্ট। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সমস্ত বিবাহের মূল আদর্শ এক নহে। তিনি যে শারীরিক সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন + তাহাও এদেশের শাস্ত্র ও ইতিহাস অনুসারে বিবাহের মূল কথা বলিয়া ধরা যায় না। দ্রৌপদীকে এদেশ কখনও পতিতা

* "A century which has added to the sum of human learning more than all the centuries that are past."
—*Ascent of Man* by H. Drummond.

† Encyclo. Brit.

‡ Data of Ethics.

§ "সংস্কার ও সংরক্ষণ" দ্রষ্টব্য

* সরকার মহাশয় যে বলেন "গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ"। শাস্ত্র তাহা স্বীকার করিবে না। গৃহস্থাশ্রমীর বিবাহ বলিয়া প্রাজাপত্যবিবাহ নিকৃষ্ট হইয়াছে।

\+ এটা মূল কথা হইলেও কিছু আসিয়া যায় না। যাঁহারা বিবাহ বিষয়ে পরিবর্ত্তন চাহেন, তাঁহারা কখনও এটীর পরিবর্ত্তন কামনা করেন না, সুতরাং খোসারই পরিবর্ত্তন চাহেন। তবে তো বিবাদ মিটিলই। সনাতনের 'স'ও খসিল না।

বলিয়া নিন্দা করে নাই। শাস্ত্রে তো বিধবা বিবাহের আদেশ রহিয়াছেই। যদি বলা যায় স্বামী উপরুত হইলে স্ত্রীর বাধ্যবাধকতা কমিয়া যায়, তবে "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে" শ্লোকের কি হইবে? উহাও যে স্মৃতিবচন। সরকার মহাশয় কি জানেন না তিব্বত প্রভৃতি দেশে এখনও এক স্ত্রীর বহুস্বামী গ্রহণের প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি কি শুনেন নাই, এই মাত্র সেদিন মহীশূরের মহারাজা আইন করিয়া আপনার হিন্দু প্রজাদিগের মধ্য হইতে এক স্ত্রীর বহুস্বামীগ্রহণপ্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। এই তো সেদিন নায়ারদিগের মধ্যে এক রমণীর যাবজ্জীবন একপুরুষগ্রহণপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে যাইয়া সংস্কারকগণ জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছেন। এইখানে "সনাতনীর" আর একটা কথার উত্তর আসিতেছে। সরকার মহাশয় আমাদিগকে আকার মানিয়া চলিতে বলিয়াছেন। উপরিউক্ত এই সকল আকার তবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত নহে? এই সকল স্থলে উন্নতি করিতে হইলে বাস্তবিকই কি বিবাহ সম্বন্ধীয় মূল মত পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন মত গ্রহণ করিতে হইবে না? সেজন্য কি আমাদিগকে জ্ঞান ও বিবেকের শরণাপন্ন হইতে হইবে না?

কিন্তু সরকার মহাশয় বিবেককে আমল দিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। বিবেক মাপকাঠি নহে। শাস্ত্র আছে, শিষ্টাচার আছে, মানিয়া চল। কিন্তু শাস্ত্র তো বহু। "বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না," আর যিনি ভিন্ন মত প্রচার করিতে পারেন না তিনি তো মুনিই নহেন। এরূপ স্থলে শিষ্টাচার অর্থাৎ মহাজনগণের পন্থা যদি অবলম্বন করিতে বল তাহাতেও তো বিবাদের অবসান হইল না। মহাজনও যে অনেক। তবে কি দেশ-প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিব? তাহা হইলে মহীশূরে রমণীর বহুস্বামীগ্রহণ অবশ্যই শিষ্টাচার বলিয়া মানিতে হইবে। নায়ারদিগের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলন করা অন্যায় হইবে। অথচ তিনি নিজেই বাঙ্গালীর কোন কোন প্রথার পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী।* সামঞ্জস্যের চূড়ান্ত আর কি! সরকার মহাশয় তো শাস্ত্র ও শিষ্টাচারের মধ্যে অনেক বিষয় সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রে যা কিছু আছে তাই কি তিনি সমর্থন করিতে প্রস্তুত? নিশ্চয়ই নহেন। তবে কে তাঁহাকে শাস্ত্রোক্ত মত বাছিয়া দিল? তাঁহার নিজেরই বিবেক নহে কি? তাহা না হইলে একজন অভ্রান্ত শাস্ত্রব্যাখ্যাকার চাই; কিন্তু পোপের কথাও তো আমাকে আমারই বুদ্ধিবিবেকের দ্বারা অবধারণ করিতে হইবে। ঘুরিয়া ফিরিয়া তো আমাকে আমার বিবেকের কাছেই আসিতে হইল। "ঘুরে শোও ফিরে শোও পৈতানেতে পা।" শাস্ত্র ও গুরুবাক্য দ্বারা বিবেককে যতদূর ইচ্ছা মার্জ্জিত ও উন্নত কর, কিন্তু মানবের শেষ দাঁড়াইবার স্থান ঐ বিবেক। বিবেকের নিন্দা করা বিবেকের কষ্টিপাথরত্ব অস্বীকার করা আর যে ডালে বসিয়া আছ সেই ডাল কাটা একই কথা। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্" ইহা ভগবদ্‌বাক্য। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার কর। কিন্তু সরকার মহাশয় আমরা যে নৌকাখানিতে বসিয়া আছি সেই নৌকাখানিকে ডুবাইয়া দিবার পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে নদী পার করিবেন, এরূপ মনস্থ করিয়াছেন।

নারীজাতির অধিকার নির্ণয় করিতে যাইয়া রুষো (Rousseau) হইতে তিনি এক গাদা বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। আমরাও মিল্ ও রামমোহন হইতে গাদা গাদা উদ্ধার করিয়া নারীর অধিকার সমর্থন করিতে পারিতাম। কিন্তু এরূপ বাদবিতণ্ডা নিষ্ফল। বিশেষতঃ যিনি মনে

* তিনি বলেন, বাঙ্গালীদের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে যে "বর-বধূর শারীরিক সংঘটন" প্রচলিত আছে তাহা নিবারণ করিতে হইবে। কেন? ইহা যে অন্যায় তাহার বিচার কি আমার বিবেকের হাতে নহে? সরকার মহাশয়ের প্রণালীতে পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

করেন, যদি একজন নরপশু একজন রমণীর উপর তাহার নিদ্রিতাবস্থায় পাশবিক অত্যাচার করে তবে ওই রমণী ঐ পশুকে যাবজ্জীবন স্বামী দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাঁহার নিকটে রমণী সম্বন্ধে সুবিচার আশা করা বিড়ম্বনা নহে কি? মানিলাম নারীকে পুরুষ করিবার চেষ্টা অন্যায়। নারী নারীত্ব অর্জ্জন করিবেন, পুরুষ পুরুষত্ব লাভে যত্নবান হইবেন। কিন্তু উভয়কেই যে মনুষ্যত্বে বিকশিত হইতে হইবে সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন?* নারীর যদি আত্মা থাকে তবে তাহাকে আত্মোচিত গুণগরিমায় ভূষিত করিয়া তুলিতে হইবেই। নারী-আত্মা, পুরুষ-আত্মা বলিয়া কিছু নাই, একই আত্মা উভয়ের মধ্যে বিরাজিত। নস্ত্রী নপুমানেষঃ—আত্মা স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়। উপনিষদের এই মহা উপদেশ ভুলিয়াই আমরা নারীর উপর এত অত্যাচার করিয়াছি—তাহার মনুষ্যোচিত সকল অধিকার হরণ করিয়াছি। রমণী আপিসে আপিসে যাইয়া কেরাণীগিরি নাই বা করিলেন, পুরুষ ঘরে বসিয়া রন্ধন নাই বা করিলেন, বাহিরে অর্থোপার্জ্জন ঘরে গৃহকর্ম্ম এতো মানব-জীবনের অতি সামান্য অংশ, অতি নিকৃষ্ট অংশ। কিন্তু যাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব তাহা তো উভয়েরই চাই। মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, কোমল; পিতা, স্বামী, ভ্রাতার কি কোমল হওয়ার প্রয়োজন নাই। পুরুষের বীর্য্য চাই, রমণীর কি বীর্য্য চাই না আত্মরক্ষার জন্য? তাঁহার কি তেজ চাই না আত্মসম্মান বোধের জন্য? তবে কোথায় রেখা টানিয়া এইটী নর-আত্মা, ঐটী নারী-আত্মা ইহা বুঝাইয়া দিবে। সেদিন গিয়াছে,—দুদিন আগেই হোক আর পাছেই হোক্ নারীকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাকে তাহার সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিতেই হইবে, গত্যন্তর নাই। রমণী আসরে নামিয়াছেন, পুরাতন জারিজুরী আর খাটিবে না।

সরকার মহাশয় জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সুখের বিষয় তিনি অন্নগত জাতিভেদের উপরে জোর দেন নাই। কিন্তু বিবাহগত জাতিভেদকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। তিনি প্রশ্নটি দুই দিক হইতে বিচার করিয়াছেন—বীজশুদ্ধি ও বংশানুক্রম (heredity): তাঁহার মতে এক জাতির মধ্যে বিবাহ বীজশুদ্ধির একমাত্র অবলম্বন। তবে এই বীজশুদ্ধিতে কি লাভ তাহা তাঁহার লেখা হইতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা গেল না। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে কেবল হিন্দু ও ইহুদীর মধ্যে বীজশুদ্ধি প্রচলিত এবং সেই জন্যই তাহারা জীবিত রহিয়াছে (মরিয়া রহিয়াছে বলিলে বোধ হয় ভাল হইত), আর সব জাতি জাহান্নামে গিয়াছে। কথাটা নানাদিক হইতে বিজ্ঞান ও ইতিহাসবিরুদ্ধ।† বর্ত্তমান ভারতীয় হিন্দুজাতি যে বহু বিভিন্নজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য, এবং উপজাতি সকলের যে কত সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহার তো ইয়ত্তাই নাই। তাহার ফলে চারি জাতি হইতে দুই সহস্রাধিক উপজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বলিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয় ভারতীয় বর্ত্তমান হিন্দুজাতি বাঁচিয়া আছে বীজসংমিশ্রণে, বীজাশুদ্ধির জোরে। হারবার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞানের সাহায্যেও তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্য্যের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ের সংমিশ্রণে বীজাশুদ্ধি হয়, (অনেক পণ্ডিত এ কথাও অস্বীকার করিয়াছেন), কিন্তু আর্য্যের বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে বীজ অশুদ্ধ না হইয়া বিশেষভাবে বলশালী হইবে। তিনি ইহুদীদের কথাই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই জাতি বিভিন্ন সেমিটিক জাতির

* সংস্কার ও সংরক্ষণ দ্রষ্টব্য।

† মে ও জুনের Modern Reviewতে প্রকাশিত Herbert Spencer on Intermarriage ও Shastras on Intermarriage প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

সংমিশ্রণে উৎপন্ন, এবং এই মিশ্রণই উক্ত জাতির মহত্ত্বের নিদান। মনুও ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করে এবং তদুৎপন্ন কন্যার যদি ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ হয় তাহা হইলে এইরূপে কয়েক পুরুষ পরে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে। এখানে দেখা যাইতেছে অসবর্ণ বিবাহে বীজ অশুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক মানব শাস্ত্রানুসারে তাহা শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হয়। সুতরাং তিনি যে বীজশুদ্ধির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বিবাহে জাতিভেদ রক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন তাহা শাস্ত্র বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিরুদ্ধ।

সরকার মহাশয় যে কি মানেন এবং কি মানেন না তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। তিনি শাস্ত্র মানেন এবং বলেন যে মনুকে তো সহজেই পালন করা যায়। কিন্তু মনুতে যে অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ আছে এবং তাহা দ্বারা যে বীজোন্নতি হইতে পারে তাহা তিনি স্বীকার করিবেন না। তাহা হইলে যে বিবাহে জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করা চলে না। গীতায় আছে "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ", কিন্তু সরকার মহাশয় ভগবদুক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, "গুণভেদে জাতি ভেদ,—অসম্ভব কথা।" তাহার শাস্ত্রভক্তির দৌড় দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া বসিয়া পড়িয়াছি। যদি জাতিভেদে গুণভেদের কোন স্থানই না রহিল তবে বীজশুদ্ধি বা বীজশুদ্ধির সঙ্গে বংশানুক্রমের প্রশ্নটা তিনি টানিয়া আনিয়াছেন কেন? ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিলেন, ব্রাহ্মণসন্তান উৎপন্ন হইল। জাতিভেদের লেঠা মিটিয়া গেল। যদি গুণাগুণের কোন প্রশ্নই না থাকিল তাহা হইলে "প্রথমে জাতিশক্তি (heredity) না বুঝিলে বীজশুদ্ধি বুঝা যায় না" কেন? জাতিশক্তির অর্থই তো এই যে পিতামাতার যে গুণ বর্ত্তমান তাহা সন্তানে সংক্রামিত হয়, সুতরাং বীজশুদ্ধির সঙ্গে জাতিশক্তির সম্বন্ধ পাতাইলে গুণভেদের সঙ্গে জাতিভেদের একটা নিকট সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাহা তিনি নিজেই অস্বীকার করিতেছেন। কেন না, সে যে "অসম্ভব কথা।" আবার এই বংশানুক্রমের প্রশ্ন তুলিয়া তিনি বিশেষভাবে নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন মিল্‌প্রমুখ পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে জাতিশক্তি মানিতেন না, শেষে হারবার্ট স্পেন্‌সারের সঙ্গে তর্কে মিল্ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা কেন স্বীকার করিবে না? কিন্তু হারবার্ট স্পেন্‌সারকেও যে পরে পাততাড়ি গুটাইতে হইয়াছিল, সে খবর অবশ্য সরকার মহাশয় রাখেন না। একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে এই, যে জাতিশক্তি সন্তানে সংক্রামিত হয় তাহার প্রকৃতি কি? আমি আমার পূর্ব্বপুরুষ হইতে যাহা পাইয়াছি তাহাই কেবল সন্তানে যাইবে, না, আমি যাহা উপার্জ্জন করি তাহাও সংক্রামিত হইবে? ডারবিন বলেন উভয়ই সন্তানে সংক্রামিত হয়, কিন্তু বিস্‌ম্যান্ (Weismann) উপার্জ্জিত শক্তির উত্তরাধিকার (inheritability of acquired characters) সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। স্পেন্‌সার ভ্যাবাচেকা খাইয়া বলিয়াছেন "Either there has been inheritence of acquired characters or there has been no evolution." বাস্তবিকই পণ্ডিতগণ মহাসঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছেন। যদি উপার্জ্জিত শক্তি সংক্রামিত না হয়, তা হইলে আদি পিতা আদম্ ও নবজাত জার্ম্মন্ ও পার্শ্ববর্ত্তী বুস্‌মন্ (Bushman) প্রভৃতির মধ্যে জন্মগত শক্তিতে কোনই বিভিন্নতা নাই। অথচ একজন জার্ম্মন্ ও বুস্‌মনে বিভিন্নতা যে আকাশ পাতাল। কিন্তু যে বিভিন্নতা বীজে নাই তাহা বৃক্ষে আসিল কোথা হইতে? অথচ ক্যান্ট জারমন, বুস্‌মন্ কিন্তু সেই আদমই রহিয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় উভয়ের বিভিন্নতা জাতিশক্তির বিভিন্নতা। কিন্তু বিস্‌ম্যান্ ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ যে সমস্ত যুক্তি দেখাইতেছেন তাহাও যে একরূপ অসজ্জনীয়। সঙ্কটে পড়িয়া পণ্ডিতগণ এক ব্যবস্থা বাহির করিয়াছেন।

পূর্ব্বপুরুষ হইতে পাই নাই অথচ আমি উপার্জ্জনও করি নাই, জন্মকালে এমন শক্তি প্রকৃতিদেবী আমার আত্মার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। ইহারই নাম জন্মকালের আকস্মিক পরিবর্ত্তন" (accidental variation), ধর্ম্মজগতের ভাষায় ইহার নাম ভগবৎকৃপা। সুতরাং কথাটা দাঁড়াইতেছে এই, আমার যেটা মনুষ্যত্ব সেটা সম্পূর্ণই ভগবৎকৃপা। অর্থাৎ রামমোহন হইতে আদমকে বাদ দিলে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সে সবটাই ভগবৎকৃপা। এবং ভগবানের কৃপায় স্রোত যখন থামে নাই তখন তিনি সে কৃপা যখন তখন করিতে পারেন। এবং সে কৃপা যে কেবল তিনি ব্রাহ্মণকে করিবেন শূদ্রকে করিবেন না এরূপ হইতে পারে না। সেই জন্য দেখা যায়, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হওয়ায় যাহাদিগকে শূদ্র বলা হয় তাহাদিগের মধ্যে এমন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাহাদিগের চরণতলে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ বহুবৎসর শিক্ষালাভ করিতে পারেন ও চরিত্রে উন্নত হইতে পারেন। পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় আমেরিকার নিগ্রো যে উন্নতি করিয়াছে এবং বংশানুক্রমের প্রশ্নটার বিজ্ঞানের দিক হইতেও এখন যে অবস্থা তাহাতে প্রত্যক্ষ ও বিজ্ঞান এই উভয়ের দিক হইতে বিচার করিয়া জাতিশক্তির কথাটা কিছুদিনের জন্য শিকায় তুলিয়া রাখা যাইতে পারে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কর, তাঁহাদের সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা কর, দেখিবে জাতিশক্তির প্রশ্ন শিকায় তোলা থাকিলেও দেশে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু, ও হরি, সরকার মহাশয় বলিয়াছেন এখনকার মত উন্নতির কথা রাখিয়া দাও, যেখানে আছ সেইখানেই যদি থাকিতে পার, তবে তাহাই ভাল। দেশে যে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের একটা সাড়া পড়িয়াছে, একথাটা কি রক্ষণশীলদিগের পক্ষ হইতে উন্নতিশীলদিগের এই উদ্যমের উত্তর? যদি তাহাই হয় তবে তো "সনাতনী" প্রকাশিত হইয়া দেশের "মঙ্গলই" হইবে।

বিবাহের বয়সের কথা এখন না তুলিলেও চলে। জীবনসংগ্রামে পড়িয়া কন্যার বিবাহের বয়স ১২ হইতে ১৪, ১৪ হইতে ষোলতে উঠিয়া গিয়াছে এবং আমাদের যুবকেরাও প্রতিজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে সরকার মহাশয়ের বিচারপ্রণালীর একটু নমুনা দেখাইবার জন্য কথাটা তুলিতে হইল,—তিনি মনুর উপর বড়ই আস্থাবান্ কিন্তু ইহা ভক্তি না শাস্ত্রাঙ্কতা? মনুতে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে—মনু বলিয়াছেন কন্যা পিতৃগৃহে আজীবন অবিবাহিতা থাকে তাহাও স্বীকার তবুও অপাত্রে কন্যাদান করিবে না, অথবা পিতা যদি বিবাহ না দেন, তবে কন্যা ঋতুমতী হইয়া ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, তারপর স্বয়ম্বরা হইবে*। কিন্তু মনুর যে দুইটী শ্লোক পণ্ডিতগণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,† যে দুইটী শ্লোকে কন্যার বিবাহের বয়স ৮ হইতে ১২ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহাকেই তিনি মনুর বিবাহতত্ত্বের মূল মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে আবার মূল কি খোসার বিচার উঠিতেছে। একজন যাহাকে

* সরকার মহাশয় "স্ত্রীনাম্ নাস্তি স্বতন্ত্রতা" কথাটা অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মনু তো একথাও বলিয়াছেন, পিতা যদি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য না করেন তবে কন্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারে। ইহাও তো মনুশাসন। ও শাস্ত্র-ফাস্ত্র কিছু নয়, যে যার নিজের মতেরই অনুসরণ করে। তবে যে শাস্ত্র হইতে শ্লোকোত্তলন, সে কেবল স্বমত সমর্থনের জন্য। শাস্ত্রের উপর ভক্তি থাকিলে বিচার আচার অন্য রকম হইত।

† সেদিন কাশীর সুপণ্ডিত বক্তা শ্রীকেশবদেব শাস্ত্রী হিন্দু-বিবাহ বিষয়ক বক্তৃতায় সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছিলেন, যেন উক্ত শ্লোক মনুতে প্রক্ষিপ্ত।

বলেন প্রক্ষিপ্ত আর জন তাহাকেই বলেন মূলতত্ত্ব। এই প্রক্ষিপ্ত অক্ষিপ্তের বিচার কে করিবে? আমারই বিবেক নহে? প্রতিপদেই আমাকে আমার বিবেকের উপর দাঁড়াইতে হইতেছে। অথচ সরকার মহাশয় বলেন, যদি হাঁটিতে চাও তো ঐ পাদুখানি ভাঙ্গিয়া ফেল। বিচারপ্রণালীর অদ্ভুতত্ব ইহা অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। পাঠক মহাশয়ের ধৈর্য্যেরও তো একটা সীমা আছে। কথা কিন্তু অফুরন্ত,—সনাতনী কিনা। আর একটা কথা বলিয়াই শেষ করিব। ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, আর সব ভোগভূমি, কিন্তু অন্য দেশেও তো কর্ম্ম আছে, আর আমরাও তো নিতান্ত অভুক্ত থাকি না। ইহার উপায় কি? কেন, যুক্তি তো হাতের কাছেই রহিয়াছে। আমরা যে ভোগ করি তাহা ধর্ম্মের জন্য* আর উহারা যে কর্ম্ম করে তাহা ভোগের জন্য। বাহবা! বাহবা! সাবাস যুক্তি! এমন যদি গোটাকয়েক যুক্তি নাই থাকিবে তবে আমরা কি যমকে ফাঁকি দিয়া এতকাল বৃথাই বাঁচিয়া রহিলাম। এমন খানকতক তোফা তোফা যুক্তি আমাদের খাতিরে ভগবান্ তাঁহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া যদি নাই রাখিতে পারেন, তবে তাঁহার সৃষ্টিশক্তি বৃথাই গজাইয়াছিল। এমন যুক্তির বালাই লইয়া মরিয়া গেলেও কত সুখ। যে জাতি দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দী ধরিয়া অন্যের কর্ম্মের চাপে নাস্তানাবুদ হইতেছে, এই সাত শত বৎসরের অভিজ্ঞতায়ও সে চাপ সামলাইবার সামর্থ্য জন্মিল না, অন্যের কর্ম্মভোগ করাই যাহার একমাত্র অদৃষ্টের লিখন, তিনি হইলেন "কর্ম্মবীর", আর যত সব ভোগাসক্ত, নচ্ছার। যুক্তিটা পাঠ করিতে করিতে এতাদৃশ একটা খাসা যুক্তি মনে পড়িয়া গেল,—"জুতা মেরেছিস্ মেরেছিস্, না হয় আরও দু'-কতক মার, দেখিস যেন অপমান করিস্নে।" অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত—শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২০+১৪৪ পৃষ্ঠা, ৬ খানি প্রতিকৃতি সম্বলিত। লোটাস লাইব্রেরী, কলিকাতা। এক টাকা।

মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রচলিত কাহিনী আছে যে পুণ্যাত্মা দাউদের হাতে লোহা ছোঁয়াতে তাহা মোম হইয়া গেল, এবং ইহা দেখিয়া লোক তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিল। কবিদেরও এই দৈবশক্তি আছে। যিনি প্রকৃত কবি তাঁহার হাতে ভাষা একেবারে কোমল ও মধুর হইয়া যায়, লোকে আদরের সঙ্গে তাঁহার বাণীগুলি মনে রাখে, ক্রমে তাহা সংসারের নিত্য ব্যবহারের কথা হইয়া দাঁড়ায়। কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার দিকে চাহিলে তাঁহাকে এইগুণে প্রকৃত কবি বলিতে হয়। যেসব ক্ষণজন্মা মনীষিগণ গদ্যেই হউক, পদ্যেই হউক, মানবের ভাব নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করেন, মানবশক্তিকে পরিবর্ত্তিত বা পুনর্জ্জীবিত করেন, সেই সব ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের স্থান নহে। দারিদ্র্যের তাপে, সংসারের অভিজ্ঞতায়, লোভের অনিবার্য্য আকর্ষণে তিনি সেই উচ্চপদে উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয় পাপের সঙ্গে সংগ্রামে সব সময়ই বিজয়ী হয় নাই। তাই তাঁহার প্রতিভা অবরোধের মধ্যে অর্দ্ধবিকশিত হইয়া শেষ হয়। যে সব দৈব মুহূর্ত্তে তিনি নিজের ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা সম্পূর্ণ অব্যাহতভাবে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাহার ফল তাঁহার কবিতাবলী। সেগুলি সংখ্যায় কম হইলেও অমর। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বিকাশের মাত্রা এবং কৃতকার্য্যের পরিমাণ দেখিলে তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলা যায় না।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মহত্ত্ব ও হৃদয়দৌর্ব্বল্যের এই ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার জীবন অত্যন্ত বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যদি কবি নাও হইতেন, তথাপি এই দরিদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষকের জীবনচরিত এক চিত্তাকর্ষক বস্তু হইত। কর্ত্তব্যের অতি মহান আদর্শ তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন; প্রতিজ্ঞা ছিল যে যাহা সত্য ও মঙ্গল তাহাই করিবেন। অথচ সংসারের পাকে, হৃদয়দৌর্ব্বল্যতায়, এবং হয়ত মস্তিষ্কবিকারেও তাঁহার কোন কোন কার্য্য অতি শোচনীয় হইয়াছিল। কিন্তু দারিদ্র্যসত্ত্বেও প্রবঞ্চনা না করা (১১১ পৃঃ) নিজ মান সম্পূর্ণ বজায় রাখা (১০২ পৃঃ), কর্ত্তব্যকার্য্য করিতে গিয়া ফলাফলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা, পাপ ও অবিচারের প্রতি ভীষণ ক্ষমাহীনতা (১০৩ ও ১১২ পৃঃ), তাঁহার জীবনকে সাধারণের জীবন হইতে অনেক উচ্চ নৈতিকস্তরে তুলিয়াছিল। ইন্দুবাবু যাহাকে "সুফী কবিদিগের স্বভাবসুলভ জিদ ও প্রতিহিংসার" (৬৭ পৃঃ) দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা প্রকৃতই কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্রের puritanismএর ফল। এরূপ জীবনের কাহিনী স্থায়ীভাবে রক্ষিত হওয়ায় বাঙ্গালীজাতির এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ হইয়াছে। এখন হারাইলে আমাদের জাতীয়জীবনের ইতিহাস অঙ্গহীন হইত। এজন্য বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই ইন্দুবাবুর নিকট ঋণী। তিনি অনেক বৎসরের চেষ্টায়, অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া, কবির কার্য্যক্ষেত্রগুলিতে বেড়াইয়া তবে এই জীবনচরিতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টাতেই সাহিত্যের স্থায়ী বৃদ্ধি হয়। ঘরে বসিয়া সংবাদপত্রের প্রবন্ধটিমাত্র অবলম্বন করিয়া হা হুতাশ এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ গ্রন্থলেখার দৃষ্টান্ত কমিয়া যাইতেছে এটা সুখের বিষয়।

ইন্দুবাবু গ্রন্থখানি মনোরঞ্জক এবং পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে অনেকটা সফলও হইয়াছেন। পারসিক সুফীদিগের বৃত্তান্ত কিছু ভাসা ভাসা হইয়াছে, গ্রন্থকার একথা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট ইহা নূতন হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটী সংশোধন হইবে আশা করি। যদি বিষয়গুলির নূতন সন্নিবেশ করিয়া, পুনরুক্তি বাহুল্য উচ্ছ্বাস এবং অবান্তর কথা বাদ দিয়া বইখানির নবসংস্করণ প্রস্তুত করা হয়, তবে ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইবে। সেই সুযোগে বর্ত্তমান পরিশিষ্টটি অধ্যায়গুলির মধ্যে মিলাইয়া দিলে হয়। পারসিক কবিতার ইংরাজী-অনুবাদ ছাপাইয়া বই বাড়ান আবশ্যক ছিল না, ঠিক বাঙ্গালা ভাষান্তর দিলেই যথেষ্ট হইত। যদি সম্ভব হয় কৃষ্ণচন্দ্রের বাছা বাছা কবিতা এক সঙ্গে ৮ম অধ্যায়ে অথবা (নূতন) পরিশিষ্টে ছাপিলে এই জীবনীর প্রসার এবং উপকারিতা বাড়িয়া যাইবে।

(৬০ পৃঃ) ওমর খাইয়াম ও তাঁহার দুই বাল্যবন্ধুর গল্প আজকাল কাল্পনিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। (৬৩ পৃঃ) গাছের ডালের ফার্সী প্রতিশব্দ "শাখ্" (*shakh*), আর পানপাত্রবাহিনীর নাম "সাকী" (*saqi*); কথা দুটি একেবারে ভিন্ন। সুতরাং "সাকী-এ-নবাৎ" অর্থে "ইক্ষুরসের পেয়ালা বাহিনী"। ৬৫ পৃঃ ৬ পংক্তি "বেলী" স্থলে "বলে" হইবে।

যদুনাথ সরকার।

---

* আচ্ছা আমার যদি মণিমুক্তা পরিধান করিবার সখ্ হয়, তবে কি আমি কামস্কাটকায় চলিয়া যাইব? তা কেন? "আমি জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পরামর্শ লইয়া যে সমস্ত রত্ন আমার উপযোগী, যে সমস্ত ধাতু আমার শরীরস্থ বিষনাশক, সেই সমস্ত ভূরি পরিমাণে ধারণ করিতে পারি। তাহাতে আমার সৎকর্ম্মই করা হইবে।" টীকা অসম্ভব!

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ (ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক) শ্রীঅচ্যুত-চরণ চৌধুরী প্রণীত, ৬০৬ পৃঃ, মানচিত্র ও ২৩ খানি চিত্রযুক্ত। প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী। চারি টাকা।

স্বদেশকে ভালবাসিতে হইলে তাহাকে ভাল করিয়া জানা চাই। তবেই স্বদেশপ্রেমিকতা বৃথা ভাবোচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়া যায় না। আমরা এত কম বেড়াই যে নিজের জেলার অনেক স্থানই চিনি না। প্রাকৃতিক অবস্থা, ইতিহাস, জীবনী, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আমরা নিজ জেলা ও প্রদেশ অপেক্ষা বিদেশের খবরই বেশী রাখি, কারণ আমাদের সকল জ্ঞানই পুঁথীগত, এবং এই সব বিভাগে বিদেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট গ্রন্থ আছে; স্বদেশ, অন্ততঃ স্বজেলা সম্বন্ধে নাই। আবার, ক্রমে কালের স্রোতে পুরাতনের অনেক চিহ্ন, অনেক জনশ্রুতি লোপ পাইতেছে।

সুতরাং জেলার ইতিহাস লেখার যে একটা চেষ্টা দেশময় জাগিয়া উঠিয়াছে সেটা শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি। এই কার্য্যে "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত"-লেখক যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহার উপকরণ সংগ্রহ সমবেত চেষ্টার ফল। যে সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ আবশ্যক তাহার তালিকা ছাপাইয়া তিনবার দেশময় বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে কতক তথ্য হস্তগত হয়। তারপর গ্রামের শিক্ষকদের নিকট হইতে অনেক স্থানীয় বিবরণ লিখিয়া আনা হয়। (যদি দেশের লেখকগণ এই শ্রেণীর সংবাদদাতাদিগকে হেয়জ্ঞান না করিতেন তবে অনেক মূল্যবান তথ্য ইঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইত।) সর্ব্বশেষে সরকারী মহাফেজখানার কাগজ পত্র পরীক্ষা করা হয়। ফলতঃ ইউরোপে ইতিহাস লিখিতে আজকাল যেরূপ সুশৃঙ্খল প্রণালী ও সমবেত চেষ্টা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" বঙ্গদেশে তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত।

যে পরিমাণে জেলার ইতিহাসের সঙ্গে দেশের ইতিহাসের অথবা মানবজাতির ভাবের ইতিহাসের সংযোগ স্থাপন করা যায়, সেই পরিমাণে তাহার প্রাদেশিকত্ব ঘুচিয়া যায়, তাহা বৃহতের অঙ্গস্বরূপ হইয়া চিরস্মরণীয়তা লাভ করে। যেমন হুগলী, ত্রিহুট, আগ্রা, আর্কট প্রভৃতি জেলাকে ভারত-ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা যায় না। শ্রীহট্ট সেরূপ স্থান নহে।

জেলার ইতিহাস-লেখকেরা প্রায়ই দুইটি দোষ এড়াইতে পারেন না। প্রথম, জোর করিয়া মহাপুরুষদিগের সঙ্গে জেলার সম্বন্ধ স্থাপন করা। আগে আমরা ভ্রমণকারী পাণ্ডবভ্রাতাদের নিজ নিজ জেলায় টানিয়া আনিয়া কোন ভিটে বা জঙ্গলের সঙ্গে তাহাদের গল্প জুড়িয়া দিতাম। এখন "বৌদ্ধপ্রভাব"টা ফেশান্ হইয়াছে। পরিত্যক্ত ইঁটের পাঁজা মাত্রেই প্রাচীন "—" বিহার। অভ্রান্ত চীনপর্য্যটক ইউয়ান্ চোয়াঙের অন্যায় করিয়া একটু দিকভ্রম কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহার ভ্রমণকাহিনী হইতে অতি সহজেই পাঁজাটি "—" বিহার বলিয়া প্রমাণ করি। আদিশূর বল্লালসেন প্রভৃতির স্থানীয় রাজধানীও এইরূপ কাল্পনিক। সাধুদের বিষয়ে উন্মাদ অর্দ্ধবিস্মৃত জনশ্রুতিও এইরূপে বিচার বিবেচনা না করিয়া জেলার ইতিহাসের অন্তর্গত করা হয়। কিন্তু সাহিত্যের জুরীগণ নিশ্চয়ই এগুলিকে "সাধু শেনাক্ত honest identification" নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, এবং কিছুদিন পরে জেলার ইতিহাসের সেই অংশও আরব্য উপন্যাসের শ্রেণীতে যোগ দিবে।

দ্বিতীয় মারাত্মক দোষটি একটা ব্যবসাদারী চালের ফল। লিখিবার মত উপকরণ একেবারেই নাই, অথচ বই বড় করিতে হইবে। কাজেই বৃথা বাগাড়ম্বর এবং অল্প কথা ফেনাইয়া তুলিবার প্রলোভন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যে সমালোচনা এখনও এত নিম্নস্তরে আছে যে ভাবের দৈন্য অলঙ্কারের আড়ম্বরে এবং ভাষার ঝঙ্কারে লুকাইয়া ফেলিলে লেখক বাহবা পান। সুখের বিষয় "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত"-লেখক এই লোভটি কাটাইতে পারিয়াছেন।

বইখানির প্রথম ভাগে, ১৫৭ পৃষ্ঠায়, জেলার বর্ণনা, প্রাকৃতিক বিবরণ প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহার চৌদ্দ আনা গেজেটিয়ার হইতে লওয়া হইলেও তাহা দোষের কথা নহে। গেজেটিয়ারগুলি অনেক শিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী লোকের যত্ন ও সমবেত চেষ্টার ফল, যথাসম্ভব শুদ্ধ; সুতরাং তাহাদের বাঙ্গালা অনুবাদ হইয়া সেই জ্ঞানরাশি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে এটা ভালই। কিন্তু শ্রীহট্ট বাঙ্গলা হইতে এত বিভিন্ন নহে যে এই বাঙ্গালা গ্রন্থে তাহার প্রত্যেক দ্রব্যেরই সুদীর্ঘ বর্ণনা আবশ্যক। এই ভাগটি কমাইয়া ৫০ পৃষ্ঠায় শেষ করিলেও ক্ষতি ছিল না। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম কয়েক খণ্ডও (অর্থাৎ পুরাতত্ত্ব এবং হিন্দু-মুসলমান যুগ) অযথা দীর্ঘ হইয়াছে। প্রবাদ এবং সংস্কৃত প্রাচীন শ্লোকের উপর অনেক তর্ক আছে। কিন্তু সেগুলি যেন ধুঁয়া হইতে দৃঢ়পদার্থ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা। অন্ততঃ এই তর্কবিতর্কগুলি মাসিকে ছাপিয়া, ইতিহাসে কেবল শেষ সিদ্ধান্তটি দিলেই যথেষ্ট হইত। এই অংশও নির্ম্মম ভাবে সংক্ষেপ করিলে গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়িত। এখানে "ফেনাইয়া তোলা" দোষ নাই বটে, এবং অনেক জ্ঞাতব্য বা মনোহর কথাও দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে "শ্রীহট্টের" সম্বন্ধ অতি দূর। কাজেই সাহিত্য হিসাবে এটা দোষের কারণ। শ্রেষ্ঠ লেখকের একটি অত্যাবশ্যক গুণ এই যে তিনি জানেন কোন্ কোন্ উপকরণ বাদ দিতে হইবে। এই গ্রন্থখানি এক বালুমেই শেষ হয় নাই, অথচ এত মোটা হইয়াছে যে দূর হইতে দেখিলে আইনের পুস্তক বলিয়া ভয় হয়।

কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে ইহা অমূল্য। ইহার বিশুদ্ধ সংবাদ, ঠিক তারিখ ও সংখ্যা, চিত্র, দলিলের প্রতিলিপি, বংশাবলী প্রভৃতির জন্য, জেলার ইতিহাস হইলেও ইহা বঙ্গের ঐতিহাসিকের, ভারতের ঐতিহাসিকের, নিকট প্রথমশ্রেণীর উপকরণ বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তি না পাইলে কোন ইতিহাস স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজের ইতিহাস লিখিবার পক্ষেও গ্রন্থখানি এক অত্যাবশ্যক খনি।

আমরা ভরসা করি যে "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" বঙ্গভাষীদের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান পাইবে, এবং অচ্যুত বাবু এইরূপ প্রণালী ও উৎকর্ষের সহিত দ্বিতীয় বালুম লিখিয়া তাঁহার কীর্ত্তি সম্পূর্ণ করিবেন।

মুসলমান যুগের বিবরণে কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোগ আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গলার লেখকেরা আদি ফার্সী গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবেন এমন দিন এখনও দূরে। সপ্তদশ শতাব্দীর ফার্সী ইতিহাসগুলিতে কয়েক স্থলে শ্রীহট্টের উল্লেখ পাইয়াছি, কিন্তু তাহা এত বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন যে তাহা একত্র করিয়া দিতে বড় বেশী সময় লাগিবে।

যদুনাথ সরকার।

কষ্টিপাথর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (ভাদ্র)—

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর আবহমান 'বেদান্তবাদ' প্রবন্ধে এবার নিম্বার্ক দর্শনের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ খুব পাণ্ডিত্য ও গবেষণার সহিত আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'যিশুচরিত' বিশ্লেষণ করিয়া যিশুচরিতের বিশেষ মহত্ত্ব ও তাঁহার নিকট মানবসমাজের ঋণ দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী 'ইউরোপে নব ধর্ম্মান্দোলন' রামমোহন রায়ের বিশ্বমানবের অখণ্ডস্বরূপের মধ্যে বিশ্ববিধাতাকে উপলব্ধি করার নামান্তরমাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সুলিখিত।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গীতাপাঠ" চলিতেছে। এবারে ত্রিগুণের স্বরূপ ও তত্ত্ব চমৎকারভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পত্র' ও শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাবীধর্ম্ম' আরও দুইটী উপভোগ্য প্রবন্ধ।

ভারতী (ভাদ্র)—

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী 'নবভারতে নব সামাজিকতা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

প্রতীচ্য জগতের সভ্যতার সহিত সংস্রবে আসিয়া আমাদের মনে অনেক নূতন প্রশ্ন জাগিয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রধান এই—নবভারতের সামাজিক জীবন কোন ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে? আমরা কি প্রাচীন ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া পারত্রিকতা, অদৃষ্টবাদ, শাসনশক্তি ও বাধ্যতা, জাতিভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখিব, না, ঐহিকতা, স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তি ও সাম্যের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রতীচ্য সভ্যতাতে গা ঢালিয়া দিব? উত্তর এই, নবভারতে নব সামাজিকতার প্রয়োজন, অর্থাৎ যাহা প্রাচ্য প্রতীচ্যকে মিলিত করিবে, যাহাতে ঐহিকতার সহিত পরমার্থিকতাকে, স্বাধীনতার সহিত সাধুভক্তিকে মিলিত করিবে তাহারই প্রয়োজন, এবং তাহা তখনই সম্ভব যখন সামাজিক জীবনে ভক্তিধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নাগের 'ভিতরগড়' পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ। জলপাইগুড়ী জেলায় এই ভিতরগড়ে প্রাচীন কোনো নগরের দুর্গপ্রাসাদ, মন্দির, ঘাট, প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।

শ্রীযুক্ত গণপতি রায় ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে "মালয় উপদ্বীপে হিন্দুভাষা ও সাহিত্য" বিদ্যমান।

তারা (শ্রাবণ)—

"রাজা লক্ষ্মীকান্ত" প্রবন্ধে ইলছোবা মণ্ডলাই গ্রামের কিংবদন্তী বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্মীকান্তের কন্যা ইলার স্বয়ম্বরসভা হইতে স্থানের নাম ইলাসভা বা ইলছোবা হইয়াছে।

জাহ্নবী (ভাদ্র)—

মলাটের উপর শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচীর নাম লেখা, সুতরাং অনুমান হয় তিনিই সম্পাদক। এই পত্রিকাখানির অনেক প্রবন্ধই পুরাতন বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি হইতে না বলিয়া নূতন করিয়া ছাপা। সুতরাং ইহার সহিত কোনো ভদ্রলোকের সম্পর্ক স্পৃহণীয় নয়।

বীরভূমি (শ্রাবণ ও ভাদ্র)—

"বীরভূমির খনিজসম্পদ কয়লা," "চণ্ডীদাস সম্বন্ধে স্থানীয় কিম্বদন্তী," "বীরভূমের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা বা বীরনগরের জমিদারদিগের পরাক্রমের বিবরণ" শ্রাবণসংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ভাদ্রসংখ্যায় শ্রীযুক্ত মৌলভী এক্রামউদ্দীন "রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে" বলিতে চান যে—পৃথিবীতে হঠাৎ কিছু নূতন দেখিলে আমাদের মনে বিদ্রোহ জাগে। কিন্তু সেই ঘটনাই ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইলে তেমন হয় না। রবিবাবু কাব্যজগতে একটি বড় রকমের নূতনত্ব আনিয়াছেন এই জন্য আমরা তাঁহাকে এখনও নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বর্ত্তমান যুগের অবশ্যম্ভাবী ফল—বিশ্বসভ্যতা ও বিশ্বহৃদয়ের স্পন্দন এখন যে সপ্তস্বরার মতো সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ ভাব ও সৌন্দর্য্যের চিত্রকর ও পূজক, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিশ্লেষক ও উপভোক্তা, কবিতাসুন্দরী তাঁহার জীবনসঙ্গিনী প্রণয়িনী। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে যে দেবীর অনুগ্রহকণা লাভ করিবার জন্য স্তব করিতে হইয়াছে, তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট স্বয়ং উপযাচিকা অভিসারিকা। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায় শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিবার জন্য দশের মাঝে সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান নহেন, তিনি নির্জ্জনে বসিয়া আত্মকৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মানবজীবনের জটিল গুপ্ততত্ত্ব নিরূপণে যত্নপরায়ণ, তিনি বিশ্বমানবের সহিত একাত্ম। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতা জটিল ঠেকে; এই জটিলতার কারণ তাঁহার কাব্যের অসম্পূর্ণতা নহে, আমাদের সম্পূর্ণ সহৃদয়তার অভাব।

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৃহত্তম গ্রন্থরচয়িতা" রাধামাধব ঘোষের বৃহৎ সারাবলী নামক পুরাণসারসংগ্রহ পুস্তকের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ ৯৫ হাজার শ্লোকে বিরচিত এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রায় তিনগুণ বৃহৎ। গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই।

শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত "বীরভূমে গালার কারবার" সম্বন্ধে একটী তথ্যবহুল বর্ণনা দিয়াছেন। গালা প্রস্তুতপ্রণালী, গালার রং, গালার খেলনা, আলতা, ও গালার ব্যাপারী নুরীজাতির বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক। লাক্ষা বা লাহা একরূপ কীটের লালা গাছের ডালে লাগিয়া শুষ্ক ও দৃঢ় হইয়া যায়; শাল, পলাশ, কুল, পাকুড় প্রভৃতি গাছে এই কীটের চাষ হয়; কীটযুক্ত গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া কাঠি ছাড়াইয়া গালা সংগৃহীত হয়; এ অবস্থায় লাহার রং কমলালেবুর শুকনা খোসার মতো। এই কাঁচা লাহা শিলে গুঁড়াইয়া জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া পুনরায় পিষিয়া ভিজানো হয়। এইরূপ তিনবার করিয়া পরে সাজিমাটির সহিত পিষিয়া ভিজাইতে হয়। ইহাও তিন বার। গালা-ছাঁকা জল হইতে গালার রং তৈরি হয় এবং তাহাতে তুলার পাত ভিজাইয়া আলতা হয়।

ভিজা গালার রং গিনি সোনার মতো। শুকাইলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। ভিজা গালা থলেয় ভর্ত্তি করিয়া আগুনের তাতে গলাইয়া মাটির ঢাকের উপর ঢালিয়া দেয়; তাহাতেই পাতগালা তৈরি হয়। কলাগাছের উপর দড়ির মতো করিয়া ঢালিয়া বাতি গালা তৈরি করে। ইহার দর মণকরা ৩২৲। ৩১৲ টাকা।

থলে হইতে গালা গলিয়া বাহির হইয়া গেলে যে গাদ থাকে তাহা হইতে চুড়ি ও খেলনা প্রস্তুত হয়। এই কার্য্য নুরী জাতি করে। এই সব চুড়ি ও খেলেনার উপরে বিশুদ্ধ পাত গালা দিয়া রং করে। একজন কারিগর সমস্ত দিনে ৷৷৹ আনার খেলেনা তৈরি করিতে পারে; খরচ বাদে লাভ থাকে ।৹ আনা।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৮।১

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিত "বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ পদাঙ্ক" প্রবন্ধ উপাদেয়। কোন কোন শব্দ মূলতঃ পর্ত্তুগীজ হইয়াও বাংলায় অবাধে চলিতেছে তাহার একটি তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রতিভা (শ্রাবণ)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত "সুধারাম বাউলের" বৃত্তান্ত সুখপাঠ্য। বাউলসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক প্রকৃত সাধক ও জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহাদের রচিত সঙ্গীত অতি সরল গ্রাম্য কথায় যেসব কবিত্বপূর্ণ তত্ত্বকথা প্রচার করিয়া গিয়াছে তাহা যিনি নিষ্ঠার সহিত সংগ্রহ করিবেন তিনি বঙ্গভাষার পরম কল্যাণ করিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "অর্থকরী উদ্ভিদবিদ্যা" শিক্ষার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ খাঁটি করিবার জন্য উহার অধিকতর আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার "মেয়েলি-সাহিত্য" নাম দিয়া প্রচলিত ব্রত পার্ব্বণের বিবরণ ও কথা সংগ্রহ করিতেছেন। উদ্যম প্রশংসার্হ।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন—

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" নামক উপাদেয় তুলনামূলক আলোচনায় এবারে ধাতু-প্রস্তুত-প্রক্রিয়া (Metallurgy) আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত পদ্মিনীভূষণ রুদ্র লিখিত "ইয়ুরোপীয় পর্য্যটকগণের মক্কা দর্শন" কৌতূহলপূর্ণ বর্ণনায় পূর্ণ। মক্কায় যাইতে হইলে অন্তত বাহ্যতঃ সম্পূর্ণভাবে মুসলমান হইতে হয়, নতুবা জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় লিখিত "বৈজ্ঞানিক কথা" শিরোনামায় (১) মনোরোগের নূতন চিকিৎসা, (২) উদ্ভিদের আত্মত্রাণ, (৩) জল, আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য লিখিত "মাইবংএর ধ্বংসাবশেষ" পুরাতত্ত্ববিষয়ক। মাইবং কাছাড়ের প্রাচীন রাজধানী। সেখানকার রণচণ্ডীর মন্দিরের প্রস্তরলিপি অনুসারে ১৬৮৩ শকে রাজা হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক এই মন্দির স্থাপিত। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে আহোম কর্ত্তৃক ডিমাপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া এখানে রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আহোমেরা এখানেও ধাওয়া করে। তখন ইহা পরিত্যক্ত হইয়া খাসপুরে (শিলচরের ১২ মাইল উত্তরে) নূতন রাজধানী হয়। কিন্তু রণচণ্ডী মন্দিরের ১৬৮৩ শক বা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ দেখিয়া মনে হয় কাছাড়-রাজগণ তখনো মাইবং একেবারে ত্যাগ করেন নাই। খাসপুরেররাজপ্রাসাদের প্রস্তরলিপি অনুসারে রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ ১৬৯৩ শকে (১৭৭১ খৃষ্টাব্দে) উহা নির্ম্মাণ করেন।

বঙ্গদর্শন (আষাঢ়)

স্বর্গীয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত দিবোন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি "বঙ্কিম-চরিত" বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিব।

সুপ্রভাত (শ্রাবণ)

নববর্ষের সুপ্রভাতের মুখপত্রে একখানি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন চিত্রের রঙিন প্রতিলিপি ৪ বর্ণে মুদ্রিত হইয়াছে। হাফ্‌টোন ব্লক হইতে তিনের অধিক বর্ণে চিত্রমুদ্রণ এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের 'সরস্বতী' নামক হিন্দী কাগজে বোধ হয় প্রথম হয়; এবং এই মুদ্রণ দ্বিতীয়। কিন্তু চিত্রে উজ্জ্বল সোনা ছাপা ভারতবর্ষের হাফটোন মুদ্রণের ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম।

বিবিধ প্রসঙ্গ

অরঙ্গাবাদ সম্মিলনীর একাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী নামক একটি পুস্তিকা কিছুদিন হইল আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

অরঙ্গাবাদ, দহরপাহাড়, জগতাই, সেরপুর, নিমতিতা ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান, নিঃস্ব নিরন্ন ব্যক্তিগণের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ, দুঃস্থ পীড়িতকে ঔষধ পথ্যাদি বিতরণ, দরিদ্র বালকের বিদ্যাশিক্ষার্থ সাহায্য দান, রাস্তাঘাট সংস্করণ ও অন্যান্য সাধারণ হিতকর কার্য্যসাধন করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

১৩১৬ সালে ইহার খরচ হইয়াছে ৫০৮৲। তন্মধ্যে মাসিক বৃত্তি ৯৬।৹, বস্ত্র বিতরণ ১৫২।৹, এককালীন দান ১৭।৵৹, রাস্তা ৬৩।৵৹, রাধানগর সাঁকোর ব্যয় ৯০৲, শিক্ষা ৯৲, চিকিৎসা ২।৵৹, জলদান ৬০৲, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কোনটিই বাজে খরচ নহে। কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অধিক ব্যয় করিলে আমরা সুখী হইতাম। সম্মিলনীর কার্য্যের নমুনা স্বরূপ জল সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থল বলিয়া এতদঞ্চলে পুষ্করিণী আদৌ হয় না। ভাগীরথীর যেরূপ অবস্থা তাহাতে গ্রীষ্মকালে নদীর জল প্রায়শঃ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ গৃহস্থগণের আবাসপল্লী হইতে নদীর জল বড় দূরবর্ত্তী হওয়ায় অধিবাসীগণকে বিশেষ জলকষ্ট ভোগ করিতে হয়। এজন্য সভার উদ্যোগে প্রতি বর্ষে যাহাতে একটি করিয়া ইন্দারা খনন করান হয়, ইহাই সভ্যগণের অভিপ্রায় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনী নিমতিতায় একটি ইন্দারা খনন করাইয়া সাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। এই ইন্দারার জন্য ডিঃ বোর্ডে ২৫০৲ টাকা জমা দিতে হইয়াছিল। উক্ত টাকার মধ্যে সম্মিলনী নিজ তহবিল হইতে ৬০৲ টাকা দেন, অবশেষ ১৯০৲ টাকা আমাদের বদান্যপ্রবর পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ চৌধুরী মহাশয় দান করিয়াছেন। এই ইন্দারাটী প্রথমতঃ যেরূপ এষ্টিমেট হইয়াছিল, খনন আরম্ভ হইয়া ক্রমে ৫০৲ ফুটের অতিরিক্ত গভীর হওয়ায় ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশী হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে সমস্ত ব্যয়ই ডিঃ বোর্ড হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইন্দারাটী খনন করিতে করিতে শেষ দিনে তলদেশ হইতে একটী ঝরণা বাহির হইয়া এক রাত্রেই প্রায় ৩০ ফুট জল হইয়াছিল। এক্ষণে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই ইন্দারা কস্মিনকালেও যে শুষ্ক হইবে, এমত বোধ হয় না।

দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ সভা স্থাপিত হইয়া উৎসাহের সহিত কাজ করিতে থাকিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হয়।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

১। এই মহামণ্ডল স্থাপন দ্বারা ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নারীদিগকে একত্র আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের নৈতিক ও অবস্থাগত স্থায়ী উন্নতিসাধন করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

২। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে (১) ভারতীয় সকল প্রদেশের স্ত্রীজাতিকে একত্র করিবার জন্য ইহার সভ্যদের মধ্যে সাময়িক মিটিং হইবে। (২) ভারতবর্ষীয় নারীদিগের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা বুঝিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অন্তঃপুর-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হইবে। (৩) ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের পুষ্টি ও বিস্তারের জন্য উৎসাহ দিয়া যাহাতে ভারতীয় স্ত্রীদিগের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞানের প্রসার হয় ও

সদ্‌গ্রন্থ সকল স্বল্পব্যয়ে ও সহজে তাঁহাদের হস্তগত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইবে।

৩। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যসকল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে "পুরনারী নির্ব্বাহ ভাণ্ডার" নামে ডিপো খোলা হইবে। ঐরূপে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত স্ত্রীদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধা হইলে উহার দ্বারা অনেক দরিদ্র পরিবারের ভরণপোষণের উপায় হইবে।

মহামণ্ডলের কলিকাতা শাখা দ্বারা গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে নিম্নলিখিত রূপ কাজ হইয়াছে।

গত ১লা এপ্রেল হইতে আমরা ৬ জন শিক্ষয়িত্রী লইয়া ১০টী বাড়ীতে ১৫টী বয়স্কা বালিকাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি। এখন আমরা ১৩ জন শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে ৫৫টী ঘরে ৯০টী বয়স্কা বালিকাকে শিক্ষা দিতেছি। এই অল্প কালের মধ্যে ইহার এরূপ দ্রুত উন্নতি দেখিয়া আমাদের মনে আশা হইতেছে যে শিক্ষাপ্রিয় কোন ব্যক্তিই যে কোন প্রকারে ইহার সাহায্য করিতে বিমুখ হইবেন না। অনেকেই এখন অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ কাজের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছেন। এই কয় মাসে সমিতির প্রায় ৩০০ জন মেম্বর হইয়াছেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সভ্যদের প্রবেশিকা ফি ১৲ টাকা ও বার্ষিক চাঁদা ১৲ টাকা মাত্র. এই সামান্য চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া সমিতি এই মহা কাজে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই কাজে যত অধিক খরচ করা যাইবে, তত অধিক লোকের উপকার হইবে। এখন মাসে ৩ খানা গাড়ীর ভাড়া ও দরোয়ান ইত্যাদিতে প্রতি মাসে প্রায় ৩০০৲ টাকা খরচ পড়িতেছে। আমাদের দেশের রাজা, মহারাজা ও স্ত্রী-শিক্ষার হিতৈষী মহোদয়গণের সাহায্য ব্যতীত এ কাজ উত্তমরূপে চালান একরূপ অসম্ভব, সে কারণে প্রার্থনা করি সঙ্গতিপন্ন উদার ব্যক্তিরা যদি কিছু কিছু দান করিয়া এ কাজটাকে স্থায়ী করেন তাহলে দেশের একটা মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।

স্ত্রী শিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা এখন আর নূতন করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। মহামণ্ডল অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। খৃষ্টান জেনানা মিশনের শিক্ষয়িত্রীগণ অন্তঃপুরে গিয়া যে শিক্ষা দেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য অন্তঃপুরিকাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা। অখৃষ্টানদিগের ইহাতে সম্মতি থাকিতে পারে না। মহামণ্ডলের সভ্যদের মধ্যে নানাধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলারা আছেন। কাহারও ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং সকলেরই ইহার কাজে সাহায্য করা উচিত। কলিকাতা শাখার সম্পাদিকা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস অতিশয় সাত্ত্বিক ভাবে হৃদয়মনের সমুদয় শক্তির সহিত কাজ করিতেছেন।

প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। যে সকল মহিলা অল্প লেখা পড়া জানেন, তাঁহারাও অপরকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইয়া দিতে পারেন। অল্প শিক্ষিতা বা অধিক শিক্ষিতা প্রত্যেক মহিলা বিদ্যাদানকে একটি ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলে অল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষর স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনেক হ্রাস হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া-নগরে ওকালতি করেন। তিনি অনেক দিন হইতে উক্ত প্রদেশে খেজুর গুড়ের কারবার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তথায় খেজুর গাছ অনেক হয়, কিন্তু তথাকার লোকেরা উহার রস সংগ্রহ করিয়া গুড় প্রস্তুত করে না ও করিতে জানেনা। তিনি হোলকার রাজ্যে এবং খাণ্ডোয়া জেলায় কয়েকটি গ্রাম ইজারা লইয়াছেন। তথায় খেজুর গুড়ের কারবারে তিনজন বাঙ্গালীকে অংশাদার লইতে চান। তাঁহাদিগকে উহার কোন না কোন গ্রামে থাকিতে হইবে ও প্রত্যেককে দুই জন করিয়া শিউলি বা গাছী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। অন্যান্য সত্ত হরিদাস বাবুকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানা যাইবে :—

Babu Haridas Chatterjee,
Pleader,
Khandwa, C. P.

কবি বা অন্য প্রকার লেখকের চেয়ে সমালোচক যে সকল স্থলেই কম দরের লোক, তাহা সত্য নহে। বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে অনেক পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির লেখকেরা বঙ্কিম বাবুর চেয়ে প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন না। রবিবাবু যাঁহাদের পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে রবিবাবুর চেয়ে উৎকৃষ্ট লেখক নহেন। জনসন্ তাঁহার Lives of the English Poets এ এমন অনেক কবির কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহা অপেক্ষা অধিক কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন না।

কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম স্থল সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে কিছু একটা করার চেয়ে কৃত কার্য্যের সমালোচনা করা সহজ। কাব্য বা চিত্র রচনা করা শক্ত, কিন্তু তাহার দোষ দেখান অপেক্ষাকৃত সহজ। রাফেলের কোন কোন ছবির দোষ আমরাও দেখাইতে পারি। কিন্তু

তাঁহার নিকৃষ্টতম ছবির মত একখানা ছবিও আমরা আঁকিতে পারি না।

মানুষের জীবনের ও কার্য্যক্ষেত্রের অন্যান্য বিভাগেও এই কথা খাটে। বুদ্ধদেব ও যিশু খৃষ্ট কি ভুল করিয়াছিলেন, তাহা আমরাও হয়ত দু একটা বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু তাঁহারা যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হইয়াছিলেন, অতি অল্পলোকে তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করে বা সমর্থ হয়। রাজ্যশাসন কার্য্যে স্বদেশে বিদেশে কোন্ রাজা বা মন্ত্রী কি ভুল করিয়াছিলেন, সমালোচকেরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সমালোচকদিগকে রাজ্য শাসন করিতে দিলে তাঁহারা কতদূর সাফল্য লাভ করিতেন, তাহা বলা যায় না। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিগণ কিরূপ ভাবে যুদ্ধ করিলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিতেন, তাহা ঐতিহাসিকেরা বলিতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের নিজের সেনানেতৃত্ব সপ্রমাণ হয় না।

আমরা একথা বলিতেছিনা যে সমালোচনা সহজ কাজ বা নিষ্প্রয়োজন। সমালোচনা সহজও নয়, ইহার উপকারিতাও আছে। সমালোচনা দ্বারা, অতঃপর যাহারা কিছু করিবে, তাহাদের ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা অনেকটা কম হয়। দুর্নীতি, কুসংস্কার, প্রভৃতির সমালোচনারূপ বিনাশের কাজ আগে না করিলে সুনীতি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান বিস্তার হইতে পারে না। কিন্তু কেবল সমালোচনা, কেবল বিনাশ, দ্বারা কাজ হয় না। কি ভাল নয়, কি সুন্দর নয়, কি কার্য্যকর নয়, কোন্‌টা ঠিক্ আদর্শ নয়, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল না। শ্রেয়ের, সুন্দরের, কার্য্যকরের, সৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা যে করিতে পারে, তাহার জীবনের সফলতা অধিক।

একজন মানুষের পক্ষে যেমন এই কথা খাটে, কোন জাতির, দেশের, সমাজের, বা সম্প্রদায়ের মানবসমষ্টির পক্ষেও তেমনি এই কথা প্রযুজ্য। কে কি করিল না, তাহার আলোচনা লইয়া দিন কাটাইলে চলিবে কেন? আমরা কি করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট কি করিলেন না, বা গবর্ণমেণ্টকৃত কার্য্যের কি দোষ, তাহার আলোচনায় আমরা যতটা সময় ও শক্তি প্রয়োগ করি, তাহার কিয়দংশ, আমাদের নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে সুফলপ্রদ হয়। আমরা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনার বিরোধী নহি। ইহা করা আবশ্যক। কঠোর আইন না থাকিলে, এই সমালোচনা কার্য্য স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতার সহিত হইতে পারিত, ইহাও ঠিক্। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা ছাড়া আমাদের আর কাজ নাই, বা বেশী কিছু কাজ নাই, ইহা মনে করা ভুল। যে সব দেশের শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্র, তাহাদের সহিত আমাদের প্রভেদ ভুলিয়া যাওয়াও ঠিক্ নয়। ইংরাজেরা তাহাদের গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে তাহা নিতান্ত অশোভন হয় না। কারণ আজ যাহারা সমালোচক, কাল তাহারাই বা তাহাদেরই দল পার্লেমেণ্টে ক্ষমতা পাইয়া "গবর্ণমেণ্ট" নামধেয় হইবে ও নিজ জ্ঞানবুদ্ধি আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিবে বা অন্ততঃ কাজ করিবার সুযোগ পাইবে। আমাদের অবস্থা সেরূপ নয়। আমরা আজও সমালোচক, কালও সমালোচক। কাল আমরা "গবর্ণমেণ্ট" হইতে পারিব না। সুতরাং আমাদের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে আমাদিগকে সমালোচনা ছাড়া আরও কিছু করিতে হইবে। এইরূপ কিছু আমরা যে কেহই করি নাই, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের কাজের দর (quality), পরিমাণ ও শৃঙ্খলা ক্রমশঃ আরও খুব বাড়া দরকার, এবং ইহাতেই আমাদের শক্তি প্রধানতঃ প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ইহা সত্য যে গবর্ণমেণ্টের হাতে যেরূপ টাকা আছে, শক্তি আছে, সুশৃঙ্খল কার্য্যকারকের দল (organisation) আছে, আমাদের তাহা নাই। সত্য বটে, বে-আইনী সমিতির বিরুদ্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সুকার্য্যকারী সমিতির বিনাশ সাধনেও প্রযুক্ত হইতে পারে। সত্য বটে গোয়েন্দা ও গুপ্ত পুলিশের প্রাদুর্ভাবে নির্দ্দোষ দেশহিতকর কাজ করাও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে। কিন্তু সকল সুচেষ্টা অসম্ভব হয় নাই; কোন দেশে রাজনৈতিক ঘোরতর দুর্দিনেও অসম্ভব হইতে পারে না। বাধা অতিক্রমেই ত মনুষ্যত্বের পরিচয়। আমরা মানুষ কি না, তাহার পরিচয় কি দিতে পারিব না?

গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা এবং ভারতীয় ইংরাজ সম্পাদকগণ বলেন যে ভারতের শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদের প্রতিনিধি নহে। শিক্ষিতেরা তাহাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক ও অন্যবিধ আন্দোলন করে, দাবী দাওয়া করে। তাহারা দেশটাকে জানেইনা, দেশের পনের আনা যে অশিক্ষিত গরীব লোক, তাহাদের সঙ্গে উহাদের কোন সংস্পর্শই নাই। ইংরাজ রাজপুরুষেরাই এই পনের আনার মা বাপ ও প্রতিনিধি; তাঁহারাই উহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এবং উহাদের হিতের জন্য দেশ শাসন করেন।

আমরা এই সব ইংরাজদের দাবী দাওয়া হাসিয়া উড়াইয়া দি। কিন্তু আমরা যে দেশটাকে জানি, আমাদের সঙ্গে যে ঐ পনের আনা লোকের সংস্পর্শ আছে, কার্য্য দ্বারা তাহা প্রমাণ করিলে ভাল হয়। দেশটাকে আমরা জানি, কিন্তু সামান্যই জানি। সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আছে, কিন্তু তাহা বেশী নয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এমন লোক অল্পই আছেন যিনি, ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্, বঙ্গের সমুদয় জেলার সদর শহর দেখিয়াছেন, যিনি নিজের জেলার প্রধান প্রধান গণ্ডগ্রাম ও শহরগুলি দেখিয়াছেন। আমরা নিজের জেলার বিষয় জানিতে চাহিলে ইংরাজের লেখা বা সঙ্কলিত গেজেটীয়ার পড়ি; ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বৃত্তান্ত জানিতে হইলে ইংরাজের লেখা বহি ভিন্ন প্রায় গতি নাই। এ বিষয়ে বেশী যে কৌতূহল আছে, তাহাও বোধ হয় না। এরূপ বহি ইংরাজ ও ইউরোপীয়েরাই বেশী ক্রয় করে; এবং তাহারাও ভারতবাসীর লিখিত বা প্রকাশিত বহি কিনে না, পড়ে না। সুতরাং কোন ভারতবাসী এরূপ বহি লিখিলে তাহার পুণ্যসঞ্চয় হয়, কিন্তু পোকায় কাটা ভিন্ন বোধ করি অন্যরূপ কাটতি বড় বেশী হয় না।

দেশের জ্ঞান ত এই পর্য্যন্ত। দেশের লোকের সহিত সংস্পর্শ কিরূপ তাহাও চিন্তনীয়। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনের পর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মিলা মিশা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আসিয়াছিল। এখন সম্ভবতঃ আবার সামান্যরূপে বাড়িতেছে। কিন্তু যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষা এখনও খুব কম।

সুতরাং দেশকে দেখিয়া দেশকে জানিয়া নিজের করা, এবং দেশের লোককে জানিয়া তাহাদিগকে নিজের লোক করা, আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা একটা নিতান্ত মামুলি কথাই বলা হইল। কিন্তু ইহা করা তত সহজ নয়। আমরা "সাধারণ" লোকদের উপকার করিতে যাইতেছি, তাহাদিগকে উন্নত করিতে যাইতেছি, এই ভাবে আমরা মনের উপর জোর করিয়া তাহাদের সঙ্গে কতকটা মিশিতে পারি বটে। কিন্তু আমাদের সকলের সাধারণ মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সহজ সহৃদয়তার সহিত সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করা, একাগ্রসাধনার কাজ। অনেকে সম্মুখে পূজার ছুটি পাইতেছেন। এখনই এই সাধনা আরম্ভ হউক।

আমরা বলিয়াছি যে গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা অপেক্ষা আমাদের নিজের কিছু করা অধিক বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয়। আর, ইহাও ত সকলে দেখিতেছেন যে বর্ত্তমান সময়ে সমালোচনার মত সমালোচনা হইতেছে না। সকল সমালোচনারই অন্তরালে, "প্রভু, আমাদের প্রতি কৃপা কর", বা "প্রভু, আমাদের প্রতি ন্যায় বিচার কর", এই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতেছে। প্রকৃত সমালোচনা যদি করা চলিত, তাহা হইলেও আমাদের নিজের কিছু করার গুরুত্ব কমিত না।

তবে এখন কি করা যায়? ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে, জেলায়, শহরে বা গ্রামে অভাবের, রোগের, অজ্ঞানতার অভাব নাই। সুতরাং কাজ পাইলাম না, ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, বালক বৃদ্ধ যুবা, স্ত্রী পুরুষ, এ কথা কাহারও বলিবার যো নাই। এই ত এখন শিক্ষা বিষয়ে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। লোকের উৎসাহও দেখা যাইতেছে। মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, সার্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-আইন, হিন্দু-সমাজের উপেক্ষিত জাতিসকলকে শিক্ষাদানের চেষ্টা, এবং অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাদানের চেষ্টা, সমস্তই দেশের অজ্ঞানতা কোন না কোন প্রকারে দূর করিতে সমর্থ।

আমাদের যাহার যেরূপ শক্তি, সুযোগ ও অভিরুচি, আমরা তদনুসারে এই শিক্ষা কার্য্যে লাগিয়া যাই না কেন? বিদ্যাদানের চেয়ে বড় দান আর কি আছে?

দর্শনাচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় লণ্ডনে সার্ব্বজাতিক মহাসম্মিলনে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন, এসংবাদ আমরা গতমাসে দিয়াছি। সম্প্রতি তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

ও অন্যান্য দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার বিশাল জ্ঞানের পরিচয় পাওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তিনি সম্মিলনীর জন্য যে আশ্চর্য্য জ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদনুসারে উহার একটী স্থায়ী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার বিদেশযাত্রা সফল হইয়াছে।

তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহার জ্ঞানের ফল নানাভাবে পাইবার জন্য উৎসুক; তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত এই কথা জানাইতেছি।

বিদেশে, বিশেষতঃ জাপানে ও আমেরিকায় যে সকল ছাত্র বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যান ও কৃতী হইয়া ফিরিয়া আসেন, আমরা মধ্যে মধ্যে সেরূপ ১।১ জনের খবর পাইলে

শ্রীবিনয়ভূষণ বসু।

প্রকাশিত করিয়া থাকি। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বি[illegible]ভূষণ বসু অন্যতম। ইনি জাপান ও আমেরিকা হইতে লিথোগ্রাফি ও টিনের উপর ছাপা শিখিয়া আসিয়াছেন। এই দুই ব্যবসায়ই ভারতবর্ষে বেশ লাভজনক হইতে পারে।

পুস্তক-পরিচয়

সওগাত—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, প্রণীত। কলিকাতা ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ১৫২+৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকখানি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। ইহাতে নিম্নলিখিত ১৬টি গল্প আছে—একটি মেহেদির পাতা, দুকূলহারা, প্রবাসী, মা, আমার ডাক্তারী, সাগর সঙ্গম, মুক্তি, ভূতের ষটকালী, অন্নসংস্থান

স্বাবধান, পরথ, সফলস্বপ্ন, মৃত্যুমিলন, সদানন্দের বৈরাগ্য, চায়া-ওল্লা, দেয়ালের আড়াল ; এগুলির অধিকাংশই প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাসীর পাঠকেরা জানেন যে চারু বাবুর লেখা বেশ সরস, এবং তাঁহার গল্পগুলি একঘেয়ে নয়, ঘটনাবৈচিত্র্যে কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। অনেকগুলির মধ্যে, কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া রম্যবেশে অনেক সামাজিক সমস্যাও দেখা দেয়। অবশ্য লেখক সমাজসংস্কারকের মত যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন নাই, হৃদয়ের তুলি দিয়া চিত্র আঁকিয়াছেন মাত্র। কিন্তু সুস্থ হৃদয়ের জয় সর্ব্বত্রই অবশ্যম্ভাবী।

ফুলের ফসল—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। মূল্য আট আনা। ১০৫+১৬ পৃষ্ঠা। এণ্টিক্ কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্, ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ইহাতে ১১০টি সুন্দর কবিতা আছে। বহিখানির নাম নির্ব্বাচন ঠিক্ হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে মহম্মদের যে উক্তিটির পদ্যানুবাদ দওয়া হইয়াছে, তাহাও বেশ উপযোগী হইয়াছে। তাহার শেষ চারি ছত্র এই—

"বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা।"

কবিতা যেরূপই হউক, তাহাতে রসোদ্দীপনের ক্ষমতা থাকা চাই, তাহাতে সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের ঝঙ্কার থাকা চাই, তাহা হইতে আনন্দ পাওয়া চাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কবিতা হইতে আত্মার অন্ন পাই, তদ্দারা আত্মা পরিপুষ্ট হয়। এই জাতীয় উৎকৃষ্ট কবিতা সত্যেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বপ্রকাশিত পুস্তক চারিখানিতে বিস্তর আছে। বর্ত্তমান পুস্তকের অধিকাংশ কবিতা অন্য ধরণের। এগুলি ফল নয়, ফুল। শোভা আছে, আনন্দ আছে, সঙ্গীত আছে, মধুও আছে; তাহার বেশী খোরাক্ কবি আমাদিগকে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহার বর্ত্তমান অতিথিশালায় সবই স্বপ্ন, সবই পরী ও পরীদের ব্যাপার, বাতাসটি পর্য্যন্ত বড়ই মিহিন্, হৃদয়বেদনাগুলিও ফিকা, কোমল,—তীব্র বা অসহ্য নহে। ইহাতে কবি মহুয়া, অশোক, হাস্নুহানা, গোলাপ, করবী, আফিমের ফুল, চম্পা, বকুল, যূথী, শিরীষ প্রভৃতি কত ফুলের কথাই বলিয়াছেন। আমরা বহিখানি তাড়াতাড়ি পড়িয়াও অনেকগুলিরই স্বতন্ত্র প্রাণ ও ব্যক্তিত্ব ধরিতে পারিয়াছি। বহিখানির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কবির নিজের চোখে দেখিয়া নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়া কল্পনা করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অনেকগুলি কল্পনা ও নামকরণ বড় সুন্দর। যেমন তিনি চাঁদকে জ্যোৎস্না-মেঘ বলিয়াছেন। ঐ মেঘ হইতে জ্যোৎস্না বৃষ্টি হয়। অনেকগুলি কবিতার স্বতন্ত্র পরিচয় দিবার জন্য ও সমালোচনা করিবার জন্য দিয়া রাখিয়াছিলাম ; কিন্তু আর সময় নাই, স্থানও নাই।

প্রকৃতি পরিচয়—

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য ১।০, কাপড়ে বাঁধা, ২২৬ পৃষ্ঠা। জগদানন্দ বাবু বাঙ্গালায় বিজ্ঞান সাহিত্য লেখায় সিদ্ধহস্ত। এ পুস্তকখানির প্রবন্ধগুলি সব কথার ছলে বোলপুর শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বলা হইয়াছে। সুতরাং অতি সরল ভাষায় ও সহজে বোধগম্য ভাবে লিখিত। প্রাঞ্জল ভাষা পড়িয়া ভাবগুলি সহজেই বুঝা যায়। বিজ্ঞানের মত এমন জটিল বিষয় এমন সহজ করিয়া বলিবার সকলের ক্ষমতা নাই। সেই হেতু এই পুস্তকখানি বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী সকল লোকেরই পক্ষে বড়ই উপযুক্ত হইয়াছে। আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহারা বেশী কিছু জানে না তাহাদেরও ইহা কত জ্ঞান দিতে পারে। যে সব বিষয় ইহাতে লিখা আছে সে সব বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান আজকালকার সকলেরই পক্ষে আবশ্যক। সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই কিছু না কিছু পরিচয় আছে। যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, উদ্ভিদবিদ্যা ও জীবতত্ত্ব। দুই একখানি ছাড়া এরূপ ধরণের বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় আর নাই। ভূমিকা-লেখকের লিখার মত প্রাঞ্জল ও গভীর ভাবেই ইহারও সব তত্ত্বগুলি লিখিত। আশাকরি এ পুস্তকের সর্ব্বত্রই প্রসার ও আদর হইবে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

চীন ভ্রমণ—

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক প্রণীত। প্রকাশক মজুমদার লাইব্রেরী। শ্রীশরৎচন্দ্র দাসগুপ্ত লিখিত অবতরণিকা সম্বলিত দ্বিতীয় সংস্করণ। কাপড়ে বাঁধা ১৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০। এই পুস্তকখানি প্রথমে যখন বাহির হইয়াছিল, আমি তখন মৃত্যুর দ্বার হইতে আস্তে আস্তে ফিরিতেছিলাম। তখন সেই নিঃসঙ্গ প্রবাসে রুগ্ন অবস্থায় এখানি পাইয়া যে কি আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইহা প্রিয়বন্ধুর সরস সঙ্গের মতো আমার পক্ষে পরম রসায়ন হইয়াছিল। সুতরাং এ বইখানির প্রতি আমার পক্ষপাত হওয়া অসম্ভব নয়। দেশ দেখে অনেকেই, কিন্তু দেখার মতো দেখিতে জানে অল্প লোকেই ; ইন্দুমাধব বাবু সেই অল্প লোকেরই একজন। নিসর্গ দৃশ্য, মানুষের আচারব্যবহার, শিল্প, সাহিত্য, সমস্তই বৈজ্ঞানিক কবির চক্ষে তিনি দেখিয়াছেন এবং বর্ণনায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ণনা স্থানে স্থানে এমন কবিত্বময় ও করুণ যে পাঠকের হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া দেয়, কিন্তু ভাষা যদি আর একটু ভালো হইত। ভাষা একটু নীরস, একটু শিথিল ও গ্রাম্যতাদুষ্ট, এবং মধ্যে মধ্যে mannerism ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয় সংস্করণেও এ ত্রুটিগুলি অল্পস্বল্প আছে।

শিক্ষাবিজ্ঞান—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। ছাপা কাগজ ভালো। এই খণ্ডে প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ইহার ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুস্তকখানি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার করিবে।

পাট বা নালিতা—

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজদাস দত্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রবাসীর আকারের ৬৮ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য ॥০ আনা। পাট বা নালিতা চাষ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলির সহিত আরো নূতন প্রবন্ধ যোগ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিয়া লাভবান হইতে চান, তাঁহাদের অনেক জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

নবকথা—

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ৩১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥০ বাঁধা ১৸০। দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে ৫টি গল্প অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সবসুদ্ধ ১৭টি গল্প আছে ; প্রভাতবাবু ছোট গল্প রচনায় যশস্বী। কিন্তু এই গল্পগুলি তাঁহার কাঁচা হাতের রচনা ; গল্পের প্লট সব জায়গায় পরিণতি লাভ করে

নাই, গল্পের চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে ফুটে নাই, সর্ব্বত্র ভাষাও স্বচ্ছন্দ নহে; কিন্তু তাহারই অন্তরালে ওস্তাদের হাতের পরিচয় পাওয়া যে না যায় এমনও নহে। কোথাও ভাবের জটিলতা নাই, ভাষার মারপ্যাচ নাই, সর্ব্বোপরি একটি কৌতুকরসে গল্পগুলি পরিষিক্ত।

পৌরাণিক কাহিনী—

শ্রীলাবণ্যপ্রভা সরকার প্রণীত। প্রকাশক ব্রাহ্মমিসন প্রেস, ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। ডিং ফুলস্ক্যাপ ১৬ অং ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা। ইহাতে রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলি বিবৃত হইয়াছে।

ছোট্ট রামায়ণ—

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক ইউ রায় এণ্ড সন্স, ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট। সরল সরস পদ্যে রামায়ণের মূল কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। খুব ছোট ছোট ছেলেরাও বুঝিতে পারিবে। বিচিত্র ছন্দ ও হাস্য করুণ প্রভৃতি বিচিত্র রস পাঠের শ্রান্তি দূর করে। অনেক ছবি আছে; এবং তাহারও আবার অনেকগুলি রঙিন।

পশুপক্ষী—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। প্রকাশক সিটীবুক সোসাইটী। মূল্য দেড় টাকা। বঙ্গভাষায় প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক খুব অল্প। এই পুস্তকখানি আমাদের সাহিত্যের ঐ বিভাগকে পুষ্ট হইবার সাহায্য করিবে। ইহাতে দেশী বিদেশী বহুবিধ জানা অজানা পশু পক্ষীর বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা অনেক পশু পক্ষী দেখি অথচ তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানি না; অনেকের নাম শুনি, চেহারা পর্য্যন্ত দেখি নাই; সেই সব অপরিচিত বা অল্প পরিচিত পশু পক্ষীর রূপ গুণ প্রকৃতির সহিত পরিচয় সাধনের ইহা উৎকৃষ্ট উপায়। বহু চিত্রে ভূষিত। চিত্রগুলিও পরিষ্কার। ছাপা কাগজ, ভাষা উৎকৃষ্ট। ইহা শিশু ও বর্ষীয়ান সকলেরই শিক্ষণীয় বিষয়ে পূর্ণ। পুরস্কার ও উপহার দিবার মতো সুন্দর বই।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী—

শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত। প্রকাশক মণিকা প্রেস, ৫১।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট। এই মহাপুরুষের জীবনী ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত। ভাষা প্রাঞ্জল। রাজার জীবনের জ্ঞানপিপাসা, লোকহিতৈষণা ও ভগবৎপ্রীতি প্রভৃতি গুণ বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাজার একখানি সুন্দর রঙিন প্রতিকৃতি সহিত। ৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০ আনা।

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস—

রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী। মূল্য দুই বালুমে ৩৲ টাকা। এই বিখ্যাত পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া প্রকাশক সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। এই পুস্তক বাংলা ভাষার স্থায়ী সম্পদরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলা অনাবশ্যক। সিপাহী বিদ্রোহের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিরপেক্ষ ইতিহাস বাংলা ভাষায় আর নাই। ইহার সমাদর করা বঙ্গবাসীর কর্ত্তব্য।

যূথিকা—

শ্রীআমোদিনী ঘোষ প্রণীত। ঢাকা, সূত্রাপুর হইতে শ্রীরাখালদাস ঘোষ প্রকাশক। ৩৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। এখানি ছোট গল্পের বই। আটটি গল্প আছে। গল্পগুলি লেখিকার গল্পরচনার প্রথম উদ্যম, সুতরাং কাঁচা। প্লট প্রায়ই জমাট বাঁধে নাই। লেখিকার ভাষার উপর দখল আছে, শব্দসম্পদও মন্দ নয়; কিন্তু রচনারীতি এমন যে পদের গোলকধাঁধায় পড়িয়া আসল বক্তব্যের খেই হারাই হয়। অনেকস্থলে চরিত্রচিত্রণ একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে, অন্তঃপুরিকার অনভিজ্ঞতা দায়ী; অনেক স্থলে লেখিকা এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যাহা মহিলার উপযুক্ত হয় না পক্ষেও সাহিত্যসঙ্গত নহে। স্বাভাবিক হইলেই তাহা সাহি সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র মর্য্যাদা আছে। লেখিকার ক বুকনি অনেক স্থলে রসভঙ্গ করিয়াছে। কিন্তু এই সব লেখিকার রচনাশক্তির প্রচ্ছন্ন পরিচয় সর্ব্বত্র পাওয়া আপনাকে সংহত, সহজ ও অনাড়ম্বর করিয়া প্রকাশ কর করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন নিশ্চিত। লেখিকার শক্তি অ ত্রুটিগুলির নির্দ্দেশ করিলাম।

নির্ঝর—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত ছোট গল্পের বই ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। মূল্য আট আনা। ইহাতে আধুনিক গল্পগুলি একত্র করা হইয়াছে, সুতরাং এগুলি গল্পগুলিতে একটি নাটকীয় আর্ট ও স্বচ্ছতা আছে; গল্পগুলি বিচিত্র রসের। সুতরাং নির্ঝর নামটি সার্থক হইয়াছে বলা

পথের কথা—

শ্রীফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস মূল্য দশ আনা। এণ্টিক কাগজে নূতন হরপে পরিষ বাঁধাটি চমৎকার; এমন 'লিম্প বাইণ্ডিং' বাংলা কোনো নাই। এখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত—দেওঘর ও তপোবন, এটে পথে, বালেশ্বরে আট দিন, খুরদা, ও চক্রধরপুর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পর্য্যটক জলধর বাবু ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন, ভূ কোনো বিশেষত্ব নাই। গ্রন্থকারের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রকাশের শক্তি আরো অল্প। তপোবনের বর্ণনাটিই কতক পাঠ্য।

হিমাদ্রি—

শ্রীজলধর সেন প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস লাইব্রেরী। আনা। এখানি জলধর বাবুর প্রসিদ্ধ 'হিমালয়' গ্র সংস্করণ,—ছাত্রদের জন্য লেখা সাধু ভাষায় বাহুল্য বর্জ্জন ক ইহাতে হিমালয়ের বর্ণনা লেখকের বিচিত্র হৃদয়ভাবে মণ্ডিত মতো ফুটিয়াছে। ছাত্রদিগের দেবতাত্মা হিমালয়ের সহি উপায় করিয়া জলধর বাবু সৎকার্য্য করিয়াছেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি, ষষ্ঠভাগ—

আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক শ্রীযুক্ত কাঙ্গালী প্রণীত। কলিকাতা ৫৫নং অপার চিৎপুর রোডে আদি ব্র এবং ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এ পুস্তকখানির আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়ো ইতিপূর্ব্বেই ইহা সঙ্গীতসাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয় সঙ্গীত ব্রাহ্মসমাজের অমূল্য সম্পত্তি, কাঙ্গালীবাবু সেই সম্প উপায় করিয়া ধন্য হইলেন। ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রতি যাঁহাদে আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের ঘরে এই পুস্তক থাকা উচি অধ্যয়ন ব্যতিরেকে ব্রাহ্ম বালকবালিকাগণের শিক্ষা সম্প হইতে পারে না।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর র

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।